তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

১৮৪১ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩২৬। খৃঃ ১৯২০। সম্বৎ ১৯৭৬। কলিগতাব্দ ৫০২০।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বিংশ কল্প, প্রথম ভাগ।

১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী।

———

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

নববর্ষের অভিবাদন।

এই পুণ্যশ্লোক ভারতভূমিতে, এই অগণিত জনগণধারিণী পৃথিবীতে এবং অনন্ত আকাশের ভিতর দিয়া পরিধাবিত এই ব্রহ্মচক্রে, যেখানে যে সকল মহাত্মাগণ অতীত কালে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধন্য করিয়াছেন, বর্ত্তমানে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের মঙ্গলসাধন করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া জগতকে পবিত্র করিবেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ভগবৎসূর্য্য হইতে নিঃসৃত এক একটী বিস্ফুলিঙ্গ। তাঁহাদের সকলকেই প্রেমালিঙ্গনে আহ্বান করিয়া এবং প্রণতিসহকারে অভিবাদন করিয়া নববর্ষের কার্য্যে নবোৎসাহে প্রবৃত্ত হইলাম। ভগবান আমাদের শুভকার্য্যের সহায় হউন।

নববর্ষে প্রার্থনা।

(শ্রীমতী মনীষা দেবী)

আজ এই শুভ নববর্ষের প্রথম দিনে, হে পরমেশ্বর আমরা সত্যসুন্দর তোমার পূজার জন্য এখানে আসিয়াছি। আজ আমাদের হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তোমার জন্য আসন পাতিয়া রাখিয়াছি—তুমি এসো,—তোমাকে আমরা প্রীতিভক্তির পুষ্পপত্রের দ্বারা পূজা করিব। তুমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবের প্রতি প্রেম, করুণা, নিত্য অজস্র বিতরণ করিতেছ—তোমার প্রেম, তোমার করুণা যেন কখনও না ভুলি। হে দেব, হে নাথ! আমরা যেন তোমারই ছায়ায় দাঁড়াইয়া তোমারই মত সমগ্র বিশ্বে আপনাকে বিলাইতে শিখি। হে স্বপ্রকাশ তুমি তোমার প্রেমময় মূর্ত্তিতে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হও। হে জ্ঞানময়, তোমার অনন্ত জ্ঞান দ্বারা আমাদের হৃদয়কে আলোকিত কর। আমাদের কথায়, আমাদের ভাষায় তুমি আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। হে অমৃতময় পূর্ণপুরুষ; তোমার নাম-গানে পাপী তরিয়া যায়, তোমার সংস্পর্শে মৃত ব্যক্তিও সঞ্জীবিত হয়। হে সর্ব্ব-শক্তিমান, আমাদের এমন শক্তি দাও, যেন তোমার নামগানে কখনও অবহেলা ও আলস্য না আসে। প্রভু, ভগবান, তুমি আমাদের চিরসঙ্গী হইয়া থাক। প্রতি বৎসর, প্রতি মাসে, প্রতি দিনে, প্রতিক্ষণে তোমারই নাম লইয়া যেন তোমার সহবাসজনিত সুখ অনুভব করি। হে নাথ, তোমার সেই আনন্দময় অমৃতনিকেতনের পথ যেন পরিত্যাগ না করি, এই আশীর্ব্বাদ দাও। তোমার চরণে আমাদের ভক্তিপুষ্প উপহার দিতেছি, তুমি আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নববর্ষ।

দেবগিরি—ঝাঁপতাল।

নববর্ষ ফিরে এল অভিনব সাজে
আজিকে হৃদয় তন্ত্রী নব সুরে বাজে
কত লোক যায় আসে কত শোকানন্দে
পুরাতন যায় চলে রেখে যায় গন্ধে
তিমির রজনী যায় ছায়া তার ফেলে
আজি তব নামে সকলে নয়ন মেলে।

সুর, কথা ও স্বরলিপি শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
II { পা মা। গা -া রা। ন্‌া রা। সা -া সা I ন্‌া সা। রা -া গা।
ন ব ব ০ র্ষ ফি রে এ ০ ল অ ভি ন ০ ব

০ ১ ২ ৩ ০ ১ ২
। রা -পা। মা -গা I গা গা। পা -া ধা। না র্সা। পা -া পা I মা পা।
সা ০ জে ০ আ জি কে ০ হৃ দ য় ত ০ ন্ত্রী ন ব

৩ ০ ১
। গা -া সা। রগা -মপা। মা -গা -া } II
সু ০ রে বা০ ০০ জে ০ ০

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
II { পা গা। পা -া ধা। পধা -নর্সা। র্সা র্সা -া। র্সা র্সা। না ধা -না।
ক ত লো ০ ক যায় ০০ আ সে ০ ক ত শো কা ০

০ ১ ২ ৩ ০ ১
। পধা -নর্সা। ধা -পা -া } I { র্সা না। ধা -া না। পধা না। পা -া পা I
ন০ ০০ ন্দে ০ ০ পু রা ত ০ ন যায় ০ চ ০ লে

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
I মা পা। গা -া -সা। ন্‌সা -রগা। রা -া -া } II { সা সা। মা -গা মা।
রে খে যায় ০ ০ গ০ ০০ ন্ধে ০ ০ তি মি র ০ র

০ ১ ২ ৩ ০ ১
। পা গা। পা -া -া I ধনা র্সর্রা। র্সা -া পা। গা সা। রা -া -া } I
জ নী যায় ০ ০ ছা০ ০০ য়া ০ তার ফে ০ লে ০ ০

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
I পা -া I গা -া মা। পা -া। ধা -া পা I মা পা। গা -া সা।
আ ০ জি ০ ত ব ০ না ০ মে স ক লে ০ ন

০ ১
। রা -া। গা -া রা } II II
য়ন ০ মে ০ লে

উদ্বোধন।

জর্মনির শ্রেষ্ঠতম কবি মৃত্যুকালেও "আলো—আরও আলো" বলিয়া তাঁহার হৃদয়ের জ্ঞানালোক পাইবার গভীর পিপাসা প্রকাশ করে গেছেন। এই জ্ঞানপিপাসা প্রত্যেক মানুষেরই ভিতর অল্পবিস্তর পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু আমরা সংসারের সুখ, ভোগবিলাস কিছু বেশী ভালবাসি, তাই স্বার্থ, কুসংস্কার প্রভৃতি রকম-বেরকমের পাষাণ-পাথর দিয়ে হৃদয়ের কবাট বন্ধ করে রেখেছি—হৃদয়ের অন্ধকার দূর করতে ভয় পাই, পাছে সুখের স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। কিন্তু হায়! আমরা জানিনে যে, হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে দিতে পারলে সুখের মাত্রা কত গুণ বেড়ে যাবে। আমরা তো প্রত্যেকেই মায়ের ছেলে বটে। সকালবেলা প্রথমেই যদি মায়ের প্রসন্ন মুখ দেখি, তাঁর পায়ে প্রণাম করে যদি কাজ করতে আরম্ভ করি, তাহলে প্রাণের ভিতর কি আনন্দ আসে, কি অনুপম সুখ হয়। আমরা সংসারের নানারকম প্রলোভনে ডুবে গিয়ে ভুলে গেছি যে আমাদের জননী হৃদয়-কবাটের বাহিরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বার্থের মোহে হৃদয়ের অন্ধকারকে ভালবেসে বাহিরে জননীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। খোলো—খোলো—সরিয়ে ফেল পাথরের বাধা—জননীকে ভিতরে আসতে দাও, তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখে জীবনকে ধন্য কর। তাঁর মুখের জ্যোতিতে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়ে যাক। প্রভাতে পাখীদের গানের মতো হৃদয় থেকে নতুন নতুন গান উঠতে থাকুক। এমন গান উঠুক যে, সেই গান গেয়ে তোমারও যেমন তৃপ্তি হবে, সেই গান শুনে অন্যদেরও তেমনি প্রাণমন ভরে উঠবে। পাষাণের বাঁধ সরিয়ে ফেলে মায়ের চরণে মা—মা—বলে আছড়িয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমাদের মা যে করুণার ধারা—ক্ষমা চাহিলেই ক্ষমা পাবে—আর তাঁর সেই অরূপ রূপের জ্যোতিতে প্রসন্ন মুখ দেখে জীবনকে মঙ্গলের পথে চালিয়ে দাও।—এই উপাসনাক্ষেত্র জননীর অধিষ্ঠান। এখানে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখে নাও—না দেখে গৃহে শূন্যহস্তে ফিরে যেও না—ফিরে যেও না। এসো, প্রাণ খুলে মন খুলে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হয়ে জননীর পূজার প্রবৃত্ত হই।

ঈশ্বরকে না জানার ফল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঈশ্বরকে জানলে অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন জেনে তাঁর মঙ্গলভাবের উপর নির্ভর করে থাকলে কি রকম নির্ভয় হওয়া যায়, শান্তি পাওয়া যায়, সে কথা আমি গেল বারে বলে' এসেছি। এবারে ঈশ্বরকে না জানার ফল কি, সেই বিষয়ে দু'চার কথা বলতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বরকে না জানার মানে এই যে, ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাস না করা অথবা আছেন কিনা সন্দেহ করা। ঈশ্বরে যার বিশ্বাস থাকবে না, তার আত্মা আছে বলেও বিশ্বাস থাকতে পারে না, কাজেই পরলোক আছে বলেও তারা বিশ্বাস করতে পারে না। ঈশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই, এই রকম এ-নেই, ও-নেই বলবার জন্য, নেই নেই স্পষ্ট করে না বলেও থাকা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের জন্যও, সংক্ষেপে এই মতকে নাস্তিকমত বলে। যারা এই মত ধরে' থাকে, তাদের নাস্তিক বলে।

একজন নাস্তিকের বিষয় বেশ ভেবে দেখা যাক। সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, আত্মাতে বিশ্বাস করে না, পরলোকে বিশ্বাস করে না। ভেবে দেখ, সে বেচারী নির্ভর করে কার উপর? তার মতো কি দুর্ভাগা আর কেউ আছে? এ রকম লোকের বিষয় ভাবলেতো আমার খুবই কষ্ট হয়, দুঃখে চোখে জল আসে। তার কাছে এই প্রকৃতির শক্তিগুলো অন্ধ শক্তি—দয়ামায়াহীন হয়ে তাকে যেন ছিঁড়ে খাবার জন্য উদ্যত। এই বিশাল বিরাট প্রকৃতির কাছে সে কতটুকুই বা মানুষ! সে প্রকৃতির অখণ্ডনীয় শক্তির সঙ্গে লড়াই করে পারবে কেন? আর লড়াই করে জিততে পারে না বলেই একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। সকলেই দেখেছে যে সমুদ্র বল, পুকুর বল, জলাশয় মাত্রেই মধ্যে মধ্যে ফেনার মতো বুদ্বুদ ওঠে, আবার এক আধ মিনিট থেকে আপনিই সেগুলি ফেটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। অবশ্য এই সব বুদ্বুদ আসবারও কারণ আছে, যাবারও কারণ আছে। কিন্তু সচরাচর লোকেরা সে কারণের কথা ভাবে না। লোকেরা ভাবে যে বুদবুদগুলো অমনি এসেছিল, আর অমনি চলে গেল। সেই রকম নাস্তি-

কেরাও মনে করে যে, কতকগুলো অন্ধশক্তির বলে সে এই সংসারে এসে পড়েছে, সজ্ঞান জীবের আকারে দুচারদিন সংসারে খেলা করবে, আবার কিছুদিন পরে সেই সব অন্ধশক্তির বলেই মৃত্যুর কবলে পড়বে। এই যে সংসারে জীবনমৃত্যুর লড়াই চলছে, দিনরাত মারামারি কাটাকাটি চলছে, মানুষ যে তার ভিতর কেন এল, কোত্থেকে এল, কে তাকে পাঠালে, সে কথা নাস্তিক বলতে পারে না। সত্যি সত্যি কেমন করে' যে সে জন্মগ্রহণ করে' জীবনীশক্তি পেয়ে বেড়ে চলেছে, কোন্ শক্তি ভিতরে থেকে সেই জীবনীশক্তিকে ঠিকঠাক রেখে তাকে বাড়বার পথে চালিয়ে বেড়াচ্ছে, সে কথা নাস্তিক বলতে পারে না। নাস্তিক এ কথা বলতে পারে না যে দুদিন পরে সে কোথায় যাবে—মরে' গেলেই কি শেষ হয়ে গেল, না অন্য কোন ভাল লোকে গিয়ে ভাল ভাব নিয়ে নতুন জীবন লাভ করবে? ভেবে দেখ, তার প্রাণের ভিতরে কত বড় একটা অন্ধকার চেপে বসে' আছে। সে যে বেঁচে আছে, সুখে আছে, সেইটাই তার কাছে সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়—সমস্যার বিষয়। তার ভিতরে যে জ্ঞান, যে ভালবাসা, যে ভক্তি এসে তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, সেই সব জ্ঞান, প্রীতিভক্তি কোথা থেকে এল, কি উদ্দেশ্য নিয়েই বা তারা এল, এ সমস্ত প্রশ্নের ভাল রকম উত্তর সে দিতে পারে না। যা কিছু সে দেখে শোনে, সে সমস্তেরই ভিতর সে কেবল মৃত্যুরই ছায়া দেখে; সংসারের প্রেমভক্তিজ্ঞান, এ সমস্ত যে জীবনকে সজীব করবার জন্য, উন্নত করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, সে কথা সে মনে করতে পারে না, কেননা তার কাছে জীবনের শেষ উদ্দেশ্য বা ফল মৃত্যুর বাহিরে আর কিছুই নয়। এই রকম ভাবতে ভাবতে ধর্ম্মজ্ঞান বলে আমরা যা বুঝি, সেটা আর নাস্তিকের মনে ঠাঁই পায় না। তার কাছে যখন এই শরীর, এই সংসার কিছুদিনের স্বপ্নমাত্র, মৃত্যুর পর যখন তার মতে কোন কিছুই থাকে না, তখন ধর্ম্মজ্ঞানের ভিত্তি, ন্যায় অন্যায়ের ভাবগুলোও তার কাছে যে কিছুদিনের স্বপ্নমাত্র। তখন সেই ভুয়ো জিনিস—ন্যায়ের স্বত্ব বজায় রাখবার জন্য সে দিনরাত পরিশ্রম করতে রাজি হতে পারে না—একটা স্বপ্নকে বজায় রাখবার জন্য তার কি এত মাথাব্যথা পড়ে' গেল?

নাস্তিক বল আর সংশয়বাদী বল, সে যদি ঠিক নিজের যুক্তির উপর মতের উপর দাঁড়াবার চেষ্টা করে, তাহলে তার সুখশান্তি থাকতে পারে না। তার আত্মীয়স্বজন রোগশয্যায় পড়ে' যন্ত্রণায় ছট-ফট করতে থাকলে একজন আস্তিকের মতো ভগ-বানের হাতে সমস্ত সঁপে দিয়ে শান্তিলাভ করতে পারে না। ইহলোকে বা পরলোকে, কোথাও তার আত্মীয় যে ভগবানের ভালবাসা হারাতে পারে না, এ কথা সে বুঝতেই পারে না, কাজেই আস্তি-কের মতো সে নির্ভয় হতে পারে না, আর উদ্বেগ অশান্তির মধ্যে বাস করে। তার মনের উপর অবিশ্বাস অশ্রদ্ধার বড় বড় পাথর চাপানো থাকে; সে পাথর ভেদ করে' তার হৃদয়ে শান্তি সান্ত্বনার কথা ঢুকিয়ে দেওয়া বড় শক্ত।

ভগবানের উপর নির্ভর করা তো দূরের কথা, নাস্তিক লোক মানুষের উপরেই কি এতটুকু নির্ভর করতে পারে? কি করে' নির্ভর করবে? তার কাছে মানুষ বলে' তো সত্যি সত্যি কোন কিছু নেই। মানুষ—এ সমস্তই তো তার কাছে আসলে জড় পদার্থ—শূন্য পদার্থ। যার জন্য মানুষ মানুষ, সেইটাই নাস্তিক স্বীকার করবে না। জড়পদার্থ কিম্বা ফাঁকা জিনিসের উপর কেউ কখনও নির্ভর করতে পারে না, আর নির্ভর করলেও সে নির্ভর বেশী দিন দাঁড়াতে পারে না। নাস্তিক বা সংশয়-বাদী বলেন কি না যে, মানুষের আত্মা নেই, আর থাকলেও তা জানা যায় না—মানুষ কেবল চোখ কান হাত পা এই সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে যে অনুভব পাওয়া যায়, সেই সমস্ত অনুভবের সমষ্টি বা একত্র জড়ো করা বা সংগ্রহ করা মাত্র। কাজেই যে নাস্তিক নিজের যুক্তির ঠিক ভিতরকার কথা তলিয়ে দেখবে, সে ঐ ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সংগ্রহের উপর নির্ভর পুরো বজায় রাখতে পারে না। শোকের অবস্থায় সে কারো কাছে সহানুভূতি আশা করতে পারে না; মনের ভালবাসা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারে না—জড় ইন্দ্রিয় তো প্রেমের সহানু-ভূতির আদান-প্রদান করতে পারে না। নাস্তিক স্ত্রীপুত্রের ভালবাসা বল, বাপমায়ের স্নেহ-প্রেমই

বল, কিছুই মনের সঙ্গে নিতে পারে না—তার মতে স্ত্রীপুত্র-বাপমা সবই যে বলতে গেলে জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভব মাত্র। সচেতন মানুষ অচেতন জড় বস্তুর কাছে কোন কিছুরই আদানপ্রদান করতেও পারে না, করবার প্রত্যাশাও রাখতে পারে না।

নাস্তিক মতটা ঠিকভাবে ধরলে মানুষের যে শান্তি থাকতে পারে না, নাস্তিকের জীবন যে অন্ধকারে ঘিরে ফেলে, একথা আমাদের দেশের লোক তো ছেলে বুড়ো সকলেই জানে, আর সকলেই স্বীকার করে। মহাভারতের কথা কে না জানে? সেই মহাভারতের ভিতর ভগবদ্গীতা নামে এক বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেশ ঢোকানো আছে। সেই গীতাতে অল্পকথায় নাস্তিকের দুর্দ্দশার কথা খুব স্পষ্টভাষায় বলা আছে—"মূর্খ ও অশ্রদ্ধাবান সংশয়াত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, কিছুমাত্র সুখ নাই। * নাস্তিক মতটা এ যুগে আমাদের দেশের চেয়ে বিলাতেই বেশী প্রচার হয়েছিল। বিলাতে ডেবিড হিউম নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত আমরা যাকে সচরাচর নাস্তিক মত বলে' বুঝি, সেইমত প্রচার করবার বড় পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনিও নাস্তিক মতের পরিণাম বিচার করে' শেষকালে নিরাশার অন্ধকারে ডুবে গিয়ে বল্লেন—"মানুষের বুদ্ধির অমিল আর অসম্পূর্ণতার বিষয়ে ভেবে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে; আমি যুক্তি, বিশ্বাস কোন কিছুই মানতে চাইনে, সবই ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছি। আমি কোথায় আছি—কে-ই বা আমি? আমি কি করে'ই বা এলুম, আর আমার শেষই বা কি হবে? কারই বা দয়া চাইব, আর কারই বা শাস্তি ভয় করব? কারাই বা আমাকে ঘিরে আছে? কার উপরেই বা আমার আর আমার উপরেই বা কার প্রভাব পড়ছে? এই সব প্রশ্নে আমি আকুল হয়ে পড়ছি; আমার বোধ হচ্ছে যেন অন্ধকার আমাকে গিলে ফেলতে আসছে; আমার হাত পা যেন শিথিল হয়ে আসছে।" † নাস্তিক মত ঠিক ধরতে গেলে কি ভয়ানক অবস্থাতে পড়তে হয়, তা উপরের কথা থেকে কেমন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

এখন বেশ ভাল করে' বোঝা যাচ্ছে যে, নাস্তিক যদি বলে যে, মানুষ মাত্রই আত্মাহীন কতকগুলো ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সমষ্টি তাহলে সে নিজেও একজন আত্মাহীন ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সমষ্টি হয়ে পড়ে। হাত-পা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলো তো সব জড় পদার্থ। হাত-পাগুলো কেটে ফেলে দিলে তারা কিছুই জানতে পারে না। সে গুলোর অনুভবগুলোও কাজেই জড়পদার্থেরই অনুভব। এই রকম তর্কের ফলে দাঁড়ায় এই যে, জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভবগুলো আছে, কিন্তু সেই অনুভবগুলো জানবার বোঝবার লোক কেউ নেই। অনুভব আছে, অনুভব বোঝবার লোক নেই—একথা শুনে তোমরা খুব হাসবে—হাসবারই যে কথা। এখন অনুভব করবার লোক থাক আর নাই থাক, নাস্তিকদের যুক্তি ঠিক বলে' ধরলে আর কিছু হোক আর নাই হোক, পৃথিবীতে ভাল বলে' সাধু বলে' যা কিছু আছে, সবেরই গোড়া কেটে দেওয়া হয়; কর্ত্তব্য বলে' কোন কিছু থাকতে পারে না, ভক্তিপ্রীতি কথার কথা হয়ে' পড়ে, ভাল কাজের উপর ঝোঁক চলে' যায়।

কোন্ মত ধরে' চল্লে মানুষের ভাল হয়, সেইটাকে মাপদণ্ড বা দাঁড়িপাল্লা করলে, না বলে' উপায় নেই যে, আস্তিক ও নাস্তিক মতের প্রভেদ—আলো ও অন্ধকারে প্রভেদ, স্বর্গ ও নরকের প্রভেদ। দেখা যায় বটে যে, অনেক আস্তিক লোক অর্থাৎ যারা বলে যে তারা ঈশ্বরে, আত্মাতে ও পরলোকে বিশ্বাস করে এমন অনেক লোক অসৎ কাজে অন্যায় কাজে ডুবে আছে; আবার অনেক নাস্তিক লোক আস্তিকের উপযুক্ত ভাল কাজ থেকে একটুও নড়েচড়ে নি। এ সত্যি হলেও হতে পারে। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে এই যে, ঐ আস্তিক লোক মুখে বলে বটে যে সে ঈশ্বর প্রভৃতিতে খুব বিশ্বাস করে, কিন্তু তার কাজেই পরিচয় পাওয়া যায় সে সে সত্যিসত্যি ঈশ্বর প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে না। আর যে নাস্তিক ভাল কাজ করে, সে আসলে কাজেতে আস্তিকেরই পথ ধরে' চলেছে। ঠিক যে নাস্তিক, তার তো কোন কাজই থাকতে পারে না,

* অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ গী. ৪. ৪৪

† Treatise on Human Nature Book I, Part IV, Sect. 7.

কেন না, সে তো কতকগুলো জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সমষ্টি বা সংগ্রহ মাত্র; কাজেই সে নিজে কোন কাজেরই কর্ত্তা হতে পারে না। আর, যদি বা সে কর্ত্তা হতে পারে বলে স্বীকার করাও যায়, তবুও তার পক্ষে উচুদরের ভাল নিঃস্বার্থপর কাজ করা সম্ভব নয়—এর একটু আভাস আগেই দিয়ে এসেছি। জড়বস্তু ছাড়া যখন কেউ কিছু নয়, তখন সেই জড়বস্তুর জন্য সে নিজের স্বার্থ ছাড়তে যাবে কেন? সে কেন সেই সব জড়বস্তুর ক্ষতি করে'ও নিজের ভোগবিলাস সাধন করবে না? নাস্তিকদের যুক্তির ফলে এই রকম সর্ব্বনাশকর মতে এসে পড়তে হয় বলে' অজ্ঞেয়বাদীদের একজন নেতা বলেছেন যে 'আস্তিক মত ভুল হলেও সেই অনুসারে কাজ করলে জগতের ভালই হয়'। *

এতক্ষণে এটা বোধ হয় বোঝা গেল যে, আস্তিক মত ধরে' কাজকর্ম্ম করলে ভালই হয়, আর নাস্তিক মত ধরে' কাজকর্ম্ম করলে খারাপই হওয়া সম্ভব। এও দেখা যায় যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই আস্তিক অর্থাৎ কোন-না-কোন এক ভাবে ঈশ্বরে, আত্মাতে আর পরলোকে বিশ্বাস করে। নাস্তিক লোক জগতে ক'টা? নাস্তিকের সংখ্যা হয়তো আঙ্গুলে গোনা যেতে পারে। এখন, নিজের যদি ভাল চাও, পরিবারের যদি ভাল চাও, সমাজের, দেশের যদি ভাল চাও, তবে এসো, আমরা ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, যে নাস্তিক মতের এমন ভয়ানক কুফল, সেই মতের প্রভাব থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করুন, তাঁর প্রেমের বর্ম্ম দিয়ে আমাদের সর্ব্বদা ঢেকে রাখুন।

গান।

(রাগিণী—কাফি-সিন্ধু)

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

ওগো তোমায় বিনা কাটবে যেদিন
ব্যর্থ সেদিন জানি
তোমার মনেই যোগে আমার
পূর্ণ জীবনখানি!

যেদিন আমি মোহের ঘোরে
আঁধার ঘরে রইবো পড়ে
রাখবো তোমায় দূরে দূরে
এসো বজ্র হানি!

তোমায় বিনা গেহ আমার
দগ্ধ মরু শূন্য আঁধার
সেই আঁধারে কেমন করে
রইবো বল প্রিয় আমার!

তাইতো সকল পরাণ আমার
থুয়েছি ঐ পায়ে তোমার
বেদন-কাঁদন নীরবে সহি
পরাণ-প্রিয় মানি!!

গীতাধ্যায় সঙ্গতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(গীতারহস্য—চতুর্দ্দশ প্রকরণ)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

ভগবান অর্জ্জুনকে প্রথমে এইরূপ বলিতেছেন যে, সাংখ্যমার্গের অধ্যাত্মজ্ঞানানুসারে আত্মা অমর ও অবিনাশী হওয়ায় "ভীষ্মদ্রোণাদিকে আমি বধ করিব" তোমার এই ধারণাটাই মিথ্যা। কারণ, আত্মা মরে না, মারেও না। মনুষ্য যেরূপ আপনার বস্ত্র বদলায় সেইরূপ আত্মা এক দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরে যায় এইমাত্র; কিন্তু সেইজন্য সে মরিয়াছে মনে করিয়া শোক করা উচিত নহে। ভাল; "আমি বধ করিব" এই ভ্রম স্বীকার করিলেও যুদ্ধ কেন করিব এইরূপ যদি বলো, তাহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রত প্রাপ্ত যুদ্ধ হইতে পরাবৃত্ত না হওয়াই ক্ষাত্রধর্ম্ম; এবং যখন এই সাংখ্যমার্গে প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন তুমি যদি তাহা না কর তাহা হইলে লোকে তোমায় নিন্দা করিবে; অধিক কি, যুদ্ধে মরাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। অতএব কেন বৃথা শোক করিতেছ? 'আমি মারিব', 'সে মরিবে' এই নিছক্ কর্ম্মবুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া, আমি কেবল আপনার স্বধর্ম্ম করিতেছি এই বুদ্ধিতে তুমি আপন প্রবাহপতিত কার্য্য কর, তাহা হইলে কোন পাপই তোমাকে স্পর্শ করিবে না। সাংখ্যমার্গানুসারে এই উপদেশ হইল। কিন্তু চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ কর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে পর শেষে সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই যদি এই মার্গ অনুসারে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়, তবে এই সংশয় থাকিয়া যায় যে উপলব্ধি

* At least this is a good working hypothesis—J. S. Mill.

হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, যুদ্ধ না করিয়া একেবারে তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করা কি ভালো নয়? পুরাপুরি গৃহস্থাশ্রম করিয়া তাহার পর বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে; যৌবনে গৃহস্থাশ্রমই করিতে হইবে এইরূপ মন্বাদি স্মৃতিকারদিগের আদেশ, এ কথা বলিলে চলিবে না। কারণ, যখনই হউক সন্ন্যাসগ্রহণই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে যখনই সংসারে বিতৃষ্ণা হইবে তখনই বিলম্ব না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই উচিত; এবং এই কারণেই উপনিষদেও "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা" এইরূপ বচন আছে (জা. ৪)। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে যে গতি হয়, রণক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে ক্ষত্রিয় সেই গতিই প্রাপ্ত হয়।

দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাঘ্র সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ॥

"হে পুরুষব্যাঘ্র! সূর্য্যমণ্ডলকে ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে দুইজন গমন করেন; এক যোগযুক্ত সন্ন্যাসী, আর এক, যে ব্যক্তি রণে অভিমুখ হইয়া মরে", এইরূপ মহাভারতে (উদ্যো. ৩২. ৬৫) উক্ত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থাৎ চাণক্যের অর্থশাস্ত্রেও এই অর্থের এক শ্লোক আছে—

যান্ যজ্ঞসংঘৈস্তপসা চ বিপ্রাঃ স্বর্গৈষিণঃ পাত্রচয়ৈশ্চ যান্তি।
ক্ষণেন তানপ্যতিযান্তি শূরাঃ প্রাণান্ সুযুদ্ধেষু পরিত্যজন্তঃ॥

"স্বর্গেচ্ছু ব্রাহ্মণ অনেক যজ্ঞের দ্বারা, নানা সরঞ্জামের দ্বারা ও তপস্যার দ্বারা যে লোকে গমন করে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণ দেয় সে তৎক্ষণাৎ সেই লোককেও ছাড়াইয়া যায়";—অর্থাৎ শুধু তপস্বী বা সন্ন্যাসী এবং নানা যাগযজ্ঞাদিকর্ত্তারাও যে গতি প্রাপ্ত হয়, রণক্ষেত্রে নিহত ক্ষত্রিয়ও সেই গতি প্রাপ্ত করে, (কৌটি. ১০. ৩. ১৫০-১৫২ এবং মভা, শাং ৯৮-১০০ দেখ)। "যুদ্ধরূপ স্বর্গের দ্বার ক্ষত্রিয়ের নিকট কচিৎ উদ্‌ঘাটিত হয়; যুদ্ধে মরিলে স্বর্গ ও জয়লাভ করিলে পৃথিবীর রাজ্য পাওয়া যায়" (২. ৩২, ৩৭) গীতার এই উপদেশের তাৎপর্য্যই এই। অতএব, সন্ন্যাস গ্রহণ কর কিংবা যুদ্ধ কর, ফল একই; ইহাও সাংখ্যমার্গ অনুসারে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। কিন্তু যাই বল না কেন, যুদ্ধ করিতেই হইবে এইরূপ নিশ্চিতার্থ এই মার্গের যুক্তিবাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না। সাংখ্যমার্গের এই বাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পরে ভগবান্ কর্ম্মযোগমার্গের প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং গীতার শেষ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত এই কর্ম্মযোগেরই—অর্থাৎ কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং তাহা মোক্ষের অন্তরায় না হইয়া বরং কর্ম্ম করিয়াও কিরূপে মোক্ষলাভ হয় তাহার বিভিন্ন প্রমাণ দিয়া সংশয়-নিবৃত্তিপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। কোন কর্ম্ম ভাল কি মন্দ ইহা স্থির করিবার জন্য সেই কর্ম্মের বাহ্য পরিণাম অপেক্ষা কর্ত্তার বাসনাত্মক বুদ্ধি, শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, ইহা প্রথমে দেখিতে হইবে, ইহাই কর্ম্মযোগতত্ত্বের প্রধান তত্ত্ব (গী. ২. ৪৯)। কিন্তু বাসনা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ ইহা স্থির করা শেষে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিরই কাজ হওয়ায়, নির্ব্বাচনকারী বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে স্থির করিতে না পারিলে বাসনাও শুদ্ধ ও সম হয় না। এই জন্য সেই সঙ্গেই ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, বাসনাত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিতে হইলে, সমাধির দ্বারা প্রথমে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে স্থির করা আবশ্যক, (গী. ২. ৪১)। জগতের সাধারণ ব্যবহার দেখিলে, অনেক লোক স্বর্গাদি বিভিন্ন কাম্য সুখ লাভ করিবার জন্যই যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কাম্য কর্ম্মের বৃথা উদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই জন্য তাহাদের বুদ্ধি—আজ এই ফল প্রাপ্তি হইবে, কাল আবার আর এক ফল পাওয়া যাইবে—এইরূপ চিন্তাতেই অর্থাৎ স্বার্থেতেই নিমগ্ন এবং সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল ও চঞ্চল হইয়া থাকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই-সব লোকেরা, স্বর্গসুখাদি অনিত্য ফল অপেক্ষা বড় অর্থাৎ মোক্ষরূপ নিত্য সুখ লাভ করিতে পারে না। তাই, কর্ম্মযোগমার্গের রহস্য অর্জুনকে বলা হইয়াছে যে, বৈদিক কর্ম্মের এই কাম্য উদ্যোগ ছাড়িয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে শিখো; কর্ম্ম করিবার অধিকার তোমার আছে; কর্ম্মের ফল পাওয়া কি না পাওয়া—ইহা কখনই তোমার আয়ত্তাধীন নহে (২. ৪৭); ফলদাতা পরমেশ্বর এইরূপ মনে করিয়া, কর্ম্মের ফল পাওয়া যাক্ কি না-যাক্ দুই সমান, এইরূপ সমবুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া যাহারা কর্ম্ম করে তাহাদের পাপ-পুণ্য কর্ত্তাকে স্পর্শ করে না; অতএব এই সমবুদ্ধিকেই আশ্রয় কর; এই সমবুদ্ধিকেই অর্থাৎ পাপস্পর্শ না লাগে এইরূপ কর্ম্মের যুক্তি বা কৌশলকেই যোগ বলে; এই যোগ সাধন করিলে, কর্ম্ম করিয়াও তোমার মোক্ষ লাভ হইবে, মোক্ষের জন্য কর্ম্মসন্ন্যাসই করিতে হইবে এরূপ নহে;—ইত্যাদি (২. ৪৭-৫৩)। ভগবান যখন অর্জুনকে বলিলেন যে, যে ব্যক্তির বুদ্ধি এইরূপ সম হইয়াছে তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়, (২. ৫৩), তখন অর্জুন পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেন যে, "স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণ কিরূপ হইবে তাহা আমাকে বলো"। তাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা করা হইয়াছে এবং শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থাকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে এইরূপ বলিয়াছেন। সার কথা, অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতায় যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা এই জগতে জ্ঞানীপুরুষের গ্রাহ্য "কর্ম্মত্যাগ" ও "কর্ম্মসাধন" (যোগ) এই দুই নিষ্ঠা হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে।

এবং যুদ্ধ কেন করিতে হইবে ইহার উপপত্তি প্রথমে সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই উপপত্তি অসম্পূর্ণ হয় দেখিয়া, পরে তখনই যোগ কিংবা কর্ম্মযোগ-মার্গানুসারে জ্ঞানের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এবং এই কর্ম্মযোগের স্বল্পাচরণও কিরূপ শ্রেয়স্কর ইহা বলিয়া তাহার পর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান স্বীয় উপ-দেশকে এই পর্য্যন্ত লইয়া চলিলেন যে, কর্ম্মযোগমার্গে কর্ম্মাপেক্ষা কর্ম্মের প্রেরক বুদ্ধিকেই যখন শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য হয়, তখন স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় তুমি নিজ বুদ্ধিকে সম করিয়া কর্ম্ম কর, তাহা হইলে কোন পাপই তোমাকে স্পর্শ করিবে না। এক্ষণে দেখা যাক্ পরে আরও কি কি প্রশ্ন বাহির হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়েই গীতার সমস্ত উপপাদনের মূল থাকায় তৎসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলো-চনা করিয়াছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "কর্ম্মযোগমার্গেও কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে আমি এক্ষণে আমার বুদ্ধিকে স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় সম করিলেই হইল; আমাকে যুদ্ধের ন্যায় নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে কেন তবে বলিতেছ? ইহার কারণ এই যে, কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলিলে, "যুদ্ধ কেন করিবে? বুদ্ধিকে সম রাখিয়া উদাসীন হইয়া কেন বসিয়া থাকিবে না," এই প্রশ্নের নির্ণয় হয় না। বুদ্ধিকে সম রাখিয়াও কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে পারা যায় না এরূপ নহে। তারপর, সমবুদ্ধি পুরুষের সাংখ্যমার্গানুসারে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধা কি? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান্ এক্ষণে এইরূপ দিতেছেন যে, পূর্ব্বে তোমাকে সাংখ্য ও যোগ এই দুই নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি সত্য; কিন্তু ইহাও মনে রেখো যে, কোন মনুষ্যের পক্ষে কর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করা অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য দেহধারী হইয়া আছে সে পর্য্যন্ত প্রকৃতি স্বভাবতই তাহাকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করিবে; এবং প্রকৃতি যখন এই কর্ম্মকে ছাড়িতে পারে না, তখন ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির ও সম করিয়া কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাকাই অধিক শ্রেয়স্কর। এইজন্য তুমি কর্ম্ম কর; কর্ম্ম না করিলে তোমার খাওয়া পর্য্যন্ত চলিবে না (৩, ৩-৮)। পরমেশ্বরই কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন; মনুষ্য নহে। ব্রহ্মদেব যখন জগৎ ও প্রজা সৃষ্টি করিলেন সেই সময়ে তিনি 'যজ্ঞে'রও সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রজাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞের দ্বারা তুমি আপনার সমৃদ্ধি করিয়া লও। এই যজ্ঞ যখন কর্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধ হয় না, তখন যজ্ঞ অর্থে কর্ম্মই বলিতে হয়। অতএব, মনুষ্য ও কর্ম্ম দুই-ই একসঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হইবে। কিন্তু এই কর্ম্ম কেবল যজ্ঞেরই জন্য এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য যজ্ঞ করা, এই কারণে এই কর্ম্মের ফলে মনুষ্যের বন্ধন হয় না। এখন ইহা সত্য যে, যে ব্যক্তি পূর্ণ জ্ঞানী হইয়াছে তাঁহার নিজের কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না; এবং লোকদিগের নিকটেও তিনি কোন বাধা পান না। কিন্তু ইহার দ্বারা সিদ্ধ হয় না যে, কর্ম্ম করিবে না। কারণ, কর্ম্ম হইতে কেহ নিষ্কৃতি পায় না বলিয়া এইরূপ অনুমান করিতে হয় যে, স্বার্থের জন্য না করিলেও সেই কর্ম্ম লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কামবুদ্ধিতে করা আবশ্যক (গী. ২, ১৭-১৯)। এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জনকাদি জ্ঞানী পুরুষ পূর্ব্বে কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং আমিও করিতেছি। তাছাড়া ইহাও মনে রেখো যে, লোকসংগ্রহ করা অর্থাৎ নিজের আচরণের দ্বারা লোক-দিগকে ভাল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া জ্ঞানী পুরুষদিগের অন্যতর মুখ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্য যতই জ্ঞানবান হউক না কেন, প্রকৃতির ব্যবহার তাহা হইতে অপসারিত হয় না; অত-এব কর্ম্মত্যাগ করা ত দূরের কথা, কর্ত্তব্য বলিয়া স্বধর্ম্মানুসারে আবশ্যক হইলে কর্ম্ম করিতে করিতে যদি মৃত্যুও হয় তাহাও শ্রেয়স্কর (৩, ৩০-৩৫); তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। ভগবান এইরূপ প্রকৃতিকে সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন দেখিয়া মনুষ্যের ইচ্ছা না থাকিলেও মনুষ্য পাপ কেন করে, অর্জ্জুন যখন এইরূপ প্রশ্ন করিলেন, তখন ভগবান এইরূপ উত্তর দিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন যে, কামক্রোধাদি বিকার বলপূর্ব্বক মনকে ভ্রষ্ট করে, অতএব ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের আপন মনকে বশে রাখিতে হইবে। সারকথা, স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধি সমতাপ্রাপ্ত হইলেও কর্ম্ম কাহাকেও ছাড়ে না; অতএব স্বার্থের জন্য না হউক, অন্তত লোকসংগ্রহের জন্যও নিষ্কাম-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতেই হইবে, এইরূপে কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা সিদ্ধ করিয়া "আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ কর" (৩, ৩০-৩১) এইরূপ পরমেশ্বরার্পণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবার, ভক্তিমার্গ বিষয়ক তত্ত্বেরও এই অধ্যায়ে প্রথম উল্লেখ হইয়াছে।

তথাপি এই বিচার-আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ না হওয়ায় চতুর্থ অধ্যায়ও তাহারই আলোচনার জন্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত যাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহা কেবল অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নূতন রচিত এইরূপ সন্দেহ যেন কাহারও মনে না হয়; এইজন্য চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভে এই কর্ম্মযোগের অর্থাৎ ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্ম্মের ত্রেতাযুগধারী পরম্পরা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, আদিতে কিংবা যুগারম্ভে আমিই এই কর্ম্মযোগমার্গ বিবস্বানকে, বিবস্বান মনুকে

এবং মনু ইক্ষ্বাকু:ক বলিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে ইহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ঐ যোগই (কর্ম্মযোগমার্গ) আমি এক্ষণে তোমা:ক পুনর্ব্বার বলিলাম; তখন অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, বিবস্বানের আগে তুমি কি করিয়া আসিবে? সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময়, সাধুদিগের সংরক্ষণ, দুষ্ট-দিগের নাশ এবং ধর্ম্মের স্থাপনা করাতেই আমার অনেক অবতারের প্রয়োজন; এবং এইরূপ এ লোক-সংগ্রহকারক কর্ম্ম আমি করিলেও আমার তাহাতে আসক্তি না থাকায় তাহার পাপপুণ্যাদি ফল আমাকে স্পর্শ করে না। এইপ্রকারে কর্ম্মযোগের সমর্থন করিয়া, এবং এই তত্ত্ব জানিয়াই জনকাদিও পূর্ব্বে কর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন এই উদাহরণ দিয়া তুমিও সেইরূপই কর্ম্ম কর, ভগবান অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার এইরূপ উপ-দেশ করিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে মীমাংসকদিগের এই যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে যে, "যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধন হয় না" তাহাই পুনর্ব্বার বলিয়া যজ্ঞের বিস্তৃত ব্যাপক ব্যাখ্যা এই ভাবে করা হইয়াছে যে, কেবল তিল-তণ্ডুল দগ্ধ করা কিংবা পশু বধ করা একপ্রকার যজ্ঞ সত্য, কিন্তু এই দ্রব্যময় যজ্ঞ হালকা-রকমের এবং সংযমাগ্নিতে কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দগ্ধ করা কিংবা 'ন মম' বলিয়া, ব্রহ্মেতে সমস্ত কর্ম্ম আহুতি দেওয়া উচ্চ দৈঠার যজ্ঞ, সে উচ্চদরের যজ্ঞের জন্য ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্ম কর অর্জ্জুনকে এক্ষণে এইরূপ উপদেশ করিলেন। মীমাংসক-দিগের ন্যায়ানুসারে যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্বতন্ত্ররূপে বন্ধন না হইলেও, যজ্ঞের কোন না কোন ফল পাইতেই হইবে। তাই, যজ্ঞও নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলে, তাহার জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম এবং স্বয়ং যজ্ঞ এই দুইই বন্ধন হয় না। শেষে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বভূত আপনাতে বা ভগবানে আছে এই জ্ঞান যে বুদ্ধি হইতে হয়, তাহারই নাম সাম্যবুদ্ধি, এবং এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম হইয়া তাহাদের কোন বাধা কর্ত্তায় অর্শে না। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"—জ্ঞানে সমস্ত কর্ম্মের লয় হয়; কর্ম্ম স্বয়ং বন্ধন হয় না, অজ্ঞান হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি। এইজন্য অজ্ঞান ত্যাগ কর এবং কর্ম্মযোগকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সার কথা, কর্ম্মযোগমার্গের সিদ্ধির জন্যই সাম্যবুদ্ধিরূপ জ্ঞান আব-শ্যক, এই অধ্যায়ে জ্ঞানের এই প্রকার প্রস্তাবনা করা হইয়াছে।

কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা কি অর্থাৎ কর্ম্ম কেন করিতে হইবে, তাহার কারণসমূহের বিচার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞানের কথা বলিয়া তাহার পর, কর্ম্মযোগের বিচার-আলোচনাতেও কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এইরূপ বারংবার বলায়, এই দুই মার্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠমার্গ কোন্‌টি তাহা বলা এক্ষণে আবশ্যক। কারণ, দুই মার্গের যোগ্যতা সমান বলিলে, ইহার মধ্যে যাহার যে মার্গ ভাল মনে হইবে সে তাহাই স্বীকার করিবে, কেবল কর্ম্মযোগকে স্বীকার করিবার কোন কারণ থাকিবে না। অর্জ্জুনের মনে এই সংশয় উৎপন্ন হওয়ায় পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন ভগবানকে এই প্রশ্ন করিলেন যে, "সাংখ্য ও যোগ এই দুই নিষ্ঠা সম্বন্ধে মিশ্রিতভাবে আমাকে না বলিয়া এই দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্‌টী, তাহা নিশ্চয় করিয়া আমাকে যদি বলো, তাহা হইলে সেই অনুসারে চলিবার সুবিধা হয়"। ইহার উত্তরে ভগবান স্পষ্টরূপে ইহা বলিয়া অর্জ্জুনের সন্দেহ দূর করিলেন যে, দুই মার্গই নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ সমান মোক্ষপ্রদ হইলেও, তন্মধ্যে কর্ম্মযোগেরই মহত্ত্ব অধিক—"কর্ম্মযোগো বিশি-ষ্যতে"—(৫. ২)। এই সিদ্ধান্তেরই দ্রঢ়ীকরণার্থ ভগবান্ আরও এইরূপ বলেন যে, সন্ন্যাস বা সাংখ্যনিষ্ঠার দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় তাহা কর্ম্মযোগের দ্বারাও যে লাভ হয় শুধু তাহা নহে; কর্ম্মযোগে যে নিষ্কাম বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত না হইলে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয় না; এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে পর, যোগমার্গের কর্ম্ম করিয়াও ব্রহ্মলাভ না হইয়া যায় না। ইহার পর, এ বিবাদে লাভ কি—যে, সাংখ্য ও যোগ ইহারা ভিন্ন? চলা, বলা, দেখা, শোনা, আঘ্রাণ করা ইত্যাদি শত শত কর্ম্ম ছাড়িব বলিলেও যদি তাহা ছাড়া না যায়, তবে কর্ম্মত্যাগের সঙ্কল্প না করিয়া, তাহা ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে করাই বুদ্ধিমানের মার্গ। তাই, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে থাকিয়া শেষে উহা দ্বারাই শান্তি ও মোক্ষলাভ করেন। ঈশ্বর তোমাকে কর্ম্ম কর এই-রূপও বলেন না, আর কর্ম্ম ত্যাগ কর এ কথাও বলেন না। এই সমস্ত প্রকৃতির খেলা; এবং বন্ধন মনের: ধর্ম্ম এই কারণে সমবুদ্ধি কিংবা 'সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা' হইয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম তাহার বাধা হয় না। অধিক কি, কুকুর, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী—ইহাদের সম্বন্ধে যাহার বুদ্ধি সম হইয়াছে এবং যে সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া আপনার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার যেখানে বসিয়া আছে সেইখানেই—ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষ-লাভের জন্য তাহাকে আর কোথাও যাইতে হয় না, অথবা সাধন করিতেও হয় না, সে মুক্ত হইয়াই আছে, এইরূপ এই অধ্যায়ের শেষ কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয়টি আরও আগাইয়া চলিয়াছে; এবং এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগে সিদ্ধির জন্য আবশ্যক

সমবুদ্ধি প্রাপ্তির উপায়টি কথিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকেই, ভগবান আপনার মত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কর্ম্মফলের আশা না রাখিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া, সংসারের প্রাপ্ত কর্ম্ম করে সে-ই প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত সন্ন্যাসী; অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ছাড়িয়া যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সে প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে। তাহার পর, ভগবান আত্মস্বাতন্ত্র্যের এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন যে, কর্ম্মযোগমার্গে বুদ্ধিকে স্থির করিবার জন্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা সে আপনা হইতেই করিবে; তাহা না করিলে তাহার দোষ অন্যের উপর দেওয়া যাইতে পারে না। ইহার পরে, এই অধ্যায়ে ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ যোগ কিরূপে সাধন করিবে, তাহার পাতঞ্জল দৃষ্টিতে, মুখ্যরূপে এই অধ্যায়ে বর্ণনা আছে। তথাপি যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়ামাদি সাধনের দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলেও তাহাতেও কার্য্যনির্ব্বাহ হয় না; সেই কারণে পরে সেই ব্যক্তির বৃত্তি "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" কিংবা "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি" (৬. ২৯, ৩০) এই প্রকার সর্ব্বভূতে সম হওয়া চাই, এইরূপ আত্মৈক্যজ্ঞানেরও আবশ্যকতা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে অর্জ্জুনের এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, এই সাম্যবুদ্ধিরূপ যোগ এক জন্মে সাধ্য না হইলে পুনর্ব্বার অন্য জন্মেও একেবারে আরম্ভ হইতেই সুরু করিতে হইবে—এবং পুনর্ব্বার সেই দশাই হইবে—এবং এই প্রকার যদি চক্র ক্রমাগতই চলিতে থাকে, তবে এই মার্গের দ্বারা মনুষ্য কখনই সদগতি লাভ করিতে পারিবে না। এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান প্রথমে বলিলেন যে, যোগমার্গে কিছুই ব্যর্থ যায় না, প্রথম জন্মের সংস্কার থাকিয়া গিয়া, অন্য জন্মে তাহা অপেক্ষা অধিক অভ্যাস হইয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে শেষে সিদ্ধি লাভ হয়। এইরূপ বলিয়া ভগবান এই অধ্যায়ের শেষে অর্জ্জুনকে পুনরায় এই নিশ্চিত ও স্পষ্ট উপদেশ দিলেন যে, কর্ম্মযোগমার্গই শ্রেষ্ঠ ও ক্রমশঃ-সুসাধ্য হওয়ায়, কেবল (অর্থাৎ ফলাশা না ছাড়িয়া) কর্ম্ম করা, তপশ্চর্য্যা করা এবং জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম-সন্ন্যাস করা—এই সমস্ত মার্গ ত্যাগ করিয়া তুমি যোগী হও, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগমার্গের আচরণ কর।

তান্ত্রিক বর্ণপরিচয়।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

শাস্ত্রে বর্ণের উপাদান বাগ্দেবতার চারিটি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থাচতুষ্টয় পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারিনামে অভিহিত হইয়াছে। কাদিমততন্ত্রে ইহাদের বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—প্রথমত আত্মার ইচ্ছাশক্তির অর্থাৎ আত্মপ্রণোদিত মনের আঘাতের দ্বারা মূলাধার চক্রে পরানামক উত্তম নাদ উৎপন্ন হয়। অনন্তর উহা বায়ুর দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে নীত হইয়া স্বাধিষ্ঠান চক্রে বিজৃম্ভিত হয়, অর্থাৎ আত্মবিস্তার করে। এবং পশ্যন্তী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তথা হইতে মন্দ মন্দ গতিতে ঊর্দ্ধদিকে যাইয়া অনাহত চক্রে বুদ্ধি তত্ত্বের সহিত যুক্ত হয়। তখন উহা মধ্যমা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তথা হইতে ঊর্দ্ধগতিতে কণ্ঠদেশস্থ বিশুদ্ধ চক্রে গমন করিয়া "বৈখরী" নামে অভিহিত হয়। অনন্তর কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানে যাইয়া তথা হইতে ক্রমে স্থানের গুণনিবন্ধন কণ্ঠ্যাদি সংজ্ঞাযুক্ত অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণাবলীরূপে অভিব্যক্ত হয়। *

শরীরের মধ্যে যে প্রসিদ্ধ মেরুদণ্ড অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যে সুষুম্না নামক নাড়ী অবস্থিত, তন্মধ্যে বজ্রানাড়ী, তন্মধ্যে চিত্রিনী নাড়ী এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী অবস্থান করিতেছে। গুহ্য দ্বারের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে এবং লিঙ্গমূলের দুই অঙ্গুলি নিম্নে কন্দমূল নামক স্থান। উহা মেরুদণ্ডের অধঃসীমা। কন্দ এবং সুষুম্না এতদুভয়ের সংযোগস্থলে চতুর্দ্দল মূলাধার চক্র বর্ত্তমান। লিঙ্গমূলের সমদেশে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে ষড়্‌দল স্বাধিষ্ঠান চক্র অবস্থিত। উহার ঊর্দ্ধে নাভিমূলের সমদেশে দশদল মণিপূর নামক চক্র অবস্থিত। তদূর্দ্ধে হৃদয়ে দ্বাদশ দল অনাহত চক্র, তদূর্দ্ধে কণ্ঠদেশে ষোড়শদল বিশুদ্ধ চক্র, এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দ্বিদল আজ্ঞা নামক চক্র অবস্থিত। প্রদর্শিত ছয়টি চক্রের মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, অনাহত ও বিশুদ্ধ, এই চারিটি চক্রের সহিত বর্ণনিষ্পত্তির সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ মূলাধার চক্র হইতে বর্ণপ্রক্রিয়ার সূক্ষ্মতম ব্যাপার আরব্ধ হয়, অনন্তর সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত বায়ুর প্রেরণানুসারে ক্রমে প্রদর্শিত অবস্থাচতুষ্টয় নিষ্পন্ন হইলে, পরে মুখমধ্যে সুস্পষ্ট বর্ণভাব ঘটিয়া থাকে। চক্রের বিস্তৃত বিবরণ ষট্‌চক্র-নিরূপণে দ্রষ্টব্য।

* স্বাত্মেচ্ছাশক্তিঘাতেন প্রাণবায়ুস্বরূপতঃ।
মূলাধারে সমুৎপন্নঃ পরাখ্যো নাদ উত্তমঃ॥
স এব চোর্দ্ধতাং নীতঃ স্বাধিষ্ঠানবিজৃম্ভিতঃ।
পশ্যন্ত্যাখ্যামবাপ্নোতি তথৈবোর্দ্ধং শনৈঃ শনৈঃ॥
অনাহতে বুদ্ধিতত্ত্ব-সমেতো মধ্যমাভিধঃ।
তথা তয়োর্দ্ধগতো বিশুদ্ধে কণ্ঠদেশতঃ॥
বৈখর্য্যাখ্যস্ততঃ কণ্ঠ-শীর্ষতাল্বোষ্ঠদন্তগঃ।
জিহ্বামূলাগ্রপৃষ্ঠস্থস্তথানাসাগ্রতঃ ক্রমাৎ॥
কণ্ঠতাল্বোষ্ঠকণ্ঠস্থঃ কণ্ঠোষ্ঠদ্বয়তস্তথা
সমুৎপন্নান্যক্ষরাণি ক্রমাদাদিক্ষকাবধি॥
কালীচরণকৃত ষটচক্রটীকা ১১ শ্লোক।

মহাবৈয়াকরণ ভর্তৃহরির গ্রন্থেও বৈখরী প্রভৃতি সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"বৈখর্য্যা মধ্যমায়াশ্চ পশ্যন্ত্যাশ্চৈতদদ্ভুতং" ১. ১৪৪। বাক্যপদীয়ের টীকাকার "পুণ্যরাজ" মহাভারতের প্রমাণের দ্বারা বৈখরী প্রভৃতির উৎপত্তিপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। বৈখরী অবস্থাই মানবদিগের ব্যবহারোপযোগী ; অতএব বৈয়াকরণের গ্রন্থে প্রথমতঃ বৈখরীই পঠিত হইয়াছে। উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, প্রয়োগকর্ত্তার অর্থাৎ যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহার প্রাণবায়ুর ব্যাপার-নিবন্ধন বৈখরী বাক্ প্রবৃত্ত হয়। কণ্ঠপ্রভৃতি স্থানে বায়ু বিবৃত হইলে অর্থাৎ তত্তৎস্থানে আঘাত করিলে "বৈখরী" বর্ণরূপ ধারণ করে। কেবল বুদ্ধিকল্পিত বর্ণাকারের অনুপাতিনী বাক্ প্রাণবৃত্তিকে অর্থাৎ স্থানবিশেষে বায়ুর আঘাতকে অতিক্রম করিয়া (অপেক্ষা না করিয়া) মধ্যমা অবস্থায় প্রবৃত্ত হয়। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা পশ্যন্তী। এই অবস্থায় কার্য্যকারণের বিভাগ অর্থাৎ উপাদান হইতে কার্য্যের স্বতন্ত্রতা বিবেচিত হয় না, এবং পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমেরও অভিব্যক্তি হয় না। ইহাই আবার অন্তরে (মূলাধার চক্রে) স্বরূপজ্যোতীরূপে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জ্যোতির্ম্ময়ী পরারূপে অবিনশ্বরভাবে অবস্থান করে। উহা আগন্তুক মলের সহিত নিরন্তর মিশ্রিত হইয়াও চন্দ্রের অন্ত্যকলার ন্যায় অর্থাৎ অবিনশ্বর অমাকলার ন্যায় * অত্যন্ত অভিভূত হয় না। উহার স্বরূপ দৃষ্ট হইলে পুরুষের অধিকার নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম করিবার আর প্রয়োজন থাকে না। † ষোড়শকল পুরুষে অবস্থিত পরা বাক্ অমৃত কলা বলিয়া কথিত হইয়াছে। *

পুণ্যরাজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাগ্‌দেবতা নিজের একচতুর্থাংশের দ্বারা মানবদিগের নিকট প্রত্যবভাসমান হন, অর্থাৎ একমাত্র বৈখরীই বর্ণাকারে অভিব্যক্ত হইয়া লোকব্যবহারের উপযোগী হইয়া থাকে ("সৈষা ত্রয়ী বাক্ চৈতন্যগ্রন্থিবিবর্ত্তবদনাখ্যেয়পরিমাণা তুরীয়েণ ভাগেন মনুষ্যেষু প্রত্যবভাসতে")। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ পাণিনীয় শিক্ষাগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ আত্মা কোনও একটি বিষয় বুদ্ধিস্থ করিয়া তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে মনকে নিযুক্ত করে, অনন্তর মন কায়স্থিত অগ্নিকে আঘাত করে, আহত অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করে, অগ্নিপরিচালিত বায়ু বক্ষঃস্থলে বিচরণসময়ে মন্দ্রধ্বনি উৎপাদন করে। অতএব প্রাণপ্রভৃতি

* চন্দ্রের ষোড়শ কলা ; তন্মধ্যে পঞ্চদশ কলা ক্রিয়াশীল, ইহাদের হ্রাস বৃদ্ধি আছে ; এবং ইহাদের ক্রিয়া হইতেই প্রতিপদাদি তিথির উৎপত্তি হইয়া থাকে। অমানাম্নী ষোড়শকলা নিত্যা, ইহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। উহাই জগতের আধার শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

† "স্থানেষু বিবৃতে বায়ৌ কৃতবর্ণপরিগ্রহা।
বৈখরী বাক্ প্রয়োক্তৃণাং প্রাণবৃত্তি-নিবন্ধিনী॥
কেবলবুদ্ধ্যুপাদানক্রমরূপানুপাতিনী।
প্রাণবৃত্তিমতিক্রম্য মধ্যমা বাক্ প্রবর্ত্ততে॥ •
অবিভাগাত্তু পশ্যন্তী সর্ব্বতঃ সংহৃতক্রমা
স্বরূপজ্যোতিরেবান্তঃ সৈষা বাগনপায়িনী॥
সৈষা সঙ্কীর্য্যমানাপি নিত্যমাগন্তুকৈর্ম্মলৈঃ
অন্ত্যা কলেব সোমস্য নাত্যন্তমভিভূয়তে
তস্যাং দৃষ্টস্বরূপায়ামধিকারো নিবর্ত্ততে
পুরুষে ষোড়শকলে তামাহুরমৃতাং কলাং।

অশ্বমেধপর্ব্ব।

* ষোড়শকল পুরুষের বিবরণ ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ কথিত হইয়াছে। শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা বলিয়াছেন, হে সৌম্য! পুরুষ ষোড়শকল (অর্থাৎ ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্মতম অংশ মনে শক্তিসঞ্চার করে, অন্নসারোপচিত মনের সেই শক্তি ষোড়শভাগে বিভক্ত, তাহাই পুরুষের কলা অর্থাৎ অংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মনেতে অবস্থিত ষোড়শভাগে বিভক্ত অন্নোপচিত শক্তিযুক্ত জীববিশিষ্ট পুরুষও ষোড়শকল বলিয়া কথিত হইয়াছে।) তুমি পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত আহার করিওনা, কেবল জল পান কর, জল পান করিলে অনাহার নিবন্ধন প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা নাই। অনন্তর শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন এবং পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি কি বলিব, তাহা আদেশ করুন। পিতা বলিলেন—তুমি ঋক্ যজু ও সাম বল। তখন শ্বেতকেতু বলিলেন পিতঃ! আমার কিছুই মনে পড়ে না! পিতা বলিলেন বাছা! যেমন প্রজ্জলিত বৃহদগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া খদ্যোতপরিমাণমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং অধিক দহন করিতে পারে না, এইরূপ তোমার ষোড়শ কলার মধ্যে পঞ্চদশ কলা অনাহারে বিনষ্ট হইয়া একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট আছে ; সুতরাং তদ্দ্বারা তুমি বেদ স্মরণ করিতে পারিতেছ না ; অতএব আহার কর। অনন্তর তিনি আহারান্তে পিতার সমীপে উপস্থিত হইলে পিতা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাই বলিতে সমর্থ হইলেন। তখন পিতা পুত্রকে বুঝাইয়া দিলেন যে বিপুল অগ্নির খদ্যোতপরিমাণমাত্র অবশিষ্ট একটি অঙ্গার তৃণের দ্বারা বর্দ্ধিত হইলে যেমন অনেক বস্তু দগ্ধ করিতে পারে, তেমনই তোমার একটিমাত্র অবশিষ্টকলা অন্নের দ্বারা উপচিত হওয়ায় এখন তদ্দ্বারা বেদ অনুভব করিতে পারিতেছ। হে সৌম্য! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়।

বায়ুই শব্দের উৎপাদন করিয়া থাকে। যেহেতু পরিশ্রান্ত ব্যক্তি কোনও বিষয়ে বলিতে ইচ্ছা করিলে সে বাহ্য বায়ু উদরস্থ করে, সেই বায়ু নাভি দেশে যাইয়া প্রাণাপানের গ্রন্থিস্থানে অপান বায়ুর সহিত মিলিত হয়। অনন্তর মনের সহিত মিলিত হয়, তৎপর মনোভিহত দেহস্থ অগ্নির দ্বারা আহত হইয়া প্লুতগতিতে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বেগের তারতম্যানুসারে মন্দ-মধ্যম-তীব্রভেদে ভিন্নধ্বনি উৎপাদন করিয়া মুখচ্ছিদ্রে উপস্থিত হইয়া নানা-জাতীয় শব্দ অভিব্যক্ত করে।

(অশ্বমেধপর্ব্ব ২য় অধ্যায় টীকা)

প্রপঞ্চসারেও মূলাধারসমুৎপন্ন পরা বাক্ হইতেই ক্রমে বর্ণাভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে, এবং প্রাণীদিগের মুখমধ্যে বৈখরীর অবস্থান কথিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাও কথিত হইয়াছে যে, বর্ণগুলি বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সুষুম্না নাড়ীর রন্ধ্রের দ্বারা নির্গত হইয়া কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে ঘট্টিত (আঘাত প্রাপ্ত) হইয়া মুখগহ্বরে অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়। * এই সম্বন্ধে প্রপঞ্চসারের টীকাকার সুগৃহীতনামা পদ্মপাদাচার্য্য আরও কিছু নিগূঢ় তত্ত্বের খবর দিয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে—জগতের মূলভূতা পরিণামিনী মায়াশক্তির আধারস্বরূপ চিদাত্মাই মূলাধার পদবাচ্য। সেই চিদাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও মলদ্বার ও লিঙ্গ এতদুভয়ের মধ্যস্থলে তাঁহার অভিব্যক্তি হয় বলিয়া সেই স্থানও মূলাধার নামে কথিত হইয়াছে। তথা হইতে প্রথম আবির্ভূত হয় যে চিদাভাস মায়া-শক্তি, তাহা জগতের উদ্ভাবন করে; অতএব ভাবনামে অভিহিত হইয়াছে। তাহাই পরাখ্য অর্থাৎ পরানামক বাক্, উহা চৈতন্যাবভাসবিশিষ্টতা-নিবন্ধন প্রকাশিকা মায়াশক্তির নিস্পন্দাবস্থা। পশ্যন্তী প্রভৃতি সস্পন্দাবস্থা। তাহাদের মধ্যে সামান্য স্পন্দস্বভাব শব্দের প্রকাশরূপিণী অর্থাৎ প্রকাশকারিণী বিন্দুতত্ত্বাত্মিকা অর্থাৎ ওঁকার ঘটক বিন্দুর পরিণাম বৈখরী অবস্থা। উহা দেহাভ্যন্তরে মূলাধার চক্র হইতে ক্রমে কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে অভি-ব্যক্ত হইয়া থাকে, ইহা বাকের সামান্যাবস্থা। এই সামান্য শব্দ হইতেই বিশেষ শব্দের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। পবন কর্ত্তৃক শব্দের প্রেরণা কথিত হইয়াছে; পবনশব্দে সমস্ত প্রেরকবর্গ অর্থাৎ পূর্ব্ব-বর্ণিত মন অগ্নি প্রভৃতি সমস্তই অভিপ্রেত হইয়াছে। অথবা সূক্ষ্মা পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী, এই পঞ্চপদী অর্থাৎ পঞ্চাবস্থাপন্ন বাকের অভিপ্রায়ে মূলাধার হইতে উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই মতে সূক্ষ্মা এবং পরা দুইটি অবস্থা। ইহা দ্বারা সপ্তপদী বাক্ অর্থাৎ বাক্‌নিষ্পত্তির সাতটি অবস্থাও সূচিত হইয়াছে। এই সপ্তাবস্থা গণনায় প্রথমাবস্থা শূন্যা, দ্বিতীয় সংবিৎ, তৃতীয় সূক্ষ্মা, চতুর্থ পরা, পঞ্চম পশ্যন্তী, ষষ্ঠ মধ্যমা, সপ্তম বৈখরী। তন্মধ্যে অনুৎপন্ন নিস্পন্দাবস্থা শূন্যা, উৎপত্তির ইচ্ছাযুক্তাবস্থা সংবিৎ, উৎপত্ত্যবস্থা সূক্ষ্মা। অন্যান্য অবস্থা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। *

ব্যাকরণশাস্ত্রে বর্ণের যে উদাত্তাদি স্বরবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ণাভিব্যঞ্জক বায়ুর গতি-বিশেষই তাহার কারণরূপে বিবেচিত হইয়াছে। যথা—বায়ু ঊর্দ্ধগতির তালু প্রভৃতি স্থানের ঊর্দ্ধভাগে গত হইয়া "উদাত্ত" স্বর উৎপাদন করে। নীচভাগে গত হইয়া "অনুদাত্ত" স্বর এবং বক্রগতির দ্বারা "স্বরিত" স্বর অর্থাৎ উদাত্তানুদাত্ত মিশ্রস্বর উৎপাদন করে। † সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণসম্বন্ধ যাবতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্বেরই আলোচনা হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

---

* মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু ভাবঃ পরাখ্যঃ
পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্‌মধ্যমাখ্যঃ
বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুরুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্না-
বদ্ধ স্তস্মাদ্ ভবতি পবন-প্রেরিতো বর্ণসঙ্ঘঃ ॥ ২।৪৩
সমীরিতাঃ সমীরেণ সুষুম্নারন্ধ্র নির্গতাঃ
ব্যক্তিং প্রযান্তি বদনে কণ্ঠাদিস্থানঘট্টিতাঃ ॥ ৩।৫৯।

* মূলং জগন্মূলভূতা পরিণামিনী মায়াশক্তিঃ ; তস্যা আধার-ভূত শ্চিদাত্মা মূলাধারঃ সর্ব্বগতস্যাপি তস্যাভি-ব্যক্তিস্থানত্বাৎ গুদমেঢ্রমধ্যোঽপি মূলাধারঃ, তস্মাৎ প্রথমমুদিতশ্চেতন্যাভাসঃ ভাবশ্চ যঃ জগদ্ভাবয়তীতি মায়াশক্তিভাবঃ। স পরাখ্যশ্চৈব তদবভাসবিশিষ্টতয়া প্রকাশিকা মায়া নিস্পন্দঃ পরা বাগিত্যর্থঃ। সস্পন্দাবস্থাঃ পশ্যন্ত্যাদ্যাঃ তত্র সামান্যস্পন্দপ্রকাশরূপিণীঃ বিন্দু-তত্ত্বাত্মিকামধ্যাত্মমূলাধারাদিকণ্ঠান্তমভিব্যজ্যমানাং শব্দ-সামান্যাত্মিকাং বৈখরীমাহ বক্ত্র ইতি .... সামান্যশব্দাদ্ বিশেষশব্দনিষ্পত্তিমাহ তস্মাদিতি। তস্মাদ্ বৈখর্য্যাত্মকভাবাদিত্যর্থঃ। পবনশব্দেন প্রেরক-বর্গঃ সর্ব্বোঽপ্যুক্তঃ। অথবা সূক্ষ্মা পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীতি পঞ্চপদীং বাচমভিপ্রেত্যাহ মূলাধারাদিতি। সপ্ত-পদ্যপি বাগনেনৈব সূচিতা। শূন্য-সংবিৎ সূক্ষ্মাদীনি সপ্তপদানি। তত্রানুৎপন্না নিস্পন্দা শূন্যা বাক্। উৎপিৎ-সুঃ সংবিৎ। উৎপত্ত্যবস্থা সূক্ষ্মা। মূলাধারাৎ প্রথম মুদিতেতি বিভাগঃ ॥

† উচ্চৈরূর্দ্ধগো বায়ু রুদাত্তং কুরুতে স্বরং
নীচৈর্গতোঽনুদাত্তঞ্চ স্বরিতং তির্য্যগাগতঃ ॥

(প্রপঞ্চসার। ৩।৬।)

আদর্শ
বা
দাদা ঠাকুর

তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। কাল—প্রভাত।

সেবা। ভাই, এবার আমাদের কঠোর পরীক্ষা সম্মুখে। আজ দীনের সহায় ধর্ম্মের প্রতিনিধি, বিপন্নের রক্ষাকর্ত্তা আমাদের গুরুদেব, ধনদাস রায়ের ষড়যন্ত্রে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

১ম। আমরা এর প্রতিশোধ নেব। ধনদাস রায়কে উচিত শিক্ষা দিব।

সেবা। আমাদের কাজ সেরূপ নয়। আমরা ক্রোধ করব না। প্রতিহিংসাবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে স্থান পাবে না। মনে কর দাদাঠাকুরের আদেশ। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু জগতের কল্যাণ। আমরা হাইকোর্টে আপীল করব। তোমরা নিশ্চিন্ত হও। ন্যায়ধর্ম্মের প্রতিনিধি বৃটিশ রাজ্যে কখনো নির্দ্দোষ ব্যক্তির সাজা হয় না।

২য়। আমরা অর্থ কোথায় পাব?

সেবা। সে জন্য চিন্তা নাই। এ গ্রামের অনেকেই দাদাঠাকুরের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হ'তে আজ আর কুণ্ঠিত নয়। যে দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন মাত্র ভিক্ষা করে' আনে, সেও তার আধমুষ্টি দিয়ে দাদাঠাকুরের সাহায্য করবে। কোনো চিন্তা নাই, শীঘ্র তাঁকে মুক্ত করে আনতে পারব। তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য কর। দাদাঠাকুর উপস্থিত না থাকায় যেন তাঁর কার্য্যের কোনো ব্যাঘাত না হয়। কেবল মুখে দাদাঠাকুরের উপর ভক্তি করলে হবে না। তাঁর উপদিষ্ট কার্য্য কর, তবেই প্রকৃত ভক্তি দেখানো হবে।

সকলে। আমরা অবশ্য তাঁর কাজ করব।

সেবা। বল সকলে জয় সচ্চিদানন্দ।

সকলে। জয় সচ্চিদানন্দ।

সেবা। তবে যাও ভাই, মনে রেখো আমাদের প্রচারের বিষয়, সার্ব্বভৌমিক প্রেম করুণা মৈত্রী। উদ্দেশ্য বিশ্বের কল্যাণ। যাও, তোমাদের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ধর্ম্মের তেজ, মাথার উপরে ভগবান। যাও সেবকগণ, অদম্য উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। বল আবার জয় সচ্চিদানন্দ।

সকলে। জয় সচ্চিদানন্দ। (সকলের প্রস্থান)

সেবা। কি মহাব্রত, তুমি যে গেলে না?

মহা। আমি আর এখানে থাকব না।

সেবা। কেন?

মহা। থেকে কি হবে?

সেবা। চাও কি?

মহা। চাই ধর্ম্মার্জ্জন।

সেবা। তার পক্ষে এ উত্তম স্থান।

মহা। আমার বিশ্বাস—না।

সেবা। কেন?

মহা। এও কি একটা আশ্রম? আর এ রকম কখনো গুরু হয়!

সেবা। কেন হবে না?

মহা। প্রথমতঃ দ্যাখো, এখানে একখানি ঠাকুরঘর পর্য্যন্ত নেই।

সেবা। গুরুদেব বলেন, ঠাকুর সব জায়গায় আছেন, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, একখানি ঠাকুরঘর করে নিতে পারো। তাতে তো তাঁর কোনো নিষেধ নেই। গুরুদেব বলেন সকলের জন্যে সমান ব্যবস্থা নয়। তিনি সব ধর্ম্মেরই সার সত্য মানেন।

মহা। আরো দ্যাখো, উনি ব্রাহ্মণ নন—কায়স্থ। আমরা বামুনের ছেলে, কায়স্থ কি কখন গুরু হোতে পারে?

সেবা। কেবল কি যজ্ঞোপবীত না থাকলেই ব্রাহ্মণ হয় না? যিনি ধার্ম্মিক তিনিই ব্রাহ্মণ।

মহা। ওঁর স্ত্রী আছে। উনি সংসারী মানুষ।

সেবা। গৃহত্যাগী হয়ে ভস্ম মাখলেই বুঝি খুব ধার্ম্মিক হয় তোমার বিশ্বাস? দ্যাখো উনি গৃহে থেকেও সন্ন্যাসী। গুরুদেব আদর্শ-গৃহস্থ।

মহা। কখনো দেখলাম না মালা জপ করতে, একটা আসন করতে, সন্ধ্যাপূজাও তো করে না। এ আবার কেমন ধর্ম্ম?

সেবা। ওঁর ভিতরে সাধনভজন যে সব সহজ হয়ে গেছে। বাইরে তাঁকে নানা কাজ করতে দেখছো, কিন্তু জেনো ভিতরে তাঁর সাধন চলছে।

মহা। উনি অনেক সময়ে ক্রোধ করেন।

সেবা। সেটা ক্রোধ নয়, তেজ। ক্রোধও যা তেজও তা। একটার গতি ঊর্দ্ধদিকে, আর একটার গতি নিম্নদিকে। গুরুদেব যে ভীম-কান্ত-গুণশালী।

মহা। আচ্ছা লোকটা যে একটু পাগলাটে ধরণের ভাই, সেটা অস্বীকার করবার যো নেই। আমার যেন ওটা একটু কেমন কেমন লাগে।

সেবা। তা বুঝেছি; প্রদীপের তলেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আঁধার। আমরা বড়ই হতভাগা, কাছে থেকে লোকটাকে চিনতে পারলুম না। মহাব্রত, এই আকাশের দিকে চাও দেখি, কি দেখছ?

মহা। দেখছি, বেশ উজ্জ্বল, সূর্য্যালোকিত আকাশ।

সেবা। আর কি দেখছো?

মহা। বিরাট মহিমাময়, প্রশান্ত।

সেবা। আচ্ছা, এই আকাশে যখন ঝড় উঠে তখন দেখেছো? যখন এর মাঝে কৃষ্ণমেঘমালা দৈত্যসৈন্যের মত গর্জ্জন করে, বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে তখন দেখেছো?

মহা। দেখেছি।

সেবা। তবে জেনে রাখো, গুরুদেবের চরিত্রও এই আকাশেরি মত। এতে গর্জ্জন আছে, বর্ষণ আছে, আবার প্রশান্ত ভাব আছে।

মহা। এ এক রহস্য!

সেবা। হাঁ রহস্যই বটে। এ বোঝা বড়ই কঠিন। লোকশ্রেষ্ঠগণের চরিত্র বোঝা সহজ নয়। এ চিনির পাহাড়ের মত; পিপ্‌ড়ে একটু খুঁটে নিয়ে মনে করে খুব নিয়েছি। দাদাঠাকুরকে অত অল্পে বোঝা যায় না। আমি দেখেছি যখন তিনি কোনো অনুতাপী ব্যথিতকে সান্ত্বনা দান করেন, তখন তাঁর আকৃতি সরল শান্ত। যখন ভগবৎকথা বলেন তখন দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। যখন কারেও শাসন করেন তখন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত তেজোময় খরতর মূর্ত্তি। আর যখন ছেলেদের সঙ্গে মেশেন, তখন তাঁকে যেমন দেখি, অমন আর কোনো সময়ে দেখি না। সে ভাব কি যে মধুর, তা বল্‌তে পারি না; কেবল অনুভব কর্‌তে পারি। তখন তিনি আধা পাগল, আধা বালক। আহা কি সুন্দর! কি সুন্দর!

মহা। আচ্ছা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য কি?

সেবা। সর্ব্বজীবের কল্যাণ, অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌম ধর্ম্মপ্রচার, আদর্শ-গৃহস্থ-চরিত্র প্রদর্শন।

মহা। এখন বুঝলাম। একখানি মেঘ কেটে গেল।

সেবা। চল এখন, অনেক কাজ আছে।

মহা। চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—ধনদাস রায়ের বাটী।—কাল অপরাহ্ন।

(ধনদাস রুগ্নশয্যায় শায়িত)

ধন। উঃ জ্বলে' গেল! জ্বলে গেল! পুড়ে গেল! ছাই হয়ে গেল! আমায় কে আগুনের ভিতরে ফেলে দিয়েছে! উঃ জ্বলে' গেল!

তর্ক। কবিরাজ মশাই, এ কি ব্যাধি?

কবি। বুঝ্‌তে পারছিনে।

ধন। কুলভূষণ কোথায়? এখনো একবার আমার কাছে এলনা। আমার যে শেষ হয়ে' আসচে!

কবি। তাকে ডাক্‌তে পাঠানো হয়েছে।

ধন। বড় ভয় করে; তোমরা আমার কাছে এস। আরো কাছে এস। আমার বড় ভয়,—বড় ভয়! আমি কি মরব? না না আমার মর্‌তে ভয় করে। উঃ ঐ যেন কারা আস্‌চে। উঃ কি ভীষণ চেহারা! আমায় তারা ডাক্‌চে। ঐ অন্ধকারের ভিতরে যেতে বল্‌ছে। আমি যাবোনা, যাবোনা। ধর, ধর, আমায় ধর!

কবি। এ কি ব্যাধি কিছুই যে বুঝ্‌তে পারিনে!

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। হাঃ হাঃ হাঃ আমি জানি।

কবি। কে তুমি?

পাগ। আমি পাগ্‌লী—

কবি। এখানে কেন এসেছ?

পাগ। বল্‌তে।

কবি। কি বল্‌তে?

পাগ। রোগের কথা।

তর্ক। আঃ যা বেটী, এখানে গোল করিস্‌নে। একে আস্‌তে দিলে কে?

কবি। তাড়াবেন না। দেখি ব্যাপারটা কি?

পাগ। তাড়িয়ে দেবে? তা দিও; আমি তো তাড়া খেয়েই ফিরি। ওতে আর আমার কি হবে? তবে বল্‌ব, তবে বল্‌ব? কি হয়েছে বল্‌ব?

কবি। বল।

পাগ। বিষ, বিষ, এ বিষের জ্বালা।

কবি। সে কি, বিষ কি?

(কবিরাজের কাণে কাণে পাগলিনী কহিল)

কবি। এ বলে কি!

পাগ। হাঁ সত্যকথা (সাশ্চর্য্যে) মিছে বলিনি। কি কর্লুম? বলে' ফেল্লুম? কাঁদতে হবে। এর জন্যে আমায় কাঁদ্‌তে হবে। কি কর্‌লুম! কি কর্‌লুম!

কবি। এই—দরোজা বন্ধ কর। পাগলীকে যেতে দিওনা। তুমি এ সব কথা কি করে' জান্‌লে?

পাগ। কি করে' জান্‌লুম? তবে শোনো। তবে বলেই ফেলি। যখন একটা বলেছি—সব বল্‌ব। সব বল্‌ব। বলে' শেষে খুব কাঁদ্‌ব। তবে শোনো। ওরা যেদিন রেতের বেলায় জঙ্গলে বসে' পরামর্শ করছিল, তখন আমি সব শুনেছি।

(কবিরাজের কাণে কাণে আবার কহিল)

কবি। (চমকিত হইয়া) উঃ! কি ভয়ানক! হ'তেও পারে। আমি অবিশ্বাস করিনে। তুমি কে?

পাগ। আমি কে? আমি কে? আমায় তোমরা

চিনবে না। (ধনদাসকে দেখাইয়া) ঐ বুড়োর কাছে জিজ্ঞেস কর।

কবি। তুমিই বল।

পাগ। আমি পাগ্‌লী পোড়াকপালী। কুলভূষণের মা! ওঃ———!

কবি। কি আশ্চর্য্য!

(ধর্ম্মধ্বজ চূড়ামণির প্রবেশ)

ধর্ম্ম। (পাগলিনীকে দেখিয়া) এ কে! (গমনোদ্যত)

পাগ। ওকি যাচ্ছ কেন? যেওনা দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওঃ চিন্‌তে পেরেছ তুমি? যেওনা দাঁড়াও। ওরা তোমায় চেনেনা, কিন্তু আমি তোমায় চিনি। তবে বল্‌ব নাকি?

ধর্ম্ম। মশাই, আপনারা শীঘ্র এটাকে তাড়িয়ে দিন।

পাগ। তাড়াবে? তাড়াবে? তাড়াতে হবে না। নিজেই যাবো, তবে যাবার আগে সব বলে' যাবো। তবে তোমরা শোনো—

ধর্ম্ম। আঃ! মশাই, আপনারা দাঁড়িয়ে দেখ্‌চেন কি? এটাকে তাড়িয়ে দিন; রোগীর ঘরে এ রকম গণ্ডগোল হওয়া তো ঠিক নয়। (ভয়ে কম্পন)

পাগ। কাঁপ্‌ছ? ভয়ে কাঁপ্‌ছ? মুখ শুকিয়ে গেছে! আ কাঁপো। তবে বল্‌ব? তবে বলি। তোমরা শোনো, আমি এই—

ধর্ম্ম। এই পাগ্‌লী (গলাটিপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল; পাগ্‌লী ছুরিকা বাহির করিল। ধর্ম্মধ্বজ সভয়ে পিছাইয়া গেল।)

পাগ। আমায় মার্‌বে? তবে এই দেখেছ? মারো—মারো এখন। ওকি পেছনে হটে যাচ্ছ যে? দাঁড়াও ওখানে—পালাতে চাইবে তো এই ছুরি বসিয়ে দেব। তোমরা শোনো, এই ধর্ম্মধ্বজ এখানে এসে আবার ব্রাহ্মণ সেজেছে! ও নমঃশূদ্র। ও যাত্রার দলে থাক্‌ত। ও-ই তো আমার—

(ধর্ম্মধ্বজ পলায়নোদ্যত)

সকলে। এই ধর্‌ ধর্‌।

(দারোগা ও কয়েক জন কনেষ্টবলের প্রবেশ)

দারোগা। আর যেতে হবে না বাপু। ধর এই অলঙ্কার পর। (কনষ্টবেলের প্রতি) এই হাতকড়ি পরাও। কিহে বাপু ধর্ম্মধ্বজ, অনেক রকম ভেস্কীবাজী করে' এত দিন ঠকিয়ে এসেছ। তোমার পেছনে পেছনে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে হয়রাণ হয়েছি। এইবার জালে পড়েছো। মশাইরা একে চেনেন না? ইনি জাতে নমঃশূদ্র, পাকা বদ্‌মায়েস্‌, কাশী থেকে এসে এখানে ধর্ম্মধ্বজ সেজে বেড়াচ্ছেন।

তর্ক। আশ্চর্য্য!

দারোগা। আশ্চর্য্য অনেক আছে। আপনারা এই পাগ্‌লীর কাছে সব শুনুন। আমরা এর জন্যেই সব জান্‌তে পেরেছি। রাসবিহারী আর কুলভূষণ কোথায়?

তর্ক। তাদের পাওয়া যাচ্ছেনা।

দারোগা। হাঁ, তা এখন পাওয়া যাবে কেন? এক দিন এই ব্যাটার মত জালে পড়বেই।

তর্ক। তাদের কি অপরাধ?

দারোগা। বেশি কিছু নয়। পরে শুন্‌বেন।

তর্ক। সর্ব্বনাশ! সব জেনেছেন দেখ্‌তে পাচ্ছি।

দারোগা। আমরা এই রকমেই সব জানি মশাই। এটাকে নিয়ে চল। (পাগলিনীর প্রতি) পাগ্‌লী তুইও আয়।

(দারোগা প্রভৃতির প্রস্থান)

কবি। কি আশ্চর্য্য! কি ভয়ানক ব্যাপার! যাক্‌ এখন রোগীকে একটু ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। বিষের চিকিৎসা কর্‌তে হবে।

(রোগীকে লইয়া অপর সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল—মধ্যাহ্ন। স্থান—রাস্তা।

(চেলীর কাপড় পরিহিত, কৃত্রিম টোপর মাথায় দিয়া বরবেশী অর্দ্ধোন্মত্ত ধনদাস রায়ের প্রবেশ, পশ্চাৎ ছেলের দলের প্রবেশ)।

ধন। দ্যাখ্‌তো, দ্যাখ্‌তো, আমায় কেমন মানিয়েছে! দ্যাখ্‌তো।

১ম। বেশ মানিয়েছে। খুব মানিয়েছে!

ধন। আমায় মেরে ফেল্‌বে না তো?

২য়। পাগ্‌লা তোর ঝুলিতে কিরে?

ধন। টাকা—টাকা; টাকার থলে। সঙ্গে রাখি। না হলে' নিয়ে যাবে। সব পুষ্যিপুত্তুরে নিয়ে যাবে।

৩য়। যমের বাড়ী যাবি?

ধন। কোথায়? তা যাবো, তা যাবো। আমি যে ছেলেমানুষ, একলা কি করে' যাবো?

৩য়। তোর থলেটা দে।

ধন। উঁহুঁ তা দেব না।

৩য়। কেড়ে নেব। আয়তো দেখি সবাই, ওর থলে' কেড়ে নেব।

ধন। ও বাবারে, আমার টাকার থলে নিলেরে। ও বাবারে। (পলায়ন, সকলের পশ্চাদ্ধাবন)

(দুইজন গ্রামবাসীর প্রবেশ)

১ম। বল কি?

২য়। হাঁ।

১ম। তুমি শুন্‌লে কি করে ?

২য়। আমি লোকের কাছে শুনেছি; আর ওকে আমি আগেও দেখেছি।

১ম। এ গ্রামে এল কি করে ?

২য়। এখন তো পাগল হয়েছে।

১ম। যাই হোক লোকটাকে দেখলে দুঃখ হয়; একদিন তো বড়লোক ছিল।

২য়। দুঃখ! অমন পাষণ্ডকে দেখে আবার দুঃখ! ওর এ অবস্থা হয়েছে, বেশ হয়েছে। ওর এমন সাজা হবে না তো আর কার হবে? লোকটা যেমন কৃপণ তেমনি অত্যাচারী। এমন মানুষ দাদাঠাকুর, তাঁকে চক্রান্ত করে' সর্ব্বস্বান্ত করেছে। একটা পুষ্যিপুত্তুর রেখেছে—সেটা নাকি নমঃশূদ্রের ছেলে। সর্ব্বনাশ! ঐ ব্যাটার বাড়ীতে কত কায়েত বামুন খেয়েছে। সকলের জাত গ্যাছে। ওকে সবাই এখন একঘরে করে' রেখেছে। ওর শালা আর ওদের পুষ্যিপুত্তুর মিলে ওকে মারবার চেষ্টা করেছে—বহুকষ্টে এ যাত্রা বেঁচে গ্যাছে।

১ম। কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

২য়। হাঁ, আর দুশ্চিন্তায় এখন পাগল হয়েছে। বেশ হয়েছে। ঐ দ্যাখো ও এদিকে আস্‌চে।

(ধনদাস রায়ের প্রবেশ)

ধন। হায়, হায়! আমার টাকার থলে! ওগো আমার সর্ব্বনাশ করেছে! আমার থলে নিয়ে গেছে। আমার সব গেছে। (ভদ্রলোক দুইজনের নিকটে গিয়া) মশাই একটা পয়সা দিন্‌না মশাই।

১ম। এই—এই—যা, যা ব্যাটা। পাগ্‌লামী কর্‌তে আর যায়গা পাস্‌নি!

ধন। দাওনা একটা পয়সা। (হাত ধারণ)

২য়। তবু আবার! যা ব্যাটা (ধাক্কা দিয়া)

ধন। ও বাবারে গেছি। (পলায়ন)

১ম। চল এটাকে দেখ্‌লেও পাপ আছে।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাজপথ। কাল—অপরাহ্ন।

ন্যায়রত্ন। বল কি? তুমি তো আমায় একেবারে অবাক্ করে দিলে! এতো ভারী আশ্চর্য্য!

তর্করত্ন। তুমি কেবল একা "আশ্চর্য্য" হওনি দেশশুদ্ধ "আশ্চর্য্য" হয়েছে। প্রথম আশ্চর্য্য এই যে কুলভূষণ আর রাসবিহারী এমন ভয়ানক মানুষ। দ্বিতীয় আশ্চর্য্য এই যে এই ধর্ম্মধ্বজ চূড়ামণি একটা আশ্চর্য্য রকমের জোচ্চোর।

ন্যায়। আশ্চর্য্য!

তর্ক। রোসো, "আশ্চর্য্য" গুলি এখনো শেষ হয়নি। সব চেয়ে আশ্চর্য্য গুলি এখনো বাকী আছে।

ন্যায়। কি আশ্চর্য্য! আরো কিছু বাকী আছে নাকি?

তর্ক। হাঁ আরো কিছু। আরো আশ্চর্য্য এই যে তোমরা এই লোকগুলিকে এতদিনে চিন্‌লে না। আমরা সবাই আশ্চর্য্য-রকম গাধা বনে' গেছি।

ন্যায়। দ্যাখো ওটা আমি বরাবরই জান্‌তাম।

তর্ক। এ আরো আশ্চর্য্য! জেনে শুনেও এই ধনদাস রায় আর ধর্ম্মধ্বজের তোষামোদ করেছ! এঃ, দেখছি সেই "আশ্চর্য্য" গুলি আশ্চর্য্য রকম আবিষ্কৃত হচ্চে।

ন্যায়। মশাই সংসারে থাক্‌লে ও সব কর্‌তে হয়।

তর্ক। এ আরো আশ্চর্য্য! সংসারটাকে তুমি যত খারাপ বলে' ভাবছো ন্যায়রত্ন, সে তত খারাপ নাও হতে পারে।

(নিধিরামের প্রবেশ ও অন্যমনস্কভাবে প্রস্থানোদ্যোগ)

ন্যায়। ওহে নিধিরাম, নিধিরাম, বলি যাচ্ছ কোথায়? ইস্, কথাই কইছ না যে মোটে! কলিকাল! ঘোর কলিকাল! ব্রাহ্মণ দেখে একেবারে প্রণামটা না করেই চলে যাচ্ছ যে!

নিধি। কৈ, ব্রাহ্মণ কোথায়?

ন্যায়। এই যে আমরা কি তবে জড়পদার্থ নাকি? এ সব বুঝি দাদাঠাকুরের কাছে শিখেছ। এই যে পরিষ্কার যজ্ঞসূত্র গলায় দেখতে পাচ্ছ। স-শরীরে জলজ্যান্ত দু' দুটো ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছি। দেখতে পাচ্ছ না? তুমি কি অন্ধ নাকি?

নিধি। এখনো তোমরা ব্রাহ্মণত্বের বড়াই কর? তোমরা জড়পদার্থের চেয়েও নিকৃষ্ট। জড়পদার্থ কি তোষামোদ করে? জড়পদার্থ কি ষাট্ বছরের বুড়োর বিয়ে দেবার উদ্যোগ করে? তোমার মত ব্রাহ্মণের চেয়ে জড়পদার্থ অনেক ভালো। যজ্ঞসূত্র তোমায় উপহাস করছে। তোমার গলায় ওটা শোভা পায় না। তোমাকে প্রণাম করব? তুমি চণ্ডালের অধম। আমি অন্ধ না তুমি অন্ধ?

ন্যায়। নিধিরাম, মুখ সামলে কথা কয়ো। যত সব ছোট লোকের আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে। ব্যাটা ছোট লোকের ছেলে, একটু ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছে, তাই আর অহঙ্কারে চোখে দেখেন না!

নিধি। ঠাকুর নিজেকে সামলাও। হাঁ আমরা ছোটলোকই সত্য। তাই বলি হুঁসিয়ার! ছোটলোকের স্বভাব জানতো? নেমকহারাম, যে দাদাঠাকুর সকলের কত উপকার করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র করে' তাঁকে জেলে পাঠিয়েছো, তাঁকে পথের ভিখারী করেছ। তোমরা আবার ব্রাহ্মণ? তোমাদের আবার প্রণাম করব! তোমরা তো ধনদাস রায়ের বাড়ী খেয়েছ, ধনদাস রায় তো নমঃশূদ্রের ছেলেকে পুষ্যিপুত্তুর রেখে জাতিভ্রষ্ট হয়েছে। তোমাদের প্রণাম করা তো দূরের কথা তোমাদের স্পর্শ করলে পাপ আছে। যত সব বদমায়েস—

ন্যায়। (আস্ফালন করিয়া) তবে রে ব্যাটা এত বড় কথা!

নিধি। (অগ্রসর হইয়া) কি রে ব্যাটা কি বল্লি? (লাঠি উঠাইল)।

ন্যায়। ওরে বাবারে গেছি, গেছি। কে আছো রক্ষা কর। ব্রহ্মহত্যা হোল, ব্রহ্মহত্যা হোল।

(সেবাব্রতের প্রবেশ)

সেবা। একি—কিসের গোলমাল হচ্ছে?

ন্যায়। এই-এই-এই-এই

তর্ক। বাঃ ন্যায়রত্ন তুমি যে কেবল টিকিই নাড়ছ। কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারলে না? ওহে বাপু শোনো (সেবাব্রতের প্রতি) এই ন্যায়রত্ন মশাই নিধিরামকে গালাগাল দিচ্ছিলেন।

ন্যায়। কি, কি কি কি! আমি গালাগাল দিচ্ছিলাম?

তর্ক। তা নৈক্ষি?

সেবা। নিধিরাম, চ'টো না। স্থির হও। আজ সবাইকে এক শুভসংবাদ দিতে এসেছি।

নিধি। কি সম্বাদ?

সেবা। দাদাঠাকুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করে আসচেন।

তর্ক। তাই নাকি? তাই নাকি? ঈশ্বর তুমি আছো—ধন্য সুবিচার! কবে তিনি আসবেন?

সেবা। কাল।

তর্ক। সুসম্বাদ! সুসম্বাদ! যাও সেবাব্রত এ কথা রাষ্ট্র করে দাও। চল চল হে ন্যায়রত্ন চল এখন।

(সকলের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

সম্রাট্ অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা।

(শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী)

ভারতসম্রাট্ অশোক সাম্রাজ্যলাভের পূর্ব্বে পিতার আদেশে উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভালবাসিতেন না বলিয়া তদানীন্তন ভারতরাজধানী পাটনা মহানগরী হইতে বহুদূরে অবস্থিত উজ্জয়িনী নগরীর শাসনভার প্রদান করিয়া তাঁহাকে উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। অশোক উজ্জয়িনীসংক্রান্ত রাজকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি শ্রেষ্ঠী উপাধিধারী একজন গুজরাটী বণিকের দেবীনাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবী পরমা সুন্দরী গুণবতী সুশীলা মহিলা ছিলেন। দেবী রাজবংশসম্ভূতা না হইলেও তাঁহার রূপে গুণে ও শীলতায় আকৃষ্ট হইয়া ভাবী সম্রাট অশোক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া পরম সুখে তথায় কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার এই বিবাহবার্ত্তা তিনি পাটলীপুত্রনগরে তাঁহার পিতাকে না জানাইয়া দেবীর সহিত মহাসুখে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার মহেন্দ্র নামক এক পুত্র ও সংঘমিত্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মিল। ইহার কিছুদিন পরে যখন তিনি ভারতের সম্রাট্ হইয়া পাটনায় আগমন করিলেন, সেই সময়ে প্রথমতঃ তিনি ঐ পুত্র ও কন্যাটিকে উজ্জয়িনীতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। পরে তাহাদিগকে পাটনায় আনাইয়াছিলেন। তাহাদিগকে রাজধানী পাটনায় আনাইয়া উত্তমরূপে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনীতি শিক্ষাদানপ্রভাবে তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক সুনীতিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন।

সম্রাট্ অশোক সংঘমিত্রাকে সমস্ত বৌদ্ধগাথা অভ্যাস করাইয়াছিলেন। সংঘমিত্রার স্বভাব এতই বিনয়নম্র ছিল ও তাঁহার ব্যবহার এতই সরল ছিল যে, তিনি সম্রাটকন্যা হইলেও মঠের ভিক্ষুণী উপাধিধারিণী সামান্যবেশা সন্ন্যাসিনীর ন্যায় সর্ব্বসাধারণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন ও দীনদরিদ্র বলিয়া সকলের নিকটে প্রতীয়মান হইতেন। ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েই সমভাবাপন্ন ছিলেন। সকলেই তাঁহাদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। অহঙ্কার কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই লেখাপড়ায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়া কালযাপন করিতেন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ চুরাশী হাজার বিহার (অতি প্রশস্ত প্রাঙ্গনসমন্বিত উদ্যানমধ্যবর্ত্তী বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এক একটি বিহারে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিয়া ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মপ্রচার করিতেন।

বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীদিগের জন্যও এই প্রকার অনেক বিহার ছিল। তাঁহাদের অন্নবস্ত্র ব্যয়ভার সম্রাট নিজেই বহন করিতেন। রোমরাজ্যে যেমন ধর্ম্ম-গুরু পোপের প্রাধান্য শ্রুত হইয়া থাকে, সম্রাট অশোকের সময়ে সেই সকল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী-দের প্রাধান্য ছিল। সম্রাট স্বয়ং ইঁহাদের নেতার চরণে প্রণত হইতেন ও তাঁহার আদেশ বৌদ্ধগাথার ন্যায় শিরোধার্য্য করিতেন। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী-দিগকেও যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পুষ্টিসাধনার্থ দশ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া-ছিলেন। যেদিন তিনি শুনিলেন যে, চুরাশী হাজার বিহারের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, সেইদিন আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করিতে আদেশ দিলেন, যে, "অদ্য হইতে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্য মধ্যে প্রতিযোজন অন্তর স্থানে 'মহাদান মহোৎসব' হইবে। এই উৎ-সব উপলক্ষে তাঁহার প্রজাবর্গকে রাজ্যের সকল স্থান পুষ্পমাল্য ও পল্লবাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে হইবে। এবং যাহার যেমন সামর্থ্য, তাহাকে তদনুসারে এই চুরাশী হাজার বিহারের ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদিগকে ভিক্ষা দিতে হইবে। রজনীতে দীপাবলী দ্বারা রাজ্যের সমস্ত স্থান আলোকিত করিতে হইবে। সুমধুর গীতবাদ্য দ্বারা সকলের হৃদয়ে অসীম আনন্দ উৎ-পাদন করিতে হইবে। এই এক সপ্তাহ কাল সকলকেই সংযত ও অবহিতচিত্তে পবিত্রভাবে, পবিত্রবেশে ভগবান বুদ্ধদেবের অমৃতময় অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে হইবে। সপ্তম দিবসে সম্রাট স্বয়ং পাত্রমিত্র মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজযোগ্যো-চিত শোভাযাত্রার সহিত রাজধানীর প্রধান রাজ-মার্গে বহির্গত হইবেন। ঐ দিবসের সমস্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদিগকে বিশেষরূপে ভিক্ষা দিতে হইবে। ভিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিতে হইবে। এইরূপে সপ্তম দিবসের কার্য্য শেষ হইলে 'মহাদান মহোৎসবের অনুষ্ঠান শেষ হইবে।" সম্রাটের এই আদেশ-বাণী শুনিয়া সকলেই আদেশোচিত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সম্রাট নিজে ভিক্ষু ভিক্ষুনীদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্য যেমন ব্যয় করিতেন, গৃহস্থ প্রজাবর্গকেও তদ্রূপ ব্যয় করাই-তেন। যথাসময়ে সম্রাটের প্রাসাদ, প্রজাবর্গের গৃহসমূহ, রাজপথে রাজকার্য্যালয়সমূহ সুসজ্জিত হইয়া ইন্দ্রের রাজধানী অমরাবতী পুরীকেও হীনপ্রভ করিয়া ফেলিল। প্রধান প্রধান বিহারের প্রধান প্রধান ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণ পাটনা রাজধানীতে মহা-সম্মানের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পদমর্য্যাদা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণ নিজ নিজ দলসহ ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থানে আসিয়া পৌঁছিলে রাজধানীর লোকসকল তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতে লাগিল এবং তাঁহা-দিগকে ভিক্ষাদানে সম্মানিত করিতে লাগিল। তাঁহা-দের উপদেশ বাণী শ্রবণে কৃতার্থ হইতে লাগিল।

এইরূপে ছয় দিন কাটিয়া গেল। সপ্তম দিবসে সম্রাট অনির্ব্বচনীয় মহাশোভা যাত্রাসহ রাজধানীর প্রধান রাজপথে বহির্গত হইলেন। প্রজাবর্গ মহাহর্ষের সহিত সম্রাটের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। সকলেই আনন্দে অতিশয় উৎফুল্ল হইল। যেথানে মহাদানমহোৎসব উপলক্ষে মহামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়া সুসজ্জিত হইয়াছিল, সম্রা-টের শোভাযাত্রা সেই দিকেই চলিল। তথায় উপস্থিত হইয়া মহামণ্ডপ মধ্যে স্বর্ণসিংহাসনে উপ-বিষ্ট হইলেন। সম্রাটের প্রধান প্রধান সামন্তরাজ মন্ত্রিবর্গ ও প্রজাগণ স্ব স্ব পদ-মর্য্যাদা অনুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সভা এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এমন সময়ে মহা-মনীষী মৌদ্গলীর পুত্র তিষ্য নামক প্রধানতম মহা-বিদ্বান্ "মহাস্থবির" ভিক্ষু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র সম্রাট স্বয়ং সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন। রাজসভাস্থ সকলেই উত্থিত হইল। সম্রাট তিষ্যের চরণ-কমলোপরি রাজমুকুট-সুশোভিত মস্তক অর্পণ করি-লেন। তিষ্যের পদধূলি লইয়া তিষ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে তিষ্যকে বসাইলেন। এবং সিংহাসনের নিম্নে অন্য একটি আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সেই দিন তথায় সহস্র সহস্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী উপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বিদ্যোপার্জ্জন অনু-সারে যাহার যেমন পদ তিনি তদনুসারে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সম্রাটের প্রতি মহাপ্রসন্ন হইয়া সম্রাটকে আশীর্ব্বাদ করিতে

লাগিলেন। তাঁহাদের সেই আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে সম্রাট সেই দিন অলৌকিক দিব্যশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই দিব্য শক্তির সাহায্যে তিনি বিভিন্নস্থানস্থিত চুরাশী হাজার ধর্ম্মভবন মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিতে পাইলেন।

তখন সম্রাট সঙ্ঘকে অর্থাৎ ভিক্ষু ভিক্ষুণী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মসেবকগণের মধ্যে কাহার দান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ" ? সঙ্ঘ উত্তর করিল, "হে সম্রাট্, ভগবান্ বুদ্ধদেবের লীলাকালেও আপনার মত দানশীল কেহই ছিলেন না"। সম্রাট ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইপ্রকার দান করিয়া কোন ব্যক্তি কি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত সেবক হইতে পারে" ? সংঘের প্রধান নেতা মহাস্থবির তিষ্য বলিলেন, "যিনি পুত্র বা কন্যাকে ধর্ম্মার্থে উৎসর্গ করিতে পারেন, তিনিই ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের প্রকৃত সেবক। হে সম্রাট্, আপনার মত পরম দাতা যে, এই ধর্ম্মের পরম হিতৈষী, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।" তৎকালে সেই মহামণ্ডপ মধ্যে সম্রাটের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক মহেন্দ্রের উত্তম স্বভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ধর্ম্মে নিষ্ঠা এবং নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া সম্রাট তাঁহাকেই সাম্রাজ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া সদা আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য মহাস্থবির তিষ্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি ভাবী সম্রাট্পুত্রের মায়া মমতা ত্যাগ করিলেন। অষ্টাদশ-বর্ষ-বয়স্কা যুবতী সংঘমিত্রাও সেখানে বসিয়াছিলেন। সম্রাট পুত্র ও কন্যার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা আছে কি? আদর্শ বৌদ্ধ মহাস্থবিরগণ ভিক্ষুধর্ম্মকে অতিশয় পবিত্র ব্রত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই মহাব্রত গ্রহণ করিতে তোমাদের কোন আপত্তি আছে কি? পিতার এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "পিতৃদেব, আপনার অনুমতি পাইলে আমরা দুইজন এই মুহূর্ত্তেই ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন সার্থক করিতে প্রস্তুত আছি।" সম্রাট এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অদ্য আমি ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্রতম ধর্ম্ম প্রচারার্থ আমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্র ও কন্যাকে উৎসর্গ করিলাম"। সভাস্থ সকল লোক সসাগরা পৃথিবীর সম্রাটের এইপ্রকার অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব মহা বিস্ময়জনক ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া "সম্রাটের জয় হউক, সম্রাট চিরজীবী হউন," এই কথায় মহাহর্ষ কোলাহলে দিগন্ত পূরিত করিল। সম্রাটের উপর সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলেই সম্রাটকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল।

সম্রাট কৃতাঞ্জলিপুটে মহাস্থবির তিষ্যকে বলিলেন, "হে ভগবন, আপনি আমার পুত্র মহেন্দ্রের শিক্ষাদাতা গুরু হউন"। তিষ্য সম্মত হইলেন। তিনি মহেন্দ্রকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য মহাস্থবির মহাদেবকে আদেশ করিলেন। সম্রাট-কুমারী সংঘমিত্রাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মহাভিক্ষুণী ধর্ম্মপালী আদিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য মহাভিক্ষুণী আয়ুঃপালী আদিষ্ট হইলেন। ইহার পর ইতিহাস-বিখ্যাত "মহাদান" আরব্ধ হইল। সম্রাট সকলকে প্রভূত প্রণামী দিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহার যেমন পদ, তাঁহাকে তদনুসারে দক্ষিণা দিতে লাগিলেন। এইরূপে "মহাদান মহোৎসব" বিধি সম্পন্ন হইল। ইহার পর সভাভঙ্গ হইল। সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরদিন হইতে সংঘমিত্রা মহাভিক্ষুণী ধর্ম্মপালীর নিকটে উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে উক্ত ধর্ম্মের সাধারণ পাঠ্য অন্যান্য বহু গ্রন্থই শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাভিক্ষুণী আয়ুঃপালী তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এই ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সাধনাপদ্ধতিগুলি শিখাইতে লাগিলেন। ভিক্ষু-সংঘে প্রবেশের নাম "উপসম্পদা"। মহেন্দ্র পিতৃপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া "উপসম্পদা মন্দিরে" দীক্ষিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তথায় তিন বৎসর কাল তিষ্যের নিকটে অধ্যয়ন করিয়া "অর্হৎ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এত অল্প কালের মধ্যে এই উপাধি লাভ করা বড়ই প্রশংসার কথা। কিন্তু মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংঘমিত্রা ইহা অপেক্ষা অল্প কালের মধ্যে এই উপাধিটি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে স্ত্রীলোক ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্ম-

সাধনায় উত্তম রূপে শিক্ষা পাইলে পুরুষ অপেক্ষা অনেক উন্নত হইতে পারে। ধর্ম্মে স্ত্রীলোকের বিশ্বাস ও ভক্তি যত দৃঢ় হয়, পুরুষের তদ্রূপ হয় না। এই জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্ত্রীলোকের যত আগ্রহ দৃষ্ট হয়, পুরুষের তত আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোক ধার্ম্মিকের জাতি। এ হেন স্ত্রীজাতি যদি ধর্ম্মশিক্ষাবিহীন হয়, তাহা হইলে দেশের ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সংঘমিত্রা এই উপাধি লাভ করিয়া সকলের মহানন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

সাড়া।

(শ্রীমতী অভ্ররেণু দেবী)

এবার আমি খোঁজ পেয়েছি গো
তুমি আসবে ওগো আসবে
তোমার দেখা রোজ চেয়েছি গো
এবে সামনে আমার হাস্‌বে;
ছুটে ছুটে তোমার তরে
আবেগ ভরে,
পাইনি দেখা এক নিমেষের
আঁখির জলে ভেসে—
এবার তুমি চিরজীবন থাক্‌বে ওগো
আমার কাছে এসে;
আজ, হৃদয়পুরে সাড়া দেছে
আসবে তুমি আসবে
আমায় তুমি আপন করে
এবার ভালো বাসবে।
বাতাস যেন বিভোর হয়ে
আনচে বয়ে
তোমার দেশের সব ভুলানো
আবেশভরা মায়া,
মেঘের কোলে, পাতায় পাতায় দেখচি শুধু
তোমার যেন ছায়া;
আজ, হৃদয়বীণার কোন্ তারেতে গো
করলে তুমি স্পর্শ?
গাহিছে সে আজ তার তারেতে গো
ছড়িয়ে শুধু হর্ষ।

বিশ্ব-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

যিনি নিত্যবস্তুর অভাববোধের উদ্রেক করাইয়া দেন এবং যিনি তাহা পূরণ করেন, অবস্থাবিশেষে এই দুই জনই মনুষ্যজাতির কল্যাণকারী। মানুষ অনেক দিনের মানুষ; এত বড় পুরাতন জগদ্‌ভাণ্ডারের বহুমূল্য রত্নগুলি বাহিরে পড়িয়া আছে, সে গুলি এখনো মাল-কোঠায় আনিয়া সঞ্চিত করিতে পারে নাই, এ একটা অকর্ম্মণ্যতারই লজ্জাজনক নিদর্শন। কতদূর পর্য্যন্ত এখানে তাহার দাবিদাওয়া, মানুষ এখনো তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তাই বাহিরে এত বড় বিপুল ভাণ্ডার থাকিতেও দৈন্যের কারাগারে ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া আছে। এমন একদিন ছিল যখন এই জগৎটা কেবল একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় বলিয়া বোধ হইত; ইহার মধ্যে যে ভাবের উচ্ছ্বাস আছে, মানবহৃদয়ে তাহার তরঙ্গ পঁহুছিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। তারপর বিস্ময়সঞ্জাত ভাবরাশি ক্রমে ক্রমে একটি অনির্ব্বচনীয় কমনীয় মাধুরীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মাঝখানে আকার ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল;—

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"

প্রথমতঃ মানুষ কেবল তাহার নিদ্রাপ্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সহজ ব্যাপারগুলিকেই কায়ক্লেশে সম্পন্ন করিয়া একটা মূঢ় আনন্দে পরিতৃপ্ত ছিল; ক্রমে নূতনতর অভাব বোধের সঙ্গে জীবনটাকে সুখ-দুঃখ-বেদনাময় করিবার বিচিত্র উপাদান সৃষ্টি হইল।

সেই আদিকালে সুখ দুঃখ উপভোগের মধ্যে কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি ছিল না। জীবনে কোনো প্রকার ব্যস্ততা অথবা মন্থরতা ছিল না। অতৃপ্তির মধ্যে যে তৃপ্তি অপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ রহিয়াছে, একথা তখনকার লোকের কাছে আদৌ ভাবিবার বিষয় হয় নাই। সেকালে এই সূর্য্যের দিকে চাহিয়া শিশু মানব নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিত। তারপর একদিন কোনো এক লোহিত-রাগরঞ্জিত মহা প্রত্যূষে একজন বলিয়া উঠিলেন;— "সবিতুর্ব্বরেণ্যং" আর সকলে অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃতাঞ্জলি হইয়া মূক-হৃদয়ের সভক্তি প্রণতি জ্ঞাপন করিল।

এই নিত্যকার সুখ দুঃখ, আলো ছায়া, দিবা রাত্রিগুলি যে কেবল ভৃত্যের মত আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধি করিতেই এখানে আসে নাই, তাহা মানবহৃদয় ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছে। এ সকলের প্রয়োজনের ঘর ছাড়া অন্য এক জায়গায় দিব্য মহিমার আসন পাতা রহিয়াছে; যখন সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই ইহাদের বিচিত্রতা ও অভিনবত্ব বিকশিত হইয়া উঠে। এ সকল যতই কেন অনেক দিনের হৌক না তবু পুরাতন অথবা একঘেয়ে বলিয়া বোধ হয় না। মানুষ ভিতর হইতে ইহার উপর নব নব বর্ণের মাধুরী ফলাইয়া চিরনূতন করিয়া রাখিয়াছে। এ শক্তিটা মানুষের নিজের অন্তরের ভিতরেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই সকল দিব্যানুভূতি যখন অসহ পরিপূর্ণতার ভারে বাহিরে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন অবধি আজ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ক্রমে খড়ি পাতিয়া দেখিলে ইহাকেই বলা যায় সাহিত্যের ক্রমবিকাশ।

বিশ্ব-প্রকৃতির মর্ম্মতলে একটা প্রকাশ-ব্যাকুলতা প্রতি নিয়তই আঁকু-পাকু করিতেছে। গাছ, পাতা, লতা, ফুল ইত্যাদিকে বাহিরে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করি এ গুলি তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ নহে। কুসুম গন্ধ, বর্ণ এবং পাপড়ীর মধ্যেই তাহার সমগ্র মাধুরী টুকুকে নিঃশেষে রাখিয়া দেয় নাই। এরূপ হইলে তাড়াতাড়ি কোন এক উজ্জ্বল প্রভাতে ফুটিয়া উঠিয়া, মধ্যাহ্নেই জগতের হৃদয় হইতে বিদায় লইত। এ ভাবে ফুলকে দেখিলে তাহাকে নিতান্ত ছোট করিয়াই দেখা হয়। এইটুকু ছাড়া ফুলের আর একটি মহান্ সার্থকতা, চরম পরিণতি আছে। সেইটুকু ধরা পড়ে মানব হৃদয়ে। বাহিরে সে প্রভাতের আলোর সম-বয়সী হইলেও ভিতরে তাহার অনন্ত জীবন, অফুরন্ত মাধুরী ও বিচিত্র উদ্দেশ্য।

অনেক সময়ে দেখা যায় এখানে যাহার ক্ষুদ্র প্রয়োজনসিদ্ধি মাত্রই উদ্দেশ্য তাহার মুল্য বড় কম; তদপেক্ষা যাহা বাহিরের জগতের পক্ষে নিতান্তই আগন্তুক তাহাই পরে হৃদয়-রাজ্যে চির বসতি লাভ করে। এই ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের মধ্যে অতীন্দ্রিয় মাধুরীটুকুকে চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া রাখে একমাত্র সাহিত্যে। এক কথায় সাহিত্য উচ্চতম উদ্দেশ্য, মহান্ লক্ষ্য, অপরিমেয় সুখ, এবং প্রচুর দুঃখ দিয়া মানব জীবনকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছে। জীবনধারণের পক্ষে যে আপিসে যাতায়াত, আহার; নিদ্রা প্রভৃতিই প্রচুর নহে, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছে এই সাহিত্য।

বহিঃপ্রকৃতি যতই বড় হৌক্ না কেন মানুষের হৃদয়ের তুলনায় সে অনেক ছোট। মানবহৃদয় যে প্রকৃতি হইতে কেবল গ্রহণ করে তাহা নহে। সে যতটুকু নেয় তাহার শতগুণ দেয়। এই আদান প্রদানে প্রকৃতিই জিতিয়া যায়। কিন্তু এত সে দেয়, তবু ইহাকে বাজে খরচ, অথবা অমিতব্যায়িতা বলা যায় না কারণ এর গোলাবাড়ীতে যাহা সঞ্চিত আছে তাহা অফুরন্ত। তবে এ নেওয়া দেওয়ার মধ্যে অবশ্যই একটা ভাল-মন্দ, ইতর-বিশেষ আছে। অনেক সময়ে গ্রহণ করে ভালো, দেয় মন্দ।

এই জমা-খরচের হিসাব রাখে সাহিত্যে। কাহারো নেমকহারামী করিবার সাধ্য নাই। বহু পুরাতন কালের আদান-প্রদান-সম্বন্ধীয় নিকাশ তলব করিলেও তাহা এই খাতা হইতেই খতাইয়া দেখানো যায়।

আমরা নিতান্ত ভিক্ষুকের মত এই বিশ্ব-নগরে আসিয়া একটি সরাইখানার সঙ্কীর্ণ-কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। অগ্রদূত সাহিত্য আসিয়া আমাদিগকে রাজবাড়ীর দরওয়াজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে। কিন্তু খবর দেওয়া পর্য্যন্তই সাহিত্যের কাজ। সেখানে যে দ্বারবান আছে এখন তাহার সঙ্গে রফা করিয়া সেই রাজাধিরাজের চরণসমক্ষে উপস্থিত হইতে পারিলেই আমরা কৃতার্থম্মন্য হইব। সেখানেই আমরা "মহতো-মহীয়ান্"। এইরূপেই সাহিত্যে ক্রমবিকাশের চরম পরিণতি।

বারাণসী-কথা।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

দেখিতে দেখিতে ট্রেনখানি ডফারিন ব্রিজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এখান হইতে বারাণসীর মোহন সৌন্দর্য্য দেখিলে প্রাণ-মন শীতল হয়। ব্রিজের

উপর আসিয়া আমার মনে ভক্ত কবি হেমচন্দ্রের কাশী-স্তোত্র মনে পড়িল—

'জয় জয় কাশী অৰ্দ্ধচন্দ্রাকার,
বেণী সুসজ্জিত অসি বরুণায়।
পদতলে শোভে সুরধুনী-ধার,
কটিদেশে কোটি সোপানের হার।
নবদিবাকর কিরণমালা,
মন্দির মুকুট দেউলে ঢালা।
দিব্যচক্ষে শিব-ত্রিশূল কাশী,
জয় বিশ্বেশ্বর-পুরী বারাণসী॥'

ব্রিজের অপর পারে 'কাশী' ষ্টেশন। এখানে গাড়ী থামিল। আমি এখানে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশনের ফটক দিয়া বাহিরে আসিয়া আমরা দুই জন একখানি একাতে আরোহণ করিলাম। পূজার সময় একার ভাড়া একটু চড়িয়াছিল। একামন্তের দণ্ডটাকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিলাম, নতুবা একার 'বিকট আন্দোলনে' মাটিতে পড়িয়া যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা। একাখানি দ্রুতবেগে রাস্তার ধূলিরাশি উড়াইতে উড়াইতে ছুটিয়া চলিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু দোকান, দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা দেখিতে পাইতাম। পূজার বাজারে বহু লোক-সমাগম দেখিতে দেখিতে আমরা প্রায় অৰ্দ্ধ ঘণ্টার 'গোধূলির' গাড়ীর আড্ডায় আসিয়া পৌঁছা গেল। এখানে নামিয়া কুলির মাথায় মোট দিয়া ত্রিপুরাভৈরবীর গলিতে আমার আত্মীয়ের বাসায় পৌঁছিলাম। পরস্পর কুশল-প্রশ্নাদির পর আমি একটী প্রৌঢ়া রমণীর সহিত মীরঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে যাই। মধ্যাহ্নে বাসায় ফিরিয়া আহারাদির পর আত্মীয়টির সহিত কাশীসম্বন্ধে অনেক আলাপ হয়।

কাশী হিন্দুর নিকট পরম পবিত্র তীর্থ। এই স্থানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ দিয়া বরুণা ও অসি নামক দুইটী নদী প্রবাহিত হইয়া উত্তরবাহিনী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, এইজন্য এই পুণ্যস্থানকে 'বারাণসী' কহে।

এই পুণ্য নগরীর উল্লেখ সর্ব্বপ্রথমে আমরা শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে দেখিতে পাই। সেই সময় কাশী পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল। রামায়ণযুগেও যে কাশী অত্যন্ত বিস্তৃত জনপদ ছিল ইহার সবিশেষ প্রমাণ আছে। আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে কাশী প্রদেশে অনার্য্য জাতিরা (দ্রাবিড় ও কোল) বাস করিত। ১৪০০-১০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আর্য্যজাতিরা উত্তর ভারতবর্ষ হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ফাহিয়ানের ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে কাশীরাজ্য ৩৩৩ ক্রোশ (৪০০০ লি) ও ইহার প্রধান নগরী বারাণসী দেড় ক্রোশ দীর্ঘ, অৰ্দ্ধ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে হিউএনৎ-সাঙ্ সারনাথে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য দেখিয়া যান। উড়িষ্যার 'মাদলাপঞ্জীতে' দেখা যায় যে, রাজা যযাতি কেশরী বারাণসীর মন্দিরের আদর্শে ৩১৬ শকে ভুবনেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৫ই অক্টোবর, ১৯১৩ রবিবার। অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বেশ্বর মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। অল্প কিছুদূর অগ্রসর হইলেই বিশ্বেশ্বর মন্দিরের সংকীর্ণ গলি। গলিতে প্রবেশ করিয়াই দেখি পুষ্পমাল্যবিক্রেতা, মিষ্টান্নবিক্রেতারা যাত্রীকে অতি সমাদরে 'আইয়ে বাবুজী, আইয়ে মা-জী' বলিয়া ডাকিতেছে। আমি কিছু মিষ্টান্ন ও ফুল খরিদ করিলাম। মন্দিরের বহির্দ্বারে দেখি ডান দিক একখানি শ্বেত প্রস্তরফলকে লেখা রহিয়াছে—'Gentlemen not beloning to the Hindu Religion are requested not to enter the temple.' এই নিষেধবাক্যটী আমার নিকট ভাল বলিয়া মনে হইল না। সামান্য একখানি প্রস্তরফলকে এই নিষেধবাক্যটী লিখিয়া সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়া যে কি লাভ আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাহিরের তোরণ অতিক্রম করিয়া আমি মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম শত শত নরনারী বিশ্বেশ্বরকে দেখিবার আকুলতায় আনন্দের কোলাহলে এবং ভক্তিগদগদ কণ্ঠে 'হর-হর ব্যোম্ ব্যোম্' ধ্বনিতে মন্দিরাভ্যন্তর মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের মধ্যস্থানে বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গ।* মনপ্রাণ ভাবে ভরিয়া গেল।

'তেজোময়ং সগুণনির্গুণমদ্বিতীয়ং
আনন্দকন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ম্।
নাগাত্মকং সকলনিষ্কলমাত্মরূপং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বেশ্বরং॥

বিশ্বেশ্বর দর্শনশেষে অপর পথ দিয়া বাহির হইয়া অন্নপূর্ণা মন্দিরের দিকে চলিলাম। পূজার সময় অন্নপূর্ণা মন্দিরে অত্যন্ত ভিড় হয়। এখানে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বারান্দায় ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে তান-লয়-সংযোগে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মুখোচ্চারিত চণ্ডীর প্রতিশ্লোক যেন কত গম্ভীর ও প্রাণের ভিতর কি এক ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়, তাহা বর্ণনাতীত।

* চৈনিক পরিব্রাজক হিউএনৎ-সাঙ্ এখানে শত হস্ত উচ্চ তাম্রনির্ম্মিত বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকদের মতে ১১৯০ সালে কাশীর রাজা রাঠোর জয়চাঁদ যখন সেনাপতি কুতবউদ্দীন কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন, বোধ হয় তখন মুসলমান সৈন্য এই প্রাচীন লিঙ্গমূর্ত্তি বিধ্বস্ত করিয়াছিল।

কাশী অন্নপূর্ণার নগরী, এখানে কেহই অভুক্ত অবস্থায় থাকে না—

'জগৎজননী অন্নদা আপনি,
যেথানে খুলেছে আনন্দ-বিপণি।'

এই মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে পুণার মহারাষ্ট্র নৃপতি * কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী কালে নাটোরের রাণী ভবানী মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। মন্দিরের উপরিভাগে একটী গুম্বজ ও একটী চূড় আছে। মন্দিরের একাংশে সপ্তাশ্বযোজিত রথের উপর সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম।

অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া আমরা বিশ্বেশ্বর মন্দিরের উত্তর পার্শ্বের গলি দিয়া জ্ঞানবাপী দর্শনে যাই। কথিত আছে রুদ্ররূপী মহাদেব ত্রিশূল দ্বারা এই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া এই কূপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হিন্দুর বিশ্বাস, এই কূপের জল পান করিলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। কালাপাহাড় কাশীর মন্দির ধ্বংস করিবার সময় পাণ্ডাগণ বিশ্বেশ্বরকে এই কূপে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া জনমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এই কূপের উপরিভাগে একটী ছাদ আছে। গোয়ালিয়র-রাজ দৌলত রাও সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী রাণী বৈজাবাই ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইহা চল্লিশটী প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের উপর স্থাপিত। একটী পাণ্ডা ঠাকুর সমাগত যাত্রীকে কূপ হইতে জল তুলিয়া দিতেছিলেন এবং তাঁহার পারিশ্রমিক বাবদ একটী পয়সা গ্রহণ করিতেছিলেন। জ্ঞানবাপী কূপের মুক্তপ্রাঙ্গণের পূর্ব্বাংশে একটী শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত সাতফুট উচ্চ বৃহৎ বৃষভ-মূর্ত্তি দেখিলাম। নেপালের রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে ঔরংজেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে মসজিদ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে এই স্থানে আদি বিশ্বেশ্বর-মন্দির ছিল। কথিত আছে যে, ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ঔরংজেব এই মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদের প্রতিষ্ঠা করেন। †

মসজিদের পশ্চাতে দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া আমি প্রত্যহ প্রাতে মুগ্ধনেত্রে পুরাতন বিশ্বেশ্বর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতাম। সুন্দর কারুকার্য্য খচিত সেই অংশ দেখিয়া কত কথা মনে আসিত। এই ভগ্নস্তূপ হইতে হিন্দুর স্থাপত্য শিল্পোৎকর্ষের একটা চরম নিদর্শন পাওয়া

---

* রায় জয়নারায়ণ ঘোষালের মতে উহা জনৈক মহারাষ্ট্র বিষ্ণু মহাদেও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

† জেনারেল কনিংহামের মতে জাহাঙ্গীর বিশ্বেশ্বর-মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কানিংহাম চখের নিকটবর্ত্তী আদি বিশ্বেশ্বর মন্দিরের কথাই বলিয়া থাকিবেন। ঔরংজেব কাশীর মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে সম্প্রতি একটা আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনার মূলে একখানি ১৬৫৩ বা ৫৪ খৃষ্টাব্দে পারসীতে লিখিত 'ফারমান'। চট্টগ্রামের উকিল Holy city (Benares) রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু রজনীরঞ্জন সেন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নিজ চক্ষে কাশী পুলিশের সিটি ইনস্পেক্টর খান্ বাহাদুর শেখ মহম্মদ তোয়াবের নিকট মূল দলিলখানি দেখিয়াছেন। পূর্ব্বে এই ফারমানখানি মঙ্গলগৌরী মহল্লার জনৈক পাণ্ডার নিকট হইতে খান্ বাহাদুর প্রাপ্ত হন। লেফটানান্ট কর্ণেল ডাঃ জি, বি, ম্যাইলেটের ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

'Let Abul Hasan worthy of favour and countenance trust to our royal bounty and let him know that, since in accordance with our innate kindness of disposition and natural benevolence the whole of our untiring energy and all our upright intentions are engaged in promoting the public welfare and bettering the condition of all classes high and low, therefore in accordance with our holy Law we have decided that the ancient temples shall not be overthrown but that new ones shall not be built. In these days of our justice, information has reached our noble and most holy court that certain persons actuated by rancour and spite have harassed the Hindu resident in the town of Benares and a few other places in that neighbourhood, and also certain Brahmins, keepers of the Temples, in whose charge those ancient temples are, and that they further desire to remove these Brahmins from these ancient office (and this intention of theirs causes distress to that community) therefore our Royal Command is that after the arrival of our lustrous order you should direct that in future no person shall in unlawful ways interfere or disturb the Brahmins and the other Hindu resident in those places, so that they may as before remain in their occupation and continue with peace of mind to offer up prayers for the continuance of our God-given Empire that is destined to last to all time. Consider this as an urgent matter. Dated 15th of Jumada 'S-Saniya A. H. 1064 (A. D. 165' or 4.)

উপরোক্ত ফারমানের মূল ভাবার্থ জানিবার জন্য আমি [illegible] সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রফেসর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়কে চিঠি লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে আমাকে জানাইয়াছেন—'ঔরংজীব হুকুম দিয়া কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দির ভগ্ন করান, একথা তাঁহার সরকারী ফারসী ইতিহাসে লিখিত আছে। সেন মহাশয় যে ফার্ম্মান উল্লেখ করিয়াছেন তাহা Journal of the Asiatic Society of Bengalএ তৎপূর্ব্বে মুদ্রিত হয়, এবং তাহার একখানি বড় ফটো আমার নিকট আছে। সেখানিতে কাশীর কয়েকজন পূজারীকে রক্ষা করিবার হুকুম দেওয়া হয়; উহার তারিখ বাদশাহের রাজত্বকালের প্রথম বৎসর, যখন তাঁহার পুত্র মুহম্মদ সুলতান, পরাজিত শূজাকে মুঙ্গেরের দিকে পশ্চাদ্ধাবন করেন।'

যায়। মনে হয় যেন কোন দেবশিল্পী এই মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। হিন্দুর স্থাপত্যসৌন্দর্য্যের গৌরব-স্মৃতির মহিমা মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠে। এত সুন্দর, এত সুগঠিত মন্দির সম্রাট্ ঔরংজেব কেন ভাঙ্গিয়াছিলেন? প্রজার বেদান্তমূলক ধর্ম্মকে ঔরংজেবের মত ধর্ম্মবিশ্বাসী কেন যে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহাও একটা সমস্যার বিষয়। আজিও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বিধর্ম্মী বলিয়া—ভারতসম্রাট্ শুধু প্রজার স্কন্ধে 'জিজিয়া' কর স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, প্রজার ধর্ম্ম, প্রজার পূজার মন্দির, প্রজার দেবতাকে নষ্ট করিতে—ভাঙ্গিতে—চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এত করিয়াও কিন্তু তিনি হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের এক কণিকাও বিলোপ করিতে পারেন নাই।

(ক্রমশঃ)

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"করমালা" তালুকে পীড়া।

২৬, ২৭, ২৮ ফেব্রুারী ১৮৯১।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

ডাক্তার ভিতরে বিছানায় বসিয়াই ছিলেন। ইনি জাতিতে মুসলমান, কিন্তু ব্যবহারে খুব সৎ ও সুশীল। তিনি খুব আস্থা ও যত্নের সহিত ঔষধোপচার করিতেছিলেন, তথাপি ওঁর শরীর ক্রমশ খারাপ হইতে লাগিল। খুব ঘাম ছুটিতেছিল এবং মুখও ছায়ের মত রক্তহীন দেখাইতেছিল। এক্ষণে ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। মুখের কাছে কাণ না আনিলে তাঁর মুখের কথা শুনা যায় না। বলিতেছিলেন কি?—সমস্ত দিন কেবলি বলিতেছেন;—"তুমি ঘাবড়িয়ে যেওনা, ভয় পেয়োনা, মনোযোগ দিয়ে বোতলের উপরকার অক্ষরগুলা ভাল করে' পড়ে তবে আমাকে ঔষধ দিতে থাক। ঘাবড়িয়ে গেলে ভুল করে আর কোন ঔষধ দেবে"—ইত্যাদি কথা আমাকে সাহস দিয়া দিনের মধ্যে কতবার বলিতেন। শরীর ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল; সেইজন্য আমার ধড়ে যেন প্রাণ ছিল না। কিন্তু ওঁর সাহসের কথা শুনিয়া আমি যেন নূতন প্রাণ পাইতাম; কিন্তু এখন কথা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আমি একেবারেই সাহস হারাইলাম। ধরণী ও আকাশ ছাড়া আমার কাছে যেন আর কিছুই নাই। সেই দয়াময় পরমেশ্বর এখন কোথায়? আজ পর্য্যন্ত আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাঁর উপরেই। তিনি ছাড়া এ সময়ে আমার আর কেহ নাই, এ কি তিনি জানেন না? ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া, আমি আপন মনে কাঁদিতেছিলাম এবং সেই আবেশভরেই উঠিয়া একবার নাড়ী দেখিলাম। নিকটে ডাক্তার ও কেরাণী বসিয়া ছিলেন। "আমি ভিতর থেকে এখনি আসৃচি" এই কথা তাঁদের বলিয়া যে দেবালয়ে আমরা নামিয়াছিলাম, সেই মহাদেবেরই মন্দিরের ভিতর দেবতার সম্মুখে গিয়া বসিলাম। তখন রাত্রি তিনটা। ভিতরে এক বৃদ্ধা পূজারিনী শুইয়াছিল, আমি তাকে বাহিরে যাইতে বলিলাম। কিন্তু সেখানকার দীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আমার তা' ভালই মনে হইল। কারণ এই সময় আমার যেরূপ মনের অবস্থা তাহাতে দেবতা ও আমি—আমরা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি যেন কেহ না থাকে; একটি দীপও না থাকিলে ভাল হয় মনে হইতেছিল। পারিতাম যদি নিবাইয়া দিতাম, কিন্তু হাত দিতে সাহস হইল না। ও কথা মনে করিলেও অশুভ হয় এইরূপ মনে করিয়া আমি দেবতার সম্মুখে পাগলের মত বসিয়া রহিলাম। মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল না বলিয়া দেবতার সম্মুখে মাথা রাখিয়া আস্তে আস্তে—কিন্তু খুব মন খুলিয়া কাঁদিলাম। খুব কাঁদিবার পর, মন একটু হাল্কা হইলে যা মনে হইতেছিল তাই বলিতে লাগিলাম, প্রার্থনা করিলাম এবং সর্ব্বপ্রকারে দীনতার ভাব মনে আসা সত্ত্বেও আক্রোশের সহিত বলিলাম; "আমরা দীন, সঙ্কটে তোমার দ্বারে এসে পড়েছি; তোমার যাহা ভাল মনে হয় সেই ভাবে আমাদের উদ্ধার কর; তুমি অন্তর্যামী সবাই বলে; আমার উপর তোমার যদি দয়া না হয় তাহলে বাহিরে যে একটা বড় কুয়ো আছে সে নিশ্চয়ই দয়া করে তার উদরের মধ্যে আমাকে গ্রহণ করবে," এইরূপ কত কথাই বকর বকর করিয়া বকিয়া গেলাম। সব রকমে শ্রান্ত হইয়া পড়িবার দরুণ, কি অন্য কারণে, তা কে জানে—এইরূপ ভয়ঙ্কর কষ্টের অবস্থা সত্ত্বেও, কয়েক সেকেণ্ড-কাল সেইখানেই আমার চোখ্ বুজিয়া আসিল। আমি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন কোথাও একটা উচু পাহাড়ের উপর দেবালয় আছে আমি যেন সেইখানে গিয়াছি। দেবালয়ের নীচেই কৃষ্ণানদীর প্রবাহ-পথ; তারই ধারে স্থানে স্থানে বট-পিপলের বৃক্ষ;—তাহা বেশ মজবুত করিয়া বাধানো; এবং মাঝে মাঝে বড় ঘাট। এইরূপ এক উচ্চ ঘাটের নিকটস্থ বাঁধান বটবৃক্ষের উপরে দুই হাতে ঠেস্ দিয়া নীচের মজা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছি। সেই দিন কোন একটা বিশেষ বড় পরব ছিল। হাজার হাজার স্ত্রীলোক ও পুরুষ কৃষ্ণানদীতে স্নান করিতেছিল। আমি যে উচ্চ ও বিস্তৃত বটবৃক্ষকে দুই

হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই বড় গাছটা যেন পড়িয়া যাইবে এইভাবে সম্মুখের দিকে ঝুঁইয়া পড়িতে লাগিল এবং তাহার দরুন গাছের বাঁধানো বেদীর মাটী ফাটিয়া যাইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভয় পাইলাম এবং দুই হাতে সেই বটবৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া খুব চীৎকার করিয়া নীচের ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম,—ওগো। তোমরা দেখ এই গাছটা পড়ে যাচ্ছে, কেহ নীচের থেকে ওকে হাত দিয়ে ধর, আটকাও ; যদি পড়ে ত হাজার লোকের প্রাণ যাবে”—এইরূপ বলিয়া, আমার যতটা শক্তি ছিল, সেই শক্তি ব্যয় করিয়া গাছটাকে আমার দিকে টানিতে লাগিলাম। আমি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলাম, আমার মুখ শুকাইয়া গেল। ইতিমধ্যে নীচের লোকেরা নদী হইতে ভিজে-গায়ে দৌড়িয়া আসিয়া হাজার হাজার লোক সেই বট বৃক্ষকে হাত দিয়া আট্‌কাইল। দুই এক মিনিটের মধ্যেই ঐ বৃক্ষ আর বেশী না ঝুঁকিয়া, দৃঢ়ভাবে সেইখানেই রহিল। গাছটা আর নীচে পড়িয়া যাইবে না, এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে, নীচের লোকেরা হাত ছাড়িয়া দিল এবং আমারও আনন্দ হইল। গাছটাকে তখনও জাপ-টিয়া ধরিয়া আছি এমন সময় আমাদের শিরেস্তাদার আসিয়া আমাকে ডাকিল। আমি ভীত হইয়া একেবারে উঠিয়া পড়িলাম এবং তখনি সেই ভাবেই রোগীর শয্যার পাশে আসিলাম সত্য ; কিন্তু আমাকে কেন ডাকা হই-য়াছে, অবস্থাটা কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি পাগলের মতো চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। ইতি-মধ্যে ডাক্তার আমাকে বলিলেন, “একটু নীচু হও, উনি তোমাকে কিছু বলতে ইচ্ছা করেন মনে হয়।” আমি তখনই নীচু হইয়া “ওঁর” মুখের কাছে আমার কাণ রাখিলাম। তখন ক্ষীণ স্বরে আস্তে আস্তে উনি বলিলেন—“আমাকে বসিয়ে দেও। আমার বমি আসচে।” এই কথা শুনিয়া আমি ও ডাক্তার দুজনে মিলিয়া ওঁকে আস্তে আস্তে বসাইয়া দিলাম। তখন খুব জোরে বমি হইয়া গেল। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, ঘাড় নেতিয়া পড়িল। বালিস উঁচু করিয়া ও তাহাতে আস্তে আস্তে ঠেস দিয়া রাখিয়া, ডাক্তার নাড়ি দেখিলেন। সন্ধ্যাকাল হইতে ঠাণ্ডা ঘাম ছুটিতেছিল, এক্ষণে তাহা বন্ধ হইল, কিন্তু হাত-পা-ঠাণ্ডা সেই রকমই ছিল ; তাই ডাক্তার আমাকে বলিলেন, আমি যা দেব বলে রাত্রি থেকে ভাবচি সেই ঔষধের এক মাত্রা এখন দেও।” আমি তুলসীর রসে হেমগর্ভের ঔষধটা ঘসিয়া তাহাই দুই তিন আঙ্গুল পরিমাণ চাটিতে দিলাম। নাড়ী অস্থির ভাবে চলিতেছিল, যেরূপ হওয়া উচিত তাহা ছিল না ; সেই অবস্থায়, রোগের জোর আরও বেশী হইল। এই সময়েই উনি ভরসা হারাইলেন এবং আমাকে বলি-লেন—“এখন আমার অবস্থা ভাল নয়। কোথায় পুণা আর কোথায় আমি। তুমি নিতান্তই একলা!” এইরূপ বলাবলির পর, আবেগে ওঁর বুক ভরিয়া উঠিল,—ও উনি বলিলেন :—“ভয় নাই, ঈশ্বর তোমাকে দেখবেন ; বাড়ীতে তার করে’ দুর্গাকে ডাকিয়ে আনো।” আমি আবার হেমগর্ভের মাত্রা চাটিতে দিলাম এবং ডাক্তার যে ঔষধ দিয়াছিলেন সেই ঔষধ খাওয়াইয়া তারপর কাঁজি পান করাইলাম এবং খুব ভরসা দিয়া বলিলাম—“ডাক্তার আমাকে বলেচেন, খাদ্রির চেয়ে এখন ভাল আছেন, ভরসা ছেড়ো না। বাড়ীতে তার করেছি ; বিশ্রামজী ও ননদ সকালে শীঘ্রই আসচেন।” তখন সকাল ৫টা ; ডাক্তার ও আমি দুজনে পাশে থাকিয়া নাড়ী ধরিয়া বসিয়াছিলাম। আমি নামমাত্র হাত ধরিয়া ছিলাম, কিন্তু আমার মন সেখানে না থাকায়, নাড়ীর চলাচল কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। বরং নাড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া আমি ওঁর মুখের পানে চাহিয়া ডাক্তারের দিকে তাকাইলাম ; তখন, ডাক্তার “ভয় কোরো না”—হাতের ইসারায় আমাকে বলি-লেন। ৫।৭ মিনিটের পর—এখন নাড়ী নিশ্চয়ই বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ আমার মনে হইল এবং হয়তো বা একবার ফুকরিয়া কাঁদিয়াও উঠিয়াছিলাম, ইতি-মধ্যে ডাক্তার ইহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে বলিলেন :—“ভয় নাই, কেঁদো না, আমি মিথ্যা বলচিনে। ঘুম না হলেই খারাপ। এই দেখ, ঘুম এসেছ, এবং হাত-পাও একটু গরম হয়ে আসছে।” তাঁর এই কথা শেষ না হইতে হইতেই আমি ওঁর নিদ্রাকার নাক-ডাকার শব্দ শুনিতে পাইলাম, তখন আমার মন স্থির হইল। তার-পর প্রায় ২০ মিনিট বেশ ঘুম হইয়াছিল। রাত্রি হইতে যে সকল ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে যেন জর আসিবার মতো গরম হইয়া উঠিল। নাড়ীর টোকা অধিক জোরে ও দ্রুত পড়িতে লাগিল। তখনও ঘুমাইতেছিলেন। এইরূপ অবস্থায় পাকা এক ঘণ্টা নিদ্রা হইবার পর, প্রায় ৭টার সময় বিশ্রামজীর গাড়ী আসিল। তাঁকে ও ননদকে দেখিয়া আমার ভরসা হইল। ডাক্তার বিশ্রামজী শয্যার নিকট আসিবামাত্র, তিনি জাতিতে মরাঠা, গোয়ালা হইলেও আমি তাঁর পা ধরি-লাম ও পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিলাম—“এখন পর্য্যন্ত এই ডাক্তার দয়া করে’ ওঁকে কোন রকম করে’ বাঁচিয়ে রেখেছেন, এখন উনি আপনার হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন ; এখন আপনি ওঁকে রক্ষা করুন। আপনার রূপ ধরে দেবতাই আমাকে সাহায্য করতে এসেছেন, এই রকম আমার বোধ হচ্চে।” বিশ্রামজী নিকটে গিয়া নাড়ী দেখিলেন। সেই সময় আধা ঘুমন্ত অবস্থা ছিল ; তাই ডাক্তারকে লইয়া বিশ্রামজী একটু বাহিরে গেলেন এবং এখন পর্য্যন্ত কি কি ঔষধাদি দেওয়া হইয়াছে তাহার তদন্ত করিতে লাগিলেন। ননদ শয্যার নিকট বসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে, উনি চোখ মেলিয়া উপরে চাহিলেন। ননদ ও বিশ্রামজীকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া বলিলেন—“তোমরা এসেছ ? দেখ আমার কি অবস্থা!” এবং মনের মধ্যে একটা আবেগ আসিবামাত্র দুর্ব্বলতার দরুণ ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিশ্রামজী, একটু পাখার বাতাস দিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বলিলেন :—“আমি এসেছি, আর কোন ভয় নাই ; যা কিছু সঙ্কট সে কাল ছিল ; এখন সেটা কেটে গেছে।” এই কথা বলিয়া তিনি নিজের ব্যাগ হইতে বোতল বাহির করিয়া একটা গেলাসে ঔষধ ঢালিলেন এবং তাহাতে একটু জল দিয়া তাহা পান করিবার জন্য সম্মুখে ধরি-লেন। তখন উনি আস্তে আস্তে বলিলেন :—“আমাকে বসিয়ে দেও।” আমরা দুজনে ধরিয়া ওঁকে বসাইয়া দিলাম। উনি ডাক্তারের হাত হইতে গ্লাস আপন হাতে লইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন :—“পান করব কি ?” ডাক্তার বলিলেন “হাঁ” ; তারপর ঠোঁটের কাছে আনিয়া, কি

জানি, কি একটা ওঁর মনে হইল। গেলাসটা শয্যার বাহিরে রাখিয়া একেবারে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। "এরূপ কেন করিলেন"? জিজ্ঞাসা করায়, একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"আমাকে তোমরা কেউ এ রকম ঠাট্টা কোরো না; আমার যা নিয়ম তা রাখো; ও-ছাড়া আমাকে আর যে ঔষধ দেবে তা আমি খাব।" এই কথায়, ডাঃ বিশ্রামজী অনেক রকম করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, "নিতান্ত নিরুপায় না হলে আমি এ ঔষধ ব্যবহার করিনে। আপনার স্বভাব আমার জানা আছে। কিন্তু হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ও থেকে-থেকে মূর্চ্ছা হচ্চে—এর প্রতীকারের জন্য ২০ হইতে ৩০ ফোঁটা খাওয়া দরকার এবং পুণায় যাওয়া পর্য্যন্ত আমার এই কথাটা শুনতে হবে; সেখানে গেলে এর বদলে অন্য ঔষধ প্রয়োগ করব।" এই কথা শুনিয়া, শুধু 'রাম রাম' বলিয়া, নীরবে ও অতি কষ্টে ঔষধটা খাইলেন। এইরূপ সেইদিন ঐ খানেই কাটাইয়া, তারপর দিন করমালা হইতে আমরা বাহির হইয়া গরুর গাড়ী করিয়া জেউরের ষ্টেশানে আসিলাম। ওঁকে গরুর গাড়ীতেই নরম গদি পাতিয়া রাখা হইয়াছিল। এবং গাড়ীতে একটুও ঝাঁকানি না লাগে, এইজন্য গাড়ী আস্তে আস্তে চালানো হইতেছিল। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বিশ্রামজী, আমি, ননদ প্রভৃতি আমরা হাঁটিয়া চলিতেছিলাম, প্রতি বিশ মিনিট কিংবা অর্দ্ধ ঘন্টায় ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া ঔষধ দিতেছিলেন। এইরূপ প্রায় ১১টার সময় আমরা ষ্টেশানে আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত আড্ডা করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে সেকণ্ড ক্লাসের কামরা রিজার্ভ করিয়া রাত্রি দশটার সময় পুণায় আসিয়া পৌছিলাম। বোম্বায়ে চিরঞ্জীব-বাবা-ভাউজী স্কুলে পড়িত, তাকে পূর্ব্বদিনে তার করা হইয়াছিল। তদনুসারে সে ও প্রিন্সিপ্যাল বামন-আবাজী-মোড়ক জেউরের ষ্টেশানে আসিয়া মিলিত হইলেন। তদনুসারেই পুণা হইতে কীর্ত্তনে ও অন্যান্য ব্যক্তি জেউরায় আসিয়াছিলেন; আমাদের পুণায় পৌছিবার ২ দিন আগে পীড়ার খবর সহরময় রাষ্ট্র হয়, সেই জন্য সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন ছিল। আজ রাত্রে পুণার ষ্টেশনে তান পাল্কী লইয়া আসিবে, এইরূপ বাড়ীতে তার করিয়াছিলাম। সেই অনুসারে আমাদের বাড়ীর লোক পাল্কী লইয়া ষ্টেশনে আসিয়াছিল। সেই সময় অন্য বন্ধুবর্গও ষ্টেশনে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র পাল্কী আনিয়া গাড়ীর কাম্‌রার গায়ে লাগান হইল এবং যাতে ঝাঁকানি না লাগে—ওঁকে আস্তে আস্তে উঠাইয়া পাল্কীতে রাখা গেল এবং কাহাকেও সাক্ষাৎ করিতে না দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া পাল্কী আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে রওয়ানা করা হইল। এই পীড়ায় এতটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মনে একটু আনন্দ বা একটু দুঃখের আবেগ আসিলে তখনই মূর্চ্ছা যাইতেন। সেইজন্যই কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে অনেক দিন পর্য্যন্ত ওঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়া হয় এইরূপ ডাঃ বিশ্রামজী আদেশ করিয়াছিলেন। এই পীড়া ভাল করিয়া সারিতে এবং তাহার পর কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ওঁর প্রায় দুই মাস লাগিয়াছিল।

১৭ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

মহাভারতীয় নীতিকথা।

আদিপর্ব্ব।

গতানুশোচনা। যাহা ভবিতব্য, অতি সাবধানে থাকিলেও তাহা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়।

দৈব। এই জগতীতলে অদ্যাপি বুদ্ধিবলে কেহই দৈবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেন নাই। কারণ দৈবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে। (অনুক্রমণিকাধ্যায়-২৮।

পাপ নহে। তপস্যার অনুষ্ঠান পাপজনক নহে, অধ্যয়নে পাপ নাই, জীবিকার নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও পাপাচার নহে। (ঐ ৩১।

ধর্ম্ম। লোকান্তরগতজনের ধর্ম্মই অদ্বিতীয় বন্ধু।

অর্থ ও স্ত্রী। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয়ানুরাগপূর্ব্বক সেবিত হইলেও কখন স্থির ও আত্মীয় হয় না।

(পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়-৬৫।

দক্ষিণা। যিনি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া শিক্ষা দান করেন ও যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করে তাহাদের মধ্যে একজন মৃত্যু বা বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়।

(পৌষ্য পর্ব্বাধ্যায়-৮১।

মিথ্যা। মিথ্যাবাদী সর্ব্বত্র অনাদরণীয় হয়।

(পৌলম পর্ব্বাধ্যায়-১০২।

মিথ্যা। যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া, জানিয়া শুনিয়াও মিথ্যা বলে, সে আপনার উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষকে নরকে পাতিত করে। আর যে ব্যক্তি যথার্থ জানিয়াও না কহে সেও সেই পাপে লিপ্ত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। (ঐ ১০৩।

অহিংসা। অহিংসা পরম ধর্ম্ম। (ঐ ১১৪।

পুত্র। লোকে পুত্রোৎপাদন দ্বারা যেরূপ সদ্গতিসম্পন্ন হয়, ধর্ম্মফল দ্বারা সেরূপ সদ্গতি লাভ করিতে পারে না। (ঐ ১১৮।

আত্মশ্লাঘা। অকারণে আত্মশ্লাঘা অতিশয় অন্যায়।

(আস্তীক পর্ব্বাধ্যায়-১৭১।

মাতৃক্রোধ। সর্ব্বপ্রকার শাপেরই প্রতিবিধানোপায় আছে, কিন্তু মাতৃদত্ত শাপমোচনের কোন উপায় দেখি না। (আস্তীক পর্ব্বাধ্যায় ১৭৯।

অধর্ম্ম। বিপদকালে ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতীকার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য, কারণ অধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্ত জগতের বিনাশকারী। (ঐ ১৮০।

হিতসাধন। যাহাতে সকলের হিতসাধন হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। (ঐ ১৮২।

দৈব। যে ব্যক্তি দৈবপর হয়, তাহার দৈবের উপর নির্ভর করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কারণ সে স্থলে দৈব ব্যতিরেকে তাহার রক্ষা পাইবার আর কোন উপায়ান্তর নাই। (ঐ ১৮৩।

রাজা। ন্যায়পরায়ণ রাজা যদিও কদাচিৎ কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদিগের অবশ্যই সহ্য করা উচিত। (ঐ ১৯৩।

রাজা উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগের প্রতি দণ্ড বিধান করেন

রাজা। রাজদণ্ড ভয়ে পুনর্ব্বার ধর্ম্ম ও শান্তির সংস্থাপন হয় এবং ধর্ম্ম হইতে স্বর্গ সংস্থাপিত হয়।

(ঐ ১৯৪।

ক্রোধ। ক্রোধ সংযমী তপস্বীগণের বহুযত্নে সঞ্চিত ধর্ম্মরাশি লোপ করে।

ধর্ম্ম। ধর্ম্মহীন লোকদিগের সদ্গতি লাভ হয় না।

ক্ষমা। শমগুণই ক্ষমাশীল তপস্বীগণের সর্ব্বত্র সিদ্ধিদায়ক। কি ইহলোক কি পরলোক ক্ষমাবানের সর্ব্বত্রই মঙ্গল।

(ঐ ১৯৫।

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের পূজনীয় সন্দেহ নাই।

(ঐ ২৩৭।

স্ত্রীলোকের পিতৃগৃহে বাস। নারীগণের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা অবিধের এবং তাহাতে কীর্ত্তি, চরিত্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

(সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়-৩১৯।

আত্মাবমানন। আত্মাকে অবজ্ঞা করিও না।

মিথ্যা। যে ব্যক্তি মনে একপ্রকার জানিয়া মুখে অন্যপ্রকার বলে, সেই আত্মাপহারী চৌরের কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করা হয়।

(ঐ ৩২১।

পাপ। লোকে পাপ কর্ম্ম করিয়া মনে করে আমার দুষ্কর্ম্ম কেহই জানিতে পারে নাই কিন্তু দেবগণ ও অন্তর্যামী পুরুষেরা সকলই জানিতে পারেন।

আত্মার পরিতোষ। পাপপুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ হৃদয়স্থিত আত্মা সন্তুষ্ট থাকিলে বৈবস্বত যম স্বয়ং মনুষ্যের পাপ নাশ করেন। আর যে দুরাত্মার আত্মা সন্তুষ্ট নহেন যম সেই দুরাচারের পাপ বৃদ্ধি করেন।

মিথ্যা। যে পাপাত্মা আত্মাকে অপমান করিয়া সত্য বিষয় মিথ্যারূপ প্রতিপাদন করে, দেবতারা তাহার মঙ্গল বিধান করেন না।

(ঐ ৩২১।

ভার্য্যা। গৃহকর্ম্মদক্ষা পুত্রবতী পতিপরায়ণা ভার্য্যাই যথার্থ ভার্য্যা।

ভার্য্যা। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা অসহায়ের সহায়স্বরূপ, ধর্ম্মকার্য্যে পিতার স্বরূপ, আর্ত্ত ব্যক্তির জননী স্বরূপ, এবং পথিকের বিশ্রাম-স্থানস্বরূপ। ভার্য্যাবান ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাজন।

ভার্য্যা। ভার্য্যা কর্ত্তৃক সাতিশয় ভৎর্সিত হইলেও তাহার অপ্রিয় কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে, কারণ রতি প্রীতি ও ধর্ম্ম এই তিন সুখসাধনই ভার্য্যার আয়ত্ত।

স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক আত্মার পবিত্র কর্ম্মক্ষেত্র।

(ঐ ৩২২-৩।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থপরিচয়।

মাধবী—শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত। যতীশ লাইব্রেরী চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। এখানি কবিতা পুস্তক। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র মহাশয় লিখিত ভূমিকা-সহ। বিভূতি বাবু ভূমিকায় বলিতেছেন "কিরূপে একটি মুমুক্ষু জীবাত্মা আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-ব্যথা, বিরহ-মিলন প্রভৃতি মানবজীবনের চিরন্তন আলো-অন্ধকারের ভিতর দিয়া পরমাত্মাকে বাহিত হইয়া তাঁর অন্বেষণ করিয়া লয়, "মাধবীর" বিভিন্ন স্তবক-পরম্পরায় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।" এই কবিতা-পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। প্রায় অনেকগুলি কবিতাই অতি সুন্দর লাগিল—সদ্যস্ফুট "মাধবী" ফুলের মতই সেগুলি মনোহর —গন্ধমধুর।

কবিতাগুলি পড়িলে "আলো ও ছায়া"র কবির কথাই মনে পড়ে। শিশুর মতন সরলতা ও আন্তরিকতা এই কবিতাগুলিকে আরো সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। আমরা এই কবির পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। তবু কবি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই বঙ্গসাহিত্যে উজ্জ্বলমণি-বিশেষ।

ধ্যানলোক—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত কবিতা পুস্তক। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। মূল্য বারো আনা। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের একখানি চিত্র আছে। এই ভক্ত-কবির 'ধ্যানলোকে' প্রবেশ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করিলাম। কবিতাগুলি বেশ গাম্ভীর্য্য ও ভাবপূর্ণ। প্রত্যেক কবিতাতেই কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কবির মনও খুব উদার ও ভগবদ্‌ভাবে পূর্ণ। "আহ্বান" শীর্ষক কবিতায় কবি অসঙ্কোচে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"কে মহৎ শত ধন্য পূজ্য গরীয়ান্
কে নগণ্য অতি তুচ্ছ ধূলির সমান
তিলেক চিন্তিতে আজি নাহি অবসর—
এস মোর মুক্ত-বক্ষে বিশ্ব-চরাচর!

"স্বদেশের প্রতি" কবিতাটি বেশ গম্ভীর-ভাবোদ্দীপক ;—

"স্তব্ধ কেন দশদিক,—শান্ত কেন সিন্ধুর গর্জ্জন,
এতো নহে শান্তিছায়া—আসে পুনঃ ঘনায়ে মরণ!"

জন্মভূমির প্রতি কবির কি প্রগাঢ় ভালবাসা :—

"তবু মা জগতে সব জন হতে তোমা
গোপন মরমে ভালো যে বেসেছি ওমা!
সকল হৃদয় বাহিরি গানের ছলে
লুটাতে চাহে মা, তোমারি চরণতলে," ইত্যাদি।

"জপমালা" "নবতীর্থ" "মাল্যদান" "প্রার্থনা" "সম্ভোগ" প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতা বেশ ভাল লাগিল।

"সাধনাকুঞ্জের" কবির সাধনা সার্থক হউক।

পিতৃ-বিলাপ কাব্য ও বিবিধ কবিতা—শ্রীহৃষীকেশ দত্ত প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

আমরা উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া এই শোক-সন্তপ্ত পিতার দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করি। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন। কবিতাগুলি শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের মর্ম্মস্থলোত্থিত কাতর উচ্ছ্বাস—সুখপাঠ্য ও সুমধুর ভাষায় ব্যক্ত। কতকগুলি কবিতা বেশ কবিত্বপূর্ণ। মোটের উপর এরূপ বিশুদ্ধ ভাবের কবিতাপুস্তক আমরা অনেকদিন দেখি নাই।

সাহিত্যকল্পলতা ও সুকথামঞ্জুষা—গল্পকাহিনী, নচিকেতা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপরি-উক্ত পুস্তক দুই-

খানি আমাদের দেশের অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের উপযোগী করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন। সাহিত্যকমলমালা নামক পুস্তকখানি গদ্য ও পদ্য এই দুইভাগে বিভক্ত। পুস্তকখানিতে দুই চারিটী পদ্য থাকিলেও গদ্যের ভাগই অধিক। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম যে, গ্রন্থকার বর্ত্তমান কালের গতানুগতিকতার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া দেশের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানে ও গুণে বরেণ্য হইয়া শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল মহাত্মাদিগের পূত জীবনকথা অতি সরল ভাষায়, গল্পচ্ছলে লিখিয়া দেশের ছোট ছোট বালকবালিকাদের সম্মুখে উজ্জ্বল, পবিত্র আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এইরূপ পুস্তকের দ্বারা বালকদের হৃদয় শৈশব অবধি গঠিত হইলে পরিণামে সুফল হইবে।

পুস্তক দুইখানির প্রথমখানি আট আনা আর দ্বিতীয়খানি চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। প্রকাশক শ্রীকালীপ্রসন্ন নাথ ; রিপণ লাইব্রেরী, পটুয়াখালি ঢাকা। সম্ভবতঃ প্রকাশকের এই ঠিকানায় পুস্তক দুইখানি প্রাপ্তব্য।

সংবাদ।

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার এবার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসকদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মানকর পদ লাভ করিলেন।

শোক-সংবাদ।

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস—আমরা নিতান্ত শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে ৮ দিন মাত্র ভুগিয়া রমণীকুলের গৌরব ৺কৃষ্ণভাবিনী দাস গত ১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক স্বর্গীয় মিঃ ডি, এন, দাসের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ইনি ইংরাজী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল স্বামীর সহিত ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। তথাপি দেশীয় সমাজ ও দেশীয় ভাবের উপর ইঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ ইনি কয়েকখানি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন। সমাজ-সেবা ত ইঁহার জীবনের ব্রত-স্বরূপই ছিল। নিজে কষ্টকর জীবন যাপন করিয়াও যাহাদের জীবন অন্ধকারে আবৃত, যাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিবার কেহ নাই,—সেই সকল পতিত, নিরাশ্রয় রমণীমণ্ডলীকে মাতার ন্যায় আপনার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন। অন্তঃপুরচারিণীদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে তাঁহার অসামান্য উদ্যম বিশেষ প্রসংশার যোগ্য। এমন একজন সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা রমণীর মৃত্যুতে সমাজের যে সমূহ ক্ষতি হইল তাহা যে সহজে পূর্ণ হইবে তাহার আশা খুব অল্প। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। ভগবান এই পরদুঃখকাতরা রমণীকে তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে গ্রহণ করুন। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি; ভগবান তাঁহাদের উপর শান্তিবারি বর্ষিত করুন।

৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—গত ১৬ই চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় "বসুমতীর" প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৫২ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার মত কর্ম্মের একজন একনিষ্ঠ সাধক বাঙ্গালীর মধ্যে খুব অল্প দেখা যায়। ইনি বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে সাহিত্যপ্রচারব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং আমরণ সেই ব্রত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। পিতৃশোকসন্তপ্ত তাঁহার একমাত্র সন্তান সতীশ চন্দ্রকে আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি। আশা করি তিনি তাঁহার পিতৃগৌরব রক্ষা করিবেন।

ভ্রম-সংশোধন।

অগ্রহায়ণের সংখ্যায় তান্ত্রিক বর্ণবিবরণ প্রবন্ধে কতকগুলি ভুল হইয়াছে।

২০৬ পৃষ্ঠার ৩য় প্যারার ২য় লাইনে "লকার স্বীকৃত হইয়াছে" এমত হইবে, নকার নহে। ইহারই ৪র্থ লাইনে দুইটি লকারের মধ্যে, ৫ম লকার, এবং অপরটি শব্দ অধিক হইয়াছে। সংস্কৃতাংশে বামকেশ্বরতন্ত্র, রামকেশ্বর নহে। ২০৭ পৃঃ সংস্কৃতাংশে "বিভর্ত্তু পরিশুদ্ধিং চেতসঃ সা সদা বঃ" এইরূপ হইবে। ২০৮ পৃঃ ৩য় লাইন "হব্যবহা ও কব্যবহা" এমত হইবে। ২৪ লাইনে "ওঁ পঞ্চাবয়ব সংস্কৃষ্ট" এমত হইবে।

বিংশ কল্প
প্রথম ভাগ।
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০।

৯০৮ সংখ্যা | ১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

নববর্ষের অভিবাদন।

এই পুণ্যশ্লোক ভারতভূমিতে, এই অগণিত জনগণধারিণী পৃথিবীতে এবং অনন্ত আকাশের ভিতর দিয়া পরিধাবিত এই ব্রহ্মচক্রে, যেখানে যে সকল মহাত্মাগণ অতীত কালে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধন্য করিয়াছেন, বর্ত্তমানে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের মঙ্গলসাধন করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া জগতকে পবিত্র করিবেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ভগবৎসূর্য্য হইতে নিঃসৃত এক একটী বিস্ফুলিঙ্গ। তাঁহাদের সকলকেই প্রেমালিঙ্গনে আহ্বান করিয়া এবং প্রণতিসহকারে অভিবাদন করিয়া নববর্ষের কার্য্যে নবোৎসাহে প্রবৃত্ত হইলাম। ভগবান আমাদের শুভকার্য্যের সহায় হউন।

নববর্ষে প্রার্থনা।

(শ্রীমতী মনীষা দেবী)

আজ এই শুভ নববর্ষের প্রথম দিনে, হে পরমেশ্বর আমরা সত্যসুন্দর তোমার পূজার জন্য এখানে আসিয়াছি। আজ আমাদের হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তোমার জন্য আসন পাতিয়া রাখিয়াছি—তুমি এসো,—তোমাকে আমরা প্রীতিভক্তির পুষ্পপত্রের দ্বারা পূজা করিব। তুমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবের প্রতি প্রেম, করুণা, নিত্য অজস্র বিতরণ করিতেছ—তোমার প্রেম, তোমার করুণা যেন কখনও না ভুলি। হে দেব, হে নাথ! আমরা যেন তোমারই ছায়ায় দাঁড়াইয়া তোমারই মত সমগ্র বিশ্বে আপনাকে বিলাইতে শিখি। হে স্বপ্রকাশ তুমি তোমার প্রেমময় মূর্ত্তিতে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হও। হে জ্ঞানময়, তোমার অনন্ত জ্ঞান দ্বারা আমাদের হৃদয়কে আলোকিত কর। আমাদের কথায়, আমাদের ভাষায় তুমি আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। হে অমৃতময় পূর্ণপুরুষ; তোমার নাম-গানে পাপী তরিয়া যায়, তোমার সংস্পর্শে মৃত ব্যক্তিও সঞ্জীবিত হয়। হে সর্ব্ব-শক্তিমান, আমাদের এমন শক্তি দাও, যেন তোমার নামগানে কখনও অবহেলা ও আলস্য না আসে। প্রভু, ভগবান, তুমি আমাদের চিরসঙ্গী হইয়া থাক। প্রতি বৎসর, প্রতি মাসে, প্রতি দিনে, প্রতিক্ষণে তোমারই নাম লইয়া যেন তোমার সহবাসজনিত সুখ অনুভব করি। হে নাথ, তোমার সেই আনন্দময় অমৃতনিকেতনের পথ যেন পরিত্যাগ না করি, এই আশীর্ব্বাদ দাও। তোমার চরণে আমাদের ভক্তিপুষ্প উপহার দিতেছি, তুমি আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নববর্ষ।

দেবগিরি—ঝাঁপতাল।

নববর্ষ ফিরে এল অভিনব সাজে
আজিকে হৃদয় তন্ত্রী নব সুরে বাজে
কত লোক যায় আসে কত শোকানন্দে
পুরাতন যায় চলে রেখে যায় গন্ধে
তিমির রজনী যায় ছায়া তার ফেলে
আজি তব নামে সকলে নয়ন মেলে।

সুর, কথা ও স্বরলিপি শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
II { পা মা। গা -া রা। ন্া রা। সা -া সা I ন্া সা। রা -া গা।
ন ব ব ০ র্ষ ফি রে এ ০ ল অ ভি ন ০ ব

০ ১ ২ ৩ ০ ১ ২
। রা -পা। মা -গা I গা গা। পা -া ধা। না র্সা। পা -া পা I মা পা।
সা ০ জে ০ আ জি কে ০ হৃ দ য় ত ০ ন্ত্রী ন ব

৩ ০ ১
। গা -া সা। রগা -মপা। মা -গা -া } II
সু ০ রে বা০ ০০ জে ০ ০

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
II { পা গা। পা -া ধা। পধা -নর্সা। র্সা র্সা -া। র্সা র্সা। না ধা -না।
ক ত লো ০ ক যায় ০০ আ সে ০ ক ত শো কা ০

০ ১ ২ ৩ ০ ১
। পধা -নর্সা। ধা -পা -া } I { র্সা না। ধা -া না। পধা না। পা -া পা I
ন০ ০০ ন্দে ০ ০ পু রা ত ০ ন যায় ০ চ ০ লে

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
I মা পা। গা -া -সা। ন্সা -রগা। রা -া -া } II { সা সা। মা -গা মা।
রে খে যায় ০ ০ গ০ ০০ ন্ধে ০ ০ তি মি র ০ র

০ ১ ২ ৩ ০ ১
। পা গা। পা -া -া I ধনা র্সর্রা। র্সা -া পা। গা সা। রা -া -া } I
জ নী যায় ০ ০ ছা০ ০০ য়া ০ তার ফে ০ লে ০ ০

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
I পা -া I গা -া মা। পা -া। ধা -া পা I মা পা। গা -া সা।
আ ০ জি ০ ত ব ০ না ০ মে স ক লে ০ ন

০ ১
। রা -া। গা -া রা } II II
য়ন ০ মে ০ লে

উদ্বোধন।

জর্ম্মনির শ্রেষ্ঠতম কবি মৃত্যুকালেও "আলো—আরও আলো" বলিয়া তাঁহার হৃদয়ের জ্ঞানালোক পাইবার গভীর পিপাসা প্রকাশ করে গেছেন। এই জ্ঞানপিপাসা প্রত্যেক মানুষেরই ভিতর অল্পবিস্তর পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু আমরা সংসারের সুখ, ভোগবিলাস কিছু বেশী ভালবাসি, তাই স্বার্থ, কুসংস্কার প্রভৃতি রকম-বেরকমের পাষাণ-পাথর দিয়ে হৃদয়ের কবাট বন্ধ করে রেখেছি—হৃদয়ের অন্ধকার দূর করতে ভয় পাই, পাছে সুখের স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। কিন্তু হায়। আমরা জানিনে যে, হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে দিতে পারলে সুখের মাত্রা কত গুণ বেড়ে যাবে। আমরা তো প্রত্যেকেই মায়ের ছেলে বটে। সকালবেলা প্রথমেই যদি মায়ের প্রসন্ন মুখ দেখি, তাঁর পায়ে প্রণাম করে যদি কাজ করতে আরম্ভ করি, তাহলে প্রাণের ভিতর কি আনন্দ আসে, কি অনুপম সুখ হয়। আমরা সংসারের নানারকম প্রলোভনে ডুবে গিয়ে ভুলে গেছি যে আমাদের জননী হৃদয়-কবাটের বাহিরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বার্থের মোহে হৃদয়ের অন্ধকারকে ভালবেসে বাহিরে জননীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি! খোলো—খোলো—সরিয়ে ফেল পাথরের বাধা—জননীকে ভিতরে আসতে দাও, তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখে জীবনকে ধন্য কর। তাঁর মুখের জ্যোতিতে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়ে যাক। প্রভাতে পাখীদের গানের মতো হৃদয় থেকে নতুন নতুন গান উঠতে থাকুক। এমন গান উঠুক যে, সেই গান গেয়ে তোমারও যেমন তৃপ্তি হবে, সেই গান শুনে অন্যদেরও তেমনি প্রাণমন ভরে উঠবে। পাষাণের বাঁধ সরিয়ে ফেলে মায়ের চরণে মা—মা—বলে আছড়িয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমাদের মা যে করুণার ধারা—ক্ষমা চাহিলেই ক্ষমা পাবে—আর তাঁর সেই অরূপ রূপের জ্যোতিতে প্রসন্ন মুখ দেখে জীবনকে মঙ্গলের পথে চালিয়ে দাও!—এই উপাসনাক্ষেত্র জননীর অধিষ্ঠান। এখানে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখে যাও—না দেখে গৃহে শূন্যহস্তে ফিরে যেও না—ফিরে যেও না। এসো, প্রাণ খুলে মন খুলে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হয়ে জননীর পূজায় প্রবৃত্ত হই।

ঈশ্বরকে না জানার ফল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঈশ্বরকে জানলে অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন জেনে তাঁর মঙ্গলভাবের উপর নির্ভর করে থাকলে কি রকম নির্ভয় হওয়া যায়, শান্তি পাওয়া যায়, সে কথা আমি গেল বারে বলে' এসেছি। এবারে ঈশ্বরকে না জানার ফল কি, সেই বিষয়ে দু'চার কথা বলতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বরকে না জানার মানে এই যে, ঈশ্বর আছেন বলে' বিশ্বাস না করা অথবা আছেন কিনা সন্দেহ করা। ঈশ্বরে যার বিশ্বাস থাকবে না, তার আত্মা আছে বলেও বিশ্বাস থাকতে পারে না, কাজেই পরলোক আছে বলেও তারা বিশ্বাস করতে পারে না। ঈশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই, এই রকম এ-নেই, ও-নেই বলবার জন্য, নেই নেই স্পষ্ট করে না বল্লেও থাকা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের জন্যও, সংক্ষেপে এই মতকে নাস্তিকমত বলে। যারা এই মত ধরে' থাকে, তাদের নাস্তিক বলে।

একজন নাস্তিকের বিষয় বেশ ভেবে দেখা যাক। সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, আত্মাতে বিশ্বাস করে না, পরলোকে বিশ্বাস করে না। তেবে দেখ, সে বেচারী নির্ভর করে কার উপর? তার মতো কি দুর্ভাগ্য আর কেউ আছে? এ রকম লোকের বিষয় ভাবলেতো আমার খুবই কষ্ট হয়, দুঃখে চোখে জল আসে। তার কাছে এই প্রকৃতির শক্তিগুলো অন্ধ শক্তি—দয়ামায়াহীন হয়ে তাকে যেন ছিঁড়ে খাবার জন্য উদ্যত। এই বিশাল বিরাট প্রকৃতির কাছে সে কতটুকুই বা মানুষ। সে প্রকৃতির অখণ্ডনীয় শক্তির সঙ্গে লড়াই করে পারবে কেন? আর লড়াই করে জিততে পারে না বলেই একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। সকলেই দেখেছে যে সমুদ্র বল, পুকুর বল, জলাশয় মাত্রেই মধ্যে মধ্যে ফেনার মতো বুদবুদ ওঠে, আবার এক আধ মিনিট থেকে আপনিই সেগুলি ফেটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। অবশ্য এই সব বুদবুদ আসবারও কারণ আছে, যাবারও কারণ আছে। কিন্তু সচরাচর লোকেরা সে কারণের কথা জানে না। লোকেরা ভাবে যে বুদবুদগুলো অমনি এসেছিল, আর অমনি চলে গেল। সেই রকম নাস্তি-

কেয়াও মনে করে যে, কতকগুলো অন্ধশক্তির বলে সে এই সংসারে এসে পড়েছে, সজ্ঞান জীবের আকারে দুচারদিন সংসারে খেলা করবে, আবার কিছুদিন পরে সেই সব অন্ধশক্তির বলেই মৃত্যুর কবলে পড়বে। এই যে সংসারে জীবনমৃত্যুর লড়াই চলছে, দিনরাত মারামারি কাটাকাটি চলছে, মানুষ যে তার ভিতর কেন এল, কোথেকে এল, কে তাকে পাঠালে, সে কথা নাস্তিক বলতে পারে না। সত্যি সত্যি কেমন করে' যে সে জন্মগ্রহণ করে' জীবনীশক্তি পেয়ে বেড়ে চলেছে, কোন্ শক্তি ভিতরে থেকে সেই জীবনীশক্তিকে ঠিকঠাক রেখে তাকে বাড়বার পথে চালিয়ে বেড়াচ্ছে, সে কথা নাস্তিক বলতে পারে না। নাস্তিক এ কথা বলতে পারে না যে দুদিন পরে সে কোথায় বা যাবে—মরে' গেলেই কি শেষ হয়ে গেল, না অন্য কোন ভাল লোকে গিয়ে ভাল তার নিয়ে নতুন জীবন লাভ করবে? ভেবে দেখ, তার প্রাণের ভিতরে কত বড় একটা অন্ধকার চেপে বসে' আছে। সে যে বেঁচে আছে, সুখে আছে, সেইটাই তার কাছে সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়—সমস্যার বিষয়। তার ভিতরে যে জ্ঞান, যে ভালবাসা, যে ভক্তি এসে তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, সেই সব জ্ঞান, প্রীতিভক্তি কোথা থেকে এল, কি উদ্দেশ্য নিয়েই বা তারা এল, এ সমস্ত প্রশ্নের ভাল রকম উত্তর সে দিতে পারে না। যা কিছু সে দেখে শোনে, সে সমস্তেরই ভিতর সে কেবল মৃত্যুরই ছায়া দেখে; সংসারের প্রেমভক্তিজ্ঞান, এ সমস্ত যে জীবনকে সজীব করবার জন্য, উন্নত করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, সে কথা সে মনে করতে পারে না, কেননা তার কাছে জীবনের শেষ উদ্দেশ্য বা ফল মৃত্যুর বাহিরে আর কিছুই নয়। এই রকম ভাবতে ভাবতে ধর্ম্মজ্ঞান বলে আমরা যা বুঝি, সেটা আর নাস্তিকের মনে ঠাঁই পায় না। তার কাছে যখন এই শরীর, এই সংসার কিছুদিনের স্বপ্নমাত্র, মৃত্যুর পর যখন তার মতে কোন কিছুই থাকে না, তখন ধর্ম্মজ্ঞানের ভিত্তি, ন্যায় অন্যায়ের ভাবগুলোও তার কাছে যে কিছুদিনের স্বপ্নমাত্র। তখন সেই ভুয়ো জিনিস—ন্যায়ের স্বত্ব বজায় রাখবার জন্য সে দিনরাত পরিশ্রম করতে রাজি হ'তে পারে না—একটা স্বপ্নকে বজায় রাখবার জন্য তার কি এত মাথাব্যথা পড়ে' গেল?

নাস্তিক বল আর সংশয়বাদী বল, সে যদি ঠিক নিজের যুক্তির উপর মতের উপর দাঁড়াবার চেষ্টা করে, তাহলে তার সুখশান্তি থাকতে পারে না। তার আত্মীয়স্বজন রোগশয্যায় পড়ে' যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে থাকলে একজন আস্তিকের মতো ভগবানের হাতে সমস্ত সঁপে দিয়ে শান্তিলাভ করতে পারে না। ইহলোকে বা পরলোকে, কোথাও তার আত্মীয় যে ভগবানের ভালবাসা হারাতে পারে না, এ কথা সে বুঝতেই পারে না, কাজেই আস্তিকের মতো সে নির্ভয় হতে পারে না, আর উদ্বেগ অশান্তির মধ্যে বাস করে। তার মনের উপর অবিশ্বাস অশ্রদ্ধার বড় বড় পাথর চাপানো থাকে; সে পাথর ভেদ করে' তার হৃদয়ে শান্তি সান্ত্বনার কথা ঢুকিয়ে দেওয়া বড় শক্ত।

ভগবানের উপর নির্ভর করা তো দূরের কথা, নাস্তিক লোক মানুষের উপরেই কি এতটুকু নির্ভর করতে পারে? কি করে' নির্ভর করবে? তার কাছে মানুষ বলে' তো সত্যি সত্যি কোন কিছু নেই। মানুষ—এ সমস্তই তো তার কাছে আসলে জড় পদার্থ—শূন্য পদার্থ। যার জন্য মানুষ মানুষ, সেইটাই নাস্তিক স্বীকার করবে না। জড়পদার্থ কিম্বা ফাঁকা জিনিসের উপর কেউ কখনও নির্ভর করতে পারে না, আর নির্ভর করলেও সে নির্ভর বেশী দিন দাঁড়াতে পারে না। নাস্তিক বা সংশয়বাদী বলেন কি না যে, মানুষের আত্মা নেই, আর থাকলেও তা জানা যায় না—মানুষ কেবল চোখ কান হাত পা এই সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে যে অনুভব পাওয়া যায়, সেই সমস্ত অনুভবের সমষ্টি বা একত্র জড়ো করা বা সংগ্রহ করা মাত্র। কাজেই যে নাস্তিক নিজের যুক্তির ঠিক ভিতরকার কথা তলিয়ে দেখবে, সে ঐ ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সংগ্রহের উপর নির্ভর পুরো বজায় রাখতে পারে না। শোকের অবস্থায় সে কারো কাছে সহানুভূতি আশা করতে পারে না, মনের ভালবাসা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারে না—জড় ইন্দ্রিয় তো প্রেমের সহানুভূতির আদান-প্রদান করতে পারে না। নাস্তিক স্ত্রীপুত্রের ভালবাসা বল, বাপমায়ের স্নেহ-প্রেমই

বল, কিছুই মনের সঙ্গে নিতে পারে না—তার মতে স্ত্রীপুত্র-বাপমা সবই যে বলতে গেলে জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভব মাত্র। সচেতন মানুষ অচেতন জড় বস্তুর কাছে কোন কিছুরই আদানপ্রদান করতেও পারে না, করবার প্রত্যাশাও রাখতে পারে না।

নাস্তিক মতটা ঠিকভাবে ধরলে মানুষের যে শান্তি থাকতে পারে না, নাস্তিকের জীবন যে অন্ধকারে ঘিরে ফেলে, একথা আমাদের দেশের লোক তো ছেলে বুড়ো সকলেই জানে, আর সকলেই স্বীকার করে। মহাভারতের কথা কে না জানে? সেই মহাভারতের ভিতর ভগবদ্গীতা নামে এক বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেশ ঢোকানো আছে। সেই গীতাতে অল্পকথায় নাস্তিকের দুর্দ্দশার কথা খুব স্পষ্টভাষায় বলা আছে—"মূর্খ ও অশ্রদ্ধাবান সংশয়াত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, কিছুমাত্র সুখ নাই। * নাস্তিক মতটা এ যুগে আমাদের দেশের চেয়ে বিলাতেই বেশী প্রচার হয়েছিল। বিলাতে ডেবিড হিউম নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত আমরা যাকে সচরাচর নাস্তিক মত বলে' বুঝি, সেইমত প্রচার করবার বড় পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনিও নাস্তিক মতের পরিণাম বিচার করে' শেষকালে নিরাশার অন্ধকারে ডুবে গিয়ে বল্লেন—"মানুষের বুদ্ধির অমিল আর অসম্পূর্ণতার বিষয়ে ভেবে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে; আমি যুক্তি, বিশ্বাস কোন কিছুই মানতে চাইনে, সবই ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছি। আমি কোথায় আছি—কে-ই বা আমি? আমি কি করে'ই বা এলুম, আর আমার শেষই বা কি হবে? কারই বা দয়া চাইব, আর কারই বা শাস্তি ভয় করব? কারাই বা আমাকে ঘিরে আছে? কার উপরেই বা আমার আর আমার উপরেই বা কার প্রভাব পড়ছে? এই সব প্রশ্নে আমি আকুল হয়ে পড়ছি; আমার বোধ হচ্ছে যেন অন্ধকার আমাকে গিলে ফেলতে আসছে; আমার হাত পা যেন শিথিল হয়ে আসছে।" † নাস্তিক মত ঠিক ধরতে গেলে কি ভয়ানক অবস্থাতে পড়তে হয়, তা উপরের কথা থেকে কেমন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

এখন বেশ ভাল করে' বোঝা যাচ্ছে যে, নাস্তিক যদি বলে যে, মানুষ মাত্রই আত্মাহীন কতকগুলো ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সমষ্টি তাহলে সে নিজেও একজন আত্মাহীন ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সমষ্টি হয়ে পড়ে। হাত-পা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলো তো সব জড় পদার্থ। হাত-পাগুলো কেটে ফেলে দিলে তারা কিছুই জানতে পারে না। সে গুলোর অনুভবগুলোও কাজেই জড়পদার্থরই অনুভব। এই রকম তর্কের ফলে দাঁড়ায় এই যে, জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভবগুলো আছে, কিন্তু সেই অনুভবগুলো জানবার বোঝবার লোক কেউ নেই। অনুভব আছে, অনুভব বোঝবার লোক নেই—একথা শুনে তোমরা খুব হাসবে—হাসবারই যে কথা। এখন অনুভব করবার লোক থাক আর নাই থাক, নাস্তিকদের যুক্তি ঠিক বলে' ধরলে আর কিছু হোক আর নাই হোক, পৃথিবীতে ভাল বলে' সাধু বলে' যা কিছু আছে, সবেরই গোড়া কেটে দেওয়া হয়; কর্ত্তব্য বলে' কোন কিছু থাকতে পারে না, ভক্তিপ্রীতি কথারি কথা হয়ে' পড়ে, ভাল কাজের উপর ঝোঁক চলে' যায়।

কোন্ মত ধরে' চল্লে মানুষের ভাল হয়, সেইটাকে মাপদণ্ড বা দাঁড়িপাল্লা করলে, না বলে' উপায় নেই যে, আস্তিক ও নাস্তিক মতের প্রভেদ—আলো ও অন্ধকারে প্রভেদ, স্বর্গ ও নরকের প্রভেদ। দেখা যায় বটে যে, অনেক আস্তিক লোক অর্থাৎ যারা বলে যে তারা ঈশ্বরে, আত্মাতে ও পরলোকে বিশ্বাস করে এমন অনেক লোক অসৎ কাজে অন্যায় কাজে ডুবে আছে; আবার অনেক নাস্তিক লোক আস্তিকের উপযুক্ত ভাল কাজ থেকে একটুও নড়েচড়ে নি। এ সত্যি হলেও হতে পারে। কিন্তু এখানে কথা হচ্চে এই যে, ঐ আস্তিক লোক মুখে বলে বটে যে সে ঈশ্বর প্রভৃতিতে খুব বিশ্বাস করে, কিন্তু তার কাজেই পরিচয় পাওয়া যায় সে সে সত্যিসত্যি ঈশ্বর প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে না। আর যে নাস্তিক ভাল কাজ করে, সে আসলে কাজেতে আস্তিকেরই পথ ধরে' চলেছে। ঠিক যে নাস্তিক, তার তো কোন কাজই থাকতে পারেনা,

* অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ গী. ৪. ৪৪

† Treatise on Human Nature Book I, Part IV, Sect. 7.

কেন না, সে তো কতকগুলো জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সমষ্টি বা সংগ্রহ মাত্র; কাজেই সে নিজে কোন কাজেরই কর্ত্তা হতে পারে না। আর, যদি বা সে কর্ত্তা হতে পারে বলে স্বীকার করাও যায়, তবুও তার পক্ষে উচুদরের ভাল নিঃস্বার্থপর কাজ করা সম্ভব নয়—এর একটু আভাস আগেই দিয়ে এসেছি। জড়বস্তু ছাড়া যখন কেউ কিছু নয়, তখন সেই জড়বস্তুর জন্য সে নিজের স্বার্থ ছাড়তে যাবে কেন? সে কেন সেই সব জড়বস্তুর ক্ষতি করে'ও নিজের ভোগবিলাস সাধন করবে না? নাস্তিকদের যুক্তির ফলে এই রকম সর্ব্বনাশকর মতে এসে পড়তে হয় বলে' অজ্ঞেয়বাদীদের একজন নেতা বলেছেন যে 'আস্তিক মত ভুল হলেও সেই অনুসারে কাজ করলে জগতের ভালই হয়'। *

এতক্ষণে এটা বোধ হয় বোঝা গেল যে, আস্তিক মত ধরে' কাজকর্ম্ম করলে ভালই হয়, আর নাস্তিক মত ধরে' কাজকর্ম্ম করলে খারাপই হওয়া সম্ভব। এও দেখা যায় যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই আস্তিক অর্থাৎ কোন-না-কোন এক ভাবে ঈশ্বরে, আত্মাতে আর পরলোকে বিশ্বাস করে। নাস্তিক লোক জগতে ক'টা? নাস্তিকের সংখ্যা হয়তো আঙ্গুলে গোনা যেতে পারে। এখন, নিজের যদি ভাল চাও, পরিবারের যদি ভাল চাও, সমাজের, দেশের যদি ভাল চাও, তবে এসো, আমরা ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, যে নাস্তিক মতের এমন ভয়ানক কুফল, সেই মতের প্রভাব থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করুন, তাঁর প্রেমের বর্ম্ম দিয়ে আমাদের সর্ব্বদা ঢেকে রাখুন।

গান।

(রাগিণী—কাফি-সিন্ধু)

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

ওগো তোমায় বিনা কাটবে যেদিন
বার্থ সেদিন জানি
তোমার সনেই যোগে আমার
পূর্ণ জীবনখানি!
যেদিন আমি মোহের ঘোরে
আঁধার ঘরে রইবো পড়ে
রাখবো তোমায় দূরে দূরে
এসো বজ্র হানি!
তোমায় বিনা গেহ আমার
দগ্ধ মরু শূন্য আঁধার
সেই আঁধারে কেমন করে
রইবো বল প্রিয় আমার!
তাইতো সকল পরাণ আমার
থুয়েছি ঐ পায়ে তোমার
বেদন-কাঁদন নীরবে সহি
পরাণ-প্রিয় মানি!!

গীতাধ্যায় সঙ্গতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(গীতারহস্য—চতুর্দ্দশ প্রকরণ)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত)

ভগবান অর্জ্জুনকে প্রথমে এইরূপ বলিতেছেন যে, সাংখ্যমার্গের অধ্যাত্মজ্ঞানানুসারে আত্মা অমর ও অবিনাশী হওয়ায় "ভীষ্মদ্রোণাদিকে আমি বধ করিব" তোমার এই ধারণাটাই মিথ্যা। কারণ, আত্মা মরে না, মারেও না; মনুষ্য যেরূপ আপনার বস্ত্র বদলায় সেইরূপ আত্মা এক দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরে যায় এইমাত্র; কিন্তু সেইজন্য সে মরিয়াছে মনে করিয়া শোক করা উচিত নহে। ভাল; "আমি বধ করিব" এই ভ্রম স্বীকার করিলেও যুদ্ধ কেন করিব এইরূপ যদি বলো, তাহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রত প্রাপ্ত যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ না হওয়াই ক্ষাত্রধর্ম; এবং যখন এই সাংখ্যমার্গে প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন তুমি যদি তাহা না কর তাহা হইলে লোকে তোমার নিন্দা করিবে; অধিক কি, যুদ্ধে মরাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। অতএব কেন বৃথা শোক করিতেছ? 'আমি মারিব', 'সে মরিবে' এই নিছক কর্ম্মদৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া, আমি কেবল আপনার স্বধর্ম্ম করিতেছি এই বুদ্ধিতে তুমি আপন প্রবাহপতিত কার্য্য কর, তাহা হইলে কোন পাপই তোমাকে স্পর্শ করিবে না। সাংখ্যমার্গানুসারে এই উপদেশ হইল। কিন্তু চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ কর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে পর শেষে সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই যদি এই মার্গ অনুসারে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়, তবে এই সংশয় থাকিয়া যায় যে, উপরন্তু

* At least this is a good working hypothesis—J. S. Mill.

হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, যুদ্ধ না করিয়া একেবারে তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করা কি ভালো নয়? পুরাপুরি গৃহস্থাশ্রম করিয়া তাহার পর বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে; যৌবনে গৃহস্থাশ্রমই করিতে হইবে এইরূপ মন্বাদি স্মৃতিকারদিগের আদেশ, এ কথা বলিলে চলিবে না। কারণ, যখনই হউক সন্ন্যাসগ্রহণই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে যখনই সংসারে বিতৃষ্ণা হইবে তখনই বিলম্ব না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই উচিত; এবং এই কারণেই উপনিষদেও "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা" এইরূপ বচন আছে (জা. ৪)। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে যে গতি হয়, রণক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে ক্ষত্রিয় সেই গতিই প্রাপ্ত হয়।

দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাঘ্র সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ॥

"হে পুরুষব্যাঘ্র! সূর্য্যমণ্ডলকে ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে দুইজন গমন করেন; এক যোগযুক্ত সন্ন্যাসী, আর এক, যে ব্যক্তি রণে অভিমুখ হইয়া মরে", এইরূপ মহাভারতে (উদ্যো. ৩২. ৬৫) উক্ত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থাৎ চাণক্যের অর্থশাস্ত্রেও এই অর্থের এক শ্লোক আছে—

যান্ যজ্ঞসংঘৈস্তপসা চ বিপ্রাঃ স্বর্গৈষিণঃ পাত্রচয়ৈশ্চ যান্তি।
ক্ষণেন তানপ্যতিযান্তি শূরাঃ প্রাণান্ সুযুদ্ধেষু পরিত্যজন্তঃ॥

"স্বর্গেচ্ছু ব্রাহ্মণ অনেক যজ্ঞের দ্বারা, নানা যজ্ঞপাত্রের দ্বারা ও তপস্যার দ্বারা যে লোকে গমন করে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণ দেয় সে তৎক্ষণাৎ সেই লোককেও ছাড়াইয়া যায়";—অর্থাৎ শুধু তপস্বী বা সন্ন্যাসী এবং নানা যাগযজ্ঞকারীকিতেরাও যে গতি প্রাপ্ত হয়, রণক্ষেত্রে নিহত ক্ষত্রিয়ও সেই গতি লাভ করে, (কৌটি. ১০. ৩. ১৫০-১৫২ এবং মভা, শাং ৯৮-১০০ দেখ)। "যুদ্ধরূপ স্বর্গের দ্বার ক্ষত্রিয়ের নিকট কচিৎ উদ্‌ঘাটিত হয়; যুদ্ধে মরিলে স্বর্গ ও জয়লাভ করিলে পৃথিবীর রাজ্য পাওয়া যায়" (২. ৩২, ৩৭) গীতার এই উপদেশের তাৎপর্য্যই এই। অতএব, সন্ন্যাস গ্রহণ কর কিংবা যুদ্ধ কর, ফল একই; ইহাও সাংখ্যমার্গ অনুসারে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। কিন্তু যাই বল না কেন, যুদ্ধ করিতেই হইবে এইরূপ নিশ্চিতার্থ এই মার্গের যুক্তিবাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না। সাংখ্যমার্গের এই ব্যাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পরে ভগবান্ কর্ম্মযোগমার্গের প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং গীতার শেষ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত এই কর্ম্মযোগেরই—অর্থাৎ কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং তাহা মোক্ষের অন্তরায় না হইয়া বরং কর্ম্ম করিয়াও কিরূপে মোক্ষলাভ হয় তাহার বিভিন্ন প্রমাণ দিয়া সংশয়নিবৃত্তিপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। কোন কর্ম্ম ভাল কি মন্দ ইহা স্থির করিবার জন্ত সেই কর্ম্মের বাহ্য পরিণাম অপেক্ষা কর্ত্তার বাসনাত্মক বুদ্ধি, শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, ইহা প্রথমে দেখিতে হইবে, ইহাই কর্ম্মযোগতত্ত্বের প্রধান তত্ত্ব (গী. ২. ৪৯)। কিন্তু বাসনা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ ইহা স্থির করা শেষে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিরই কাজ হওয়ায়, নির্ব্বাচনকারী বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে স্থির করিতে না পারিলে বাসনাও শুদ্ধ ও সম হয় না। এই জন্য সেই সঙ্গেই ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, বাসনাত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিতে হইলে, সমাধির দ্বারা প্রথমে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে স্থির করা আবশ্যক, (গী. ২. ৪১)। জগতের সাধারণ ব্যবহার দেখিলে, অনেক লোক স্বর্গাদি বিভিন্ন কাম্য সুখ লাভ করিবার জন্যই যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কাম্য কর্ম্মের বৃথা উদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই জন্য তাহাদের বুদ্ধি—আজ এই ফল প্রাপ্তি হইবে, কাল আবার আর এক ফল পাওয়া যাইবে—এইরূপ চিন্তাতেই অর্থাৎ স্বার্থেতেই নিমগ্ন এবং সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল ও চঞ্চল হইয়া থাকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই-সব লোকেরা, স্বর্গসুখাদি অনিত্য ফল অপেক্ষা বড় অর্থাৎ মোক্ষরূপ নিত্য সুখ লাভ করিতে পারে না। তাই, কর্ম্মযোগমার্গের রহস্য অর্জ্জুনকে বলা হইয়াছে যে, বৈদিক কর্ম্মের এই কাম্য উদ্যোগ ছাড়িয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে শিখো; কর্ম্ম করিবার অধিকার তোমার আছে; কর্ম্মের ফল পাওয়া কি না পাওয়া—ইহা কখনই তোমার আয়ত্তাধীন নহে (২. ৪৭); ফলদাতা পরমেশ্বর এইরূপ মনে করিয়া, কর্ম্মের ফল পাওয়া যাক্ কি না-যাক্ দুই সমান, এইরূপ সমবুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া যাহারা কর্ম্ম করে তাহাদের পাপ-পুণ্য কর্ত্তাকে স্পর্শ করে না; অতএব এই সমবুদ্ধিকেই আশ্রয় কর; এই সমবুদ্ধিকেই অর্থাৎ পাপস্পর্শ না লাগে এইরূপ কর্ম্মের যুক্তি বা কৌশলকেই যোগ বলে; এই যোগ সাধন করিলে, কর্ম্ম করিয়াও তোমার মোক্ষ লাভ হইবে; মোক্ষের জন্য কর্ম্মসন্ন্যাসই করিতে হইবে এরূপ নহে;—ইত্যাদি (২. ৪৭-৫৩)। ভগবান যখন অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, যে ব্যক্তির বুদ্ধি এইরূপ সম হইয়াছে তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়, (২. ৫৩), তখন অর্জ্জুন পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেন যে, "স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণ কিরূপ হইবে তাহা আমাকে বলো"। তাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা করা হইয়াছে এবং শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থাকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে এইরূপ বলিয়াছেন। সার কথা, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতায় যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা এই জগতে জ্ঞানীপুরুষের গ্রাহ্য "কর্ম্মত্যাগ" ও "কর্ম্মসাধন" (যোগ) এই দুই নিষ্ঠা হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে;

এবং যুদ্ধ কেন করিতে হইবে ইহার উপপত্তি প্রথমে সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই উপপত্তি অসম্পূর্ণ হয় দেখিয়া, পরে তখনই যোগ কিংবা কর্ম্মযোগ-মার্গানুসারে জ্ঞানের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এবং এই কর্ম্মযোগের স্বল্পাচরণও কিরূপ শ্রেয়স্কর ইহা বলিয়া তাহার পর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান স্বীয় উপদেশকে এই পর্য্যন্ত লইয়া চলিলেন যে, কর্ম্মযোগমার্গে কর্ম্মাপেক্ষা কর্ম্মের প্রেরক বুদ্ধিকেই যখন শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানা হয়, তখন স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় তুমি নিজ বুদ্ধিকে সম করিয়া কর্ম্ম কর, তাহা হইলে কোন পাপই তোমাকে স্পর্শ করিবে না। এক্ষণে দেখা যাক পরে আরও কি কি প্রশ্ন বাহির হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়েই গীতার সমস্ত উপপাদনের মূল থাকায় তৎসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "কর্ম্মযোগমার্গেও কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে আমি এক্ষণে আমার বুদ্ধিকে স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় সম করিলেই হইল; আমাকে যুদ্ধের ন্যায় নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে কেন তবে বলিতেছ? ইহার কারণ এই যে, কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলিলে, 'যুদ্ধ কেন করিবে? বুদ্ধিকে সম রাখিয়া উদাসীন হইয়া কেন বসিয়া থাকিবে না," এই প্রশ্নের নির্ণয় হয় না। বুদ্ধিকে সম রাখিয়াও কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে পারা যায় না এরূপ নহে। তারপর, সমবুদ্ধি পুরুষের সাংখ্যমার্গানুসারে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধা কি? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান্ এক্ষণে এইরূপ দিতেছেন যে, পূর্ব্বে তোমাকে সাংখ্য ও যোগ এই দুই নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি সত্য, কিন্তু ইহাও মনে রেখো যে, কোন মনুষ্যের পক্ষে কর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করা অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য দেহধারী হইয়া আছে সে পর্য্যন্ত প্রকৃতি স্বভাবতই তাহাকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করিবে; এবং প্রকৃতি যখন এই কর্ম্মকে ছাড়িতে পারে না, তখন ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির ও সম করিয়া কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই আপন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিতে থাকাই অধিক শ্রেয়স্কর। এইজন্য তুমি কর্ম্ম কর; কর্ম্ম না করিলে তোমার খাওয়া পর্য্যন্ত চলিবে না (৩. ৩-৮) পরমেশ্বরই কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন; মনুষ্য নহে। ব্রহ্মদেব যখন জগৎ ও প্রজা সৃষ্টি করিলেন সেই সময়ে তিনি 'যজ্ঞে'রও সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রজাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞের দ্বারা তুমি আপনার সমৃদ্ধি করিয়া লও। এই যজ্ঞ যখন কর্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধ হয় না, তখন যজ্ঞ অর্থে কর্ম্মই বলিতে হয়। অতএব, মনুষ্য ও কর্ম্ম দুই-ই একসঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হইবে। কিন্তু এই কর্ম্ম কেবল যজ্ঞেরই জন্য এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য যজ্ঞ করা, এই কারণে এই কর্ম্মের ফলে মনুষ্যের বন্ধন হয় না। এখন ইহা সত্য যে, যে ব্যক্তি পূর্ণ জ্ঞানী হইয়াছে তাঁহার নিজের কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না; এবং লোকদিগের নিকটেও তিনি কোন বাধা পান না। কিন্তু ইহার দ্বারা সিদ্ধ হয় না যে, কর্ম্ম করিবে না। কারণ, কর্ম্ম হইতে কেহ নিষ্কৃতি পায় না বলিয়া এইরূপ অনুমান করিতে হয় যে, স্বার্থের জন্য না করিলেও সেই কর্ম্ম লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কামবুদ্ধিতে করা আবশ্যক (গী. ২. ১৭-১৯)। এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জনকাদি জ্ঞানী পুরুষ পূর্ব্বে কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং আমিও করিতেছি। তাছাড়া ইহাও মনে রেখো যে, লোকসংগ্রহ করা অর্থাৎ নিজের আচরণের দ্বারা লোকদিগকে ভাল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া জ্ঞানী পুরুষদিগের অন্যতম মুখ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্য যতই জ্ঞানবান হউক না কেন, প্রকৃতির ব্যবহার তাহা হইতে অপসারিত হয় না; অতএব কর্ম্মত্যাগ করা ত দূরের কথা, কর্ত্তব্য বলিয়া স্বধর্ম্মানুসারে আবশ্যক হইলে কর্ম্ম করিতে করিতে যদি মৃত্যুও হয় তাহাও শ্রেয়স্কর (৩. ৩০-৩৫); তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। ভগবান এইরূপ প্রকৃতিকে সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন দেখিয়া মনুষ্যের ইচ্ছা না থাকিলেও মনুষ্য পাপ কেন করে, অর্জ্জুন যখন এইরূপ প্রশ্ন করিলেন, তখন ভগবান এইরূপ উত্তর দিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন যে, কামক্রোধাদি বিকার বলপূর্ব্বক মনকে ভ্রষ্ট করে, অতএব ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের আপন মনকে বশে রাখিতে হইবে। সারকথা, স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধি সমতাপ্রাপ্ত হইলেও কর্ম্ম কাহাকেও ছাড়ে না; অতএব স্বার্থের জন্য না হউক, অন্তত লোকসংগ্রহের জন্যও নিষ্কাম-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতেই হইবে, এইরূপে কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা সিদ্ধ করিয়া "আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ কর" (৩, ৩০-৩১) এইরূপ পরমেশ্বরার্পণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবার, ভক্তিমার্গ বিষয়ক তত্ত্বেরও এই অধ্যায়ে প্রথম উল্লেখ হইয়াছে।

তথাপি এই বিচার-আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ না হওয়ায় চতুর্থ অধ্যায়ও তাহারই আলোচনার জন্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত যাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহা কেবল অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নূতন রচিত এইরূপ সন্দেহ যেন কাহারও মনে না হয়; এইজন্য চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভে এই কর্ম্মযোগের অর্থাৎ ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্ম্মের ত্রেতাযুগবাহী পরম্পরা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, আদিতে কিংবা যুগারম্ভে আমিই এই কর্ম্মযোগমার্গ বিবস্বানকে, বিবস্বান মনুকে

এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে ইহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ঐ যোগই (কর্ম্মযোগমার্গ) আমি এক্ষণে তোমাকে পুনর্ব্বার বলিলাম ; তখন অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, বিবস্বানের আগে তুমি কি করিয়া আসিবে? সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময়, সাধুদিগের সংরক্ষণ, দুষ্টদিগের নাশ এবং ধর্ম্মের স্থাপনা করাতেই আমার অনেক অবতারের প্রয়োজন ; এবং এইরূপ এ লোকসংগ্রহকারক কর্ম্ম আমি করিলেও আমার তাহাতে আসক্তি না থাকায় তাহার পাপপুণ্যাদি ফল আমাকে স্পর্শ করে না। এইপ্রকারে কর্ম্মযোগের সমর্থন করিয়া, এবং এই তত্ত্ব জানিয়াই জনকাদিও পূর্ব্বে কর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন এই উদাহরণ দিয়া তুমিও সেইরূপই কর্ম্ম কর, ভগবান অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার এইরূপ উপদেশ করিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে মীমাংসকদিগের এই যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে যে, "যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধন হয় না" তাহাই পুনর্ব্বার বলিয়া যজ্ঞের বিস্তৃত ব্যাপক ব্যাখ্যা এই ভাবে করা হইয়াছে যে, কেবল তিল-তণ্ডুল দগ্ধ করা কিংবা পশু বধ করা একপ্রকার যজ্ঞ সত্য, কিন্তু এই দ্রব্যময় যজ্ঞ হালকা-রকমের এবং সংযমাগ্নিতে কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দগ্ধ করা কিংবা 'ন মম' বলিয়া, ব্রহ্মেতে সমস্ত কর্ম্ম আহুতি দেওয়া উচ্চ পৈঠার যজ্ঞ, সে উচ্চদরের যজ্ঞের জন্য ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্ম কর অর্জ্জুনকে এক্ষণে এইরূপ উপদেশ করিলেন। মীমাংসকদিগের ন্যায়ানুসারে যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্বতন্ত্ররূপে বন্ধন না হইলেও, যজ্ঞের কোন না কোন ফল পাইতেই হইবে। তাই, যজ্ঞও নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলে, তাহার জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম এবং স্বয়ং যজ্ঞ এই দুইই বন্ধন হয় না। শেষে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বভূত আপনাতে বা ভগবানে আছে এই জ্ঞান যে বুদ্ধি হইতে হয়, তাহারই নাম সাম্যবুদ্ধি, এবং এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম হইয়া তাহাদের কোন বাধা কর্ত্তায় অর্শে না। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"—জ্ঞানে সমস্ত কর্ম্মের লয় হয় ; কর্ম্ম স্বয়ং বন্ধন হয় না, অজ্ঞান হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি। এইজন্য অজ্ঞান ত্যাগ কর এবং কর্ম্মযোগকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সার কথা, কর্ম্মযোগমার্গের সিদ্ধির জন্যই সাম্যবুদ্ধিরূপ জ্ঞান আবশ্যক; এই অধ্যায়ে জ্ঞানের এই প্রকার প্রস্তাবনা করা হইয়াছে।

কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা কি অর্থাৎ কর্ম্ম কেন করিতে হইবে, তাহার কারণসমূহের বিচার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে করা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞানের কথা বলিয়া তাহার পর, কর্ম্মযোগের বিচার-আলোচনাতেও কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এইরূপ বারংবার বলায়, এই দুই মার্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠমার্গ কোন্‌টি তাহা বলা এক্ষণে আবশ্যক। কারণ, দুই মার্গের যোগ্যতা সমান বলিলে, ইহার মধ্যে যাহার যে মার্গ ভাল মনে হইবে সে তাহাই স্বীকার করিবে, কেবল কর্ম্মযোগকে স্বীকার করিবার কোন কারণ থাকিবে না। অর্জ্জুনের মনে এই সংশয় উৎপন্ন হওয়ায় পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন ভগবানকে এই প্রশ্ন করিলেন যে, "সাংখ্য ও যোগ এই দুই নিষ্ঠা সম্বন্ধে মিশ্রিতভাবে আমাকে না বলিয়া এই দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্‌টী, তাহা নিশ্চয় করিয়া আমাকে যদি বলো, তাহা হইলে সেই অনুসারে চলিবার সুবিধা হয়"। ইহার উত্তরে ভগবান স্পষ্টরূপে ইহা বলিয়া অর্জ্জুনের সন্দেহ দূর করিলেন যে, দুই মার্গই নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ সমান মোক্ষপ্রদ হইলেও, তন্মধ্যে কর্ম্মযোগেরই মহত্ব অধিক—"কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে"—(৫. ২)। এই সিদ্ধান্তেরই দ্রঢ়ীকরণার্থ ভগবান্ আরও এইরূপ বলেন যে, সন্ন্যাস বা সাংখ্যনিষ্ঠার দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় তাহা কর্ম্মযোগের দ্বারাও যে লাভ হয় শুধু তাহা নহে ; কর্ম্মযোগে যে নিষ্কাম বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত না হইলে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয় না ; এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে পর, যোগমার্গের কর্ম্ম করিয়াও ব্রহ্মলাভ না হইয়া যায় না। ইহার পর, এ বিবাদে লাভ কি—যে, সাংখ্য ও যোগ ইহারা ভিন্ন? চলা, বলা, দেখা, শোনা, আঘ্রাণ করা ইত্যাদি শত শত কর্ম্ম ছাড়িব বলিলেও যদি তাহা ছাড়া না যায়, তবে কর্ম্মত্যাগের সঙ্কল্প না করিয়া, তাহা ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে করাই বুদ্ধিমানের মার্গ। তাই, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে থাকিয়া শেষে উহা দ্বারাই শান্তি ও মোক্ষলাভ করেন। ঈশ্বর তোমাকে কর্ম্ম কর এইরূপও বলেন না, আর কর্ম্ম ত্যাগ কর এ কথাও বলেন না। এই সমস্ত প্রকৃতির খেলা ; এবং বন্ধন মনের ধর্ম্ম এই কারণে সমবুদ্ধি কিংবা 'সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা' হইয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম তাহার বাধা হয় না। অধিক কি, কুকুর, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী—ইহাদের সম্বন্ধে যাহার বুদ্ধি সম হইয়াছে এবং যে সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া আপনার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার যেখানে বসিয়া আছে সেইখানেই—ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভের জন্য তাহাকে আর কোথাও যাইতে হয় না, অথবা সাধন করিতেও হয় না, সে মুক্ত হইয়াই আছে, এইরূপ এই অধ্যায়ের শেষ কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয়টি আরও আগাইয়া চলিয়াছে ; এবং এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগে সিদ্ধির জন্য আবশ্যক

সমবুদ্ধি প্রাপ্তির উপায়টি কথিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকেই, ভগবান আপনার মত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কর্ম্মফলের আশা না রাখিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া, সংসারের প্রাপ্ত কর্ম্ম করে সে-ই প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত সন্ন্যাসী; অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ছাড়িয়া যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সে প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে। তাহার পর, ভগবান আত্মস্বাতন্ত্র্যের এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন যে, কর্ম্মযোগমার্গে বুদ্ধিকে স্থির করিবার জন্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা সে আপনা হইতেই করিবে; তাহা না করিলে তাহার দোষ অন্যের উপর দেওয়া যাইতে পারে না। ইহার পরে, এই অধ্যায়ে ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ যোগ কিরূপে সাধন করিবে, তাহার পাতঞ্জল দৃষ্টিতে, মুখ্যরূপে এই অধ্যায়ে বর্ণনা আছে। তথাপি যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়ামাদি সাধনের দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলেও তাহাতেও কার্য্যনির্ব্বাহ হয় না; সেই কারণে পরে সেই ব্যক্তির বৃত্তি "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" কিংবা "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি" (৬, ২৯, ৩০) এই প্রকার সর্ব্বভূতে সম হওয়া চাই, এইরূপ আত্মৈক্যজ্ঞানেরও আবশ্যকতা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে অর্জ্জুনের এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, এই সাম্যবুদ্ধিরূপ যোগ এক জন্মে সাধ্য না হইলে পুনর্ব্বার অন্য জন্মেও একেবারে আরম্ভ হইতেই শুরু করিতে হইবে—এবং পুনর্ব্বার সেই দশাই হইবে—এবং এই প্রকার যদি চক্র ক্রমাগতই চলিতে থাকে, তবে এই মার্গের দ্বারা মনুষ্য কখনই সদ্‌গতি লাভ করিতে পারিবে না। এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান প্রথমে বলিলেন যে,যোগমার্গে কিছুই ব্যর্থ যায় না, প্রথম জন্মের সংস্কার থাকিয়া গিয়া, অন্য জন্মে তাহা অপেক্ষা অধিক অভ্যাস হইয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে শেষে সিদ্ধি লাভ হয়। এইরূপ বলিয়া ভগবান এই অধ্যায়ের শেষে অর্জ্জুনকে পুনরায় এই নিশ্চিত ও স্পষ্ট উপদেশ দিলেন যে, কর্ম্মযোগমার্গই শ্রেষ্ঠ ও ক্রমশঃ-সুসাধ্য হওয়ায়, কেবল (অর্থাৎ ফলাশা না ছাড়িয়া) কর্ম্ম করা, তপশ্চর্য্যা করা এবং জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম-সন্ন্যাস করা—এই সমস্ত মার্গ ত্যাগ করিয়া তুমি যোগী হও, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগমার্গের আচরণ কর।

তান্ত্রিক বর্ণপরিচয়।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

শাস্ত্রে বর্ণের উপাদান বাগ্দেবতার চারিটি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থাচতুষ্টয় পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারিনামে অভিহিত হইয়াছে। কাদিমতন্ত্রে ইহাদের বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—প্রথমত আত্মার ইচ্ছাশক্তির অর্থাৎ আত্মপ্রণোদিত মনের আঘাতের দ্বারা মূলাধার চক্রে পরানামক উত্তম নাদ উৎপন্ন হয়। অনন্তর উহা বায়ুর দ্বারা উর্দ্ধদিকে নীত হইয়া স্বাধিষ্ঠান চক্রে বিজৃম্ভিত হয়, অর্থাৎ আত্মবিস্তার করে। এবং পশ্যন্তী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তথা হইতে মন্দ মন্দ গতিতে উর্দ্ধদিকে যাইয়া অনাহত চক্রে বুদ্ধি তত্ত্বের সহিত যুক্ত হয়। তখন উহা মধ্যমা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তথা হইতে উর্দ্ধগতিতে কণ্ঠদেশস্থ বিশুদ্ধ চক্রে গমন করিয়া "বৈখরী" নামে অভিহিত হয়। অনন্তর কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানে যাইয়া তথা হইতে ক্রমে স্থানের গুণনিবন্ধন কণ্ঠ্যাদি সংজ্ঞাযুক্ত অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণাবলীরূপে অভিব্যক্ত হয়। *

শরীরের মধ্যে যে প্রসিদ্ধ মেরুদণ্ড অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যে সুষুম্না নামক নাড়ী অবস্থিত, তন্মধ্যে বজ্রানাড়ী, তন্মধ্যে চিত্রিনী নাড়ী এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী অবস্থান করিতেছে। গুহ্য দ্বারের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং লিঙ্গমূলের দুই অঙ্গুলি নিম্নে কন্দমূল নামক স্থান। উহা মেরুদণ্ডের অধঃসীমা। কন্দ এবং সুষুম্না এতদুভয়ের সংযোগস্থলে চতুর্দ্দল মূলাধার চক্র বর্ত্তমান। লিঙ্গমূলের সমদেশে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে ষড়্‌দল স্বাধিষ্ঠান চক্র অবস্থিত। উহার উর্দ্ধে নাভিমূলের সমদেশে দশদল মণিপূর নামক চক্র অবস্থিত। তদূর্দ্ধে হৃদয়ে দ্বাদশ দল অনাহত চক্র, তদূর্দ্ধে কণ্ঠদেশে ষোড়শদল বিশুদ্ধ চক্র, এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দ্বিদল আজ্ঞা নামক চক্র অবস্থিত। প্রদর্শিত ছয়টি চক্রের মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, অনাহত ও বিশুদ্ধ, এই চারিটি চক্রের সহিত বর্ণনিষ্পত্তির সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ মূলাধার চক্র হইতে বর্ণপ্রক্রিয়ার সূক্ষ্মতম ব্যাপার আরব্ধ হয়, অনন্তর সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত বায়ুর প্রেরণানুসারে ক্রমে প্রদর্শিত অবস্থাচতুষ্টয় নিষ্পন্ন হইলে, পরে মুখমধ্যে সুস্পষ্ট বর্ণভাব ঘটিয়া থাকে। চক্রের বিস্তৃত বিবরণ ষট্‌চক্র-নিরূপণে দ্রষ্টব্য।

---

* স্বাত্মেচ্ছাশক্তিঘাতেন প্রাণবায়ুস্বরূপতঃ।
মূলাধারে সমুৎপন্নঃ পরাখ্যো নাদ উত্তমঃ॥
সএব চোর্দ্ধতাং নীতঃ স্বাধিষ্ঠানবিজৃম্ভিতঃ।
পশ্যন্ত্যাখ্যামবাপ্নোতি তথৈবোর্দ্ধং শনৈঃ শনৈঃ॥
অনাহতে বুদ্ধিতত্ত্ব-সমেতো মধ্যমাভিধঃ।
তথা তয়োর্দ্ধগতো বিশুদ্ধে কণ্ঠদেশতঃ॥
বৈখর্য্যাখ্যস্ততঃ কণ্ঠ-শীর্ষতাল্বোষ্ঠদন্তগঃ।
জিহ্বামূলাগ্রপৃষ্ঠস্থস্তথানাসাগ্রতঃ ক্রমাৎ॥
কণ্ঠতাল্বোষ্ঠকণ্ঠস্থঃ কণ্ঠোষ্ঠদ্বয়তস্তথা
সমুৎপন্নান্যক্ষরাণি ক্রমাদাদিক্ষকাবধি॥
কালীচরণকৃত ষট্‌চক্রটীকা ২১ শ্লোক।

মহাবৈয়াকরণ ভর্ত্তৃহরির গ্রন্থেও বৈখরী প্রভৃতি সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"বৈখর্য্যা মধ্যমায়াশ্চ পশ্যন্ত্যাশ্চৈতদদ্ভুতং" ১. ১৪৪। বাক্যপদীয়ের টীকাকার "পুণ্যরাজ" মহাভারতের প্রমাণের দ্বারা বৈখরী প্রভৃতির উৎপত্তিপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। বৈখরী অবস্থাই মানবদিগের ব্যবহারোপযোগী; অতএব বৈয়াকরণের গ্রন্থে প্রথমতঃ বৈখরীই পঠিত হইয়াছে। উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, প্রয়োগকর্ত্তার অর্থাৎ যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহার প্রাণবায়ুর ব্যাপার-নিবন্ধন বৈখরী বাক্ প্রবৃত্ত হয়। কণ্ঠপ্রভৃতি স্থানে বায়ু বিবৃত হইলে অর্থাৎ তত্তৎস্থানে আঘাত করিলে "বৈখরী" বর্ণরূপ ধারণ করে। কেবল বুদ্ধিকল্পিত বর্ণাকারের অনুপাতিনী বাক্ প্রাণবৃত্তিকে অর্থাৎ স্থানবিশেষে বায়ুর আঘাতকে অতিক্রম করিয়া (অপেক্ষা না করিয়া) মধ্যমা অবস্থায় প্রবৃত্ত হয়। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা পশ্যন্তী। এই অবস্থায় কার্য্যকারণের বিভাগ অর্থাৎ উপাদান হইতে কার্য্যের স্বতন্ত্রতা বিবেচিত হয় না, এবং পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমেরও অভিব্যক্তি হয় না। ইহাই আবার অন্তরে (মূলাধার চক্রে) স্বরূপজ্যোতীরূপে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জ্যোতির্ম্ময়ী পরারূপে অবিনশ্বরভাবে অবস্থান করে। উহা আগন্তুক মলের সহিত নিরন্তর মিশ্রিত হইয়াও চন্দ্রের অন্ত্যকলার ন্যায় অর্থাৎ অবিনশ্বর অমাকলার ন্যায় * অত্যন্ত অভিভূত হয় না। উহার স্বরূপ দৃষ্ট হইলে পুরুষের অধিকার নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম করিবার আর প্রয়োজন থাকে না। † ষোড়শকল পুরুষে অবস্থিত পরা বাক্ অমৃত কলা বলিয়া কথিত হইয়াছে। *

পুণ্যরাজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাগ্‌-দেবতা নিজের একচতুর্থাংশের দ্বারা মানবদিগের নিকট প্রত্যবভাসমান হন, অর্থাৎ একমাত্র বৈখরীই বর্ণাকারে অভিব্যক্ত হইয়া লোকব্যবহারের উপযোগী হইয়া থাকে ("সৈষা ত্রয়ী বাক্ চৈতন্যগ্রন্থি-বিবর্ত্তবদনাখ্যেয়পরিমাণা তুরীয়েণ ভাগেন মনুষ্যেষু প্রত্যবভাসতে")। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ পাণিনীয় শিক্ষাগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ আত্মা কোনও একটি বিষয় বুদ্ধিস্থ করিয়া তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে মনকে নিযুক্ত করে, অনন্তর মন কায়স্থিত অগ্নিকে আঘাত করে, আহত অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করে, অগ্নিপরিচালিত বায়ু বক্ষঃস্থলে বিচরণসময়ে মন্দ্রধ্বনি উৎপাদন করে। অতএব প্রাণপ্রভৃতি

* চন্দ্রের ষোড়শ কলা; তন্মধ্যে পঞ্চদশ কলা ক্রিয়াশীল, ইহাদের হ্রাস বৃদ্ধি আছে; এবং ইহাদের ক্রিয়া হইতেই প্রতিপদাদি তিথির উৎপত্তি হইয়া থাকে। অমানাম্নী ষোড়শকলা নিত্যা, ইহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। উহাই জগতের আধার শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

† "স্থানেষু বিবৃতে বায়ৌ কৃতবর্ণপরিগ্রহা।
বৈখরী বাক্ প্রয়োক্তৃণাং প্রাণবৃত্তি-নিবন্ধিনী॥
কেবলবুদ্ধ্যুপাদানক্রমরূপানুপাতিনী।
প্রাণবৃত্তিমতিক্রম্য মধ্যমা বাক্ প্রবর্ত্ততে॥
অবিভাগাত্তু পশ্যন্তী সর্ব্বতঃ সংহৃতক্রমা
স্বরূপজ্যোতিরেবান্তঃ সৈষা বাগনপায়িনী॥
সৈষা সঙ্কীর্যমানাপি নিত্যমাগন্তুকৈর্ম্মলৈঃ
অন্ত্যা কলেব সোমস্য নাত্যন্তমভিভূয়তে
তস্যাং দৃষ্টস্বরূপায়ামধিকারো নিবর্ত্ততে
পুরুষে ষোড়শকলে তামাহুরমৃতাং কলাং।
অশ্বমেধপর্ব্ব।

* ষোড়শকল পুরুষের বিবরণ ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ কথিত হইয়াছে। শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা বলিয়াছেন, হে সৌম্য! পুরুষ ষোড়শকল (অর্থাৎ ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্মতম অংশ মনে শক্তিসঞ্চার করে, অন্নসারোপচিতা মনের সেই শক্তি ষোড়শভাগে বিভক্ত, তাহাই পুরুষের কলা অর্থাৎ অংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মনেতে অবস্থিত ষোড়শভাগে বিভক্ত অন্নোপচিত শক্তিযুক্ত জীববিশিষ্ট পুরুষও ষোড়শকল বলিয়া কথিত হইয়াছে।) তুমি পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত আহার করিওনা, কেবল জল পান কর, জল পান করিলে অনাহার নিবন্ধন প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা নাই। অনন্তর শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন এবং পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি কি বলিব, তাহা আদেশ করুন। পিতা বলিলেন—তুমি ঋক্ যজু ও সাম বল। তখন শ্বেতকেতু বলিলেন পিতঃ! আমার কিছুই মনে পড়ে না। পিতা বলিলেন বাছা! যেমন প্রজ্বলিত বৃহদগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া খদ্যোতপরিমাণমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং অধিক দহন করিতে পারে না, এইরূপ তোমার ষোড়শ কলার মধ্যে পঞ্চদশ কলা অনাহারে বিনষ্ট হইয়া একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট আছে; সুতরাং তদ্দ্বারা তুমি বেদ স্মরণ করিতে পারিতেছ না; অতএব আহার কর। অনন্তর তিনি আহারান্তে পিতার সমীপে উপস্থিত হইলে পিতা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাই বলিতে সমর্থ হইলেন। তখন পিতা পুত্রকে বুঝাইয়া দিলেন যে বিপুল অগ্নির খদ্যোতপরিমাণমাত্র অবশিষ্ট একটি অঙ্গার তৃণের দ্বারা বর্দ্ধিত হইলে যেমন অনেক বস্তু দগ্ধ করিতে পারে, তেমনই তোমার একটিমাত্র অবশিষ্টকলা অন্নের দ্বারা উপচিত হওয়ায় এখন তদ্দ্বারা বেদ অনুভব করিতে পারিতেছ। হে সৌম্য! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়।

বায়ুই শব্দের উৎপাদন করিয়া থাকে। যেহেতু পরিশ্রান্ত ব্যক্তি কোনও বিষয়ে বলিতে ইচ্ছা করিলে সে বাহ্য বায়ু উদরস্থ করে, সেই বায়ু নাভি দেশে যাইয়া প্রাণাপানের গ্রন্থিস্থানে অপান বায়ুর সহিত মিলিত হয়। অনন্তর মনের সহিত মিলিত হয়, তৎপর মনোভিহত দেহস্থ অগ্নির দ্বারা আহত হইয়া প্লুতগতিতে উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বেগের তারতম্যানুসারে মন্দ-মধ্যম-তীব্রভেদে ভিন্নধ্বনি উৎপাদন করিয়া মুখচ্ছিদ্রে উপস্থিত হইয়া নানা-জাতীয় শব্দ অভিব্যক্ত করে।

(অশ্বমেধপর্ব্ব ২য় অধ্যায় টীকা)

প্রপঞ্চসারেও মূলাধারসমুৎপন্ন পরা বাক্ হইতেই ক্রমে বর্ণাভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে, এবং প্রাণীদিগের মুখমধ্যে বৈখরীর অবস্থান কথিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাও কথিত হইয়াছে যে, বর্ণগুলি বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সুষুম্না নাড়ীর রন্ধ্রের দ্বারা নির্গত হইয়া কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে ঘট্টিত (আঘাত প্রাপ্ত) হইয়া মুখগহ্বরে অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়। * এই সম্বন্ধে প্রপঞ্চসারের টীকাকার সুগৃহীতনামা পদ্মপাদাচার্য্য আরও কিছু নিগূঢ় তত্ত্বের খবর দিয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে—জগতের মূলভূতা পরিণামিনী মায়াশক্তির আধারস্বরূপ চিদাত্মাই মূলাধার পদবাচ্য। সেই চিদাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও মলদ্বার ও লিঙ্গ এত-দুভয়ের মধ্যস্থলে তাঁহার অভিব্যক্তি হয় বলিয়া সেই স্থানও মূলাধার নামে কথিত হইয়াছে। তথা হইতে প্রথম আবির্ভূত হয় যে চিদাভাস মায়া-শক্তি, তাহা জগতের উদ্ভাবন করে; অতএব ভাবনামে অভিহিত হইয়াছে। তাহাই পরাখ্য অর্থাৎ পরানামক বাক্, উহা চৈতন্যাবভাসবিশিষ্টতা-নিবন্ধন প্রকাশিকা মায়াশক্তির নিষ্পন্দাবস্থা। পশ্যন্তী প্রভৃতি সম্পন্দাবস্থা। তাহাদের মধ্যে সামান্য স্পন্দস্বভাব শব্দের প্রকাশরূপিণী অর্থাৎ প্রকাশকারিণী বিন্দুতত্ত্বাত্মিকা অর্থাৎ ওঁকার ঘটক বিন্দুর পরিণাম বৈখরী অবস্থা। উহা দেহাভ্যন্তরে মূলাধার চক্র হইতে ক্রমে কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে অভি-ব্যক্ত হইয়া থাকে, ইহা বাকের সামান্যাবস্থা। এই সামান্য শব্দ হইতেই বিশেষ শব্দের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। পবন কর্ত্তৃক শব্দের প্রেরণা কথিত হইয়াছে; পবনশব্দে সমস্ত প্রেরকবর্গ অর্থাৎ পূর্ব্ব-বর্ণিত মন অগ্নি প্রভৃতি সমস্তই অভিপ্রেত হইয়াছে। অথবা সূক্ষ্মা পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী, এই পঞ্চপদী অর্থাৎ পঞ্চাবস্থাপন্ন বাকের অভিপ্রায়ে মূলাধার হইতে উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই মতে সূক্ষ্মা এবং পরা দুইটি অবস্থা। ইহা দ্বারা সপ্তপদী বাক্ অর্থাৎ বাক্‌নিষ্পত্তির সাতটি অবস্থাও সূচিত হইয়াছে। এই সপ্তাবস্থা গণনায় প্রথমাবস্থা শূন্যা, দ্বিতীয় সংবিৎ, তৃতীয় সূক্ষ্মা, চতুর্থ পরা, পঞ্চম পশ্যন্তী, ষষ্ঠ মধ্যমা, সপ্তম বৈখরী। তন্মধ্যে অনুৎপন্ন নিষ্পন্দাবস্থা শূন্যা, উৎপত্তির ইচ্ছাযুক্তাবস্থা সংবিৎ, উৎপত্ত্যবস্থা সূক্ষ্মা। অন্যান্য অবস্থা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। *

ব্যাকরণশাস্ত্রে বর্ণের যে উদাত্তাদি স্বরবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ণাভিব্যঞ্জক বায়ুর গতি-বিশেষই তাহার কারণরূপে বিবেচিত হইয়াছে। যথা—বায়ু উর্দ্ধগতির তালু প্রভৃতি স্থানের উর্দ্ধভাগে গত হইয়া "উদাত্ত" স্বর উৎপাদন করে। নীচভাগে গত হইয়া "অনুদাত্ত" স্বর এবং বক্রগতির দ্বারা "স্বরিত" স্বর অর্থাৎ উদাত্তানুদাত্ত মিশ্রস্বর উৎপাদন করে। † সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণসম্বন্ধ যাবতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্বেরই আলোচনা হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

---

* মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু ভাবঃ পরাখ্যঃ
পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্‌মধ্যমাখ্যঃ
বক্ত্রে বৈখর্য্যাথ রুরুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্না-
বদ্ধ স্তস্মাদ্ ভবতি পবন-প্রেরিতো বর্ণসঙ্ঘঃ ॥ ২।৪৩
সমীরিতাঃ সমীরেণ সুষুম্নারন্ধ্র নির্গতাঃ
ব্যক্তিং প্রয়ান্তি বদনে কণ্ঠাদিস্থানঘট্টিতাঃ ॥ ৩।৫৯।

* মূলং জগন্মূলভূতা পরিণামিনী মায়াশক্তিঃ; তস্যা আধার-ভূত শ্চিদাত্মা মূলাধারঃ সর্ব্বগতস্যাপি তস্যাভি-ব্যক্তিস্থানত্বাৎ গুদমেঢ্র মধ্যোঽপি মূলাধারঃ, তস্মাৎ প্রথমমুদিতশ্চৈতন্যাভাসঃ ভাবশ্চ যঃ জগদ্ ভাবয়তীতি মায়াশক্তিভাবঃ। স পরাখ্যশ্চৈব তদবভাসবিশিষ্টতয়া প্রকাশিকা মায়া নিষ্পন্দঃ পরা বাগিত্যর্থঃ। সম্পন্দাবস্থাঃ পশ্যন্ত্যাদ্যাঃ তত্র সামান্যস্পন্দপ্রকাশরূপিণীং বিন্দু-তত্ত্বাত্মিকামধ্যাত্মমূলাধারাদিকণ্ঠান্তসভিব্যজ্যমানাং শব্দ-সামান্যাত্মিকাং বৈখরীমাহ বক্ত্রইতি .... সামান্যশব্দাদ্ বিশেষশব্দনিষ্পত্তিমাহ তস্মাদিতি। তস্মাদ্ বৈখর্য্যাত্মকভাবাদিত্যর্থঃ। পবনশব্দেন প্রেরক-বর্গঃ সর্ব্বোঽপ্যুক্তঃ। অথবা সূক্ষ্মা পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীতি পঞ্চপদীং বাচমাশ্রিত্যাহ মূলাধারাদিতি। সপ্ত-পদ্যপি বাগনেনৈব সূচিতা। শূন্য-সংবিৎ সূক্ষ্মাদীনি সপ্তপদানি। তত্রানুৎপন্না নিষ্পন্দা শূন্যা বাক্। উৎপিৎ-সুঃ সংবিৎ। উৎপত্ত্যবস্থা সূক্ষ্মা। মূলাধারাৎ প্রথম মুদিতেতি বিভাগঃ॥

† উচ্চৈরুন্মার্গগো বায়ু রুদাত্তং কুরুতে স্বরং
নীচৈর্গতোঽনুদাত্তঞ্চ স্বরিতং তির্য্যগাগতঃ॥
(প্রপঞ্চসার। ৩।৬।)

আদর্শ
বা
দাদা ঠাকুর

তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। কাল—প্রভাত।

সেবা। ভাই, এবার আমাদের কঠোর পরীক্ষা সম্মুখে। আজ দীনের সহায় ধর্ম্মের প্রতিনিধি, বিপন্নের রক্ষাকর্ত্তা আমাদের গুরুদেব, ধনদাস রায়ের ষড়যন্ত্রে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

১ম। আমরা এর প্রতিশোধ নেব। ধনদাস রায়কে উচিত শিক্ষা দিব।

সেবা। আমাদের কাজ সেরূপ নয়। আমরা ক্রোধ করব না। প্রতিহিংসাবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে স্থান পাবে না। মনে কর দাদাঠাকুরের আদেশ। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু জগতের কল্যাণ। আমরা হাইকোর্টে আপীল করব। তোমরা নিশ্চিন্ত হও। ন্যায়ধর্ম্মের প্রতিনিধি বৃটিশ রাজ্যে কখনো নির্দ্দোষ ব্যক্তির সাজা হয় না।

২য়। আমরা অর্থ কোথায় পাব?

সেবা। সে জন্য চিন্তা নাই। এ গ্রামের অনেকেই দাদাঠাকুরের জন্য সর্ব্বস্ব দিতে আজ আর কুণ্ঠিত নয়। যে দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন মাত্র ভিক্ষা করে' আনে, সেও তার আধমুষ্টি দিয়ে দাদাঠাকুরের সাহায্য করবে। কোনো চিন্তা নাই, শীঘ্র তাঁকে মুক্ত করে আনতে পারব। তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য কর। দাদাঠাকুর উপস্থিত না থাকায় যেন তাঁর কার্য্যের কোনো ব্যাঘাত না হয়। কেবল মুখে দাদাঠাকুরের উপর ভক্তি করলে হবে না। তাঁর উপদিষ্ট কার্য্য কর, তবেই প্রকৃত ভক্তি দেখানো হবে।

সকলে। আমরা অবশ্য তাঁর কাজ করব।

সেবা। বল সকলে জয় সচ্চিদানন্দ।

সকলে। জয় সচ্চিদানন্দ।

সেবা। তবে যাও ভাই, মনে রেখো আমাদের প্রচারের বিষয়, সার্ব্বভৌমিক প্রেম করুণা মৈত্রী। উদ্দেশ্য বিশ্বের কল্যাণ। যাও, তোমাদের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ধর্ম্মের তেজ, মাথার উপরে ভগবান। যাও সেবকগণ, অদম্য উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। বল আবার জয় সচ্চিদানন্দ।

সকলে। জয় সচ্চিদানন্দ। (সকলের প্রস্থান)

সেবা। কি মহাব্রত, তুমি যে গেলে না?

মহা। আমি আর এখানে থাকব না।

সেবা। কেন?

মহা। থেকে কি হবে?

সেবা। চাও কি?

মহা। চাই ধর্ম্মার্জ্জন।

সেবা। তার পক্ষে এ উত্তম স্থান।

মহা। আমার বিশ্বাস—না।

সেবা। কেন?

মহা। এও কি একটা আশ্রম? আর এ রকম কখনো গুরু হয়!

সেবা। কেন হবে না?

মহা। প্রথমতঃ দ্যাখো, এখানে একখানি ঠাকুরঘর পর্য্যন্ত নেই।

সেবা। গুরুদেব বলেন, ঠাকুর সব জায়গায় আছেন, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, একখানি ঠাকুরঘর করে নিতে পারো। তাতে তো তাঁর কোনো নিষেধ নেই। গুরুদেব বলেন সকলের জন্যে সমান ব্যবস্থা নয়। তিনি সব ধর্ম্মেরই সার সত্য মানেন।

মহা। আরো দ্যাখো, উনি ব্রাহ্মণ নন—কায়স্থ। আমরা বামুনের ছেলে, কায়স্থ কি কখন গুরু হোতে পারে?

সেবা। কেবল কি যজ্ঞোপবীত না থাকলেই ব্রাহ্মণ হয় না? যিনি ধার্ম্মিক তিনিই ব্রাহ্মণ।

মহা। ওঁর স্ত্রী আছে। উনি সংসারী মানুষ।

সেবা। গৃহত্যাগী হয়ে ভস্ম মাখলেই বুঝি খুব ধার্ম্মিক হয় তোমার বিশ্বাস? দ্যাখো উনি গৃহে থেকেও সন্ন্যাসী। গুরুদেব আদর্শ-গৃহস্থ।

মহা। কখনো দেখলাম না মালা জপ করতে, একটা আসন করতে, সন্ধ্যাপূজাও তো করে না। এ আবার কেমন ধর্ম্ম?

সেবা। ওঁর ভিতরে সাধনভজন যে সব সহজ হয়ে গেছে। বাইরে তাঁকে নানা কাজ করতে দেখছো, কিন্তু জেনো ভিতরে তাঁর সাধন চলছে।

মহা। উনি অনেক সময়ে ক্রোধ করেন।

সেবা। সেটা ক্রোধ নয়, তেজ। ক্রোধও যা তেজও তা। একটার গতি উর্দ্ধদিকে, আর একটার গতি নিম্নদিকে। গুরুদেব যে ভীম-কান্ত-গুণশালী।

মহা। আচ্ছা লোকটা যে একটু পাগলাটে ধরণের ভাই, সেটা অস্বীকার করবার যো নেই। আমার যেন ওটা একটু কেমন কেমন লাগে।

সেবা। তা বুঝেছি; প্রদীপের তলেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আঁধার। আমরা বড়ই হতভাগ্য, কাছে থেকে লোকটাকে চিনতে পারলুম না। মহাব্রত, এই আকাশের দিকে চাও দেখি, কি দেখছ?

মহা। দেখছি, বেশ উজ্জ্বল, সূর্য্যালোকিত আকাশ।

সেবা। আর কি দেখছো?

মহা। বিরাট মহিমাময়, প্রশান্ত।

সেবা। আচ্ছা, এই আকাশে যখন ঝড় উঠে তখন দেখেছো? যখন এর মাঝে কৃষ্ণমেঘমালা দৈত্যসৈন্যের মত গর্জ্জন করে, বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে তখন দেখেছো?

মহা। দেখেছি।

সেবা। তবে জেনে রাখো, গুরুদেবের চরিত্রও এই আকাশেরি মত। এতে গর্জ্জন আছে, বর্ষণ আছে, আবার প্রশান্ত ভাব আছে।

মহা। এ এক রহস্য!

সেবা। হাঁ রহস্যই বটে। এ বোঝা বড়ই কঠিন। লোকশ্রেষ্ঠগণের চরিত্র বোঝা সহজ নয়। এ চিনির পাহাড়ের মত; পিপ্ড়ে একটু খুঁটে নিয়ে মনে করে খুব নিয়েছি। দাদাঠাকুরকে অত অল্পে বোঝা যায় না। আমি দেখেছি যখন তিনি কোনো অনুতাপী ব্যথিতকে সান্ত্বনা দান করেন, তখন তাঁর আকৃতি সরল শান্ত। যখন ভগবৎকথা বলেন তখন দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। যখন কারেও শাসন করেন তখন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত তেজোময় খরতর মূর্ত্তি। আর যখন ছেলেদের সঙ্গে মেশেন, তখন তাঁকে যেমন দেখি, অমন আর কোনো সময়ে দেখি না। সে ভাব কি যে মধুর, তা বল্‌তে পারি না; কেবল অনুভব করুতে পারি। তখন তিনি আধা পাগল, আধা বালক। আহা কি সুন্দর! কি সুন্দর!

মহা। আচ্ছা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য কি?

সেবা। সর্ব্বজীবের কল্যাণ, অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌম ধর্ম্মপ্রচার, আদর্শ-গৃহস্থ-চরিত্র প্রদর্শন।

মহা। এখন বুঝলাম। একখানি মেঘ কেটে গেল।

সেবা। চল এখন, অনেক কাজ আছে।

মহা। চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—ধনদাস রায়ের বাটী।—কাল অপরাহ্ন।

(ধনদাস রুগ্নশয্যায় শায়িত)

ধন। উঃ জ্বলে’ গেল! জ্বলে গেল! পুড়ে গেল! ছাই হয়ে গেল! আমায় কে আগুনের ভিতরে ফেলে দিয়েছে! উঃ জ্বলে’ গেল!

তর্ক। কবিরাজ মশাই, এ কি ব্যাধি?

কবি। বুঝ্‌তে পারছিনে।

ধন। কুলভূষণ কোথায়? এখনো একবার আমার কাছে এলনা। আমার যে শেষ হযে’ আস্‌চে!

কবি। তাকে ডাক্‌তে পাঠানো হয়েছে।

ধন। বড় ভয় করে; তোমরা আমার কাছে এস। আরো কাছে এস। আমার বড় ভয়,—বড় ভয়! আমি কি মরব? না না আমার মরুতে ভয় করে। উঃ ঐ যেন কারা আস্‌চে। উঃ কি ভীষণ চেহারা! আমায় তারা ডাক্‌চে। ঐ অন্ধকারের ভিতরে যেতে বল্‌ছে। আমি যাবোনা, যাবোনা। ধর, ধর, আমায় ধর!

কবি। এ কি ব্যাধি কিছুই যে বুঝ্‌তে পারিনে!

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। হাঃ হাঃ হাঃ আমি জানি।

কবি। কে তুমি?

পাগ। আমি পাগ্‌লী—

কবি। এখানে কেন এসেছ?

পাগ। বল্‌তে।

কবি। কি বল্‌তে?

পাগ। রোগের কথা।

তর্ক। আঃ যা বেটী, এখানে গোল করিস্‌নে। একে আস্‌তে দিলে কে?

কবি। তাড়াবেন না। দেখি ব্যাপারটা কি?

পাগ। তাড়িয়ে দেবে? তা দিও; আমি তো তাড়া খেয়েই ফিরি। ওতে আর আমার কি হবে? তবে বল্‌ব, তবে বল্‌ব? কি হয়েছে বল্‌ব?

কবি। বল।

পাগ। বিষ, বিষ, এ বিষের জ্বালা।

কবি। সে কি, বিষ কি?

(কবিরাজের কাণে কাণে পাগলিনী কহিল)

কবি। এ বলে কি!

পাগ। হাঁ সত্যকথা (সাশ্চর্য্যে) মিছে বলিনি। কি কল্লুম? বলে’ ফেল্লুম? কাঁদ্‌তে হবে। এর জন্যে আমায় কাঁদ্‌তে হবে। কি করলুম! কি করলুম!

কবি। এই—দরোজা বন্ধ কর। পাগলীকে ছেড়ে দিওনা। তুমি এ সব কথা কি করে’ জান্‌লে?

পাগ। কি করে’ জান্‌লুম? তবে শোনো। তবে বলেই ফেলি। যখন একটা বলেছি—সব বল্‌ব। সব বল্‌ব। বলে’ শেষে খুব কাঁদ্‌ব। তবে শোনো। ওরা যেদিন রেতের বেলায় জঙ্গলে বসে’ পরামর্শ করছিল, তখন আমি সব শুনেছি।

(কবিরাজের কাণে কাণে আবার কহিল)

কবি। (চমকিত হইয়া) উঃ! কি ভয়ানক! হ’তেও পারে। আমি অবিশ্বাস করিনে। তুমি কে?

পাগ। আমি কে? আমি কে? আমায় তোমরা

চিনবে না। (ধনদাসকে দেখাইয়া) ঐ বুড়োর কাছে জিজ্ঞেস কর।

কবি। তুমিই বল।

পাগ। আমি পাগ্‌লী পোড়াকপালী। কুলভূষণের মা! ওঃ——!

কবি। কি আশ্চর্য্য!

(ধর্ম্মধ্বজ চূড়ামণির প্রবেশ)

ধর্ম্ম। (পাগলিনীকে দেখিয়া) এ কে! (গমনোদ্যত)

পাগ। ওকি যাচ্ছ কেন? যেওনা দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওঃ চিনতে পেরেছ তুমি? যেওনা দাঁড়াও। ওরা তোমায় চেনেনা, কিন্তু আমি তোমায় চিনি। তবে বল্‌ব নাকি?

ধর্ম্ম। মশাই, আপনারা শীঘ্র এটাকে তাড়িয়ে দিন।

পাগ। তাড়াবে? তাড়াবে? তাড়াতে হবে না। নিজেই যাবো, তবে যাবার আগে সব বলে' যাবো। তবে তোমরা শোনো—

ধর্ম্ম। আঃ! মশাই, আপনারা দাঁড়িয়ে দেখ্‌চেন কি? এটাকে তাড়িয়ে দিন; রোগীর ঘরে এ রকম গণ্ডগোল হওয়া তো ঠিক নয়। (ভয়ে কম্পন)

পাগ। কাঁপ্‌ছ? ভয়ে কাঁপ্‌ছ? মুখ শুকিয়ে গেছে! তা কাঁপো। তবে বল্‌ব? তবে বলি। তোমরা শোনো, আমি এই—

ধর্ম্ম। এই পাগ্‌লী (গলাটিপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল; পাগ্‌লী ছুরিকা বাহির করিল। ধর্ম্মধ্বজ সভয়ে পিছাইয়া গেল।)

পাগ। আমায় মারবে? তবে এই দেখেছ? মারো—মারো এখন। ওকি পেছনে হটে যাচ্ছ যে? দাঁড়াও ওখানে—পালাতে চাইবে তো এই ছুরি বসিয়ে দেব। তোমরা শোনো, এই ধর্ম্মধ্বজ এখানে এসে আবার ব্রাহ্মণ সেজেছে! ও নমঃশূদ্র। ও বাজার দলে থাক্‌ত। ও-ই তো আমার—

(ধর্ম্মধ্বজ পলায়নোদ্যত)

সকলে। এই ধর্ ধর্।

(দারোগা ও কয়েক জন কনেষ্টবলের প্রবেশ)

দারোগা। আর যেতে হবে না বাপু। ধর এই অলঙ্কার পর। (কনষ্টেবলের প্রতি) এই হাতকড়ি পরাও। কিহে বাপু ধর্ম্মধ্বজ, অনেক রকম ভেল্কীবাজী করে' এত দিন ঠকিয়ে এসেছ। তোমার পেছনে পেছনে ঘুরতে ঘুরতে হয়রাণ হয়েছি। এইবার জালে পড়েছো। মশাইরা একে চেনেন না? ইনি জাতে নমঃশূদ্র, পাকা বদমায়েস্, কাশী থেকে এসে এখানে ধর্ম্মধ্বজ সেজে বেড়াচ্ছেন।

তর্ক। আশ্চর্য্য!

দারোগা। আশ্চর্য্য অনেক আছে। আপনারা এই পাগ্‌লীর কাছে সব শুনুন। আমরা এর জন্যেই সব জান্‌তে পেরেছি। রাসবিহারী আর কুলভূষণ কোথায়?

তর্ক। তাদের পাওয়া যাচ্ছেনা।

দারোগা। হাঁ, তা এখন পাওয়া যাবে কেন? এক দিন এই ব্যাটার মত জালে পড়বেই।

তর্ক। তাদের কি অপরাধ?

দারোগা। বেশি কিছু নয়। পরে শুন্‌বেন।

তর্ক। সর্ব্বনাশ! সব জেনেছেন দেখ্‌তে পাচ্ছি।

দারোগা। আমরা এই রকমেই সব জানি মশাই। এটাকে নিয়ে চল। (পাগলিনীর প্রতি) পাগ্‌লী তুইও আয়।

(দারোগা প্রভৃতির প্রস্থান)

কবি। কি আশ্চর্য্য! কি ভয়ানক ব্যাপার! যাক্ এখন রোগীকে একটু ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। ঝিয়ের চিকিৎসা কর্‌তে হবে।

(রোগীকে লইয়া অপর সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল—মধ্যাহ্ন। স্থান—রাস্তা।

(চেলীর কাপড় পরিহিত, কৃত্রিম টোপর মাথায় দিয়া বরবেশী অর্দ্ধোন্মত্ত ধনদাস রায়ের প্রবেশ, পশ্চাৎ ছেলের দলের প্রবেশ)।

ধন। দ্যাখ্‌তো, দ্যাখ্‌তো, আমায় কেমন মানিয়েছে! দ্যাখ্‌তো।

১ম। বেশ মানিয়েছে। খুব মানিয়েছে।

ধন। আমায় মেয়ে কেল্‌বে না তো?

২য়। পাগ্‌লা তোর ঝুলিতে কিরে?

ধন। টাকা—টাকা; টাকার থলে। সঙ্গে রাখি। না হলে' নিয়ে যাবে। সব পুষ্যিপুত্তুরে নিয়ে যাবে।

৩য়। যমের বাড়ী যাবি?

ধন। কোথায়? তা যাবো, তা যাবো। আমি যে ছেলেমানুষ, একলা কি করে' যাবো?

৩য়। তোর থলেটা দে।

ধন। উঁহুঁ তা দেব না।

৩য়। কেড়ে নেব। আয়তো দেখি সবাই, ওর থলে' কেড়ে নেব।

ধন। ও বাবারে, আমার টাকার থলে নিলেরে। ও বাবারে। (পলায়ন, সকলের পশ্চাদ্ধাবন)

(দুইজন গ্রামবাসীর প্রবেশ)

১ম। বল কি?

২য়। হাঁ।

১ম। তুমি শুন্‌লে কি করে?

২য়। আমি লোকের কাছে শুনেছি। আর ওকে আমি আগেও দেখেছি।

১ম। এ গ্রামে এল কি করে?

২য়। এখন তো পাগল হয়েছে।

১ম। যাই হোক লোকটাকে দেখলে দুঃখ হয়; একদিন তো বড়লোক ছিল।

২য়। দুঃখ! অমন পাষণ্ডকে দেখে আবার দুঃখ! ওর এ অবস্থা হয়েছে, বেশ হয়েছে। ওর এমন সাজা হবে না তো আর কার হবে? লোকটা যেমন কৃপণ তেমনি অত্যাচারী। এমন মানুষ দাদাঠাকুর, তাঁকে চক্রান্ত করে' সর্ব্বস্বান্ত করেছে। একটা পুষ্যিপুত্তুর রেখেছে—সেটা নাকি নমঃশূদ্রের ছেলে। সর্ব্বনাশ! ঐ ব্যাটার বাড়ীতে কত কায়েত বামুন খেয়েছে। সকলের জাত গ্যাছে। ওকে সবাই এখন একঘরে করে' রেখেছে। ওর শালা আর ওদের পুষ্যিপুত্তুর মিলে ওকে মারবার চেষ্টা করেছে—বহুকষ্টে এ যাত্রা বেঁচে গ্যাছে।

১ম। কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

২য়। হাঁ, আর দুশ্চিন্তায় এখন পাগল হয়েছে। বেশ হয়েছে। ঐ দ্যাখো ও এদিকে আসছে।

(ধনদাস রায়ের প্রবেশ)

ধন। হায়, হায়! আমার টাকার থলে। ওগো আমার সর্ব্বনাশ করেছে! আমার থলে নিয়ে গেছে। আমার সব গেছে। (ভদ্রলোক দুইজনের নিকটে গিয়া) মশাই একটা পয়সা দিন্‌না মশাই।

১ম। এই—এই—যা, যা ব্যাটা। পাগ্‌লামী করতে আর যায়গা পাস্‌নি।

ধন। দাওনা একটা পয়সা। (হাত ধারণ)

২য়। তবু আবার। যা ব্যাটা (ধাক্কা দিয়া)

ধন। ও বাবারে গেছি। (পলায়ন)

১ম। চল এটাকে দেখলেও পাপ আছে।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—গ্রামপথ। কাল—অপরাহ্ণ।

ন্যায়রত্ন। বল কি? তুমি তো আমায় একেবারে অবাক্ করে দিলে। এতো ভারী আশ্চর্য্য!

তর্করত্ন। তুমি কেবল একা "আশ্চর্য্য" হওনি' দেশশুদ্ধ "আশ্চর্য্য" হয়েছে। প্রথম আশ্চর্য্য এই যে কুল-ভূষণ আর রাসবিহারী এমন ভয়ানক মানুষ! দ্বিতীয় আশ্চর্য্য এই যে এই ধর্ম্মধ্বজ চূড়ামণি একটা আশ্চর্য্য রকমের জোচ্চোর।

ন্যায়। আশ্চর্য্য!

তর্ক। রোসো, "আশ্চর্য্য"গুলি এখনো শেষ হয়নি। সব চেয়ে আশ্চর্য্যগুলি এখনো বাকী আছে।

ন্যায়। কি আশ্চর্য্য! আরো কিছু বাকী আছে নাকি?

তর্ক। হাঁ আরো কিছু। আরো আশ্চর্য্য এই যে তোমরা এই লোকগুলিকে এতদিনে চিন্‌লে না। আমরা সবাই আশ্চর্য্য-রকম গাধা বনে' গেছি।

ন্যায়। দ্যাখো ওটা আমি বরাবরই জানুতাম।

তর্ক। এ আরো আশ্চর্য্য! জেনে শুনেও এই ধন-দাস রায় আর ধর্ম্মধ্বজের তোষামোদ করেছ! এঃ, দেখছি সেই "আশ্চর্য্য" গুলি আশ্চর্য্য রকম আবিষ্কৃত হচ্চে।

ন্যায়। মশাই সংসারে থাক্‌লে ও সব করতে হয়।

তর্ক। এ আরো আশ্চর্য্য! সংসারটাকে তুমি যত খারাপ বলে' ভাবছো ন্যায়রত্ন, সে তত খারাপ নাও হতে পারে।

(নিধিরামের প্রবেশ ও অন্যমনস্কভাবে প্রস্থানোদ্যোগ)

ন্যায়। ওহে নিধিরাম, নিধিরাম, বলি যাচ্ছ কোথায়? ইস্ কথাই কইছ না যে মোটে! কলিকাল! ঘোর কলিকাল! ব্রাহ্মণ দেখে একেবারে প্রণামটা না করেই চলে যাচ্ছ যে!

নিধি। কৈ, ব্রাহ্মণ কোথায়?

ন্যায়। এই যে আমরা কি তবে জড়পদার্থ নাকি? এ সব বুঝি দাদাঠাকুরের কাছে শিখেছ। এই যে পরিষ্কার যজ্ঞসূত্র গলায় দেখতে পাচ্ছ। স-শরীরে জল-জ্যান্ত দু' দুটো ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছি। দেখতে পাচ্ছ না? তুমি কি অন্ধ নাকি?

নিধি। এখনো তোমরা ব্রাহ্মণত্বের বড়াই কর? তোমরা জড়পদার্থের চেয়েও নিকৃষ্ট। জড়পদার্থ কি তোষামোদ করে? জড়পদার্থ কি ষাট বছরের বুড়োর বিয়ে দেবার উদ্যোগ করে? তোমার মত ব্রাহ্মণের চেয়ে জড়পদার্থ অনেক ভালো। যজ্ঞসূত্র তোমায় উপ-হাস করছে। তোমার গলায় ওটা শোভা পায় না। তোমাকে প্রণাম করব? তুমি চণ্ডালের অধম। আমি অন্ধ না তুমি অন্ধ?

ন্যায়। নিধিরাম, মুখ সামলে কথা কয়ো। যত সব ছোট লোকের আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে। ব্যাটা ছোট লোকের ছেলে, একটু ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছে, তাই আর অহঙ্কারে চোখে দেখেন না!

নিধি। ঠাকুর নিজেকে সামলাও। হাঁ আমরা ছোটলোকই সত্য। তাই বলি হুঁসিয়ার! ছোট-লোকের স্বভাব জানতো? নেমকহারাম, যে দাদাঠাকুর সকলের কত উপকার করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে

বড়যন্ত্র করে' তাঁকে জেলে পাঠিয়েছো, তাঁকে পথের ভিখারী করেছ। তোমরা আবার ব্রাহ্মণ? তোমাদের আবার প্রণাম করব! তোমরা তো ধনদাস রায়ের বাড়ী খেয়েছ, ধনদাস রায় তো নমঃশূদ্রের ছেলেকে পুষ্যিপুত্তুর রেখে জাতিভ্রষ্ট হয়েছে। তোমাদের প্রণাম করা তো দূরের কথা তোমাদের স্পর্শ করলে পাপ আছে। যত সব বদমায়েস—

ন্যায়। (আস্ফালন করিয়া) তবে রে ব্যাটা এত বড় কথা!

নিধি। (অগ্রসর হইয়া) কি রে ব্যাটা কি বল্লি? (লাঠি উঠাইল)।

ন্যায়। ওরে বাবারে গেছি, গেছি। কে আছো রক্ষা কর। ব্রহ্মহত্যা হোল, ব্রহ্মহত্যা হোল।

(সেবাব্রতের প্রবেশ)

সেবা। একি—কিসের গোলমাল হচ্ছে?

ন্যায়। এই-এই-এই-এই

তর্ক। বাঃ ন্যায়রত্ন তুমি যে কেবল টিকিই নাড়ছ। কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারলে না? ওহে বাপু শোনো (সেবাব্রতের প্রতি) এই ন্যায়রত্ন মশাই নিধিরামকে গালাগাল দিচ্ছিলেন।

ন্যায়। কি, কি কি কি! আমি গালাগাল দিচ্ছিলাম?

তর্ক। তা নৈকি?

সেবা। নিধিরাম, চ'টো না। স্থির হও। আজ সবাইকে এক শুভসংবাদ দিতে এসেছি।

নিধি। কি সম্বাদ?

সেবা। দাদাঠাকুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করে আস্‌ছেন।

তর্ক। তাই নাকি? তাই নাকি? ঈশ্বর তুমি আছো—ধন্য সুবিচার! কবে তিনি আসবেন?

সেবা। কাল।

তর্ক। সুসম্বাদ! সুসম্বাদ! যাও সেবাব্রত এ কথা রাষ্ট্র করে দাও। চল চল হে ন্যায়রত্ন চল এখন।

(সকলের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

সম্রাট্ অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা।

(শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী)

ভারতসম্রাট্ অশোক সাম্রাজ্যলাভের পূর্ব্বে পিতার আদেশে উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভালবাসিতেন না বলিয়া তদানীন্তন ভারতরাজধানী পাটনা মহানগরী হইতে বহুদূরে অবস্থিত উজ্জয়িনী নগরীর শাসনভার প্রদান করিয়া তাঁহাকে উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। অশোক উজ্জয়িনীসংক্রান্ত রাজকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি শ্রেষ্ঠী উপাধিধারী একজন গুজরাটী বণিকের দেবী-নাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবী পরমা সুন্দরী গুণবতী সুশীলা মহিলা ছিলেন। দেবী রাজবংশসম্ভূতা না হইলেও তাঁহার রূপে গুণে ও শীলতায় আকৃষ্ট হইয়া ভাবী সম্রাট অশোক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া পরম সুখে তথায় কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার এই বিবাহবার্ত্তা তিনি পাটলীপুত্রনগরে তাঁহার পিতাকে না জানাইয়া দেবীর সহিত মহাসুখে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার মহেন্দ্র নামক এক পুত্র ও সংঘমিত্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মিল। ইহার কিছুদিন পরে যখন তিনি ভারতের সম্রাট্ হইয়া পাটনায় আগমন করিলেন, সেই সময়ে প্রথমতঃ তিনি ঐ পুত্র ও কন্যাটিকে উজ্জয়িনীতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। পরে তাহাদিগকে পাটনায় আনাইয়াছিলেন। তাহাদিগকে রাজধানী পাটনায় আনাইয়া উত্তমরূপে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনীতি শিক্ষাদানপ্রভাবে তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক সুনীতিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন।

সম্রাট্ অশোক সংঘমিত্রাকে সমস্ত বৌদ্ধগাথা অভ্যাস করাইয়াছিলেন। সংঘমিত্রার স্বভাব এতই বিনয়নম্র ছিল ও তাঁহার ব্যবহার এতই সরল ছিল যে, তিনি সম্রাট্‌কন্যা হইলেও মঠের ভিক্ষুণী উপাধিধারিণী সামান্যবেশা সন্ন্যাসিনীর ন্যায় সর্ব্বসাধারণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন ও দীনদরিদ্র বলিয়া সকলের নিকটে প্রতীয়মান হইতেন। ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েই সমভাবাপন্ন ছিলেন। সকলেই তাঁহাদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। অহঙ্কার কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই লেখাপড়ায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়া কালযাপন করিতেন। সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ চুরাশী হাজার বিহার (অতি প্রশস্ত প্রাঙ্গনসমন্বিত উদ্যানমধ্যবর্ত্তী বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এক একটি বিহারে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিয়া ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মপ্রচার করিতেন।

বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীদিগের জন্যও এই প্রকার অনেক বিহার ছিল। তাঁহাদের অন্নবস্ত্র ব্যয়ভার সম্রাট নিজেই বহন করিতেন। রোমরাজ্যে যেমন ধর্ম্ম-গুরু পোপের প্রাধান্য শ্রুত হইয়া থাকে, সম্রাট অশোকের সময়ে সেই সকল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী-দের প্রাধান্য ছিল। সম্রাট স্বয়ং ইঁহাদের নেতার চরণে প্রণত হইতেন ও তাঁহার আদেশ বৌদ্ধগাথার ন্যায় শিরোধার্য্য করিতেন। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী-দিগকেও যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পুষ্টিসাধনার্থ দশ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া-ছিলেন। যেদিন তিনি শুনিলেন যে, চুরাশী হাজার বিহারের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, সেইদিন আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করিতে আদেশ দিলেন, যে, "অদ্য হইতে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্য মধ্যে প্রতিযোজন অন্তর স্থানে 'মহাদান মহোৎসব' হইবে। এই উৎ-সব উপলক্ষে তাঁহার প্রজাবর্গকে রাজ্যের সকল স্থান পুষ্পমাল্য ও পল্লবাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে হইবে। এবং যাহার যেমন সামর্থ্য, তাহাকে তদনুসারে এই চুরাশী হাজার বিহারের ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদিগকে ভিক্ষা দিতে হইবে। রজনীতে দীপাবলী দ্বারা রাজ্যের সমস্ত স্থান আলোকিত করিতে হইবে। সুমধুর গীতবাদ্য দ্বারা সকলের হৃদয়ে অসীম আনন্দ উৎ-পাদন করিতে হইবে। এই এক সপ্তাহ কাল সকলকেই সংযত ও অবহিতচিত্তে পবিত্রভাবে, পবিত্রবেশে ভগবান বুদ্ধদেবের অমৃতময় অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে হইবে। সপ্তম দিবসে সম্রাট স্বয়ং পাত্রমিত্র মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজরাজো-চিত শোভাযাত্রার সহিত রাজধানীর প্রধান রাজ-মার্গে বহির্গত হইবেন। ঐ দিবসের সমস্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদিগকে বিশেষরূপে ভিক্ষা দিতে হইবে। ভিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিতে হইবে। এইরূপে সপ্তম দিবসের কার্য্য শেষ হইলে 'মহাদান মহোৎসবের অনুষ্ঠান শেষ হইবে।" সম্রাটের এই আদেশ-বাণী শুনিয়া সকলেই আদেশোচিত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সম্রাট নিজে ভিক্ষু ভিক্ষুনীদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্য যেমন ব্যয় করিতেন, গৃহস্থ প্রজাবর্গকেও তদ্রূপ ব্যয় করাই-তেন। যথাসময়ে সম্রাটের প্রাসাদ, প্রজাবর্গের গৃহসমূহ, রাজপথে রাজকার্য্যালয়সমূহ সুসজ্জিত হইয়া ইন্দ্রের রাজধানী অমরাবতী পুরীকেও হীনপ্রভ করিয়া ফেলিল। প্রধান প্রধান বিহারের প্রধান প্রধান ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণ পাটনা রাজধানীতে মহা-সম্মানের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পদমর্য্যাদা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণ নিজ নিজ দলসহ ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থানে আসিয়া পৌছিলে রাজধানীর লোকসকল তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতে লাগিল এবং তাঁহা-দিগকে ভিক্ষাদানে সম্মানিত করিতে লাগিল। তাঁহা-দের উপদেশ বাণী শ্রবণে কৃতার্থ হইতে লাগিল।

এইরূপে ছয় দিন কাটিয়া গেল। সপ্তম দিবসে সম্রাট অনির্ব্বচনীয় মহাশোভা যাত্রাসহ রাজধানীর প্রধান রাজপথে বহির্গত হইলেন। প্রজাবর্গ মহাহর্ষের সহিত সম্রাটের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। সকলেই আনন্দে অতিশয় উৎফুল্ল হইল। যেখানে মহাদানমহোৎসব উপলক্ষে মহামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়া সুসজ্জিত হইয়াছিল, সম্রা-টের শোভাযাত্রা সেই দিকেই চলিল। তথায় উপস্থিত হইয়া মহামণ্ডপ মধ্যে স্বর্ণসিংহাসনে উপ-বিষ্ট হইলেন। সম্রাটের প্রধান প্রধান সামন্তরাজ মন্ত্রিবর্গ ও প্রজাগণ স্ব স্ব পদ-মর্য্যাদা অনুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সভা এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এমন সময়ে মহা-মনীষী মৌদ্গলীর পুত্র তিষ্য নামক প্রধানতম মহা-বিদ্বান্ "মহাস্থবির" ভিক্ষু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র সম্রাট স্বয়ং সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন। রাজসভাস্থ সকলেই উত্থিত হইল। সম্রাট তিষ্যের চরণ-কমলোপরি রাজমুকুট-সুশোভিত মস্তক অর্পণ করি-লেন। তিষ্যের পদধূলি লইয়া তিষ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে তিষ্যকে বসাইলেন। এবং সিংহাসনের নিম্নে অন্য একটি আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সেই দিন তথায় সহস্র সহস্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বিদ্যোপার্জ্জন অনু-সারে যাহার যেমন পদ তিনি তদনুসারে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সম্রাটের প্রতি মহাপ্রসন্ন হইয়া সম্রাটকে আশীর্ব্বাদ করিতে

লাগিলেন। তাঁহাদের সেই আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে সম্রাট সেই দিন অলৌকিক দিব্যশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই দিব্য শক্তির সাহায্যে তিনি বিভিন্নস্থানস্থিত চুরাশী হাজার ধর্ম্মভবন মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিতে পাইলেন।

তখন সম্রাট সঙ্ঘকে অর্থাৎ ভিক্ষু ভিক্ষুণী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মসেবকগণের মধ্যে কাহার দান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ"? সঙ্ঘ উত্তর করিল, "হে সম্রাট্, ভগবান বুদ্ধ-দেবের লীলাকালেও আপনার মত দানশীল কেহই ছিলেন না"। সম্রাট ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইপ্রকার দান করিয়া কোন ব্যক্তি কি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত সেবক হইতে পারে"? সংঘের প্রধান নেতা মহাস্থবির তিষ্য বলিলেন, "যিনি পুত্র বা কন্যাকে ধর্ম্মার্থে উৎসর্গ করিতে পারেন, তিনিই ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের প্রকৃত সেবক। হে সম্রাট্, আপনার মত পরম দাতা যে, এই ধর্ম্মের পরম হিতৈষী, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।" তৎকালে সেই মহামণ্ডপ মধ্যে সম্রাটের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা তথায় উপ-স্থিত ছিলেন। বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক মহেন্দ্রের উত্তম স্বভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ধর্ম্মে নিষ্ঠা এবং নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া সম্রাট তাঁহাকেই সাম্রা-জ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া সদা আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য মহাস্থবির তিষ্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি ভাবী সম্রাট্পুত্রের মায়া মমতা ত্যাগ করিলেন। অষ্টাদশ-বর্ষ-বয়স্কা যুবতী সংঘমিত্রাও সেখানে বসিয়াছিলেন। সম্রাট পুত্র ও কন্যার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা আছে কি? আদর্শ বৌদ্ধ মহাস্থবিরগণ ভিক্ষুধর্ম্মকে অতিশয় পবিত্র ব্রত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই মহাব্রত গ্রহণ করিতে তোমাদের কোন আপত্তি আছে কি? পিতার এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "পিতৃ-দেব, আপনার অনুমতি পাইলে আমরা দুইজন এই মুহূর্ত্তেই ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন সার্থক করিতে প্রস্তুত আছি।" সম্রাট এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অদ্য আমি ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্রতম ধর্ম্ম প্রচারার্থ আমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্র ও কন্যাকে উৎসর্গ করিলাম"। সভাস্থ সকল লোক সসাগরা পৃথিবীর সম্রাটের এইপ্রকার অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব মহা বিস্ময়জনক ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া "সম্রা-টের জয় হউক, সম্রাট চিরজীবী হউন," এই কথায় মহাহর্ষ কোলাহলে দিগন্ত পূরিত করিল। সম্রা-টের উপর সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সক-লেই সম্রাটকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল।

সম্রাট কৃতাঞ্জলিপুটে মহাস্থবির তিষ্যকে বলিলেন, "হে ভগবন, আপনি আমার পুত্র মহেন্দ্রের শিক্ষাদাতা গুরু হউন"। তিষ্য সম্মত হইলেন। তিনি মহেন্দ্রকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য মহাস্থবির মহাদেবকে আদেশ করিলেন। সম্রাট-কুমারী সংঘমিত্রাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মহাভিক্ষুনী ধর্ম্মপালী আদিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য মহাভিক্ষুণী আয়ুঃপালী আদিষ্ট হইলেন। ইহার পর ইতিহাস-বিখ্যাত "মহাদান" আরব্ধ হইল। সম্রাট্ সকলকে প্রভূত প্রণামী দিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহার যেমন পদ, তাঁহাকে তদনুসারে দক্ষিণা দিতে লাগিলেন। এইরূপে "মহাদান মহোৎসব" বিধি সম্পন্ন হইল। ইহার পর সভাভঙ্গ হইল। সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরদিন হইতে সংঘমিত্রা মহাভিক্ষুণী ধর্ম্মপালীর নিকটে উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে উক্ত ধর্ম্মের সাধারণ পাঠ্য অন্যান্য বহু গ্রন্থই শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাভিক্ষুণী আয়ুঃপালী তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এই ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সাধনাপদ্ধতিগুলি শিখাইতে লাগিলেন। ভিক্ষু-সংঘে প্রবেশের নাম "উপসম্পদা"। মহেন্দ্র পিতৃ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া "উপসম্পদা মন্দিরে" দীক্ষিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তথায় তিন বৎসর কাল তিষ্যের নিকটে অধ্যয়ন করিয়া "অর্হৎ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এত অল্প কালের মধ্যে এই উপাধি লাভ করা বড়ই প্রশংসার কথা। কিন্তু মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংঘমিত্রা ইহা অপেক্ষা অল্প কালের মধ্যে এই উপাধিটি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে স্ত্রীলোক ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্ম-

সাধনায় উত্তম রূপে শিক্ষা পাইলে পুরুষ অপেক্ষা অনেক উন্নত হইতে পারে। ধর্ম্মে স্ত্রীলোকের বিশ্বাস ও ভক্তি যত দৃঢ় হয়, পুরুষের তদ্রূপ হয় না। এই জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্ত্রীলোকের যত আগ্রহ দৃষ্ট হয়, পুরুষের তত আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোক ধার্ম্মিকের জাতি। এ হেন স্ত্রীজাতি যদি ধর্ম্মশিক্ষাবিহীন হয়, তাহা হইলে দেশের ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সংঘমিত্রা এই উপাধি লাভ করিয়া সকলের মহানন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

সাড়া।

(শ্রীমতী অনুরেণু দেবী)

এবার আমি খোঁজ পেয়েছি গো
তুমি আসবে ওগো আসবে
তোমার দেখা রোজ চেয়েছি গো
এবে সামনে আমার হাসবে;
ছুটে ছুটে তোমার তরে
আবেগ ভরে,
পাইনি দেখা এক নিমেষের
আঁখির জলে ভেসে—
এবার তুমি চিরজীবন থাকবে ওগো
আমার কাছে এসে;
আজ, হৃদয়পুরে সাড়া দেছে
আসবে তুমি আসবে
আমায় তুমি আপন করে
এবার ভালো বাসবে।
বাতাস যেন বিভোর হয়ে
আনচে বয়ে
তোমার দেশের সব ভুলানো
আবেশভরা মায়া,
মেঘের কোলে, পাতায় পাতায় দেখচি শুধু
তোমার যেন ছায়া;
আজ, হৃদয়বীণার কোন্ তারেতে গো
করলে তুমি স্পর্শ?
গাহিছে সে আজ তার তারেতে গো
ছড়িয়ে শুধু হর্ষ।

বিশ্ব-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

যিনি নিত্যবস্তুর অভাববোধের উদ্রেক করাইয়া দেন এবং যিনি তাহা পূরণ করেন, অবস্থা-বিশেষে এই দুই জনই মনুষ্যজাতির কল্যাণকারী। মানুষ অনেক দিনের মানুষ; এত বড় পুরাতন জগদ্ভাণ্ডারের বহুমূল্য রত্নগুলি বাহিরে পড়িয়া আছে, সে গুলি এখনো মাল-কোঠায় আনিয়া সঞ্চিত করিতে পারে নাই, এ একটা অকর্ম্মণ্যতারই লজ্জাজনক নিদর্শন। কতদূর পর্য্যন্ত এখানে তাহার দাবিদাওয়া, মানুষ এখনো তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তাই বাহিরে এত বড় বিপুল ভাণ্ডার থাকিতেও দৈন্যের কারাগারে ধূলি-শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। এমন একদিন ছিল যখন এই জগৎটা কেবল একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় বলিয়া বোধ হইত; ইহার মধ্যে যে ভাবের উচ্ছ্বাস আছে, মানবহৃদয়ে তাহার তরঙ্গ পঁহুছিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। তারপর বিস্ময়সঞ্জাত ভাবরাশি ক্রমে ক্রমে একটি অনির্ব্বচনীয় কমনীয় মাধুরীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মাঝখানে আকার ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল;—

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"

প্রথমতঃ মানুষ কেবল তাহার নিদ্রাপ্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সহজ ব্যাপারগুলিকেই কায়ক্লেশে সম্পন্ন করিয়া একটা মূঢ় আনন্দে পরিতৃপ্ত ছিল; ক্রমে নূতনতর অভাব বোধের সঙ্গে জীবনটাকে সুখ-দুঃখ-বেদনাময় করিবার বিচিত্র উপাদান সৃষ্টি হইল।

সেই আদিকালে সুখ দুঃখ উপভোগের মধ্যে কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি ছিল না। জীবনে কোনো প্রকার ব্যস্ততা অথবা মন্থরতা ছিল না। অতৃপ্তির মধ্যে যে তৃপ্তি অপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ রহিয়াছে, একথা তখনকার লোকের কাছে আদৌ ভাবিবার বিষয় হয় নাই। সেকালে এই সূর্য্যের দিকে চাহিয়া শিশু মানব নির্ব্বাক-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিত। তারপর একদিন কোনো এক লোহিত-রাগরঞ্জিত মহা প্রত্যূষে একজন বলিয়া উঠিলেন;—"সবিতুর্ব্বরেণ্যং" আর সকলে অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃতাঞ্জলি হইয়া মূক-হৃদয়ের সভক্তি প্রণতি জ্ঞাপন করিল।

এই নিত্যকার সুখ দুঃখ, আলো ছায়া, দিবা রাত্রিগুলি যে কেবল ভৃত্যের মত আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধি করিতেই এখানে আসে নাই, তাহা মানবহৃদয় ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছে। এ সকলের প্রয়োজনের ঘর ছাড়া অন্য এক জায়গায় দিব্য মহিমার আসন পাতা রহিয়াছে; যখন সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই ইহাদের বিচিত্রতা ও অভিনবত্ব বিকশিত হইয়া উঠে। এ সকল যতই কেন অনেক দিনের হোক না তবু পুরাতন অথবা একঘেয়ে বলিয়া বোধ হয় না। মানুষ ভিতর হইতে ইহার উপর নব নব বর্ণের মাধুরী ফলাইয়া চিরনূতন করিয়া রাখিয়াছে। এ শক্তিটা মানুষের নিজের অন্তরের ভিতরেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই সকল দিব্যানুভূতি যখন অসহ পরিপূর্ণতার ভারে বাহিরে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন অবধি আজ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ক্রমে খড়ি পাতিয়া দেখিলে ইহাকেই বলা যায় সাহিত্যের ক্রমবিকাশ।

বিশ্ব-প্রকৃতির মর্ম্মতলে একটা প্রকাশ-ব্যাকুলতা প্রতি নিয়তই আঁকু-পাকু করিতেছে। গাছ, পাতা, লতা, ফুল ইত্যাদিকে বাহিরে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করি এ গুলি তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ নহে। কুসুম গন্ধ, বর্ণ এবং পাপড়ীর মধ্যেই তাহার সমগ্র মাধুরী টুকুকে নিঃশেষে রাখিয়া দেয় নাই। এরূপ হইলে তাড়াতাড়ি কোন এক উজ্জ্বল প্রভাতে ফুটিয়া উঠিয়া, মধ্যাহ্নেই জগতের হৃদয় হইতে বিদায় লইত। এ ভাবে ফুলকে দেখিলে তাহাকে নিতান্ত ছোট করিয়াই দেখা হয়। এইটুকু ছাড়া ফুলের আর একটি মহান্ সার্থকতা, চরম পরিণতি আছে। সেইটুকু ধরা পড়ে মানব হৃদয়ে। বাহিরে সে প্রভাতের আলোর সম-বয়সী হইলেও ভিতরে তাহার অনন্ত জীবন, অফুরন্ত মাধুরী ও বিচিত্র উদ্দেশ্য।

অনেক সময়ে দেখা যায় এখানে যাহার ক্ষুদ্র প্রয়োজনসিদ্ধি মাত্রই উদ্দেশ্য তাহার মূল্য বড় কম; তদপেক্ষা যাহা বাহিরের জগতের পক্ষে নিতান্তই আগন্তুক তাহাই পরে হৃদয়-রাজ্যে চির বসতি লাভ করে। এই ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের মধ্যে অতীন্দ্রিয় মাধুরীটুকুকে চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া রাখে একমাত্র সাহিত্যে। এক কথায় সাহিত্য উচ্চতম উদ্দেশ্য, মহান্ লক্ষ্য, অপরিমেয় সুখ, এবং প্রচুর দুঃখ দিয়া মানব জীবনকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছে। জীবনধারণের পক্ষে যে আপিসে যাতায়াত, আহার, নিদ্রা প্রভৃতিই প্রচুর নহে, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছে এই সাহিত্য।

বহিঃপ্রকৃতি যতই বড় হোক না কেন মানুষের হৃদয়ের তুলনায় সে অনেক ছোট। মানবহৃদয় যে প্রকৃতি হইতে কেবল গ্রহণ করে তাহা নহে। সে যতটুকু নেয় তাহার শতগুণ দেয়। এই আদান প্রদানে প্রকৃতিই জিতিয়া যায়। কিন্তু এত সে দেয়, তবু ইহাকে বাজে খরচ, অথবা অমিতব্যয়িতা বলা যায় না কারণ এর গোলাবাড়ীতে যাহা সঞ্চিত আছে তাহা অফুরন্ত। তবে এ নেওয়া দেওয়ার মধ্যে অবশ্যই একটা ভাল-মন্দ, ইতর-বিশেষ আছে। অনেক সময়ে গ্রহণ করে ভালো, দেয় মন্দ।

এই জমা-খরচের হিসাব রাখে সাহিত্যে। কাহারো নেমকহারামী করিবার সাধ্য নাই। বহু পুরাতন কালের আদান-প্রদান-সম্বন্ধীয় নিকাশ তলব করিলেও তাহা এই খাতা হইতেই খতাইয়া দেখানো যায়।

আমরা নিতান্ত ভিক্ষুকের মত এই বিশ্ব-নগরে আসিয়া একটি সরাইখানার সঙ্কীর্ণ-কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। অগ্রদূত সাহিত্য আসিয়া আমাদিগকে রাজবাড়ীর দরওয়াজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে। কিন্তু খবর দেওয়া পর্য্যন্তই সাহিত্যের কাজ। সেখানে যে দ্বারবান আছে এখন তাহার সঙ্গে রফা করিয়া সেই রাজাধিরাজের চরণসমক্ষে উপস্থিত হইতে পারিলেই আমরা কৃতার্থম্মন্য হইব। সেখানেই আমরা "মহতো-মহীয়ান্"। এইরূপেই সাহিত্যে ক্রমবিকাশের চরম পরিণতি।

বারাণসী-কথা।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

দেখিতে দেখিতে ট্রেনখানি ডফারিন ব্রিজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এখান হইতে বারাণসীর মোহন সৌন্দর্য্য দেখিলে প্রাণ-মন শীতল হয়। ব্রিজের

উপর আসিয়া আমার মনে ভক্ত কবি হেমচন্দ্রের কাশী-স্তোত্র মনে পড়িল—

'জয় জয় কাশী অর্দ্ধচন্দ্রাকার,
বেণী সুসজ্জিত অসি বরুণার।
পদতলে শোভে সুরধুনী-ধার,
কটিদেশে কোটি সোপানের হার।
নবদিবাকর কিরণমালা,
মন্দির মুকুট দেউলে ঢালা।
দিব্যচক্ষে শিব-ত্রিশূল কাশী,
জয় বিশ্বেশ্বর-পুরী বারাণসী॥'

ব্রিজের অপর পারে 'কাশী' ষ্টেশন। এখানে গাড়ী থামিল। আমি এখানে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশনের ফটক দিয়া বাহিরে আসিয়া আমরা দুই জন একখানি একাতে আরোহণ করিলাম। পূজার সময় একার ভাড়া একটু চড়িয়াছিল। এক্কামঞ্চের দণ্ডটীকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিলাম, নতুবা একার 'বিকট আন্দোলনে' মাটিতে পড়িয়া যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা। একাখানি দ্রুতবেগে রাস্তার ধূলিরাশি উড়াইতে উড়াইতে ছুটিয়া চলিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু দোকান, দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা দেখিতে পাইতাম। পূজার বাজারে বহু লোক-সমাগম দেখিতে দেখিতে আমরা প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টায় 'গোধূলির' গাড়ীর আড্ডায় আসিয়া পৌঁছা গেল। এখানে নামিয়া কুলির মাথায় মোট দিয়া ত্রিপুরাভৈরবীর গলিতে আমার আত্মীয়ের বাসায় পৌঁছিলাম। পরস্পর কুশল-প্রশ্নাদির পর আমি একটী প্রৌঢ়া রমণীর সহিত মীরঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে যাই। স্নানান্তে বাসায় ফিরিয়া আহারাদির পর আত্মীয়টির সহিত কাশীসম্বন্ধে অনেক আলাপ হয়।

কাশী হিন্দুর নিকট পরম পবিত্র তীর্থ। এই স্থানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ দিয়া বরুণা ও অসি নামক দুইটী নদী প্রবাহিত হইয়া উত্তরবাহিনী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, এইজন্য এই পুণ্যস্থানকে 'বারাণসী' কহে।

এই পুণ্য নগরীর উল্লেখ সর্ব্বপ্রথমে আমরা শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে দেখিতে পাই। সেই সময় কাশী পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল। রামায়ণযুগেও যে কাশী অত্যন্ত বিস্তৃত জনপদ ছিল ইহার সবিশেষ প্রমাণ আছে। আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে কাশী প্রদেশে অনার্য্য জাতিরা (দ্রাবিড় ও কোল) বাস করিত। ১৪০০-১০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আর্য্যজাতিরা উত্তর ভারতবর্ষ হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ফাহিয়ানের ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে কাশীরাজ্য ৩৩৩ ক্রোশ (৪০০০ লি) ও ইহার প্রধান নগরী বারাণসী দেড় ক্রোশ দীর্ঘ, অর্দ্ধ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে হিউএন্‌ৎ-সাঙ্ সারনাথে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য দেখিয়া যান। উড়িষ্যার 'মাদলাপঞ্জীতে' দেখা যায় যে, রাজা যযাতি কেশরী বারাণসীর মন্দিরের আদর্শে ৩২৬ শকে ভুবনেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৫ই অক্টোবর, ১৯১৩ রবিবার। অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া গঙ্গা-স্নান করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বেশ্বর মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। অল্প কিছুদূর অগ্রসর হইলেই বিশ্বেশ্বর মন্দিরের সংকীর্ণ গলি। গলিতে প্রবেশ করিয়াই দেখি পুষ্পমাল্যবিক্রেতা, মিষ্টান্নবিক্রেতারা যাত্রীকে অতি সমাদরে 'আইয়ে বাবুজী, আইয়ে মা-জী' বলিয়া ডাকিতেছে। আমি কিছু মিষ্টান্ন ও ফুল খরিদ করিলাম। মন্দিরের বহির্দ্বারে দেখি ডান দিকে একখানি শ্বেত প্রস্তরফলকে লেখা রহিয়াছে—'Gentlemen not beloning to the Hindu Religion are requested not to enter the temple.' এই নিষেধবাক্যটী আমার নিকট ভাল বলিয়া মনে হইল না। সামান্য একখানি প্রস্তরফলকে এই নিষেধবাক্যটী লিখিয়া সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়া যে কি লাভ আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাহিরের তোরণ অতিক্রম করিয়া আমি মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম শত শত নরনারী বিশ্বেশ্বরকে দেখিবার আকুলতায় আনন্দের কোলাহলে এবং ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে 'হর-হর ব্যোম্ ব্যোম্' ধ্বনিতে মন্দিরাভ্যন্তর মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের মধ্যস্থানে বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গ। * মনপ্রাণ ভাবে ভরিয়া গেল।

'তেজোময়ং সগুণনির্গুণমদ্বিতীয়ং
আনন্দকন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ং।
নাগাত্মকং সকলনিষ্কলমাত্মরূপং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বেশ্বরং॥'

বিশ্বেশ্বর দর্শনশেষে অপর পথ দিয়া বাহির হইয়া অন্নপূর্ণা মন্দিরের দিকে চলিলাম। পূজার সময় অন্নপূর্ণা মন্দিরে অত্যন্ত ভিড় হয়। এখানে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বারান্দায় ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে তান-লয়-সংযোগে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মুখোচ্চারিত চণ্ডীর প্রতিশ্লোক যেন কত গম্ভীর ও প্রাণের ভিতর কি এক ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়, তাহা বর্ণনাতীত।

* চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌ৎ-সাঙ্ এখানে শত হস্ত উচ্চ তাম্রমণ্ডিত বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকদের মতে ১১৯৪ সালে কাশীর রাজা রাঠোর জয়চাঁদ যখন সেনাপতি কুতবউদ্দীন কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন, বোধ হয় তখন মুসলমান সৈন্য এই প্রাচীন লিঙ্গমূর্ত্তি বিধ্বস্ত করিয়াছিল।

কাশী অন্নপূর্ণার নগরী, এখানে কেহই অভুক্ত অবস্থায় থাকে না—

'জগৎজননী অন্নদা আপনি,
যেখানে খুলেছে আনন্দ-বিপণি।'

এই মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে পুণার মহারাষ্ট্র নৃপতি * কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী কালে নাটোরের রাণী ভবানী মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। মন্দিরের উপরিভাগে একটী গুম্বজ ও একটী স্তম্ভ আছে। মন্দিরের একাংশে সপ্তাশ্বযোজিত রথের উপর সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম।

অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া আমরা বিশ্বেশ্বর মন্দিরের উত্তর পার্শ্বের গলি দিয়া জ্ঞানবাপী দর্শনে যাই। কথিত আছে রুদ্ররূপী মহাদেব ত্রিশূল দ্বারা এই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া এই কুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হিন্দুর বিশ্বাস, এই কুণ্ডের জল পান করিলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। কালাপাহাড় কাশীর মন্দির ধ্বংস করিবার সময় পাণ্ডাগণ বিশ্বেশ্বরকে এই কুণ্ডে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া জনমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এই কুণ্ডের উপরিভাগে একটী ছাদ আছে। গোয়ালিয়ররাজ দৌলত রাও সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী রাণী বৈজাবাই ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইহা চল্লিশটী প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের উপর স্থাপিত। একটী পাণ্ডা ঠাকুর সমাগত যাত্রীকে কুণ্ড হইতে জল তুলিয়া দিতেছিলেন এবং তাঁহার পারিশ্রমিক বাবদ একটা পয়সা গ্রহণ করিতেছিলেন। জ্ঞানবাপী কুণ্ডের মুক্তপ্রাঙ্গণের পূর্ব্বাংশে একটী শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত সাতফুট উচ্চ বৃহৎ বৃষভমূর্ত্তি দেখিলাম। নেপালের রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে ঔরংজেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে মসজিদ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে এই স্থানে আদি বিশ্বেশ্বর-মন্দির ছিল। কথিত আছে যে, ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ঔরংজেব এই মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদের প্রতিষ্ঠা করেন। †

মসজিদের পশ্চাতে দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া আমি প্রত্যহ প্রাতে মুগ্ধনেত্রে পুরাতন বিশ্বেশ্বর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতাম। সুন্দর কারুকার্য্য খচিত সেই অংশ দেখিয়া কত কথা মনে আসিত। এই ভগ্নস্তূপ হইতে হিন্দুর স্থাপত্য শিল্পোৎকর্ষের একটা চরম নিদর্শন পাওয়া

---

* রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের মতে উহা জনৈক মহারাষ্ট্র বিষ্ণু মহাদেও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

† জেনারেল কনিংহামের মতে জাহাঙ্গীর বিশ্বেশ্বর-মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কানিংহাম চখের নিকটবর্ত্তী আদি বিশ্বেশ্বর মন্দিরের কথাই বলিয়া থাকিবেন। ঔরংজেব কাশীর মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে সম্প্রতি একটা আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনার মূলে একখানি ১৬৫৩ বা ৫৪ খৃষ্টাব্দে পারসীতে লিখিত 'ফারমান'। চট্টগ্রামের উকিল Holy city (Benares) রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু রজনীরঞ্জন সেন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নিজ চক্ষে কাশী-পুলিশের সিটি ইনস্পেক্টর খান্ বাহাদুর শেখ মহম্মদ তোয়াবের নিকট মূল দলিলখানি দেখিয়াছেন। পূর্ব্বে এই ফারমানখানি মঙ্গলগৌরী মহল্লার জনৈক পাণ্ডার নিকট হইতে খান্ বাহাদুর প্রাপ্ত হন। লেফটানান্ট কর্ণেল ডাঃ জি, সি, ফাইলটের ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

'Let Abul Hasan worthy of favour and countenance trust to our royal bounty and let him know that, since in accordance with our innate kindness of disposition and natural benevolence the whole of our untiring energy and all our upright intentions are engaged in promoting the public welfare and bettering the condition of all classes high and low, therefore in accordance with our holy Law we have decided that the ancient temples shall not be overthrown but that new ones shall not be built. In these days of our justice, information has reached our noble and most holy court that certain persons actuated by rancour and spite have harassed the Hindu resident in the town of Benares and a few other places in that neighbourhood, and also certain Brahmins, keepers of the Temples, in whose charge those ancient temples are, and that they further desire to remove these Brahmins from these ancient office (and this intention of theirs causes distress to that community) therefore our Royal Command is that after the arrival of our lustrous order you should direct that in future no person shall in unlawful ways interfere or disturb the Brahmins and the other Hindu resident in those places, so that they may as before remain in their occupation and continue with peace of mind to offer up prayers for the continuance of our God-given Empire that is destined to last to all time. Consider this as an urgent matter. Dated 15th of Jumada 'S-Saniya A. H. 1064 (A. D. 165' or 4.)

উপরোক্ত ফারমানের মূল ভাবার্থ জানিবার জন্য আমি অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রফেসর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়কে চিঠি লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে আমাকে জানাইয়াছেন—'ঔরংজীব হুকুম দিয়া কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দির ভগ্ন করান, একথা তাঁহার সরকারী ফারসী ইতিহাসে লিখিত আছে। সেন মহাশয় যে ফার্মান উল্লেখ করিয়াছেন তাহা Journal of the Asiatic Society of Bengalএ তৎপূর্ব্বে মুদ্রিত হয়, এবং তাহার একখানি বড় ফটো আমার নিকট আছে। সেখানিতে কাশীর কয়েকজন পূজারীকে রক্ষা করিবার হুকুম দেওয়া হয়। উহার তারিখ বাদশাহের রাজত্বকালের প্রথম বৎসর, যখন তাঁহার পুত্র মুহম্মদ সুলতান, পরাজিত সুজাকে মুঙ্গেরের দিকে পশ্চাদ্ধাবন করেন।'

যায়। মনে হয় যেন কোন দেবশিল্পী এই মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। হিন্দুর স্থাপত্যসৌন্দর্য্যের গৌরব-স্মৃতির মহিমা মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠে। এত সুন্দর, এত সুগঠিত মন্দির সম্রাট্ ঔরংজেব কেন ভাঙিয়াছিলেন? প্রজার বেদান্তমূলক ধর্ম্মকে ঔরংজেবের মত ধর্ম্মবিশ্বাসী কেন যে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহাও একটা সমস্যার বিষয়। আজিও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বিধর্ম্মী বলিয়া—ভারতসম্রাট্ শুধু প্রজার স্কন্ধে 'জিজিয়া' কর স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, প্রজার ধর্ম্ম, প্রজার পূজার মন্দির, প্রজার দেবতাকে নষ্ট করিতে—ভাঙিতে—চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এত করিয়াও কিন্তু তিনি হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের এক কণিকাও বিলোপ করিতে পারেন নাই।

(ক্রমশঃ)

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"করমালা" তালুকে পীড়া।

২৬, ২৭, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯১।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

ডাক্তার ভিতরে বিছানায় বসিয়াই ছিলেন। ইনি জাতিতে মুসলমান, কিন্তু ব্যবহারে খুব সৎ ও সুশীল। তিনি খুব আস্থা ও যত্নের সহিত ঔষধোপচার করিতেছিলেন, তথাপি ওঁর শরীর ক্রমশ খারাপ হইতে লাগিল। খুব ঘাম ছুটিতেছিল এবং মুখও ছায়ের মত রক্তহীন দেখাইতেছিল। এক্ষণে ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। মুখের কাছে কাণ না আনিলে তাঁর মুখের কথা শুনা যায় না। বলিতেছিলেন কি?—সমস্ত দিন কেবলি বলিতেছেন;—"তুমি ঘাব্‌ড়িয়ে যেওনা, ভয় পেয়োনা, মনোযোগ দিয়ে বোতলের উপরকার অক্ষরগুলা ভাল করে' পড়ে তবে আমাকে ঔষধ দিতে থাক। ঘাব্‌ড়িয়ে গেলে ভুল করে আর কোন ঔষধ দেবে"—ইত্যাদি কথা আমাকে সাহস দিয়া দিনের মধ্যে কতবার বলিতেন। শরীর ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল; সেইজন্য আমার ধড়ে যেন প্রাণ ছিল না।" কিন্তু ওঁর সাহসের কথা শুনিয়া আমি যেন নূতন প্রাণ পাইতাম; কিন্তু এখন কথা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আমি একেবারেই সাহস হারাইলাম। ধরণী ও আকাশ ছাড়া আমার কাছে যেন আর কিছুই নাই। সেই দয়াময় পরমেশ্বর এখন কোথায়? আজ পর্য্যন্ত আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাঁর উপরেই। তিনি ছাড়া এ সময়ে আমার আর কেহ নাই, এ কি তিনি জানেন না? ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া, আমি আপন মনে কাঁদিতেছিলাম এবং সেই আবেশভরেই উঠিয়া একবার নাড়ী দেখিলাম। নিকটে ডাক্তার ও কেরাণী বসিয়া ছিলেন। "আমি ভিতর থেকে এখনি আস্‌চি" এই কথা তাঁদের বলিয়া যে দেবালয়ে আমরা নামিয়াছিলাম, সেই মহাদেবেরই মন্দিরের ভিতর দেবতার সম্মুখে গিয়া বসিলাম। তখন রাত্রি তিনটা। ভিতরে এক বৃদ্ধা পূজারিণী শুইয়াছিল, আমি তাকে বাহিরে যাইতে বলিলাম। কিন্তু সেখানকার দীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আমার তা' ভালই মনে হইল। কারণ এই সময় আমার যেরূপ মনের অবস্থা তাহাতে দেবতা ও আমি—আমরা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি যেন কেহ না থাকে; একটি দীপও না থাকিলে ভাল হয় মনে হইতেছিল। পারিতাম যদি নিবাইয়া দিতাম, কিন্তু হাত দিতে সাহস হইল না। ও কথা মনে করিলেও অশুভ হয় এইরূপ মনে করিয়া আমি দেবতার সম্মুখে পাগলের মত বসিয়া রহিলাম। মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল না বলিয়া দেবতার সম্মুখে মাথা রাখিয়া আস্তে আস্তে—কিন্তু খুব মন খুলিয়া কাঁদিলাম। খুব কাঁদিবার পর, মন একটু হাল্কা হইলে যা মনে হইতেছিল তাই বলিতে লাগিলাম, প্রার্থনা করিলাম এবং সর্ব্বপ্রকারে দীনতার ভাব মনে আসা সত্ত্বেও আক্রোশের সহিত বলিলাম; "আমরা দীন, সঙ্কটে তোমার দ্বারে এসে পড়েছি; তোমার যাহা ভাল মনে হয় সেই ভাবে আমাদের উদ্ধার কর; তুমি অন্তর্যামী সবাই বলে; আমার উপর তোমার যদি দয়া না হয় তাহলে বাহিরে যে একটা বড় কুয়ো আছে সে নিশ্চয়ই দয়া করে তার উদরের মধ্যে আমাকে গ্রহণ করবে," এইরূপ কত কথাই বকর বকর করিয়া বকিয়া গেলাম। সব রকমে শ্রান্ত হইয়া পড়িবার দরুণ, কি অন্য কারণে, তা কে জানে—এইরূপ ভয়ঙ্কর কষ্টের অবস্থা সত্ত্বেও, কয়েক সেকেণ্ড-কাল সেইখানেই আমার চোখ্ বুজিয়া আসিল। আমি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন কোথাও একটা উঁচু পাহাড়ের উপর দেবালয় আছে আমি যেন সেইখানে গিয়াছি। দেবালয়ের নীচেই কৃষ্ণানদীর প্রবাহ-পথ; তারই ধারে স্থানে স্থানে বট-পিপলের বৃক্ষ;—তাহা বেশ মজবুত করিয়া বাঁধানো; এবং মাঝে মাঝে বড় ঘাট। এইরূপ এক উচ্চ ঘাটের নিকটস্থ বাঁধান বটবৃক্ষের উপরে দুই হাতে ঠেস্ দিয়া নীচের মজা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছি। সেই দিন কোন একটা বিশেষ বড় পরব ছিল। হাজার হাজার স্ত্রীলোক ও পুরুষ কৃষ্ণানদীতে স্নান করিতেছিল। আমি যে উচ্চ ও বিস্তৃত বটবৃক্ষকে দুই

হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই বড় গাছটা যেন পড়িয়া যাইবে এইভাবে সম্মুখের দিকে ঝুইয়া পড়িতে লাগিল এবং তাহার দরুন গাছের বাঁধানো বেদীর মাটী ফাটিয়া যাইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভয় পাইলাম এবং দুই হাতে সেই বটবৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া খুব চীৎকার করিয়া নীচের ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম,—ওগো! তোমরা দেখ এই গাছটা পড়ে যাচ্ছে, কেহ নীচেয় থেকে ওকে হাত দিয়ে ধর, আটকাও; যদি পড়ে ত হাজার লোকের প্রাণ যাবে"—এইরূপ বলিয়া, আমার যতটা শক্তি ছিল, সেই শক্তি ব্যয় করিয়া গাছটাকে আমার দিকে টানিতে লাগিলাম। আমি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলাম, আমার মুখ শুকাইয়া গেল। ইতিমধ্যে নীচের লোকেরা নদী হইতে ভিজে-গায়ে দৌড়িয়া আসিয়া হাজার হাজার লোক সেই বট বৃক্ষকে হাত দিয়া আট্‌কাইল। দুই এক মিনিটের মধ্যেই ঐ বৃক্ষ আর বেশী না ঝুঁকিয়া, দৃঢ়ভাবে সেইখানেই রহিল। গাছটা আর নীচে পড়িয়া যাইবে না, এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে, নীচের লোকেরা হাত ছাড়িয়া দিল এবং আমারও আনন্দ হইল। গাছটাকে তখনও জাপটিয়া ধরিয়া আছি এমন সময় আমাদের শিরেস্তাদার আসিয়া আমাকে ডাকিল। আমি ভীত হইয়া একেবারে উঠিয়া পড়িলাম এবং তখনি সেই ভাবেই রোগীর শয্যার পাশে আসিলাম সত্য; কিন্তু আমাকে কেন ডাকা হইয়াছে, অবস্থাটা কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি পাগলের মতো চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে ডাক্তার আমাকে বলিলেন, "একটু নীচু হও, উনি তোমাকে কিছু বল্‌তে ইচ্ছা করেন মনে হয়।" আমি তখনই নীচু হইয়া "ওঁর" মুখের কাছে আমার কাণ রাখিলাম। তখন ক্ষীণ স্বরে আস্তে আস্তে উনি বলিলেন—"আমাকে বসিয়ে দেও। আমার বমি আসচে।" এই কথা শুনিয়া আমি ও ডাক্তার দুজনে মিলিয়া ওঁকে আস্তে আস্তে বসাইয়া দিলাম। তখন খুব জোরে বমি হইয়া গেল। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, ঘাড় নেতিয়া পড়িল। বালিস উঁচু করিয়া ও তাহাতে আস্তে আস্তে ঠেস দিয়া রাখিয়া, ডাক্তার নাড়ি দেখিলেন। সন্ধ্যাকাল হইতে ঠাণ্ডা ঘাম ছুটিতেছিল, এক্ষণে তাহা বন্ধ হইল, কিন্তু হাত-পা-ঠাণ্ডা সেই রকমই ছিল; তাই ডাক্তার আমাকে বলিলেন, আমি যা দেব বলে রাত্রি থেকে ভাবচি সেই ঔষধের এক মাত্রা এখন দেও।" আমি তুলসীর রসে হেমগর্ব্ভের ঔষধটা ঘসিয়া তাহাই দুই তিন আঙ্গুল পরিমাণ চাটিতে দিলাম। নাড়ী অস্থির ভাবে চলিতেছিল, যেরূপ হওয়া উচিত তাহা ছিল না; সেই অবস্থায়, রোগের জোর আরও বেশী হইল। এই সময়েই উনি ভরসা হারাইলেন এবং আমাকে বলিলেন—"এখন আমার অবস্থা ভাল নয়। কোথায় পুণা আর কোথায় আমি। তুমি নিতান্তই একলা!" এইরূপ বলিবার পর, আবেগে ওঁর বুক ভরিয়া উঠিল,—ও উনি বলিলেন:—"ভয় নাই, ঈশ্বর তোমাকে দেখবেন; বাড়ীতে তার করে' দুর্গাকে ডাকিয়ে আনো।" আমি আবার হেমগর্ব্ভের মাত্রা চাটিতে দিলাম এবং ডাক্তার যে ঔষধ দিয়াছিলেন সেই ঔষধ খাওয়াইয়া তারপর কাঞ্জি পান করাইলাম এবং খুব ভরসা দিয়া বলিলাম—"ডাক্তার আমাকে বলেচেন, রাত্রির চেয়ে এখন ভাল আছেন, ভরসা ছেড়ো না। বাড়ীতে তার করেছি; বিশ্রামজী ও ননদ সকালে শীঘ্রই আসচেন।" তখন সকাল ৫টা; ডাক্তার ও আমি দুজনে পাশে থাকিয়া নাড়ী ধরিয়া বসিয়াছিলাম। আমি নামমাত্র হাত ধরিয়া ছিলাম, কিন্তু আমার মন সেখানে না থাকায়, নাড়ীর চলাচল কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। বরং নাড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া আমি ওঁর মুখের পানে চাহিয়া ডাক্তারের দিকে তাকাইলাম; তখন, ডাক্তার "ভয় কোরো না"—হাতের ইসারায় আমাকে বলিলেন। ৫।৭ মিনিটের পর—এখন নাড়ী নিশ্চয়ই বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ আমার মনে হইল এবং হয়তো বা একবার ফুকরিয়া কাঁদিয়াও উঠিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে ডাক্তার ইহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে বলিলেন:—"ভয় নাই, কেঁদো না, আমি মিথ্যা বলচিনে। ঘুম না হলেই খারাপ। এই দেখ, ঘুম এসেছে, এবং হাত-পাও একটু গরম হয়ে আসছে।" তাঁর এই কথা শেষ না হইতে হইতেই আমি ওঁর নিত্যকার নাক-ডাকার শব্দ শুনিতে পাইলাম, তখন আমার মন স্থির হইল। তারপর প্রায় ২০ মিনিট বেশ ঘুম হইয়াছিল। রাত্রি হইতে যে সকল ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে যেন জ্বর আসিবার মতো গরম হইয়া উঠিল। নাড়ীর টোকা অধিক জোরে ও দ্রুত পড়িতে লাগিল। তখনও ঘুমাইতেছিলেন। এইরূপ অবস্থায় পাকা এক ঘণ্টা নিদ্রা হইবার পর, প্রায় ৭টার সময় বিশ্রামজীর গাড়ী আসিল। তাঁকে ও ননদকে দেখিয়া আমার ভরসা হইল। ডাক্তার বিশ্রামজী শয্যার নিকট আসিবামাত্র, তিনি জাতিতে মরাঠা, গোয়ালা হইলেও আমি তাঁর পা ধরিলাম ও পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিলাম—"এখন পর্য্যন্ত এই ডাক্তার দয়া করে' ওঁকে কোন রকম করে' বাঁচিয়ে রেখেছেন, এখন উনি আপনার হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন; এখন আপনি ওঁকে রক্ষা করুন। আপনার রূপ ধরে দেবতাই আমাকে সাহায্য করতে এসেছেন, এই রকম আমার বোধ হচ্চে।" বিশ্রামজী নিকটে গিয়া নাড়ী দেখিলেন। সেই সময় আধা ঘুমন্ত অবস্থা ছিল; তাই ডাক্তারকে লইয়া বিশ্রামজী একটু বাহিরে গেলেন এবং এখন পর্য্যন্ত কি কি ঔষধাদি দেওয়া হইয়াছে তাহার তদন্ত করিতে লাগিলেন। ননদ শয্যার নিকট বসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে, উনি চোখ মেলিয়া উপরে চাহিলেন। ননদ ও বিশ্রামজীকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া বলিলেন—"তোমরা এসেছ? দেখ আমার কি অবস্থা!" এবং মনের মধ্যে একটা আবেগ আসিবামাত্র দুর্ব্বলতার দরুণ ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিশ্রামজী, একটু পাখার বাতাস দিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বলিলেন;—"আমি এসেছি, আর কোন ভয় নাই; যা কিছু সঙ্কট সে কাল ছিল। এখন সেটা কেটে গেছে।" এই কথা বলিয়া তিনি নিজের ব্যাগ হইতে বোতল বাহির করিয়া একটা গেলাসে ঔষধ ঢালিলেন এবং তাহাতে একটু জল দিয়া তাহা পান করিবার জন্য সম্মুখে ধরিলেন। তখন উনি আস্তে আস্তে বলিলেন:—"আমাকে বসিয়ে দেও।" আমরা দুজনে ধরিয়া ওঁকে বসাইয়া দিলাম। উনি ডাক্তারের হাত হইতে গ্লাস আপন হাতে লইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন:—"পান করব কি?" ডাক্তার বলিলেন "হাঁ"; তারপর ঠোঁটের কাছে আনিয়া, কি

জানি, কি একটা ওঁর মনে হইল। গেলাসটি শয্যার বাহিরে রাখিয়া একেবারে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। "এরূপ কেন করিলেন"? জিজ্ঞাসা করায়, একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"আমাকে তোমরা কেউ এ রকম ঠাট্টা কোরো না; আমার যা নিয়ম তা রাখো; এ-ছাড়া আমাকে আর যে ঔষধ দেবে তা আমি খাব।" এই কথায়, ডাঃ বিশ্রামজী অনেক রকম করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, "নিতান্ত নিরুপায় না হলে আমি এ ঔষধ ব্যবহার করিনে। আপনার স্বভাব আমার জানা আছে। কিন্তু হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ও থেকে-থেকে মূর্চ্ছা হচ্চে—এর প্রতীকারের জন্য ২০ হইতে ৩০ ফোঁটা খাওয়া দরকার এবং পুণায় যাওয়া পর্য্যন্ত আমার এই কথাটা শুনতে হবে; সেখানে গেলে এর বদলে অন্য ঔষধ প্রয়োগ করব।" এই কথা শুনিয়া, শুধু 'রাম রাম' বলিয়া, নীরবে ও অতি কষ্টে ঔষধটা খাইলেন। এইরূপ সেইদিন ঐ খানেই কাটাইয়া, তারপর দিন করমাল৷ হইতে আমরা বাহির হইয়া গরুর গাড়ী করিয়া জেউরের ষ্টেশানে আসিলাম। ওঁকে গরুর গাড়ীতেই নরম গদি পাতিয়া রাখা হইয়াছিল। এবং গাড়ীতে একটুও ঝাঁকানি না লাগে, এইজন্য গাড়ী আস্তে আস্তে চালানো হইতেছিল। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বিশ্রামজী, আমি, ননদ প্রভৃতি আমরা হাঁটিয়া চলিতেছিলাম, প্রতি বিশ মিনিট কিংবা অর্দ্ধ ঘণ্টায় ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া ঔষধ দিতেছিলেন। এইরূপ প্রায় ১১টার সময় আমরা ষ্টেশানে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত আড্ডা করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে সেকণ্ড ক্লাসের কামরা রিজার্ভ করিয়া রাত্রি দশটার সময় পুণায় আসিয়া পৌঁছিলাম। বোম্বায়ে চিরঞ্জীব-বাবা-ভাউজী স্কুলে পড়িত, তাকে পূর্ব্বদিনে তার করা হইয়াছিল। তদনুসারে সে ও প্রিন্সিপ্যাল বামন-আবাজী-মোড়ক জেউরের ষ্টেশানে আসিয়া মিলিত হইলেন। তদনুসারেই পুণা হইতে কীর্ত্তনে ও অন্যান্য ব্যক্তি জেউরায় আসিয়াছিলেন; আমাদের পুণায় পৌঁছিবার ২ দিন আগে পীড়ার খবর সহরময় রাষ্ট্র হয়, সেই জন্য সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন ছিল। আজ রাত্রে পুণার ষ্টেশনে ভাল পাল্কী লইয়া আসিবে, এইরূপ বাড়ীতে তার করিয়াছিলাম। সেই অনুসারে আমাদের বাড়ীর লোক পাল্কী লইয়া ষ্টেশনে আসিয়াছিল। সেই সময় অন্য বন্ধুবর্গও ষ্টেশনে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র পাল্কী আনিয়া গাড়ীর কামরার গায়ে লাগান হইল এবং যাতে ঝাঁকানি না লাগে—ওঁকে আস্তে আস্তে উঠাইয়া পাল্কীতে রাখা গেল এবং কাহাকেও সাক্ষাৎ করিতে না দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া পাল্কী আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে রওয়ানা করা হইল। এই পীড়ায় এতটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মনে একটু আনন্দ বা একটু দুঃখের আবেগ আসিলে তখনই মূর্চ্ছা যাইতেন। সেইজন্যই কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে অনেক দিন পর্য্যন্ত ওঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়া হয় এইরূপ ডাঃ বিশ্রামজী আদেশ করিয়াছিলেন। এই পীড়া ভাল করিয়া সারিতে এবং তাহার পর কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ওঁর প্রায় চই মাস লাগিয়াছিল।

১৭ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

মহাভারতীয় নীতিকথা।

আদিপর্ব্ব।

গতানুশোচনা। যাহা ভবিতব্য, অতি সাবধানে থাকিলেও তাহা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়।

দৈব। এই জগতীতলে অদ্যাপি বুদ্ধিবলে কেহই দৈবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেন নাই। কারণ দৈবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে। (অনুক্রমণিকাধ্যায়-২৮।

পাপ নহে। তপস্যার অনুষ্ঠান পাপজনক নহে, অধ্যয়নে পাপ নাই, জীবিকার নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও পাপাচার নহে। (ঐ ৩১।

ধর্ম্ম। লোকান্তরগতজনের ধর্ম্মই অদ্বিতীয় বন্ধু।

অর্থ ও স্ত্রী। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয়ানুরাগপূর্ব্বক সেবিত হইলেও কখন স্থির ও আত্মীয় হয় না।

(পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়-৬৫।

দক্ষিণা। যিনি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া শিক্ষা দান করেন ও যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করে তাহাদের মধ্যে একজন মৃত্যু বা বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়।

(পৌষ্য পর্ব্বাধ্যায়-৮১।

মিথ্যা। মিথ্যাবাদী সর্ব্বত্র অনাদরণীয় হয়।

(পৌলম পর্ব্বাধ্যায়-১০১।

মিথ্যা। যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া, জানিয়া শুনিয়াও মিথ্যা বলে, সে আপনার উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষকে নরকে পাতিত করে। আর যে ব্যক্তি যথার্থ জানিয়াও না কহে সেও সেই পাপে লিপ্ত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। (ঐ ১০৩।

অহিংসা। অহিংসা পরম ধর্ম্ম। (ঐ ১১৬।

পুত্র। লোকে পুত্রোৎপাদন দ্বারা যেরূপ সদ্গতিসম্পন্ন হয়, ধর্ম্মফল দ্বারা সেরূপ সদ্গতি লাভ করিতে পারে না। (ঐ ১১৮।

আত্মশ্লাঘা। অকারণে আত্মশ্লাঘা অতিশয় অন্যায়।

(আস্তীক পর্ব্বাধ্যায়-১৭১।

মাতৃক্রোধ। সর্ব্বপ্রকার শাপেরই প্রতিবিধানোপায় আছে, কিন্তু মাতৃদত্ত শাপমোচনের কোন উপায় দেখি না। (আস্তীক পর্ব্বাধ্যায়-১৭৯।

অধর্ম্ম। বিপদকালে ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতীকার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য, কারণ অধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্ত জগতের বিনাশকারী। (ঐ ১৮০।

হিতসাধন। যাহাতে সকলের হিতসাধন হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। (ঐ ১৮২।

দৈব। যে ব্যক্তি দৈবপর হয়, তাহার দৈবের উপর নির্ভর করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কারণ সে স্থলে দৈব ব্যতিরেকে তাহার রক্ষা পাইবার আর কোন উপায়ান্তর নাই। (ঐ ১৮৩।

রাজা। ন্যায়পরায়ণ রাজা যদিও কদাচিৎ কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদিগের অবশ্যই সহ্য করা উচিত। (ঐ ১৯৩।

রাজা উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগের প্রতি দণ্ড বিধান করেন

রাজা। রাজদণ্ড ভয়ে পুনর্ব্বার, ধর্ম্ম ও শান্তির সংস্থাপন হয় এবং ধর্ম্ম হইতে স্বর্গ সংস্থাপিত হয়।

(ঐ ১৯৩।

ক্রোধ। ক্রোধ সংযমী তপস্বীগণের বহুযত্নে সঞ্চিত ধর্ম্মরাশি লোপ করে।

ধর্ম্ম। ধর্ম্মহীন লোকদিগের সদ্গতি লাভ হয় না।

শমগুণই ক্ষমাশীল তপস্বীগণের সর্ব্বত্র সিদ্ধিদায়ক।

ক্ষমা। কি ইহলোক কি পরলোক ক্ষমাবানের সর্ব্বত্রই মঙ্গল।

(ঐ ১৯৫।

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের পূজনীয় সন্দেহ নাই।

(ঐ ২৩৭।

স্ত্রীলোকের পিতৃগৃহে বাস। নারীগণের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা অবিধেয় এবং তাহাতে কীর্ত্তি, চরিত্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

(সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়-৩১৯।

আত্মাবমাননা। আত্মাকে অবজ্ঞা করিও না।

মিথ্যা। যে ব্যক্তি মনে একপ্রকার জানিয়া মুখে অন্যপ্রকার বলে, সেই আত্মাপহারী চৌরের কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করা হয়।

(ঐ ৩২১।

পাপ। লোকে পাপ কর্ম্ম করিয়া মনে করে আমার দুষ্কর্ম্ম কেহই জানিতে পারে নাই কিন্তু দেবগণ ও অন্তর্যামী পুরুষেরা সকলই জানিতে পারেন।

আত্মার পরিতোষ। পাপপুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ হৃদয়স্থিত আত্মা সন্তুষ্ট থাকিলে বৈবস্বত যম স্বয়ং মনুষ্যের পাপ নাশ করেন। আর যে দুরাত্মার আত্মা সন্তুষ্ট নহেন যম সেই দুরাচারের পাপ বৃদ্ধি করেন।

মিথ্যা। যে পাপাত্মা আত্মাকে অপমান করিয়া সত্য বিষয় মিথ্যারূপ প্রতিপাদন করে, দেবতারা তাহার মঙ্গল বিধান করেন না।

(ঐ ৩২১।

ভার্য্যা। গৃহকর্ম্মদক্ষা পুত্রবতী পতিপরায়ণা ভার্য্যাই যথার্থ ভার্য্যা।

ভার্য্যা। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা অসহায়ের সহায়স্বরূপ, ধর্ম্মকার্য্যে পিতার স্বরূপ, আর্ত্ত ব্যক্তির জননী স্বরূপ, এবং পথিকের বিশ্রাম-স্থানস্বরূপ। ভার্য্যাবান ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাজন।

ভার্য্যা। ভার্য্যা কর্ত্তৃক সাতিশয় ভৎর্সিত হইলেও তাহার অপ্রিয় কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে, কারণ রতি প্রীতি ও ধর্ম্ম এই তিন সুখসাধনই ভার্য্যার আয়ত্ত।

স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক আত্মার পবিত্র কর্ম্মক্ষেত্র।

(ঐ ৩২২-৩।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থপরিচয়।

মাধবী—শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত। যতীশ লাইব্রেরী চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। এখানি কবিতা পুস্তক। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র মহাশয় লিখিত ভূমিকা-সহ। বিভূতি বাবু ভূমিকায় বলিতেছেন "কিরূপে একটি মুমুক্ষু জীবাত্মা আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-ব্যথা, বিরহ-মিলন প্রভৃতি মানবজীবনের চিরন্তন আলো-অন্ধকারের ভিতর দিয়া পরমারাধ্য বাঞ্ছিত দেবতার অন্বেষণ করিয়া লয়, "মাধবীর" বিভিন্ন স্তবক-পরম্পরায় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।" এই কবিতা-পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। প্রায় অনেকগুলি কবিতাই অতি সুন্দর লাগিল—সদ্যস্ফুট "মাধবী" ফুলের মতই সেগুলি মনোহর—গন্ধ মধুর।

কবিতাগুলি পড়িলে "আলো ও ছায়া"র কবির কথাই মনে পড়ে। শিশুর মতন সরলতা ও আন্তরিকতা এই কবিতাগুলিকে আরো সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। আমরা এই কবির পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। তবু কবি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই বঙ্গসাহিত্যে উজ্জ্বলমণি-বিশেষ।

ধ্যানলোক—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত কবিতা পুস্তক। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। মূল্য বারো আনা। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের একখানি চিত্র আছে। এই ভক্ত-কবির 'ধ্যানলোকে' প্রবেশ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করিলাম। কবিতাগুলি বেশ গাম্ভীর্য্য ও ভাবপূর্ণ। প্রত্যেক কবিতাতেই কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কবির মনও খুব উদার ও ভগবদ্ভাবে পূর্ণ। "আহ্বান" শীর্ষক কবিতায় কবি অসঙ্কোচে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

> "কে মহৎ শত ধন্য পূজ্য গরীয়ান্
> কে নগণ্য অতি তুচ্ছ ধূলির সমান
> তিলেক চিন্তিতে আজি নাহি অবসর—
> এস মোর মুক্ত-বক্ষে বিশ্ব-চরাচর!

"স্বদেশের প্রতি" কবিতাটি বেশ গম্ভীর-ভাবোদ্দীপক :—

> "স্তব্ধ কেন দশদিক,—শান্ত কেন সিন্ধুর গর্জ্জন,
> এতো নহে শান্তিছায়া—আসে পুনঃ ঘনায়ে মরণ!"

জন্মভূমির প্রতি কবির কি প্রগাঢ় ভালবাসা :—

> "তবু মা জগতে সব জন হতে তোমা
> গোপন মরমে ভালো যে বেসেছি ওমা!
> সকল হৃদয় বাহিরি গানের ছলে
> লুটাতে চাহে মা, তোমারি চরণতলে," ইত্যাদি।

"জপমালা" "নবতীর্থ" "মাল্যদান" "প্রার্থনা" "সন্তোষ" প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতা বেশ ভাল লাগিল।

"সাধনাকুঞ্জের" কবির সাধনা সার্থক হউক।

পিতৃ-বিলাপ কাব্য ও বিবিধ কবিতা—শ্রীহৃষীকেশ দত্ত প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

আমরা উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া এই শোক-সন্তপ্ত পিতার দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করি। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন। কবিতাগুলি শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের মর্ম্মস্থলোত্থিত কাতর উচ্ছ্বাস—সুখপাঠ্য ও সুমধুর ভাষায় ব্যক্ত। কতকগুলি কবিতা বেশ কবিত্বপূর্ণ। মোটের উপর এরূপ বিশুদ্ধ-ভাবের কবিতাপুস্তক আমরা অনেকদিন দেখি নাই।

সাহিত্যকল্পলতা ও সুকথামঞ্জুষা—গয়াকাহিনী, নচিকেতা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপরি-উক্ত পুস্তক দুই-

খানি আমাদের দেশের অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের উপযোগী করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন। সাহিত্যকল্পলতা নামক পুস্তকখানি গদ্য ও পদ্য এই দুইভাগে বিভক্ত। সুকথামঞ্জুষায় দুই চারিটী পদ্য থাকিলেও গদ্যের ভাগই অধিক। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম যে, গ্রন্থকার বর্ত্তমান কালের গতানুগতিকতার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া দেশের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানে ও গুণে বরেণ্য হইয়া শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল মহাত্মাদিগের পূত জীবনকথা অতি সরল ভাষায়, গল্পচ্ছলে লিখিয়া দেশের ছোট ছোট বালকবালিকাদের সম্মুখে উজ্জ্বল, পবিত্র আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এইরূপ পুস্তকের দ্বারা বালকদের হৃদয় শৈশব অবধি গঠিত হইলে পরিণামে সুফল হইবে।

পুস্তক দুইখানির প্রথমখানি আট আনা আর দ্বিতীয়খানি চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। প্রকাশক শ্রীকালীপ্রসন্ন নাথ ; রিপণ লাইব্রেরী, পটুয়াখালি ঢাকা। সম্ভবতঃ প্রকাশকের এই ঠিকানায় পুস্তক দুইখানি প্রাপ্তব্য।

সংবাদ।

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার এবার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসকদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মানকর পদ লাভ করিলেন।

শোক-সংবাদ।

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস—আমরা নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা রোগে ৮ দিন মাত্র ভুগিয়া রমণীকুলের গৌরব ৺কৃষ্ণভাবিনী দাস গত ১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক স্বর্গীয় মিঃ ডি, এন, দাসের সহধর্ম্মিনী ছিলেন। ইনি ইংরাজী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল স্বামীর সহিত ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। তথাপি দেশীয় সমাজ ও দেশীয় ভাষার উপর ইঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ ইনি কয়েকখানি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন। সমাজ-সেবা ত ইঁহার জীবনের ব্রত-স্বরূপই ছিল। নিজে কষ্টকর জীবন যাপন করিয়াও যাহাদের জীবন অন্ধকারে আবৃত, যাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিবার কেহ নাই,—সেই সকল পতিত, নিরাশ্রয় রমণীমণ্ডলীকে মাতার ন্যায় আপনার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন। অন্তঃপুরচারিণীদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে তাঁহার অসামান্য উদ্যম বিশেষ প্রসংশার যোগ্য। এমন একজন সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা রমণীর মৃত্যুতে সমাজের যে সমূহ ক্ষতি হইল তাহা যে সহজে পূর্ণ হইবে তাহার আশা খুব অল্প। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। ভগবান এই পরদুঃখকাতরা রমণীকে তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে গ্রহণ করুন। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি ; ভগবান তাঁহাদের উপর শান্তিবারি বর্ষিত করুন।

৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—গত ১৬ই চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় "বসুমতীর" প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৫২ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার মত কর্ম্মের একজন একনিষ্ঠ সাধক বাঙ্গালীর মধ্যে খুব অল্প দেখা যায়। ইনি বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে সাহিত্যপ্রচারব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং আমরণ সেই ব্রত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। পিতৃশোকসন্তপ্ত তাঁহার একমাত্র সন্তান সতীশ চন্দ্রকে আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি। আশা করি তিনি তাঁহার পিতৃগৌরব রক্ষা করিবেন।

ভ্রম-সংশোধন।

অগ্রহায়ণের সংখ্যার তান্ত্রিক বর্ণবিবরণ প্রবন্ধে কতকগুলি ভুল হইয়াছে।

২০৬ পৃষ্ঠার ৩য় প্যারার ২য় লাইনে "লকার স্বীকৃত হইয়াছে" এমত হইবে, নকার নহে। ইহারই ৪র্থ লাইনে দুইটি লকারের মধ্যে, ৫ম লকার, এবং অপরটি শব্দ অধিক হইয়াছে। সংস্কৃতাংশে বামকেশ্বরতন্ত্র, রামকেশ্বর নহে। ২০৭ পৃঃ সংস্কৃতাংশে "বিতরতু পরিশুদ্ধিং চেতসঃ সা বলা বঃ" এইরূপ হইবে। ২০৮ পৃঃ ৩য় লাইনে "হব্যবহা ও কব্যবহা" এমত হইবে। ২৪ লাইনে "ঔ পঞ্চাবয়ব সংস্কৃষ্ট" এমত হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ কল্প

প্রথম ভাগ।

জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০।

৯১০ সংখ্যা　　　　১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

অনন্ত ও অমৃতের উপলব্ধি।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

একটী বৎসর এসেছিল, একটী বৎসর চলে গেল। আর একটী নূতন বৎসরের অভ্যুদয় আমরা দেখতে পাচ্ছি। নববর্ষের আশাভরসা উৎসাহের অরুণ কিরণ আমাদের নয়নকে মুগ্ধ করে ফেলছে।

এই যে একটী বৎসর এল আর চলে গেল,—কোথায় গেল? এক একটী মুহূর্ত্ত আসছে আর যাচ্ছে—কোথায় যাচ্ছে? বৎসরের পর বৎসর এসেছে আর চলে গেছে—এমন লক্ষকোটি বৎসর এসেছে আর চলে গেছে—কোথায় গেছে? আমরা বলি বটে, এই সকল অতীত মুহূর্ত্ত, অতীত বৎসর অনন্ত কালসাগরে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু এই কথার প্রকৃত তত্ত্ব আমরা প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করতে পারি কিনা সন্দেহ। যে কালের সাগরে কোটী কোটী বৎসর অনায়াসে প্রবেশ করছে, তার কাছে আমাদের এক বৎসর, ১০০ বৎসর, ২০০ বৎসর, ১০০০ বৎসর, ২০০০০ বৎসরই বা কতটুকু? একটী পরমাণুরও সমান নয়। অনন্ত কালের কাছে আমাদের জীবন এত ক্ষুদ্র যে, কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা দিয়ে সে ক্ষুদ্রতা বোঝাবার উপায় নেই। একদিকে কালের সাগরে লক্ষকোটি বৎসর অনায়াসে প্রবেশ করছে, অপরদিকে সেই অনন্ত কালসাগরের কুক্ষি হতে লক্ষকোটি বৎসর উৎপন্ন হচ্ছে, কালের অতীত হয়ে কালের কাল মহাকাল সেই অনন্ত পুরুষের মধ্যে আপনাকে না ডুবিয়ে দিলে সে তত্ত্ব আমরা ঠিক বুঝতেই পারব না।

সেই কালের কাল মহাকাল অনন্ত পুরুষকে জেনে তাঁতে ডুবতে হবে। তাঁকে জানবার জন্য আমাদের দূরে যেতে হবে না। কেবল এক মনে আমাদের অন্তরের দিকে আত্মার প্রতি দৃষ্টি করলেই আমরা তাঁকে দেখতে পাব, জানতে পারব। সীমার মাঝে অসীম পুরুষকে দেখবার ক্ষমতা, কালের মধ্যে মহাকালকে জানবার ক্ষমতা, মৃত্যুর মাঝে অমৃতস্বরূপকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা করুণাময় পরমেশ্বর নিজেই আমাদের আত্মার অন্তরে মুদ্রিত করে রেখে দিয়েছেন। এই ক্ষমতা যে আমাদের অন্তরে আছে, সেটা কাউকে বলে দিতে হবে না। আমরা যে চোখ দিয়ে দেখতে পাই, আমাদের কানে যে শোনবার ক্ষমতা আছে, সে কথা কি কাউকে বলে দিতে হয়? সেই রকম আমরা স্পষ্টভাবে ধরতে পারি আর না পারি, প্রাণের ভিতরে এমন একটা শক্তি আছে, যে শক্তির বলে সীমার ভিতর থেকেই অসীমের ভাব, মৃত্যুর ভিতর থেকেই অমৃতের আভাস আমাদের আত্মার অন্তরে জেগে ওঠে। এই ভাব, এই ক্ষমতা আমাদের অন্তরে আছে বলেই জগতে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি সম্ভব হয়েছে। একই সীমার ভিতর চিরকাল বদ্ধ থাকতে বাধ্য হোলে উন্নতির নামগন্ধও থাকতে পারত না। মৃত্যুর

* আদিব্রাহ্মসমাজে চৈত্র সংক্রান্তির উপাসনা উপলক্ষে বিবৃত।

অতীত কোন কিছুর আভাস অন্তরে চিরনিহিত না থাকলে মানুষের প্রাণে অমর হবার আকাঙ্ক্ষা, অমৃতস্বরূপকে জানবার কথা, এ সব কোন কিছু উঠতেই পারত না।

সেই অনন্তপুরুষ আমাদের অন্তরে সীমার মধ্যে তাঁর অসীমভাব বোঝবার ক্ষমতা দিয়েই নিরস্ত হননি; যাতে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে সহজে অসীমভাব বুঝতে পারি সেই কারণে এই আকাশে তাঁর অনন্তত্বের ছাপও দিয়ে রেখেছেন। ভেবে দেখলে, এই আকাশ কি, তা আমরা কেউই বলতে পারিনে। এই আকাশের সীমাও আমরা নির্দ্দেশ করতে পারিনে। কিন্তু আমরা এই আকাশকে ভাগ-ভাগ করে দেখতে পারি বলে, আর সেই রকম ভাগ-ভাগ করে দেখবার সময় যতই এগোতে থাকি ততই এগিয়ে যাবার অবসর পাই বলে, অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে এই আকাশের কোথাও একটা অভাব খুঁজে পাইনে বলে, সীমার ভিতরে অসীমের আভাস পাই। সেই সঙ্গেই এটাও বুঝতে পারি যে, এই আকাশের সীমা আমরা ধরতে না পারলেও, আকাশের অতীত এমন এক পূর্ণপুরুষ আছেন, যাঁর চোখে আকাশের সীমা লুকিয়ে থাকতে পারে না; যিনি সমস্ত আকাশে এবং আকাশ ছেড়েও যদি কিছু থাকে তবে তাতেও ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। সেই অনন্ত পুরুষ যে কি ভাবে আকাশে ওতপ্রোত হয়ে আছেন, কি রকম অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন, প্রকৃতিতে সমস্ত আকাশে ঈশ্বরের ব্যাপ্তি হতে তার সামান্যমাত্র আভাস পাই। এই রকমে এই ছোট স্থানের সীমার ভিতর দিয়েও সেই অনন্ত পুরুষের মহান বিরাট ভাব আমাদের প্রাণের ভিতর জেগে ওঠে। এইখানেই আমরা বলতে গেলে বিন্দুর ভিতর দিয়ে সিন্ধুর উপলব্ধি করতে পারি।

যেমন এই আকাশের বা স্থানের সীমার মধ্যে অনন্ত পুরুষের অসীম ভাব বুঝতে পারি, তেমনি কালেরও সীমার ভিতর দিয়ে সেই মহাকালের অনন্ত ভাব জানতে পারি। এই কালকে যে আমরা সীমাবদ্ধ ভাবে ভাগ-ভাগ করে দেখতে বাধ্য, প্রকৃতি সূর্য্যচন্দ্রের নিয়মিতভাবে উদয়াস্তের ব্যবস্থা করে দিয়ে সেটা যেন স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আবার সেই সীমার ভিতর দিয়েই আমরা সেই মহাকালকে উপলব্ধি করতে পারি। এই রকম উদয়াস্ত কতদিন গিয়েছে, আমরা তা কি ভেবে উঠতে পারি? অতীতের দিকে দৃষ্টি করে যতই কেন পিছিয়ে যাই না, তার তো কোন কিনারাই পাইনে। যে সময় আমাদের পৃথিবী জন্মগ্রহণ করে নি, সে সময়েও সূর্য্য কত কোটী কোটী বৎসর অন্য কোন সূর্য্যের চারধারে ঘুরে নিজের উদয়াস্ত ঠিক করেছিল, সে কথা ভাবতে গেলেও বুদ্ধি কল্পনা সমস্তই হার মানে। আবার সামনের দিকে এগিয়ে কালের বিস্তৃতি যতই ভাবতে থাকি, কোথাও তো তার সীমা খুঁজেই পাইনে। এ কথা তো মনেই করতে পারিনে যে যে কালের ধ্বংস হয়েছে—কাল আর নেই। এই রকমে কালের সীমার ভিতর দিয়েই আমরা মহাকালের মাঝে অসীম ভাবের আভাস পাই। আর সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারি যে, সেই মহাকালের অতীত এমন এক পূর্ণপুরুষ আছেন, যাঁর দৃষ্টির কাছে কালের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই উন্মুক্ত হয়ে আছে।

এই আকাশের ভিতর দিয়ে, এই কালের ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত পুরুষকে দেখা দূর করে দেখা। তাঁকে আসলে দেখতে গেলে আত্মার ভিতর দিয়েই দেখতে হবে। আত্মার ভিতরে তাঁকে এত স্পষ্ট দেখা যায় যে, ঋষিরা সেই অনন্তদেবকে পরমাত্মা এবং আত্মার আত্মা বলেছেন, আর আত্মাকে পরমাত্মার হিরণ্ময় কোষ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন বলে উল্লেখ করেছেন।

যেমন আমরা আকাশ বা কাল আসলে কি জিনিস তা বলতে পারি নে, অথচ বুঝি জানি যে আকাশও আছে, কালও আছে; তেমনি আত্মা যে আসলে কি জিনিস তা বলতে না পারলেও বুঝি জানি যে আত্মা আছে। আত্মার স্বরূপ হোল "আমি" বলে নিজেকে জানা। আমরা বেশ জানি যে, আমাদের ভিতরে আমি বলে একটা জিনিস আছে, যেটা শরীর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অথচ শরীরকে অবলম্বন করে অনেক কাজ কর্ম্ম করে। এই শরীরের ভিতর আত্মা যে কখন এল, আর কখন্ যে এই শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে; সূক্ষ্মতম পরমাণুর

বিষয় আলোচনা করবার সময় আত্মা তার ভিতর অনুপ্রবেশ করে, কিম্বা সুদূরতম নক্ষত্রের বিষয় আলোচনা কালে সে পর্য্যন্ত আত্মা নিজেকে সম্প্রসারিত করে দেয়, এ সমস্ত কিছুই ঠিক করে আমরা বলতে পারি নে। কিন্তু এইটুকু জানি যে আত্মা আছে, আত্মা দেখে, শোনে এবং সেই সঙ্গে সে জানে বোঝে যে, সে-ই দেখছে, শুনছে।

আমাদের আত্মা যে সীমাবদ্ধ, ঐ যে আত্মা নিজের পূর্ব্বাপর জানতে পারে না, তা থেকেই তো বেশ বোঝা যায়। তা ছাড়া আমরা একের বেশী চিন্তাও একই সময়ে করতে পারি নে, একের বেশী জ্ঞানও একই সময়ে অর্জ্জন করতে পারি নে। একটীর পর একটা ধোরে ধাপে ধাপে আত্মাকে উঠতে হয়। আমার ছাড়া আমার মতো কত লক্ষ কোটী আত্মা জগতে বিচরণ করছে—প্রত্যেকের একটা না একটা বিশেষত্ব আছেই। এই খানেই তো আমাদের আত্মার সীমার ভাব বুঝতে পারছি, অথচ ঠিক কোথায় তার সীমা তা ধরবার কোন উপায় নেই।

আত্মা সীমাবদ্ধ হলেও সীমার ভিতর দিয়েই সেই অসীম অনন্ত পুরুষকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারে। ঐ যে আত্মা ধাপে ধাপে জ্ঞানের পথে ইচ্ছার পথে চিন্তার পথে উঠতে থাকে, তার তো কোনই সীমা পাওয়া যায় না। হঠাৎ কোন জ্ঞানের ভিতর ঢুকতে চাইলে সে বাধা পেতে পারে বটে, কিন্তু ধাপে ধাপে চলে গেলে তার কাছে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার অনন্ত কর্ম্মের রাজ্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত আছে। এইখানেই সে সীমার ভিতর দিয়েই অসীমের উপলব্ধি করতে পারে। এই অসীমের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারে যে এই অনন্ত জ্ঞানের পশ্চাতে অনন্ত কর্ম্মের পশ্চাতে এক জ্ঞানময় ইচ্ছাময় পূর্ণ পুরুষ আছেন, যাঁ থেকে এই সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের স্রোত অবিরল ধারে নেমে আসছে।

আত্মা সেই পরমাত্মাকে নিজের জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছার ভিতরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে বলার চেয়ে আত্মা পরমাত্মাকে স্পর্শ করতে পারে, ছুঁয়ে থাকে বলাই বেশী ঠিক। পরমাত্মাকে স্পর্শ করবার শক্তি তিনি নিজেই আত্মাতে দিয়ে রেখেছেন। আত্মা নিজেই জানতে পারে যে, সে পরমাত্মার সঙ্গে সমধর্ম্মী। আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুনের সঙ্গে একই ধর্ম্ম একই গুণবিশিষ্ট, সূর্য্যের একটা রশ্মি যেমন সূর্য্যের সঙ্গে আসলে সমধর্ম্মী, আত্মাও সেই রকম পরমাত্মার সঙ্গে সমধর্ম্মী। আত্মা কেমন করে পরমাত্মার সঙ্গে সমধর্ম্মী হোল, তা সে জানে না; কিন্তু সে প্রকৃতিতে যে অনন্ত পুরুষের বিরাট জ্ঞান, বিরাট ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দেখতে পায়, সে বুঝতে পারে যে তার নিজের ভিতরে যে জ্ঞান, যে ইচ্ছাশক্তি আছে, সেই জ্ঞান, সেই ইচ্ছাশক্তি ঐ বিরাট জ্ঞান, ঐ বিরাট ইচ্ছাশক্তিরই অনুরূপ, একই ধর্ম্ম বা গুণবিশিষ্ট। তাই সে চেষ্টা করলে পরমাত্মাকে জেনেশুনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারে, তাঁকে স্পর্শ করতে পারে।

আত্মা পরমাত্মাকে যেমন অনন্তপুরুষ বলে উপলব্ধি করে, তেমনি তাঁকে অমৃতস্বরূপ বলেও জানতে পারে। মৃত্যু যার আছে, ধ্বংস যার আছে, বিনাশ যার আছে, তারই তো সীমা রইল। কিন্তু অনন্ত পুরুষ যখন অনন্তস্বরূপ, তখন তাঁর সীমা কোথায়, মৃত্যু কোথায়? আত্মা সেই পরমাত্মাকে কেবল জ্ঞানে অমৃতস্বরূপ জেনে ক্ষান্ত হয় না, কিন্তু নিজের অন্তরে সেটা উপলব্ধি করতে চায়, আর উপলব্ধি করতে পারে। আত্মা নিজে অমরণ-ধর্ম্মা বলেই সেই অমৃতস্বরূপের সহবাস উপভোগের শক্তি ধারন করে। যাতে আমরা প্রকৃতি থেকে অনন্তভাব সহজে বুঝতে পারি, সেই জন্য যেমন অনন্তস্বরূপে পরমেশ্বর আকাশে কালে তাঁর অনন্তভাবের ছাপ দিয়ে রেখেছেন, তেমনি তাঁর অমৃতভাবও প্রকৃতি থেকে সহজে উপলব্ধি করতে পারব বলে প্রকৃতির শক্তি ও বস্তু সকলকে আমাদের ধ্বংস করবার শক্তির অতীত করে দিয়ে প্রকৃতিতে তাঁর অমৃতভাবের ছাপ দিয়ে রেখেছেন। বিজ্ঞান সপ্রমাণ করে দিয়েছে যে, কোন শক্তির ধ্বংস বিনাশ বা মৃত্যু নেই—তাদের আকার পরিবর্ত্তন হোতে পারে। উত্তাপ থেকে তড়িত হোতে পারে, তড়িৎ থেকে উত্তাপ হোতে পারে, কিন্তু তড়িত বা উত্তাপ, কোন শক্তিরই একটী বিন্দুও নষ্ট হোতে পারে না। সেই রকম একটী পরমাণুকেও ধ্বংস করবার শক্তি আমাদের নেই।

একটা পরমাণুও ধ্বংস করতে পারলে সমস্ত ধ্বংস করবার ক্ষমতা আমাদের থাকত। যখন একটা পরমাণুর, একটা শক্তিরও মৃত্যু বা ধ্বংস হোতে পারে না, তখন যে আত্মা ইচ্ছার বলে বিশ্বজগত পরিচালনের ধ্রুব অপরিবর্তনীয় নিয়মের জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারে, যে আত্মা ইচ্ছার বলে অমৃত পুরুষের সহবাস লাভ করতে পারে, সে আত্মারও যে সত্যি সত্যি মৃত্যু নেই, ধ্বংস বা বিনাশ নেই, সে কথা আর দুবার করে বলতে হবে না।

মৃত্যুই যদি নেই, তবে ভগবানের কাছে মৃত্যু হোতে অমৃতস্বরূপে নিয়ে যাবার প্রার্থনা কেন? আমরা মৃত্যু কাকে বলি? একটুখানি ভেবে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব যে, পরিবর্তন হচ্ছে বলে না জেনে পরিবর্ত্তনকেই আমরা মৃত্যু বলি। একটা গাছের মৃত্যু হোল যখন বলি, তার অর্থ এই যে, সেই গাছটা যে ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, যে ভাবে হেলে দুলে ধরিত্রীর বুক থেকে আহার সংগ্রহ করছিল, মৃত্যুর পরে আর সে ভাবে কোনই কাজ করে না; তাছাড়া তার শরীরের আকারে প্রকারেও অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে অথচ আমাদের মনে হয় যে, সে এই পরিবর্ত্তনের কথা জানে না জানতে পারে না। কিন্তু তার তো একেবারে বিনাশ হয়নি। এই পরিবর্ত্তন বা মৃত্যুর মধ্যেও এমন একটা অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থ দেখা যায়, যার বলে সেই মৃত গাছের ধ্বংসাবশেষ থেকেও অন্যান্য প্রাণীরা জীবন ধারণ করে, নূতন নূতন প্রাণীর উদ্ভব হয়। এই রকম আমাদের শরীরেরও তার নিজের অজ্ঞাতেই প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু বা বদল হচ্ছে, কিন্তু তার ভিতর অবিনাশী আত্মা আত্মহারা হয় না—সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমি একজন আছি, এই জেনে স্থির হয়ে বসে থাকে। আত্মারও যে একেবারে পরিবর্ত্তন হয় না, সে কথা বলি কি করে? প্রতি মুহূর্ত্তে যে আত্মা জ্ঞান অর্জ্জন করছে, প্রেমে বর্দ্ধিত হচ্ছে, তাকে পরিবর্ত্তন বলব না তো কি বলব? কিন্তু এখানে পার্থক্য এই যে, আত্মা জানতে পারে যে তার এই বদল হচ্ছে, ঐ বদল হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও বুঝতে পারে যে, তার সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে এক অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুবসত্য কেন্দ্র হয়ে বসে আছেন। গীতা ঠিকই বলেছেন যে দেহী বা আত্মা অবিনাশী হলেও জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে নূতন নূতন জ্ঞানোজ্জ্বল, প্রেমোজ্জ্বল, ধর্ম্মোজ্জ্বল শরীর পরিগ্রহ করে।

কিন্তু আত্মার প্রাণের কথা এই যে, এইটুকু পরিবর্ত্তনও বা তার হবে কেন? তাই সে অনন্ত জ্ঞানের অনন্ত প্রেমের অধিকারী হয়ে অমৃতস্বরূপকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আমরা দেখি যে মানব জন্ম অবধিই মৃত্যুকে অতিক্রম করে' অমৃতত্বলাভের জন্য তৎপর। এই ভাব থেকেই সে শৈশব অবস্থায় নানাবিধ ভীষণ ভীষণ জীবজন্তু থেকে আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সেই আত্মরক্ষার চেষ্টা থেকেই সে বুঝতে পারল যে তার অমৃতত্বলাভ করবার পক্ষে অজ্ঞানই গুরুতর বাধা। তখন আবার মানুষ সেই অজ্ঞানের বাধা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য সচেষ্ট হোল। জ্ঞানের পথে এগোতে এগোতে প্রকৃতির উপর যথেষ্ট আধিপত্য বজায় করলেও সে স্পষ্টই বুঝতে পারল যে পার্থিব বিষয়ের জ্ঞান তাকে প্রকৃতির উপর আধিপত্য দিলেও তাকে অমর করতে পারে না, মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে না, কেননা এ জ্ঞানের কারবারই হোল মৃত্যুকে নিয়ে। প্রতিপদে মৃত্যুকে দেখে দেখে যখন সে মৃত্যুর উপর বিরক্ত হয়ে উঠল, মৃত্যুর সঙ্গে খেলার উপর তার প্রাণের একটা ঘৃণা এল, তখনই সে দেখতে পেল যে, এই শত মৃত্যুর মধ্যেও অমৃতপুরুষ শান্তিজল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তখনই সেই অমৃতপুরুষকে পাবার জন্য তার প্রাণ কেঁদে উঠল। তার প্রাণের ভিতর একটা গভীর-গম্ভীর প্রশ্ন ফুটে উঠল—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং—যাতে আমি অমর না হই, তা নিয়ে কি করব? তার প্রাণের ভিতর একটা পাগলের কান্না এসে জুটল; সে নিজের মনে বলতে লাগল—চুলোয় যাক আমার ঘরবাড়ী, চুলোয় যাক আমার টাকা কড়ি; খাক পড়ে' আমার স্ত্রীপুত্র, থাক পড়ে' আমার বাপ মা ভাইবোন বন্ধুপরিজন; আমি এ সমস্ত নিয়ে মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে থাকতে চাইনে—আমি চাই আমার সেই জীবনবল্লভ প্রাণনাথকে, যাঁর সহবাসে আমি মৃত্যুকে

অতিক্রম করতে পারব, মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

এই রকম করে' মানুষ ক্রমেই, যিনি সকল মঙ্গলের নিদান, সমস্ত উন্নতির মূল, সেই অমৃতপুরুষের সহবাসলাভের জন্য এগিয়ে গিয়ে উন্নতির শিখরে উঠতে থাকে। উপনিষদের সময়ে এই অমৃতপুরুষকে পাবার জন্য প্রার্থনার ভাব ভারতবাসীর মনে খুবই সজাগ হয়ে উঠেছিল, তাই সে সময়ে ভারতের যে উন্নতি হয়েছিল তার তুলনা কোথায়? এই প্রার্থনার ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালেও আর এক আকারে সমুদয় ভারতভূমিকে ছেয়ে ফেলেছিল, তাই সে সময়েও ভারতের যে কি অসাধারণ উন্নতি হয়েছিল, তা শিক্ষিত ভারতবাসীকে বিশেষভাবে বলবার প্রয়োজন দেখিনে। এই দুই যুগে ভারতের মনীবিগণ যে সকল আশ্চর্য্য সত্যতত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, আজও সমগ্র জগত অবনতমস্তকে সেগুলি গ্রহণ করে কৃতার্থ হচ্ছে।

গত বৎসর দুঃখ শোক, মহামারী, অন্নবস্ত্রের দুর্ভিক্ষ, মহাসংগ্রামে লক্ষ লক্ষ প্রাণীহত্যা আমাদের চোখের সামনে মৃত্যুর জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল—প্রতি পদক্ষেপে প্রাণ কেঁদে উঠে বলেছিল, এই মৃত্যুর প্রতিকৃতি সংসারকে আমি চাইনে—চাই সেই অমৃতপুরুষকে, যাঁকে পেলে মৃত্যু আর আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। জগতের প্রাণ সেই অমৃতপুরুষকে চেয়েছিল বলেই ন্যায়ের ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার উপায় হোল, শান্তিস্থাপনের সূচনা হোল। জগতের প্রাণের অন্তরে অন্তরে অমৃতপুরুষকে পাবার প্রার্থনা জেগে উঠেছিল বলেই কোথায় রুষিয়া, আর কোথায় আমেরিকা, যে সুরাপান মানুষকে ভগবান থেকে দূরে নিয়ে যায়, সেই সুরারাক্ষসীকে এক মুহূর্ত্তে নির্ব্বাসিত করে দিল!

চারদিকে চোখ কান খুলে চল্লে বেশ বোঝা যাবে যে, এই দরিদ্রতম ভারতেরও অধিবাসীদের প্রাণের ভিতর থেকে সেই অমৃতপুরুষকে পাবার জন্য এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। এই আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠবার কারণেই আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে দুর্ভিক্ষ মহামারীর ভিতর থেকেও ভারতবাসী মঙ্গলের পথে উন্নতিরই পথে দ্রুতগতিতে ছুটে চলবে। দারিদ্র্য দূর করবার উপায়, মহামারীর প্রতিবিধানের পথ সেই অনন্তমঙ্গল পরমেশ্বরই আমাদিগকে দেখিয়ে দেবেন। নববর্ষের মুখে তিনিই আমাদিগকে অভয় দিচ্ছেন—আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি, তিনি মাভৈঃ মাভৈঃ বলে আমাদের সমস্ত অমঙ্গল দূর করবার জন্য ভারতবর্ষে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেখ চেয়ে, তিনি একদিকে পিতার মূর্ত্তিতে আমাদের বর্ম্মদুর্গ হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত অমঙ্গল, সমস্ত অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করছেন, আর একদিকে তিনি মায়ের মূর্ত্তিতে আমাদের কোলে নিয়ে সমস্ত আঘাতে শান্তিজল ছিটিয়ে কঠিন ব্যথাও দূর করে দিচ্ছেন।

এস এই বৎসরের শেষে, নববর্ষের প্রারম্ভে তাঁকে হৃদয়ে রেখে পুরাতনের দুঃখশোক সমস্ত দূর করে' দিয়ে নববর্ষের নূতন আশাভরসা নূতন জ্ঞান প্রেম অবলম্বন করে নিজেকে উন্নতির পথে অমৃতলাভের পথে পরিচালিত করে দিই। মৃত্যুরও বিভীষিকাতে আমাদের ভয়ের কারণ নেই—সেই আত্মার আত্মা পরমাত্মা অমৃতভাণ্ড নিয়ে আমাদের অন্তরেই সর্ব্বদা জাগ্রত হয়ে আছেন।

মহাভারতীয় নীতিকথা।

আদিপর্ব্ব।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

কুরূপ আত্মদৃষ্টি। কুরূপ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আদর্শমণ্ডলে আপন মুখমণ্ডল না দেখে ততক্ষণ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান বোধ করে; কিন্তু যখন আপনার বিকৃত মুখ-শ্রী নিরীক্ষণ করে তখন আপনার ও অন্যের রূপপ্রভেদ জানিতে পারে।

বাচালতা। যে অধিক বাক্যব্যয় করে, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে।

মূর্খ। যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষ মাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ মূর্খ লোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে শুভ কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে।

পণ্ডিত।

হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে শুভই গ্রহণ করেন।

সজ্জন ও দুর্জ্জন।

সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হয়েন, কিন্তু দুর্জ্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়।

সাধু ও অসাধু।

সাধু ব্যক্তিরা মান্য লোকদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে।

সাধু ও অসাধু।

অদোষদর্শী সাধু ও দোষৈকদর্শী অসাধু উভয়েই সুখে কালাতিপাত করে, কারণ অসাধু সাধু ব্যক্তির নিন্দা করে কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধু কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহার নিন্দা করেন না।

(সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়—৩২৮।৯।

সত্য।

শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা এক পুত্রোৎপাদন শ্রেষ্ঠ, এবং শত শত পুত্রোৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যদিকে এক সত্য রাখিয়া তুলা করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। সমুদায় বেদ অধ্যয়ন ও সর্ব্বতীর্থে অবগাহন করিলে সত্যের সমান হয় কি না সন্দেহ। যেমন সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্টও আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্যই পরব্রহ্ম; সত্যপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। (ঐ ৩৩০।

কাম।

কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত ঘৃতসংযুক্ত বহ্নির ন্যায় উহা ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

কাম।

যদি একজনে এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর সমুদায় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট, অতএব শান্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প।

অনিষ্ট না করা। লোক যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা না করে তখন ব্রহ্মতুল্য হয়।

গুরু।

সত্যফলপ্রদ নিধির নিধিস্বরূপ ও পরম পূজনীয় গুরুদেবকে যে ব্যক্তি আদর না করে, সেই পাপিষ্ঠ ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পরলোকে নিরয়গামী হয়। (ঐ ৩৪৭।

কর্ম্মফল। আপনার সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সকলে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। (ঐ ৩৫৪।

ক্ষমা।

যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই সচরাচর বিশ্ব তাঁহারই আয়ত্ত।

ক্রোধ।

সাধুলোকেরা অশ্বরশ্মিগ্রাহীকে সারথি না বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন তাঁহাকেই যথার্থ সারথি বলেন।

ক্ষমা।

যিনি উদ্রিক্ত ক্রোধানলে ক্ষমাবারি সেচন করিতে পারেন, এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই জয় করা হয়।

উপেক্ষা।

যেমন সর্প নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন।

ক্রোধ।

যিনি ক্রোধাবেশ সম্বরণ পূর্ব্বক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপিত করেন না, তাঁহারই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্রোধ।

যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা-সেবা বা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, আর যিনি কাহারও উপর কথনই ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধী ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। (ঐ ৩৫৫।

তোষামোদ।

যে হতভাগ্য ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ লাভ-প্রত্যাশায় ধনীগণের উপাসনা করে বোধ হয় তদপেক্ষা তাহার মৃত্যু হওয়া উত্তম।

(সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৩৫৬।

অধর্ম্ম।

অধর্ম্ম আচরণ করিলে সদ্যই তাহার ফল দর্শে না বটে, কিন্তু পরিণামে সেই পাপপরায়ণ ব্যক্তি সমূলে বিনষ্ট হয়। যদিও অনুষ্ঠান-কর্ত্তার তাহার ফলভোগ না হয়, তথাপি তাহার পুত্র বা পৌত্রদিগকেও তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

(ঐ ৩৫৭।

পরনিন্দা।

যে সকল লোকেরা আচারব্যবহার ও কৌলীন্যাদি লইয়া সর্ব্বদা পরনিন্দা করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি সেই সকল পাপিষ্ঠ লোকের সংসর্গ করিবেন না আর যে স্থানে বাস করিলে, আচারব্যবহার ও কৌলীন্যাদির গৌরব থাকে সেইস্থানে বাস করাই শ্রেয়ঃকল্প।

(ঐ ৩৫৬।

মিথ্যা। সাক্ষ্যপ্রদানে বা বিচারস্থলে মিথ্যা কহিলেই মহাপাপে পরিলিপ্ত হইতে হয়। (ঐ ৩৬৮।

মিথ্যা। রাজাই প্রজাদিগের দৃষ্টান্তস্থল; মিথ্যা কহিলে রাজা অবশ্যই বিনষ্ট হন। (ঐ ৩৬৮।

দুর্ম্মতি ব্যক্তিরা যে আশা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে

আশা। যে ব্যক্তি ... পারে না এবং শরীর জীর্ণ হইলেও যে আশা জীর্ণ হয় না সেই প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ আশাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

(ঐ ৩৮০।

কাম। ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

(ঐ ৩৮০।

ক্রোধ। অক্রোধন ক্রোধ-পরায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ক্ষমাবান্ অক্ষমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; মানুষ অমানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান মূর্খ হইতে প্রধান। যে ব্যক্তি আক্রোশ করিবে তাহার উপর আক্রোশ না করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করাই কর্ত্তব্য, যেহেতু আক্রোষ্টা ক্রোধানলে মনে মনে দগ্ধ হইতে থাকে কিন্তু অনাক্রোষ্টা তাহার পুণ্যভাগী হয়। (সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৩৮৫।

বাক্য-বাণ। লোকের মর্ম্মপীড়ক ও নৃশংসবাদী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়।

বাক্য-বাণ। যে কথায় অন্যে উদ্বিগ্ন হয়, এমত কথা উচ্চারণ করা অনুচিত।

অর্থগ্রহণ। অর্থহীন ব্যক্তির নিকট প্রচুর অর্থ লওয়া অন্যায্য।

বাক্য-বাণ। যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক পরুষভাষী ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে।

ধর্ম্ম-লক্ষণ। জীবের প্রতি দয়া মৈত্রী দান ও মধুর বাক্য প্রয়োগ—ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না।

যাজ্ঞা। পূজ্য ব্যক্তির পূজা ও দান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যাজ্ঞা অতিশয় নিষিদ্ধ। (ঐ ৩৮৬।

পাপ। সৎকর্ম্মের প্রতিকূলতাই পাপ।

পাপ। পাপাসক্ত হইলেই নিরয়গামী হইতে হয়।

অতিহর্ষ। বহুধনের অধিপতি হইয়াও অতিমাত্র প্রফুল্ল হওয়া বিধেয় নহে।

দৈব। সুখ ও দুঃখ সকলই দৈবাধীন, স্বেচ্ছাক্রমে কেহ কখন সুখী বা দুঃখী হইতে পারে না, অতএব দৈবই বলবান এই বিবেচনা করিয়া কদাচ দুঃখে বিষণ্ণ বা সুখে উল্লসিত হইবে না। (ঐ ৩৮৮।৯।

ধর্ম্ম-সাধন। তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং দয়া এই সাতটী স্বর্গের দ্বারস্বরূপ।

মান ও অপমান। মানে হর্ষপ্রকাশ ও অপমানে সন্তাপ করিও না।

অহঙ্কার। অহঙ্কার অতি ভয়ঙ্কর, অতএব ইহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। (ঐ ৩৯৫।

যাচ্ঞা। বরং অভাবে প্রাণত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তথাপি যাজ্ঞাজনিত লঘুতাস্বীকার করা অনুচিত।

(সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৩৯৯।

স্ত্রী। স্ত্রীলোক সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করা মহতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। (ঐ ৪৮১।

ত্যাগ। যদি একজনকে পরিত্যাগ করিলে কুল রক্ষা হয় তাহা অবশ্যই করিবে। যদি কুল পরিত্যাগ করিলে গ্রাম রক্ষা হয় তাহা করা কর্ত্তব্য; গ্রাম পরিত্যাগ করিলে যদি জনপদ রক্ষা হয় তাহা করা উচিত এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যদি আত্মরক্ষা হয় তাহাও বিধেয়। (ঐ ৪৯৫।

কর্ম্মফল। যথেচ্ছাচারী দুরাত্মারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও আপন কর্ম্মদোষে অশেষবিধ দুর্গতি ভোগ করে। (ঐ ৫০৩।

দৈব। সমস্ত লোকই দৈব ও পুরুষকার অবলম্বন করিয়া চলে, তন্মধ্যে দৈবকে কালক্রমেই লাভ করিতে পারা যায়। (ঐ ৫২৩।

দৈব। দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়। (ঐ ৫৩৩।

বন্ধুতা। কাহারও সহিত চিরকাল বন্ধুতা থাকে না; হয় সর্ব্বসংহর্ত্তা কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত করেন নয় ক্রোধবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়।

বন্ধুতা। যেমন পণ্ডিতের সহিত মূর্খের ও শূরের সহিত ক্লীবের বন্ধুতা কদাচ হইবার নহে, তদ্রূপ ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; যাহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্যস্থাপন করা উচিত। (ঐ ৫৬৩।

রাজার দম্ভ। রাজার নিরবচ্ছিন্ন দম্ভ বা নিয়ত পৌরুষ প্রকাশ করা উচিত নহে। (সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৬১১।

রাজার কর্ত্তব্য। কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া নিঃশেষে তাহার সমাধা করা (রাজার পক্ষে) অতীব কর্ত্তব্য, কারণ অসম্যক্ উচ্ছিন্ন সামান্য কণ্টকও কালক্রমে ব্রণকর হইয়া উঠে। (ঐ ৬১১।

শত্রু। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও কোনক্রমে অবজ্ঞেয় নহে। কারণ সামান্য অগ্নিকণাও সমুদায় বন ভস্মসাৎ করিতে পারে। (ঐ ৬১২।

বশীকরণ। ভীতব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন, বীরের নিকট বিনয়ভাব, লুব্ধকে অর্থ দান, সম বা ন্যূন ব্যক্তিকে বল প্রকাশ করিয়া বশীভূত করিবে।

শত্রু। পুত্র সখা ভ্রাতা পিতা এবং গুরুও যদি শত্রুর ন্যায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তৎক্ষণেই তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবে।

গুরুর শাসন। যদি গুরুও অবলিপ্ত কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানশূন্য নিতান্ত নিন্দনীয় ও কুপথগামী হন তাহা হইলে তাঁহারও শাসন করা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে।

ক্রোধ। কোপাক্রান্ত হইয়া কখনও অন্যের অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না।

শত্রু। শান্ত বাক্য ধর্ম্মোপদেশ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা শত্রুকে আখণ্ড করিবে। (ঐ ৬১৭।৮।

পরোপজীবী। পরপিণ্ডোপজীবী লোকেরা সর্ব্বদা নরক ভোগ করে। (ঐ ৬২৭।

জাতি। যাহার কুলকলঙ্কস্বরূপ বিষম জ্ঞাতিবর্গ নাই, সে পরম সুখে কালযাপন করে। (ঐ ৬৫৫।

অঙ্গীকার। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি বিপদ কি সম্পদ সর্ব্বকালেই স্বকৃত অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়া থাকেন।
(ঐ ৬৭২।

ধর্ম্ম। যে কার্য্য করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহা কাহারও পক্ষে দুষণাবহ নহে।
(হিড়িম্ববধ পর্ব্বাধ্যায় ৬৭২।

কৃতজ্ঞতা। যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করে এবং যে পুরুষ অন্যে যে পরিমাণে উপকার করে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকার করিয়া তাহার প্রতিশোধ দেয় সেই যথার্থ পুরুষ। ঐ ৬৭৯।

অর্থ। অর্থপ্রাপ্তি নরকভোগের প্রধান কারণ।

অর্থ লাভাকাঙ্ক্ষায় যৎপরোনাস্তি দুঃখ আছে, অর্থলাভ তদপেক্ষাও দুঃখদায়ক। যদি অর্থের উপর একবার স্নেহ জন্মে তাহা হইলে অর্থনাশে দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। (বকবধ পর্ব্বাধ্যায় ৬৮০।১।

অর্থ। আপদ নিবারণের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, সেই ধন দ্বারা ভার্য্যা রক্ষা করিবে এবং কি ভার্য্যা কি ধন যাহা দ্বারা হউক আত্মরক্ষণে সর্ব্বথা যত্নবান হইবে। (ঐ ৬৮৯।

লোক। আত্মঘাতী পুরুষেরা কদাচ পুণ্যলোক লাভ করিতে পারে না। (চৈত্ররথ পর্ব্বাধ্যায় ৭৬৪।

দৈব। দৈবের প্রতিকূলাচরণ করা নরলোকের অসাধ্য।

অদৃষ্টের কল অখণ্ডনীয়। স্বেচ্ছানুসারে কেহ কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না।
(বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায় ৮২১।২।

দৈব। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে দৈবই শ্রেষ্ঠ। পুরুষকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।
(বিদুরাগমন পর্ব্বাধ্যায় ৮২৭।

কীর্ত্তি। কীর্ত্তিরক্ষণে যত্নবান হও।

কীর্ত্তিই মানবজাতির অসাধারণ বল।

কীর্ত্তিবিহীন মনুষ্যের জীবনধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

যদবধি কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে তাবৎ মনুষ্য সার্থকজন্মা।
(ঐ ৮৩৬।

শরণাগত। শরণাগত লোকদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই সাধুদিগের কার্য্য। (ঐ ৮৮৩।

বুদ্ধিমান। বিপৎকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান পুরুষ সর্ব্বদা জাগরূক থাকেন, বিপদকালে কদাচ ব্যথিত হন না।
(খাণ্ডবদহন পর্ব্বাধ্যায় ৯৩৯।

ভবিষ্যৎপ্রতীক্ষা। যে মূঢ় ব্যক্তি ভূতার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎ অবলম্বন করে, সে সমস্ত লোকের অবমানাস্পদ হয়।
(খাণ্ডবদহনপর্ব্বাধ্যায় ৯৪৫।

স্ত্রী। স্ত্রীলোকের পুরুষান্তর সেবন ও সপত্নীর সহিত বিবাদ করা অপেক্ষা পারত্রিক-বিনাশক বৈরাগ্নিদীপক ও উদ্বেগজনক আর কিছুই নাই।
(ঐ ৯৪১।

নীতি। অতিদীর্ঘ জীবন ভোগ করা অপেক্ষা জীবলোকে ক্লেশকর আর কিছুই নাই।
(চৈত্ররথ পর্ব্বাধ্যায় ৭৬৩।
ক্রমশঃ।

"আনন্দ-সন্ধ্যা নামে"

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

(বাহার।)

আজি আনন্দ-সন্ধ্যা নামে
পবন মুখর কর,—গানে!
এস মুখে লয়ে কম-কান্তি
এস অন্তরে লয়ে সুখ-শান্তি
এই তারা-ভরা আকাশে গানটি
ভরি লও তব প্রাণে!
আজি ফুটে ওঠ সন্ধ্যার কূলে—
দাঁড়াও রে অকূলের কূলে!
দূরে যাক্ মোহ, দূরে যাক্ ভয়
দূরে যাক্ ক্ষোভ, সব সংশয়
সুরে সুরে আজি, ভরুক হৃদয়
ছেয়ে যাক্ তানে তানে॥

পুরাতন ও নূতন।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

পুরাতন বৎসর কাটিয়া গেল। অনন্ত কাল-সাগরে একটী বুদ্‌বুদ বিলীন হইল। পুরাতন বৎসর তাহার সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তি লইয়া বিশ্রামের আশায় অনন্তের ক্রোড়ে ডুবিয়া গিয়াছে, আর নবীন প্রভাতের উজ্জ্বল আশা-আকাঙ্ক্ষার সুবর্ণ-রেখারঞ্জিত নববর্ষ পূর্ব্বাশার দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করিয়া আমাদের নয়নসম্মুখে সমুদিত হইতেছে। এই প্রকার কালচক্র অনন্তকাল ধরিয়া ঘুরিতেছে। এই কালবিঘূর্ণনে আমরা প্রতিদিন নিজেকে নূতন করিয়া অনুভব করিবার সুযোগ পাই। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উষার অস্ফুট অরুণ-আলোক আমাদিগকে নূতন সৃষ্টির আভাস প্রদান করে; কুসুমে কুসুমে সৌন্দর্য্যের নূতন বিকাশ দেখিতে পাই। দেখি—সমস্ত দিনের পর পুরাতন ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহার স্থানে দেখা দিয়াছে নূতন কুসুম—নববর্ণে, নব গন্ধে তাহার বিকাশ। প্রকৃতির মধ্যে এই নবীনতা এই সজীবতা রহিয়াছে বলিয়া আমাদের জীবন রমণীয় হইয়াছে। এই সজীবতা না থাকিলে আমাদের বদ্ধ জীবন দুর্ব্বিবহ হইয়া উঠিত। প্রতিদিন আমরা যেমন নিজেকে নূতন করিয়া অনুভব করি, বৎসরান্তে সেইরূপ আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলের সহিত মিলিত হইয়া একবার আমাদিগকে নূতন করিয়া অনুভব করিয়া লইতে হয়। শুধু আপনাকে লইয়াই মানুষের চলে না—পাঁচ-জনকে লইয়া যে মানবসমাজ মানবজাতি গঠিত হইয়াছে। তাই সমাজের জীবন, জাতির জীবন রক্ষা করিতে গেলে মধ্যে মধ্যে আমাদের একত্র হইয়া মিলিত জীবনকে অনুভব করিয়া লইতে হয়। আজ এই নববর্ষের প্রথম দিবসে আমাদের জীবনের আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতিকে মিলাইয়া লইতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন হইল আমাদের জীবনের আহ্নিক গতি, আর আমাদের সামাজিক জীবনই হইল আমাদের জীবনের বার্ষিক গতি। আজ নূতন বৎসরের প্রথম অভ্যুদয় দিবসে আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয়ভাবেই পুরাতনকে বিদায় দিয়া নূতনকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইব।

জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহের জন্য, জীবনের গতি-শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিলে আলস্য ও জড়তাকে পরিহার পূর্ব্বক পুরাতনকে বিদায় দেওয়া আবশ্যক হয়। ইহাই প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। পুরাতন যদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চিরবর্ত্তমান থাকিয়া আমাদের প্রাণের উপর দুর্ব্বহ পাষাণভার চাপাইয়া রাখে, তাহা হইলে তো আমাদের জীবন দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠিবে, আমাদের গতি মন্দীভূত হইয়া আসিবে, আমরা ক্রমে ক্রমে জড়ে পরিণত হইব।

বর্ত্তমান যুগে এক নূতন শক্তি, নূতন প্রেরণা আমাদের অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। জীবনের নবতর অভিব্যক্তির অভিমুখে আমরা ধাবিত হইতেছি। নির্জ্জীব পুরাতনকে লইয়া সে কর্ম্মের জগতে তো চলা যাইবে না। তাই পুরাতনের সহিত নূতনের যোগের কেন্দ্র স্থির রাখিয়া পুরাতনের নির্ম্মোক নির্ম্মমহৃদয়ে বিসর্জ্জন দিয়া নূতনের সঙ্গে আমাদিগের চলিতে হইবে। জানি, ইহাতে হৃদয়ে ব্যথা লাগিবে, প্রাণ ভাঙ্গিয়া যাইবে; তবু তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিতে হইবে—সে যে মৃত, প্রাণহীন; সে যে শুধু ভারবন্ধন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মধ্যে মোহের বন্ধন আছে, মুক্তির অমৃত নাই। তাই পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিয়া আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে।

কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নহে, সমগ্র জাতিরও জীবনে পুরাতনের নির্ম্মোক এই ভাবে বিসর্জ্জন দিয়া নূতন মন্ত্রের নবশক্তির দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। হইতে পারে, পুরাতন আমার অতি প্রিয় ছিল; হইতে পারে, পুরাতনের মধ্যে অনেক ভাল জিনিস আছে। কিন্তু সমস্ত পুরাতনটা যে জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, তাহা তো আমরা দেখিতেছি না। পুরাতনের মধ্যে অনেক ভাল জিনিস থাকিলেও তাহাকে লইয়া আমাদের জীবনযাত্রা আর চলিতে পারে না। আবশ্যক মনে কর, সেই সকল ভাল জিনিস পুরাতন হইতে সরাইয়া লইয়া নূতনের সঙ্গে গাঁথিয়া লও। কিন্তু যে সমস্ত পুরাতন প্রথা, সামাজিক বন্ধন অতীতকালের প্রয়োজন সাধন করিলেও বর্ত্তমানে উন্নতির প্রতিবন্ধক মিলনের প্রতিবন্ধক অভ্র-

ভেদী প্রাচীররূপে দাঁড়াইয়া আছে, আজ সেই অনিষ্টকর প্রথা ও বন্ধনসকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবার দিন আসিয়াছে। নির্ম্মমহৃদয়ে সেই প্রথাজীর্ণ বন্ধনশীর্ণ পুরাতনকে বিসর্জ্জন না করিলে নূতন জীবনীশক্তির প্রসন্নতা আমরা লাভ করিতে পারিব না। যুগযুগান্তর হইতে বন্ধনের উপর বন্ধন স্বীকার করিয়া আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে জীর্ণ করিয়া তুলিয়াছি। যুগযুগান্তর হইতে সঞ্চিত অন্ধ বিশ্বাসে আমাদের ধর্ম্মজীবন ধর্ম্ম-বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; ক্রিয়াকর্ম্ম সকল অর্থহীন শ্রদ্ধাহীন শব্দাড়ম্বরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমাদের জীবনপ্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিক নানাপ্রকার জঞ্জাল আবর্জ্জনায় ভরিয়া উঠিয়াছে; তাই আজ অকাল মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, অভাব, দৈন্য, হাহাকার চারিদিক হইতে আসিয়া আমাদের সমাজের রক্ত শোষণ করিয়া লইতেছে। মহাদেব যেমন সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, আমরাও আজ সেইরূপ পুরাতনের মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া বেড়াইতেছি, তাই আমাদের ক্রন্দন সার হইয়াছে, আমাদের অভাব দূর হইতেছে না; জীবনসংগ্রামে আমরা জয়লাভের উপযুক্ত বল পাইতেছি না। অমৃতের পুত্র হইয়া মৃত্যুকে আমরা চিরসহায় করিয়া লইতেছি, তাই জীবন লাভ করিবার নিমিত্ত যে সরসতা যে নবীনতার প্রয়োজন, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি; সমস্ত কল্যাণের মধ্যে আমরা কেবল অমঙ্গলেরই পরিচয় খুঁজিতেছি, মৃত্যুরই বিভীষিকা দেখিতেছি।

ওদিকে পৃথিবীর সমস্ত জাতি মৃত্যুর অগ্নি-পরীক্ষার ফলে নবজীবনের অমৃতরস পান করিয়া বিদ্বেষ-যজ্ঞ পরিসমাপ্ত করিয়া মহামিলনের মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চলিয়াছে; আমেরিকা সুরারাক্ষসীকে জাতীয় কল্যাণের পরম অন্তরায় জানিয়া চিরনির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে; সমগ্র জগত নবভাবে সংগঠিত হইবার পথে চলিয়াছে। এই নবজাগরণের তরঙ্গ ভারতবর্ষকেও আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের আর আলস্য করিবার অবসর নাই। নূতন প্রাণশক্তিকে লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিতে হইবে। নববর্ষ নূতন যুগের উপযোগী জ্ঞানধর্ম্মের ধারা লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত—আমাদের সকলের একতার বলে বলীয়ান হইয়া নববর্ষকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে হইবে। জগতের সমস্ত জাতির মিলনক্ষেত্রে ভারতেরও কার্য্য আছে। সেই কর্ম্মের অধিকার আমাদিগকে আপনার বলে অধিকার করিতে হইবে। বাণিজ্য, জড়বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির উন্নতি সাধনের ফলে পাশ্চাত্য দেশ বস্তুতন্ত্রকে পূর্ণতার দিকে লইয়া চলিতেছে। কিন্তু এই বস্তুতন্ত্রকে অধ্যাত্মতন্ত্রের অধীন করিয়া আনা, উভয় তন্ত্রের যথাযুক্ত সম্মিলন সাধন করাই আমাদের মুখ্য কার্য্য; ইহারই জন্য আজও ভারতবর্ষ জাগিয়া আছে। এ ভার আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন জাতিকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর দেখি না। ভারতের রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথ, সার জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি বরেণ্য মনীষীগণ উভয়তন্ত্রের যোগধারা বন্ধনের চেষ্টা করিয়াছেন। জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞানের সংযোগ সাধিত হইলেই বিশ্বে কল্যাণের কল্পতরু প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পূর্ব্বগগনে সূর্য্যোদয়ের আভাস আমরা ঊষার প্রথম অরুণ-আলোকেই পাইয়া থাকি। আমাদেরও সম্মুখে যে নূতন জীবন সমুপস্থিত, আজ তাহার আভাস আমরা চারিদিকেই দেখিতে পাইতেছি। নবযুগের নূতন মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া আমাদের হৃদয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। সেই নূতন মন্ত্র প্রভাতসমীরে চালিত হইয়া দিকে দিকে ভারতবাসীকে নবজাগরণের সংবাদ প্রদান করিতেছে। আজ তাই ভারতের মনীষীবৃন্দ জাতীয় জীবনের কলঙ্কমোচনে অগ্রসর; যুগযুগান্তরের সঞ্চিত দৌর্ব্বল্য ও ভীরুতা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। সেই নূতন মন্ত্র হইতেছে এই যে, ঈশ্বরকে জীবনের কেন্দ্র করিয়া সত্যকে অবলম্বন কর। সহিষ্ণুতা ও হৃদয়ের বলে জগতে অসাধ্য সাধিত হয়, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আমাদিগকে নববর্ষে নবজীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যাহা মিথ্যা, যে সকল প্রথা, ধর্ম্মবিশ্বাস সত্যের মুখোস পরিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইতে এবং আমাদের উন্নতির পথে বাধাপ্রদানে উদ্যত হয়, সেই সকল বাধা ও ভয় হইতে আমা-

দের অন্তঃকরণকে মুক্তি দিতে হইবে। সত্য রক্ষার জন্য ভারতবাসী যে জাতিনির্বিশেষে আত্মবলি দিতে অগ্রসর হইতেছে, সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতন ও ভ্রূকুটীকে তুচ্ছ করিয়া অধ্যাত্মশক্তির অনুপম বলের পরিচয় দিতেছে—ইহাই তো আমাদের নবজীবনের সূত্রপাত; এই শক্তিকেই জীবনব্যাপী কঠোর সাধনের দ্বারা প্রাণের ভিতর সঞ্চিত রাখিতে হইবে। অগ্নিদাহ্য পদার্থের ন্যায় অতীতের সকল তুচ্ছ বাধাবিঘ্ন নবজীবনের তেজে ভস্মীভূত হইয়া যাউক।

এই উন্নত মন্ত্র আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে সাধন করিলে চলিবে না, আমাদের সকলের মিলিতভাবেও ইহার সাধন করিতে হইবে। সুদূর অতীতের ঋষিগণ ভারতের শ্যামল শান্ত তপোবন হইতে মিলিতভাবে ঐ মহামন্ত্র সাধনের জন্য আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং—
এক সঙ্গে চলো, এক সঙ্গে কথা কও, তোমরা পরস্পরের মন জান। মিলিতভাবে সাধনা করিলে মন্ত্রশক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রেরণা আনয়ন করিবে। মিলিত সাধনা হইতেই আমরা সহজে ভূমা পরমেশ্বরের সংস্পর্শ লাভ করিব।

হে ভারতের দেবতা, আমাদের অন্তরে তোমার নাম চিরকাল ধ্বনিত হউক। সত্যের সাধন সার্থক হউক। হে কল্যাণময় পরমেশ্বর, তোমার বরপ্রদ দক্ষিণ হস্তকে আমাদের সহায়রূপে প্রেরণ কর। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে তুমি তোমার আসন প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার বলে আমাদিগকে বলীয়ান কর। এই দরিদ্র ভারতভূমি হইতে দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, দৌর্ব্বল্য বিদূরিত করিয়া সুভিক্ষ প্রেরণ কর। দৈন্য দৌর্ব্বল্য দূর হউক। তোমার জয়গান চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হউক।

সম্রাট্ অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা।

(শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী)

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

তিনি যে মঠে বাস করিতেন, তথায় অনেক ভিক্ষুণী বাস করিতেন। সকলেই অধ্যয়ন ও ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিতেন। ধর্ম্মরত ছাত্র ও ছাত্রীগণ যথায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক রাত্রিদিন অধ্যয়ন করেন, তাহার নামই মঠ। প্রত্যেক বৌদ্ধ মঠের ব্যয় সম্রাট স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেন। ছাত্রমঠের ও ছাত্রীমঠের ব্যয়ও বড় কম ছিল না। এক একটি মঠে দশ হাজার ছাত্র ও ছাত্রী থাকিতেন। তাঁহাদের অশন-বসন-ব্যয়ভার সম্রাট স্বয়ং বহন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে অশন-বসন-ব্যয় ভাবনা করিতে হইত না বলিয়া তাঁহারা স্বচ্ছন্দচিত্তে পড়িতে পারিতেন। সংঘমিত্রা যে মঠে থাকিতেন, সেই মঠে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য ধার্ম্মিক গৃহস্থ নরনারীগণ দলে দলে আগমন করিতেন। সংঘমিত্রার যশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সম্রাট-কন্যা হইয়া ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করায় অনেক ধনীকুলের ললনাগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা শোকদুঃখপূর্ণ নানা চিন্তাগ্রস্ত গৃহস্থজীবন যাপন করা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক ত্যাগধর্ম্ম অবলম্বনকেই মহাশ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া দলে দলে ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এবং বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপন ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া নারীকুলের কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন। শিক্ষিতা ধর্ম্মনিষ্ঠা নারীর দ্বারাই নারীকুলের কল্যাণ সাধিত হওয়াই উচিত। নারীর শিক্ষার জন্যই নারীকেই শিক্ষিত হইতে হয়। বৌদ্ধযুগে ও পৌরাণিক যুগে এই নীতিই প্রচলিত ছিল। অধুনা কালধর্ম্ম অনুসারে উহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

এইরূপে সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার যখন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, সেই সময়ে মহাস্থবির তিষ্যের আদেশে সিংহল দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ সংঘমিত্রা ও মহেন্দ্র, সম্রাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। সিংহলে যাইবার সময় তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃদেবীর চরণ দর্শনার্থ উজ্জয়িনীর অন্তর্গত বিদিশাগিরি বা চৈত্যগিরি নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ঐ স্থান বর্ত্তমান ভিলসার নিকটবর্ত্তী। তাঁহারা তথায় গমন করিয়া মাতৃদেবীর চরণকমলে প্রণাম করিলেন। দেবী পুত্র ও কন্যার বৌদ্ধ পরিব্রাজ-

বেষ্টিত হরিদ্রাবর্ণ বেশ ও কমনীয় সৌম্য তেজঃপুঞ্জময় আকৃতি অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্রাট্ কি তোমাদিগকে রাজভোগে বঞ্চিত করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন ?" তাঁহারা বলিলেন, "না, মা, পিতা আমাদের ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে আমাদের অভিরুচি জানিতে চাহিয়াছিলেন। পরে আমরাই তাঁহার অনুমতি লইয়া স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে এই ধর্ম্ম ও এইরূপ বেশ অবলম্বন করিয়াছি। তিনি বলপূর্ব্বক আমাদিগকে এই ধর্ম্ম ও এই বেশ গ্রহণ করান নাই"। দেবী এই কথা শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌম্যমূর্ত্তি ও সন্ন্যাসী বেশ দেখিয়া দেবী বিষাদের পরিবর্ত্তে আনন্দই অনুভব করিয়াছিলেন। অনেক দিনের পর দেবী পুত্র-কন্যার মুখাবলোকন করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। পাছে কোলাহলপূর্ণ নগরীতে থাকিলে তাঁহাদের শান্তি-ব্যাঘাত হয়, এইজন্য তিনি তাঁহাদের বাসের নিমিত্ত নগরীর প্রান্তভাগস্থ চৈত্যবিহার নামক প্রকাণ্ড মঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারা তথায় কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় যে কয়েক দিন ছিলেন, দেবী সেই কয়েক দিন গৃহ হইতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতেন। তাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বহুদিন রাজোচিত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করেন নাই বলিয়া দেবী পুত্র-কন্যাকে ও অন্যান্য ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণকেও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। তাঁহারা সংযমনিয়মাপেক্ষী হইয়া প্রথমতঃ ঐ সকল উত্তমোত্তম খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবীর আগ্রহাতিশয্যে অবশেষে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা যে কয়েক দিন উজ্জয়িনীতে ছিলেন, সেই কয়েক দিন নগরীর নরনারীগণ তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের উপদেশ শুনিবার জন্য সেই মঠে আসিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

তাঁহারা উজ্জয়িনীতে একমাসের অধিককাল বাস করিয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সিংহলে পৌঁছিলেন। সেই দিন সিংহলের রাজা দেবপ্রিয় তিষ্য চারি হাজার অনুচরের সহিত মৃগয়া করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন। রাজার অনুচরগণ একটু দূরে আসিতেছিল, এই সুযোগে মহেন্দ্র রাজাকে একাকী পাইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। এবং রাজার নাম ধরিয়া ডাকিলেন,—"ওহে তিষ্য, কোথায় যাইতেছ" ? এইরূপ রাজার নাম ধরিয়া ডাকাতে রাজা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং মহেন্দ্রের পরিচয়-জিজ্ঞাসু হইয়া মহা ঔৎসুক্যের সহিত মহেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কারণ, তিনি সিংহলের সম্রাট্; তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকে, এমন লোক কে আছে ? তাঁহার পিতা মাতা ছাড়া সিংহলে আর কেহই ছিল না। হরিদ্রাবর্ণবেশধারী একজন অপরিচিত যুবক—একটি সামান্য লোক তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিল, অথচ তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, এ লোকটা কে ? রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজাকে এইরূপ চিন্তান্বিত দেখিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, আপনার বিস্ময়ের বা ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি ভারতের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আগমন করিয়াছি। আমার সঙ্গে আমার ভগিনী ও বহু ভিক্ষু-ভিক্ষুণী আসিয়াছেন।

রাজা এই কথা শুনিয়া আপাততঃ স্থির হইলেন। তাঁহার বিস্ময়-ঔৎসুক্য আপাততঃ কিঞ্চিৎ উপশান্ত হইল। সেই সময়ে রাজার ও মহেন্দ্রের সঙ্গিগণ তথায় উপস্থিত হইল। রাজা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইঁহারা কে ? মহেন্দ্র বলিলেন, ইঁহারা আমার সেই সহচরগণ। ইঁহারা আপনার রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করিয়াছেন। রাজার ঔৎসুক্য উপশান্ত না হইয়া এক্ষণে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। তিনি পুনর্ব্বার মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের ভারতবর্ষে এই প্রকার বেশধারী লোক কতগুলি আছেন ?" মহেন্দ্র বলিলেন, "এই প্রকার বেশধারী লোকে ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন হইয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীতে বৌদ্ধের সংখ্যার সীমা নাই। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা হইতে বৌদ্ধের সংখ্যা অনেক বেশী। গৃহস্থাশ্রমীর সংখ্যার হ্রাস হইতেছে। কারণ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির আধি-ব্যাধি ও মৃত্যুভাবনায় লোক আর জর্জ্জরিত হইতে যাইতেছে না। সেইজন্য সকলেই ইন্দ্রিয়-

সংযম পূর্ব্বক ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, বা সাংসারিক বাসনার ত্যাগধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে। ভারতের লোক ইচ্ছা করিয়া নিজের চরণে নিজে কুঠারাঘাত করিতে আর ইচ্ছুক হইতেছে না। তাহারা দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইবার ভয়ে দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমী হইতে চাহিতেছে না। তাহারা ভগবান বুদ্ধদেবের অমূল্য উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া নির্ব্বাণমুক্তির পথে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে।” রাজা মহেন্দ্রের এই সকল কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। রাজার হৃদয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অপূর্ব্ব ভক্তিভাব উদিত হইল। তিনি মহেন্দ্রকে দৈবপ্রেরিত মহাপুরুষ ও সিংহলের মহোপকারক বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত ধনুর্ব্বাণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং মহেন্দ্রের চরণকমলে প্রণত হইলেন। তখন মহেন্দ্র বলিলেন, “আমরা মহাস্থবির তিষ্য ও সম্রাট অশোকের আদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ এখানে আসিয়াছি এখানে আসিয়াই আপনার সহিত সাক্ষাৎকার হওয়ায় ইহা একটা মহাসুলক্ষণ, এইরূপ বিবেচনা করিতেছি। ইহাতে ভবিষ্যতে কার্য্যসিদ্ধিই সূচিত হইতেছে।”

মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা ভারতসম্রাট অশোকের পুত্র ও কন্যা, এবং তাঁহারা সকলেই ভারতসম্রাট কর্ত্তৃক সিংহলে প্রেরিত হইয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া সিংহলরাজ তাঁহাদের সম্মান রক্ষার্থ তাঁহাদিগকে মহাসমাদর পূর্ব্বক নিজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। তথায় কোলাহলে তাঁহাদের শান্তিভঙ্গ হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া সিংহলরাজ একটি নির্জ্জন সুন্দর উদ্যান মধ্যে তাঁহাদের বাসস্থান ঠিক করিয়া দিলেন। তাঁহারা তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। সিংহলের নরনারীগণ তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ও তাঁহাদের অমূল্য উপদেশবাণী শুনিবার জন্য দলে দলে তথায় আগমন করিতে লাগিল। সংঘমিত্রার সুমধুর ধর্ম্মোপদেশবাণী শুনিয়া নারীগণ মুগ্ধ হইয়া গেল। সংঘমিত্রা একে রূপবতী সম্রাটকন্যা, তাহাতে আবার তিনি সুশীলা সরলহৃদয়া। ইন্দ্রিয়সংযমাদি ব্রত অবলম্বন করায় তাঁহার স্বাস্থ্য কমনীয়তা উজ্জ্বলতা স্নিগ্ধতা পবিত্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য লোকসংখ্যা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। সুতরাং সেই উদ্যানটি অপর্য্যাপ্ত বিবেচনা করিয়া সিংহলরাজ একটি বৃহত্তর উদ্যান তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। তাঁহারা তথায় বাস করিয়া অতি উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার প্রভাবে সিংহলের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। সিংহলের নরনারীগণ দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী ব্রত অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারা সেই সকল বিহারে বাস করিয়া অধ্যয়ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি সৎকার্য্য করিয়া জীবন সার্থক করিতে লাগিলেন।

সিংহলরাজকুমারী অনুলা ও তাঁহার সখীগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ও ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিলেন। ইহা দেখিয়া রাজ্যের অন্যান্য উচ্চ সম্ভ্রান্ত মহিলাগণও নশ্বর পার্থিব সুখভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক ভিক্ষুনীব্রত অবলম্বন করিলেন। সংঘমিত্রা সিংহলে এই ভিক্ষুনীসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া তাহার পুষ্টি সাধনার্থ রাত্রিদিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার পরিশ্রম সফল হইল। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সিংহল ভিক্ষু ভিক্ষুনীতে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। গৃহস্থাশ্রমীর সংখ্যা ক্রমেই কমিতে লাগিল। ক্ষণিক পার্থিব সুখভোগলালসায় মত্ত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণপথের পথিক হইতে লাগিল। মানবজীবনের সার্থকতা ও উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। সিংহলাধিপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারার্থ অক্লান্তভাবে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আনুকূল্যে ইহার দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল।

একদা রাজা ও তাঁহার কন্যা অনুলা সংঘমিত্রার নিকটে সবিনয় প্রার্থনা করিলেন, অয়ি পূজ্যতমে ধর্ম্মনেত্রি যে পবিত্রতম ত্রিভুবনবিশ্রুত বোধিবৃক্ষের স্নিগ্ধঘন পল্লবের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া ভগবান বুদ্ধদেব কোটি কোটি সূর্য্যের

প্রকাশ অপেক্ষা উজ্জ্বলতম দিব্যজ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং তৎপ্রভাবে নির্ব্বাণ মুক্তি পাইয়াছিলেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাদের ভারতের গয়াধামের সেই পবিত্রতম মঙ্গলময় মহাপূজ্য বোধিবৃক্ষের একটি মাত্র শাখা ভারত হইতে সিংহলে আনাইলে সিংহলের মহা-কল্যাণ সাধিত হইবে। সিংহল ধন্য ও পবিত্র হইবে। ঐ শাখা সিংহলে আসিলে উহা বিধি-পূর্ব্বক একটি পবিত্র স্থানে মহা সমারোহের সহিত রোপিত হইবে। হে ভক্ত-বৎসলে ধর্ম্মনেত্রি, আপনার কৃপায় ইহা অনায়াসেই সুসাধিত হইতে পারে। এই মহাসৎকার্য্যটি সুসম্পন্ন হইলে আপনার নাম পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অদ্ভুতকর্ম্মা সর্ব্বমিত্রা সংঘমিত্রা এইরূপে সিংহলরাজ কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া গয়া হইতে স্বয়ং এই পবিত্র বৃক্ষশাখা আনয়ন করিলে একটি পুণ্যতিথিতে মহাসমারোহের সহিত যথাবিধি উহা সিংহলের একটি পবিত্র স্থানে রোপিত হইল।

সংঘমিত্রার অসীম অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম ও মহতী চেষ্টায় সিংহলের মহিলাকুলের ধর্ম্মনীতি শিক্ষা-দীক্ষা উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিনি সম্রাটনন্দিনী হইয়া সামান্য ভিক্ষুনীবেশ ধারণ করিয়া ভীষণ সমুদ্র পথ অতিক্রম করিয়া বিদেশে গিয়া বিদেশীয় রাজার রাজ্যে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে স্ত্রীলোকের এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ভারত ছাড়া এরূপ স্ত্রীলোক কুত্রাপি জন্মে নাই। ভারতবর্ষ ছাড়া ঈদৃশী অদ্ভুত শক্তিশালিনী অসাধারণ ত্যাগশীলা মহিলা কুত্রাপি উৎপন্ন হয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস—যে কোন যুগের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলেও সংঘমিত্রার ন্যায় একটি মহিলার নাম দৃষ্ট হইবে না ও পৃথিবীর সমগ্র দেশে অতি উত্তমরূপে ভ্রমণ করিলেও এইরূপ মহিলার ন্যায় কোন জাতীয়া কোন একটি মহিলার নাম কদাপি শ্রুত হইবে না। ভারতের ন্যায় মহা-বিস্তৃত দেশের মহাশক্তিসম্পন্ন সম্রাটের কন্যা হইয়া তিনি যে প্রকার ত্যাগশীলতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা সচ্চরিত্রতা অকুতোভয়তা অদ্ভুত অধ্যবসায়শীলতা ও শক্তিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা একবার চিন্তা করিলেও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়, ভারতই এই প্রকার পুত্রকন্যা প্রসব করিতে পারে।

তাশ খেলা।

(কুড়ানো গান)

(রামদাস)

বৃথা ভবে খেলতে এলি তাশ—
ও তোর মন্ত্রী করলে সর্ব্বনাশ;
টেক্কার উপর নয় তুরুপ করে—
ও তুই এমনি বেহুঁস;
দশ দিলি ঘুস
গোলাম না মেরে;
হাতে কাগজ পেয়ে অবশ হোয়ে
ডাকলিনে ইস্তক পঞ্চাশ;
ছক্কালোভে পাঞ্জা দাও ছেড়ে;
ও তোর দোসরা খেলা টেক্কা মেরে
কাগজ লয় কেড়ে;
হাতের বত্রিশ কাগজ ফুরিয়ে গেল
রইল ভবের মায়ারাশ।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঁচ হৌর "মিশন্"-গৃহে চা-পানের ব্যাপার ও তাহা লইয়া ঘোঁট।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

১৮৯০ অব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে, সন্ধ্যাকালে সেণ্টমেরিজ কন্‌ভেণ্টে কোন এক উৎসব ছিল। সেই উৎসব উপলক্ষে মিশনরী লোকেরা শ-দেড়শো ভদ্র-লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তদনুসারেই কয়েক জন মহিলাকেও নিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল। আমরা স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া একশো জন ছিলাম। কেহ কেহ প্রবন্ধ পাঠ করিল, কেহ বা মুখে বক্তৃতা করিল। এই কাজ শেষ হইলে, জেনানা-মিশনের সিষ্টারেরা, নিজের হাতে চা আনিয়া নিমন্ত্রিত মণ্ডলীকে দিলেন। কেহ কেহ, এই সব মিশনরী-মহিলাপ্রদত্ত চায়ের পেয়ালা উহাদের মান রক্ষা করিবার জন্য গ্রহণ করিয়া তার পর নীচে রাখিয়া দিল; আবার কেহ কেহ পেয়ালা হাতে লইয়া চা পান করিল। আমরা যে দশ বারো জন স্ত্রীলোক ছিলাম আমাদের কাছে যখন চা আনা হইল, তখন উহা লইতে আমরা সকলেই অস্বীকার করিলাম।

যাক্। এই উৎসবের অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেলে, আমরা বাড়ী আসিলাম। তার দুই তিন দিন পরেই পুণার গোপাল বিনায়ক যোশীর স্বাক্ষরে এই কন্‌ভেন্টের সমস্ত বৃত্তান্ত ছাপা হইল, এবং শেষে পত্রপ্রেরকের স্বকীয় নিত্যকার স্বভাবানুসারে আসল ঘটনার কথা ছাড়িয়া দিয়া, তিনি অনেক কুৎসিৎ টীকা-টিপ্পনী করিয়া বলিয়াছেন যে, "এই রাওসাহেব ও রায় বাহাদুর সংমাজ-সংস্কারকেরা, প্রত্যক্ষ মাহারের হাতে-বানানো ও সাদা-রং মেম্‌দিগের টুকটুকে হাতের চা পান করিয়া মুখে তৃপ্তিসূচক চুক্ চুক্ শব্দ করিতে করিতে এবং উদ্‌গার উঠাইতে উঠাইতে বাড়ী চলিয়া গেলেন—এই ব্যাপার আমাদের পুণার সনাতন ধর্ম্মাভিমানী ও ব্রাহ্মণবৃন্দের ভাল লাগিবে কি? এই রাওসাহেব্ ও রাওবাহাদুর এঁরা বড় বড় রাজকর্ম্মচারী বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, ইঁহাদের বাড়ী গিয়া বৎসরে ৫।১০ বার করিয়া যারা অন্নধ্বংস করে ও দক্ষিণা পায় সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণেরা তাঁদের নাম কেন প্রকাশ করিবে? চুপ্ করিয়াই থাকিবে। গোপালরাও যোশীর মতো কোন নির্দ্ধন মনুষ্য আমেরিকা হইতে কিংবা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিল কি অমনি লোকে তার পশ্চাতে লাগিল। তার এক পংক্তিতে বসা দূরে থাক্ সে কথা মুখে আনিলেও পাপ হয়। তাকে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা উদ্ধার করিতেও কেহ স্বীকার পায় না। ওঁকে দূর হইতে জল পান করিতে দিলে কিংবা ওঁর সঙ্গে কথা কহিলেও অধর্ম্ম হয় এইরূপ বলিতে যারা প্রস্তুত আমাদের সেই ভিক্ষুমণ্ডলী ভাবিক ও খোসামুদে; তাই আজকাল সংস্কারের দল ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, প্রভৃতি অনেক কথাই লিখিয়াছিল।

প্রায় এই সময়েই আমাদের বাড়ী একটা ভোজের নিমন্ত্রণ হয়। ৪০।৫০ জন আহার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ; কিন্তু তাহার মধ্যে ডাক্তার বিশ্রামজী ঘোলে, রাওবাহাদুর নারায়ণ-ভাউ-দান্তেকর ও রায় বাহাদুর গণপত-রাও-মানকর, ইঁহারাই ব্রাহ্মণেতর ছিলেন। এই দিন গোপালরাও জোশীও আসিয়াছিলেন। তিনি তার পরদিনই আবার "পুণা-বৈভব" নামক সংবাদপত্রে আমাদের বাড়ীর ভোজের সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা কে কোন পংক্তিতে বসিয়াছিল এবং পংক্তিগুলি কি ভাবে সাজানো হইয়াছিল তাহার একটা সুস্পষ্ট নক্সাও দিয়াছিলেন। গোপালরাও স্বভাবতই উদ্যোগী পুরুষ হওয়ায়, আর কোন কাজ হাতে ছিল না বলিয়া, এই প্রকার কাজ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল। এই সব বিষয়ে তাঁর বুদ্ধি খুব খেলিত। স্বভাবত এই সব বিষয়ে ঘোঁট করিতেই তিনি ভাল বাসিতেন; এতেই তাঁর সন্তোষ ও আমোদ হইত, এই টুকুই যা তাঁর লাভ। নচেৎ সনাতন ধর্ম্মই বা কি, সমাজসংস্করই বা কি, তাঁর কাছে দুই-ই সমান। কারণ স্বভাবত তিনি না-হিন্দু-না-মুসলমান ছিলেন। সে যাক্।

ইহা ছাপা হইলে পর পুণার ভিক্ষু-ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থ-মণ্ডলীর মধ্যে যে রকম ঘোঁট চলিতে লাগিল, তাহাতে পুণার প্রসিদ্ধ বংশের শ্রীবলবন্ত-রামচন্দ্র নাতু এই কাজে অগ্রণী হইয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নিকট নালিস করিলেন। কিন্তু "পুণা-বৈভবে" লেখা বাহির হইবার পর এই মণ্ডলীর নিকট যখন কোন অস্বীকার-বাচক উত্তর আসিল না, তখন এই ভিক্ষুক ও গৃহস্থ মণ্ডলী একটা সভা ডাকা স্থির করিলেন। আমাদের পক্ষ হইতে এই সম্বন্ধে কোন অস্বীকার-বাচক প্রবন্ধ ছাপা হইবে বলিয়া দুই সপ্তাহ কাল তাঁহারা অপেক্ষা করিলেন; কিন্তু সেরূপ কিছু না হওয়ায় উক্ত মণ্ডলী, অমুক দিন সভা করিয়া পাঁচহৌদ মিশন-গৃহে যাঁহারা চা পান করিয়াছিলেন সেই ৫২ জন লোককে বহিষ্কৃত করিতে হইবে প্রভৃতি কথা লিখিয়া হস্ত-পত্র বিলি করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে সভা আহ্বান করিলেন এবং ৫২ ব্যক্তির মধ্যে ৪২ জনকে বহিষ্কৃত করিলেন। বাকী দশ জন উক্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে নিজে নিজে পত্র লিখিয়া বলিলেন—"আমরা পেয়ালা হাতে লইয়াছিলাম সত্য কিন্তু চা পান করি নাই"। এবং এইরূপ বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া রেহাই পাইলেন।

কিছু দিন পরে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য অভিযোগকারীর কথা মনে করিয়া, আপন-তরফ্ হইতে, বিচারপতির কাজে এক শাস্ত্রী বাবাকে পুণায় পাঠাইলেন। সেই শাস্ত্রী, পুণায় আসিলে পর অভিযুক্ত (চা-পানের জন্য) ব্যক্তিগণকে নোটিস্ দিলেন এবং তাহাতে আদেশ করিলেন, "তোমাদের যা বক্তব্য তাহা বলিবে"।

এই সম্বন্ধে শাস্ত্রী উপরি-উক্ত মণ্ডলীর তরফ হইতে কৈফিয়ৎ লইয়া তদন্ত আরম্ভ করিলেন। সেই তদন্তের কাজে বাল-গঙ্গাধর-টিলক ও রঘুনাথ-দাজী-নগরকর চা-পানকারীদের পক্ষের উকীল ছিলেন। অভিযোগকারীদের তরফে পুণার অন্য পক্ষের অভিমানী প্রসিদ্ধ উকীল নারায়ণ-বাবুজী কানিট্‌কর ছিলেন। এইরূপ এই চা-পান-ব্যাপারের তদন্ত আরম্ভ হইল। সহরে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ এইরূপ দুই দল উৎপন্ন হইল। ইহার দরুণ, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং তাহাদিগের অপেক্ষাও অধিক আমার শ্বশুরবাড়ীর ও বাপের বাড়ীর মেয়েরা একেবারে হুলস্থূল বাধাইয়া দিল। এইরূপ হইবার পর, একদিন আমার ননদ "ওঁকে" জিজ্ঞাসা করিলেন;—"এই দশ জন যেরূপ পত্র লিখেছেন, তুমিও কেন সেইরূপ লেখো না? তুমিও ত পেয়ালা হাতে নিয়েই তার পর নীচে রেখে দিয়েছিলে। এই সত্য

কথা লিখ্‌তে কি বাধা আছে? দোষ না করেও লোকের অপবাদ কেন নেবে?” তখন, উনি বলিলেন—“তুমি কি ক্ষেপেছ? এরকম কথন কি করা যেতে পারে? আমি যখন তাদেরই মধ্যে একজন, তখন আমার না করলেও আমার করার তুল্যই হয়েছে। চা পান করায় কিংবা না করায় কোন পাপ পুণ্য আছে বলে’ আমি মনে করিনে। কিন্তু যারা আমারই মতন একই কাজে ব্যাপৃত, তাদের একলা ফেলে চলে যেতে আমি ভাল বাসি নে। যা হবে গেছে তা হয়ে গেছে। সে সম্বন্ধে এত হ্যাঙ্গামা কেন?” এই কথায় নন্দ বলিলেন:—তোমার ত কিছু মনে হয় না। কিন্তু আমরা যে সময়ে সময়ে মুস্কিলে পড়ব। কাল শ্রাদ্ধেতেও ব্রাহ্মণ পাওয়া যে মুস্কিল হবে, তার কি করা যাবে?” এই কথায় ‘উনি’ বলিলেন:—“এ বিষয়ে তুমি ভেবো না। মানুষ সব দিক্ বিচার না করে, কোন কাজে প্রবৃত্ত হয় না। ভিক্ষুকদের যাওয়া আসায় মুস্কিলটা কি? তোমার যত লোক চাই তার ব্যবস্থা করা যাবে। তার পর, খুঁৎখুঁৎ কোরো না। এই বিষয়ে অনেক পয়সা খরচ করতে হবে; তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।” এই কথা শুনিয়া নন্দ চুপ্ করিয়া রহিলেন। কিন্তু ‘উনি’ এই বিষয় সম্বন্ধে শীঘ্র কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, আপন পরিবারের কোন লোককে, বিশেষত বাড়ীর বড় মেয়েদের অসন্তুষ্ট রাখা—উনি কখনই ভাল বাসিতেন না। বাড়ীর লোকেরা যদি অসন্তুষ্ট থাকে, তবে সে বাড়ীর প্রধান লোকদিগেরই ত্রুটি, এইরূপ ওঁর ধারণা ছিল। কখনও যদি এরূপ কোন ঘটনা হইত, তখন তিনি দোষটা আপনার ঘাড়েই লইতেন।

এই সময় আমাদের বাড়ীতে বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যাস্কর, শ্রীপতি বোয়া ভিদালকর, বাড়ীর কুল-পুরোহিত ও কথক এইরূপ চার জন স্থায়ী আশ্রিত লোক ত ছিলই; তা ছাড়া আরও দুই বৈদিক ব্রাহ্মণকে বৎসরে ১০০ টাকা দিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার হেতু এই যে, এই দলাদলির দরুন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণদের আসা সম্বন্ধে শুধু আমাদের বাড়ীর লোকদের নয়, আমাদের পক্ষের অন্য লোকদেরও যাতে কোন প্রতিবন্ধক না হয়। উহাদের মধ্যে কোন গৃহস্থের গৃহে হোম-হবনাদি সংস্কার ব্রত-উপবাসাদি অনুষ্ঠান ও উপবীত, লগ্নাদি উপস্থিত হইলে চালাইয়া দিবে; উদ্দেশ্য—কাহারও কাজে ব্যাঘাত না হয়। এইরূপ এই দুই বৎসর মধ্যে অনেক লোকের গৃহে আমাদের এই আশ্রিত মণ্ডলীর দ্বারা অনেক কাজ হইয়াছিল। এইরূপ ব্রাহ্মণের বন্দোবস্ত থাকায় এই দলাদলি সম্বন্ধে আমাদের বাড়ীর বড়-মেয়েদের অভিযোগ করিবার কোন হেতু ছিল না। পরে এই ৪২ জনের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিত যে, এই ঘোটের দরুন পুরুষদের তেমন কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু আমাদের মেয়েদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। প্রথম প্রথম বছরখানেক কেহ কিছু বলিত না, খুব ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিত। কিন্তু আজকাল তাদের যেন কষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। যাহারা চা পান করিয়াছিল, তাদের কিছু হইল না, এবং তার দরুণ যে শাস্তি তাহা আমাদের মেয়েরাই ভোগ করিতেছে। এইজন্য প্রত্যেক পরবের সময় তাহারা এইরূপ অসন্তুষ্ট হয়; এবং তাহারা চোখের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারে না। আজ দুই বৎসর আমাদের বিবাহিত মেয়েদের একবারও বাপের বাড়ী আসা হয় নাই। তাহারা বিরক্ত হইয়া বারংবার লোক দিয়া বলিয়া পাঠায়; তাহা শুনিয়া আমাদের মেয়েদের বড় খারাপ লাগে। এই ব্যাপার আমি এক-এক সময় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি; এবং এই সম্বন্ধে কি করা যাইবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। এইরূপ কথা বারংবার কাণে আসায়, উনিও মনে মনে এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। সেইজন্য ১৮৯২ অব্দের বৈশাখ মাসে আমাদের এক মিত্র বাহির গ্রাম হইতে, সে মাসের ছুটির মধ্যে, নিজের বাড়ী পুণায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বাড়ীতে পিতা, মাতা, খুড়া, খুড়ী, চার পাঁচ ভাই, ভাজ, বোন, তাঁহাদের ছেলেপিলে এবং আমাদের নিজের ছেলেপিলে এইরূপ বৃহৎ পরিবার ছিল। এই ভদ্র লোকটি চা-প্রকরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, ইনি প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই। এই বৈশাখ মাসেই ইহার বাড়ীতে দুই একটা বিবাহ হইবার কথা ছিল। ইহার এক খুড়ো ইহার সহিত এক সঙ্গেই থাকিতেন, কিন্তু মত ইহাদের উল্টা রকমের ছিল; ইহার পিতা বাড়ীর কর্ত্তা, পরিবার-প্রতিপালক ও মামলৎ বিভাগে প্রযুক্ত, বড় ছেলে ও ছোট ভাই এই উভয়ের পরস্পরের মত একেবারে বিরুদ্ধ হই-লেও দুই জনকেই সমদৃষ্টিতেই দেখিয়া, শান্তভাবে সংসার নির্ব্বাহ করিতেছিলেন এমন সময়ে, বড় ছেলের বাড়ী আসা ও বিনা প্রায়শ্চিত্তে বাড়ীতে থাকা—এই কথাটা আমাদের মিত্রের পিতা সঙ্কটের কথা মনে করিলেন। এবং বাড়ীতে এখন কাজ (বিবাহ) উপস্থিত এই সময়ে শঙ্করাচার্য্যের নিষ্পত্তির অপেক্ষা না করিয়া, প্রায়শ্চিত্ত লইয়া খোলসা হও, ইত্যাদি বলিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্ত লইবার জন্য পুত্রকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন। কিন্তু এই কথা, পুত্রের কিংবা তাঁর পত্নীর অর্থাৎ বড়-বৌর ভাল লাগিল না। তাঁরা মনে করিলেন, আমরা কোন পাপ কর্ম্ম করি নাই, এইরূপ যখন আমাদের ধারণা তখন এই সব লোকদিগকে সুখী করিবার জন্য কিংবা

বিবাহের চার দিন বিবাহের সমারোহযাত্রায় যোগ দিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত লইতে হইবে, ইহা ঠিক নহে। এই দম্পতী এইরূপ স্থির করিয়া, এই কার্য্যে "ওঁর" মত কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন 'উনি' বলিলেন যে, "তাঁর ও তোমাদের দুজনের এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার এক উপায় আছে। তাহা এই;—তোমরা তোমাদের ছেলেপিলে নিয়ে, ছুটি শেষ হওয়া পর্য্যন্ত "লোণাবালী"তে আসিয়া আমাদের সঙ্গে থাক। তদনুসারে বাড়ীর লোকদিগের মত লইয়া, ছেলেপিলে সমেত এই দম্পতী লোণাবালীতে আমাদের সঙ্গে থাকিতে আসিলেন। সঙ্কট সম্বন্ধে যাই হোক না, তাঁদের আসাতে আমার খুবই আনন্দ হইল। কারণ, তাঁর স্ত্রী ও আমি—আমরা পুরাতন মৈত্রিণী; এবং আমাদের মধ্যে পরস্পর দুই তিন দিন দেখা সাক্ষাৎ হইলেও, আমরা দুজনে কিছুদিন একসঙ্গে থাকিতে পাইব, এতেই আমার বেশী আনন্দ হইল। এই সুযোগে মাস-দেড়েক আমাদের দুজনের এক বাড়ীতে থাকা হইল।

এইরূপ বন্দোবস্ত হওয়ার দরুন তাঁর পিতার মনে বড় ব্যথা লাগিল; বড় ছেলে ছুটির সময় ছেলেপিলে লইয়া বাড়ী আসিল,—বাড়ী আসিয়াই আমাদের এই বৃহৎ পরিবার হইতে, পুত্র পুত্রবধূ ও তিন নাতীর বাহিরে যাইতে হইল,—এটা তাঁর ভাল লাগিল না। তিনি পুত্রকে বারংবার এইরূপ পত্র লিখিতে লাগিলেন—"তুমি প্রায়শ্চিত্ত নেও এবং প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে বাড়ী এসো। এবং এই বৃদ্ধবয়সে আমাকে সন্তুষ্ট কর।"

বড় ছেলে সমাজ-সংস্কার-মতাবলম্বী হইলেও তাঁহার মন অত্যন্ত কোমল ও প্রেম-প্রবণ ছিল; তাই এই পত্র পড়িয়া তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ১০।১৫ দিন পরে পিতার দুই একখানি পত্র তিনি 'ওঁকে' দেখাইলেন এবং মুখ কাঁচুমাচু করিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া ওঁর ভাল লাগিল না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া 'উনি' এইরূপ বলিলেন যে, "আমি যদি তোমার জায়গায় হতুম, তাহলে সমস্ত মানহানি ও হীনতা সহ্য করে' আমার পিতাকে তুষ্ট করতুম।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই এইরূপ সঙ্কটে পড়েছেন; তখন সকলের সহিত আপনিও যদি প্রায়শ্চিত্ত নেন, তাহলে প্রায়শ্চিত্ত নিতে আমাদের ভাল লাগবে।" তারপর, পুণা হইতে আরও ১০।১৫ জন আসিলেন। তখন, প্রায়শ্চিত্ত নেওয়া সম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইবার পর, শেষে নগরকার সকলের হইয়া এইরূপ বলিলেন,—"আমাদের সমস্ত লোকের অব্যাহতির জন্য আপনি প্রায়শ্চিত্ত নিন, এই আমাদের বক্তব্য।" এই কথা শুনিয়া উনি বলিলেন—"এইরূপ যদি হয় আমিও প্রায়শ্চিত্ত নেব। এই সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি নাই। তোমরা পুণায় গিয়ে দিন ঠিক করে আমাকে জানাও। তাহলে একদিনের জন্য আমি পুণায় যাব।" এইরূপ স্থির হইলে পর, যাঁহারা পুণা হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন এবং চার পাঁচ দিন পরে, অমুক দিন প্রায়শ্চিত্ত লওয়া হইবে স্থির হইল। প্রাতঃকালেই গাড়িতে করিয়া সেখানে যাইতে হইবে, এইরূপ নগরকারের পত্র পাওয়া গেল। তার পরদিন প্রভাতে পাঁচটায় গাড়ীতে উনি এবং আমাদের বাড়ী আসিয়া আমাদের সঙ্গে যিনি ছিলেন সেই মিত্র,—দুজনে পুণায় চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

বারাণসী-কথা।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

মহাষ্টমীর দিন অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান ও বিশ্বেশ্বরদর্শনের পর দুর্গাবাড়ীর অভিমুখে রওনা হই। রামাপুরার ভিতর দিয়া প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটিয়া দুর্গাবাড়ী পৌঁছাই। মহাষ্টমী বলিয়া সেই দিন বহুলোক একায় ও টম্‌টমে চড়িয়া দুর্গাবাড়ীর দিকে যাইতেছিল। সম্মুখ দিকের ফটক দিয়া সদর মন্দিরে প্রবেশ করি। প্রবেশপথে দেখি শত শত ছাগবলি হইতেছে। শুনিলাম কাশীতে ছাগবলি নাই, বলির জন্য ছাগ-মহিষ এখানে আনীত হয়। মন্দিরের বারান্দার চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণগণ সুললিত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন।

মন্দিরে প্রবেশ করিতেই দেখি, পুলিশ পাহারা দিতেছে। সংকীর্ণ কুঠরীতে অতি কষ্টে প্রবেশ করিয়া দশভুজা মূর্ত্তি দেখিলাম। দর্শনান্তে অন্য রাস্তা দিয়া বাহিরে আসি। বর্ত্তমান দুর্গামন্দির ও দুর্গাকুণ্ড প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে বানরের অত্যন্ত উপদ্রব বলিয়া ইংরেজরা এই মন্দিরের নাম দিয়াছেন 'Monkey Temple।' মন্দিরের সম্মুখভাগ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ছাউনির দেশীয় সৈনিকগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দুর্গাবাড়ী ও কুণ্ড দর্শন করিয়া সঙ্কটমোচন দর্শনে রওনা হই। প্রায় ১৫ মিনিট হাঁটিয়া একটী নির্জ্জন কাননের ভিতর প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের সম্মুখে বহু প্রাচীন বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ। এখানে মন্দিরের মধ্যে রামলক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরের বিগ্রহ দেখিয়া তথায় তুলসীদাসের আসন দর্শন করি। এই গৃহের বারান্দার এক পার্শ্বে একটী অতি বৃদ্ধ সাধু

গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। এখান হইতে বাহির হইয়া ফিরিবার পথে আমি দুর্গাবাড়ীসংলগ্ন আনন্দ বাগে প্রবেশ করি। এই পুণ্যস্থানে স্বামী ভাস্করানন্দ ২৬ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। প্রাচীরবেষ্টিত বৃহৎ বাগে প্রবেশ করিতেই বামপার্শ্বে স্বামীজির শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যস্থানে স্বামীজির সমাধির উপর জয়পুরের শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত অতি অপূর্ব্ব শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ভক্তমণ্ডলী এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মুদ্রা ব্যয়ে এই স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মন্দির অতিক্রম করিয়া স্বামীজী সাধারণতঃ যে স্থানে বসিতেন সেই দালানে গিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বসি। সেখানে একটী সাধুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল। ইনি স্বামীজীর শিষ্যের শিষ্য। ইনি আগন্তুক সকলের সঙ্গেই সংসারের সুখদুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমি বসিয়া থাকিতেই দেখি একটী ৪০ বৎসরের বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী ও বয়স্থা কন্যাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে আসিলেন। আলাপে জানিলাম ইনি বেহারে ওকালতী করেন। উকিল-পত্নী বাঙ্গালীর অন্তঃপুর-মহিলা হইলেও অতি বিশুদ্ধ হিন্দিভাষায় সাধুর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আলাপের বিষয়টী কন্যার বিবাহ। কন্যাদায়গ্রস্ত মাতাপিতা এই পুণ্যস্থানে আসিয়া যে নির্লোভ ঠাকুরের নিকট কোষ্ঠীবিচারের প্রশ্ন তুলি-বেন ইহা আমার নিকট অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইল। যাহাহউক সাধু দম্পতীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'তোমার কন্যার কোষ্ঠী ভুল, আমি সব ঠিক করিয়া দিব। মা, তোমরা এখন যাও, আমি অপরাহ্নে তোমা-দের সঙ্গে দেখা করিব।' আমি অনেকক্ষণ বসিয়া সাধুর ভাবটী দেখিলাম; কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরে ব্রহ্মর্ষি ভাস্করানন্দের পুণ্যপ্রভাব বড় একটা দেখিতে পাইলাম না; তাঁহাকে একজন সাধারণ সন্ন্যাসী বলিয়াই মনে হইল। আনন্দবাগ হইতে বাহির হইয়া এক্কায় চড়িয়া দুপুর বারটার সময় বাসায় ফিরিয়া আসি।

• • •

মহাষ্টমীর রাত্রে ৯টার সময় বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই আরতি-দৃশ্যের বর্ণনা আমি আর কি করিব। শত শত নর-নারী আরতি দেখিবার জন্য সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। পাণ্ডারা বিশ্বেশ্বরকে মাল্য ও চন্দনসংযোগে অতি সুন্দরভাবে সাজাইতে ছিলেন। সেই সাজ-সজ্জার ভিতরে পাণ্ডাঠাকুরদের নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। দেবতার অঙ্গরাগ শেষ হইলে সাতটী পঞ্চপ্রদীপ জলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ ডান হাতে পঞ্চপ্রদীপ ও বাম হাতে ঘণ্টা লইয়া সমস্বরে আরতির গান ধরিলেন। সেই সঙ্গীত শুনিয়া হৃদয়-মন মুগ্ধ হইল। আমি প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়া-ইয়া বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিলাম।

নবমীর দিন প্রাতে প্রথমে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া গঙ্গার ধার দিয়া মণিকর্ণিকা ঘাটে যাই। কাশীর মধ্যে ইহার ন্যায় পবিত্র তীর্থ আর নাই। এখানে প্রথমে 'চক্রতীর্থের' জল স্পর্শ করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করি। মণিকর্ণিকার কাহিনীটি এই:—শঙ্কর ও শঙ্করী যোগমগ্ন ছিলেন। একদিন মহাদেবী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'মরিলে কি হয়, কবে
কোথায় নিবাস।'

দেবীর প্রশ্ন শুনিয়া শঙ্কর কহিলেন,

'হে প্রকৃতি মানবের পরকাল প্রথা
দুর্ব্বোধ, দুজ্ঞের অতি, অপার অশেষ।'

উত্তর শুনিয়া মহাদেবী অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শঙ্করীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য শিব শিবানী সহ কাশীতে আসিয়া 'চক্রতীর্থ' মণিকর্ণিকা স্থাপন করেন। তার পর তাঁহারা উভয়ে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। মহাদেবীর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পদদ্বয় দেখিয়া পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে এখানে কূপে অবগাহন করিতে দেয় নাই। পরে লক্ষ্মী শঙ্করীর পাদপূজা করিয়া পাদোদক পান করিলে সকলে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে অবগাহন করিতে দেন। স্নানকালে শিবের মস্তক হইতে মণি এবং শিবানীর কর্ণ হইতে কর্ণিকা কূপের মধ্যে পড়িয়া যায়। সেই অবধি এই তীর্থের নাম 'মণিকর্ণিকা' হইয়াছে।

মণিকর্ণিকা ঘাটের পার্শ্বে কাশীর মহাশ্মশান দেখিয়া আমরা বেণীমাধবের মন্দির দেখিতে যাই। পঞ্চগঙ্গা-ঘাট বা ধর্ম্মানন্দতীর্থের উপরেই আদি বেণীমাধবের মন্দির ছিল; ঔরংজেব সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া সেইস্থানে একটী বৃহৎ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মস্‌জিদের চারি কোণে চারিটি স্তম্ভ আছে, তন্মধ্যে সম্মুখের দুইটী অতি উচ্চ। এই স্তম্ভ দুইটীকে বেণীমাধবের ধ্বজা বলে। এই ধ্বজা হইতে কাশীর চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বড়ই মনোরম দেখায়।

বেণীমাধবের ধ্বজা দেখিয়া আমি দশাশ্বমেধ ঘাটে চলিয়া আসি। এখানে ঘাটের নীচে দিয়া গঙ্গার তীর ধরিয়া কেদারঘাট ও চৌষট্টি যোগিনী গিয়াছিলাম। বাঙ্গালীটোলায় গঙ্গার উপর কেদারেশ্বর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের বারান্দায় বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিলাম। মন্দিরাভ্যন্তরে লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিয়া কেদারঘাটের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে গৌরীকুণ্ডে নামিয়া আসি; কেদারেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি অনেকটা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তির অনুরূপ।

• • •

নবমীর দিন অপরাহ্নে কাশীর মানমন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের বাসার অতি নিকটেই গঙ্গা-তীরে মানমন্দির। মহারাজা মানসিংহ অনুমান ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার জন্য এই মান-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ সাহের অনুমতিক্রমে গ্রহাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য রাজা জয়সিংহ এই মন্দিরে জ্যোতিষ যন্ত্রাদি স্থাপন করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে রাজা জয়সিংহ অতি দক্ষ ছিলেন। তিনি সাত বৎসর হিন্দু, মুসলমান ও য়ুরোপের জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বহু গবেষণার পর তিনি রামযন্ত্র, সম্রাট্ যন্ত্র, বিখ্যাত জয়-প্রকাশ যন্ত্র স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া উহাদের সাহায্যে টলেমি প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের যুক্তির ভুল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'জিজ্ মহম্মদ শাহী' গ্রন্থে য়ুরোপের জ্যোতিষগণনার বহু ভুল প্রদ-র্শিত হইয়াছে। নিম্নে যন্ত্রাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যন্ত্রাদির সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

1. The Narivalaya Dakshina and Uttara Gola or the Equinoctical circle. It is a large circular slanting piece of stone placed in the equinoctical plane with a circle described on the northern side over 4½ feet in diameter. An iron spike in the centre pointing to the North Pole denotes by its shadow the meridianal distance of the sun or the stars when in the Northern Hemisphere. The use of this instrument is to find out time and also whether the heavenly bodies are in the Northern or the Southern Hemisphere.

2. Chakra Yantra, consists of a movable circle of iron and brass—the circumference of which is graduated into sixty parts turning upon an axis fixed between two walls and pointing to the North Pole. This instrument is for measuring the declination of the sun, moon and stars and their distance in time (hour angle) from the meridian.

3. Samrat Yantra, is a giant sun-dial. It is 36 feet long, and is 22½ feet high on its northern end and 6½ feet on the southern, the inclined hypotenuse thus formed pointing to the North Pole. Its use is to find time and declination and hour angle of the heavenly bodies. Another Samrat Yantra of smaller dimension and exactly similar to this lies further to the east.

4. Digansha Yantra—constructed of massive stone and consisting of two broad concentric circular walls, the outer one double the height of the inner and graduated to 360° degrees at the top. The use of this instrument is to find the degrees of azimuth of the heavenly bodies.

5. Dakshin bhilti Yantra (Mural Quadrant) is a stone wall built in the plane of the meridian eleven feet high and a little over nine feet in length, with two quadrants intersecting each other described thereon and three concentric arcs upon each of them graduated into degrees and minutes. The altitude of the heavenly bodies when on the meridian is known by this instrument.

* * * *
* * * *

বিজয়ার দিন অতি প্রত্যূষে একখানি পাল্কী গাড়ীতে চড়িয়া অদ্বৈত-আশ্রমের নিকটবর্ত্তী ছোট গৈবীর জল পান করিতে গিয়াছিলাম। বড় গৈবীর কূপটীর তখন সংস্কার হইতেছিল, তাই ছোট গৈবীর জল পান করিয়া আমি ফিরিবার পথে এনিবেশান্তের প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ ও পরাবিদ্যা সোসাইটীর সুবৃহৎ লাইব্রেরী দেখিতে যাই। কাশীর 'কুইনস্ কলেজ', 'ডফরিন ব্রিজ', শত শত ঘাটের বিবরণ নূতন করিয়া লিখিবার কিছুই নাই বলিয়া বারাণসীর বিজয়া উৎসবের কথাই এখানে লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

* * *

আজ দশাশ্বমেধঘাটে কাশীর বিজয়া উৎসব। যে দুর্গোৎসবের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী আপামর সকলকে হাবুডুবু করাইতেছিল, সমস্ত ভারতবর্ষ লইয়া যেন একটা হুলুস্থুল ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছিল—আজ সেই মহোৎসবের শেষ দিন।

বেলা ২ টার সময় আমি দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হই। সেখানে গিয়া দেখি একটিও লোক নাই। আমি চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম; কিছুক্ষণ পর দেখি রামনগরে উৎসব দেখিবার জন্য দলে দলে মাড়ো-য়ারী ঘাটে আসিতেছে। তাহারা নৌকা ভাড়া করিয়া অপর তীরে চলিয়া গেল। আমার একবার ইচ্ছা হইল রামনগরে যাই। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে দশাশ্বমেধ ঘাটের বিজয়া উৎসব দেখিবার জন্য প্রাণে উৎকণ্ঠা অনুভব করিলাম; আমি চুপ করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগি-লাম। বেলা চারিটার সময় ঘাট, ঘাটের উপর দালানের ছাদ লোকে ভরিয়া গেল। ঘাটে তখন হাঁটা

যায় না। আমি এক স্থানে দাঁড়াইয়া গঙ্গাদৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঢাক, সানাই, বিলাতী পাইপ বাজাইতে বাজাইতে কত শোভাযাত্রা ঘাটে আসিতে লাগিল। দেখি, অনেক প্রতিমা ঘাটে আসিয়া ঝুপ করিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন করা হইল। এইভাবে বিসর্জ্জনক্রিয়া সম্পন্ন হইতে লাগিল। গঙ্গায় খোল করতাল লইয়া কত লোক হরি-সংকীর্ত্তন গাইতেছিল। তীরে বাঁশী-বিক্রেতা, মিঠাই-ওয়ালা, চাই-কুলপি-বরফওয়ালা কিছুরই অভাব ছিল না। জলের উপর বাঁশের মঞ্চে বসিয়া শত শত বিধবা রমণী জপ তপ করিতেছিলেন।

ধরায় সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। চারিদিকে মন্দির হইতে আরতির ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। আমি দশাশ্বমেধ-ঘাটের পুণ্য ধূলিতে লুটিয়া ভগবানকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

—

আদর্শ

বা

দাদা ঠাকুর।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—নিবিড় জঙ্গল। কাল—রাত্রি।

(একাকী কুলভূষণ)

কুল। দেব? গলায় দড়ী দেব? এইবার দেব। কিন্তু বড় ভয় করে। মরতে বড় ভয় করে। রাত্রি প্রভাত হলে' আবার সকল লোকে আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরাবে। গায়ে থুথু দিবে। পুলিসের লোক আমার সন্ধানে ফিরচে। ওঃ একদিনে পথের কাঙাল হয়েছি। কেন এমন বুদ্ধি হোল! কেন রাসবিহারীর কথা শুন্‌লুম? তাড়িয়ে দিলে! বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে! কি অপমান! না মরতেই হবে।— উঃ কি ভয়ানক ঝড় হচ্চে! বেশ হচ্চে। বেশ হচ্চে। খুব হোক। আমার ভিতরেও একটা ঝড় চলেছে। বাইরে ভিতরে ভীষণ ঝড়। বাঃ বেশ, চমৎকার! সে দিনও এমনি অন্ধকার রাত্রি—যে দিন রাসবিহারীর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম। পাগলী তাই শুনেছিল। পাগ্‌লীই তো সর্ব্বনাশ কর্লে। আর শুনলুম এই পাগ্‌লী নাকি আমার মা! না—মরব—মরব।

(আত্মহত্যা করিতে উদ্যত ও পাগলিনী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া হস্ত ধারণ করিয়া—)

পাগ্‌লী। থামো।

কুল। কে? ওঃ তুই! সর্ব্বনাশী, রাক্ষসী আবার এসেছিস্?

পাগ্‌লী। যাবো কোথায়? তোরি জন্যে যে এখানে রয়েছি। তোকে দেখ্‌ব বলেই যে এখনো মরিনি। যাবো কোথায়? না এসে যাবো কোথায়?

কুল। যমের বাড়ী। তুই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্, আমায় পথের কাঙাল করেছিস্। আমার সারা জীবনে কলঙ্ক মাখিয়ে দিয়েছিস্। আমার সব সুখ সব আশা নষ্ট করেছিস্। যা আমার সাম্‌নে থেকে যা; না হলে' তোকে মেরে ফেলব।

পাগ্‌লী। আমায় মার্বি? পার্বি তো? সত্যি বলিস্ তো? কর্ তবে তাই কর। আমায় মেরে ফেল। আমার বুকটা জুড়াক। তোকে দেখ্‌ব বলে', তোকে একবার বল্‌ব বলে' এতদিন বেঁচে ছিলুম। আমার বলা শেষ হয়েছে, কর বাছা আমায় খুন কর্। ওঃ কি জ্বালা! কি জ্বালা! পুড়ে গেল! পুড়ে গেল!

কুল। খুব পুড়ুক। আরো পুড়বে। ভারী তো আমার জন্যে তোমার দরদ! তুই আবার আমার মা? মা হয়ে' আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্।

পাগলী। বুঝবি, একদিন বুঝবি। কেন এমন করেছি তা একদিন বুঝবি। মা হয়ে' যদি ছেলের জন্যে কিছু করে' থাকি তো এইটেই শুধু করেছি। মরিসনে বাছা; বেঁচে থাক্‌লে একদিন বুঝতে পার্বি। ওরে বড় জ্বালা—পাপের বড় জ্বালা। তোর কথা ভেবে ভেবে তোর জন্যে দুঃখ হল। এর কি জ্বালা, আমি হাতে হাতে জানি। চেয়ে দ্যাখ এই আমার দিকে; আমি কি আগুনে পুড়্‌চি। আর কেন তোকে কাঙাল করেছি জানিস? কাঙাল হয়েছিস্ বলে' আজ তোকে পেয়েছি। আমার অন্ধের যষ্টি, ভিখারীর মাণিক আবার ফিরে পেয়েছি। হোক ধূলোমাখা, আমি ধুয়ে নেব, ধুয়ে নেব। আমার চোখের জল দিয়ে ধুয়ে নেব। কাঙাল না হলে তুই ফিরে আসতিস্ না। বড়লোক হলে মাকে ভুলে থাকতিস্। তাই তোকে কাঙাল করেছি। এখন আয় কাঙালিনীর কাঙাল ছেলে, আবার তোর কাঙালিনী মায়ের বুকে ফিরে আয়। তেমনি মা বলে ডাক—যেমন একদিন ছেলেবেলায় ডাকতিস। যখন তুই বড় লোক ছিলিনে, কেবল আমাকেই চিনতি, আমাকেই জানতি, আমাকেই বুঝতি। একবার আয় বাছা, তেমনি করে একবার আমার কোলে আয়। আয় বাছা আমার বুকে আয়। উঃ আমার বুক যে পুড়ে গেল, আয় বাছা,

(হস্তপ্রসারণ)

কুল। সরে যা রাক্ষসী। তুই আমার মা নস্। তুই পিশাচী। মা হয়ে সন্তান বিক্রয় করেছিস, কি করেছিস, উঃ কি করেছিস্ তুই তা জানিস্‌নি চিরদিনের জন্য একটা জীবন নষ্ট করেছিস। আমি তো ছেলে-

বেলা এমন ছিলুম না। ছেলে বেলায় ভালো ছিলুম; যেদিন হতে শুনলুম আমি পুষ্যিপুত্তুর, লোকে আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখে, তখন থেকে বিশ্বের উপর আমার অভিমান হোল। তারপর ক্রমে এই নরপিশাচ সেজেছি। একি আমার দোষ? না—না এ তোর দোষ। তুই যদি আমায় পশুর মত বিক্রী না করতিস—আমি সেই কাঙা-লিনীর ছেলে থাকতুম, তা হলে আজ আমার এ দশা হোতনা। কেন আমায় ঐশ্বর্য্যের মাঝে এনেছিলি? বল্ রাক্ষসী, কেন আমায় বিক্রী করলি?

পাগলিনী। পেটের দায়ে, পেটের দায়ে। তুই কি বুঝবি ক্ষুধার জ্বালা কি জ্বালা! সেই জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তোকে বিক্রী করেছিলুম। তুই কি বুঝবি—প্রবল শ্রাবণের ধারায় যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজেছি; যখন রোদ্রে, অনাহারে তোকে বক্ষে নিয়ে ঘুরেছি, পিপাসায় আমার বুক ফেটে গেছে! কেউ একটু জল দেয়নি। যখন মাঘ মাসের হাড়ভাঙা শীতে বিনা বস্ত্রে পথে দাঁড়িয়ে কেঁপেছি, তুই কি বুঝবি সেই কষ্ট! সেই দুঃখ! তখন তোর পানে একবার চেয়েছি, তোর মলিন মুখ, অসহায় ভাব দেখেছি—আর আমার বুক ফেটে যেত। আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠতুম, কেউ শুন্‌তো না, সে কান্না শুনে' বাতাস শুধু হাহা করে বয়ে' যেত, আর আকাশ স্থির ভাবে চেয়ে থাক্‌তো। তুই কি বুঝবি আমার সে কি কষ্ট! কি যাতনা! কি দুঃখ!

কুল। মর্‌তে পারোনি রাক্ষসী? আমাকে মেরে ফেল্লি নে কেন? সে সময়ে মেরে ফেল্‌লে আজ আমায় এমন বিশ্বের ধিক্কৃত হয়ে বেঁচে থাক্‌তে হোতনা।

পাগলিনী। মর্‌তে পারিনি। তোর দিকে চেয়ে, মরতে পারিনি। তোর দিকে চাইলে আমার মরতে ইচ্ছা হোত না। এত দুঃখ কষ্টেও তোর মুখখানি দেখ্‌লে আমার বুক জুড়াতো। ভাব্‌তুম যদি মরে যাই তোর কি দশা হবে। আর তোকে মারব? তোকে মারব? হায় বাছা, তুই কি বুঝবি, মায়ের প্রাণ কি দিয়ে গঠিত! মায়ের প্রাণ শুধু মা-ই বোঝে, তা আর কেউ বোঝে না, আর কেউ জানে না। এই দ্যাখ্ এখনো আছে—ছেলেবেলায় তোর গলায় একখানি পদক ছিল, আমি তোর সে চিহ্ন এখনো আমার সাথে সাথে রেখেছি। পাগল হয়েও ফেলে দিতে পারিনি। আমি এই কত বছর এ চিহ্ন বুকে করে' বেঁচে আছি। বেঁচে আছি তোকে শুধু দেখ্‌ব বলে'। আবার তোকে বুকে কর্‌ব বলে'। আয় বাছা বুকে আয় (অগ্রসর হইল)

কুল। খবর্দার, এসোনা আমার কাছে—এসোনা। হায়, জানোনা তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করেছো, মা হয়ে' সন্তান বিক্রী করেছো। আমি যদি মহাপাপী হই তবে তুই মহাপাপিনী।

পাগলিনী। তুই-ও বল্‌বি? মহাপাপিনী তা তুই ও বল্‌বি? ওঃ তোর মুখে একথা শুনে——ঈশ্বর ঈশ্বর, এই আমার শেষ কথা শোনা হয়েছে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনো হয়নি? বাছা, আমি অপরের কাছে মহাপাপিনী হতে' পারি, বিশ্বের ধিক্কৃত হতে পারি—এমন কি ঈশ্বরের কাছেও অপরাধিনী হতে পারি, কিন্তু তোর কাছেও কি——উঃ!

কুল। না আর আমি এখানে দাঁড়াব না। যাই, পাগ্‌লী, তুই আমাকে মর্‌তেও দিবিনে?

পাগলিনী। ওরে! ছেলের কাছে মা যে শুধু মা, সে কি আর কিছু হতে' পারে? বাছারে! যে মুখে আজ আমায় রাক্ষসী পিশাচী বল্‌ছিস্ সেই মুখে যখন তোর কথা ফোটে নাই' যখন কচি হাত দু'খানি দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরতিস, যখন আধো আধো কথায় মা বলে' ডাক্‌তিস, তখন যে আমার কি হোত তা বোঝাতে পারিনে। তা আর কেউ বোঝে না; কেবল মা-ই বুঝতে পারে। ওঃ মনে পড়ে সেদিনের কথা যে দিন বিক্রী করেছিলুম——

(কুলভূষণ নীরবে শুনিতে লাগিল)

পাগলিনী। শুনবি? শোন্ তবে। উঃ সে কথা মনে করতে বুক ফেটে যায়। যে দিন তোকে খেলনার লোভ দেখিয়ে অন্যের হাতে দিলুম, যখন তারা তোকে নিয়ে যেতে চাইলে, তুই তা বুঝতে পার্‌লিনি। আমি রাক্ষসী, আমার বুক থেকে তোর কচি হাতের বাঁধন-খানি ছাড়িয়ে দিতে হোল। তুই জোর করে আমায় গলা সাপ্‌টে ধরলি—তা এমন জোরে—এমন জোরে সাপ্‌টে ধর্‌লি যেন আমার নিঃশ্বাস রোধ হয়ে' আস্‌তে লাগলো। তবু আমি তোকে দিলুম। তোকে তাদের হাতে দিলুম। আমার বুকের ভিতর থেকে প্রাণ টেনে ছিঁড়ে দিলুম। তার পর যখন তোকে তারা নিয়ে যায়, তখন চীৎকার করে, মূর্চ্ছিত হয়ে' পড়লুম। যখন জ্ঞান হোল তখন দেখি আমি পাগ্‌লা গারদে আছি—উঃ! (ক্রন্দন)

কুল। কাঁদো, কাঁদো, খুব কাঁদো। আর একটু কাঁদো—আমিও কাঁদব। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। কোনো দিন কাঁদ্‌তে পারিনি। কাঁদো—আমি দেখ্‌বো।

পাগলিনী। না আর কাঁদব না। আমার কান্নাও শেষ হয়েছে। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চোখের জল ফুরিয়ে গেছে। আর চোখ দিয়ে জল পড়্‌চে না—এ রক্ত এ আমার বুকের রক্ত, চোখ্ দিয়ে জল হয়ে' বের হচ্ছে। তবে যাই, যাবার বেলায় একবার আমায় মা বলে' ডাক্‌-বিনে? বাছারে আমি তোর অপরাধিনী, বিশ্বের ধিক্কৃতা

মা—থাক্ আমায় মা বলে' ডাকিস্ নি আর। যাই তবে যাই বাছা। যাই—

কুল। মা, মা, মা, মাগো (পাগলিনীর বক্ষে মুখ লুকাইল)

পাগলিনী। কি বল্লি? বল্ বল্ আবার বল। আবার ডাক্। আমি যে ঐ ডাকের কাঙালিনী। ডাক্ বাছা আবার ডাক্।

কুল। মা, মা, মাগো।

পাগলিনী। গেছে,—আমার সব দুঃখ, সব কষ্ট গেছে। ডাক্ ডাক্ আবার ডাক্। একি আমার মাথা ঘুরচে! বাছা আমার ধর্।

কুল। (মাকে ধরিয়া) মাগো, আমি তোর অবোধ ছেলে, তোর অপরাধী ছেলে। মা আমায় কোলে নে, তেমনি করে কোলে নে, যেমন একদিন ছেলেবেলায় নিতিস্। আজ পৃথিবীতে আর কেউ নেই—কিছু নেই। আছে শুধু মা আর ছেলে। মা, বিশ্ব ত্যাগ করেছে, করুক। আমি কি তোকে আর ফেলে দিতে পারি? তুই যে আমার উৎপীড়িতা মা। মা, মা, তোকে ফেলে কোথায় যাবো? মা, মা, মাগো।

পাগলিনী। একি আমি কোথায়? আমার যে বুকের ভিতর কেমন করছে! বুঝি এই আমার শেষ হয়ে এল। ডাক্ ডাক্ বাছা আবার ডাক্।

(ভূমিতে পতন)

কুল। মা, মা, একি—মাগো তুই কোথা যাচ্ছিস্।

পাগলিনী। বাছা, আমার শরীরে আর সৈলো না। যা—ই—ত—বে।

কুল। মা, মা, তোর অপরাধী অবোধ ছেলেকে কোথায় ফেলে যাবি? আমি যে বড় একা।

পাগলিনী। ঈশ্বর আছেন। অপরাধিনী হলেও আমায় শেষের দিনে বড় সুখের ভাগিনী করেছেন। ঠাকুর আছেন। ঠাকুরের উপর মতি রেখো। আমার শেষ হয়ে আসচে তবে যা—ই—(মৃত্যু)

কুল। মা, মা ওমা। একি! সব শেষ! মা মা ওমা মাগো! চল্ তোকে শ্মশানে নিয়ে যাবো। তার পর আমিও সেই চিতায় পুড়ে মরব। দুঃখিনী মা আর তার অপরাধী ছেলে এক সঙ্গে যাবে। তবে চল্ মা।

(মৃতদেহ স্কন্ধে লইতে উদ্যত)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখ্যদিগের এই দ্বৈত ভগবদ্‌-গীতার মান্য নহে। গীতান্তর্ভূত অধ্যাত্মজ্ঞানের এবং বেদান্ত শাস্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়েরই অতীত এক সর্ব্বব্যাপী, অব্যক্ত ও অমৃত তত্ত্ব চরাচর জগতের মূলে আছে, সাংখ্যদিগের প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগুণ। কিন্তু যাহা সগুণ তাহা নশ্বর বলিয়া, এই সগুণ ও অব্যক্ত প্রকৃতিরও নাশ হইলে পর শেষে যে অন্য কোন অব্যক্ত অবশিষ্ট থাকে তাহাই সমস্ত জগতের মধ্যে সত্য ও নিত্য তত্ত্ব, প্রকৃতিপুরুষ বিচার করিবার সময় এই প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২০ তম শ্লোকে ইহা কথিত হইয়াছে। আরো পরে ১৫ম অধ্যায়ে (গী. ১৫, ১৭) ক্ষর ও অক্ষর—ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে এই দুই তত্ত্ব বলিবার পর উক্ত হইয়াছে—

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

অর্থাৎ এই দুই হইতে ভিন্ন যে পুরুষ তিনিই উত্তম পুরুষ, পরমাত্মসংজ্ঞক, অব্যয় ও সর্ব্বশক্তিমান, এবং তিনিই ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাদের সংরক্ষণ করেন। এই পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুয়েরই অতীত হওয়ায় তাঁহার যথার্থ সংজ্ঞা "পুরুষোত্তম" হইয়াছে (গী. ১৫. ১৮)। মহাভারতেও ভৃগু ঋষি ভরদ্বাজকে 'পরমাত্মা' ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন—

আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব তু বিনির্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ॥

অর্থাৎ "আত্মা যখন প্রকৃতিতে বা দেহের মধ্যে বদ্ধ থাকে, তখন তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) বলে, তাহাই প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি বা দেহের গুণ হইতে মুক্ত হইলে তাহার 'পরমাত্মা' এই সংজ্ঞা হয় (মভা. শাং. ১৮৭. ২৪)। 'পরমাত্মা'র উক্ত দুই ব্যাখ্যা ভিন্ন মনে হওয়া সম্ভব, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ভিন্ন নহে। ক্ষরাক্ষর জগৎ ও জীব (অথবা সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ) এই দুয়েরই অতীত একই পরমাত্মা আছেন এই কারণেও বলা যায় যে তিনি ক্ষরাক্ষরের অতীত, আবার

কখনও বলা যায় যে তিনি জীব বা জীবাত্মার (পুরুষের) অতীত—এইরূপে এক পরমাত্মারই এই দুইটি লক্ষণ কিংবা ব্যাখ্যা করা হইলেও বস্তুত কোন ভিন্নতা হয় না। এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়া কালিদাসও কুমারসম্ভবে পরমেশ্বরের বর্ণনা করিয়াছেন যে, "পুরুষের লাভের জন্য সচেষ্ট প্রকৃতিও তুমিই, এবং নিজে উদাসীন থাকিয়া সেই প্রকৃতির দ্রষ্টা পুরুষও তুমিই" (কুমা. ২. ১৩)। সেইরূপ আবার গীতাতেও ভগবান বলিতেছেন "মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম"—এই প্রকৃতি আমার যোনি বা আমার এক স্বরূপ (১৪. ৩) এবং জীব বা আত্মাও আমারই অংশ (১৫. ৭)। ৭ম অধ্যায়েও ভগবান বলিতেছেন যে,—

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

অর্থাৎ "পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আট প্রকারের আমার প্রকৃতি; ইহা ব্যতীত (অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং) সমস্ত জগৎ যাহা ধারণ করিয়া আছে সেই জীবও আমার অপর প্রকৃতি (গী. ৭. ৪, ৫)। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অনেক স্থানে সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে; কিন্তু সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই পঁচিশ তত্ত্বের অতীত ষড়্‌বিংশতম এক পরম তত্ত্ব আছে, যাঁহাকে জানিতে না পারিলে মনুষ্য 'বুদ্ধ' হয় না (শাং ৩০৮)। আমাদের নিজের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জাগতিক পদার্থের যে জ্ঞান হয় তাহাই আমাদের সমস্ত জগৎ; তাই প্রকৃতি বা জগতকেই কখন কখন 'জ্ঞান' এই নাম দেওয়া হয় এবং এই দৃষ্টিতে 'পুরুষ' জ্ঞাতা বলিয়া উক্ত হয় (শাং ৩০৬. ৩৫-৪১)। কিন্তু প্রকৃত 'জ্ঞেয়' যিনি (গী. ১৩. ১২) তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়েরই, অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়েরই অতীত হওয়ায় গীতায় তাঁহাকেই 'পরমপুরুষ' বলা হইয়াছে। ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিয়া তাহার ধারয়িতা এই যে পরম বা পর-পুরুষ তাঁহাকে জানো, তিনি এক, অব্যক্ত, নিত্য, ও অক্ষর,—এ কথা শুধু ভগবদ্গীতা নহে, বেদান্তশাস্ত্রের সকল গ্রন্থই উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন। 'অক্ষর' ও 'অব্যক্ত' এই দুই বিশেষণ বা শব্দ সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কারণ, জগতের প্রকৃতি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অন্য কোন মূল কারণ নাই, ইহাই সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত (সাং· কা· ৬১)। কিন্তু বেদান্তদৃষ্টিতে দেখিলে, পরব্রহ্মই এক অ-ক্ষর অর্থাৎ তাঁহার কখন নাশ হয় না; তিনিই অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর; অতএব গীতায় 'অক্ষর' ও 'অব্যক্ত' এই দুই শব্দই প্রকৃতির অতীত। পরব্রহ্মের স্বরূপ দেখাইবার জন্যও প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এই বিষয় পাঠকের সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক (গী· ৮. ২০; ১১· ৩৭; ১৫· ১৬, ১৭)। বেদান্তের এই প্রকার দৃষ্টি স্বীকার করিলে, প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও তাহাকে 'অক্ষর' বলা যে ঠিক্ নহে, এ কথা সত্য। কিন্তু জগদুৎপত্তিক্রমসম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত এই তৃতীয় উত্তম পুরুষের সর্ব্বশক্তিত্বে কোন বাধা না আনায় এই সিদ্ধান্ত গীতায়ও মান্য হইয়াছে এবং সেইজন্য সাংখ্যদিগের নিশ্চিত পরিভাষাতে কোন অদল-বদল না করিয়া তাঁহাদের শব্দেই গীতাতে ক্ষরাক্ষর কিংবা ব্যক্তাব্যক্ত জগতের বর্ণনা করা হইয়াছে; তাই, ভগবদ্গীতাতে পরব্রহ্মের স্বরূপ বলিবার যেখানে প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেখানে সাংখ্য ও বেদান্তের মতান্তরবিষয়ক সন্দেহ মিটাইবার জন্য, (সাংখ্য) অব্যক্তেরও অতীত অব্যক্ত এবং (সাংখ্য) অক্ষরেরও অতীত অক্ষর, এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়াছে। উদাহরণ যথা—এই প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত শ্লোক দেখ। সারকথা, গীতা পড়িবার সময় সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক যে, 'অব্যক্ত' এবং 'অক্ষর' এই দুই শব্দই কখন সাংখ্যদিগের প্রকৃতির উদ্দেশে, কখন বেদান্তের পরব্রহ্মের উদ্দেশে—অর্থাৎ দুই বিভিন্নপ্রকারে গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে। সাংখ্যদিগের অব্যক্ত প্রকৃতিরও অতীত অপর অব্যক্তই, বেদান্তের মতে জগতের মূল। জগতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে ইহাই উপরি-উক্ত পার্থক্য। এই পার্থক্য হইতে অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ত মোক্ষের স্বরূপ এবং সাংখ্যদিগের মোক্ষস্বরূপে কিরূপ পার্থক্য হইয়াছে তাহা পরে বলা যাইবে।

প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখ্যদের এই দ্বৈতকে না মানিয়া, যখন ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, এই জগতের মূলে পরমেশ্বররূপী অথবা পুরুষোত্তমরূপী এক তৃতীয় নিত্য তত্ত্ব আছেন এবং প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই তাঁহার বিভূতি; তখন সহজেই এই প্রশ্ন আসে যে, এই তৃতীয় মূলভূত তত্ত্বের স্বরূপ কি, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়ের সহিত উহার কি সম্বন্ধ? প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমেশ্বর—এই ত্রয়ীকে, অধ্যাত্মশাস্ত্রে, যথাক্রমে জগৎ, জীব ও পরব্রহ্ম বলা হয়; এবং এই তিন বস্তুরই স্বরূপ ও ইহাদের পরস্পরসম্বন্ধ নির্ণয় করাই বেদান্তশাস্ত্রের মুখ্য কার্য্য; উপনিষদেও ইহারই আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে সমস্ত বেদান্তের মতৈক্য নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই তিন পদার্থ মূলে একই; এবং কেহ বা মনে করেন যে, জীব ও জগৎ পরমেশ্বর হইতে আদিতেই অল্প বা অত্যন্ত ভিন্ন। ইহা হইতেই বেদান্তী-

দিগের অদ্বৈতী, বিশিষ্টাদ্বৈতী ও দ্বৈতী এইরূপ ভেদ হইয়াছে। জীব ও জগতের সমস্ত ব্যবহার পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চলিতেছে এই সিদ্ধান্ত সকলেরই সমান গ্রাহ্য। কিন্তু কতক লোক বলেন যে, জীব, জগত ও পরব্রহ্ম এই তিন বস্তুর মূলস্বরূপ আকাশের ন্যায় এক বস্তুসার ও অখণ্ড; আবার অন্য বেদান্তী বলেন যে, জড় ও চৈতন্য এক হইতে পারে না বলিয়া, দাড়িমের ফলে অনেক দানা থাকিলেও তাহার ফলের একত্ব যেমন লোপ পায় না, তেমনি জীব ও জগত পরমেশ্বরের মধ্যে ওতপ্রোত থাকিলেও উহা পরমেশ্বর হইতে মূলেতে ভিন্ন এবং তিনই "এক" বলিয়া যখন উপনিষদে বর্ণিত হয় তখন তাহার অর্থে 'দাড়িমের ফলের ন্যায় এক' এইরূপ বুঝিতে হইবে। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে যখন এই মতান্তর উপস্থিত হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকাকার নিজ নিজ মতানুসারে উপনিষদসমূহের এবং গীতারও শব্দসকলের টানিয়া বুনিয়া অর্থ বাহির করিতে লাগিলেন। তাহার পরিণামে গীতার প্রকৃত স্বরূপ—উহার প্রতিপাদ্য সত্য—কর্ম্মযোগ বিষয় তো একপাশে থাকিয়া গেল এবং অনেক সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের মতে, গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ইহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, গীতা বেদান্তের দ্বৈতমতের কি অদ্বৈতমতের। হৌক; এই সম্বন্ধে বেশী বিচার করিবার পূর্ব্বে ইহাই দেখিতে হইবে যে, জগৎ (প্রকৃতি), জীব (আত্মা কিংবা পুরুষ), এবং পরব্রহ্ম (পরমাত্মা কিংবা পুরুষোত্তম) ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কি বলিয়াছেন। এই বিষয়ে গীতা ও উপনিষদ উভয়েরই যে একই মত এবং গীতার সমস্ত বিচার উপনিষদে প্রথমেই যে আসিয়াছে, পরবর্ত্তী বিচার হইতে পাঠকদিগের তাহা উপলব্ধি হইবে।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েরই অতীত যে পুরুষোত্তম পর-পুরুষ, পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম, তাঁহার বর্ণনা করিবার সময় ভগবদ্‌গীতায় প্রথমে তাঁহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত (দৃষ্টির গোচর ও দৃষ্টির অগোচর) এই দুই স্বরূপ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্যক্ত স্বরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গোচর রূপ যে সগুণই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বাকী রহিল অব্যক্ত। এই অব্যক্ত রূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও উহা যে নির্গুণই হইবে, তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, তাহার মধ্যে সকল গুণই সূক্ষ্মরূপে থাকিতে পারে। তাই, অব্যক্তেরও সগুণ, সগুণ-নির্গুণ ও নির্গুণ এই তিন ভেদ করা হইয়াছে। 'গুণ' শব্দে শুধু মনুষ্যের বহিরিন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা নহে, মনের দ্বারাও যে সকল গুণের জ্ঞান হয়, সেই সমস্ত গুণই এই স্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের মূর্ত্তিমান অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাক্ষাৎ অর্জ্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, উপদেশ করিতেছিলেন, তাই গীতার স্থানে স্থানে তিনি আপনার সম্বন্ধে প্রথম পুরুষের নির্দ্দেশ এই প্রকার করিয়াছিলেন—যথা, "প্রকৃতি আমার স্বরূপ" (৯. ৮), "জীব আমার অংশ" (১৫. ৭) "সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা আমি" (১০. ২০) "জগতে যে যে শ্রীমান্ কিংবা বিভূতিমান মূর্ত্তি আছে সে সমস্ত আমার অংশ হইতে হইয়াছে" (১০. ৪১), "আমার পরে মন রাখিয়া আমার ভক্ত হও" (৯. ৩৪), "তবে তুমি আমারই সহিত মিলিত হইবে, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত বলিয়া তোমাকে আমি ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি" (১৮. ৬৫), এবং যখন নিজের বিশ্বরূপ দেখাইয়া অর্জ্জুনকে ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইলেন যে, সমস্ত চরাচর জগৎ আপন ব্যক্ত স্বরূপেই ওতপ্রোত হইয়া আছে, তখন ভগবান তাঁহাকে এই উপদেশ করিলেন যে, অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যক্তের উপাসনা করা অধিক সহজ; তাই তুমি আমার উপর তোমার ভক্তি স্থাপন কর (গী. ১২. ৮) আমিই ব্রহ্মের, অব্যয় মোক্ষের, শাশ্বত ধর্ম্মের ও নিত্য সুখের মূল-স্থান (গী. ১৪. ২৭)। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গীতার অধিকাংশ স্থলেই ভগবানের ব্যক্ত স্বরূপই মুখ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এইটুকু হইতেই নিছক ভক্তিমানী পণ্ডিত ও টীকাকারগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতাতে পরমেশ্বরের ব্যক্ত রূপই অন্তিম সাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহা সত্য বলিয়া মানিতে পারা যায় না। কারণ, উপরি-উক্ত বর্ণনার সঙ্গেই ভগবান স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আমার ব্যক্ত স্বরূপ মায়িক, এবং তাহার অতীত (পর) অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বরূপই আমার সত্য স্বরূপ। উদাহরণ যথা—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্‌॥

অর্থাৎ—"আমি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও অজ্ঞান লোক আমাকে ব্যক্ত মনে করে, এবং ব্যক্তের অতীত আমার শ্রেষ্ঠ ও অব্যয় স্বরূপ তাহারা জানে না" (গী. ৭. ২৪); এবং ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে (৭. ২৫) ভগবান বলিতেছেন যে, "আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় মূর্খ লোক আমাকে জানে না।" আবার চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি আপন ব্যক্ত স্বরূপের উপপত্তি এইপ্রকার বলিয়াছেন; 'আমি জন্মবিরহিত ও অব্যয় হইলেও আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমি নিজ মায়ার দ্বারা (স্বাত্মমায়য়া) জন্মগ্রহণ করি অর্থাৎ ব্যক্ত হইয়া থাকি" (৪·৬)। এবং পরে সপ্তম অধ্যায়ে বলিতেছেন—এই "ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি আমার দৈবী মায়া; ওই মায়াকে যে কাটাইয়া উঠে ও সে-ই আমাকে প্রাপ্ত হয়,

এবং সেই মায়ার দ্বারা যাহার জ্ঞান নষ্ট হয় সেই মূঢ় নরাধম আমার সহিত মিলিত হইতে পারে না" (৭·১৫)। শেষে ১৮ তম অধ্যায়ে (১৮·৬১) ভগবান উপদেশ করিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন! সমস্ত ভূতের হৃদয়ে জীব-রূপে ঈশ্বরই বাস করেন, তিনি আপন মায়ার দ্বারা সমস্ত ভূতকে যন্ত্রের ন্যায় ঘুরাইয়া থাকেন"। অর্জ্জুনকে ভগবান যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন তাহাই ভগবান নারদকেও দেখাইয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত নারায়ণী প্রকরণে কথিত হইয়াছে (শাং ৩৩৯); এবং নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত ধর্ম্মই গীতারও প্রতিপাদ্য ইহা আমি প্রথম প্রকরণেই দেখাইয়াছি। নারদকে এইরূপ সহস্র চক্ষুর, রঙ্গের এবং অন্য দৃশ্য গুণের বিশ্বরূপ দেখাইবার পর ভগবান বলিয়াছেন—

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি॥

"তুমি আমার যে রূপ দেখিতেছ তাহা আমার উৎ-পাদিত মায়া; ইহা হইতে তুমি এরূপ বুঝিও না যে, সমস্ত ভূতের গুণের দ্বারা আমি যুক্ত।" আবার ইহা বলিয়াছেন যে, "আমার প্রকৃত স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী, অব্যক্ত ও নিত্য এবং তাহা সিদ্ধপুরুষেরা জানেন," (শাং ৩৩৯. ৪৪, ৪৮)। এই জন্য বলিতে হয় যে, গীতায় বর্ণিত অর্জ্জুনকে ভগবানের প্রদর্শিত বিশ্বরূপও মায়িকই ছিল। সারকথা, উপাসনার নিমিত্ত ভগবান গীতায় ব্যক্ত স্বরূপের প্রশংসা করিলেও পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠস্বরূপ অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর; এবং সেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়াই তাঁহার মায়া; এবং এই মায়া কাটাইয়া শেষে তাহার পরমাত্মার শুদ্ধ ও অব্যক্ত স্বরূপের জ্ঞান না হইলে মনুষ্যের মোক্ষলাভ হয় না, ইহাই যে গীতার সিদ্ধান্ত, তাহা উপরি উক্ত বিচার হইতে নির্ব্বিবাদে দেখা যায়। মায়া জিনিসটা কি তাহার অধিক বিচার পরে করিব। উপরে প্রদত্ত বচনাদি হইতে এইটুকু স্পষ্ট হইতেছে যে, এই মায়াবাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য নূতন বাহির করেন নাই, তাঁহার পূর্ব্বে তাহা ভগবদ্গীতায়, মহা-ভারতে এবং ভাগবত ধর্ম্মেতেও গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও এইরূপ জগতের উৎ-পত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং" (শ্বেতা, ৪·১০)। "মায়াই অর্থাৎ (সাংখ্যের) প্রকৃতি, এবং পরমেশ্বর সেই মায়ার অধিপতি তিনিই আপন মায়ার দ্বারা বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন।

পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ ব্যক্ত নহে, অব্যক্ত,—ইহা এখন স্পষ্ট হইলেও, এই শ্রেষ্ঠ অব্যক্তস্বরূপ সগুণ কি নির্গুণ ইহারও এইখানে কিছু বিচার করা আবশ্যক। কারণ, যখন সগুণ অব্যক্তের আমার সম্মুখে এই এক উদাহরণ আছে যে, সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও সগুণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমো-গুণময়ী, তখনই পরমেশ্বরের অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপও ঐ প্রকার সগুণ বলিয়া মানিতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে, আপন মায়ার দ্বারাই হোক্‌না কেন; কিন্তু যখন ঐ অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত জগৎ নির্ম্মাণ করেন (গী· ৯·৮) ও সকলের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদের দ্বারাই সমস্ত করাইয়া থাকেন (১৮·৬১), যখন তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু (৯·২৪), যখন প্রাণীগণের সুখ-দুঃখাদি সমস্ত 'ভাব' তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় (১০. ৫), এবং যখন প্রাণিগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদনকারী তিনিই এবং "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্" (৭.২২) —প্রাণীদিগের বাসনার ফল দাতা তিনিই; তখন তো এই কথাই সিদ্ধ হইতেছে যে, তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রি-য়ের অগোচর হইলেও দয়া, কর্তৃত্ব প্রভৃতিগুণের দ্বারা যুক্ত সুতরাং 'সগুণ'। কিন্তু উল্টাপক্ষে ভগবান এইরূপও বলিতেছেন যে "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি"—কর্ম্ম অর্থাৎ গুণও আমাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে না (৪. ১৪); প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হইয়া মূর্খলোক আত্মা-কেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে (৩. ২৭; ১৪.১৯); কিংবা এই অব্যয় ও অকর্ত্তা পরমেশ্বরই প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে জীবরূপ থাকা প্রযুক্ত (১৩. ৩১), প্রাণিমাত্রের কর্তৃত্ব ও কর্ম্ম এই দুই হইতেই বস্তুত তিনি অলিপ্ত হইলেও অজ্ঞানে অভিভূত লোক মোহে পতিত হয় (৫. ১৪, ১৫)। এইপ্রকার অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমেশ্বরের স্বরূপ সগুণ ও নির্গুণ, এই দুই প্রকারেই বর্ণিত হইয়াছে এরূপ নহে; কিন্তু কোন কোন স্থলে এই দুই রূপকে একত্র মিলাইয়া পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থো" (৯, ৫)—আমি ভূতসমূহের আধার হইলেও তাহাদের মধ্যে আমি নাই; এইরূপ নবম ও ত্রয়ো-দশ অধ্যায়ে "পরব্রহ্ম সৎও নহেন অসৎও নহেন" (১৩. ১২), "সর্ব্বেন্দ্রিয় আছে বলিয়া প্রতিভাত অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত এবং নির্গুণ হইয়াও গুণের উপ-ভোক্তা" (১৩.১৪), "দূরে এবং নিকটেও আছেন অবি-ভক্ত অথচ বিভক্তরূপে দৃষ্ট" (১৩. ১৬) এইপ্রকার পরমেশ্বর-স্বরূপের পরস্পরবিরুদ্ধ অর্থাৎ সগুণ নির্গুণ-মিশ্রিত বর্ণনাও করা হইয়াছে। তথাপি প্রারম্ভে দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলা হইয়াছে যে, "এই আত্মা, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য" (২. ২৫); আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "এই পরমাত্মা অনাদি, নির্গুণ ও অব্যয় হওয়া প্রযুক্ত শরীরের মধ্যে থাকিলেও কিছুই করেন না এবং তিনি কিছুতেই লিপ্ত হন না" (১৩. ৩১)। এইরূপ

পরমাত্মার শুদ্ধ, নির্গুণ, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, অচিন্ত্য, অনাদি ও অব্যক্ত স্বরূপেরই শ্রেষ্ঠত্ব গীতায় বর্ণিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

সুরা।

(উদ্ধৃত)

(কুমার শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব)

সাধারণতঃ সুরাশব্দে সর্ব্বপ্রকার মদ্যই বুঝায়। সুরার অনেক নাম—মদ্য, মদিরা, মধু, সীধু, আসব ইত্যাদি। কাদম্বরী, বারুণী প্রভৃতি শ্রুতিসুখকর নামও পাওয়া যায়; তন্ত্রশাস্ত্রে 'কারণ' 'তত্ত্ব' 'তীর্থ' প্রভৃতি গূঢ়ার্থক নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত কোষগ্রন্থে ষাটটির অধিক নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। মদ্ ইতি ধাতু; মদ্য বা মদিরা সেবনে মদ বা মত্ততা উপস্থিত হয়, ইহাই নামের ব্যুৎপত্তি।

যাবনিক 'সরাপ' বোধ হয় সুরার বৈমাত্রেয় ভাই। 'সরবৎ' ও ইংরাজী 'সিরাপ' (syrup) হয়ত নিকট আত্মীয়।

সুরা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত উক্ত হইয়াছে—"গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।"

প্রাচীন শাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার মদ্যের উল্লেখ রহিয়াছে,—

"মাধ্বীকং পানসং দ্রাক্ষং খার্জ্জুরং তালমৈক্ষবম্।
মৈরেয়ং মাক্ষিকং টাঙ্কং মধুকং নারিকেলজম্।
মুখ্যমন্নবিকারোত্থং মদ্যানি দ্বাদশৈব চ॥" (জটাধর)

(মহুয়া, কাঁটাল, আঙ্গুর, খেজুর, তাল, আক, আমলকী, বেল, মধু, যষ্টিমধু, নারিকেল ও ধান হইতে প্রস্তুত।)

ইহার মধ্যে—

"ধাতকীরসগুড়াদিকৃতা মদিরা—গৌড়ী।
পুষ্পদ্রবাদিমধুসারময়ী মদিরা—মাধ্বী।
বিবিধধান্যজাতা মদিরা——পৈষ্টী।"

অর্থাৎ ধাইফুল ও গুড় হইতে হয় গৌড়ী; ফলরস, ফুলমধু হইতে হয় মাধ্বী; নানা রকম ধান চাল হইতে হয় পৈষ্টী—অর্থাৎ ধেনো মদ।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহারই চুরাশীটি ভেদ আছে, যাহা পথ্য বলিয়া গণ্য; অপথ্য মদ্যের সংখ্যা নাই।

উদ্ভবস্থান (বস্তু) হইতেই এই বিবিধ নাম, বুঝাই যাইতেছে।

পুরাণ-ইতিহাসে দৃষ্ট হয় সুধা বা অমৃতের উৎপত্তিস্থান যাহা, সুরারও তাহাই। অবশ্য সকলেই অবগত আছেন, গরল, কালকূট বা হলাহলের উৎপত্তিস্থানও তাহার সন্নিকটে। সুরা—দেবী; অনেকেই বলিবেন শীতলা ওলাউঠার ন্যায় ইনিও এক মহা-প্রকোপ-বিশিষ্টা জাগ্রতা দেবী।

অমৃতসংগ্রহের প্রয়াসে দেবদৈত্য মিলিয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করেন। মন্থনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রীই উত্থিত হইয়াছিল—হস্তিশ্রেষ্ঠ ঐরাবত, অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, কামধেনু সুরভি, পুষ্পশ্রেষ্ঠ পারিজাত, রত্নশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ, ওষধির রাজা চন্দ্র, ঐশ্বর্য্যের রাণী লক্ষ্মী, প্রভৃতি। সেই সঙ্গেই উঠিয়াছিলেন—সমুদ্রাধিদেব বরুণের দুহিতা, সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বারুণী। উত্থিতা হইয়াই ইনি গ্রহীতার অন্বেষণ করিলেন। দৈত্যেরা ইঁহাকে গ্রহণ করিল না, দেবগণ আশ্রয় দিলেন। এই প্রতিগ্রহনিবন্ধন তদবধি দেবগণ উপাধি পাইলেন 'সুর', দৈত্যগণের নাম হইল 'অসুর।' *

[রামায়ণ। আদি ৪৫

"সুরাপরিগ্রহাৎ দেবাঃ সুরাখ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।"

সুরাপক্ষপাতী সুরগণ অসুরগণকে স্বর্গ হইতে খেদাইয়া দিয়াছিলেন।

পুরাণ অনুসারে এই পৃথিবীতে সাতটি সমুদ্র আছে, তন্মধ্যে একটি সুরাসমুদ্র।

সুরা যে দূর পূর্ব্বকালেও বড় আদরের বস্তু ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। কি দেবদেবতা কি মুনিঋষিগণ সকলেই ইহার গুণমুগ্ধ ছিলেন, সেবা করিতেন; সামান্য মনুষ্যের ত কথাই নাই। কালক্রমে অসুর দৈত্যরাও আপনাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া দেবীর যে পরম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, পুরাণ-উপপুরাণে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, আমি ভুল করিতেছি। দেব-ঋষিরা পান করিতেন সোমরস, সে কি সুরা? সত্য; উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে স্বীকার করি। কিন্তু ব্যবহারফলের দিকে দৃষ্টি রাখিলে, উভয়ের মধ্যে যে বিশেষ তফাৎ আছে, মনে হয় না।

সুরা প্রস্তুত হয়, ধান্য-ফল-ফুল-রস হইতে; আর সোমরস প্রস্তুত হইত, লতা-বিশেষের নির্য্যাস হইতে। সোমরস পান করিলে স্বর্গলাভের—অমরত্ব লাভের সম্ভাবনা ঘটিত; সুরা পান করিলে বিষম প্রত্যবায়—নরকবাস ঘটে; শাস্ত্রে ঐরূপ উল্লেখ আছে।

স্মৃতিগ্রন্থ বিষ্ণু-সংহিতায় রহিয়াছে,—"সোমপায়ী ব্যক্তি সুরাপায়ীর মুখ আঘ্রাণ করিলে জলমগ্ন অবস্থায় তিন বার অঘমর্ষণ জপ করিয়া ঘৃত ভোজন করতঃ এক দিন থাকিবে, তবে তাহার পাপ মোচন হইবে।"

[বিষ্ণু। ৫১।১-২

সোমপায়ী ও সুরাপায়ীর মধ্যে এতই প্রভেদ! সুরাস্পর্শে পাপ, সুরার আঘ্রাণে পর্য্যন্ত পাপ। সুরার আঘ্রাণমাত্র গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সুরাপায়ী পতিত, সুরাপান করিলে নরক অনিবার্য্য—বহু স্মৃতিকার ঋষিই বিধান দিয়াছেন। আর সোমরস দেবতার ভোগ "সোম জ্যোতি দান করে, স্বর্গ দান করে, সমস্ত সৌভাগ্য দান করে, শত্রু নাশ করে ও মঙ্গল বিধান করে।" বৈদিক ঋষিগণ উল্লাসভরে গান করিয়াছেন। [ঋক্। ৯৪।২।৩] সুরার উপর শুক্রশাপ, ব্রহ্মশাপ, কৃষ্ণশাপ আছে, দৃষ্ট হয়। সোম ও সুরার এতই পার্থক্য!

---

* কোন কোন পুরাণে ইহার বিপরীত কথা আছে; যথা—শ্রীমদ্ভাগবত। ৮ স্ক ৮ অ।

সোম নামক লতা (এক প্রকার পার্ব্বত্য উদ্ভিদ্) প্রস্তর দ্বারা নিষ্পীড়ন করতঃ অর্থাৎ থ্যাতলাইয়া, দশ আঙ্গুলে চটকাইয়া শ্বেতবর্ণ (অথবা হরিত কিম্বা পিঙ্গল বর্ণ) * এক প্রকার ঈষৎ অম্লস্বাদ রস বাহির হইত; সেই রস জলে ফেনাইয়া লইয়া মেষলোমনির্ম্মিত ছাঁকনীতে ছাঁকিয়া কাষ্ঠ বা গোচর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রে নয় দিন ধরিয়া রাখিয়া পচাইয়া লওয়া হইত; তখন মাদক অবস্থায় পরিণত হইলে উহা ব্যবহারের উপযোগী হইয়া দাঁড়াইত। ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর কিম্বা নাবার ও ভৃষ্টযব সহযোগে অতি উপাদেয় পানীয় হইয়া উঠিত—যাহার জন্য দেবতা ঋষিরা লালায়িত হইয়া থাকিতেন।

সোমরস পান করিলে যে বিলক্ষণ নেশা হইত, বেদে ভূয়োভূয়ঃ তাহার উল্লেখ আছে। সোমপানে প্রাণে স্ফূর্ত্তি আইসে, মাদকতা জন্মে, এমন কি নিদ্রা আসিয়া পড়ে, ঋক্‌বেদে (৯ মণ্ডল) সে কথাও রহিয়াছে। সোমের একটী বিশেষণ,—মদিরার ন্যায় তুমি সতেজ (৯।১০৮।১২)। এই দূর্ব্বাদলবর্ণ সোম যিনি মদিরা ক্ষরিত করেন (৯৫৩।৪)। সোমরস দেবতাদিগের অতি প্রিয় পানীয়। পানীয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত (৯।৫১।২)। দুগ্ধসংযোগে সুবাসিত সোমপানে আমোদ। পানে সুখ (৯।৪৫।৩)। সোমের নামান্তর অমৃত। সোমই অমৃত। † ৬।৪৪।১৬

পুরাকালে আর্য্যজাতির সোমযাগ ছিল। ‡ সোমযজ্ঞে দেবতাকে সোমরস নিবেদন করা হইত। যাজ্ঞিকেরা, যজ্ঞকর্ত্তারা, ঋত্বিক্ ও যজমান যজ্ঞশেষ গ্রহণ করিতেন অর্থাৎ প্রসাদী সোমরস পান করিতেন। সোমযজ্ঞে দেবতাদিগকে ভাণ্ড ভাণ্ড চিত্তমুগ্ধকর সোমরস সমর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত করিবার উল্লেখ আছে। যজ্ঞকারীরা উৎফুল্ল হইয়া গাহিয়াছেন "সে অমিয়ধারা পান করিলে অসুস্থ সুস্থ হইয়া উঠে, কবির কবিত্ব-উচ্ছ্বাস ফুটে, দরিদ্র মনে মনে ধনভাণ্ডার লুটে!" (৯।৬৭।১৩) "ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাহা কিছু উলঙ্গ তাহাই আবৃত এবং যাহা কিছু আতুর তাহাই আরোগ্য করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপায় অন্ধ দেখিতে ও খঞ্জ হাঁটিতে পারে।" (৮।৭৯।২) (ক্রমশঃ)

গার্হস্থ্য সংবাদ।

গত ২৬শে বৈশাখ (৯ই মে) শুক্রবার মাননীয় জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের বালিগঞ্জস্থ ভবনে ডাক্তার সুহৃদনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরমা দেবীর সহিত দারিয়াপুর নিবাসী ৺প্যারিমোহন সিকদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সিকদারের শুভ বিবাহ আদিব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। চৌধুরীপরিবার সমাগত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে সাদরসম্ভাষণে পরম পরিতোষ প্রদান করিয়াছিলেন। বিবাহ শেষ হইয়া গেলে প্রীতিভোজন হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি পৌরোহিত্য করেন।

গত ২৯শে বৈশাখ (১২ই মে) সোমবার কলিকাতা ৫১ নম্বর গড়পার নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র পাকড়াসী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সবিতা দেবীর সহিত শ্রীযুক্ত ক্ষতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ আদিব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শোক সংবাদ।

৺রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর—আমরা গভীর শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে প্রথিতনামা পণ্ডিত রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। তিনি ৯ই এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় দুরারোগ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে অশীতিপরা বৃদ্ধা মাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও দেশবাসীকে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স কিঞ্চিদধিক উনষাট বৎসর হইয়াছিল। আমরা ঈশ্বরের নিকট তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিসুখ প্রার্থনা করি।

আয় ব্যয়।

১৮৪০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮৯।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৯০১৮॥৶১
পূর্ব্ববৎসরের স্থিত	...	৫৸৶৬
সমষ্টি	...	৯০২৪॥/৭
ব্যয়	...	৯০২২৻৭
স্থিত	...	২॥/০

* ঋক্‌বেদে সোমরস নানাবর্ণ—শ্বেত, হরিত, পিঙ্গল, লোহিত, রক্ত। সোমলতা দূর্ব্বাবর্ণ।

† বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের কাহারও কাহারও মতে অমৃত ও সোম অভিন্ন। দেবগণের পানীয় সমুদ্রমন্থনোদ্ভব অমৃতের উল্লেখ ঋকবেদে নাই। বহুস্থলে আছে, সুপর্ণ শ্যেন পক্ষী আকাশ হইতে সোম আনিয়াছিলেন (৯।৪৮।৪); ইহা হইতেই পুরাণে সুপর্ণ গরুড় কর্ত্তৃক অমৃত আহরণ আখ্যানের উৎপত্তি। সোম যদি হয় অমৃত বা সুধা, সুরার সহিত সুধার বড় তফাৎ নাই।

‡ প্রাচীন আর্য্যজাতির শাখা ইরানীয়দিগের মধ্যেও সোমের ব্যবহার ও উপাসনা ছিল। তাঁহারা সোমকে হওমা কহিতেন ও যজ্ঞে ইহার অভিষব প্রদান করিতেন। তাঁহাদের উত্তর পুরুষ বোম্বায়ের পার্সী সম্প্রদায় এখনও উহা করিয়া থাকেন।

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	...	২৪০০৲
বাৎসরিক দান	...	২১৲
আনুষ্ঠানিক দান	...	২৭৲
এককালীন দান	...	২৬৷/০
মাঘোৎসবের দান	...	৪০৷৷০
বণ্ডেড ওয়্যার হাউস ডিভিডেণ্ড		১০০৲
কোম্পানীর কাগজের সুদ	...	৯২৻৪
ওয়ারলোনে সুদ	...	৬/১০
সসপেন্স আদায়	...	৯৭৻৩
সসপেন্স জমা	...	৩৩৸/০
Theological College fund		২৯৷/৮
দানাধারে প্রাপ্ত	...	২৷/৬
পুরাতন কাগজ বিক্রয়	...	৬৶৯
গচ্ছিত আদায়	...	২৩২৫৷৶৩
হাওলাত আদায়	———	৫৭৲
হাওলাত জমা	...	১০৭৬৷৶৯
সমষ্টি		৬৩৪১৷৶৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বকেয়া মূল্য	...	২২২৸৯
কালমূল্য	...	২৪৬৶০
ডাকমাশুল	...	২৫/০
নগদ বিক্রয়	...	৪/৯
সমষ্টি	...	৪৯৮/৬

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	...	৯১৸/০
গচ্ছিত পুস্তক	...	১১৯৷০
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	...	১৫৶৬
ডাকমাশুল আদায়	...	৮৷৷৬
সমষ্টি	...	২৩৫/০

যন্ত্রালয়।

তত্ত্ববোধিনী মুদ্রণ	———	৪৯৫৲
সমাজের পুস্তক মুদ্রণ	...	৩৬৲
অপরের পুস্তক মুদ্রণ	...	৭০৫৶৯
কাগজের মূল্য	...	৫৯১৷৷৶৯
দপ্তরী	...	১০৬৸৯
বিবিধ জমা		৯৲
সমষ্টি	...	১৯৪৪/৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

কর্ম্মচারীর বেতন	...	৯১৭৶০
আসবাব	...	৩১৸/৬
সরঞ্জামী	...	১৫৸/৩
ডাকমাশুল	...	২২৶৬
পাখাকুলি	...	৮৷০
গান ছাপান	...	৩৬৲
ইলেক্‌ট্রিক্‌লাইট	...	৩৬৷৷৶০
আলো মেরামত	...	৫৷৷/০
ট্যাক্স	...	২০৭৸৶০
লাইসেন্স	...	১২৲
কেরোসিন তৈল	...	৮৷৬
বারবরদারী	...	২৪৸৯
পার্ব্বনী	...	৩৲
সসপেন্স	...	৬০৷/৯
মাঘোৎসব	...	১০৪৷৷০
কোম্পানীর কাগজক্রয়	...	১৭০৷৶০

১৯১৭ সালের ১১শে আগষ্ট তারিখের ০৩৪৬১২ নং ৫৲ সুদের ওয়ারলোন ও ১৮৫৪।৫৫ সালের ১৮৬০৩৮ নং ৩৷০ সুদের কাগজ।

সসপেন্স শোধ	...	৩২৸৶০
অন্যান্য	...	২১৸৶৩
গচ্ছিত	...	২৪৮৪৸৶১
হাওলাত দাদন	...	৫০৸৶৯
হাওলাত শোধ	...	১৫২৯৷৷৶৩
সমষ্টি	...	৫৭৮৪৸৶৭

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

কাগজের মূল্য	...	২২২৷৷৶৬
মুদ্রাঙ্কণ মূল্য	...	৪৯৫৲
বাঁধান	...	২৮৷৷০
প্রবন্ধ	...	১০৭৸০
ডাকমাশুল	...	৭৭৶৩
কর্ম্মচারীর বেতন	...	৬০৲
কমিশন	...	৪৸০
অন্যান্য	...	১৷৶৩
সমষ্টি	...	৯৯৬৸৶০

পুস্তকালয়।

দপ্তরী	...	৫৶০
গ্রন্থভাণ্ডারের জন্য পুস্তক	...	১৮৻৩
বিক্রয়ের জন্য পুস্তক ক্রয়	...	২৸৶০
গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শোধ	...	৭৯৷৩
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	...	১১৸৶৯
বিজ্ঞাপন	...	৬৷/৬
ডাকমাশুল	...	১১৷৷/০
অন্যান্য	———	৸৩
সমষ্টি	...	১৪৩৲

যন্ত্রালয়।

কর্ম্মচারীর বেতন	...	৯৭৭৷৷৶৬
জলপানী	...	৫৷৷৶০
প্রুফ কাগজ	...	১৩৸৶০
অপরের কাগজ	...	৫১৪৷৶৯
কালী	...	২১৷৶০
দপ্তরী	...	১৫৫৸/০
অক্ষর	...	১৮৫৷৷৩
মাশুল	...	৮৲
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	...	১১৩৷৷৶০
সসপেন্স	...	৪২৷৷০
অন্যান্য	...	৬০৸৶৬
সমষ্টি	...	২০৯৭৶০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ কল্প

প্রথম ভাগ।

আষাঢ় ব্রাহ্মসমাজ ৯০।

৯১১ সংখ্যা — ১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

চিরাশ্রয়।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

শুধু তুমি—শুধু তুমি—শুধু তুমি নাথ,
আছ—আছ মোর তরে! নিষ্ঠুর ভুবন
সুকোমল বুকে মোর করিয়া আঘাত
বিকচ জীবনখানি করিতে দহন
জ্বালে শত দাবানল—নিবিড় আঁধার
ঘেরে আসে চারিধারে, মনে হয় হায়,
নাহি বুঝি মুক্তি আর! হে প্রিয় আমার!
তুমি হাস প্রাণে বসি', পীযূষ-ধারায়
কবে যাই সিক্ত হয়ে! চেয়ে দেখি কবে
দুই বাহু প্রসারিয়া মায়ের মতন
আমারে রেখেছ ঢাকি' বিষ-দগ্ধ ভবে
সকল বেদনা হতে! বুঝি না কেমন
এ লীলা—এ দয়া তব! শুধু সত্য জানি
হারাব না কভু এই চিরাশ্রয়খানি!

জাতীয় জীবনের অন্যতর ভিত্তি।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

যখন কোন অধঃপতিত জাতি নানা অত্যাচার ও কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখনই সেই মৃতকল্প জাতির মধ্যে জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হইয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যেও প্রকৃত জাতীয় জীবনের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

এই পবিত্র 'জাতীয়-জীবন' যে কয়েকটী সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, আত্মসম্মানজ্ঞান এবং আপনার জনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্মান-স্পৃহা তন্মধ্যে একতম, প্রধানতমও বটে।

যে জাতির আত্মসম্মান বোধ নাই, যাহারা আপনার জনকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে জানে না, তাহারা শত সাধনা সত্ত্বেও জগতে উন্নতির স্তরে আরোহণ করিতে পারে না। সে জাতি জীবিত হইলেও মৃত।

প্রকৃত আত্মসম্মানজ্ঞান মানুষকে 'মানুষ' করিয়া তোলে, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রমুখে তাহাকে সজোরে আকর্ষণ করে। পরস্পরকে যথোপযুক্ত সম্মান করিতে জানিলে প্রথম দর্শনেই পরস্পরের গুণাবলী পরস্পরের চক্ষে পড়ে; নিজের দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবার সুযোগ ঘটে। ইহাতে হিংসা বিদ্বেষ কিংবা পরশ্রীকাতরতা মনে আসিতে পারে না; পক্ষান্তরে অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনও সহজসাধ্য ও সুদৃঢ় হয়।

ইতিহাস আবহমান কাল হইতে প্রাগুক্ত বিষয়-দ্বয়ের অশেষ গুণ-কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। যে ইংরাজ আজ উন্নতির সর্ব্বোচ্চগ্রামে আরূঢ় বলিয়া এত স্পর্দ্ধা করে, তাহাদের মধ্যে আত্ম-সম্মানজ্ঞান ও পরস্পরের প্রতি সম্মান-স্পৃহা অতীব বলবতী। ইংরাজ আত্ম-সম্মান রক্ষা করিবার জন্য কি না করে?

সম্প্রতি জাপানসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তকে পড়িতেছিলাম—"জাপানীদের মনুষ্যত্বের মূল্য কোথায় ? একটা উৎকট আত্ম-মর্য্যাদা বা আত্ম-সম্মান জ্ঞানে। যে আত্ম-সম্মানবোধ মনুষ্যের আপাদমস্তকে এক বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারণ করে, এবং অবমাননার ছায়পাতেও জীবনটা অবলীলা-ক্রমে মৃত্যুর পায়ে ঠেলিয়া দিতে প্রস্তুত করে, সেই তীব্র আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞান যে জাতির আছে, তাহাকে জগতের সমক্ষে হীন করিয়া রাখে, এ শক্তি কাহার ?

"যাহাদের আত্ম-সম্মান জ্ঞান আছে, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে সক্ষম—পাশ্চাত্য জগতে যাহাকে স্বদেশ-প্রেম বলে, উহা এই আত্মমর্য্যাদারই নামান্তর মাত্র।

"এই আত্ম-মর্য্যাদাবোধ এবং তৎপ্রসূত আত্ম-নির্ভর ও স্বাবলম্বন জাপানীদের মধ্যে সুতীব্র ভাবে বিদ্যমান এবং উহার মূলে এক অমর তেজ নিহিত রহিয়াছে।"

জাপানীরা যে পরস্পরকে সম্মান করিতে কত পটু, লেখক সে কথা এ স্থলে না লিখিলেও আমরা অবগত আছি; প্রকৃত মানীই অপরের মান রক্ষা করিতে জানেন।

কথায় বলে "প্রাণ অপেক্ষা মান বড়"। মহা-রাজ দুর্য্যোধন এই মানের জন্যই প্রাণ দিয়াছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সোনার ভারতকে মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি ভাগ্যদোষে মানীর মান রক্ষা করিতে জানিতেন না—তিনি ধর্ম্মরাজ যুধি-ষ্ঠিরকে তাঁহার জ্যেষ্ঠোচিত সম্মানপ্রদর্শনে পরাঙ্মুখ ছিলেন, তাই পরিণামে তাঁহার এত শোচনীয় অধঃপতন।

আজ আমরা আশার অত্যুজ্জ্বল আলোকে মুগ্ধ হইয়া জাতীয় জীবন লাভার্থ ছুটিয়াছি, কিন্তু আমা-দের মধ্যে তেমন আত্মসম্মানজ্ঞান, তেমন পরস্প-রের প্রতি সম্মানস্পৃহা কোথায় ? তবে আমাদের জাতীয় জীবন কোন্ অক্ষয় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে ?

আমাদিগের পূজ্যতম পিতৃপুরুষগণের অতীত গৌরবকাহিনী স্মরণ করিয়া আমরা যে মধ্যে মধ্যে স্ফীত হই, তাহা আত্মসম্মান-জ্ঞান নহে; তাহা আত্মাভিমান বা আত্মছলনা। আমরা মাঝে মাঝে পরস্পরকে সম্মান দেখাইবার জন্য যে উৎসুক হইয়া উঠি, তাহা অনেক স্থলে পরস্পর-সম্মান-স্পৃহা-সঞ্জাত নহে; স্থলবিশেষে তাহা আন্তরিকও নহে; প্রকৃত পক্ষে উহা বাহ্যিক শিষ্টাচার বা লোকাচারের একটা অস্থায়ী উচ্ছ্বাস মাত্র।

আত্মাভিমান বা আত্মছলনা মানুষকে আত্মো-ন্নতি বিষয়ে অন্ধ করে, আর সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক উচ্ছ্বাসই জলবুদ্বুদবিশেষ; যেমনি জাগিয়া উঠে, তেমনি মিলাইয়া যায়, হৃদয়ে চিহ্নমাত্রও অঙ্কিত করিতে পারে না। ফলতঃ কার্য্যকারিতা হিসাবে এ গুলির কোনও মূল্য নাই, ইহাদের দ্বারা ইষ্টা-পেক্ষা অনিষ্টই অবশ্যম্ভাবী।

ইতিপূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, স্বদেশের সহিত বাস্তব পরিচয়ে সকল বিবাদ-বিসম্বাদ, সকল অসামঞ্জস্য বিদূরিত হইয়া যায়। আজ মনে হয়, এই স্বদেশপ্রেমের মধ্যেই প্রকৃত আত্মসম্মানজ্ঞান লুক্কায়িত রহিয়াছে, ইহার বিকা-শেই পরস্পরের প্রতি সম্মানস্পৃহা আপনি জাগিয়া উঠে। যে নিজের মূল্য বুঝে না, সে অপরের মূল্য বুঝিবে কিরূপে ?

আপনাদিগের প্রাচীন জাতীয় ইতিহাস পর্য্যা-লোচনা করিলে আত্মসম্মান বোধ পরিস্ফুট হইতে পারে বটে। কিন্তু দুর্ব্বল হৃদয়ে আত্মসম্মানজ্ঞান স্থলে আত্মাভিমান সংক্রামিত হইবারও আশঙ্কা আছে।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে যাঁহাদিগকে আমাদের দেশনেতা বলিয়া মান্য করি, তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিষয় দুটীর বিশেষ অস-দ্ভাব দেখা যায়। ইহা আমাদের দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষে এবং জাতীয় জীবনের পক্ষে কিছু শুভজনক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

জানি না কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে বিধাতা আমা-দিগের মধ্যে জাপানীদের মত তীব্র আত্মমর্য্যাদা-বোধ ও পরস্পরের প্রতি সম্মানস্পৃহা জাগাইয়া তুলিবেন—আমাদিগের গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় ভাবকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করিবেন। আমরা কি

সে পুণ্য মুহূর্ত্ত অদূরবর্ত্তী বলিয়া আজ আশ্বস্ত হইতে পারি না? একমনে ভগবানকে আহ্বান করিয়া প্রাণের ভিতরে বসাও, তাহা হইলেই জাতীয় ভাব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারিবে। ভগবদ্ভক্তিই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধানতম ভিত্তি।

স্বদেশ-সঙ্গীত।

(বাউলের সুর)

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

ভারতের মলিন মুখ—মুছাও মুছাও!
ভারতের গভীর দুখ—ঘুচাও ঘুচাও!
তৃষ্ণা-ক্ষুধায় হাহা করে লোক
নিবার' নিবার' এ যাতনা শোক
অবমান স্মরি' ভরে আসে চোখ্
জননী, বাঁচাও বাঁচাও!
তোমা সম ওগো জননী
কে বুঝিবে ব্যথা অমনি!
তোমারে ডাকি গো এ ঘোর দুর্দ্দিনে
মুনি ঋষি সনে আন গো সুদিনে
এ তিমির-রাত কর গো প্রভাত
আঁখি, মুছাও মুছাও॥

লাইব্রেরি—আমাদের জীবনের অঙ্গ।

(একটী ইংরাজী প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কোন মহাত্মা বলেছেন যে "একটা ছোট লাইব্রেরিকে প্রত্যেক বৎসর বাড়িয়ে তোলা মানুষের জীবনের একটা খুব ভাল কাজ। পুস্তক রাখা মানুষের কর্ত্তব্য; লাইব্রেরী বিলাসের বস্তু নয়, কিন্তু জীবনের একটা অঙ্গ।" এই লাইব্রেরী অর্থে বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত গ্রন্থভাণ্ডার নহে, কিন্তু পড়িবার জন্য রক্ষিত গ্রন্থাগার। মনুষ্যের জীবনে, কেবল মনুষ্যের কেন, জাতীয় জীবনে লাইব্রেরী যেমন প্রভাব বিস্তার করে, এমন আর কোন কিছুও করিতে পারে কি না সন্দেহ।

অনেক লাইব্রেরী সম্বন্ধে সুপাঠ্য ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। কত অমূল্য লাইব্রেরী পুড়িয়া যাইবারও বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সকল বিবরণ নীরস নহে; সেগুলি পড়িলে মনে হয় যেন উপন্যাস পড়িতেছি। কোন দেশে বিদ্রোহ-বিপ্লব ঘটিবার সঙ্গে, কিম্বা যুদ্ধ বাধিলে কত ভাল ভাল লাইব্রেরি যে বিনষ্ট হইয়া যায় বা যাইবার সম্ভাবনা, তাহা ভাবিলেই বিদ্রোহবিপ্লব বাধাইতেও ইচ্ছা হইবে না, আর অন্যায় লোভে অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইতেও ইচ্ছা জাগিবে না। প্যারিসে একবার ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব উপলক্ষে ক্ষিপ্তপ্রায় লোকেরা সেখানকার একটা বৃহৎ লাইব্রেরি পুড়াইয়া দিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি কবি ভিক্টর হিউগো তাঁহার এক গ্রন্থে ("ভীষণ বৎসর") ইহারই উদ্দেশে মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন:—

"তুমি তবে পুড়ায়েছ গ্রন্থাগার ওই?—
পুড়ায়েছি আমি—আগুন দিয়েছি আমি।
অপরাধ—এত বড় শুনিনিকো কোথা—
হতভাগ্য নিজপ্রতি করেছ এ পাপ!
বুঝিয়া দেখেছ তুমি করেছ কি কাজ?—
নিভায়েছ আপনার প্রাণের আলোক।"

পুরাকালে মিশর দেশের আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে একটী সুবৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। এই একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, একবার যখন মুসলমানগণ আলেকজাণ্ড্রিয়া নগর দখল করিয়াছিল, তখন তাহাদের সেনাপতি নিজের গোঁড়ামির ফলে সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারটী পুড়াইয়া দিবার হুকুম দিয়াছিল। সেই সেনাপতির কথা ছিল এই যে, কোরাণে যে কথা আছে, সেই কথাই যদি লাইব্রেরির গ্রন্থসমূহে থাকে, তবে সে সমস্ত গ্রন্থ রাখিয়া এত স্থান বৃথা অধিকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই; আর যদি কোরাণে যে কথা আছে, সে কথা যদি লাইব্রেরির গ্রন্থসমূহে না থাকে, অথবা কোরাণের কথার অতিরিক্ত কোন কথা থাকে, তবে সে সমস্ত গ্রন্থ অপাঠ্য, সুতরাং সেগুলি সযত্নে রক্ষা করা অনুচিত। এই যুক্তিতে সেনাপতি সমস্ত লাইব্রেরি পুড়াইয়া দিবার হুকুম দিয়াছিল। ইহা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, মূল কথাটা সত্য বলিয়া মনে হয় যে, আলেকজাণ্ড্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারটী এক সময়ে পুড়িয়া গিয়াছিল, আর সেই সঙ্গে বিস্তর বহুমূল্য গ্রন্থও ভস্মীভূত হইয়াছিল। এই ঘটনার ফলে

জগতের যে লোকসান হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ?

আমাদের দেশেও এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এদেশের তান্ত্রিক রাজাগণ এবং মুসলমান নবাবগণ নিজেদের গোঁড়ামির কারণে কত শত বৌদ্ধস্তূপ এবং সেই সকল স্তূপে সঞ্চিত কত সহস্র অমূল্য পুঁথি যে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যাইতে পারে না। ইহা ব্যতীত, আমাদের পল্লীগ্রামে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘর খড়বিচালিতে ছাওয়া। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই সমস্ত খড়বিচালি শুকাইয়া গিয়া সামান্য বাতাসের হিল্লোলে নড়িতে নড়িতে অথবা কোন সূত্রে একস্ফুলিঙ্গ অগ্নি পাইলেই সহজে জ্বলিয়া উঠে। সেই অগ্নির মুখ হইতে ঐ প্রকার ঘর-দুয়োর রক্ষা করাই অসম্ভব। এই প্রকারে আগুন লাগিয়াও কত পণ্ডিতের কত যে অমূল্য পুঁথি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে করিলেও চক্ষের জল ধরিয়া রাখা যায় না। এই সেদিন বেলজিয়মের লুভেন নগর ধ্বংস করিবার ফলে তাহার যে সুপ্রসিদ্ধ লাইব্রেরি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, শুনা যায় যে সেই লাইব্রেরিতে এমন অনেক পুস্তক ও পুঁথি ছিল যাহা অন্য কোথাও পাওয়া যাইত না। সেগুলি যদি বিনষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহার আর উদ্ধারের কোনই সম্ভাবনা নাই।

তারপর, লড়াই-যুদ্ধ উপলক্ষে এক দেশের লাইব্রেরির গ্রন্থ পুঁথি প্রভৃতি আর এক দেশে যখন লইয়া যাওয়া হয়, তখন কত গ্রন্থ, কত যন্ত্র প্রভৃতি যে নষ্ট হইয়া যায় তাহার সংখ্যা নাই। ইহার ফলে একদেশের লোকেরা পুরুষানুক্রমে সেই সমস্ত গ্রন্থনিহিত জ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকে; যে দেশে সেই সমস্ত গ্রন্থ গিয়া পড়িল, তথাকার লোকেরা নূতন করিয়া সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে ধীরে ধীরে নূতন জ্ঞান লাভ করিবার অধিকারী হইতে লাগে। লড়াই-যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলেও কত শত লাইব্রেরি নানা কারণে একের অধিকার হইতে অপরের অধিকারে চলিয়া যায়, একদেশ হইতে অপর দেশে চলিয়া যায়। এই প্রকার লাইব্রেরি সমূহের উত্থানপতন, হস্তান্তর ব্যাপার প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে আমরা এত মোহিত হইয়া পড়ি যে, আমরা ভুলিয়া যাই যে লাইব্রেরি আমাদের জীবনের একটা অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে যাও, দেখিবে সেখানে প্রায় ত্রিশ লক্ষ পুস্তক তোমাকে ঘিরিয়া আছে; সেখানে কত শত বিদ্বান ব্যক্তি আলোচনা-অধ্যয়নে সমুদয় মনোযোগ নিয়োগ করিয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিলে কে অস্বীকার করিবে যে, এই বিংশ শতাব্দীতে, এই উচ্চ শিক্ষা এবং জ্ঞানবিষয়ক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে, লাইব্রেরি আমাদের জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ ? কার্লাইল ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরির সঙ্গে রীতিমত বিবাদ করিলেও ইহার বিশেষ উপকারিতা বুঝিয়া প্রত্যেক নগরে এক একটী সাধারণ লাইব্রেরি খুলিবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

কেবল কার্লাইল কেন, অন্যান্য অনেকেও লাইব্রেরির সংখ্যা বাড়াইবার জন্য এবং সাধারণের পক্ষে সুপাঠ্য পুস্তক পাইবার সুবিধা করিবার জন্য আন্তরিক উপদেশ দিয়াছেন। রাজনীতিজ্ঞেরা খুব জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাতীয় উন্নতির পক্ষে লাইব্রেরি বিশেষ সহায়। এইপ্রকার সকল শ্রেণীর লোকদের উৎসাহ ও অনুমোদনের ভিতরে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রবর্ত্তিত হইয়া হুহু শব্দে বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা বর্ত্তমানে যে রকম বেশী হইয়াছে, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জাতিমাত্রেরই পক্ষে সাধারণ লাইব্রেরি অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক।

সাধারণ পাঠাগার প্রবর্ত্তিত হইবার পর জগতে দু'এক পুরুষ নূতন লোক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছে। নব্যযুগের নূতন লোকদের কার্য্যকলাপে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে সাধারণ গ্রন্থাগার সকল আমাদের জীবনে জাতীয় মঙ্গলের দিকে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে।

মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি দেখিয়া অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, সাধারণ পাঠাগার অপেক্ষা আর একটী জিনিস লোকের সুখ ও আনন্দ বিধানে অধিকতর সাহায্য করিবে—সেটী হইতেছে যাহারা পুস্তক ভাল বাসে, তাহাদের পুস্তক পাইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া—এক কথায়, প্রত্যেকের নিজ নিজ গৃহে লাইব্রেরি গড়িয়া তুলিবার সাহায্য করা।

মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ঘরে ঘরে এই রকম লাইব্রেরি গড়িয়া উঠিয়া দেশের খুব উপকার করিয়াছে বটে, কিন্তু সেই উপকার সম্বন্ধে আমরা বড় বেশী কথা শুনিতে পাই না। আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রে ছাপিবার তড়িদ্গতি এবং তাহার ফলে পুস্তকপ্রকাশে ও পুস্তকের মূল্যে মহাপরিবর্ত্তন প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে লাইব্রেরি গড়িয়া তুলিবার একপ্রকার আশ্চর্য্য প্রণালী বাঁধিয়া দিয়াছে বলিলেও চলে। পুস্তক প্রকাশ খুব উচ্চ সীমায় উঠিলেও এখনও সে বিষয়ে উন্নতি সাধনের অনেক অবসর আছে।

এখনও অনেক বৃদ্ধ জীবিত আছেন যাঁহারা বলিতে পারেন যে এক সময়ে কি-প্রকার উচ্চ মূল্যে পুস্তক কিনিতে হইত—এত উচ্চ মূল্যে যে, অনেক স্থলে মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে পুস্তক ক্রয় করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। এখন তাঁহারা সুলভ মূল্যে ভাল ভাল পুস্তক বিক্রয় হইতে দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবেন যে তাঁহাদের সময়ে সুলভ মূল্যে এ রকম ভাল ভাল গ্রন্থ কেন বিক্রয় হয় নাই। আমাদের দেশে এই বিষয়ে আদিব্রাহ্মসমাজ পথ-প্রদর্শক। আদিব্রাহ্মসমাজ এ দেশে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম ও শাস্ত্রমূলক নানাবিধ গ্রন্থের সম্ভবমত সুলভ মূল্যে সৌষ্ঠবসম্পন্ন ও নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশ করিয়া যখন এ বিষয়ে পথপ্রদর্শন করিয়াছিল, তখন জনসাধারণ অবাক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যে মূল্যে সেই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা সম্ভব-মত অল্প হইলেও এ দেশের মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে উপযোগী হয় নাই। তারপর, জনসাধারণের উপ-যোগী মূল্যে গ্রন্থপ্রকাশের পথপ্রদর্শক হইলেন বঙ্গবাসীর প্রথম স্বত্বাধিকারী স্বনামধন্য ৺ যোগেন্দ্র নাথ বসু। তিনি অধিকসংখ্যক ছাপাইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার মূল মন্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি যখন তাঁহার এই উদ্দেশ্য ঘোষণা করিলেন, আমরা শুনিয়াছি যে, তখন অনেক প্রবীণ গ্রন্থপ্রকাশকও যোগেন বাবুর সে উদ্যমের সার্থকতা বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। তিনি বহুকাল যাবৎ এদেশে এ বিষয়ে একরথী ছিলেন। তাঁহার পর, বসুমতীর স্বত্বাধিকারী ৺উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এবং হিতবাদীর স্বত্বাধিকারী ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বহুসংখ্যক ছাপাইয়া সুলভ মূল্যে গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার মন্ত্র আয়ত্ত পূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাঁদেরই পুণ্যপ্রভাবে আজ বঙ্গদেশ সাহিত্যপ্রেমে সমুদয় ভারতবর্ষের অগ্রণী বলিলেও চলে।

বর্ত্তমানে আমরা ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও মন্ত্রী ব্যালফরের সহিত একবাক্যে বলিতে পারি যে, "জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের সময় অপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে এবং সেই সংগৃহীত বিষয় সকল জনসাধারণের হস্তে অর্পণ করিবারও অনেক বেশী সুবিধা হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা কল্পনাই করিতে পারেন না যে, আমরা এখন কি সুলভ মূল্যে ছোট ছোট বই—ভাল কাগজে ছাপা, ভাল বাঁধা পাইতে পারি।

আর একটী গ্রন্থ-বিক্রয়ের নূতন প্রণালী প্রব-র্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রণালীর নাম আমরা কিস্তিবন্দী প্রণালী দিতে পারি। সামান্য কিছু অগ্রিম দিয়া তুমি এক সেট গ্রন্থের গ্রাহক হইলে; তাহার পর প্রতি মাসে কিছু কিছু করিয়া দিয়া কয়েক মাসে সেই সেটের সমস্ত দামটাও চুকাইয়া দিলে, আর তোমারও বিশেষ কিছু গায়ে লাগিল না। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাই। আমার এক সেট বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ চাই। মনে কর সেই সমুদয় সেটের দাম ২০৲ টাকা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এমন কয়জন লোক আছেন, যাঁহারা একেবারে ২০৲ টাকা দিয়া একসেট গ্রন্থ ক্রয় করিতে পারেন? কিন্তু এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা ১৲ টাকা অগ্রিম দিয়া তাহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। এইরূপে তাঁহারা গ্রাহক হইলে বহিগুলো তাঁহাদের গৃহে আনা হইল, তাঁহারা বহিগুলি পাঠ করিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিলেন। তাহার পর, যদি তাঁহাদের মাসে মাসে ৪৲ টাকা করিয়া ছয় মাসও দিতে হয়, মোটের উপর ২০৲ টাকার স্থলে ২৫৲ টাকাও দিতে হয়, তাহাতেও হয়তো তাঁহাদের গায়ে লাগিবে না। মধ্যবিত্তদের মধ্যে অনেকেই চাকুরী করেন, মাসে মাসে মাহিনা পান; কাজেই তাঁহাদের পক্ষে এ ভাবের একটা গ্রন্থক্রয়ের প্রণালী বড়ই সুবিধা-জনক। এভাবে লাইব্রেরি করিতে থাকিলে ক্রেতা,

তাঁহার কত খরচ হইল, তাহা ধারণা করিতে না করিতে তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। এই প্রণালীতে যাঁহারা কখনও দুচারখানি ভাল গ্রন্থ কিনিবার আশাও করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও অনেকগুলি গ্রন্থের অধিকারী হইতে পারেন।

এই প্রণালী প্রবর্ত্তনের ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটা বিশ্বাসস্থাপনরূপ আর একটা গুরুতর সুফল হয়। আমাদের দেশে পূর্ব্বে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সত্যবাদিতা এত বেশী ছিল যে, অনেক সময়ে মুখের কথাই বাণিজ্যব্যবসায়ে যথেষ্ট বন্ধন বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন তাহার ঠিক উল্টা হইয়াছে। এখন আমরা আমাদের কথার প্রমাণস্বরূপ প্রতিপদে লিখিত দলিল চাই। কিন্তু গ্রন্থ কিনিবার কিস্তিবন্দী প্রণালীতে যদিও নামেমাত্র একটা দলিল লিখিয়া দিতে হয়, তথাপি উহার প্রধান ভিত্তি হইল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। এই প্রণালী পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেই খুব প্রচলিত। বিলাতের টাইমস পত্রের স্বত্বাধিকারীগণ এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড লিটরেচার কোম্পানি আমাদের দেশে বিলাতী পুস্তক সম্বন্ধে এই প্রণালী সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃতভাবে চালাইবার সূত্রপাত করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশে দেশীয় পুস্তকাদি সম্বন্ধে এখনও কোন ব্যক্তি বা কোন কোম্পানি এ প্রণালী চালাইতে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া জানি না। ইহার প্রধান কারণ আমাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব। আমাদের বিশ্বাস, একটা কোম্পানি খুলিয়া এই প্রণালীতে গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে নিশ্চয়ই লাভ হইবে, এবং সেই সঙ্গে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিশ্বাসস্থাপনের একটা পথ খুলিয়া যাইবে।

একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক ঠিকই লিখিয়াছেন যে, 'যে গৃহে গ্রন্থ নাই, সে গৃহ জানালাবিহীন ঘরের ন্যায়। ছেলেদিগকে গ্রন্থের দ্বারা ঘিরিয়া না রাখিলে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার কথা বলিবার অধিকার কোন পিতামাতার নাই। এরূপ করিলে সমস্ত পরিবারের পক্ষে গৃহকর্ত্তার অন্যায় করা হয়, তিনি পরিবারকে প্রতারিত করিতেছেন! গ্রন্থের সংস্পর্শে থাকিতে থাকিতেই ছেলেরা পড়িতে শিক্ষা করে!' সেই কারণেই আমরা বলিতে চাই যে, গৃহে একটা লাইব্রেরি থাকা আমাদের জীবনের অঙ্গ।

অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে কিস্তিবন্দী প্রণালীতে বিলাতে অনেক বড় বড় লাইব্রেরি গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই সমস্ত লাইব্রেরি যে ভালরকমে চলিতেছে, তাহাই প্রমাণ করিতেছে যে, সেই সমস্ত লাইব্রেরি স্থানীয় অভাব মোচন করিয়াছে। যে রকম কোম্পানির কথা ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি, যদি সে রকম কোন কোম্পানি গঠিত হয়, আর যদি সেই কোম্পানি সত্য সত্য দেশের মঙ্গল সাধনে উদ্যুক্ত হয়, তবে আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন মহৎ লোকের জীবনী প্রকাশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঝোঁক দেন। চাষাভুষো বলিয়া পূর্ব্বে যাহারা অবজ্ঞার পাত্র ছিল, আজকাল তাহারাও একটু পয়সার সুবিধা হইলেই ছেলেপিলেদিগকে লেখাপড়া শিখিবার জন্য স্কুলে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেয়। তাহার উপর প্রস্তাবিত শাসনসংস্কারের ফলে অনেক "চাষাভুষোর"ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে অধিকার পাইবার সম্ভাবনা। এই জন্য আমাদের উচিত যে তাহাদের হাতে খুব ভাল ভাল গ্রন্থ, বিশেষত মহৎলোকের জীবনী তুলিয়া দেওয়া এবং এই প্রকারে তাহাদের প্রাণে মহৎলোক হইবার ইচ্ছা জাগাইয়া তোলা।

চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই জীবনীর মূল্য বেশ বুঝিতে পারিবেন। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক লর্ড লিটন বলিয়াছেন—"তুমি যাহা পাইতে চাও, তাহা না পাইয়া যখন তুমি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বলিতে থাক যে, ভগবান আমাকে এটা দিলেন না, ভগবান আমাকে ঐটা দিলেন না, এবং নিজের জীবনকে শূন্য মরুভূমি বলিয়া ভাবিতে থাক, তখন মহৎ-জীবন অধ্যয়নে সমস্ত মনোযোগ দাও। দেখিবে একটা দুঃখ জীবনের কত ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে। জীবনীর একটা পৃষ্ঠাতেও তোমার মতো হতাশা দেখিতে পাও কি না সন্দেহ। বরঞ্চ দেখিবে, মহৎলোকের জীবন সমস্ত দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গিয়াছে।" জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে আমাদের প্রাণে মহৎলোকদের প্রতি একটা মনুষ্যোচিত অনুরাগ জন্মে এবং সেই কারণে কেবল উপন্যাসরাশি অপেক্ষা জীবনীসংগ্রহ অনেক উপকারী। এই প্রকার

জীবনী গ্রন্থের সংগ্রহে আমাদের দেশের বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, নানক, রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি দেশীয় মহৎ লোকদিগের জীবনীর সমাবেশ হওয়া উচিত। আবার সেই সঙ্গে তুলনার সুবিধার জন্য উহাতে বিদেশেরও মহৎলোকের জীবনী স্থান পাওয়া উচিত।

দেখা গিয়াছে, এক একজন এক একটা বিশেষ গ্রন্থ পড়িতে খুবই ভাল বাসেন—পড়িয়া পড়িয়া শেষ করিতেছেন, আবার সেই গ্রন্থই পাঠ করিতেছেন, কিছুতেই তাঁহার 'আশ' মিটিতেছে না। আমাদের কোন পূজ্যপাদ আত্মীয় রবিনসন্ ক্রুসো এইরূপে কতবার যে পড়িয়াছেন তাহা বলা যায় না—এখনো তিনি তাঁহার গম্ভীর বিষয়ের অধ্যয়ন হইতে বিশ্রাম পাইলেই রবিনসন ক্রুসো পড়িতে বসেন। আবার দেখা গিয়াছে যে হয়তো কোন মহৎজীবনী পাঠকের জীবন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। হর্নপ্রণীত নেপোলিয়নের জীবনী বাল্যকালে পড়িয়া লেখকের জীবনে অধ্যয়নশীলতা কিরূপ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা লেখকেরই প্রত্যক্ষ; মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ পড়িয়া বাল্যকাল অবধিই তাঁহার মনে নূতন প্রণালীতে ভারতের ইতিহাস প্রণয়নের ইচ্ছা কিরূপ জাগিয়া উঠিয়াছিল। আবার ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে মন্দ উপন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়া পাঠকের জীবন চিরকালের জন্য কিরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানুষের জীবনের ভালমন্দ গ্রন্থের ভালমন্দের সহিত বিশেষ জড়িত। কার্লাইলের কথায় আমরা বলিতে পারি—"গ্রন্থ অসম্ভবকে সম্ভব করে, গ্রন্থ মানুষের মত গড়াইয়া দেয়।" সুপ্রসিদ্ধ বক্তা জনব্রাইটের সহিত আমরা একবাক্যে বলিতে পারি যে "ভাল ভাল গ্রন্থ মানুষকে অনেক প্রলোভন অনেক মন্দ কর্ম্ম হইতে রক্ষা করে।"

রসকিন বলিয়াছেন—"আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে অতিরিক্ত মিতব্যয়িতার সঙ্গে চলিয়াও সারা জীবন ধরিয়া জীবনের সদ্ব্যবহারের উপযোগী ভাল গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিই। ঘরের বৃথা সাজসজ্জা অপেক্ষা লাইব্রেরিটাকে খুব সুনির্ব্বাচিত গ্রন্থে সুসজ্জিত করা উচিত।" সুখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে ভাল গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত মিতব্যয়িতা আবশ্যক নাই। এখন অনেক ভাল গ্রন্থ অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। কিস্তিবন্দী প্রণালী এদেশে প্রচলিত হইলে তো ভাল গ্রন্থ কিনিবার জন্য অতিরিক্ত মিতব্যয়িতার অবসরই থাকিবে না। রসকিনের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ লেখক সিডনি স্মিথও বলিয়াছেন যে "গ্রন্থের ন্যায় ঘরের উৎকৃষ্টতর সাজসজ্জা আর কিছুই নাই।"

যে দিক দিয়া দেখা যাউক, একটা ভাল লাইব্রেরির মতো উপকারী ও মূল্যবান আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। হাতের কাছে প্রয়োজন মতো পুস্তক পড়িতে দেখিতে পাওয়া যে, জীবনপথে কৃতকার্য্য হইবার একটী প্রধান উপায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে বহিগুলি পড়িতে ভালবাসি, সেগুলি হাতের কাছে পাইলে কত সুখ হয়। উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, সেগুলি আলোচনা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে বর্ত্তমানে লাইব্রেরি কেবল আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ও সুখ প্রদান করে না, কিন্তু বলিতে গেলে তাহা আমাদের জীবনের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

এইভাবে প্রতিগৃহে লাইব্রেরি গড়িয়া উঠিলে আমাদের দেশে শীঘ্রই এক মহান পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে দেখিব নিঃসন্দেহ। সুপ্রসিদ্ধ লেখক কিংস্লির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

"জীবিত মনুষ্যকে ছাড়িয়া দিলে জগতে গ্রন্থের ন্যায় আশ্চর্য্যতর বস্তু দ্বিতীয় নাই।"

আনন্দ রহো।

সহজ কথাটা বটে আনন্দে নাচিতে
সহজ কথাটা বটে হাসিতে খেলিতে,
সহজে যখন যায় সময় চলিয়া,
মনের মতন সব ঘটনা ঘটিয়া।

কঠিন কথা রে হায় আনন্দিত চিতে
নিয়মেতে ধরা দিয়ে কাজ করে যেতে,
সকলি যখন যায় বিরুদ্ধে আমার
দিনের আলোক গিয়ে আসে গো আঁধার

আনন্দ রহোরে ভাই—যাবে কেটে মন্দ,
আঁধার কাটিবে, মনে কোরোনাকো দ্বন্দ্ব;
উঠুক ঝটিকা মেঘ যত কালো ঘোর,
প্রভাতে নামিবে জেনো আলোকের ঝোর॥

রাজভক্তি।

(কবিরাজ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন, বিদ্যাভূষণ,
আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর)

ভারত চিরকালই রাজভক্ত। সেই রাজভক্তির পরিচয় ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলেই জ্ঞাত হওয়া যায়। বেদে, পুরাণে, ইতিহাসে, ধর্ম্মসংহিতার বহুস্থলে এ সম্বন্ধে প্রমাণ আছে।

রাজার অভিষেক উপলক্ষে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৭৩ সূক্তে ধ্রুব ঋষি বলিতেছেন,—"হে রাজন্! তোমাকে রাজপদে অধিরোপিত করিলাম। তুমি এই জনপদের মধ্যে প্রভু হও, অটল, অবিচলিত, স্থির হইয়া থাক। তাবৎ প্রজাগণ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। তোমার রাজত্ব যেন নষ্ট না হয়। ১॥

"তুমি এই স্থানেই পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত থাক, রাজ্যচ্যুত হইও না। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল হইয়া এই স্থানে রাজ্যকে ধারণ কর। ২॥

বরুণদেব তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতরূপে ধারণ করুন"। ৫॥

"বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেন তিষ্ঠতি॥"

(মনুসংহিতা, ৭ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক।

বালক হইলেও রাজা সামান্য মনুষ্য নহেন। সামান্য মনুষ্য-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ একান্ত অকর্ত্তব্য। তিনি মহান্ দেবতা; নররূপে অবস্থান করিতেছেন মাত্র।

ন হি জাত্ববমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ৪০ ম শ্লোক।

যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলিতেছেন—ভূপতিকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া কখনই অবমান করা উচিত নহে; কারণ, এই মহতী দেবতা নররূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করেন।

"চূড়ামণিঃ সমুদ্রোঽগ্নির্মণ্ডলাখণ্ডমম্বরম্।
অথবা পৃথিবীপালো মূর্দ্ধ্নি পাদঃ প্রমাদজঃ॥"

(গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, (নীতিসার খণ্ড,)
দশাধিকশততম অধ্যায় ১১শ শ্লোক।

চূড়ামণি, ইন্দ্রধনু, আকাশ, সমুদ্র, অগ্নি, ও রাজা ইহাঁদিগের মস্তকে থাকাই স্বভাব। কখনও ভ্রমবশেও পাদ দ্বারা স্পর্শ (অবমাননা) করিবে না।

"যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ॥

(মনুসংহিতা, ৭ম অঃ, ১১শ শ্লোক।

রাজা প্রসন্ন থাকিলে মহতী শ্রীলাভ হয়, তাঁহার ক্রোধে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তাঁহার পরাক্রম-প্রভাবে বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। তিনি সর্ব্ব-তেজোময়।

"তং যস্তু দ্বেষ্টি সম্মোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ম্।
তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ॥

(মনু, ৭ম অঃ ১২শ শ্লোক।)

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ রাজার প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

"এবং যে ভূতিমিচ্ছেয়ুঃ পৃথিব্যাং মানবাঃ ক্বচিৎ।
কুর্য্যু রাজানমেবাগ্রে প্রজানুগ্রহকারণাৎ॥
নমস্যেয়ুশ্চ তং ভক্ত্যা শিষ্যা ইব গুরুং সদা।
দেবা ইব চ দেবেন্দ্রং তত্র রাজানমন্তিকে॥"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়, ৩৩—৩৪ শ্লোক।

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—হে যুধিষ্ঠির! এইরূপে পৃথিবীতে যে মনুষ্যগণ মঙ্গল-কামনা করিবেন,—তাঁহারা প্রজাবর্গের অনুগ্রহের নিমিত্ত রাজাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন। শিষ্যগণ যেরূপ গুরুর নিকট প্রণত থাকেন এবং দেবগণ যেরূপ দেবেন্দ্রের নিকট নত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ রাজার নিকট প্রজাগণ প্রণত হইয়া থাকিবেন।

"যস্তস্য পুরুষঃ পাপং মনসাপ্যনুচিন্তয়েৎ।
অসংশয়মিহ ক্লিষ্টঃ প্রেত্যাপি নরকং ব্রজেৎ॥"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়। ৩১ শ্লোক।

যে পুরুষ মনোমধ্যেও রাজার অনিষ্টাশঙ্কা উৎপাদন করিবে, সে নিশ্চয়ই ইহলোকে ক্লেশ ভোগ করিয়া পরিশেষে নরকে পতিত হইবে।

"রাজানং প্রথমং বিন্দেত্ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্।
রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভার্য্যা কুতো ধনম্ ॥"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৫৭ অধ্যায়, ৪১ শ্লোক।

"প্রজাগণ ভূপতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিবে; তৎপরে ভার্য্যা এবং তদনন্তর ধনরক্ষায় যত্নবান হইবে; কারণ রাজা না থাকিলে, তাহাদের ভার্য্যাই বা কোথায় এবং ধনই বা কোথায় থাকিবে?

"তস্মাদ্রাজৈব কর্ত্তব্যঃ সততং ভূতিমিচ্ছতা।
ন ধনার্থো ন দারার্থস্তেষাং যেষামরাজকম্ ॥"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৬৭ অঃ, ১২শ শ্লোক।

"প্রজাগণের আত্মমঙ্গলের নিমিত্তই রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, অরাজক হইলে ধন অথবা দারাদির প্রয়োজন থাকে না।

"রাজমূলো হি ধর্ম্মশ্চ যশশ্চ জয়তাং বর।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু সুরক্ষিতব্যা নরাধিপাঃ ॥"

(রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড, একচত্বারিংশ সর্গ, ১০ম শ্লোক।

রাজারাই প্রজাবর্গের ধর্ম্ম ও যশোলাভের মূল, সুতরাং সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগকে রক্ষা করা প্রজাবর্গের একান্ত কর্ত্তব্য।

"মাতা ন পালয়েদ্ বাল্যে পিতা সাধু ন শিক্ষয়েৎ।
রাজা যদি হরেদ্ বিত্তং কা তত্র পরিবেদনা ॥
সুসেবিতাঃ প্রকুপ্যন্তি মিত্রস্বজনপার্থিবাঃ।
গৃহমগ্ন্যশনিহতং কা তত্র পরিবেদনা।"

(শুক্রনীতি, ৩য় অধ্যায়, ৪৭।৪৮ শ্লোক।

মাতা যদি বাল্যকালে প্রতিপালন না করেন, পিতা যদি সাধু পথ প্রদর্শন না করেন, রাজা যদি ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লন, বিলাপ করিয়া কোনই ফল নাই। মিত্র, আত্মীয় ও নৃপতি সুসেবিত হইয়াও যদি ক্রোধপরায়ণ হন, গৃহ যদি অগ্নি বা বজ্র দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অনুশোচনা করিয়া কি ফল আছে?

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লব বা প্রজাবিদ্রোহ হয় নাই। একবার বেণ রাজার হত্যার পর প্রজাগণ সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া দেশের দুরবস্থা আনয়ন করিয়াছিল।

ভারতীয় রাজনীতির বিবরণ ধর্ম্মসংহিতা ব্যতিরেকেও কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্রে ও অন্যান্য গ্রন্থে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারত, ইংরাজের শাসনাধীনে থাকিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইংরাজজাতি শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে ও ঔদার্য্যে অনুকরণীয় ও স্মরণীয়। বিজ্ঞানে, শিল্পে, বাণিজ্যে, এবং ত্যাগে ইংরাজজাতি আমাদের নমস্য।

ইংরাজশাসনের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশের রাষ্ট্র-নৈতিক অবস্থা স্মরণ করিলে দেখিবে, ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; রাজন্যগণ পরস্পর বিবাদপ্রিয় ছিলেন, দেশ দস্যুতস্করের লীলাভূমি হইয়াছিল; দেশবাসী ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিত; তখন ভারত অন্তর্বিপ্লবের বহ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল। দেশ হইতে শিক্ষার আলোক অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

দেশের নৈতিক জীবন, ধর্ম্মজীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, কর্ম্মজীবন অসাড়, নিস্পন্দ, নিশ্চেষ্ট, মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী জীবনসংগ্রামের ফলে একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল হা-হুতাশ, দীর্ঘ-নিশ্বাস, নৈরাশ্যের তীব্র জ্বালাময়ী অভিব্যঞ্জনা। সংসার-মরুভূমিতে দেশবাসী কেবল ওয়েসিসের অন্বেষণ করিতেছিল। তাহারা চাহিতে-ছিল কেবল শান্তি। এই অবস্থায়, ভগবানের মঙ্গল বিধানে ইংরাজজাতি এ দেশে আসিয়া ভারতের নব অভ্যুদয় সূচিত করিল।* শান্তি-অন্বেষণকারী ভারতবাসী শান্তির আশায় ইংরাজের পতাকাতলে আশ্রয় লইল।

ইংরাজজাতির সহিত সংঘর্ষণ ও সংমিশ্রণের ফলে, নব নব ভাবের আদান প্রদানের ফলে, মৃত-প্রায় তরু মুঞ্জরিয়া উঠিল, ভারতের দেহে নব যৌবনের মধুর শোভা বিকশিত হইল।

ইংরাজ আমাদের প্রতীচ্যভাবের শিক্ষার আলোক দেখাইল। প্রতীচ্যের ভাবমঞ্জুষা আমা-দের শিরায় শিরায় প্রবাহিত করিয়া দিল; আমা-দের দেশাত্মবোধের ভাব জাগাইয়া দিল। আমার দেশ, আমার জন্মভূমি, আমার কর্ম্মভূমি, আমার পিতৃপুরুষের অতীত গৌরবের লীলা নিকেতন, আমিত্বের ধারা, আমিত্বের মর্য্যাদা—এ সমস্তই ইংরাজ আমাদের শিক্ষা দিল।

বাষ্পযান, জলযান, তড়িৎযান ও বায়ুযান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দেশের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিল। ইংরাজরাজত্বে পুলিশ দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিল।

ইংরাজ রাজ-শক্তি এতই আমাদের আপনার করিয়া লইয়াছিল যে, যে দিন ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া পরলোক গমন করিলেন সে দিন ভারতবাসী মাতৃহারা শিশুর ন্যায়—"মা মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। আবার যে দিন সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন সে দিন ভারত কত না অশ্রু পরিত্যাগ করিয়াছিল। আবার যে দিন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সেই পরম পবিত্র পুণ্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, সে দিন কত আশা, কত আনন্দ, কত উৎসাহ, কত উদ্দীপনা ভারতের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আবার যখন যুদ্ধের জন্য সম্রাট ভারতবাসীকে আহ্বান করিলেন, তখন ভারতবাসী অবিচারিত চিত্তে প্রাণের প্রেরণায় রণস্থলে গমন করিয়াছিল।

সম্রাটের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ভারত ক্লৈব্য পরিহার করিয়া ইউরোপীয় মহাসমরে যে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে—তাহা জগতের ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত।

ছত্রিশ বৎসর গত হইল, যাঁহার বিয়োগবেদনা অনুভব করিয়া বাঙ্গালী একদিন শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাঁহার কথা কি বাঙ্গালীর মনে আজ উদয় হয়? ১২৯০ সালের এই ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে অক্ষয়কুমারকে আমরা হারাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি-পূজার জন্য বাঙ্গালার কোথাও কি কোনও উদ্যোগ-আয়োজন আজ হইয়াছে?

আদর্শ বাঙ্গালা-গদ্যের তিনি অন্যতম জন্মদাতা বলিয়া যে কেবল এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার পুস্তক পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিবার চেষ্টা করে নাই, এমন বাঙ্গালী পাঠক কেহ আছে বলিয়া ত মনে হয় না। কিন্তু সে ঋণের কথা স্মরণ করিয়া কি আজ আমরা একটি কথাও বলিব না?

বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি যে সামগ্রী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্যও সামান্য নহে। "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে"র মত উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর একখানিও আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। তিনি কুম্ব সাহেব প্রণীত"Constitution of Man"নামক পুস্তক অবলম্বনে "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার" নাম দিয়া যে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও তাঁহার অসামান্য লিপি-ভঙ্গীর গুণে মৌলিক রচনা বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালীকে নূতন তত্ত্ব শিখাইবার জন্য বিলাতী সাহিত্য হইতে তিনি বহু সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। আজ আমরা রাধাকুমুদ বাবুর'Indian Shiping'পড়িয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতেছি বটে, কিন্তু প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে, সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়কুমারই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মারফতে বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্যে বাঙ্গালীকে শুনাইয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানের নাবিক বহুশত বর্ষ ধরিয়া, এসিয়ার সকল সমুদ্র ও সমুদ্রাকূলে একাধিপত্য করিয়াছে। 'ভারতের অর্ণবযান' নাম দিয়া সে প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, অক্ষয়কুমারের লেখনীপ্রভাবেই 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রসার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল।

অক্ষয়কুমার অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিলে তাঁহার সাহিত্যসাধনার পরিচয় পরিস্ফুট হয় না। সাহিত্য সাধনাই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। প্রাণের প্রেরণায় তিনি সাহিত্য-সেবী হইয়াছিলেন। নহিলে, রুগ্ন অবস্থায় ভগ্ন-হৃদয় লইয়া তিনি 'উপাসক সম্প্রদায়ে'র মত বিরাট গ্রন্থ কখনও লিখিয়া যাইতে পারিতেন না।

নানা বিষয়ে তিনি গুরুস্থানীয় আমাদের।—বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিয়া গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনার পথ বোধ হয় তিনিই বাঙ্গালীকে প্রথম দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক রচনারও প্রকৃত প্রবর্ত্তন তিনিই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট বহু শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার নিকট আমরা অশেষ ঋণে ঋণী। তাই আজ ভক্তি-কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি লইয়া তাঁহার স্মৃতির বেদীতে অর্পণ করিতেছি।

হিন্দুস্থান ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।

মদ্যপানের অপকারিতা।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় ভূখণ্ডেরই প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মাদক দ্রব্য কোন-না-কোন আকারে তখনকার প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের মত স্থানেও একদিন মদ্যের ব্যবহার খুব প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতের সেই প্রাচীনকালের জ্ঞানগুরু ঋষিরাও তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর তাঁহারা যখন ধীরে ধীরে মদের অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তখন মদ্যপানের প্রথা যাহাতে দেশ হইতে একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায় তাহার জন্য তাঁহারা

বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালের স্মৃতিপুরাণ অনুসন্ধান করিলে সেই চেষ্টার তীব্রতা যে কত অধিক ছিল তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। অতি প্রাচীন-কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহারাও যদি সুরা পান করিতেন তবে তাহাও:কাহারও নিকট দোষের বলিয়া মনে হইত না; কিন্তু পরে উহা দেশের মধ্যে এরূপ নিষিদ্ধ ও নিন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল যে লোকে সুরাপানের পাপ ব্রহ্মহত্যা ও গুরুপত্নীগমনের পাপের সহিত সমান বলিয়া মনে করিত। দেশের হিতৈষিগণ পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ তীব্র চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবর্ষ একটা মহা-পতনের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিয়া-ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের বাহিরেও আমরা এই একই দৃশ্যের পুনরভিনয় দেখি। রোমের মত সুবৃহৎ সাম্রাজ্য যখন গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখন সেখানকার ধনী ও দরিদ্র এই উভয় শ্রেণীরই অধিবাসী-দিগের মধ্যে অহিফেন অত্যধিক মাত্রায় প্রচলিত হইয়া-পড়িয়াছিল। তাহারা অহিফেনের নেশায় বিভোর হইয়া দিন দিন অজ্ঞাতভাবে ধ্বংসের পথে নামিয়া চলিতে-ছিল। সকলেই মোহাচ্ছন্ন; কে কাহাকে প্রবুদ্ধ করিবে? তাই ভারতবর্ষের মত রোম আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। সেই আসন্ন দুর্দ্দিনের করাল ছায়ায় সমগ্র রোমক-সাম্রাজ্য কবলিত হইলেও দেশের কোন হিতৈষীর অন্ধ চক্ষে তাহা প্রতিফলিত হইল না। রোম ডুবিল; অবনতির চরম সাগরতলে চিরতরে অদৃশ্য হইল।

অহিফেন প্রাচীনকালে কেবল যে রোমেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছিল তাহা নহে; বর্ত্তমান কালেও তাহা অনেকের সর্ব্বনাশ করিতেছে; রুষিয়া ও চীনে তাহার পূর্ণপ্রভাব। প্রবল প্রতাপশালী তুর্কিদিগকে সে আপনার দাস করিয়া ফেলিয়াছে। কেবল অহিফেন নহে—মদ, গাঁজা, চরস প্রভৃতি যে কোন প্রকারের মাদক দ্রব্য যখন যে দেশ দীর্ঘ কাল ধরিয়া ব্যবহার করিয়াছে তখন সেই দেশই মনুষ্য-ত্বের বিনিময়ে পশুত্ব বা জড়ত্বকে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য জগৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত হইলেও সেখানে মদ্যের ব্যবহার অতি-রিক্ত মাত্রায় প্রচলিত হইয়া পড়ায় তাহাদের চরিত্র হইতে পশুভাবের প্রভাব কিছুতেই অপনোদিত হইতেছে না। কৃত্রিম বাহ্য সভ্যতার অন্তরালে তাহারা আপনাদের কুৎসিত পশুভাবকে প্রচ্ছন্নে পোষণ করিয়া আসিতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া যে প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রদীপ্ত আলোকে সেই কুৎসিত পশুভাবের নগ্নমূর্ত্তি বিশ্ববাসীর নয়ন সমক্ষে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই ভয়ঙ্কর 'ছিন্নমস্তা' মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া বিশ্ববাসীর সহিত তাহারাও অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তাই সেদিন-কার সেই ঘোরতর দুর্দ্দিনও তাহাদের মধ্যে মঙ্গল বহন করিয়া আনিল, তাহারা জাগরণ লাভ করিল। সেই-দিন হইতে পাশ্চাত্য মনীষিগণের ইহাই একটী প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে কেমন করিয়া এই ভীষণ পশুত্বের গ্রাস হইতে দেশবাসীর উদ্ধার সাধন করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা দেশের মধ্যে যাহাতে মদ্যের প্রচলন কমিয়া যায়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন এবং অনেকপরিমাণে সফলকামও হইয়াছেন। এ বিষয়ে আমেরিকা জগদ্বাসীকে একেবারে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে! আজ সেখানে মদ্য একেবারে নিসিদ্ধ। ইহা যে একদিনে বা একটীমাত্র চেষ্টায় সিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে। কতদিনের কত প্রকারের কঠিন সাধনার ফলে আজ মার্কিণগণ এই অভিলষিত সিদ্ধিকে লাভ করি-য়াছে। যাহারা আজীবন মদ্যপানে অভ্যস্ত তাহাদিগকে ইহার অপকারিতা বুঝান যে কত বড় কঠিন কাজ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; কারণ যে কোন অভ্যাস বা প্রথার মধ্যে আমরা আজন্ম আবদ্ধ থাকি, লালিত-পালিত হই, তাহাকে বিচার করিয়া বুঝিবার শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলি; তাই সেখানে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার সময় হইতেই মদ খাইলে কি কুফল আর না খাইলেই বা কি সুফল পাওয়া যায়, তাহা অতি ধীরে ধীরে শিক্ষা দিয়া আসা হইতেছিল। কেবল যে এক বিদ্যালয় হইতেই এই শিক্ষার বিস্তার হইতেছিল তাহা নহে, দেশীয় নানাবিধ নৈতিক সভাসমিতি এবং ধর্ম্মমন্দির হইতেও এই শিক্ষা দিন দিন বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইতে-ছিল। চারিদিক দিয়াই ইহার অপকারিতাসম্বন্ধে দেশ-বাসীকে সচেতন করিয়া তুলিবার তীব্র চেষ্টা চলিতেছিল। ইহার ফলও আশানুরূপ ফলিয়াছিল; দেশের জনসাধা-রণের মধ্যে এই একটী ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, এই মদ্যব্যবসায়ের মূলে একটী দুষ্ট রাজনীতি রহিয়াছে। তাহারা দেখিতেছিল যে দেশের মধ্যে যে সমস্ত বড় বড় পদ রহিয়াছে, সেগুলি যাহারা মদ্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদেরই অধিকৃত; নানাবিধ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে যে মদ্যপান পরিত্যাগ করিলেই তাহাতে অধিক সিদ্ধি লাভ করা যায়। শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম্মের প্রভাবে দেশের জনসাধা-রণের মনোভাব যখন এইরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময় ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ বিঘোষিত হইল। দেশবাসীর চিত্তক্ষেত্রে যে মঙ্গলের বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল এখন অনুকূল অবস্থা পাইয়া তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। মদ্যের ব্যবসায় বেশীর ভাগ জার্ম্মানদিগেরই হাতে ছিল; তাই এই যুদ্ধের

সময় মদ্য অতি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। যে কর্ত্তব্যকে আমেরিকাবাসী অতি কঠোর বলিয়া মনে করিতেছিল প্রয়োজনের তাড়নায় তাহা অতি সহজ হইয়া আসিল; তাহারা মদ্য পরিত্যাগ করিল। যাহারা যথার্থ মানুষ তাহারা যদি একটীবারও জানিতে পারে যে কোথায় তাহাদের প্রকৃত মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে, তবে সহস্র বাধাবিপত্তি তাহাদিগকে সে পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। আমেরিকাবাসী যে যথার্থ মানুষ, তাহা আমরা তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই নিদর্শন পাইয়া আসিতেছি; ইহাও তাহাদের মনুষ্যত্বের একটী অন্যতম নিদর্শন।

সমগ্র জগদ্বাসী যখন জাগরিত হইয়া মদ্যপানের কুফল উপলব্ধি করিয়া তাহার হস্ত হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট, তখন চিরনিদ্রিত ভারতবর্ষ একেবারে উদাসীন! পূর্ব্বপিতামহগণের পরম শুভকর নিষেধ বাক্যকে অবহেলা করিয়া পাশ্চাত্য জাতির অন্ধ অনুকরণে তাহারা মদ্যপানে অভ্যস্ত হইয়াছে। মহাযুদ্ধের পর হইতে পাশ্চাত্যজাতির মধ্যেও মদ্যের প্রভাব হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলেও ভারতবর্ষে উহার প্রসার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। গাঁজা ও অহিফেনের ব্যবহারও প্রতিদিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না; বিশেষত এ বিষয়ে বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিয়াছে; বৎসরে বৎসরে আবগারীবিভাগের আয় দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইতেছে! শুনিলে ঘৃণায় মর্ম্মাহত না হইয়া থাকা যায় না যে সামান্য অর্থের লোভে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত যুবকগণও আত্মমর্য্যাদাকে পদদলিত করিয়া গাঁজা, মদ ও অহিফেন প্রভৃতির দোকান করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণও আজ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া মদ্যপান ও তাহার ব্যবসায় করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছেন না। দেশমাতার কোন সুসন্তান যদি কখন বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রা করিতে বাধ্য হন, তখন যাঁহারা শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘিত হইল বলিয়া তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে বদ্ধপরিকর হন, এখন তাঁহারা কোথায়? শাস্ত্র যে মদ্যকে "অদেয়ঞ্চাপ্য পেয়ঞ্চ তথৈবাস্পৃশ্যমেব চ" বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন; এমন কি যাহাকে "দ্বিজাতীনামনালোচ্যম্" দ্বিজাতিদিগের আলোচনার অযোগ্য বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন, আজ দ্বিজাতিগণ—ব্রাহ্মণগণ তুচ্ছ অর্থের জন্য সেই মদ্যের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন; অথচ এজন্য তাঁহাদের কোন সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইল না! সম্মানেরও কোন লাঘব ঘটিল না! ইহা অপেক্ষা দেশের আর কি দুর্দ্দশা হইতে পারে?

আমরা কি এমনই পরাধীন হইয়া পড়িয়াছি যে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও আমরা আমাদের প্রকৃত হিত কিসে হয়, তৎসম্বন্ধে অন্ধ থাকিব? বিশ্বের মধ্যে যে উন্নতির ভেরী নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কি আমরা শ্রবণ করিব না? যে আমেরিকাবাসী পুরুষানুক্রমে মদ্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহারা যদি আজ মদ্যকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়; তবে যাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে মদ্যের ব্যবহার শত শত যুগ রহিত হইয়া গিয়াছে, যাহারা অল্প কয়েক দিন মাত্র পাশ্চাত্যের অনুকরণে পুনর্ব্বার মদ্যব্যবহারে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইতেছে—তাহারা মদ্যপান ত্যাগ পারিবে না? আমরা সকল বিষয়েই গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকি, গভর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ না করিলে আমরা ক্ষুব্ধ হই; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যতদিন পর্য্যন্ত লোকে নিজের অভাব নিজে বুঝিয়া তাহার প্রতীকারে চেষ্টিত না হয়, ততদিন কেহই তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। আমরা যদি নিজেরাই নিজেদের হিত না বুঝিয়া ব্যবসায় করিয়া দিনদিন মদ্যের প্রসার বাড়াইয়া দিতে থাকি আর মুখে কেবল গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন জানাই, তবে তাহা কোন দিনই সুফল প্রসব করিবে না; কিন্তু আমরা যদি দেশবাসীকে এই মহাপাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আন্তরিক চেষ্টা করি, তবে তাহাতে নিশ্চয়ই ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে; আমরা সফলকাম হইব; উন্নতি আমাদের করায়ত্ত হইবে।

কবে?

(শ্রীবিধুমুখী দেবী)

কবে তুমি সহজ হবে এ জীবন মাঝে
কবে তুমি সহজ হবে মোর সব কাজে?
কবে তুমি সহজ হবে সংসারের পথে
কবে তুমি সহজ হবে, রবে সাথে সাথে?
কবে তুমি সহজ হবে আশায় নিরাশায়
কবে তুমি সহজ হবে দুঃখ বেদনায়?
কবে তুমি সহজ হবে শয়নে স্বপনে
কবে তুমি সহজ হবে অজ্ঞানে সজ্ঞানে?
কবে তুমি সহজ হবে শোকে আনন্দে
কবে তুমি রবে প্রাণে মোর সব ছন্দে?

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঁচ হৌদ "মিশন্"-গৃহে চা-পানের ব্যাপার ও তাহা লইয়া ঘোঁট।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ওঁর যাওয়াটা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ হইল। কোন দোষ করিয়া শাস্তি পাইবার সময় যে দুঃখ হয়, তাহা অপেক্ষা এ দুঃখ বড় কিছু বেশী নয়; কিন্তু আমাদের যে মানহানি হইল, ইহার দরুণ আমার কান্না আসিল। তখন প্রাতঃকাল,—আমি বিছানাতেই পড়িয়া থাকিয়া ১০।২০ মিনিট আমার মনকে ইচ্ছামত ছুটিতে দিলাম। প্রথম বেগটা একটু কম হইলে পর, এই সম্বন্ধে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। কোন প্রকারেই মনকে শান্ত করিতে পারিলাম না; মন কিছুতেই ভাল হইল না। যাহারা এই সঙ্কটে পড়িয়াছেন তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত নিন না কেন, কিন্তু আমরা কেন ইহাতে লিপ্ত হইয়া আমাদের মান-হানি করি? আমরা প্রায়শ্চিত্ত না লইলে কিছু কি আটকায়? যারা ওঁর ভীরু স্বভাবের সুবিধা পাইয়া এইরূপ কাজ আদায় করেন, সেই মিত্রমণ্ডলীকেই বা কি বলিব? ভাল, উনি কেন এই বিষয়ে লোকের কথা শুনিলেন? এই পুণার লোকদের জন্য সব করিতেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং তাহার জন্য লোকনিন্দাও সহিতে হইবে—এইরূপ প্রথম হইতেই ওঁর মনোভাব। এই ধরণের উদ্বেগ ও কষ্টজনক চিন্তা সমস্ত দিন আমার মনে আন্দোলিত হইতেছিল। এইজন্য আমার ঐ দিনটা একেবারে উদাসভাবে ও বিষণ্ণভাবে কাটিল।

এই সময়ে, আমার অন্য এক মৈত্রিণী আমাদের বাড়ীতে কিছুদিন থাকিবার জন্য সোণাবালীতে আসিয়াছিলেন; তিনি আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে, ১০,২০ শব্দও আমরা পরস্পর বলি নাই। কারণ, এই চিন্তায় আমার মন উদ্বেলিত হওয়ায় কোন কাজ করিতে কিংবা কাহারও সহিত কথা কহিতে আমার ইচ্ছা হইত না।

সন্ধ্যার গাড়ীতে 'উনি' ফিরিয়া আসিলে, আমি তাঁর সম্মুখে একেবারেই যাইতে পারিলাম না। কারণ, আমার মনে হইল, সকালের কথা সম্বন্ধে ওঁর খুবই খারাপ লাগিয়া থাকিবে এবং আমি সম্মুখে গেলে হয়ত আরো খারাপ লাগিবে; আর আমি ত সাম্‌নে গিয়ে একটু দাঁড়াতেও পারব না; তার চেয়ে এখন সামনে না যাওয়াই ভাল। এইরূপ মনে মনে বিচার করিয়া, যেন কোন কাজে ব্যাপৃত আছি এইভাবে দূরে-দূরেই রহিলাম কিন্তু বাহিরে কি চলিতেছে জানিবার জন্য দুই তিনবার কাণ পাতিয়া শুনিলাম, উঁকি মারিয়া দেখিলাম; আমার নজরে আসিল,—ওঁর মন রোজকার মোতোই শান্ত; ডাকের চিঠি দেখা ও খবরের কাগজ পড়া—এই নিত্য নিয়মিত কাজ, একটার পর একটা বেশ নিশ্চিন্ত মনে করিয়া যাইতেছেন। ওঁর মনে কোন রকম উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য হইয়াছে বলিয়া দেখা গেল না। ইহা দেখিয়া আমার ভারী আশ্চর্য্য মনে হইল।

তারপর, আহারের সময় হইলে সকলে আহার করিতে বসিলেন। আহারের সময়েও একেবারে শান্তভাবে, অন্যদিনের মতো কথা কহিতে কহিতে ও হাসিতে হাসিতে আহার করিলেন তারপর ঘণ্টাখানেক সেইখানে বসিয়া নিত্যানুসারে কথাবার্ত্তা কহিয়া ও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া শুইতে গেলেন।

যতই ওঁর এই সব ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম ততই আমার আশ্চর্য্য মনে হইতে লাগিল। এবং এইরূপ কেন হইল? সকালের কথার দরুণ ওঁর কিছুই মনে হইল না কেন? ঐ সম্বন্ধে ওঁর কি কোন কষ্ট হয় নাই? এ রকম ত হওয়া উচিত নয়; ওঁর মনে কষ্ট হওয়াই উচিত। কিন্তু উহা বাহিরে না দেখাইয়া মনে-মনেই রাখিয়া মনকে রোজকার মতো শান্ত ও নিশ্চিন্ত রাখা ও নিত্যনিয়মিত কার্য্যক্রমের কোন প্রকার ব্যতিক্রম না করা—এই কাজ উনি সহজে কি করিয়া সাধন করেন? ইহা একটা মস্ত রহস্য বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল।

আজ উনি বাড়ী আসিলে ওঁকে অমুক অমুক কথা জিজ্ঞাসা করিব, অমুক কথা বলিব—এইরূপ যাহা মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম তাহা সেইখানেই বিলীন হইয়া গেল।

"পুণার সব লোকই ভাল—না?" এইটুকু শুধু আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ ছাড়া আর কিছুই বলি নাই। অনেক কথাই বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মুখ হইতে শব্দ বাহির হইল না। কিন্তু আমি চাকরকে ঘি লাগাইবার জন্য ডাকিয়া, নিত্যানুসারে আনীত মরাঠী পুস্তকের মধ্যে এক পুস্তক উঠাইয়া লইয়া পড়িতে বসিলাম। তবুও উনি 'না' কি 'হাঁ' কিছুই বলিলেন না। নিদ্রা আসা পর্য্যন্ত মনোযোগ দিয়া শান্তভাবে পড়া শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে ওঁর নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে দেখিয়া আমি পুস্তক বন্ধ করিলাম ও প্রদীপটা দূরে রাখিয়া চাকরকে 'হয়েছে, এখন তুই যা' এইরূপ বলিয়া আমি বিছানায় শুইয়া পড়িলাম এবং অনেকক্ষণ পরে ঘুম আসিল। নিত্যানুসারে আমরা প্রভাতে গাত্রোত্থান করিলাম; কিন্তু এই সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোন কথাই হইল না। নিত্যানুসারে উনি শ্লোক পাঠ করিয়া ভজনা আরম্ভ

করিলেন এবং ভজনা শেষ হইলে উনি উঠিয়া নিত্য নিয়মিত কাজ করিতে চলিয়া গেলেন।

কেবল আমার মনে এতক্ষণ এই কথা তোলাপাড়া করিতেছিল যে হয় ত উনি আপনা হইতেই আমাকে এই বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু ঐ কথা সেই-খানেই রহিয়া গেল। পরে ৮-টা ৯-টার সময়, আমাদের ন্যায় ছুটিতে লোণাবলিতে থাকিবার জন্য যাঁরা আসিয়াছেন সেই সব মিত্রদের মধ্যে দুই তিন জন মিত্র আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, এবং আগের দিন-কার কথা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শুরু হইলে ক্রমে তাঁরা খুব জোরে জোরে কথা বলিতে লাগিলেন; তথাপি ওঁর মনোভাবের একটুও বদল হইল না। বরং তাঁহাদের সহিত শান্তভাবে ও বুঝাইবার স্বরে কথাবার্ত্তা বলিতে ছিলেন। কিন্তু এই ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের তাহা ভাল লাগিল না। তৃতীয় দিনে টাইম্‌স্ কাগজে, দুই একজন মিত্র, নিজের নাম দিয়া খুব কড়া সমালোচনা করিয়া আমাদের এই প্রায়শ্চিত্তসম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া উনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তথাপি উঁহার মনে একটুও উদ্বেগ হইল না কিংবা উনি একটু টুঁ-শব্দও করিলেন না। এই কথার পর, আরও দুই একদিন কাটিয়া গেল। "ওঁর" এইরূপ শান্ত আচরণ দেখিয়া আমার ভারী আশ্চর্য্য বোধ হইল। এবং রাগ ও উদ্বেগ এক্ষণে একেবারে তিরোহিত হইয়া আমার মন একেবারে ঠাণ্ডা হইল। তার পর আমি একবার সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই প্রায়শ্চিত্ত কেন নিলে বল দেখি? চারিদিকে এর জন্যও এখন কত কষ্ট হচ্চে। বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা যতই গালমন্দ দিক্ না, সে সম্বন্ধে মন প্রস্তুত আছে বলে কিছুই খারাপ মনে হয় না; কিন্তু পরশু সকালে, কত কালের পুরাণো ও আমাদের তথা কথিত মিত্রদের কথা শুনে আমার অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল। অন্যের উন্নতি সহ্য না হওয়ায় মনে মনে মৎলব এঁটে তারা এইরূপ একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল কি? তাদের আবেগ-উক্তি ও কথার স্বরে আমার এই রকম মনে হয়েছিল"। তখন উনি বলিলেন—"তাঁরা ঐরূপ করেছেন বলে কেন একটা ভুল ধারণা মনে রেখে দেবে? কেহ কিছু বলেছে বলে' তোমাকে উদ্দেশ করেই বলেছে এ রকম কেন মনে করবে? প্রকৃত অবস্থাটা নিজের মনে জানা থাক্‌লেই হল। যে সকল লোক আমাদের বন্ধু বলে পরিচয় দেন এবং যাঁরা আমাদের সঙ্গে আপনার মতো ব্যবহার করেন তাঁদের জন্য, লোকের কাছ থেকে যদি একটু মন্দ ব্যবহার পাওয়া গিয়া থাকে তাতে কি হল?" আমি বলিলাম, "প্রকৃত কারণটা আমাদের আপনাদের মধ্যেই জানা আছে। কিন্তু তা অন্য লোকে কেমন করে জান্‌বে? এতে লোকের মধ্যে একটা ভুল ধারণা প্রচার হয়ে পড়ে না কি?"

কাল সকালে ...... কুৎসিৎভাবে ও এমন রাগের সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন, যেন এই কাজটা আমরা নিজের স্বার্থের জন্যই করেছি। এত দিনকার সহবাসেও যাঁরা স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় পান নি তাঁরা আপনাদিগকে মিত্র বলে পরিচয় দেন কি করে'? মিত্রতার দ্বারা পর-স্পরের অন্তঃকরণের যোগ্যতা ও মূল্য বুঝিতে পারা যাইবে। যতক্ষণ তা না হয় সে পর্য্যন্ত ওটা শব্দ মাত্রই থেকে যায়"। তখন 'উনি' বলিলেন,—"তাঁদের স্বভাব একটু ঐ রকমই বটে। তাঁরা-কিছু বলেছেন বলে' কি হল? কোন্‌টা ঠিক্, তাঁরা কি বোঝেন না? কিন্তু মানুষ একবার অভিমানের মধ্যে গিয়ে পড়লে, সেই অভিমানের আবেশে ঐ রকমই বলে থাকে। মনুষ্য স্বভাবই এই। এই সময়ে তার অন্যপক্ষের বিচার থাকে না। এই বিষয়ে লোকেরা শান্তমনে আরও বিচার করলে, আজ যেমন জোরে তারা আমাদের উপর আঘাত করছে, ততটা জোরে আর আঘাত করবে না। তারা গালমন্দ দিচ্ছে; কিন্তু কালপর্য্যন্ত তুমিও ত এইজন্য অভিমান করে বসেছিলে? তাদের চেয়ে তোমার আসল অবস্থা জান্‌বার কথা না কি? আমাদের ছেলে কিংবা মেয়ের উপবীত কিংবা বিবাহে কোন বাধা হয় না, কিংবা বাড়ীর কাহারও অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণের অভাবে আট্‌কায় না। দলাদলির ঘোঁট হয়েছে বলে' তোমার বাড়ীতে কখন কিছু আট্‌কেছে কি? তোমার যা কিছু কাজকর্ম্ম তার আগের মতই ঠিক্ চল্‌চে। এই অবস্থায়, প্রায়শ্চিত্ত নেওয়াতে আমার দোষ হয়েছে এইরূপ তুমিও মনে করেছ। এই রকমের ধারণা যার যে রকম হবে, তারা কিছু দিন সেই রকমই বল্‌তে থাক্‌বে, এ কথা আমি বুঝতে পারি। মানুষ যে কাজ করে তা পূরাপূরী বিচার করেই করে, তাড়াতাড়ি কিছুই করে না, এইরূপ মনে বিশ্বাস রাখ্‌বে। কোন বিষয়ে যথোচিত জানা না থাক্‌লে জিজ্ঞাসা করে নেবে। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বকার অভিজ্ঞতা অনুসারে মনকে শান্ত রাখ্‌বে। অনর্থক আপনাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?"

এই কথা শুনিয়া আমি লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। সমস্ত ব্যাপার জানিবার অভিপ্রায় প্রথমে জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে দোষ দিলাম, ইহার দরুন আমার পশ্চাত্তাপ হইয়া মন বড় খারাপ হইল।

যাক্। মে মাসের ছুটির মধ্যে আমাদের এক মিত্র এবং তাহার পত্নী তিন পুত্র লইয়া আমাদের সহিত থাকিবার জন্য আসিয়াছিলেন এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি

তিনি প্রায়শ্চিত্ত লইয়া লোণাবালিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় 'উনি' বারান্দায় এক আরাম কেদারায় বসিয়াছিলেন, ভাওজী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন আর উনি তাহা শুনিতেছিলেন। উপরি-উক্ত ভদ্রলোকটি সিঁড়ির নিকট আসিয়াছেন দেখিলেন এবং হাসিয়া 'উনি' তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হল?" ইহাতে তিনি তখনি বলিলেন, "আপনি যা বলেছিলেন তাই আমার ঘটল। আমি এই সময় পিতার প্রকৃত প্রেম বুঝতে পেরেছি এবং তার দরুণ আনন্দ লাভ করেছি। প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে আমি যখন উঠলুম তখন ব্রাহ্মণেরা বলিলেন "পিতাকে প্রণাম কর"; তখন আমি বৃদ্ধ পিতার নিকট গিয়া প্রণাম করিবার জন্য নতকায় হইলাম এবং প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিবামাত্র তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। এবং তিনি ভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন,—"এত লোকের মধ্যে তুমি আজ আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ!" এইরূপ বলিবার সময় তাঁর চোখে জল আসিতে লাগিল এবং তাহা দেখিয়া আমারও চোখে জল না আসিয়া থাকিতে পারিল না। ইহার পূর্ব্বে পিতাকে এতটা প্রেমের সহিত আচরণ করিতে কিংবা তাঁর চোখ দিয়া জল পড়িতে আমি কখন দেখি নাই। প্রায়শ্চিত্ত নেবার সময় পর্য্যন্ত, আমরা যা করচি তা ভাল নয় এইরূপ আমারও মনে হচ্ছিল; কিন্তু পিতার এই আচরণ দেখিয়া, যা করেছি তা ভালই করেছি এইরূপ আমার মনে হল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

কিরাতার্জ্জুনীয়ে দ্রৌপদী-চরিত্র।

মহাকবি ভারবি, তাঁহার অমরকাব্য 'কিরাতার্জ্জুনীয়ের' কয়েক পৃষ্ঠায় দ্রৌপদীর একখানি মনোরম চিত্র আঁকিয়াছেন। যদিও ইহা অমর কবি ব্যাসদেবের চিত্রেরই অনুরূপ হইয়াছে, যদিও ইহাতে তিনি কোন নূতন বর্ণ সংযোজিত করেন নাই, তাহা হইলেও জানি না কবি কোন্ মুগ্ধমন্ত্রে এই চিত্রখানিকে কতকটা নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। যে কেহই ভারবির দ্রৌপদী-চরিত্র পড়িয়াছেন, তিনিই মহাভারতের দ্রৌপদী হইতে ইহাতে একটা নূতন সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়াছেন। কবি তাঁহার কাব্যখানির প্রায় সকল চরিত্র ও সকল ঘটনাই মহাভারত হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু যদি তাঁহার এই "পরকে আপন করিয়া লইবার" অনন্যসাধারণ মহাকবিসুলভ ক্ষমতাটুকু না থাকিত, তবে কি আজ আমরা তাঁহার কাব্যখানির নামগন্ধও পাইতাম? ব্যাসের আবিষ্কৃত পথে গমন করিয়াছেন বলিয়া, ভারবির কবিপ্রতিভা যে তত প্রখর ছিল না তাহা বলা যায় না। সংস্কৃতসাহিত্যের কোন্ কবিই বা বাল্মীকি ও ব্যাসের নিকট ঋণী নন?

ভারবির এই মহাকাব্যখানির মাত্র প্রথম ও তৃতীয় সর্গে আমরা দ্রৌপদীকে দেখিতে পাই; আর একাদশ সর্গে অর্জ্জুনের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে মাত্র দুই-একটী কথা শুনিয়াই আমাদের নিরস্ত হইতে হয়। কিন্তু কবি এই অল্প কয়েকটী রেখাপাত করিয়াই পাঠকের হৃদয়কন্দরে দ্রৌপদীর এমনই একখানি পূর্ণ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া দেন, যে তাহা আর সমস্ত জীবনেও ভুলিতে পারা যায় না।

কাব্যের আরম্ভেই আমরা দেখিতে পাই একজন গুপ্তচর আসিয়া দুর্য্যোধন কিরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া রাজ্যপালন করিতেছেন তাহা গোপনে যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিয়া গিয়াছে; তিনি দ্রৌপদীর কুটীরে আসিয়া শত্রুর সেই অভ্যুদয়বার্ত্তা সকলের সমক্ষে নিবেদন করিয়াছেন; আর ক্ষত্রিয়কুমারী দ্রৌপদী, তেজস্বিনী পতিপরায়ণা দ্রৌপদী যখন দেখিলেন যে, শত্রুর সেই সমুদ্ভাসিত যশঃপ্রভায় পঞ্চভ্রাতার পূর্ব্বার্জ্জিত কীর্ত্তিমালা যেন ম্লান হইয়া আসিতেছে, যখন দেখিলেন ভ্রাতৃপ্রেমের স্নিগ্ধস্পর্শে যুধিষ্ঠিরের ক্ষাত্র তেজ বুঝি বা নির্ব্বাপিত হইয়াই যায়; বুঝি বা তিনি স্নেহের মোহে পতিত হইয়া কঠোর নীতিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন; তাই তখন ভারতেশ্বরের উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদী নিজের কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইলেন। তিনি ভাবিলেন যে এই সুপ্ত সিংহকে জাগাইতে হইলে একটু আঘাতের প্রয়োজন, হৃদয়ের এই স্নেহময় আবরণখানিকে তুলিয়া ফেলিতে হইলে কঠোর নীতির প্রয়োজন, তাই দ্রৌপদী অতি বিচক্ষণতার সহিত নিজেদের পূর্ব্বাবস্থা ও শত্রুকৃত দুরবস্থা একটী একটী করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মানুষ অবস্থার দাস'; সে যখন যে অবস্থায় পতিত হয় তখন অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহারি মত করিয়া আপনাকে গঠিত

করিয়া লয়; তখন আর সে অবস্থা তাহাকে কোন কষ্ট দিতে পারে না; কিন্তু কষ্ট তখনই, যখন সেই অবস্থার সহিত পূর্ব্বের অবস্থার তুলনা করা যায়, যখন অবস্থাদ্বয়ের বৈষম্য নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, যখন বোঝা যায় যে আমাদের অবনতিটা কত বড়! দ্রৌপদী মনুষ্যহৃদয়ের এই গূঢ় রহস্যটুকু অবগত ছিলেন; তাই তিনি কাতরকণ্ঠে যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন;—

অনারতং যৌ মণিপীঠশায়িনৌ
অরঞ্জয়দ্রাজশিরঃস্রজাং রজঃ।
নিষীদতস্তৌ চরণৌ বনেষু তে
মৃগদ্বিজালূনশিখেষু বর্হিষাম্॥

"আপনার যে চরণযুগল সর্ব্বদা মণিময় পাদপীঠের উপর থাকিত; কত নৃপতিবৃন্দের শিরোমালিকার পরাগপুষ্পে যে চরণযুগল সর্ব্বদা রঞ্জিত হইত; হায়! আজ আপনার সেই চরণযুগল,—যেখানকার কুশাগ্র মৃগেরা খাইয়া ফেলিয়াছে, কিংবা ঋষিরা যেখানকার কুশাগ্র পুণ্য কর্ম্মের নিমিত্ত কাটিয়া লইয়া গিয়াছেন, সেই খরস্পর্শ কুশারণ্যের মধ্যে রহিয়াছে।"

দ্রৌপদী দেখিলেন যে, শত্রুরা পদে পদে তাঁহাসহিত শঠতা করিতেছে। তাহারা ভীমার্জ্জুনের তীব্র ক্ষাত্রতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, ছলে তাঁহাদিগকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যদি সেই শঠদিগের সহিত শঠতা বা মন্ত্রগুপ্তি না করেন, তবে তাঁহারা নীতির মর্য্যাদা রাখিতে পারিবেন না; এই ভীষণ সংসারক্ষেত্রে নীতিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ কেবল পরাভবই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাই তিনি কঠোর স্বরে যুধিষ্ঠিরকে শুনাইতেছেন,—

"ব্রজন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ পরাভবং
ভবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ।"

দ্রৌপদী আবার আপনার তীক্ষ্ণ অনুভূতির দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, মনুষ্যের হৃদয় নিজের দুঃখদৈন্যের মধ্যে যতই কেন অবিচলিত থাকুক না, কিন্তু কখনও সে নিজের স্নেহাস্পদের দুঃখদৈন্যকে তেমন অবিচলিতভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার একটুখানি ম্লান হাসিতেই অন্তরের সমস্ত উৎসব একেবারে আঁধার হইয়া যায়, কিছুই ভাল লাগে না; তাই দ্রৌপদী নিজের তেজস্বিনী ভাষায় ভীমার্জ্জুন ও নকুলসহদেবের সেই তীব্র দৈন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণনা করিলেন। আমরা তাঁহার যে উক্তিটাই লইয়া একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখি, তাহারি মাঝে তাঁহার অপূর্ব্ব নীতিপরায়ণতা লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই।

দ্রৌপদী ভাবিলেন বুঝি বা ধর্ম্মরাজ ক্রোধকে একটা 'কুবৃত্তি' মনে করিয়াই তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শত্রুকৃত অপমানকে অঙ্গের ভূষণই মনে করিতেছেন। তিনি বুঝিলেন যে একেবারে ক্রোধরাহিত্যটা মোটেই ভাল নয়; বিশেষতঃ সংসারীর পক্ষে কিছু ক্রোধ থাকা বিশেষ দরকার। ভগবান তাঁহার সেবকগণের কেবল দুঃখকষ্ট বাড়াইবার জন্যই এই বৃত্তিটাকে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি কখনও এত নিষ্ঠুর নন, তবে আমরা বড় অসংযত, তাই তাহার যথাযথ ব্যবহার করিতে পারি না বলিয়াই কষ্টভোগ করিয়া থাকি। তাই তিনি বলিলেন যে ক্রোধ একেবারেই পরিত্যাগ করিলে লোকে মোটেই মানে না; কিন্তু যে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যকে নিপীড়িত বা অনুগৃহীত করে লোকে তাহারই বশবর্ত্তী হয়। আপনি রাজা হইয়া ভারতের সিংহাসনে উপবেশন করিবেন; আপনার এরূপ হইলে চলিবে কেন? অতএব নরনাথ! আপনার নির্ব্বাপিতপ্রায় ক্ষাত্র তেজকে আবার প্রজ্বালিত করুন, আবার শত্রুবধের নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন, তাহা হইলে আবার আমাদের গৌরবসূর্য্য দিক প্রোদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইবে।

দ্রৌপদীর যেমন অপূর্ব্ব নীতিজ্ঞতা ও বিচারক্ষমতা, তাঁহার তেজস্বিতাও তেমনি অপূর্ব্ব। যুধিষ্ঠির যখন প্রশান্তহৃদয়ে দুর্য্যোধনের অভ্যুদয় বর্ণনা করিলেন, তখন সেই দ্বৈতবনের গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করার সৎসাহস এক দ্রৌপদী ব্যতীত আর কাহারও ছিল না। যদিও ভীম পরে যুধিষ্ঠিরকে যথেষ্ট বলিয়াছিলেন, কিন্তু দ্রৌপদী যদি অগ্রবর্ত্তী না হইতেন তবে কি আমরা ভীমকে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে দেখিতাম? দ্রৌপদী বুঝিয়াছিলেন, অন্ধানুবর্ত্তিতা কিছুই নয়। অবশ্য ভাল বুঝিয়া যাহা বলা যায় তাহা দোষসঙ্কুল হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া

ভয়ে ভয়ে যুধিষ্ঠিরের কথা সমর্থন করা অপেক্ষা নিজে যাহা সত্য ও নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাই সাহসপূর্ব্বক প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এরূপ সংসাহস জগতে অতীব বিরল। দ্রৌপদীর এই সৎসাহসই তাঁহার মনের ও ধর্ম্মের বল আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্টভাবে উপস্থিত করিতেছে।

দ্রৌপদীকে আবার যখন কবি তৃতীয় সর্গে উপস্থিত করিয়াছেন, সেখানেও তাঁহাকে আমরা এইরূপই নীতিজ্ঞা ও তেজস্বিনী দেখিয়া থাকি। একমাত্র কর্ত্তব্যের দিকে, নীতির দিকে, ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সর্ব্বত্রই কার্য্য করিয়া যাইতেছেন; একদেশদৃষ্টি বা অন্যবিধ মানসিক দুর্ব্বলতা তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। রমণীরত্ন তিনি যে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল সেই কর্ত্তব্যকেই নিজের জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া সংসারের পথে চলিয়াছেন। তিনি ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, সহস্র অত্যাচার মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু নিতান্ত নিরীহের মত দুর্ব্বৃত্তের শঠতাজালে বিজড়িত হইয়া দুঃখভোগ করাকে কাপুরুষতা বলিয়া মনে করেন। তাঁহার দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ; তাঁহার অভিজ্ঞতার উপদেশ দৈববাণীর মত ফল প্রসব করে। তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, নির্জ্জন প্রদেশে বসিয়া তপস্যা করিতে করিতে মনে করিও না যে, 'আমি ত নিস্পৃহ, আমার আবার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়'? কারণ,—

"মাৎসর্য্যরাগোপহতাত্মনাং হি
স্খলন্তি সাধুষ্বপি মানসানি॥"

অর্থাৎ লোকে স্নেহ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া নিরপরাধ সাধুর প্রতিও অত্যাচার করিতে পারে। আমরা যখন ত্রয়োদশ সর্গে মূকদানবকে বরাহমূর্ত্তিতে তপস্যাপরায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান দেখি তখন মনে হয়, বুঝি বা দ্রৌপদী দৈববাণীই করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি নীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট ভবিষ্যৎও তাহার রহস্যময় আবরণকে অনেক সময়ে মুক্ত করিয়া দেয়।

প্রথম সর্গে দ্রৌপদীর তেজঃপূর্ণ উক্তিগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, বুঝি বা তিনি রমণীর পবিত্র ধর্ম্ম পাতিব্রত্যের মর্য্যাদা রাখিতে পারিতেছেন না; বুঝি বা তিনি সে অমূল্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন; কিন্তু যদি আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার কথাগুলি বুঝিতে চেষ্টা করি, যদি আমরা তাঁহার হৃদয়ের সহিত আমাদের হৃদয়খানি মিশাইতে পারি, তবে তাঁহার পতিপ্রীতির চরমোৎকর্ষ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইব, ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা অনাবিল, পতির পরম মঙ্গলবিধায়ী তাঁহার সেই পাতিব্রত্যধর্ম্মের প্রতি স্থির লক্ষ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইব, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, সেরূপ উন্নত আদর্শের স্রষ্টার প্রতি বিস্ময় ও ভক্তিতে হৃদয় অবনত হইয়া পড়িবে।

দ্রৌপদীর পতিপ্রীতি এত উন্নত, এত স্বর্গীয় যে পৃথিবীর লোক আমরা, হঠাৎ তাহার সে উচ্চতা, সে স্বর্গীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি না। তাই আমরা বড় ভুল করি, দ্রৌপদীকে ভাল বুঝিতে পারি না। ক্ষত্রিয়রমণী তিনি, কর্ত্তব্যপরায়ণা ভারতের ঈশ্বরী তিনি, তাঁহার পতিপ্রীতি একজন সাধারণ রমণীর সহিত সমান হইবে? পতির সর্ব্ববিধ মঙ্গলের প্রতি তাঁহার স্নেহদৃষ্টি সর্ব্বদাই জাগরূক রহিয়াছে। তাঁহার কোমল হৃদয়, পতির প্রতি কত স্নেহময়! কত ব্যগ্র! তিনি যেন আপনার সুখদুঃখের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন; কেবল স্বামীর সুখদুঃখের মাঝেই আপনার হৃদয়খানি ডুবাইয়া দিয়াছেন, তাই স্বামীর পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলেও সে আঘাতে তাঁহার কোমল হৃদয়খানি একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়; তাই ত স্বামীকে বিপন্ন হইয়াও উদাসীন থাকিতে দেখিয়া, মর্ম্মবেদনায় ক্ষুব্ধা দ্রৌপদীকে বলিতে শুনি,—

ইমামহং বেদ ন তাবকীং ধিয়ং
বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ।
বিচিন্তয়ন্ত্যা ভবদাপদং পরাং
রুজন্তি চেতঃ প্রসভং মমাধয়ঃ।

"আপনার এই বুদ্ধি আমি বুঝিতে পারি না; লোকের মনোবৃত্তি কত বিচিত্র! আপনার বিপদের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার চিত্ত অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে আর আপনি কেমন নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন!"

দ্রৌপদীর মানসিক বল অসীম। তিনি আসন্ন

দৈন্যকে হাস্যমুখে আলিঙ্গন করিতে পারেন। কিন্তু ইহা ত শুধু দৈন্য নয়, ইহা যে শত্রুর প্রচ্ছন্ন উপহাস! তেজস্বিনী পতিপরায়ণা রমণী স্বামীর এ অপমান কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? তাই ত ভারতের উপযুক্তা ঈশ্বরীর মত দ্রৌপদীর কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইতেছে,—

"দ্বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং দশা ততঃ
সমূলমুন্মূলয়তীব মে মনঃ।"

"আপনি শত্রুর জন্যই এরূপ দুরবস্থা ভোগ করিতেছেন দেখিয়া, আমার মন সমূলে উন্মূলিত হইয়া যাইতেছে।"

দ্রৌপদীর বেদনাপ্লুত জ্বালাময়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি পড়িতে পড়িতে আমাদের স্বতঃই রাজপুতমহিলার কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়; আর ভাবি তিনি বুঝি ভারতের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়াই, অমরার সুখসম্পত্তিকে তুচ্ছ করিয়া আবার রাজপুত-মহিলারূপে ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের সীতা, শকুন্তলা ও দ্রৌপদীতে রমণীচরিত্রের পূর্ণ পরিণতি দেখান হইয়াছে। আমাদের মনে হয় এই তিনটী চরিত্র, যে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, সে ই ভারতবর্ষকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে সক্ষম, সে-ই ইহার অন্তঃসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবে।

আর এক জায়গায় আমরা দ্রৌপদীর একখানি "কোমল-কঠোর" মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাই; আত্মহারা হইয়া সেই সৌন্দর্য্য-ধারা পান করিতে থাকি; আর তাঁহার পতিপ্রীতির উচ্চ আদর্শ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাই। অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের জন্য দেবতার আরাধনা করিতে যাইতেছেন; তাঁহাকে কিছু কালের জন্য বিদায় দিতে হইবে; তাই আসন্ন বিরহের দুঃখে দ্রৌপদীর নীল নয়ন দুইটী অশ্রুকণিকায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে; যেন হেমন্তপ্রাতের শিশির-সিক্ত দুইটী নীলোৎপল! প্রবাসগামী স্বামীকে একটীবার প্রাণ ভরিয়া দেখিবার জন্য সাধ্বী রমণী বড় আশায় তাঁহার প্রতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! কোথা হইতে দুই ফোটা অশ্রু আসিয়া তাঁহার সে আশাটুকু পূর্ণ করিতে দিল না, তাঁহার স্বামীদর্শনপুণ্যে ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিল। চোখের জল পড়িলে পাছে স্বামীর কোন অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় স্নেহময়ী রমণী নয়ন নিমীলিত করিতে পারিতেছেন না। আহা কি হৃদয়হারী চিত্র! জানি না কবি কোন্ কলা-বিদ্যার সাহায্যে মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে, এই মুগ্ধ আলেখ্যখানি খোদিত করিয়া দিলেন। কোন্ অতীত যুগে, কে জানে কোথাকার কোন্ নিভৃত গৃহে বসিয়া কবি এই আলেখ্যখানি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া চিত্রে তাহা ফুটাইয়া গিয়াছেন!

কিন্তু দ্রৌপদীর সংযম-শক্তি অসীম; সর্ব্বত্রই কর্ম্মের দৃঢ়ভিত্তির উপর তাঁহার চরিত্র প্রতিষ্ঠিত। কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া শোক প্রকাশ করা কি সে চরিত্রে সম্ভব? হৃদয়ের মাঝে শোকের ফল্গু নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়া, তাঁহাকে যে এখনই কর্ত্তব্যের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে হইবে। পতনোম্মুখী অশ্রুধারাকে রুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে যে এখনই অর্জ্জুনের হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করিতে হইবে। তাই ত আমরা দেখিতে পাই কর্ত্তব্যপরায়ণা রমণী শোকসাগরের তীব্র বিলোড়নে অবিচলিত থাকিয়া কঠোর ভর্ৎসনার স্বরে স্বামীকে বলিতেছেন,—"তুমি কোন্ অর্জ্জুন? একদিন যার ক্ষাত্রবীর্য্যে উত্তর কুরু পর্য্যন্ত পায়ের তলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল সেই অর্জ্জুন অথবা আজ যাহার সম্মুখে দুঃশাসন তাহার স্ত্রীর কেশাকর্ষণ করিয়া বীরত্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিয়াছে, সেই অর্জ্জুন"?

দ্রৌপদীর এই তীব্র ভর্ৎসনাবাণী পড়িতে পড়িতে মনে হয়, আজ যিনি তাঁহাদের ভাবী মঙ্গলের জন্য বিদেশ যাত্রা করিতেছেন, তাঁহাকে এত করিয়া বলাটা বুঝি দ্রৌপদীর ন্যায়সঙ্গত হইতেছে না। বিশেষতঃ তাঁহার নিজের দুঃখ, নিজের অপমানটাই এত বড় করিয়া প্রকাশ করাটা আমাদের প্রথম দৃষ্টিতে মোটেই ভাল লাগে না। কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিলেই আমরা এখানেও তাঁহার সেই পতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের প্রতি স্থির লক্ষ্যটাই দেখিতে পাই। দ্রৌপদী বুঝিয়াছিলেন যে পুরুষমাত্রই—সে যতই কেন হীন, দুর্ব্বল ও নগণ্য হউক না—যদি সে কাহাকেও তাহার স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিতে

দেখে, তবে সে অম্লানবদনে কখনও তাহা সহ্য করিয়া যাইতে পারে না; আর যাহাদের বীর্য্যে জগদ্ বিকম্পিত, সেই ভীমার্জ্জুনের কথা ত স্বতন্ত্র; আজ বিদায়ের দিনে অর্জ্জুনের মনের মধ্যে কতকটা বিষাদ সঞ্চিত হইয়া যাহাতে তাঁহার হৃদয়কে দুর্ব্বল করিয়া না ফেলে তাহারই জন্য নীতিকুশলা দ্রৌপদীর এই কৌশল।

একাদশ সর্গে ইন্দ্র যখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া অর্জ্জুনের মানসিক বল পরীক্ষা করিতেছিলেন, আর তিনি তাঁহার এক একটী প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সুযোগ লাভ করিতেছিলেন, সেই সময় আমরা অর্জ্জুনের কয়েকটী কথা হইতে বুঝিতে পারি যে দ্রৌপদীর এই তীব্র ভর্ৎসনা তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল এবং সেরূপ অবস্থায় তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে তেমন একটা কঠোর আঘাতের কতখানি দরকার ছিল। অর্জ্জুন যেন নয়নের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিলেন, যে দুঃশাসন আসিয়া দ্রৌপদীর কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে; আর তিনি নিতান্ত অসহায়ার ন্যায়, সিংহকবলিতা হরিণীর ন্যায় মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। জানি না কত ক্ষোভে, কত দুঃখে, অর্জ্জুনের সেই বীর-হৃদয়কে বিলোড়িত করিয়া তখন বিনির্গত হইয়াছিল;—

অযথার্থক্রিয়ারম্ভৈঃ পতিভিঃ কিং তবেক্ষিতৈঃ।
অরুধ্যেতামিতীবাস্যা নয়নে বাষ্পবারিণা ॥

"তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ অতএব পতিনামের অযোগ্য, ইহাদিগকে দেখিয়া আর কি হইবে? এই বলিয়াই যেন তাঁহার আঁখিজল নয়ন দুইটাকে রুদ্ধ করিয়া দিল"। কবি এই একটী মাত্র কথায় অর্জ্জুনের হৃদয়খানি খুলিয়া আমাদের দেখাইয়া দিতেছেন যে দ্রৌপদীর তেমন কঠোর উক্তির মধ্যেও পতিপ্রীতির কেমন অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত ছিল।

ভারবি-অঙ্কিত দ্রৌপদীর চরিত্রে আমরা দেখি যে, তিনি কর্ত্তব্যকে কেন্দ্র করিয়া সংসারের সমস্ত কার্য্য সাধন করিতেন। সহস্র দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও কখনও তিনি এই চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। আমরা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ও প্রত্যেক বাক্যে এই কর্ত্তব্যের প্রতি অসীম গৌরবের ভাবটুকু অনুস্যূত দেখিতে পাই। আমরা যখন দেখিতে পাই যে এই মহান্ পবিত্র ভাবটাই তাঁহার আর সকল ভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তখন সত্য সত্যই আমাদের মস্তক ভক্তিভরে কবির পদপ্রান্তে অবনত হইয়া পড়ে। এমন কর্ত্তব্য-পরায়ণা বীররমণীর আদর্শ চরিত্র কেবল ভারতিতেই আমরা দেখিতে পাই।

কামরূপের পুরাতত্ত্ব।

(শ্রীবিজয় ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

কামরূপ অতি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সম্পৎসম্ভারে পরিপূরিত। কামরূপে যে সকল পুরাতত্ত্বের নিদর্শন এবং প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ রহিয়াছে ঐতিহাসিকগণ ঐ সকল লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিলে তাহাতে অনেক সামগ্রী লাভ করিবেন সংশয় নাই। মহামতি গেট (E. A. Gait) সাহেব বাহাদুরের অনুসন্ধিৎসার ফলে কামরূপের প্রাচীন ভূপতিগণের যে সকল তাম্রশাসন (copper plate grant) বঙ্গীয় এসিয়েটিক সোসাইটীতে প্রেরিত হইয়াছিল, প্রগাঢ় প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হর্ণলী (A. F. Rudolf Hoernle) কর্ত্তৃক সে সমস্ত সমালোচিত হইয়াছে। কল্কিপুরাণে উল্লেখ আছে "শম্ভুনেত্রাগ্নিদগ্ধঃ কামঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ তত্র রূপং যতঃ প্রাপ তত্তোভবেৎ" অর্থাৎ হরকোপানলে কামদেব ভস্মীভূত হইয়া তাঁহার কৃপাবশতঃ এই স্থানে পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হন; এই জন্য এই দেশ কামরূপ নামে অভিহিত।

"ঐশান্যাং পূর্ব্বভাগে চ কামরূপং বিজানীহি," অর্থাৎ ভারতবর্ষের ঈশানকোণে এবং পূর্ব্বভাগে কামরূপ দেশ অবস্থিত। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানাদির বর্ণনায় পদ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ ইত্যাদিতে কামরূপ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মহাভারতের কোন স্থানে কামরূপের উল্লেখ নাই। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে চন্দ্রবংশীয় রাজা "অমূর্ত্ত-রজা" পুণ্ড্র ভূমি অতিক্রম করতঃ কামরূপে ধর্ম্মারণ্য-

সমীপে একটা আর্য্য রাজ্য স্থাপন করেন। সেখানে উল্লেখ আছে—

"তথামূর্ত্তরজা বীরশ্চক্রে প্রাগজ্যোতিষং পুরং ধর্ম্মারণ্যসমীপস্থং" ইত্যাদি রামায়ণ।

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমে কামরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু দানবরাজ নরকের নাম যে যে স্থানে উক্ত হইয়াছে সেই সেই স্থানে প্রাগজ্যোতিষপুরের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।

যোগিনী তন্ত্রে কামরূপের সীমা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে :—

নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রিং ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমং।
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিং করতোয়াত্তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠো দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি
কামরূপ ইতি খ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্।
(একাদশ পটল ১৬-১৮)।

ইহার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে কামরূপের ভূভাগ পশ্চিম দিকে করতোয়া * ও পূর্ব্বদিকে দিক্করং † (Dikrang) নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমা কঞ্জগির ও কনকগিরি এবং দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষী নদীর সঙ্গম স্থল; অর্থাৎ মোটামুটী ভাবে বলিতে গেলে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, ভূটান, ত্রিপুরা, রঙ্গপুর, মৈমনসিংহ, কোচবিহার, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান কামরূপের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত তন্ত্রানুসারে কামরূপের এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ (১) উপবীথি, (২) বীথি, (৩) উপপীঠ, (৪) পীঠ, (৫) সিদ্ধপীঠ, (৬) মহাপীঠ, (৭) ব্রহ্মপীঠ, (৮) বিষ্ণুপীঠ ও (৯) রুদ্রপীঠ এই নবপীঠ বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল। সেখানে উল্লেখ আছে :—

"উপবীথিশ্চ বীথিশ্চ, উপপীঠঞ্চ পীঠকম্।
সিদ্ধপীঠং মহাপীঠং ব্রহ্মপীঠং তদান্তরম্॥
বিষ্ণুপীঠং মহাদেবি রুদ্রপীঠং তদান্তরম্।
নব যোনিরিতি খ্যাতা চতুর্দ্দিক্ষু সমন্ততঃ॥
(একাদশ পটল ২৫ শ্লোক)।

যোগিনী তন্ত্র অপেক্ষা "কালিকাপুরাণ" বহু পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে কামরূপের সীমা সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

করতোয়া নদী পূর্ব্বং যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তম্॥
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভূতাচলপূরিতম্।
নদীশতসমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্॥

অর্থাৎ কামরূপের সীমা পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত। ইহার পরিমাণ দৈর্ঘে একশত যোজন, বিস্তারে ত্রিশ যোজন। ইহা ত্রিকোণ, কৃষ্ণবর্ণ, প্রভূত পর্ব্বত বেষ্টিত এবং একশত নদী সমাযুক্ত; ইহাই কামরূপ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত।

গ্রীক পণ্ডিত মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা গ্রন্থে প্রকাশিত মানচিত্রে সমুদয় পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিমোত্তরে মিথিলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মগধ পর্য্যন্ত কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে গভর্ণমেণ্ট লাইব্রেরী হইতে ব্রহ্ম ও আসাম দেশের যে বিবরণ পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়—আসাম নামে অদ্যাবধি অভিহিত প্রদেশ ব্যতীত বর্ত্তমান রঙ্গপুর, রাঙ্গামাটী বিভাগ, মৈমনসিংহ জেলার কিয়দংশ * এবং শ্রীহট্ট, মণিপুর, জয়ন্তীয়া ও কাছাড় প্রভৃতি জেলা কামরূপের অন্তর্গত ছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যোগিনীতন্ত্রানুসারে শ্রীহট্ট দেশ কামরূপের অন্তর্গত ছিল। এই তন্ত্রের কোন কোন স্থানে লিখিত আছে :—

ঐশান্যাং পূর্ব্বভাগে চ কামরূপং বিজানীহি
জালন্ধরস্তু বায়ব্যে কোলাপুরস্তু উত্তরে।
ঈশানে চৈব বিহারং মহেন্দ্রমুস্তরে কিয়ৎ
শ্রীহট্টমপি পূর্ব্বে চ উপপীঠান্যথ শৃণু॥
(দ্বিতীয়ার্দ্ধ ১ম পটল ১৪-১৫)।

* করতোয়া নদী বগুড়া জেলার সেরপুর গ্রাম হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই করতোয়া তটে সতীর বামতল্প মতান্তরে বসন পতিত হয়। এই জন্য ইহা একটী পীঠ স্থান হইয়াছে।

† দিক্করং নদী লক্ষীপুর জেলার অন্তর্গত সদীয়া নগরীর কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত।

* মৈমনসিংহের পূর্ব্বভাগে প্রাচীন কালে কামরূপ রাজ্যের অধীন ছিল। মদনপুরের রাজা মদনমোহন, গড়জরিপার দলিপ সামন্ত এবং জঙ্গল বাড়ীতে ভবানন্দ প্রভৃতি রাজগণ কামরূপের অধীন থাকিয়া ময়মনসিংহ জেলার সীমাবদ্ধরূপে শাসন দণ্ড পরিচালিত করিতেন। ইহারা সকলেই কোঞ্চানিতি সম্ভূত ছিলেন।

পংক্তিহস্তং কামরূপে সৌমারে তারহস্তকম্।
কোষপীঠে তুর্য্যহস্তং চৌহারে দ্বিগুণং ভবেৎ॥
মহেন্দ্রে তু কলাহস্তং শ্রীহট্টে বহ্নিহস্তকম্।
উপপীঠে তু পাতালে হস্তমেব বিজানীহি॥
(২য় ভাগ, দ্বিতীয় পটল ৪২-৪৩ শ্লোক)।

যোগিনীতন্ত্রের কয়েক স্থানে শ্রীহট্টদেশ কামরূপের সীমান্তর্গত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন। উক্ত তন্ত্রে কোচবিহারের আদিভূত রাজা বিশ্বসিংহের নাম পাওয়া যায়। তিনি মোগলকেশরী বাবরের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালে মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানের ন্যায় শ্রীহট্টদেশও মুসলমানদিগের অধীন হইয়া সুবে বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল। সুতরাং যোগিনীতন্ত্রমতে শ্রীহট্টদেশ তৎকালে কামরূপ রাজ্যান্তর্গত বলিয়া স্থির নির্দ্ধারণ করা যায় না।

প্রাচীন রাজগণ।

মহীরঙ্গ দানব কামরূপের আদি রাজা বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তার পর হাটকাসুর, শম্বরাসুর, রত্নাসুর প্রভৃতি দানবগণ পর্য্যায়ক্রমে কামরূপে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। অসুরশব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে বুঝা যায় যে তাঁহারা বৈদিক দেবদ্বেষী ছিলেন। তারপর নরকাসুর কামরূপের রাজা হয়। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে, "দেবেশ্বর নামক জনৈক শূদ্ররাজ শকাব্দের প্রারম্ভে কামরূপে রাজত্ব করিতেন। উক্ত তন্ত্রমতে "নাগাখ্যা" বিশ্বনাথ নামক স্থানের সন্নিকটে প্রতাপগড়ে আবির্ভূত হন। অনেকে অনুমান করেন এখানে যে দুর্গটীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, উহা তাঁহারই সময়ে বিরচিত হইয়াছিল। যোগিনীতন্ত্রমতে মীনাঙ্ক, গজাঙ্ক, শূকরাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক নামে অভিহিত নরপতিগণ দুই শত বৎসর কামরূপের লৌহিত্যপুর নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। উপরোক্ত প্রথম তিন জন রাজার রাজ্যশাসন সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

সুস্থির বর্ম্মা।

হর্ষচরিতে দেখিতে পাওয়া যায়, "পুত্রো দেবস্য কৈলাসস্থিতেঃ স্থিতিবর্ম্মণঃ সুস্থিরবর্ম্মা নাম মহারাজাধিরাজো যজ্ঞে তেজসাং রাশি মৃগাঙ্ক ইতি সংজনা জগুঃ (হর্ষচরিত, ৭ম উচ্ছ্বাস)। কামরূপের রাজা সুস্থিরবর্ম্মা "মৃগাঙ্ক" উপাধিতে অভিহিত হইতেন। হর্ষচরিতে "র" যুক্ত নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু তৎপুত্র ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে তাঁহার নাম সুস্থিতবর্ম্মা লেখা আছে। হর্ষচরিত পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীর লোক। তিনি ঐ সময়েই শ্রীকণ্ঠের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই রাজা শিলাদিত্য নামেও পরিচিত। তাহারই রাজধানীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ আহূত হন। বাণভট্ট ঐ ভ্রমণকারীর গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মগধের দামোদরগুপ্তের পুত্র "মহাসেন গুপ্ত" কামরূপ-রাজ সুস্থিত বর্ম্মার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি লৌহিত্য-তীরে (ব্রহ্মপুত্রতটে) সুস্থিতবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন:—

"শ্রীমৎসুস্থিতবর্ম্মঃ যুদ্ধবিজয়শ্লাঘাপদাঙ্কং মুহু
র্যস্যাদ্যাপি বিবুদ্ধকন্দকুমুদকুন্নাৎচ্ছহার [৺] তং।
লোহিত্যা তটেষু শীতলতলেষুৎফুল্লনাগদ্রুম
চ্ছায়াসুপ্তবিবুদ্ধসিদ্ধমিথুনৈঃস্ফীতং যশো গীয়তে॥

Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum.

কুন্নাৎচ্ছহারের পরবর্ত্তী লিপি অবুদ্ধ থাকায় উক্ত স্থানে বন্ধনীসমন্বিত একটী চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হইল।

মগধের এই গুপ্তবংশ সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র "গোবিন্দ গুপ্ত" হইতে উৎপন্ন। অফস্‌ড় ও দেওবরনার্কের খোদিত লিপি হইতে গুপ্তরাজবংশের যে তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(৪০০-১৪) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত = ধ্রুবদেবী

(৪১৫-৫৪) প্রথম কুমারগুপ্ত | গোবিন্দগুপ্ত বা কৃষ্ণগুপ্ত
| হর্ষগুপ্ত
| প্রথম জীবিত গুপ্ত
| তৃতীয় কুমার গুপ্ত
| দামোদর গুপ্ত
| মহাসেন গুপ্ত

মহাসেন গুপ্ত
|
শশাঙ্ক মাধবগুপ্ত = শ্রীমতী দেবী
আদিত্যসেন = কোন দেবী
দেবগুপ্ত = কমলা দেবী
|
২য় জীবিত গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুমান করেন আদিত্যসেন ৬৪০-৭৫ খৃঃ অব্দে মগধে রাজত্ব করেন। অফসঁড় নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই অফসঁড় নগর অতি প্রাচীন স্থান, ইহা সাকরী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। দেওবরনার্কের প্রাচীন নাম "বরুণিকা"। বিষ্ণুপুরাণ মতে মগধের গুপ্ত রাজ্য গঙ্গার উপকূল ভাগে প্রয়াগ (Allahabad) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বায়ুপুরাণের মতে সাকেত (অযোধ্যা) গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বায়ুপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পণ্ডিতবর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মগধের প্রধান নগরী ললিতপট্টন (পাটলিপুত্র) গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান রাজধানী ছিল। মিঃ গ্রাণ্ট (A. Grant) গুপ্ত সম্রাটদিগের যে সকল স্বর্ণমুদ্রা আহরণ করেন তাহাদের অধিকাংশই প্রাচীন সাকেত (ফৈজাবাদের নিকটবর্ত্তী অযোধ্যা) নগরের নিকট প্রাপ্ত হন। মিঃ হুপার অযোধ্যার পূর্ব্বভাগ হইতে অনেক গুপ্তমুদ্রা সংগ্রহ করেন। এতদ্দ্বারা বায়ুপুরাণের ঐতিহাসিক সত্যতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

ভগবদ্গীতার ন্যায় উপনিষদেও অব্যক্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ কখন সগুণ, কখন সগুণ-নির্গুণ এইরূপ উভয়বিধ এবং কখন শুদ্ধ নির্গুণ, এই তিন প্রকার বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়। উপাসনায় সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিই চোখের সম্মুখে থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। নিরাকার অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর স্বরূপের উপাসনাও হইতে পারে। কিন্তু যাঁহার উপাসনা করিতে হইবে তিনি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচর না হইলেও, মনের গোচর না হইলে তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না। উপাসনা অর্থে চিন্তন, মনন বা ধ্যান। চিন্তিত বস্তুর রূপ না হইলেও অন্য কোন গুণও মনের উপলব্ধি না হইলে মন কিসের চিন্তা করিবে? তাই অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষের অগ্রাহ্য পরমাত্মার উপাসনা (চিন্তন, মনন, ধ্যান) উপনিষদে যে যে স্থানে কথিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে অব্যক্ত পরমেশ্বর সগুণ বলিয়াই কল্পিত হইয়াছেন। পরমেশ্বরের সম্বন্ধে কল্পিত এই গুণ উপাসকের অধিকার অনুসারে ন্যূনাধিক ব্যাপক কিংবা সাত্ত্বিক হইয়া থাকে; এবং যাহার যেরূপ নিষ্ঠা তাহার সেইরূপ ফলও লাভ হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩. ১৪. ১) উক্ত হইয়াছে, "পুরুষ ক্রতুময়, যাহার যেরূপ ক্রতু (নিশ্চয়), মরিবার পর সে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়", এবং ভগবদ্গীতাতেও কথিত হইয়াছে যে, "দেবতাদের প্রতি ভক্তিমান দেবতাদের সহিত এবং পিতৃগণের প্রতি ভক্তিমান পিতৃগণের সহিত গিয়া মিলিত হয়েন" (গীতা ৯. ২৫), অথবা "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"—যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা তাহার সেইরূপ সিদ্ধি লাভ হয় (১৭. ৩)। তাৎপর্য্য এই যে, উপাসকের অধিকারভেদে উপাস্য অব্যক্ত পরমাত্মার গুণও উপনিষদে ভিন্ন ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদের এই প্রকরণকে 'বিদ্যা' বলে। বিদ্যা ঈশ্বরপ্রাপ্তির (উপাসনারূপ) মার্গ, এবং এই মার্গ যে প্রকরণে কথিত হইয়া থাকে, তাহাও শেষে 'বিদ্যা' নামে অভিহিত হয়। শাণ্ডিল্যবিদ্যা (ছাঃ. ৩. ১৪), পুরুষবিদ্যা (ছাঃ. ৩. ১৬, ১৭), পর্য্যঙ্কবিদ্যা (কৌষী. ১), প্রাণোপাসনা (কৌষী. ২) ইত্যাদি অনেক প্রকারের উপাসনা উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে; এবং বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে এই সকল বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। এই প্রকরণে অব্যক্ত পরমাত্মার সগুণ বর্ণন এই প্রকারে করা হইয়াছে যে তিনি মনোময়, প্রাণশরীর, ভারূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ ও সর্ব্বরস (৩. ১৪. ২)। তৈত্তিরীয়োপনিষদে তো অন্ন, প্রাণ, মন, জ্ঞান বা আনন্দ—এই সকল রূপেও পরমাত্মার ক্রমোচ্চ উপাসনা কথিত হইয়াছে (তৈ. ২. ১-৫; ৩. ২-৬)। বৃহদারণ্যকে (২. ১) অজাতশত্রুকে গার্গ্য বালাকী সর্ব্বপ্রথম আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল বা দিক্‌সমূহে অধিষ্ঠিত পুরুষসমূহেরই ব্রহ্মরূপে উপাসনা কথিত হইয়াছে; কিন্তু পরে প্রকৃত ব্রহ্ম এই সকলেরও অতীত, ইহা

অজাতশত্রু তাহাকে বলিয়া শেষে প্রাণোপাসনাকেই মুখ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাতেই এই পরম্পরা কিছু সম্পূর্ণ হয় না। উপরি-উক্তসমস্ত ব্রহ্মরূপকে 'প্রতীক' অর্থাৎ এই সকলকে উপাসনার জন্য কল্পিত গৌণ ব্রহ্ম-স্বরূপ কিংবা ব্রহ্মনিদর্শক চিহ্ন বলা যায়; এবং এই গৌণ রূপই কোন মূর্ত্তির রূপে চোখের সামনে রাখিলে তাহাকেই 'প্রতিমা' বলা হয়। কিন্তু মনে রেখো, সমস্ত উপনিষদের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ ইহা হইতে ভিন্ন (কেন. ১. ২-৮)। এই ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণন করিবার সময় কোন স্থানে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তি. ২. ১) কিংবা "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃ. ৩. ৯. ২৮) বলা হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য (সৎ), জ্ঞান (চিৎ) এবং আনন্দরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ,—এই প্রকারে তিন-গুণেরই মধ্যে সমস্ত গুণের সমাবেশ করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এবং অন্যস্থানে ভগবদ্গীতার ন্যায় পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণসমূহ একত্র করিয়া ব্রহ্মের: বর্ণন এইপ্রকার করা হইয়াছে যে, "ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন" (ঋ. ১০. ১২৯. ১) অথবা "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" অর্থাৎ অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অপেক্ষাও বৃহৎ (কঠ. ২. ২০), "তদেজতি তন্নৈজতি তৎদূরে তদ্বন্তিকে" অর্থাৎ তিনি চলেন তিনি চলেন না, তিনি দূরেও আছেন, তিনি নিকটেও আছেন—(ঈশ. ৫; মুং, ৩. ১. ৭), অথবা 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস" অথচ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত' (শ্বেতা. ৩. ১৭)। যম নচিকেতাকে এই জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন যে, শেষে উপযুক্ত সমস্ত লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের, কৃত ও অকৃতের, কিংবা ভূত ও ভব্যেরও অতীত যিনি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া, জান (কঠ. ২. ১৪)। এইপ্রকার মহাভারতের নারায়ণীয় ধর্ম্মে ব্রহ্মা রুদ্রকে (মভা. শাং. ৩৫১. ১১), এবং মোক্ষধর্ম্মে নারদ শুকদেবকে বলিয়াছেন (৩৩১.৪৪)। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (২. ৩. ২) পৃথিবী, জল ও অগ্নি, এই তিনটিকে ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ বলা হইয়াছে; আবার বায়ু ও আকাশকে অমূর্ত্তরূপ বলিয়া, দেখাইয়াছেন যে, এই অমূর্ত্তের সারভূত পুরুষের রূপ বা রং বদল হয়; এবং শেষে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, 'নেতি নেতি' অর্থাৎ এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল, তাহা নহে, তাহা ব্রহ্ম নহে,—এই সমস্ত নামরূপাত্মক মূর্ত্ত বা অমূর্ত্ত পদার্থের অতীত (পর) যে 'অগৃহ্য' বা অবর্ণনীয় তাহাকেই পরব্রহ্ম জানিবে (বৃহ. ২. ৩, ৬ এবং বেসূ. ৩. ২. ২২)। অধিক কি, যে যে পদার্থের কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে সেই সমস্তেরও অতীত যিনি, তিনিই পরব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্মের অব্যক্ত ও নির্গুণ স্বরূপ দেখাইবার জন্য 'নেতি নেতি' এই এক ক্ষুদ্র নির্দ্দেশ, আদেশ বা সূত্রই হইয়া গিয়াছে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদেই উহার চারিবার প্রয়োগ হইয়াছে (বৃহ. ৩. ৯. ২৬; ৪.২. ৪; ৪. ৪. ২২; ৪. ৫. ১৫); সেইরূপ অন্য উপনিষদেও পরব্রহ্মের নির্গুণ ও অচিন্ত্যরূপের বর্ণন পাওয়া যায়, যথা—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈত্তি. ২. ৯); "অদ্রেশ্যং (অদৃশ্য), অগ্রাহ্য" (মুং. ১. ১. ৬), "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" (মুং. ৩. ১. ৮)—চোখে দেখা যায় না কিংবা বাক্যের দ্বারা বলা যায় না; অথবা—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎপ্রমুচ্যতে॥

অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম পঞ্চ মহাভূতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুণ-বিরহিত, অনাদি, অনন্ত, ও অব্যয় (কঠ. ৩. ১৫; বেসূ. ৩. ২, ২২-৩০ দেখ)। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম্মের বর্ণনাতেও ভগবান নারদকে আপন বাস্তব স্বরূপ "অদৃশ্য, অজ্ঞেয়, অস্পৃশ্য, নির্গুণ, নিষ্কল (নিরবয়ব), অজ, নিত্য, শাশ্বত ও নিষ্ক্রিয়" এইরূপ বলিয়া তিনিই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়কর্ত্তা ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বর, এবং ইঁহাকেই 'বাসুদেব পরমাত্মা' বলা হয়, এইরূপ বলিয়াছেন (মভা. শাং. ৩৩৯. ২১-২৮)।

অতএব উপরি-উক্ত বচনাদি হইতে উপলব্ধি হইবে যে, শুধু ভগবদ্গীতায় নহে, মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম্মে এবং উপনিষদেও পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্ত স্বরূপই শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং এই শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত স্বরূপ সেখানে সগুণ, সগুণনির্গুণ ও শেষে কেবল নির্গুণ এই তিনপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপের এই তিন পরস্পর-বিরোধী রূপের মিল কিরূপে করা যাইবে? এই তিনের মধ্যে সগুণ-নির্গুণ অর্থাৎ উভয়াত্মক যে রূপ তাহা সগুণ হইতে নির্গুণে (কিংবা অজ্ঞেয়ে) যাইবার সোপান বা সাধন এইরূপ বুঝা যায়। কারণ, প্রথমে সগুণ রূপের জ্ঞান হইলে পর আস্তে আস্তে এক এক গুণ ছাড়িয়া দিলে নির্গুণ স্বরূপের অনুভব হইতে পারে এবং এই পদ্ধতি অনুসারেই ব্রহ্মপ্রতীকের ক্রমোচ্চ উপাসনা উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে বরুণ ভৃগুকে প্রথমে এই উপদেশ দিলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম তদনন্তর ক্রমে ক্রমে প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান তাঁহাকে দিয়াছেন (তৈত্তি. ৩. ২-৬)। কিংবা এরূপও বলা যাইতে পারে যে, গুণবোধক বিশেষণের দ্বারা কেহ নির্গুণের বর্ণনা কখনই করিতে পারে না বলিয়া, অগত্যা পরস্পরবিরুদ্ধ বিশে-

যণের দ্বারা তাহার বর্ণনা করিতে হয়। কারণ, 'দূর' বা 'সৎ' শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র অন্য কোন বস্তু 'নিকটে' বা 'অসৎ' এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে আমাদের মনে উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু একই ব্রহ্ম যদি সর্ব্বব্যাপী হয়েন তবে পরমেশ্বরকে 'দূর' বা 'সৎ' বিশেষণ দিয়া 'নিকট' বা 'অসৎ' কাহাকে বলিব? এই অবস্থাতে 'দূর নহেন, নিকট নহেন; সৎ নহেন, অসৎ নহেন'—এইরূপ ভাষার উপযোগ করিলে,—দূর ও নিকট, সৎ ও অসৎ ইত্যাদি পরস্পরসাপেক্ষ গুণের জোড় উঠাইয়া দিয়া, বাকী যাহা কিছু নির্গুণ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদা নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তাহাই ব্রহ্ম এইরূপ বোধ হইবার জন্য, ব্যবহারক্ষেত্রে পরস্পর-বিরুদ্ধ বিশেষণের এই ভাষাই প্রয়োগ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই (গী. ১৩. ১২)। যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই ব্রহ্ম হওয়ায় দূরে তিনিই, নিকটেও তিনিই, সৎও তিনিই এবং অসৎও তিনিই। তাই, অন্য দৃষ্টিতে দেখিলে, সেই ব্রহ্মের পরস্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের দ্বারা একই সময়ে বর্ণনা করিলেও চলে (গী. ১১. ৩৭; ১৩·১৫)। কিন্তু সগুণ-নির্গুণ এই উভয়বিধ বর্ণনার উপপত্তি এইরূপ করিলেও একই পরমেশ্বর কিরূপে সগুণ ও নির্গুণ এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন, সে কথার ব্যাখ্যা অবশিষ্টই রহিয়া যায়। যখন অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়গোচর রূপ ধারণ করেন তখন উহা তাঁহার মায়া; কিন্তু ব্যক্ত কিংবা ইন্দ্রিয়ের গোচর না হইয়া অব্যক্ত থাকিয়াই যখন তিনি নির্গুণের স্থানে সগুণ হইয়া যান তখন তাঁহাকে কি বলিবে? উদাহরণ যথা—একই নিরাকার পরমেশ্বরকে কেহ 'নেতি নেতি' বলিয়া নির্গুণ বলেন, আবার কেহ তাঁহাকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সর্ব্বকর্ত্তা ও দয়ালু বলেন। ইহার বীজ কি? কিম্বা উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পক্ষ কোন্‌টি? এই নির্গুণ অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ ও জীব কিরূপে উৎপন্ন হইল? এই সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আবশ্যক। সমস্ত সঙ্কল্পের দাতা অব্যক্ত পরমেশ্বর বাস্তবিক সগুণ; উপনিষদে ও গীতায় নির্গুণস্বরূপের যে বর্ণনা আছে, তাহা অতিশয়োক্তি বা নিরর্থক প্রশংসাপর উক্তি—এইরূপ বলিলে অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের মূল ভিত্তিকেই আঘাত করা হয়। যে বড় বড় মহাত্মাগণ ও ঋষিরা মনকে একাগ্র করিয়া সূক্ষ্ম ও শান্ত বিচারের দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈ. ২. ৯)—মনেরও যিনি দুর্গম, বাক্যও যাঁহাকে বর্ণনা করিতে পারে না, তাহাই চরম ব্রহ্মস্বরূপ তাঁহাদের আত্মপ্রতীতি অতিশয়োক্তি, কি প্রকারে বলা যায়? আমরা সাধারণ মনুষ্য, আমাদের ক্ষুদ্র মনে অনন্ত ও নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা হয় না বলিয়া প্রকৃত ব্রহ্ম সগুণই হইবে বলা আর সূর্য্যাপেক্ষা আমাদের দীপ শ্রেষ্ঠ বলা একই! হাঁ, যদি এই নির্গুণ স্বরূপের উপপত্তি উপনিষদে অথবা গীতায় না দেওয়া হইত তবে পৃথক কথা হইত; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দেখ-না, ভগবদ্‌গীতায় তো স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত স্বরূপ অব্যক্তই; এবং তিনি ব্যক্ত জগতের রূপ ধারণ করেন সে তো তাঁর মায়া (গী. ৪. ৬); কিন্তু ভগবান ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির গুণের দ্বারা "মোহ প্রাপ্ত হইয়া মূর্খ লোক (অব্যক্ত ও নির্গুণ) আত্মাকেই কর্ত্তা মনে করে" (গী. ৩. ২৭-২৯), কিন্তু ঈশ্বর তো কিছুই করেন না, কেবল অজ্ঞানের দ্বারা লোক ভ্রান্ত হয় (গী. ৫. ১৫) অর্থাৎ ভগবান স্পষ্টাক্ষরে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, অব্যক্ত আত্মা বা পরমেশ্বর বস্তুত নির্গুণ হইলেও (গী. ১৩. ৩১) মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ লোকে তাঁহার উপর কর্তৃত্বাদিগুণের অধ্যারোপ করিয়া তাঁহাকে সগুণ অব্যক্ত করিয়া তোলে (গী. ৭. ২৪)। এইরূপ ভগবান স্পষ্ট উপদেশ করিয়াছেন ইহা হইতে পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে গীতায় এ সিদ্ধান্ত বুঝা যায়:—(১) গীতায় পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের অনেক বর্ণনা থাকিলেও পরমেশ্বরের মূল ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপ নির্গুণ ও অব্যক্তই, এবং মনুষ্য অজ্ঞান বা মোহবশত তাঁহাকে সগুণ মনে করে, (২) সাংখ্যদিগের প্রকৃতি বা তাহার ব্যক্ত প্রপঞ্চ অর্থাৎ সমস্ত জগত এই পরমেশ্বরের মায়া; এবং (৩) সাংখ্যদিগের পুরুষ বা জীবাত্মা যথার্থত পরমেশ্বররূপী, পরমেশ্বরেরই ন্যায় নির্গুণ ও অকর্ত্তা, কিন্তু 'অজ্ঞান'-বশত লোকে তাহাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। বেদান্ত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও এইরূপ; কিন্তু উত্তর-বেদান্ত গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত বলিবার সময় মায়া ও অবিদ্যা এই দুয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ করা হইয়াছে। উদাহরণযথা—পঞ্চদশীতে প্রথমে কথিত হইয়াছে যে, আত্মা ও পরব্রহ্ম উভয়ই মূলে একই অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ; এই চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম যখন মায়াতে প্রতিবিম্বিত হন তখন সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী (সাংখ্যদিগের মূল) প্রকৃতি নির্ম্মিত হয়। কিন্তু পরে এই মায়ারই আবার 'মায়া' ও 'অবিদ্যা' এইরূপ দুই ভেদ করিয়া, বলা হইয়াছে; মায়ার ত্রিগুণের মধ্যে 'শুদ্ধ' সত্ত্বগুণের যখন উৎকর্ষ হয় তখন তাহাকে কেবল মায়া, এবং এই মায়াতেই প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মকে সগুণ অর্থাৎ ব্যক্ত ঈশ্বর (হিরণ্যগর্ভ) বলা হয়; এবং এই সত্ত্বগুণ যে, 'অশুদ্ধ' হইলে 'অবিদ্যা' হয় এবং তাহাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মকে 'জীব' এই নাম দেওয়া হয় (পঞ্চ. ১. ১৫-১৭)। এই-ভাবে দেখিলে, একই মায়ার স্বরূপত দুই ভেদ করিতে হয়—অর্থাৎ উত্তরকালীন বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখিলে,

পরব্রহ্ম হইতে 'ব্যক্ত ঈশ্বর' উৎপন্ন হইবার কারণ মায়া এবং 'জীব' উৎপন্ন হইবার কারণ অবিদ্যা মানিতে হয়। কিন্তু গীতাতে এইপ্রকার ভেদ করা হয় নাই। গীতা বলেন যে, ভগবান স্বয়ং যে মায়ার দ্বারা ব্যক্ত অর্থাৎ সগুণ রূপ ধারণ করেন (৭.২৫), কিংবা যে মায়ার দ্বারা অষ্টধা প্রকৃতি অর্থাৎ জগতের সমস্ত বিভূতি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, (৪.৬), সেই মায়ারই অজ্ঞানের দ্বারা জীব মোহ প্রাপ্ত হয় (৭. ৪-১৫)। 'অবিদ্যা' এই শব্দ গীতার কোথাও আসে নাই; এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যেখানে ঐ শব্দ আসিয়াছে সেখানে তাহার অর্থও এইপ্রকারে স্পষ্ট করা হইয়াছে যে, মায়ার প্রপঞ্চকেই অবিদ্যা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, (শ্বেতা. ৫. ১)। তাই, উত্তরবেদান্তগ্রন্থে কেবল নিরূপণের সুবিধার জন্য জীব ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অবিদ্যা ও মায়ার সূক্ষ্ম ভেদ স্বীকার না করিয়া আমি 'মায়া', 'অবিদ্যা' ও 'অজ্ঞান' এই শব্দগুলিকে সমানার্থকই মানি; এবং এক্ষণে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে সংক্ষেপে এই বিষয়ের বিচার করিব যে, ত্রিগুণাত্মক মায়া অবিদ্যা বা অজ্ঞান ও মোহ ইহাদের সামান্যত তাত্ত্বিক স্বরূপ কি, এবং উহার সাহায্যে গীতা ও উপনিষদের সিদ্ধান্তসমূহের উপপত্তি কিরূপে করা যায়।

নির্গুণ ও সগুণ এই শব্দ দুটি দেখিতে ছোট হইলেও উহার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ের সমাবেশ হয় তাহা দেখিতে গেলে, সত্যই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। যথা, জগতের মূল যখন ঐ অনাদি পরব্রহ্মই, যিনি এক, নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন, তখন তাহাতে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের গোচর অনেক প্রকার ব্যাপার ও গুণ কি প্রকারে উৎপন্ন হয় এবং এই প্রকার তাঁহার অখণ্ডতা কি প্রকারে ভগ্ন হইল; কিংবা যিনি মূলেতে একই তাঁহাতে ভিন্ন ভিন্ন বহুবিধ পদার্থ কিরূপে দৃষ্ট হইতেছে; যে পরব্রহ্ম নির্ব্বিকার এবং যাঁহাতে, মধুর, অম্ল, কটু কিংবা ঘন, তরল অথবা শীতোষ্ণাদি ভেদ নাই, তাঁহাতেই বিভিন্ন রুচি, ন্যূনাধিক ঘন-তরলতা কিংবা শীতল ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, আলোক ও অন্ধকার, মৃত্যু ও অমরতা ইত্যাদি অনেক প্রকারের দ্বন্দ্ব কিরূপে উৎপন্ন হইল; যে পরব্রহ্ম শান্ত ও নির্ব্বাত, তাঁহাতেই নানাবিধ ধ্বনি ও শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইল; যে পরব্রহ্মে অন্তর-বাহির কিংবা দূর-নিকট ভেদ নাই, তাঁহাতে অগ্রপশ্চাৎ এ-পার ও-পার কিংবা দূর-নিকট অথবা পূর্ব্ব-পশ্চিম ইত্যাদি দিক্‌কৃত স্থলকৃত ভেদ কিরূপে আসিল; যে পরব্রহ্ম অবিকারী, ত্রিকালে অবাধিত, নিত্য ও অমৃত, তাঁহাতে ন্যূনাধিক কাল-পরিমাণে নশ্বর পদার্থসমূহ কিরূপে হইল; কিংবা যাঁহাতে কার্য্যকারণভাবের স্পর্শমাত্র নাই সেই পরব্রহ্মের কার্য্যকারণরূপ,—যথা মৃত্তিকা ও ঘট—কেন দেখা যায়; এইপ্রকার অনেক বিষয়ের সমাবেশ উক্ত ছোট শব্দ দুটির মধ্যে হইয়াছে। কিংবা সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এক্ষণে এই বিষয়ের বিচার করিতে হইবে যে, একেরই মধ্যে নানাত্ব, নির্দ্বন্দ্বে অনেক প্রকার দ্বন্দ্ব, অদ্বৈতে দ্বৈত, অথবা অসঙ্গে সঙ্গ কিরূপে জুটিল। সাংখ্যকারেরা এই বিবাদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই দ্বৈত কল্পনা করিয়াছেন যে, নির্গুণ ও নিত্য পুরুষের ন্যায় ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগুণ প্রকৃতিও নিত্য ও স্বতন্ত্র। কিন্তু জগতের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার মানবমনের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, এই দ্বৈতের দ্বারা তাহার সমাধান হয় না শুধু নহে, প্রত্যুত যুক্তিবাদেও এই দ্বৈত টেঁকে না। তাই, প্রকৃতি ও পুরুষের বাহিরে গিয়া উপনিষৎকারেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠপদবীর 'নির্গুণ' ব্রহ্মই জগতের মূল। কিন্তু এক্ষণে নির্গুণ হইতে সগুণ কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার উপপত্তি দেওয়া আবশ্যক। কারণ সাংখ্যের ন্যায় বেদান্তশাস্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যাহা নাই তা হইতেই পারে না; এবং তাহা হইতে যাহা আছে তাহা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্গুণ অর্থাৎ যাহাতে গুণ নাই সেই ব্রহ্ম হইতে, সগুণ অর্থাৎ যাহাতে গুণ আছে এইরূপ জাগতিক পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। তবে আবার সগুণ আসিল কোথা হইতে? সগুণ যদি নাই বল, তাহা তো চোখের সামনে দেখা যাইতেছে। এবং নির্গুণের ন্যায় সগুণও যদি সত্য বল, তাহা হইলে দেখিতেছি যে, ইন্দ্রিয়ের গোচর শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদি সমস্ত গুণের স্বরূপ আজ এক প্রকার কল্য অন্য প্রকার—অর্থাৎ উহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, অতএব নশ্বর, বিকারী ও অ-শাশ্বত, তখন তো (পরমেশ্বর বিভাজ্য এইরূপ কল্পনা করিয়া) ইহাই বলিতে হয় যে এইরূপ সগুণ পরমেশ্বরও পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর। কিন্তু বিভাজ্য ও নশ্বর হওয়ায় যিনি জাগতিক নিয়মপদ্ধতির মধ্যে নিত্য পরতন্ত্র হইয়া কাজ করেন তাঁকে কেমন করিয়া পরমেশ্বর বলিবে? সারকথা, চাই ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত সগুণ পদার্থ পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার কর, কিংবা সাংখ্যের ন্যায় অথবা আধিভৌতিক দৃষ্টিতে মনে কর যে, সমস্ত পদার্থ একই অব্যক্ত কিন্তু সগুণ মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে;—যে কোন পক্ষই স্বীকার কর না কেন, ইহা নির্বিবাদরূপে সিদ্ধ যে, নশ্বর গুণ যে পর্য্যন্ত এই মূল প্রকৃতি হইতেও বিচ্যুত না হয় সে পর্য্যন্ত পঞ্চ মহাভূতকে বা প্রকৃতিরূপ এই সগুণ মূল পদার্থকে জগতের অবিনাশী, স্বতন্ত্র ও অমৃত তত্ত্ব মানিতে পারা যায় না। তাই যিনি প্রকৃতিবাদ স্বীকার করেন তাঁহার পরমেশ্বরকে নিত্য, স্বতন্ত্র ও অমৃত

বলা ছাড়িয়া দিতে হয়; অথবা পঞ্চ মহাভূতের অথবা সগুণ মূল প্রকৃতিরও অতীত কোন্ তত্ত্ব আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, ইহা ব্যতীত অন্য কোন মার্গ নাই। মৃগতৃষ্ণিকায় তৃষ্ণা নিবারণ কিংবা বালুকা হইতে তৈল বাহির হওয়া যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ প্রত্যক্ষ নশ্বর বস্তু হইতে অমৃতত্ব প্রাপ্তির আশাও এইরূপ ব্যর্থ; এবং এই জন্য, যাজ্ঞবল্ক্য আপনার পত্নী মৈত্রেয়ীকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, যতই কেন সম্পত্তিলাভ হউক না তাহা দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশা নাই—"অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" (বৃ. ২. ৪. ২)। ভাল, এখন যদি অমৃতত্বকে মিথ্যা বল, তবে কোন মানুষের এই স্বাভাবিক ইচ্ছা দেখা যায় যে, সে কোন রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত ইনাম বা পুরস্কার কেবল নিজে নহে বরঞ্চ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অর্থাৎ চিরকাল উপভোগ করিতে চায়; অথবা ইহাও দেখা যায় যে, চিরস্থায়ী বা শাশ্বত কীর্ত্তির অবসর উপস্থিত হইলে আমরা জীবনেরও পরোয়া রাখি না। ঋক্‌বেদের ন্যায় অতি প্রাচীন গ্রন্থেও পূর্ব্বতন ঋষিদের এই প্রার্থনা যে, "হে ইন্দ্র! তুমি 'অক্ষিতশ্রব' অর্থাৎ অক্ষয় কীর্ত্তি বা ধন দাও" (ঋ. ১, ৯. ৭), অথবা "হে সোম! তুমি আমাকে বৈবস্বত (যম) লোকে অমর কর" (ঋ. ৯.১১৩.৮)। পূর্ব্বঋষিদিগের প্রার্থনা ছাড়িয়া দিলেও অর্ব্বাচীনকালে এই দৃষ্টিই স্বীকার করিয়া, স্পেন্সর, কোঁৎ-প্রভৃতি নিছক আধিভৌতিক পণ্ডিতও প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, "কোন ক্ষণিক সুখে না ভুলিয়া বর্ত্তমান ও ভাবী মানবজাতির চিরন্তন সুখের জন্য চেষ্টা করাই এই জগতে মনুষ্যমাত্রের নৈতিক পরম কর্ত্তব্য" আমাদের দৃষ্টিসীমার বাহিরে নিরন্তর কল্যাণের অর্থাৎ অমৃতত্বের এই কল্পনা আসিল কোথা হইতে? যদি বল তাহা স্বভাবসিদ্ধ, তাহা হইলে এই বিনশ্বর দেহের বাহিরে কোন প্রকার অমৃত বস্তু আছে এইরূপ বলিতে হয়। এবং এই প্রকার অমৃত বস্তু কিছু নাই যদি বল, তবে আমাদের যে মনোবৃত্তির সাক্ষাৎ প্রতীতি হয় তাহার অন্য কোন উপপত্তিও দেওয়া যাইতে পারে না। এইরূপ কঠিন সমস্যার স্থলে কোন কোন আধিভৌতিক পণ্ডিত এই উপদেশ করেন যে, এই প্রশ্ন কখনই মীমাংসা হইবার নহে, তাই ইহার বিচার না করিয়া, দৃশ্য জগতের পদার্থসমূহের গুণধর্ম্মের বাহিরে আমাদের মনকে ধাবিত হইতে দিবে না। এই উপদেশ সহজ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু মনুষ্যের মনে তত্ত্বজ্ঞানের যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে তাহা কে আটক করিবে, আর কি করিয়া আটক করিবে? এবং এই দুর্দ্দমনীয় জ্ঞান-স্পৃহাকে একবার নিহত করিলে, পরে জ্ঞানের বৃদ্ধি কোথা হইতে হইবে? যে দিন মনুষ্য এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই দিন অবধি সে ইহার বিচার বরাবর করিয়া আসিয়াছে যে, সমস্ত দৃশ্য ও নশ্বর জগতের মূলীভূত অমৃত তত্ত্ব কি, এবং তাহা আমি কিরূপে প্রাপ্ত হইব। আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই উন্নতি হোক্ না কেন, মনুষ্যের অমৃততত্ত্বের জ্ঞানের দিকে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কখনই হ্রাস হইবার নহে। আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই উন্নতি হোক্ না কেন, সমস্ত আধিভৌতিক জগৎ-বিজ্ঞানকে বগলে রাখিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান তাহার অগ্রেই নিয়ত দৌড়িতে থাকিবে! দুই চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই অবস্থাই ছিল, এবং এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশেও ঐ প্রকার অবস্থাই দৃষ্টিগোচর হয়। অধিক কি, মানব-বুদ্ধির এই আকাঙ্ক্ষা যে দিন চলিয়া যাইবে সেই দিন তাহাকে "স বৈ মুক্তোঽথবা পশুঃ" এইরূপ বলিতে হইবে!

যাক্। দিক্‌কালে অসীম, অমৃত, অনাদি, স্বতন্ত্র, সম, এক, নিরন্তর, সর্ব্বব্যাপী ও নির্গুণ তত্ত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অথবা সেই নির্গুণ তত্ত্ব হইতে সগুণ জগতের উৎপত্তিবিষয়ে আমাদের প্রাচীন উপনিষদে যাহা উপপাদিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক সযুক্তিক উপপাদন অন্য কোন দেশের তত্ত্বজ্ঞানী অদ্যাপি বাহির করেন নাই। অর্ব্বাচীন জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞ ক্যাণ্ট মনুষ্যের বাহ্য-জগতের নানাত্বজ্ঞান একত্বের দ্বারা কেন ও কি প্রকারে হয় তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিয়া এই উপপত্তিই অর্ব্বাচীন-শাস্ত্র-পদ্ধতিতে অধিক স্পষ্ট করিয়াছেন; এবং হেগেল নিজের বিচারে কাণ্ট হইতে কিছু আগাইয়া গেলেও তাঁহারও সিদ্ধান্ত বেদান্তকে আগাইয়া যাইতে পারে নাই। শোপেন্‌হোয়েরকথাও তাই। ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত উপনিষদ তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি একথাও লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, 'জগতের সাহিত্যের এই অত্যুত্তম গ্রন্থ' হইতে কোন কোন বিচার তিনি আপন গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এই গভীর বিচার এবং তাহার সাধকবাধক প্রমাণে কিংবা বেদান্তের সিদ্ধান্ত এবং ক্যাণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞদিগের সিদ্ধান্তে কতটা সাদৃশ্য ও কতটা বৈষম্য; অথবা উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থোক্ত বেদান্ত এবং তদুত্তর-কালীন গ্রন্থোক্ত বেদান্ত—ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদ কি কি আছে, এই সকল বিষয়ের সবিস্তর নিরূপণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভব নহে। তাই, গীতার অধ্যাত্ম সিদ্ধান্তের সত্যতা, উপপত্তি ও মহত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করিয়া, মুখ্যরূপে উপনিষদ, বেদান্ত-সূত্র ও তাহার শাঙ্করভাষ্য—অবলম্বনে, আমি কেবল ঐ সকল বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্যোক্ত এই দ্বৈতের অতীত কি

তাহার নির্ণয় করিবার জন্য জগৎদ্রষ্টা ও দৃশ্যজগৎ এই দ্বৈতী ভেদের উপরেই দাঁড়াইয়া না থাকিয়া জগৎদ্রষ্টা পুরুষের বাহ্য-জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহার স্বরূপ কি, তাহা কি করিয়া ও কাহার হয়, এই বিষয়েরও সূক্ষ্ম বিচার করা আবশ্যক। বাহ্য জগতের পদার্থ মনুষ্যের চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হয়, পশুদের নিকটেও সেইরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের ইহাই বিশেষত্ব যে, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে উহার মনের উপর সংঘটিত সংস্কারসমূহের একীকরণ করিবার শক্তি উহাতে বিশেষরূপে থাকা প্রযুক্ত, বাহ্যজগতের পদার্থমাত্রের জ্ঞান উহার হইয়া থাকে। এই বিশেষ শক্তি যে একীকরণের ফল, সেই শক্তি মন ও বুদ্ধিরও অতীত, অর্থাৎ উহা আত্মার শক্তি,—ইহা পূর্ব্বে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারে বলিয়াছি। কেবল একটীমাত্র পদার্থের নহে, প্রত্যুত জগতের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের কার্য্যকারণভাবাদি যে অনেক সম্বন্ধ—যাহাকে জাগতিক নিয়ম বলে—তাহারও জ্ঞান এই প্রকারেই হইয়া থাকে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইলেও, তাহাদের কার্য্য-কারণাদি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষগোচর হয় না; কিন্তু দ্রষ্টা স্বীয় মানসিক ব্যাপারের দ্বারা তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। উদাহরণ যথা—কোন এক পদার্থ আমাদের চোখের সমুখ দিয়া চলিয়া গেলে তাহার রূপ ও গতি দেখিয়া আমরা স্থির করি যে, তাহা একজন যুদ্ধের সেপাই এবং সেই সংস্কার মনে স্থায়ী রহিয়া যায়। ইহার পরেই আর কোন পদার্থ ঐ প্রকার রূপ ও গতি লইয়া চোখের সমুখে আসিলে আবার সেই মানসিক ক্রিয়া সুরু হয় এবং উহাও আর এক সিপাই এইরূপ আমাদের বুদ্ধি নিশ্চিত ধারণা করে। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে একের পর এক করিয়া যে অনেক সংস্কার আমাদের মনের উপর সংঘটিত হয় আমাদের স্মরণশক্তি দ্বারা সেগুলি স্মরণ করিয়া একত্র করি; এবং যখন ঐ পদার্থসমূহ আমাদের সমুখে আসে, তখন ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের জ্ঞান একতা প্রাপ্ত হয়, আর আমরা বলি যে আমাদের সমুখ দিয়া 'সৈন্য' চলিতেছে। এই সৈন্যের পশ্চাতে আগত পদার্থের রূপ দেখিয়া তাহাকে 'রাজা' বলিয়া নির্দ্ধারিত করি। এবং সৈন্য-সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব সংস্কার ও 'রাজা' সম্বন্ধীয় এই নূতন সংস্কার—এই দুই সংস্কারকে একত্র করিয়া আমরা বলিয়া থাকি যে, 'রাজার সোয়ারী' চলিয়াছে এই জন্য বলিতে হয় যে, জগৎ-জ্ঞান কেবল ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত জড় পদার্থের জ্ঞান নহে; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের উপর সংঘটিত অনেক সংস্কারের বা পরিণামের যে একীকরণ 'দ্রষ্টা' আত্মা করে, তাহারই ফল এই জ্ঞান। এইজন্য ভগবদ্গীতাতেও জ্ঞানের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে যে, "অবিভক্তং বিভক্তেষু" অর্থাৎ যাহা বিভক্ত বা ভিন্ন ভিন্ন, তাহার মধ্যে অবিভক্ততা বা একত্ব যাহা দ্বারা বুঝা যায় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান * (গী. ১৮. ২০)। কিন্তু ইন্দ্রিয়-যোগে মনের উপর যে সংস্কার প্রথমে সংঘটিত হয়, তাহা কিরূপ, এই বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার করিলে আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, চোখ, কাণ, নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা পদার্থমাত্রের রূপ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি গুণ জানিতে পারিলেও এই বাহ্য গুণ যে দ্রব্যের মধ্যে আছে সেই দ্রব্যের অন্তরঙ্গ স্বরূপসম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদিগকে কিছুই বলিতে পারে না। ভিজা মাটির ঘট হইল ইহা আমরা দেখি সত্য, কিন্তু যাহাকে আমরা 'ভিজা মাটি' বলি সেই পদার্থের মূল তাত্ত্বিক স্বরূপ কি তাহা আমরা জানিতে পারি না। চিকনাই, আর্দ্রতা, ময়লা রং বা গোলার ন্যায় আকার (রূপ), ইত্যাদি গুণ, ইন্দ্রিয়যোগে মন পৃথক পৃথকরূপে অবগত হইলে পর, সেই সমস্ত সংস্কারের একীকরণ করিয়া 'দ্রষ্টা' আত্মা, বলিয়া থাকে যে ইহা 'ভিজা মাটি'; এবং পরে এই দ্রব্যের (কারণ, দ্রব্যের তাত্ত্বিক স্বরূপ বদলিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই) ভিতরফাঁপা, গোলাকার, ধনুধ্বনে আওয়াজ ও শুষ্কতা ইত্যাদি গুণ মন অবগত হইলে পর, তাহাদের একীকরণ করিয়া 'দ্রষ্টা' আত্মা তাহাকে 'ঘট' বলিয়া থাকে। সারকথা, সমস্ত পরিবর্ত্তন বা ভেদ, 'রূপ বা আকারেই' হইতে থাকে এবং যথা, মনের উপর উক্ত গুণসমূহের যে সংস্কার সংঘটিত হয়, 'দ্রষ্টা' সেই সকল সংস্কারের একীকরণ করিবার পর, একই তাত্ত্বিক পদার্থ অনেক নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উদাহরণ—সমুদ্র ও তরঙ্গ, কিংবা সুবর্ণ ও অলঙ্কার। কারণ, এই দুই উদাহরণে রং, ঘনত্ব, তরলতা, ওজন প্রভৃতি গুণ একই থাকে, কেবল রূপ (আকার) ও নাম এই দুই গুণ বদল হয়। সেই জন্যই বেদান্তে এই সহজ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। সোনা একই, কিন্তু তাহার আকারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, ইন্দ্রিয়যোগে গৃহীত তাহারই সংস্কার-সকল মনের দ্বারা একত্র করিয়া 'দ্রষ্টা', তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একই মূল পদার্থের একবার 'ঠুসী', একবার 'পোঁচী' একবার 'সল্লে', একবার 'তন্মণি' এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া থাকে। আমরা সময়ে সময়ে পদার্থসমূহের এই প্রকার যে নাম দিয়া থাকি, এবং যে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির

---

* Cf. "Knowledge is first produced by the synthesis of what is manifold" Kant's *Critique of pure Reason*, P. 64. Max Muller's translation 2nd Ed.

দরুণ উক্ত নাম বদলাইতে থাকে সেই আকৃতিসমূহকেই উপনিষদে 'নামরূপ' (নাম ও রূপ) বলা হয়; অন্য সমস্ত গুণেরও উহারই মধ্যে সমাবেশ করা যাইতে পারে (ছাং· ৩ ৩ ৪; বৃ. ১. ৪. ৭)। কারণ, যে কোন গুণ ধর না কেন, তাহার কোন না কোন নাম বা রূপ থাকিবেই। কিন্তু এই নামরূপ ক্ষণে ক্ষণে বদল হইলেও, তাহাদের মূলে এই নামরূপ হইতে ভিন্ন ও অপরিবর্ত্তনীয় এবং আধারভূত কোন দ্রব্য আছে বলিতে হয়। জলের উপর যেমন কোন প্রকার ফেণপুঞ্জ (বা তরঙ্গ) থাকে, সেইরূপ একই মূল দ্রব্যের উপর অনেক নামরূপের আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে—ইহা বলিতেই হইবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ, নামরূপ ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না সত্য; তাই এই নামরূপের আধারভূত অথচ নামরূপ হইতে ভিন্ন ঐ যে মূল দ্রব্য, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। এ কথা সত্য। কিন্তু সমস্ত জগতের আধারভূত এই তত্ত্ব অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয় হইলেও তাহা সৎ, অর্থাৎ সত্য সত্যই সর্ব্বকালে সকল নামরূপের মূলে নামরূপের মধ্যেও বাস করিতেছে, কখনই লোপ পায় না, আমাদের বুদ্ধির দ্বারা এই নিশ্চিত অনুমান করিতে হয়। কারণ, ইন্দ্রিয়গোচর নামরূপ ব্যতীত মূলে কিছুই নাই, এইরূপ মানিলে 'হার' ও 'বলয়' প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ একই পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াছে, আমাদের এই যে জ্ঞান এক্ষণে হয় তাহার কোনই ভিত্তি থাকিবে না। এই অবস্থাতে 'হার' আছে, 'বলয়' আছে, ইহাই বলা যাইতে পারিবে; কিন্তু 'হার সোনার', এবং 'বলয় সোনার' ইহা কখনও বলা যাইতে পারিবে না। তাই ন্যায়ত ইহা সিদ্ধ হয় যে, 'সোনার হার', 'সোনার বালা' ইত্যাদি বাক্যে 'সোনার' এই শব্দের দ্বারা যে সোনার সঙ্গে নামরূপাত্মক হার ও বালার সম্বন্ধ যোজিত হইয়াছে, সেই সোনা কেবল শশশৃঙ্গবৎ অভাবরূপী নহে, উহা সমস্ত অলঙ্কারের আধারভূত দ্রব্যাংশেরই বোধক। এই ন্যায়টি জাগতিক সমস্ত পদার্থে প্রয়োগ করিলে, এই সিদ্ধান্ত বাহির হয় যে, পাথর, মুক্তা, রূপা, লোহা, কাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপাত্মক যে সকল পদার্থ আমাদের নজরে আসে সে সমস্ত একই কোন নিত্য দ্রব্যের উপর বিভিন্ন নামরূপের গিল্টি চড়াইয়া উৎপন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ সমস্ত ভেদ কেবল নামরূপেরই, মূল দ্রব্যের নহে, নানাপ্রকার নামরূপের নীচে মূলে একই পদার্থ নিত্য বাস করিতেছে। 'সমস্ত পদার্থে এইরূপ নিত্যরূপে সর্ব্বদাই থাকা'—ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় 'সত্তাসামান্যত্ব' বলে। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের পত্র।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় লাটকে ইংরেজীতে যে পত্র লিখিয়া নাইট্ উপাধি বর্জ্জন করিয়াছেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

পঞ্জাবের কয়েকটী স্থানীয় দাঙ্গা নিবারণ করিতে গিয়া পঞ্জাব সরকার যে বিরাট প্রতিকার-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে এবং আমাদের মনে হইতেছে যে, ভারতবাসী প্রজাকুল আমরা নিতান্তই অনাথ। হতভাগ্য অপরাধিগণের অপরাধগুলি যেরূপ, শাস্তি তাহার গুরুত্বের অনুপাতে অত্যন্ত কঠোর হইয়াছে। সেই কঠোর শাস্তি এবং ঐ শাস্তি যেরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি, অধুনা এবং দূরভূতকালে সংঘটিত কয়েকটী জলন্ত দৃষ্টান্ত বাদ দিলে, ঐরূপ শাস্তি পৃথিবীর সভ্যজাতির ইতিহাসে একেবারে তুলনাবিহীন। যে সকল লোকের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহারা নিরস্ত্র এবং নিরুপায়। যে সরকার তাহাদের প্রতি এই ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার হাতে মানুষমারার ভয়ানক সুবিধাজনক কল্-কব্জা প্রস্তুত আছে। সুতরাং উভয় পক্ষের অবস্থার তুলনা করিলে আমাদের দৃঢ় ধারণা হয় যে, ঐরূপ ব্যবহারে রাজনীতিক সুবিধাতো নাই-ই, নীতির হিসাবেও উহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। পাঞ্জাববাসী আমাদিগের ভ্রাতারা যেরূপ অপমান ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাহার সংবাদ ভারতের সর্ব্বত্র ছাইয়া পড়িয়াছে। লোকের মুখ জোর করিয়া বন্ধ করা, তাহা সকলে নীরবে শুনিয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্বহৃদয়ে রাগ ও কষ্টের উদয় হইয়াছে, তাহা যেন গবর্ণমেন্ট বুঝিয়াও বুঝেন নাই। সরকারের সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, ঐরূপ ব্যবহারের ফলে লোকে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছে। এই বিশ্বাসে সরকারের মনে সম্ভবতঃ আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হইয়াছে। অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ-চালিত সংবাদপত্র এই কঠোরতার প্রশংসা করিয়াছে। কোনও কোনও কাগজ আমাদের কষ্ট দেখিয়া পাশবোচিত হৃদয়হীনতার সহিত পরিহাস করিয়াছে। অথচ কর্ত্তৃপক্ষ সেই সকল সংবাদপত্রের ঐরূপ কার্য্য নিবারণ করিতেও কোনও প্রকার প্রয়াস পান নাই। যে সকল সংবাদপত্র নির্জ্জিত জনসাধারণের পক্ষ হইয়া তাহাদের যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে ও ন্যায়ের কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছে, সরকার নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগের আর্ত্তনাদ ও কথা বলা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি, আমাদের আবেদন বৃথা হইয়াছে, আমাদের গবর্ণমেন্ট প্রতিহিংসায় অন্ধ হইয়াছেন। উদার রাজনীতিদের যেরূপ

তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকা উচিত, তাঁহাদের তাহা লোপ পাইয়াছে। সরকারের যেরূপ শক্তি, যেরূপ নৈতিক খ্যাতি, তাহার হিসাবে ইচ্ছা করিলে সহজেই গবর্ণমেণ্ট উদারতা প্রকাশ করিতে পারিতেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া, আমার দেশের সেবায় এই সামান্য কাজটুকু করিতে ইচ্ছা করি। আমার স্বদেশীয়গণ বিস্ময় ও ভয়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিয়াছেন, আমি ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, দেশের কোটী কোটী লোকের নির্ব্বাক্ প্রতিবাদ বাক্যে প্রকাশ করিতে চাই। এ হেন অপমান যাহাদের ভাগ্যে ঘটিল, তাহাদের পক্ষে এখন এ সব বিসদৃশ সম্মান-চিহ্ন যেন লজ্জা আরও বৃদ্ধি করে। আমার স্বজাতীয়গণ নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইতেছে, এবং অমানুষিক অপমানে অপমানিত হইতেছে। সুতরাং আমি সমস্ত বিশেষ সম্মানচিহ্ন খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। এই সকল কারণে বাধ্য হইয়া, সদুঃখে ও সসম্মানে আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি আমাকে নাইট্ উপাধি হইতে অব্যাহতি দান করুন। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী লাটের হস্তে আমি ঐ সম্মান-সূচক উপাধি রাজপ্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী লাটের সহৃদয়তা এখনও বিশেষ প্রশংসার সহিত স্মরণ করিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথ ত এইরূপে তাঁহার নাইট্ উপাধি পরিত্যাগ করিলেন; এদিকে সার শঙ্কর নায়ারও বড় লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিলেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাইট্ উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাই নাকি সার শঙ্কর নায়ারেরও সদস্যপদ পরিত্যাগ করিবার অন্যতর কারণ। এই সকল ঘটনা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, পঞ্জাবের কঠোর শাসননীতির কারণে দেশবাসীর অন্তঃকরণে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে। প্রজাগণের প্রাণে এত বড় আঘাত করা কোন দিক দিয়াই সমর্থন করা যায় কিনা সন্দেহ। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে, সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অক্ষম ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করাই পরম ধর্ম্ম।

উন্নতি প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালির মহাপ্রাণতা। মাদ্রজের অন্তর্গত দক্ষিণ আর্কটে কুষ্ঠরোগীদিগের একটী হাঁসপাতাল আছে। কলিকাতানিবাসী মহাপ্রাণ দানবীর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় উহার উন্নতিকল্পে এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও বাড়ী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ছয় হাজার টাকা পৃথক্ ভাবে দান করিয়াছেন। মাননীয় সার আব্দুর রহিম এবং মাননীয় সার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জিও ইহার উন্নতির জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বাঙ্গালীর এই মহাপ্রাণতার সংবাদে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত ও আশান্বিত হইয়াছি। বাঙ্গালীর সহানুভূতি প্রকাশ কেবল তাহার বঙ্গদেশীয়গণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেছে না, ইহা খুবই আশার কথা।

৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, স্বর্গীয় দেশপূজ্য পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত সেরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত গোপাল লাল চৌধুরী মহাশয় ময়মনসিংহের হাসপাতালে ১২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ অর্থের দ্বারা সেখানে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নামানুসারে একটী চিকিৎসাবিভাগ খোলা হইবে। জমিদার মহাশয়ের এই সদনুষ্ঠানটীর দ্বারা যুগপৎ পূজ্যের প্রতি সম্মান ও দীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে।

শোক সংবাদ।

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরলোকগমনে আদিব্রাহ্মসমাজ একটী আন্তরিক বন্ধু হারাইয়াছেন। তিনি উদার সম্প্রদায়ের হিন্দু ছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহাকে আদিসমাজের প্রকৃত বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু কখনও আপনাকে কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে স্বীকার করেন নাই। এই তো সেদিন তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্রোন্মোচন উপলক্ষে রামমোহন লাইব্রেরীতে কি উদারভাবের কথা বলিয়া স্বীয় উদার হৃদয়ের কেমন সুন্দর পরিচয় দিয়াছিলেন। এমন বন্ধুকে যে আমরা এত শীঘ্র হারাইব, তাহা আমাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। তাঁহার পরলোক গমনের সংবাদে আমরা বজ্রাহত হইয়াছিলাম—অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া আজ তিনি বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের হৃদয় অধিকার করেন নাই। তাঁহার মনুষ্যত্ব, তাঁহার প্রাণ আমাদের সকলকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার প্রাণের ভিতর মনুষ্যত্বের একটা গভীর স্তর ছিল বলিয়াই তিনি নিজের রসধারার উৎস খুলিয়া দিয়া বালকবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে সকলকেই সেই রসের স্রোতে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। এই মনুষ্যত্বই তাঁহাকে ধনমানের প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই

মনুষ্যত্বই তাঁহাকে তাঁহার সুনির্ব্বাচিত বঙ্গসাহিত্যের সেবার পথ হইতে তিলমাত্র বিচলিত হইতে দেয় নাই।

তিনি সর্ব্বদা প্রকাশ করিতে না চাহিলেও আমরা দেখিয়াছি যে তাঁহার হৃদয় স্বাধীনভাবে পূর্ণ ছিল। সেই কারণেই স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অবস্থানকালে তাহার স্বাধীনতায় এতটুকু আঘাতের আশঙ্কা যেই উঠিল, অমনি রামেন্দ্রসুন্দর কয়েকজন বন্ধুর সহিত সাহিত্যপরিষদের স্থানান্তরিতকরণে অগ্রণী হইলেন। এই সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার প্রাণের জিনিস ছিল। তিনি ইহাকে সাহিত্যিকদিগের কেন্দ্ররূপে দাঁড় করাইয়া সাহিত্যবিষয়ে অনন্যসাধারণ শক্তিশালী করিবার চেষ্টায় ছিলেন। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ কোন কোন পরিষৎসভ্য তাঁহার ইচ্ছা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার প্রতি নানাবিধ অসঙ্গত ইচ্ছার আরোপ করাতে তিনি অত্যন্ত মানসিক কষ্ট পাইয়াছিলেন। গত ১লা জুন তাঁহাকে পরিষদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত করাতে হয়তো সে কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দরের পরিবার এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈবাহিক আদানপ্রদানে আবদ্ধ না হইলেও এই পরিবারকে আমরা বাঙ্গালী পরিবার এবং রামেন্দ্রসুন্দরকে আমরা বঙ্গ-সাহিত্যিকদিগের মুকুটমণি বলিয়া গৌরব করিতে পারি নিঃসন্দেহ। এই একটী লোক বঙ্গসাহিত্যে ছিলেন যিনি সাহিত্যের দর্শন ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি উভয় বিভাগেই নিজেকে up-to-date করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধাদি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, তিনি কোন বিভাগেই পল্লবগ্রাহী হইয়া আত্মপ্রতারণা করেন নাই এবং যাহা একেবারে ঠিক না জানিতেন, সে বিষয়ে কখনও সাধারণকে ভুল বুঝাইতে যাইতেন না।

দর্শনে ও বিজ্ঞানে তিনি সুপণ্ডিত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে সে পাণ্ডিত্য কখনও প্রকাশ পাইত না—বন্ধুগণের সহিত আলাপে তিনি নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কখনও তর্কবিতর্কের ছলে পাণ্ডিত্যের অভিমান প্রকাশ করিতেন না। তিনি যেমন পণ্ডিত লোক ছিলেন, তেমনি সুসামাজিক ছিলেন। বর্ত্তমান কালে প্রকৃত সুসামাজিক ব্যক্তি বড়ই বিরল।

তিনি একজন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী এবং নীরব স্বদেশসেবক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ছেলেরাই দেশের আশাভরসা এবং বিজ্ঞানই বর্ত্তমান যুগে দেশকে উন্নতির মুখে পরিচালিত করিতে পারে। সেই কারণে তিনি সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিলেন। দেশীয় নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পরিশেষে তাহার অধ্যক্ষ হইয়া নিজের ব্রতগ্রহণের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে প্রেসিডেন্সি কলেজের পরেই রিপণ কলেজের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশালা সুনিপুণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ জন্য কেবল রিপণ কলেজ কেন, বঙ্গবাসীমাত্রই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি রিপণ কলেজে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, ইহাতেই তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানে তাঁহার এতদূর অনুরাগ ছিল যে, তিনি প্লেগের টীকা লইবার ফল পরীক্ষা করিবার জন্য অম্লানবদনে প্লেগের টীকা লইয়াছিলেন। কে জানে যে, সেই টীকা তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের সূত্রপাত করিয়া দেয় নাই?

বৈদিক সাহিত্যেও তাঁহার পাণ্ডিত্য বড় অল্প ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যে অনুবাদ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে একক। ইংরাজীতে Martin Haug ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অনেকস্থলে বৈদিক প্রাণ ধরিতে না পারিয়া ভ্রান্ত অনুবাদ চালাইয়া গিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের অনুবাদ সম্ভবমত নির্ভুল হইয়াছে বলিতে পারি। তিনিই বোধহয় সর্ব্বপ্রথম বৈদিক বিষয়ের উপর বঙ্গভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন।

তাঁহার পরলোকগমনে দেশের প্রাণে যে আঘাত পড়িল, তাহার যন্ত্রণা শীঘ্র নির্ব্বাণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার এক কন্যা সান্নিপাতিক জ্বরে পরলোক গমন করাতেই তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। আজ তাঁহার বিরহে আমরাও ভাঙ্গিয়া পড়িলাম।

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠের দৈনিক বসুমতীতে তাঁহার যে জীবন-কথা বাহির হইয়াছে তাহাকে স্থায়িত্ব দিবার মানসে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা করি, তাঁহার কোন শোকসন্তপ্ত বন্ধু তদবলম্বনে তাঁহার এক জীবনী প্রকাশ করিয়া বন্ধুজনোচিত কার্য্য করিবেন।

"প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বাৎস্যগোত্রীয় জিজ্যোতীয়া ব্রাহ্মণ * * মুর্শিদাবাদ জিলার টেঁয়াগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র বলভদ্র জেমোর রাজবাটীতে বিবাহ করিয়া জেমোয় বাস করিতে থাকেন। বলভদ্রের দুই পুত্র—কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর। ব্রজসুন্দর পৌরাণিক শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বাঙ্গালায় মাধব-সুলোচনা নাটক ও স্বর্ণসিন্দূর-সিংহ প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসুন্দরের পুত্র গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর প্রতিভায়, তেজস্বিতায় ও চরিত্রগুণে সমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। উপেন্দ্রসুন্দর সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং সেক্সপীয়রের

একখানি নাটক সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। গোবিন্দসুন্দরের পুত্র রামেন্দ্রসুন্দর ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র জন্ম গ্রহণ করেন।

"'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য রামেন্দ্র বাবু স্বীয় জীবনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। পিতৃদেব পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেন,—ক্লাসের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই; কিন্তু ফাঁকি দিয়া উচ্চে উঠিবার চেষ্টা লজ্জাকর। সেই সঙ্গে স্বধর্ম্মের প্রতি—স্বদেশের প্রতি ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলাম। বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগও সেই বয়সে পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল। পিতৃদেবের জ্যোতিষশাস্ত্রে ও গণিতে অসামান্য অধিকার ছিল। বাল্যকালেই তাহার ফলভাগী হইয়াছিলাম।

"পাঠশালার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বৎসর প্রথম পুরস্কার পাইতাম; ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান ও বৃত্তি লাভ করি। ইতিমধ্যে বাঙ্গলা বহি পড়ায় নেশা জন্মিয়াছিল।

"পরে কান্দি ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হই। প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়ায় পিতৃদেবের দুঃখ হইয়াছিল। পরে আর এরূপ ঘটনা হয় নাই। ইংরেজি স্কুলে পড়িবার সময় বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। এন্ট্রেন্স পরীক্ষার বৎসরে পিতৃদেবের মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনায় অবশ হইয়া পড়ি ও পরীক্ষার ফলে হতাশ হই। ১৮৮১ অব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান পাইয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি।

"পিতৃব্যদেবের সহিত কলিকাতা আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হই। এই সময়টা পড়াশুনায় বড় অমনোযোগ ঘটে। পাঠ্য পুস্তক না পড়িয়া বাহিরের বহি (ইংরেজি-সাহিত্য ও ইতিহাস-পুস্তক) অধিক পড়িতাম। ফলে ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানে নামিতে হয়। ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও আনুষঙ্গিক স্বর্ণপদক লাভ করি।

"১৮৮৪ সালে পিতৃব্যের মৃত্যু পুনরায় অবসন্ন করিয়াছিল। বি. এ পরীক্ষাতেও তেমন যত্নপূর্ব্বক পড়িতে পারি নাই। এই সময়ে বিজ্ঞান গ্রন্থের অধ্যয়নে নেশা জন্মে। ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া একরূপ বন্ধ করি। ১৮৮৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনার্সে প্রথম স্থান ও ৪০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি। এই সময়ে নবজীবনে আমার প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুই একটা প্রবন্ধ বেনামিতে লিখিয়াছিলাম।

"পর বৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে এম, এ দিবার জন্য প্রস্তুত হই। রসায়নের অধ্যাপক পেড্‌লার সাহেব একটা 'ক্লাস এক্সারসাইজ' দেখিয়া সন্তুষ্ট হন ও তখনহইতেই প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতে উৎসাহিত করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন; ঐ পরীক্ষায় আমার কাগজ সম্বন্ধে তিনি সেই দিন আপনার অভিপ্রায় ক্লাসের সম্মুখে ব্যক্ত করেন;—আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি তন্মধ্যে ঐ 'out of the way the best'—কিছু থামিয়া পুনর্ব্বার—"out of the way the bes"। তাঁহার, ঐ বাক্যে উৎসাহের সহিত প্রেমচাঁদের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এম এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রথম স্থান, আনুষঙ্গিক স্বর্ণপদক ও ১০০৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার লাভ করি।

"পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পর বৎসর প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলাম (১৮৮৮), পরীক্ষকগণের এইরূপ মন্তব্য—'The candidate who took up physics and chemistry is perhaps the best student that has as yet taken up these subjects at this examination,' অর্থাৎ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্র ফিজিক্স এবং কেমিষ্ট্রী লইয়াছেন, এই ছাত্রই তাহাদের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"পরে দুই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবোরেটরিতে বিনা বেতনে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে পেডলার সাহেবের অনুমতি লইয়াছিলাম। ১৮৯০ সালে এনট্রান্সে পরীক্ষক নিযুক্ত হই। চারি বৎসর পরে ফার্ষ্ট আর্টসে পরীক্ষক হই। আর পাঁচ বৎসর পর হইতে এন্ট্রান্সে অন্যতম হেড্ একজামিনার বা প্রথম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছি।

"১৮৯২ সালে রিপণ কলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া থাকি। * * * কৃষ্ণকমল বাবুর পদত্যাগের পর ঐ কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়াছি।

"কলেজ হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে প্রধানতঃ বিজ্ঞানশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকি। 'সাধনা' পত্রিকা বাহির হইলে মাসিক পত্রিকায় বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

"১৩০৩ সালে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া 'প্রকৃতি' প্রকাশ করিয়াছি।

"১৩১০ সালে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশ করিয়াছি। সামাজিক প্রবন্ধগুলি এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই।

"১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্থাপন অবধি

উহার সহিত সংস্পৃষ্ট আছি। ১৩০৫ হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত পরিষৎপত্রিকা পরিচালনা করিয়াছি।"

শেষে রামেন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন—

"বাঙ্গালা সাহিত্যের ও তদ্দ্বারা স্বজাতির যথাধ্য সেবা করিয়া জীবন শেষ করি, এই প্রার্থনা।"

৺ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।—বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রি ১৷৷০ দেড়টার সময় সর্ব্ববিত শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় তাঁহার গিরিডির বাসভবনে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বহদিন ধরিয়া বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন; শেষে ঐ রোগেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। মনোরঞ্জন ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের একজন প্রধান ভক্ত শিষ্য ছিলেন, এবং পূর্ব্ববঙ্গে বহুদিন ধরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া ছিলেন। অবশেষে "স্বদেশী আন্দোলনের যুগে" তিনি স্বদেশী প্রচার ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভগবান তাঁহার পরিজনদিগের হৃদয়ে শান্তিবিধান করুন।

৺ রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর।—বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ প্রায় ৬ ঘটিকার সময় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর মহাশয় তাঁহার কলিকাতার মাণিকতলার বাসভবনে ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে একটি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। বহুদিন যাবৎ যোগ্যতার সঙ্গে এই কার্য্য করায় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্রের সকল বিভাগে ইহাঁর অভিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল। যেমন সঙ্গীতের তেমনি সাহিত্যেরও তিনি একজন ভক্ত সেবক ছিলেন। তিনি নানাবিধ নাটক ও সঙ্গীত রচনা করিয়া আজীবন বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন; উচ্চ ধরণের সাহিত্য-সমালোচনায়ও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। সাধারণের নানাবিধ কার্য্যে তিনি আনন্দের সহিত যোগদান করিতেন। এরূপ সঙ্গীতজ্ঞ সামাজিক লোক বঙ্গদেশে বিরল। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

৺ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিগত ৮ই ফাল্গুন ভবানীপুরের শ্রদ্ধেয় শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দ ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহাকে শতায়ু বলিলেই হয়—৯৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। হুগলি জেলার অন্তর্গত জাঁই-পাড়া কৃষ্ণনগরে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বংশে তাঁহার জন্ম। এগার কি বার বৎসর বয়সে বিদ্যা শিক্ষা উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসেন। সেই সময় রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। অনেকের সঙ্গে শ্রীনাথ বাবুও রাজাকে দেখিতে যান। তার পর রাজার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেই কারণে বার্ষিক স্মৃতি সভায় তাঁহার মুখে রাজার কথা শুনিবার জন্য তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করা হইত। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তদ্ভিন্ন ঐ সমাজের উপাচার্য্য ও সম্পাদকের কার্য্যে বহু বৎসর বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। ভবানীপুরের যাবৎ সৎকার্য্যে তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। আদিব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী সভার, খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক মার্সম্যান, কেরি ও ডফ্ প্রভৃতি সাহেবদিগের কার্য্যকলাপ ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ডি, রোজারিওর পুস্তকালয়ে ইনি অনেক কাল লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। সুতরাং নুতন নূতন পুস্তক সকল পাঠ করিবার তাঁহার বিশেষ সুযোগ ছিল। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ থাকায়, যাহা একবার পড়িতেন কি শুনিতেন, তাঁহার মনে মুদ্রিত হইয়া যাইত। বঙ্গের পুরাতন বড় বড় বংশের বিবরণ হইতে, উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে ছিল। লোকে তাঁহাকে walking encyclopedia বলিত। জাল প্রতাপচন্দ্রের ও ওহাবি আমীর খাঁর বিচার, দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী, প্রিভিকাউন্সিল রিপোর্ট ও ক্রণলজিক্যাল টেবেল ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদ পত্রে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লিখিত প্রবন্ধ বৃদ্ধ বয়সেও অনর্গল আবৃত্তি করিতেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত কোন দিন চসমার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ভাল রূপ বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পাইলে ইনি নিশ্চয়ই এক জন বড়লোক মধ্যে গন্য হইতে পারিতেন। শেষ বয়সে অর্থকষ্টজনিত অনেক প্রকার অশান্তিভোগ করিয়াছেন। স্নেহময়ী জগজ্জনীর শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুন।*

---

* নানা গোলমালে এই শোকসংবাদটী প্রকাশ করিতে অযথা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

তং, বোং, সং।

বিংশ কল্প
প্রথম ভাগ
শ্রাবণ ব্রাহ্মসমাজ ৯০।
৯১২ সংখ্যা ১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

উদ্বোধন।

পবিত্র বুধবারের পবিত্র সন্ধ্যাকালে যখন আমি উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করতে থাকি, তখন মনে হয় বিশ্বপতির সৃষ্ট ঐ আকাশের সমস্ত ভারটা যেন আমার মাথার উপর নেমে পড়েছে। সে ভার সহ্য করা কি আমার সাধ্য? যাঁহার আকাশ, আর যিনি আমাকে এ কার্য্যে পাঠিয়েছেন তিনিই সেই ভার সহ্য করবার ক্ষমতাও আমাকে দিচ্ছেন।

এই উপাসনাতে প্রাণের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য অল্প লোককেই অগ্রসর দেখি। কিন্তু তাতে নিরাশ হবার কোনই কথা নেই। আমরাও যেমন আজ অল্প লোককে এবিষয়ে অগ্রসর দেখছি, পুরাকালে ঋষিরাও তা দেখেছিলেন। তাই না ভগবদ্গীতাতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে হাজারের মধ্যে একজন ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেন, আর সেই রকম চেষ্টাশীল দশহাজারের ভিতর একজন যদি সিদ্ধি পান তো যথেষ্ট। কিন্তু এই মনে করে আমাদের বসে থাকলে চলবে না। ঈশ্বরের উপাসনা আমাদের নিজেদের জীবনে একেবারে মিশিয়ে নিতে হবে, আর তার পর সেটা পরিবারে, সমাজে, দেশে প্রচার করতে হবে—ছড়িয়ে দিতে হবে। ভগবানের কাজে নির্ভয় হয়ে লাগতে হবে। এই সময় এসেছে, যখন সমস্ত দেশের হৃদয় ঈশ্বরের পথে দাঁড়াবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। বন্ধুগণ, এই সুসময় অবহেলায় নষ্ট হতে দিও না—ঈশ্বরের উপাসনার আগুন জ্বালাবার এমন সময় পাবে কি না সন্দেহ। ঐ যে একটা কথা আছে অধিকারীভেদ চাই—ছেড়ে দাও সে কথা। আমাদের দেশের যে রকম অবস্থা হয়েছে, তাতে কে অধিকারী, আর কে অনধিকারী, সে বিচার করবার সময় নেই। ভগবানের উপাসনার বীজ চারদিকে দুচোখো ছড়িয়ে যাও—যার ধরবার সময় এসেছে সে ধরে নিক, যার ধরবার সময় আসেনি সে দুদিন পরে ধরে নেবে। তাতে ক্ষতি তো হবে না। ভগবানের নাম প্রচারে ক্ষতি হবে, এ কথা শুনতেই চাই নে—শুনলেও পাপ স্পর্শ করবে বলে মনে হয়।

আমরা যে কয়জন প্রাণের সঙ্গে ভগবানের উপাসনায় যোগ দিয়েছি—এসো দিকিন, একবার জোর করে বলি যে, ভগবান ছাড়া আর কাহাকেও হৃদয়ের পূজা দেব না—সত্যি সত্যি একথা জোর করে বলতে পারলে তো আমরা আগুন লাগাতে পারব। যিশু খৃষ্টের বারোজন শিষ্য কি রকম আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে কথা কি আমরা ভুলে যাব? মহম্মদও তো মুষ্টিমেয় সঙ্গীদের নিয়ে কি রকম আগুনের বীজ ছড়িয়েছিলেন, সেটা কি ভোলবার কথা? প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজেরই প্রতিষ্ঠাতা গোড়ায় খুবই অল্প লোক নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা

রামমোহন রায়ই বল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই বল, কয়জন সঙ্গী নিয়ে এ কার্য্যে নেমেছিলেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তো মাত্র ২১ জন সঙ্গী পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সেই ২১ জনেরই প্রাণের ভিতর আগুন জ্বালাতে পেরেছিলেন। আমাদেরও সেই রকম নিজেদের প্রাণের ভিতর আগুন জ্বালাতে হবে, তবে চারদিকে সেই আগুন ছড়াতে পারব। এসো সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে হৃদয়ে ধরে, তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর নামের আগুনে আপনাকে বলি দিই।

নাস্তিকমতের প্রমাণ চাই।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, আস্তিক মত ধরিয়া চলিলে সকল দিকে ভালই হয়; আর নাস্তিক মত ধরিয়া চলিলে মন্দ ফল হইবার সম্ভাবনা বেশী। ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি যে, পৃথিবীর বেশী লোকেই আস্তিক অর্থাৎ কোন-না-কোন একভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আত্মায় বিশ্বাস করে আর পরলোকে বিশ্বাস করে। তাহা হইলেও আমাদিগের দেখিতে হইবে যে, যে ঈশ্বরের উপর আমরা নির্ভর করিতে চাহিতেছি, তিনি একটা কাল্পনিক বস্তু কিম্বা তিনি সত্য সত্যই আছেন; অন্ধভক্তিতে ঈশ্বর আছেন বলিয়া কল্পনা করিয়া লই, অথবা জ্ঞানের আলোচনার ফলে তিনি আছেন বলিয়া সত্যসত্যই প্রাণের ভিতর জানিতে পারি বুঝিতে পারি। জ্ঞানেতে যদি তাঁহাকে না জানিতে পারি, তবে নাস্তিকের কথা ছাড়িয়া দাও, আমরাই বা কি প্রকারে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিব? কোন বুদ্ধিমান লোকেই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া বালির উপর ঘর প্রস্তুত করিতে রাজী হইবেন না। কল্পনার উপর যতই বেশী দিন নির্ভর করিয়া থাকিব, আমাদের বিপদও তত বেশী ঘনাইয়া আসিবে। চক্ষু বুজিয়া বিপদের মধ্যে ডুবিয়া থাকা অপেক্ষা বিপদ কাটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করাই মনুষ্যত্ব। তাই, পাছে বিচার আলোচনা করিতে গিয়া নাস্তিক মতে গিয়া পড়ি, সেই ভয়ে ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পিছাইয়া যাওয়া আমাদের কথনই উচিত নহে। বরঞ্চ এই রকম বিচার আলোচনার ফলে ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, এই সকল সত্য নিঃসন্দেহভাবে জানিতে পারিলে আমাদের প্রাণে কত বড় একটা শান্তি আসিবে বল দিকিন?

আলোচনার মুখেই আমরা দেখি যে, নাস্তিকেরা আস্তিকদিগকে এই বলিয়া উপহাস করেন যে, ঈশ্বর, আত্মা, এ সমস্ত আস্তিকদিগের কল্পনার খেয়াল মাত্র, আসলে ওসকল কিছুই নাই, আর যদি বা থাকে তাহা হইলেও সে সমস্ত জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা কোন রকম যন্ত্রের সাহায্যে অনেক চেষ্টা করিয়াও ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতিকে দেখিতে পান নাই, আর ক খ-য়ের সমান, খ গ-য়ের সমান, অতএব ক গ-য়ের সমান এই রকম কাটাছাঁটা তর্কের দ্বারাও ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে এমন কোন প্রমাণ পান নাই; কাজেই তাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস রাখিতে পারেন না। তাঁহাদের কথায় ভাবে মনে হয় যে, বোধ হয় তাঁহাদের মতে যন্ত্রতন্ত্র আর তর্ক ছাড়িয়া ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি জানিতে পারিবার অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহাদের মতে অন্য কোন উপায় যদি বা থাকে, তবে সেটা আস্তিকেরাই দেখাইয়া দিতে বাধ্য। তাঁহাদের মনোগত ভাব এই যে, ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি প্রমাণের ভার আস্তিকদিগেরই স্কন্ধে চাপানো থকুক, তাঁহারা কেবল আস্তিকদিগের প্রমাণের ছিদ্র দোষ ধরিতে থাকিবেন।

সর্ব্বপ্রথমে আমরা দেখিতে চাই যে ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতির প্রমাণের ভারটা কাহা স্কন্ধে রক্ষা করা উচিত। ঐ সকল বস্তু যদি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যাইত, তাহা হইলে প্রাণের ভার কাহার উপর রাখা উচিত, সে বিষয়ে কেন আলোচনাই আবশ্যক হইত না। কারণ ইন্দ্রিয়গোচর কোন বস্তু সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ প্রকা করিলে আমরা তাহাকে সেই বস্তু প্রত্যক্ষ করায়া দিতে পারি। ঈশ্বর প্রভৃতি যদি কেবল তর্কের ফল একটা কথার কথা মাত্র হইত, তাহা হলে কেহ ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহিলে তাঁহাকে আমরা তর্কের নিয়ম ধরিয়া বুঝাই দিতে পারিতাম। কিন্তু ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি না ইন্দ্রিয়-

গোচর বস্তু, না তর্কের ফল। আস্তিকদিগের নিকট ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি স্বপ্রকাশ। তাঁহাদের মতে আমরা প্রত্যেকেই জানিতেছি যে আত্মা আছে, আর সেই আত্মার ভিতর দিয়া ঈশ্বরকেও প্রত্যক্ষ জানিতেছি। মিষ্ট বস্তু আছে। কিন্তু আমি তাহা খাইয়া জানি যে মিষ্ট বলিতে কি বুঝায়। আর কেহ যদি বলেন যে যন্ত্রতন্ত্র দ্বারা মিষ্ট বস্তু দেখা যায় না, কিম্বা তর্ক করিয়াও মিষ্ট বস্তু কি তাহা বুঝা যায় না, তাহা হইলে যে মিষ্ট খাইয়া মিষ্টের আস্বাদ জানিয়াছে সে, সেই তার্কিককে মিষ্ট বস্তু আছে, ইহা ছাড়া আর কি বলিতে পারেন? সেইরূপ আস্তিকেরা বলেন যে ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, ইহা তাঁহারা জানিতেছেন; নাস্তিকেরা যতক্ষণ প্রমাণ করিতে না পারিবেন যে, ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই, ততক্ষণ তাঁহারা আস্তিক মত ছাড়িতে পারেন না। কাজেই দাঁড়ায় এই যে, ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, তাহার প্রমাণের ভার আস্তিকদিগের স্কন্ধে ফেলা উচিত নহে। ইহার বিপরীতে, নাস্তিকদিগেরই উপর প্রমাণের ভার থাকা উচিত যে ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই ইত্যাদি।

নাস্তিকদিগকে আস্তিকদিগের এ কথা বলিবার অধিকার আছে। কারণ, আস্তিক মত তো কোন নূতন মত নহে—ইহা যে মানবজাতির অতি পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাস। মানুষের যে সময়ের ইতিহাস পাওয়া যায় না, সেই সময়ের যেটুকু অল্পস্বল্প বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতেও দেখা যায় যে, সেই খুব আদিম কালেও মানুষের ভিতর কোন-না-কোন আকারে ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল, আস্তিকভাব ছিল। এই আস্তিকভাব কোন বিশেষ লোকে বা সম্প্রদায়ে বদ্ধ নহে, কিম্বা কোন বিশেষ কালেতেও বদ্ধ নহে। এই পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত ঘুরিয়া আইস, দেখিবে যে, কি সভ্য, কি অসভ্য সকল জাতির ভিতরেই কোন-না-কোন আকারে আস্তিকভাব অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস, নিজে (কাজেই আত্মা) আছে বলিয়া বিশ্বাস জাগিয়া আছে। এমন কি, যে বৌদ্ধেরা নাস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও নাস্তিকতা ঠিকটা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিতে গেলে বুদ্ধনামে ঈশ্বরকে পূজা দিয়া এবং বুদ্ধের অধীনে অনেক দেবদেবীর কল্পনা করিয়া আস্তিকভাব যে মানুষের স্বাভাবিক, তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। আজকাল তো বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকগণ অনেকেই স্পষ্টরূপেই বৌদ্ধধর্ম্মকে নাস্তিক ধর্ম্ম বলিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে বুদ্ধদেব কোন কথা বলা আবশ্যক বোধ করেন নাই বলিয়াই সে সকল বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু তিনি ঐ সকল বিষয় তাঁহার উপদেশের কোথায়ও অস্বীকার করেন নাই। আস্তিক মতের পক্ষে যখন সমস্ত মানবজাতি একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে, তখন নাস্তিকেরা সে মতকে ভুল বলিলেই বা আমরা তাহা স্বীকার করিব কেন? বরঞ্চ তাঁহারা আস্তিক মতকে ভুল প্রমাণ করিতে না পারিলে আমরাই বা তাঁহাদের সঙ্গে বৃথাতর্কে প্রবেশ করিব কেন? তাঁহারা এইটুকু বলিলেই আমরা শুনিতে পারি না যে, মানুষ ঈশ্বরকে আত্মাকে জানে না বা জানিতে পারে না; কিম্বা ঈশ্বর আছেন আত্মা আছে, ইহার পক্ষেও যেমন অনেক কথা বলিবার আছে, বিপক্ষেও তেমনি অনেক কথা বলিবার আছে। এসব ফাঁকা কথা আমরা শুনিতে চাই না। তাঁহারা যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে ঈশ্বর নাই বা আত্মা নাই, অথবা ওসকল থাকিতে পারে না, তবেই আমরা তাঁহাদের কথায় কান দিতে পারি।

নাস্তিক মত তেমন কঠিন ভিত্তির উপর না দাঁড়াইলেও দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিকভাবটা বেশ শীঘ্র শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে। তাহার কারণ, নিম্ন শ্রেণী হইতেই বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পড়ানো হয়, কিন্তু খুব উচ্চ শ্রেণীতে ছাত্রেরা খুব উচ্চ শ্রেণীতে না উঠিলে দর্শনসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থই পড়িতে পায় না। সেই সমস্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ছাত্রেরা হক্স্‌লি, টিণ্ডাল প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের গভীর পাণ্ডিত্যের আভাস পাইয়া তাঁহাদিগকে প্রাণের গভীর শ্রদ্ধা দিতে শিক্ষা করে। তার পর, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন সেই সকল ছাত্রেরা উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া দর্শনবিষয়ের গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে দেখে যে, তাহাদের শ্রদ্ধার পাত্র বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি আস্তিকদিগের বিশ্বাসের বস্তুগুলি হয় একেবারেই উড়াইয়া

দিয়াছেন অথবা সংশয়ের চক্ষে দেখিয়াছেন, তখন তাহারা স্বভাবতই তাঁহাদিগের মত যুক্তি সকলই নির্ব্বিচারে ঠিক বলিয়া মানিয়া লয়। আমাদের স্বভাবই এই যে, কোন বিদ্বান কোন এক বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য একবার আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিলে, তিনি অন্য যে কোন বিষয়ে যে কোন মতামত প্রকাশ করিবেন, তাহাই আমরা নির্ভুল বলিয়া মানিয়া লইতে চাই—তাঁহার সেই মতামত সম্বন্ধে বিচার করিতে চাহি না—এক-কথায়, আমরা একপ্রকার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া নিজেদের বুদ্ধিবিবেচনা তাঁহার পদতলে ন্যস্ত করিয়া রাখি। আমাদের উচিত অবশ্য বিচার করা যে, যে বিষয়ে তিনি মতামত দিতেছেন সে বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে কি না। কোন জ্যোতির্ব্বেত্তা চিকিৎসা শাস্ত্র অল্পস্বল্প অধ্যয়ন করিলেও রোগী ব্যক্তি কি তাঁহাকে নিজের চিকিৎসার জন্য আহ্বান করিতে পারে? কখনই নহে—চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে রোগী সুচিকিৎসকেরই কাছে দৌড়াইবে। সেইরূপ, বিজ্ঞানের বিষয় কোন কিছু জানিবার থাকিলে হক্স্লি বল, ডার্বিন বল, বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের নিকট যাইতে পার। কিন্তু ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে চাহিলে সেই সকল বিষয় যাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কাছে যাওয়া উচিত।

ভারতের আস্তিকশ্রেষ্ঠ ঋষিরা আত্মার ভিতর দিয়া পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া মহা-শান্তিময় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন যে, সেই ভগবানকে নিজের অন্তরে দেখিলে মনের গাঁইট ভাঙ্গিয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্ম্মেরও অবসান হয়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

উন্নতি প্রসঙ্গ।

মহাসমরের শান্তি। গত ২৮শে জুন সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে যে রকম মনোমালিন্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে এই সন্ধি চিরস্থায়ী হইবে না। আসল কথা এই যে, ভগবানের উপর ধর্ম্মের উপর ভিত্তি স্থাপিত না হইলে কোন সন্ধি, কোন সৎকার্য্য দাঁড়াইতে পারে না। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বেশ মনে হয় যে, তাহারা নিজেদের স্বার্থপরতার জন্য কঠোর শাস্তি পাইতে পাইতে উপযুক্ত সময়ে সত্যধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিবেই। সন্ধিপত্র সাক্ষরের সময়ে কোন্ তিথি, কোন্ নক্ষত্রের সম্মিলন হইয়াছিল, ফলিত-জ্যোতিষীগণ তাহা দেখিয়া রাখিলে মন্দ হয় না।

বাঙ্গালীর সম্মান। ভগবানের বিধানে বিগত মহাসমরস্রোতে বিশেষভাবে বাঙ্গালী সকল ক্ষেত্রে সম্মান লাভ করিতেছে দেখিয়া আমাদের প্রাণে নবতর আশা-ভরসা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, এক এক যুগ উঠিবার সময়ে তাহার অগ্রপশ্চাৎ কতকটা সময় সন্ধিক্ষণরূপে কাটিয়া যায়। সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়। আমরা চারিদিকের লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি করিতেছি যে, ভারতে উন্নতির এক নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। এই নবযুগের সন্ধিক্ষণেই জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাঙ্গালীই ধর্ম্ম বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ের ভাব-সম্পদের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া জগতকে চমকিত করিয়া দিয়াছেন। তার পর দেখি, একদিকে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আচার্য্য নিজের কৃতিত্বের বলে পাশ্চাত্যভূখণ্ডের দেশ-বিদেশের উচ্চতম সম্মান লাভ করিতেছেন; অপরদিকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীরা কৃতিত্ব দেখাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্যে বীর্য্যে বাঙ্গালীরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা কিছুমাত্র নিম্ন আসন অধিকার করে নাই। দেশের শাসনকার্য্যেও বাঙ্গালীরা কমিশনর, একজিকিউটিব কাউন্সিলের সভ্য প্রভৃতি উচ্চতর পদ পাওয়াতেই অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনের অবসর পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল প্রভৃতি বাঙ্গালীরা যে কমিশনর পদে উন্নীত হইয়াছেন, ইহার জন্য আমরা গবর্ণমেন্টের বুদ্ধির প্রশংসা করি। তার পর, শাসনকার্য্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মহীশূর, বরোদা প্রভৃতি স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে নিজেদের ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় দেখাইবার অবসর পাওয়াতে বাঙ্গালীর জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজের একচেটিয়া রেল-ওয়ের উচ্চপদে শ্রীযুক্ত এন, কে, বসু প্রভৃতি অধিষ্ঠিত হইয়াও বাঙ্গালীর কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় দিতেছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাইয়া আজ আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে অনুরোধ করি, একজনও বাঙ্গালী যেন বৃথা সময় নষ্ট না করেন, যাঁহার যে বিষয়ে ক্ষমতা তিনি সেই বিষয়েই যেন নিজের উন্নতি সাধন করেন, দেশের মঙ্গল

সাধন করেন এবং ভারতভূমিকে জগতের সাধারণতন্ত্রে এক উচ্চ আসন অধিকারলাভের পথে অগ্রসর করিয়া দেন।

কাজের লোক। ইহা একটী মাসিক পত্রের নাম। অল্পদিন যাবৎ ইহা আমাদের হস্তগত হইতেছে। আমরা এরূপ একখানি কাগজের বহুলপ্রচার দেখিলে সুখী হইব। ইহাতে বাঙ্গালী যাহাতে কেবল কলমপেষার পেশা পাইবার পরিবর্ত্তে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার পথ দেখাইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়। আমাদের অনুরোধ যে, ইহাতে দেশ-বিদেশের বড় বড় কাজের লোক কি প্রকারে কাজের লোক হইয়াছেন, সেই তত্ত্ব তাঁহাদের জীবনী সহ প্রকাশ করেন।

আয়ুর্ব্বেদ। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র বিলাতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের ফল প্রত্যক্ষ করাইয়া আশ্চর্য্য করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের ফল তো আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু বিলাতে ইহা প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য আমরা এই কারণে সুখী যে, গবর্ণমেণ্টের প্রসন্ন দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে এ দেশে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিসাধন এবং প্রসারবৃদ্ধি হইবে।

সমাজ-সংস্কার সমিতি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে লেফটেনেণ্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমাজ-সংস্কার সমিতি নামে একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সভ্যগণ নানা উপায়ে হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উদ্যোক্তাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি এবং প্রার্থনা করি যে তাঁহারা তাঁহাদের সংকল্পসাধনে সিদ্ধকাম হউন। একটী কথা আমাদের বলিবার আছে। কেবল কতকগুলি সভাসমিতি স্থাপন বা কতকগুলি প্রস্তাব নির্দ্ধারিত করিলেই সমাজের সংস্কার সাধন হইতে পারে না। প্রত্যেক সৎকার্য্যেই আত্মবলি চাই। নিজের কথা, নিজের স্বার্থ ষোল আনা বজায় রাখিব, অথচ সৎকার্য্যে সিদ্ধ হইব, জগতে তো এ রকম ঘটনা দেখিতে পাই না। আমরা জানি, উদ্যোক্তাদের বাড়ীর অনেকেই হয় তো প্রস্তাব সমর্থনের সময়ে খুবই জোরের সহিত সমর্থন করিবেন, কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার সময়ে খুবই পশ্চাৎপদ। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, বাড়ীর পুরুষেরা সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী হইলেও বাড়ীর মেয়েদের ভয় ও অজ্ঞতাজন্য জেদের কারণে সে বিষয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেন। আসল কথা—প্রয়োজন কোন বাধা মানে না—necessity has no law। ভগবানের বিধানে প্রয়োজনের মত প্রয়োজন পড়িলে সকল বাধা দূর হইবে। বিধবাবিবাহের জন্য কত চেষ্টা হইল, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারেই তাহার কৃতকার্য্যতা হইতেছে। আমরা সমিতির আবশ্যকতা কম করিতেছি না। বরঞ্চ প্রয়োজন পড়িলে লোকেরা যাহাতে একটা কূল খুঁজিয়া পায়, আদর্শ দেখিতে পায়, তাহার জন্য এরকম সমিতির বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে করি। আমাদের বক্তব্য এই যে, সমিতির প্রত্যেক সভ্য দেশে প্রয়োজন পড়িবার পূর্ব্বেই প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। আর তাহা না করিলে ভগবৎপ্রেরিত প্রয়োজনের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, তখন অনেক ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

রাজনারায়ণ বসু পবলিক লাইব্রেরি। আদি-ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে না জানেন এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী বড়ই বিরল। তাঁহারই সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" স্বনামধন্য মোক্ষমূলরকে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মবিজ্ঞান আবিষ্কারের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ বহুকাল যাবৎ দেওঘরে কাটাইয়াছিলেন। দেওঘরের সহিত তাঁহার নাম অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ বলিলেও বলা যায়। প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেওঘরের পাণ্ডাদের উৎপাত বড় বেশী রকমের ছিল; এমন কি, মধুপুর হইতে সেই উৎপাতের সূত্রপাত হইত। রাজনারায়ণ বাবুর প্রদত্ত একটী মন্ত্রবলে আমি সেই উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলাম। অনেকগুলি পাণ্ডা মধুপুর হইতে আমার সঙ্গ লইয়াছিলেন। তাঁহাদের চীৎকারে আমার কাণ ঝালাপালা হইয়া যাইতেছিল। আমিও তাঁহাদিগকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দেওঘরে পৌঁছিলাম। যখন পাণ্ডারা তখনও সঙ্গত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন দেখিলাম, তখন তাঁহাদের মধ্যে এক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম—বলিলাম যে "রাজনারায়ণ বোস আমার পাণ্ডা"। অবিলম্বে পাণ্ডাদিগের বৃহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেওঘরে শিক্ষিত বাঙ্গালী গিয়া সদা হাস্যমুখ রাজনারায়ণ বসুর সহিত যদি সাক্ষাৎ না করিতেন, তবে তিনি নিজের জীবন বিফল মনে করিতেন। সেই মহাপুরুষের নামে অল্পকাল হইল একটী সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসু বহুকাল যাবৎ মেদিনীপুর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং এই গ্রন্থাগার যে তাঁহার একটী উৎকৃষ্ট স্মৃতিচিহ্ন হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এই গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আমরা একটী আবেদন পাইয়াছি। এই গ্রন্থাগারের জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় আট

হাজার টাকা লাগিবে। যে মহাপুরুষের নামে গ্রন্থাগার উৎসৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নামে আট হাজার টাকা সংগ্রহ বিশেষ কষ্টকর হইবে বলিয়া মনে করি না। দেশের মহাপুরুষদিগের নাম চির-স্মরণীয় রাখিবার জন্য আমরা যত টুকু সাহায্য করিতে পারিব, দেশও তদনুসারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে নিঃসন্দেহ। এই উপলক্ষে যাঁহার ইচ্ছা আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নামে অথবা Honorary Secretary R. N. Bose Public Library, Deoghar (S. P.) এই ঠিকানায় অর্থ পুস্তক প্রভৃতি যে কোনরূপ সাহায্য প্রেরণ করিতে পারেন। আবেদনখানি স্থানাভাবে আচ্ছাদনীর তৃতীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

হুগলি সঙ্গীতবিদ্যালয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর হুগলি বড়ালপাড়ায় একটী সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আদিসমাজের পরম হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত লাল বেহারী বড়াল ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তিনি হুগলি জেলার গণ্যমান্য প্রায় সকলেরই নিকটে উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছেন। এখানে অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণকে প্রধানত ধর্ম্মসঙ্গীতই শিক্ষা দেওয়া হয়। আপাতত লালবিহারী বাবুই সঙ্গীত শিক্ষা দেন। কলিকাতায় সঙ্গীতসংঘ যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হুগলির এই বিদ্যালয়টীরও উদ্দেশ্য তাহারই একাংশসাধন। এই কারণে আমাদের অনুরোধ যে, এই বিদ্যালয়টী স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত না হইয়া সঙ্গীত সঙ্ঘেরই শাখা স্বরূপে গণ্য হয়। বৃথা স্বাতন্ত্র্যে বলহানি, মিলনেই বলবৃদ্ধি। উভয় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মিলিত হইয়া এ বিষয়ের একটা সুবন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, ধর্ম্মসঙ্গীত দেশে-বিদেশে যতই গীত হইতে থাকিবে, ততই দেশের মঙ্গল হইবে, ততই দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। হুগলি সঙ্গীতবিদ্যালয়ের সাহায্যে ভগবানের নাম সমস্ত হুগলি জেলা ছাইয়া ফেলুক এই প্রার্থনা করি। লালবেহারী বাবুর সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক।

সাধারণ গ্রন্থাগার। বরোদা রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইতেছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই সকল গ্রন্থাগারে ধর্ম্ম, জীবনী, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিষয় আলোচনা করিলে মানুষের যথার্থ মনুষ্যত্ব জন্মে, সেই সকল বিষয়েরই গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, উপন্যাসের গ্রন্থ স্থান পায় না। ইহা ব্যতীত, এই সকল গ্রন্থাগারের আর একটী গুরুতর বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের তত্ত্বাবধায়কগণ স্বয়ং নানাগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত লোকদের নিকটে ব্যাখ্যা করেন। আমাদের দেশে অবশ্য কথকতা দ্বারা কতকটা এইভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু সে শিক্ষা প্রধানত ধর্ম্মবিষয়েই আবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান উন্নতির যুগে কেবল ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষাকে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। ইংলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশে travelling library বা চলন্ত গ্রন্থাগার নামে এক ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থা উপরোক্ত ব্যবস্থার কতকটা কাছাকাছি যায়। এই সমস্ত গ্রন্থাগার প্রধানত অল্পশিক্ষিত চাষাভুষো কারিগর প্রভৃতির জন্য একটা বৃহৎকায় গাড়ীর উপর সংগঠিত হয়। কাজেই এই সকল গ্রন্থাগারে কৃষি প্রভৃতি শ্রমশিল্পবিষয়ক গ্রন্থই প্রধানত সংগৃহীত হয় এবং এই সকল গ্রন্থাগারকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এক একটী গ্রামের মধ্যে সেগুলি দাঁড় করাইয়া গ্রন্থাধ্যক্ষ যথোপযুক্ত বিষয়সমূহের উপর সংক্ষেপে উপদেশ দেন; এমন কি, যন্ত্রাদি দ্বারা অনেক বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখানোও হইয়া থাকে। আমাদের দেশের জমীদারেরা শিক্ষা বিষয়ে দেশকে বাস্তবিক অগ্রসর করিয়া দিতে চাহিলে গ্রামে গ্রামে ছোটখাটো এক একটা লাইব্রেরি করিয়া দিন; তাঁহাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, সেই সকল লাইব্রেরিতে উপন্যাসের (খুব সুনির্ব্বাচিত না হইলে) প্রবেশ যেন নিষিদ্ধ হয়। এই প্রকার দেশের উন্নতির উদ্দেশ্য লইয়াই আজ শ্রীযুক্ত কার্ণেগী মহোদয় আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রজা হইয়াও জন্মভূমি স্কটলাণ্ডের গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

জাতিভেদ ও ব্রাহ্মসমাজ। গত ১লা জ্যৈষ্ঠের "ধর্ম্মতত্ত্ব" কাগজে (নববিধান সমাজের মুখপত্র) "জাতিভেদ ও ব্রাহ্মসমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে—"অনেকে মনে করেন, উপবীত পরিত্যাগ করিলে, ইউরোপ ভ্রমণ করিলে এবং চীনাবাটির বাসনে গোমাংস ইত্যাদি আহার করিলেই বুঝি জাতিভেদের সংহার সাধন হইল। কেহ কেহ মনে করেন, ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এবং ভারতবাসী ও পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইলে জাতিভেদের তিরোধান হইবে। এই সমস্ত প্রথার দ্বারা জাতিভেদের দুই একটী শাখা ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু মানবজাতির প্রাণ হইতে জাতিভেদের মূল বিনষ্ট হইবে না ... ... সুতরাং উপবীত স্কন্ধ হইতে পরিত্যক্ত হইলে কি হইবে, পদমর্য্যাদার উপবীত হৃদয়ের উপর ঝুলিবে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে জাতিভেদ বিনষ্ট হইলে কি হইবে? ধনী ও দরিদ্রের জাতিভেদ হৃদয়ে আসন পাতিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন দ্বারা ব্রহ্ম ও মানবের সহিত

সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে উপবীত আপনা আপনি ছিন্ন হইবে, শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়ের ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হইবে। সমস্ত মানবজাতি একই ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ হইতে সক্ষম হইবে"। ইহা আদিসমাজের সমাজসংস্কারসম্বন্ধীয় মূলমন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। টীকা নিষ্প্রয়োজন—সত্যমেব জয়তে, সত্যেরই জয় হয়।

ধারবার ব্রাহ্মসমাজ। আদিসমাজের মূলমন্ত্র (সত্য ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া) যে অল্পে অল্পে কিরূপ প্রসার লাভ করিতেছে ধারবার ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাই তাহার অন্যতর প্রমাণ। আদিসমাজের মূলমন্ত্র লইয়া এবং আদিসমাজকেই আদর্শে রাখিয়া এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপত এম বিজুর। এই ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটি মেডিক্যাল মিশন খোলা হইয়াছে। এই মিশনেও সুবিধার কারণে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত এম, কুরুন্দার, ডাক্তার এস, আর, কির্লসবতার এবং ডাক্তার এ, শিবরাও এই মিশনের চিকিৎসা কার্য্যে সহায়তা করেন। ইহার প্রতিষ্ঠা অবধি প্রায় এক বৎসর কালের মধ্যে প্রায় দুই সহস্র লোককে ঔষধপত্র দেওয়া হইয়াছে। এই ব্রাহ্মসমাজ পোষ্টার মিশন (Poster Mission) নামে একটি বিভাগ খুলিয়াছেন। এই মিশনের সাহায্যে স্থানে স্থানে বড় বড় অক্ষরে ধর্ম্মমন্ত্র ছাপাইয়া জনসাধারণকে ধর্ম্মভাবে জাগাইয়া তোলা হয়। এই ব্রাহ্মসমাজ গত মাঘ মাসে ব্রহ্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নানা গোলযোগে তাহার বিবরণ আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত। ভগবানের দৃষ্টি বড়ই সূক্ষ্ম। তিনি কালীপ্রসন্ন বাবুর সাধু উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল করিবেন।

মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন। আমরা সংবাদ পত্রে দেখিলাম—"২৪ পরগণার সুপ্রসিদ্ধ টাকী গ্রামের অনতিদূরে অবস্থিত জালালপুর নামক গ্রামে নন্দলাল জৈনীর একটি ধ্বংসোন্মুখ দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার স্থানে একটি নুতন দেবমন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পৌরোহিত্যের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী অথবা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের তথায় যাওয়ার কথা ছিল। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইতে অসমর্থ হওয়ায় মন্দিরস্থাপনের প্রবর্ত্তক ও উদ্যোগী বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান ও বৈষ্ণবদের উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুলসমূহের এডিশনাল ইন্স্পেক্টার খাঁ বাহাদুর মৌলবী আশাদুল্লা সাহেবের পৌরোহিত্যে মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মৌলবী সাহেব একজন ভক্ত লোক। ইনি কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বহস্তেই মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।" ধর্ম্মের রাজ্যে আমরা এইরূপ উদারতা ও একপ্রাণতাই তো দেখিতে চাই। "যতক্ষণ রাস্তাপরে ততক্ষণ জাতবিচারে। খেয়াপরে চড়লে পরে নাহি কোন ভেদ।"

রাজনৈতিক জাতিভেদ। গত ১৩ই আষাঢ় "রায়ত" কাগজে একটি কথা বড়ই ঠিক বলিয়াছে—সামাজিক জাতিভেদে অনিষ্ট যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছেই, আবার রাজনৈতিক জাতিভেদ কেন? আমরা "রায়তের" নিজের কথা উদ্ধৃত করিলাম:—

"রায়ত আলাদা বাছাই চাহে না। তোমরাও আলাদা বাছাই লইও না। শাসক এক জাতি, শাসিত এক জাতি। এই দুই জাত বাস্। আর দোসরা কোন কথা নাই। দিনরাত হিন্দুর জাতিভেদের নিন্দা কর—ভেদে যে কি ফল হয় তাহা হিন্দুর জাতিভেদে বেশ বুঝিতেছ। তবু রাজনৈতিক জাতিভেদ গড়িতে চাও? যদি খাঁটি গণতন্ত্র চাও ত এক বাছাই চাহিয়া লও। আর যদি এক একটা দলতন্ত্র চাও ত আলাদা বাছাই লও। যাহারা শাসনসংস্কার চাও তাহাদিগকে একটা কথা সুধাই, তোমরা কি গণতন্ত্রের হিসাবে সংস্কার চাও? না, গণতন্ত্রের যুগে দলতন্ত্রের হিসাবে সংস্কার চাও? গণতন্ত্রের যুগে যদি দলতন্ত্রের উমেদারী কর, তবে লাভ হইবে পিতলের কাটারী। তার "ঝিকি মিকি সার" হইবে।" ইহাই ভারতবাসীর প্রাণের কথা বলিয়াই মনে হয়। সকল রকমেরই জাতিভেদের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়ানো কর্ত্তব্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফী বৃদ্ধি। আমরা এই ফী বৃদ্ধির বিরোধী। সমস্ত দেশ চাহিতেছে শিক্ষাবিস্তার। আপাততঃ সেই কারণে নিম্ন শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থার জন্য নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফী বৃদ্ধির ব্যবস্থা সমীচীন হইয়াছে কিছুতেই বলিতে পারি না। যে মূলমন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নশিক্ষার বিস্তার দেখিতে চাই, সেই মূলমন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চ শিক্ষার আরও বেশী বিস্তার দেখিতে চাই। তৎপরিবর্ত্তে ফী বৃদ্ধির ফলে উচ্চ শিক্ষার প্রসার কমিয়া যাইবে বলিয়া আমাদের স্থির ধারণা। একজনও যদি এই ফী বৃদ্ধির কারণে উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহাও দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ঘোর অমঙ্গলজনক। দেশের অবস্থা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই এক-

বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীগণের অনেকেই নিতান্ত দরিদ্র না হইলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। তাঁহাদের ফী সংগ্রহের কাহিনী শুনিলে সময়ে সময়ে পাষাণও "গলিয়া গিয়া হয় যে অশ্রুর ধারা।" এ বিষয়ে আমরা বেশী কি আর বলিব? যতদূর বুঝিতেছি, সমগ্র বঙ্গদেশ একবাক্যে এই বৃদ্ধির ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত দেখিতে চাহিতেছে। আমাদেরও অনুরোধ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই এই বিধি প্রত্যাহৃত করুন।

জননী জন্মভূমি।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

না রহিত যদি তোর অসীম উদার
নীলিম আকাশতল; রবি-শশী-তারা
যদি না ঢালিত নিতি আলোকের ধারা
তোর মুক্ত শ্যামাঙ্গনে; স্নেহাঞ্চল-ছায়
যদি না ফুটিত কলি উষায় সন্ধ্যায়
তোর পুণ্য বন-ভূমে; যদি না গাহিত
বিহঙ্গ ললিত সুরে; যদি না বহিত
মৃদু মন্দ গন্ধবহ থাকিয়া থাকিয়া
তোর প্রাসাদের দ্বারে; নাচিয়া নাচিয়া
যদি না ছুটিত নদী; যদি হিমাচল
না রহিত; চুম্বি তোর চরণ কমল
না গর্জ্জিত মহাসিন্ধু! এই মত আমি
ভাল বাসিতাম তোরে তবু দিন-যামি।

প্রসাদজীবনীর সন্ধানকথা।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

মাতৃভক্ত রামপ্রসাদের জীবনী বঙ্গভাষায় অনেকেই লিখিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি, আই, ই, সম্পাদিত 'বিবিধার্থসংগ্রহ' পত্রিকার ১৭৭৩ শকের ফাল্গুন সংখ্যায় ৺ হরিমোহন সেন মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে প্রসাদ-জীবনী অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেন। ইহা প্রসাদজীবনীর সর্ব্ব প্রথম প্রবন্ধ হইলেও ইহাতে মালমসলার অভাব হেতু পরবর্ত্তী লেখকগণের প্রসাদপ্রসঙ্গ আলোচনার বিশেষ কোন সাহায্য হয় নাই। এই প্রবন্ধের সর্ব্বপ্রধান ত্রুটী এই যে ইহাতে সাধকের পদাবলী-সংগ্রহ একেবারেই নাই। পদাবলীই সাধকের শ্রেষ্ঠ দান; এই ধনের অধিকারী বলিয়া বাঙ্গালী ধনী। প্রসাদের কথা উত্থাপিত হইলে প্রথমেই পদাবলীর কথা মনে পড়ে। ইহা ভিন্ন সাধকের সাধনরহস্য জানিবার অন্য কোন উপায় নাই বলিলেও চলে। পদাবলী ছাড়া প্রসাদী প্রবন্ধ একেবারে শক্তিহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কারণ প্রসাদের সাধন-জীবনের পরিচয় দিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার পদাবলীবিশেষের ভাব তাহাতে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, নতুবা উহার কোন মূল্য আছে বলিয়া কেহই মনে করেন না। ইহার পরই প্রসাদ-প্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা গুপ্ত কবিকে দেখিতে পাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজে গুপ্ত কবির প্রভাব এক সময়ে যে কিরূপ ছিল তাহার আলোচনা পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ অনেকেই করিয়াছেন, সে বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়া এখানে কোনই ফল নাই। গুপ্ত কবিই রামপ্রসাদের লুপ্তপ্রায় জীবনী-কথা সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করেন। গুপ্ত কবির গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখিত আছে যে, প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশ বর্ষকাল নানা স্থান পর্য্যটন এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ের সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী। ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক 'প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত 'কালী-কীর্ত্তন' 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' প্রভৃতি বিষয়ের অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। ১২৬০ সালের ১লা পৌষ গুরুবারে মাসিক 'প্রভাকর' পত্রিকার ৪৮০১ সংখ্যায় চৌদ্দ পৃষ্ঠাব্যাপী 'কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন' প্রবন্ধ চৌদ্দটি পদাবলী সহ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি ১লা আশ্বিনের মাসিক 'প্রভাকরে' 'মনরে আমার এই মিনতি', 'আর কাজ কি আমার কাশী', 'আর বাণিজ্যে কি বাসনা', 'মায়ের পরম কৌতুক', 'মন কর কি তত্ত্ব তারে', 'এই সংসার ধোঁকার টাটি', * 'ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গম সঙ্গ'

---

* এই পদাবলী ১ পৌষের সংখ্যাতে লিপিবদ্ধ আছে। কাজেই দেখা যায় গুপ্ত কবি মাত্র কুড়িটী পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই সাতটি পদাবলী সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। এই পৌষ সংখ্যার প্রসাদ-জীবনী পড়িয়া হালিসহর নিবাসী গুপ্তকবির কোন বন্ধু একখানা পত্র লেখেন, তাহা তিনি ১লা মাঘের 'প্রভাকরে' ছাপাইয়াছিলেন।

গুপ্তকবির সংগৃহীত প্রসাদ-জীবনীর উপাদানই প্রামাণিক এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেকেই প্রসাদ-জীবনী লিখিয়াছেন। কিন্তু দুই চারিজন লেখক ভিন্ন অপর কেহই একথা স্বীকার করেন নাই। এমন কি 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ-কার' তাঁহার গ্রন্থের কোন স্থানেই গুপ্তকবির প্রবন্ধের উল্লেখ করেন নাই। তবে এই ক্ষেত্রে এরূপও হইতে পারে যে তিনি স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া গুপ্তকবির প্রবন্ধের কোন সংবাদই লন নাই। যাহা হউক তিনি গুপ্তকবির প্রবন্ধের ভিতর অনেক নূতন সংবাদ পাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে গুপ্তকবির এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটী একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। আমি এই প্রবন্ধের জন্য আট বৎসর কাল বঙ্গদেশের বহুস্থানে এবং বহুব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করিয়াছি। বহু প্রসাদ-প্রসঙ্গ লেখককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা এই মূল প্রবন্ধ পড়িবার সুযোগ পান নাই বলিয়া আমাকে উত্তর দিয়াছেন। এ বিষয়ে বাংলার নানা পত্রিকায় আমি বাঙ্গালী জনসাধারণের নিকট নিবেদন ছাপাইয়াছিলাম। গভীর পরিতাপের বিষয় আমি কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর পাই নাই।

এই ভাবে নানা দিক দিয়া অনুসন্ধান করিয়া আমি কলিকাতা মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটের গুপ্তকবির সহোদরের দৌহিত্র-বংশীয়দের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তাঁহারা আমাকে জানাইয়াছিলেন 'এই সংখ্যাখানা কে জানি লইয়া গিয়া আর ফিরাইয়া দেন নাই।' ইহার পর গুপ্তকবির জন্মস্থান কাঁচড়াপাড়ায় অনুসন্ধান করিয়াও সফলকাম হইতে পারি নাই। হালিসহরেও অনুসন্ধান করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছি। শুনিয়াছিলাম রামপ্রসাদ মেমোরিয়াল কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত মহাশয় প্রসাদ জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন; কলিকাতায় তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলাম, তিনিও 'প্রভাকরের' কোন সংবাদ আমাকে দিতে পারেন নাই। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয়ের গ্রন্থাগারে অনেক প্রাচীন লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ আছে, সেখানেও দুই তিন বার অনুসন্ধান করিয়া কোনই ফল হয় নাই। শ্রীরামপুর কলেজের লাইব্রেরী, বহরমপুর ডাক্তার রামদাস সেনের লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া কলেজ লাইব্রেরী, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, এসিয়াটিক সোসাইটী, সাহিত্য-পরিষদ লাইব্রেরী, * চৈতন্য লাইব্রেরী, সাবিত্রী লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতার বহু গ্রন্থাগারে, রামপ্রসাদের বংশধরদের গৃহে, বড় বড় রাজা মহারাজা ও জমিদারদের বাড়ী, ঠাকুরবাড়ী, ৮কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ী, দীনধামে, বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ী, ভূকৈলাসের রাজবাটী এবং কলিকাতার গলিতে গলিতে যে কত খুঁজিয়াছি তাহার বিবরণ দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। গুপ্তকবির এই প্রবন্ধটী এবং নূতন অপ্রকাশিত পদাবলীর জন্য অনেক সময় বড় বড় লোকদের গৃহে যাইয়া বলিয়াছি 'মহাশয়, আপনাদের গ্রন্থাগারে রামপ্রসাদের পদাবলী ও গুপ্তকবির ১২৬০ সালের 'প্রভাকর' আছে কি'? প্রায় সকলেই 'না' করিয়াছেন; এবং কেহ বা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। অনেককে দেখিয়াছি তাঁহারা প্রসাদের নামটী পর্য্যন্ত শুনেন নাই। ইহাতে আমি একটুও আশ্চর্য্য হই নাই। ধীরে ধীরে সেই সব 'বড়লোকদের' গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। এই ক্ষেত্রে কলিকাতা 'ভক্তি-ভবনের' আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্তের নিকট হইতে আমি নানা সাহায্য পাইয়াছি। তিনি নিজে কলিকাতার বহু স্থানে 'প্রভাকরের' সংবাদ লইয়াছেন। কিন্তু তিনিও এতটা শ্রম স্বীকার করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; কেবলমাত্র 'পরিষদে' রক্ষিত আশ্বিন ও মাঘ সংখ্যার নকল আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। চুঁচুড়ার কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় গত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাকে লিখিয়াছিলেন 'যদি তাড়াতাড়ি না থাকে, আমি আপনাকে "প্রভাকর" সংগ্রহ করিয়া দিব।' সম্ভবতঃ তিনি অনুসন্ধান করিয়াও 'প্রভাকর' পান

* 'সাহিত্যপরিষদ' গ্রন্থাগারে ১২৬০ সালের ১ আশ্বিন ও ১ মাঘ সংখ্যা আছে। পৌষ সংখ্যাখানা নাই।

নাই। এইভাবে কত লোককে যে 'প্রভাকরের' জন্য ধরিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। অবশেষে আমি উহা কি করিয়া পাইলাম সেই কাহিনীটি এখানে বলিব।

বিগত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে একদিন বেলা ৮ ঘটিকার সময় আমি 'বঙ্কিম-ভবন' হইতে ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময় কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত সহসা দেখা হয়। তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি বলিলেন 'আমার মনে হইতেছে, আমরা হকারের নিকট হইতে কতকগুলি 'প্রভাকরের' ফাইল কলেজের জন্য খরিদ করিয়াছিলাম, উহাতে প্রসাদজীবনী আছে কিনা ঠিক বলিতে পারি না। আপনি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া এই বিষয়ের সঠিক সংবাদ জানুন।' আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তখনই কানাইলাল ধরের লেনে ডাঃ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি বলিলেন, 'আপনি রাঁচি ফিরিয়া গিয়া আমাকে এ বিষয়ে চিঠি লিখিবেন। আমি অনুসন্ধান করিয়া আপনাকে সংবাদ জানাব। এখন বড়দিনের ছুটীতে কলেজ বন্ধ বলিয়া আপনাকে সাহায্য করিতে পারিলাম না।' যেন আমার মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। তবুও আবার মনে হইল এ ভাবেতে কত স্থানে আশা পাইয়া অবশেষে নিরাশ হইয়াছি। প্রতিদিনই বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার দৈনিক অনুসন্ধানের ফলাফল বলিতাম। আজও সে কথা বলিবার পর তিনি বলিলেন, 'গুপ্তকবির প্রবন্ধটী যদি প্রকাশের যোগ্য হয় তাহা হইলে তোমার মা তোমাকে ইহা সংগ্রহ করিয়া দিবেন। তুমি ত বহু অনুসন্ধান করিলে, এখন মায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাক।' এখানেই আমার অনুসন্ধানের শেষ হইল। ভাগ্যক্রমে রাঁচি বলিয়া আমি মায়ের আশীর্বাদে ও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রবন্ধটী পাইয়াছি। বিগত ১৭ই জানুয়ারী সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীয়ানের পত্রে জানি যে সংস্কৃতকলেজের গ্রন্থাগারে প্রসাদজীবনী-সম্বলিত ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক 'প্রভাকর' খানা আছে। এই শুভ সংবাদে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। যে প্রবন্ধের অনুসন্ধানে আমি এত দীর্ঘকাল ঘুরিয়াছি এবং যাহা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে তাহা সাহিত্যসেবী ও প্রসাদ-ভক্তের পাইতে আমার মত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে না হয় এজন্য উক্ত মূল প্রবন্ধটী 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' পুনঃ মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। কেবল তাহাই নয় যাহাতে জনসাধারণ উহা সহজে পাইতেপারেন এজন্য উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। গুপ্ত কবির মূল প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ আকারে যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, স্থল বিশেষেও গুপ্ত কবির বানান সংশোধন করা আমি সঙ্গত মনে করি নাই। কারণ সেই সময়ে এই বানান ও ভাষা বাঙ্গালীর আদর্শ ছিল।

এই দুর্দ্দিনে আমার ভক্তিভাজন অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে চির-ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারই আশা-বাণীর উপর নির্ভর করিয়া এই অমূল্য সম্পদ আমি পাইয়াছি। আমি যে বহুদিনের চেষ্টায় জগজ্জননীর আশীর্ব্বাদে এই প্রবন্ধটী পাইয়াছি, এজন্য মায়ের নিকট আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইতেছি। অলমিতি—

গীতাধ্যায়-সঙ্গতি।

(গীতারহস্য—চতুর্দ্দশ প্রকরণ)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাহারও কাহারও মত এই যে, কর্ম্মযোগের বিচার-আলোচনা এইখানে অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে; ইহার পরে, জ্ঞান ও ভক্তি এই দুই নিষ্ঠা স্বতন্ত্র, অর্থাৎ পরস্পরনিরপেক্ষ কিংবা কর্ম্মযোগের সামিল অথচ তাহা হইতে ভিন্ন এবং তাহার পরিবর্ত্তে বিকল্প বলিয়া আচরণীয় এইরূপ ভগবান বর্ণনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভক্তি এবং পরে বাকী ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন; এবং এই প্রকারে আঠারো অধ্যায়ের বিভাগ করিলে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান

ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের অংশে ছয় ছয় অধ্যায় হইয়া গীতার সমান ভাগ হয়। কিন্তু এই মত ঠিক্ নহে। পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভের শ্লোক হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে যুদ্ধ ছাড়িয়া দিব কিংবা যুদ্ধের ঘোরতর পরিণাম চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াও যুদ্ধই করিব, এবং "যুদ্ধ কর" বলিলে তাহার পাপ কি করিয়া এড়াইব, যখন অর্জ্জুনের এই মুখ্য সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন 'জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় আর কর্ম্মের দ্বারাও মোক্ষলাভ হয়; এবং তোমার যদি ইচ্ছা হয়, ভক্তির তো এক তৃতীয় নিষ্ঠাও আছে' এইরূপ 'ধরা-ছাড়া' ও নিষ্ফল উত্তরে সেই সংশয়ের সমাধান হইতে পারিত না। তাহা ছাড়া, অর্জ্জুন যখন এক নিশ্চয়াত্মক মার্গের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সর্ব্বজ্ঞ ও চতুর শ্রীকৃষ্ণ আসল কথা ছাড়িয়া তাঁহাকে তিন স্বতন্ত্র ও বিকল্পাত্মক মার্গ দেখাইলেন, এ কথাও অসঙ্গত। ইহাই সত্য যে, গীতায় 'সন্ন্যাস' ও 'কর্ম্মযোগ' এই দুই নিষ্ঠারই বিচার আছে (গী. ৫. ১); তন্মধ্যে 'কর্ম্মযোগ' যে অধিক শ্রেয়স্কর তাহাও স্পষ্ট বলা হইয়াছে (গী. ৫. ২)। ভক্তির তৃতীয় স্বতন্ত্র নিষ্ঠা তো কোথাও বলা হয় নাই। সুতরাং জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিন স্বতন্ত্র নিষ্ঠায় কল্পনা সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের নিজের মনগড়া; এবং গীতায় কেবল মোক্ষোপায়েরই বিচার করা হইয়াছে তাঁহাদিগের এইরূপ ধারণা থাকায় এই তিন নিষ্ঠার কথা প্রায় ভাগবত হইতেই তাঁহাদের মনে আসিয়াছে (ভাগ. ১১. ২০. ৬)। কিন্তু ভাগবত পুরাণ ও ভগবদ্-গীতার তাৎপর্য্য যে এক নহে, সে কথা টীকাকারদিগের মনে হয় নাই। শুধু কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, মোক্ষের জন্য জ্ঞান চাই, এই সিদ্ধান্ত ভাগবতকারেরও মান্য। কিন্তু ইহা ব্যতীত, ভাগবতকার এ কথাও বলেন যে, জ্ঞান ও নৈষ্কর্ম্য মোক্ষপ্রদ হইলেও ঐ দুই-ই (অর্থাৎ গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগ) ভক্তি ব্যতীত শোভা পায় না—নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ (ভাগ. ১২. ১২. ৫২ এবং ১. ২. ১২)। এইরূপে দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ভাগবতকার ভক্তিকেই এক প্রকৃত নিষ্ঠা অর্থাৎ চরম মোক্ষপ্রদ অবস্থা মনে করেন। ভগবদ্ভক্তেরা ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবেনই না, ভাগবত এরূপ বলেন না এবং করিতেই হইবে এ কথাও বলেন না। নিষ্কাম কর্ম্ম কর বা না কর, এ সমস্ত ভক্তিযোগেরই বিভিন্ন প্রকার মাত্র (ভাগ. ৩. ২৯. ৭-১৯), ভক্তি না থাকিলে সমস্ত কর্ম্মযোগ পুনর্ব্বার সংসারে অর্থাৎ জন্মমরণের ফেরে আনিয়া ফেলে (ভাগ. ১. ৫. ৩৪, ৩৫), ভাগবত কেবল এই কথাই বলেন। সারকথা, ভাগবতকারের সমস্ত কটাক্ষ ভক্তির উপরেই থাকায়, তিনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগকেও ভক্তিযোগের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ভক্তিই একমাত্র প্রকৃত নিষ্ঠা। কিন্তু ভক্তিই গীতার কিছু মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। তাই, ভাগবতের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত কিংবা পরিভাষা গীতার মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া আতার গাছে আমের কলম লাগাইবার মতো অনুচিত। পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্তি আর কিছুতেই হয় না, এবং এই জ্ঞান সম্পাদনের ভক্তি এক সহজ মার্গ—এ কথা গীতার সম্পূর্ণ মান্য। কিন্তু এই মার্গের সম্বন্ধেও আগ্রহ না রাখিয়া, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যে জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক যাহার যে মার্গ সহজ মনে হইবে সেই মার্গ অনুসারেই সেই জ্ঞান সে সম্পাদন করিয়া লইবে, গীতা একথাও বলিয়াছেন। শেষে অর্থাৎ জ্ঞান-প্রাপ্তির পর মনুষ্য কর্ম্ম করিবে কি করিবে না—ইহাই গীতার মুখ্য বিষয়। তাই, সংসারে কর্ম্ম করা ও কর্ম্ম ত্যাগ করা—জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের জীবনে এই যে দুই মার্গ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ দুই মার্গ হইতেই গীতার আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে, ভাগবতকারের অনুসারে প্রথম মার্গের 'ভক্তিযোগ' এই নূতন নাম না দিয়া, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাকে 'কর্ম্মযোগ' বা 'কর্ম্মনিষ্ঠা' এবং জ্ঞানোত্তর কর্ম্মত্যাগকে 'সাংখ্য' বা জ্ঞাননিষ্ঠা', নারায়ণীয় ধর্ম্মের এই প্রাচীন নাম গীতাতে স্থির রাখা হইয়াছে। গীতায় এই পরিভাষা স্বীকার করিয়া বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমান ভক্তি নামক কোন তৃতীয় স্বতন্ত্র নিষ্ঠা কখনই হইতে পারে না। কারণ, 'কর্ম্ম করা' ও 'না করা অর্থাৎ ছাড়া' (যোগ ও সাংখ্য) এই অস্তি-নাস্তিরূপ দুই পক্ষ ব্যতীত কর্ম্ম-সম্বন্ধে তৃতীয় পক্ষ এক্ষণে অবশিষ্টই থাকে না। তাই, ভক্তিমান্ পুরুষের নিষ্ঠাটি কি, তাহা গীতা অনুসারে স্থির করিতে হইলে, উক্ত ব্যক্তি ভক্তি করে ইহা ধরিয়াই তাহার নির্ণয় না করিয়া, সেই ব্যক্তি কর্ম্ম করে কি করে না তাহারই বিচার করা আবশ্যক। ভক্তি পরমেশ্বর-প্রাপ্তির এক সুগম সাধন; এবং সাধন অর্থে যদি ভক্তিকেই যোগ বলা যায় (গী. ১৪. ২৬) তথাপি তাহা চরম 'নিষ্ঠা' হইতে পারে না। ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর কর্ম্ম করিলে কর্ম্মনিষ্ঠা এবং না করিলে সাংখ্যনিষ্ঠা বলিতে হয়। তন্মধ্যে কর্ম্ম করিবার নিষ্ঠা অধিক শ্রেয়স্কর, ভগবান্ আপনার এই অভিপ্রায় পঞ্চম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্ম করিলে, পরমেশ্বরের জ্ঞান হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়, এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না, তাই কর্ম্ম ত্যাগ করিতেই হইবে;—সন্ন্যাসমার্গীয় কর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ একটা বড় আপত্তি আছে। এই আপত্তি যে সত্য নহে এবং সন্ন্যাসমার্গের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় তাহা

কর্ম্মযোগের দ্বারাও যে প্রাপ্ত হওয়া যায় (গী· ৫· ৫) পঞ্চম অধ্যায়ে তাহা সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে এই সাধারণ সিদ্ধান্তের কোন খোলসা ব্যাখ্যা করা হয় নাই। তাই কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার দ্বারাই শেষে পরমেশ্বরের জ্ঞান হইয়া কিরূপে মোক্ষলাভ হয় এক্ষণে ভগবান সেই অবশিষ্ট মহত্বপূর্ণ বিস্তৃত বিষয়ের সবিস্তার নিরূপণ করিতেছেন। এই কারণেই সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে ভক্তি নামক এক স্বতন্ত্র তৃতীয় নিষ্ঠা তোমাকে বলিতেছি, এরূপ না বলিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে—

> ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
> অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥

"হে পার্থ, আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিয়া এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ সাধন করিবার সময় 'যথা' অর্থাৎ যে প্রকারে আমার সম্বন্ধে নিঃসংশয় পূর্ণ জ্ঞান হইবে তাহা (সেই প্রণালী তোমাকে বলিতেছি) তুমি শোন" (গী· ৭·১); এবং ইহাকেই পরের শ্লোকে 'জ্ঞানবিজ্ঞান' বলা হইয়াছে (গী· ৭. ২)। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ উপরি-প্রদত্ত 'ময্যাসক্তমনাঃ' ইত্যাদি শ্লোকে 'যোগং যুঞ্জন্' অর্থাৎ "কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে" এই পদের খুবই গুরুত্ব আছে। কিন্তু উহার প্রতি কোন টীকাকারই ভাল করিয়া মনোযোগ দেন নাই। 'যোগং' অর্থাৎ সেই কর্ম্মযোগ, যাহা পূর্ব্বের ছয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; এবং এই কর্ম্মযোগ সাধন করিলে যে প্রকার বিধি বা রীতিতে ভগবানসম্বন্ধীয় পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে, সেই রীতি বা বিধির কথা এক্ষণে অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় হইতে বলিতে আরম্ভ করিতেছি, ইহাই এই শ্লোকের অর্থ। অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরবর্ত্তী অধ্যায়ের সহিত সম্বন্ধ কি, তাহা দেখাইবার জন্য এই শ্লোক সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে ইচ্ছাপূর্ব্বকই দেওয়া হইয়াছে। তাই এই শ্লোকের প্রতি উপেক্ষা করিয়া "প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরে ভক্তিনিষ্ঠা স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে" এ কথা বলা নিতান্তই অসঙ্গত। অধিক কি, এইরূপ বলিলেও চলে যে, এইরূপ অর্থ যাহাতে কেহ না করে এই জন্যই "যোগং যুঞ্জন্" এই পদ এই শ্লোকে ইচ্ছা করিয়াই দেওয়া হইয়াছে। গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে কর্ম্মের আবশ্যকতা দেখাইয়া সাংখ্যমার্গ হইতে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ এইরূপ স্থির করা হইয়াছে; এবং তাহার পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে, কর্ম্মযোগে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবার জন্য যাহা আবশ্যক সেই পাতঞ্জল যোগের সাধন বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেই কর্ম্মযোগের বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগের একপ্রকার কসরত কসরৎ। এই অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে আপনার অধীনে রাখা যায় সত্য; কিন্তু মনুষ্যের বাসনাই যদি মন্দ হয় তবে ইন্দ্রিয়গণ অধীনে থাকিলেও কোন লাভ হয় না। কারণ দেখা যায় যে, বাসনা দুষ্ট হইলে, কোন কোন লোক জারণ-মারণরূপ দুষ্কর্ম্মে, এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ সিদ্ধির উপযোগ করিয়া থাকে। তাই ষষ্ঠ অধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাও "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" এইভাবে পরিশুদ্ধ হওয়া চাই (গী· ৬. ২৯); এবং বাসনার এই শুদ্ধি ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপ উপলব্ধি ব্যতীত হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মযোগে যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আবশ্যক তাহা সম্পাদন করিলেও 'রস' অর্থাৎ বিষয়ের অভিরুচি মন হইতে বিলুপ্ত হয় না। এই রস কিংবা বিষয়বাসনার উচ্ছেদ করিতে হইলে পরমেশ্বরের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে হওয়া চাই, এই কথা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলা হইয়াছে (গী. ২·৫৯)। তাই, কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে এই পরমেশ্বরের জ্ঞান যে প্রকারে অর্থাৎ যে বিধির দ্বারা হইতে পারে এক্ষণে ভগবান সপ্তম অধ্যায় হইতে সেই বিধি বিবৃত করিতেছেন। 'কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে' এই পদ হইতে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, কর্ম্মযোগ যখন চলিতে থাকে তখনই এই জ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে; ইহার জন্য কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে হয় না; এবং সেইজন্য কর্ম্মযোগের পরিবর্ত্তে বিকল্প হিসাবে ভক্তি ও জ্ঞানকে মানিয়া এই দুই স্বতন্ত্র মার্গ সপ্তম অধ্যায় হইতে পরে বলা হইয়াছে, এ কথাও নির্ম্মূল হইয়া পড়ে। গীতার কর্ম্মযোগ ভাগবতধর্ম্ম হইতেই গৃহীত হওয়ায়, কর্ম্মযোগে জ্ঞানলাভবিধির যে বর্ণনা আছে তাহা ভাগবত ধর্ম্ম কিংবা নারায়ণীয় ধর্ম্মে কথিত বিধিরই বর্ণনা; এবং এই অভিপ্রায়েই শান্তিপর্ব্বের শেষে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিয়াছেন যে, "প্রবৃত্তিমূলক নারায়ণীয় ধর্ম্ম, এবং তাহার বিধি ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হইয়াছে" (প্রথম প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত শ্লোক দেখ)। বৈশম্পায়নের উক্তি অনুসারে সন্ন্যাসমার্গের বিধিও ইহারই অন্তর্ভূত। কারণ, কর্ম্ম করা ও কর্ম্ম ত্যাগ করা—এই ভেদ এই দুই মার্গের মধ্যে থাকিলেও উভয়েরই একই জ্ঞানবিজ্ঞান আবশ্যক; সেই জন্য দুই মার্গেরই জ্ঞানপ্রাপ্তির বিধি একই হইয়া থাকে। কিন্তু, "কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে" এইরূপ প্রত্যক্ষপদ যখন উপরি উক্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে, তখন ইহাই স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, গীতার সপ্তম ও তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরূপণ মুখ্যতঃ কর্ম্মযোগেরই পরিপূর্ত্তি ও সমর্থনের জন্য করা হইয়াছে, উহারই ব্যাপকতার কারণ উহাতে সন্ন্যাস মার্গেরও বিধিসমূহের সমাবেশ হয়, কর্ম্মযোগ ছাড়িয়া

কেবল সাংখ্যনিষ্ঠার স্বতন্ত্র সমর্থনের জন্য এই জ্ঞানবিজ্ঞান বলা হয় নাই। ইহাও বিবেচনার যোগ্য যে, সাংখ্যমার্গী জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করিলেও কর্ম্ম বা ভক্তির কোনই গুরুত্ব দেন না; এবং গীতাতে তো ভক্তিকে সুগম ও প্রধান বলা হইয়াছে—ইহাই বা কেন; বরঞ্চ অধ্যাত্ম-জ্ঞান ও ভক্তির বর্ণন করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্থানে স্থানে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, 'তুমি কর্ম্ম অর্থাৎ যুদ্ধ কর' (গী. ৮. ৭; ১১. ৩১; ১৬. ২৪; ১৮. ৬)। কাজেই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, গীতার সপ্তম ও পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে নিরূপণ হইয়াছে, উহা পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় অধ্যায়ে কথিত কর্ম্মযোগেরই পরিপূর্ত্তি ও সমর্থনের জন্য বলা হইয়াছে; এখানে কেবল সাংখ্য-নিষ্ঠা বা ভক্তির স্বতন্ত্র সমর্থন বিবক্ষিত নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে পর, কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান গীতার তিন পরস্পর-স্বতন্ত্র বিভাগ হইতে পারে না। শুধু ইহাই নহে; কিন্তু এখন বুঝা যাইবে যে, এই মতও (যাহা কোন কোন লোক প্রচার করেন) কাল্পনিক ও মিথ্যা। তাঁহারা বলেন যে, "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যে তিনটী পদ আছে এবং গীতার অধ্যায়ও আঠারো; তাই, "তিন-ছয় আঠারো" এই হিসাবে গীতার ছয় ছয় অধ্যায়ের তিন সমান খণ্ড করিয়া প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'ত্বম্' পদের, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'তৎ' পদের এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'অসি' পদের বিচার করা হইয়াছে। এই মতকে কাল্পনিক বা মিথ্যা বলিবার কারণ এই যে, গীতায় কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই প্রতিপাদ্য হইয়াছে এবং 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের বিবৃতির বাহিরে গীতায় আর বেশী কিছু নাই, এই একদেশদর্শী পক্ষই এক্ষণে আর দাঁড়াইতে পারে না।

ভগবদ্গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানের বিচার কেন আসিল তাহার এইরূপ একবার মীমাংসা হইলে পর, সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত একাদশ অধ্যায়ের সঙ্গতি সহজে অবগত হইতে পারা যায়। পূর্ব্বে ষষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, যে পরমেশ্বরের জ্ঞান হইতে বুদ্ধি বাসনাবর্জ্জিত ও সম হয়, সেই পরমেশ্বর-স্বরূপের বিচার একবার ক্ষরাক্ষর-দৃষ্টিতে এবং একবার ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-দৃষ্টিতে করা আবশ্যক, এবং তাহা হইতে শেষে এই চরম সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে যে, যে তত্ত্ব পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে। এই বিষয়ই গীতাতে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বর-স্বরূপের এইরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ কখনও ব্যক্ত (ইন্দ্রিয়গোচর) হয়, আর কখন বা অব্যক্ত হইয়া থাকে। এবং তাহার পর, এই দুই স্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি, এবং এই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ হইতে কনিষ্ঠ স্বরূপ কিরূপে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি অনেক প্রশ্নেরও বিচার এই নিরূপণে করা আবশ্যক হয় সেইরূপ আবার, পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইতে বুদ্ধিকে স্থির, সম ও আত্মনিষ্ঠ করিবার জন্য পরমেশ্বরের যে উপাসনা করিতে হয় তাহার মধ্যে ব্যক্তের উপাসনা ভাল কি অব্যক্তের উপাসনা ভাল তাহারও নির্ণয় করা অতি আবশ্যক হয়। এবং সেই সঙ্গে, পরমেশ্বর যখন একমাত্র, তখন ব্যক্ত জগতের মধ্যে নানাত্ব কেন দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও উপপত্তি বোঝানো আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয় সুব্যবস্থিতভাবে বুঝাইবার জন্য এগারো অধ্যায়ের যে প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানের বিচার মোটেই করা হয় নাই এ কথা আমি বলি না। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, এই তিন বিষয় কিংবা নিষ্ঠা স্বতন্ত্র অর্থাৎ তুল্যবল বুঝিয়া গীতার আঠারো অধ্যায়ের ভাইদের ভাগবণ্টনের মতো এই তিনের মধ্যে যে সমান ভাগ-বণ্টন করা হইয়া থাকে তাহা উচিত নহে; কিন্তু জ্ঞান-মূলক ও ভক্তিপ্রধান কর্ম্মযোগরূপ একই নিষ্ঠা গীতার প্রতিপাদ্য; এবং সাংখ্যনিষ্ঠা, জ্ঞানবিজ্ঞান বা ভক্তি, ইহাদের যে নিরূপণ ভগবদ্গীতায় আছে তাহা এক কর্ম্মযোগনিষ্ঠার পূর্ত্তি ও সমর্থনার্থ আনুষঙ্গিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, স্বতন্ত্র বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্য নহে। এক্ষণে এই সিদ্ধান্তানুসারে কর্ম্মযোগের পরিপূর্ত্তি ও সমর্থনের জন্য কথিত জ্ঞানবিজ্ঞানের অধ্যায়-ওয়ারী বণ্টন গীতার অধ্যায়সমূহের ক্রমানুসারে কিরূপে করা হইয়াছে তাহা দেখা যাক্।

সপ্তম অধ্যায়ে ক্ষরাক্ষর জগতের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বিচার আরম্ভ করিয়া ভগবান প্রথমে অব্যক্ত ও অক্ষর পরব্রহ্মের জ্ঞানের বিষয়ে বলিয়াছেন যে, যে এই সমস্ত সৃষ্টিকে—পুরুষ ও প্রকৃতিকে—আমারই পর ও অপর স্বরূপ জানে,এবং যে এই মায়ার বাহিরে অব্যক্ত রূপ উপলব্ধি করিয়া আমাকে ভজনা করে,তাহার বুদ্ধি সম হওয়ায় তাহাকে আমি সদ্গতি দিই; এবং পুনরায় তিনি আপন স্বরূপের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে সমস্ত দেবতা,সমস্ত ভূত, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত কর্ম্ম, এবং সমস্ত অধ্যাত্ম আমিই, আমা ছাড়া এই জগতে আর কিছুই নাই। তাহার পর, অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভে, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ, অধিদৈব ও অধিভূত কি, তাহার অর্থ আমাকে বল, অর্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন করায়, এই সকল শব্দের অর্থ বলিয়া ভগবান বলিয়াছেন যে, এইরূপ আমার স্বরূপ যে ব্যক্তি উপলব্ধি করিয়াছে তাহাকে আমি বিস্মৃত হই না। এইরূপ বর্ণনার পর, সমস্ত জগতে অবিনাশী বা অক্ষর তত্ত্ব কি; সমস্ত জগতের সংহার কখন ও কিরূপে হয়; এবং পরমেশ্বর-স্বরূপের জ্ঞান যাহার হইয়াছে সেই ব্যক্তি কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়,

এবং জ্ঞান ব্যতীত শুধু কাম্য কর্ম্ম যে ব্যক্তি করে তাহার কোন্ গতি হয়, এই সকল বিষয়ের সংক্ষেপে বিচার আছে। নবম অধ্যায়েও ঐ বিষয়ই চলিয়াছে। এই অধ্যায়ে ভগবান উপদেশ দিয়াছেন যে, চারিদিকে পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত অব্যক্ত পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপকে ভক্তির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া অনন্যভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রত্যক্ষগম্য ও সুলভ মার্গ বা রাজমার্গ, এবং ইহাকেই রাজবিদ্যা বা রাজগুহ্য বলে। তথাপি এই তিন অধ্যায়ে মধ্যে মধ্যে, জ্ঞানবান বা ভক্তিমান ব্যক্তিকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, কর্ম্মমার্গের এই প্রধান তত্ত্ব ভগবান বলিতে বিস্মৃত হন নাই। উদাহরণ যথা :—"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ" এই জন্য সর্ব্বদা নিজের মনে আমাকে স্মরণ রেখো এবং যুদ্ধ কর, এইরূপ অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (৮. ৭); আবার "সমস্ত কর্ম্ম আমাকে অর্পণ করিলে কর্ম্মের শুভাশুভ ফল হইতে তুমি মুক্ত হইবে" এইরূপ নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (৯. ২৭, ২৮)। সমস্ত জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন এবং উহা আমারই রূপ, উপরে এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাই দশম অধ্যায়ে এইরূপ অনেক উদাহরণ দিয়া অর্জ্জুনকে ভালরূপেই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, 'জগতের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ বস্তু আমারই বিভূতি'। অর্জ্জুনের প্রার্থনা অনুসারে একাদশতম অধ্যায়ে ভগবান তাঁহাকে নিজের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া (আমিই) পরমেশ্বর চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এই কথার সত্যতা অর্জ্জুনের চক্ষের সম্মুখে বিন্যাসপূর্ব্বক তাহার উপলব্ধি করাইয়া দিলেন। কিন্তু এই প্রকার বিশ্বরূপ দেখাইয়া এবং 'সমস্ত কর্ম্ম আমিই করাইতেছি' অর্জ্জুনের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া, ভগবান তখনই বলিলেন যে, "প্রকৃত কর্ত্তা তো আমিই এবং তুমি উপলক্ষ্য মাত্র, অতএব নিঃশঙ্ক হইয়া যুদ্ধ কর" (গী. ১১. ৩৩)। সমস্ত জগতে একই পরমেশ্বর আছেন ইহা এই প্রকারে সিদ্ধ হইলেও অনেক স্থানে পরমেশ্বরের অব্যক্ত স্বরূপকেই মুখ্য মানিয়া বর্ণন করা হইয়াছে যে,"আমি অব্যক্ত, মূর্খ লোকেরা আমাকে ব্যক্ত মনে করে" (৭. ২৪); "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি" (৮. ১১) বেদবেত্তারা যাঁহাকে অক্ষর বলে; "অব্যক্তকেই অক্ষর বলে" (৮. ২১); "আমার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া আমি মনুষ্যদেহধারী এইরূপ মূঢ় লোকেরা মনে করে" (৯. ১১); "বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা শ্রেষ্ঠ" (১০. ৩২); এবং অর্জ্জুনের কথন অনুসারে "ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ" (১১. ৩৭)। এইজন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে, 'পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে ব্যক্তের অথবা অব্যক্তের উপাসনা করিতে হইবে'? তখন ভগবান নবম অধ্যায়ে বর্ণিত ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা সুগম, এইরূপ আপন মত বলিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের যেরূপ বর্ণনা আছে সেইরূপই পরম ভগবদ্‌ভক্তের অবস্থার বর্ণনা করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন।

কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান, গীতার এই তিন স্বতন্ত্র খণ্ড না করা হইলেও, সপ্তম অধ্যায় হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে বিষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ভক্তি ও জ্ঞান এই দুই পৃথক্ বিভাগ সহজেই হয়, এইরূপ কাহারও কাহারও মত। দ্বিতীয় ষড়ধ্যায়ী ভক্তিমূলক, এইরূপ তাঁহারা বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই মতও যে সত্য নহে, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। কারণ, সপ্তম অধ্যায় ক্ষরাক্ষর জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে, ভক্তি হইতে নহে। এবং যদি বলা যায় যে,দ্বাদশতম অধ্যায়ে ভক্তির বর্ণনা শেষ হইয়াছে, তবে আমি দেখি যে, পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ ভক্তিরই এই উপদেশ করিয়াছেন যে, বুদ্ধির দ্বারা যাহারা আমার স্বরূপ অবগত হয় নাই তাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক "অন্যের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমার ধ্যান করিবে" (গী. ১৩. ২৫), "যে আমাকে অব্যভিচারিণী ভক্তি করে সে-ই ব্রহ্মীভূত হয়" (১৪. ২৬), "যে আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে সে আমাকেই ভক্তি করে" (গী. ১৫. ১৯), এবং শেষে অষ্টাদশতম অধ্যায়ে পুনরায় ভক্তিরই এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন যে, "সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়িয়া তুমি আমাকে ভজনা কর" (গী. ১৮. ৬৬)। তাই, দ্বিতীয় ষড়ধ্যায়ীতেই ভক্তির উপদেশ আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। সেইরূপ আবার, জ্ঞান হইতে ভক্তি স্বতন্ত্র, ভগবানের যদি এইরূপ অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রস্তাবনা করিয়া (৪. ৩৪-৩৭) সপ্তম অধ্যায়ের অর্থাৎ উক্ত আপত্তিকারীদিগের মতে ভক্তিমূলক ষড়ধ্যায়ীর আরম্ভে ভগবান বলিতেন না যে, সেই 'জ্ঞান-বিজ্ঞানই' তোমাকে এখন বলিতেছি (৭. ২)। ইহার পরবর্ত্তী নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষাবগম্য ভক্তিমার্গের কথা বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু অধ্যায়ের আরম্ভেই "বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি" (৯. ১) এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের মধ্যেই গীতোক্ত ভক্তির সমাবেশ করা হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে ভগবান্ স্বকীয় বিভূতির বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু একাদশতম অধ্যায়ের আরম্ভেই অর্জ্জুন তাহাকেই 'অধ্যাত্ম' বলিয়াছেন (১১. ১); এবং পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের বর্ণনা করিতে করিতে মধ্যে

মধ্যে ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্তস্বরূপ শ্রেষ্ঠ এইরূপ বিধান আছে, ইহাও উপরে বলা হইয়াছে। এই সকল বিষয় হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন এই প্রশ্ন করিলেন যে, উপাসনা ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত পরমেশ্বরের করিতে হইবে? তখন অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যক্তের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি সুগম এইরূপ উত্তর দিয়া ভগবান ত্রয়োদশতম অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের 'জ্ঞানের' কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভের ন্যায়, চতুর্দ্দশতম অধ্যায়ের আরম্ভেও বলিলেন যে, "পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্" (১৪. ১)—পুনর্ব্বার তোমাকে সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানই সম্পূর্ণ করিয়া বলিতেছি। এই জ্ঞানের কথা বলিবার সময়, ভক্তির সূত্র বা সম্বন্ধও বজায় রাখিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, জ্ঞান ও ভক্তির কথা পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ আলাদা আলাদা করিয়া বলা ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু সপ্তম অধ্যায় হইতে আরব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যেই দুই-টিকে একত্র গাঁথা হইয়াছে। ভক্তি ভিন্ন এবং জ্ঞান ভিন্ন, ইহা বলা সেই সেই সম্প্রদায়ের অভিমানমত্ততার ভ্রান্ত উক্তি; গীতার অভিপ্রায় সেরূপ নহে। অব্যক্ত-উপাসনাতে (জ্ঞানমার্গে) অধ্যাত্মবিচারের দ্বারা পরমেশ্বর-স্বরূপের যে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়, তাহাই ভক্তি-মার্গেও আবশ্যক হয়; কিন্তু ব্যক্ত-উপাসনাতে (ভক্তি-মার্গে) আরম্ভে ঐ জ্ঞান অন্যের নিকট হইতে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে (১৩. ২৫), তাই, ভক্তিমার্গ প্রত্যক্ষাবগম্য এবং সাধারণত সকল লোকেরই পক্ষে অনায়াসসাধ্য (৯. ২), এবং জ্ঞানমার্গ (বা অব্যক্তোপাসনা) কষ্টকর (১২. ৫)—ইহা ছাড়া এই দুই সাধনের মধ্যে, গীতা আর কোন ভেদ করেন নাই। পরমেশ্বর-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধিকে সম করা—কর্ম্মযোগের এই যে সাধ্য বিষয়, তাহা এই দুই সাধনের দ্বারা সমানই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই ব্যক্তোপাসনাই কর আর অব্যক্তোপাসনাই কর, দুই-ই ভগবানের সমান গ্রাহ্য। তথাপি জ্ঞানী ব্যক্তিরও উপাসনার ন্যূনাধিক আবশ্যকতা থাকায়, চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে ভক্তিমান জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ এইরূপ বলিয়া (গী. ৭. ১৭), ভগবান জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ অপসারিত করিয়া দিয়াছেন। যাই হৌক, জ্ঞানবিজ্ঞানের বর্ণনা যখন চলিতে থাকে তখন প্রসঙ্গক্রমে কোন অধ্যায়ে ব্যক্তোপাসনার আর অপর কোন অধ্যায়ে অব্যক্ত উপাসনার বিশেষ বর্ণনা অপরিহার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ সন্দেহ যেন না হয় যে, এই দুইটী পৃথক পৃথক, এই কারণে পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের বর্ণনা যখন চলিতেছিল সেই সময়েই ব্যক্তস্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্তের শ্রেষ্ঠতা, এবং অব্যক্তের বর্ণনা যখন চলিতেছিল সেই সময়ে ভগবান ভক্তির আবশ্যকতা বলিতে ভুলেন নাই। এখন বিশ্বরূপের ও বিভূতির বর্ণনাতেই তিন চার অধ্যায় লাগিয়া যাওয়ায় এই তিন চার অধ্যায়কে (ষড়ধ্যায়ীকে নহে) মোটামুটিভাবে 'ভক্তিমার্গ' নাম দেওয়া যদি কাহারও ভাল লাগে, তবে সেরূপ করিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু যাহাই বল না কেন, ইহা নিশ্চিত স্বীকার করিতেই হইবে যে, গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানকে না পৃথক করা হইয়াছে, না এই দুই মার্গকে স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে। সংক্ষেপে উক্ত নিরূপণের এই ভাবার্থ মনে রাখিতে হইবে যে, কর্ম্মযোগে যাহা প্রধান সেই সাম্যবুদ্ধি লাভ করিতে হইলে, পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপী স্বরূপের জ্ঞান হওয়া চাই; তারপর এই জ্ঞান ব্যক্তের উপাসনা দ্বারাই হউক বা অব্যক্তের উপাসনা দ্বারাই হউক, সুগমতা ছাড়া ইহার মধ্যে আর কোন ভেদ নাই; এবং গীতাতে সপ্তম হইতে সপ্তদশতম অধ্যায় পর্য্যন্ত, সমস্ত বিষয়েরই 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' বা 'অধ্যাত্ম' এই একই নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

যাক; পরমেশ্বরই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বা ক্ষরাক্ষর জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, ভগবান তাহা বিশ্বরূপ প্রদর্শনের দ্বারা অর্জ্জুনের 'চর্ম্মচক্ষুর' প্রত্যক্ষ অনুভব করাইয়া দিলে পর, এই পরমেশ্বরই পিণ্ডে অর্থাৎ মনুষ্যের শরীরে বা ক্ষেত্রে আত্মারূপে অবস্থিত এবং এই আত্মার অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই পরমেশ্বরেরই (পরমাত্মার) জ্ঞান এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার ত্রয়োদশতম অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমে পরমাত্মার অর্থাৎ পরব্রহ্মের "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপনিষদের ভিত্তিতে বর্ণনা করিয়া পরে বলা হইয়াছে যে, এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারই 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' নামক সাংখ্যবিচারে অন্তর্ভূত হইয়াছে; এবং শেষে ইহা বলা হইয়াছে যে, 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষের' ভেদ উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বগত নির্গুণ পরমাত্মাকে যিনি 'জ্ঞানচক্ষু'র দ্বারা দেখিয়াছেন তিনি মুক্ত হন। তথাপি তাহার মধ্যেও কর্ম্মযোগের এই সূত্র স্থির রাখা হইয়াছে যে, "সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতি করে, আত্মা কর্ত্তা নহে—ইহা জানিলে কর্ম্ম বন্ধন হয় না" (১৩. ২৯); এবং "ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি" (১৩. ২৪) ভক্তির এই সূত্রও বজায় রহিয়াছে। চতুর্দ্দশতম অধ্যায়ে এই জ্ঞানের কথা সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে বর্ণন করা হইয়াছে যে, একই আত্মা বা পরমেশ্বর সর্ব্বত্র থাকিলেও সত্ত্ব, রজ ও তম প্রকৃতির গুণসমূহের ভেদ প্রযুক্ত জগতে বৈচিত্র্য কিরূপে উৎপন্ন হয়। পরে বলা হইয়াছে যে প্রকৃতির এই খেলা জানিয়া এবং নিজেকে কর্ত্তা নহে উপলব্ধি করিয়া, ভক্তিযোগে যে পরমেশ্বরের সেবা করে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ত্রিগুণাতীত কিংবা মুক্ত। শেষে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উপর স্থিত-

প্রজ্ঞ ও ভক্তিমান পুরুষের অবস্থায় সমানই ত্রিগুণাতীতের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতিগ্রন্থসমূহে পরমেশ্বরের কখন কখন বৃক্ষরূপে যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চদশ অধ্যায়ের আরম্ভে তাহারই বর্ণনা করিয়া ভগবান বলিয়াছেন যে, সাংখ্য যাহাকে, 'প্রকৃতির বিস্তার বলে, এই অশ্বত্থ বৃক্ষ সেই বিস্তারকেই বুঝায়; এবং শেষে ভগবান অর্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, ক্ষর ও অক্ষর এই দুয়ের অতীত যে পুরুষোত্তম তাঁহাকে জানিয়া তাঁহাকে 'ভক্তি' করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হয় এবং তুমিও তাহাই কর। ষোড়শতম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিভেদ প্রযুক্ত জগতে যেরূপ বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় সেইরূপ মনুষ্যের মধ্যেও দৈবী সম্পত্তিবিশিষ্ট ও আসুরী সম্পত্তিবিশিষ্ট, এইরূপ দুই ভেদ হয়; এইরূপ বলিয়া, তাহাদের কর্ম্ম কিরূপ এবং তাহারা কোন্ কোন্ গতি প্রাপ্ত হয় তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলে পর সপ্তদশতম অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির গুণবৈষম্য প্রযুক্ত যে বৈচিত্র্য হয় তাহা শ্রদ্ধা, দান, যজ্ঞ, তপ ইত্যাদি কর্ম্মের মধ্যেও কিরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পর বলা হইয়াছে যে, 'ওঁতৎসৎ' এই ব্রহ্ম নির্দ্দেশের মধ্যে, 'তৎ' এই পদের অর্থ নিষ্কামবুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম, এবং 'সৎ' এই পদের অর্থ 'ভাল কিন্তু কাম্যবুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম,' এবং এই অর্থ অনুসারে ঐ সাধারণ ব্রহ্মনির্দ্দেশও কর্ম্মযোগেরই অনুকূল। সারকথা, সপ্তম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশতম অধ্যায় পর্য্যন্ত এগারো অধ্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, জগতে চতুর্দ্দিকে একই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত আছেন—তুমি তাঁকে বিশ্বরূপদর্শনেই উপলব্ধি কর কিংবা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই উপলব্ধি কর; শরীরের মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞও তিনি এবং ক্ষর জগতে অক্ষরও তিনি; তিনিই দৃশ্যজগৎ ভরিয়া আছেন এবং তাহারও তিনি বাহিরে কিংবা অতীত; তিনি এক হইলেও প্রকৃতির গুণভেদ প্রযুক্ত ব্যক্ত জগতে নানাত্ব বা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়; এবং এই মায়া হইতে কিংবা প্রকৃতির গুণভেদের কারণেই জ্ঞান, শ্রদ্ধা, তপ, যজ্ঞ, ধৃতি, দান ইত্যাদি এবং মনুষ্যের মধ্যেও অনেক ভেদ হইয়া থাকে; কিন্তু এই সমস্ত ভেদের মধ্যে যে ঐক্য আছে তাহা উপলব্ধি করিয়া সেই এক ও নিত্য তত্ত্বের উপাসনার দ্বারা—আবার সেই উপাসনা ব্যক্তেরই হউক বা অব্যক্তেরই হউক—প্রত্যেকে আপন বুদ্ধিকে স্থির ও সম করিয়া সেই নিষ্কাম, সাত্ত্বিক কিংবা সাম্যবুদ্ধি হইতেই স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত সমস্ত ব্যবহার জগতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া করিতে হইবে। এই জ্ঞানবিজ্ঞান এই গ্রন্থের অর্থাৎ গীতারহস্যের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে আমি সবিস্তর প্রতিপাদিত করিয়াছি বলিয়া, সপ্তম হইতে সপ্তদশতম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার এই প্রকরণে দিয়াছি—অধিক বিস্তৃতরূপে দিই নাই। গীতার অধ্যায়সঙ্গতি দেখানই উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হওয়ায়, তাহারই জন্য যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুই এখানে প্রদত্ত হইয়াছে।

কর্ম্মযোগমার্গে কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, এই বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও সম করিবার জন্য পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বের অর্থাৎ সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মৈক্যের যে "জ্ঞানবিজ্ঞান" আবশ্যক, তাহারই বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত এই বিষয়ের নিরূপণ করা হইল যে অধিকার-ভেদানুসারে ব্যক্তের কিংবা অব্যক্তের উপাসনা দ্বারা এই জ্ঞান হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে পর, বুদ্ধি স্থৈর্য্য ও সমতা প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্ম ত্যাগ না করিলেও শেষে তাহার দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। ইহারই সঙ্গে ক্ষরাক্ষর ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞেরও বিচার করা হইয়াছে। তথাপি বুদ্ধি এইরূপ সম হইবার পরেও কর্ম্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা ফলাশয় ছাড়িয়া লোকসংগ্রহার্থে আমরণ কর্ম্ম করিতে থাকাই অধিক শ্রেয়স্কর, ইহা ভগবান্ নিশ্চিতরূপে বলিয়াছেন (গী. ৫, ২)। তাই স্মৃতিগ্রন্থসমূহে বর্ণিত 'সন্ন্যাসাশ্রম' এই কর্ম্মযোগে নাই এবং সেইজন্য মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থ এবং কর্ম্মযোগের বিরোধ হওয়া সম্ভব। এইরূপ এক সংশয় মনে উপস্থিত করিয়া 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ'—এই দুয়ের রহস্য কি, অর্জুন অষ্টাদশতম অধ্যায়ের আরম্ভে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন। ভগবান ইহার এই উত্তর দিতেছেন যে, সন্ন্যাসের মূল অর্থ 'ত্যাগ করা' হওয়ায় এবং কর্ম্মযোগমার্গে কর্ম্ম ত্যাগ না করিলেও ফলাশা ত্যাগ করা হইয়া থাকে বলিয়া কর্ম্মযোগ তত্ত্বতঃ সন্ন্যাসই; কারণ সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করিয়া ভিক্ষা না করিলেও বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের সূত্রোক্ত তত্ত্ববুদ্ধিকে নিষ্কাম রাখা—কর্ম্মযোগেও বজায় থাকে। কিন্তু ফলাশা চলিয়া গেলে স্বর্গলাভেরও আশা না থাকায় যাগযজ্ঞাদি শ্রৌত কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা কি, এইরূপ আর এক সংশয় এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার উত্তরে ভগবান আপন নিশ্চিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উক্ত কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধিকারক হওয়ায় তাহাও অন্য কর্ম্মের সঙ্গেই নিষ্কামবুদ্ধিতে করিয়া লোক-সংগ্রহার্থ যজ্ঞচক্র বজায় রাখা আবশ্যক। অর্জুনের প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দেওয়া হইলে পর, প্রকৃতি-স্বভাবানুরূপ জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ, ইহাদের যে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ হইয়া থাকে তাহা নিরূপণ করিয়া গুণ-বৈচিত্র্যের বিষয়টা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাহার পর স্থির করা হইয়াছে যে, নিষ্কাম

কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ত্তা, আসক্তিরহিত বুদ্ধি, অনাসক্তিসম্ভূত সুখ এবং "অবিভক্তং বিভক্তেষু" এই নীতি অনুসারে উৎপন্ন আত্মৈক্যজ্ঞানই সাত্ত্বিক বা শ্রেষ্ঠ। এই তত্ত্ব অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণোরও উপপত্তি বিবৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত কর্ম্ম সাত্ত্বিক অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া করিলেই মনুষ্য এই জগতে কৃতকৃত্য হইয়া শেষে শান্তি ও মোক্ষ লাভ করে। শেষে ভগবান অর্জ্জুনকে ভক্তিমার্গের এই নিশ্চিত উপদেশ দিয়াছেন যে, কর্ম্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম হওয়ায় তাহা ছাড়িব মনে করিলেও ছাড়া যায় না; তাই, পরমেশ্বরই সর্ব্বকর্ত্তা ও কারয়িতা ইহা বুঝিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া, সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাক; আমিই সেই পরমেশ্বর, আমার উপর বিশ্বাস রাখিয়া আমাকে ভজনা কর, আমি সমস্ত পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব। এইরূপ উপদেশ করিয়া ভগবান গীতায় প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের নিরূপণ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। সারকথা, ইহলোক ও পরলোক এই দুয়েরই বিচার করিয়া জ্ঞানবান ও শিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা প্রচারিত 'সাংখ্য' ও 'কর্ম্মযোগ', এই দুই নিষ্ঠা হইতেই গীতার উপদেশ সুরু হইয়াছে; তন্মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের নির্ণয় অনুসারে যে কর্ম্মযোগের মহত্ব অধিক, যে কর্ম্মযোগের সিদ্ধির নিমিত্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগের বর্ণনা করা হইয়াছে, যে কর্ম্মযোগের আচরণবিধির বর্ণন পরবর্ত্তী এগারো অধ্যায়ে (৭ম হইতে ১৭ তম পর্য্যন্ত) পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-জ্ঞানপূর্ব্বক সবিস্তর নির্ণয় করা হইয়াছে, এবং ইহা বলা হইয়াছে যে ঐ বিধি আচরণ করিলে পর পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইয়া শেষে মোক্ষলাভ হয়, সেই কর্ম্মযোগের সমর্থন অষ্টাদশতম অধ্যায়ে অর্থাৎ শেষেও আছে; এবং মোক্ষরূপ আত্মকল্যাণের বাধা না হইয়া পরমেশ্বরার্পণ-পূর্ব্বক কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে স্বধর্ম্মানুসারে লোকসংগ্রহার্থ সমস্ত কর্ম্ম করিবার যে এই যোগ বা যুক্তি, তাহার শ্রেষ্ঠত্বের এই ভগবৎপ্রণীত উপপাদন অর্জ্জুন যখন শুনিলেন, তখনই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা করিবার স্বীয় প্রথম সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া—কেবল ভগবান্ বলিতেছেন বলিয়া নহে, কিন্তু—কর্ম্মাকর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান হওয়ায় স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই গীতার আরম্ভ হইয়াছিল এবং গীতার শেষও সেইরূপ হইয়াছে (গী· ১৮·৭৩)।

(ক্রমশঃ)

৫

Brahmo Dharma.

PART I.

CHAPTER I.

1. The divine spark of the knowledge of Brahma dwells within every heart; in every soul the infinite good will of Brahma is written in indelible characters. We have only to kindle this flame by the contemplation of universal phenomena, when God the Infinite Good stands revealed to us. He has imp essed His holy image of good on all material things and on the mind of man. Those wise and fortunate men,—sinless and noble-minded,—who have striven and succeeded in realising this, they know Brahma; and those who, after such realisation, impart their knowledge to others, they are the exponents of Brahma. To know and to tell others about Brahma, it is not necessary to belong to any particular age, race or country. The men of God of all countries have a right to discourse upon Brahma. In this first part of the Brahmo Dharma are collected those eternal verities and self-evident truths, which have been taught by the ancient sages of India with regard to Brahma. That is why it begins with the words, "So say the Brahmavadins."

2. He from whom all things moveable and immoveable have sprung, upon whom all things depend for their existence, not an atom of which would remain, if He so wills it,—He is Brahma, He is Truth, He is our Lord. That Almighty Lord's will is true. His resolves are true; as He wishes, so it comes to pass. That Perfect Being from whose energy all things have been created and each received their respective forces,—should He wish to destroy them, then all these things together with their forces, would become merged in His energy and revert to Him,—not a sign of them would be seen anywhere. God alone is the creator, preserver and destroyer. We can, indeed, fashion some wonderful machine, if we are given certain things, by examining their properties and combining them in due proportion; we can also easily destroy it; but we do not possess the power of creating or destroying one single grain of sand. The

one and absolute God alone has the power of creation, preservation and destruction.

3. That indefinable Lord who is Creator, Preserver and Destroyer, has no particular name. Those ancient Brahmavadi sages, who have tasted the unalloyed bliss of feeling the presence of that supremely great, all-pervading all-indwelling benign Being within their hearts, they have pronounced Him to be joy itself. When our souls melt and sink into the ineffable beauty of his love, then we too cannot but call him Joy.

4. That Lord, who is the infinite source of wisdom, is not a finite object; He is neither mind nor matter, therefore the mind cannot grasp Him; and since the mind cannot grasp Him, words also cannot express Him. The mind tries to think of Him, and desists; words try to describe Him, and fail. That Infinite Being can only be defined as the mind of minds, the word of words, the conscious cause and refuge of all things. He who enjoys the heavenly bliss of seeing constantly within his soul this indefinable and all-pervading joyous entity,—all his desires are at an end. He rests satisfied in union with his beloved, and has attained fulfilment. He becomes His willing and devoted slave, and is diligent in the performance of deeds that please Him. He never fails to act thus, through fear of contumely; insufferable indignities, undeserved reproaches, or irrepressible tyranny. It is an easy matter for him to sacrifice his life in fulfilling the behests of his beloved,—so how can he know fear? He has been released from fear by placing his life in the hands of Him who gave it,—and for him even dread Death the destroyer holds no terrors.

5. That benign Being, by reaching whose fount of love His creatures are immersed in ecstatic happiness,—what can words call Him but divine joy.

6. It is because this Supreme Spirit exists, that this incomparable universe has been created, and all creatures have obtained their means of sustenance. Without Him all this could never have been done. If that Supreme Holiness, the creator and refuge of all things, had not created this world and established such perfect law and order, then where would be the earth and the heavens, all these living and moving creatures and their doings, all happiness and prosperity? He it is who scatters delight among all creatures. We are blest in the enjoyment of every kind of pleasure which the beneficent protector of the universe has ordained for our happiness from each particular thing. The sight of nature's beauty, the taste of good food, the benefits of parental affection and loving friendship, the cultivation of knowledge, the performance of righteous deeds,—and all suchlike things from which we derive various kinds of pleasure by various means,—everything is by His grace. Oh, how great is His compassion! Not satisfied only with granting us all kinds of material joys, if we so beseech Him, He gives us even Himself, and thus soothes our souls, fills our minds, and satisfies our longing.

To those calm-minded saints who, unsatisfied with the pleasures of this world, desire Him night and day, He inwardly appears without delay, wipes away the sorrowful tears from their eyes, and makes the withered lotus of their hearts bloom again with plentiful showers of divine bliss. Ah! he alone knows His glory, who has even for a moment enjoyed the unalloyed bliss of seeing that immortal and perfect Being within his soul.

7. Like the frightened child which secures itself from fear in its mother's lap, so are we safe from the terrors of this fearsome world by taking refuge in the all-embracing lap of that divine Being. Free from all fear, and knowing Him to be our only friend and guardian we then dedicate ourselves to that supreme Lord, who sees all yet is not seen, who contains all yet is not contained, who is the refuge of all; and obedient to His commands, we walk in His appointed path with dauntless hearts.

8. He who believes not in the goodness of God, and who knows not His real intentions, even though he live in this well-ordered and stable universe, yet is he a prey to various fears, like one imprisoned in a dark cell; but he who sees reflected through the universe the holy light of that supreme being, the source of all goodness,—he no longer knows any fear.

9. Of all desirable states in the next world, God is the highest ; to attain Him is virtue's last reward. Of all riches, God is the most precious ; he who has gained this wealth, thinks nothing of any other possesion. Of all worlds, God is our best refuge; he who dwells in Him, covets not the fleeting and imperfect joys of any frail and finite world. Of all delights, the attainment of God is our greatest delight ; compared to this ineffable bliss, all other earthly delights are but infinitesimal, yet all creatures live upon this infinitesimal atom of delight.

আদর্শ
বা
দাদা ঠাকুর

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। কাল-অপরাহ্ন।

(দাদাঠাকুরকে পুষ্পমাল্যচন্দনাদিতে সজ্জিত করিয়া সকলের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

পুণ্যোজ্জ্বল, স্নিগ্ধ ললাটে
অঙ্কিত করি গৌরবে ;
অপ্রধৃষ্য, বিজয় চিহ্ন
মণ্ডিত মহা বৈভবে।
মহিমাদীপ্ত ময়ূখমাখা
অবিনশ্বর যশোছবি আঁকা
ধরিয়া মহতী কীর্ত্তি-পতাকা
এসেছ জীবন-আহবে
অদ্ভুত তব কর্ম্ম-যজ্ঞ
বিস্মিত হেরি মনুজ বর্গ
আপনি নামিয়া এসেছে স্বর্গ
মর্ত্ত্যে তোমারি উদ্ভবে।
বঙ্গগগনে দিব্য সূর্য্য
বিশ্ববাসীর হৃদয় পূজ্য
মহাসমারোহে বাজায়ে তূর্য্য
বরিব তোমারে উৎসবে।
হে মানি, তোমারে মহৎ মান
আপনি যে "মান" করেছে দান
সে মানে করিতে মহা মহীয়ান
দীনের কি দান সম্ভবে ?

দাদা। দ্যাখ্ তোরা অমন কর্ব্বি তো আমি চলে' যাবো।

সেবা। দাদাঠাকুর আজ একটু অবাধ্য হব।

দাদা। তা হলে' মার খাবি। তোরা অমন কর্‌ছিস্ কেন ? ছেলেরা কৈ ? আমায় তাদের কাছে যেতে দে। তারা তোদের মত আমায় নিয়ে অমন করবে না। তাদের কেবল আমোদ—আমার তাই ভালো লাগে। এ সব মান দেওয়া, গণ্ডগোল,—এ হলে' আমি ছুটে পালাব।

সেবা। এ আমরা আজ কর্‌বই।

দাদা। শেষটা কিন্তু দৌড় দেব। এই দৌড় দিলুম বুঝি।

সেবা। দৌড় দিয়ে আর পালাবার যো নেই। যে যায়গায় বসায়েছি, সেখান দিয়ে কেউ যেতে পারে না।

(সার্ব্বভৌম, ন্যায়রত্ন ও তর্কালঙ্কারের প্রবেশ)

তর্ক। দাদাঠাকুর, তোমাকে আমরা এতদিন চিন্‌তে পারিনি। তুমি মহৎ আমরা ক্ষুদ্র। আমাদের ক্ষমা কর।

দাদা। (উঠিয়া) আমি আপনাদের দাস (পদধূলি-গ্রহণ)। সেবাব্রত, এ সব গণ্ডগোলের মূল তুই।*

সেবা। (হাসিতে হাসিতে) দোষ আমার না আপনার ?

তর্ক। দাদাঠাকুর, তুমি আজ জগতে এক মহৎ আদর্শ দেখালে। এখন প্রার্থনা কর, বিশ্ব যেন এ আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে।

দাদা। আমায় ও সব বলে' লজ্জা দিবেন না। আমি অধম। আপনাদের দাসানুদাস। আমি কি করেছি ? কি কর্‌তে পারি ? যার কর্ম্ম তিনি করেন। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমায় আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন।

তর্ক। তোমায় পদধূলি দেব ? না দাদাঠাকুর, ও কথা বলো না। তুমি আমাদের প্রাণে শক্তি সঞ্চার কর, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যে, যেন তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে' ধন্য হ'তে পারি। দাদাঠাকুর ধর, আজ এই শ্রদ্ধাচন্দনাক্ত মাল্য গ্রহণ কর।

(গলায় মালা পরাইয়া দিলেন ও দাদাঠাকুর প্রণত হইলেন)

(রহিমদ্দীর প্রবেশ)

রহিম। দাদাঠাকুর (কাঁদিয়া ফেলিল)

দাদা। (ছুটিয়া গিয়া বক্ষে ধরিলেন) রহিম, রহিম, ভাই তুই আয়, আমার বুকে আয়। তুই আমায় আলিঙ্গন কর ; রহিম আমি তোকে একটু কালের জন্যও

ভুলতে পারিনি। একি রহিম, তুই তো আর সে রহিম নেই! তুই যে বড় শুকিয়ে গেছিস্। আপনারা দেখুন, এই সেই রহিমদ্দী যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না বলে' সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে।

তর্ক। এমন মানুষ! এস ভাই আমরা সবাই তোমাকে আলিঙ্গন করব। তোমারো গলায় আজ মালা দেব। (মাল্য দান)

রহিম। আমায় অত করবেন না। সইতে পারবো না। দেমাক হবে। দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর!!

দাদা। আর আমায় ডাকলে কি হবে? চিনে ফেলেছে। লুকোচুরি আর ক'দিন চলে?

(দ্বারদেশে নিধিরাম ও ফেলারামের প্রবেশ)

নিধি। আমরা আসতে পারব তো?

দাদা। কে আসচে? দেখুন দেখুন। (উঠিয়া) এস ভাই, সবাই এস, কারো আসতে বাধা নেই।

(নিধিরামের প্রবেশ)

দাদা। ও কে—নিধিরাম? এসো ভাই (আলিঙ্গন)

নিধি। দাদাঠাকুর! (পায়ের কাছে দুইটী পেয়ারা রাখিয়া)

দাদা। ও আবার কি?

নিধি। এই দুইটী পাকা পেয়ারা। দাদাঠাকুর এই গাছের পেয়ারা খেয়ে তুমি একদিন বড় খুসী হয়েছিলে। তুমি চলে' গেলে পর আর এ গাছের তলায় যাইনি। গাছের দিকে চাইলে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ত। তুমি আসবে বলে' এ দু'টো বড় কষ্ট করে' রেখেছি।

দাদা। নিধিরাম, এত স্নেহ, এত ভালবাসা দিয়ে কি তোরা আমায় পাগল করে' দিবি? ঠাকুর, এরা আমায় এত স্নেহ করে কেন? এদের আমি কি দেব? এদের নিয়ে আমি কি করব?

(ধনদাস রায়ের প্রবেশ)

ধন। (দুর্ব্বলভাবে যষ্টি ভর করিয়া) দাদাঠাকুর কৈ? (কেহ তাহার কথার উত্তর দিল না। সবাই মুখ ফিরাইয়া রহিল)।

দাদা। (উঠিয়া) এই যে। আসুন। (প্রণত হইলেন)

ধন। আমি আসতে কি পারব? দাদা ঠাকুর, কৈ তুমি? আমি প্রায় অন্ধ হয়েছি। আমার কাছে এস।

(দাদাঠাকুর নিকটে গেলেন)

ধন। আমি একটা কথা বলতে এসেছি।

দাদা। আদেশ করুন।

ধন। বলতে পারব তো? আমি কি বলবার মুখ রেখেছি?

দাদা। সে কি!

ধন। দাদাঠাকুর, আমায় ক্ষমা কর। আর একটু কালের জন্য ভুলে যাও—আমি পীড়নকারী আর তুমি পীড়িত। আজ আমি শুধু পাতকী, লাঞ্ছিত ধনদাস আর তুমি আমার ইষ্টদেব। দাদাঠাকুর, আজ তোমার কাছে এসেছি প্রাণের আগুন নিভাতে। বল আমায় ক্ষমা করবে কি না?

দাদা। আপনি কোনো অপরাধ করেন নি। কোনো অত্যাচার করেন নি।

ধন। অপরাধ করি নি? না না আমায় ক্ষমা করো না। আমি ক্ষমার অযোগ্য। আমায় শাস্তি দাও, আমি অপরাধী, আমায় শাস্তি দাও। ক্ষমায় প্রাণে আগুন আরো জলে' উঠে। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় শাস্তি দাও। (পদধারণোদ্যত)।

দাদা। আঃ এ কি কচ্ছেন? আমায় অপরাধী করবেন না—আপনি আমার পূজনীয়।

ধন। দাদাঠাকুর, তুমি কি মানুষ? মানুষে এত সইতে পারে? এত বিপদে মানুষ স্থির থাকতে পারে? মানুষে বাল্যকালাবধি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এমন অবিরল আনন্দে থাকতে পারে? মানুষে এত কাজ করতে পারে? এত জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি কি মানুষের থাকে? না দাদাঠাকুর, তুমি মানুষ নও। আজ আমি অনুতপ্ত হয়ে' তোমার কাছে শাস্তি নিতে এসেছি, তুমি দেবতা আমায় শাস্তি দাও।

দাদা। রায়মশাই, কে কার উপরে অত্যাচার করে? সবি ঠাকুরের লীলা। আপনার চোখের জলে আপনার প্রাণের কালী মুছে যাবে। কেন এ মূল্যবান মানব-জীবন চিরকাল অনুতাপদগ্ধ করে রাখবেন? মানুষ মিথ্যা বলে, চুরি করে, নরহত্যা করে; তবু সে মানুষ। আর এই বৃক্ষাদি জড় পদার্থ—এরা চুরি করে না, মিথ্যা কথা কয় না; তবু এরা জড় পদার্থ। মানুষ ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ যে ভগবানের প্রতিনিধি। কেন তবে মূল্যবান মনুষ্যজীবন নষ্ট করতে চাচ্ছেন? হয়েছে না হয় একটা অপরাধ, তা বলে' কি সে চিরদিন কেবল অনুতাপ করতে থাকবে? প্রেমময় ঠাকুরকে ডাকুন। পিতার কাছে সন্তান কি চিরদিন তাড়িত হয়ে থাকতে পারে? সখা কি সখাকে একটা অপরাধের জন্য চিরদিন দূরে ফেলে রাখতে পারে? তেমনি ভগবান— যিনি আমাদের আপনার হ'তে আপনার, তিনি কি কাউকে দূরে রাখতে পারেন? তিনি যে না ডাকলেও আপনি কাছে আসতে চান? কেন এ জীবন নষ্ট করবেন?

ধন। আমার জীবন একটা মরুভূমি, একটা শ্মশান,

একটা হাহাকার। এখন আমি জাতিভ্রষ্ট, সমাজচ্যুত, অন্ধপ্রায়, রুগ্ন, বৃদ্ধ। রাস্তার ছেলেরা দেখলে আমায় টিটকারী দেয়। অনুতাপে পাগল হয়ে গেছি। এমন জীবন কেউ রাখতে পারে?—উঃ!

দাদা। স্থির হোন। ঠাকুরের দয়া হয়েছে। পিতা অবাধ্য পুত্রকে শাস্তি দেন, সে শাস্তিতে দুঃখ নেই—তা ভালোর জন্য। আর আপনার দুঃখ নেই। তিনি আপনাকে ডাক দিয়েছেন, আপনার পানে মুখ তুলে চেয়েছেন। কিছু ভয় নাই আর! এ জীবন অনন্ত কাল হ'তে আছে, অনন্ত কাল থাকবে। কালে এ পাপ ধুয়ে যাবে। তাঁর দয়া যে অসীম। মানুষের আর পাপ করবার শক্তি কতটুকু?

ধন। মরতে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সাহস হয়নি। মরতে আমার ভয় করে; কি জানি এ জীবনের পরেও যদি কিছু থাকে।

দাদা। হাঁ আছে; অনন্তকাল অনন্ত জীবন আছে। তাতে ভয় কি? বরং আশার কথা। বিস্তৃত উন্নতিক্ষেত্র আপনার সম্মুখে। আমরা যে অসীমের শিশু, আমরা কি এমন ছোট হয়ে এখানে থাকতে পারি? আমাদের পবিত্র, নির্মল শুদ্ধ হতেই হবে। জাগ্রত করুন, আপনার আত্মার ভিতরের সেই মহাশক্তিকে জাগ্রত করুন। জানবেন, আমাদের পবিত্রতাই স্বাভাবিক; অপবিত্রতা অস্বাভাবিক। আত্মার এ অকারণ দৈন্য পরিত্যাগ করুন, সেই মহাশক্তি জাগ্রত করুন।

ধন। জুড়িয়েছে! আমার বুক জুড়িয়েছে! এমন আশার কথা আর তুমি বিনা আমায় কে বলতে পারত? আমার প্রাণ যে গলে' যাচ্ছে। দাদাঠাকুর আমি এ দুঃখ জানাই কারে?

দাদা। আনন্দ, আনন্দ, আজ আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ এই যে আপনাকে পেয়েছি।

ধন। দাদাঠাকুর আমার একটা অনুরোধ—

দাদা। বলুন—

ধন। রাখবে তো?

দাদা। রাখব।

ধন। তোমার পূর্ব্ব সম্পত্তি তোমায় সব দিলুম। আর আমার অবশিষ্ট সম্পত্তি তোমার হাতে দিলুম। তুমি সৎকার্য্যে ব্যয় কর। আর আমার হতভাগ্য ছেলেটা —কুলভূষণকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তাকে আজীবন তোমার কাছে রেখো। আমি আজ হতে তোমার কাছে কাছে থাকব।

দাদা। আমার আর অর্থের প্রয়োজন নাই। বেশ আছি। আপনার এ সম্পত্তি জগতের হিতে ব্যয়িত হবে। গাও তাই সবাই মিলে তাঁর জয়ধ্বনি কর।

সকলে। জয় সচ্চিদানন্দ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নব গৌরব কানন। কাল—সন্ধ্যা।

(দাদাঠাকুর গাহিতে ছিলেন)

গীত।

মরি কি আনন্দ জাগে পরাণে
চিদানন্দ ব্রহ্মধ্যানে
মুগধ মুখর উদার গীতি
নীরবে ছুটে অসীম পানে।
প্রকাশে বিরাট্ বিমল জ্যোতিঃ
কোটি রবি শশী তারকা দ্যুতি
শান্তি সৌম্য মধুর ভাতি
কান্ত হৃদয়-গগনে।
মুদিত লোচন তবু হেরে সব
নাহি মন শুধু জ্ঞানে অনুভব
নাহিক শ্রবণ তবু শোনে রব
ভরা অভিনব তানে।
একিরে বিপুল মহান্ দৃশ্য
আমা-মায়ে আমি বিরাট্ বিশ্ব
কেবা গুরু আর কোথা বা শিষ্য
কেবা জানে কারে জানে।

দাদা। সন্ধ্যা হয়ে' আসচে, ঐ দিগন্তবিতত শ্যাম বনানীর উপরে গলিত স্বর্ণ ঢেলে দিয়ে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। কি করুণ-গম্ভীর মহিমময় দৃশ্য। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসচে। এখনি বিশ্বের এ আলোক নিভে যাবে। ঘোর তমসাবৃত হবে। আবার প্রভাতে ধরা আলোক-স্পর্শে হেসে উঠবে। এই তো বিশ্বের চিরন্তন নিয়ম। আলোক ও অন্ধকার, জীবন ও মৃত্যু, উত্থান ও পতন ক্রমাগত হ'চ্চে। হে অনাদি অনন্তদেব, এস; এমনি কালরাত্রির মত আগে একবার বিশ্ব-সংসারকে গ্রাস কর; তোমার ভীষণ যজ্ঞাগ্নিতে যত ভেদ, বিবাদ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, সমস্ত দগ্ধ কর। তার পর তারে আবার এক নবীন প্রভাতে আলোকোজ্জল, হাস্যমুখরিত, পুণ্য-প্রেম-প্রীতিবিলসিত কর। এস হে কালরূপী মহাপুরুষ, এবার ভীষণ হতে ভীষণতর হ'য়ে এস, এই পতিত হিন্দু-সমাজ তোমাকে চাচ্ছে, এবার প্রলয়ের বেগে এসে তার উপরে পতিত হও, একটা প্রবল প্লাবনে এসে উচু নীচু

সব সমান ক'রে দাও। আজ এ সন্ধ্যাগগনতলে দাঁড়িয়ে তোমায় এ কি মূর্ত্তিতে দেখ্‌ছি রাজাধিরাজ!

(গাহিতে গাহিতে পুনর্ধ্যানস্থ হইলেন)

গীত।

রাজ-রাজেন্দ্র রাজে
বিরাট্ ব্যোম মহাশূন্য সিংহাসন মাঝে।
চন্দ্র সূর্য্য করিছে আরতি
অনিল বহিছে যশোভারতী
বিশ্ব করিছে চরণে প্রণতি
নিখিল-ভুবন-রাজে।
অগণন কত সৌর লোকে
গাহে বন্দনা প্রেমে পুলকে
গভীরমন্ত্রে দ্যুলোকে ভূলোকে
মঙ্গলারতি বাজে,
স্থাবর জঙ্গম দেশ কাল পাত্র
জনম-মরণধারা দিবস রাত্র
স্থূল সূক্ষ্ম পরমাণু তন্মাত্র
অরূপ-স্বরূপমাঝে।

(সেবাব্রতের প্রবেশ)

সেবা। গুরুদেব! (নিকটে আসিয়া) একি ধ্যানস্থ! আ মরি মরি! একি অপূর্ব্ব ধ্যানসমাহিত মূর্ত্তি। সেবাব্রত, এ সময় একবার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করে ধন্য হও। (সেবাব্রত পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দাদাঠাকুর চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।)

দাদা। কে?

সেবা। আমি।

দাদা। সেবাব্রত? (পুনর্ধ্যানস্থ)

সেবা। একি আবার ধ্যানস্থ?

দাদা। সেবাব্রত, এস একবার—তাঁর নাম গান করি, দেখ কি সুন্দর সন্ধ্যা।

(উভয়ে গাহিলেন)

গীত।

একি আনন্দ পুলক বেদনা হৃদয়নাথ হৃদয়পুরে
মরমের বাণী উঠিল বাজিয়া মোহন মধুর নবীন সুরে
কি প্রেম মদিরা পান
পরাণে জাগিল নবীন প্রাণ
জ্ঞানে বিকশিত নবীন জ্ঞান
একি অনুভূতি হৃদয় জুড়ে।
সকল ইন্দ্রিয় নয়ন মাঝে
আমার সকলে সবার সাজে
সকল জুড়িয়া মুরতি রাজে
ভিতরে বাহিরে নিকটে দূরে।

সেবা। আপনাকে আজ একি মূর্ত্তিতে দেখ্‌ছি গুরুদেব?

দাদা। কি দেখ্‌ছো?

সেবা। একটা সূর্য্যের মত; একটা হোমশিখার মত। এমন তো আর কখনো দেখিনি! আপনি যখন ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেন, তখন দেখেছি এক আনন্দঘন মূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তির সঙ্গেই আমরা বিশেষ পরিচিত। কিন্তু আজ একি ভাবে দেখ্‌ছি! এ নির্জ্জনে বসে' কি কর্চ্ছিলেন গুরুদেব?

সেবা। ধ্যান কর্চ্ছিলাম।

সেবা। কিসের ধ্যান? কি ধ্যান? কার ধ্যান?

দাদা। ধ্যান-রহস্য তোমায় আরো কিছুদিন পরে বল্‌ব।

সেবা। ধ্যানের কথা শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হ'চ্ছে।

দাদা। তবে শোন। তার আগে একবার এই সন্ধ্যাকাশের প্রশান্ত মাধুরী, এই কাননের পবিত্র শান্তিতে স্নান করে' তোমার দেহ মন স্নিগ্ধ করে' নও, তারপর স্থির চিত্তে বসে' শোনো। তোমাকে এ শুভ লগ্নে দীক্ষিত করব; তোমার সময় হয়েছে।

(সেবাব্রত স্থিরভাবে বসিলেন)

দাদা। এখন ভাবো, তুমি আত্মা; এই বিশ্বে আর কিছু নাই, মাত্র তুমি আছ। সেই আত্মার মাঝে জেগে আছেন সেই শুদ্ধ সত্য অপাপবিদ্ধ। তিনি অনন্ত তিনি মহান্ নামরূপাদি বর্জ্জিত। তুমিই ধ্যাতা, তিনিই ধ্যেয়।

গীত।

কেবা করে কার আরাধন?
(যেন) আপনি পাতিয়া কাণ,
শোনা আপনার গান
আপনা আপনি আলাপন।
কারে ডাকো বারে বারে কে দিবে সাড়া?
আপনারে নাহি চেন আপন-হারা
মুঠোর ভিতরে রাখি, মোহ বশে মুদি আঁখি
আঁধারে নিবায়ে বাতি খোঁজ হারাধন।
কেবা তুমি কেবা আমি সব আমি হই
আমাতেই আমি-তুমি ভিন্ন কেহ নই,
হয় শুধু তুমি থাক, নয় শুধু আমি রাখ
উভয়ের নহে একাসন।

সেবা। গুরুদেব, আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, আমার সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আজ আমায় একি দিলে? এ আমার

কি দেখালে? এ যে এক অমৃতহ্রদে অবগাহন কর্চ্ছি! একি অমৃত পান কর্চ্ছি! একি চক্ষে দিব্য সৌন্দর্য্য দেখতে পাচ্ছি! একি কর্ণে সুধাসঙ্গীত শ্রবণ কর্চ্ছি! আনন্দ! আনন্দ! এত আনন্দ যে সৈতে পারি না! এ কোথায় ছিল? এ আমায় কি দেখালে? এ আমায় কি দিলে? গুরুদেব! গুরুদেব!

দাদা। আনন্দম্! সেবাব্রত!

সেবা। গুরুদেব!

দাদা। চল এখন যাই।

সেবা। গুরুদেব, এ অমৃত ফেলে আর যেতে ইচ্ছা হয় না। আমি আর যাবো না। আমি এ আনন্দসুধা নিরবচ্ছিন্ন পান করব, এতদিন এর আস্বাদ পাইনি। আমি আর যাবো না।

দাদা। সেবাব্রত, তুমি ভুল বুঝেছ। এ ঘোর স্বার্থপরতা। যে আনন্দ তুমি পেয়েছ, চল তাই ঘরে ঘরে বিলোতে হবে। মনে কর বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্যের কথা। এ নিবিড় আনন্দ তাঁরা সম্ভোগ কর্ত্তেন। কিন্তু তাঁরা এ আনন্দ একা ভোগ করেন নি। মানবের দ্বারে দ্বারে বিলিয়েছেন। এ আনন্দকে দেহে প্রাণে সহজ করে নাও। বিশ্বপ্রেমে, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে, এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, বিশ্বজনীন প্রেম প্রচার কর। বিশ্ব আপনার করে লও।

সেবা। তাতে যে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হবে?

দাদা। তা হবে না, উপরে কাজ করবে; কিন্তু ভিতরে এ আনন্দ জমাট হয়ে থাকবে। আনন্দের বহির্বিক্ষেপ অপেক্ষা ঘনীভূত অবস্থাই ভালো। আরো দেখ, এ সময়ে এ যুগে কেবল ধ্যানধারণা নিয়ে থাকলে চলবে না। স্থূল কার্য্যও কর্ত্তে হবে। রজোগুণকে একটু জাগ্রত করতে হবে। আমাদের কার্য্য আদর্শ গৃহস্থ তৈরি করা, আমাদের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক প্রেম। এর উদ্দেশ্য জগন্মঙ্গল, পরিণাম সমগ্র জগতের মুক্তি। আমাদের এ ধর্ম্মে জাতিবর্ণসম্প্রদায়ের কোনো ভেদ নাই। চল সেবাব্রত, মানবসমাজ আজ এই চায়; একবার কল্পনানেত্রে নিরীক্ষণ কর, যেন সমস্ত বিশ্ব তোমার পানে চেয়ে আছে, একটা শুভ সংবাদ, একটা মহাশান্তি চাচ্ছে।

সেবা। কাজ করে যাচ্ছি সত্য, কিন্তু জগৎ তো একটুকুও অগ্রসর হচ্চে না।

দাদা। কাজ করো, বিচার করো না। তোমার কার্য্য তুমি কর। ফলাফলের অধিকারী আমরা নই। কাল সময়ে তার কার্য্য আপনি করবে। জগতে ভেদ চিরদিন থাকবে। বৈচিত্র্য ও বৈষম্যই জগতের রীতি; এ ভেদ, এ বৈষম্য দেখে হতাশ হয়ো না। এতে বহুদর্শিতা লাভ কর। ভেদ একভাবে কি অন্যভাবে চিরদিন আছে ও থাকবে। এ না হলে সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকে না। বৈষম্যই সৃষ্টি। সাম্যাবস্থা মহাপ্রলয়, চেয়ে দেখ জগতে একপ্রকার দুটি পদার্থ নেই। যে পরমাণুসমূহ অথবা যে পঞ্চতন্মাত্র জগতের উপাদান কারণ, তাও যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখনই প্রলয়; তার অসমান অবস্থা অর্থাৎ প্রকৃতির বিক্ষোভই সৃষ্টি। সৃষ্টি থাকলেই এ ভেদ থাকবে। একবার মহাপ্রেমে প্রাণ উদার কর, দেখবে ভেদের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্য রয়েছে। সেই বিশ্ববীণার সুরে একবার সুর মিলাও দেখি।

সেবা। আপনি বল্‌ছেন কর্ম্মের কথা; তার সঙ্গে কি জ্ঞানভক্তির বিরোধ নেই?

দাদা। না, জ্ঞানভক্তিকর্ম্ম তিনটিই এক সূত্রে বাঁধা। বায়ু পিত্ত কফ অথবা সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের মত। তিনটি সংহত হয়ে জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন হচ্চে। সেবাব্রত, একবার মনশ্চক্ষে জগতের ভবিষ্যৎপানে চাও দেখি! কি দেখছো?

সেবা। একটা দুর্জ্ঞেয়, অস্পষ্ট, কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন মহারহস্য।

দাদা। না সেবাব্রত, দুর্জ্ঞেয় নয়, অস্পষ্ট নয় বড় স্পষ্ট, এর চেয়ে প্রত্যক্ষ আর কিছুই নেই। বর্ত্তমানই ভবিষ্যতের জনক, চেয়ে দেখ জগতের ভবিষ্যৎ এক মহামহিম আলোকোজ্জ্বল প্রদেশ—যেখানে চিন্তা বর্ণময়ী, কল্পনা কর্ম্মময়ী, আশা ফলবতী; যেখানে কেবল শান্তি, কেবল পবিত্রতা, কেবল আনন্দ, কেবল মধুরতা, যেখানে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি পরস্পর হাতধরাধরি করে চলেছে। একদিন পাপী তাপী পুণ্যবান সব একসঙ্গে এক মহাপুণ্যপূত শান্তিময় রাজ্যে মিলিত হবে। দিব্য চক্ষে চেয়ে দেখ সেবাব্রত, আর বল জয় সচ্চিদানন্দ।

সেবা। জয় সচ্চিদানন্দ।

(যবনিকাপতন।)

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

রাগিণী—জয়জয়ন্তী।

তোমার চরণ যদি নামে
আমার বুকের পরে—
তবে সব কালো কি আলো হয়ে
ফুটবে না?
কাঁটার বন যে হৃদয় আমার—
ও তার গায়ে গায়ে কুসুমরাশি
লুটবে না?

শুষ্ক কঠিন মরুভূমি
জান আমার হৃদয় তুমি,—
সেই পাষাণ-পথে সহস্র-ধার
উৎস কি গো
ছুটবে না ?
তোমার চরণ যদি নামে
আমার বুকের পরে—
তবে তারার মালা আঁধারে কি
জ্বল্‌বে না ?
গোপন প্রাণের বেদন-জ্বালায়
গভীর ধারে সুধার ধারা
গল্‌বে না ?
তোমায় ভুলেই আছি আমি
কত যুগ যে হৃদয়-স্বামী ;
তুমি আমায় না জাগালে
এ মোহ-স্বপন
টুটবে না ॥

৺বটকৃষ্ণ পালের স্মৃতিসভা।

আমরা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে গত ৬ই জুলাই সুপ্রসিদ্ধ ঔষধবিক্রেতা ৺বটকৃষ্ণ পালের স্মৃতিসভার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমাদের সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সমাজনীতি ক্ষেত্রে, সাহিত্যক্ষেত্রে এবং এইরূপ অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহাদের স্মৃতিসভা খুব সহজেই হয়, কারণ আমাদের দেশ আজকাল ঐ সকল বিষয়ই বোঝে ভাল। কিন্তু ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এত অল্প বাঙ্গালী উন্নতি লাভ করেছেন যে, সে বিষয়ে কে কতদূর দেশকে উন্নতির পথে আগাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা মোটেই দৃষ্টি করিতে শিখি নাই। যে দ্বারকানাথ ঠাকুর নব্যযুগের বঙ্গদেশকে ব্যবসায়ের প্রাধান্য সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন, কয়জন বাঙ্গালী তাঁহার স্মৃতিসংস্থাপনে বা স্মৃতিসভার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন ? রামদুলাল দের কয়খানি জীবনচরিত বাহির হইল ? কার-ঠাকুর কোম্পানির তারকনাথ সরকারের উন্নতির মূল কোথায়, তাহা কয়জন সন্ধান করিয়াছেন ? বাণিজ্যের মাহাত্ম্য, দেশের উন্নতির পক্ষে বাণিজ্য কিরূপ উপযোগী, দু'চার জন বাঙ্গালী তাহা বুঝিলেও বাঙ্গালী জনসাধারণ তাহা এতদিনেও বোঝে নাই। আজ বটকৃষ্ণ পালের স্মৃতিসভা হওয়াতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি যে, বুঝিয়াছে যে বাণিজ্যেই আমাদের একমাত্র রক্ষার উপায়, তাহারই পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাতে ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র হইতেছে খাঁটি হওয়া অর্থাৎ honesty। এই honestyর অভাবেই আমাদের দেশের অনেক ভাল ভাল কাজ একেবারে মাটী হইয়া গেল। কত অর্থভাণ্ডার উঠিল, অথচ তাহার কোন কূলকিনারাই পাওয়া যায় না। এই কারণে বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি কোন বিষয়ে চাঁদা উঠাইতে গেলেই লোকে আর বিশ্বাস করিয়া টাকা দিতেই চাহে না এবং টাকার অভাবে কোন ভাল কাজও দাঁড়াইতে পারে না। সুখের বিষয় যে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ পাল প্রভৃতি এমন কয়েকজন লোক উঠিয়াছেন, যাঁহাদের নাম কোন ব্যবসায়ে সংলগ্ন থাকিলেই তাহার কৃতকার্য্যতা বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় থাকে না এবং ইচ্ছা করিলেও যাঁহাদের নামে এতটুকু অবিশ্বাস মনে আনিতেই পারি না। যেদিন বঙ্গের ঘরে ঘরে এমন লোক জন্মগ্রহণ করিবেন, যাঁহাদের প্রত্যেক কথার উপর আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারিব, সেইদিন সত্য সত্য আমাদের প্রিয়তম জন্মভূমি বঙ্গদেশ সকল বিষয়ে জয় লাভ করিবে। বাঙ্গালীর মধ্যে বটকৃষ্ণ পালের মত ব্যক্তি যখন জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তখন আমরা ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি বক্তাগণের সহিত এক প্রাণে বলিতে পারি যে এখনও আমাদের দেশের আশা আছে, এখনও দেশের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। বটকৃষ্ণ পালের (ইনি দেশের আত্মীয় বলিয়া যে নামে দেশে সুপরিচিত, সেই নামেই উল্লেখ করিলাম) উদ্দেশে এরূপ বাৎসরিক স্মৃতিসভার অতিরিক্ত, তাঁহার কৃতী সন্তানগণের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে তাঁহারা যেন কোন স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করেন। আমরা তাঁহাদের বিবেচনার জন্য দুইটী স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নের ইঙ্গিত করিতেছি—একটী হইতেছে "যথার্থ" বাণিজ্যব্যবসায় কি প্রণালীতে করিতে হয়, তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য একটী উপযুক্ত বিদ্যালয়; বর্ত্তমানের কেরাণী প্রস্তুত করিবার জন্য যেরূপ বড় বড় বিদ্যালয়ে নামে মাত্র ব্যবসায় শিখাইবার শ্রেণী বা Commercial Class খোলা হয়, সেরূপ class আমরা চাহি না; এবং দ্বিতীয়টী হইতেছে বটকৃষ্ণ পালের একটী উপযুক্ত জীবনচরিত প্রকাশ করা। এই দুইটী সংসিদ্ধ হইলে বাঙ্গালী শীঘ্রই মানুষ হইতে পারিবে আশা করা যায় এবং বটকৃষ্ণ পাল মহোদয় স্বর্গবাসী হইয়াও লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসীর নিত্য আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন নিঃসন্দেহ।

স্ত্রীশিক্ষার অভাব ও তাহার কুফল।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্যবেদান্ততীর্থ)

[স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একজন খাঁটি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের লিখিত এই প্রবন্ধ আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের ভিতরেও স্ত্রীশিক্ষার প্রভাব কিরূপ গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে, এই প্রবন্ধটী তাহারই পরিচয় দিতেছে। তঃ সং]

স্ত্রীশিক্ষার অভাবে দিনের পর দিন আমাদের যে কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা একবারও আমরা ভাবিয়া দেখি না। যে আজ বালিকা, কাল সেই গৃহিণী; বালিকা অবস্থায় যদি সে পিতামাতার অবহেলায় শিক্ষালাভ না করিল, পরে অধিক বয়সে সে ছেলের মা হইলে আর তাহার শিক্ষার অবকাশ থাকে না। প্রত্যেক পিতা ছেলের শিক্ষার জন্য যেরূপ যত্ন লয়েন, মেয়ের শিক্ষার জন্যও যে সেরূপ যত্ন লওয়া উচিত তাহা ভাবিয়াও দেখেন না। আমাদের শাস্ত্রে আছে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" যেরূপ পুত্রকে পালন করিবে ও শিক্ষা দান করিবে কন্যাকেও সেইরূপ পালন করিবে ও শিক্ষা দান করিবে। যাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, তাঁহাদিগকে আমি বলিতে চাই যে, কোন্ শাস্ত্রে কোথায় স্ত্রীশিক্ষার নিষেধের কথা আছে, তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন কি? বরং বেদে গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং পুরাণে শকুন্তলা, অরুন্ধতী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা যে বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিশেষ আদরণীয় ছিল, আমরা ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাই। উভয়ভারতী, লীলাবতী প্রভৃতি এই দেশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বিদ্যার গৌরব আজিও দেশ ঘোষণা করিতেছে। আমার মনে হয়, মুসলমান রাজত্বের সময় হইতেই নানা কারণে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল। তাহারই কুফল বর্ত্তমান সময়ে আমরা ভোগ করিতেছি। স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, স্ত্রীলোক শিক্ষা লাভ করিলে বিধবা হয়, এই সকল কুসংস্কার তখন হইতেই এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের এই সকল কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে দিন দিন আমরা হীন ভীরু ও কাপুরুষ হইতেছি। মাতার নিকট সন্তান যেরূপ সহজে শিক্ষালাভ করিতে পারে অন্য কাহারও নিকট তাহা সম্ভব নয়। মাতা যদি শিক্ষিতা হন, শুধু কথায় কথায় সন্তানকে কত সৎশিক্ষা দিতে পারেন; বাল্য-কাল হইতে সেই উপদেশগুলি শিশুর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে ভবিষ্যতে তাহার সুফল সমগ্র দেশবাসী ভোগ করিতে পারে। যে দেশের লোক ইহা বুঝিতে পারে না, তাহারা যে কতদূর অদূরদর্শী তাহা আর কি বলিব!

এইত সেদিন একখানি সংবাদপত্রে দেখিলাম যে একজন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখিয়া নিজের গায়ে ও কাপড়ে কেরোসিন ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিয়াছেন, তাহার পরে অন্য লোক জানিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করে; পরদিন প্রাতে স্বামীর মৃত্যু হয়, সন্ধ্যার সময় হাঁসপাতালে স্ত্রীরও মৃত্যু হয়; স্ত্রীটী গর্ভবতী ছিলেন। কি ভীষণ কথা! দেখুন দেখি, শিক্ষার অভাবে কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে। সেই স্ত্রী হয়ত মনে করিয়াছিল যে স্বামীর সহিত সহমৃতা হওয়াই স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম, অতএব যে ভাবেই হউক আমাকে মরিতে হবে; সে জানে না যে আত্মহত্যা মহাপাপ, তাহার পর আবার পুত্রহত্যা; হয়ত সেই একমাত্র পুত্রই তাহার বংশকে উজ্জ্বল করিত—সেই পুত্রটী পর্য্যন্ত গেল; তাহার বংশের আর পরিচায়ক কিছু রহিল না। আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, সীতাদেবী নানা ক্লেশে ক্লিষ্টা হইয়াও অনেক সময় বলিতেছেন—যে কি করিব, আমার গর্ভে সন্তান রহিয়াছে, তাহা নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই; তাহা না হইলে আমি জীবন বিসর্জ্জন করিতাম। আমাদের দেশের স্ত্রীগণ যদি শিক্ষিতা না হন তবে দিন দিন আরও যে কত ভীষণ দৃশ্য দেখিতে হবে তাহা বলা যায় না। স্ত্রীর সহমরণে যাওয়ার কথা কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু নিতান্ত পাপজনক এবং দেশের ক্ষতিকারক।

এই সকল মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল লেখক লেখনী সঞ্চালনে সতীত্বের গুণগান করিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা হিন্দুসমাজকে গৌরবান্বিত করিতেছেন, তাঁহারা যে দেশের কিরূপ সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ইহার দৃষ্টান্তে যদি আবার দশজন এই ভাবে আত্মবিসর্জ্জন করে তাহার জন্য দায়ী হইবে কে? এই সকল অবিমৃষ্যকারী অদূরদর্শী লেখকগণের দ্বারা যে দেশের কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা বলা যায় না। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের কোথাও এইরূপ আত্মহত্যার পোষক কোন প্রমাণ নাই; বরং এইরূপ মৃত্যু নিতান্ত পাপজনক, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হয়। আমার খুব বিশ্বাস যে শিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশে অনেকে এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছেন; ইহার পূর্ব্বে স্নেহলতা প্রভৃতি অনেক অবিবাহিতা বালিকা কেরোসিন ও অগ্নির সাহায্যে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে। সেইজন্য কত সভা-সমিতিও হইয়াছিল। আমি জানি একদিন গোলদিঘীর

ধারে স্নেহলতার জন্য এক সভা হইয়াছিল; মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিলাম সভায় স্নেহলতার খুব প্রশংসা করা হইয়াছিল, তাহার পিতাকেও ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছিল। আমরা কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না যে এ প্রশংসা এবং ধন্যবাদ কি জন্য। আমাদের দেশ এমন হইয়া পড়িয়াছে যে কোন একটা কিছু হইলেই তাহার সদসৎ বিবেচনা না করিয়াই সভাসমিতি করিয়া তাহার প্রশংসা করিতে হইবে। সভায় বক্তারও অভাব হয় না—যাঁহারা বাঁধা বক্তা আছেন তাঁহারা দুই চার জন সভার নাম শুনিলেই উপস্থিত হয়েন; আর কোন কালেও যাঁহার যে বিষয়ের সহিত পরিচয় নাই বা নাম শুনা নাই, এমন বিষয়েও তিনি কিছু না বলিয়া ছাড়িবেন না। এই সকল আত্মঘাতিনীদের নিতান্ত দুর্গতির কথা শাস্ত্রে উক্ত আছে। ইহাদের দাহ নাই, অশৌচ নাই, শ্রাদ্ধ নাই, এমন কি এই সকল মৃত্যুতে শোক করা পর্য্যন্ত পাপজনক। ইহা জানিয়াও বৃদ্ধ সার্ব্বভৌমমহাশয় কিরূপে এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। বর্ত্তমানে সংবাদপত্রে উক্ত ঘটনাটী দেখিয়া আমার এই অতীত ঘটনাটী মনে পড়িল। বাস্তবিক এরূপ সভা করিয়া এই সকল কার্য্যের প্রশ্রয়দান করাতেই পর পর আরও অনেকগুলি এইরূপ ঘটনা আমরা শুনিতে পাইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। এইরূপ মৃত্যু দ্বারা সমাজশরীরের বিশেষ হানি হয়; তাই শাস্ত্রকারগণ এইরূপ মৃত্যুর প্রতি নানারূপ নিন্দা বাক্য প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন—ভ্রমেও যেন কাহারও আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা না হয়, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য।

মহাভারতীয় নীতিকথা।

সভাপর্ব্ব।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

অবজ্ঞার পাত্র। যাজকেরা পতিত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করেন, প্রমদারা তীক্ষ্ণস্বভাব কামপরতন্ত্র পতিকে অনাদর করিয়া থাকে। (লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বাধ্যায় ১৯।

কোন্ কর্ম্মের কি ফল। বেদাধ্যয়নের ফল অগ্নিহোত্র, ধনোপার্জ্জনের ফল দান ও ভোজন, দারপরিগ্রহের ফল রতিক্রীড়া ও অপত্যোৎপাদন, বিদ্যাশিক্ষার ফল সুশীলতা ও সদ্ব্যবহার। (ঐ ২৭।

বিবেচনা। যে ব্যক্তি আপনার সামর্থ্য সম্পত্তি দেশ কাল আয় ও ব্যয় দেখিয়া এবং সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। (রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বাধ্যায় ৫৪।

আত্মপ্রশংসা। যে ব্যক্তি পরের মর্য্যাদা জানে, সে কখন আত্মপ্রশংসা করে না। যেহেতু অন্যে যাহার প্রশংসা করে তিনিই যথার্থ পূজ্য। ঐ ৬৪।

নীতি। সমতাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; উহা অবলম্বন করিলেই মঙ্গল লাভ হয়। ঐ।

অনলস। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল কিন্তু আলস্যশূন্য, সে সম্যক্ যুদ্ধাদি প্রয়োগ দ্বারা বলবান শত্রুকে জয় করিতে পারে এবং নীতি দ্বারা আপনার হিতকর অর্থ লাভ করে। (ঐ ৬৫।

বীরপুরুষ। বীর্য্যবানদিগের কুলে সমুৎপন্ন দুর্ব্বল ব্যক্তি কিছুই করিতে পারে না; কিন্তু নির্বীর্য্যকুলোদ্ভব বীর্য্যবান ব্যক্তি সম্ভ্রমাস্পদ হয়।

পরাক্রম ও অভিনিবেশ। পরাক্রমশালী ব্যক্তিতে সমস্ত গুণ ঘনীভূত হইয়া থাকে। অভিনিবেশ জয়ের হেতু, উহা কর্ম্ম ও দৈব এই উভয়ের আয়ত্ত। ঐ।

শত্রু। বলবিহীন বিপক্ষ পক্ষের দৈন্য অবলম্বন করা যেরূপ দোষাবহ, বলবান শত্রুর নিকট অনবহিত হওয়াও তদ্রূপ। ঐ।

নির্গুণ পুরুষ। লোকে যাহাকে নির্গুণ বলিয়া বোধ করে, তাহার শমগুণ অবলম্বন ও কষায় বসন পরিধান পূর্ব্বক বনে গমন করা শ্রেয়। (ঐ ৬৯।

দুর্ব্বল। দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত স্পর্দ্ধা করিবে না। (ঐ ৭১।

শত্রু। যখন মৃত্যু দিবাভাগে কি রজনীযোগে হইবে তাহার স্থিরতা নাই এবং কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করাতে অমর হইয়াছে ইহা কখনও শুনি নাই। অতএব বিধানানুসারে নীতিপূর্ব্বক শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া পরিতোষ লাভ করাই পুরুষের কার্য্য।

(রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বাধ্যায় ৬৯।

কর্ম্মফল। যে ব্যক্তি যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্ম করে, সে সেই সেই অবস্থায় তাহার ফলভাগী হয়। (ঐ ৯১।

স্বর্গের হেতু। বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশ, তপোনুষ্ঠান ও যুদ্ধে মৃত্যু—এই সমুদায়ই স্বর্গের হেতু। (ঐ।

সাধুর অকর্ত্তব্য। আত্মনিন্দা ও আত্মপূজা এবং পরনিন্দা ও পরস্তব সাধুদিগের অকর্ত্তব্য।

(শিশুপালবধপর্ব্বাধ্যায় ১৫৯।

কাল। কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

দৈব। পৌরুষ দ্বারা দৈবশক্তির অতিক্রম করা অতীব দুরূহ কর্ম্ম। (দ্যূতপর্ব্বাধ্যায় ১৭০। ১।

দৈব। দৈবই প্রধান, পৌরুষ নিরর্থক। (ঐ ১৭৬।

অনুগ্রহ ও ভয়। যিনি কেবল অনুগ্রহ কিম্বা ভয়ের বশীভূত হইয়া চলেন, তিনি কখন মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন না। (ঐ ১৮০।

কাপুরুষ। কাপুরুষেরাই অশন বসনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, এবং অধম পুরুষেরাই অমর্ষশূন্য হয়। (ঐ ১৮৬।

দ্বেষ্টা। দ্বেষ্টা হইলে অসুখী ও নিধন প্রাপ্ত হইতে হয়। (ঐ ১৯৮।

যুক্তি। যাহার যুক্তিবৃত্তি নাই অথচ শাস্ত্রজ্ঞান আছে,

সে শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মার্থ কদাচ অনুধাবন করিতে সমর্থ নহে। (ঐ ১৯৯।

আর্য্যোচিত কার্য্য। আর্য্যলোকেরা মুখে ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার ও কপটাচারপ্রদর্শন করেন না।

সৎপুরুষের কার্য্য। অকপট যুদ্ধই সৎপুরুষের লক্ষণ।

ব্রাহ্মণ। শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণের উপকারসাধনার্থ যত্ন করাই আমাদিগের ধর্ম্ম। (ঐ ২১০।

নীতি। কুলরক্ষার্থ এক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার্থ কুল পরিত্যাগ করিবে, জনপদরক্ষার্থ গ্রাম পরিত্যাগ করিবে, এবং আত্মরক্ষার্থ পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে।

দ্যূতপর্ব্বাধ্যায় ২১৬।

বাক্য। লোকে অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ দ্বারাই অন্যের শত্রু হইয়া উঠে। (ঐ ২২৯।

অসতী। অসতী স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করে। (ঐ ২২১।

(ক্রমশঃ)

কামরূপের পুরাতত্ত্ব।

(শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

খ্রীষ্টীয় ৪০০ শতাব্দীতে চৈনিক ফাহিয়ান * কনোজ পরিদর্শন পূর্ব্বক তাহার সমৃদ্ধি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তখন উহা গুপ্ত সম্রাটদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল। গুপ্তবংশের দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমে লিচ্ছবি বংশ মগধ ও মিথিলা হইতে দূরীভূত হইয়া নেপালের দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। গুপ্ত বংশের অঙ্গীভূত রাজা "শ্রীগুপ্ত" পুষ্পপুরের (পাটলীপুত্রের) সিংহাসনে (৩১৯-৪০ খৃঃ অব্দে) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যারম্ভের কিছুকাল পূর্ব্বে (৩১৫-৩৪০ খৃঃ অব্দে) জয়দেব নেপালে লিচ্ছবি বংশের আধিপত্য স্থাপন করেন। এই জয়দেবই নেপালের বংশাবলীতে জয়বর্ম্মণ নামে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি লিচ্ছবি বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। জয়দেব হইতে বসন্তদেব পর্য্যন্ত একবিংশতি জন লিচ্ছবি বংশীয় নরপতি নেপালে রাজত্ব করেন। অতি প্রাচীনকালে ব্রিজি বা লিচ্ছবিরা ভোটদেশ হইতে মিথিলায় আসিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ তাঁহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বৌদ্ধ পুরাবৃত্তে ইহাদের বিবরণ পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নেপালে এই বংশের নিম্নলিখিত রাজত্বকাল * আনুমানিকভাবে চারিপুরুষে এক শতাব্দী নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

লিচ্ছবি বংশ।

১। জয়দেব (৩১৫ খৃঃ অব্দ ৪০)।
২। বর্ষদেব (৩৪০ „ ৬৫)।
৩। সর্ব্বদেব (৩৬৫ „ ৯০)।
৪। পৃথ্বীদেব (৩৯০ „ ৪১৫)।
৫। জ্যেষ্ঠদেব (৪১৫ „ ৪০)।
৬। হরিদেব (৪৪০ „ ৬৫)।
৭। কুবেরদেব (৪৬৫ „ ৯০)।
৮। সিদ্ধিদেব (৪৯০ „ ৫১৫)।
৯। হরিদেব (৫১৫ „ ৪০)।
১০। বসুদত্তদেব (৫৪০ „ ৬৫)।
১১। পতিদেব (৫৬৫ „ ৯০)।
১২। শিববৃদ্ধিদেব (৫৯০ „ ৬১৫)।
১৩। বসন্তদেব (৬১৫ „ ৪০)।
১৪। শিবদেব (৬৪০ „ ৬৫)।
১৫। রুদ্রদেব (৬৬৫ „ ৯০)।
১৬। বৃষদেব (৬৯০ „ ৭১৫)।
১৭। শঙ্করদেব (৭১৫ „ ৪০)।
১৮। ধর্ম্মদেব (৭৪০ „ ৬৫)।
১৯। মনদেব (৭৬৫ „ ৯০)।
২০। মহীদেব (৭৯০ „ ৮১৫)।
২১। বসন্তদেব (৮১৫ „ ৪০)।

গুপ্তবংশীয় মাধব গুপ্তের পুত্র আদিত্য সেনের দৌহিত্রী "বৎস দেবীর" সহিত ভগদত্ত বংশীয় কামরূপ রাজ হর্ষদেবের কন্যা "রাজ্যমতী"র বিবাহ হইয়াছিল :—

মাধব গুপ্ত
|
আদিত্য সেন — মৌখরি রাজ — উদয়দেব
|
দেবগুপ্ত .... কন্যা = ভোগবর্ম্মণ† — নরেন্দ্র
|
বৎস দেবী = শিবদেব — হর্ষদেব
জয়দেব = রাজ্যমতী

* ফাহীয়েন একজন চীন দেশীয় পরিব্রাজক, যতি এবং পুরোহিত ছিলেন। তিনি বাল্যকালে "কুং" (kung) নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার বাসভবন "উ-ঈয়ং" বা "হুয়য়েঙ্গ" নামক স্থানে ছিল। ইহা শ্যানটী প্রদেশের "পিং-ঈয়াং" জেলায় অবস্থিত। ৩৩১ খৃঃ অব্দে বহুদেশ পরিভ্রমণান্তর তিনি প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ভারতভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

* নব্যভারত, পৃঃ ৫০৭, ১৩০২ সাল, মাঘ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† ভোগবর্ম্মণ- ইনি ঠকুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা নেপালরাজ অংশু বর্ম্মণের ভাগিনেয়। ভোগবর্ম্মণ লিচ্ছবি বংশীয় নরপতি শিবদেবের উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভোগবর্ম্মণের পুত্র যশোবর্ম্মণ কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। এই যশোবর্ম্মণের সভায় মহাকবি ভবভূতি ও বাক্‌পতি বিদ্যমান ছিলেন। প্রায় দেড় শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত লিচ্ছবি ও ঠকুরী বংশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম নেপালে এক সময়ে সমভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। শিবদেবের রাজধানীর নাম কৈলাসকুট। সুপ্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তরাংশে কৈলাসকুটির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। লিচ্ছবিবংশ আপনাদের নামাঙ্কিত শাসন লিপিতে গুপ্তাব্দের এবং ঠকুরী বংশ হর্ষাব্দের ব্যবহার করিতে থাকেন।

মৌখরি বর্ম্মণ বংশীয় "ভোগবর্ম্মণ" মগধের গুপ্তবংশীয় মহারাজ আদিত্য সেনের জামাতা ছিলেন। মহারাজ আদিত্য সেন গুপ্ত বংশের এক কনিষ্ঠ শাখা হইতে উদ্ভূত হন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র গোবিন্দ গুপ্ত মতান্তরে কৃষ্ণগুপ্ত এই বংশের আধিপত্য মগধে প্রতিষ্ঠিত করেন। নেপালের লিচ্ছবিবংশীয় নরপতি "শিবদেব" গুপ্ত বংশীয় আদিত্য সেনের দৌহিত্রী ও মৌখরী-রাজ ভোগবর্ম্মার দুহিতা বৎসদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শিবদেবের পুত্র জয়দেব "রাজ্যমতী" দেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। রাজ্যমতী ভগদত্ত বংশীয় কামরূপরাজ হর্ষদেবের কন্যা। ইহা নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের পশ্চিম তোরণের সংলগ্ন জয়দেবের খোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায়। ১৫৩ শ্রীহর্ষাব্দে (৭৫৯ খৃঃ অব্দে) এই খোদিত লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই খোদিত লিপি হইতে "মৌখরি" ও "গুপ্ত" বংশের সহিত "ঠকুরি" বংশের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। লিচ্ছবি বংশীয় মহারাজ শিবদেবের রাজত্বকাল ৬৪০-৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। হর্ষদেব কামরূপরাজ বলিয়া খোদিত লিপিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। তবে তাঁহার কন্যা রাজ্যমতীর ভগদত্তকুলজা উপাধি দেখিয়া বোধ হয় হর্ষদেব কামরূপের অধিপতি ছিলেন ঃ—

"মাদ্যদ্দন্তিসমূহ-দন্তমুসল-ক্ষুণ্ণারি-ভূভৃচ্ছিরো
গৌড়োড্রাদিকলিঙ্গ-কোশলপতি-শ্রীহর্ষদেবাত্মজা
দেবী রাজ্যমতী কুলোচিতগুণৈর্যুক্তা প্রভূতা কূলৈ
র্যেনোঢ়া ভগদত্তরাজকুলজা লক্ষীরিব ক্ষ্মাভূজা ॥"

গৌড় দেশ হর্ষ কর্ত্তৃক জিত হইয়াছিল অথবা তাহার পূর্ব্বে জিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। রাখাল বাবু অনুমান করেন অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে গৌড়দেশ, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশল কামরূপরাজগণের হস্তগত হইয়াছিল। * (ক্রমশঃ)

গ্রন্থ পরিচয়।

শিবাজী—কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বসুর বিরচিত "শিবাজী" নামক কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যোগীন্দ্র বাবু যখন যাহা কিছু রচনা করেন, তাহার ভিতরে আমরা তাঁহার বিশেষ গবেষণার পরিচয় পাই। বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি কাব্য ও ইতিহাসের অপূর্ব্ব সমাবেশ করিয়াছেন। একটি অন্যটিকে রেখামাত্র অতিক্রম করে নাই। কবিত্বের ভাষায় ও কবির সম্মোহন তুলিকায় তিনি শিবাজীর আদর্শ চরিত্র আশ্চর্য্যভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদের বিপুল চেষ্টা ও অধ্যবসায় শিবাজীর জীবনে আরোপিত কলঙ্ক এমন মর্ম্মস্পর্শী ভাবে স্খলিত করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান যুগের উৎগীরিত নাট্য ও ছোট বড় গল্পের ভিতরে প্রেমিক প্রেমিকার অনুরূপ মিলন কখন বা বিচ্ছেদের কাহিনী পড়িয়া সত্য সত্যই আমরা (effeminate) বীর্য্যহীন ও প্রকৃত মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িতেছি। মনুষ্যত্বের পরিপোষক ও চৈতন্যবিধায়ক গ্রন্থের পঠন পাঠন ভিন্ন এ দেশের দুর্গতির অবসান হইবে না। অতীতের ভিতর হইতে অসম্ভবকে যাঁহারা স্বীয় বীর্য্যে ও প্রতিভায় সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিস্ময়কর কার্য্যাবলীকে সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে না পারিলে এ দেশের পরিত্রাণ নাই। সুকবি বা সুলেখক বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, গুরুতর দায়িত্ব তাঁহাদের মস্তকের উপরে। প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠকের অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন নানা রসের উদ্রেক করিলেই তাঁহাদের দায়িত্ব শেষ হইল না। জনসাধারণকে প্রকৃত আদর্শের দিকে সমুন্নত করিয়া তুলিবার গুরুভার তাঁহাদের উপরে। চিত্তবিনোদন তাঁহাদের একমাত্র কাব্য নহে। এ জাতিকে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব তাঁহাদের হস্তে। যোগীন্দ্র বাবু সেই দায়িত্বটুকু বুঝিয়া কবির আসরে নামিয়াছেন। যোগীন্দ্র বাবু এই গ্রন্থে তাঁহার প্রতিভার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। নানা চিত্রের ভিতরে সাধু রামদাসের উক্তি ও ভক্ত তুকারামের প্রসঙ্গ অবলম্বনে এবং শিবাজীর বিনয় ঔদার্য্য ও বৈরাগ্যের কাহিনী ধরিয়া এই পুস্তকে ধর্ম্মের সঙ্গে শৌর্য্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার রচনাকে মহাকাব্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে ইহা মহাকাব্য না হইলেও যে ছাঁদে ও মহান আদর্শে কাব্যখানি সংরচিত তাহাতে ইহাকে মহাকাব্য বলিয়া মানিয়া লইতে পাঠকের আপত্তি হইতে পারে না। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইহাতে কবির পরিশ্রম ও উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে।

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। পৃ ১০৮।

একমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০।

৯১৩ সংখ্যা ১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

উদ্বোধন।

হে প্রাণের পরমেশ্বর, তুমি আনন্দময় হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছ। কিন্তু সময়ে সময়ে এক একটা ঘটনা দেখে এক একটা অবস্থায় পড়ে তোমার আনন্দস্বরূপে সন্দেহ এসে পড়ে। এর কারণ আর কিছুই নয়—কেবল এই যে, তোমাকে হৃদয়ের ভিতর প্রাণের ভিতর মঙ্গলময় স্বামী বলে ধরতে পারি নি, বিশ্বাস করি নে। মুখে অনেক কথা বলি বটে, কিন্তু সত্যিসত্যি প্রাণের ভিতর থেকে সে সব কথা বলিনে। এই পৃথিবীতে যাঁর অধীনে আমি, আর আমার মতো আরও পাঁচজন কাজ করি, তিনি যদি আমাকে তাঁর এক কর্ম্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে অন্য কোন কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠান, তাহলে সকলেই বলবেন যে, আমার মনিব নিশ্চয়ই ভাল বিবেচনা করেই এরকম বন্দোবস্ত করেছেন; হতে পারে যে তার ফলে তোমার বা আমার অল্প বেশী কষ্ট হবে। কিন্তু যে মনিবের ভাল হওয়াতেই আমার খাওয়া পরা চলছে, আমার তোমার ভাল হচ্ছে, তাঁর ভালর জন্য একটু কষ্ট হলেও মনিবের ভাল হবে বলে সেটা সহ্য করতে প্রস্তুত আছি বলে মেনে নিই। পার্থিব মনিব-ভৃত্যের সম্বন্ধ দিয়ে সেই প্রভু পরমেশ্বর ও আমাদের সম্বন্ধে ঠিকটা বোঝানো অসম্ভব জানি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য আছে সেটাও একেবারে অস্বীকার করতে পারি নে। এই সম্বন্ধ ধরে বোঝবার চেষ্টা করলেই আমরা বুঝতে পারব যে মঙ্গলময় পরমেশ্বর সত্যই আমাদের ভালর জন্যই সমস্ত ঘটনা, আমাদের সকল অবস্থা নিয়মিত করছেন। তবে অনেক বিষয় আমরা বুঝতে না পেরে তাঁর মঙ্গল স্বরূপের কথা মানতে চাই নে। তোমার শোক দুঃখ হোক, বিপদ আপদ আসুক, একবার তাঁর চরণে কেঁদে পড় দিকিন, তোমার শোকের ভার কেমন নেবে যাবে। ঘনঘটা মেঘ করে খুব একটা বর্ষা নেমে গেলে যখন সূর্য্যের আনন্দমঙ্গল কিরণজাল দেখা যায়, তখন হৃদয়ে কি সুন্দর প্রেমের ভাব জেগে উঠে। আমি হয় তো অট্টালিকায় বাস করছি, এরকম ঘনঘটার কারণই বুঝতে পারলুম না, আর সেই জন্য সেই বৃষ্টি-ঝড়কে একটা মহা অমঙ্গলের কারণ মনে করে আছি। কিন্তু হয় তো কৃষকদের অবস্থা দেখলে বুঝতে পারতুম যে, বৃষ্টি-ঝড় হওয়া কিরকম দরকার ছিল। সেই রকম তাঁর উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করলে অনেক সময়ে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার কেটে যায়, আর তখন তাঁর মঙ্গলস্বরূপ আনন্দস্বরূপ নূতনতরভাবে প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি।

আজ এই পবিত্র সময়ে, এসো, আমাদের সমুদয় সংশয় দূর করে তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করে দিই। সুখের সময় তাঁরই দান বলে যেমন নেব, দুঃখের সময়েও তাঁরই মঙ্গলভাবের কার্য্য বলে মনে স্থির জানব। তাহলেই চারিদিকে মৃত্যু

শোক বিপদ আপদ দেখে প্রাণে যে ভয়-ভাবনা ওঠে, সে সমস্ত কেটে গিয়ে প্রাণের ভিতর শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, দেশদেশান্তরবাসীর সঙ্গে, লোক-লোকান্তরবাসীর সঙ্গে আমাদের হৃদয় একভাবে মিলিত হবে। তখন আর আমাদের পরস্পরের মধ্যে মৃত্যুর ব্যবধান থাকবে না, তখনই আমরা মৃত্যু হতে অমৃতে উপনীত হব।

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

ব্রাহ্মসম্মিলন। গতপূর্ব্ব বৎসর ভাদ্রমাসে ব্রাহ্মদিগের একটী সম্মিলিত উপাসনা হওয়াতে আমরা হৃদয়ে খুবই আনন্দ পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর মাঘোৎসবের সময়ে সম্মিলিত উপাসনার জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, যে সম্ভাবের ফলে ব্রাহ্মদিগের যথার্থ সম্মিলন হইতে পারে, কেন জানি না ব্রাহ্মমণ্ডলীর ভিতর হইতে সে সম্ভাব চলিয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ ব্রাহ্মদিগের ব্যক্তিত্বের অতিমাত্র বোধ এবং মণ্ডলীর প্রতি সহানুভূতির হ্রাস। কিন্তু এ সম্ভাবকে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। মার্কিন যুক্তরাজ্যে ধর্ম্মমহাসভা উপলক্ষে মিলনের মহাফল সম্বন্ধে অধ্যাপক মোক্ষমূলর যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগের প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। "কিন্তু আমাদের ভুলিলে চলিবে না কর্ম্মক্ষেত্রে এই মহাসভা কি ফল দান করিল। জগতের প্রত্যেক অংশ হইতে সহস্র সহস্র লোককে সর্ব্বপ্রথম মিলিতভাবে প্রার্থনা করিতে দেখা গেল "আমাদের পিতা যিনি ঐ আকাশে আছেন" (Our father, which art in heaven), আমাদের পিতা যে একই এবং একই পরমেশ্বর যে আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, এই সম্মিলিত প্রার্থনা তাঁহারই সাক্ষ্য দিতেছে। এই মহাসংঘ ঘোষণা করিয়াছে যে প্রত্যেক জাতির ভিতরেই ভগবানকে যিনি চাহেন এবং সৎকার্য্য করেন, তিনিই ভগবানের প্রিয়। এই মহাসংঘ প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন যে যাঁহারাই ভগবানকে পাইতে চাহেন, তিনি তাঁহাদেরই নিকটে আসেন। শাস্ত্রীগণ ধর্ম্মশাস্ত্র রাশি রাশি সংগ্রহ করিতে থাকুন; কিন্তু ধর্ম্ম অতি সহজ বস্তু, এবং যে বস্তু এত সহজ অথচ আমাদের এত আবশ্যক, সেই ধর্ম্মের জীবনপ্রদ শাঁস প্রত্যেক ধর্ম্মে পাওয়া যায় বলিয়া আমার ধারণা; খোসার আকার নানাবিধ হইতে পারে। ভাবিয়া দেখ, ইহার অর্থ কি! ইহার অর্থ এই যে, সকল ধর্ম্মের ঊর্দ্ধেতে ও অধোতে, সম্মুখে ও পশ্চাতে এক চিরন্তন সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম আছে, যে ধর্ম্মে কৃষ্ণকায় বা শ্বেতকায়, পীতকায় বা রক্তকায়, সকল মনুষ্যেরই সমাবেশ হইতে পারে।" ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ইচ্ছা করিলে আমাদের প্রত্যেক পদে সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সম্মুখে ভাদ্রোৎসব—দেখা যাক।

স্ত্রী-শিক্ষা। আমরা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম যে রাজসাহী বোয়ালিয়ার ধর্ম্মসভার মুখপত্র হিন্দুরঞ্জিকা কাগজের গত আষাঢ়ের কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে স্ত্রীশিক্ষা, কেবল সাধারণ স্ত্রীশিক্ষা নহে, বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত উচ্চ স্ত্রীশিক্ষাও সমর্থন করিয়া কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। কয়েকস্থলে প্রবন্ধের মতের সহিত আমাদের মত না মিলিলেও আমরা ঘোর প্রাচীন-পন্থী একখানি কাগজে নব্যযুগের প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার এরূপ সমর্থনকেই যুগধর্ম্মের অন্যতর সুলক্ষণ বলিয়া মনে করি। ব্রাহ্মসমাজ প্রথমাবধি কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ এই যে শাস্ত্রানুশাসন বিধিমতে প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, প্রাচীনপন্থীগণ প্রতিপদে মুখে না হইলেও কার্য্যে যে অনুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, আজ বড়ই আশার কথা যে তাঁহারাই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই অনুশাসনসিদ্ধ স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন সমর্থন করিতেছেন। এই ফিরিয়া দাঁড়াইবার পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ আশ্চর্য্যরূপ সহায়তা করিয়াছেন। সত্যমেব জয়তে—সত্যেরই জয় হয়।

যুদ্ধশান্তির উৎসব। সমস্ত দেশ হইতে একটা প্রাণের কথা উঠিয়াছে যে, যুদ্ধশান্তির উৎসব উপলক্ষে টাকা সংগ্রহ করিয়া ধোঁয়াতে উড়াইয়া দেওয়া কেবল অনুচিত নহে, পাপ। পৃথিবীর অনেক অর্থ গত চার বৎসরের যুদ্ধে ধোঁয়াতে শেষ হইয়াছে। আবার যুদ্ধের শান্তিতেও, বিশেষত বর্ত্তমান দুর্বৎসরে, আমাদের মতে একটা কপর্দ্দকও বাজে কাজে খরচ করা উচিত নয়। দুইটী জিনিস আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে—আহার না পাইলে বাঁচিতে পারি না এবং কাপড় না পাইলে লজ্জা নিবারণ করিতে পারি না। এ সময়ে কি জমীদার কি প্রজা, আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে সকলেই চাঁদার কারণে এবং দুর্ম্মূল্যতার কারণে "জেরবার" হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি বলা বাহুল্য যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপের চোটে পিপীলিকার শুষ্ক উদর হইতেও হয়তো গুড় বাহির হইতে পারে। কিন্তু সেই পিপ্‌ড়ার পেট গালিয়া বাহির করা গুড়টুকুও অপচয় না করিয়া যথাসাধ্য সৎকার্য্যে ব্যয় করা উচিত। আমাদের মতে সংগৃহীত অর্থ হইতে সর্ব্বপ্রথম শীর্ষস্থানীয় উপযুক্ত লোকদিগের মত লইয়া আহারের এবং কাপড় সরবরাহের উপায় যে প্রকারেই হউক সংস্থাপিত করা উচিত।

প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে মরিতে হয় মরিব, কিন্তু বাজে ধোঁয়াতে নষ্ট করিবার জন্য এক কপর্দ্দকও দিব না।

মুদ্রাযন্ত্র আইনের ফল। আমরা সংবাদপত্রে দেখিতেছি যে গত নয় বৎসরের মধ্যে এই আইনের ফলে "৩৫০টী মুদ্রাযন্ত্র দণ্ডিত, তিনশত সংবাদ পত্র ৪০০০০ পাউণ্ড অর্থ জামিন রাখার জন্য তাগিদ প্রাপ্ত, এবং ৫০০ মুদ্রিত মাসিক পত্র, সংবাদপত্র ও পুস্তকাদির পরিচালন নিবারিত হইয়াছে। জামিন দিতে না পারায় ১০০ মুদ্রাযন্ত্র ও ১৩০ খানি সংবাদপত্রের উৎপত্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই" (ঢাকা প্রকাশ ২৮শে আষাঢ় ১৩২৬)। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে এই মুদ্রাযন্ত্র আইন করিয়া গভর্ণমেন্ট একটী বিরাট ভুল সৃষ্টি করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্র আইনে উপরোক্ত কার্য্যের কি ফল, গভর্ণমেণ্ট কি জানি কেন ইতিহাসে সুপণ্ডিত হইয়াও প্রত্যক্ষ করিতেছেন না। অবশ্য যে সকল কাগজপত্রে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সত্য সত্য রাজবিদ্রোহে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মস্তকে বজ্রদণ্ড ফেলিয়া যথার্থ দোষীদিগকে প্রচণ্ড শক্তিবলে দণ্ড করা হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু যে-সে ভুলভ্রান্তিবিশিষ্ট মানুষের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের এবং সংবাদপত্র প্রভৃতির স্বাধীনতা হরণ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। কৃষ্ণকায়ও মানুষ, শ্বেতকায়ও মানুষ; রাজাও মানুষ, প্রজাও মানুষ। প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে এক বিরাট আত্মশক্তি নিয়ত কাজ করিতেছে। আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, গভর্ণমেণ্ট নিজের স্থায়িত্ব চাহিলে—যাহা অন্তত আমরা চাহি—সেই আত্মশক্তিকে মুখ বন্ধ করিয়া সংহত হইবার অবসর দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। সংহত হইতে থাকিলে আমাদের আশঙ্কা হয় যে, যে বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্র আইনের সৃষ্টি করিলেন, সেই বিপ্লব শতগুণ বল লইয়া রাজ্য, সাহিত্য প্রভৃতি দেশের যাহা কিছু ভাল, সমস্তই অগ্নিসাৎ করিয়া দিবে। এইভাবে দেশের মুখবন্ধ করিবার ফলে ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা গভীর অসন্তোষের স্রোত দেশবাসীর হৃদয়ে যে খাত কাটিতে চলিয়াছে, সেটা গভর্ণমেণ্ট লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, সময় থাকিতে ভগবান এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের সুমতি প্রদান করুন।

ধরাধামে স্বর্গরাজ্য। যুদ্ধের শেষ বৎসরে মার্কিন যুক্তরাজ্য জাহাজবল বাড়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কোন কারণে সে প্রস্তাব স্থগিত থাকে। অবশেষে প্রস্তাবক প্যারিসের শান্তিসংঘ হইতে ফিরিয়া গিয়া নিজের নৌবল বৃদ্ধির প্রস্তাব উঠাইয়া লইয়াছেন। যতদূর বুঝা যায় যে এখন অবধি রাষ্ট্রসমূহের কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে তাহা যুদ্ধের দ্বারা মীমাংসিত না হইয়া আপোষে মীমাংসা করিবার চেষ্টা হইবে। চেষ্টা কতদূর সফল হইবে তাহা এখনও কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু এই চেষ্টা যে হইবার কথা উঠিয়াছে, তাহাই তো জগতের আত্মশক্তির উন্নতির পথে আরোহণ করিবার সুস্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। আমরা দুঃখবাদীদিগের দৃষ্টিকে আর কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না।

হিন্দু শ্বেতকায় কিনা? সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাজ্যের উচ্চতম বিচারালয়ে সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে হিন্দু শ্বেতকায় জাতির মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। শ্বেতকায় হউক আর কৃষ্ণকায়ই হউক, আমরা বিচারফলে এই কারণে সন্তুষ্ট যে অন্তত প্রাচ্য ভূখণ্ডের একটী জাতিও মার্কিনরাজ্যের স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্যান্য জাতিগণও কবে সেই স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাই দেখিবার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিয়া আছি। প্রতীক্ষা কর এবং ভগবানের আশ্চর্য্য মঙ্গলবিধান পর্য্যবেক্ষণ কর।

বিলাতে ভারতবাসী। গত ২০শে জুলাইয়ের ষ্টেটসম্যান কাগজে একটী চিত্র দেখিলাম যে সেখানে ডরিনকোর্ট নামক স্থানে "ভারতীয় শিল্প ও নাট্যসমিতি"র তত্ত্বাবধানে "আরাকানের মহারাণী" অভিনীত হইয়াছিল, এবং শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কয়েকজন ভারতবাসী মহিলা ও পুরুষ উপস্থিত থাকিয়া অভিনয়ের আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। ভারতের যে রকম দুর্বৎসর চলিতেছে, তাহাতে আমরা ইঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছি। সমিতির নিশ্চয়ই ভারতবাসী সভ্য আছেন—তাঁহারা ধনী বলিয়াও ধরা যাইতে পারে; তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য হইয়াছে যে ভারতের এই দুর্বৎসরের সময় আমোদ প্রমোদে জলের মত অর্থ ঢালিয়া দেওয়া? সেই টাকা যদি এদেশে পাঠাইতেন, তাহা হইলে না জানি কত কঙ্কালসার দরিদ্র স্বদেশবাসী অন্নবস্ত্র পাইয়া বাঁচিয়া যাইত? আমরা অবাক হইতেছি যে দেশভক্ত অনেকেও স্বদেশের দুরবস্থা ভুলিয়া গিয়া কেমন করিয়া এই অভিনয় দর্শনে আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন? যোড়করে প্রার্থনা, বিলাসবিভব সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া আগে দেশকে বাঁচাও, তারপর না হয় বিলাসকে আদরপূর্ব্বক বুকের ভিতর টানিয়া লইও। এদেশেও যে সমুদয় ধনীগণ থিয়েটারে, বায়স্কোপে রাশি রাশি অর্থের অপব্যয় করিতেছেন, তাঁহাদেরও প্রতি আমাদের অনুরোধ,

তাঁহারা অন্তত একটী বৎসর এই অপব্যয় বন্ধ করিয়া অর্থ সঞ্চিত করিয়া দেশের দুরবস্থা দূর করিতে প্রয়োগ করুন দেশবাসী দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ দিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফী বৃদ্ধির অন্যতর যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহারও মূলোচ্ছেদ হইবে। দেশের অবস্থা ভাবিয়া আর বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারি না। জানি—ইহা অরণ্যে রোদন; কিন্তু না কাঁদিয়াও থাকিতে পারি না।

ব্রাহ্মসমাজের অবনতির কারণ—ব্রাহ্মসমাজের অবনতির অনেকগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে একটী এই যে, ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা আজকাল স্বার্থ দ্বারাই বেশী পরিচালিত। কিসে টাকা পাইব, কিসে যশমান পাইব, তাহারই পশ্চাতে আমরা ধাবিত হই। ব্রাহ্মসমাজের প্রারম্ভকালে অনেকে স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া, যশোলিপ্সা মানের ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাই সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের গৌরব জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে, অনেকে দেখিলেন যে, যশমান অর্থের আশা ছাড়িয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে ধার্ম্মিক প্রভৃতি নাম এবং তদনুরূপ যশমান পাওয়া যায়, তখন তাঁহারা সেই যশের আকাজ্ক্ষাতেই প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ফলে দাঁড়াইল যে প্রচারকদিগের মধ্যে উপযুক্ত কর্ম্মী, জ্ঞানবান ও ভক্তিমান ব্যক্তি বিরল হইল। আজ যদি কোন ধর্ম্মপ্রচারকের যে কোন বিষয়ের ক্ষমতার জন্য দেশবাসী অথবা বিদেশীয়গণ সম্মান দেখাইতে প্রস্তুত হয়, তবে আমাদের মতে বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে এমন কেহ আছেন কি না সন্দেহ, যিনি সেই সম্মানপ্রাপ্তির লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন। বিলাতে সম্প্রতি সল্‌সবেরির বিশপকে লর্ডসভার সভ্য করাতে তাঁহার বন্ধুবান্ধব আনন্দ প্রকাশ করিয়া রাশি রাশি চিঠি দিতেছেন। সেই সূত্রে তিনি লিখিতেছেন যে, "লর্ডসভার সভ্য হওয়া আমার পক্ষে আনন্দের সংবাদ নহে। আমার কার্য্য এত বেশী যে লর্ডসভায় উপস্থিতি আমার পক্ষে কষ্টদায়ক হয়"। ব্রাহ্মেরাও যখন সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য আপনার স্বার্থ, যশোলিপ্সা প্রভৃতি, এক কথায় কর্ম্মফলের আকাজ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইবার অভ্যাস করিবেন, তখনই ব্রাহ্মসমাজ জয়ী হইবে; প্রাণের ভিতর ব্রহ্মোপাসক হইলেই ব্রাহ্মসমাজের জয়; মুখের কথায় ব্রাহ্মসমাজের কখনও জয় হইবে না—ইহা নিশ্চয়। মুখের লম্বাচৌড়া ভাল ভাল কথায় কখনও কোন ধর্ম্ম সমাজ উন্নতি করিয়াছে বলিয়া জানি না।

সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন—যাঁহারা আর্টের দোহাই দিয়া অশ্লীলতার বিষ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেশকে অন্তঃসারশূন্য করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সহিত আলোচনা করাই নিষ্ফল। কিন্তু যাঁহারা দেশের অপবিত্রতা দূর করিয়া দেশকে উন্নতির শিখরে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, তাঁহাদের কাগজে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে রেনল্ডস প্রণীত বিলাতের শতাব্দীপূর্ব্বের অশ্লীল চিত্রসকল ভবিষ্যৎ বংশের সম্মুখে ধারণ করিয়া এবং প্রকারান্তরে সেই সকল পুস্তক পড়িবার জন্য উৎসাহ দিয়া তাঁহারা কি সেই শুভ ইচ্ছাকে সফল করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন? বিলাতে যেমন অনেক মদ্যব্যবসায়ীগণ একদিকে সুরাপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য অনেক ধর্ম্মপ্রচার সভায় যথেষ্ট সাহায্য করেন, আবার নিজেদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য মদ্যের বহুল প্রচলনের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, এই সকল বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমাদের সেই কথাই মনে হয়—একদিকে বড় বড় প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় বলিতেছি, ধর্ম্মপথে চল, বদমায়েসী করিও না; কিন্তু সেই আমরা নিজেদের দুচারটাকার স্বার্থের জন্য, আপাত লাভের জন্য নিজেদের ছেলেপিলের মুখে অধর্ম্মের বিষ ঘড়া ঘড়া ঢালিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইতেছি না!

সংগচ্ছধ্বং। আমরা দেখিলাম, গত ১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে সংগচ্ছধ্বং শীর্ষক একটী প্যারাগ্রাফে ব্রাহ্মদের মধ্যে সম্মিলিত হইয়া সমস্ত কাজকর্ম্ম করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। হায়! ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থার সেই প্রাণে প্রাণে মিলনের ভাব যে কবে আমরা ফিরিয়া পাইব তাহা কে জানে? প্রাচীন দলের ব্রাহ্মদের সঙ্গে সঙ্গে সেই একাত্মভাব আশ্চর্য্যরূপে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কারণ—স্বার্থচিন্তা, নিজের উন্নতির জন্য গর্ব্ব ইত্যাদি। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ঠিকই বলিয়াছেন—অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং—অর্থকে ধর্ম্মপথের অনর্থ বলিয়াই নিত্য ভাবিবে। ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের কতকগুলি অঙ্গ সাধনার ফলে যোগবিভূতিস্বরূপে অর্থ মান প্রভৃতির যথেষ্ট সমাগম হইয়াছে, কিন্তু এখন আমরা সেই বিভূতির গর্ব্বে তাল সামলাইতে পারিতেছি না। কয়জন ব্রাহ্ম অর্থ যশ মান লাভ করিয়া নিজেকে ব্রাহ্মসাধারণের কাজে লাগাইয়াছেন? তাঁহারা নিজেদের উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত আছেন—কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় লোক বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজও তো বিশেষভাবে তাঁহাদের কাছে কিছু না কিছু সাহায্য প্রত্যাশা করে, কিন্তু পায় কৈ? ফলে দাঁড়ায় এই যে, ব্রাহ্মদিগের অনেকে এক স্থানে মিলিত হইলেই ঐ সকল বড় লোকদের নিন্দাসূচক অনেক আলোচনা হয়, কিন্তু সেই সব নিন্দার

মূল কারণ কেহই সেই বড়লোকদের কাছে বলিতে সাহস করে না। এই রকমে চলিতে চলিতে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের বড়লোক এবং সাধারণ, পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা ছাড়াছাড়ির ভাব জাগিয়া উঠে; তখন কেহ কাহারও সাহায্য পাইতেও চাহে না, আর কেহ কাহাকে সাহায্য দিতেও চাহে না। ক্রমে এই ভাবটা সমাজের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে—এখন যাহা হইয়াছে। যদি ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত উন্নতি প্রার্থনীয় হয়, তবে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য—ঐ সকল বড়লোকদের নিজের নিজের অর্থ মান যশের উচ্চ উচ্চ সিংহাসন হইতে নামিয়া ব্রাহ্মসাধারণকে আহ্বান করিয়া মিলন সাধনের ব্যবস্থা সংসাধিত করা। ইহা ছাড়িয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগ্রত আছে—তিন শাখারই অনেক সভ্যের মনে হয় যে, যে শাখা যত হৈ চৈ করিতে পারিবে সেই শাখারই যেন জয়। ইহাও ব্রাহ্মসমাজের অবনতির অন্যতর প্রধান কারণ। ইহার ফলে তিন শাখার পরস্পরের মধ্যে নিন্দাবাদ, পরস্পরের প্রতি সংশয় আসিয়া—হৈচৈ করিলে কি হইবে—আসলে কোন সৎকাজ করিতে দিতেছে না। এই কারণে আমরা একটী সম্মিলিত সমিতির প্রস্তাব করিয়া নববিধানসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে পত্র দিয়াছি—দেখি তাহার ফল কি হয়। এক-রাশ কথাতে কোনই ফল হইবে না—প্রাণের ইচ্ছা চাই।

জননী আমার!

(শ্রীনীরেন্দ্রকুমার দত্ত)

(১)

আমি জানিতাম শুধু অলক্ষ্যে সবার
তোর পূত মৃত্তিকার প্রতি স্তরে স্তরে
মোর পূর্ব্ব-পুরুষেরা নিশ্চিন্ত অন্তরে
রয়েছেন চির-সুপ্ত; প্রতি রেণু মাঝে
তাঁহাদের কত কীর্ত্তি নিঃশব্দে বিরাজে
ফল্গুর অন্তরবাহী সলিলের সম;
তাঁহাদের রক্ত মাংস তোরে অনুপম
গড়িয়াছে সংগোপনে; কক্ষে কক্ষে তোর
তাঁহাদের স্মৃতি-গন্ধে আজো আছে ভোর;
তাঁহাদের শেষ শ্বাস—শেষ সাধ-আশা
তোর বুকে হে জননি, লইয়াছে বাসা
অশরীরী আত্মা সম!—তোর আমি তাই
প্রাণে মনে চিরদিন পূজিবারে চাই!

(২)

মোরে কত স্নেহে যত্নে শ্রীঅঙ্কে তোমার
আজীবন পালিতেছ; মেলিয়া নয়ন
করিয়াছি তোমারেই প্রথম দর্শন
চির কল্যাণীর বেশে; শৈশব-কৈশোর
যাপিয়াছি তোমাতেই সুখে নিরন্তর
শত হাসি-খেলা মাঝে; তোমারি শিক্ষায়
দীক্ষিত যৌবনে এবে; সকল হিয়ায়
তোমারি আসন তুমি করি প্রতিষ্ঠিত
পবিত্র করেছ মোরে; কি সুধা-সঙ্গীত
মোরে করিয়াছ দান; ভুলায়ে সকলি
তব মহা সৌন্দর্য্যেতে রেখেছ কেবলি
আকণ্ঠ নিমগ্ন করি'!—তোরে আমি তাই
জন্মে জন্মে মা বলিয়া ডাকিবারে চাই!

মূর্ত্তিপূজা।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী)

আজকাল মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা কথাই শোনা যায়। উভয় পক্ষই স্বমত স্থাপনের জন্য বিবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন; কিন্তু ধীরচিত্তে শাস্ত্রালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মের—ঋষিপ্রোক্ত বৈদিক ধর্ম্মের সহিত এই মূর্ত্তিপূজার কোনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। আর্য্যধর্ম্মের মূল প্রস্রবণ যে বেদ ও উপনিষদ তাহাতে এই মূর্ত্তিপূজার সমর্থক কোন বাক্যই পাওয়া যায় না; অধিকন্তু ইহা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতিরোধক বলিয়া, লোকে যাহাতে ভ্রান্ত হইয়া এই মায়াকূপে নিপতিত না হয় তাহার জন্য অনেকস্থলে ইহার বিরুদ্ধে অনেক নিন্দাবাদ পর্য্যন্ত শোনা যায়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে একস্থলে লিখিত আছে যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে ন স বেদ, পশুরেব স দেবানাম্" অর্থাৎ যে পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে তাঁহাকে জানিতে পারে না,—সে দেবতাদিগের পশুস্বরূপ। ঋগবেদ বলিতেছেন "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" অর্থাৎ সর্ব্বত্র যাঁহার যশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে সেই পরব্রহ্মের অনুরূপ কিছুই নাই। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—আজ আমরা যে মূর্ত্তিবাদকে

হিন্দুধর্ম্মের সনাতন প্রথা বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছি,—যাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভ্রান্ত যুক্তিজালে জড়িত আত্মাকে পৃথিবীর বক্ষ হইতে উর্দ্ধে উত্তোলিত করিতে পারিতেছি না, তাহা কিন্তু সেই প্রাচীন জ্ঞানোন্নত ঔপনিষদ যুগে মোটেই ছিল না। আর্য্যধর্ম্মের সেই গৌরবময় যুগের অনেক পরবর্ত্তীকালে—পৌরাণিক যুগেই ইহার প্রথম সূত্রপাত আরম্ভ হয় বলিয়া আমাদের মনে হয়। ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থার আলোচনাতেও আমরা আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানেরই সায় পাইয়া থাকি; তখন ভারতবর্ষের পবিত্র আরণ্যক জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। জনসাধারণের দৃষ্টি তখন অনেক পরিমাণে বহির্মুখীন হইয়া পড়িতেছিল। অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া বাঞ্ছিততমের পবিত্র সঙ্গলাভ করিবার প্রবৃত্তি, বাহ্যজগতের প্রবল আকর্ষণে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিতেছিল। সামাজিক মন তখন অনেক পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল; তাই তখনকার সেই সমাজের দুর্ব্বল মনের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা দূর করিবার জন্য এই সহজপ্রাপ্য পথ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; কিন্তু পীড়িত অবস্থায় যে লঘু পথ্য আহারে লোকে ধীরে ধীরে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে, সুস্থ হইয়াও যদি তাহার প্রতি অত্যধিক মায়াবশতঃ তাহাকে ত্যাগ করিতে না পারে তখন তাহাই আবার যে নূতন রোগ ডাকিয়া আনে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর তাহার কোন ঔষধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের অবস্থাটাও এখন ঠিক এইরূপ দাঁড়াইয়াছে; তাই আমাদের আধ্যাত্মিক শরীরটা বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক—আরও দিন দিন শুকাইয়া উঠিতেছে।

মূর্ত্তিপূজা যে ঔপনিষদ নহে তাহা মহামুনি ব্যাসদেবের আক্ষেপোক্তি পাঠ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। তিনি অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারত রচনা করিবার পর ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতোধ্যানেন যৎকল্পিতং
স্তুত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্‌বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

অর্থাৎ,—

তোমার রূপ না থাকিলেও আমি ধ্যানের দ্বারা তাহা কল্পনা করিয়াছি, তুমি অনির্ব্বচনীয় হইলেও আমি স্তুতির দ্বারা তোমার অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি; তুমি সর্ব্বব্যাপী হইলেও আমি তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিতা নিরাকৃত করিয়াছি, দেব! তুমি আমার এই বিকলতাজনিত দোষত্রয়কে ক্ষমা কর।

পুরাণকর্ত্তা ব্যাসদেবের এই বাক্য হইতেও আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, পুরাণাদি ব্যতীত শ্রুতি কোথাও মূর্ত্তিপূজার বিধান দেন নাই। আমাদের দেশে শ্রুতিপ্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ। স্মৃতি পুরাণাদি শ্রুতির অনুবর্ত্তী মাত্র। শ্রুতির সহিত স্মৃতি প্রভৃতির বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিই প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। অতএব মূর্ত্তিপূজা যে হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত ইহা কোনও প্রকারে স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ এই মৃণ্ময়ী প্রতিমার পূজা তো আমাদের দেশে বেশী দিন প্রচলিত হয় নাই; অথচ আমাদের অনেকেরই ধারণা যে ইহা বুঝি ভারতের সকল স্থানে সকল কালে সমান ভাবেই আচরিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব যে এই মৃণ্ময়ী প্রতিমার পূজা আমাদের দেশে অতি অল্পদিনই প্রচলিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত অন্যত্র ইহা মোটেই প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এই যে বৎসর বৎসর মহাধুমধামের সহিত বাঙ্গালার প্রতিপল্লীতে দুর্গাপ্রতিমার অর্চ্চনা হইয়া থাকে, ইহার উৎসবের আধিক্য দেখিয়া হঠাৎ মনে হয়, বুঝি বা শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়ের পরবর্ত্তী কাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্রই এমনিভাবে ইহার অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে; কিন্তু যদি আমরা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখি তাহা হইলে জানিতে পারিব যে, ইহা মাত্র সে দিন—গত ১৪শত শতাব্দীতে রাজা জগদ্‌রাম রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। এই যে আজকাল বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কালীপ্রতিমা গড়িয়া পূজা করিবার প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, এ প্রথাও কিন্তু আমাদের দেশে বেশী দিন প্রচলিত হয় নাই। আগম-

বাগীশ কৃষ্ণানন্দই ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার প্রথম প্রচলন করিয়া যান। এইরূপ জগদ্ধাত্রী প্রতিমা-পূজাও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। সরস্বতীর প্রতিমাপূজা তো একশত বৎসরের অধিক প্রচলিত হয় নাই।

এই প্রকার প্রতিমাপূজার আর একটী বিশেষ কুফল এই যে, ইহাতে দিন দিন বাহ্য অনুষ্ঠানের অংশটাই বাড়িয়া যাইতেছে; আন্তরিকতার অংশ কমিয়া আসিয়া ইহা কেবল আজকাল একটা ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া জাঁকজমকের সহিত পূজা করিলে লোকের মনে গর্ব্বের সঞ্চার ভিন্ন যে আর কিছু হইতে পারে, তাহা ত আমাদের মনে হয় না; এবং ঐ গর্ব্ব যে তাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানোন্নতির মহা প্রতিবন্ধক তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই সকল কারণে দেশের মধ্যে প্রতিমাপূজার প্রচলন থাকিলেও শাস্ত্র কোনও দিন নির্ব্বিবাদে তাহা স্বীকার করিয়া লন নাই; চিরদিনই তাহাকে নিম্ন আসনই প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের এক স্থানে বলা হইয়াছে,—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমভাবো মূর্ত্তিপূজাঽধমাধমা॥

শ্লোকটীর ভাব হইতেছে এই যে, ব্রহ্মকে জানিবার যে কয়টী পথ আছে তাহার মধ্যে যেটা জ্ঞানের পথ সেইটাই হইতেছে সব হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার পর ধ্যানের পথটী মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম; আর মূর্ত্তিপূজা সব হইতে নিকৃষ্ট—অধমাধম।

কেবল প্রতিমাপূজা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ যে কত ছোট হইয়া গিয়াছে আমরা তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমরা নিজেরাই নিজেকে ঠকাইতেছি। দেবতার স্বর্ণসিংহাসনে কখন্ যে ভুল করিয়া "অহং"কে বসাইয়া তাহারই আরাধনায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি তাহা এখন নির্ণয়েরও বাহিরে গিয়াছে। আমাদেরই দেবতা এখন আমাদেরই মত আহার-বিহার বেশভূষা প্রভৃতির অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের স্বাভাবিক অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি এই প্রতিমাপূজার উর্ব্বরা ভূমিতে রোপিত হইয়া দিন দিন এত শীঘ্র বাড়িয়া চলিয়াছে যে, তাহার দ্বারা আমরা কেবল নিজেরাই যে সঙ্কীর্ণ ও ভেদসম্পন্ন হইয়াছি তাহা নহে, আমাদের আরাধ্যকেও আমরা আমাদেরই মত সঙ্কীর্ণ ও ভেদসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছি। আমাদের ভেদ-বুদ্ধি এতদূর বাড়িয়া গিয়াছে যে, এখন আর আমরা তেত্রিশ কোটি দেবতাতেও সন্তুষ্ট নহি। এখন আবার একটী দেবতাকেই স্থানভেদেও ভিন্ন করিতে শিখিয়াছি। "অমুক স্থানের দেবতা যেমন জাগ্রত অমুক স্থানের তেমন নন" এ কথা আমাদের মুখ হইতে এখন নিত্যই উচ্চারিত হয়; আমরা আর ইহার মধ্যে কোনই অসামঞ্জস্য দেখি না।

পুণ্যের উদ্দেশ্যে ধর্ম্মাচরণ করা আমাদের দেশের একটা চিরন্তন প্রথা। আমরা এই প্রথাকে ভাবের দিক দিয়া বড় উন্নত করিয়া দেখি। যখন কোন শুভযোগ উপলক্ষে ভারতের কোন্ সুদূর প্রান্ত হইতে ভক্ত নরনারীসকল দলে দলে আসিয়া গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হইতে থাকে, তখন আমরা সেই বিরাট দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। কিন্তু ইহার মধ্যে ভাবিবার বিষয় এই যে, কেবল পুণ্য সঞ্চয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অন্ধের মত কতক-গুলি নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেই আমাদের ধর্ম্মাচরণ সার্থক হয় না। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রখানি যে পবিত্র রসধারায় নিত্য সিক্ত হইয়া সরস হইয়া রহিয়াছে, সেই রসধারার সহিত ইহার পরিচয় ঘটা সহজ হয় না।

আর এক কথা। ভগবান্ আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্ম্মুখীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তাই তাহারা কেবল বাহিরের রূপ-রস-গন্ধাদির মধ্যে আপনাদিগকে ছড়াইয়া রাখিতে চায়, ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্তরাত্মাকে জানিবার প্রবৃত্তি তাহাদের বড় হয় না। এইরূপ রস-গন্ধাদির মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া ইন্দ্রিয়গুলিকে সংহত করিয়া অন্তরাত্মার অভিমুখীন করাই হইতেছে,—আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম ভিত্তি স্থাপন। কিন্তু যাঁহারা সাধারণতঃ বাহিরে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা আসলে বিষয়েরই উপাসনা করেন। কেবল মাত্র বাহিরের পুণ্যানুষ্ঠানে যাঁহাদের প্রীতি তাঁহারা এখনও শাস্ত্রসম্মত ঋষিকথিত আধ্যা-

স্তিকতার প্রথম সোপানেও আরোহণ করেন নাই ; এখনও তাঁহারা আত্মানুভূতি, আত্মপ্রীতির সন্ধান পান নাই।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এই বাক্যটার দ্বারা অনেকে মূর্ত্তিপূজার সমর্থন করিয়া থাকেন দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা যে মূর্ত্তিপূজার সমর্থক তাহা ত আমাদের মনে হয় না। কূটস্থ নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা বা উপাসনা করা যায় না বলিয়া সাধকেরা তাঁহার ধারণা ও উপাসনা করিবার জন্য সগুণ ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা ত অতি সত্য কথা। আমরা দেখিতে পাই যে, গীতাও এই উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতেও অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যক্তের উপাসনাই সহজ ; তাই সেখানে অতি সরল সহজভাবে বলা হইয়াছে—"ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" যাঁহারা ব্যক্তরূপকে ছাড়িয়া দিয়া ব্রহ্মের অব্যক্ত রূপের উপর আসক্ত হন, তাঁহাদের বড় বেশী কষ্টভোগ করিতে হয় ; কারণ, "অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে" দেহের উপর যাহাদের আত্মাভিমানটুকু এখনো বজায় আছে,তাহাদের বড় কষ্টে এই অব্যক্ত পথের পথিক হইতে হয়। ফুলফলভরাবনত বৃক্ষ যেমন তাহার অব্যক্ত বীজমূর্ত্তিরই বহিঃপ্রকাশ, ব্যক্তভাব—তেমনি এই নানা বিচিত্রতাময়ী সৃষ্টিরচনাও সেই অব্যক্ত ব্রহ্মেরই বহিঃপ্রকাশ, ব্যক্তভাব। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা" এই শ্লোকাংশেও গীতারই ঐ কথাটি,—ঐ ব্যক্ত জগতের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া উপাসনা করিবার কথাটাই ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে। এই জন্যই সগুণোপাসকেরা ব্রহ্মকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সর্ব্বভূতের অধিপতি বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাই বলিয়া সেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সর্ব্বভূতের অধিপতির উপাসনা করিবার জন্য কোন কপোল-কল্পিত মূর্ত্তির প্রয়োজন দেখি না। শ্রুতি বলিতেছেন,—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া এই জগতের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। অতএব তিনি যখন তাঁহার এই দুর্ব্বল সন্তানগণের প্রতি করুণা করিয়াই আত্মসৃষ্ট নামরূপের মধ্যে অনুস্যূত হইয়াই রহিয়াছেন, তখন আর ব্যক্ত জগতে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে না পারিব কেন ? তবে কেন আমরা তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইবার এই সহজ পথটী ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের অনভিমতে স্বকপোল-কল্পিত মূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিব ? তিনি ত বিশ্বেশ্বরমূর্ত্তিতে এই বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তবে আর তাঁহার উপাসনার জন্য ক্ষুদ্র মৃণ্ময় প্রভৃতি মূর্ত্তির প্রয়োজন কি ? ঐ যে শ্রুতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতেছেন,—"যস্য অগ্নিরাস্যং দ্যৌ মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিশ্চ সূর্য্যশ্চক্ষুঃ দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ" অর্থাৎ অগ্নি যাঁহার মুখ, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভি, পৃথিবী যাঁহার চরণ, সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, দিঙ্মণ্ডল যাঁহার শ্রবণ সেই লোক সকলের অন্তরাত্মা পুরুষকে নমস্কার" আজও কি আমাদের এই বদ্ধ শ্রবণযুগলে শ্রুতির ঐ গম্ভীর নিনাদ পৌঁছিবে না ? আমাদের নিত্য সম্মুখীন এই বিরাট পুরুষকে অবলোকন করিলে হৃদয়ের মধ্যে যে ভাবের,যে ভক্তির তরঙ্গ নাচিয়া উঠে—ভগবানের সর্ব্বব্যাপিতা যেরূপ পরিস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, আমাদের নিজের হাতে গড়া কল্পিত মৃণ্ময় প্রভৃতি মূর্ত্তি হইতে কি তাহা কখনও সম্ভব ? কবি যেমন তাঁহার কাব্যখানির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়াই থাকেন, তেমনি এই অনন্তবৈচিত্র্যময় বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তাও তাঁর এই স্বরচিত বিশ্বরাজ্যের মধ্যে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়াই রাখিয়াছেন। তাই ত এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কখন তাঁহার "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" রূপ দেখিয়া ভীত ত্রস্ত হইয়া পড়ি, কখন বা "আনন্দময়"রূপ দেখিয়া সুখী হই, আবার কখন বা "শান্তং শিবং" রূপ দেখিয়া শান্তি লাভ করি।

বিদ্যাসাগর।

(৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাৎসরিক স্মৃতি সভায় শ্রীরণময় সাহা কর্ত্তৃক বিতরিত)

(১)

শক্তিশালী পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর মহাত্মন্,
সাগর ছেঁচা মাণিক তুমি, বাংলা মায়ের বুকের ধন ;
বঙ্গবাসার মাথার মণি, বঙ্গদেশের অমর মান !
কর্ম্ম তোমার বিজয় কিরীট, ধর্ম্ম তোমার বিরাট দান।
হৃদয় তোমার দুঃস্থ সেবায়, বিদ্যায় তুমি উচ্চ শির ;
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(২)

বহিত তোমার মানস-মাঝে ভক্তি-নদী নিরন্তর,
মাকে দেখতে অন্নপূর্ণা বাপকে দেখতে মহেশ্বর ;
সকল দৈন্য তুচ্ছ করে' তাঁদের সেবায় সঁপে প্রাণ,
বিদ্যার্জ্জনে কৃতী হয়ে', কর্‌লে দেশে বিদ্যাদান !
"বিদ্যাসাগর কলেজ" যে আজ কীর্ত্তির তব শ্রীমন্দির ;
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(৩)

ছিলে তুমি খাঁটি মানুষ—ধারতে না ধার সুবিধার,
পাঁচশো টাকার চাকুরি ছাড়তে দেখনি তাই অন্ধকার ;
পৌরুষ তোমায় দেখিয়ে দিলে ভবিষ্যতের দীপ্ত যশ ;
ভাগ্য তোমার হাতেই গড়া ছিলে নাকো ভাগ্যের বশ।
অর্থ তোমার আশ্রয় নিল, লভিতে পথ সদ্‌গতির,
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(৪)

যত্নে তোমার উদ্‌ঘাটিত প্রথম নারী-শিক্ষাগার ;
মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হ'তে দুঃখে বঙ্গ বিধবার ;
তাদের পুনঃ পরিণয়ে শাস্ত্র বিধি বলবান্—
দেখিয়ে ছিলে, ঢেলে আপন স্বাস্থ্য-জীবন-অর্থ-মান।
সংস্কৃত-শিক্ষা সুগম, প্রভায় তব "কৌমুদী"র।
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(৫)

সাহিত্যিকের ব্যথার ব্যথী করতে আদর প্রতিভায় ;
সাক্ষ্য তাহার—জন্মদাতা অমিত্রাক্ষর কবিতার।
বঙ্গভাষার জনক তুমি, গঙ্গার যথা হিমালয় ;
"সীতার বনবাসে" তাহার লীলাভঙ্গের পরিচয়।
তোমার পুণ্যে সে ভাষা আজ সম্মানিতা পৃথিবীর ;
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(৬)

আদর্শ আজ তুমিই তাঁদের যাঁরা দেশের সুসন্তান,
তোমার স্মৃতিপূজায় সবাই শ্রদ্ধায় করেন অর্ঘ্যদান।
হৃদয় তোমার প্রয়াগ-ক্ষেত্র শিক্ষা এবং করুণার
সম্মিলিত যুগল ধারা জাহ্নবী ও যমুনার ;—
অন্তর্গতা সরস্বতী—তীর্থ তুমি ত্রিবেণীর ;
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(৭)

সহজ সরল অসন বসন—মোটা চাদর, মোটা থান,
দেশী চটির দর্পে তোমার বাড়িয়ে ছিলে জাতির মান।
স্বাধীন চিন্তা বিলাস তোমার, ত্যাগেই তোমার মহাসুখ,
যেমনি শক্তি তেমনি ক্ষমায় প্রস্ফুটিত হাস্য মুখ।
ললাট তোমার কি উন্নত-তুষার স্বচ্ছ হিমাদ্রির !
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(৮)

খুল্লে একাই অন্নসত্র দেখে দেশের মন্বন্তর !
"বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর আর্ত্তশরণ হে ঈশ্বর"—
উল্লাস ধ্বনি দীনের কণ্ঠে ; গাইলে দশে তোমার জয় !
লক্ষ্মীর বরপুত্র যত রৈল-চেয়ে সবিস্ময় !
তোমার নামে হয়না কাহার সসম্ভ্রমে নম্র শির ?
ধর এ দীন কবির পূজা হে প্রণম্য মানুষ বীর।

লিঙ্গায়ত-ধর্ম্মশাস্ত্র।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

লিঙ্গায়ত-ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে সিদ্ধান্ত-শিখামনী সর্ব্ব প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই গ্রন্থে লিঙ্গায়ত-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে। কথিত আছে যে এই গ্রন্থ-লিখিত শাস্ত্র, সর্ব্বপ্রথমে তেলঙ্গ দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ঋষি শিবযোগী রেণুকাচার্য্য দ্বারা কন্নাড়-দেশপ্রবাসী অগস্ত ঋষির নিকট বিবৃত হয়। হৈসুর-নিবাসী রাঃ রাঃ বৈঃ বীরসংগপ্পা, সংস্কৃত মুল ও ব্যাখ্যান এবং উহার অনুবাদ কন্নাড় ভাষায় মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করিয়াছেন। বাদামী (ভূতপূর্ব্ব বাতাজী) নগর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে মহাকূট নামক লিঙ্গায়তদিগের একটি তীর্থস্থান আছে। তথা হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে লিঙ্গায়তগণ লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া মলপ্রভানদীতীরে শিরমন্দির নামক একটি আশ্রম এবং ঋষিকুল বিদ্যালয়ের অনুকরণে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছে। আমি তথায় এই গ্রন্থের একখানি প্রাচীন পত্রলিপি দেখিয়াছি। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

স্বরূপনির্ণয়।

(তিনি) সচ্চিৎসুখস্বরূপ, লক্ষণশূন্য, ভেদ-রহিত, নিরাকার এবং সকল-বিপ্লব-নিবারিত (অবি-নাশী)। তিনি বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ-রহিত (নির্বিভাজ) প্রপঞ্চাতীত বৈভব (অলৌকিক-সামর্থ্য-সম্পন্ন) এবং প্রত্যক্ষাদি (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ইত্যাদি) প্রমাণের অগোচর। তিনি স্বপ্রকাশ, নীরোগ, উপমারহিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ (সর্ব্বত্র গতি-শালী, সর্ব্বব্যাপী) শান্ত, সর্ব্বশক্তিমান এবং নির-

ক্লেশ (প্রতিবন্ধরহিত)। তিনি শিব, রুদ্র, মহাদেব, ভব প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েন। তিনি অদ্বিতীয়, অনির্দ্দেশ্য, সনাতন এবং পরব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহাতে চেতনাচেতন জগৎ লীন ছিল। তিনি সর্ব্বদা আত্মস্বরূপে লীন থাকিয়া আপন তেজ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। ইহাই বিচিত্র।

শৈবমত নিরূপণ।

শৈবমত চারিশাখায় বিভক্ত। এই চারি শাখার নাম, (১) বাম, (২) দক্ষিণ (৩) মিশ্র এবং (৪) সিদ্ধান্ত। বামশাখাভুক্ত শৈবগণ শক্তির উপাসনা করে। দক্ষিণশাখাভুক্তগণ ভৈরবের উপাসনা করে, মিশ্র শৈবগণ সপ্ত মাতৃর পূজা করে এবং সিদ্ধান্তীগণ বেদকে অনুসরণ করে।

শৈবশাস্ত্রনিরূপণ।

বেদোক্ত শৈবধর্ম্মের প্রতিপাদক এবং বেদ বহিষ্কৃত জৈন ও চার্ব্বাকমতের উচ্ছেদকারী এই সিদ্ধান্ত-শিবাগম-শাস্ত্র বেদসম্মত বলিয়া মান্য হয়। বেদ এবং সিদ্ধান্ত উভয়েই একমত প্রতিপাদন করে, এইজন্য বেদ ও সিদ্ধান্ত সমপ্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত। কামিকা অবধি বাতুলা পর্য্যন্ত যে আগম কথিত আছে তাহাকে সিদ্ধান্ত-মহাতন্ত্র কহে। তাহার উত্তরভাগে বীর-শৈব-(লিঙ্গায়ত) মতের বিবরণ এবং পূর্ব্বভাগে সাধারণ-শৈবমতের বিবরণ আছে।

বীরশৈব নিরূপণ।

যাহারা শিবস্বরূপী ব্রহ্মবিদ্যা মধ্যে বিশেষভাবে রমণ (অভ্যাস) করে, তাহাদিগকে বীর-শৈব বলে। 'বির' শব্দ বিদ্যা-অর্থবোধক। সেই বিদ্যা শিব (ব্রহ্ম) এবং জীবমধ্যে সম্বন্ধ জ্ঞান করাইয়া দেয়। যাহারা এই বিদ্যাকে অভ্যাস করে, তাহাদিগকে বীরশৈব কহে। যে জ্ঞান বেদান্ত হইতে উৎপন্ন তাহাকে বিদ্যা বলে। সেই বিদ্যাকে যে অভ্যাস করে সে বীরমধ্যে গণ্য হয়। বীরশৈবগণ ভক্তাদিস্থল ভেদে ছয় ভাগে বিভক্ত।

সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র-বিবরণ।

বীরশৈবদিগের শাস্ত্র, স্থল ভেদ ধর্ম্মভেদ এবং অধিকারভেদে ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা—

(১) ভক্তস্থল, (২) মাহেশ্বরস্থল, (৩) প্রসাদিস্থল, (৪) প্রাণলিঙ্গস্থল, (৫) শরণস্থল এবং (৬) ঐক্যস্থল।

১। ভক্তস্থল পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত। (১) পিণ্ডস্থল, (২) পিণ্ডবিজ্ঞানস্থল, (৩) সংসারহেয়-স্থল, (৪) দীক্ষাস্থল, (৫) লিঙ্গধারণস্থল, (৬) বিভূতিধারণস্থল, (৭) রুদ্রাক্ষধারণস্থল, (৮) পঞ্চাক্ষরী জপস্থল, (৯) ভক্তমার্গস্থল, (১০) গুরু-অর্চ্চনস্থল, (১১) লিঙ্গার্চ্চনস্থল, (১২) জঙ্গমার্চ্চনস্থল, (১৩) গুরুপ্রসাদস্থল, (১৪) লিঙ্গপ্রসাদস্থল এবং (১৫) জঙ্গমপ্রসাদস্থল।

ভক্তস্থলে তিন প্রকার দানের উল্লেখ আছে। (১) উপাধিদান, (২) নিরুপাধিদান এবং (৩) সহজদান।

দীক্ষাস্থল ত্রিবিধ। (১) বেধারূপা, (২) ক্রিয়ারূপা, এবং (৩) মন্ত্ররূপা।

২। মাহেশ্বর স্থল নবম ভাগে বিভক্ত। (১) মাহেশ্বরস্থল, (২) লিঙ্গনিষ্ঠস্থল, (৩) পূর্ব্বাশ্রয়নিরসনস্থল, (৬) অষ্টমূর্ত্তিনিরসনস্থল, (৭) সর্ব্বগত্বনিরসনস্থল, (৮) শিবজগন্ময়স্থল এবং (৯) ভক্তদৈহিকলিঙ্গস্থল।

৩। প্রসাদিস্থল সপ্তমভাগে বিভক্ত। (১) প্রসাদিস্থল, (২) গুরুমাহাত্ম্যস্থল, (৩) লিঙ্গপ্রশংসাস্থল, (৪) জঙ্গমগৌরবস্থল, (৫) ভক্তমাহাত্ম্যস্থল, (৬) শরণকীর্ত্তনস্থল এবং (৭) শিবপ্রসাদমাহাত্ম্যস্থল।

৪। প্রাণলিঙ্গস্থল পঞ্চভাগে বিভক্ত (১) প্রাণলিঙ্গস্থল, (২) প্রাণলিঙ্গার্চ্চনস্থল, (৩) শিবযোগসমাধিস্থল, (৪) লিঙ্গনিজস্থল এবং (৫) অঙ্গলিঙ্গস্থল।

৫। শরণস্থল চতুর্ভাগে বিভক্ত। (১) শরণ স্থল, (২) তামস-বর্জ্জনস্থল, (৩) নির্দ্দেশস্থল এবং (৪) শীলসম্পাদনস্থল।

৬। ঐক্য স্থলও চতুর্ভাগে বিভক্ত। (১) ঐক্যস্থল, (২) আচারসম্পত্তিস্থল, (৩) একভাজনস্থল এবং (৪) সহভোজনস্থল।

উপরি উক্ত ভক্তাদি ষষ্ঠস্থলে যে সকল সদাচার বর্ণিত আছে, তাহা যথারীতি পালন করিবার উপযুক্ত হইবার জন্য ষষ্ঠপ্রকার লিঙ্গস্থল আছে।

১। ভক্তলিঙ্গস্থল নবম ভাগে বিভক্ত। (১) দীক্ষাগুরুস্থল, (২) শিক্ষাগুরুস্থল, (৩) প্রজ্ঞাগুরুস্থল, (৪) ক্রিয়ালিঙ্গস্থল, (৫) ভাব-

লিঙ্গস্থল, (৬) জ্ঞানলিঙ্গস্থল, (৭) স্বয়ংস্থল, (৮) চরস্থল এবং (৯) পরস্থল।

২। মাহেশ্বরলিঙ্গস্থল, নবম ভাগে বিভক্ত। (১) ক্রিয়াগমস্থল, (২) ভাবাগমস্থল, (৩) জ্ঞানাগমস্থল, (৪) সকায়স্থল, (৫) অকায়স্থল, (৬) পরকায়স্থল, (৭) ধর্ম্মাচারস্থল, (৮) ভাবাচারস্থল এবং (৯) জ্ঞানাচারস্থল।

৩। প্রসাদিলিঙ্গস্থল, নবম ভাগে বিভক্ত। (১) কায়ানুগ্রহস্থল, (২) ইন্দ্রিয়ানুগ্রহস্থল, (৩) প্রাণানুগ্রহস্থল, (৪) কায়ার্পিতস্থল, (৫) করণার্পিতস্থল, (৬) ভাবার্পিতস্থল, (৭) শিষ্যস্থল, (৮) শুশ্রূষাস্থল এবং (৯) সেব্যস্থল।

৪। প্রাণলিঙ্গস্থল, নবম ভাগে বিভক্ত। (১) আত্মস্থল (২) অন্তরাত্মস্থল (৩) পরমাত্মস্থল (৪) নির্দ্দেহাগমস্থল, (৫) নির্ভাগগমস্থল, (৬) নষ্টাগমস্থল (৭) আদিপ্রসাদস্থল (৮) অন্তঃপ্রসাদস্থল এবং (৯) সেব্যপ্রসাদস্থল।

৫। শরণলিঙ্গস্থল, দ্বাদশভাগে বিভক্ত। (১) দীক্ষাপাদোদকস্থল (২) শিক্ষাপাদোদক স্থল (৩) জ্ঞানপাদোদক স্থল (৪) ক্রিয়ানিস্পত্তিক স্থল (৫) ভাবনিস্পত্তিক স্থল (৬) জ্ঞাননিস্পত্তিক স্থল (৭) পিণ্ডাকাশস্থল (৮) বিন্দাকাশস্থল, (৯) মহাকাশস্থল (১০) ক্রিয়াপ্রকাশস্থল (১১) ভাবপ্রকাশস্থল এবং (১২) জ্ঞানপ্রকাশস্থল।

৬। ঐক্যলিঙ্গস্থল, নবম ভাগে বিভক্ত। (১) স্বীকৃতপ্রসাদৈকস্থল (২) শিষ্টোদনস্থল (৩) চরাচরলয়স্থল (৪) ভাণ্ডস্থল (৫) ভাজনস্থল (৬) অঙ্গালেপস্থল (৭) স্বপরাজ্ঞাস্থল (৮) ভাবাভাববিনাশস্থল (৯) জ্ঞানশূন্যস্থল।

তত্ত্বস্থল।

শিব-(ব্রহ্ম) শক্তি হইতে উৎপন্ন এই সংসারে শুদ্ধান্তঃকরণ (নিস্পাপ) প্রাণ, পিণ্ডনামে অভিহিত হয়। যিনি পুণ্যময়, ক্ষীণপাপ (অপাপ-বিদ্ধ) শুদ্ধাত্মা, তাঁহাকে পিণ্ড কহে। কেবলমাত্র শিব (ব্রহ্ম) এই পিণ্ড নামের অধিকারী। তিনি সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর। সেই নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, নির্গুণ, নিস্প্রপঞ্চক পিণ্ডের অংশ হইয়াও অনাদিকালীন অজ্ঞানতাবশতঃ জীবগণ উক্ত (জীব) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। দেব, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি ও নানাপ্রকার বিভিন্ন জাতি সর্ব্বদা সেই মায়াময় পরমেশ্বরের শরণপথে রহিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগকে যথারীতি নিয়মে প্রতিপালন করিতেছেন।

চন্দ্রকান্তমণিমধ্যে যেমন জল, সূর্য্যকান্তমণিমধ্যে যেরূপ অগ্নি, বীজমধ্যে যথা অঙ্কুর স্বভাবতঃ অবস্থান করে, আত্মা মধ্যে সেইরূপ শিব (ব্রহ্ম) অবস্থিত আছেন। সূর্য্যমধ্যে যেরূপ বিম্বত্ব এবং প্রতিবিম্বত্ব উভয়ই বর্ত্তমান আছে, ব্রহ্মমধ্যে সেইরূপ জীব এবং ঈশ্বর একত্রে বর্ত্তমান আছে। চিৎস্বরূপ পরতত্ত্বে ভোক্তৃত্ব, ভোজ্যত্ব এবং প্রেরকত্ব এই তিন গুণই বর্ত্তমান আছে। সেই পরব্রহ্ম মধ্যে সত্ত্ব, রজ এবং তমোময়(ত্রিগুণাত্মিকা) শক্তিকে অনাদিসিদ্ধ কহে। তাহাদিগের বৈষম্যহেতু এই ত্রিবিধ বস্তু (ভোক্তৃত্বাদি) সমুৎপন্ন হইয়াছে। কিঞ্চিৎ সত্ত্বগুণ এবং তামসগুণসম্পন্ন ও রজগুণসম্পন্ন চৈতন্যকে ভোক্ত্ (জীব চৈতন্য), কহে। অতিশয় তামসগুণসম্পন্ন চৈতন্য, ভোজ্য (রসাদি) নামে অভিহিত হয়।

ভোক্তা, ভোজ্য এবং প্রেরয়িতা এই তিনকে বস্তু কহে। ব্রহ্মস্বরূপ অখণ্ড তথাপি সত্ত্ব রজ এবং তম এই গুণত্রয়ের অল্পাধিক্যবশতঃ উক্ত বস্তুত্রয় কল্পিত হয়। এই ব্রহ্মস্বরূপ মধ্যে শুদ্ধোপাধি শঙ্কর মহেশ্বর নামে অভিহিত হন। মিশ্র-উপাধিযুক্ত ভোক্তাকে পশু কহে। ভোজ্য অব্যক্ত (অস্পষ্ট) চৈতন্য এবং কেবল তামসগুণসম্পন্ন। প্রেরক শম্ভু সর্ব্বজ্ঞ। কিঞ্চিদজ্ঞ জীবনামে অভিহিত হয়। যাহা অত্যন্ত গূঢ়(গুপ্ত) চৈতন্য, তাহাকে জড় কহে।

উপাধি দুই প্রকার। (১) শুদ্ধোপাধি এবং (২) অশুদ্ধোপাধি। শুদ্ধ উপাধিই শ্রেষ্ঠ মায়া। ইহা স্বাশ্রয়া (নিজস্বরূপে আশ্রিত) এবং মোহকারিণী।

অবিদ্যাকে অশুদ্ধ উপাধি কহে। সেই অবিদ্যার সম্বন্ধবশতঃ পরমাত্মা মোহান্বিত হন। অবিদ্যাশক্তির ভেদমূলে নানাপ্রকার জীব সৃষ্ট হইয়াছে। মায়াশক্তির বশে পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা নিত্যমুক্ত হইয়াও নানা মূর্ত্তি ধারণ করেন। জীব অল্প (সামান্য) কর্ম্মকারী, এইজন্য অল্পজ্ঞ এবং বদ্ধ

(সীমাবদ্ধ) অনাদিকাল হইতে দেহধারী থাকিয়া অবিদ্যার মোহে বিস্মৃতবশতঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া আপনাপন কর্ম্মানুসারে দেব, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি চৌরাশী লক্ষ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসারে জাতি, আয়ু, ভোগ, বৈশম্য, সুখদুঃখ মধ্যে চক্রনেমীবৎ পরিভ্রমণ করে।

পরমেশ্বর কর্ম্মরূপী যন্ত্রের আবর্ত্তনে আকৃষ্ট প্রাণিমাত্রের (কর্ম্মাকর্ম্মের) প্রেরক এবং সাক্ষী-স্বরূপ। তিনি প্রাণিমাত্রের প্রেরক হেতু তাহা-দিগকে কল্যাণকর পথ (সৎপথ) এবং জন্ম-মরণ-রহিত মোক্ষপথের উপদেষ্টা।

আপন কর্ম্মের পরিচালক হইলে (কর্ম্মভোগ শেষ হইলে) অসৎ ইচ্ছা নাশ প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের কৃপায় জীবের মন শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ কর্ম্মের উদয় হইলে জীবের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং (শিব) (পরমেশ্বরের) কৃপায় উত্তম প্রকার শিবশক্তি (ব্রহ্মজ্ঞান) উৎপন্ন হয়। যে জীব একপ্রকার দেহমধ্যে (জন্মমধ্যে) মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে পিণ্ড কহে। ইতি পিণ্ডস্থল।

৺রায় ব্রহ্মমোহন মল্লিক বাহাদুর।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

বিগত ২৮শে আষাঢ় রবিবার প্রত্যূষে ৫॥০টার সময় গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রায় ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয় ৮৮ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দধামে যাত্রা করিয়াছেন।

ব্রহ্মমোহন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন তারিখে কলিকাতা পঞ্চাননতলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন—দারিদ্রহেতু পুত্রকে উপ-যুক্ত শিক্ষা দিবারও ইচ্ছা বা সামর্থ্য ছিল না—কিন্তু পরি-শ্রম স্বাবলম্বন, চেষ্টা ও বুদ্ধিশক্তির সহায়ে মানুষ কিরূপে উন্নতির উচ্চ-শিখরে অধিরোহণ করিতে পারে—ইঁহার জীবন তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শৈশবে ইনি সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা আদর্শ-বাঙ্গলা-বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করেন। অল্প কালের মধ্যেই শিক্ষ-কেরা তাঁহার অসাধারণ শ্রমশীলতা, তীক্ষ্ণমেধা ও প্রখর বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। ঐ স্কুলে দুই বৎসর থাকিবার পর স্বনামধন্য David Hare মহোদয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলুটোলা স্কুলে অবৈতনিক ছাত্রদের অন্যতম-রূপে তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করেন এবং তথা হইতে হিন্দু-কালেজে প্রবেশ করিয়া অবশেষে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়াশুনা করিয়া অধ্যয়ন শেষ করেন। ব্রহ্ম-মোহন বাবু হিন্দুকলেজ ও প্রেসিডেন্সি কালেজের একজন উৎকৃষ্ট মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং প্রতি পরীক্ষাতেই উচ্চ-বৃত্তি লাভ করিতেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে যে সুপ্রসিদ্ধ Woodrow সাহেবও মাঝে মাঝে কঠিন কঠিন অঙ্ক লইয়া তাঁহাকে ডাকিতেন এবং ব্রহ্মমোহন বাবু স্বচ্ছন্দে ঐ সকল অঙ্ক কষিয়া দিতেন। তিনি সিনীয়র বৃত্তি পরীক্ষাতেও (Senior Scholarship Examination) উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সেই দুরূহ সিনীয়রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণগণের মধ্যে আর কেহই বাঁচিয়া রহিলেন না। তিনি তাঁহার পড়াশুনার ব্যয় আপ-নিই চালাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতাকে তাঁহার স্কুলকলেজে পড়াশুনার জন্য সর্ব্বসমেত ৬৲ টাকা মাত্র ব্যয় করিতে হইয়াছিল। 'বেতন হিসাবে আর একটি পয়সাও তাঁহাকে খরচ করিতে হয় নাই।' কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া ১৮৫৬ সালে ব্রহ্মমোহন বাঁকুড়া জেলার স্কুলসমূহ দেখিবার জন্য ডেপুটি-ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তিনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়া-ছিলেন। তৎপরে তিনি বদলী হইয়া হাবড়ায় আসেন। এই সময় কলিকাতায় Education Gazette নামক পত্রিকাখানি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করি-য়াছিল। তিনি ঐ কাগজে 'রণজিৎ সিংহের জীবন-বৃত্তান্ত' লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বা-চিত হইয়াছিল। হাবড়ায় অবস্থানকালে তিনি কলি-কাতা হুঁকাপটিতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন—তাহার নাম Model School। বর্দ্ধমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল সুবি-খ্যাত তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ স্কুলের হেড্-মাষ্টার ছিলেন। তৎপরে প্রায় দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া তিনি হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের হেড্মাষ্টার ছিলেন। তিনি এরূপ সুচারুরূপে কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেন ও সকলের প্রতি এরূপ বিনয়-নম্র ব্যবহার করিতেন, যে ছাত্র, শিক্ষকও কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহাকে ভালবাসিতেন। ১৮৭৭ সালে সহকারী স্কুল-ইন্সপেক্টরের পদ প্রথম সৃষ্টি হইলে তিনি সর্ব্বপ্রথম আপন গুণে ঐ পদ প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুদিন পরে কুচবেহার রাজ-ষ্টেটে শিক্ষা বিভাগের উৎকর্ষ সাধন জন্য তিনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হন। তিন চারি মাস কাল সেখানে অবস্থান করিয়া তিনি উহার উন্নতিকল্পে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ অনুমোদিত হয় তদনুযায়ী কার্য্য

অদ্যাপিও বলিয়া আসিতেছি। পরে প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহার স্থানে স্কুল-ইন্সপেক্টর নির্ব্বাচিত হ'ন এবং সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়া সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেন। বহুবৎসর শিক্ষাকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া ব্রহ্মমোহন বঙ্গদেশে নানাস্থানে স্কুল-পাঠশালাদি খুলিতে সচেষ্ট ছিলেন এবং জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ-অনুরাগী ছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম মাতৃভাষায় জ্যামিতি প্রণয়ণ করেন। উহার পরিভাষা সম্পূর্ণ তাঁহারই রচিত। এবং ১৮৭২ সালে উহা মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচিত জ্যামিতি ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি পুস্তক বঙ্গভাষায় গণিত বিদ্যাশিক্ষা প্রদানে সোপান স্বরূপ দিন। একখানি ভূগোলের পুস্তকও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা প্রকাশিত হয় নাই।

তিনি ১৮৮৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও Central Text Book Committeeর সভ্য হন। সুযোগ্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত Indian Association for the Cultivation of Scienceএর তিনি আজীবন সভ্য ছিলেন। Sir Stnart Campbell এর শাসনকালে ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; এই পরীক্ষাকে Statutory Civil Sariroe পরীক্ষা বলা হইত; ব্রহ্মমোহন বাবু তিন বৎসরই এই পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁহার অন্তর অতি মহৎ ছিল। ক্ষমা, সৌজন্য, সকলের প্রতি বিনয়-নম্র ব্যবহার, শিশুর মত সারল্য তাঁহার চিত্তের আভরণ স্বরূপ ছিল। হিংসা বিদ্বেষ তাঁহার মনে কদাপি স্থান পায় নাই। তিনি নির্দ্বন্দ্ব, নিরহঙ্কার, এবং ধনী নির্ধনে সমদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন।

বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্ম।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

এক সময়ে এইরূপ ধারণা প্রবল ছিল যে হিব্রু ভাষাই প্রাচীনতম ভাষা এবং অন্যান্য ভাষা উহা হইতে উৎপন্ন। অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে সে ধারণা চলিয়া গিয়াছে এবং বিদ্বৎমণ্ডলী বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গ্রীক, ইটালীয় এবং সংস্কৃত ভাষার মূল একই আকরের মধ্যে নিহিত। রোমন ক্যাথলিক প্রচারকগণ সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে গমন করিয়া কোন কোন বিষয়ে বাইবেলের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সৌসাদৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের এইরূপ ধারণা ছিল যে বাইবেলে যাহা আছে তাহা অনন্যসাধারণ। তাঁহারা তিব্বতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, পাপস্বীকার উপবাস সংসারত্যাগ ও মালাজপ উভয় ধর্ম্মের মধ্যে প্রায়ই এক। কিন্তু কেমন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে এই ঐক্য আসিয়া দাঁড়াইল? পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারমূলক ধর্ম্ম। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণ দেশ-বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। গ্রীস দেশেও তাঁহাদের প্রভাব বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীসীয় প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে এইরূপ অনেক কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা ভারতবর্ষ হইতে সেখানে গিয়া গ্রীসীয় পরিচ্ছদে শোভা পাইতেছে। বাইবেলের ভিতরেও এইরূপ নিদর্শনের অভাব নাই। বৌদ্ধজাতকের অনেক গল্প বাইবেলের উভয় খণ্ডের ভিতরে স্থান পাইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে সেণ্ট জোসেফ বুদ্ধদেবের নামান্তর মাত্র। সলোমনের বিচার-বিবরণের ছায়া বৌদ্ধগ্রন্থের ভিতরে রহিয়াছে; পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য মাত্র। একজনের দুই স্ত্রী ছিল, প্রথম স্ত্রীর পুত্র হয় নাই। দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি পুত্র হইয়াছিল। প্রথম স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের ভার প্রথম স্ত্রীর উপরে অর্পিত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরে উভয় স্ত্রীই ঐ সন্তানের দাবী করে। যিসাকার নিকট তাহারা বিচারার্থী হইয়া গমন করে। যিসাকা বলিলেন দুইজনের মধ্যে যে বলপূর্ব্বক সন্তানটি ছিনাইয়া লইতে পারিবে, সন্তানটি তাহারই। যখন শিশুটি উভয়ের বলপ্রয়োগফলে কাঁদিয়া উঠিল, একজন শিশুর ক্রন্দন শ্রবণে নিরস্ত হইয়া গেল। যিসাকা তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন যে শেষোক্ত স্ত্রীলোকই তাহার প্রকৃত মাতা। Prodigal sonএর কাহিনীও বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতরে রহিয়াছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস অটল থাকিলে জলের উপর দিয়া চলা যায় এবং বিশ্বাস হারাইবামাত্র জলে নিমগ্ন হইতে হয়, বাইবেলের এই কাহিনীও বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তকে দেখা যায়। এইরূপ সাদৃশ্য

আকস্মিকতার ফলে হয় নাই। আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে লূকের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের ঐ সমস্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কয়েকখানি রুটি ও কয়েকটি মৎস্য লইয়া অসংখ্য লোককে খাওয়াইবার বৃত্তান্ত বাইবেলে রহিয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রের কাহিনীর সহিত উহার পার্থক্য এই যে একখানি রুটি খণ্ড খণ্ড করিয়া পাঁচশত লোককে খাওয়াইয়াও এত উদ্বৃত্ত রহিয়া গেল যে তাহা পর্ব্বত গুহায় নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। পণ্ডিত মোক্ষমুলার বলেন যে খৃষ্টের আবির্ভাবের একশত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধগণের সংস্পর্শে এইরূপ অনেক কাহিনী পাশ্চাত্য ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছিল। মোক্ষমুলার নিজে সিদ্ধান্ত না টানিয়া পাঠকের উপর সিদ্ধান্তের ভার দিয়াছেন। আমরা মোক্ষমুলারের ইঙ্গিতে বলিতে চাই যে অনেক বিষয়ে বাইবেল বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট ঋণী।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

আমাদের বেদান্তশাস্ত্রের উক্ত সিদ্ধান্তই কাণ্ট প্রভৃতি অর্ব্বাচীন পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞানীরাও স্বীকার করিয়াছেন, নামরূপাত্মক জগতের মূলে অবস্থিত, নামরূপ হইতে ভিন্ন, এই যে কিছু অদৃশ্য দ্রব্য তাহাকেই তাঁহারা আপন গ্রন্থে 'বস্তুতত্ত্ব' বলিয়া এবং নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নামরূপকে 'বহির্দৃশ্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।* কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল নামরূপাত্মক বহির্দৃশ্যকে 'মিথ্যা' বা 'নশ্বর' এবং মূল দ্রব্যকে 'সত্য' বা 'অমৃত' এইরূপ বলিবার রীতি আছে। সাধারণ লোক 'চক্ষুর্বৈ সত্যং' অর্থাৎ চোখে যাহা দেখা যায় তাহাই সত্য, এইরূপ সত্য শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে; এবং লোকব্যবহারেও লাখ টাকা পাইয়াছি এইরূপ স্বপ্ন দেখা কিংবা লাখ টাকা পাইবার কথা কাণে শোনা, এবং লাখ টাকা হাতে পাওয়া,—ইহাদের মধ্যে যে অনেক প্রভেদ, আছে তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। এইজন্য কাণাঘুসা কোন কথা যে শুনে এবং চক্ষে যে দেখে, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিবে ইহা বলিবার জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে, 'চক্ষুর্বৈ সত্যং' এই বাক্য আসিয়াছে (বৃ. ৫. ১৪. ৪)। কিন্তু টাকা পদার্থটি—'টাকা' দৃশ্যটি নাম ও রূপে অর্থাৎ বর্ত্তুল আকৃতিতে, সত্য কিনা—যে শাস্ত্র ইহার নির্ণয় করিবে সেই শাস্ত্রে সত্যের এই আপেক্ষিক ব্যাখ্যা কি উপযোগী? ব্যবহারেও দেখা যায় কোন ব্যক্তির কথায় যদি মিল না থাকে, যদি সে এখন এ কথা পরক্ষণে আর এক কথা বলিতে থাকে তখন লোকে তাহাকে মিথ্যুক বলে। তাহা হইলে, 'টাকার' নামরূপের প্রতি (আভ্যন্তরিক দ্রব্য সম্বন্ধে নহে) ঐ ন্যায়ই প্রয়োগ করিয়া টাকাকে মিথ্যুক কিংবা মিথ্যা বলিতে বাধা কি? কারণ, টাকার এই চক্ষুগ্রাহ্য নামরূপ আজ টাকা হইতে বাহির করিয়া লইয়া কাল তাহার স্থানে 'চেন' কিংবা 'পেয়ালা' এই নামরূপ দেওয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ নামরূপ নিত্য তফাৎ হয়, নামরূপের মিল থাকে না, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া চোখে যাহা দেখা যায় তাহা ব্যতীত আর কিছুই সত্য নহে এইরূপ বলিলে, একীকরণের যে মানসিক ক্রিয়াতে জগৎজ্ঞান হয় সেই ক্রিয়াও চোখে দেখা যায় না অতএব তাহা মিথ্যা এইরূপ বলিতে হয়; সেইজন্য আমাদের সমস্ত জ্ঞানকেই মিথ্যা বলিতে হয়। এই বাধা এবং এইরূপ অন্য বাধার কথা মনে আনিয়া, যাহা চোখে দেখা যায় এইরূপ সত্যকে, সত্যের এই লৌকিক ও আপেক্ষিক লক্ষণকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া, যাহা অবিনাশী অর্থাৎ অন্য সমস্ত বিষয় লোপ পাইলেও যাহা কখনই লোপ পায় না তাহাই সত্য, সমস্ত উপনিষদে এই প্রকার সত্য শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এবং সেইরূপ মহাভারতেও—

সত্যং নামাঽব্যয়ং নিত্যমবিকারি তথৈব চ। †

অর্থাৎ—"যাহা অব্যয় অর্থাৎ কখন বিনাশ পায় না, নিত্য অর্থাৎ চিরকাল সমান থাকে এবং অবিকারী অর্থাৎ যাহার পরিবর্ত্তন কখনই হয় না, তাহাই সত্য"—এইরূপ সত্যের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে (মভা, শাং. ১৬২. ১০)।

---

* কাণ্টের *Critique of Pure Reason* গ্রন্থে এই বিচার করা হইয়াছে। নামরূপাত্মক জগতের মূলে অবস্থিত দ্রব্যকে তিনি 'ডিং আন্ জিশ্' (Ding an sich—Thing in itself) এইরূপ নাম দিয়াছেন এবং ইহারই ভাষান্তর আমরা বস্তুতত্ত্ব করিয়াছি। নামরূপের অবভাস কাণ্টের 'এরশায়নুঙ্' (Ercheinung—appearance)। কাণ্টের মতে 'বস্তুতত্ত্ব' অজ্ঞেয়।

† গ্রীন real এর (সৎ সত্য) ব্যাখ্যা করিবার সময় "whatever anything is *really*, it is *unalterably*" এইরূপ বলিয়াছেন (*Prolegomena to Ethics* § 25)। গ্রীনের এই ব্যাখ্যা এবং মহাভারতের উপরি উক্ত ব্যাখ্যা এই দুই তত্ত্বতঃ একই।

এখন এক কথা বলা, আর এক সময়ে আর-এক কথা বলা—এই ব্যবহারকে যে মিথ্যা ব্যবহার বলা হয়, ইহাই তাহার বীজ। সত্যের এই নিরপেক্ষ লক্ষণ স্বীকার করিলে,—চোখে দেখিলেও ক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল নামরূপ মিথ্যা; এবং চোখে না দেখা গেলেও নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত ও নামরূপের মূলে সতত সমানভাবে অবস্থিত অমৃত বস্তুতত্ত্বই সত্য, এইরূপ অগত্যা বলিতেই হয়। ভগবদ্গীতাতে "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্থ ন বিনশ্যতি" (গী. ৮. ২০; ১৩. ২৭) সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের নামরূপাত্মক শরীর লোপ পাইলেও যাহা লোপ পায় না তাহা অক্ষর ব্রহ্ম—ব্রহ্মের এইরূপ যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা এই ভাবেই করা হইয়াছে। মহাভারতে নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত ধর্ম্মের নিরূপণে, "যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু" ইহার বদলে 'ভূতগ্রামশরীরেষু' এইরূপ পাঠভেদে এই শ্লোকই পুনর্ব্বার আসিয়াছে (মভা. শাং. ৩৩৯. ২৩)। সেইরূপ আবার, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬ ও ১৭ শ্লোকের তাৎপর্য্যও ইহাই। বেদান্তে 'অলঙ্কার' মিথ্যা এবং 'সুবর্ণ' সত্য এইরূপ যখন বলা হয়, তখন অলঙ্কার নিরুপযোগী কিংবা একেবারেই মিথ্যা, অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর, অথবা মাটীতে গিল্টী করা অর্থাৎ উহার মূলেই অস্তিত্ব নাই এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে না। 'মিথ্যা' শব্দ এইস্থানে পদার্থের বর্ণরূপাদি গুণ ও আকৃতি অর্থাৎ উপরকার বাহ্য দৃশ্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, আভ্যন্তরিক তাত্ত্বিক দ্রব্যের লক্ষণসম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। কারণ, তাত্ত্বিক দ্রব্য চিরকালই সত্য, ইহা মনে রাখিতে হইবে। পদার্থমাত্রের নামরূপাত্মক আবরণের নীচে মূলদেশে কি তত্ত্ব আছে বেদান্তী তাহাই দেখেন; তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়ই ত তাহাই। ব্যবহারেও আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, কোন গহনা গড়াইবার জন্য আমরা অনেক মজুরী দিলেও আপৎকালে সেই গহনা পোদ্দারের নিকট বিক্রয় করিবার সময়, পোদ্দার আমাদিগকে স্পষ্ট এই কথা বলে যে "গহনা গড়াইতে তোলা-পিছু কত খরচা হইয়াছে আমি তা দেখিব না; তুমি এই গহনা যদি সোনার দরে দাও ত কিনিব!" বেদান্তের পরিভাষায় এই বিচারই ব্যক্ত করিতে হইলে "পোদ্দারের চোখে গহনা মিথ্যা ও গহনার সোনাটাই সত্য" এইরূপ বলিতে হয়। নূতন গঠিত গৃহ বিক্রয় করিবার সময় উক্ত গৃহের সুন্দর আকার (রূপ:), অথবা সুবিধাজনক রচনা (আকৃতি) করিতে কত খরচা হইয়াছে সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, গৃহের মালমসলা ও কাঠের দামে আমাকে বিক্রয় কর, খরিদ্দার এইরূপ বলিয়া থাকে। নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম সত্য বেদান্তের এই উক্তির অর্থ উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে। দৃশ্য জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ জগৎ চক্ষে দেখা যায় না এরূপ অর্থ গ্রহণ করিবে না; একই দ্রব্যের নামরূপের ভেদে উৎপন্ন জগতের অনেক স্থলকৃত কিংবা কালকৃত দৃশ্য নশ্বর অতএব মিথ্যা, এবং এই সমস্ত নামরূপাত্মক দৃশ্যের আবরণের নীচে নিয়ত অবস্থিত অবিনাশী ও অপরিবর্ত্তনীয় দ্রব্যই নিত্য ও সত্য, ইহাই তাহার প্রকৃত অর্থ। পোদ্দারের নিকট গোট, তাবিজ, বাজুবন্দ, হার প্রভৃতি গহনা মিথ্যা এবং সেই সব গহনার সোনাই সত্য; কিন্তু জগতের যে স্বর্ণকার, তাঁহার কারখানায় মূল এক দ্রব্যেরই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ দিয়া তাহার সোনা, পাথর, কাঠ, জল, বায়ু প্রভৃতি, সমস্ত গহনা গড়া হয় বলিয়া বেদান্তী পোদ্দার অপেক্ষা আরও কিছু বেশী তলাইয়া সোনা, রূপা কিংবা পাথর প্রভৃতি নামরূপকে গহনারই ন্যায় মিথ্যা জানিয়া এই সমস্ত পদার্থের মূলে অবস্থিত দ্রব্য অর্থাৎ বস্তুতত্ত্বই সত্য অর্থাৎ অবিকারী সত্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। এই বস্তুতত্ত্বের নামরূপ আদি কোন গুণই না থাকা প্রযুক্ত উহা নেত্রাদির গোচর কখনই হইতে পারে না। কিন্তু চক্ষে না দেখিলেও, নাকে আঘ্রাণ না করিলেও, হাতে স্পর্শ না করিলেও অব্যক্তরূপে তাহা থাকেই, এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা অনুমান করা যায় শুধু নহে, কিন্তু জগতে যাহার কখন পরিবর্ত্তন হয় না এমন একটা কিছু:যাহা আছে তাহাই সত্য বস্তুতত্ত্ব, এরূপও নিশ্চয় করিতে হয়। ইহাকেই জগতের মূল সত্য বলে। কিন্তু সত্য ও মিথ্যা, বেদান্তশাস্ত্রের এই শব্দের পারিভাষিক অর্থ লক্ষ্য না করিয়া কিংবা আমরা এই শব্দের যে অর্থ মনে করি তাহা হইতে ভিন্ন অর্থ হইতে পারে কি না ইহা দেখিবার কষ্ট স্বীকার না করিয়া "আমাদের চোখে প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগতও বেদান্তী মিথ্যা বলে, এর উপায় কি?" এই কথা বলিয়া কতকগুলি অজ্ঞ বিদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিতম্মন্য লোকও অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাস্কের উক্তি অনুসারে বলিতে পারি যে, অন্ধ যে স্তম্ভ দেখিতে পায় না তাহা কিছু স্তম্ভের দোষ নহে! নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অতএব নশ্বর নামরূপ সত্য নহে; যে ব্যক্তি সত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী তত্ত্ব দেখিতে চায় তাহার দৃষ্টি নামরূপ ছাড়াইয়া নামরূপের বাহিরে যাওয়া চাই, ছান্দোগ্য (৬. ১; ও ৭. ১), বৃহদারণ্যক (১. ৬. ৩), মুণ্ডক (৩. ২. ৮), এবং প্রশ্ন (৬. ৫) প্রভৃতি উপনিষদে ইহা বারম্বার উক্ত হইয়াছে। এই নামরূপকে কর্ম্মে

(২, ৫) মুণ্ডক (১. ২. ৯) প্রভৃতি উপনিষদে ‘অবিদ্যা’ এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ‘মায়া’ নামে কথিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় ‘মায়া’ ‘মোহ’ ‘অজ্ঞান’ এই সকল শব্দের দ্বারা ঐ অর্থই বিবক্ষিত। জগতের আরম্ভে যে-কিছু ছিল তাহা নামরূপবর্জ্জিত অর্থাৎ নির্গুণ ও অব্যক্তছিল; পরে তাহা নামরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় ব্যক্ত ও সগুণ হইয়া পড়িল (বৃ. ১. ৪. ৭; ছাং. ৬. ১. ২, ৩)। তাই বিকারী কিংবা নশ্বর নামরূপকেই ‘মায়া’ সংজ্ঞা দিয়া এই সগুণ বা দৃশ্য জগৎ এক মূল দ্রব্যের অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়ার খেলা কিংবা লীলা এইরূপ বলা হয়। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে সাংখ্যদিগের প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও উহা সত্ত্বরজস্তমোগুণী অতএব নামরূপের দ্বারা যুক্ত মায়াই। এই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন (৮ম প্রকরণে বর্ণিত) ব্যক্ত বিশ্বের যে উৎপত্তি বা বিস্তার, তাহাও সেই মায়ার সগুণ নামরূপাত্মক বিকার। যে কোন গুণই বল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর সুতরাং নামরূপাত্মক হইবেই হইবে। সমস্ত আধিভৌতিক শাস্ত্রসমূহও এইরূপ মায়ার গণ্ডীর মধ্যে আসে। ইতিহাস, ভূজ্ঞান, বিদ্যুৎশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি যে-কোন শাস্ত্র ধর না কেন, তাহার মধ্যে যে বিচার-আলোচনা করা হইয়া থাকে তাহা সমস্ত নামরূপেরই অর্থাৎ কোন পদার্থের এক নামরূপ চলিয়া গিয়া সেই পদার্থের অন্য নামরূপ কি করিয়া হয় তাহারই বিচার-আলোচনা করা হয়। উদাহরণ যথা, যার নাম জল তাহার বাষ্প নাম কখন্ ও কিরূপে আসে, কিংবা এক কুচ্‌কুচে কালো জাম হইতে তাম্র, সবুজ, নীল প্রভৃতি অনেক প্রকারের রং (রূপ) কি করিয়া হয় ইত্যাদি নামরূপের ভেদেরই বিচার এই শাস্ত্রে করা হইয়া থাকে। তাই, নামরূপের মধ্যেই মগ্ন এই শাস্ত্রের অভ্যাসের দ্বারা নামরূপের বাহিরে অবস্থিত সত্য বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সত্য ব্রহ্মবস্তুর অনুসন্ধান করিতে চায়, তাহার দৃষ্টিকে এই সমস্ত আধিভৌতিক অর্থাৎ নামরূপাত্মক শাস্ত্রের বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে, ইহা সুস্পষ্ট। এবং এই অর্থ ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভিক কথার মধ্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কথারম্ভে নারদ ঋষি সনৎকুমার অর্থাৎ স্কন্দের নিকট গিয়া ‘আমাকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দেও’, এইরূপ বলিলেন; তখন সনৎকুমার "তুমি কি শিখিয়াছ আগে বল তার পর আমি বলিব" এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। নারদ বলিলেন "আমি ঋগ্‌বেদাদি চারি ও ইতিহাস পুরাণরূপী পঞ্চম সমেত সমস্ত বেদ, ব্যাকরণ, গণিত, তর্কশাস্ত্র, কালশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, বেদাঙ্গ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পদেবজনবিদ্যা প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষা করিয়াছি; কিন্তু তাহার দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় নাই বলিয়া এক্ষণে আপনার নিকট আসিয়াছি।” তাহাতে সনৎকুমার “তুমি যাহা কিছু শিখিয়াছ তাহা সমস্ত নামরূপাত্মক, প্রকৃত ব্রহ্ম এই নাম ব্রহ্মের অতীত" এইরূপ উত্তর দিয়া পরে ক্রমে ক্রমে এই নামরূপ অর্থাৎ সাংখ্যদিগের অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত কিংবা বাণী, আশা, সঙ্কল্প, মন, বুদ্ধি (জ্ঞান) ও প্রাণ—ইহাদেরও বাহিরে এবং ইহাদের খুব উপরে যে পরমাত্মারূপী অমৃত তত্ত্ব নারদকে তাহারই সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

নামরূপের অতিরিক্ত মানব-ইন্দ্রিয়ের আর কিছুরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলেও এই অনিত্য নামরূপের আবরণের নীচে চক্ষুর অগোচর অতএব অব্যক্ত এইরূপ কোন কিছু নিত্য দ্রব্য অবশ্যই থাকিবে এবং তৎপ্রযুক্তই সমস্ত জগতের জ্ঞান আমাতে একত্বের দ্বারা হইয়া থাকে, ইহাই উপার-উক্ত বিচার আলোচনার তাৎপর্য্য। যাহা কিছু জ্ঞান হয় তাহা আত্মারই হইয়া থাকে, তাই আত্মা জ্ঞাতা; এই জাতীয় যে জ্ঞান হয় তাহা নামরূপাত্মক জগতেরই জ্ঞান; তাই, নামরূপাত্মক বাহ্য জগতই জ্ঞান (মভা. শাং. ৩০৬. ৪০); এবং এই নামরূপাত্মক জগতের মূলে যে-কিছু বস্তুতত্ত্ব আছে তাহাই জ্ঞেয়। এই বর্গীকরণ স্বীকার করিয়া ভগবদ্গীতায় জ্ঞাতাকে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা এবং জ্ঞেয়কে ইন্দ্রিয়াতীত নিত্য পরব্রহ্ম (গী. ১৩. ১২-১৭) বলা হইয়াছে এবং পরে জ্ঞানের তিন ভেদ করিয়া ভিন্নত্ব কিংবা নানাত্বের দ্বারা উৎপন্ন জগৎজ্ঞানকে রাজসিক এবং শেষে নানাত্বের যে জ্ঞান একত্বরূপ হইতে হয় তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা হইয়াছে (গী. ১৮. ২০, ২১)। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ তর্ক করেন যে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এইরূপ ত্রিবিধ ভেদ করা ঠিক নহে; আমাদের যাহা কিছু জ্ঞান হয়, এই জগতে তাহা হইতে ভিন্ন আর কিছু আছে এরূপ বলিবার পক্ষে আমাদের কোন প্রমাণ নাই। গরু ঘোড়া প্রভৃতি যে সকল বাহ্য বস্তু আমরা দেখিতে পাই তাহা আমাদেরই জ্ঞান, এবং এই জ্ঞান সত্য হইলেও তাহা কি করিয়া উৎপন্ন হইল বুঝাইবার জন্য আমার জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না; এই জ্ঞান ব্যতীত বাহ্য পদার্থ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু আছে কিংবা এই সকল বাহ্য বস্তুর মূলে অন্য কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ জ্ঞাতা না থাকিলে জগত থাকে কোথায়? এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইহাদের মধ্যে জ্ঞেয় এই তৃতীয় বর্গ থাকে না; জ্ঞাত ও তাহার জ্ঞান এই দুই শুধু বাকী থাকে; এবং এই যুক্তিবাদকে আর একটু দূরে লইয়া গেলে ‘জ্ঞাতা’ বা ‘দ্রষ্টা’, ইহাও একপ্রকারের জ্ঞান হয়, তাই শেষে জ্ঞান ব্যতীত আর কোন বস্তুই অবশিষ্ট

থাকে না। ইহাকে 'বিজ্ঞানবাদ' বলে ; এবং ইহাকেই যোগাচারপন্থী বৌদ্ধেরা প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছে ; জ্ঞাতার জ্ঞান ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য কিছুই এই জগতে নাই ; অধিক কি, জগতই নাই, যাহা কিছু আছে তাহা মনুষ্যের জ্ঞান, এইরূপ এই মার্গের বিদ্বানেরা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের মধ্যেও হিউমের ন্যায় পণ্ডিত এই প্রকার মতের অগ্রণী। কিন্তু বেদান্তীদিগের নিকট এই মত মান্য নহে; বাদরায়ণাচার্য্য বেদান্তসূত্রে (বেসূ. ২. ২. ২৮–৩২) এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য উক্ত সূত্রসমূহে ভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। মনুষ্যের মনের উপর উৎপন্ন সংস্কারও শেষে মনুষ্য জানিয়া থাকে, ইহা মিথ্যা নহে ; এবং ইহাকেও আমরা জ্ঞান বলি। কিন্তু এই জ্ঞান ব্যতীত যদি অন্য কিছু না থাকে, তবে 'গরু' এই জ্ঞান ভিন্ন, 'ঘোড়া' এই জ্ঞান ভিন্ন, 'আমি' এই জ্ঞান ভিন্ন,—এইরূপ জ্ঞানাজ্ঞানের মধ্যেও যে ভিন্নতা আমাদের বুদ্ধি উপলব্ধি করে তাহার কারণ কি? জ্ঞান হইবার মানসিক ক্রিয়া সর্ব্বত্র একই মানিলাম ; কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই বলিলে গরু ঘোড়া ইত্যাদি বিভিন্ন ভেদ আসিল কোথা হইতে? স্বপ্নজগতের ন্যায় মন আপনা হইতেই আপন মর্জ্জি অনুসারে জ্ঞানের এই ভেদ স্থাপন করে এইরূপ কেহ যদি বলেন, তাহা হইলে স্বপ্নজগৎ হইতে ভিন্ন জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানে যে একপ্রকার সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ বলিতে পারা যায় না। (বেসূ. শাং ভা· ২· ২· ২৯ ; ৩· ২. ৪)। তাছাড়া, জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই, 'দ্রষ্টার' মনই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্ম্মাণ করে এইরূপ বলিলে, প্রত্যেক দ্রষ্টার 'আমার মন' অর্থাৎ 'আমিই স্তম্ভ' কিংবা 'আমিই গরু' এই রূপ 'আমি-পূর্ব্বক' সমস্ত জ্ঞান হওয়া চাই। কিন্তু তাহা না হইয়া, আমি পৃথক, স্তম্ভ গরু প্রভৃতি পদার্থও আমা হইতে ভিন্ন, যখন এইরূপ প্রতীতি সকলের হইয়া থাকে, তখন দ্রষ্টার মনে উৎপন্ন সমস্ত জ্ঞানের আধারভূত বাহ্যজগতে অন্য কোন স্বতন্ত্র বাহ্য বস্তু অবশ্যই থাকিবে, এইরূপ শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (বেসূ. শাংভা· ২. ২. ২৮)। কান্টের মতও এইরূপ ; জাগতিক জ্ঞানলাভের জন্য মনুষ্যের বুদ্ধির একীকরণ অপরিহার্য্য হইলেও, এই জ্ঞানকে বুদ্ধি একেবারেই স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিরাধার কিংবা নূতন উৎপন্ন করে না তাহা সর্ব্বদাই জাগতিক বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা করে, এইরূপ, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন। এই স্থানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, "কিহে! শঙ্করাচার্য্য একবার বাহ্য জগৎ মিথ্যা বলেন এবং পুনরায় বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডন করিবার সময় সেই বাহ্য জগতের অস্তিত্বই 'দ্রষ্টা'র অস্তিত্বেরই ন্যায় সত্য, এইরূপ প্রতিপাদন করেন। কেমন করিয়া ইহার সমন্বয় করা যাইবে?" এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। আচার্য্য বাহ্য জগৎকে যখন মিথ্যা কিংবা অসত্য বলেন তখন বাহ্যজগতের দৃশ্য নামরূপ অসত্য অর্থাৎ নশ্বর ইহাই তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে। কিন্তু নামরূপাত্মক বাহ্য দৃশ্য মিথ্যা হইলেও তাহার মূলে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়াতীত সত্য বস্তু আছে,—উহার দ্বারা এই সিদ্ধান্তের কোন বাধা হয় না। সার কথা, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারে যেমন এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে দেহেন্দ্রিয়াদি নশ্বর নামরূপের মূলে কোন নিত্য আত্মতত্ত্ব আছে ;—সেইরূপ নামরূপাত্মক বাহ্য জগতের মূলেও কোন নিত্য আত্মতত্ত্ব আছে, এইরূপ বলিতে হয়। তাই, দেহেন্দ্রিয় ও বাহ্য জগৎ এই দুয়ের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ মিথ্যা দৃশ্যমান বস্তুর মূলে দুইদিকেই কোন নিত্য অর্থাৎ সত্য বস্তু আচ্ছাদিত হইয়া আছে, এইরূপ বেদান্ত-শাস্ত্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহার পরে দুই দিকের এই যে ইহা নিত্য তত্ত্ব, বিভিন্ন কি একরূপ এই প্রশ্ন আসে। কিন্তু ইহার বিচার করিবার পূর্ব্বে, অনেক সময় এই মতের অর্ব্বাচীনতা সম্বন্ধে যে আপত্তি করা হয় প্রথমে তাহার একটু বিচার করিব।

কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ বেদান্তশাস্ত্রের অভিমত না হইলেও, চক্ষুর গোচর বাহ্যজগতের নামরূপাত্মক স্বরূপ মিথ্যা এবং তাহার মূলদেশে যে অব্যয় ও নিত্য দ্রব্য আছে তাহাই সত্য, শঙ্করাচার্য্যের এই মত—যাহাকে মায়াবাদ বলে—প্রাচীন উপনিষদে বর্ণিত না থাকা প্রযুক্ত উহাকেও বেদান্তশাস্ত্রের মূল-ভাগ মানিতে পারা যায় না। কিন্তু উপনিষদ্ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে এই আপত্তি যে, ভিত্তিহীন ইহা যে-কোন ব্যক্তির সহজে উপলব্ধি হইবে। ইহা প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, 'সত্য' শব্দ সাধারণ ব্যবহারে চক্ষুর গোচর বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হয়। এইজন্য 'সত্য' শব্দের এই ব্যবহারিক অর্থ লইয়াই উপনিষদের কোন কোন স্থানে চক্ষুর গোচর নামরূপাত্মক বাহ্য পদার্থকে 'সত্য' এবং সেই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত দ্রব্যকে 'অমৃত' নাম দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ যথা, বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১. ৬. ৩) "তদেতৎ অমৃতং সত্যেনচ্ছন্নং"—এই অমৃত সত্যের দ্বারা আচ্ছাদিত—এইরূপ বলিয়া অমৃত ও সত্য এই দুই শব্দের "প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ"—প্রাণ অমৃত এবং নামরূপ সত্য, এবং এই নামরূপ সত্যের দ্বারা প্রাণ আচ্ছাদিত—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে প্রাণের অর্থ প্রাণস্বরূপ পরব্রহ্ম। পূর্ব্বে ইহা হইতে দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী উপনিষদে যাহাকে 'মিথ্যা' ও 'সত্য' বলা হইয়াছে তাহারই অনুক্রমে সত্য' ও 'অমৃত' এই নাম

ছিল কোন কোন স্থানে এই অমৃতকেই 'সত্যস্য সত্যং'—চক্ষুর গোচর সত্যের ভিতরকার চরম সত্য (বৃ ২. ৩. ৬) এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতেই উক্ত আপত্তি সিদ্ধ হয় না যে, উপনিষদের কোন কোন স্থানে চক্ষুর গোচর জগৎকেই সত্য বলা হইয়াছে—কারণ, বৃহদারণ্যকেই শেষে আত্মরূপ পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত 'আর্ত্তম্' অর্থাৎ নশ্বর এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। (বৃ· ৩· ৭২৩)। জগতের মূল তত্ত্বের অনুসন্ধান যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন চক্ষুর গোচর জগতকে প্রথম হইতেই সত্য মানিয়া লইয়া তাহার অভ্যন্তরে অন্য কোন্ সূক্ষ্ম সত্য লুক্কায়িত আছে তাহার অনুসন্ধান হইতে লাগিল। কিন্তু পরে এইরূপ দেখা গেল যে, যে দৃশ্য জগতের রূপকে আমরা সত্য বলিয়া মনে করি, তাহা আসলে নশ্বর এবং তাহার অভ্যন্তরে কোন অবিনশ্বর বা অমৃত তত্ত্ব আছে। দুয়ের মধ্যে এই ভেদ যেমন যেমন অধিক ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, সেই অনুসারে 'সত্য' ও 'অমৃত' এই দুই শব্দের স্থানে 'অবিদ্যা' ও 'বিদ্যা' এবং পরিশেষে 'মায়া ও সত্য' কিংবা 'মিথ্যা ও সত্য' এই পরিভাষা প্রচলিত হইল। কারণ, 'সত্য' শব্দের ধাত্বর্থ 'নিত্যস্থায়ী' হওয়া প্রযুক্ত নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর নামরূপকে সত্য বলা উত্তরোত্তর অধিকতর অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু এই প্রকারে 'মায়া' কিংবা 'মিথ্যা' এই দুই শব্দ পূর্ব্বাবধি প্রচলিত হওয়া সত্বেও আমাদের চক্ষুর গোচর জাগতিক বস্তুর বাহ্য আবির্ভাব নশ্বর ও অসত্য; এবং তাহার মূলস্থিত 'তাত্ত্বিক দ্রব্য'ই সৎ কিংবা সত্য, এই বিচার অতীব প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। ঋগ্বেদে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (১. ১৬৪. ৪৬ ও ১০. ১১৪. ৫)—যাহা মূলে এক ও নিত্য (সৎ) তাহাকেই বিপ্র (জ্ঞাতা) বিভিন্ন নাম দিয়া থাকেন—অর্থাৎ এক সত্য বস্তুই নামরূপের দ্বারা বিভিন্ন হয় প্রতীত এইরূপ কথিত হইয়াছে। "এক রূপের অনেক রূপ করিয়া দেখান" এই অর্থে ঋগ্বেদেও 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে" ইন্দ্র নিজের মায়ার দ্বারা অনেক রূপ ধারণ করেন (ঋ. ৬. ৪৭. ১৮)। তৈত্তিরীয় সংহিতার এক স্থলে (তৈ. সং. ৩. ১. ১১) এই অর্থেই 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে; এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এই 'মায়া' শব্দ নামরূপের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু মায়াশব্দ নামরূপ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিবার রীতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের কাল অবধিই প্রচলিত হইলেও ইহা তো নির্ব্বিবাদ যে, নামরূপ অনিত্য কিংবা অসত্য এই কল্পনা উহার পূর্ব্বের, 'মায়া' শব্দের বিপরীত অর্থ করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই কল্পনা নূতন বাহির করেন নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ন্যায় যাঁহাদের নামরূপাত্মক জগৎ-স্বরূপকে 'মিথ্যা' নাম দিবার সাহস হয় না, অথবা গীতায় যেমন ভগবান ঐ অর্থে মায়া শব্দের উপযোগ করিয়াছেন, তাহা করিতেও যাঁহারা ভয় পান, তাঁহারা ইচ্ছা করেন তো বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'সত্য' ও 'অমৃত' শব্দের স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। যাই বলনা কেন, নামরূপ 'নশ্বর' এবং নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত তত্ত্ব 'অমৃত' বা 'অবিনশ্বর' এবং এই ভেদ প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এই সিদ্ধান্তে কোনই বাধা হয় না।

যাক্। নামরূপাত্মক বাহ্য জগতের পদার্থমাত্রের যে জ্ঞান আমাদের আত্মায় উৎপন্ন হয় তাহা উৎপন্ন হইতে হইলে আমাদের আত্মার মূলে এবং আত্মার ন্যায় বাহ্য-জগতের নানা পদার্থের মূলে 'কোন-না-কোন কিছু' এক মূলীভূত নিত্য পদার্থ থাকা চাই, নচেৎ এই জ্ঞান হইতে পারে না—ইহা স্থির করিলেই অধ্যাত্ম শাস্ত্রের কাজ শেষ হয় না। বাহ্য পদার্থের মূলে অবস্থিত এই নিত্য বস্তুকেই বেদান্তী 'ব্রহ্ম' বলেন; এবং সম্ভব হইলে এই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করাও আবশ্যক। সমস্ত নামরূপাত্মক পদার্থের মূলে অবস্থিত এই নিত্য তত্ত্ব অব্যক্ত হওয়া প্রযুক্ত তাহার স্বরূপ নামরূপাত্মক পদার্থের ন্যায় ব্যক্ত ও স্থূল (জড়) হইতে পারে না, ইহা সুস্পষ্ট। কিন্তু ব্যক্ত ও স্থূল পদার্থ ছাড়িয়া দিলেও, মন, স্মৃতি, বাসনা, প্রাণও জ্ঞান প্রভৃতি স্থূল নহে এমন অনেক অব্যক্ত পদার্থ আছে, এবং ইহা অসম্ভব নহে যে, পরব্রহ্মও তাহাদেরই মধ্যে কোন-না-কোন রূপে একটার স্বরূপ বিশিষ্ট কেহ কেহ বলেন যে, প্রাণের ও পরব্রহ্মের স্বরূপ একই। জর্ম্মন পণ্ডিত শোপেনহর পরব্রহ্ম বাসনাত্মক স্থির করিয়াছেন। বাসনা মনের ধর্ম্ম হওয়ায়, এই মতানুসারে ব্রহ্মকে মনোময় বলা যাইতে পারে (তৈ. ৩৪)। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যে বিচার করা হইয়াছে তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (ঐ. ৩. ৩), কিংবা 'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম' (তৈ. ৩. ৫)—জড়জগতের অন্তর্ভূত নানাত্বের যে জ্ঞান এক স্বরূপ হইতে হয় তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। হেগেলের সিদ্ধান্ত এই ধরণেরই। কিন্তু উপনিষদে চিদ্রূপী জ্ঞানের ন্যায়ই সৎকে (অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বের সাধারণ ধর্ম্ম বা সত্তাসামান্যত্বকে) এবং আনন্দকেও ব্রহ্মস্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপ এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতেছে ওঁকার। ইহার উপপত্তি এইরূপ;—প্রথমে সমস্ত অনাদি বেদ ওঁকার হইতে নিঃসৃত হইয়াছে; এবং উহা বাহির হইবার পর সেই বেদের নিত্য শব্দ

হইতেই পরে ব্রহ্মদেব যেহেতু সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিলেন (গী. ১৭. ২৩; মভা. শাং. ২৩১. ৫৬. ৫৮)। সেই হেতু ওঁকার ব্যতীত মূলারম্ভে অন্য কিছু ছিল না এইরূপ সিদ্ধ হয়। এবং এই জন্যই ওঁকারই প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ (মাণ্ডুক্য. ১; তৈত্তি. ১.৮)। কিন্তু শুধু অধ্যাত্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে বিচার করিলে, পরব্রহ্মের এই সমস্ত স্বরূপ ন্যূনাধিক নামরূপাত্মক হইয়া পড়ে। কারণ, এই সমস্ত স্বরূপ মানব-ইন্দ্রিয়ের গোচর, এবং মনুষ্য এই প্রকারে যাহা জানে তাহা নামরূপের গণ্ডীর মধ্যেই পড়িয়া যায়। তবে, এই নামরূপের মূলে অবস্থিত যে অনাদি, অন্তর-বাহিরে পূর্ণরূপে অবস্থিত, একাত্মক, নিত্য ও অমৃত তত্ত্ব (গী. ১৩. ১২-১৭) তাহার বাস্তব স্বরূপের নির্ণয় কি করিয়া হইবে? অনেক অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞ বলেন যে, আর যাহাই হউক না, এই তত্ত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয় থাকিবেই; ক্যাণ্ট তো এই প্রশ্নের বিচার করাই ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেইরূপ আবার উপনিষদেও "নেতি নেতি"—অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে ইহা নহে; তাহা ব্রহ্ম ইহারও অতীত, তাহা চক্ষুর অদৃশ্য; "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—বাক্যমনের অগোচর—এই প্রকারে পরব্রহ্মের অজ্ঞেয় স্বরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। তথাপি এই অগম্য অবস্থাতেও মনুষ্য আপন বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের একপ্রকার নির্ণয় করিতে পারে, ইহা অধ্যাত্মশাস্ত্র স্থির করিয়াছে। বাসনা, স্মৃতি, ধৃতি, আশা, প্রাণ, জ্ঞান প্রভৃতি যে সকল অব্যক্ত পদার্থ উপরে বলা হইয়াছে তন্মধ্যে অতিশয় ব্যাপক কিম্বা শ্রেষ্ঠ কে তাহার বিচার করিয়া এই সকলের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ নির্দ্ধারিত হইবে তাহাকেই পরব্রহ্মের স্বরূপ মানিতে হইবে। কারণ, সমস্ত অব্যক্ত পদার্থের মধ্যে পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ এই বিষয়টি নির্ব্বিবাদ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, আশা, স্মৃতি, বাসনা, ধৃতি ইত্যাদি মনের ধর্ম্ম হওয়ায় মন ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; এবং জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; এবং শেষে বুদ্ধিও যাহার ভৃত্য সেই আত্মা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ (গী. ৩. ৪২)। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ প্রকরণে ইহার বিচার করা হইয়াছে। বাসনা, মন, প্রভৃতি সমস্ত অব্যক্ত পদার্থের মধ্যে যদি আত্মা শ্রেষ্ঠ হয় তবে পরব্রহ্মের স্বরূপও অবশ্য তাহাই হইবে ইহা স্বতই নিষ্পন্ন হইল। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে এই যুক্তিবাদই স্বীকৃত হইয়াছে; এবং সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছেন যে, বাক্য অপেক্ষা মন অধিক যোগ্য (ভূয়স্), মন অপেক্ষা জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা বল, এবং এইপ্রকার ক্রমশ ঊর্দ্ধে উঠিয়া আত্মা যখন সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ভূমন্) তখন আত্মাই পরব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ। ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের মধ্যে গ্রীণ এই সিদ্ধান্তই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তিবাদ একটু ভিন্ন হওয়ায় তাহা এখানে বেদান্তের পরিভাষায় সংক্ষেপে বলিব। গ্রীণ বলেন যে, ইন্দ্রিয়াদির যোগে আমাদের মনের উপর বাহ্য নামরূপের যে সকল সংস্কার সংঘটিত হয় তাহাদের একীকরণ করিয়া আমাদের আত্মার যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার অনুরূপ বাহ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন নামরূপের মূলেও একত্বের দ্বারা উৎপন্ন কোন প্রকার বস্তু থাকা চাই; নচেৎ আত্মার একীকরণের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান স্বকপোলকল্পিত ও নিরাধার হইয়া বিজ্ঞানবাদের ন্যায় মিথ্যা হইয়া পড়িবে এইরূপ গ্রীন্ বলেন। এই 'কোন এক' বস্তুকে আমরা ব্রহ্ম বলি। কিন্তু কাণ্টের পরিভাষা স্বীকার করিয়া গ্রীণ তাহাকে বস্তুতত্ত্ব বলেন—ইহাই ভেদ; যাহাই বলনা কেন, বস্তুতত্ত্ব (ব্রহ্ম) ও আত্মা এই পরস্পরের অনুরূপ দুই পদার্থই শেষে অবশিষ্ট থাকে। তন্মধ্যে 'আত্মা,' মন ও বুদ্ধির অতীত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও, নিজের প্রতীতিকে প্রমাণ মানিয়া আমরা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি যে, এই আত্মা জড় নহে,—ইহা চিৎ-রূপী কিংবা চৈতন্যরূপী। আত্মার স্বরূপ এইরূপ নির্দ্ধারিত করিলে পর, বাহ্য জগতের অন্তর্গত ব্রহ্মের স্বরূপ কি তাহা স্থির করিতে হইবে। এই ব্রহ্ম বা বস্তুতত্ত্ব (১) আত্মস্বরূপাত্মক কিংবা (২) আত্মা হইতে ভিন্ন স্বরূপাত্মক এই বিষয়ে দুইটী মাত্র পক্ষই সম্ভব। কারণ, ব্রহ্ম ও আত্মা ব্যতীত তৃতীয় বস্তুই অবশিষ্ট নাই। কিন্তু সকলেই ইহা জানে যে, যদি কোনও দুই পদার্থ স্বরূপত ভিন্ন হইলেও তাহাদের পরিণাম কিংবা কার্য্যও অবশ্য ভিন্ন হইবে। তাই, পদার্থের পরিণাম হইতেই উক্ত পদার্থ ভিন্ন কিংবা একরূপ, তাহার নির্ণয় আমরা যে কোন শাস্ত্রে করিয়া থাকি। উদাহরণ যথা—দুই গাছের মূল, ডালপালা, ছাল, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি দেখিয়া আমরা স্থির করি যে, ঐ দুইটী গাছ অথবা ভিন্ন। এই রীতি উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক-স্বরূপাত্মকই হইবে, এইরূপ উপলব্ধি হয়। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পদার্থের যে সংস্কার মনের উপর হয়, আত্মার ব্যাপার সমূহের মূলে যে একীকরণ সেই একীকরণ এবং এই ভিন্ন ভিন্ন বাহ্য পদার্থের মূলে অবস্থিত বস্তুতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম, উক্ত পদার্থসমূহের নানাত্ব ভাঙ্গিয়া যে একীকরণ করে সেই একীকরণ,—এই দুই মিলিয়া পরস্পরের অনুরূপ হওয়া চাই, নচেৎ সমস্ত জ্ঞান নিরাধার ও মিথ্যা হইয়া পড়িবে, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। একই নমুনার এবং সম্পূর্ণ এক কি অন্যের সহিত মিলাইয়া একীকরণকারী তত্ত্ব দুই স্থানে হইলেও,

তাহা পরস্পর হইতে ভিন্ন থাকিতে পারে না ; অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইহার মধ্যে, আত্মার যে রূপ তাহাই ব্রহ্মেরও রূপ।* সারকথা, যে কোন প্রকারেই বিচার করা হোক না কেন, বাহ্য জগতের নামরূপে আচ্ছাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব নামরূপাত্মক প্রকৃতির ন্যায় জড় তো নহে, পরন্তু বাসনাত্মক ব্রহ্ম, মনোময় ব্রহ্ম, জ্ঞানময় ব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্ম, কিংবা ওঁকাররূপী শব্দব্রহ্ম, এই সমস্ত ব্রহ্ম পও নিম্নপদবীর এবং প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ ইহার অতীত ও ইহা হইতে অধিক যোগ্য অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মস্বরূপ, এইরূপ এক্ষণে সিদ্ধ হইতেছে। ইহাই যে গীতারও সিদ্ধান্তও তাহাই ; এইরূপ, এই সম্বন্ধে গীতার অনেক স্থানে যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় (গী. ২. ২০ ; ৭. ৫ ; ৮. ৪ ; ১৩. ৩১ ; ১৫. ৭. ৮ দেখ)। তথাপি ব্রহ্মের ও আত্মার স্বরূপ এক, এই সিদ্ধান্ত কেবল এই যুক্তিবাদেই আমাদের ঋষিরা যে প্রথমে বাহির করিয়াছিলেন এরূপ বুঝিবে না। কারণ, অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে কোন অনুমানই নিশ্চিত করা যাইতে পারে না, তাহার সহিত সর্ব্বদা আত্ম-প্রতীতির যোগ হওয়া চাই, ইহা এই প্রকরণের আরম্ভেই বলিয়াছি। তাছাড়া, আধিভৌতিক শাস্ত্রেও অনুভূতি আগে আসে তাহার পর উপপত্তি জানা হয়, কিংবা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা হয়, ইহা ত আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। এই ন্যায় অনুসারে উপরি-প্রদত্ত ব্রহ্মাত্মৈক্যের বুদ্ধিগম্য উপপত্তি বাহির হইবার শত শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রাচীন ঋষিরা "নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন" (বৃ. ৪. ৪. ১৯ ; কঠ. ৪. ১১) এই জগতের দৃশ্যমান অনেকত্ব সত্য নহে, তাহার মূলে চারিদিকে একই অমৃত, অব্যয় ও নিত্য তত্ত্ব আছে (গী. ১৮. ২০) এইরূপ প্রথমে নির্ণয় করিয়া, শেষে বাহ্য জগতের নানারূপের দ্বারা আচ্ছাদিত অবিনাশী তত্ত্ব এবং আমাদের শরীরান্তর্ভূত বুদ্ধির অতীত আত্মতত্ত্ব এই দুই একই অর্থাৎ একপদার্থ, অমর ও অব্যয় কিংবা যে তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাহাই পিণ্ডে অর্থাৎ মনুষ্যের দেহতেই অবস্থিত, এই সিদ্ধান্ত আমাদের অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা বাহির করিয়াছেন ; এবং ইহাই যাহা কিছু বেদান্তের রহস্য, এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে, গার্গী বারুণী প্রভৃতিকে এবং জনককে বলিয়াছেন (বৃ. ৩ ৫-৮ ; ৪. ২-৪)। "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম,—ইহা যিনি জানিয়াছেন তিনি সমস্তই জানিয়াছেন এইরূপ এই উপনিষদেই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (বৃ. ১. ৪. ১০) ; ছান্দোগ্য-উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতুর পিতা অদ্বৈতবেদান্তের এই তত্ত্বই অনেক প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। "মাটীর এক গোলায় কি আছে তাহা জানিতে পারিলে মৃত্তিকার নামরূপাত্মক সমস্ত বিকার যেরূপ বুঝা যায় সেইরূপ যে-এক বস্তুর জ্ঞান হইলে সমস্ত বস্তুই জানা যায়,সেই বস্তু আমাকে বল, তদ্বিষয়ক জ্ঞান আমার নাই", অধ্যায়ে আরম্ভে শ্বেতকেতু আপন পিতাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তাঁহার পিতা তখন নদী, সমুদ্র, জলও লবণ ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন যে, বাহ্যজগতের মূলে যে দ্রব্য আছে তাহা (তৎ) এবং তুমি (ত্বম্) অর্থাৎ তোমার দেহান্তর্গত আত্মা একই—"তত্ত্বমসি" ; এবং আপনাকে আপনি জানিলে, সমস্ত জগতের মূলে কি আছে তাহা স্বতই তুমি জানিতে পারিবে। এইরূপ শ্বেতকেতুর পিতা, নূতন নূতন বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিলেন ; এবং প্রতিবারেই "তত্ত্ব-মসি"—তাহাই তুমি—এই সূত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন (ছাং. ৬. ৮-১৬)। "তত্ত্বমসি" ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের মহাবাক্যগুলির মধ্যে মুখ্য বাক্য। "যাহা পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে" ইহা উহারই মারাঠী রূপান্তর।

(ক্রমশঃ)

সুরা।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

(কুমার শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব)

ঋক্‌বেদের দশটি মণ্ডলের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ মণ্ডল—নবম—সোমরসের স্তুতিতে পূর্ণ ; ইহা ব্যতীত অপরাপর মণ্ডলেও বহু উল্লেখ আছে। ঋক্‌-বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতি দেবতার প্রতি স্তুতি-মন্ত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়, স্থলেস্থলে এই চিত্তো-ন্মাদক পানীয়ের লোভ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হইবার জন্য আবাহন করা হই-তেছে। দেবতাগণ অমরত্ব পাইবার জন্য এই সুখ-কর রস পান করিতেন। (৯।১০৬।৮)

ঋক্‌বেদে বর্ণিত আছে, যজ্ঞদেবতা সুরেশ্বর ইন্দ্র এত অধিক পরিমাণে সোমরস পান করিতেন যে তজ্জন্য তাঁহার উদরদেশ স্ফীত হইয়া পড়িয়াছিল ; তাঁহার মুখে লালাস্রাবের বিরাম ছিল না।

(ঋক্ ১।৮৭)

ঋক্‌বেদে রহিয়াছে—"হে সোম, তুমি উদরের পীড়া জন্মাইও না।" (৮।৪৮।১০)

---

* Green's *Prolegomena to Ethics* §§ 26-3?.

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে একটি আখ্যান আছে ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপ সোমযজ্ঞ করিতেছিলেন ; যজ্ঞ করিতে করিতে এত বেশী সোমরস গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন যে বলির জন্য আনীত পশুগুলির গায়ের উপর হুড় হুড় করিয়া বমি করিতে লাগিলেন।

ইহার পর আমরা যদি বলি, সোমরস সুরা বা মদ্যেরই প্রকারান্তর, তাহা হইলে কি বড় দোষের কথা হইবে ?

সুরাপানের ফল কি, আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, সোমপানের ফল কিরূপ তাহার আভাস পাইলাম। তবে স্মৃতি পুরাণের সুরারই উপর এত আক্রোশের কারণ কি ? অমৃত যদি হয় সোম, এবং সোমের যদি সুরার সহিত এত সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে অমৃতের ও সুরার সম্পর্কটাও কি নিকট হইয়া দাঁড়াইতেছে না ? রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয় রাজার সুরাপানের যে মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রে সুরাকে সোম বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্যার্থে সোম শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে—

"সম্বিদা সেবনং কুর্য্যাৎ সোমপানং মহেশ্বরি।"
(উৎপত্তি তন্ত্র)

এখানে 'সম্বিদা' অর্থে ভাঙ্ এবং সোম অর্থে সুরা। বেদে সোম ও সুরা উভয়েরই উল্লেখ আছে ; উভয়ই পীত হইত সন্দেহ নাই।

বৈদিক শাস্ত্রে সুরাপানের বিধিও রহিয়াছে— 'সৌত্রামণ্যাং সুরাং পিবেৎ'—সৌত্রামণি যজ্ঞে সুরাপান করিবে—ইহা শ্রৌতবিধি। *

শ্রৌত, সূত্র মধ্যেও মাধ্বীক (মহুয়া মদ), গৌড়ী (তাড়ী রস) প্রভৃতি মদ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। চলন ছিল বলিয়াই ত উল্লেখ।

বৃহস্পতি দেবগুরু। বৃহস্পতিসংহিতাতে রহিয়াছে—

"সৌত্রামণ্যাং তথা মদ্যং শ্রুতৌ ভক্ষ্যমুদাহৃতম্।"

প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ বৌধায়ন ও কাত্যায়ন সূত্রমধ্যে সৌত্রামণি ও রাজসূয় যজ্ঞে দেবতার ভোগ্য সুরা প্রস্তুতের প্রণালী ও নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

বৈদিক সৌত্রামণী ও রাজসূয় যজ্ঞে সুরা অঙ্গ—একটি প্রধান উপকরণ।

ঋক্‌বেদ সংহিতায় মন্ত্র আছে, যাহা হইতে বুঝা যায় যে সেই দূর বৈদিক কালেও শৌণ্ডিকালয় ছিল ; চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রে (কুপায় ?) সুরা রক্ষিত হইত এবং সাধারণ্যে বিক্রীত হইত। (১।১৯১।১০।

অতএব সপ্রমাণ হইল, সেকালে দেবতা-ব্রাহ্মণেও সুরাপান করিতেন। দেবতারা যজ্ঞে খাইতেন, ঋষিরা ব্রাহ্মণেরা প্রসাদ পাইতেন।

শুধু যজ্ঞে কেন, মুনিঋষিরা অন্য সময়েও খাইতেন। সুরার প্রতি শুক্রশাপ-বিবরণ হইতে বুঝা যায়, অগাধপণ্ডিত মহর্ষি শুক্রাচার্য্য নিত্য এত মদ খাইতেন, খাইয়া এমন অসামাল হইয়া পড়িতেন যে একদা মদ্যের সহিত স্বশিষ্য বৃহস্পতিপুত্র কচকে উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

(মহাভারত, আদি ৭৬ ; মৎস্যপুরাণ।

শাস্ত্রে দেখা যায়, দেবপত্নীগণও সুরাপানে বিরত ছিলেন না। হিন্দুর নিত্য-পূজ্য মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, সুরনরবন্দ্যা মহিষাসুরমর্দ্দিনী ভগবতী মহামায়া ধনাধিপের নিকট হইতে অফুরন্ত সুরাপান-পাত্র পাইয়াছিলেন—"অশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং"। মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন ঘন ঘন সুরাপান করতঃ শ্রান্তি দূর করিতেছেন ; তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, মহিষাসুরের গর্জ্জন শুনিয়া তিনিও হুঙ্কার ছাড়িতেছেন—

"গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।"
(৩।৩৬)। বহু পুরাণেও এই উল্লেখ আছে।

মহাভারত বিরাটপর্ব্বে যে দুর্গা-স্তোত্র আছে, তন্মধ্যে দেবী দুর্গার একটি বিশেষণ—"সীধুপশুমাংসপ্রিয়া।"

দেখা যাইতেছে, দেবীরা পর্য্যন্ত সুরার স্ফূর্ত্তিকারক বলকারক গুণ অনবগত ছিলেন না। শুধুই কি দেবীরা ?

কোন কোন পুরাণে স্থানে স্থানে রাজমহিষী বা বিশিষ্টা রমণীর বারুণী বা মাধ্বীক আসবে রতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক স্থলে তাহার কুফল প্রদর্শনই উদ্দেশ্য মনে হয় ; সকল স্থলে নহে।

* শ্রীমদ্ভাগবতে এই বৈদিক বিধির উপর কলম চালানো আছে—"যদ্ ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তঃ।" স্বামীজীর টীকা—যস্মাৎ সুরায় ঘ্রাণভক্ষঃ অবঘ্রাণং স এব বিহিতঃ ন পানং। পান নাই, ঘ্রাণ আছে।

রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই,—অযোধ্যা রাজধানীতে অশোকবন নামে এক রম্য রাজোদ্যান ছিল; লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাজাধিরাজ রামচন্দ্র এই অশোকবনে প্রবেশপূর্ব্বক কুসুমখচিত আস্তরণাচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করিলেন এবং সীতাকে লইয়া স্বহস্তে মৈরেয় নামক বিশুদ্ধ মদ্য পান করাইতে লাগিলেন।

উত্তর। ৫২

"সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি
পায়য়ামাস"——

তথায় নৃত্যগীতবিশারদা রূপবতী রমণীরা পানবশীভূতা হইয়া রামসন্নিধানে নাচ-গান দেখাইতেছিল—"স্ত্রিয়ঃ পানবশঙ্গতাঃ",

ত্রেতাযুগে সাধারণ স্ত্রীলোক এবং রাজরাণীরা পর্য্যন্ত মদ্য পান করিতেন। *

বশিষ্ঠ একজন বৈদিক ঋষি, বিশ্বামিত্রও একজন বৈদিক ঋষি। রামায়ণে দেখা যায়,—রাজর্ষি বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠ-আশ্রমে অতিথি হন, মহর্ষি বশিষ্ঠ তখন বিশিষ্ঠ অতিথিকে নানা ভোক্ষ্যভোজ্য-চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা সৎকার করিয়াছিলেন; তাহার ভিতর মৈরেয় সুরা বাদ পড়ে নাই।

"ইক্ষুন্মধূংস্তথা লাজান্ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্।"

রামায়ণে রহিয়াছে—

ভরত যখন রামকে ফিরাইয়া আনিতে চিত্রকূট যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে তিনি সসৈন্যসামন্তানুচর ভরদ্বাজ ঋষির আতিথ্য গ্রহণ করেন; ইনিও একজন প্রখ্যাত বৈদিক ঋষি, তিনি অতিথি সৎকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নানা উপভোগসামগ্রীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—প্রচুর সুরা, মৈরেয় মদ্য—মদ্যের দীর্ঘিকা পর্য্যন্ত ছিল—"বাপ্যো মৈরেয়পূর্ণাশ্চ।" নানাবিধ সুরা সেবন করিয়া সৈন্যসামন্ত মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল; সে স্থান হইতে নড়িতে চাহে নাই।

(অযোধ্যা ৯১।

রামায়ণের সময় সুরা যে সাধারণ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল এবং দেবনৈবেদ্যরূপে উপকল্পিত হইত, তাহার প্রমাণ আছে।

ভরত যখন রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে ফিরাইতে অক্ষম হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন রাজধানীর শ্রীহীনতা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"বারুণীমদগন্ধশ্চ মাল্যগন্ধশ্চ মূর্চ্ছিতঃ।
চন্দনাগুরুগন্ধশ্চ ন প্রবাতি সমন্ততঃ॥"

(অযোধ্যা ১১৪।

রামের বিরহে অযোধ্যা নগরীতে বারুণীমদগন্ধ মাল্যগন্ধ, চন্দনঅগুরুগন্ধ কৈ আর চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে না?

ভরত দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—মদ্যপানের অবসানে ভগ্নপাত্র-পরিবৃত, মদ্যপায়ী-বিবর্জ্জিত অসংস্কৃত পানভূমির যাদৃশ দশা ঘটিয়া থাকে, রামবিহনে অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে—

"ক্ষীণপানোত্তমৈর্ভগ্নৈঃ শরাবৈরভিসংবৃতাম্।
হতশৌণ্ডামিব ধ্বস্তাং পানভূমিমসংস্কৃতাম্॥

(অ ১১৪।

সীতাদেবী রামের সহিত বনগমন কালে যখন গঙ্গা পার হইতেছেন, তখন ভাগীরথী দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"দেবী প্রসন্না হউন, যখন আমরা ফিরিয়া আসিব, তখন সহস্র কলস সুরা ও পলান্ন দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিব।"—

"সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।"

(অযো ৫২।

সীতাদেবী যমুনা উত্তরণ কালে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিয়াছিলেন,—"হে দেবি, অযোধ্যা নগরীতে আমার পতি মঙ্গলে মঙ্গলে প্রত্যাগত হইলে আমি আপনাকে সহস্র গো ও সুরাপূর্ণ একশত কলস দ্বারা পূজা করিব।"

"যক্ষ্যে ত্বাং গোসহস্রেণ সুরাঘটশতেন চ।"

(অ ৫৫।

রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই, কিষ্কিন্ধ্যায় বানররাজেরও পানভূমি ছিল। কিষ্কিন্ধ্যার পথ সকল সুরাগন্ধে আমোদিত থাকিত—

"মৈরেয়াণাং মধূনাঞ্চ সম্মোদিতমহাপথাম্।"

(কিঃ)

লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীব ও বানররাজমহিষী

---

* বহু পণ্ডিত লোকের মত,—রামায়ণ হইতে বুঝা যায়, বাল্মীকি ছয় কাণ্ডে গ্রন্থ শেষ করিয়াছিলেন। উত্তর কাণ্ড পরে সংযোজিত। তাহা যদি হয়, সীতাদেবীর সুরাপান আসল রামায়ণে নাই ধরিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। বাল্মীকিরামায়ণ মধ্যেও প্রক্ষিপ্ত কথাও আছে, যথা রামায়ণে বুদ্ধদেবের উল্লেখ। (অযোধ্যা ১১১।৩৪।

তারাকে মদ্যপানে মাতাল দেখিয়াছিলেন—"সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী" (ঐ)

লঙ্কার পানভূমির সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে, মনোরম। "তথায় কোথাও স্বর্ণকলস, কোথাও মণিময় ও স্ফটিক পানপাত্র, ঐ সমস্ত সুরায় পূর্ণ; কোথাও কামিনীগণ অতিপানে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া আছে.........।" ইত্যাদি, আর—

"দিব্যাঃ প্রসন্না বিবিধাঃ সুরাঃ কৃতসুরা অপি।
শর্করাসব-মাধ্বীকাঃ পুষ্পাসব-ফলাসবাঃ।
বাসচূর্ণৈশ্চ বিবিধৈঃ সৃষ্টাস্তৈস্তৈঃ পৃথক্ পৃথক্।"
(সু ১১)

নানান্ রকম সুরা।

দেখা যাইতেছে, রামায়ণের সময় (রামরাজত্বের কালে?) মদের খুব রেওয়াজ ছিল। প্রজাসাধারণের ত কথাই নাই, (নদী) দেবতা, বড় বড় মুনি ঋষি রাজা রাণী রাক্ষস বানর স্ত্রী পুরুষ সকলেই সুরাভক্ত ছিলেন।

এক স্থলে সুরাপানের নিন্দা আছে, দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে মাতাল দেখিয়া তিরস্কার করত বলিয়াছিলেন—

"ন হি ধর্ম্মার্থসিদ্ধ্যর্থং পানমেবং প্রশস্যতে।
পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্ম্মশ্চ পরিহীয়তে॥ (কি ৩৩)

ধর্ম্ম ও অর্থ সিদ্ধিবিষয়ে, সুরাপান প্রশস্ত নহে; যেহেতু সুরাপানে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের হানি হইয়া থাকে।

রামায়ণে এ উপদেশ অরণ্যে রোদন।

মহাভারতের দিকে চক্ষু মিলাইলে আমরা দেখিতে পাই, মহাভারতের প্রধান চরিত্র দুইটি—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই সুরাপান করিতেন, এমন কি মাতাল হইয়া পড়িতেন। মহাভারতে রহিয়াছে—

"সঞ্জয় কহিলেন,—আমি সেই স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলাম, বাসুদেব ও অর্জ্জুন উভয়ে মধুপানে মত্ত; চন্দনচর্চ্চিত এবং মালা, উত্তম বস্ত্র ও দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া, অনেক-রত্ন-শোভিত, বিবিধ আস্তরণ-মণ্ডিত, কাঞ্চনময় আসনে আসীন হইয়া আছেন; এবং কেশবের চরণযুগল অর্জ্জুনের উৎসঙ্গে এবং অর্জ্জুনের এক চরণ দ্রুপদনন্দিনীর অঙ্কে ও অন্যচরণ সত্যভামার অঙ্কে আরোপিত আছে—

"উভৌ মধ্বাসবক্ষীবৌ উভৌ চন্দন-চর্চ্চিতৌ।
উভৌ পর্য্যঙ্ক-রথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবার্জ্জুনৌ॥*
উদ্যোগযানসন্ধি। ৫৮

মহাভারতের সময়ে স্ত্রীলোকেও যে মদ্য পান করিতেন, তাহার প্রমাণের অসদ্ভাব নাই:—

বিরাট-রাজমহিষী সুদেষ্ণা কীচককে কহিলেন,—"তুমি পর্ব্বোপলক্ষে সুরা ও অন্ন প্রস্তুত রাখিও; আমি সুরা আহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট সৈরিন্ধ্রীকে প্রেরণ করিব"......সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "সৈরিন্ধ্রী, আমি বলবতী পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব তুমি কীচকের ভবনে গমন করিয়া সত্বর পানীয় আনয়ন কর"........দ্রৌপদী কীচককে কহিলেন, "রাজমহিষী আমাকে সুরা আহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন"........কীচক কহিল—"আমি তোমার নিমিত্ত এক রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করিয়াছি; চল এক্ষণে তথায় গিয়া আমরা মধুপান করি।"

(বিরাট। কীচকবধ ১৫-১৬)

যেরূপভাবে বিরাটমহিষী সুরা চাহিয়াছেন এবং দ্রৌপদী আনিতে ছুটিয়াছেন, দেখিলে মনে হয়, সুরাপান রাজরাণীদিগের নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত ছিল।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও যে সুরাত্যাগী ছিলেন না, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে;—দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের গৌরব বর্ণনা করিতে করিতে হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া, মাতুল শকুনিকে বলিতেছেন,—"অমরাঙ্গনারা যেমন অমররাজের নিমিত্ত মধু ধারণ করিয়া থাকে, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তও সেইরূপ ধারণ করিয়াছিল।" (সভা ৪৮)

ইহা রাজসূয়যজ্ঞের একটা নিয়মপালন মাত্র হইতে পারে।

ভীমসেন যে সুরাভক্ত ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মধ্যম পাণ্ডব পাতালপুরী নাগভবনে গিয়া যে আট আট কুণ্ড রস পান করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা সুরা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? (আদি ১২৮)

* মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে" এই ঘটনা প্রক্ষিপ্ত (মহাভারতে) বলিয়াছেন। তাহাই সম্ভব, কিন্তু আমরা সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। ভিন্ন পাঠে—উভৌ মধ্বাসবাক্ষীবৌ চন্দনচর্চিতৌ। স্রগ্বিনৌ বরবস্ত্রৌ তু দিব্যাভরণভূষিতৌ। ৬১৫

আরও দেখা যায়, ভীমসেন যুদ্ধযাত্রাকালে অর্চ্চিত সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ও অষ্ট-বিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ পূর্ব্বক 'কৈরাতক' মদ্য পান করিলেন। তখন তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ ও তেজোরাশি দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। "পীত্বা কৈরাতকং মধু·········মদবিহ্বললোচনঃ।"

(দ্রোণ ১২৭)

এখানে মদ্যপানই যেন নিত্যকর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বে শান্তি।

(শ্রীপঞ্চানন রায়—১৩ বৎসরের বালক)

(১)

আজি দিয়েছে অভয়া
এ ধরাবাসীরে
শান্তি-সুধাধারা ঢালিয়ে।
আজি নব হর্ষামোদে
বিশ্ববাসী তাই
মাতৃপ্রেমে আছে মাতিয়ে।
গত চতুর্ব্বর্ষ যে প্রেম-বিহনে
দিয়ে বিসর্জ্জন নিজ পরিজনে
সহি নানা ক্লেশ ছিল ক্ষুণ্ণমনে
নীরবে জননী স্মরিয়ে।
আজি দিয়েছে অভয়া
এ ধরাবাসীরে
শান্তি সুধা ধারা ঢালিয়ে।

(২)

আজি মহাকালরূপী
সে ভীষণরণ
গেছে কোন্ দেশে পালিয়ে।
আজি পলায়নে তার
ধরা অধিবাসী
আনন্দেতে আছে মাতিয়ে।
ধরা এবে হবে শান্তির আগার
ভুঞ্জিবে মানব আনন্দ অপার
ধরামাঝে হবে সুখ শান্তি সার
অশান্তি যাইবে ঘুচিয়ে।
আজি মহাকালরূপী
সে ভীষণ রণ
গেছে কোন দেশে পালিয়ে।

(৩)

আজি মহাবিশ্ব-বক্ষে
প্রলয়ের ঝড়
গিয়াছে নির্ব্বাণ হইয়ে।
আজি বীর দর্পে যুঝি
ন্যায় ধর্ম্ম দেছে
অন্যায়ের দর্প দলিয়ে।
যাদের ব্যগ্র লোলুপরসনা
জেগেছিল বিশ্বে লয়ে উত্তেজনা
বিশ্বে সম্মিলিত ন্যায়বাদী জনা
দিয়াছে তা শান্ত করিয়ে।
আজি মহাবিশ্ব-বক্ষে
প্রলয়ের ঝড়
গিয়াছে নির্ব্বাণ হইয়ে।

(৪)

আজি ধন্য বিশ্বমাঝে
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক।
দাও ধর্ম্ম বিশ্বে ছড়ায়ে।
আজি টুটে যাক্ বিশ্বে
অধর্ম্ম শৃঙ্খল
ধর্ম্মে দাও বিশ্ব ভরায়ে।
ধন্য ভগবান অধর্ম্মের অরি
বাজুক এ বিশ্বে ধর্ম্মের বাঁশরী
ধন্য তুমি মাত বিশ্বব্যথাহারী
দাও বিশ্বব্যথা ঘুচায়ে।
আজি ধন্য বিশ্বমাঝে
ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক!
দাও ধর্ম্ম বিশ্বে ছড়ায়ে॥

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সোলাপুরে পীড়িত।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

১৮৯৩ অব্দে যখন আমরা সোলাপুর-পরিদর্শনে যাত্রা করিলাম, তখন প্রথম আড্ডা হইল মাটিতে। দুই তিন দিবস সেখানে ছিলাম। সেই সময়ের মধ্যে একটা বক্তৃতা দিবার জন্য সেখানকার কতকগুলি লোক আসিয়া আগ্রহ জানাইল। উনি 'হাঁ' বলিয়া দ্বিতীয় দিনে মাটিতে প্রায় ঘণ্টা সওয়া ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন; সেখান হইতে আমরা সোলাপুরে গেলাম। সেখানেও এই ক্ষেপে লোকেরা বক্তৃতা দিবার সম্বন্ধে এতটা আগ্রহ কেন

প্রকাশ করিলেন কে জানে! সেই সময় কি লইয়া আন্দোলন হইতেছিল এবং লোকের দৃষ্টি কোন্ বিষয়ের দিকে ছিল তাহা আমার ঠিক মনে নাই; ভারতের শিল্প-উদ্যমের প্রগতি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর বোধ হয় সেই সময় লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল মনে হয়। কারণ সোলাপুরের খোলা ময়দানে তিন দিন ঘণ্টা-তিনেক বক্তৃতা চলিয়াছিল ও শেষদিনে এই বক্তৃতা দুই ঘণ্টা সওয়া দুই ঘণ্টা সমান আবেগের সহিত হইয়াছিল। শেষ দিনের বক্তৃতা হইয়া গেলে, সেই রাত্রেই খানিকটা নিদ্রা হইবার পর ওঁর পেটে কি একটা ব্যথা ধরিল; আমি গরম জল ভরা থলে দিয়া পেটে শেক দিতে লাগিলাম, গা টিপিয়া দিলাম, আর সচরাচর যে সব ঔষধ জানা ছিল সেই সব ঔষধ দিলাম, তবু পেটের ব্যথা গেল না। ব্যথাটা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ভোর চারিটা পর্য্যন্ত খুবই কষ্ট হইয়াছিল। সকালে ডাক্তার কিলোস্করকে ডাকাইলাম। তিনি আসিয়া ঔষধাদি দিবার পর ব্যথাটা একটু কমিল, কিন্তু একেবারে থামিল না; তথাপি একটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অসহ্য পেটের ব্যথায় শরীর ও প্রাণ অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই শ্রান্তির দরুন একটা ক্লান্তি আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটু নিদ্রাও আসিল, তাই, অল্প কাঁজি খাইতে দিয়া ও ঔষধ দিয়া আমি সেই-খানেই আস্তে আস্তে ওঁর গা টিপিয়া দিতে লাগিলাম এবং "এখন ঘুমটা যতই বেশী হয় ততই ভাল, কারণ বিশ্রামের খুবই দরকার, কোন গোলমাল না করে চুপ-চাপ থাকতে দেও, আমি ঘুমের ঔষধ দিয়েছি, ঘুম আসলে আর কোন ভাবনার কারণ নাই। বিশ্রাম করতে দেও।" এইরূপ আমাকে বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সেই অনুসারে উনি সমস্ত দিনই খুব বিশ্রাম পাইলেন। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে শুধু একটু কাঁজি ও ঔষধ দিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত দিন কাটাইয়া রাত্রে বেশ নিদ্রাও হইল, সমস্ত দিন গায়ে যে একটু জ্বর ছিল, তাও শেষ রাত্রে ২।৩টার সময় চলিয়া গেল—যত আলো হইতে লাগিল ততই বেশ ভাল বোধ করিতে লাগিলেন। তথাপি উঠিয়া বাহিরে যাইবার শক্তি ছিল না; তাই নিকটেই পরদা লাগান হইয়াছিল। সেখানে মুখমার্জ্জনাদি সমা-পন করিয়া আবার বিছানায় আসিয়া বসিতেন। আমি একটু দুধসাবু ও ঔষধ দিবার পর, নিকটে যে হাবলদার দাঁড়াইয়াছিল তাকে 'উনি' বলিলেন, "সিরেস্তাদারকে ডাকাও ও কালকের সহির কাগজ চেয়ে পাঠাও। তদনু-সারে সে কার্য্য সম্পাদন করিল। সিরেস্তাদার ও অন্য কেরাণী সহির জন্য আপন আপন কাগজ লইয়া আসিল। সেই সমস্ত কাগজের উপর উনি নিত্যানুসারে সহি করি-লেন, এবং "টাইম্‌স" খুলিয়া টেলিগ্রাম পড়িলেন। সকালে ভাল আছেন মনে করিয়া পাঁচটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত যে শ্রম করিলেন তাহা সহিল না। পেট ব্যথা করিতে লাগিল। পায়ের গুল্‌ফ বাঁকিয়া যাইতে লাগিল এবং একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। সেইজন্য গায়ে কাপড় মুড়ি দিয়া চুপচাপ করিয়া থাকিতে হইল। দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইবার পর খুব জোরে ১০৫.৬ ডিগ্রী জ্বর আসিল। সে জ্বর সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত আর নামিল না। ইতিমধ্যে ৩টার সময়, বোম্বাই হাইকোর্টের জজের পদে ওঁকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, এইরূপ গভর্ণর সাহে-বের নিকট হইতে সিলমোহর করা পত্র আসিল; সিরে-স্তাদার সেই পত্র খুলিয়া আমার নিকট আনিয়া আমাকে পড়িয়া শুনাইল এবং এই সংবাদ ওঁকে দিবে মনে করিয়া দুই তিনবার পরদার ভিতর দিয়া উঁকি মারিল; কিন্তু আমি তাকে বারণ করিয়া হাতের ইসারা করিলাম। আমার ভয় হইল, এই আনন্দের সংবাদ জানিতে পারিলে, আনন্দের আবেগে হয়ত জ্বরটা আরো জোরে আসিবে। তাই আমি ঐ হুকুমনামা না দেখাইয়া রাখিয়া দিতে বলিলাম; তারপর রাত্রি ১১টার সময় জ্বরটা ছাড়িয়া গেল এবং বেশ নিদ্রা আসিল। সকালবেলা জাগিয়া ভাল বোধহইতে লাগিল; তখন শিরেস্তাদারকে ঐ হুকুমনামা ওঁকে দেখাইতে বলিলাম। হুকুমনামা দেখিয়া ওঁর মনের কোন ভাবান্তর হইল বলিয়া মনে হইল না। খুব সহজ ভাবে শিরেস্তাদারের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'তাহ'লে দেখছি, এখানকার কাজ সেরে শীঘ্রই পুণায় যেতে হবে।" শিরেস্তাদার প্রস্থান করিলে, আমার সহিত ঐ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। ইহা দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য মনে হইল এবং আগের দিনের ভয়ের কথা মনে করিয়া আমার হাসি পাইতে লাগিল। আমি কি পাগল! অনেক বৎসর দিবারাত্রি নিকটে থাকিয়াও ওঁর স্বভাব এবং তাতে যে সকল সদ্‌গুণ আছে সেই সকল সদ্‌গুণ আমি অবগত হইতে পারিলাম না! এবং আমি এইরূপ ক্ষুদ্র ভীতি অনুভব করিয়াছিলাম। দুঃখের পর্ব্বত মাথার উপর পড়িলেও যে ব্যক্তিকে টলাইতে পারে না, কিংবা সুখের তরঙ্গ আসিয়া ভাসাইয়া দিলেও যাহার হর্ষাতিশয্য হয় না, শুধু কাছের লোকই তাঁর দুঃখ ও আনন্দ সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিতে পারে, অন্য লোকের তাহা নজরে পড়ে না; এইরূপ যখন তাঁহার স্বভাব, এই স্বভাব আমি জানিয়াও এই সময়ে কেন এইরূপ পাগলামি করিয়া ভয় পাইয়াছিলাম কে জানে।

যাক; দুই দিন পরে, আমরা সোলাপুর হইতে পুণায় আসা স্থির করিলাম। তার পর দিনও সোলা-পুরের লোকেরা আসিয়া বলিল যে, আমাদের সহরে এই নিয়োগের হুকুম আসিয়াছে, অতএব এই সম্বন্ধে পান-সুপারী করিবার সম্মান আমাদের সহরের প্রথম প্রাপ্য। পানসুপারী গ্রহণ না করিলে আমরা যাইতে দিব না। উনি পীড়িত থাকায় এই কথা তাঁরা আমাকে বলিলেন এবং "কোন সময়ে সুযোগ পাইলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদের জানাইবেন"—এইরূপ বলিয়া গেলেন। সেই সময় আমি ওঁকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে উনি বলিলেন "আমি এখনও বসিতে পারি না এবং আমার কথা কহিবার শক্তি নাই—এখন আমি পানসুপারী লইতে পারিব না।" এই কথা আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, কিন্তু তবু তাঁরা নিজের জেদ্ ছাড়িলেন না। তাঁরা বলিলেন—আমরা তাঁকে কথা কহিবার শ্রম করিতে দিব না। ষ্টেশনে যখন আমরা তাঁকে পৌঁছাইয়া দিতে যাইব সেই সময় রেল-গাড়ী ছাড়িবার আগেই আমরা প্রথম মালাটি তাঁর গলায় পরাইয়া দিব—তাহা হইলেই হইবে। সেইরূপই তাঁরা করিলেন। সঙ্গে তাঁরা মালা, থিলি, চুবড়ী ভরিয়া আনিয়াছিলেন। উনি এসব কিছুই জানিতেন না। উনি সেকেণ্ড ক্লাসে নিশ্চিন্তভাবে আরামে শুইয়াছিলেন। গাড়ী ছাড়িবার দুই মিনিট আগে

শ্রীমন্ত অম্বাসাহেব বারদ, নাগপুরের উকীল, ডাক্তার কির্লোস্কর প্রভৃতি ভদ্রলোক গাড়ীর কাম্‌রার ভিতর আসিলেন ও পানের খিলি সাম্‌নে রাখিয়া, ওঁর গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময়, "আমরা চলিলাম" এই কথা বলিয়া তাঁরা গাড়ীর কামরা হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন—ঠিক্ সেই সময় শিটি দিল এবং তাঁরা ঝুড়ি হইতে ফুল লইয়া কাম্‌রার ভিতরে নিঃক্ষেপ করিলেন ও ওঁর নাম ধরিয়া তিনবার জয়োচ্চারণ করিলেন। গাড়ী ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেল।

বোম্বায়ে বদ্‌লী ১৮৯৩।

বোম্বাই-হাইকোর্টের জজের পদে ওঁর নিয়োগ।

সোলাপুর হইতে পুণায় আসিবার পর, দশদিন পর্য্যন্ত "উহাঁর" শরীর অত্যন্ত অশক্ত থাকায়, ঘরেই পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল, উনি বাহিরে কোথাও যাইতে পারেন নাই। তথাপি লোকের ভীড় সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার নিকট হইতই হইত এবং এই বোম্বায়ে বদ্‌লীর দরুন, পুণার লোকেরা কি কি করিবেন সেই সম্বন্ধে উনি কিছু না শুনিতে পান আমরা চুপি চুপি আপনাদের মধ্যে স্থির করিলাম। এই পুণার লোকদিগের বড়ই আনন্দ হইয়াছিল এবং ওঁর এই পদগৌরব তাঁরা যেন নিজেই প্রাপ্ত হইয়াছেন এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন। উঁহার সম্বন্ধে তাঁদের এইরূপ ঐকামত এবং উহাঁর প্রতি এতই প্রবল অনুরাগ ছিল। উনি একটু ভাল বোধ করিলে, একদিন সকালে ১৫।২০ জন ভদ্রলোক "ডেপুটেশনের হিসাবে আসিলেন এবং কাল হইতে ৮ দিন পর্য্যন্ত পানসুপারী প্রভৃতি তাঁরা নিজের মনের মতন করিবেন বলিয়া অনুমতি চাহিলেন। "এই সময় আমরা আমাদের ইচ্ছামত করিব এবং এই কাজ হইবে না এই কথা বলিলে চলিবে না, আমরা যাহা করিব তাহাতে আপনার সম্মতি দিতে হইবে, এই আমাদের অনুরোধ ;"—এই সব কথা শুনিয়া উনি বলিলেন—"তোমরা ৮ দিনের কার্য্যক্রম কি স্থির করেছ, একবার আমাকে বলো—তার পর দেখা যাবে।" তাঁহারা বলিলেন ;—"এই সম্বন্ধে আপনাকে কিছুই দেখাইব না, জিজ্ঞাসাও করিব না, এইরূপ আমরা স্থির করিয়াছি। একেবারে কিছুই না জানাইলে চলিবে না বলিয়া আমরা জানাইতে আসিয়াছি"। "উনি" আবার বলিলেন, —"আমাকে কিছুই দেখিও না, আমার জানবার জন্য কিছু আগ্রহ নাই। কিন্তু তোমরা পুণার লোক, আমার ভয় হয়, তোমরা যাই করবে তাই বাড়াবাড়ি করবে ; তাতে তোমাদের বিচার-বিবেচনা থাকে না, তা ভালই হোক মন্দই হোক। যদি একবার বলো করবে, তা না করে' ছাড়বে না। তা আমার ভাল লাগে না। এখন যা তোমাদের করতে হবে তা বেশ বিবেচনা করে—বিচার করে' কর শুধু এই কথা আমি বল্‌চি।" ইহা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, তাই করা যাবে", এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। তার পর দিন হইতে, এই পানসুপারী ও আতিথ্যসৎকার আরম্ভ হইল। সর্ব্বাপেক্ষা হীরাবাগের উৎসব অনুষ্ঠানে বাজি পোড়ানো প্রভৃতিতে যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা ওঁর পছন্দ হয় নাই ; কারণ, উহাঁর মতে এইরূপ ব্যয় অর্থের অপব্যয়। আরও কিছু দিন এখানে থাকিলে, পুণার লোকেরা আরও বেশী বেশী অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে, তাই যত শীঘ্র হয় বোম্বায়ে চলিয়া যাওয়াই ভাল, এইরূপ উনি স্থির করিলেন, এবং আমরা সোমবারে রাত্রির গাড়ীতেই বোম্বাই যাত্রা করিলাম। পুণার লোকদিগের কার্য্যক্রম অনুসারে আমাদের যাত্রার দিন বুধবার স্থির হইয়াছিল এবং সেই দিন, ষ্টেশন ও প্ল্যাটফর্ম্মের উপর ফুলের রাস্তা করিয়া শহরের সমস্ত জাতির লোক একত্র সমবেত হইয়া, ব্যাণ্ড-বাজনা প্রভৃতি আনাইয়া খুব ধুমধামের সহিত ষ্টেশনে উঁহাকে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে—এইরূপে পুণার লোকেরা স্থির করিয়াছিল। এই কথা ওঁর কাণে আসিয়া থাকিবে ; তাই হঠাৎ উনি সোমবারে যাইবেন বলিয়া মনে করিলেন। সন্ধ্যাকালে বাহিরে যাইবার সময় বলিলেন, "দুই একটা বাক্সে যত জিনিসপত্র যেতে পারে শুধু তাই সঙ্গে নেও এবং আজ রাত্রে ১১ টার গাড়ীতে যাবার জন্য সব ঠিক্‌ঠাক্ কর। বেশী কোন উদ্যোগ একেবারেই করবে না। আমি ক্লব থেকে আহার করে ফিরে এলে পর ষ্টেশনে যাওয়া যাবে, অবশিষ্ট জিনিসপত্র ও বাক্স কাল কেউ নিয়ে যাবে।" তদনুসারে আমরা সব ঠিক্‌ঠাক্ করিলাম এবং সেই রাত্রেই ১১টার সময় ষ্টেশনে গেলাম। কিন্তু তবু ঠিক্ সেই সময় ৪০ জন ভদ্রলোক ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন এবং তাঁরা ফুল, মালা প্রভৃতি আনিয়া যতটা সম্ভব ধুমধাম করিয়াছিলেন, আমাদের আফিসের লোক আমাদিগকে পৌঁছিয়া দিতে আসিয়াছিল। বিদায় লইবার সময় তাহাদের খারাপ লাগিয়াছিল, আমাদেরও কষ্ট হইয়াছিল। এই সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ সেই সময়ের জ্ঞানপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই খানে বলা আবশ্যক যে, বোম্বায়ে যাইবার সময় পুণার ও অন্য স্থানের দেশীয় রাজ্যকে সাহায্য করিবার জন্য উনি ২৫০০০৲টাকা বাহির করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাহার ব্যবস্থার ভার বর্যোক্ত নগরকর ও আবাসাহেব সাঠের হাতে দিয়াছিলেন। যাক্ ; আমরা বোম্বাই যাইবার পর প্রথম মাসে সমস্ত পুরাতন ও নূতন মিত্রমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এবং ঘরকন্নার ব্যবস্থা করিবার জন্য উনি বাহির হইলেন। তারপর জানোয়ারীর শেষে ওঁর পুরাতন প্রাণেরবন্ধু বা. ব. শঙ্কর পাণ্ডুরং পণ্ডিত পীড়িত হওয়ায়, স্ত্রীপুত্রের সহিত পোরবন্দর হইতে বোম্বায়ে ঔষধোপচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। বোম্বায়ের ডাক্তারেরা তাঁহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ৫।৬ মাস ছুটি লইয়া এইখানেই থাকিয়া উহাঁর ঔষধোপচার করা উচিত। তাই বোম্বায়ে থাকা স্থির করিয়া পণ্ডিত একটা বাঙ্গলার সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কোনটাই পছন্দ হইল না। একদিন সকালে এইরূপ দুই একটা বাঙ্গলা দেখিয়া তিনি আমাদের বাড়ী আসিলেন এবং বলিলেন যে, "আমি গত সপ্তাহে অনেক বাঙ্গলা দেখেছি, কিন্তু সুবিধাজনক ও আপনাদের নিকটবর্ত্তী কোন বাঙ্গালাই এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না, তাই অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হচ্চে। বোম্বায়ে থেকে আপনাদের হইতে দূরে থাকা আমার ভাল লাগে না, দিনের মধ্যে নিদেন দুই একবারও আমাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হয় এইরকম নিকটে কোন বাঙ্গলা পেলে, আমি পৃথক বাসায় থাকৃতে পারি; নৈলে আমার লোকজন নিয়ে এসে এই খানেই থাকব।

এই বাঙ্গলাটা খুব বড়"। এই কথা শুনিয়া "উনি" বলিলেন যে,—"বাঃ! এ রকম হলে, ত ভালই হয়। আমিও তোমার কাছে এই কথা পাড়ব বলে অনেকবার মনে করেছিলুম" কিন্তু "উনি" তারপর আবার বলিলেনঃ—"আমাদের মত সব কাজে বিলম্ব করা কিংবা একটু বাধাবিঘ্ন সহ্য করা তোমার কখনই অভ্যাস নাই। প্রথম থেকেই সমস্ত বিষয় সুনিয়মে ও ঠিক সময়-মত হওয়া চাই,—এই রকম তোমার অভ্যাস। আজ পর্য্যন্ত তুমি স্বাধীনভাবে চলচ; তোমাকে আমাদের বাড়ীতে থাক্‌তে বল্লে, তুমি হয়ত আমাদের কথা ঠেল্‌তে না পেরে "হাঁ" বল্‌বে কিন্তু তোমার লোকজনদের তা কতটা ভাল লাগবে কে জানে,—এই রকম আমার মনে হওয়াতেই আমি এখনো পর্য্যন্ত তোমাকে কিছু বলি নি।" এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত বলিলেন যে, "না না, সে রকম কিছুই না, আমার লোকজন অনেক। আপনাদের কষ্ট হবে বলেই আমি অন্য বাড়ী দেখছিলুম। এখন আমি মন স্থির করেছি। আমি কালই এখানে এসে থাক্‌ব।" এইরূপ বলিয়া তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন এবং তিন চার দিনের মধ্যেই ছেলে পিলে ও বৌদিদিকে সঙ্গে করিয়া এখানে থাকিতে আসিলেন। আমাদের বাড়ী আসা অবধি সকাল সন্ধ্যায় 'উনি' পণ্ডিতের নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিবার সময় পাইয়াছিলেন। এই জন্য পণ্ডিত বেশ স্ফুর্ত্তিতে ছিলেন মনে হয়; কিন্তু এই স্ফূর্ত্তি কেবল মনেরই স্ফুর্ত্তি। শরীরের ভিতর যে রোগরূপ ভীমরুল গর্ত্ত কাটিতেছিল, তাহার কাজ সজোরেই চলিতেছিল। তাহার সামনে এই মনের স্ফুর্ত্তি আর কত দিন টিকিবে? ভিতরকার রোগের যন্ত্রণা বাড়িতে থাকায়, তিনি অধিক দুর্ব্বল ও অশক্ত হইয়া পড়িলেন ও মনেও অধিক অসোয়াস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন তিনি একলা থাকিতেন সেই সময় এই রোগের যন্ত্রণায় গোঁগুরাইতেন ও একেবারেই অধীর হইয়া পড়িতেন; কিন্তু পণ্ডিতের কাছে আসিয়া 'ওঁর' বসিবার সময় উপস্থিত হইলেই, পণ্ডিত চাজা হইয়া উঠিতেন। ওঁর সহিত কথা কহিবার সময়, তাঁর যে কোন রোগ আছে সে স্মরণ পর্য্যন্তও তাঁর নাই বলিয়া মনে হইত। কেবল 'ওঁর' অবস্থা শুধু একেবারেই উল্টা হইয়াছিল। পণ্ডিতের সহিত কথা কহিবার সময় উনি খুব ধীরভাবে বলিতেন, কিন্তু তাঁর নিকট হইতে উঠিয়া নিজের কামরায় আসিবার পর সমস্ত ক্ষণ তাঁর শরীর সম্বন্ধে ভাবিতেন। বাড়ীতে সরকারী কাজ করিবার সময়, খাওয়াদাওয়ার সময়েও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেন এবং উদাসভাবে "রাম-রাম" উচ্চারণ করিতেছেন—বারংবার শুনিতে পাওয়া যাইত। রাত্রিতে কতক্ষণ ধরিয়া আমাদের মধ্যে কেবলই তাঁহার কথা হইত। এই সময়ে কখন কখন উনি উঠিয়া পণ্ডিতের ঘরে গিয়া, পণ্ডিত ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন কি না, আজ তাঁর শরীর কেমন আছে, ইত্যাদি চুপি চুপি দেখিয়া আসিতেন; কখন কখন এই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি ওঁর নিদ্রা আসিত না। এইরূপ ভাবে দিনের পর দিন যাইতেছে—এমন সময় ১৮ই মার্চ্চ ১৮৯৪ তারিখে সকাল বেলায় ৬টার সময় তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল! বেচারী উমা-বাইর উপর সমস্ত দুঃখের পর্ব্বত চাপিয়া পড়ায় তাঁর শোকের তো সীমা ছিল না! কিন্তু এই পণ্ডিতের বিয়োগে, নিজের পুত্র বিয়োগ বা ভ্রাতৃবিয়োগের মতোই ওঁর শোক হইয়াছিল! পণ্ডিতের মতো মানী, তেজস্বী বুদ্ধিমান ও নিরলস ব্যক্তি মেলা খুবই দুর্ঘট, ওঁর মুখ হইতে বারংবার এইরূপ উচ্ছ্বাস-বাক্য বাহির হইত। ওঁর উপর পণ্ডিতের এরূপ অপরিসীম প্রীতি ছিল যে অনেক দিনের পর ওঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে খুব ঘনিষ্ঠভাবে, প্রীতি সহকারে, আদুরে ছেলের মতো ওঁর সহিত ব্যবহার করিতেন। যখন দীর্ঘকালের জন্য আসিয়া আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, যতদিন থাকিতেন, দুজনের মধ্যে ছোট বড় কত কথাই হইত, জিজ্ঞাসাবাদ হইত—এবং ইহাতেই মত্ত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। যখন তাঁরা দুজনে বসিতেন, আমি সেই স্থান হইতে, কোন কাজে চলিয়া গেলে পণ্ডিতের ভাল লাগিত না। এই সম্বন্ধে কখন কখন ওঁকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "লোকে বলে, দুজনেরই সমান স্বভাব না হইলে ভালবাসা জমে না; তবে তোমার সহিত পণ্ডিতের কি করিয়া এতটা বন্ধুত্ব হইল? দুজনের স্বভাবের মধ্যে তো আগুন জলের পার্থক্য। পণ্ডিতের মুখের বোল এই ছিল—I shall better like to breake than to bend। এবং তোমার তত্ত্ববাক্য ও আচরণ, পণ্ডিতের আচরণ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত।" তাতে উনি বলিলেন, "এই দরুণই তাঁকে অধিক ভাল বলে মনে করতে হবে। ভাল লোকদের মধ্যেই তেজস্বিতা বেশী দেখা যায়। তোমরা টীকাকার যাই টীকা কর না কেন—কিন্তু আমরা দুজনে 'শিবস্য হৃদয়ে বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ে শিবঃ' এইরূপ পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করেছি। এই মার্চমাসে ১৩ই মাঘেই চিরঞ্জীব নান্থুর পুণায় জন্ম হইল।

(ক্রমশঃ)

নানা-কথা।

জনৈক ব্রাহ্ম বন্ধুর পত্র। "আপনার ২৫ তারিখের (জানুয়ারির) পত্রে আপনার সাদর আলিঙ্গন আমাকে বড় প্রীতি প্রদান করিল। আপনাদিগকে স্মরণ করিব না, তবে কাহাকে স্মরণ করিব। রাজা রামমোহন রায় নিরাকার একেশ্বরবাদ স্থাপন করিয়া বৈরাগ্য এবং সত্যেতে বঙ্গবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গেলে শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজকে কোন প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহর্ষিদেবের আবির্ভাবে নিরাকার ঈশ্বরই যে সত্যভাবে দর্শন করা যায় তাহা আবিষ্কৃত হইল। ঈশ্বর-উপাসনা আজ যা ব্রাহ্মসমাজে চলিত আছে তাহা তাঁহারই প্রবর্ত্তিত। যার যার সাধনার ক্রমে তাঁহাদের উপযোগী (ঈশ্বরালোকে) করিয়া লইয়াছেন এইমাত্র প্রভেদ। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মহর্ষিরই শিষ্যরূপে—অধ্যাত্মপুত্ররূপে সেই ধর্ম্মকে প্রচার করিয়াছেন। * * * মহর্ষিদেবের আত্মজীবনীতে আছে তিনি কাহারও নিকট হইতে ধর্ম্ম পান নাই। স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাকে আলোকিত করিয়াছেন। "ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"! শেষ জীবনে মহর্ষিদেব এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্র মধ্যে যে পত্রাপত্রি হয় তাহাতে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে যে ব্রহ্মানন্দ

চির দিন মহর্ষিদেবকে পিতা বলিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি মহর্ষিদেবেরই অধ্যাত্মপুত্র। আমি ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত মফঃস্বলবাসী ছিলাম। ১৮৬২ সন হইতে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করি, তখন আদিসমাজ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। মহর্ষি-প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে যে উপাসনাপদ্ধতি আছে যা আদিসমাজে এখনও প্রচলিত সেই পদ্ধতি মুখস্থ করিয়া উপাসনা করিয়াছি এবং তখনকার হিন্দুরা ব্রাহ্মসমাজের শাখাতে যোগ দিতেন। কালে ব্রহ্মানন্দ-সংস্রবে সাধনভজনে তাঁদের সঙ্গে সংযুক্ত হই। * * * তৎপূর্ব্বেও আমি জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতাম, যখনই বিষয়-কার্য্য হইতে অবকাশ পাইতাম। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মগ্রন্থের উপাসনাপদ্ধতিই প্রথম লোককে অবলম্বন করিতে বলিয়া থাকি। * * * আমার বয়স এখন ৭২ বৎসর, জোর ৭২ আরম্ভ। আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। নচেৎ আমি বুধবারে বুধবারে কলিকাতায় আদিসমাজেই উপাসনায় পূর্ব্বে যেমন যোগ দিতাম এখনও সেইরূপ দিতাম।

আপনি যে তিন সমাজ মিলিয়ে উপাসনার যাহা করিয়াছেন তাহাতে আমি বড় প্রীত। আমি আদিসমজের উপাসনায় সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারি; কারণ এইখানে আমার জন্ম। জন্মগত জিনিষ চিরদিন ভাল। আমি ময়মনসিংহ অঞ্চলে কিশোরগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য ১৮৮০ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত করিয়াছি, এবং বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজে কয়েক বৎসর সময়ে সময়ে প্রচার করিয়াছি। এই দুই সমাজে যাহাতে আদিসমাজের প্রচারক যেয়ে উপাসনা আদিসমাজের মতে বুধবারে করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এখনও আমার প্রাণ চায় যে মহর্ষি যে পন্থায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন আমি যতদূর পারি তাহার সহায়তা করি।

আদিসমাজের উপাসনালয়টী বিক্রয় হইবে—শুনে প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম। হায়! রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি যেখানে উপাসনা করিতেন; বিশেষতঃ রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাবযোগ যেখানে,—সেই মহাতীর্থ স্থানটি আজ বিলুপ্ত হইতে চলিল।

শব্দের শক্তি।—বাইবেলে লিখিত আছে যে, জেরিকোর প্রাচীর যিহুদীগণের জয়ধ্বনিতে এবং সাত জন পুরোহিতের শিঙ্গা-রবে তাহাদের সম্মুখে ভূতলশায়ী হইয়াছিল। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই সকল কথা স্বীকার করিতে চান না বটে কিন্তু এখন শব্দবিজ্ঞানের আলোচনা ও আবিষ্কারের দ্বারা জানা যাইতেছে যে বাইবেলের এই ঘটনার সত্যতা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রমাণিত হইতে পারে। শব্দগতি হইতে কত প্রকার কার্য্য সম্ভবপর হইতে পারে তাহা এখনও জানা যায় নাই। কথিত আছে যে ক্যারিউশো মৌখিক গদে গান গাহিয়া মদের গ্ল্যাস ভাঙ্গিতে পারেন। শুনা যায় যে মধুর সঙ্গীতে বাঁশীর প্রধান স্বর স্থান ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল। লোকে বলিয়া থাকে যে যখন নায়াগারায় ঝুলান সেতু প্রস্তুত হইতেছিল তখন ইহার কারিকরগণ কোন বৃদ্ধ বেহালা-বাদককে রাগান্বিত করিয়াছিল বলিয়া বেহালা-বাদক সেতু ভাঙ্গিয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছিল, ইহাতে কারিকরেরা তাহাকে খুব উপহাস করায় বেহালাবাদক সেতুর অতি নিকটে উপবেশন করিয়া তাহার শক্তি পরীক্ষা করিতে লাগিল। যখন বেহালার স্বর আসিল, তখন সে তন্ময় হইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে সেতুর তারগুলি খসিয়া যাইতে লাগিল এবং সকলে আশ্চর্য্য ও ভয়সহকারে দেখিল যে সেতু ভাঙ্গিয়া যাইতে উদ্যত। তখন যদি তাহার বেহালাবাদ্য না থামান হইত তাহা হইলে তাহার কথা কার্য্যে পরিণত হইত। ইহার পরে সেতু-নির্ম্মাণস্থানে যাহাতে শব্দ না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়াছিল।

সম্মিলনী ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

মিসরে আবিষ্কার।—দানিনম পাশা মিসরের অন্যতর প্রাচীনতম নগর ক্যানোপস (Canopus) আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। আলেকজান্দ্রিয়া স্থাপনের বহু পূর্ব্বে ইহাই বাণিজ্যে দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নগর ছিল। নিম্ন মিশরে ইহাই ধর্ম্ম-প্রচারের অন্যতর মুখ্য কেন্দ্র ছিল। এই নগরে টলেমির সময়ের একটী সুবৃহৎ স্নানাগার, বিভিন্ন গৃহে টলেমিবংশীয়দিগের শবমূর্ত্তির নিকটে পিত্তলের মুদ্রা ও ছোট ছোট মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে একটী চীনেম্যানের মূর্ত্তি আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে অতি পুরাকালে চীনের সহিত মিশরের বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল। ভারতের সঙ্গে যে ছিল না তাহাই বা কে বলিতে পারে?

"শ্রীভগবৎ কথা" ও "মা"। এই দুইখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রথিতনামা জনৈক বন্ধু একটী পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। আশা এই যে, তৎপাঠে অপর কাহারও প্রাণে ঐ দুইটী গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবে এবং পাঠ করিয়া ভগবানে মতি দৃঢ় হইবে;—

* * * আপনার ন্যায় সরল সহজ ভাষায় সহজপ্রণালীতে শ্রীভগবানের কথা মনের ভিতর প্রবেশ করাইবার চেষ্টা ও তাহাতে সফলতা আজ পর্য্যন্ত আর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। বিদেশে অনেকগুলি বই লইয়া আসা সুবিধা হয় না; আমার সঙ্গে এখানে যে সকল বই লইয়া আসিয়াছি, আপনার "শ্রীভগবৎকথা" তাহাদের মধ্যে একখানি; তাহা হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন বইখানিকে আমি কত ভাল বাসিয়াছি।

আপনার "মা"ও পাঠ করিলাম। তিনি মা ও আমরা ছেলে, এই সম্বন্ধ এই বইখানিতে সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইবার অতি সহজ উপায়। অনেকে বলিয়া থাকেন যে ভক্তিপথ বড় সোজা। মার নাম করিব আর দুই চক্ষে অশ্রুধারা বহিবে; এ পথে মানুষ সহজে পৌঁছাইতে পারে বলিয়া আমার বোধ হয় না। আপনি আপনার মনকে যে সুরে চড়াইয়া মার নাম গাহিয়াছেন, যদি আমিও কখন সেই সুরে চড়াইতে পারি, তাহা হইলেই বুঝিব যে ভক্তিপথের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব।

একটি নিজের কথা বলিব। আপনি ৭এর পাতার যা বলিয়াছেন, আমাকে তিন বার তাহা বলিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে মাকে অনেকটা চিনিতে শিখিয়াছি। ১৭ বৎসরের বালক তিন দিন ধরিয়া এক মনে মাকে ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল—মার কোলে গেল, ইহা দেখিয়া ধন্য হইয়াছি।

বিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

আশ্বিন ব্রাহ্মসংবৎ ৯০।

৯১৪ সংখ্যা ১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

"শুভ মুহূর্ত্ত"।
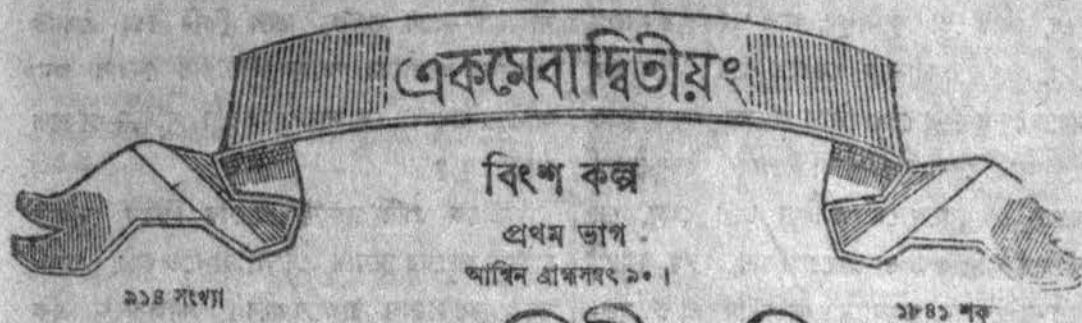
অতি দূর সীমাহীন দিগন্তের কোলে
কেন আজি ছুটে যেতে চাহে মোর প্রাণ—
কাহার আহ্বান বাণী পশিছে মরমে আজি
ভাবপূর্ণ ভাষাহীন নীরব মহান্ ?
নৈশ আকাশের তলে কোন্ দেবদূত
আছে মোরে অপেখিয়া নীরব নিশ্চল !
অস্ফুট হেরিছে নেত্র সে রূপমাধুরী,
অস্পষ্ট পশিছে কর্ণে সে গীত তরল
বাঁশরীর ক্ষীণ তানে মৃদু সমীরণে ;
কি সৌরভ ! কি সঙ্গীত ! আকুল পরাণ
ছুটিছে সসীম হতে অসীমে মিশিতে—
ঘুচে গেছে সব বাধা সব ব্যবধান।

উদ্বোধন।

(কোজাগর পূর্ণিমা উপলক্ষে)

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে যে, কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে লক্ষ্মী আসিয়া প্রত্যেক লোকের দুয়োর ঠেলে দেখেন। যদি কোন গৃহস্থ ঘুমিয়ে থাকেন, তাহলে সে গৃহ ছেড়ে লক্ষ্মী পালিয়ে যান। আর যে গৃহস্থ লক্ষ্মীদেবীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য জেগে থাকেন, তাঁহার গৃহ তিনি ধনধান্যে পূর্ণ করে দেন। এই প্রবাদের ভিতর যে-কোন সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে থাক্, আমরা কিন্তু তার ভিতর থেকে এই একটী মহান্ সত্য পাচ্ছি যে ইষ্ট দেবতাকে লাভ করতে চাইলে, তাঁর প্রসাদ অনুভব করতে চাইলে জেগে থাকা চাই। ধন চাও, বিদ্যা চাও, পৃথিবীতে ঐহিক যা কিছু চাও, যে কোন জিনিষকে পেতে চাও, তারই জন্য তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে। ঘুমিয়ে সময় কাটালে তুমি তা পাবে না। অন্য লোক যদি জেগে থাকে, তবে তারাই তাদের পরিশ্রমের ধন লাভ করে উন্নতির দিকে চলতে থাকবে, আর তুমি জেগে উঠে তাদের উন্নতি দেখে নিরাশ-হৃদয়ে কেবল হাহুতাশ করতে থাকবে। ঐহিক জিনিষ আর অধ্যাত্ম জিনিসের পার্থক্য যাঁরা জানেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে, ঐহিক জিনিষের জন্যই যদি আমাদের জেগে থাকতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়, তবে অধ্যাত্ম জিনিষ লাভ করবার জন্য তার চেয়ে শতগুণ পরিশ্রম করতে হবে। সর্ব্বদাই সজাগ থাকতে হবে, প্রতি মুহূর্ত্তে অধ্যাত্ম বিষয় লাভের জন্য সতৃষ্ণ নয়নে আশাপথ চেয়ে থাকতে হবে। এক মুহূর্ত্তও ঘুমোলে চলবে না। হয়তো তুমি যে মুহূর্ত্তে মনে করছ যে এখনও পাবার অবসর হয় নি, আর সেই ভেবে নিরাশ মনে জেগে থাকা অনাবশ্যক মনে করলে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভগবান জ্যোতির্ম্ময়রূপে তোমার সামনে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু তুমি তখন নিদ্রিত—তাঁকে তুমি দেখতে পেলে না। এটা মনে কোরো

না যে, এবার তো ঘুমোলুম, আর একবার সজাগ থাকব, তখন ভগবানকে দেখতে পাব। যে বার ভগবান যে মূর্ত্তিতে দেখা দিতে আসেন, সে মূর্ত্তিতে তাঁকে আর দেখা যায় কি না সন্দেহ। যেমন এই ব্রহ্মচক্র এই মুহূর্ত্তে যে পথ দিয়া চলে গেল, সে পথ দিয়ে আর কখনও চলবে কিনা, কেহ বলতে পারে না, তেমনি ভগবানের আবির্ভাব প্রতি মুহূর্ত্তেই যখন নবনব ভাবে হচ্ছে, তখন একবার যে মূর্ত্তিতে তিনি দেখা দেবেন, আর কখনও সে মূর্ত্তিতে দেখা দেবেন কি না বলা যায় না। বোধ হয় এই ভাবেই আমাদের ঋষিরা বলেছেন সকৃৎ বিভাত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ—এই ব্রহ্মলোক একবারই প্রকাশ পায়। সেই প্রকাশের সময় যিনি তাঁকে হৃদয়ে ধরতে পারলেন, তিনিই তাঁকে সেই মূর্ত্তিতে ধরতে পারলেন।

ঘুমিয়ে থাকবার আর অবসর নেই। ভগবানের জন্য সতৃষ্ণনয়নে প্রতীক্ষা করে থাক। হৃদয়ের অন্ধকার গৃহের দুয়োর খুলে দাও। এই পবিত্র স্থানে পবিত্র সন্ধ্যাকালে আমরা তাঁকে পাবার জন্য কি ভাবে প্রতীক্ষা করব, কি উপায় অবলম্বন করলে সমস্ত জীবন জেগে থাকতে পারব, সেইটী জানবার জন্য এসেছি। আজ আমাদের সেই উপায়টী জেনে যেতে হবে। সে উপায়টী আর কিছুই নয়—হৃদয়ের দুয়োর খুলে রেখো; প্রাণটাকে বন্ধ করে রেখো না। অন্ধকার গৃহে এতটুকু আলো পেলেও সেটুকু সঞ্চিত করে রাখতে হবে। সেই অরূপরূপী জননী বড়ই নিঃশব্দে এসে হৃদয় অধিকার করেন। সন্ধ্যার শিশিরের মত তাঁর আবির্ভাব বোঝা যায়। কিন্তু তিনি এসে যদি দুয়োর ভেজানো দেখেন, দেখে যদি ফিরে যান, সে দোষ কার উপর ফেলব, সে দোষ তো আমাদের। তিনি যখন আসবেন, তখন আকাশে গ্রহচন্দ্র নক্ষত্রসূর্য্য সকলেই আনন্দে হাসতে থাকবে। তখন ফুলফল গাছপালা সমস্তই প্রফুল্ল হয়ে উঠবে, নদী সাগর সমস্তই প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করবে; আর, আমাদের হৃদয়ে আনন্দধ্বনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে। এর পরেও যদি আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, তাঁর দেখা না পাই, তবে সে দোষ তো আমাদের নিজেরই। এই উপাসনামন্দিরে যদি আমরা সকলে মিলিতকণ্ঠে প্রাণের সঙ্গে এখনি মা—মা—বলে ডাকি, তবে তিনি তো এখনই এখানেই আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবার জন্য আসতে বাধ্য। সে আনন্দকলরবে ঘুমিয়ে থাকতে পারে কে?

তাঁকে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণের ভিতর দেখতে চাইলে হৃদয়ের দুয়োর খোলা রাখতে হবে, প্রাণ-মন সমুদয় সজাগ রাখতে হবে। আলস্যকে এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থান দেবে না। এই আলস্যই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। ঐ যে একটা কথা আছে ব্রহ্মের রূপকল্পনা সাধকদের হিতের জন্য, এটার ভিতর খুব সত্য থাকলেও আমরা খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, আজকাল সাধারণে উহার অর্থ যে ভাবে গ্রহণ করেন তাহা কখনই ঠিক হতে পারে না। মায়ের কাছে ছেলে যাবে, মাকে ছেলে হৃদয়ের পূজা দেবে, তার জন্য রূপকল্পনা, মূর্ত্তিস্থাপন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা এত ঘনঘটা এত রকমের অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন? সরল প্রাণে সরল পথ ধরে তাঁর কাছে চল, তাঁকে হৃদয়ের পূজা দাও, হৃদয়ের গুহা অন্ধকার রেখো না, জ্ঞানের আলো জ্বেলে দাও, তখন বুঝতে পারবে যে, ব্রহ্মের রূপকল্পনার দোহাই দিয়ে যে আলস্যের প্রশ্রয় দিয়েছিলুম, সেই আলস্য আমাদের কি সর্ব্বনাশ করেছে—মায়ের কাছ থেকে আমাদের কত দূরে রেখেছে।

জননীর জয়গানে সমস্ত আকাশ প্রতিধ্বনিত করে তোলো। অন্য সমস্ত কথা ছেড়ে দাও। তাঁর অরূপ রূপের কথাই বল, সেইটাই হৃদয়ে অনুভব কর, তখন দেখবে এই বিশ্বজগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে প্রত্যেক নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তাঁকে দেখতে পাবে; তখন আর রূপকল্পনার জন্য রাশি রাশি মূর্ত্তি গড়ে পূজার কথা মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ে স্থান পাবে না। তখন জননীর যে জ্যোতির্ম্ময় রূপের আভাসমাত্রে সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র আশ্চর্য্য আলোকে বিভাসিত হয়েছে, যাঁর জ্ঞানজ্যোতির ইঙ্গিতমাত্র আমাদের আত্মা প্রভাতসমীরণে শুভ্র শতদলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, সেই আশ্চর্য্য মূর্ত্তি আমাদের সমুদয় হৃদয় অধিকার করবে। এসো, আজ এই শুভমুহূর্ত্তে তাঁর সেই অরূপরূপের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করে প্রাণকে শীতল করি।

প্রকৃত শিক্ষা।

(শ্রীযোগেশ চন্দ্র চৌধুরী)

আমাদের দেশে পূর্ব্বে এক সময় ছিল যখন শিক্ষা তাহার নিজের অবলম্বনে দাঁড়াইত অন্য কোনও বস্তুর মুখাপেক্ষী তাহাকে হইতে হইত না। বিদ্যার্থী বিদ্যা শিখিতেন শুধু বিদ্যারই নিমিত্ত—বিদ্যাই ছিল তাঁহাদের আরাধনার দ্রব্য। তখন দেশের অবস্থা অন্যরূপ—অন্নের হাহাকার চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান কালের মত বাজিয়া উঠে নাই, বিলাসিতার বিষ তখন দেশের অঙ্গ জর্জ্জরিত করে নাই—লোকে অল্পে সন্তুষ্ট হইত, জীবন অপেক্ষাকৃত সরস ছিল। মামলা, মোকদ্দমা, অশন, আসন, বসন, ভূষণের চেষ্টায় বাঙ্গালী তখন এতটা ব্যতিব্যস্ত ছিল না। তখন গৃহে গৃহে ম্যালেরিয়ার এত প্রকোপ হয় নাই; প্লেগ কলেরা বসন্তের রক্তচক্ষু দেশবাসীগণকে এরূপ বিব্রত করিয়া তুলে নাই; সমুদ্রপার হইতে বিলাতী বিলাসী দ্রব্যের সঙ্গে নিত্যনূতন রোগের বীজ দেশের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া দেশের বায়ুকে এমন করিয়া কলুষিত করে নাই; সর্ব্বোপরি অকাল মৃত্যুর বিজয়ভেরী এখনকার মত চতুর্দ্দিকে তাহার জয়ডঙ্কা নিনাদিত করে নাই। মানুষ ছিল বহু-ভোগী এবং দীর্ঘজীবী। সে সময়ে বিদ্যার্থী গুরু-গৃহে অবস্থান করিয়া পাঁচ বৎসর কাল ব্যাকরণ, সাত বৎসর কাব্য, দশ বৎসর ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়নে অসঙ্কুচিতভাবে ব্যয় করিতেন। বিদ্যায় অর্থ ব্যয় হইত না—গুরুগৃহে বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিতেন, গুরু অন্নদানে কাতর ছিলেন না। দেশের জমিদারগণ ভূমি এবং বৃত্তি দান করিয়া সেই সকল অধ্যাপকগণের মহৎকার্য্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন।

জীবন তখন তাহার স্বাভাবিক গতিতে চলিয়া-ছিল—কোনরূপ অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উহার গতিশক্তিকে বর্দ্ধিত করিবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইত না। এখন জীবনের গতিশক্তি অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানকালে জীবনে আমাদের বড়ই ব্যস্ত থাকিতে হয়। এখন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখাপড়া সাঙ্গ করিতে পারিলে তবে রাজকার্য্য পাওয়া যাইবে। কে বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এক প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রদান করিতে হইবে—অধ্যাপক এবং শিক্ষক কোন একটি বিশিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা দিবেন—ঠিক এক ঘণ্টা বা পঞ্চাশ কিম্বা কোন কোন স্থলে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে—বিদ্যার সাধনা, যাহা আদৌ সময়মুখাপেক্ষী নহে। তাহাকে এইরূপে বৎসর, মাস ও দিনের কঠোর কাঠগড়ায় নিক্ষেপ করিয়া তাহার সমস্ত রস নিং-ড়াইয়া ফেলা হইতেছে। পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষার চরম লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ফলে বিদ্যার সাধনা যথেষ্টপরিমাণে খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। শিক্ষার প্রসার বাড়িয়াছে, গভীরত্ব নষ্ট হইয়াছে। চেয়ার, টেবিল, টুল, তক্তাপোষে গৃহ পূর্ণ হইল—কিন্তু ফলভারাবনত বৃক্ষের অভাব; শিক্ষার বহি-শ্চাকচিক্য বহুল পরিমাণে রহিয়াছে, নাই কেবল তাহার স্নিগ্ধ শ্যামলতা যাহা জীবনের রসে অভিষিক্ত।

বর্ত্তমানকালে জীবনযাত্রা যে বড়ই জটিল হইয়া পড়িয়াছে ইহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানাপ্রকার অভাব অভিযোগের সহিত সংগ্রাম করিয়া তবে আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইতেছে। এই সকল অভাব অভিযোগ দূর করি-বার নিমিত্ত সকলকে সচেষ্ট হইতে হইয়াছে। এই নিমিত্ত জীবনে আমাদিগকে বস্তুসংগ্রহের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় আমাদের শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে বস্তুতান্ত্রিক হইয়া পড়িতেছে। কি প্রাথমিক কি উচ্চশ্রেণীর উভয়বিধ শিক্ষায় নীরস বস্তুর দিকে ছাত্রগণকে লইয়া যাওয়া হইতেছে। জীবনযাপনের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; জীবন বিকশিত হইলে বহুপ্রকার অভিনব উপায়ে সে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইবে গোড়া হইতে তাহাকে একটা বাঁধা পথ দেখাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। জীবনকে গঠিত করিয়া তোলা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ছেলেদের practical করিবার চেষ্টায় প্রথম হইতে কেবল পাশ্চাত্য অনুকরণ শিক্ষা দিলে তাহাদের সমস্ত শিল্পশিক্ষা ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। যে সকল উপকরণে তাহাদের চিত্তের বিকাশ হইবে তাহাই শুধু শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। উন্মুখ চিত্ত যখন আপন স্বাভাবিক বৃত্তি লইয়া

নিজের বিশিষ্টতার পথে অগ্রসর হইবে সেই সময়ে সেই বিশেষ শিল্প, কলা বা সাহিত্য তাহার শিক্ষার বিষয় করিলে যথেষ্ট উপকার হওয়া সম্ভব। আজকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে "বিজ্ঞান-রিডার" নামধেয় একখানি পুস্তক ছেলেদের পড়ান হয়—কথামালা পড়িবার পরেই সম্ভবতঃ ঐ শ্রেণীর পুস্তক পাঠশালায় পড়ান হইয়া থাকে। উহাতে নানা বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, কৃষি, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা আছে। আবার ইংরাজী বিজ্ঞানে যে সকল বড় বড় নাম প্রচলিত আছে—বালকদিগের পাঠ্য সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থেও সেই সকল নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ শিক্ষা বালকগণকে যখন দেওয়া হয় তাহাদের চিত্ত উহার জন্য একেবারেই প্রস্তুত থাকে না—উদজান, যবক্ষারজান, মাধ্যাকার্ষণ, তাপমান যন্ত্র ইত্যাদি সকল কথাই উহাতে আছে। শিক্ষাটাকে প্রয়োজনমূলক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত গ্রন্থকারের প্রবল চেষ্টা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে লক্ষিত হইয়াছে—কিন্তু এমন ব্যর্থচেষ্টাও বোধ হয় আর কুত্রাপি দেখা যায় না। বিজ্ঞান, শিল্প বা সাহিত্যের প্রতি ছাত্রগণের অনুরাগ জন্মিবার পূর্ব্বে যে চিত্তের একটা সাধারণ বিকাশের প্রয়োজন আছে তাহা আমরা অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই। আমরা মনে করি অষ্টমবর্ষীয় শিশুকে যদি বিজ্ঞান-রীডার পড়াইতে পারি তবেই বুঝি একদিনেই বাঙ্গালা দেশের উদ্যানে বিজ্ঞানের পারিজাত ফুল ফুটিবে।

এ তো গেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার কথা; কালেজে বি, এস্, সি, এম্, এস্, সি, পাশ করিয়াই বা কি হয়! উক্ত পরীক্ষায় যাঁহারা সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই বলিতে শুনিয়াছি—"এর চেয়ে বি, এ; এম্, এ, পাশ করিলেই ভাল হইত; ওকালতী পক্ষে খানিকটা সুবিধা হইত"; ইণ্টারমিডিয়েট হইতে ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনা বন্ধ হওয়ায় ইংরাজীতে লিখন কথন ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহাদের বরং কিছু কিছু অসুবিধা হয়। বিজ্ঞানে অনুরাগ স্থাপিত হইল কৈ? শিল্পবিদ্যা সুপ্রচলিত হইয়া দেশের অভাব মিটাইল কই? দৈন্য হাহাকার প্রশমিত হইল কৈ? বিদেশী ভাষায় বিদেশীয় শাস্ত্রের প্রাণহীন অনুকরণ এমনই ব্যর্থ হয় বটে! বিলাতে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান যাহা আলোচিত হইয়া ইয়ুরোপ-খণ্ডকে উন্নত করিয়াছে তাহা সেখানকার জীবনের অভিব্যক্তি। আমরা এখানে যদি ঐ সকল বিষয়ের যথাযথ অনুকরণ করি তাহা হইলে কেমন করিয়া আমাদের সুফল লাভ হইবে? আমাদের স্বকীয় অভিব্যক্তির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া উহা আমাদের জীবনের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে তবেই উহা এ দেশে সার্থক হইয়া উঠিবে—নতুবা স্তূপীকৃত বস্তুর অনুকরণ তাসের ঘরের মত একদিন আপনার ভারে আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ইয়ুরোপ হইতে যাহা আসিবে তাহার ক্ষেত্র এ দেশের মাটীতে প্রস্তুত না করিলে টবে শোভিত বিলাতী ফুলগাছের মত এ শিক্ষা দু' একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের ড্রয়িং রুমের শোভাবর্দ্ধন করিবে মাত্র—ফুল, ফল ও ছায়াদানে দেশের সর্ব্ববিধ অভাব দূর করিবে না।

আমি জানি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অনেক ছাত্র ইতিহাস না পড়িয়া "মেকানিক্স" পড়িতে চায়। গণিতবিজ্ঞানে তাহাদের অনুরাগ অধিকতর বলিয়া যে ইহা ঘটে তাহা নহে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায়—"ইতিহাসে বেশী নম্বর পাইবার সম্ভাবনা নাই—মেকানিক্সে অনেকে পূর্ণ সংখ্যা পাইয়া থাকে।" বিদ্যালয়ে দেখা যায় যে সকল ছাত্রের মেধা অল্প তাহারাই ইতিহাস গ্রহণ করে—কারণ তাহাদের পক্ষে "নান্যঃপন্থা"—কোনও রূপে মুখস্থ করিয়া পাশ করিবে। ছাত্রেরা সর্ব্ববিধ নোট মুখস্থ করিতেছে, পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে পেন্সিল দ্বারা নানা প্রকার চিত্র করিয়া দরকারী প্রশ্নসমূহ চিহ্নিত করিয়াছে—এই প্রকারে "পাশ-ফোভিয়া" চক্ষুরোগের ন্যায় বিদ্যার্থীর একটা বিশিষ্ট ব্যাধিস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। এই পাশ-রোগ সংক্রামক; সর্ব্বত্রই ইহার প্রবল প্রকোপ দেখা যাইতেছে। সংস্কৃত-শিক্ষা—যাহা লোকে বিদ্যাশিক্ষার জন্যই শিখিয়া থাকে তাহাতেও সর্ব্বত্র এই পাশ-পাশ। বেদান্তের মায়াবাদ-পাঠীগণও এই পাশের মায়াপাশে আবদ্ধ।

যে পাশ পাশ করিয়া আমাদের শিক্ষা কলুষিত হইল, বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠিল—সেই পাশের কি মর্য্যাদা আছে তাহা একবার লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। general line এ পাশ করিয়া হয় চাকরী না হয় ওকালতী। তাহাও যে কতপ্রকার নিগ্রহ সহ্য করিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা বলা দুঃসাধ্য। বি, এ ও এম, এ, চাকরী বাজারে ২৫৲।৩০৲ টাকায় বিকাইতেছে। সমস্ত আদালতেই মক্কেল ও মোকদ্দমার সংখ্যা একত্র করিলে উকীল মোক্তা-রের সংখ্যার সমকক্ষ হইতে পারে না।

যে জীবন প্রাণের রসধারায় নিষিক্ত—অভাব-অভিযোগের সম্মুখে সে সঙ্কুচিত হয় না, বিঘ্ন বিপ-দকে তুচ্ছ করিয়া সম্মুখপানে অগ্রসর হইবার শক্তি তাহার আছে। সম্মুখে সমুদ্র দেখিয়া তীরে বসিয়া সে লহর গণনা করে না—লম্ফ দিয়া তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তাহার নিমিত্ত নিয়ম প্রস্তুত করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাহার চলিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা নাই—সে আপনার পথ আপনি তৈয়ার করিয়া লইবে। বিদে-শীয় অনুকরণের দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা যে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহা কেমন করিয়া অস্বী-কার করিব ? জাতীয় জীবনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতি-রেকে কোন শিক্ষাই কার্য্যকরী হইবে না। আমাদের প্রভূত ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলন ব্যর্থ হইবে, যদি বাঙ্গালা সাহিত্যকে আদর করিতে না শিখি ; ভারতবর্ষের বীজে যে দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার সহিত যোগধারা না রাখিয়া আমরা যে বিদেশীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করি অনেক স্থলেই তাহা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এ কথা বোধ হয় আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। যাহার নিজের মর্য্যাদা বোধ আছে সেই অপরের মর্য্যাদা অনুভব করিয়া থাকে। যে দেশের স্বকীয় বিশিষ্ট সাহিত্য ও সভ্যতা আছে সেই দেশই অপর দেশের সাহিত্য ও সভ্যতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের দেশীয় সাহিত্য এবং সভ্যতাকে একেবারে বর্জ্জন করিলে বিদেশী সাহিত্য এবং সভ্যতা আমাদের গলগ্রহস্বরূপ হইয়া উঠিবে। উহা আমাদের জাতীয় জীবনের বন্ধন মোচন না করিয়া কঠোর হইতে কঠোরতর বন্ধনে প্রতিদিন আমাদিগকে বাঁধিতে থাকিবে। জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের দেশে যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক জীবনধর্ম্মাবলম্বী নহে ; তাহা একটী প্রকাণ্ড কারখানার মত দেশের মধ্যস্থলে বসিয়া আছে—সমস্ত দেশের হৃৎপিণ্ড, শিরা, উপশিরার সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, এই কারণে সে যাহা তৈয়ার করিতেছে তাহা খাঁটী মানুষ না হইয়া অনেকটা কলের পুতুল হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা কলের পুতুলের ন্যায় বসি দাঁড়াই, একটা বিধিবদ্ধ কাজে লাগাইয়া দিলে সে কাজ বেশ করিয়া যাইতে পারি ; কিন্তু জীবনযাত্রার নিমিত্ত যে প্রাণময়ী উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই। আমাদের শিক্ষা আমাদের জীব-নের সহায় হইতে পারে নাই, জীবনের সহিত উহার বিশেষ সংশ্রবও নাই। আমাদের গৃহের সহিত আমাদের শিক্ষার কোন নিকট সম্বন্ধই নাই। সেই জন্য পাশ করা হইয়া গেলেই আমাদের শিক্ষা শেষ হইয়া আসে ; জ্ঞানচর্চ্চা জীবনব্যাপী সাধনা হইয়া দাঁড়ায় না।

এ দেশে যখন প্রথম ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন হয় তখন অল্প বেতনে কেরাণী সংগ্রহ করা ইংরাজগণের উদ্দেশ্য ছিল। তারপর হঠাৎ এই ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আমরা কেরাণী, উকিল, ডাক্তার ও ইঞ্জি-নিয়ার অনেক পরিমাণে পাইয়াছি বটে ; কিন্তু আমাদের জীবনের সাধনা সার্থক হইয়া উঠে নাই। তবে একটা শুভলক্ষণ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ আমরা প্রকৃত পন্থা অন্বেষণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। দুঃখ, দৈন্য, অভাব ও মর্ম্ম-বেদনার দুঃসহ ব্যথায় পীড়িত হইয়া জাতীয় জীব-নের মুক্তিদ্বার খুঁজিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছি। বিধাতার বিধানে আমরা সে সত্য পথ পাইব মনে এমন আশা হইতেছে।

সেই ভুল সব চেয়ে সাংঘাতিক যাহা আমাদিগকে জানিতে দেয় না যে আমরা ভ্রান্ত পথে চলিয়াছি। কিন্তু আমাদের শিক্ষাসমস্যাপ্রসঙ্গে সেরূপ কোনও মারাত্মক ভুল আজ আর নাই। আমাদের শিক্ষা বিধানের মধ্যে কোথায় যে একটী কণ্টক রহিয়াছে—যাহা পথটাকে সুগম হইতে দেয় নাই, সে কথাটী আজ দেশের বরেণ্য মনীষিবৃন্দ সুস্পষ্ট বুঝিতে

পারিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা হইয়াছে কেমন করিয়া এ সমস্যা মীমাংসিত হইয়া শিক্ষা দেশের বাস্তব কল্যাণসাধনে সমর্থ হইবে। নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া চালিত হইয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় প্রথানুসারে শিক্ষিত হইয়াও আমরা যে এখনও জীবনহীন হই নাই, তাহার নিদর্শন আছে। এমন অবস্থায়ও আমরা যে জগদীশ চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে পাইয়াছি—তাহা অল্প গৌরবের কথা নহে। অবশ্য কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর নির্ভর করিলে, ইহাঁদের প্রতিভা এতটা ফুটিয়া উঠিত না; কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জাতীয় ভাবের পরিপোষণের পরিবর্ত্তে বরং ঐ ভাব বিনষ্ট করিয়া থাকে। দেশীয় ভাষা এখানে অনাদৃত। বর্ত্তমানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রবেশ লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু সেখানে বাঙ্গালা ভাষাকে তাহার প্রকৃত সম্মানের আসন দেওয়া হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাঙ্গালায় কোনও কাব্য পুস্তক নাই, শুধু অনুবাদ ও রচনা পরীক্ষার বিষয়। পরীক্ষার্থীগণ বাঙ্গালা ভাষা আদৌ আলোচনা করেন না; নিজেদের সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা যে প্রশ্ন থাকে তাহার উত্তর করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্য—যাহাতে প্রাচীন ও নবীন যুগভেদে বঙ্গসাহিত্যের অন্ততঃ পনর আনা অংশ নিবদ্ধ, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবহির্ভূত। মুকুন্দরাম, ঘনরাম, কেতকাদাস, কবিরাজ কৃষ্ণদাস ও বৈষ্ণব মহাজনগণের কাব্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের নামের সহিতও অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েটের পরিচয় হয় না। ইংরাজী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট কাব্যসাহিত্য পাঠকালে দেশীয় কবিগণের ভাবসম্পদ-ভাণ্ডারের দিকে যাঁহাদের চিত্ত বিপুল আগ্রহে আকৃষ্ট না হয়, তাঁহাদের কাব্যালোচনা বিড়ম্বনা। দর্শনশাস্ত্রে ক্যাণ্ট, হেগেল, হেকেলের মতবাদ মুখস্থ করা হইল কিন্তু বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, জৈমিনি, পতঞ্জলি, কপিল প্রভৃতির মতবাদ তথাকথিত দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রগণের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়া গেল। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস স্কুলে পড়ান হইয়া থাকে, তাহাতে ইংরাজশাসনকালের পূর্ব্বে এ দেশের যথার্থ চিত্রের সহিত ছাত্রগণের আদৌ পরিচয় হয় না। কেমন করিয়া পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং কোন্ উপায়ে আবার তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া ভারতের নবজীবনের পথ আলোকিত হইতে পারে, বিদ্যালয়ের ইতিহাসে তাহার আভাস ত নাই, বরঞ্চ এমন অনেক মিথ্যা সংবাদ উহাতে আছে যাহাতে আমাদের আত্মসম্মান ক্রমশঃ লোপ পায়।

জাতীয় ভাব এবং ভাষা হইতে বঞ্চিত হইয়া এমনি ভাবে আমরা যে শিক্ষা পাইতেছি তাহাতে আমাদের জীবন কেমন করিয়া গঠিত হইবে? জীবন স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছে, দাসত্ব ও অনুকরণ হইয়াছে তাহার একমাত্র অবলম্বন। দেশে দেশে নব জাগরণের সুবাতাস বহিতেছে, প্রত্যেক দেশের লোক প্রাণশক্তির অনুপ্রাণনে স্ব স্ব জাতীয় জীবনকে নূতন করিয়া অনুভব করিতেছে, আমরা শুধু অনুচিকীর্ষুর বৃত্তি অবলম্বনে পরমুখাপেক্ষী হইয়া জগতের গলগ্রহস্বরূপ দণ্ডায়মান। জগতের লোক আমাদিগকে কৃপা করিয়া যেন জগতে বাস করিতে দিয়াছে। এখানে আমরা শুধু যেন অনুগ্রহ লাভের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া থাকিব, আমাদের নিজের অধিকার যেন কিছুই নাই।

যে শিক্ষা এই দৈন্য, অবসাদ, আত্মাবমাননা প্রভৃতি কুসংস্কারসমূহকে আত্মজ্ঞানের পবিত্র অনলে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে, যে শিক্ষা দাসত্বের প্রতি ঘৃণা এবং স্বাবলম্বনের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিবে, যাহা এক হাত দিয়া প্রাচ্য জ্ঞানমন্দিরের বহুযুগরুদ্ধ দুয়ার বিশ্বজনের নিমিত্ত উন্মুক্ত করিবে এবং অন্য হস্ত দিয়া দেশবিদেশের বস্তুজ্ঞান নিজের দেশে সংগ্রহ করিবে; যাহাতে অনুকরণ নাই প্রাণ আছে; উপকরণের আড়ম্বর নাই, আছে সত্যের নিমিত্ত প্রাণপূর্ণ একাগ্র সাধনা সেই শিক্ষাই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা। ইহা পাইবার পথে আমাদের যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে; কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকট আমাদিগকে নিরুৎসাহিত এবং উপহসিত হইতে

হইবে, কিন্তু উহাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয়। আমাদিগকে মনঃপ্রাণ এক করিয়া, সমগ্র দেশবাসীগণের সহিত সমস্বরে বলিতে হইবে—“ইহাই আমাদের চাই”। প্রার্থনা ঐকান্তিক হইলে স্বয়ং ঈশ্বর তাহা সম্পূরণের বিধান করেন। আমরা আশা করি আমাদের ঐকান্তিকতা সফল হইবে।

ছোট আর বড়।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমরা যাকে ইতিহাস বলি, সে ইতিহাস নিজের ইচ্ছামত কাউকে ছোট, কাউকে বড় বলে' ঠিক করে, আর আমরাও চর্ব্বিতচর্ব্বণের মতো সেই ইতিহাসের অনুযায়ী মত প্রকাশ করে' নিজেদের বিজ্ঞতা প্রকাশ করি। ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে কয়জন বড় বড় কাজের ভিতরকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ জানেন বা জানবার চেষ্টা করেন? একজনও করেন কিনা অথবা করতে পারেন কিনা সন্দেহ। আসলে ধরতে গেলে আমরা যত ভুল ইতিহাস পড়ি, আর সেই ইতিহাসের উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের মতামত তৈরি করি, কাউকে ছোট মনে করি, কাউকে বা বড় মনে করি।

কিন্তু আমরা কাকে ছোট বলি আর কাকে বড় বলি? কাউকে ছোট বলবার অথবা কাউকে বড় বলবার আমাদের অধিকার কি? আমার নিজের বিশ্বাস, প্রত্যেকেই আপনাপন ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড়। বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র পাঠ করতে করতে বিজ্ঞানাচার্য্য অধ্যাপক (বর্ত্তমানে স্যর) জগদীশচন্দ্রের কাছে যখন উপদেশ পেলুম যে ধুলো না থাকলে আমরা দেখতেই পেতুম না, তখনই আমার মনে এই কথাটী সব প্রথম জেগে উঠেছিল যে, সকলেই যখন ভগবান থেকে এসেছে, তখন কাউকে বড় আর কাউকে ছোট বলবার অধিকার আমাদের নেই। তারপর আবার যখন দেখলুম যে কোন একটী পরমাণু বা শক্তি বিনাশ করবার ক্ষমতা আমাদের নেই, তখনই সেই পরমাণুর আর শক্তির মহত্ব দিব্য চক্ষে দেখতে পেলুম—আমার প্রাণের কথায় খুব সায় পেলুম।

কাউকে বড়, কাউকে ছোট, আমরা কি হিসেবে বলতে পারি? আমি নিজেকে মনে করি যে, ধুলোর চেয়ে আমি খুব উঁচু, খুব বড়; কিন্তু ধুলোর দ্বারা যে সমস্ত কাজ হয়, সে সব কাজ কি আমার দ্বারা হোতে পারে? ধুলোর অভাবে আমি কি জীবজন্তুকে দেখবার শক্তি দিতে পারি? তা যখন পারি নে, তখন ধুলোকে ছোট, আর নিজেকে বড় বলে দেখবার বলবার আমার অধিকার কি? কাউকে ছোট বা বড় বলবার অধিকার সত্যিই আমাদের নেই। কি করেই বা থাকবে? একই মহাশক্তি যে সকলেতে বিকশিত। বৃহত্তম সূর্য্য থেকে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্য্যন্ত সকলই যে একই মহাশক্তির বিকাশ। মহত্তম মানবাত্মা থেকে ক্ষুদ্রতম প্রাণপঙ্কের মনোবৃত্তি পর্য্যন্ত, সকলই যে একই মহান্ অগ্নি থেকে নিঃসৃত বিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। সকলেতেই যে মহাশক্তি ভগবান আছেন। কাজেই আমি বড় তুমি ছোট বলবার অধিকার আমার নেই। তাই আসলে ধরলে তুমি আমি একই। তাই আমরা সকলেই প্রেমের একই বন্ধনে বাঁধা। কোথায় ছায়াপথের অনন্ত নক্ষত্র, আর কোথায় আমার মতো একটী ক্ষুদ্র প্রাণী—সকলেই এক আশ্চর্য্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা।

সকলের মধ্যে এই মহাশক্তির বিকাশ, এই প্রেমের বাঁধন যে গ্রন্থে প্রকাশ করা হবে, যত খুলে বলা হবে, বুঝিয়ে দেওয়া হবে, সেই গ্রন্থই ইতিহাস নামের তত বেশী দাবী করতে পারবে। কেবল কতগুলো লোক মারা গেল, তার বিবরণ থাকলেই কোন গ্রন্থকে ইতিহাস বলা যায় না। পাশ্চাত্যগণ অবশ্য বাহিরের ছোটবড়কে নিয়েই ইতিহাস গড়ে তুলতে চান—ভিতরের কথা তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আছে। আমরাও আজকাল পাশ্চাত্যদেশের নকলে বলতে শিখেছি যে খুব পুরাকালে আমাদের কোনই ইতিহাস ছিল না; আমাদের রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণগুলো ইতিহাস নামেরই উপযুক্ত নয়। যে সমস্ত গ্রন্থে লেখা আছে যে, এতগুলো লোক অমুক যুদ্ধে মরেছে, এতগুলো গ্রামনগর ধ্বংস হয়েছে, অমুক রাজাকে অমুক প্রজা অমুক দিনে খুন করেছে, এখন আমরা পাশ্চাত্যদের

* প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক স্বয়ং দায়ী।

নকলে সেই সমস্ত গ্রন্থকেই খুব বড় ইতিহাস নাম দিয়ে নিজেদের জ্ঞানপনার পরিচয় দিয়ে গৌরব ও গর্ব্ব অনুভব করতে থাকি।

কিন্তু এইখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদের মধ্যে প্রভেদ। আমাদের মন যে কারণেই হোক, দর্শনের দিকে একটু বেশী ঝোঁকে—বাহিরের ঘটনার দিকে কেবল ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চাযাভূযোর মতো তাকিয়ে থেকেই নিশ্চিন্ত হয় না; কিন্তু ঘটনাগুলোর নীচে কি আছে, কিসের জোরে ঘটনাগুলোর উদ্ভব হোল, সেইটি আমরা দেখতে চাই। এইভাবে দেখতে অভ্যাস করেছি বলে, আমরা কাউকে আসলে ছোটবড় করে দেখতে চাইনে। আমাদের শ্রেষ্ঠতম পুরাণ মহাভারত দেখ। তাতে ছোটবড় ভেদাভেদ অলজ্যরূপে দেখানো হয় নি। মহাভারত ভাল করে আলোচনা করে দেখলে বোঝাই যায় না যে সত্যি সত্যি কে বড় আর কে ছোট। দেখা যায় যে, মহাভারতে সমস্ত পাত্র-পাত্রীর ভিতর দিয়ে মিলিতভাবে এক মহাশক্তির বিকাশ দেখানো হয়েছে। পাছে পাত্রপাত্রীর মধ্যে কাউকে ছোট আর কাউকে বড় বলে মনে বসে যায়, তাই প্রথমেই তাঁদের সকলকে হয় জগতের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন দেবতাদের অংশে অবতীর্ণ অথবা নিজের নিজের কর্ম্মফলে নূতন করে জন্মলাভ করেছেন বলে বলা হয়েছে। কাজেই সে অবস্থায় পাত্র-পাত্রীদের কাউকেই ছোট বা বড় বলবার অবসরই পাওয়া যায় না।

কিন্তু পাশ্চাত্যদের ইতিহাস অহংভাবে পূর্ণ বলে নিজেকে বড় করে, আর নিজেকে ছেড়ে অন্য সকলকে ছোট করে দেখতে শেখায়। তাই পাশ্চাত্যেরা নিজেদের সমস্ত শক্তি বর্ত্তমানেরই উপর প্রয়োগ করতে চায়—অতীতের সঙ্গে বা ভবিষ্যতের সঙ্গে যোগ রাখবার একটা তীব্র আশঙ্কা বড় একটা দেখা যায় না। এই ভাব থেকেই ঘটনাগুলো লিখে রাখাকেই ইতিহাস নাম দেবার ভাব তাদের মাথায় জেগে উঠেছে মনে হয়। নেপোলিয়নের জন্ম অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করেই লেখক মনে করলেন যে, মস্ত একটা ইতিহাস লেখা হোয়ে গেল। এ রকম ঘটনাগুলোকে লিপিবদ্ধ করা যে ইতিহাসের এক অংশ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এইটাই ইতিহাসের সমস্ত নয়। এ রকম ইতিহাসে একটা সত্যিকার জীবন পাওয়া যায় না। তাই এ রকম নির্জীব ইতিহাস লিখে বড়াই করা প্রাচ্য পুরন্দর-কারেরা পছন্দ করতেন না। তাই তাঁরা নিজেরা অজ্ঞাতনামা থেকেও সজীব ইতিহাস লিখে নিজেদের ডাকনামেই বিখ্যাত হতে পেরেছেন। সমস্ত জগতে যে একই মহাশক্তি নিজের লীলায় আপনাকে বিকাশ করছেন, নির্জীব ইতিহাসে তাঁরা সে কথার কোন পরিচয় পান না। কিন্তু তাঁরা জগতের ইতিহাসে সেই বিকাশই দেখতে চান, আর দেখাতে চান। তাঁরা জগতের বিভিন্ন লোকের কাজে বাহ্যিক ছোটবড়র ভাব দেখতে পেলেও তাঁরা বেশ জানতেন যে ছোটবড় বলে আসলে কিছু নেই, আসলে কোন লোককে ছোট বা কোন লোককে বড় বলা যায় না। সেই ভাবটাই তাঁরা তাঁদের পুরাণ-ইতিহাসেও দেখাতে সচেষ্ট। তাই প্রত্যেক পুরাণেরই গ্রন্থকার বেদব্যাস—যিনি জগতের জ্ঞানের প্রারম্ভ অবধি সমসময় পর্য্যন্ত সমস্ত ভগবৎ-লীলা দেখাতে অগ্রসর। প্রত্যেক পুরাণকার "বেদব্যাস" নাম ধরে অনাদ্যনন্ত মহাশক্তির অনাদি ও অনন্ত লীলায় আপনাকে মিশিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা জগতের কর্ম্মক্ষেত্রের ছোটবড়র ভাব আসলে স্বীকার করতে চান না বলে প্রত্যেক পুরাণে পরব্রহ্মের মহাশক্তির জাগরণ অবধি আরম্ভ করে সমস্ত ঘটনাকে সেই মহাশক্তির লীলারূপে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছেন; আবার ভবিষ্যতেও সেই মহাশক্তিরই লীলাস্বরূপে কি রকম ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা হোতে পারে, তারও দিকে অল্পাধিক উঁকিঝুঁকি মেরেছেন। এই জন্যই আমাদের পুরাণ, আমাদের তন্ত্র, বলতে গেলে আমাদের সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রকেই সমস্ত কাল ও জীবনের সমস্ত কাজ ধরে রচনা করবার চেষ্টা হয়েছে।

অদ্বৈতবাদ আর পূর্ব্বজন্মবাদ হয়তো ছোটবড়-ভাব নির্ম্মূল করবার মূল। কিন্তু এটা আমাদের ধারণা যে, এই ছোটবড়র অভাবজ্ঞান, সমস্ত জগত সংসারকে একই মহাশক্তির লীলাক্ষেত্র বলে মনে করবার ভাবই আবার সেই অদ্বৈতবাদ আর কর্ম্মফলবাদ বা পূর্ব্বজন্মবাদের মূল আমাদের দেশে খুব

গভীর করে নামিয়ে দিয়েছে। সমস্ত জগত-সংসারকে যখন সেই বিরাট মহাশক্তির বিকাশভূমি বলে মনে করি, তখন তো আমার নিজেরও জ্ঞানের সীমা দেখতে পাই নে, আর জগতসংসারেরও সীমা দেখতে পাই নে—তখন আর ছোটবড়র ছোটখাটো সীমা থাকে না, অসীমে অসীম মিশে যায়—থাকেন কেবল একমেবাদ্বিতীয়ং, এক মহান অদ্বৈতভাব। সংসারে নেমে এসে দেখি, এখানে দ্বৈতবাদ তোমার আমার ভিতর কার্য্যক্ষেত্রে ছোটবড় এনে দিয়ে একটা কাটাছাঁটা সীমা এনে দেয়।

মহান বিশাল অদ্বৈতভাব আমাদের প্রেমেতে, জ্ঞানেতে, আনন্দে শ্রেষ্ঠতম আদর্শের সঙ্গে এক ও অবিচ্ছিন্ন বলে দাঁড় করিয়ে, আমাদের ক্রমাগত বড় বলে বলে, আমাদের ছোট হোতে দিতে জানে না—বড়র দিকে লক্ষ্যটা স্থির রাখিয়ে দেয়। কিন্তু সংসারে দ্বৈতভাব আমাদের বড় আদর্শ ঠিকমত দেখাতে পারে কি না সন্দেহ। এই দ্বৈতভাব আমাদের ক্রমাগত ছোট বলতে বলতে আমাদের আদর্শকে বোধ হয় কতকটা সত্যিই ছোট করে দেয়। দ্বৈতবাদ বাহ্যিক ফল দেখে যা তার মনে হয় তাই সে বলতে পারে। সে কাজেই বলে যে, এটা ছোট, ওটা বড়। সংসারের অনেক কাজ গায়ের জোরে হয়, দ্বৈতবাদেরও ছোটবড় সেই রকম গায়ের জোরে হয়। দ্বৈতবাদ বলে বটে যে, তুমি ছোট থাকলেও চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা আমার সমান বড় হোতে পার, কিন্তু কি করে যে বড় হোতে পারি তার ভিতরকার তত্ত্বটুকু সে বলতে পারে না। রোগ নির্ণয় হোলে তবে তো তার ওষুধ বেরোয়। দ্বৈতবাদ গায়ের জোরে ছোটবড় ধরে লওয়া ছাড়া বলতে তো পারে না যে কেন আমরা ছোট বড় হলুম; কাজেই ছোট কি করে বড় হোতে পারে তার ভিতরকার তত্ত্বটুকুও বলতে পারে না। দ্বৈত-বাদ ছোটবড় হবার একটা কৈফিয়ৎ এই দেয় যে, তোমার বাপমায়ের দোষে তুমি ছোট হয়ে জন্মেছ। কিন্তু কেন তুমি ছোট বাপমা থেকে জন্ম পেয়ে ছোট হোলে, সে কথার বেশ পরিষ্কার স্পষ্ট উত্তর দ্বৈতবাদ থেকে পাই বলে মনে হয় না। এই সব প্রশ্ন আর তাদের ঠিকমত উত্তরে মানুষের জীবন গড়ে ওঠে। কাজেই এসব বিষয়ে কতকগুলো হ-য-ব-র-ল গোছের মনকে প্রবোধ দেবার মতো উত্তর দিলে তো চলবে না। অদ্বৈতবাদ জোরের সঙ্গে এই সব প্রশ্নের যে সমাধান করে, সেটা কেবল মন বুঝানো গোছের নয়, কিন্তু সেই সমাধান আমাদের প্রাণের ভিতর থেকেও সায় পায়।

যে বিশাল অদ্বৈতবাদের কথা আমরা ইঙ্গিত করে এসেছি, সেই অদ্বৈতবাদ বলে যে, প্রকৃতিতে আসলে ছোটবড় বলে কোন কিছু নেই। সেই মহাশক্তির শক্তির বিকাশের গতিতেই আমরা কাউকে বা ছোট, আর কাউকে বা বড় বলে মনে করি। যাকে আজ তুমি ছোট বলে মনে করেছ, সেও যদি স্থানে আর কালে মহাশক্তির বিকাশ-সূত্রে তোমার স্থান অধিকার করত, তবে আর তাকে তুমি ছোট বলে মনে করতে পারতে না। অদ্বৈতবাদ বলে যে, আসলে ছোটবড় বলে কোন কিছু নেই—আমরা প্রত্যেকে, জগতের প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক অণুপরমাণু নিজ নিজ ক্ষেত্রে সব চেয়ে উপযুক্ত ও সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা বড়। অদ্বৈত-বাদের মূল কথা এই যে, এই সমস্ত বিশ্বচরাচর আর এই বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক অণুপরমাণু প্রত্যেক শক্তিকণা সেই মহাশক্তির শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ।

সমস্ত প্রকৃতি এবং প্রকৃতির প্রত্যেক অংশ সেই মহাশক্তির শক্তির বিকাশক্ষেত্র বলেই সমস্ত জগতে তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের অধিকতর বিকাশেই জগ-তের উন্নতি, আর সঙ্গে আমাদেরও উন্নতি। অধিকতর বিকাশের অর্থ কি? তাঁরই তো বিকাশ সব স্থানে আর সব সময়ে? তবে কোন স্থানে বা কোন সময়ে তাঁর অধিকতর বিকাশের অর্থ কি? এই তত্ত্বটি বুঝতে গিয়ে বুদ্ধি কথা সমস্তই হার মানে। ভগবানের সঙ্গে আমাদের এ এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। তাঁরই শক্তির বিকাশে আমরা হয়েছি, আবার তাঁর সেই শক্তির বিকাশেরই ফলে আমা-দের মধ্যে তাঁর আরও বেশী বিকাশ জাগিয়ে তুলতে হবে। এই বিকাশ জাগিয়ে তোলবার মোটামুটি ভাব এই যে, বিশ্বজগতের যেখানে যে কেহ বা যা কিছু আছে, প্রত্যেকের জ্ঞানে সেই বিকা-শের বেশী করে উপলব্ধি হওয়া। সেই মহাশক্তির সঙ্গে আমাদের এই এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ যে আমরা

তাঁরই শক্তির বিকাশের পরিণাম হোলেও আমরা তাঁর শক্তির বিকাশ উপলব্ধিও করতে পারি, আর যতই উপলব্ধি করি, ততই সেই উপলব্ধির সীমাও খুঁজে পাইনে। সেই সঙ্গে আমরা এক আশ্চর্য্য শক্তির বলে বুঝতে পারি যে সেই মহাশক্তির জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ কোন্ দিকে। সেই বিকাশের গতি যেদিকে, সেইদিকে তারই অনুসরণে আমাদেরও জ্ঞান ও শক্তিকে চালিয়ে দিলেই আমরাও সেই মহাশক্তিকে বেশী করে উপলব্ধি করতে পারি, আর সেইরকম উপলব্ধি যত বেশী করতে পারব ততই বেশী আমাদের উন্নতি হয়েছে বলে বুঝতে পারব। আবার আমাদের নিজেকে যেমন উন্নতির পথে চালাতে গেলে আমাদের কোনমতে নিজেদের জ্ঞান ও শক্তিকে সেই মহাশক্তির উপলব্ধির অনুকূল করবার চেষ্টা করতে হবে, তেমনি আমাদের সমাজকেও উন্নতির পথে চালাতে ইচ্ছা করলে সমাজের আইনকানুন প্রভৃতিকেও সেই পথেরই অনুকূল করবার চেষ্টা করতে হবে। যে গ্রন্থ ছোটবড়-নির্ব্বিশেষে জগতের সকল ঘটনার ভিতর উন্নতির এই মূলমন্ত্র যে:পরিমাণে দেখাতে পারবে, সমস্ত ঘটনাকে মহাশক্তিকেন্দ্রক করে বোঝাতে পারবে, সেই গ্রন্থই সেই পরিমাণে ইতিহাস নামের যোগ্য হবে।

অদ্বৈতবাদের মতো কর্ম্মফলবাদ বা পূর্ব্বজন্মবাদেরও ভিতরকার কথা এই যে, সমস্ত বিশ্বচরাচরে আসলে ছোটবড় বলে কিছুই নেই। পাশ্চাত্যধারার ইতিহাসগুলো চোখের সামনে যেটুকু পায় সেইটুকু ধরেই কর্ম্মফল দেখাতে চায়। কিন্তু আমাদের পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সেটুকু দেখিয়েই থামতে চায় না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বোঝাতে চায় যে প্রকৃতিতে আসলে ছোটবড় নেই, কিন্তু এই যে কোন-কিছু তোমার চোখে ছোট আমার চোখে বড় বলে মনে হয়, এটা মূলে সেই মহাশক্তি ভগবানের জ্ঞান ও শক্তির বিকাশসূত্রে অতীতের যুগ যুগান্তরের শত সহস্র লক্ষ কোটী বৎসরের কর্ম্মের ফল। কোন্ কর্ম্মের কোন্ ফল হোল, সেটা বলতে গিয়ে আমাদের ঋষিরা অনেক ভুল করতে পারেন সত্য, কিন্তু ঐ যে মূল কথা যে, একই মহাশক্তির শক্তি-বিকাশসূত্রে প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্ম্মের পরিণামেই প্রকৃতির প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক বস্তুর জন্ম—এ বিষয়ে সকল ঋষিই যেন একমত বলে মনে হয়। আজকালকার দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, সকলই সপ্রমাণ করেছে যে, জগতের একটা ঘটনাও দৈবাৎ বা আকস্মিক হোতে পারে না। ঋষিদের কথা থেকে বেশ বোঝা যায় যে তাঁরা এই সত্য সেই সুদূর অতীতকালেও অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের রচিত গ্রন্থে আবশ্যক হোলে ইহলোক ছেড়ে পরলোক থেকে এই সত্যের প্রমাণ সংগ্রহ করতে বিরত হতেন না। এই সত্যের উপর দাঁড়িয়েই তাঁরা পূর্ব্বজন্মেও কর্ম্মের ফলাফল নির্ণয়ের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। এইজন্যই আমাদের দেশে অতীতের উপর এত শ্রদ্ধা। আধুনিক ইতিহাস, নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করলেন বলেই তাঁর জীবনী আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোন পুরাণকার ঋষি অত বড় একটা মহাপুরুষের জন্মগ্রহণকে একটা আকস্মিক ঘটনার মতো ধরে চলতে পারতেন না। তাঁরা এই ঘটনারও একটা কার্য্যকারণমূলক তথ্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতেন। আমাদের দেশে পুরাণকার প্রভৃতি পুরাকালের ঐতিহাসিকেরা কাজেই এই কর্ম্মফলবাদের উপর দাঁড়িয়ে জগতে ছোটবড়র বস্তুত অস্তিত্ব স্বীকার করবার অবসরই পেতেন না। তাঁদের মত যা সংক্ষেপে বুঝেছি তা এই যে—অবস্থাবিশেষে, স্থানবিশেষে বা কালবিশেষে পড়ে আমি আপাতত যাকে ছোট বলি তুমি তাই হয়েছ, কিন্তু তুমিও আবার যথাযুক্ত কাজ করলে আমার স্থান অধিকার করে আমি যাকে বড় বলি তাই হোতে পার। এই ছোটবড় না দেখা বিষয়ে অদ্বৈতভাব আর কর্ম্মফলবাদ উভয়েরই মূলতত্ত্ব একই বলে আমাদের দেশে অদ্বৈতবাদের সঙ্গে কর্ম্মফলবাদ ও পূর্ব্বজন্মবাদের এত মেশামেশি হয়ে গেছে।

আমাদের ঋষিমুনিরা অদ্বৈতবাদ আর কর্ম্মফলবাদের উপর দাঁড়িয়ে কাউকে ছোটবড় মনে করতে চাইতেন না। কিন্তু আমাদের দেশের আবহাওয়ার গুণে আমরা সেই দুটো মতেরই উপর দাঁড়িয়ে ঠিক তার উল্টোদিকে ব্যাখ্যা করে ঐ দুটো মতকে, লোককে ছোটবড় দেখার মূল বংশগত জাতিভেদের সপক্ষ প্রমাণ বলে দাঁড় করাই।

বর্ত্তমানে আমরা আমাদের ধর্ম্মের—কেবল আমাদের কেন, জগতের সমস্ত সত্যধর্ম্মের মূলভাব ছেড়ে দিয়ে কেবল ধর্ম্মের খোসা নিয়ে মারামারি করি বলে সেই মূলভাব ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি ধর্ম্মটাকে ছেড়ে দিয়ে বসেছি। তার বদলে অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি একরাশ ধর্ম্মের বহিরাবরণ মতবাদ সংগ্রহ করে তারই চাপে মারা যাবার জোগাড়ে আছি। এসব মতবাদ নিয়ে তর্ক করার বিশেষ কি ফল তা বুঝিনে। অদ্বৈতবাদ—তুমি হাহুতাশ করে বলবে—এ সমস্তই মিথ্যা মায়া মরীচিকা—এক অনির্ব্বচনীয় অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্মই সত্য; এ কথার ভাব তোমার উপলব্ধি হোক বা না-ই হৌক, তুমি এর সপক্ষে খুব জোরে তর্ক করতে প্রস্তুত—কেননা, তুমি অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের একজন। কিন্তু যেই তুমি ঐ কথা বল্লে, অমনি দ্বৈতবাদী তেড়ে এসে বল্লেন—এ সব কথনই মিথ্যামায়া হোতেই পারে না; আমরা যখন প্রত্যক্ষ দেখছি যে তুমি আমি সমস্তই পৃথক পৃথক, তখন কেবল অনির্দ্দেশ্য এক পরব্রহ্মই আছেন, আর আমরা কেউ কোথাও নেই, আমরা সমস্তই মায়া, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি নে। তখন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী এসে ঝগড়া থামাবার উদ্দেশ্যে বল্লেন—না হে তা নয়, অদ্বৈতবাদীরও কথা ঠিক নয়, আর দ্বৈতবাদীরও কথা ঠিক নয়; আসল কথা হচ্ছে এই যে আমরা সকলই পৃথক পৃথক বটে, কিন্তু আমরা সকলই সেই একই মহাশক্তির শক্তিবিকাশ। আমার মনে হয় যে দ্বৈতাদ্বৈত মূলে ঠিক হোলেও ব্যক্ত করবার প্রণালীর দোষে আমাদের জ্ঞানে তার বক্তব্যের উল্টো ভাবই জেগে ওঠে। দ্বৈত অর্থাৎ এই যে সব আমরা পৃথক পৃথক, এটা গোড়ায় দ্বৈতাদ্বৈত আমাদের বলে না। আমাদের বোধ হয় যে, দ্বৈতাদ্বৈতকে উল্টো করে অদ্বৈতদ্বৈত বল্লে যে ভাবটা প্রকাশ পায় সেইটেই ঠিক আর সেইটেই দ্বৈতাদ্বৈত আসলে বলতে চায়। গোড়ায় ভগবানকে ধরা চাই-ই। ভগবানকে মূলে রেখে তাঁরই শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ বলে এই বিশ্বচরাচরকে ধরতে হবে। তা ধরলে আমরা আসলে কাউকে ছোট আর কাউকে বড় মনে করতে পারব না।

অদ্বৈত হোল সেই মহাশক্তি ভগবানের অব্যক্ত আকার। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, সেই অব্যক্ত আকার নিয়ে আমরা দিনরাত থাকতে পারি নে—তাহলে তো আমরাই এক একটী অদ্বৈত হোয়ে সেই অদ্বৈতের সঙ্গে মিশে যেতুম—তাহলে তো জগতের অস্তিত্বই থাকত না। দ্বৈত হোল সেই অব্যক্তের ব্যক্ত আকার। এই দ্বৈত নিয়েই সংসারে আমাদের চলতেই হবে—মাথার উপরে অদ্বৈতকে স্থির লক্ষ্যরূপে রেখে দ্বৈত ধরে চলতে হবে। যা কিছু ঘটনা দেখি—যা কিছু হচ্ছে—সমুদয়ই সেই অব্যক্ত মহাশক্তির মহাধ্যানের ব্যক্ত আকার। কাজেই আমরা এই অদ্বৈতকে মূলে রেখে দ্বৈতক্ষেত্রে বিচরণ করতে বাধ্য এবং সে ভাবে বিচরণ করলে আমরা কাউকে ছোট আর কাউকে বড় বলতে পারব না। শতদল যখন ফুটে ওঠে, তখন তার কোনটাকে তুচ্ছ আর কোনটাকে আদরের বলতে পারি? এক মহান সৌন্দর্য্য সমস্ত শতদলটাকে নিয়ে ফুটে বেরোয়। তার নীচের সবুজ পাতাটী তুচ্ছ বলে ছিঁড়ে ফেল, উপরের গোলাপীপাতা, পাঁপড়ী সমস্ত খসে পড়বার উপক্রম করবে। প্রকৃতিতেও আমরা যাকে ছোট বলি আর আমরা যাকে বড় বলি, সমস্তটা নিয়েই আজ প্রকৃতি সৌন্দর্য্যে চল-চল।

যাক্; এখন শেষ কথা এই যে, আমরা যদি সত্যিসত্যি ভগবানকে প্রাণের মধ্যে আনতে চাই, যদি তাঁর মহাশক্তির মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিতে চাই, তাহলে আমরা মস্ত বড়লোক, আমাদের শক্তি অতুলনীয়, এই ভেবে জাঁকে ফুলে উঠলে চলবে না। যে ধুলো সমস্ত প্রাণীদের দেখতে পাবার অপরিহার্য্য সহায়, নিজেদের সেই ধুলোর সঙ্গে এক করে নিতে হবে। কাউকে ছোট মনে করতে পারব না। তাই সাধকপ্রবর বৈষ্ণবচূড়ামণি বলেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

কামরূপের পুরাতত্ত্ব।

(শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

ভাস্করবর্ম্মা।

৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মৌখরী বংশীয় ঈশান বর্ম্মা, সর্ব্ববর্ম্মা, সুস্থিত-বর্ম্মা ও অবন্তীবর্ম্মা রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তদনন্তর কনৌজের বর্দ্ধনবংশীয় প্রভাকর বর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) ৫৮৫-৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্রাটের পদলাভ করেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জকে (Kanauj) উত্তর ভারতের রাজধানী করেন। ভগদত্তবংশীয় কাম-রূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মা (নামান্তর মৃগাঙ্কে)র পুত্র ভাস্করবর্ম্মা মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের একজন করদ (tributery) রাজা ছিলেন। প্রয়াগ অর্থাৎ আধুনিক আলাহাবাদে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে একটী বালুকাময় সমতল ভূমির উপর প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ এক উৎসবে সমবেত হইতেন। মহারাজ হর্ষ প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ঠিক এই সময়ে উক্তস্থানে একটী বিরাট উৎসবের আয়োজন করিতেন। উহা মহোৎ-সব নামে পরিজ্ঞাত। এই উৎসবকালে তিনি নানারূপ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং দীন দরিদ্রদিগকে অজস্র পরিমাণ দান করিতেন। খ্রীষ্টীয় ৬৪৪ অব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উৎসবের (sixth quenquennial assembly) অধি-বেশন হয়। ইতঃপূর্ব্বে এই স্বনামধন্য ধর্ম্মপরি-ব্রাজক হুয়েন-সাঙ (Hiuen Sang) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি সর্ব্বশেষ (extreme) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থ বলভীরাজ "২য় দূর্ভাসেন" * ও সর্ব্ব পূর্ব্বদেশস্থ কামরূপরাজ (ভাস্করবর্ম্মা) প্রভৃতি লইয়া পঁচিশ জন করদ রাজাকে এই মহোৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছিলেন।

হুয়েন সাঙ্গের পরিচয়।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সুবিখ্যাত পরিব্রাজকের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা যাউক। যাঁহাকে আমরা সাধ-রণতঃ "হুয়েন সাঙ্গ", "হুয়েন্থ সাঙ" হিউএনথ সাঙ্গ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকি, তাঁহার প্রকৃত নাম "য়ুয়ন্—চুয়ঙ" (Yuan Chwang)। হুয়েন সাঙ্গ খ্রীষ্টীয় ৬০৩ অব্দে চীন দেশের "চীন-লিউ" নামক স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই স্থান এক প্রকার সহরতলী (suberb) বলিলেই হয়। স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে তাঁহার সন্দেহ অধিকতর বদ্ধমূল হওয়ায় মূল গ্রন্থ পড়িবার জন্য খ্রীষ্টীয় ৬২৯ অব্দে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণ-পূর্ব্বক ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিবার জন্য তিনি যে অটল সাহস, বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রাম ও অভাবনীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মানবমাত্রেরই যুগপৎ নিরতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। এই স্বনামধন্য ধর্ম্মবীর কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিবার পর, ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে আপনার জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি এ দেশ হইতে বুদ্ধদেবের স্বর্ণ, রৌপ্য ও চন্দনকাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি এবং ৬৪৭ খানি গ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন। ভারত হইতে সংগৃহীত সংস্কৃত পুথি সমূহের অনু-বাদে তাঁহার বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৬৬৪ অব্দে এই মহাপুরুষ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নালন্দা হইতে হুয়েন সাঙ্গের কামরূপে নিমন্ত্রণ।

কি শুভক্ষণে ধর্ম্মবীর হুয়েন সাঙ্গ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার লিখিত বিবরণ পাঠে কামরূপেশ্বর ভাস্করবর্ম্মার বিদ্যাগৌরব, ধর্ম্মা-নুরাগ ও তৎকালীন অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। বস্তুতঃ রাজা ভাস্করবর্ম্মা মহাপণ্ডিত চাণক্যের "বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে" এই বাক্যের প্রতিপোষ-কতা করিতেন। হুয়েন সাঙ যখন মগধের অন্তর্গত বিশ্ববিশ্রুত নালন্দার † সন্ন্যাসীমঠে বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিতেছিলেন তৎকালে

* বলভীরাজ ২য় দুর্ভাসেন বা বালাদিত্য ;মহারাজা খড়গরাহার পুত্র। মহারাজ ভার্কক এই বংশের আদিপুরুষ।

† নালন্দার অপর একটী অর্থ আছে ; যথা—ন + অলম্ + দা = নালন্দা। ইহার অর্থ—অধিক কিছুই প্রদান করিবার নাই। অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ যাহা আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক দান করিয়াছেন তাহাই দান করা যাইতে পারে। তদতিরিক্ত প্রাপ্ত হইতে বা দান করিতে হইলে বিশেষ সাধনা আবশ্যক।

কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা সেখানে কতিপয় দূত প্রেরণ করতঃ তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে (গৌহাটীতে) আমন্ত্রণ করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। মহারাজ শিলাদিত্য ৬০৬ খৃঃ অব্দ হইতে ৬৪৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতাবস্থা ছিল। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল যে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ই শিক্ষণীয় ছিল তাহা নহে। ভারতের সমগ্র বিদ্যার অধ্যয়ন এবং পর্য্যালোচনা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইত। ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য বহুস্থান হইতে বিদ্যার্থীগণ আগমন করিতেন। এখানে সকল প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র পঠিত হইত; কেহ ঈর্ষাপরবশ হইয়া অপরের ক্ষতি করিত না। এ-কারণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈদৃশী উন্নতি হইয়াছিল। হিউএন্ সাঙ্গ পাঁচবৎসর কাল নালন্দার মঠে থাকিয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনাপূর্ব্বক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নালন্দায় কামরূপ-রাজের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া প্রথমে সেখানে যাইতে অস্বীকৃত হন। এখানে তাঁহার শাস্ত্রাধ্যাপক "শীল-ভদ্র" কামরূপ গমনে তাঁহার অনিচ্ছা অবগত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "রাজা ভাস্করবর্ম্মা ধর্ম্ম-বিরোধী (heretic) গণের উপদেশে মনোনযোগী। যাহাতে এই সত্যধর্ম্ম প্রচার হয়, তাহার উপায় বিধান করা তোমার কর্ত্তব্য। কামরূপ রাজ্যে গমনার্থ এক্ষণে তিনি দূতগণ দ্বারা সাদরে নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তদীয় নিমন্ত্রণ-পত্র উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট এই সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার এরূপ সুযোগ পরিহার করা নিতান্ত অবিধেয়। শাস্ত্রাধ্যাপকের উপদেশে হুয়েন সাঙ নালন্দা হইতে কামরূপ রাজ্যে গমন করেন।

কামরূপের বিবরণ।

সুবিখ্যাত হুয়েন সাঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার চীনদেশে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬৪২ বা ৬৪৩ খৃঃ অব্দে রাজা ভাস্কর-বর্ম্মা তাঁহাকে কামরূপে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি কামরূপকে "কিয়া—মো—লু—পো" বলিয়া তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত পুস্তকের নাম "সি—ইউ—কি" (Si-yu-ki) বা পশ্চিম দেশের বৃত্তান্ত। তাঁহার কামরূপের বর্ণনায় জানা যায় যে তিনি কলোটু বা করতোয়া নদী পার হইয়া * তৎপরে ব্রহ্মপুত্রের তীরদেশ দিয়া কামরূপের তৎকালীন রাজধানী "গৌহাটী"তে উপস্থিত হন। তৎকালে ভাস্করবর্ম্মা নামক জনৈক রাজা সেখানে রাজত্ব করিতেন। তিনি "কুমার" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। এই রাজা নরনারায়ণের বংশধর। হাজার পুরুষ যাবৎ ইহাঁরা এই রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন, (বরাহের পুত্র নরক, নরকের পুত্র ভগদত্ত)। পরিব্রাজক তখনও সেখানে একটীও বৌদ্ধ বিহার দেখিতে পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "কামরূপের বিস্তৃতি ১০০০লী (প্রায় ১৭০০ মাইল) এবং ইহার প্রধান রাজধানী গৌহাটী প্রায় ৩০লী (৫ মাইল)। কামরূপের অধিবাসীগণ দেবপূজা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহাদের কোনরূপ আস্থা ছিল না। রাজা ভাস্করবর্ম্মা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহারই অনুকরণে চলিতেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাঁহার কর্ম্মে প্রবেশ লাভের আশায় সুদূর প্রদেশ হইতে তাঁহার রাজ্যে আগমন করিতেন। এই রাজা কান্যকুব্জের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ও নেপালরাজ অংশুবর্ম্মার সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার মতে কামরূপের অধিবাসীগণ অতিশয় কাঁঠাল ও নারিকেল ভক্ত ছিলেন।

ভাস্করবর্ম্মার ধর্ম্মাবলম্বন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। শ্রীযুক্ত স্মিথ (V. A. Smith) সাহেব তাঁহার Early History of India নামক মূল্যবান গ্রন্থে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ—He belonged to a very ancient dynasty which claimed to have existed for thousand generations and almost certainly he must have been a Hinduised Kuch aborigin. রাজা ভাস্করবর্ম্মা যে কোচবংশ সম্ভূত, ইহা তাঁহার নিজস্ব মত। কুত্রাপি ইহার কোন প্রমণ পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত ব্যাডেনের (B. H. Baden) মতে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ

* Watter's Yuan Chwang, Vol II, P. 187

শ্রীযুক্ত Alex. Cunningham তাঁহার Ancient Geography of India নামক পুস্তকে (P.531) লিখিয়াছেন :—He (Bhaskara Varma)was a staunch Buddhist and accompanied Harsha vardana in is religious procession from Pataliputtra, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় তিনি আবার ১৮৪৮ খৃঃঅব্দে Jour. A.S. of Bengal নামক পত্রিকায়(পৃঃ ৪০) *Kia—mew—Pho* নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "The people of the country were unconverted and had built no monasteries" এইরূপ ঐতিহাসিক গবেষণা কি দূষণীয় নহে?

ভগদত্তবংশীয় কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার পরিচয় বাণভট্টের হর্ষচরিত কাব্যে ও চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্গের গ্রন্থে এতাবৎকাল কেবলমাত্র অবগত হওয়া যাইত। সৌভাগ্যক্রমে বিগত ১৯১২ সালে ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত "নিধানপুর" গ্রামের জনৈক মুসলমান তাহার মহিষগুলি রাখিবার জন্য একটী চালা (shade) নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে মৃৎপিণ্ড চূর্ণ করিবার কালে কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। এই তাম্রশাসন দৃষ্টে ঐ ব্যক্তির ধারণা জন্মে উহাতে কোন স্থানে দৈব ধনের কথা উল্লেখ আছে। অতঃপর ঐ মুসলমানটী স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত পবিত্রনাথ দাস মহাশয়কে উহা প্রদান করে। তৎকালে জমিদার মহাশয় উহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটনার্থ গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলে তিনি প্রায় একমাস পরে জনসমাজে উহার বিবরণ প্রকাশ করেন। স্বয়ং ভাস্করবর্ম্মা এই তাম্রশাসনের প্রচারক। শ্রীহট্টের পঞ্চ খণ্ডের অন্তর্গত নিধানপুর গ্রামে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলেও শ্রীহট্টদেশ তৎকালে কামরূপের অন্তর্গত ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বড়ই সুকঠিন। কারণ কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন বারাণসীর অদূরস্থ "কমৌলী" গ্রামে আবিষ্কৃত হইলেও বারাণসী কস্মিনকালে কামরূপের অন্তর্গত অথবা কোন কামরূপাধিপতির অধিকৃত হয় নাই। (ক্রমশঃ)

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

স্ত্রীস্বাধীনতা। ব্রাহ্মসমাজ প্রথম অবধি বঙ্গদেশে যে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা সরল ও সবল স্ত্রীস্বাধীনতা। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যে স্বাধীনতা দেখা যায়, পুরুষে পুরুষে যে স্বাধীনতা দেখা যায়, আমরা বরাবরই চাহিয়া আসিয়াছি যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে সেই রকম একটা মুক্ত প্রাণের খোলা স্বাধীনতা জাগিয়া উঠুক। পুরুষ ও স্ত্রীলোক হইলেই যে "স্ত্রীসংগ্রহ" বা ইয়ারকির ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। পরস্পরের মধ্যে সদ্‌ভাবের আদান-প্রদানে চলিতে থাকিলেই ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য—মানবের পূর্ণতাসাধন—সফল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, বঙ্গদেশের আবহাওয়ার গুণেই হউক বা বিলাতবাসীদের অন্যায় অনুকরণের—পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ যাহার নাম দিয়াছিলেন হনুকরণ—কারণেই হউক, ব্রাহ্মসমাজের সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের ভিতর স্ত্রীস্বাধীনতা কতকটা বক্রপথগামী হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—"স্ত্রীসংগ্রহ"ই অনেকটা স্ত্রীপুরুষের সম্মিলনের মুখ্য লক্ষ্য হইয়া উঠিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই ভাব দূর করিবার একটা প্রধান উপায় হইতেছে ভারতবাসীদের মধ্যে বিবাহাদি উপায়ে অন্তঃপ্রাদেশিক সম্মিলন। বাঙ্গালীদের সঙ্গে যদি বোম্বাইবাসীদের বিবাহসম্বন্ধ হইতে থাকে, তবেই বাঙ্গালীরা বোম্বাইবাসীদের সরল ও সবল স্ত্রীস্বাধীনতা প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিয়া আপনাদের দেশেও স্বাভাবিকভাবে প্রবর্ত্তিত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। বিবাহ দূরে থাক্, সাধারণ মেলামেশা হইতে থাকিলেও স্ত্রীস্বাধীনতাসম্বন্ধে নানা সঙ্কীর্ণভাব কাটিয়া যাইবে। সম্প্রতি আমাদের কোন বন্ধু বোম্বাই অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়া তথাকার ঐ সরল ও সবল স্ত্রীস্বাধীনতা দেখিয়া যে মুগ্ধ-পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"এ দেশের female libertyর কথা আগে শোনা ছিল কিন্তু চোখে না দেখলে ধারণা হয় না। পুণায় যে বন্ধুটির বাড়ীতে ছিলাম, তিনিও একজন ইঞ্জিনিয়ার। বাড়ীর বাহিরভিতর নাই তাঁর স্ত্রী সকল স্থানেই ঘুরচেন। আমার সঙ্গে অতি সরল ও innocentভাবে প্রথমেই আলাপ করেন। মেয়ে পুরুষে যে আমাদের দেশে একটা ভেদ-বিচার আছে, মেয়েদের privacyর জন্য আমরা ও মেয়েরা যেমন আমাদের দেশে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, এদেশে সে জিনিষ একেবারেই নাই। মেয়েও যেমন পুরুষও তেমন। এই ভাবটি আমার বড় সুন্দর লেগেছে।

তোমার আমার এতকালের বন্ধুতা—কৈ তোমার বাড়ীতে আমি গিয়ে, কি তুমি আমাদের বাড়ীতে এসে সেরূপ freedom কোথাও পাও বা পাই? আমরা মেয়েদের ভয়ে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, মেয়েরা আমাদের লজ্জায় সর্ব্বদাই আকুল। এ ভাব যদি থাকত তাহলে তোমার বাড়ীতে থাকা আমার আদবে মুস্কিল হতো না। কোলাপুরে যে বন্ধুর বাড়ীতে ছিলাম, তারা মারহাটী। বেশী গোঁড়া গোছের। সেখানেও ঐ ভাব। বন্ধুর বাড়ীতে নাইতে গেলুম, বন্ধুর স্ত্রী এসে গরম জল দিয়ে গেল। বন্ধু একজন উকিল। ব্রাহ্মসমাজ এই ভাবটা নেবার চেষ্টা করেছিল বটে নিতে পারে নাই। এক ঘরে মেয়ে পুরুষে সরলভাবে আলোচনা আমাদের দেশে ভয়ানক কথা। বোধহয় আমাদের মন বড় কলুষিত।"

পাঠ্যপুস্তক কমিটি। গবর্ণমেণ্ট পাঠ্যপুস্তক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কমিটি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হয় যে, তাঁহারা তাঁহাদেরই মনের মতো ছচারিটা কথা শুনিতে পাইবেন—আসল সত্য কথা কোন সভ্য সাহস করিয়া বলিতে অগ্রসর হইবেন কি না সন্দেহ। আমাদের মতে স্বাধীনভাবে জনসাধারণের মতামত পাইবার একটা ব্যবস্থা করা উচিত। সভ্যদিগের নিকটে স্বভাবতই অনেক গ্রন্থকার স্বরচিত গ্রন্থ পাঠাইবেন। কিন্তু সভ্যদিগের কেবল সেইগুলি দেখিলে চলিবে না! বড় বড় গ্রন্থপ্রকাশকদিগের নিকট হইতে উপযাচক হইয়া তাঁহাদের সন্ধান লওয়া উচিত যে কি কি নূতন ভাল গ্রন্থ প্রকাশিত হইল এবং সেই সকল গ্রন্থেরও মধ্য হইতে উপযুক্ত গ্রন্থ নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠ্যপুস্তকরূপে সন্নিবিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রত্যেক সভ্যের অন্তরে দেশের মঙ্গলকে মূলমন্ত্ররূপে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। সেই মূল মন্ত্রের উপরে আমাদের প্রত্যেকের কার্য্য করা উচিত।

জমীদার ও প্রজা। আইনকানুনের বাঁধনছাঁদনে বর্ত্তমানে জমীদার ও প্রজার সম্বন্ধ আর পূর্ব্বেকার পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নাই—একটা ব্যবসাদারী সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমরা ইহার জন্য কেবল আইনকানুনকে দায়ী করিতে পারি না। জমীদার ও প্রজা উভয় পক্ষেরই দোষে বর্ত্তমান প্রচলিত আইনকানুন আমাদের অদৃষ্টে জুটিয়াছে। যদি জমীদারেরা প্রজাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন, এবং প্রজারা জমীদারকে পিতার চক্ষে দেখিতেন, তাহা হইলে আজ দেশের অন্য শ্রী দেখিতাম। যাই হোক, আইনকানুনের কঠোর বন্ধন সত্ত্বেও এখনো জমীদার ও প্রজার পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তারের যথেষ্ট অবসর আছে। সে অবসর আর হেলায় হারাইবার সময় নাই। পুণ্যাহ উপলক্ষে জমীদারেরা যদি প্রজাদের দুঃখ স্বকর্ণে শোনেন ও দেখেন, তাহা হইলে যে সুফল উৎপন্ন হইবে তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা জানি সরিকানি প্রভৃতি নানা কারণে অনেক জমীদার ইচ্ছা থাকিলেও প্রজাদের মঙ্গলসাধনে সমর্থ হন না। কিন্তু এমনো অনেক জমীদার আছেন, যাঁহারা নিজের মঙ্গলসাধনের অবসরের সদ্ব্যবহার করেন না। জমীদার ও প্রজাসকলের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে, তাঁহারা সকলেই পরস্পরের প্রতি দ্বেষহিংসা পরিত্যাগ করিয়া, আদালতে গিয়া পরস্পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দেশের মঙ্গলকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন।

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা। আমরা গত আষাঢ়ের আল্-এস্লাম নামক মুসলমান সমাজের মুখপত্রে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক শেখ আবদুল গফুর জালালী প্রকৃত মুসলমানোচিত অসাম্প্রদায়িক ভাবের উপর দাঁড়াইয়া অতি সত্য কথাই বলিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষাই বাঙ্গালী মুসলমানদিগের প্রকৃত মাতৃভাষা। এ বিষয়ে যে তর্ক ও সন্দেহ উঠে ইহাই আশ্চর্য্য। আমরা তাঁহার উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আমরা বাঙ্গালী নহি, আরব পারস্য ইত্যাদি দেশ হইতে আমরা এদেশে আসিয়াছি; সুতরাং বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা নহে। আমাদের মাতৃভাষা আরবী পারসী না হইলেও নিশ্চয়ই উর্দ্দু। এই শ্রেণীর লোক উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করিবার জন্য বিরাট চীৎকার করিয়া থাকে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার জলবায়ুতে দেহ পুষ্ট করিয়া যাঁহারা মাতৃঅঙ্ক হইতেই বাঙ্গালা কথা শুনিয়া আসিয়াছেন এবং মাতৃস্তন পানের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা কথা শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারাই আবার বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করিবার কল্পনা জল্পনা আঁটিতেছেন, তাঁহাদের এই উদ্ভট কল্পনা আলাউদ্দীনের বিচিত্র প্রদীপ অপেক্ষাও বিস্ময়াবহ বটে। বাঙ্গালার বাঁশবন ও আম্রকুঞ্জবেষ্টিত, শান্তিনিকেতনে বাস করিয়াও যাঁহারা এখনও বোখারা, ছমরকন্দ, সিরাজ, তেহ্‌রান, কায়রো ও বাগ্‌দাদের খোরমা ও আখরোট তরু এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জের শীতল ছায়ায় বিচরণশীলা পারসী ও উর্দ্দু গজলভাষিণী হুরীগণের বিচিত্র নর্ত্তনের স্বপ্ন দেখেন, তাঁহারা খুব বুদ্ধিমান (?) এবং বিচিত্র কল্পনাপ্রিয় হইতে পারেন বটে, কিন্তু জানি না, তাঁহাদের সেই বুদ্ধি ও কল্পনা বাস্তব জগতের কার্য্যে কপর্দ্দক মূল্যেও গৃহীত হইবার যোগ্য কিনা"!

দেবোত্তর ও সেবায়ত। আমরা অনেকস্থলেই দেখিতে পাই যে বড় বড় জমীদারেরা তাঁহাদের বিষয়-সকল দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া যান—উদ্দেশ্য এই যে, দেবতার নামে যৎকিঞ্চিৎ ভোগাদি প্রদান করিয়া সম্পত্তির আয়ের অধিকাংশ তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা ভোগ করেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অন্যায়। দেবতার নামে যাহা উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাহার আয় হইতে দেবতার নামেই নিজের উদরপোষণ না করিয়া তাহা নানাবিধ সৎকার্য্যে ব্যয় করা উচিত। ঐরূপ আয় হইতে আপনার উদরপোষণের ব্যবস্থা হয় বলিয়াই দেবোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরা প্রায়ই আপনাদিগকে সৎপথে ঠিক রাখিতে পারেন না; তাঁহারা যত পারেন টাকা ধার করেন, জানেন যে দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রয় করা বড় সহজ নয়। দেবোত্তর সম্পত্তির দুর্দ্দশার একটী দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আমাদের চক্ষের সমক্ষে পড়িয়াছে। কোন সুপ্রসিদ্ধ জমীদারবংশের পূর্ব্বপুরুষ দুইটী বিগ্রহের সেবা প্রভৃতির জন্য একটী সম্পত্তিকে দেবোত্তর করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী ও সেবায়ৎ দেবোত্তর সম্পত্তির বিরুদ্ধে একটী ডিক্রী জারী করিয়া তাহার এক অংশ নিজের ছেলের বেনামীতে কিনিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার অন্যতর শরিক হাইকোর্টে উক্ত সেবায়তের বিরুদ্ধে একটা মকদ্দমা রুজু করাইয়া দিয়া তাঁহাকে উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়তের পদ হইতে সরাইয়া দিয়াছেন এবং সেই অংশ ক্রয় নাকচ করাইয়া দিয়াছেন। আমরা এই ন্যায় বিচারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। দেবোত্তরের সেবায়ৎগণ মনে করেন যে তাঁহারাই সেই সম্পত্তির কর্ত্তা—সম্পত্তি লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। আমরা জানি যে অনেকস্থলে সেবায়ৎগণ এই প্রকার ভাব লইয়া দেবোত্তর সম্পত্তিকে নানা প্রকারে ছারখার করিয়া নিজেদেরও অধোগতির পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। আশা করি, হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের পর সেবায়ৎগণ দেবোত্তর সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করিতে নিরস্ত থাকিবেন।

অনশন। দেশের লোক অনশনে মরিতেছে কি না, এই একটা মহা প্রশ্ন উঠিয়াছে। আমাদের দেশেই কেবল ইহা সম্ভব যে, যাহা চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, সে বিষয়েও জোর করিয়া আমাদিগের অবিশ্বাস করিতে হইবে—যেহেতু গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে তোমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছ, তাহা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতেছ—উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইহারও যে একটা দিক নাই তাহা নহে। হয়তো একটা লোক আজই খাইবার কিছু পাইল না, আর সদ্যসদ্যই মরিয়া গেল, একথা ঠিক নহে। কিন্তু একথা কেহই কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, লোকে না খাইতে পাইয়া জীর্ণ হইতে হইতে হঠাৎ একদিন একটুকু জর হইল আর মরিয়া গেল। নাম হইল বটে যে জরে মরিয়াছে, কিন্তু আসল কথাটা কি এই নহে যে, সেই লোকটী অনাহারেই মরিল? গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা উচ্চতন কর্ম্মচারীদিগের মন বুঝিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধানের জন্য অবশ্য বলিতে পারেন যে অমুক লোক জরে মরিয়াছে—বলিলেও সত্যের অপলাপ হইবে না। কিন্তু সেই লোকের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবেরা কি শতকণ্ঠে বলিবে না যে, সে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে? গবর্ণমেণ্ট কথামালার একচক্ষু হরিণের মত চক্ষু বুজিয়া থাকিলে চলিবে না; মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় কি সর্ব্বনাশই না করিতে পারে—তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। তাই আমরা শতবার বলিব যে গবর্ণমেণ্ট আহার্য্যের অভাব সম্বন্ধে কমিউনিক প্রচার করা ছাড়িয়া দিন—কারণ সত্য কথা বলিতে কি, আমরা যতদূর জানি, মুখে না বলিলেও বর্ত্তমানে অধিকাংশ ভারতবাসীই এ সমস্ত কমিউনিক এক বিন্দুও বিশ্বাস করে না। গবর্ণমেণ্টের পারিব না বলিলে চলিবে না—গবর্ণমেণ্ট নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে চাহিলে, লোকে যাহাতে দুবেলা দুমুটো ভাত খাইতে পায় এবং লজ্জানিবারণের বস্ত্র পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

সম্প্রতি বড়লাটের সভায় বলা হইয়াছে যে যেহেতু এবারে দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে সংরক্ষণ কার্য্য relief works খোলা হইলেও পাঁচ ছয় লক্ষের অধিক লোক সেই কার্য্যের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হয় নাই এবং যেহেতু গত দুর্ভিক্ষের সময়ে ১০ লক্ষ লোকেরও অধিক লোক ঐ প্রকার সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিল, অতএব—অতএব আমাদিগের বুঝিতে হইবে যে এই দরিদ্রতম ভারতভূমি, এই কবির সোনার ভারতভূমি আজ সত্য সত্যই সোনারূপায় একেবারে টলটল করিতেছে। যদিও লাটসভা হইতে এই কথা বাহির হইয়াছে, তথাপি এই কথার উপর আমাদের কিছুমাত্র আস্থা বা শ্রদ্ধা নাই। ভারতবাসীদের অনেকের ধারণা এই যে, পূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের সময়ে ভারতবাসীরা স্বয়ং দলবদ্ধ ভাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে সাহায্য করিতে শিক্ষা করে নাই; বর্ত্তমান সময়ে রামকৃষ্ণমিশন, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির পক্ষ হইতে লোকেরা দলে দলে organised ভাবে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিতে শিখিয়াছে, তাই অনেক গৃহস্থের বাহিরে গিয়া relief works এর সাহায্য লইবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু relief works এ কম লোক গিয়াছে বলিয়াই যে ভারতবাসী একেবারে ধনী হইয়া পড়িয়াছে, এ কথা শুনিলে আমাদের কেবল হাসিই পায়; আমরা জানি যে এরকম কথা statistics রূপ আশ্চর্য্য যন্ত্রধারী গভর্ণমেণ্টের মুখে শোভা পায়।

ভারতের দারিদ্র্য ও আমাদের কর্ত্তব্য।

ভারতবাসী দরিদ্র, একথা আমাদের বলিবার জো নাই। কারণ, কতকগুলি বিষকুম্ভ পয়োমুখ ইঙ্গভারত খবরের কাগজ মহা চীৎকার করিয়া বলিতেছে যে ভারতবাসী দরিদ্র নহে! এই সকল কাগজওয়ালারা গবর্ণমেণ্টের কমিউনিকগুলিকে তাঁহাদের উক্তির ভিত্তি করেন, আর গবর্ণমেণ্টের কমিউনিকের ভিত্তি হইল তাঁহাদের আশ্চর্য্য statistics বস্তু। আমরা গবর্ণমেণ্টের অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকট শুনিয়াছি যে এই সমস্ত statistics যথারীতি সংগৃহীত হয় না। সর্ব্বনিম্নস্তরে এগুলি সংগ্রহ করিবার ভার আসলে পড়ে অলস ও অশিক্ষিত চৌকীদার শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের উপর। তাহারা উচ্চতর কর্ম্মচারীগণ কিরূপ সংবাদে সন্তুষ্ট হইবেন তাহার বেশ সন্ধান রাখে এবং তাঁহাদের সন্তোষবিধানের জন্য তাঁহাদের মনের মতো সংবাদ দেয়। প্রজাদের অবস্থা প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের সংবাদসংগ্রহের ভার দেওয়া উচিত শিক্ষিত কর্ম্মচারীদের উপর এবং তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে বলিয়া এবং বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে তাঁহাদের নিকটে নিরপেক্ষ সংবাদ প্রত্যাশা করা হয়, মন-যোগানো কথা কেহ চাহে না। যাই হোক, দেশের অবস্থা আমরা যতদূর জানি, তাহাতে কি গবর্ণমেণ্টের কমিউনিক, কি খবরের কাগজের কথা, কিছুই বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা শতমুখে বলিব, ভারতবাসী দরিদ্র—অনেকের পেটে দুবেলা দুমুটো অন্ন জোটে না। আর যদি আমাদের উপর নিষেধবিধি আসে যে আমরা এমন কথা বলিতে পারি না, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া নীরবে প্রাণের ভিতর নিশ্চয়ই বলিব এবং গোপনে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করিব, কারণ ইহা স্বাভাবিক। সুখের বিষয় যে ইংরাজদিগের ভিতরেও এখন অনেকে বুঝিতেছেন যে ভারতবাসী সত্যই দরিদ্র এবং সেই সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন। এই রকম সত্য কথা বলিয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট "দেশের কথা'' গ্রন্থ proscribed করিলেন, কারণ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ হইলেও গবর্ণমেণ্টের ভয় হইল যে সেই সমস্ত কথা পড়িয়া দেশের লোক বিদ্রোহী বা বিপ্লববাদী হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাঁহাদের স্বজাতি এবং তাঁহাদেরই কর্ম্মচারী যে এখন দেশের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে ভারতবাসী সত্যই বড় দরিদ্র—এখন বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট সে কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, আর আমরা তো স্বীকার করিবই। গত ২৩শে শ্রাবণের "হিন্দুস্থান" লক্ষ্ণৌয়ের মেথডিষ্ট খৃষ্টানদিগের মুখপত্র Indian Witness হইতে এবং ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি সার ওমূর ক্রে সাহেবের Indian Studies হইতে যে দুইটা অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতেই ভারতের দারিদ্র্যের গভীরতা বিষয়ে আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না। Indian Witness বলেন—"ভারতবর্ষের লোকের দৈনিক আয় গড়ে চারি পয়সা হইতে ছয় পয়সা। এই চারি পয়সা বা ছয় পয়সায় কি পরিমাণ আহার্য্য সামগ্রী এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায় না কি? সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধিসম্পন্ন আমেরিকায় আহারের জন্য গম ও কাপড়চোপড়ের জন্য তুলা খরিদ করা যেমন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, ভারতেও ঠিক তাই। ভারতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এ বৎসর অসংখ্য শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। এই ভারতবর্ষ—এখানে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা নাই, এখানে কোটি কোটি লোকের পায়ে জুতা নাই, নগ্নতা নিবারণের উপযোগী বস্ত্র নাই, অতি নিকৃষ্ট খাদ্যও এখানকার অধিবাসীদের এক বেলা বৈ দুই বেলা জুটে না; এদেশের দারিদ্র্যের তুলনা নাই।"

সার ওমূর ক্রে বলেন—"ভারতে সামান্য দুটী পেটের ভাতের জন্য পরিবারের সমস্ত লোককে দিনরাত পরিশ্রম করিতে হয়। এ বৎসরের ফসল পাকিতে না পাকিতে গত বৎসরের ফসল শেষ হইয়া যায়। তাহার পর লোকদিগকে ক্ষুধার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। লক্ষ লক্ষ লোক সুজন্মার সময়েও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না।"

এখন বোধ হয় আর কেহই বলিতে সাহস করিবেন না যে ভারতবাসী দরিদ্র নহে, ভারতবর্ষ সোনা-রূপার সাগরে ভাসিয়া চলিয়াছে। এইবার আমাদের কর্ত্তব্য কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, সুতরাং বলা বাহুল্য যে ভারতবাসীর পক্ষে কৃষিই প্রধানত অবলম্বনীয় এবং কৃষির উন্নতিসাধনই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে বুঝিতে হইবে যে, আর সেকালের মতো জগতের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে না; এখন সভ্য জগতের প্রায় সকল দেশই শ্রমশিল্পবিষয়ে ভারতবর্ষকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষ এখন জগতের মধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া নাই, সমস্ত জগতের সঙ্গে নানাবিধ বন্ধনে আবদ্ধ। কাজেই ভারতবর্ষের কেবল কৃষি লইয়া থাকিলে চলিবে না, শ্রমশিল্প বা Industry বিষয়েও ভারতের অগ্রসর হইতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রমশিল্পবিষয়ে অগ্রসর হইবার বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান উপায় উহার বিভিন্ন বিভাগে যৌথ কারবার খোলা। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পাল, সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহারথীদিগের

উদ্যোগে বঙ্গদেশও যে শ্রমশিল্পবিষয়ে অগ্রণী হইতে চলিয়াছে, ইহা দেশের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলের চিহ্ন। প্রফুল্ল চন্দ্রের ন্যায় আমরাও দেশবাসীকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা ওকালতী চাকরী প্রভৃতির আশা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া কৃষি এবং ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হউন এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকেই এ বিষয়ে উৎসাহিত করুন। দেশের শ্রী ফিরিবে। স্বীকার করি এ বিষয়ে উন্নতি করিতে গেলেই অনেক আঘাত সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেই যে উন্নতি।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

হিন্দুস্থানের নক্সা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

একদিন আমাদের পাচকের রান্না ভাত কাঁচা ছিল বলিয়া তাহার অযত্নের দরুন আমি তাকে খুব বকিয়াছিলাম ও রাগ করিয়াছিলাম, ইহা শুনিয়া আঁচাইবার সময় 'উনি' আমার রাগ তাড়াইবার জন্য ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"আঃ! ভাত কিংবা পুরী একটু কাঁচা রইল বোলে পাচককে এত ধম্‌কাচ্চ কেন? শুধু কাঁচা ধান খেয়ে যাদের হজম হয় সেই আমাদের ভাত কিংবা পুরী একটু কাঁচা থাক্‌লে কি কিছু আট্‌কায়! আমরা লড়াকে মানুষ। হাতে কাঁচা নেবু ঘসে শুধ্ তাই খেয়ে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিয়েছি। সেই আমাদের ভাত পুরী একটু কাঁচা থাকলই বা, তাতে কিসের পরোয়া? তুমি যখন পাচককে বকছিলে তখনই আমি বলতুম; কিন্তু তুমি গোড়াতেই রেগে উঠ্‌লে। গৃহকর্ত্রীর হিসেবে তুমি তাকে বকছিলে, তখন আমি তার মধ্যে কোন কথা কয়ে তোমাকে বিরক্ত করব না মনে করে' সেই সময় আমি কিছু বলিনি। আসল কথা, রান্না খারাপ হলে রাঁধুনীর দোষ দেওয়া অপেক্ষা, আহারের সমস্ত ব্যবস্থার যিনি তত্ত্বাবধান করেন আমি তাঁরই বেশী দোষ মনে করি। চাকরদের কাজ এই রকমই হয়ে থাকে। তাদের কাজ যারা তত্ত্বাবধান করে, এই বিষয়ে তাদেরই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।"—ইত্যাদি কথা আমি নীরবে শুনিয়া গেলাম। কিন্তু "নেবু খেয়ে দিন কাটাই, আমরা লড়াকা মানুষ"—এইরূপ বলায় আমি বলিলাম, "রোজের খাওয়ায় এক গ্রাস যদি অধিক হল ত অমনি দূরে সরিয়ে রাখা হবে, যে ওজন করে আহার করে সে আবার লড়াই করবে কি করে'!! এখন লড়াই কলমেতেই এসে ঠেকেচে। কলম ছাড়া আর কিসে লড়াই হবে? হাতিয়ারের ত বন্দোবস্ত আছেই, এখন একটা ছড়ি ব্যবহার করতে পেলেও ভাগ্যি বলে মান্‌তে হবে। তাও কিছু দিন পরে সরকার কোন পুরাণো আইন কানুনের নূতন সংস্কার করে বন্ধ করে দিলেই কাজ শেষ হবে! সত্যি সত্যিই যদি লড়াই বাধে তখন সবাই কি মুস্কিলেই পড়বে! বুকে ব্যথা হলে তার উপর রাইসর্ষে বেটে লাগালে কিংবা টর্পেণ্টাইন ঘষলে সেই জায়গা পুড়ে যায় ও ফোস্‌কা হয়, সেই শরীরে লড়ায়ের জখম সইবে কি করে!!" তাতে উনি বলিলেন;—"সইবে কি করে' স্থানে স্থানে জখমের চিহ্ন আছে! এই দেখ কাঁধের উপর জখম!! বুকের উপরে ত এত জখম আছে যে সে সমস্ত জখমের আঁচড়ে এক হিন্দুস্থানের নক্সাই তৈরি হয়ে যায়। আমি কিছুই মিথ্যে বলচি নে; ভাল করে দেখে বল দিকি একথা সত্যি কি না"। আমি হাসিতে হাসিতে কেবল ঠাট্টা করিবার ভাবেই নিকটে গিয়া খুব ঠিক্ করিয়া দেখিলাম (পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমি ততটা লক্ষ্য করিনি) ওঁর বুকের বামভাগে, বুকের আঁচড়-কাটা দাগের আকৃতি হুবহু হিন্দুস্থানের নক্সার মতো। এই আঁচড়-কাটাগুলা পূর্ব্বে-হওয়া কোন জখমের মতো দেখিতে নয়, ঠিক্ যেন মসৃণ কাগজের উপর waterline রহিয়াছে! ইহা দেখিয়া বাহিরে যদিও এ সমস্ত আমি ঠাট্টা বলিয়া উড়াইয়া দিলাম, কিন্তু আমার মনের উপর একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব পরিণাম ঘটিল. সেই পরিণাম কি যদিও এখন আমি তাহা ঠিক্ শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি না, কিন্তু মনে মনে আমি অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম।

উপাসনা ভাল হল কি না?

প্রার্থনাসমাজে "উনি" যে দিন উপাসনা করিবেন, সেই দিন আমিও ওঁর সঙ্গে থাকি,—ওঁর খুবই ইচ্ছা; এবং সত্য কথা বলিতে গেলে ওঁর এই উপাসনার সময়েই, আমার কোন বিশেষ কাজ থাকিলে, আমি অবসর করিয়া লইয়া প্রার্থনাসমাজে যাইতাম। অন্য কাহারও দ্বারা নির্ব্বাহিত উপাসনা আমার ততটা ভাল লাগিত না। এই সম্বন্ধে আমার মৈত্রিণী কতবার ঠাট্টা করিয়া আমাকে বলিয়াছেন:—"প্রতি রবিবারের উপাসনায়,—কোন একটা বাধা পড়ায় তোমার আস্‌তে সুবিধা হয় না, কিন্তু আজ ত বেশ সুবিধা হয়েছে। ভাল, এ দিনে ত তোমার বাড়ীতে কোন অতিথি-অভ্যাগত আসে নি, কোন ছোটখাটো কাজের বাধাও পড়ে নি"—উপাসনা হইয়া গেলে বাড়ী ফিরিবার সময়, আমরা গাড়ীতে উঠিলে উনি জিজ্ঞাসা করিতেন "আজ সমস্ত কথা কি রকম বুঝ্‌লে বলো"; উপাসনার সময় যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম ঠিক্ সেই সমস্ত বলিলাম। তখন

উনি বলিলেন, "তাহলে আমার মনে হয় আজকের উপাসনা ভাল হয়েছিল"। কোন কোন বার, উপাসনার সময় উনি যাহা বলিতেন, তাহা কঠিন হইলে আমি বলিতে পারিতাম না। তাতে উনি বলিতেন, "তাহলে আজকের উপাসনা ভাল হয় নি বলতে হবে; উপাসনা-সম্বন্ধে আমি এই প্রমাণ ঠিক করেছি যে, তুমি যে উপাসনা বুঝতে পেরেছ সেই উপাসনাই ভাল, আর তুমি যা বুঝতে পার নি সে উপাসনা ভাল হয় নি; আমার বিশ্বাস সে উপাসনা দুর্ব্বোধ্য হয়েছে"। উনি যাই বলুন না কেন, সত্য কথা বলিতে গেলে—ওঁর নির্ব্বাহিত উপাসনা এরূপ অর্থগর্ভ, প্রেমপূর্ণ ও গম্ভীর হইত যে, শ্রোতৃবর্গ ধন্য ধন্য মনে করিত; কিয়ৎক্ষণের জন্য দেহের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইত; ঈশ্বরের সম্মুখে আমি সাক্ষাৎ কথা কহিতেছি, এবং আমার প্রার্থনা তিনি শুনিতেছেন এইরূপ তাহাদের মনে হইত, তাহাদের চিত্তবৃত্তি তন্ময় হইয়া যাইত। কখন কখন ওঁর সেই শান্ত ও ভক্তিপারপ্লুত মুখমণ্ডলে যে একপ্রকার তেজ প্রকাশ পাইত, সেই তেজোদীপ্ত মুখের দিকে আমি একদৃষ্টে মূঢ়ের মতো চাহিয়া থাকিতাম, দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতাম না। আশপাশের লোকেরা না জানি কি মনে করিবে!—এইরূপ কচিৎ মনে হইলে চোখ নীচু করিতাম, কিন্তু আবার তখনি উপর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঐ কাজেই নিযুক্ত হইতাম। এখন আমার এই সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের অবস্থাতেও তখনকার সেই মুখশ্রী মনে আসিলে, আমার এই দীনাবস্থা বিস্মৃত হইয়া সেই সময়কার মনোভাব উপলব্ধি করিতেছি মনে করিয়া ক্ষণেকের জন্যও আনন্দ হয় এবং কতবার সেই মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াই মনে একটু শান্তিলাভ করিয়া থাকি। কোন কারণে ইহার ব্যত্যয় হইলে, কি যেন করিতে চুকিয়াছি, এইরূপ সমস্ত দিন আমার মনে তোলপাড় হইতে থাকে।

বোম্বায়ে অবস্থিতিকালে নিত্যনিয়মিত কার্য্যক্রম।

প্রতিদিন রাত্রিতে আহারান্তে বাড়ীর ছেলেদের পাঠাভ্যাসের তত্ত্বাবধান করিতাম; সেইরূপ আবার বয়স্ক লোকদিগের সঙ্গে এক আধ ঘণ্টা কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহার পর দোতালায় যাইতাম এবং কোন কিছু পাঠ করিতে আরম্ভ করিতাম। পড়িতে পড়িতে ঘুম পাইত। ইহা ভিন্ন নিদ্রা আসিত না; এইরূপ অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছিল। সাড়ে দশটা কিংবা এগারটায় নিদ্রা আসিলে তিন, সওয়া তিন বাজিলেই নিদ্রা পূরা হইত। তাহার পর বিছানাতেই পড়িয়া পড়িয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে বিচার বা মনন চলিত। ইহার পর বিছানাতেই উঠিয়া বসিয়া ৪ হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আমি ও 'উনি' তুকারামের অভঙ্গ আওড়াইয়া, হাতের তালি দিয়া কিংবা তুড়ি দিয়া ভজন করিতাম। তার মধ্যে, অত্যন্ত ভক্তিপর ও ঈশ্বরের সহিত যাহাতে আত্মরেপনা ও ঘনিষ্ঠতা ব্যক্ত হইয়াছে সেই সব নামদেবের অভঙ্গ একটার পর একটা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতাম। অনেক সময় আবৃত্তি করিতাম, অনেক সময় আবৃত্তি করিতে করিতে কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া উঠিত। এই সময়ে মুখের কথা বন্ধ হইয়া কেবল অশ্রুধারা চলিতে থাকিত। কখন কখন, আপনার মধ্যে তল্লীন হইয়া, অভঙ্গ বলিবার সময়, যে অভঙ্গটি আবৃত্তি করিতেছি তাহার দ্বিতীয় চরণ যুক্ত হইয়াছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য থাকিত না। প্রথমে এক অভঙ্গের চরণ আবৃত্তি করা হইত এবং অন্য আর এক সময়ে দ্বিতীয় চরণ বলা হইত। এই অভঙ্গটি গাথার মধ্যে না থাকিলে, আপন মনের অবস্থা অনুসারে ঐরূপ একটা জুড়িয়া দিয়া আবৃত্তি করা হইত। ইহার যমক যোজিত হইল কি না সে দিকে লক্ষ্য থাকিত না। এই সময় আমার বড় হাসি পাইত এবং আমি বলিতাম,—এই সমস্ত নূতন অভঙ্গের এক গাথা তৈরী করিয়া রাখো। আমি কল্যাণ শিষ্যের মতো লিখিবার ভার লইয়া এই সমস্ত অভঙ্গ যদি লিখিয়া রাখি ত বেশ হয়। ইহা শুনিয়া উনি উত্তর করিতেন,—আমরা সাদাসিধা লোক, আমাদের যমক, তালস্বরের জ্ঞান নেই ও তার জন্য গরজও নেই। যাদের জন্য ঐ সব অভঙ্গ বলি, তারা সবাই ঐ সমস্ত বুঝতে পারে। এই সব বিষয়ে তাদের কখনই লক্ষ্য থাকে না।" এইরূপ ৫টা পর্য্যন্ত অভঙ্গ ও ভজন হইবার পর, সংস্কৃত শ্লোক ও স্তোত্র আওড়াইয়া ৫॥০টার সময় বিছানা হইতে উঠিয়া মুখমার্জ্জনাদি প্রাতঃকৃত্য আধ ঘণ্টার মধ্যে সারিয়া ৬টার সময় বৈঠকখানায় আপন কৌচের উপর বসিয়া উনি কাজ করিতে আরম্ভ করিতেন। প্রথমে দৈনিক পত্রাদি পাঠ করিয়া তাহার পর ডাকের কাগজ-পত্র দেখিতেন এবং তদনন্তর ৯॥০টার সময় স্নান করিতে উঠিতেন। স্নানাহার হইয়া গেলে প্রায় ১৫ মিনিট কথাবার্ত্তা কহিতে বসিতেন, তাহার পর উঠিয়া পোষাক পরিয়া ১০॥০টার সময় কোর্টে যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিতেন। ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত হাই-কোর্টের কাজ চলিত। ইহার মধ্যে যে সময় জলখাবার ছুটি হইত সেই সময় বাড়ী হইতে জলখাবার লইয়া রেল-গাড়ীতে "বজাবা" ব্রাহ্মণ সময়মত যাইত ও ডিবা হইতে গরম গরম জিনিস বাহির করিয়া খাইতে দিত। তাহা হইতে অল্প কিছু খাইয়া জল পান করিয়া সেইখানেই আরাম-কেদারায় একটু বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার গিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিতেন। ৫টার সময় কাজ শেষ করিয়া উঠিবার পর গাড়ী কেবল সঙ্গে রাখিয়া ২।৩ মাইল পায়ে হাঁটিয়া চলিতেন অর্থাৎ ইহাতে করিয়া

আবার বেড়াইতে যাইবার কাজটা বাঁচিয়া যাইত। ৬টার সময় বাড়ী আসিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল কথাবার্ত্তা কহিয়া, আবার নিজের নিত্যকর্ম্ম—অর্থাৎ সকালে-আসা ডাকের চিঠিপত্রের উত্তর লেখা ও তাহার পর বই পড়া আরম্ভ হইত। রোজকার চিঠিপত্রের উত্তর যাহাতে সেই দিনই পাঠান হয় সেইদিকে তাঁর লক্ষ্য থাকিত। ছুটির দিনে সকালে ও কখন কখন দুপুর বেলায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনেক লোক আসিয়া জমিত। যে রকমের লোক আসিত তাহাদের সহিত ঠিক্ সেই রকমই জিজ্ঞাসা-বাদ করিতেন, কথা বলিতেন, এবং যে কাজ যাহার দ্বারা হওয়া সম্ভব তাহার দ্বারা সেই কাজ করিয়া লইতেন। কোন বড় ঘরের প্রাচীনতন্ত্রের লোক, ব্রাহ্মণ, মরাঠা, গুজ্‌রাটী, ভাট প্রভৃতি যে কোন পদবীরই গৃহস্থ আসিত তাহার সহিত পদোচিত সসম্ভ্রমে কথা কহিতেন। তাহার দ্বারা ও তাহার মার্ফতে কোন সার্ব্বজনিক লোকোপযোগী কাজ সাধিত হইলে, তাহার গৌরব করিতেন, যাহাতে তাহার উৎসাহ ও বেশী উত্তেজনা হয় এইরূপ কথায় তাহার প্রশংসা করিতেন। এই সব দেখিয়া কখন কখন আমার হাসি পাইত ও আমোদও বোধ হইত। এই সকল ভদ্র লোকের সহিত কথা কহিবার সময় তাহাদের গ্রামে বা জাতের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানের অভাব হইত, "সেইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান তোমরা আপনারা অগ্রসর হইয়া স্থাপন কর ও তোমাদের ন্যায় কোন উৎসাহী লোকের নামে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম দেও। তাহা হইলে অনায়াসে স্মারক-স্বরূপ হইয়া এই প্রতিষ্ঠান লোকোপযোগী হইবে", —এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ শব্দের দ্বারা তাহাদের মনের উপর এই কথা মুদ্রিত করিয়া দিতেন। যাইবার সময় এই সব লোক,—একটা নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছে মনে করিয়া, খুব উল্লাসের সহিত যাইত ও কাজে প্রবৃত্ত হইত। এই সব লোক উঠিয়া গেলে পর, আমি বৈঠকখানায় গিয়া ওঁকে জিজ্ঞাসা করিতাম—"আজকের লোকদের উপর কি কি কাজের ভার দেওয়া হল"? বেশ নিপুণতার সহিত কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্য এই, যাহাদের উপর কাজের ভার দেওয়া যায়, তাহারা তাহার দরুন বিরক্ত হয় না, উল্টা,—আজ আমরা একটা বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছি—এইরূপ মনে করে।

মহাবলেশ্বরে যাত্রা। ১৮৯৫।

দুইটা বিছা

কিংবা সৃষ্টিসৌন্দর্য্য দর্শনে দেহের অস্তিত্বজ্ঞানের লোপ।

জুন ১৮৯৫ অব্দে আমরা মহাবলেশ্বর হইতে "ওয়াঠা"রে আসিবার সময় "বাঈ"র আগে ও ওয়াঠারের পরে বড় ডোঙ্গির এক ঘাট আছে সেই ঘাটের নিকট আমরা আসিলাম। পূর্ব্ব-যাত্রায় ফিরিবার সময় ওঁর এইরূপ নিয়ম ছিল যে, রোজ বারো ক্রোশের উপর বয়েল কিংবা ঘোড়াদের খাটাইতেন না এবং পথের মধ্যে ঘাট (শৈল মালা) আসিয়া পড়িলে সেই ঘাট শেষ হওয়া পর্য্যন্ত উনি হাঁটিয়া যাইতেন, গাড়ীতে উঠিতেন না এবং ঘোড়াদিগকে আস্তে আস্তে পৌঁছে চরাইয়া আনো—এইরূপ কোচম্যানকে তাগিদ হুকুম দিতেন। এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া তাড়াগাড়ী হইলেও, ঘাটের নিকট আসিবামাত্র 'উনি' নীচে নামিয়া পায়ে চলিতে আরম্ভ করিলেন। চিরঞ্জীব সধু ও নাহু এই দুই ছেলের বয়স সাত ও আড়াই বৎসর ছিল। এই দুইটিকে গাড়ীতে রাখিয়া ও সিপাইকে তাদের নিকটে বসাইয়া, "গাড়ী নিয়ে এসো" এইরূপ কোচম্যানকে হুকুম দিয়া, আমি ওঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিবার জন্য নীচে নামিলাম; কিন্তু "আমরা তোমার সঙ্গে চলব" এইরূপ দুই ছেলেই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল এবং নীচে নামিবার জন্য গোলযোগ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে কোন প্রকারে বুঝাইয়া আমি অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে ১০ মিনিট অতীত হইল। উনি গাড়ী হইতে নামিয়াই চলিতে আরম্ভ করায়, এখান হইতে নজর পৌঁছোয় না এতটা দূরে তখন চলিয়া গিয়াছেন; তাই শীঘ্র গিয়া ওঁকে ধরিবার জন্য যতটা পারি দ্রুত চলিতে লাগিলাম এবং রাস্তায় যখন লোক না থাকিবে তখন মধ্যে মধ্যে একটু দৌড়িয়াও যাইতাম। এত ত্বরা করিবার কারণ—সন্ধ্যা বেলায় উনি খুব কমই দেখিতে পাইতেন, সঙ্গে কোন লোক নাই, এই অবস্থায় সম্মুখে কোন গাড়ী আসিয়া পড়িলে, হয়ত ওঁর গায়ে গাড়ীর ধাক্কা লাগিতে পারে,—এই ভয়ে আমি এইরূপ ত্বরা করিতাম। আমি নিকটে আসিয়া পড়িলে, আমার চলার গতিটা একটু মন্থর হইল। স্বভাবত উনি বেশ লম্বা বলিয়া উনি লম্বা লম্বা পা ফেলিতেন, এবং আমি বেঁটে মানুষ, ওঁর সঙ্গে যাইবার জন্য যতই তাড়াতাড়ি চলি না কেন কিছুতেই পারিয়া উঠিতাম না, আমাদের দুজনের মধ্যে একটু অন্তর থাকিয়াই যাইত।

যাহা সর্ব্বদা দেখিয়া আসিয়াছি সেইরূপ এখনও দেখিতে পাই, আমাদের দুজনের মধ্যে স্বভাবতই ১০।১২ পদ অন্তর থাকিয়া যায়। নতুবা, আমি কাছে আসিয়াছি দেখিয়া রোজকার মতো দাঁড়াইয়া আমার জন্য আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিতেন কিন্তু আজিকার মনোভাব ভিন্ন ছিল। এইরূপ গম্ভীর সময়ে "ঐ সে ভাগ্য বাঈ লাহতা হোঈন। অবঘে দেখে জন ব্রহ্মরূপ" অর্থাৎ এমন ভাগ্য লাভ কার হবে, যে দেখে সমস্তই ব্রহ্ম-

রূপ,—এই অভঙ্গ সম্পূর্ণ তল্লীনতাসহকারে ফিরিয়া ফিরিয়া বলিয়া যাইতেছেন—আমরা পরস্পরের মধ্যে একটু অন্তর রাখিয়া চলিতে চলিতে ঘাটের মাথায় আসিয়া পড়িলাম। সেখানে এক পুলের নিকটেই দুইটা বড় বড় বিছা প্রায় ৪।০-৫।০ ইঞ্চি লম্বা ও এক-দেড় ইঞ্চি গোল হইবে। বিছা দুইটার দাঁড়া পিঠের দিকে ঝুলিতেছিল—কড়ে আঙ্গুলের মতো মোটা। তার রং গুড়ের পাক করা রসের মত। ঐ দুইটা বিছা ইচ্ছাসুখে পরস্পরের পিছনে চলিতেছিল। ওঁর পায়ের দিকে আমার নজর পড়ায়, ঐ বিছা দুটা আমি দেখিতে পাইলাম। আর দুই তিন পা চলিলেই ঐ বিছার উপর ওঁর পা পড়িবে এইরূপ মনে করিয়া আমার ভয় হইল, আমি সম্ভবতঃ সজোরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু কি হইল কে জানে, বিছার উপর পা পড়িবার পূর্ব্বেই আমি গিয়া পড়িব এবং হাত দিয়া সরাইয়া দিব এই উদ্দেশে আমি খুব দৌড়িয়া গেলাম; কিন্তু সেখান পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, সেই বিছা যে পংক্তি ধরিয়া চলিতেছিল তার দুই তিন পা আগে উনি চলিয়া গিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ লিখিতে ৮।১০ মিনিট লাগিয়াছে, কিন্তু এই ঘটনাটা হইতে ৮।১০ সেকেণ্ডও লাগে নাই। দৌড়াইয়া যাইবার সময় পথে বিছা আছে তার উপর পা পড়িতে পারে এই কথা হাঁক দিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমি বলিতে পারিলাম না। এদিকে, বিছার উপর পা পড়িতে পারে এইরূপ মনে করিয়া আমার বুক ধড়ফড় করিতেছিল। নিমেষের মধ্যে আমার চোখ আপনাপনি মুদিত হইল। কিন্তু তারপরেই চোখ খুলিয়া দেখি যে বিছার লাইন হইতে আগে চলিয়া গিয়া উনি পূর্ব্ববৎ সজোরে পদক্ষেপ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমার খুব আনন্দ হইল এবং এই একটা বড় অরিষ্ট এড়ান গেল বলিয়া আমি ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম; এই সমস্ত ব্যাপার কত সময়ের মধ্যে ঘটিল তাহা এখন বলা কঠিন। আমি ওঁর নিকট গিয়া ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম ওঁর পায়ে কোন কিছু ঠেকিয়াছে কিনা। এই কথা জিজ্ঞাসা করায় উনি একটু আশ্চর্য্য হইলেন এবং তখনই থামিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি? কি জিজ্ঞাসা করচ? কি হয়েছে? এত হাঁপিয়ে গেছ কেন? গাড়ী কোথায়?" প্রভৃতি একটার পর একটা প্রশ্ন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন। গাড়ীর কোন কিছু বিপদ হইয়াছে কিংবা ঘোড়া ভাগিয়াছে এইরূপ কোন কিছু আশঙ্কা ওঁর মনে হওয়ায় বোধ হয় এত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; "কিছু হয় নি, গাড়ী নিরাপদে আসচে, আমি একটু তাড়াতাড়ি চলছিলুম, ও চড়াই বলে হাঁপিয়ে পড়েছি। একটু বসা যাক। যতক্ষণ না গাড়ী আসে। এখন চড়াই সমস্ত শেষ হয়েছে এই সমস্ত বলিলেও উনি নীচে বসিলেন না। তখন আমি একটু কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলাম, একটু নীচে বসবে না কি? একটু হাঁপ লেগেছে।" তখন উনি বলিলেন:—"কার হাঁপ লেগেছে? আমার? আমার একটুও হাঁপ লাগেনি। বেটা ছেলেরা শ্রম ও কষ্ট করতেই জন্মেছে। আমার হাঁপ লাগলে চলবে কি করে? বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বতের ভিতর দিয়ে আমরা বেড়িয়ে বেড়াই; তোমার হাঁপ লেগেছে বলে তুমি কাকুতি মিনতি করচ। তোমার হাঁপ লেগেছে এই কথা স্পষ্ট করে বল, তাহলে তোমার জন্য আমি নীচে বসচি।" আমি তখনি বলিলাম, "হাঁ সত্যই হাঁপ লেগেছে। আমার জন্যই না হয় হল। এখন নীচে বসা যাক। রাস্তার ধারে সারি সারি সাদা পাথর বসান ছিল তার উপরেই আমরা দুজনে বসিলাম। গাড়ী আসা পর্য্যন্ত অনেকটা অবকাশ পাওয়া গিয়াছিল; তাই সেই বিছা দুটার কথা আমি বলিলাম। তাহা শুনিয়া উনি বলিলেন, "তখন তোমার ভয় পাওয়া আওয়াজ ও ভয় পাবার ভঙ্গী দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলেম ও গাড়ীর সম্বন্ধে আমার ভাবনা হয়েছিল।" আমি বলিলাম, "কি বিপদই এড়ান গেছে? বিছে দুইটা পায়ের স্পর্শমাত্রই দংশন করত। এই রকম ঠিক ত্রিসন্ধ্যার সময় উজাড় মাঠের মধ্যে ঔষধ কোথায় পাওয়া যেত? এই সময় কে সহায় হত?" এইরূপ বলিতে বলিতে আমার বুক আবেগে ভরিয়া উঠিল,—এমন কি, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তখন উনি কিয়ৎক্ষণ একেবারে স্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর আমাকে বলিলেন—"এখন বিপদটা কেটে গেছে ত? এখন আর ভয় কিসের? এথেকে দেখ, পরমেশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে আছেন। এবং পদে পদে আমাদের রক্ষা করেন। বিছাটা আমার পায়ে না পড়ে, আমার পা সহজেই বিছার বাহিরে পড়েছিল এই রকম তোমার মনে হয়েছে; সে যাইহোক্ যোজনাটা সেই রকমই হয়েছে বটে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি যদি রক্ষা করবেন মনে করেন ত কিছুতেই বিপদ হতে পারে না। কেবল আমাদের ঐরূপ বিশ্বাস থাকা চাই। এটা কি শেখবার মতো নয়? তুকারাম বাবার একটা অভঙ্গ আছে। "যেথাই যাই তুমি মোর সঙ্গী। চালাইছ আমার ধরিয়া হাত"। এই অভঙ্গ কতটা সত্য খুবই সত্য নয় কি? ধন্য সেই পুরুষ এবং তাঁর অপরিসীম ভক্তি ও বিশ্বাস। যখন নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় তখনই এই উক্তিটা খাটে। আমরা দুর্ব্বল মানুষ, ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস মনে পোষণ করা খুব একটা সামর্থ্যের কথা, এবং তাহাতে আমাদের কল্যাণ আছে"। এই রকম উনি বলিতেছেন এমন সময় গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। রাত্রি ৮ টায় পুণার গাড়ী ধরা চাই, তাই আমরা গাড়ী করিয়া ওয়াঠারে আসিলাম ও সেখান হইতে রেল-পথে পুণায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

প্রথমা প্রভৃতি বিভক্তিগুলি এবং ক্রিয়াপদগুলি প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব বলিয়া কথিত হইবার যোগ্য। এই নিয়মানুসারে বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব বিভক্তিরও ক্রিয়াপদসম্পত্তির অল্পতা অনুভূত হয় না। কারণ সংস্কৃত হইতে যে সমস্ত প্রাকৃত-ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তন্মধ্যে পালিভাষাই বোধ হয় সংস্কৃতের অনন্তর এবং অন্যান্য প্রাকৃত প্রত্যনন্তর নামে উল্লেখ যোগ্য।

"কচ্চা অন"কৃত পালিব্যাকরণে কথিত সপ্ত-বিভক্তির আকার এইরূপ,—

১। ব ২। ব ৩। ব ৪। ব ৫। ব
সি ও অং ও না হি স ণ স্মা হি

৬। ব ৭। ব
স ণ স্মি মু

প্রাকৃতভাষায় অকারের পরবর্ত্তী প্রথমা বিভক্তি 'সু'স্থানেও হয়, এবং জসের লোপ ও পূর্ব্ব অকারের স্থানে আকার হয়; সুতরাং সাধারণতঃ অকারান্ত শব্দের পর ও এবং আ এই দুই বিভক্তিই যথাক্রমে এক বচনে ও বহু বচনে ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বাদি এবং ইগন্ত শব্দের পরবর্ত্তী বিভক্তির রূপ স্বতন্ত্র হয়। প্রাকৃত ভাষায় চতুর্থী বিভক্তির ব্যবহার নাই; চতুর্থীর পরিবর্ত্তে ষষ্ঠী বিভক্তিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় চতুর্থীর পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়া বিভক্তিরই ব্যবহার দেখা যায়।

বাঙ্গালায় প্রথমা বিভক্তির একবচনে মানুষ বহুবচনে মানুষেরা ইত্যাদিরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং সংস্কৃতভাষার বা প্রাকৃতভাষার বিভক্তির সহিত উহার দূরসম্পর্কও পরিলক্ষিত হয় না। দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তিঘটিত পদের প্রতি লক্ষ্য করিলেও কোনরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। জিজ্ঞাসু পাঠক মহোদয়গণ প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অনায়াসেই প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

মুখ্য ক্রিয়াপদে কোন কোন স্থলে সংস্কৃতভব প্রাকৃতের চিহ্ন দৃষ্ট হইলেও স্থলবিশেষে কিছুমাত্রও সাদৃশ্য অনুভূত হয় না। এই বিষয়ে কয়টি উদাহরণ উপন্যস্ত হইতেছে, "সংস্কৃত পঠতি, প্রাকৃত পঢ়ই পঢ়এ, বাঙ্গালা পড়ে; কর্ম্মবাচ্যে সং-পঠ্যতে প্রা-পঢ়িজ্জই, বাঙ্গালা পড়া হইতেছে। সং-করিষ্যামি, প্রা-কাহং বাঙ্গালা; করিবো। সং-দাস্যামি, প্রা-দাহং, বাঙ্গালা দিবো। সং-শ্রোষ্যামি,প্রা-সোচ্ছং, বাঙ্গালা শুনিবো। সংবক্ষ্যামি, প্রা-বোচ্ছং, বাঙ্গালা বলিবো। সং-যাস্যামি, প্রা, যাজ্জং-বাঙ্গালা যাবো। সং-রোদিষ্যামি, প্রা-রোচ্ছং, বাঙ্গালা-রোদন করিব। সং-দ্রক্ষ্যামি, প্রা-দচ্ছং, বাঙ্গালা-দেখিবো। সং-বেৎস্যামি, প্রা-বেচ্ছং, বাঙ্গালা-বুঝিবো। ইত্যাদি।

দৃশধাতুর অর্থে দেখধাতু বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতে দৃশ ধাতুর স্থানে পেকথ আদেশ হইয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার ক্ত্বা প্রত্যয়ের স্থানে প্রাকৃতে তুম, অৎ, তূণ, তু আণ এই চারিপ্রকার আদেশ হয়। যথা—সং-দৃষ্ট্বা, প্রা-দটুং, বাঙ্গালা-দেখিয়া। সং-পীত্বা, প্রা-পাউন, বাঙ্গালা-পিয়া। সং-গৃহীত্বা, প্রা-ঘেত্তূন, বাঙ্গালা-গ্রহণ করিয়া। সং-কৃত্বা, প্রা-কাউন, বাঙ্গালা-করিয়া। সং-ভিত্বা, প্রা-ভেত্তুআন, বাঙ্গালা-ভেদিয়া। সুতরাং ক্ত্বা প্রত্যয়ার্থে "ইয়া" প্রত্যয় বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

বাঙ্গালীর নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুজাতের নামের প্রতি লক্ষ্য করিলে বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত নিজস্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত গৃহ শব্দ হইতে প্রাকৃত ঘর শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; ঘর শব্দ প্রাকৃত হইতে অথবা সাক্ষাৎ সংস্কৃত হইতেই বাঙ্গালাভাষার প্রবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ঘর নির্ম্মাণের উপাদান ও অবয়ব এতদুভয়ের বাচ্যে প্রায় সমস্ত শব্দই বাঙ্গালা ভাষার নিখুৎ নিজস্ব বলিয়া মনে হয়। চালশব্দটা একসময়ে সম্ভবতঃ বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব ছিল, অমরকোষের পরবর্ত্তিকালে উহাকে সংস্কৃতের জ্ঞাতি করিয়া লওয়া হইয়াছে। চালের রুয়া, সাঁড়ক, ছাঁটন, পাইড়, আড়া, টুই (টুয়া), আন্ধারিয়া, ডাব, চুকনা, বাতা, ছেঁচা, দড়ী বা দড়া, শুতলী, তোঁয়াল্‌ ও খুঁটি, পালা, পেলা প্রভৃতি বাঙ্গালার নিজস্ব। ঘরের ভিতরে পাকের স্থান "হেঁসেল" বাহিরে চালের জল পড়ার স্থান "ছাঁইচ" উঠানামার পদক্ষেপ স্থান, পৈঠা, উঠান, চান্দড়, আদাড়, (আবর্জনা ফেলিবার স্থান) উহা বিক্রমপুর প্রদেশে ছিঠাল, ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে ও শ্রীহট্টে "আঁইঠাল" মালদহপ্রদেশে আস্টল, সম্মার্জ্জনীর অর্থে বাড়ুন্‌, ঢাকাপ্রদেশে পীছা, ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে ও শ্রীহট্টে সাছুন বা হাছুন, (ইহার প্রকৃত উচ্চারণ করিতে হইলে হকারের কিয়দংশ চাঁছিয়া ফেলা দরকার) মেয়েদের মসল্লা রাখিবার জন্য ঝাইল নামক বাঁশের একটা জিনিস ছিল, পোর্টমেন্টের আবির্ভাবে সংপ্রতি উহার তিরোভাব হইয়াছে। কিন্তু শব্দটা এখনও একেবারে মরে নাই। ঘরকন্নার উপযোগী পাতিল, হাতা, বাউলী, বগুণা, বাসন, বিড়া, কুলো, ধাগা, কাঠা, চুঙা, ছালা, থৈলা প্রভৃতি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ।

জলবহুল বাঙ্গালাদেশবাসীর নৌকার সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নৌকা শব্দ সংস্কৃত, উহার অপভ্রংশে নাও শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এই উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার অবয়ব বাচক এবং ইহার সহিত সংসৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের বাচক শব্দগুলি বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব। যথা—গলই, গোরা, ভহর, ভওরা, বা ভরা, ছঁই (ছদি হইতেও হইতে পারে) মাস্তুল, পাল, বৈঠা, দাঁড়, হাইল, লগী, ধাপার, ছ্যাপুণ, সেঁঅৎ বা সেউতী, চালকের নাম মাঝী মাল্লা ইত্যাদি। দাঁড়া (দামের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ রাস্তা) প্রাকৃত ভাষায় যদিও দাঁড়া শব্দ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার অর্থ দাঁত।

মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালীর মৎস্য ধরিবার উপযোগী যন্ত্রগুলির অধিকাংশই বাঙ্গালীর নিজের উদ্ভাবিত; সুতরাং এইগুলির নামও খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ।

যথা—টেটা, কোঁচ, ভাইড়, ভুয়ারী, খলুয়ন্ বা খর-যোন, সাগড়া ছুঁচা, খরা, কাঠা, মাছ রাখিবার পাত্র—খালই চুপড়ী ইত্যাদি।

চাষাদিগের চাষসংক্রান্ত অনেক কথা আছে, যাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে পরিচিত নহে। যেমন—একহর (প্রথমচাষ) দোহর, তেহর নিড়ান, জাবর সামাল ইত্যাদি।

পশুর নামও বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। যেমন—পাঁঠা পাঁঠী আবাল্, বল্দন, (বলদ) এঁড়ে বা আঁইড়া। বাক্যালঙ্কার বা নিরর্থক শব্দ ভাষার মৌলিকতার পরিচায়ক এবং নিজস্ব। যেমন সংস্কৃতভাষায় যাবৎ, তাবৎ, খলু প্রভৃতি শব্দ; সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্ববর্ণের পরিবর্ত্তে টকার যুক্ত পাল্টা শব্দ অলঙ্কাররূপে চল্তি ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যথা—মানুষ টানুষ, গাছ টাছ, মাছ টাছ, কলা টলা, গরু টরু ইত্যাদি।

কোন কোন স্থলে নিরর্থক অন্য শব্দও ব্যবহৃত হয়, যেমন—খাবো অনে, খাবোথন, খাবোএখন, খাবোঅনে, করবোঅনে বাসন কোসন ইত্যাদি।

ভাব বিহিত কৃৎপ্রত্যয়ান্ত ধাতুজ সংস্কৃত শব্দের পর "কর" শব্দযোগে বাঙ্গালাভাষায় অনেক ধাতু কল্পিত হইয়া থাকে। যেমন,—গমন কর, গ্রহণ কর, প্রস্থান কর, শয়ন কর, আহার কর, পাঠ কর ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃতভাষার গন্ধরহিত বাঙ্গালা-ভাষার নিজস্ব ধাতু সম্পত্তি নেহাৎ কম বলিয়া মনে হয় না। যথা—কথন অর্থে "বল"ধাতু, যাচ্ঞার্থে ও দর্শনার্থে "চাহ"ধাতু, সঙ্কোচনার্থে "আঁট" পরি-ধানার্থে "পিন্ধ" তক্ষণার্থে "চাঁচ" আকর্ষণার্থে "টান" উপবেশনার্থে "বস" ছুসনার্থে "কম" বর্দ্ধ-নার্থে "বাড়" প্রবেশনার্থে "শেন্ধ" দর্শনার্থে "তাক" স্পর্শনার্থে "ছুঁয়" অগ্রগমনার্থে "আগ" পশ্চাদ্-গমনার্থে "পাছ" বা "পিছ" নিদ্রার্থে "ঘুম" উপ-লালনার্থে "বুল" (যেমন হাত বুলাও) উৎপবনার্থে "হাঁক" স্থিতি অর্থে "থাক" পাকান অর্থে "পাক" (দড়ী পাকান ইত্যাদি) মোচড়ান, নিংড়ান ইত্যাদি। বাঙ্গালাভাষার ক্রিয়া বিশেষণ ও অধিকাংশই তাহার নিজস্ব। যেমন—"সাপ্টাইয়া" (পদ্যে সাপুটিয়া) "ঝাপ্টাইয়া" "গোল্লাইয়া" জুইৎ করিয়া ইত্যাদি।

ক্রিয়াব্যতিহারে ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যাও বাঙ্গালাভাষায় নিতান্ত অল্প বলিয়া মনে হয় না, এই গুলিতে ভাষান্তরের দাবীদাওয়া আছে বলিয়াও বোধ হয় না। যথা—"কাটাকাটি" "মারামারি" "ছড়াছড়ি" "পাড়াপাড়ি" "খাওয়া-খাওয়ি" "লাথা-লাথি" "গুতাগুতি" "চড়াচড়ি" "কিলাকিলি" "বকাবকি" "মুখামুখি বা মুখোমুখি" "রোখারোখি" "জড়াজড়ি" ইত্যাদি।

সম্বন্ধবাচক দাদা, কাকা প্রভৃতি শব্দও বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব। প্রাকৃত ভাষায় "পিউসা মাউসা" শব্দ পিসি মাসি অর্থে ব্যবহৃত হইত। বাঙ্গালায় পিসি মাসি শব্দ সংস্কৃতের অপভ্রংস বলিয়া ধরা হয়, এবং পিসা মাউসা শব্দ পিসিমাসির পতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ অর্থান্তরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ঐ গুলিকে বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ উহাদের উভয় ভাষাগত অর্থের কোনও সাম্য প্রতিভাত হয় না। যেমন—বাঙ্গালায় গৌরবার্থে সম্ভ্রম শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সংস্কৃতে ত্বরা অর্থে উহার ব্যবহার দেখা যায়। সংস্কৃতে নিপুনার্থে অভিযুক্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যেমন "অভিযুক্তাঃ পঠন্তি" কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দেখা যায়, যাহার উপর কোনরূপ দোষারোপ হয়, তাদৃশ মানবই অভিযুক্ত শব্দে অভিহিত হয়।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ ভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায়। তন্মধ্যে সংস্কৃত ও পারসিক শব্দের সংখ্যাই অধিক। কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালাভাষায় পঁহুছিয়াছে, আর কতক-গুলি অবিকৃতভাবে, ও কতক কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গালাভাষার প্রত্যয়ভাগ সম্পূর্ণরূপেই নিজস্ব। যদিও কতকগুলি প্রত্যয়ে সংস্কৃতের ছাঁচ দেখা যায়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার প্রত্যয়ের সহিত তাহাদের অর্থের কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই। যেমন—আমি "করিতাম" এই তাম্ প্রত্যয় বাঙ্গা-লায় অতীতকালে উত্তম পুরুষের একবচনে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু সংস্কৃতের "তাম্" প্রত্যয় অতীতা-ভিধায়ী বিভক্তির প্রথম পুরুষের দ্বিবচনে এবং অনুজ্ঞাদিবোধক লোট বিভক্তির পরস্মৈপদে প্রথম পুরুষের দ্বিবচনে ও আত্মনেপদে প্রথম পুরুষের একবচনে প্রযুক্ত হয়। এইরূপ অনেক স্থলেই অর্থের অত্যন্ত পার্থক্য উপলব্ধ হয়।

যে সকল প্রাকৃত শব্দ বাঙ্গালাভাষায় মিশি-য়াছে; তাহাতে ব্যাকরণ শুদ্ধ প্রাকৃতের সংখ্যাই অধিক দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় যে, বাঙ্গালা দেশে দেশান্তরাগত আর্য্যজাতির সমাগমের পূর্ব্বে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাই আর্য্যবংশীয় নৃপতি-গণের অধিকার সময়ে রাজকার্য্য সম্পাদনার্থ বিশুদ্ধ প্রাকৃত ভাষার সহিত মিলিত হইয়া থাকিবে। সম্ভবত ঐ সময়েই শিক্ষিত রাজপুরুষজুষ্ট সংস্কৃত শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই বিষয়ে কতকটা নিদর্শনও দেখিতে পাওয়া যায়। আলঙ্কা-রিকদিগের মতে গৌড়ীয় প্রাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছে। রাজসাহী প্রদেশে বাঙ্গালার

অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেকগুলি বিশুদ্ধ প্রাকৃত ব্যবহৃত হয়। যেমন,—"বোর" "মোর" "সেজা" ইত্যাদি। বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগে "ধরই" দক্ষিণ-ভাগে "কুল" শব্দ ব্যবহৃত হয়, ময়ূর শব্দ অবিকৃত ভাবেই ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতব্যাকরণানুসারে শয্যা-শব্দের স্থানে "সেজ্জা" হয়। রাজসাহী প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সেজা শব্দের ব্যবহার করে।

হিন্দুনৃপতিবৃন্দের রাজত্বাবসানে মুসলমান শাসনকালে রাজকীয় কার্য্যে যে সকল যাবনিক শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহা অদ্যাপি বাঙ্গালাভাষায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং এই সকল নবাগত শব্দের আবির্ভাবই রাজকার্য্যোপযোগী পুরাতন শব্দের তিরোধানের কারণ বলিয়া মনে হয়।

নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ পুরাতন ভাষার অনেকটা বজায় রাখিয়াছে; কেবল যে যে বিষয়ে উচ্চশ্রেণীর লোকের সহিত তাহাদিগের সম্পর্ক, সেই সেই বিষয়েই আর্য্যজুষ্ট ভাষা গ্রহণ করিয়া, প্রাচীন ভাষার সহিত অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মাঝিমাল্লার মুখে লাও ও নৌকা এই দুইটি শব্দই সমভাবে ব্যবহৃত হয়, ইহার মধ্যে লাও শব্দটা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ-জুষ্ট এবং নৌকাশব্দ ভদ্র আরোহীর মুখ হইতে অভ্যস্ত, গোরাভরার সহিত ভদ্র আরোহীর বড় বেশী পরিচয় নাই; সুতরাং সেই সকল শব্দ অদ্যাপি অবিকৃতরূপে দেশ্যভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, জাহাজের খালাসিগণ সাহেবদিগের মুখে শুনিয়া শুনিয়া লগির দরকার হইলে "বাম্বু বাম্বু" বলিয়া চীৎকার করে, কিন্তু ঝাড়ের বাঁশকে বেম্বু বলিতে তাহারা অদ্যাপি শিখে নাই। দেশ্যপ্রাকৃতের সহিত পুরাতত্ত্ব নির্ণয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। পুরাতত্ত্ব নির্ণয়াভিলাষী ইদানীন্তন মনীষীদিগের সুদৃঢ় গবেষণার ফলে যে সকল প্রাচীন প্রশস্তি তাম্রশাসন এবং শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়া, ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুজ্ঞেয় অতীত অবস্থার সাক্ষ্যপ্রদানে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইতেছে, তাহাদিগের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, দেশ্য প্রাকৃতের অর্থ নির্ণয় নিতান্ত প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ দুই একটি স্থল উদ্ধৃত হইতেছে। উমাপতিধরের লিখিত প্রশস্তিতে তল্লশব্দের উল্লেখ আছে। বৃহজ্জলাশয় বাচক এই তল্ল শব্দ "সরস্বতীকণ্ঠাভরণে" "গল্লৌ লাবণ্যতল্লৌতে" ইত্যাদি শ্লোকে দেশ্য প্রাকৃত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কণ্ঠাভরণকার ভোজদেব এই শব্দদ্বয়ের অর্থকথনে প্রয়াসী হন নাই। অন্যান্য শব্দের অর্থ টীকায় কথিত হইয়াছে; কিন্তু এই দুইটি শব্দের দুজ্ঞেয়তা নিবন্ধন সমগ্রকবিতাটিই অর্থ প্রকাশের অযোগ্য অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। সংপ্রতি বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব নির্ণয়প্রসঙ্গে নানাশ্রেণীর প্রাকৃত ভাষার প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হওয়ার ফলে, গল্ল তল্লশব্দের যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাহাতে বোধ হয় সমগ্র কবিতাটির অর্থ এইরূপ হইবে—

"গল্লৌ লাবণ্যতল্লৌতে লড়হৌ মড়হৌ ভুজৌ।
নেত্রে বোসট্টকন্দোট্ট-মোট্টায়িত-সখে সখি॥"

টীকাকারদিগের মতে লড়হ-মনোহর, মড়হ-কৃশ, বোসট্ট নীলোৎপল, মোট্টায়িত-বিলাস, গল্লতাল্লর কোনও অর্থ লিখিত হয় নাই। "তল্ল" কৃত্রিম বৃহজ্জলাশয়, এবং গল্ল অর্থ গাল। এই কবিতাটিতে কোনও রূপসীর প্রতি তাহার সখি বলিয়াছেন, হে সখি! তোমার গাল দুখানা লাবণ্যের তালস্বরূপ (সরোবর) বাহু দুখানা মনোহর অথচ কৃশ, চক্ষু দুটি বিকসিত নীলোৎপলের বিলাস অর্থাৎ স্ফুরণের সদৃশ।

প্রদর্শিত কবিতাটি প্রাকৃতভাষার কবিতা নহে। কয়টি সংস্কৃতশব্দে ও কয়টি দেশ্য প্রাকৃতশব্দে সংস্কৃতভাষার বিভক্তিযোগে ইহা রচিত হইয়াছে। সংস্কৃতসাহিত্যে এইরূপ দেশ্য প্রাকৃত শব্দ দীর্ঘকাল হইতেই সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। মীমাংসাদর্শনের ম্লেচ্ছাধিকরণে বিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে অবিরুদ্ধ ম্লেচ্ছশব্দ (অর্থাৎ দেশ্য প্রাকৃত) আর্য্যগণ ব্যবহার করিতে পারেন। উদাহরণ স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "পিক" "তামরস" প্রভৃতি অনার্য্য শব্দ আর্য্যভাষায় স্থান পাইয়াছে।

পুরাতন দেশ্য প্রাকৃত শব্দ হইতে বাঙ্গালা-ভাষার নিখাত রীতির অনুসারে, গল্ল হইতে "গাল", তল্ল হইতে "তাল" গচ্ছ হইতে "গাছ" বপ্প হইতে "বাপ" ইত্যাদি রূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ক্রমে বাপ হইতে বাপা, পরে বর্ত্তমান সময়ে "বাবা" অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। খনার বচনে "যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা, এক পা না বের হও বাপা" প্রভৃতি স্থলে বাপা শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের পত্রে স্থলবিশেষে "বাপাজীউ, বাপাজীবন দীর্ঘজীবেষু" ইত্যাকার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। দেশ্যশব্দের অননুশীলনের ফল বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের কবিতার অর্থ নির্ণয়ে অনেক স্থলেই অত্যন্ত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। অনেক স্থানেই দেখা যায়, চণ্ডী কাটিয়া আণ্ডী করিবার প্রবাদ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। একটি শব্দ বিভিন্ন ভাষায় তেজস্তিমিরবৎ পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন মামী শব্দ বাঙ্গালাভাষায় মাতুলানী অর্থে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু প্রাচীন দেশ্য প্রাকৃতে ইহার অর্থ "সখী"। যথা—"কৈঅবরহিতং পিম্মং নচ্চিচ্চিঅ মামি? মানসে লোএ অহ পিম্মং কোবিরহো কোজী এই" (সিদ্ধহৈম) ইহার অর্থঃ—হে সখী! কৈতব (ছল) রহিত প্রেম মনুষ্য লোকে নাই, যদি সেই অকপট প্রেম কখনও ঘটে, তবে বিরহ হয় না, যদি তাহাতেও বিরহ ঘটে, তবে কে বাঁচে? অর্থাৎ প্রেমিক মরিয়া যায়। (ক্রমশঃ)

বিংশ কল্প
প্রথম ভাগ
কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০।

৯১৫ সংখ্যা — ১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

৺আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিসভায় প্রার্থনা।

পরম ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিসভায় শ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার সারাংশ :—

আমার প্রিয় সুহৃৎ পরম ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, যিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেরুদণ্ড ছিলেন—যাঁর উপদেশ ও দৃষ্টান্তে কতশত যুবক ধর্ম্মপ্রাণে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই সমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—হায় তিনি আর নাই। আমি যেন তাঁকে সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে সে দিন তাঁর প্রেমোজ্জ্বল সহাস্য বদন দেখেছি—তাঁর সরল সরস মধুরালাপে মুগ্ধ হয়েছি আর এর মধ্যে তিনি কোথায় চলে গেলেন—আমাদের সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি সেই পুণ্যধামে প্রস্থান করেছেন যেখান থেকে পথিক আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। আমরা তাঁর অকাল মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁর আত্মার কল্যাণ ও শান্তি কামনা করে ভগবান্‌কে ডাকছি—বিনীত ভাবে তাঁর নিকট প্রার্থনা করছি যে 'হে বিশ্ববিধাতা জগৎপিতা তুমি সেই পুণ্যাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণবিধান কর—তাঁর বিয়োগে যাঁরা শোকসন্তপ্ত, তোমার মধুর সান্ত্বনাবাক্যে তাঁদের শোকতাপ হরণ কর; তাঁর পবিত্র চরিত্রের উচ্চ আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধারণ কর—তাঁর সেই অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, তাঁর অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তাঁর আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতা, স্বদেশপ্রেম, ধর্ম্মভীরুতা ও ভগবদ্ভক্তি এই সমস্ত দৈব সম্পদ যেন আমাদের জীবনপথের পাথেয় হয়। হে দেব, হে পিতা যিনি তোমার চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন—তোমার কার্য্যে সমুদয় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন—যিনি তোমার প্রিয় কার্য্যসাধনে কোন কষ্টকে কষ্ট বোধ করেন নি, কোন ক্ষতিকে ক্ষতি বলে গ্রাহ্য করেন নি, লোকের গ্লানি নিন্দা উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করেছেন, যিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশ বিদেশে তোমার নাম প্রচার করে ধন্য হয়েছেন তিনি এক্ষণে ভয় হতে অভয়দ্বারে, মৃত্যু হতে অমৃতনিকেতনে গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তাঁকে তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়ে তাঁর দুঃখতাপ দূর কর—তাঁর আত্মার শান্তি রক্ষা কর এই আমাদের প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর—এই সকল সাধু পুরুষদের দৃষ্টান্তে আমরা যেন দিন দিন তোমার নিকটবর্ত্তী হতে পারি, তোমার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস যেন কখনই শিথিল না হয়। তুমি আমাদিগকে সংসারের সম্পদ প্রেরণ কর আর বিপদেই আবৃত কর, তোমার দক্ষিণ মুখ—তোমার প্রেমদৃষ্টি যেন জীবনে মরণে সকল সময়ে আমাদের হৃদয়কে প্রফুল্ল ও উন্নত করে রাখে। দেখ, বলতে বলতে এই বিশ্বেশ্বরের হস্ত হতে অমৃত বর্ষণ হচ্ছে।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বী র্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ
মধু নক্তমুতোষসোঃ
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতিঃ
মধুমানস্তু সূর্য্যঃ
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ

বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করিতেছে—ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান হউক—গো সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক, রাত্রি মধু হউক—উষা মধু হউক—দ্যুলোক, ভূলোক ও সূর্য্য মধুময় হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ—

আমাদের সেই প্রেমাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর জীবনের কার্য্য সমাধান করে নুতন অজানার দেশে প্রস্থান করেছেন,—যেখান হতে সকল পাপ্মা প্রতিনিবৃত্ত হয়, অন্ধ যে সে অনন্ধ হয়, যে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়—রাত্রি দিবসের ন্যায় আলোকিত, সেই সকৃদ্বিভাসিত ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মলোক।

নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ
ন জরা ন মৃত্যু র্ন শোকঃ ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং
সর্ব্বে পাপ্মানো ইতো নিবর্ত্তন্তে
অপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ

তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বা
অন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি—
বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবতি
উপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি
তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বা নক্তমহরেবাভি-
নিস্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ

ইহাই সকৃৎ বিভাসিত ব্রহ্মলোক—হে বন্ধুগণ! ভক্তেরা যার জন্য ব্যাকুলচিত্তে প্রতীক্ষা করছেন এই সেই ব্রহ্মলোক! আমরা কেনই বা শোক করব—যাঁর বিচ্ছেদে আমরা বিলাপ করছি তিনি সেই পুণ্যলোকে প্রস্থান করেছেন।

৺আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পরলোকগত আচার্য্য আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন, কাজেই তিনি আমার পিতৃস্থানীয় ছিলেন। আমিও তাঁহাকে সেই চক্ষেই দেখিতাম। যৌবনে তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থসকল পাঠ করিয়া অনেক উপকার পাইয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার সহিত যখন মিশিতাম, তখন তিনি আমাকে এমন সরলভাবে গ্রহণ করিতেন, আমার সহিত সমবয়স্কের ন্যায় এমন সহজভাবে মিশিতেন যে, বয়সের বিদ্যার আধ্যাত্মিকতার তারতম্যজনিত যে একটা "সম্ভ্রম" ভাব থাকা দরকার, সে ভাবটা থাকিত না, থাকিতে পারিত না। যুবকদিগেয় সহিত এইভাবে মিশিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লওয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আমি তিনটী লোকে দেখিয়াছি—ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু, পরম শ্রদ্ধাভাজন ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী। ঋষি রাজনারায়ণ বসুর এই গুণটী কি পরিমাণে ছিল, তাহা আমার মুখে ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই; ভাই প্রতাপচন্দ্রের এই গুণ ছিল বলিয়াই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদিগের মিলনস্থল Calcutta University Institute এর অন্যতর প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারিয়াছিলেন; আর আচার্য্য শাস্ত্রীমহাশয়ের এই গুণ ছিল বলিয়াই যুবকবহুল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত নিজের দিকে টানিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন এবং সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই সাধনাশ্রমেই তাঁহার মনের ছায়া সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধন এই সাধনাশ্রমে তিনি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন বলিলেও চলে। ব্রাহ্মদিগকে ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন করাইবার দিকেই বোধ হয় যেন তাঁহার একটু বেশী ঝোঁক ছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে প্রিয়কার্য্যসাধনে মনোযোগ না দিলে ঈশ্বরপ্রীতি সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইবার অবসর পায় না।

তাঁহার জীবনের শেষভাগে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উপাসনার ভাব কমিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলেন। আমার সঙ্গে

ইদানীং যখনই তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, তখনই তিনি এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিজের গৃহে তিনি নিত্য উপাসনার পূর্ব্বে কাহাকেও জলস্পর্শ করিতে দিতেন না। আজকাল অনেক ব্রাহ্মের গৃহে উপাসনা অনাবশ্যক, কতকগুলি বিদেশী পণ্ডিতের এই মত খুব আদরের সহিত গৃহীত হয়। অনেক ব্রাহ্মেরই ছেলেপিলেরা সপ্তাহে একবার ব্রহ্মমন্দিরে যান কি না সন্দেহ—সে দিন তাঁহাদের গৃহে বন্ধুসমাগমের বড়ই ধুম পড়িয়া যায়,—গৃহে তো উপাসনার নামগন্ধও করেন না। যাঁহারা উপাসনার প্রয়োজন স্বীকার করেন না, তাঁহারা উপাসনার প্রকৃত তত্ত্বই জানেন না। এই উপাসনার অভাবের কারণে ব্রাহ্মসমাজ অবনতির দিকে দ্রুতপদে নামিয়া চলিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগঠনে যিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, এই উপাসনার অভাব এবং সেই কারণে ব্রাহ্মসমাজের অবনতি দেখিলে তাঁহার প্রাণে যে অত্যন্ত ব্যথা লাগিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

যাঁহারা উপাসনার প্রয়োজন অস্বীকার করেন, তাঁহাদের একটা প্রধান আপত্তি এই যে নিত্য উপাসনায় তাঁহারা নিত্য সরসতা অনুভব করেন না। এই আপত্তির উত্তরে শাস্ত্রীমহাশয় দার্জ্জিলিঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে একটী সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন। সেই কথাটী আজ কয়েক মাস হইল তিনি আমার কাছেও পুনরুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—পশ্চিমাঞ্চলে অনেক নদীর গর্ভ গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায় এবং সেই গর্ভ দিয়া কোথাও জলের ক্ষীণ স্রোত চলিতে থাকে এবং কোথাও বা কোন স্রোতই দেখা যায় না। এখন যদি এতটা জমী নষ্ট হইতেছে দেখিয়া কেহ মনে করেন যে সেই নদীগর্ভ পতিত রাখা আবশ্যক নাই এবং ইহা ভাবিয়া সেই নদীগর্ভ বুজাইয়া লয়েন, তাহা হইলে বর্ষা নামিলে সে জল বহিবার উপযুক্ত পথ না পাইয়া নগরপল্লী যে ভাসাইয়া দিবে, তাহাতে কতনা অনিষ্টের সম্ভাবনা। সেইরূপ যদি এখন হৃদয়ে সরস ভাব উঠিতেছে না বলিয়া উপাসনা দ্বারা হৃদয় নদীর পথ ঠিক করিয়া না রাখা যায়, তাহা হইলে সময়ে যখন ভগবানের করুণাধারার বর্ষা নামিবে, তখন সে বেগ সামলানো দুরূহ হইবে—সংসারের মঙ্গলভাব সকল কোথায় যে সেই বেগে ভাসিয়া যাইবে তাহার ঠিকানাই থাকিবে না। তিনি এই ভাবের উপরে দাঁড়াইয়াই গৃহে সমস্ত কর্ম্মের বাধা সত্ত্বেও উপাসনা কিছুতেই বন্ধ হইতে দেন নাই, এই কথা আমি তাঁর নিজমুখে শুনিয়াছি। কথাটা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে—এই কথাটী বর্ত্তমান কালের বড়ই উপযোগী। এই কথাটী পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের নিকট বলাতে তাহার উত্তরে তিনি শাস্ত্রীমহাশয়কে আলিঙ্গন প্রদান করিয়াছিলেন।

জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি মহর্ষিদেবের প্রচার-প্রণালী ভারতের পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাহার উপযোগিতাবিষয়ে এক্ষণে আলোচনা করিতেছি না, কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় আমার নিকট এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম মাত্র। ইদানীং তিনি বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে পাঠাদি করিতেন, একদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে 'আমরা কি ভুলই করিয়াছি—আমি যতই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করি, ততই তাহাতে গভীর হইতে গভীরতর সত্য লাভ করিতে থাকি। আমার বিশ্বাস যে এই প্রকার উপনিষদাদির ভিতর দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার না করিলে ভারতের হৃদয়ের মধ্যে ইহা প্রবেশ করিবে না।' জীবনের শেষাশেষি তাঁহার মনে কিরূপ ভাব কার্য্য করিতেছিল, তাহা এই উক্তি হইতেই সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি শেষজীবনে উপনিষদের সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম প্রভৃতি প্রাণপ্রদ মন্ত্রের বিশেষভাবে সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, একথা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। এ বিষয়ে মহর্ষিদেবের একটী কথা তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। মহর্ষিদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা কি রকম করে' সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম মন্ত্রটী পাঠ কর, তাহাতে হৃদয় খোলে না; কিন্তু যথাযথ বৈদিক সুরে ঐটী আবৃত্তি করিলে আমি উহাতে ভাবের অন্ত পাই না; যতই ডুবি, ততই ডুবিতে ইচ্ছা হয়।"

তাঁর হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতি উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট

হইয়াছিল বলিয়াই স্বদেশভক্তিও তাঁহার হৃদয়কে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল। শাস্ত্রীমহাশয়ের এই স্বদেশভক্তির কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমরা তখন বিদ্যালয়ে পড়ি—যখন কি একটা আইন বিষয়ে বড়ই আন্দোলন হয়। উক্ত আইন সংক্রান্ত গবর্ণমেন্টের কোন একটি কার্য্য স্বদেশের অনিষ্টকর বলিয়া তদানীন্তন স্বদেশনেতাগণের নিকট উপলব্ধি হইয়াছিল। তাই সেই সকল নেতৃবর্গ আমাদের বাড়ীতে যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দেশভক্ত দুর্গামোহন দাস, প্রাতঃস্মরণীয় আনন্দমোহন বসু এবং আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী এই তিনজনকে, অগ্রণীরূপে দেখিয়াছিলাম বেশ মনে পড়ে। তখন রাত্রি প্রায় ১০॥ টা। আমরা পাঠ সমাপন করিয়া ঘুমাইতে যাইবার জোগাড় করিতেছিলাম। এমন সময়ে তাঁহারা উপস্থিত। পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তদানীন্তন ব্রাহ্মসাধারণেরই "বড়দা" ছিলেন। দুর্গামোহন বসু প্রভৃতি বাটীতে পদার্পণ করিতে না করিতেই যে প্রাণস্পর্শী সুরে চীৎকার করিতে করিতে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন—'বড়দা—বড়দা—সর্ব্বনাশ হয়েছে'—সে সুর আজও আমার কানে বাজিতেছে। তাঁহাদের দেশভক্তিতে উজ্জ্বল সে মুখশ্রীও আমার চক্ষের সম্মুখে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আর শাস্ত্রীমহাশয়ের গ্রন্থসমূহে তো দেশভক্তির পরিচয় প্রতিপদেই পাওয়া যায়।

এখন আমি অন্তরের সঙ্গে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, আমরা যেন শাস্ত্রীমহাশয়ের পবিত্র স্মৃতি অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিসাধনের জন্য হৃদয়ে ইচ্ছা পোষণ করি এবং শক্তি সঞ্চয় করি। এইরূপ করিলেই পরলোকগত মহাত্মার যথার্থ তৃপ্তি সাধন হইবে। ভগবান আমাদের এই সদিচ্ছায় সহায় হউন। সমস্ত জগত মধুময় হউক। ব্রাহ্মসমাজ বিদ্যা ও ধর্ম্মে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

ব্রহ্ম আত্মস্বরূপী—ইহা নির্ণয় হইল। কিন্তু আত্মা চিদ্রূপী বলিয়া ব্রহ্মও চিদ্রূপী, এরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। তাই, এখানে ব্রহ্মের ও সেই সঙ্গে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি, ইহার আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আত্মার সান্নিধ্যে জড়াত্মক বুদ্ধিতে উৎপন্ন ধর্ম্মকে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান বলে। কিন্তু যেহেতু বুদ্ধির এই ধর্ম্ম আত্মার উপর চাপানো উচিত নহে, অতএব তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আত্মার মূল স্বরূপকেও নির্গুণ ও অজ্ঞেয় বলিয়াই মানিতে হইবে। তাই কাহারও কাহারও মত এই যে, ব্রহ্ম আত্মস্বরূপী হইলেও এই উভয়কে কিংবা ইহাদের মধ্যে কোন একটিকে চিদ্রূপী বলা কিয়দংশে গৌণ। কেবল চিদ্রূপসম্বন্ধেই এই আপত্তি নহে; কিন্তু 'সৎ' এই বিশেষণও পরব্রহ্মের উপর চাপানো ঠিক নহে ইহাও ঐ সঙ্গে স্বতঃই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, সৎ ও অসৎ এই দুই ধর্ম্ম পরস্পর-বিরুদ্ধ ও নিয়ত পরস্পরসাপেক্ষ অর্থাৎ দুই বিভিন্ন বস্তুর উদ্দেশেই বলা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আলোক কখনই দেখে নাই, সে আঁধারের কল্পনা করিতে পারে না; শুধু তাহাই নহে, আলো ও আঁধার এই দুটি শব্দের দ্বন্দ্বও সে বুঝিতে পারিবে না। সৎ ও অসৎ এই শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্বসম্বন্ধে এই ন্যায়ই উপযোগী। কোন কোন বস্তুর নাশ হইয়া থাকে ইহা আমাদের উপলব্ধি হইলে, আমরা সমস্ত বস্তুর অসৎ (নশ্বর) ও সৎ (অবিনশ্বর) এই দুই বর্গ নির্দ্দেশ করিয়া থাকি; কিংবা সৎ ও অসৎ এই দুই শব্দ বুঝিতে হইলে মনুষ্যের দৃষ্টির সম্মুখে দুই প্রকারের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আসা আবশ্যক। কিন্তু মূলারম্ভে যদি একই বস্তু ছিল, তবে দ্বৈত উৎপন্ন হইলে পর দুই বস্তুকে উদ্দেশ করিয়া যে সাপেক্ষ সৎ ও অসৎ এই দুই শব্দের প্রচার হইয়াছে, এই মূল বস্তুতে উহাদের কিরূপে প্রয়োগ করা যাইবে? কারণ, ইহাকে সৎ বলিলে সেই সময়ে তাহার জুড়ীর কোন অসৎ ছিল কি না এই সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই পরব্রহ্মের কোন বিশেষণ না দিয়াই "জগতের আরম্ভে সৎও ছিল না অসৎও ছিল না, যাহা কিছু ছিল তাহা একই ছিল", ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে জগতের মূলতত্ত্বের এইরূপ বর্ণনা আছে (ঋ. ১০. ১২৯)। সৎ ও অসৎ এই দুই শব্দের যুগল (কিংবা দ্বন্দ্ব) পরে বাহির হইয়াছে; এবং সৎ ও অসৎ, শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব হইতে যাহার বুদ্ধি মুক্ত হইয়াছে সে এই সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্ব ব্রহ্মপদে উপনীত হয় এইরূপ গীতাতে উক্ত হইয়াছে (গী. ৭. ২৮; ২. ৪৫)। অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিচার কিরূপ গভীর ও সূক্ষ্ম তাহা ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে। কেবল তর্কদৃষ্টিতে বিচার করিলে, পরব্রহ্মের কিংবা আত্মারও অজ্ঞেয়ত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু ব্রহ্ম এইরূপ অজ্ঞেয় ও নির্গুণ অতএব ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও ইহা প্রতীতি হইতে পারে

যে, প্রত্যেক মনুষ্য নিজ নিজ আত্মার সাক্ষাৎ প্রতীতি হওয়ায়, আবার নির্গুণ ও অনির্ব্বাচ্য আত্মার যে স্বরূপ সাক্ষাৎকারে আমি জানিতে পারি তাহাই পর-ব্রহ্মেরও স্বরূপ সেইজন্য ব্রহ্ম ও আত্মা একস্বরূপী, এই সিদ্ধান্ত নিরর্থক হইতে পারে না। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, "ব্রহ্ম আত্মস্বরূপী" ইহা অপেক্ষা ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা যাইতে পারে না; অবশিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে স্বানুভূতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু বুদ্ধিগম্য শাস্ত্রীয় প্রতিপাদনে যতদূর সম্ভব শব্দের দ্বারা খোলসা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তাই, ব্রহ্ম সর্বত্র সমান ব্যাপ্ত, অজ্ঞেয় ও অনির্ব্বাচ্য হইলেও জড়জগতের ও আত্মস্বরূপী ব্রহ্মতত্ত্বের ভেদ ব্যক্ত করিবার জন্য আত্মার সন্নিধানে জড়প্রকৃতিতে চৈতন্যরূপী যে গুণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহাকেই আত্মার প্রধান লক্ষণ মানিয়া, অধ্যাত্মশাস্ত্র আত্মা ও ব্রহ্ম দুইকেই চিদ্রূপী কিংবা চৈতন্যরূপী বলিয়া থাকে। কারণ, সেরূপ না করিলে আত্মা ও ব্রহ্ম দুই-ই নির্গুণ, নিরঞ্জন ও অনির্ব্বাচ্য হওয়ায় তাহাদের স্বরূপ বর্ণন একেবারেই বন্ধ করিতে হয়; কিংবা শব্দের দ্বারা কোন কিছু বর্ণনা করিতে হইলে "নেতি নেতি"। "এতস্মাদন্যৎপরমস্তি।"—ইহা নহে, ইহা (ব্রহ্ম) নহে, (ইহা নামরূপ), প্রকৃত ব্রহ্ম ইহার অতীত আর কিছু—এইরূপ নিয়ত "না"-"না"-ধারা পাঠের ন্যায় আবৃত্তি করিতে থাকা ভিন্ন আর উপায় নাই (বৃ· ২. ৩. ৬)। তাই, চিৎ (জ্ঞান), সৎ (সত্তামাত্রত্ব কিংবা অস্তিত্ব) ও আনন্দ—সাধারণত ব্রহ্মস্বরূপের এই লক্ষণ-গুলি বলিতে পারা যায়। এই লক্ষণগুলি অন্য সমস্ত লক্ষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহাতে সংশয় নাই। তথাপি শব্দের দ্বারা যতদূর হইতে পারে ব্রহ্মের স্বরূপ জানাইবার জন্য এই লক্ষণগুলি কথিত হইয়াছে; প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ নির্গুণ হওয়ায় তাহার জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহার অপরোক্ষ অনুভূতি আবশ্যক হয়, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এই অনুভূতি কিরূপে আসিতে পারে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত অতএব অনির্বাচ্য ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের কিরূপে ও কখন্ অনুভবে আইসে, আমাদের শাস্ত্রকারেরা ইহার যে বিচার করিয়াছেন তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে বলিব।

ব্রহ্ম ও আত্মা এক—এই সমীকরণকেই মারাঠীতে "যাহা পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে" এইরূপ বলা হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাত্মৈক্য অনুভূতিতে আসিলে পর জ্ঞাতা অর্থাৎ দ্রষ্টা আত্মা পৃথক্ এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু ভিন্ন, এই ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহার নেত্রাদি ইন্দ্রিয় যদি তাহা হইতে বিচ্যুত না হয়, তবে ইন্দ্রিয় ভিন্ন ও ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় ভিন্ন—এই ভেদ কি করিয়া চলিয়া যাইবে? এবং এই ভেদ না চলিয়া গেলে ব্রহ্মাত্মৈক্যের অনুভূতি কি করিয়া ঘটিবে? এইরূপ এক সংশয় আসিতে পারে। কেবল ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতেই বিচার করিলে এই সংশয় সম্পূর্ণ অসঙ্গতও মনে হয় না। কিন্তু একটু তলাইয়া বিচার করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্রিয়-গণ বাহ্য বিষয় দেখিবার কাজটা কেবল আপনা হইতেই করে এরূপ নহে। "চক্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি মনসা ন তু চক্ষুষা" (মভা. শাং· ৩১১· ১৭) যে কোন বস্তু দেখিতে হইলে (এবং শুনিতে হইলে) নেত্রের (ও কান প্রভৃতির) মনের সাহায্য আবশ্যক হয়; মন শূন্য থাকিলে অন্য কোন বিষয়ে ডুবিয়া থাকিলে, বস্তু চোখের সম্মুখে থাকিলেও দেখা যায় না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহা সহজে অনুমান করা যায় যে, নেত্রাদি ইন্দ্রিয় ঠিক্ থাকিলেও মনকে যদি তাহা হইতে বাহির করিয়া আনা যায়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বিষয়ের দ্বন্দ্ব বাহ্য জগতে থাকিলেও আমাদিগের নিকট না থাকিবার মতনই হয়। পরিণামে মন কেবল আত্মাতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপী ব্রহ্মেতেই রত হওয়ায় আমাদিগের ব্রহ্মাত্মৈক্যের সাক্ষাৎ-কার হয়। ধ্যানের দ্বারা, সমাধির দ্বারা, একান্ত উপাসনার দ্বারা, কিংবা অত্যন্ত ব্রহ্মবিচারান্তে শেষে এই মান-সিক অবস্থা যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, দৃশ্য জগতের দ্বন্দ্ব বা ভেদ তাহার নেত্রসম্মুখে থাকিলেও না থাকিবার মতই হয়; এবং পরে স্বতই তাহার অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপের পূর্ণ সাক্ষাৎকার হয়। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের শেষে এই যে নিত্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থার মধ্যে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনপ্রকারের ভেদ অর্থাৎ ত্রিপুটী অবশিষ্ট থাকে না, কিংবা উপাস্য ও উপাসক এই দ্বৈতভাবও থাকে না। তাই, এই অবস্থার কথা অন্য কাহাকে বুঝাইতে পারা যায় না। কারণ 'অন্য' এই শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র এই অবস্থা বিঘটিত হয় এবং মনুষ্য অদ্বৈত হইতে দ্বৈতে আসিয়া পড়ে, ইহা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। অধিক কি, এই অবস্থা আমি নিজে উপলব্ধি করিয়াছি, ইহা বলাও মুস্কিল! কারণ, 'আমি' বলিলেই অন্য হইতে ভিন্ন এই ভাবন মনে আসে এবং ব্রহ্মাত্মৈক্য হইবার পক্ষে উহা সম্পূর্ণ বাধক হয়। এই কারণে "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি…জিঘ্রতি…শৃণোতি…বিজানাতি।…যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ…জিঘ্রেৎ… শৃণুয়াৎ … বিজানীয়াৎ। … বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ। এতাবদরে খলু অমৃতত্বমিতি।"—দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য পদার্থ এই দ্বৈত যে পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় সে পর্য্যন্ত এক আর একজনকে দেখে, আঘ্রাণ করে, শ্রবণ করে,

এবং জানে; কিন্তু সমস্ত যখন আত্মময় হইয়া যায় (অর্থাৎ আত্ম-পর ভেদই থাকে না) তখন কে কাহাকে দেখিবে, আঘ্রাণ করিবে, শুনিবে বা জানিবে! ওরে! যে স্বয়ং জ্ঞাতা তাহার জ্ঞাতা আর কোথা হইতে আসিবে!—যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে এই চরম ও পরম অবস্থার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (বৃ. ৪. ৫. ১৫; ৪. ৩. ২৭)। এইরূপ সমস্তই আত্মভূত কিংবা ব্রহ্মভূত হইলে পর, সে অবস্থায় ভীতি, শোক কিংবা সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বও থাকিতে পারে না (ঈশ. ৭)। কারণ, যাহার ভয় হইবে, কিংবা যাহার জন্য শোক হইবে, তাহার আপনা হইতে—আমা হইতে—ভিন্ন হওয়া চাই এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যের অনুভূতি আসিলে পর এইপ্রকার ভিন্নতার কোন অবকাশ থাকে না। এই দুঃখশোক-বিরহিত অবস্থাকেই 'আনন্দময়' এই নাম দিয়া এই আনন্দই ব্রহ্ম এইরূপ তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (তৈ. ২. ৮; ৩. ৬)। কিন্তু এই বর্ণনাও গৌণ। কারণ, আনন্দের অনুভবকারী এখন থাকে কোথায়? তাই, লৌকিক আনন্দ হইতে আত্মানন্দ কিছু বিশেষ প্রকারের, এইরূপ বৃহদারণ্যকে কথিত হইয়াছে (বৃ. ৪. ৩. ৩২)। ব্রহ্মবর্ণনায় যে 'আনন্দ' শব্দ প্রযুক্ত হয় সেই শব্দের গৌণত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই অন্য স্থানে 'আনন্দ' শব্দ ছাঁকিয়া ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের শেষ বর্ণনা এইমাত্র করা হয় যে, "ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ" (বৃ. ৪. ৪. ২৫) কিংবা "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুং ৩. ২. ৯)—যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্ম হইয়া যায়। এই অবস্থার এইরূপ দৃষ্টান্ত উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে (বৃ. ২. ৪. ১২; ছাং, ৬. ১৩)—লবণখণ্ড জলের মধ্যে মিশিয়া গেলে, সেই জলের মধ্যে অমুক ভাগ লবণাক্ত এবং অমুক ভাগ লবণাক্ত নহে এইরূপ ভেদ যেমন থাকে না, তেমনি ব্রহ্মাত্মৈক্যের জ্ঞান হইলে পর সমস্ত ব্রহ্মময় হইয়া যায়। কিন্তু "অযাচী বদে নিত্য বেদান্ত বাণী"—যিনি বলেন নিত্য বেদান্তের বাণী—সেই তুকারাম বাবা এই লবণাক্ত দৃষ্টান্তের বদলে—

গোড়পণে জৈসা গুড। তৈসা দেব ঝালা সকল॥
আতাঁ ভজো কোণেপরী। দেব সবাহ্য অন্তরী॥

অর্থাৎ—"গুড়ের মধ্যে যেরূপ মিষ্টতা, সেইরূপ সমস্তের মধ্যেই ভগবান, এখন যে রকমেই ভজনা কর—ভগবান বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন"—এইরূপ গুড়ের মিষ্টতার দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজের অনুভূতির বর্ণনা করিয়াছেন (তু, গা, ৩৬২৭)। পরব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও মনেরও অগম্য হইলেও তিনি স্বানুভবগম্য এইরূপ যে বলা হয় তাহার তাৎপর্য্যই এই। পরব্রহ্মের যে অজ্ঞেয়তা বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈতী অবস্থাসম্বন্ধীয়, অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারের অবস্থা সম্বন্ধীয় নহে। আমি ভিন্ন এবং জগৎ ভিন্ন এই বুদ্ধি যে পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, সে পর্য্যন্ত যাহাই কর না কেন ব্রহ্মাত্মৈক্যের সম্পূর্ণ-জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু নদী সমুদ্র হইতে না পারিলেও সমুদ্রে পড়িয়া তাহার যেরূপ সমুদ্র রূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মের মধ্যে ডুব দিলে তাহার অনুভব মনুষ্যের হইয়া থাকে; এবং তাহার পর, "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" (গী. ৬. ২৯) সমস্ত ভূত আপনাতে এবং আপনি সর্ব্বভূতে—এইরূপ তাহার ব্রহ্মময় অবস্থা হইয়া পড়ে। পূর্ণ পরব্রহ্মজ্ঞান এইরূপ কেবল স্বানুভূতিকেই অবলম্বন করিয়া আছে, এই অর্থ ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং" (কেন. ২. ৩) আমি পরব্রহ্মকে জানি যাহারা বলে তাহারা তাঁহাকে জানে না এবং যাহারা বলে আমি পরব্রহ্মকে জানিনা তাহারাই তাঁহাকে জানে, কেনোপনিষদে এইরূপ অতি সুন্দর পরব্রহ্মস্বরূপের বিরোধাভাসাত্মক বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ, পরব্রহ্মকে আমি জানি এইরূপ যখন কেহ বলে, সেই সময় আমি (জ্ঞাতা) ভিন্ন, এবং আমার জানা (জ্ঞেয়) ব্রহ্ম ভিন্ন, এই দ্বৈতবুদ্ধি মনে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত তাহার ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপী অদ্বৈত অনুভব এই সময় ততটা কাঁচা কিংবা অপূর্ণই হইয়া থাকে। তাই, এইরূপ যে বলে সে প্রকৃত ব্রহ্মকে জানে না ইহা তাহার নিজের মুখেই সিদ্ধ হয়। উল্টাপক্ষে, 'আমি' ও 'ব্রহ্ম' এই দ্বৈতী ভেদ লুপ্ত হইয়া ব্রহ্মাত্মৈক্যের যখন পূর্ণ অনুভূতি আসে তখন "আমি তাহা (অর্থাৎ আমা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু) জানি" এই ভাষা তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। তাই, এই অবস্থায়, অর্থাৎ আমি ব্রহ্মকে জানি ইহা বলিতে যখন কোন জ্ঞানী মনুষ্য অসমর্থ হয়, তখন সে ব্রহ্মকে জানিয়াছে এইরূপ বলা হইয়া থাকে। দ্বৈতীভাবের এইরূপ সম্পূর্ণ লোপ হইয়া আত্মার সমস্তই ব্রহ্মেতে রঞ্জিত হওয়া, লয় পাওয়া, নিঃশেষে মিশাইয়া যাওয়া, মাখামাখি হওয়া, 'মরিয়া' যাওয়া সাধারণতঃ দুষ্কর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে এই 'নির্ব্বাণ' অবস্থা দুর্ঘট মনে হইলেও, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনুষ্যের শেষে সাধ্য হইতে পারে এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা অনুভবের দ্বারা স্থির করিয়াছেন। আমিত্বের দ্বৈতভাব এই অবস্থাতে নাশ কিংবা লোপ পায় বলিয়া আত্মনাশের এই এক প্রকারভেদ, এইরূপ কেহ কেহ সন্দেহ করেন। কিন্তু এই অবস্থা অনুভূতিতে উপলব্ধি করিবার সময় উহার বর্ণনা করা যাইতে পারে না; তবে পরে তাহার স্মরণ হইতে পারে, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ত

সন্দেহ নির্ম্মূল হয় * ইহা অপেক্ষাও বলবত্তর প্রমাণ সাধুসন্তদিগের অনুভূতি। পূর্ব্বেকার সিদ্ধপুরুষদের অনুভূতির বর্ণনা রাখিয়া দেও; কিন্তু নিতান্ত আধুনিক ভগবদ্ভক্ত শিরোমণি তুকারাম বাবাও—

"আছুলেঁ মরণ পাহিলেঁ মাঁ ডোলাঁ। তো ঝালা সোহলা অনুপম।" অর্থাৎ নিজের মরণ নিজের চোখে দেখেছি, সে এক অনুপম উৎসব, এইরূপ আলঙ্কারিক ভাষায় এই পরম অবস্থার বেশ চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন (গা. ৩৫৮৯)। ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে ধ্যানের দ্বারা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে উপাসক শেষে "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃ. ১. ৪. ১০)—আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়; তাহার এই ব্রহ্মাত্মৈক্য অবস্থায় সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। তাহার পর তাঁহার মধ্যে সে এরূপ নিমজ্জিত হয় যে, আমি কি অবস্থাতে আছি, অথবা কাহার অনুভব করিতেছি, সেদিকে তাহার লক্ষ্যই যায় না। এই অবস্থায় জাগরণ বজায় থাকায় এই অবস্থাকে স্বপ্ন কিংবা সুষুপ্তি অর্থাৎ নিদ্রা বলিতে পারা যায় না; যদি জাগৃতি বল, তবে জাগ্রত অবস্থাতে সাধারণত যে সমস্ত ব্যবহার উৎপন্ন হয় সে সমস্ত বন্ধ থাকে। তাই স্বপ্ন, সুষুপ্তি, (নিদ্রা) কিংবা জাগরণ, এই তিন ব্যবহারিক অবস্থা হইতে ভিন্ন ইহা এক চতুর্থ কিংবা তুরীয় অবস্থা এইরূপ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে, নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ যাহাতে দ্বৈতের কিঞ্চিন্মাত্রও স্পর্শ নাই এইরূপ সমাধিযোগে প্রবৃত্ত করানোই পাতঞ্জল যোগদৃষ্টিতে মুখ্য সাধন। এবং এই কারণেই গীতাতে এই নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগ অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করিতে মনুষ্য যেন অবহেলা না করে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী. ৬.২০-২৩)। এই ব্রহ্মাত্মৈক্য অবস্থাই জ্ঞানের পূর্ণ অবস্থা। কারণ, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মরূপ অর্থাৎ একই হইয়া গেলে "অবিভক্তং বিভক্তেষু"—অনেকের একত্ব করা চাই গীতার জ্ঞানক্রিয়ার এই লক্ষণের পূর্ণতা হয়, এবং ইহার পর কাহারও অধিক জ্ঞান হইতে পারে না। সেইরূপ আবার, নামরূপের অতীত এই অমৃতত্বের অনুভব আসিলে পর, জন্মমরণের আবৃত্তিও মানুষের আপনা-আপনিই চুকিয়া যায়। কারণ, জন্মমরণ তো নামরূপেতেই আছে এবং ইহা তাহার অতীত। (গী. ৮. ২১)। তুকারাম এইজন্য এই অবস্থাকে 'মরণের মরণ' এই নাম দিয়াছেন (গী. ৩৫৮৯)। এবং যাজ্ঞবল্ক্য এই অবস্থাকে অমৃতত্বের সীমা বা পরাকাষ্ঠা বলিয়াছেন। ইহাই জীবন্মুক্তাবস্থা। এই অবস্থায় আকাশগমনাদি কতকগুলি অপূর্ব্ব ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভ হয় এইরূপ পাতঞ্জল যোগসূত্রে এবং অন্যত্রও বর্ণিত আছে (পাতঞ্জল সূ. ৩. ১৬-৫৫); এবং এইজন্য কাহারও কাহারও যোগাভ্যাসের সখ হইয়া থাকে। কিন্তু যোগবাসিষ্ঠকারের উক্তি অনুসারে আকাশগমনাদি সিদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থার সাধ্য বা অংশ নহে; জীবন্মুক্ত পুরুষ এই সিদ্ধিলাভ করিবার উদ্যোগ করেন না এবং অনেক সময় তাঁহার এই সিদ্ধি দেখাও যায় না (যো. ৫. ৮৯)। তাই, শুধু যোগবাসিষ্ঠে নহে, গীতাতেও এই সিদ্ধির কোন উল্লেখ নাই। ইহা চমৎকার মায়ার খেলা, ব্রহ্মবিদ্যা নহে, এইরূপ বসিষ্ঠ রামকে স্পষ্ট বলিয়াছেন। উহা কদাচিৎ সত্য হয়, সত্য হইবে না এইরূপ আমরা বলি না। যাহা হোক উহা ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় নহে এইটুকু নির্ব্বিবাদ। তাই এই সিদ্ধি লাভ হউক বা না হউক, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কিংবা তাহার ইচ্ছা বা আশাও না রাখিয়া সর্ব্বভূতের মধ্যে এক আত্মা উপলব্ধি করা, ব্রহ্মনিষ্ঠের এই পরম অবস্থা আমাদের যে প্রকারে লাভ হইতে পারে তৎপক্ষেই মনুষ্যের চেষ্টা ও প্রযত্ন করা চাই, অলৌকিক সিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা করিবে না, ইহাই ব্রহ্মবিদ্যাশাস্ত্রের উক্তি। ব্রহ্মজ্ঞানই আত্মার শুদ্ধাবস্থা, জাদু অথবা ধোঁকা লাগাইবার কেরামতী ব্যাপার নহে। এই কারণে উক্ত চমৎকার শক্তির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্যের বৃদ্ধি হয় না শুধু নহে, ব্রহ্মবিদ্যার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উক্ত আশ্চর্য্য শক্তি প্রমাণও হইতে পারে না। পক্ষীর ন্যায় এক্ষণে মানুষও বিমানে করিয়া আকাশে উড়িয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া সেই মানুষকে কেহ ব্রহ্মবেত্তার মধ্যে গণনা করে না। এমন কি, আকাশগমনাদি সিদ্ধিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি মালতীমাধব নাটকের অঘোরঘণ্টের ন্যায় ক্রূর ঘাতক পর্য্যন্ত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

---

* ধ্যানের দ্বারা ও সমাধির দ্বারা প্রাপ্ত এই অদ্বৈতের কিংবা অভেদভাবের অবস্থা nitrous oxide gas নামক একপ্রকার রাসায়নিক বায়ু আঘ্রাণ করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বায়ুকে 'লাফিং গ্যাস' বলে। *Will to Believe and Other Essays on Popular Philosophy* by William James, pp. 294, 298. কিন্তু এই অবস্থা কৃত্রিম। সমাধির দ্বারা প্রাপ্ত অবস্থা সত্য ও স্বাভাবিক। এই দুয়ের মধ্যে ইহাই গুরুতর প্রভেদ। তথাপি এই কৃত্রিম অবস্থার প্রমাণ হইতে অভেদাবস্থার অস্তিত্বপক্ষে কোন বিরোধ থাকে না, তাই এইস্থানে উহার উল্লেখ করিয়াছি।

গীতা-স্তোত্র।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।

তুমিই দেবাদিদেব, পুরুষ পুরাণ,
নিখিল বিশ্বের তুমি পরম নিধান।
সর্ব্বজ্ঞ, জানিবার বস্তু হে তুমি,
অনন্ত স্বরূপে ব্যাপ্ত স্বর্গ মর্ত্ত্যভূমি॥

নমো নমস্তেঽস্তু নমো নমস্তে॥—(ধুয়া)

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।

লোকচরাচরে তুমি পিতার সমান,
তুমি হে জগতবন্দ্য গুরু গরীয়ান।
কেহনা সমান তব, অধিক কোথায়,
তোমার মহিমাভাতি ত্রিভুবনে ভায়॥
অতএব নমি, দেব, প্রণত শরীরে,
তোমার প্রসাদ প্রভু মাগি অধ্রনীরে।
পিতা পুত্রে ক্ষমে যথা, প্রণয়ী প্রিয়ায়,
সখারে যেমতি সখা, ক্ষমগো আমায়॥

নমো নমস্তেঽস্তু নমো নমস্তে॥—(ধুয়া

মিশ্র কেদারা—ঝাঁপতাল।

সংস্কৃত।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
II সা সা। -ᵍমা -া মা। মা -া। মা -া -া I মা মা। মা গা পা। পক্ষা ধপা।
ত্ব মা ০ ০ দি দে ০ ব ০ ০ পু রু ষ ০ পু রা০ ০

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
। ᵍমা -া -া I মা -া। মা -া মগা। পা -ক্ষা। ধা পা পা I ধা পা। মা -া মা।
ণ ০ ০ ত্ব ০ ম ০ স্ত০ বি ০ শ্ব ০ স্য প র ং ০ নি

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২
। ᵍগা পা I ᵍমা -া -া I মা -া। মা -া মগা। পা ক্ষা। ধা পা পা I র্সা র্সা।
ধা ০ নম্ ০ ০ বে ০ ত্তা ০ সি বে ০ দ্যং ০ চ প র

৩ ০ ১ ২ ৩ ০ ১
। ধা র্সা র্সা। র্সর্রর্সনা র্সা। র্সা -া -া I মা মা। -া গা পা। পা -া। পা -ক্ষপা পা I
০ ০ ঞ্চ ধা০০০ ০ ম ০ ০ ত্ব য়া ০ ০ ত তং ০ বি ০ ০ শ্ব

২ ৩ ০ ১
I ধনা -র্সর্রা। র্সনর্সা ধা পা। মপমগা -মা। -ᵍমা -রা সা I
ম০ ০০ ন০০ ০ ন্ত রূ০০০ ০ ০ ০ প

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা -া। মা গা পা। পা ক্ষা। ধা পা পা I পা ক্ষা। ধা পা পা।
ন • স্বং • স মো • ত্ত • ত্ত খি • • • কঃ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা ধা। র্সা নর্সা র্সা I সা ন্া। ঋা সা সা। মা মা। মগা পক্ষা পা I
কু • তো • ক্তো লো • • • ক ত্র য়ে •• •• প্য

২´ ৩ ০ ১
I ধা পা। মা গা মা। পা মগা। মা ঋা সা I
প্র ভি • • ম প্র ভা০ • • ব

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I { সা -া। সা -া ঋা। ঋা -া। মমা ঋা মা I মা মা। গমা পা পা।
ত • স্যাং • প্র ণ • ম্য • • প্র ণি ধা০ • য়

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা -া। পা -া -া I মা পা। -া -া ধা। পা মা। মা গমা ঋা I
কা • য়ম্ • • প্র সা • • দ য়ে • ত্বা •• •

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা ঋা। মঋা মপা পা। মা ঋা। -া সা -া I } মা পা। না র্সা র্সা।
ম হ মী০ •• শ মী • • ড্যং • পি • তে • ব

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্ঋা র্সা। র্সা নর্সা র্সা I র্ঋা র্সা। না র্সা র্সা। র্সা না। র্সা র্সা -া I
পু • ত্র • স্য স খে • ব স • • খ্যুঃ •

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I সা সা। ঋা ঋা -া। মা ঋা। মা পা পপা I মা ঋা। সা সা -া।
প্রি য়ঃ প্রি য়া • য়া • • • র্হসি দে • • ব •

০ ১
। ঋা ঋা। সা সা -া I
সো • • ঢুং •

বাঙ্গালা।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা পা। না -া না। র্সা -া। র্সনা র্সা র্সা I না র্সা। র্ঋা -া র্সা।
লো • ক • চ রা • চ০ • রে তু • মি • পি

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্ঋা র্সা। র্সনা র্ঋা র্সা I র্ঋা র্ঋা। র্ঋা -া র্মা। র্ঋা র্ঋা। র্সনা র্সা র্সা I
তা র ন০ • মান্ তু মি হে • জ গ ত ব০ • ন্দ্য

২´ ৩ ১ ২´ ৩
I র্সনা র্রা। র্রা র্সা র্রা। র্সা না। র্সা -া -া I ধা ধা। পা মা ধা।
ও • • ক • র্গ রী • ম্লান্ • • কেহ • না • ন

• ১ ২´ ৩ • ১
। পা মা। মা -া মা I মা মা। মগা পা পা। পা -া। মা -া -া I
মা ন ত • ব অ ধি ক• • কো থায় • • • •

২´ ৩ ১ ২´ ৩
I সা সা। রা গা মা। পা পা। পক্ষা ধা পা I মা মা। মা গা মা।
তো মা র • ম হি মা ভা• • তি ত্রি ভু ব • নে

• ১
। রা -া। সা -া -া I
তায় • • • •

২´ ৩ ১ ২´ ৩
I সা সা। মা -া মা। রা মা। সা ৰসা সা। রা পা। পা মা ধা।
অ ত এ • ব ন মি রে • • ব প্র ণ ত • ন

• ১ ২´ ৩ • ১
। পা মা। মা -া -া I মা মা। মা গা পা। পা পা। পক্ষা ধা পা I
রী • • রে • • তো মা র • প্র সা দ প্র• • ভু

২´ ৩ ১ ২´ ৩
I মা পা। মা রা মা। রা সা। সা -া -া I } রা রা। মা -া মা।
মা গি অ • প্র মী • রে • • পি তা পু • ত্রে

• ১ ২´ ৩ • ১
। পা পা। ধা পা পা I মা পা। না পা না। র্সা -া। -া -া -া I
ক ষে ব • থা প্র ণ য়ী • প্রি য়ায় • • • •

২´ ৩ ১ ২´ ৩
I র্রা র্রা। র্রা -া র্মা। র্রা র্সা। র্সনা র্রা র্সা I র্সণা পা। মা রা মা।
স খা য়ে • যে ম তি স• • খা ক• ম গো • আ

• ১
। রা -া। সা -া -া I
মায় • • • •

(ধুয়া)—নমো নমস্তে ইত্যাদি।

কামরূপের পুরাতত্ত্ব।

(শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

(পুর্ব্বানুবৃত্তির ১৫৮ পৃষ্ঠার পর)

নিধনপুরে আবিষ্কৃত ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসনে (১) দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত তাম্র-শাসন "কর্ণসুবর্ণবাস" হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। উহাতে ভগদত্তবংশীয় কামরূপের রাজগণের যে বংশ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

পুষ্যবর্ম্মা।

সমুদ্র বর্ম্মা	দত্তদেবী
বল বর্ম্মা	রত্নদেবী
কল্যাণ বর্ম্মা	গন্ধর্ববতী
গণপতি বর্ম্মা	যজ্ঞবতী
মহেন্দ্র বর্ম্মা	সুব্রতা
নারায়ণ বর্ম্মা	দেববতী
মহাভূত বর্ম্মা	বিজ্ঞানবতী
চণ্ডমুখ বর্ম্মা	ভোগবতী
স্থিতি বর্ম্মা	নয়নদেবী
সুস্থিত বর্ম্মা (নামান্তর মৃগাঙ্ক)	শ্যামাদেবী

সুপতিষ্ঠিত বর্ম্মা ভাস্কর বর্ম্মা

ভাস্কর বর্ম্মার পরবর্ত্তী "ব্রহ্মপাল, রত্নপাল, ইন্দ্রপাল প্রভৃতি ভগদত্তবংশীয় তিনজন নরপতির (২) কামরূপে রাজত্ব করিবার বিষয় অবগত হওয়া যায়। রত্নপালের তাম্রশাসন পাঠে ভাস্কর বর্ম্মার লোকান্তরিত হইবার কিছুকাল পরে কামরূপে রাষ্ট্রবিপ্লবের একটা আভাস পাওয়া যায়। গৌহা-টীতে মহারাজ ইন্দ্রপালের আবিষ্কৃত তাম্রশাসন (Journ. A. S. B. 1897, P. 113) হইতে ইহাঁদের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই শাসন ফলকের অক্ষরাদি দৃষ্টে প্রগাঢ় প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত হর্ণলি ইহার জন্মকাল একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (J. A. S. B 1898, P. 102), তাহা হইলে মোটামুটীভাবে ধরিয়া বলা যাইতে পারে যে "ব্রহ্মপাল" ১০০০ খ্রীঃ অব্দে কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১। তাম্রশাসন—কামরূপের নরপতিগণের সর্ব্বশুদ্ধ ছয় খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, যথা—

(১) বনমাল দেবের তাম্রশাসন (J. A. S. B., Vol IX, P. 766)

(২) ইন্দ্র পালের তাম্রশাসন (J. A. S. B., Vol LXVI., P. 113)

(৩) বলবর্ম্মা দেবের তাম্রশাসন (J. A. S. B., Vol. LXI, P. 285)

(৪) রত্নপালের ১নং তাম্রশাসন (J. A. S. B., Vol. LXVII, P. 99)

(৫) রত্নপালের ২নং তাম্রশাসন (J. A. S. B., Vol. LXVII, P. 120)

(৬) বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন (Epigraphica Indica, Vol II, P. 347)

২। ইহাঁরা "শ্রীদুর্জ্জয়" নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করত রাজত্ব করিতেন।

বঙ্গের প্রচীনত্ব।

সুপ্রসিদ্ধ চৈণিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন (খ্রীঃ অঃ ৬২৯) তৎ-কালে বঙ্গ নামে কোন রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিলে তিনি অবশ্য তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া যাইতেন। "মনুসংহিতা"তে বঙ্গদেশের নামোল্লেখ নাই। গ্রীক, মুসলমান ও ইয়ুরোপীয় ঐতিহাসিক ভ্রমণকারীরা বঙ্গের নাম উল্লেখ করেন নাই। পূর্ব্বে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহানায় যে ভূখণ্ড সাগর দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল তাহাই পরবর্ত্তী কালে "বঙ্গ" নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই দেশের অধিকাংশ ভূমি * জলা ও সর্ব্বত্র জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। পুষ্করিণী অথবা কূপ খনন কালে ২৪।২৫ ফুট মৃত্তিকার নিম্নভাগে আজিও ভাঙ্গা নৌকা, গাছের গুঁড়ি প্রভৃতি পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গদেশ অত্যন্ত আধুনিক। ৩৫০ খ্রীঃ অব্দে লিখিত কালিদাসের রঘুবংশে যে বঙ্গের উল্লেখ আছে তদন্তর্গত আধুনিক পাটনা, গয়া, সাহাবাদ প্রভৃতি স্থান ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ভারত-বর্ষের যে প্রদেশ "বঙ্গ" নামে পরিচিত, তাহা হুয়েন সাঙ্গের সময়ে পাঁচটী স্বতন্ত্র দেশ বা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের নাম যথা ঃ—(১) কামরূপ রাজ্য, (২) সমতট, (৩) কর্ণ-সুবর্ণ, (৪) পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ, ও (৫) তাম্রলিপ্ত।

* সমুদ্র পশ্চিম দিক হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বে সরিয়া আসিয়াছে এবং ঐ অপসরণহেতু এ অঞ্চলের অনেক গ্রামই ক্রমে জল হইতে উত্থিত হইয়াছে—Revision of the Boundary Commissioner's Lists of villages in the Province of Bengal.

নিম্নে এই রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

১। কামরূপরাজ্য—যোগিনী তন্ত্রে এই রাজ্যের যে সীমা নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহাতে উল্লেখ আছে, "ত্রিংশ যোজনম্ বিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শত যোজনং, কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকার মুত্তমং"। যোগিনীতন্ত্রের জন্মকাল পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ১ম চন্দ্রগুপ্ত বা ১ম বিক্রমাদিত্যের পুত্র "সমুদ্রগুপ্ত" (৩) যিনি পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আসীন ছিলেন, এলাহাবাদে তদীয় প্রস্তরস্তম্ভ লিপি (Pillar stone inscription) তে কামরূপের নাম পাওয়া যায় :—সমতট, ডবাক (৪) কামরূপ, নেপাল কর্তৃপুরাদি (৫) প্রত্যন্ত নৃপতিভি মালবার্জ্জুনায়ণ যৌধেয় মাদ্রকাভির প্রার্জ্জুন সনকাকানিক কাক খরপরিকাদিভিশ্চ সর্ব্ব করদানাজ্ঞাকরণ প্রণাম গমন। (Corpus. Ins. Indi :, Vol. III, P 8.)

২। সমতট—সমতট শব্দের অর্থ তীরবর্ত্তী বা সমতল দেশ। বর্ত্তমান সুন্দর বনের কিয়দংশ ও পূর্ব্ব বঙ্গ বা বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান। হিন্দু-জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরের "বৃহৎ-সংহিতা নামক গ্রন্থে সমতটের উল্লেখ দেখা যায়। "সি-ইউ-কি নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "পরিব্রাজক কামরূপ হইতে সমতটে গমন করিয়াছিলেন।" এলাহাবাদে সমুদ্রগুপ্তের প্রস্তরস্তম্ভ লিপিতেও সমতটের উল্লেখ (উপরোক্ত স্তম্ভলিপি দ্রষ্টব্য) রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু সমতটকে বর্ত্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম অনুমান করিয়া (বাঙ্গালার ইতিহাস ৬ষ্ঠ পরি-পরিচ্ছেদ, ৪৮ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের ইহাই যে মত তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। "সমতটের পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্র (বর্ত্তমান প্রোম) কমলাঙ্ক (বর্ত্তমান পেগু) ইত্যাদি" ইহা তিনি লিখিয়াছেন (বাঙ্গালার ইতিহাস পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ৯৫ পৃঃ)। এই যে "প্রোম বিশেষতঃ পেগু" এগুলি কি কুমিল্লার পূর্ব্বে! অতএব তাঁহারই উক্তিতে "সমতট" কেমন করিয়া কুমিল্লা হইতে পারে? বিশেষজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন সমুদ্রকুলবর্ত্তী তট-ভূমিতে কোথায়ও গাছ পালা জন্মিয়াছে, কোথায়ও বা জোয়ারের জলে ডুবিয়া যায়; এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল বলিয়াই সমতট নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

৩। কর্ণসুবর্ণ—পশ্চিম বঙ্গ। বর্ত্তমান হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত "রাঙ্গামাটী" কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

৪। পৌণ্ড্র বর্দ্ধণ—বর্ত্তমান মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী, প্রভৃতি জেলা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহাভারতের মতে সূর্য্যবংশীয় বলিরাজার অন্যতম পুত্র "পুণ্ড্র" এই দেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে এ দেশের নাম "পৌণ্ড্র" দেশ হইয়াছে। ইহার প্রাচীনতম রাজধানী পৌণ্ড্র বর্দ্ধণপুর। খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত "কল্পসূত্র" নামে সুপরিচিত জৈন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গের আগমন কালে পৌণ্ড্র বর্দ্ধণ দেশ চতুর্দ্দিকে ৪০০০ লি ও ইহার রাজধানী "পৌণ্ড্র বর্দ্ধণপুর" চতুর্দ্দিকে ৩০লি (প্রায় ৫ মাইল) ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। হর্ষচরিতে যে শশাঙ্কের* কথা উল্লেখ আছে তিনি গৌড় ও কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। তৎকালে গৌড়ের অপর নাম

(৩) সমুদ্রগুপ্ত—ইঁহার পত্নীর নাম "দত্তদেবী।" এই দত্তদেবীর গর্ভে "দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য" জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি শ্রীমতী "ধ্রুব দেবী"র পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৪) ডবাক—শ্রীযুক্ত স্মিথ (V. A. Smith) বগুড়া জেলার প্রাচীন স্থান বলিয়া অনুমান করেন।

(৫) কর্তৃপুর—শ্রীযুক্ত স্মিথের মতে জালান্দার জেলার বর্ত্তমান কুমায়ুণ, আলমোরা, গাড়োয়াল, কাংগ্রা প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন "কর্তৃপুর রাজ্য গঠিত ছিল।

* শশাঙ্ক—রাখাল বাবুর মতে "হুয়েন সাঙ্গ" শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষের কথা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে; অথচ এই হুয়েন সাঙ্গ কথিত শশাঙ্ক সম্বন্ধে অপর কয়েকটী তথ্য (বাঙ্গালার ইতিহাস ৮২ পৃঃ) কর্ণসুবর্ণ ও হর্ষবর্দ্ধনের ইতিহাস বিশ্বাস করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। একই বিষয়ে এক অংশ অমূলক ও দ্বিতীয় অংশ সত্যরূপে গ্রহণ করা ইতিহাস রচনার বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী নহে।

ছিল "পুণ্ড্রবর্দ্ধন"। খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এখানে "জয়ন্ত" নামে একজন পরাক্রমশালী নরপতি রাজত্ব করিতেন। তদীয় রূপ লাবণ্যবতী দুহিতা "কল্যাণ দেবী"র সহিত কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ রাজা জয়াদিত্যের বিবাহ হইয়াছিল।

৫। তাম্রলিপ্ত—বর্ত্তমান মেদনীপুর প্রভৃতি জেলা লইয়া এই রাজ্য গঠিত ছিল। তাম্রলিপ্ত এক্ষণে "তমোলুক" নামে পরিচিত। এই তমলুকের বহুসংখ্যক প্রাচীন নাম পাওয়া যায়ঃ—(১) তাম্রলিপ্ত (ইতি মহাভারতম্), (২) তামলিপ্তী, (ইতি ভারতকোষ), (৩) বেলাকুলং, তামলিপ্তং, তামলিপ্তী, তমালিকা (ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ) (৪) দামলিপ্ত, তমালিনী, স্তম্বপু, বিষ্ণুগৃহং (ইতি হেমচন্দ্রঃ), (৫) তমোলিপ্তী (ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ), (৬) তমোলিপ্ত (ইতি রত্নাকরবলী) প্রভৃতি।

চতুর্থ বিক্রমাদিত্যের বাঙ্গালা ও আসাম আক্রমণ।

চালুক্যরাজ জয়সিংহের পুত্র "১ম সোমেশ্বর সিংহ" যিনি বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের "কল্যাণী" নগরে স্বীয় রাজধানী স্থানান্তর করতঃ ১০৪৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১০৬৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপুত্র "৪র্থ বিক্রমাদিত্য" তাঁহার জীবদ্দশায় চোলারাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন। পিতার লোকান্তর গমনে তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা "সোমেশ্বর সিংহং" সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১০৭৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন। তদীয় আবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি এরূপ একজন অমিত পরাক্রমশালী নৃপতি হইয়া উঠিয়াছিলেন যে "বঙ্গ ও আসাম" প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য।

এই ভারত ভূমিতে আবহমান কাল হইতে ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটীত হইতে দেখা যায়। এখানে যত সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয়, পৃথিবীর আর কোন অংশে তত আছে কি না সন্দেহ। পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের বিলোপ সাধনার্থ কত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উত্থান হইল, কিন্তু এই ধর্ম্মের সংঘর্ষণে কোন ধর্ম্মই অস্তিত্ব রক্ষণে সমর্থ হইল না। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধধর্ম্ম (৬) ভারতভূমিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, ও বেদদ্বেষী ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের আবির্ভাব হইল। হিন্দুর প্রধান তীর্থক্ষেত্রেও বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম লোক পাইতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে নানাধর্ম্মের অভ্যুদয় দেখা দিল। তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশের অন্তর্গত কালাদি (ক্যালদি) গ্রামে ভগবান শঙ্করাচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। এই ক্যালাদি গ্রাম পূর্ণ নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছে! ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে তিনি ৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে আবির্ভূত হন। কিন্তু বলবত্তর প্রমাণের দ্বারা স্থিরিকৃত হইয়াছে যে, খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯ অব্দে শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (৭) নাম্বুরী বংশে তাঁহার জন্ম হয়, এইজন্য নাম্বুরী ব্রাহ্মণগণ অদ্যাবধি তাঁহাদের বংশ গরিমায় গরিয়াণ। শঙ্করাচার্য্যের পিতার নাম "শিবগুরু," মাতার নাম "সতী দেবী" মতান্তরে সুভদ্রা। শঙ্কর বিজয় সংগ্রহ (পুরুষোত্তম ভারতী বিরচিত) অনুসারে শঙ্করের পিতার নাম "বিশ্বজিৎ", মাতার নাম "বিশিষ্টা"। শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধ মত ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী দিগের মত খণ্ডন করায় ভারতে পুনর্ব্বার বৈদিক মত ও সাধারণের মধ্যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মত প্রচলিত হয়। দাক্ষিণাত্যের "চেলা"-গণ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মের মূল উৎপাটন করিতে সক্ষম হন। কাঞ্চি চোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই কাঞ্চী নগর শাস্ত্র চর্চ্চা ও বিদ্যা বিষয়ক গৌরবের জন্য ভারতের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। শঙ্করাচার্য্য যে সকল ধর্ম্মাবলম্বী দিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন সেই সকল সম্প্রদায়ের নাম যথাঃ—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন্য, সৌর, গাণপত্য, শূন্যবাদী (৮) নাস্তিক,

(৬) বৌদ্ধদিগের আচার ব্যবহার বেদবিহিত নহে; তাঁহারা জাতিভেদ মানেন না; বর্ণাশ্রম বিধানও তাঁহারা পালন করেন না।

(৭) সাহিত্য ১৩০৬ চৈত্র সংখ্যা "শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৮) শূন্যবাদী বলেন, "সৃষ্টির পূর্ব্বে একাবারে শূন্য ছিল। ঈশ্বর ছিলেন না, তাঁহাকে কিছুই সৃষ্টি করি হয় নাই। ইহাঁদের মতে কিছুরই সত্ত্বা ছিল না"।

চার্ব্বাক, কাপালিক, অগ্নিবাদী, চণ্ডালক, বৈখানস, পঞ্চরাত্র, প্রভৃতি। তৎকালে এই সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম লোক পাইতে বসিয়াছিল। ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই সকল সম্প্রদায়কে বিচারে পরাস্ত করিয়া ধর্ম্মজগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের কামরূপ রাজ্যে গমন।

ভগবান "শঙ্করাচার্য্য" যথন আপনার বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে কামরূপ রাজ্যে গমন করেন, তৎকালে সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, শাস্তিরাম, গণপতি, আনন্দ গিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য প্রভৃতি শিষ্যগণ শঙ্কাচার্য্যের সমভিব্যাহারে ছিলেন। তৎকালে "অভিনব গুপ্ত" নামে যে এক প্রোথিত নামা পণ্ডিত তথায় বাস করিতেন। শঙ্কর তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করেন। এই অবমাননার প্রতিশোধার্থ তিনি শঙ্কর দেবের প্রাণ সংহারে কৃত-সংকল্প হন। এইরূপ জনশ্রুতি—অভিনব গুপ্ত তদ্বিষয়ে নিস্ফল মনোরথ হওয়ায়, স্বীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ অভিচার দ্বারা শঙ্কর দেবের উৎকট ভগন্দর রোগ উৎপন্ন করাইয়া দেন। এই সময়ে সনন্দন নামক তাঁহার জনৈক প্রধান শিষ্য "সিদ্ধ মন্ত্র" যপ করিয়া তাঁহাকে এই ভোগান্তিক রোগ হইতে মুক্ত করেন।

হিমালয়ের পাদদেশে প্রসিদ্ধ কেদারনাথ তীর্থে এই মহাপুরুষের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। তিনি ৩২ বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য কদাপি বেদের কোন মনগড়া অর্থ করেন নাই। তাঁহার প্রধান রচনা মোহমুদগর। ইহা সংসারে মোহনাশের অমোঘ অস্ত্র-স্বরূপ।

জিতারী বংশ।

প্রাচীন কামরূপ বা বর্ত্তমান আসাম প্রদেশ ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা "উত্তর কূল" ও "দক্ষিণ কূল" এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। এই নদের উত্তরাংশ উত্তর কূল ও দক্ষিণাংশ দক্ষিণ কূল নামে অভিহিত হইত। গৌহাটী হইতে আরম্ভ করিয়া মিরি, মিসমি জাতিদিগের আবাস ভূমি পর্য্যন্ত উত্তর কূলের সীমা ছিল, আর দক্ষিণ কূলের সীমা ছিল শদীয়া হইতে শ্রীনগরের পাহাড় পর্য্যন্ত। কাশ্মীর রাজ "ললিতাদিত্য" যিনি ৭১৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তিনিই এই প্রাচীন কামরূপের "উত্তর কূল" রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন (Calcutta review 1867, P. 521). অহম বুরুঞ্জীতে তিনি কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য নামের পরিবর্ত্তে "পশ্চিম দেশীয় ক্ষত্রীয় জিতারী" নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

বহির্জগতে ঈশ্বরজ্ঞানের অভিব্যক্তি।

(ডাক্তার সর্ গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রণীত "ধর্ম্মসম্বন্ধীয় লেখা ও ব্যাখ্যান" নামক মরাঠীগ্রন্থ হইতে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত।)

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ক চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥

শ্বেতাশ্বতর, ১.১।

"হে ব্রহ্মবেত্তাগণ, এই সমস্ত বিশ্বের কারণ কি, আমরা কাহা হইতে হইয়াছি, কাহার দ্বারা আমরা জীবিত আছি, আমাদের প্রতিষ্ঠাভূমি কে, এবং সুখদুঃখসম্বন্ধীয় যে ব্যবস্থা আছে তাহা আমরা কাহা কর্তৃক প্রাপ্ত হইতেছি।"

শ্বেতাশ্বতর নামক এক উপনিষদের আরম্ভেই এই বাক্যটি আছে। যে কোন রাষ্ট্রমধ্যে যখন মনুষ্যের বিচারালোচনা করিবার সামর্থ্য জন্মিয়াছে, বুদ্ধির বিকাশ হইয়া মনোমধ্যে নানা প্রকার বিচার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অনেক বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উদ্রেক হইয়া তাহার পূর্ণ মীমাংসা করিতে মনুষ্য প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সময় এই বড় প্রশ্নটি সকলের আগে মনুষ্যের মনে স্বভাবতই উৎপন্ন হয়; এবং আপন-আপন বুদ্ধি অনুসারে উহার বিচার করিয়া তাহারা উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের কোন কোন উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।

সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥
শ্বেতাশ্বতর, ১.২।

"কেহ বলে, কালই কারণ; কেহ বলে, যাহা চলিতেছে সে সমস্ত আপন স্বভাবের দ্বারাই চলিতেছে; কেহ বলে, ভবিতব্যতা বলিয়া এক অবশ্যম্ভাবী নিয়ম আছে, তাহাতে করিয়া বিশ্ব চলিতেছে; কাহারও মতে, সমস্ত বস্তু আকস্মিক, অতএব আকস্মিকতাই কারণ; কাহারও মতে,—পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি ভূতই কারণ; কেহ বলে, পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাই কারণ। অতএব এই বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক। উহা হইতে জীবাত্মাকে এক পাশে রাখিয়া, অন্যগুলির মধ্যে এক একটি স্বতন্ত্রভাবে কারণ হইতে পারে না। এই বিশ্বের মধ্যে কর্তৃত্বশক্তি, জ্ঞানশক্তি থাকিলেও সেই জীবাত্মাতেই আছে, অন্য কারণের মধ্যে নাই। আচ্ছা, জীবাত্মাকেই সকলের কারণ যদি বল, তবে ঐ জীবাত্মা দুর্ব্বল; কেননা, জীবাত্মা কখন সুখ, কখন দুঃখ প্রাপ্ত হয়; এইজন্য জীবাত্মা স্বতন্ত্র নহে।" তবে বিশ্বের কারণ কি?

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥
শ্বেতাশ্বতর, ১.৩।

"তারপর, ঋষি ধ্যান করিতে করিতে দেখিলেন,—দেবরূপ যে আত্মা, সেই আত্মার বহির্দৃশ্য যে সমস্ত কার্য্য, তাহারই অভ্যন্তরে গূঢ় রহিয়াছে এক শক্তি, এবং আরও দেখিতে পাইলেন, কাল ও জীবাত্মা সমেত যে সকল কারণ স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে, সেই সকল কারণের এক অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ব্যবস্থা-সংস্থাপক আছেন"। ইহাই এই উপনিষদের অন্য স্থানেও উক্ত হইয়াছে ঃ—

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥
শ্বেতাশ্বতর, ৬.১।

"পরিমুহ্যমান কোন কোন পণ্ডিত,—স্বভাবই কারণ এইরূপ বলেন; আবার অন্য লোকে বলে, কালই কারণ। পরন্তু, এই যে ব্রহ্মচক্র সতত ভ্রমণ করিতেছে, তাহা দেবের মহিমাতেই ভ্রমণ করিতেছে।"

আমাদের মন অন্য বিষয়ের মধ্যে নিমগ্ন থাকিলে, মনের মূল সামর্থ্য বিনষ্ট হইয়া, সেই সকল বিষয়যোগে, মনের উপর ভ্রান্ত সংস্কার-সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে লিপ্ত থাকায় অন্তঃকরণ বিষয়াকারে পরিণত হয়। মনের মূল স্বরূপের উপর কামক্রোধাদি বিকারের একটা ঘন আবরণ আসিয়া পড়ে। এইজন্য, অন্তঃকরণরূপ মলিনীকৃত আদর্শে অনন্ত যে পরমেশ্বর তাঁহার প্রতিবিম্ব পতিত হয় না; ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞান হইবার যে স্বাভাবিক সামর্থ্য তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। তাহার পর মানুষ, নানা প্রকার কুতর্ক অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সমস্ত আপনা-আপনি চলিতেছে, সমস্তই আকস্মিক, ইহার শাস্তা কেহ নাই,—ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু বিষয় ও কামক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তির প্রলেপ বিধৌত করিয়া মনুষ্য যদি এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাহা হইলে অবশ্যই পরমেশ্বরের উন্নতস্বরূপ তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে আবির্ভূত হয় এবং ঐ ঋষির উক্তি অনুসারে সে বলিতে থাকে যে, "দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্", "বাদবিবাদকারী শাস্ত্রবেত্তারা যাহাই বলুন না কেন, এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেবের মহিমাতেই চলিতেছে।"

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
শ্বেতাশ্বতর, ১৭.৪।

"সমস্ত বিশ্বের কর্ত্তা, মহান্ আত্মা এই দেব মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণের মধ্যে সদা অবস্থিত।" তাই, এই বাহ্য জগতের কোন পদার্থের জ্ঞান কিংবা কোন আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞান হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পরমেশ্বরের সম্বন্ধীয় জ্ঞানও উৎপন্ন হয়। যেরূপ, বহু বৎসর পূর্ব্বে পরিদৃষ্ট কোন বস্তুর সংস্কার আমাদের অন্তঃকরণে থাকে, কিন্তু সেই বস্তুর স্মরণ আমাদের সর্ব্বদা মনে হয় না; যখন সেই সংস্কারের অভিব্যঞ্জক ঘটনা, অর্থাৎ পুনরপি সেই সংস্কার জাগৃত কিংবা অভিব্যক্ত

করে এইরূপ কোন ঘটনা ঘটে, তখনই স্মরণ হয়; সেইরূপ মনুষ্যের অন্তঃকরণের মধ্যে স্বভাবতই পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের সংস্কার আছে; কিন্তু সেই সংস্কার, বাহ্যজগতের জ্ঞান কিংবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ কোন মানসিক বস্তুর জ্ঞান হইলে তবেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, ঐ বস্তু সেই সংস্কারের অভিব্যঞ্জক। বাহ্যজগৎ অর্থাৎ আধিভৌতিক বিষয় হইতে ঈশ্বর-বিষয়ক সংস্কার কিরূপে অভিব্যক্ত হয়, প্রথমে সেই বিষয়ে আমরা বিচার করিব।

জগতের মধ্যে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার দ্বারা পরমেশ্বরের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে তাহা অভিব্যক্ত হইয়া আমাদের প্রত্যয় না জন্মে। সকলের মধ্যেই আশ্চর্য্য রচনা আশ্চর্য্য যোজনা, আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। কোন রমণীয় পুষ্পদর্শনে কতই গম্ভীর চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হয়! কিন্তু মনুষ্যের স্বভাবই এই, কোন পদার্থের অতিপরিচয় হইলে তাহার প্রকৃত স্বরূপ লক্ষ্য করা যায় না। সেই বিষয়ে মনুষ্য অন্ধই থাকে। সেই পদার্থ হইতে মনের উপর যে ছাপ পড়িবার কথা, তাহা পড়ে না। কিন্তু এই জগতের মধ্যে এমন কতকগুলি বড় বড় পদার্থ আছে, এরূপ দৃশ্য আছে যে, অতিপরিচয়েও তাহাদের স্বরূপসম্বন্ধে অন্ধতা উৎপন্ন হয় না কিংবা তাহাদের অতিপরিচয় আদৌ হয়ই না। যখন তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় তখন অন্তঃকরণের মধ্যে উন্নত চিন্তা সমুদিত হইয়া, আমাদের মনোবৃত্তি বিস্মিত ও সমুৎসুক হয়।

কোন মনুষ্য পার্ব্বত্যপ্রদেশে গিয়া একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকে যদি দৃষ্টিপাত করে এবং দেখিতে পায়—যতদূর দৃষ্টি যায় শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ সমান চলিয়া গিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে কিংবা অতি উচ্চ খাড়া খাদ সম্মুখে কিংবা নীচে বৃহৎ গভীর উপত্যকা রহিয়াছে কিংবা এক পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে বাহির হইয়া এক বড় নদী উপত্যকার মধ্যে অতিশয় বেগে গড়াইয়া পড়িতেছে এবং তাহার পথরোধী বৃক্ষপাষাণাদি সহসা উৎপাটন করিয়া ফেলিতেছে; অথবা, সমুদ্রের নিকটস্থ এক পর্ব্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া যদি দেখে, সূর্য্যের উদয়ে সমুদ্রের সমস্ত জল তরল রজতের ন্যায় চক্ চক্ করিতেছে, কিংবা নৌকাতে যাইবার সময় দেখিতে পায় সমুদ্রের তরঙ্গরাজি খুব জোরে শিলার উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে, কিংবা অনেক দূরে গিয়া জমি দেখা যাইতেছে না, কেবলই জল, জলের আর অন্ত নাই, অথবা সূর্য্য নিজ দেদীপ্যমান প্রখর তেজে সমস্ত পৃথিবীকে প্রতপ্ত করিতেছে, কিংবা বর্ষাকালে সমস্ত বায়ুমণ্ডল ক্ষুব্ধ হইতেছে, প্রচণ্ড বায়ু নিজ বেগে গাছপালা উপড়াইয়া ফেলিতেছে, আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, তৎসহ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন হইতেছে, অথবা রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্রের শান্ত কিরণ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া সমস্ত আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে,—এই সমস্ত দৃশ্য দেখিলে, বিস্ময়, ঔৎসুক্য, আনন্দ, শান্তি, পূজ্যত্ব-বুদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ ভাব তাহার অন্তঃকরণে উৎপন্ন হইয়া অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শান্তি, অনন্ত গাম্ভীর্য্য, অনন্ত মহিমার জ্ঞান স্পষ্টরূপে ও সহজভাবে উদিত বা অভিব্যক্ত করিবে এবং পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপও তাহার নেত্রসমক্ষে আবির্ভূত হইবে। সেইরূপ আবার, সমস্ত জগতের মধ্যে যে আশ্চর্য্য যোজনা চারিদিকে দৃষ্টিগোচর হয় তাহা দেখিয়া কোন মনুষ্যের সহজেই বিশ্বাস হইবে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রচনা অনন্ত ত্রৈকালিক জ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না। এই ব্রহ্মচক্র এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারেই চলিতেছে। সমস্ত ঘটনা হইতেই কোন-না-কোন প্রকার ভাল পরিণাম উৎপন্ন হইতেছে, সেই সব ঘটনা আকস্মিক নহে। সূর্য্যের উত্তাপে সমুদ্রের উপর জলের বাষ্প জন্মিয়া, তাহা বায়ুমণ্ডলে গিয়া অদৃশ্য হইতেছে। কিয়ৎকালের মধ্যে, শীতল বায়ুর সমাগমে আবার উহা জলের রূপ প্রাপ্ত হইতেছে এবং উহাই মেঘ হইয়া বায়ুতে তরঙ্গিত হইতেছে। এই মেঘ বায়ুযোগে সমুদ্র হইতে দূরে যাইতেছে; তার পর, বৃষ্টি আরম্ভ হইতেছে। ঐ বৃষ্টির জল মাটিতে মিশিয়া গেলে মাটি ও জলের এমন একটা অবস্থা হয় যে, মাটিতে যে বীজ থাকে মাটি ও জল উভয়ই তাহার পোষক হয়, এবং সেই বীজ হইতে পরম গুহ্য অপরিজ্ঞেয়রূপে অঙ্কুর জন্মে; তার পর জল ও মাটি ঐ অঙ্কুরকে

আপন যোগ্য রূপ দিয়া থাকে; কেন ও কি শক্তি অবলম্বন করিয়া এরূপ হয় তাহা গুহ্য; এবং অঙ্কুর হইতে চারা হয়। এইরূপে চারা বড় হইয়া তাহাতে ফুল হয় এবং তাহার মধ্যে ধান্য উৎপন্ন হয়। সেই ধান্য কিংবা সেই চারার অন্য অবয়ব মনুষ্য ও অন্য প্রাণীর উদরস্থ হইলে উহা আর এক আশ্চর্য্য রূপ প্রাপ্ত হয়। সেই পদার্থ হইতে রক্ত হইয়া ঐ রক্ত সমস্ত শরীরে ঘুরিয়া তাহা হইতে অস্থি মজ্জা স্নায়ু ইত্যাদি শরীরের যে সকল অংশ, তাহার বৃদ্ধি হয় এবং সেই প্রাণীদিগের দেহ বর্দ্ধিত হয়। এবং ঐ ধান্যকে কিংবা তৃণকে রূপ দিবার জন্য সেই প্রাণীদিগের উদরে কতই যোজনা আছে! প্রথমতঃ মুখের মধ্যে লালা বলিয়া যে পদার্থ আছে তাহার যোগে সেই অন্ন নরম হয়। তার পর জঠরের মধ্যে, পিত্তাশয়ের মধ্যে এবং অন্য অবয়বের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রস উৎপন্ন হইয়া সেই অন্নে মিশ্রিত হয় এবং উহা হইতে সেই অন্ন যোগ্য রূপ প্রাপ্ত হইলে জঠর ও যন্ত্রাদি তাহা শোষণ করে। এইরূপ অনেক চমৎকার প্রকরণ আছে। প্রাণীদিগের দেহমধ্যে যে সমস্ত অবয়ব আছে তাহারা পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ এবং সমস্ত মিলিয়া পরস্পরের সাহায্য করিয়া একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে; এবং শাস্ত্রবেত্তারা বলেন, এই প্রকার যোজনা সমস্ত জগতেই দেখা যায়। এই বিষয়ের বিচার করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, এই জাগতিক শক্তির একজন যোজক বা প্রয়োগকর্ত্তা আছেন, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞান জগতের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।

আজকাল, পৃথিবীর পূর্ব্ব-অবস্থা সম্বন্ধে ও আকাশের গ্রহনক্ষত্রসম্বন্ধে মনুষ্য যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহা দ্বারা এই শক্তির অচিন্ত্যনীয়তা এবং এই যোজনাসম্বন্ধে দূরদর্শিতা অধিক স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়া মনুষ্যের বুদ্ধি অবসন্ন হইয়া পড়ে। কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর উপর বনস্পতি ও প্রাণীর সৃষ্টি হয় নাই। তখন পৃথিবীর উদরে অগ্নি এখন অপেক্ষা অধিক প্রজ্জ্বলিত ছিল, তাহারই যোগে সমস্ত ধাতু গলিয়া কতকটা বায়ুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পর সেই বায়ু খুব জোরে পৃথিবীর পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ধাতুরস উপরে আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল এবং এইরূপ সঞ্চিত হইয়া কালক্রমে শীতল হইয়া সেই ধাতুরস এক্ষণে পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। তাহার পর সেই অগ্নি যেমন যেমন নিবিতে লাগিল, তদনুসারে বনস্পতি ও প্রাণীর সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রথমে প্রকাণ্ড শতহস্ত উচ্চ ও খুব চওড়া বৃক্ষ পৃথিবীর উপর ছিল। এক্ষণে খনির ভিতরে যে কয়লা পাওয়া যায় তাহা এই বৃক্ষই, কালক্রমে পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর নূতন স্তর পড়িয়া চাপা পড়িলে উহা হইতেই এই কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার পর, বড় বড় সর্পাকৃতি প্রাণী উৎপন্ন হইল এবং এইরূপ ক্রম কোটি বৎসর চলিয়া তাহার পর মনুষ্যের সৃষ্টি হইল। এই সমস্ত ভূমির উপর পৃথ্বী আদি যে মহাভূত ছিল তাহাই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, এই সমস্ত প্রকারভেদ সিদ্ধ হইল। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটি বিষয় যাহা লক্ষ্য করা যায় তাহা এই যে, যে সকল নূতন রূপ উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বরূপ অপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ উত্তরোত্তর এই পৃথিবীতে চৈতন্য, সত্য, প্রভৃতির অধিক বিকাশ হইয়া জড়তা, তম প্রভৃতির হ্রাস হইতেছে। এইরূপ ক্রম চলিয়া, পরে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ মানবাদি কি আশ্চর্য্য রূপ প্রাপ্ত হইবে তাহা সর্ব্ব-সত্তাধার ভগবানই জানেন। এইটুকু মাত্র স্পষ্ট জানা যায় যে, পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রম সততই চলিতেছে। সেইরূপ আবার, যে পৃথিবীকে আমরা এত বড় বলিয়া মনে করি, তাহা অপেক্ষা বৃহস্পতি গ্রহ ১৪৩৬ গুণ বড় এবং সূর্য্য ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৩৬ গুণ বড়! অচল তারা সকল এত বড় যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের যে প্রায় ৯ কোটি বিশ লক্ষ মাইল ব্যবধান আছে, তাহা প্রত্যেক তারার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া যাইতে পারে। এবং দূরস্থ অন্য যে সকল তারা আছে, তাহাদের বৃহত্ত্ব ইহাদের অপেক্ষাও বেশী। এইরূপ তারা অসংখ্য আছে। এবং পৃথিবী হইতে ইহাদের ব্যবধান পরার্দ্ধ মাইল অপেক্ষাও অধিক, গণনার মধ্যেই আনা যায় না এত বেশী। অতএব, এই বিশ্বজগৎ কি বিশাল, এই বিশ্বাধিপতি জগদীশ্বরের

কি শক্তি, কি অগম্য তাঁহার লীলা! এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী কি ক্ষুদ্র, সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্রজলের এক বিন্দুর যেরূপ গণনা, বিশ্বজগতের মধ্যে পৃথিবীর সেইরূপ গণনা। তার পর, আমরা মানব কি ক্ষুদ্র! যুগযুগানুক্রমে সমস্ত ব্যাপার সুচারুরূপে চলিয়া, পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে, এবং ঐ উদ্দেশ্য সর্ব্বপ্রকারেই শুভ; এই সমস্ত বিচার করিলে, পরমেশ্বরের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বিস্ময় ও পূজ্যত্ব-বুদ্ধি আসিয়া অন্তঃকরণকে অধিকার করে; এবং মনুষ্যের অভিমান সর্ব্বথা শূন্যগর্ভ ও মিথ্যা এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে।

ভৌগোলিক পরিভাষা গঠনে পণ্ডিতদিগের অভিমত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

আজ প্রায় ৩৭ বৎসর হইল, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথভবনে সারস্বত-সমাজ নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছিল। তদানীন্তন সাহিত্যিকগণের অগ্রণীমাত্রেই এই সভার সভ্য ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সভার ১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণের অধিবেশনে উপস্থাপিত ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে তিনজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মতামত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সেগুলি বর্ত্তমানকালে সাধারণের কৌতূহল উদ্রেক করিতে পারে এবং বঙ্গের সাহিত্যিক জগতের উপকারে আসিতে পারে বিবেচনায় প্রকাশ করিলাম।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অভিমত।

উক্ত অধিবেশনের সভাপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় "সভ্যসাধারণের দ্বারা আহূত হইয়া" এ বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত হইলেও তাহার নিম্নে তাঁহার স্বাক্ষর দেখিতে পাই না। উক্ত মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

প্রত্যেক গ্রন্থকার তাঁহার ভূগোলগ্রন্থে নিজের নিজের মনোমত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—আবার মানচিত্রকারও তাঁহার মানচিত্রে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বালকেরা সর্ব্বত্র এক শব্দ পায় না।

বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিলেন যে—এক Isthmus শব্দের স্থলে কেহ বা যোজক, কেহ বা ডমরুমধ্যস্থান কেহ বা সঙ্কটস্থান ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শব্দটি বক্তাই স্বয়ং প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে "সঙ্কট" শব্দ, স্থলেও ব্যবহার করা যায়, জলেও ব্যবহার করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা যায়—সুতরাং উক্ত এক শব্দে Isthmus, Channel, Mountain-pass সমস্তই বুঝায়।

অনেক গ্রন্থকার Strait শব্দের স্থলে "প্রণালী" ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী শব্দে জল-নির্গমপথ বুঝায়। প্রণালী—অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুদ্রে আরোপ করা অকর্ত্তব্য।

Peninsula কে বাঙ্গলায় সকলে উপদ্বীপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপদ্বীপ বলিতে দ্বীপের ছোটই বুঝায়। অতএব এইরূপে প্রসিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ করা উচিত হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে "প্রায়দ্বীপ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রায়দ্বীপ শব্দেই তাহার আকার বুঝা যায়।

এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত।

ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যাহা রূঢ়িক—এবং আর কতকগুলি কথা আছে, যাহা অর্থ জ্ঞাপনের নিমিত্ত সৃষ্ট। যেগুলি রূঢ়িক শব্দ তাহার অনুবাদ করা উচিত নহে, আর অপরগুলি অনুবাদের যোগ্য। ইংরাজীতে যাহাকে Red sea বলে, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত-সমুদ্র বলে। কিন্তু India শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের ভাষায় এ নিয়মের প্রতি আস্থা নাই—কখন এটা হয় কখন ওটা হয়।

বক্তা বলিলেন, ইংরাজেরা বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে শব্দের তদ্ধিত গ্রহণ করে না। ইণ্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ধিত করিবার সময় তাহাকে ইণ্ডিয়ান্ বলিয়া থাকে। বিভক্তি শুদ্ধ অনুকরণ করে না। কিন্তু বাঙ্গলায় এ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। অনেক বাঙ্গলা গ্রন্থকার কাস্পীয় সাগর না বলিয়া কাস্পিয়ান সাগর বলিয়া থাকেন।

এইরূপ শব্দ গ্রহণের একটা কোন নিয়ম করা উচিত, এবং কোন্ গুলি অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্গুলি অনুবাদ না করিতে হইবে, তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

পরিভাষা-বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করা উচিত। Long সাহেবকে কেহই অনুবাদ করিয়া দীর্ঘ-সাহেব বলে না—কিন্তু একটা পর্ব্বতের নামের বেলায় অনেকে হয়ত ইহার বিপরীতাচরণ করেন। আমরা যাহাকে ধবলাগিরি বলি—তাহার ইংরাজী অনুবাদ

করিতে হইলে তাহাকে White-mountain বলিতে হয়—কিন্তু আমেরিকায় White-mountain নামে এক পর্ব্বত আছে। আবার ফরাসীতে ধবলাগিরির অনুবাদ করিতে হইলে, তাহাকে Mont Blanc বলিতে হয়—অথচ Mont Blanc নামে অন্য প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। এইরূপ স্থলে একটা নিয়ম স্থির না থাকিলে দেশের নামের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যভিচার হইয়া থাকে।

গ্রন্থের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বত্র এক শব্দের এক অর্থ রাখা আবশ্যক। অভিধান স্থির করিলে ইহা সহজ হইতে পারিত—কিন্তু তাহার উপায় নাই—কারণ অনেক শব্দ এখনো প্রস্তুত হয় নাই। অতএব এক এক শাস্ত্র লইয়া তাহার শব্দগুলি আগে স্থির করা আবশ্যক।

বক্তা বলিলেন অল্পবয়স্ক শিশুদের হাতেই ভূগোল দেওয়া হয়—অতএব ভুগোলের পরিভাষা স্থির করাই সারস্বত সমাজের প্রথম কার্য্য হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণেরও কিছু কিছু হইলে ভাল হয়।

উপসংহারে বক্তা বলিলেন—সারস্বত সমাজের তিন চারি জন সভ্য মিলিয়া একটি সমিতি করিয়া প্রথমতঃ ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করুন, পরে সাধারণ সভায় তাহা স্থির হউক।

স্বনামধন্য ৺রাজনারায়ণ বসুর অভিমত—

দেওঘর ৪ আষাঢ়, ৫৪।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারস্বত সমাজ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত "ভৌগোলিক-পরিভাষা" বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব পাইয়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ; তাহা অঙ্কুশ মানে না। ব্যকরণ ও শব্দশাস্ত্র বসিয়া বসিয়া নিয়ম করেন; সে তাহা না মানিয়া হাস্য করত প্রচণ্ডবেগে চলিয়া যায়। বিদ্যাকল্প দেশের লোক সাধারণ তন্ত্রের লোক; কেহ কাহার কথা শুনে না। তাহাদিগকে বশে আনা মুস্কিল। "irritabile vates trition"। আমার অনুরোধ এই আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট অপমানিত না হইতে হয়। যে সকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে; যথা—উপদ্বীপ, প্রণালী, যোজক, অন্তরীপ, উদ্যান প্রভৃতি, যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। যে সকল অপপ্রয়োগ ভাষায় সবে ঢুকিতেছে অর্থাৎ দুই তিন খানি বহিতে সবে মুখ বাহির করিয়াছে—তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্তু পরে ঢুকিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিশব্দের অভিধান এই বেলা করিয়া রাখিলে ভাল হয়। তদ্দ্বারা ভাবী গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আপনার প্রেরিত প্রস্তাবটিতে যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কোন সুবোধ ব্যক্তি কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারেন না—সেগুলি এত পরিপাটী হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়া অন্য প্রকার শব্দের প্রতি খাটাইলে ভাল হয়। যখন ব্যবহার দাঁড়াইয়াছে তখন আমরা কি করিব? এ বিষয়ে আমাদিগের হাত-পা বাঁধা। কোন কোন শব্দ উপযুক্ত নহে তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কি করা যাইবে? English Channel একটি উপসাগরের নাম; Channel শব্দ কেবলমাত্র জল যাইবার রাস্তা বুঝায়; তাহা এরূপ উপসাগরের প্রতি কখন খাটিতে পারে না। কিন্তু কি করা যায়? তাহা ইংরাজীতে পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব্দ জানিবেন। যোজক শব্দের পরিবর্ত্তে এখন "স্থলসঙ্কট" ব্যবহার করিতে গেলে লোকে বিদ্যাড়ম্বর সূচক (pedantic) মনে করিবে। ইতি—

বশম্বদ—

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পুনশ্চঃ উপরে যে নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের কথা উল্লেখ আছে তাহাতে ইংরাজী Grammar, Rhetoric, Philosophy, Painting, Architecture, Logic প্রভৃতির শব্দও ভুক্ত থাকিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। Passion, Emotion শব্দের বাঙ্গালায় অদ্যাপি উপযুক্ত প্রতিশব্দ হয় নাই। উহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ হইলে ভাল হয়।

খিদিরপুরের সুপ্রসিদ্ধ পব্লিক্‌প্রসিকিউটর ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের অভিমত—

খিদিরপুর ৬ই জুলাই ১৮৮৩।

সবিনয় নিবেদন।

ভৌগোলিক-পরিভাষাবিষয়ক বিজ্ঞাপনসম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিবার যোগ্য নহি। বাস্তবিক আমি এখনকার গ্রন্থে কি কি শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে তাহা জানি না। সুতরাং শব্দ নির্ব্বাচন করা আমার পক্ষে দুরূহ কার্য্য।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গভাষাতে Etymology সংক্রান্ত নিয়ম করিতে আমি ইচ্ছা করি না। লেখকেরা স্বভাবতঃই মনের কথা ব্যক্ত করিতে কষ্ট পাইয়া থাকেন। অন্ততঃ আমার মত হতভাগ্য আরো দু-দশ জন আছে মনে করিয়া এই কথা বলিলাম। সুতরাং তাহাদের হাতে আরো হাতকড়া দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। সত্য কথা বলিলে মূর্খ বলিয়া যদি ঘৃণা না করেন তবে বলিতে

পারি যে বিজ্ঞাপনের ৩ পৃষ্ঠার নিয়মগুলি আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। সভাপতি মহাশয়ের ইংরাজি পুস্তিকা একখানিতে ঐরূপ কতকগুলি নিয়ম পড়িয়াছিলাম। তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে আমার বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি কি পর্য্যন্ত হইত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালা বুঝিবার জন্য আমাকে ইংরাজ দোভাষির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে ইহা মনে করিতেও কষ্ট বোধ হইল।

উদাহরণস্থলে বলিতে পারি যে "মানচিত্র" শব্দের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। তথাচ আমার বয়সে মনে মনে কোন চিন্তা করিবার সময়ে কখনই যে "নকসা" ছাড়িয়া "মানচিত্র" শব্দ প্রয়োগ করিব তাহা সহসা মনে করিতে পারি না। "নকসা" শব্দের প্রতি অনেক আপত্তি আছে। তথাচ আমি যদি কাহাকেও কোন কথা বলিতে যাই, যথা—"২৪ পরগণার নকসাটা আন" তবে এইরূপ ব্যতীত বলিব না। লিখিবার সময়ে মনের কথা ভাষান্তরিত করিতে হইলে অনেক গুরুতর ক্ষতি হয়। "ছাড়া" শব্দ মনে করিয়া ব্যতীত শব্দ লেখা দোষের কিনা সন্দেহের স্থল; কিন্তু "নকসা" শব্দ মনে করিয়া "মানচিত্র" লিখিতে হইলে আমার আপত্তি থাকিবে।

আমার বিবেচনাতে সারস্বত সমাজ যদি একটি ফর্দ্দ ছাপাইয়া দেন যে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অমুক অমুক ইংরাজি শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এই এইরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে তন্মধ্যে অমুক অমুক প্রতিশব্দ এই এই কারণে পরিত্যাজ্য——তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারিবে।

লেখকের ইচ্ছা শাসিত করা অসাধ্য; এবং বাঞ্ছনীয় কি না সন্দেহের স্থল। পরন্তু যে স্থলে লেখকের তেমন প্রবল ইচ্ছা থাকে না; লেখক কেবল শব্দ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন সেখানে তাঁহার সহকারীতা করা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত বটে এবং তন্নিমিত্ত একাধিক শব্দ যোগাইয়া দিলে কোন স্থায়ী ক্ষতি হইবে না। আপাততঃ পরিভাষা বৃদ্ধি জন্য দোষ মনে হইতে পারে; কিন্তু ক্রমশঃ লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাঁহাদিগের অভিরুচি অনুসারে শব্দ-নির্ব্বাচন-ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইবে।

উপসংহারস্থলে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যদি বিজ্ঞাপনের লিখিত প্রতিশব্দ ধরিয়া আমাকে ভোট * দিতে হয় তবে প্রতি প্রস্তাবে কত amendment উপস্থিত হয় তাহা দেখা আবশ্যক হইবে। আর যদি সভাপতিমহাশয়ের নিজের নির্ব্বাচন বলিয়া বিচার করিতে হয় তাহা হইলে আমার অভিপ্রায় এই যে তাঁহার নাম দিয়া নির্ঘণ্টটী প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। সভাপতি মহাশয় এ বিষয়ে যত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তিনি যেরূপ পারদর্শী তাহা সকলেরই বিদিত আছে। তাঁহার নির্দ্দেশ মতে শব্দ প্রয়োগ করিতে, বিশেষ কারণ ব্যতীত কাহারই আপত্তি থাকা সম্ভব মনে হয় না। কিন্তু সারস্বত-সমাজের নির্ব্বাচন বলিয়া নির্ঘণ্টটী প্রকাশ করিলে অনেক কথা উঠিতে পারে এবং অন্ততঃ আমার মনে সভাপতিমহাশয়ের নামের গৌরব অনেক পরিমাণে dilute হইয়া যাইবে। নিবেদনমিতি—

বশম্বদ

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

* আমি সারস্বত-সমাজের ব্যবহৃত প্রতিশব্দ ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া 'ভোট' শব্দ ব্যবহার করিলাম। কেহ যেন উপেক্ষা মনে না করেন।

এই সারস্বত সমাজ একসময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সমাজের উপরোক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

Brahma Dharma.

CHAPTER II.

1. In the beginning, before creation, there was only the one true Parabrahma, and naught else beside Him; even after creation, all things, animate and inanimate, exist by virtue of His protection; hence is He called the one without a second. He is the absolute One and only existent; He is conscious; He knows Himself; hence is He called the Soul. But that Soul is not finite like our souls; to explain this, it is again said that He is the Great soul, birthless, ageless, deathless, eternal, and without fear. From Him, and by His will, creature-souls are born with limited powers, and by His will they live under His protection, and will so live as long as He so wills— Not such is the nature of Parabrahma; He is self-born, self-poised, eternal, and perfect.

2. Before creation there was naught else but Parabrahma, hence He did not create, like a maker, with the help of any

other thing. He considered the act of creation, and after thus considering, He created all that there is. We can make a particular object with earth, stone, iron—or other things, but this cannot be called *creation*. Creation means evolving a thing out of one's own will, without the aid of anything else. Hence we do not possess the power of creating anything. To Parabrahma alone belongs the power of creation; He alone, by His natural faculty of wisdom has created this wonderful machine of the universe with all things animate and inanimate.

3. Water, air, and fire, together with all materials for making the universe;—life, mind, and all the senses,—these have all been created by the will of that Almighty and perfect Being.

4. In obedience to the will of the all-ruling supreme Lord, the fire gives heat, the sun shines, the clouds pour forth rain, the wind blows, and death stalks abroad. Nothing can escape His will and His sway: sun and moon, stars and planets, water and air, through fear of Him speed on their appointed tasks,—inanimate though they be,

---

বঙ্গসাহিত্যে বৰ্দ্ধমান।

(শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী)

মাননীয় বৰ্দ্ধমানের মহারাজ নিম্নলিখিত একাদশটী কুসুমমালিকা বঙ্গভাষার শ্রীকণ্ঠে পরাইয়া বাণীর আরাধনা করিয়াছেন; (১) বিজয় গীতিকা (১ম ভাগ) (২) বিজয়গীতিকা (২য়) (৩) শুকদেব (৪) কমলাকান্ত (৫) চন্দ্রজিৎ (৬) একাদশী (৭) ত্রয়োদশী) (৮) পঞ্চদশী (৯) কতিপয় পত্র (১০) আবেগ (১১) বিজন বিজলী।

ইহাদের মধ্যে নাটক, কবিতা, গান, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানাপ্রকার রচনাই আছে, আমরা স্থানাভাববশতঃ সকলগুলির বিশেষ পরিচয় দিতে পারিলাম না। পুস্তকগুলির বহিঃসৌন্দর্য্য তাহাদের অন্তঃসৌন্দর্য্যেরই অনুরূপ। চিত্রসম্পৎ সুবহুল, এবং তাহাদের মাধুর্য্যও উপভোগ্য। পুস্তকগুলি প্রিয়জনকে উপহার দিবার এবং লাইব্রেরীতে রাখিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এ কথা বিশেষভাবে বলা বাহুল্য। এই পুস্তকগুলির মুদ্রণকার্য্যে কে, ভি, সেন কোম্পানিও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিবাদের কথা আমাদের দেশে প্রবাদের মত প্রচলিত। কথাটার মূলে সত্য কিছু থাক আর নাই থাক, আমরা কিন্তু বাস্তব জগতে প্রায়ই দেখিতে পাই যে, যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র তাঁহাদের উপর বাণীর করুণা বড় প্রকাশ পায় না, আবার যাঁহারা বাণীর প্রিয়পুত্র তাঁহাদের উপর লক্ষ্মীর সুদৃষ্টিরও সেইরূপ বড় অভাব; কিন্তু সময়ে সময়ে এমন এক এক জন সৌভাগ্যশালী পুরুষ দেখা দেন—যাঁহাদের নিকট হইতে পূজার পূত অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই পরস্পরের বিবাদ ভুলিয়া গিয়া একই সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন।

মাননীয় বৰ্দ্ধমানের মহারাজ তাঁহার সাধন-মন্দিরে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আরাধনা যুগপৎ তুল্যরূপেই করিতেছেন বলিয়া ইহাঁর উপর তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রচুর পরিমাণেই পড়িয়াছে। মহারাজ যে সত্য সত্যই প্রগাঢ় হৃদয়ানুরাগের সহিতই বাণীর উপাসনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার অভিনব সাহিত্য-রচনার প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেই বুঝা যায়। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার রচনার সর্ব্বত্রই একটা নিজত্ব বেশ পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকাল এইরূপ স্বতন্ত্রতার বড় অভাব। এখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছু রচনা করিতে যাওয়া বড় শক্ত কাজ। বিশেষতঃ যাঁহারা কবিতা লেখেন তাঁহাদের বিপদ তো পদে পদে। কিন্তু আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, মহারাজ তাঁহার গদ্য বা পদ্য কোন রচনাতেই নিজের বিশেষত্বটুকু হারাইয়া ফেলেন নাই। তাঁহার কবিতাগুলির আর একটী বিশেষ গুণ এই দেখিলাম যে তাহার কোথাও অস্পষ্টতার একটু লেশও নাই; সবই তাঁহার সরল প্রাণের সহজ সুন্দর উক্তি, কোথাও জ্ঞানে সমুন্নত

কোথাও বা ভক্তিতে গদগদ হইয়া আসিয়াছে। যখন তাঁহাকে ভগবানের উদ্দেশে করুণকণ্ঠে প্রার্থনা করিতে শুনি, তখন সে কাতর প্রার্থনা আমাদেরও হৃদয়তন্ত্রীকে আসিয়া তেমনি ভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, কোথাও একটু বাধা পায় না।

যেটুকু বলিতে চাই সেটুকু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারাই হইতেছে লেখকের একটা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। তিনি যদি অস্পষ্টতার সৃষ্টি করিয়া বক্তব্যটুকুর সবখানি পাঠককে নিঃশেষে বুঝিতে না দেন, তবে তাহাতে তাঁহার নিজের শক্তিহীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজ যে কয়েকটী পবিত্র কুসুমগুচ্ছে বঙ্গবাণীর চরণপদ্ম অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটীরই সুবাস অতি মনোরম; প্রত্যেক গ্রন্থই পবিত্র ভাবের উৎস; পড়িতে পড়িতে মনে হয় আমরা বুঝি, আমাদের এই চিরপরিচিত রূপ-রস-গন্ধময়ী পৃথিবীর স্নেহক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া উন্নত কোন্ জ্যোতির্ম্ময় অধ্যাত্মলোকে ভ্রমণ করিতেছি। সাধনপথের, অধ্যাত্ম মার্গের এমন সব উচ্চ ভাব লইয়া গ্রন্থগুলি লিখিত হইয়াছে যে, এ গুলিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অভিনব সম্পৎ বলা যাইতে পারে। আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা আর নাট্যসাহিত্যের প্লাবন আসিয়াছে বলিলে বোধ হয় বেশী কিছু বলা হয় না; কিন্তু তাহার মধ্যে কয়খানি পুস্তকে এমন উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব দেখিতে পাই? গ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে লেখক কেবল যে উপনিষদ বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনগুলি মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের সত্যগুলি প্রাণের মধ্যে মিশাইয়া লইতে পারিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত মায়াবাদের স্বপক্ষে বিপক্ষে সেই প্রাচীনকাল হইতেই নানা কথা-কাটাকাটি হইয়া আসিতেছে; আজিও তাহার বিরাম হয় নাই; গ্রন্থকার কিন্তু এই দুরূহ মায়াবাদ একটী কথায় আমাদের বুঝাইয়া দিলেন,—

"মায়া কিরে? মায়া কেরে?
সে তো তাঁর ছায়াটীরে।"

জ্ঞানের ভাস্বরতার সহিত ভক্তির স্নিগ্ধতার শুভ সম্মিলন যাঁহাতে না ঘটিয়াছে তিনি কখনই এরূপ জটিল দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসা এত সহজে করিতে পারেন না।

ভক্ত কবি গদগদ কণ্ঠে গাহিতেছেন,—

"করুণার তব কিনারা নাই।
প্রতিকাজে তাই তোমারে পাই॥"

যিনি সাংসারিক জীবনের পুঞ্জীভূত তুচ্ছ নীরস কর্ম্মরাশির মধ্যে ভগবানের স্নিগ্ধ স্পর্শ লাভ করিয়া সেই কর্ম্মরাশিকে সরস, শ্যামল, মহনীয় করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন তিনিই তো এই মরণশীলা পৃথিবীর বক্ষে অমৃতের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। এই অমৃতের সন্ধান লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই তো জগতের এই মরণশীল ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে একদিনের জন্যও মুগ্ধ করিতে পারে নাই; তাই তিনি "আমার কর্ত্তব্য" স্থির করিয়া বলিতে পারিয়াছেন,—

দেখহে দয়াল যেন কোন ত্রুটী নাহি করি।
কর্ত্তব্য পালন যেন সদা ক'রে যেতে পারি॥
দারা, সুত, দুহিতারে, স্বদেশ, আত্মীয়, পরে,
সকলে সেবিয়া যেন তব পুণ্য নাম স্মরি।
যে সুখ জীবনে নাই, সে সুখ আকাঙ্ক্ষা নাই,
কিছু নহে, কিছু নাই, তোমা শুধু চাই হরি॥

তাই তো অনন্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে চির-লালিত হইয়াও তিনি যুক্তকরে ভগবানের নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছেন,—

"শিখালে কেমনে মোরে ডাকিতে তোমার নাম।
শত প্রলোভন মাঝে যাচিতে হে মোক্ষধাম॥"

প্রকৃত ভক্ত ছাড়া এমন কথা আর কাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে? এই প্রকার ভক্ত লেখকের হস্ত হইতেই চন্দ্রজিৎ নাটক বাহির হইতে পারে। অতি সুন্দর ভাবে তিনি এই গ্রন্থে বলিদানের অযোগ্যতা এবং অহিংসা ও ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়াছেন। এই নাটকখানির প্রকাশ্য ভাবে অভিনয় দেখাইলে ছাত্রগণের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

গ্রন্থকারের কবিত্বের আর একটু নমুনা না দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। তিনি "সুখ ও দুঃখ" কবিতায় বলিতেছেন—

দুঃখ সুখ ভিন্ন ভাবি দুঃখ পাই অকারণ।
একেরই দুই দিকে দুটী নাম সংযোজন॥

আজি যাহা সুখকর, তাই কিছু দিনান্তর,
বোধ হয় বিষময়, ইহা দেখি অনুক্ষণ।
তুমি যারে তপ্ত বল, অন্যে ভাবে সুশীতল,
সুখ দুঃখ অবিকল, এইরূপ বিবেচন।
সুখ বলে যারে মানি, সেই আনে দুঃখ টানি,
বোধ-সূত্রে দুই ধারে, দুটীর আছে বন্ধন।
সুখ প্রতি অনুরাগী, বিচলিত দুঃখ লাগি.
কল্পনার কষ্টভাগী, এ নিখিল জীবগণ।

কি সুন্দর! কি সরল ভাষায় সুখ ও দুঃখের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য আমরা এমন কথা বলি না যে সকল কবিতা গুলিই আমাদের সমান ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার "একাদশী" গ্রন্থে কেমন বলের সহিত বলিয়াছেন,—

মোহের সাগরে, ডুবা'তে আমারে, অনায়াসে আর
পারিবে না।
নিষ্কাম করমে, গেঁথেছি মরমে, তায় বাধা কেহ
করিবে না॥
আমি তো দেখেছি, শিখেছি, বুঝেছি, মায়ার ধার তো
ধারিব না।
অন্তহীন হ'ব, অনন্তে মিশিব, আঁধারে তো আর
ডরিব না॥

নিজের সাধনের লক্ষ্য স্থির করিয়া কেমন সহজে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

অনন্ত সুষুপ্তে করিনা ভাবনা।
অনন্ত জাগ্রতে সদাই বাসনা॥
অনন্তের তরে, অনন্তের সুরে,
অনন্তের স্বরে, গাহিতে কামনা।
অনন্ত করমে, অনন্ত মরমে,
অনন্ত চরমে, এইত সাধনা॥

তাঁহার "আবেগ" গ্রন্থের বলিতে গেলে প্রত্যেক কবিতাই শান্ত গাম্ভীর্য্যে ও ধর্ম্মভাবের পবিত্রতায় মাখা। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে তাঁহার গুরুদত্ত "বিজয়ানন্দ" নাম লওয়া সার্থক হইয়াছে।

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

বিলাতে ধর্ম্মঘট। বিলাতে নানাবিধ ধর্ম্মঘটে বিলাতবাসীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বিলাত এখন একটা মহান ঘাতপ্রতিঘাতের সংঘর্ষের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। এই সেদিন মহাসমরের ভীষণ আঘাত গেল, আজ আবার ভীষণ ধর্ম্মঘটের আঘাত। এইরূপ আঘাতের পর আঘাতের বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন। কিন্তু আমাদের ধারণা যে ভগবান বিলাতবাসীকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইবার জন্যই এত আঘাত দিতেছেন। যে মহান উদ্দেশ্যে ভগবান কর্ম্মক্ষেত্র ইংলণ্ডকে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের সহিত রাজাপ্রজার পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আজ ইংলণ্ডকে এত আঘাত সহ্য করিতে হইতেছে। ইংরাজ জাতির কর্ত্তব্য যে তাহারা স্বার্থকে বলিদান করিয়া ভারতবর্ষকে এবং অন্যান্য অধীন ভূমিখণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়া এবং স্বদেশেও ধনী নির্ধন সকলকে ন্যায়, সত্য প্রভৃতি চিরন্তন ভূমির উপর দাঁড়াইয়া শাসনের ব্যবস্থা করিয়া নিজেরা অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় পবিত্র মূর্ত্তিতে বাহির হইরা আসুক। ইহাতে ইংরাজ জাতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতের আশ্চর্য্য মঙ্গল সাধিত হইবে।

ভারতে কুষ্ঠরোগ। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত টি, এস, কৃষ্ণমূর্ত্তি "ভারতে কুষ্ঠরোগ" নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে ভারতে গত সেন্সসের সময়ে ১,১০,০০০ কুষ্ঠরোগী ছিল। তিনি অনুমান করেন, এতদ্ব্যতীত অপ্রকাশিত কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০ ছিল। কিন্তু এই যে কুষ্ঠরোগীরা ভারতের কুষ্ঠীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, ইহার জন্য দায়ী কে? স্বদেশবাসীরাই আমাদের মতে ইহার জন্য প্রধানত দায়ী। স্বদেশী-প্রতিষ্ঠিত দুএকটা কুষ্ঠাশ্রম এখানে ওখানে টিমটিম করিতেছে, কিন্তু মিশনরিদিগের ন্যায় কয়জন স্বদেশী কুষ্ঠীদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে? কৃষ্ণমূর্ত্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে কয়েকটী মিশন বিলাত হইতে যেটুকু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা দ্বারাই কুষ্ঠাশ্রমসমূহের যে কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তদতিরিক্ত আর বিশেষ কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় না। আমাদের তো নিত্যই প্রত্যক্ষ হয় যে, কত মিঠাইয়ের দোকানের পার্শ্বে কুষ্ঠরোগী বসিয়া আছে, এবং কত শত মক্ষিকা উভয়েরই সমান সেবা করিয়া চলিয়াছে। আমাদের দেশ বড়ই অদৃষ্টবাদী, তাই অনেক স্থলেই দেখিয়াছি যে আমাদের দেশবাসীগণ কুষ্ঠ প্রভৃতি কোন সংক্রামক রোগেরই বড় একটা "পরোয়া" করে না। ফলে হইতেছে যে আমাদের দেশের লোক ক্রমে নির্বীর্য্য হইতেছে এবং পরিণামে ধ্বংসের অভিমুখে দ্রুতগতি চলিয়াছে। এইখানেই শিক্ষার কথা আসে। দেশবাসীগণ যদি সাধারণত স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিত, তাহা হইলে এরূপ ঘটনা সম্ভবপর হইত না। কেবল Primary শিক্ষাগ্রহণে দেশবাসীকে বাধ্য করিলে

চলিবে না, Secondary শিক্ষাগ্রহণেও বাধ্য করিতে হইবে। তবেই দেশের মুখ উজ্জ্বল শ্রীধারণ করিবে।

আদিসমাজের প্রভাব। আমরা দেখিতেছি যে চতুর্দ্দিকেই আদিসমাজের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এই যে ব্রাহ্মদিগের ভিতরে একটা সুদৃঢ় ভাব মনে জাগিয়াছে যে তাঁহারা বিবাহকালে আপনাদিগকে হিন্দু নয় বলিতে রাজী নহেন, ইহা আদিসমাজেরই প্রচারের ফল বলিয়া আমরা মনে করি। চক্ষু খুলিয়া দেখিলে এবং প্রাণ খুলিয়া বিবেচনা করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে কেবল ব্রাহ্মসমাজে নহে, সমস্ত হিন্দুসমাজেও আদিসমাজের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং পরেও হইবে। ইহার কারণ এই :যে আদিসমাজের মূলমন্ত্র প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতার উপর সংস্থাপিত। কেহ কেহ মনে করেন যে আদিসমাজ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহা ঠিক নহে। আদিসমাজের প্রায় সকল সভ্যই বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই অনিবার্য্যভাবে আদিসমাজ হিন্দুভাবের উপর দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কাল যদি ইহার সভ্যগণের অধিকাংশ মুসলমান সমাজ হইতে আসেন, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আদিসমাজকে কোরাণসংপৃক্ত মুসলমানী ভাবের উপর দাঁড়াইতে হইবে। আসল কথা, আদিসমাজ নিজেকে ধর্ম্মবিষয়ে একান্তই অসাম্প্রদায়িক রাখিতে চাহেন। যদি কেহ জাতিভেদ ত্যাগ করেন, আদিসমাজ তাঁহাকেও যেমন ত্যাগ করিতে পারেন না, তেমনি যদি কেহ জাতিভেদ মানিয়া চলেন, তাঁহাকেও তেমনি পরিত্যাগ করিবার অধিকার আদিসমাজের নাই। আর প্রকৃতই, আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা জাতিভেদের উপকারিতা স্বীকার করেন না এবং কার্য্যত মানিলেও মন্ত্রত জাতিভেদ মানিতে চাহেন না; আবার এমনও অনেকে আছেন, যাঁহারা জাতিভেদকে সমাজের উপকারী মনে করেন এবং কার্য্যত ও মন্ত্রত জাতিভেদ মানিয়া চলেন। হার্বার্ট স্পেন্সর যে বলিয়াছেন যে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে এসিয়াবাসীদিগের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার অন্তরে দুইটী জাতির স্বতন্ত্র ভেদজ্ঞান খুব প্রবল ছিল। তাই বলিয়া তাঁহাকে কেহ ব্রহ্মোপাসক হইবার অনুপযুক্ত বলিতে সাহস করিবেন না। বিজ্ঞানসঙ্গত বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, সামাজিক সকল প্রথারই সপক্ষ ও বিপক্ষ লোক থাকিবেই। সুতরাং তাহা লইয়া বিরোধবিবাদ অনিবার্য্য। কিন্তু বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে বিরোধ-বিবাদ হইতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। এই মন্ত্র ধরিয়াই আদিসমাজ অক্ষুণ্ণভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য পথে চলিয়া আসিতেছে। এই জন্যই প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে আদিসমাজের মূলভাবগুলি হিন্দুসমাজের অন্তস্তরসমূহে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

আদিসমাজগৃহবিক্রয়ের প্রস্তাব। আমরা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে গত ১৫ই আশ্বিনের সঞ্জীবনীতে আদিসমাজগৃহবিক্রয়ের বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ করা হইয়াছে। অধ্যক্ষসভা এ বিষয়ে সম্মত হইলেও আমরা তাহা সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। আমাদের মতে গৃহখানি ট্রষ্টডীড অনুসারে ট্রষ্টীদের সম্পত্তি হইলেও ইহা রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত হইবার কারণে প্রকৃতপক্ষে কেবল বঙ্গবাসীর নহে, সমগ্র ভারতবাসীর নিজস্ব। ইহা বিক্রয় করিতে গেলে আমাদের মতে সমস্ত ভারতবাসীর মত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে গত ১৫ই আশ্বিন সংখ্যার সঞ্জীবনীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে এবং পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত তদুত্তর যাহা ৫ই কার্ত্তিকের সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

"গত সপ্তাহে ভারতবর্ষের নানাস্থানে রামমোহন রায়ের স্মৃতি সভা হইয়া গিয়াছে। শত শত নরনারী তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য করিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। সিটি কলেজের ছাত্রাবাস রামমোহন রায়ের নামে অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার জন্মস্থান রাধানগরে ভারতের নানাশ্রেণীর লোকের সাহায্যে স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। লাহোরে রামমোহন রায়ের নামে এক বালিকা হাইস্কুল স্থাপিত হইয়াছে। বাঁকিপুরে রামমোহন সেমিনারি নামে বালকদের জন্য এক হাইস্কুল বহুদিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের অন্তর্গত কোকনদে রামমোহন রায় অনাথ আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরে রামমোহন রায় আশ্রম গঠিত হইয়াছে; মান্দ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর, বাঁকিপুর এবং বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে রামমোহন রায়ের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা হইতেছে কিন্তু এদিকে রামমোহন রায়ের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত, যোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজগৃহ বিক্রয় করা হইতেছে। যাঁহাদের হস্তে ঐ ব্রাহ্মসমাজের ভার পড়িয়াছে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি যদি তাঁহাদের বিন্দু পরিমাণ শ্রদ্ধা থাকিত তবে কখনও তাঁহারা এমন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। যে সমাজ ভবন রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনার জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, যেখানে তিনি স্বয়ং উপাসনা করিতেন, যেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপূর্ব্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যান করিয়া বহুলোকের প্রাণে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, সেই পবিত্র স্থান বিক্রয় করিতে যাঁহারা সাহসী হইয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত ভারতবাসীর ধিক্কারের পাত্র হইবেন।

আমরা অবগত হইয়াছি, ৯০৫০০৲ টাকাতে আদি-সমাজগৃহ বিক্রয় করা হইবে। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের আত্মা এই দুরাচার দেখিয়া কি ভাবিতেছেন, তাহা আদি সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ কি একবার চিন্তা করিয়াছেন?

যাঁহারা আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহের ট্রষ্টিরূপে সমাজগৃহ বিক্রয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা আইনসঙ্গতরূপে ট্রষ্টি হইয়াছেন কি না তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। ট্রষ্টিরা উপাসনাগৃহ বিক্রয় করিতে পারেন কিনা তাহাও জানিতে হইবে। যাহাতে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ বিক্রয় হইতে না পারে, তৎপক্ষে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

যেরূপেই হউক মাড়োয়ারীর হস্ত হইতে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি ট্রষ্টিরা বিক্রয় করিতে কৃতসংকল্প হন, তবে রামমোহন রায়ের গুণগ্রাহীগণ মিলিত হইয়া উহা ক্রয় করিবার উদ্যোগ করুন, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

রামমোহন রায়ের প্রধান কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে, ইহা কোনমতেই সহ্য করা যায় না।

মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়গণ রামমোহনের ও তাঁহাদের পিতার প্রিয় ব্রহ্ম-মন্দির বিক্রয়ে বাধা দিবেন, আমরা এইরূপ আশা করি।

সঞ্জীবনী ১৫ই আশ্বিন ১২২৬।

ওঁ

৬।১, দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন,
পূর্ব্বদ্বার যোড়াসাঁকো
কলিকাতা ৩. ১০. ১৯।

শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার,

মহাশয়, গত ১৫ই আশ্বিনের সঞ্জীবনীতে আদিব্রাহ্ম-সমাজগৃহ বিক্রয়ের বিরুদ্ধে আপনি সবল প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। আদি-সমাজের গৃহ এখনও বিক্রয় হয় নাই—হইবার প্রস্তাব হইয়াছে মাত্র। আপনাদের ন্যায় আমিও আশা ও ইচ্ছা করি, যে সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ গৃহবিক্রয়ে নিরস্ত হউন। বিক্রয়প্রস্তাবের উৎপত্তির কারণ এই যে, পল্লী খারাপ এবং সেই কারণে আদিসমাজের অনেক সভ্য ইচ্ছা থাকিলেও উপাসনায় যোগ দিতে পারেন না—সপরিবারে আসা তো দূরের কথা। এই একটী মহান্ বাধা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত হিসাবে আমি এবং আমার ন্যায় আদিসমাজের আরও অনেক সভ্য এই প্রস্তাবের বিরোধী। আমার মতে যদি নূতন কোন একটী উপযুক্ত স্থানে উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বিবেচিত হয় তবে তাহা করা হউক, কিন্তু রামমোহন রায়ের আদিম স্মৃতি বজায় রাখিয়া। অধিকন্তু আমার মতে আদিসমাজ গৃহের আশেপাশের জমী ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজ গৃহকে সুন্দর-রূপে পুনর্নির্ম্মিত করিয়া ইহাকে রামমোহন রায়ের স্মৃতির উপযুক্ত করা হউক। এরূপ করিলেই বিক্রয়প্রস্তাবকদিগের প্রধান আপত্তি খণ্ডিত হইবে। এ বিষয়ে আমি যথা-সাধ্য প্রতিবাদও করিয়াছিলাম। কিন্তু অধ্যক্ষসভার এক অধিবেশনে যখন দেখা গেল যে আদিসমাজগৃহকে পুনর্নির্ম্মিত করিবার মত অর্থসংগ্রহ সম্ভব হইবে না এবং গৃহবিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা হইতে একটী নূতন সমাজগৃহ নির্ম্মিত হইতে পারিবে এবং ভাল পল্লীতে ঐরূপ নূতন সমাজগৃহ নির্ম্মিত হইলে আদি-সমাজের সভ্যগণের সপরিবারে উপাসনায় যোগদান সম্ভব হইবে, তখন কাজেই অধ্যক্ষসভা বিক্রয়প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। আমার নিজের বিশ্বাস ও ধারণা এই যে আদিসমাজের ট্রষ্টিগণ, সভাপতিমহোদয়গণ এবং পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের বংশধরগণ ইচ্ছা করিলে এবং সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে সাধারণ দেশবাসীর সাহায্যে রামমোহন রায়ের এবং দেবেন্দ্রনাথের এই পুণ্যস্মৃতি স্থিরতর রাখিতে পারেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে অন্যত্রও আর একটী সমাজগৃহ স্থাপন করিতে পারেন। আপনি ইচ্ছা করিলে আমার এই পত্র আপনার সঞ্জীবনীতে প্রকাশ করিতে পারেন। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহম্মদীয় শব্দে আপত্তি। আজ কয়েক মাস হইল একজন মুসলমান ভদ্রলোক সুপ্রসিদ্ধ মাদ্রাজ টাইমস পত্রে লিখিয়াছিলেন যে 'মুসলমানগণের মহম্মদীয় (Mahomedan) বলিয়া পরিচয় দেওয়া অনুচিত। মহম্মদীয় শব্দের অর্থ মহম্মদের শিষ্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মহম্মদ মুসলমানদিগের একমাত্র নেতা নহেন। মোজেস, এব্রাহাম প্রভৃতি পয়গম্বরগণও মহম্মদের পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। মহম্মদ সেই ধর্ম্মের অন্যতর প্রচারক মাত্র। মুসলমান ধর্ম্ম পৃথিবীর প্রথম সৃষ্ট মনুষ্যের অর্থাৎ আদমের সময় হইতে প্রচলিত আছে। এই ধর্ম্ম একমাত্র "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করে। ইহাতে মধ্যবর্ত্তীর আবশ্যকতা নাই। মহম্মদ কখনও আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াও প্রচার করেন নাই। সুতরাং প্রকৃত মুসলমান মহম্মদীয় বলিয়া পরিচিত হইতে আপত্তিজনক বলিয়া জ্ঞান করিবে নিঃসন্দেহ।' উক্ত পত্রের দ্বারা প্রচলিত ধর্ম্ম সকল কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

চিন্তালহরী।

ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। ধর্ম্মের দুইটী মূলমন্ত্র—ভগবানে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। এই প্রত্যেক মন্ত্রের আবার দুইটী দিক আছে—অন্বয় ও ব্যতিরেক। অন্বয় দিক দিয়া দেখিলে বুঝি যে ভগবানকেই একমাত্র প্রীতি করিতে হইবে, তাঁহাকেই পিতা-মাতা, সখা প্রভৃতি যে ভাবে যাহার সুবিধা হয় তাহার সেই-ভাবেই প্রাণের ভিতর ধরিয়া পূজা করিতে হইবে। ব্যতিরেক দিক দিয়া দেখিলে বুঝি যে, ভগবান ছাড়া অন্য কোন জীবজন্তুমনুষ্য কাহাকেও ভগবান বলিয়া পূজা করা উচিত নয়; হৃদয়ের আসনে তাঁহার স্থানে আর কাহাকেও বসানো উচিত নয়।

তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন বিষয়েও অন্বয়দিক দিয়া

দেখিলে বুঝি যে, তাঁহার সৃষ্ট জীবজন্তু যেখানে যাহা কিছু আছে, সকলেরই প্রতি দয়াপ্রকাশ করিতে হইবে, সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। ভগবানকে ভালবাসার পরিচয়ই হইল তাঁহার জীবগণকে ভালবাসা। এইজন্যই জীবগণের কষ্টে দুঃখে আমাদের সহানুভূতি জাগিয়া উঠা আমাদের অন্তরে স্বাভাবিকভাবে নিহিত আছে। ব্যতি-রেকের দিকে দেখিলে বুঝি যে, ভগবানের সৃষ্ট কোন জীবকে শরীর, মন বা কথায় কোন প্রকারে কষ্ট দিবে না। ধর্ম্মের এই দুইটী মূলমন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কবে আমরা এই মূল সত্যধর্ম্মকে নিজেদের জীবনে সংসিদ্ধ করিতে পারিব?

ধর্ম্মের আড়ম্বর। পশ্চিমাঞ্চলে দেখা যায় যে, এক একটা নীচু স্থানকে চারিধারে উঁচু বাঁধ দিয়া ঘিরিয়া রাখে, বাহিরের জল আসিবার জন্য একটা স্থান খোলা থাকে। সেই খোলা স্থান দিয়া যতটুকু সম্ভব জল আসিল এবং সেই জল যতদিন না শুকাইয়া যায়, ততদিন সেই জলের দ্বারাই স্থানীয় লোকদের পিপাসা দূর হয় এবং কাজকর্ম্ম চলিতে থাকে। আলস্যের কারণেই হোক বা ঐ প্রকার অন্য যে কারণেই হোক, লোকেরা অধিক নীচে খুঁড়িয়া জলের উৎস বাহির করিতে সম্মত হয় না। তাহার ফলে বাহির হইতে আগত জল গ্রীষ্মকালে যখন শুকাইয়া যায়, তখন একেবারে জলের জন্য হাহাকার পড়িয়া যায়। তখন যে জলাশয়ে নিজের উৎস হইতে জল দিবানিশি বাহির হইতেছে, যাহার জল শুকাইয়া যায় না, লোকেরা সেই জলাশয়ের দিকেই পিপাসা দূর করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। সেই প্রকার, যে মনুষ্য আত্মার অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মের উৎস সকল না খুলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাছে আসিয়া লোক-সকল চিরকাল ধর্ম্মপিপাসা মিটাইতে পারে না। তিনি বাহিরের পড়া বা শোনা বিদ্যা চর্ব্বিতচর্ব্বণরূপে আও-ড়াইয়া বাঁধের জলের মত কিছুকালের জন্য লোকদের পিপাসা মিটাইয়া বাহবা পাইতে পারেন, কিন্তু সময়ে যখন সেই বিদ্যা শেষ হইয়া যাইবে, তখন তাঁহাকে লোকদের তৃষ্ণা নিবারণের উপযুক্ত বিদ্যার জন্য হাহুতাশ করিতে হইবে, আর লোকেরাও তাঁহার নিকটে গিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের অভাব দেখিয়া হাহুতাশ করিতে থাকিবে। যে বাঁধের নিকট হইতে জল না পাইয়া লোকেরা ফিরিয়া যায়, সেই বাঁধ সংস্কারের অভাবে শীঘ্রই মাটিতে ভরিয়া যায়, ক্রমে ক্রমে তাহা সাধারণ জমীর সমান হওয়াতে আর একটুও জল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা রাখে না; সেইরূপ যে মনুষ্য অন্তরের উৎস না খুলিয়া কেবল বাহি-রের বিদ্যা দ্বারাই নিজের আত্মাকে ভরিয়া রাখেন, তাঁহার নিকটে তৃষ্ণার উপযুক্ত উপদেশাদি না পাইয়া যতই লোকেরা ফিরিয়া যায়, ততই তাঁহার অন্তর শুষ্ক হইতে হইতে সময়ে মরুভূমির ন্যায় হইয়া উঠে। সেই-জন্য আমাদের প্রত্যেকের আত্মার গভীর অন্তস্তলে নিহিত ধর্ম্মের উৎস সকল খুলিয়া দিতে হইবে; তাহার উপর যদি বাহিরের বিদ্যাপ্রভৃতি আত্মাতে সঞ্চিত করিয়া রাখো, সে তো ভাল কথা।

ব্রহ্মচক্রে ব্রহ্মশক্তি। এই সমগ্র ব্রহ্মচক্রে একটী মহান্ জ্ঞান কার্য্য করিতেছে। যে কিছু ঘটনা ঘটিতেছে, যে কিছু ইচ্ছা হইতেছে, যে কিছু জ্ঞান জগতে প্রত্যক্ষ হইতেছে, সে সমস্তই সেই মহাজ্ঞানের আত্মপ্রকাশ মাত্র। জ্ঞানের ধর্ম্মই হইল প্রকাশ। তাই আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানের প্রকাশ হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে, আর সেই মহাজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছে এই ব্রহ্মচক্রের বিকাশে। ফুলের পাপড়ি-গুলি যেমন ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে হইতে একটা সুগন্ধ ও সুদৃশ্য পুষ্পে পরিণত হয়, সেই প্রকার মহাজ্ঞান মহাশক্তি সৃষ্টিতে ছড়াইয়া থাকায় সৃষ্টির পাপড়ি-গুলি ক্রমেই ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া শতদলে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই পূর্ণ পুষ্পের যে কবে পরিণতি হইবে, তাহা আমরা জানিও না এবং সম্ভবত কখনই জানিতে পারিব না। যখন সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইবে, তখনই বলিতে গেলে তাহার মুক্তি বা লয়, কারণ মহা-জ্ঞান ব্রহ্মশক্তিই মূলে, ব্রহ্মশক্তিই মধ্যে এবং ব্রহ্মশক্তিই অন্তে। এইজন্য ভারতের জ্ঞানী ব্যক্তি বলিতে সাহস করিয়াছেন যে নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব— সমস্ত জলের যেমন আসল গতি সমুদ্রের অভিমুখে, সেই-রূপ সকল মনুষ্যের আসল গতি সেই ব্রহ্মশক্তির অভিমুখে।

গ্রন্থ পরিচয়।

দাস আমি। শ্রীহরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়, প্রভাকর লাইব্রেরী। ৪ নং রামমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেন, শিবপুর, হাবড়া। মূল্য ॥০ আনা।

"দাস আমি" একটী দার্শনিক প্রবন্ধ। গ্রন্থকার তিনটী খণ্ডে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে "আমি" অর্থাৎ জীব ভগবানের দাস। তিনি "আমির" জন্মলাভ, যৌবনকাল, এবং শেষ জীবন, এই তিন ভাবে আত্মার তিন অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা থাকিলেও লেখক সরল ও সহজ ভাষায় তত্ত্বগুলিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ অনুসরণ করিয়া লেখক এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হইল না; তিনি আপন সুবিধামত বিভিন্ন দার্শনিক মতের অনুসরণ করিয়াছেন।

পূর্ণযোগ। প্রকাশক শ্রীরামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাব্লিসিংহাউস, বোড়াই চণ্ডীতলা; চন্দননগর। গ্রন্থ-কারের নামোল্লেখ নাই।

পূর্ণযোগ পূর্ব্বে কয়েকটী প্রবন্ধের আকারে প্রবর্ত্তকে বাহির হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সে গুলিকে একত্র করিয়া গ্রন্থকার পূর্ণযোগকে পূর্ণমূর্ত্তিতেই সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন। অতীত যুগে, প্রাচীন ভারতে যে কয়টী সাধন পথ প্রচলিত ছিল, গ্রন্থকার ইহাতে তাহাদের প্রত্যেকটীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাদের দোষগুণ পৃথক্ পৃথক্ দেখাইয়াছেন। তিনি হঠযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, এবং তান্ত্রিকযোগ পর্য্যন্ত যোগমার্গের কোথায় কতটুকু সার্থকতা কোথায় বা কতটুকু ত্রুটি ঘটিয়াছে

তাহা পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; অবশেষে দোষক্রটগুলি বাদ দিয়া মার্গগুলির পরস্পর সামঞ্জস্যে লেখক এক নবতর সাধন পথের উল্লেখ করিয়াছেন—তাহারই নাম "পূর্ণযোগ"। বর্ত্তমানে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া যে নবযুগের সূচনা হইয়াছে তাহাতে কেবল ব্যষ্টিজীবনের সিদ্ধি বা মুক্তিই আর আমাদের পরমার্থ নয়, তাহার সহিত চাই এখন সমষ্টিজীবনের সিদ্ধি—নিখিল মানবজাতির সিদ্ধি। ইহাতে সেই নিখিল মানবজাতির সাধনার কথাই বলা হইয়াছে। ভাষা অতি সহজ, সরস, দীপ্তিময়ী; গ্রন্থকারের আপনার শক্তির উপর আস্থা লেখার অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন ভাবের প্রতি একটা বিদ্রোহের ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে দেখা যায়। এই ভাব না থাকিলেই ভাল হইত। আমরা প্রাচীন ও নবীনের সামঞ্জস্য দেখিতে চাই।

কাব্যসাহিত্যে "আমি"র কথা। শ্রীরামনারায়ণ কর, বি-এ কর্ত্তৃক প্রণীত প্রকাশক শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস ৩।১ নং কলেজষ্টীট,—কলিকাতা।

লেখক এই পুস্তকখানিতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাব্যসাহিত্যের একটা দিক ধরিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের অহংভাবমূলক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলিকে তিনি অতি নিপুণতার সহিত পর পর সাজাইয়া সরলভাবে কবিত্বের ভাষায় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক কবিতার অপরিস্ফুট ভাব তাঁহার এই ব্যাখ্যায় সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে; লেখক অবশ্য এ বিষয়ে অগ্রণী নহেন। আরও দুই একজনকে এ পথে আসিতে দেখিয়াছি। ইনি তাঁহাদেরই অনুসরণ করিয়াছেন। অহংরূপী জীব, নানাবিচিত্রতাময়ী এই ধরণীর বক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, জীবনের পথ বাহিয়া, সাধনার পথ বাহিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে অবশেষে একদিন কেমন করিয়া ব্রহ্মানন্দে আসিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে, ইহারই একটা ধারাবাহিক চিত্র লেখক আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন। যতদূর দেখিলাম তাহাতে মনে হয় যে লেখক কেবল রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের মধ্যে "আমি"র কথার অনুসন্ধান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত কোন যোগ না রাখিয়া এইরূপ ব্যাপকভাবে গ্রন্থের নামকরণ করিবার উদ্দেশ্য বুঝিলাম না।

প্রাপ্তিস্বীকার। নববিধান সমাজ হইতে তীর্থযাত্রা, নববৃন্দাবন, নববিধান ট্রাষ্ট, মণ্ডলীগঠন প্রভৃতি কয়েক খণ্ড পুস্তিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

বাইওকেমিক্ চিকিৎসা বিধান, বাইওকেমিক্ মেটিরিয়া মেডিকা এবং বাইওকেমিক্ গার্হস্থ্য চিকিৎসা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইউ, এম্, সামন্ত এল্, এম্, এস্ বাইওকেমিষ্ট, কর্ত্তৃক প্রণীত। ২৮ নং আপার চিৎপুর রোড, সামন্ত বাইওকেমিক ফার্ম্মেসী হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সামন্ত এল্, এম্, এস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাইওকেমিক্ বা জৈব রসায়ন বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের এক অভিনব চিকিৎসাবিধান। জার্ম্মনদেশীয় প্রতিভাশালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেডি শুস্লার মহোদয় এই নব চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তা। এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অভিনব মত হইতেছে এই যে, যে কয়েকটী পদার্থ দ্বারা আমাদের এই স্থূল শরীর গঠিত হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে কোনটীর অভাব বা অল্পতা হইলে বাহিরে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় চিকিৎসা-বিদ্যার ভাষায় তাহারই নাম হইতেছে পীড়া, আর দেহের মধ্যে যে পদার্থটীর যতটুকু অভাব হইয়াছে বাহির হইতে তাহার পরিপূরণ করিয়া দেওয়ার নামই হইতেছে চিকিৎসা। এই মতে ধাতব লবণ হইতে প্রস্তুত দ্বাদশটী মাত্র ঔষধের দ্বারাই সমস্ত রোগ আরাম করা যায়; তাই গ্রন্থকার মুখবন্ধে বলিয়াছেন,—"এই চিকিৎসা অতি সরল, সুন্দর, স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত; এইজন্য ইহা সকল প্রকার চিকিৎসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইউ, এম, সামন্ত মহাশয় নানা বিদেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহায্যে এই অভিনব চিকিৎসা-বিধান সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কয়েকখানি বিপুলায়তন পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা দেশের চিকিৎসাবিষয়ক সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন নিঃসন্দেহ।

কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসকদিগের এই চিকিৎসাবিধান পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ইহার ফল যথাবর্ণিত হইলে কত সহজে যে রোগ হইতে মুক্তিলাভের উপায় প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে।

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। পরমভক্ত নরোত্তমদাস ঠাকুর বিরচিত। শ্রীদুর্গাদাস রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

গ্রন্থখানিতে ভাগবত প্রেম ও ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরম ভগবদ্ভক্ত নরোত্তমদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক ইহা রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অতি প্রিয় বস্তু; কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে এতদিন পর্য্যন্ত ইহার একখানিও পারশুদ্ধ সংস্করণ বাহির হয় নাই। প্রকাশক এই প্রাচীন পুস্তকখানিকে বটতলার আবর্জ্জনা হইতে উদ্ধার করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের—বিশেষত ভক্তিপিপাসুগণের—বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। প্রকাশক তাঁহার সুদীর্ঘ মুখবন্ধের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন, অবশেষে তিনি গ্রন্থকারের একটা জীবনী দিবারও চেষ্টা করিয়াছেন; এবং পাদটীকা ও পরিশিষ্ট সংযোজনা করিয়া তিনি এই প্রাচীন পুস্তকখানি যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয় তাহার জন্য বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়াছেন।

নিত্যসহচর। শ্রীদুর্গাদাস রায় কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৶০ আনা।

সঙ্কলয়িতা তাঁহার এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ-পুস্তিকাখানিতে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ হইতে কতকগুলি অমূল্য উপদেশ এবং সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় হইতে তাহার দিনচর্য্যা পর্ব্বাধ্যায়টী সানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই শিক্ষাসঙ্কট ও স্বাস্থ্যহীনতার দিনে এরূপ প্রাচীন-

উপদেশপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ সাধারণের উপকারে আসিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

শ্রীদুর্গানামমালিকা। শ্রীদুর্গাদাস রায় কর্ত্তৃক বিরচিত; মূল্য ৵০ আনা।

পুস্তিকাখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ইহাতে দুর্গানামের মাহাত্ম্য দেখান হইয়াছে।

চণ্ডী-চরিতামৃত। শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কন কর্ত্তৃক প্রণীত। ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৷৵০ পাঁচ আনা মাত্র।

ইহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পদ্যানুবাদ। অনুবাদটী সুন্দর হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহারা এই অনুবাদ পাঠ করিয়া মূল চণ্ডীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিবেন নিঃসন্দেহ।

আয়ুর্ব্বেদতত্ত্ববিজ্ঞান। পূর্ব্ব ও মধ্যখণ্ড শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ প্রণীত। এই পুস্তকের উদ্দেশ্য ইহার নামেতেই বুঝা যাইতেছে। পুস্তকের মূল্য কত অথবা কলিকাতার কোথায় পাওয়া যায়, তাহার কোনই উল্লেখ নাই। তবে আমরা জানি যে গ্রন্থকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ বটকৃষ্ণ পালের সভাবাজারের কবিরাজী ঔষধালয়ের চিকিৎসক। সুতরাং ঐ স্থানে যে পাওয়া যায় তাহা সুনিশ্চিত। এই দুই খণ্ডে কবিরাজমহাশয় চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় নানা তত্ত্ব পদ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা পদ্যে গভীর বিষয় লিখন সম্বন্ধে কবিরাজমহাশয় সিদ্ধহস্ত। আমাদের দেশ (কলিকাতা ও কয়েকটী সহর ছাড়িয়া) আজও পদ্যানুরাগী। তাই আমাদের মনে হয়, কবিরাজ মহাশয়ের এই পুস্তকখানি পল্লীগ্রামে আয়ুর্ব্বেদীয় তত্ত্বপ্রচারে বিশেষ সহায়তা করিবে। আমরা কবিরাজ মহাশয়কে এই পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ করি।

তপোবন। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত। গ্রন্থখানির সমালোচনা বোধ হয় এক কথায় করা যাইতে পারে—গ্রন্থের তপোবন নামটী সার্থক হইয়াছে। কিন্তু এইটুকু বলিলেই গ্রন্থকার সন্তুষ্ট হইবেন কি না জানি না। তাই আরও দুচার কথায় আমাদের বক্তব্য বলিতে ইচ্ছা করি। গ্রন্থের শেষ কয়েকটি কবিতা বাদ দিয়া যে কয়েকটি পড়িয়াছি, তাহাতেই তপোবনের সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য, পবিত্রভাব, এমন কি তপোবনের গাছপালা কুটীর এবং সৌম্যমূর্ত্তি ঋষিমুনিদিগেরও চিত্র মনশ্চক্ষের সমক্ষে প্রত্যক্ষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কণ্বমুনির তপোবনে যেমন রাজা দুষ্মন্তের মাতঙ্গরাজি প্রবেশ করিয়া তপোবনের শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিল, আমাদেরও আলোচ্য এই গ্রন্থে তপোবনেরও শান্তি "জালিমসিংহ" প্রভৃতি শেষের কয়েকটী কবিতার প্রবেশে কতকটা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। কবিতাগুলিতে যথেষ্ট কবিত্ব আছে, কিন্তু সেগুলি শান্ত তপোবনে প্রবেশের অধিকার পাইবার উপযুক্ত নহে। গ্রন্থখানির প্রাপ্তিস্থান বোধ হয় গ্রন্থকারের চট্টগ্রামস্থ সাধনাকুঞ্জ। গ্রন্থের মূল্য লিখিত হয় নাই—তপোবনের কোন বস্তরই মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, অথচ তাহার প্রত্যেক বস্তই সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য।

গান। (২য় উচ্ছ্বাস) শ্রীবিহারীলাল সরকার প্রণীত মূল্য ॥০ আনা।

রায় সাহেব বিহারী বাবু কেবল বঙ্গবাসীর সম্পাদক বলিয়া নহে, কিন্তু সঙ্গীতরচয়িতা বলিয়াও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের গানগুলিও তাঁহার সে খ্যাতি হ্রাস করে নাই। সকল গানেরই ভিতর তাঁহার প্রাণের ধর্ম্মভাব বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে।

আইন ও আদালত। শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র বি, এল প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা।

আইন আদালত লইয়া যাঁহাদের কার্য্য, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ কাজে আসিবে, ইহা আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি। গ্রন্থখানি যেমন সহজভাবে লিখিত হইয়াছে, ইহার বিষয়বিভাগও তেমনি সুন্দররূপে সংন্যস্ত হইয়াছে। যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে আইন আদালত সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ই পরিত্যক্ত হয় নাই।

৺শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত। শ্রদ্ধেয় ৺শিবনাথ শাস্ত্রী নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা স্বত্বেও নিজের একখানি জীবনী প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পুস্তকখানি প্রায় এক বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, জীবনের নানা ঘটনার সমাবেশও তেমনি মনোজ্ঞ। পুস্তকখানি একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। তিনি প্রাচীন বয়সে বাল্যের ঘটনাগুলি সমস্ত স্মরণ করিয়া খুঁটিনাটিসহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। প্রথম বয়স হইতেই তাঁহার হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু একদিকে উহা সুকোমল হইলেও তাহার ভিতরে যে একটি তেজ ছিল, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়াও সত্যের প্রতি তাঁহার যে যে অটল নিষ্ঠা ছিল, নিজমত রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার যে বিপুল অধ্যবসায় ছিল, তাহাই তাঁহার চিত্তকে অন্যদিকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। বন্ধুসেবা যৌবনে যাহা তিনি অকাতরে করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অপরের পক্ষে গল্পের কথা। আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার অল্পদিনের যোগ। ভক্তিভাজন কেশববাবুর প্রথম আমলের নগর সংকীর্ত্তন তাঁহার হৃদয়কে মাতাইয়া তুলিল। তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে সমস্ত হৃদয়ের সহিত যোগ দিলেন। পরস্পরের মধ্যে কত ভাবের বাধ্যবাধকতা। কুচবিহার বিবাহের পূর্ব্বে হইতেই বিবাদের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল, বিবাহের পরেই শিবনাথ বাবুপ্রমুখ কয়েকজন বীরের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া আসিলেন। এই বিচ্ছেদের কারণ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার যথাযথ বিবরণ তাঁহার আত্মজীবনীতে স্থান পাইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ভাবী ইতিহাস লেখকের নিকট তাহার মূল্য যাহাই থাক, অনেকের মতে কেশববাবু সম্বন্ধে সমালোচনাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য অতিরিক্ত মাত্রায় কঠোর ও তীব্র হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে শিবনাথ বাবু প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে একজন, কিন্তু তাহা হইলেও অসামান্য প্রতিভাশালী কেশব বাবু অনেক বিষয়ে তাঁহার গুরুস্থানীয় ছিলেন। কেশব বাবুতে যে সমস্ত অসামান্য গুণের সমাবেশ ছিল, তাহা মুক্তহৃদয়ে স্বীকার করিতে

শিবনাথ বাবু সঙ্কুচিত হন নাই এ কথা সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও বর্ণনায় আর একটু সংযম থাকিলে ভাল হইত। আবার কেহ কেহ বলিতে চান যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উত্থানের কথা বলিতে হইলে এরূপ অপ্রীতিকর সমালোচনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সে যাহা হউক শিবনাথ বাবু অমিতবিক্রমে দেশ দেশান্তরে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। সম্পূর্ণ নিঃস্বম্বল অবস্থায় বাহির হইলে কেমন করিয়া অযাচিত দান আসিয়া সাধুকার্য্যের সহায়তা করে। তাহার পরিচয় এই পুস্তকে সুব্যক্ত। তিনি ইউরোপ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। সকল স্থানেই তিনি খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য কখন লালায়িত ছিলেন না। তিনি ভগবানের আদেশ বহন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। নিন্দা প্রশংসা তাঁহাকে একদিনের জন্যও বিচলিত করিতে পারে নাই। শেষ জীবনে মহর্ষির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জাগ্রত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে বিদেশীয় ভাব অতিমাত্রায় প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে হতাশ হইয়া পড়িতেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস (ইংরাজিতে) তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। শেষ অংশের জন্য কতক কতক সংগ্রহ করিয়াছিলেন; আমরাও তাঁহাকে কিছু কিছু সহায়তা করিয়াছিলাম; জানি না তাহা প্রকাশিত হইবে কি না। শিবনাথ বাবু একাধারে কবি, বাগ্মী, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও ইতিহাস লেখক। ইংরাজি ও বাঙ্গালা রচনায় তিনি সুপটু ছিলেন। তাঁহার স্থান সহজে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পূর্ণ হইবে না। শিবনাথ বাবু সমাজ-সংস্কারের দিকে অধিকাংশ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই কারণে আত্মচরিতে তাঁহার আধ্যাত্মিকতার ছবি সেরূপে ফুটিয়া উটিতে পারে নাই, যেরূপ আশ্চর্য্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে মহর্ষির আত্মজীবনীতে। আমরা এই পুস্তকের প্রচার ও প্রসার কামনা করি। শ্রী:—

শোক-সংবাদ।

৺ব্রজগোপাল নিয়োগী।—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক রেভারেণ্ড ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় গত ১০ই ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে কেবল নববিধান সমাজ নহে, সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে যে কয়জন উদারচেতা প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল, ব্রজগোপাল বাবু তাঁহাদের অন্যতর। গতপূর্ব্ব ভাদ্রোৎসবে যখন ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার সম্মিলিত উপাসনায় প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন বেদীগ্রহণের জন্য নববিধান সমাজের কাহাকে আহ্বান করা যাইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে সকল শাখার লোকই ব্রজগোপাল বাবুর কথা বলিলেন। ইহা অল্প গৌরবের কথা নহে। ইহাই তাঁহার উদারতার পক্ষে সুদৃঢ় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তাঁহার ন্যায় নির্ব্বিরোধী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি খুবই বিরল। ভগবান তাঁহার আত্মাকে সুশীতল-ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করুন।

৺পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।—কলিকাতা আর্য্যমিশন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য গত ৭ই ভাদ্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কাশীধামের প্রসিদ্ধ ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এক সময়ে শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে সমাকৃষ্ট করিয়াছিল এবং অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিগত কয়েক বৎসর হইতে তিনি বৈদ্যনাথে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সন্তপ্ত হইলাম।

৺ডাক্তার অমৃতলাল সরকার।—প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের সুযোগ্য পুত্র অমৃতবাবু বিগত ২১শে ভাদ্র লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি পিতার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভার জীবন ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিতার আদর্শ হৃদয়ে ধরিয়া আজীবন উক্ত সভার উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অভাবে বিজ্ঞান সভার যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পুরিবে না। তিনি তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

৺শিবনাথ শাস্ত্রী। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম. এ, বিগত ১৩ই আশ্বিন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনৈক প্রতিষ্ঠাতা; বহুকাল ধরিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে করিতে তাঁহার শ্রান্তদেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে। বিগত দুই বৎসর ধরিয়া তিনি রোগভোগ করিতেছিলেন। এমন সুলেখক, সুবক্তা, ত্যাগী ও বীর পুরুষের অভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আজ বিপন্ন। তাঁহার মত আর কেহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মণ্ডলীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। ইদানীং তিনি ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যবিন্দু ছিলেন। তাঁহার উপাসনায় বিমুগ্ধ কে না হইত? ১১ই মাঘের প্রাতে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা উপভোগের সামগ্রী ছিল। সমস্ত জীবন ধরিয়া আপনাকে ভুলিয়া সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ঠিক সেই এক সরল ও অটলভাবে নিজের মত পোষণ করা ও প্রচার করা তাঁহার মত আর কেহ পারিবে কি না জানি না। নিরহঙ্কারী মিষ্টভাষী সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের অভাবে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে একটি সুগভীর শূন্যতা প্রতীয়মান হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যমণ্ডলী পরলোকগত আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ বিগত ২রা নবেম্বর বিশেষভাবে তাঁহার পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে চির শান্তি দান করুন।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

অন্তর্জগতে ব্রহ্মজ্ঞানে অভিব্যক্তি

(ডাক্তার সার ভাণ্ডারকার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥

"আমি একলাই আছি, এরূপ যদি মনে কর তাহা ঠিক নহে; এই পুণ্যপাপদর্শী জ্ঞানী পুরুষ নিত্য তোমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন।"

মনুষ্যের অন্তর্যামী একপ্রকার বুদ্ধি আছে, তাহাতে করিয়া মনুষ্য কোন কাজ করিবার সময়, তাহা ভাল কি মন্দ, যোগ্য কি অযোগ্য এইপ্রকার জ্ঞান সে সহজভাবে লাভ করে। ভাল কিংবা যোগ্য হইলে তাহা করা আমাদের কর্ত্তব্য, মন্দ হইলে তাহা বর্জ্জন করা, তাহা হইতে দূরে থাকা আমাদের কর্ত্তব্য, এইরূপভাবে ঐ বুদ্ধি পরিণত হয়। ইহা ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেচক সাত্ত্বিক বুদ্ধি। সাধারণত যাহাকে আমরা বিবেক বলি তাহা ইহাই। অমুক কাজ যোগ্য, তাহা তুমি কর, এই বিবেকবুদ্ধি মনুষ্যকে এইরূপ আদেশ করে; অমুক অযোগ্য, তাহা তুমি করিও না, এইরূপ নিষেধ করে। ভালোর বিধানকর্ত্তা, মন্দের প্রতিষেধকর্ত্তা, এইরূপ এই বিবেকরূপ বুদ্ধি সর্ব্বদা মনুষ্যের অন্তঃকরণে, কোন কাজ করাইবার সময়, কিংবা করিবার পর, তখনই জাগৃত হয়। বিবেকযোগে, অমুক কাজ ভাল কিংবা মন্দ এইরূপ যে উপলব্ধি তাহা সর্ব্বথা অবাধিত। বিশ্বাসঘাতকতা করা, কাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব নাশ করা—ইহা অযোগ্য, ইহা মন্দ, এবং এই যে মন্দ ইহা মন্দই, কখনই কোন প্রসঙ্গেই তাহার মন্দত্ব দূর হইবার নহে, তাহা ভাল কখনই বলা যাইবে না, এই প্রকারের ঐ ধারণা। এবং এই সাত্ত্বিক বিবেকের আদেশও সেই অনুসারে অনুল্লঙ্ঘনীয়—এইরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমুক কাজ আমাদের কর্ত্তব্যই, তাহা কখনই এড়াইতে পারা যাইবে না, করিতেই হইবে; ঐ কর্ত্তব্য হইতে অমুক অমুক ফল হইবে বলিয়াই করিতে হইবে এরূপ নহে, উহা কর্ত্তব্য বলিয়াই করিতে হইবে,—তারপর ফল যাহাই হোক না কেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে এইরূপ এক কথা আছে যে, এক সময়ে দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ধর্ম্ম আচরণ করিতেছ তাহার কোন ফলই নাই, উল্টা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনবাসের দুঃখ ভোগ করিতেছ, তবে কেন ধর্ম্মাচরণ কর?" তাহাতে ধর্ম্মরাজ উত্তর করিলেন:—

"হে রাজপুত্রি, আমি ধর্ম্ম্যকর্ম্ম হইতে ফললাভ করিব এই উদ্দেশে ধর্ম্মাচরণ করি না; যাহারা দান করে, ঐ দান করাই কর্ত্তব্য এইরূপ মনে করিয়াই তাহারা দান করে। হে কৃষ্ণে, ফল লাভ হোক বা না হোক, কোন ব্যক্তির কিংবা গৃহস্থের যাহা করা কর্ত্তব্য তাহাই আমি যথাশক্তি করিয়া থাকি।" অতএব, এই যে ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক ইহার

আদেশ এইরূপই হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, যোগ্য অযোগ্য,—এই বিষয়ে যে স্বাভাবিক ধারণা তাহা এই প্রকারের যে, যাহা ধর্ম্ম্য অথবা যোগ্য, তাহা কর্ত্তব্য বলিয়াই করিবে; যাহা অধর্ম্ম্য অথবা অযোগ্য তাহা অকর্ত্তব্য বলিয়াই বর্জ্জন করিবে। এবং এই বিবেকের আদেশ অনুসরণ করিয়া চলিলে যোগ্যকে অবলম্বন করিয়া অযোগ্যকে পরিত্যাগ করিলে, আমাদের অন্তঃকরণ শান্ত হয়, আমরা শান্তি ও সন্তোষ অনুভব করিয়া থাকি; কিন্তু ঐ আদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে, অধর্ম্মের আচরণ করিলে, অযোগ্য কাজ করিলে এবং ধর্ম্ম্য ও যোগ্য কাজ পরিত্যাগ করিলে, মন অস্বস্থ হয়, শান্তি নাই সন্তোষ নাই—এইরূপ আমাদের অবস্থা হয়। এই প্রকার যোগ্যাযোগ্য নির্ব্বাচনকারী, সর্ব্বথা অনুল্লঙ্ঘনীয় এইরূপ আদেশকারী এই যে বিবেক ইহা ঈশ্বরের বাণীরূপে আমাদের অন্তঃকরণে সমুদিত হয়। কখনই যাহার বাধা নাই এই প্রকারের সত্য যদি এই বিবেকবুদ্ধি আমাদিগকে জানাইয়া দেয়, আমরা মন্দ কাজ করিলে "হে জীব, তুমি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, তুমি নীচ ও দূষিত হইয়াছ, তোমাতে কলঙ্ক লাগিয়াছে"—এই বিবেকবুদ্ধি যদি আমাদিগকে এইরূপ ভর্ৎসনা করে, এবং ভাল কাজ করিলে, "যাহা ঠিক তাহাই হইয়াছে, তুমি যোগ্য কাজ করিয়াছ" এই বিবেকবুদ্ধি যদি এই প্রকারে আমাদিগকে সন্তোষ দেয় এবং এইরূপে আমাদিগকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবার জন্য যত্ন করে, তবে উহা বিবেকবৎসল মঙ্গলময় পরমেশ্বরেরই বাণী—এইরূপ বলিতে হইবে। এই বাণীকে মানিয়া আমরা নিত্য চলিতেছি এরূপ নহে, নিত্য মত্বশীল হই এরূপ নহে; কিন্তু ঐভাবে না চলিলেও, ঐ বাণীর উক্তি কখনই বন্ধ হয় না। বিষয়প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া যদি আমরা জীবনযাপন করি, তথাপি পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ে বাস করেন; আমাদের পুণ্যপাপের সাক্ষী নিরত থাকিয়া, "তুমি ভাল কাজ করিয়াছ, তুমি যোগ্য ব্যক্তি, তুমি নীচ ব্যক্তি" এই প্রকারের আপন বাণী বিবেক দ্বারা প্রকট করিয়া থাকেন।

তাই, ভগবদ্‌গীতা বলিয়াছেন ঃ—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
১৫-১৫।

ভগবান বলিতেছেন "সকলের অন্তঃকরণের মধ্যে আমি আছি, মনুষ্য বক্র পথে গমন করিলে, তাহাকে বিশুদ্ধ করি (মত্তঃ স্মৃতিঃ), তাহাকে ভাল মন্দ এবং অন্য কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়া থাকি এবং মন্দ হইতে তাহাকে নিবৃত্তি করি"। সেইরূপ আবার—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এইরূপ,—অবিনশ্বর ও নির্ব্বিকার এইরূপ যে ব্রহ্ম তাহার আধার আমি এবং নিশ্চয়াত্মক যে সুখ তাহারও আধার আমি"। শাশ্বত ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহা সকল মনুষ্যেই প্রয়োগ হয়, সে যে বর্ণেরই হোক্ না কেন; সমস্ত আশ্রমেও প্রয়োগ হয়, ভূত-ভবিষ্য-বর্ত্তমান কোনও কালের দ্বারা বাধিত হইবার নহে। আজ যাহা সত্য ও ন্যায্য তাহা ভূতকালেও সেইরূপ এবং ভবিষ্যকালেও সেইরূপ; তাই, শাশ্বত ধর্ম্মের অর্থ, ব্যবহারক্ষেত্রে আমরা যাহাকে নীতি বলিয়া থাকি। তাহার আধার পরমেশ্বর; তাই, ঐ ধর্ম্ম পরমেশ্বরের ইচ্ছারই রূপ বা অভিব্যক্তি। অতএব ঐ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিলে পরমেশ্বরের ইচ্ছা উল্লঙ্ঘন করা হয়, তাহার সহিত বিরোধ করা হয়। তাই অন্যত্র গীতার মধ্যে "শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা" অর্থাৎ শাশ্বতধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা এইরূপ ভগবানের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ভগবান শাশ্বতধর্ম্মকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ যখন পাপ অর্থাৎ অসত্য, অন্যায়, দ্বেষ ইত্যাদি লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় তখন ঈশ্বরের যোজনায় পাপ বিনষ্ট হইয়া পুণ্যের উৎকর্ষ হইয়া থাকে।

অবিশ্বাস।

(শ্রীনির্ম্মল হাসিনী দেবী)

সুরম্য কানন মাঝে প্রমোদ প্রাসাদ
বড় সাধে রচেছিনু লতায় পাতায়;
সুসজ্জিত নানা চিত্রে কুসুম আসবে
রেখেছিনু আলোকিয়া শান্তি জ্যোছনায়,
করি সহচরী প্রিয় সখী কল্পনায়
রাখিয়ে এ ক্ষুদ্র মুখ তাহার বক্ষেতে

ভুলি জগতের সর্ব্ব দুঃখ-বেদনায়
রয়েছিনু আত্মহারা সুখ-স্বপনেতে ;
সংসারের কোলাহল পশেনি শ্রবণে
পশে নাই শোক-তাপ সুখের ভবনে
পূর্ণ বিশ্বাসের কোলে সুখে করি খেলা
কেটে যেত জীবনের সুমধুর বেলা।
কে তুইরে ভীমবেশে সহসা আমার
ভেঙ্গে দিলি নিমেষেতে সুখের স্বপন
পদাঘাতে চূর্ণ করি সুখের সংসার
জ্বেলে দিলি বক্ষমাঝে তীব্র হুতাশন
কেরে তুই নিরদয় পাষাণের প্রায়,
কোমল কুসুম আহা দলিলি চরণে ?
যে জন ভ্রমিতেছিল শান্তি পিপাসায়,
পোড়াইলি হৃদি তার অনলদহনে ?

প্রেম।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী)

তোমার চারদিকে সৌন্দর্য্য, চারিদিকে প্রেম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটী অনন্ত প্রেমপারাবার। ইহার অনন্ত জলরাশি, অগণিত সৈকতমালা, অসংখ্য ঊর্ম্মিনিচয়, আবর্ত্ত, বুদ্‌বুদ্ যাহা কিছু সমস্তই প্রেমে বিনির্ম্মিত। এই প্রেম পয়োনিধি তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, তোমার চক্ষু থাকিতেও তুমি অন্ধ হইয়াছ ; ঐ প্রেমরাশি তোমাকে নিয়ত আহ্বান করিতেছে তাহা তুমি শুনিয়াও শুনিতেছ না, কর্ণ থাকিতেও তুমি বধির হইয়াছ। এই অনন্ত প্রেম-সমুদ্রে তুমি নিয়ত ভাসিয়া বেড়াইতেছ কিন্তু তাহা অনুভব করিতে পারিতেছ না। এই প্রেম-পারবার না থাকিলে তুমি একদিনও জীবিত থাকিতে না,—তোমার জীবনী শক্তিই ঐ প্রেমপারাবার। ঐ প্রেমই তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে ইহা তুমি জান ; কিন্তু তোমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তুমি জানিয়াও জানিতেছ না। তুমি কি চাও ? তুমি যাহা চাও তাহা কি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই ? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা নাই তাহা তুমি চাওনা। তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে সুখে ও আনন্দে রাখিতে তোমাকে অনন্ত জীবন দিতে যাহা কিছু আবশ্যক তাহা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই আছে, আছে বলিয়া তুমিও আছ নচেৎ থাকিতে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার অনন্ত ভাণ্ডার তোমার জন্য খুলিয়া রাখিয়াছে ; ইচ্ছা করিলে তুমি সমস্ত ভাণ্ডার আত্মসাৎ করিতে পার, কিন্তু সমস্ত ভাণ্ডার তুমি চাও না, উহার গুটিকতক বস্তু লাভ করিয়াই তুমি যথেষ্ট মনে কর, তোমার তৃষ্ণা তাহাতেই মিটিয়া যায় আর অন্যগুলির প্রতি দৃক্‌পাতও কর না। তাই বলিতেছিলাম চক্ষু থাকিতেও তুমি অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও তুমি বধির। এই অনন্ত ভাণ্ডার তোমারই জন্য ছড়ান রহিয়াছে এই অনন্ত প্রেম তোমাকেই আহ্বান করিতেছে, শুনিতেছ কিন্তু তাহাতে মন দিতেছ না। তুমি কূপমণ্ডুকের ন্যায় স্বল্পজলে সন্তরণ করিতে শিখিয়াছ এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক। অনন্ত জলে সন্তরণ করা যে কি সুখ তাহা তুমি জান না, কখনও তাহা আস্বাদন কর নাই তাই গুটিকতক বস্তু পাইয়াই আপনাকে সুখী ও ধন্য মনে কর।

ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি প্রকৃতই সুখী কিনা ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেমন অনন্ত তোমার হৃদয়টীও সেইরূপ অনন্ত। গুটিকতক বস্তুতে তোমার অনন্ত হৃদয় কদাচ ভরিতে পারে না। তুমি সুখী নও। তুমি সর্ব্বদাই অভাব অনুভব কর, তুমি আরও কিছু চাও। যাহা পাইয়াছ তাহাতে তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই। আপন আপন অবস্থায় কেহই সুখী ও নিশ্চিন্ত নহে। ঐ কূপমণ্ডুক জানে না যে তাহার বাসস্থান কূপটীর বাহিরেও জগৎ আছে। জানে না বটে কিন্তু তাই বলিয়া যে সে কূপটীতে সুখী ও নিশ্চিন্তভাবে বাস করিতেছে তাহা নহে। বহির্জ্জগতের জ্ঞান না থাকিলেও বহির্জ্জগতের প্রতি তাহার প্রাণের টান আছে। সে যেন কিছু চায়—কি চায় সে তাহা জানে না। তাহার সন্তরণপ্রবৃত্তি সেই কূপটীর গায়ে গিয়া শেষ হয়, আর প্রসারিত হয় না ; এই অবস্থাটা তাহার সুখের অবস্থা নহে, তাহার আকাঙ্ক্ষা এইখানেই শেষ হয় না। আকাঙ্ক্ষা শেষ হয় না সত্য, কিন্তু কি উপায়ে সেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে ইহাও সে জানে না। কূপের বাহিরে যে জগৎ আছে ইহা তাহার জানা নাই। ঐ মণ্ডুকের মত তুমিও জান না যে, যে গুটিকতক বস্তু লইয়া তুমি আপন

গণ্ডী মধ্যে আবদ্ধ আছ তাহা ছাড়া তোমার আপনার বলিবার আরও অনেক আছে—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে। সেই অনন্তের প্রতি তোমার জ্ঞান ধাবিত হয় না, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ধাবিত হয়। তোমার প্রাণটা সেইদিকে ছুটিয়া যাইতে চায়। তুমি আমার বলিবার যতই পাইতেছ ততই চাহিতেছ, সুখী ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছ না। অনন্তের পিপাসা কদাচ পরিমিত বস্তুতে মিটে না।

ঐ যে উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল সুনীল জলনিধি হাসিতেছে, নাচিতেছে, গভীর গর্জ্জন করিতেছে; ঐ যে শুভ্র তুষারমণ্ডিত গিরিনিচয় নানা জাতীয় তরু-গুল্মলতায় শোভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ঐ যে নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারাগণ, অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রগণ আপন আপন উজ্জ্বল কিরণমালায় মণ্ডিত হইয়া বিচরণ করিতেছে, ঐ যে তটিনী, ঐ যে নির্ঝরিণী, ঐ যে শ্যামল শস্পবীথিশোভিত প্রান্তর, জ্যোৎস্নাধবলিত নদীসৈকত; নানা বর্ণে রঞ্জিত মধুরঝঙ্কারকারী বিহঙ্গমবৃন্দ ও পতঙ্গগণ, ঐ যে অশেষ-রূপলাবণ্যবিশিষ্ট নর নারীগণ, ইহারা প্রত্যেকে কি তোমার চিত্ত আকর্ষণ করে না? ইহারা প্রত্যেকে কি সুন্দর নহে? ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র বৃহৎ হইতেও বৃহৎ সকলেই সুন্দর। প্রেমচক্ষে উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর তোমার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ হইবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে ইহাদের সহিত তোমার প্রাণের কি অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। ইহারাই আনন্দের মলয়হিল্লোল উঠাইয়া তোমার প্রাণ-কুসুম ফুটাইয়া তুলে, এই হিল্লোলের অভাবে তোমার প্রাণকুসুম শুকাইয়া যায়, তুমি দুঃখময় মৃত্যুশয্যায় নিপতিত হও। নির্জ্জন কারাবাসের অন্ধকারময় বাসস্থান, অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন চিররজনী আমাদের এত অপ্রিয় ও দুঃখজনক কেন? সেই হিল্লোলের অভাব—পূর্ণ মাত্রায় অভাব নহে, আংশিক অভাব—তাই প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকি, ষোল আনা অভাব হইলে কেহ বাঁচিতে পারিত না।

জগৎজননী তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি নানাভাবে নানা আকারে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করিয়াছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারই রূপ—তাঁহারই প্রেমের উচ্ছ্বাস। তিনিই তরুতে আছেন, লতাতে আছেন, পর্ব্বতে আছেন, নদীতে আছেন, সমুদ্রে আছেন, তিনি বিশ্বব্যাপী আকাশে আছেন, আকাশের অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রে আছেন। তাঁহারই শক্তি বায়ুরূপে বহিতেছে, অগ্নিরূপে জ্বলিতেছে, বিদ্যুতরূপে বিস্ফুরিত হইতেছে, জ্যোতিরূপে প্রকাশ করিতেছে। কুসুমকাননে অপূর্ব্ব শোভা, নরনারীগণের কমনীয় কান্তি, বিহঙ্গকুলের রমণীয়তা ও সুমধুর স্বরলহরী সমস্তেই তিনি। তিনিই দয়ারূপে, শান্তিরূপে, প্রীতিরূপে, প্রেমরূপে হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই পিতারূপে সৃষ্টি করিতেছেন, মাতারূপে পালন করিতেছেন, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূলে তিনিই। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যদিও ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন নহে, সকলেই এক শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত; ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সেই বিরাট পুরুষের অঙ্গ মাত্র; পরস্পর পৃথক হইলেও সেই বিরাট পুরুষ হইতে পৃথক নহে। তুমিও যাঁহার আমিও তাঁহার। তুমি যেখান হইতে আসিয়াছ আমিও সেখান হইতে আসিয়াছি; তুমিও যেদিকে যাইতেছ আমিও সেই দিকে যাইতেছি। পরস্পরের পন্থা বিভিন্ন হইলেও গন্তব্য স্থান বিভিন্ন নহে। এই বিস্তীর্ণ প্রেমজলধির আমরা এক একটী তরঙ্গ তাহা হইতে উঠিতেছি। আবার তাহাতেই লয় হইয়া যাইতেছি। তবে কেন আমরা পরস্পর পৃথক মনে করি? কেন "আমার" "তোমার" এই সকল অপ্রকৃত ভাব হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়া এই আনন্দের রাজ্যে দুঃখ আনয়ন করি? আমি কেন তোমার সহিত কলহ করি? রাম কেন শ্যামের বস্তু আপন আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে? শ্যাম কেন রামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়? হরি কেন মদগর্ব্বে মত্ত হইয়া আপনাকে সর্ব্বোচ্চ মনে করে? জারমানি কেন ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া পৈশাচিক বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জগতে এই ঘোর অশান্তি আনয়ন করে? ইহা আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থা নহে, আমরা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াছি। বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছি। আমরা আমাদের ভালবাসা অপাত্রে প্রদান করিতে শিখিয়াছি। আমরা নিজেকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি; জগৎকে ভালবাসিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ; সেই

প্রেমের প্রকৃত পাত্র খুঁজিয়া না পাইয়া অপাত্রে সমর্পণ করিয়াছি। আমাকে এবং আমার বলিবার যাহা কিছু আছে তাহাকে ছাড়া আমরা অন্যকে ভালবাসিতে পারি না। 'আমি কে'? 'আমার কে'? বৃথা হাহা করিয়া মরি। এ ভালবাসায় কি সুখ আছে? শান্তি আছে? আনন্দ আছে? কথনও থাকিতে পারে না! মূলে 'আমি' বলিয়া কিছু নাই, তাহার উপরে কোন বস্তু স্থাপিত হইতে পারে না। আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে গেলে দুর্গ দাঁড়াইবে না, ক্রমশঃ পড়িতে থাকিবে, দুর্গকে আকাশে দণ্ডায়মান রাখিবার জন্য তুমি শত চেষ্টা করিবে চেষ্টা ফলবতী হইবে না, চেষ্টা করিতে গিয়া চিরজীবন দুঃখ, ক্লেশ, সন্তাপ ভোগ করিবে। তাহাই ত হইতেছে। আমরা কি করিতেছি? "আমি" "আমি" "আমার" "আমার" করিয়া চিরজীবন মরিতেছি, কত দুঃখ কত ক্লেশ পাইতেছি, আমিই বা কোথায় 'আমার'ই বা কোথায়? কেহই ত থাকে না। কাহাকেও ত রাখিতে পারি না; হাহাকার করিতে করিতে পরিশেষে মৃত্যুর কোলে শয়ন করিয়া শান্তি লাভ করি! সব "আমি" "আমি" "আমার" "আমার" এইখানেই শেষ হইয়া যায়।

"আমি" একটী কাল্পনিক বস্তু। উহার কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। উহা আমাদের সংস্কারলব্ধ। জগতের বস্তুগুলি মূলে অভিন্ন হইলেও আপাত-বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা ঐ আপাত-প্রতীয়মান বিভিন্নতাকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিরপেক্ষ সত্য বলিয়া মনে করি এবং ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে ঐ মিথ্যা সংস্কার দৃঢ় হইয়া যায়। আমা হইতে অপরকে পৃথক জ্ঞান হয় এবং "আমি" এইরূপ কাল্পনিক মিথ্যা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

'আমি' হইতে 'আমার' উৎপন্ন হয়। আমার দেহ, আমার গেহ, আমার পুত্র, আমার পরিবার, আমার বিষয়, এই সকল জ্ঞান "আমি" আছে বলিয়া হয়। ইহারাও কাজেই মূলে কাল্পনিক। ইহাদের প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নাই। দেহ, গেহ, পুত্র, পরিবার সবই আছে; কিন্তু সেগুলি যে আমার ইহা একটি মিথ্যা সংস্কার মাত্র! এই মিথ্যা সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা ঐ সকল বস্তুর সহিত "আমার" এই সম্বন্ধটী বজায় রাখিতে কত দুঃখে, কত ক্লেশে পড়ি তাহার আদি-অন্ত নাই। আজীবন ইহারই চিন্তা করি। জীবন এই চিন্তাতেই শেষ হইয়া যায়। কথনও উল্লাস, কথনও নৈরাশ্য, কথনও আনন্দ কথনও দুঃখ; আজ হাসি, কাল কাঁদি, আজ জন্মমহোৎসব, কাল প্রেতকৃত্য ও রোদন— এই ভাবে জীবন কাটে, 'আমার' কেহ হয় না। শত চেষ্টায়ও 'আমার' এই সম্বন্ধটী ঐ সকল বস্তুতে বজায় রাখিতে পারি না। 'তারা আসে তারা চলে যায়'। তাহারা নদীর স্রোতে সমুদ্রের পানে ধাবিত; ক্ষণকালের জন্য আমার সম্মুখে আসে আবার চলিয়া যায়। তাহারা চাঁদের আলো— কথনও পৌর্ণমাসী কথনও অমানিশা। তাহারা আমার নহে—চেষ্টা করিলে তাহারা আমার হইবে কেন? তাহারা আপন কাজে জীবনের অনন্তপথে চলিয়াছে। কর্ম্মসূত্রে দুদিনের জন্য তোমার সঙ্গে মিলিত হয়, কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হইলে আর তোমার কাছে থাকে না। তুমি পাগল হইয়া তাহাদের পিছু পিছু ছোট কেন? ছুটিলে কি ধরিতে পারিবে? তোমার গতি কত দূর? তাহার পথ অনন্ত। এই পাগলামির জন্যই ত আজীবন কষ্ট পাও। এই ভ্রান্তিই ত তোমাকে প্রকৃত প্রেমানন্দে বঞ্চিত করিতেছে। তোমার 'আমি'র বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া ঐ অনন্তের পথে তুমিও ছুট দেখি; ঐ অনন্তে তোমার হৃদয়টী সমর্পণ কর দেখি, তখন তুমি তাহাদিগকে পাইবে। তাহারা তোমার নহে— তাহারা ঐ অনন্তের। তাহাদিগকে পাইতে হইলে তোমাকেও অনন্তে ছুটিতে হইবে। তখন তুমি প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে, তখন তোমার শোক থাকিবে না, তাপ থাকিবে না, নৈরাশ্য, হাহাকার, মান, অভিমান কিছুই থাকিবে না, শুধুই প্রেম— প্রেমের সমুদ্র, তুমি তাহাতে সন্তরণ করিতে থাকিবে। এই প্রেমে তোমার হৃদয়টী পূর্ণ আছে, কিন্তু চাপা পড়িয়াছে। তোমার অলীক চিন্তায় উহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

ঐ শুভ্রফেন রাশিবিশোভিত, তরঙ্গমালাসঙ্কুল অনন্ত সমুদ্রের পানে যখন দৃষ্টিপাত কর, যখন ঐ পূর্ণ-শশধর-মণ্ডিত, অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রখচিত নীল-

নভোমণ্ডলের প্রতি তোমার দৃষ্টি নিপতিত হয়, যখন মলয়হিল্লোল তোমার চারিদিকে বহিয়া যায়, কুসুমরাশি ফুটিয়া উঠে, কোকিল কুহুরবে ঝঙ্কার করিতে থাকে, তখন ক্ষণকালের জন্য তোমার চিত্ত বিমোহিত হয়, তুমি অপার আনন্দ অনুভব কর; কিন্তু কতক্ষণ? তুমি কি ইহাতে ডুবিয়া যাইতে পার?—না। তোমার 'আমি' তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তোমাকে ডুবিয়া যাইতে দেয় না; পশ্চাৎ হইতে আকর্ষণ করে, আবার তোমাকে গণ্ডীর ভিতরে লইয়া আইসে। তখন কোথায় সেই সমুদ্র! কোথায় সেই নীলনভস্তল! "তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে" সেই গৃহ, সেই পরিবার, সেই দুঃখ, সেই সন্তাপ চারিদিকে মক্ষিকা-রাশির ন্যায় তোমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলে।

এই চিন্তাগুলি যদি পরিত্যাগ করিতে পার তাহা হইলে অন্তরে আনন্দ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। তখন আনন্দময় হইয়া যাইবে, তখন দুটী চারটী বস্তু "আমার" বলিবার থাকিবে না, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড "আমার" হইয়া পড়িবে। কিংবা আমিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের হইয়া যাইব। তখন প্রেমের বস্তু আর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না, আশে পাশে চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে; তখন প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া প্রহরী নিযুক্ত করিয়া প্রেমের বস্তু রক্ষা করিতে হইবে না, তখন সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া, শোণিতস্রোতে মেদিনী প্লাবিত করিয়া, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা আচরণ করিয়া নরনারীগণের হাহাকারে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করাইয়া প্রেমরস আস্বাদন করিতে হইবে না। প্রেম আমাদের চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে তাহার জন্য চেষ্টা ও বলপ্রয়োগের কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা যে পথে চলিয়াছি সে পথে প্রেম নাই, সে পথে দুঃখের সাগর। প্রেমকে সীমাবদ্ধ করিতে গেলে প্রেম থাকে না, স্বার্থপরতা হয়। স্বার্থপরতাই সকল দুঃখের আকর।

দুই ব্যক্তি দাবা কি পাশা খেলিতে বসিয়াছে। নিজ পক্ষের ঘুঁটিগুলিকে প্রত্যেকে আপন মনে করিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। ঐ ঘুঁটিগুলির চিন্তায় তখন তাহারা নিমগ্ন, কারণ ঐ গুলির মঙ্গলে তাহাদের মঙ্গল, গৌরব, যাহা কিছু সমস্তই। এই খেলা লইয়া বালকের মত কখন কলহ করিতেছে, কখন বা হায় হায় করিকরিতেছে, কখনও বা উৎসাহে নৃত্য করিতেছে, আবার কখনও বা অভিমানে গরগর করিতেছে। কেন করিতেছে? অচেতন ঘুঁটিগুলির সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ? কটুতিক্তাদি কোন রসই ঘুঁটিতে নাই যে রসনার তৃপ্তিসাধন করিতে পারে। সৌন্দর্য্যও তেমন কিছু নাই যে নয়নরঞ্জন করিতে পারে। তবে কেন ঘুঁটি এত প্রিয়? তবে কেন ঘুঁটির গায়ে আঘাত নিজ গাত্রে আঘাতের মত লাগে? ঘুঁটি কি গুণে মোহিত করিয়াছে? ঘুঁটিগুলির সহিত ক্রীড়কদের প্রত্যেকের "আমার" এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই "আমার" সম্বন্ধ বজায় রাখাই প্রত্যেকের চেষ্টা। তাহাতেই আনন্দ, গৌরব, উৎসাহ, অহঙ্কার সমস্তই এবং তাহাতেই হাসি, হায়! হায়! বিবাদ কলহ ইত্যাদি। ভাবিয়া দেখ, এই "আমার" সম্বন্ধের মূলে কি আছে! কিছুই নাই। কল্পনা মাত্র। খেলা সাঙ্গ হইয়া গেলে আর কিছুই থাকে না। তখন আমার ঘুঁটি তোমার ঘুঁটি এক হইয়া যায়, সেই উৎসাহ সেই নৃত্য, সেই দুঃখ, সেই অভিমান কিছুই থাকে না।

সংসারটাও ঐরূপ একটী খেলা। আমার দেহ, আমার গেহ, আমার পুত্র, আমার পরিবার, আমার বিষয়, আমার সম্পদ, আমার জাতি, আমার দেশ, আমার রাজ্য এ সমস্তই ঐ খেলার ঘুঁটির মত কল্পনা। এই কল্পনা হইতে মায়া উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে অশেষ দুঃখে দুঃখিত করে। এই মায়ার প্ররোচনায় পড়িয়াই আমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু হই, নির্দ্দয়তা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি আচরণ করি। অপরকে পরাভব করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি, অভিমানের বশবর্ত্তী হই, অন্যায়াচরণ করিতে কুণ্ঠিত হই না এবং অনেক সময়ে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যও করিয়া থাকি। আমাদের যত কিছু শোক, তাপ, দুঃখ; জগতের যাহা কিছু হাহাকার দুর্দ্দশা সমস্তই এই মায়া-জনিত। জগতের লোক যেন পাগল হইয়া এই মায়াজালে আবদ্ধ হইতেছে এবং আপনাদের সর্ব্বনাশ আপনারা আনয়ন করিতেছে। ইহা হইতে সুখ আশা করিতেছে, পাইতেছে না। সুখ যে পথে আছে সে

পথে কেহ যাইতেছে না। জগতকে ভাল না বাসিয়া আপনাকে ভাল বাসিতেছে, জগতকে অগ্রাহ্য করিয়া, এমন কি উৎপীড়ন করিয়াও আপনার জয়ঢাক বাজাইয়া সুখী হইবার চেষ্টা করিতেছে। সুখী ত কেহ হইতেছে না, যাহার মূলে কিছু নাই তাহা হইতে সুখ কি প্রকারে আসিতে পারে?

ঐ আমিত্বের গণ্ডীর ভিতরে সুখ খুঁজিলে সুখ পাওয়া যায় না। সুখ প্রেমে আছে ইহা সত্য, কিন্তু প্রেমকে যদি গুটিকতক বস্তুতে আবদ্ধ রাখিয়া সীমাবদ্ধ কর তাহা হইলে প্রেমের প্রেমত্ব থাকে না এবং তাহা হইতে সুখও পাওয়া যায় না। গুটিকতক বস্তু আমার হইবে আমি তাহাদিগকেই ভালবাসিব এরূপ অবস্থায় দুঃখ ভিন্ন সুখ কদাপি হয় না।

ঐ বস্তু কয়েকটীকে "আমার" করিয়া রাখিতে গিয়া কষ্টই পাওয়া যায় সুখ পাওয়া যায় না; তাহারাও চিরদিন "আমার" হইয়া থাকে না। অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গ একটার পর একটা আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে; সকলেই তোমার মনোরঞ্জন করিতেছে, তুমি যদি কয়েকটী মাত্র তরঙ্গকে ভালবাস, অন্যগুলিকে চাওনা তাহা হইলে তুমি বঞ্চিত হইবে। সেই কয়েকটী তরঙ্গকে তুমি কি প্রকারে ধরিয়া রাখিবে? তাহারা আসিবে চলিয়া যাইবে, আবার নূতন একদল আসিবে। এই নূতন দলকে প্রেমে আলিঙ্গন করিবে না? পুরাতন দলের জন্য বসিয়া বসিয়া কাঁদিবে? কয়েকটী মাত্র ফুল তুলিয়া আনিয়া তোড়া বাঁধিয়া তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া দিয়াছে। তুমি যদি কেবল ঐ তোড়ার ফুলগুলিকেই ভালবাস, অন্য ফুলের দিকে ফিরিয়াও না দেখ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে দিনকতক পরে তোড়ার ফুলগুলি শুকাইয়া গিয়াছে, তোমার মনোরঞ্জন করিবার ফুল আর জগতে নাই—যদিও জগত ফুলে ভরা।

অনন্ত জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে, সকলই সুন্দর সকলকেই ভালবাসিতে শিখ; আমি, আমি, আমার আমার এই সকল কাল্পনিক চিন্তা দূর কর। সকলকে ভালবাসিতে পারিলে সকলই তোমার হইবে অথবা তুমিই সকলের হইয়া যাইবে। সর্ব্বদা আমিত্বের গণ্ডী মধ্যে থাকিয়া আমি, আমি, আমার, আমার, চিন্তা করিয়া তোমার মন সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, মনটী সর্ব্বদাই চিন্তায় মগ্ন থাকে, কখনও ভয়, কখনও আশা, কখনও নৈরাশ্য, কখনও আনন্দ কখনও নিরানন্দ প্রভৃতি নানাপ্রকারের তরঙ্গে তোমার মনটী তরঙ্গায়িত থাকে, তুমি প্রাণ ভরিয়া কাহারও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পার না। তুমি প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কাহাকেও ভালবাসিতে পার না। একবার ঐ গণ্ডী হইতে সরিয়া যাও দেখি, তখন সকলেই তোমার আপনার হইবে, সকলের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদিবে, সকলকেই পাইয়া পরম সুখী হইবে। তোমার দুনয়নে সর্ব্বদা প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে থাকিবে, যাহা দেখিবে, যাহা পাইবে, ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক সমস্তই তোমার প্রেমের বস্তু হইবে, তুমি প্রেমসাগরে ভাসিতে থাকিবে। হাহাকার, দুঃখ, শোক, তাপ, নৈরাশ্য, মান, অভিমান, অহঙ্কার এ সকল কিছুই থাকিবে না। এই শিক্ষাই মনুষ্যজীবনের উচ্চ শিক্ষা এবং ইহাতেই আমাদের একমাত্র উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আসিবে, ধরাধামে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই অবস্থাটী মনুষ্যের স্বাভাবিক অবস্থা, এই অবস্থা লইয়াই মনুষ্য ধরাধামে আইসে কিন্তু আসিয়াই মায়াজালে আবদ্ধ হয়। জগতকে ভুলিয়া যায়, আত্মপ্রেমে মত্ত হয়, প্রেমের পরিবর্ত্তে স্বার্থপরতা অবলম্বন করে, সুধা পরিত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ করে!

পুত্রকলত্রাদিকে ভালবাসিতে হইবে না, তাহাদের ভরণ-পোষণ, রক্ষাবেক্ষণ করিতে হইবে না, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিতে হইবে, এ কথা কেহ বলিতেছে না। ঐ সকল তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভগবান তোমাকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তোমার কর্ত্তব্য তুমি অবশ্যই করিবে, তাহাদিগকে ভালবাসিবে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, কিন্তু তাহাদিগকে আপনার মনে করিয়া মত্ত হইবে না। মায়ার বশীভূত হইবে না। সেগুলি তোমার সম্পদ ইহা কখনও মনে করিয়া অহঙ্কৃত হইবে না। উহারা তোমার সম্পদ নহে। তুমি তাহাদের রক্ষক মাত্র। যাঁহার সম্পদ তিনি পাঠাইয়াছেন, আবশ্যক হইলে আবার লইয়া যাইবেন। তুমি ভ্রান্ত হইয়া তাহাদের মায়ায় মুগ্ধ হও কেন?

ইহাতে তোমার দুঃখ বই সুখ নাই, ইহাতে তোমার হৃদয়ের প্রকৃত প্রেম চলিয়া যায়, তোমাকে স্বার্থপর দাম্ভিক নীচাশয় করিয়া তুলে। তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব আর থাকে না। এই কুশিক্ষার বলে মনুষ্যসমাজ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রেমের সুধাভাণ্ডার হইতে সকলে বঞ্চিত হইয়াছে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, জাতিতে জাতিতে বিবাদ, পরস্পর পরস্পরের সর্ব্ব নাশ করিয়া সকলে দুঃখসাগরে ভাসিতেছে। ইহা কুশিক্ষা, ইহা ভ্রান্তি,—তুমি আমি এই কুশিক্ষা ও ভ্রান্তি দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু যিনি মহান্, যিনি সকলের নিয়ন্তা ও রক্ষাকর্ত্তা, যিনি সর্ব্ব-অন্তঃকরণে আছেন, যিনি সকল বুদ্ধির আকর, সকল জ্ঞানের আধারস্বরূপ যিনি সর্ব্বব্যাপক, যাঁহার শক্তিতে এই অনন্ত জগৎ চলিতেছে, সৃষ্ট হইতেছে, লয় প্রাপ্ত হইতেছে;—তিনি দেখিতে পান; তাই তিনি সময়ে সময়ে জগতের শিক্ষার্থ তদীয় গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে প্রেরণ করেন। জগতকে এই বিশ্বজনীন প্রেমশিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন, যীশু আসিয়াছিলেন, মহম্মদ আসিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব আসিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই প্রেমের বাঁশরী লইয়া জগতে অবতীর্ণ হন, এবং সেই বংশীধ্বনিতে জগতকে মাতাইয়া তুলেন। সেই বংশী সমস্বরে এই গানই গাহিয়াছিল যে আত্ম-পর, মান অভিমান, উচ্চনীচ, ভেদাভেদ সব ভুলিয়া যাও। জগৎ তোমার—জগৎ তোমাকে বাহু তুলিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য আসিতেছে, তুমি জগতকে আপন বক্ষঃস্থলে ধারণ কর, প্রেমভরে সকলকে আলিঙ্গন কর, প্রেমের সুবাতাস বহিতে থাকুক, নরনারী তাহা উপভোগ করিয়া অমরত্ব লাভ করুক। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনের গহন কাননে বসিয়া এই বংশী ধ্বনিত করিয়াছিলেন, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ব্রজবাসীগণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের কুল, শীল, মান ও অভিমানের বাঁধন খসিয়া পড়িয়াছিল, মধুর বৃন্দাবন প্রেমময় হইয়াছিল; সেই প্রেমতরঙ্গ ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল।

ভগবান প্রেমময়, তিনি প্রেমের সাগর, আমরা সেই প্রেমসাগরের এক একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ—আমরা পরস্পর পৃথক্ নহি; আমরা সকলে এক প্রেম-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। ভেদাভেদ ভুলিয়া যাও, নিখিল বিশ্বকে প্রেমচক্ষে দেখ, শ্রীকৃষ্ণ জগতকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই শিক্ষামন্ত্র যখন বহুকাল পরে ভারতবাসী ভুলিয়া যাইতেছিল, তখন বুদ্ধদেব সেই শিক্ষাই অন্য প্রকারে জগতকে দিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তিনি সাম্যমৈত্রীর ধ্বজা উড্ডীয়মান করিয়া জগতকে আহ্বান করেন, ও জগতের লোক সেই ধ্বজার চতুঃপার্শ্বে সমবেত হইয়া পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। প্রাচ্য জগতে এই শিক্ষা বহুকাল যাবৎ চলে, কিন্তু কালের গতিতে সেই শিক্ষা যখন আবার লোপ হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছিল তখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আগমন করেন। তিনি প্রেমের তুমুল তুরী-নিনাদে প্রাচ্যভূমিকে মাতাইয়া তুলেন, গৃহে গৃহে প্রেম বিতরণ করেন, ছোটবড় উচ্চনীচ তাঁহার নিকট কিছুই ছিল না। দুহাত তুলিয়া তিনি সকলকে আলিঙ্গন করিতেন। প্রেমই আমাদের একমাত্র সাধ্য বস্তু, প্রেমই ভগবানের স্বরূপ; প্রেমকে পাওয়া গেলে ভগবানকে পাওয়া যায়। ইতরনির্ব্বিশেষে আমরা সকলে সকলকে প্রেমচক্ষে দেখিব, প্রেমভরে আলিঙ্গন করিব এবং প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আনন্দে নৃত্য করিব, আত্মপর, উচ্চনীচ সমস্ত ভুলিয়া যাইব; জগতকে তিনি এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে শিক্ষার বীজ ভারতক্ষেত্রে বপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া শাখাপ্রশাখা দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ভারতবাসী অতি শ্রদ্ধার সহিত এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কালে যে ইহা ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বব্যাপী হইবে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি।

প্রাচ্যজগতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাপ্রভু চৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য জগতেও তেমনি যিশু, মহম্মদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারাও জগতকে এই বিশ্বজনীন প্রেমই শিক্ষা দিয়াছিলেন। মনুষ্য যে এক প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ; পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেমই যে আমাদিগকে স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইতে পারে, জগতকে তাঁহারা ইহাই শিখাইয়াছিলেন।

পুনঃ পুনঃ এরূপ শিক্ষা পাইয়াও আবার আমরা উহা ভুলিয়া যাই, আবার আমরা স্বাভাবিক অবস্থা হারাইয়া কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হই, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, প্রভৃতি আসিয়া আমাদিগকে আশ্রয় করে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সেই অবনতি আসিয়াছে। মনুষ্য-সমাজ পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব ভুলিয়া গিয়াছে, পরস্পর পরস্পরের সর্ব্বনাশ করিয়া কাল্পনিক "আমি"র শ্রীবৃদ্ধিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার ফলে অশান্তি হাহাকার যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি হইতেছে। জগৎ এইপথে যতই অগ্রসর হইবে এই অশান্তি ততই বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এ ভাব অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিবে না। যাঁহার জগত তিনি রক্ষা করিবেন। এই কুশিক্ষাই সুশিক্ষা আনয়ন করিবে। কুশিক্ষাও জগতের মঙ্গলের জন্য হইয়া থাকে। মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কিছুই নাই। অন্ধকারে বাস না করিলে আলোকের জন্য আমাদের তীব্র তৃষ্ণা হয় না। অজ্ঞানবশতঃ দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হইলে জ্ঞানপিপাসা হইবে কেন? আবার জগতে সেই প্রেমের রাজ্য আসিবে, আবার আমরা দুবাহু তুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিব,জগতে দুঃখ থাকিবে না, শোক থাকিবে না, অশান্তি থাকিবে না, দ্বেষ, হিংসা নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, অভিমান কিছুই থাকিবে না। আনন্দের ধ্বনিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত হইবে, প্রেমের ভাণ্ডার জগতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

ব্রহ্মবাদী নিউম্যানের সহিত ব্রাহ্ম-সমাজের পত্রব্যবহার।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মসমাজের সহ-যোগী সম্পাদক হইলেন, তখন তাঁহার উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কেবল ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেষ্টা ও ব্রাহ্মসমাজে বক্তার কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবে তিনি ইংলণ্ডের নিউম্যান প্রভৃতি ব্রহ্মবাদীদিগের সহিত পত্রব্যবহার আরম্ভ করিয়া (১৮৬০ খৃঃ ৬ই জুলাই) উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজকে সভ্যজগতের সর্ব্বত্র পরিচিত করিবার সূত্রপাত করিয়া দেন। তিনি নিজে নব্যবঙ্গের আদর্শ যুবক (typical Young Bengal) ছিলেন এবং তদানীন্তন নব্য-বঙ্গের যুবকদিগের হৃদয়ের ভাবটী বিলক্ষণ বুঝিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সকল কার্য্যেই তাঁহার সমসময় হইতে অনেক দূরে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র সমসময়ের ভাবটী বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। উভয়েরই উপযুক্ত মূল্য আছে বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই হয় যে, একজনের কাজের মূল্য লোকে যথাসময়ে ধরিতে পারে না, অপরের কাজের ন্যায্য মূল্য না ধরিয়া লোকে অতিরিক্ত মূল্য ধরে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের প্রকৃত মঙ্গল দেশীয় ভাষার সাহায্যে দেশীয় ভাবে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা এবং হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভাবটী সে সময়ে জনসাধারণের হৃদয়কে তেমন স্পর্শ করিল না, তাই সেই বিদ্যালয়গুলি স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না। সাধারণ বঙ্গযুবক তখন অর্থোপার্জ্জনের উপযোগী বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। ইংরাজজাতি তখন কিছু পূর্ব্বাবধি ভারত জয় করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য-সূত্রে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ক্রোড়পতি হইতেছিল, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। কাজেই নব্যবঙ্গের প্রধান লক্ষ্য হইল ইংরাজদিগের সহিত আলাপপরিচয়ের উপযোগী, কথাবার্ত্তা চালাইবার উপযোগী ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা। স্বদেশীয় ভাষায় দেশীয়ভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিলে দেশের যে একটা স্বাধীনভাব রক্ষিত হইতে পারিত, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উপর ইংরাজী ভাষায় কথোপকথনের সক্ষমতার উপর এবং ইংরাজদিগের সহিত বিশেষভাবে মেলামেশার উপর অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিত বলিয়া নব্যবঙ্গের হৃদয়ে সেই প্রকৃত স্বাধীনভাব রক্ষিত হইতে পারিল না। আমাদের বিশ্বাস যে, সেই সময়ের ইংরাজী শিক্ষা ও বিপুল অর্থোপার্জ্জনে পক্ষপাত তদানীন্তন বঙ্গবাসী-দিগকে ক্রমশঃ আত্মচেষ্টাহীন ও পাশ্চাত্যদিগের

মুখাপেক্ষী করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময় অবধি আমরা কথায় কথায় দেখিতে চাহিলাম যে ইংরাজেরা কোন্ কাজ পছন্দ করেন, আমাদের কোন্ কাজ ইংরাজের চক্ষে সুন্দর লাগিবে, কোন্ কাজে আমরা পাশ্চাত্যদিগের নিকটে উৎসাহ পাইব। সেই যে নব্যবঙ্গে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে পরমুখাপেক্ষার তরঙ্গ উঠিয়াছিল, সেই তরঙ্গের আঘাত আজ আমাদের একালেরও দ্বারে আসিয়া লাগিতেছে।

নব্যবঙ্গের বলিতে গেলে প্রধানতম নেতা কেশবচন্দ্র তদানীন্তন যুবকদিগের অন্তর্নিহিত ভাব ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজ যদি একবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট সমাদৃত হয়, তাহা হইলে ইহা নব্যযুবকদিগের হৃদয়ে অতি উচ্চ আসন অধিকার করিবে। প্রকৃতই তিনি ব্রাহ্মসমাজকে পাশ্চাত্যদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ব্রাহ্মসমাজ যেমন পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল, তেমনি স্বদেশীয়দিগেরও মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার সূত্রপাত করিয়াছিল। কিন্তু আমরা ইহা বলিতে বাধ্য যে, ইহার ফলে আমাদের দেশে পাশ্চাত্যদিগের মুখাপেক্ষায় একটা প্রবল হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল—পাশ্চাত্যদিগের ভালমন্দ বিচারকে আমাদেরও বিচারের ভিত্তি করিতে লাগিলাম। মহর্ষিদেব ও কেশবচন্দ্র, ইঁহারা উভয়ে যদি সামঞ্জস্যসহকারে অবিচ্ছিন্ন হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতেন, তবে এতদিনে ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে এবং ভারতের মঙ্গলসাধক দেবমণ্ডলে জয়ধ্বনি পড়িয়া যাইত।

কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডীয় ব্রহ্মবাদীগণের সহিত পত্রব্যবহারের ফলে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাদী নিউম্যান সাহেব (F. W. Newman) ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রভূতপরিমাণে জ্ঞান বিস্তার করিতে এবং তাহার জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলে বিলাতে আবেদনপত্র প্রেরণ করিতেও উপদেশ দিয়াছিলেন। আমরা দেখি যে, উত্তরকালে এই ইঙ্গিত ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক সাগ্রহে গৃহীত হইয়াছিল। কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন, সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত ভারতের সকল সমাজই পাশ্চাত্যদিগের দ্বারে সুবিধা পাইলেই ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইতে প্রস্তুত আছে বলিয়া মনে হয়। এস্থলে দুইটী চিত্র তুলনা করিলে আমাদের অবস্থা কতকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। গ্রীসের অধিপতি আলেকজাণ্ডার যখন সিন্ধুপ্রদেশ জয় করিয়া নিজেকে অতিমানব মনে করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি শুনিলেন যে কোথায় এক যোগী বাস করিতেছেন। তিনি স্বীয় মন্ত্রীর দ্বারা তাঁহাকে গ্রীসে লইয়া যাইবার জন্য প্রভূত অর্থদানের প্রলোভন দেখাইয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন তিনি নিজে সেই যোগীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে যোগীবর রৌদ্রের উত্তাপ উপভোগ করিতেছিলেন; তাঁহার সেই রৌদ্র আটকাইয়া আলেকজাণ্ডর দাঁড়াইয়াছিলেন। তার পর যখন তিনি সেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কি চাহেন, তাহার উত্তরে সন্ন্যাসী তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। আর, আজ আমরা সমাজগৃহ স্থাপন করিব, বিদ্যালয়ের জন্য গৃহনির্ম্মাণ করিব, প্রতিপদে পাশ্চাত্যদিগের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইতেছি। এই ভিক্ষালব্ধ ধনে ধনবান হওয়াতে একদিকে আমাদের স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইলে যেরূপ স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারিতাম, তেমন স্বাধীনভাবে মাথা তুলিতে দেয় না; অপরদিকে যাহারা এরূপ ভিক্ষালব্ধ ধনের অভাবে দরিদ্রবেশে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তাহাদের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব দেখাইতে কুণ্ঠিত হই না।

সম্ভবত নিউম্যান সাহেবের উপদেশের ফলে এই বৎসরেরই (১৭৮২ শকের) মাঝামাঝি, আমরা দেখি যে, কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি শিশুদেরও প্রতি নিপতিত হইয়াছিল। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে, শৈশবকালই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজবপনের সময়। শিশুদের জন্য একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় খুলিবার একটী কল্পনা যে উঠিয়াছিল, তাহা এই বৎসরের ভাদ্রমাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত একটী বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাই না।

১৭৮৩ শকের ১৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার কেশবচন্দ্র নিউম্যান সাহেবের সেই পূর্ব্বোক্ত পত্র অবলম্বনে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিসাধনের বিহিত উপায় স্থির করিবার জন্য এক সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় তিনি তদানীন্তন বিদ্যাশিক্ষাপ্রণালীর ফলে "কতকগুলি সত্য উদরস্থ করাইয়া দিবার" কুফল বর্ণনা করিয়া যাহাতে যুবকদের হৃদয়ে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবেশ করানো হয়, যাহাতে দরিদ্রসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হয় এবং যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার হয়, সেই সকল বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবার জন্য উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ সহজজ্ঞানে তিনি প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, ছাত্রের দল না পাইলে একটা মণ্ডলী গঠনের সুবিধা হইবে না। তাঁহার আহূত এই সভায় সভাপতি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ শ্যামাচরণ সরকার।

পরিচয়।

(শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দত্ত)

যত দুখের বজ্র-লিখন
 লিখছ তুমি আপন হাতে
 আমার বুকের পাতে পাতে,
ততই ওগো হৃদি-রমণ!
 সিক্ত হয়ে নয়নজলে
 লুটছি তব চরণতলে!
ততই ওগো, বুঝছি ভাল
 শুধুই তোমা আপন বলে!
চিতার আগুন যত জ্বাল
 পারবে না আর যেতে ছলে!
যতই তুমি নিচ্ছ কেড়ে
 স্নেহ আমায় করত যারা
 মুছিয়ে দিয়ে অশ্রুধারা,
ততই সখা, সবায় ছেড়ে
 আমার সারা শূন্য-মনে
 পাচ্ছি তোমা সংগোপনে!
ততই তোমা বাসছি ভাল
 চাচ্ছি তোমা পরাণপণে!
তুমি আমার দুখের আলো
 আঁধার-ঘেরা গহন-বনে!

শব্দব্রহ্ম।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভাষাকোলাহলময় বর্ত্তমান ভারতে আজকাল সকলেরই প্রাণ নিজ নিজ ভাষাসংস্কারের দিকে ছুটিয়াছে। বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; যেহেতু জাতির উন্নতি ভাষার উপরে প্রচুরপরিমাণে নির্ভর করে। আমরা যদি ভালরূপে কথা কহিতে না জানিলাম তবে আমাদের উন্নতি কোথায়? এক কথায় যুগ উল্টাইয়া যায়। কথার মাহাত্ম্য সকল দেশেই মানব বুঝিয়াছে। কথার যে কি মাহাত্ম্য আমাদের ভারতের বেদ তাহার সাক্ষী, খৃষ্টানদিগের বাইবেল তাহার সাক্ষী, এক কথায় সকল প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থেরই প্রাণ কথা। কথাতেই সংসারে বার্ত্তা চলিতেছে। আমাদের ভাষায় আমরা কথার সঙ্গে বার্ত্তার যোগ না করিয়া থাকিতে পারি না। কথা না হইলে বার্ত্তা চলিতে পারে না। বার্ত্তা কথারই প্রকারান্তর, কথারই পুনরুক্তিমাত্র; ইহা ইংরাজী wordএর প্রাণ বা মূল। এই এক কথাতেই সমুদয় সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ কথাতেই বিবাহসংস্কার সিদ্ধ হয়। কথাতেই আইন। কথায় কথায় যুদ্ধ। কথায় কথায় সন্ধি স্থাপিত হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এক কথার কি মহিমা। তাহা আর আশ্চর্য্য কি? কারণ পণ্ডিতেরা ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে কথা ভগবানেরই ধ্বনি। কথার মূলেই ভগবান। কথা আছে বলিয়াই শ্রুতি আছে, নহিলে শ্রুতির কোনও প্রয়োজন হইত না। ভগবান এই বিশ্বের মধ্যে বিরাজমান থাকিয়া আমাদিগকে বিশ্বের ও বিশ্বাতীত ভাষায় উপদেশ দিতেছেন। এই দুই ভাষা বা কথার একটী অনাহত, অপরটি আহত। এই অনাহত ও আহত ভাবের প্রভাবে আমাদের ভাষা শ্রুতিসুখকর হয়; আমাদের শ্রুতিতে ছন্দের সঞ্চার হয়, আমরা স্বচ্ছন্দে ভাষাকে শ্রুতিসুখকর করিয়া তুলিতে সক্ষম হই, গীতিময়ী করিতে সমর্থ হই।

ভাষার মধ্যে এই আহত ও অনাহত ভাবের প্রভাব যে বিস্তৃত হয় তাহা সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাই সংস্কৃত ভাষা যথার্থ সংস্কৃত হইয়া 'সংস্কৃত' আখ্যার উপযুক্তই হইয়াছে। এই দুই ভাব না বুঝিলে ভাষার সংস্কার-কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। যেমন চিত্রে আলোছায়া বা দৃষ্ট-অদৃষ্টভাব, ভাষায় বা শব্দে সেইরূপ আহত বা অনাহত ধ্বনি।

আহত ও অনাহত ধ্বনি ভাষাকে চিত্র-বিচিত্র করিয়া তুলে; ভাষায় শ্রম ও বিশ্রম আনয়ন করিয়া তাহাকে musical করিয়া তুলে। তাহাতে ভাষায় এক নবতর আনন্দের সৃজন হয়। এই দুয়ের উপর নির্ভর করিয়া মানবের ভাষা উন্নতি-গগনে উঠিতে পারে। দুয়ের মধ্যে একটীর অভাব হইলে তাহা উন্নত হইতে পারে না; তাহার সংস্কার-সাধন দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। দুইয়ে মিলিয়াই বাস্তবিক কথা।

এই কথাই বাস্তবপক্ষে আমাদের অস্তিত্বের পরিচায়ক। কথাও যাহা, বস্তুতঃ ভাবও তাহাই। (ভূ-ধাতু) কথাতে আমাদের অভাব, ব্যক্ত হইতেছে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ভাবরূপে বিরাজ করিতেছে। ইংরাজী word শব্দেরও মূল আমাদের জর্ম্মন werden কথা মনে হয়; werden অর্থাৎ to be or to become। পূর্ব্বে বলিয়া আসিলাম কথার উপর কথা অর্থাৎ কথার স্রোত অনেকটা কথাবার্ত্তা। এই বার্ত্তারও মূল বর্ত্তন। এই বর্ত্তনের সঙ্গে werdenএর সাদৃশ্য আছে। তাই দেখিতেছি কথা অস্তিত্বের পরিচায়ক, কথা নাস্তিকতার বিরোধী। এক কথাতেই ঈশ্বর প্রকাশিত। কথাই অস্তিত্বের যেন সহচর—সহোদর। ঈশ্বর আছেন বলিয়াই ঈশ্বরের কথা। আমরা আছি বলিয়াই আমাদের কথা। না থাকিলে কথা থাকে না। ঈশ্বর চিরকাল থাকিবেন। তিনি নিত্য, তাই তাঁহার কথা চিরকাল থাকিবে। তাঁহার কথাও নিত্য। নিত্যের কথা নিত্য। এই নিত্য, কথাই শব্দব্রহ্ম। এই নিত্য কথা শব্দব্রহ্ম—সকল কথার পরিস্ফোট হইতেছে এবং এই শব্দব্রহ্ম স্বয়ং আপন মহিমায় স্ফুটিত হইয়া আছে। এই হেতুই শাস্ত্রকারেরাও এই নিত্যশব্দকে 'স্ফোট' আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। এবং বলিয়া গিয়াছেন "স্ফোটাখ্যো নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দো ব্রহ্মৈবেতি"। ইংরাজী অভিধানে দেখিয়াছি word এক অর্থে Son of God, God অথবা Jesus Christকে বুঝায়।

এই কথা শিক্ষা দেয় বলিয়া সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ব্যাকরণকে বেদের বেদ-চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা ইহাকে বেদের বেদরূপে সম্মানিত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই ব্যাকরণই অব্যক্ত ভাবের একটা আকৃতি দেয় (বি+আ+কৃ), রহস্যকে প্রকাশ করিয়া ফেলে। তাই ব্যাকরণের এত মান ভারতে; ভারতে কেন, আমার বোধ হয় সমগ্র পৃথিবীতে।

আমাদের বঙ্গভাষার আকৃতি যখন বিশেষরূপে পুষ্ট হইয়া উঠিবে তখন আপনা হইতেই তাহার বিশেষ আকৃতি ফুটিয়া উঠিবে,—তাহার ব্যাকরণ; স্বাভাবিক ও সহজ হইবে। সংস্কৃত যখন রীতিমত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তখনই তাহার ব্যাকরণের বা বিশেষ রূপ ও আকৃতি দিবার ব্যবস্থা আবশ্যক হইল। তাহা না হইলে পূর্ব্ব হইতে অপরিপুষ্ট ভাষাকে বিশেষ আকৃতিতে আবৃত করিয়া ফেলিলেই আর সে ভাষার শুদ্ধ ভাব দেখিতে পারিবে না। গোড়া হইতেই বাঁধিলেই সে কলমের চারাগাছের মত ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া যায়।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ আনন্দময় অবস্থার অনির্ব্বাচ্য অনুভূতি অন্যকে পূর্ণরূপে বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাহা অন্যকে বলিতে গেলে 'আমি-তুমি' এই দ্বৈতাত্মক ভাষা প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়; এবং এই দ্বৈতী ভাষায় অদ্বৈতের সমস্ত অনুভূতি ব্যক্ত করা যায় না। তাই এই চরম অবস্থার উপনিষদে যে বর্ণনা আছে তাহাও অপূর্ণ ও গৌণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এবং এই বর্ণনা যদি গৌণ হয়, তবে জগতের উৎপত্তি, রচনা প্রভৃতি বুঝাইয়া দিবার

অন্য কোন কোন স্থানে যে শুদ্ধ দ্বৈতী বর্ণনা উপনিষদে পাওয়া যায়, তাহাও গৌণ বলিয়াই মানিতে হইবে। উদাহরণ যথা,—আত্মস্বরূপী, শুদ্ধ, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী ও অবিকারী ব্রহ্ম হইতেই পরে হিরণ্যগর্ভ নামক সগুণ পুরুষ অথবা অপ (জল) প্রভৃতি জগতের ব্যক্ত পদার্থ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হয়, কিংবা এই নামরূপ সৃষ্টি করিয়া পরে জীবরূপে পরমেশ্বর তাহাতে প্রবেশ করেন (তৈ. ২. ৬; ছাং. ৬. ২. ৩; বৃ. ১. ৪. ৭), এইরূপ দৃশ্য জগতের উৎপত্তির যে বর্ণনা উপনিষদে করা হইয়াছে তাহা অদ্বৈত দৃষ্টিতে যথার্থ হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানগম্য নির্গুণ পরমেশ্বরই যদি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তবে এক অপর-এককে উৎপন্ন করিয়াছে এই কথাও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নির্ম্মূল হইয়া পড়ে। কিন্তু সাধারণ লোককে জগৎ-রচনা বুঝাইয়া দিবার জন্য ব্যবহারিক অর্থাৎ দ্বৈতের ভাষাই একমাত্র সাধন হওয়ায়, ব্যক্ত জগতের অর্থাৎ নামরূপের উৎপত্তির উপরি উক্ত বর্ণনা উপনিষদে পাওয়া যায়। তথাপি তাহাতেও অদ্বৈতের যোগসূত্রটি বজায় আছে এবং এই প্রকার দ্বৈতের ব্যবহারিক ভাষা ব্যবহৃত হইলেও মূলে অদ্বৈতই সত্য, এইরূপ অনেক স্থানে কথিত হইয়াছে। সূর্য্য ভ্রমণ করে না এইরূপ এক্ষণে নিশ্চিত জ্ঞান হইলেও, সূর্য্য উদয় হইল কিংবা অস্ত হইল এই ভাষা যেমন আমরা ব্যবহার করি সেইরূপ একই আত্ম-স্বরূপী পরব্রহ্ম চারিদিকে অখণ্ডরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি নির্ব্বিকার এইরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দ্ধারণ হইলেও "পরব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে" এইরূপ ভাষা উপনিষদে প্রয়োগ হইয়া থাকে; এবং গীতাতেও সেই-রূপ "আমার প্রকৃত স্বরূপ অব্যয় ও অজ" (গীতা. ৭. ২৫) এইরূপ উক্ত হইলেও "আমি সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়া থাকি" (গী. ৪. ৯) এইরূপ ভগবান বলিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনার মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উহা শব্দশঃ সত্য এবং উহাই মুখ্য এইরূপ কল্পনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত, দ্বৈত কিংবা বিশিষ্টাদ্বৈত মত উপ-নিষদের প্রতিপাদ্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, সর্ব্বত্র একই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এইরূপ মানিলে, এই নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হইতে সবিকার বিনশ্বর সগুণ পদার্থ কিরূপে সৃষ্ট হইল ইহার উপপত্তি পাওয়া যায় না। কারণ, নাম-রূপাত্মক জগৎকে 'মায়া' বলিলেও নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ মায়া উৎপন্ন হওয়া তর্কদৃষ্টিতে সম্ভব না হওয়ায় অদ্বৈতবাদ খঞ্জ হইয়া পড়ে। ইহা অপেক্ষা সাংখ্যশাস্ত্রের উক্তি অনুসারে প্রকৃতির ন্যায় নামরূপাত্মক ব্যক্ত জগতের কোন সগুণ অথচ ব্যক্ত রূপকে নিত্য মনে করিয়া লৌহযন্ত্রের মধ্যে বাষ্পের ন্যায় তাহার অন্তর্যামী পরব্রহ্ম-রূপ অন্য কোন নিত্য তত্ত্ব খেলিতেছে, (বৃ. ৩. ৭), এবং দাড়িম্ব ফলের মধ্যে তাহার দানার ন্যায় ঐক্য এই দুয়ের মধ্যে আছে এইরূপ মনে করা অধিক প্রশস্ত। কিন্তু আমার মতে, উপনিষদের তাৎপর্য্য এইরূপ নির্দ্ধারণ করা ঠিক নহে। উপনিষদে কখন দ্বৈতী ও কখন শুদ্ধ অদ্বৈতী বর্ণনা থাকায় এই দুয়ের কোন প্রকার সমন্বয় করিতে হইবে ইহা সত্য। কিন্তু অদ্বৈতবাদকে মুখ্য মানিয়া, নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হওয়া পর্য্যন্ত মায়িক দ্বৈতের অবস্থা প্রাপ্ত হইবার মতন দেখায়,—এইরূপ মনে করিলে সমস্ত বর্ণনার যেরূপ সমন্বয় হয়, দ্বৈতপক্ষকে প্রধান করিয়া মানিলে সেরূপ সমন্বয় হয় না। উদাহরণ যথা—"তৎ ত্বমসি" এই বাক্যান্তর্গত পদের অন্বয় দ্বৈত মত অনুসারে কখনই ঠিক লাগে না। দ্বৈতীদিগের মনে ইহা একটা খটকা বলিয়া মনে হয় না এরূপ নহে। কিন্তু তত্ত্বম্-তস্য ত্বম্—অর্থাৎ তোমা হইতে ভিন্ন এরূপ যে কোন ব্যক্তি তাহার তুমি, সে তুমি নও—এইরূপ কোন রকমে এই মহাবাক্যের অর্থ করিয়া দ্বৈতী নিজের মনকে আশ্বাস দিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান কিছুমাত্র আছে, যাঁহার বুদ্ধি আগ্রহের দ্বারা বিদ্ধ হয় নাই তিনিই এই 'টানাবুনা' অর্থ সত্য নহে বলিয়া তখনই বুঝিতে পারিবেন। কৈবল্যোপনিষদে আবার "স ত্বমেব ত্বমেব তৎ" (কৈ. ১. ১৬) এইরূপ "তৎ" ও "ত্বম্" শব্দ দুইটিকে উল্টাপাল্টা করিয়া উক্ত মহাবাক্যের অদ্বৈতপর সিদ্ধান্তই দেখান হইয়াছে। আর অধিক কি বলিব? সমস্ত উপনিষদের অধিকাংশ কাটিয়া না ফেলিলে কিংবা জানিয়া বুঝিয়া তাহার প্রতি দুর্লক্ষ্য না করিলে উপনিষদশাস্ত্রের অদ্বৈত ব্যতীত অন্য কোন রহস্য আছে, এরূপ দেখান যাইতে পারে না। কিন্তু এই বাদপ্রতিবাদ কখনই শেষ হইবে না মনে করিয়া সেই সম্বন্ধে আমি অধিক আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। যাঁহার অদ্বৈত ব্যতীত অন্য মত ভাল লাগে তিনি স্পষ্টা-ক্ষরে তাহা স্বীকার করিতে পারেন। যে মহাত্মারা উপনিষদে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃ. ৪. ৪. ১৯; কঠ ৪. ১১)—এই জগতে নানাত্ব কিছুই নাই—যাহা কিছু আছে মূলে সমস্ত "একমেবাদ্বিতীয়ং" (ছাং. ৬. ২. ২), এইরূপ আপন প্রতীতি স্পষ্ট বলিয়া পরে "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—এ জগতে যে নানাত্ব দেখে সে জন্মমরণের ফেরে পড়িয়া যায়—এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদের লক্ষ্য অদ্বৈত ব্যতীত অন্য কোনরূপ হইতে পারে এরূপ আমার মনে হয় না। কিন্তু অনেক বৈদিক শাখার অনেক উপনিষদ থাকা প্রযুক্ত সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য একই কি না এই সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কথা-

চিৎ যেরূপ কিছু অবকাশ পাওয়া যায়, গীতা-সম্বন্ধে সেরূপ নহে। গীতা একই গ্রন্থ হওয়ায়, একই প্রকারের বেদান্ত তাহার প্রতিপাদ্য ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে; এবং সেই বেদান্ত কি, ইহার নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে "সমস্ত ভূতের নাশ হইলেও যে একই বজায় থাকে" (গী. ৮. ২০) তাহাই প্রকৃত সত্য হওয়ায়, পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়া সর্ব্বত্র তাহাই ওতপ্রোত হইয়া আছে (গী. ১৩. ৩১,) এইরূপ অদ্বৈতমূলক সিদ্ধান্ত না করিলে চলে না। অধিক কি, আত্মৌপম্যবুদ্ধির যে নীতিতত্ত্ব গীতাতে বলা হইয়াছে, তাহার পুরাপুরি উপপত্তিও অদ্বৈত ব্যতীত অন্য প্রকারের বেদান্ত-দৃষ্টিতে উপযোগী হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সময়ে কিংবা তদুত্তরকালে অদ্বৈতমতপ্রতিপাদক যে সকল যুক্তি অথবা প্রমাণ বাহির হইয়াছে তাহার সমস্তই গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে এরূপ বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সম্প্রদায় বাহির হইবার পূর্ব্বেই গীতা হইয়াছে; এবং সেইজন্য কোন বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক যুক্তির সমাবেশ তাহাতে হইতে পারে না, ইহা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু সেইজন্য গীতাতে যে বেদান্ত আছে তাহা সাধারণত শঙ্করসম্প্রদায়ের জ্ঞানানুরূপ অদ্বৈতী, দ্বৈতী নহে, ইহা বলিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে গীতা ও শঙ্করসম্প্রদায় ইহাদের মধ্যে সাধারণ মিল থাকিলেও আচারদৃষ্টিতে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা গীতা কর্ম্মযোগকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায়, গীতাধর্ম্ম শঙ্করসম্প্রদায় হইতে ভিন্ন হইয়াছে এইরূপ আমার মত। কিন্তু তাহার বিচার পরে করা যাইবে। এখনকার বিষয় তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয়; এবং এই তত্ত্বজ্ঞান গীতা ও শঙ্করসম্প্রদায় এই দুয়ের মধ্যেই একই প্রকার অর্থাৎ অদ্বৈতী ইহাই এখানে বক্তব্য। অন্য সাম্প্রদায়িক ভাষ্য অপেক্ষা গীতার শাঙ্করভাষ্যের গৌরব যে বেশী হইয়াছে তাহার কারণই এই।

সমস্ত নামরূপ জ্ঞানদৃষ্টিতে একপাশে সরাইয়া রাখিবার পর, একই নির্ব্বিকার ও নির্গুণ তত্ত্ব থাকিয়া যায় এবং সেইজন্য পূর্ণ ও সূক্ষ্ম বিচারান্তে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে হয়—ইহা সিদ্ধান্ত হইলে পর এই এক নির্গুণ ও অব্যক্ত দ্রব্য হইতে নানাবিধ ব্যক্ত সগুণ জগৎ কি করিয়া হইল, অদ্বৈত বেদান্তদৃষ্টিতে তাহার স্পষ্টরূপ বিচার করা আবশ্যক। নির্গুণ পুরুষেরই সহিত ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগুণ প্রকৃতিকে অনাদি ও স্বতন্ত্র মানিয়া সাংখ্যেরা এই প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সগুণ প্রকৃতিকে এইরূপ স্বতন্ত্র বলিয়া মানিলে জগতের মূলতত্ত্ব দুই হওয়ায় অনেক কারণ হইতে উপরে পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত অদ্বৈতমতে বাধা পড়ে; এবং সগুণ প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলিয়া না মানিলে একই মূল নির্গুণ দ্রব্য হইতে নানাবিধ সগুণ জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, নির্গুণ হইতে সগুন—অর্থাৎ যাহা কিছু নাই, তাহা হইতে অন্য কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না, এই সৎকার্য্যবাদের সিদ্ধান্ত অদ্বৈতীদিগেরও মান্য হইয়াছে। এইজন্য, দুইদিক্ হইতেই বাধা। এখন, এই জটিল প্যাঁচ ঘুচিবে কি করিয়া? অদ্বৈতকে না ছাড়িয়া নির্গুণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইবার মার্গটি কি তাহা বলিতে হইবে; এবং সৎকার্য্যবাদের দৃষ্টিতে উহা বন্ধ হইবার মতো দেখায়। পেঁচটা খুবই বড় সত্য; অধিক কি, অদ্বৈত সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিতে হইলে, কাহারও কাহারও মতে, ইহাই মুখ্য বাধা এবং এই জন্যই তাহারা দ্বৈতকে অঙ্গীকার করিয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈতী পণ্ডিতেরা নিজ বুদ্ধির দ্বারা এই বিকট বাধা হইতে মুক্ত হইবারও এক সযুক্তিক ও অক্ষুণ্ণ মার্গ বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ বলেন যে, কার্য্য ও কারণ এই দুই-ই যখন একই গণ্ডীর মধ্যে কিংবা একই বর্গের মধ্যে থাকে তখনই সৎকার্য্যবাদের কিংবা গুণপরিণামবাদের সিদ্ধান্তের উপযোগ হয়। এবং সেই জন্য সত্য ও নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সত্য ও সগুণ মায়া উৎপন্ন হইতে পারে না ইহা অদ্বৈত বেদান্তও স্বীকার করিবে। কিন্তু এই স্বীকৃতি তখনকারই যখন দুই পদার্থই সত্য; যেখানে এক পদার্থ সত্য ও অন্যটি শুধু তাহার অনুরূপ, সেখানে সৎকার্য্যবাদ প্রযুক্ত হইতে পারে না। পুরুষের ন্যায় প্রকৃতিকেও স্বতন্ত্র ও সত্যপদার্থ বলিয়া সাংখ্য, মানিয়া থাকেন। তাই সাংখ্য, নির্গুণ পুরুষ হইতে সগুণ প্রকৃতির উৎপত্তির উপপত্তি, সৎকার্য্যবাদের অনুসারে করিতে পারে না। কিন্তু মায়া অনাদি হইলেও তাহা সত্য ও স্বতন্ত্র নহে, গীতার উক্তি অনুসারে তাহা 'মোহ' 'অজ্ঞান' কিংবা 'ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রতীয়মান বিষয়', এইরূপ অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত হওয়ায়, সৎকার্য্যবাদ হইতে নিষ্পন্ন আপত্তি অদ্বৈত সিদ্ধান্তে প্রযুক্ত হইতে পারে না। পিতা হইতে পুত্র হইলে পিতার গুণ-পরিণামের দ্বারা সে উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ আমরা বলি; কিন্তু পিতা একই ব্যক্তি হইয়া তিনি যখন কখন বালকের, কখন যুবকের কখন বৃদ্ধের রূপ গ্রহণ করেন দেখা যায়, তখন এই ব্যক্তির মূলে এবং তাঁহার অনেক রূপের মধ্যে গুণ-পরিণামরূপী কার্য্য-কারণভাব থাকে না, এইরূপ আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার, সূর্য্য একই ইহা নিশ্চিত হইলে পর, জলেতে চক্ষুগোচর তাহার প্রতিবিম্ব একটা ভ্রম, গুণপরিণামপ্রযুক্ত উৎপন্ন অন্য সূর্য্য নহে, এইরূপ আমরা বলি। সেইরূপ দূরবীণে কোন গ্রহের প্রকৃত স্বরূপ নিশ্চিত করিলে পর, কেবল

চোখে দেখা সেই গ্রহের স্বরূপ চোখের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ও অতি দীর্ঘ অন্তর প্রযুক্ত উৎপন্ন শুধু প্রতীয়মান আবির্ভাব মাত্র, এইরূপ জ্যোতিঃশাস্ত্র স্পষ্ট বলে। যে কোন বিষয়ই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচর হইলেই তাহাকে স্বতন্ত্র ও সত্য বস্তু বলিয়া মানিতে পারা যায় না—ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তাহার পর, ঐ ন্যায়ই অধ্যাত্মশাস্ত্রেও প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানচক্ষুরূপ দুর্বীণের দ্বারা নির্দ্ধারিত নির্গুণ পরব্রহ্মই সত্য, এবং জ্ঞানশূন্য চর্ম্মচক্ষুর গোচর নামরূপ এই পরব্রহ্মের কার্য্য নহে, উহা ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা হইতে উৎপন্ন শুধু একটা ভ্রম অর্থাৎ মোহাত্মক প্রতীয়মান রূপ মাত্র, এইরূপ বলিতে বাধা কি? নির্গুণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইতে পারে না এই আপত্তিও এখানে থাকে না। কারণ, দুই বস্তু একই গণ্ডীভুক্ত নহে; একটি সত্য আর একটী শুধু প্রতীয়মান রূপ মাত্র; এবং মূলে একই সত্য বস্তু হইলেও দ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টিভেদে, অজ্ঞানে, দৃষ্টিবিভ্রমে সেই একই বস্তুর প্রতীয়মান রূপ পরিবর্ত্তিত হয় এইরূপ আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। উদাহরণ যথা—কানে শোনা শব্দ আর চোখে দেখা রং, এই দুই গুণ ধর। তন্মধ্যে কানে আমরা যে শব্দ বা আওয়াজ শুনিতে পাই তাহার সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়া শব্দ অর্থাৎ বায়ুর তরঙ্গ কিংবা গতি এইরূপ আধিভৌতিক শাস্ত্র পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিয়াছেন। সেইরূপ আবার চোখে দেখা লাল, হল্‌দে, নীল প্রভৃতি রংও মূলে একই সূর্য্যালোকের বিকার, এবং সূর্য্যালোকও একপ্রকার গতি এইরূপ এক্ষণে সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। 'গতি' মূলে একই হওয়ায় কান যদি তাহাকে শব্দ ও চোখ যদি তাহাকে রং বলিয়া ঠাওরায়, তবে এই ন্যায়ই অধিক ব্যাপকরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রতি প্রয়োগ করিলে, সমস্ত নামরূপের উৎপত্তি সম্বন্ধে সৎকার্য্যবাদের সহায়তা ব্যতীতই ঠিকঠিক উপপত্তি এই প্রকার দেওয়া যাইতে পারে যে, মনুষ্যের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আপনা-আপনিই এক নির্ব্বিকার বস্তুর উপরেই শব্দরূপাদি নামরূপাত্মক গুণসমূহের 'অধ্যারোপ' করিয়া নানাপ্রকার প্রতীয়মান রূপ উৎপন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু মূলের একই বস্তুতে এই প্রতীয়মান রূপ, গুণ কিংবা এই নামরূপ থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। এবং এই অর্থই সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, অথবা চোখে আঙ্গুল দিলে এক বস্তুকে দুইটা দেখা, অথবা অনেক রংয়ের চসমা পরিলে এক পদার্থকে বিভিন্ন রংয়ের দেখা ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত বেদান্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায়। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি মনুষ্যকে কখনই ছাড়িয়া যায় না বলিয়া জগতের নামরূপ কিংবা গুণ সর্ব্বদাই তাহার নজরে পড়িবে ইহা সত্য। কিন্তু ইন্দ্রিয়বান মনুষ্যের দৃষ্টিতে জগতের এই যে আপেক্ষিক স্বরূপ দেখা যায়, তাহাই সেই জগতের মূলগত অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ এরূপ বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় অপেক্ষা যদি সে ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ তাহার চোখে এখন যেরূপ দেখায় তখনও যে সেইরূপ দেখা যাইবে এরূপ নহে। এবং ইহা যদি সত্য হয়, তবে দ্রষ্টা মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া জগতের মূলে যে তত্ত্ব আছে তাহার নিত্য ও প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা বল, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ মূলতত্ত্ব নির্গুণ, কিন্তু মনুষ্যের নিকট উহা সগুণ দেখায়; ইহা মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, মূল বস্তুর গুণ নহে, এইরূপ উত্তর দিতে হয়। আধিভৌতিক শাস্ত্রে কেবল ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়েরই পরীক্ষা করিতে হয় বলিয়া এইপ্রকার প্রশ্ন কখনই উত্থিত হয় না। কিন্তু মনুষ্য ও তাহার ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত হইলে, পরমেশ্বরও লোপ প্রাপ্ত হন, কিংবা মনুষ্যের নিকট উহা অমুক প্রকার দেখায় বলিয়া তাহার ত্রিকাল-অবাধিত নিত্য ও নিরপেক্ষ স্বরূপও তাহাই হইবে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। তাই, জগতের মূলে অবস্থিত সত্যের মূলস্বরূপ কি, যে অধ্যাত্মশাস্ত্রে ইহার বিচার করিতে হয় তাহাতে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের আপেক্ষিক দৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া কেবল জ্ঞানদৃষ্টিতে অর্থাৎ যতদূর সম্ভব বুদ্ধির দ্বারাই শেষে বিচার করা আবশ্যক হয়। এইরূপ করিলে ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত গুণ স্বতই চলিয়া গিয়া ব্রহ্মের নিত্য স্বরূপ ইন্দ্রিয়াতীত অর্থাৎ নির্গুণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এইরূপ সিদ্ধ হয়। কিন্তু যে নির্গুণ তাহার বর্ণনা কে করিবে, আর কি প্রকারে করিবে? এইজন্য পরব্রহ্মের চরম অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ কেবল নির্গুণ নহে, তাহা ছাড়া অনির্ব্বাচ্য; এবং এই নির্গুণ স্বরূপে মনুষ্য স্বকীয় ইন্দ্রিয়যোগে সগুণ রূপ দেখিতে পায়, অদ্বৈতবেদান্তে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু নির্গুণকে সগুণ করিবার এই শক্তি ইন্দ্রিয়ের আসিল কোথা হইতে, এইখানে আবার এই প্রশ্ন উত্থিত হয়। অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্র ইহার উত্তরে এইরূপ বলেন যে, মানবজ্ঞানের গতি এখানে বাধিত হয়, এইজন্য ইহা ইন্দ্রিয়াদির অজ্ঞান এবং নির্গুণ পরব্রহ্মে সগুণ জগতের রূপ দেখা সেই অজ্ঞানের পরিণাম; কিংবা ইন্দ্রিয়াদিও পরমেশ্বরের জগতেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই সগুণ জগৎ (প্রকৃতি) নির্গুণ পরমেশ্বরেরই এক 'দৈবী মায়া' এইরূপ নিশ্চিত অনুমান করিয়াই এই স্থানে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতে হয় (গী. ৭. ১৪)। অপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষকারী লোকের নিকট পরমেশ্বর ব্যক্ত ও

সগুণ দৃষ্ট হইলেও পরমেশ্বরের প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপ নিগুর্ণ হওয়ায় তাহা জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখাতেই জ্ঞানের চরমসীমা, ইত্যাদি গীতাতে যে বর্ণনা আছে (গী. ৭. ১৪, ২৭, ২৫). তাহার তত্ত্ব পাঠকের এক্ষণে উপলব্ধি হইবে। পরমেশ্বর মূলে নিগুর্ণ, তাহার মধ্যেই মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি সগুণ জগতের বিবিধ প্রতীয়মান রূপ দেখিতে পায়, এইরূপ নির্ণয় করিলেও এই সিদ্ধান্তের মধ্যে 'নিগুর্ণ' শব্দের অর্থ কি বুঝাইবার জন্য আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আমাদের ইন্দ্রিয়াদি যখন বায়ুতরঙ্গের উপর শব্দরূপাদি গুণের কিংবা শুক্তির উপর রজতের অধ্যারোপ করে তখন বায়ুতরঙ্গের মধ্যে শব্দরূপাদির কিংবা শুক্তির মধ্যে রজতের গুণ থাকে না ইহা সত্য; কিন্তু অধ্যারোপিত গুণ তাহাতে না থাকিলেও উহা হইতে ভিন্ন গুণ মূল পদার্থের মধ্যে থাকিবেই না এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, শুক্তির মধ্যে রজতের গুণ না থাকিলেও রজতের গুণের অতিরিক্ত অন্য গুণ উহাতে থাকে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। ইহা হইতে আপন অজ্ঞানে মূল ব্রহ্মের উপর ইন্দ্রিয়াদির অধ্যারোপিত গুণ এই ব্রহ্মের মধ্যে নাই বলিলেও অন্য গুণ পরব্রহ্মের মধ্যে কি নাই, এবং যদি থাকে তবে তাহা নিগুর্ণ হয় কিরূপে, এইরূপ এক সংশয়ও এই স্থানে আসে। কিন্তু আর একটু সূক্ষ্ম বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধ্যারোপিত গুণ ব্যতীত মূল ব্রহ্মের মধ্যে অন্য গুণ আছে এরূপ স্বীকার করিলেও তাহা আমরা জানিব কিরূপে? মনুষ্য যে গুণ অবগত হয় তাহা নিজের ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অবগত হয়; এবং যে গুণ ইন্দ্রিয়গোচর হয় না তাহা মনুষ্য জানিতেই পারে না। সার কথা এই যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা অধ্যারোপিত গুণ ব্যতীত যদি অন্য কোন গুণ পরব্রহ্মে থাকে, তাহা জানা আমাদের সাধ্য নহে, এবং তাহা পরব্রহ্মের মধ্যে আছে এইরূপ বিধান করাও ন্যায়শাস্ত্রদৃষ্টিতে ঠিক্ নহে। তাই গুণশব্দে "মনুষ্যের জ্ঞানগম্য গুণ" এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম 'নিগুর্ণ' ইহা বেদান্তী সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। মনুষ্যের অচিন্তনীয় এইরূপ গুণ কিংবা শক্তি মূল পরব্রহ্ম স্বরূপের মধ্যে আছে অদ্বৈত বেদান্তও এরূপ বলেন না, আর অপর কেহ তাহা বলিতে পারে না। অধিক কি, বেদান্তীগণও ইন্দ্রিয়াদির উপরি-উক্ত অজ্ঞান কিংবা মায়াকে সেই মূল পরব্রহ্মেরই এক অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ত্রিগুণাত্মক মায়া কিংবা প্রকৃতি স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে; একপদার্থী নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপর মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা অজ্ঞানবশত সগুণ প্রতীয়মান রূপের অধ্যারোপ করিয়া থাকে। এই মতকে 'বিবর্ত্তবাদ' বলে। নিগুর্ণ ব্রহ্ম একই মূলতত্ত্ব হওয়ায়, নানাবিধ সগুণ জগৎ প্রথমে কিরূপে দেখিতে পাওয়া গেল,—অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে ইহার এই উপপত্তি। কাণাদন্যায়শাস্ত্রে অসংখ্য পরমাণুই জগতের মূল কারণ স্বীকার করা হইয়াছে; এবং নৈয়ায়িক এই পরমাণুকে সত্য বলিয়া মানে। তাই, এই অসংখ্য পরমাণুর সংযোগ হইতে আরম্ভ হইলে পর, জগতের অনেক পদার্থ উৎপন্ন হইতে লাগিল, এইরূপ তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই মতানুসারে, পরমাণুদের সংযোগ আরম্ভ হইলে পর জগৎসৃষ্ট হয়, তাই ইহাকে 'আরম্ভবাদ' বলে। কিন্তু নৈয়ায়িকদিগের অসংখ্য পরমাণুসম্বন্ধীয় মত স্বীকার না করিয়া "একপদার্থী, সত্য ও ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই" ইহাই জড়জগতের মূলকারণ, এবং এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির অন্তর্গত গুণ-বিকাশের দ্বারা কিংবা পরিণামের দ্বারা ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হয়, ইহা সাংখ্যেরা বলেন। এই মতকে 'গুণ-পরিণামবাদ' বলে। কারণ, এক মূল সগুণ প্রকৃতির গুণ-বিকাশের দ্বারা সমস্ত ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুই মতবাদকে অদ্বৈতবেদান্তী স্বীকার করেন না। পরমাণু অসংখ্য হওয়া প্রযুক্ত অদ্বৈতমতানুসারে উহা জগতের মূল হইতে পারে না; এবং প্রকৃতি এক হইলেও উহা পুরুষ হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, এই দ্বৈতও অদ্বৈত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই প্রকারে এই দুই মতবাদকে ছাড়িয়া দিলে এক নিগুর্ণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল ইহার অন্য কোন উপপত্তি দেওয়া আবশ্যক। কারণ, সৎকার্য্যবাদঅনুসারে নিগুর্ণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে বেদান্তী বলেন যে, সৎকার্য্যবাদের এই সিদ্ধান্ত, কার্য্য ও কারণ এই দুই বস্তু যেখানে সত্য সেইখানেই খাটে। মূল বস্তু যেখানে একই এবং তাহার শুধু বাহ্যরূপ যেখানে বদল হয় সেখানে এই ন্যায়ের প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ, একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ দেখা, ইহা সেই বস্তুর ধর্ম্ম না হইয়া দ্রষ্টা-পুরুষের দৃষ্টিভেদে এই বিভিন্ন বাহ্যরূপ উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।* এই ন্যায় নিগুর্ণ ব্রহ্ম ও সগুণ জগতের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে, ব্রহ্ম নিগুর্ণ,—মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ধর্ম্মপ্রযুক্ত তাহার মধ্যেই সগুণত্বের প্রতীয়মান রূপ উৎপন্ন হয়, এইরূপ বলিতে হয়। ইহা বিবর্ত্তবাদ। একই মূল সত্য দ্রব্যকে

---

* ইংরাজীতে এই অর্থ ব্যক্ত করিতে হইলে appearances are the results of subjective conditions, viz. the senses of the observer and not of the thing in itself.

ধরিয়া তাহার উপরেই অনেক অসত্য অর্থাৎ নিত্য পরিবর্তনশীল রূপের অধ্যারোপ হইয়া থাকে, ইহাই বিবর্ত্তবাদের মত, এবং প্রথমেই দুই সত্য দ্রব্যকে ধরিয়া তন্মধ্যে একের গুণের বিকাশ হইয়া জগতের নানাগুণযুক্ত অন্যান্য বস্তু উৎপন্ন হয় ইহাই গুণপরিণামবাদের মত। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়—ইহাই বিবর্ত্তবাদ; এবং নারিকেল ছোবড়ায় দড়ি হওয়া কিংবা দুধের দই হওয়া ইহাই গুণপরিণাম। এই কারণবশতই বেদান্তসার গ্রন্থের এক সংস্করণে দুই মতবাদের এই লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—

যস্তাত্ত্বিকোঽন্যথাভাবঃ পরিণাম উদীরিতঃ।
অতাত্ত্বিকোঽন্যথাভাবো বিবর্ত্তঃ স উদীরিতঃ॥

"কোন মূল বস্তু হইতে যখন তাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্য অন্য প্রকারের বস্তু হয় তখন তাহাকে (গুণ-) 'পরিণাম' বলে; এবং সেরূপ না হইয়া মূল বস্তু যখন অসত্যরূপে (অতাত্ত্বিক) প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে 'বিবর্ত্ত' বলে" (বে. সা. ২১)। আরম্ভবাদ নৈয়ায়িকদিগের, গুণপরিণামবাদ সাংখ্যদিগের, এবং বিবর্ত্তবাদ অদ্বৈতবেদান্তীদিগের। অদ্বৈতবেদান্তী পরমাণু কিংবা প্রকৃতি এই দুই সগুণ বস্তুকে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিয়া মানেন না। কিন্তু আবার সৎকার্য্যবাদ অনুসারে নির্গুণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব এই আপত্তি আসে। ইহা দূর করিবার জন্য বিবর্ত্তবাদ বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে, কাহারও কাহারও যে ধারণা হইয়াছে যে, বেদান্তী গুণপরিণামকে কখনই স্বীকার করেন না, কিংবা করিবেন না, তাহা ভুল। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ প্রকৃতির অর্থাৎ মায়ার উদ্ভব হওয়াও অসম্ভব এইরূপ অদ্বৈত মতের উপর সাংখ্যদিগের কিংবা অন্য দ্বৈতীদিগেরও যে মুখ্য আপত্তি তাহা অপরিহার্য্য নহে। একই নির্গুণ ব্রহ্মেতে মায়ার অনেক প্রতীয়মান বাহ্যরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যক্ষ করিতে পারে ইহাই দেখানো বিবর্ত্তবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে পর, অর্থাৎ এক নির্গুণ পরব্রহ্মেতেই সগুণ প্রকৃতির রূপ দেখা যাইতে পারে, বিবর্ত্তবাদের দ্বারা সিদ্ধ হইলে পর, এই প্রকৃতির পরবর্ত্তী বিস্তার গুণপরিণামের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে বেদান্তশাস্ত্রের কোনও বাধা নাই। মূলপ্রকৃতি স্বয়ং এক প্রতীয়মান রূপ, সত্য নহে—ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের মুখ্য উক্তি। প্রকৃতির প্রতীয়মান রূপ একবার দেখা দিলে তাহার পর এই প্রতীয়মান রূপ হইতে নির্গত অন্য প্রতীয়মান রূপকে স্বতন্ত্র বলিয়া না মানিয়া এক প্রতীয়মানরূপের গুণ হইতে অন্য প্রতীয়মান রূপের গুণ, এইরূপ নানাগুণাত্মক রূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে এইরূপ মানিতে অদ্বৈত বেদান্তের কোন বাধা নাই। তাই "প্রকৃতি আমারই মায়া" (গী. ৭. ১৪; ৪. ৬) এইরূপ ভগবান গীতাতে বলিলেও ঈশ্বর-অধিষ্ঠিত (গী. ৯. ১০) এই প্রকৃতির পরবর্ত্তী বিস্তার "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" (গী. ৩. ২৮; ১৩. ২৩) এই নীতি অনুসারেই হইয়া থাকে, এইরূপ গীতাতে উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, বিবর্ত্তবাদ অনুসারে মূল নির্গুণ পরব্রহ্মেতে একবার মায়ার ভ্রান্ত রূপ উৎপন্ন হইলে পর, এই মায়িক রূপের অর্থাৎ প্রকৃতির পরবর্ত্তী বিস্তারের উপপত্তির জন্য গুণোৎকর্ষের তত্ত্ব গীতাতেও স্বীকৃত হইয়াছে। সমস্ত দৃশ্য জগৎ এই মায়াত্মক রূপ বলিলে, এই রূপের যে রূপান্তর হইয়া থাকে তাহার জন্য গুণোৎকর্ষের ন্যায় কোন একটা নিয়ম চাই এইরূপ বলিতে হইবে এরূপ নহে। মায়াত্মক রূপের বিস্তারও নিয়মবদ্ধ হইয়া থাকে ইহা যে তাঁহারা অস্বীকার করেন না। তাঁহাদের কথাটা এই যে, মূলপ্রকৃতির ন্যায় এই নিয়মও মায়িক, এবং পরমেশ্বর এই সমস্ত মায়িক নিয়মের অধিপতি এবং তাহাদের অতীত; তাঁহার সত্তার দ্বারা এই নিয়মের নিয়মত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ত্রিকালে অবাধিত নিয়ম স্থাপন করিবার সামর্থ্য, প্রতীয়মান-রূপবিশিষ্ট সগুণ সুতরাং নশ্বর প্রকৃতির হইতে পারে না।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়িত লোকদিগের জন্য উৎকণ্ঠা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

যতই দূর আত্মীয় হউক, অথবা চাকর-বাকর হউক, বাড়ীতে কেহ পীড়িত হইয়াছে এইরূপ সংবাদ কর্ণ-গোচর হইবামাত্র তখনি ঐ পীড়িত ব্যক্তি যে কামরায় থাকে সেই কামরায় উনি গিয়া তাহার সমাচার লইতেন। "ডাক্তার ডাকাইয়া তাহার ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা তুমি নিজে দেখিয়া শুনিয়া কর, আর কাহারও উপর ভার দিবে না," এইরূপ আমাকে উনি আদেশ করিতেন। শুধু তাহাই নহে, "সেই ব্যক্তি বেশ ভাল হইয়া সম্মুখে আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যতক্ষণ না বেড়ায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিদিন দুইবেলা খাইবার সময় খোঁজখবরও লইবে। বিস্মৃত হইবে না।" এই সব কথায় আমার ভারী আশ্চর্য্য মনে হইত এবং আমি কখন কখন বলিতাম যে, "এত কাজের মধ্যে এবং নানাপ্রকার চিন্তায় মন নিমগ্ন থাকায়, কখন কখন ঘরের লোকের সঙ্গেও কথা কহিবার তোমার ফুরসৎ হয় না, কিন্তু এইরূপ ছোটখাটো বিষয়সম্বন্ধে প্রতিদিন দুইবেলা খোজখবর করা আমার মনে

থাকে কি করে' ? অমুক বিষয় করিতে হইবে—আমি স্মরণ করিয়া রাখিব মনে করিলেও ত আমার স্মরণে থাকে না। এই সম্বন্ধে আমারও কখন কখন রাগ হয়। তা ছাড়া, এই ভোলা-স্বভাবের দরুন রাগ হওয়া সে স্বতন্ত্র কথা। যে কাজ করিতে হইবে সেই কাজ কিংবা সেই মনুষ্যকে চোখের সামনে না দেখিলে আপনা-আপনি মনে পড়ে না।" তখন উনি বলিলেন যে, স্মরণ থাকা না থাকা—সেই কাজের ভাবনার উপর এবং আপনার জবাবদিহির উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই দুই বিষয়-সম্বন্ধে মনের শিথিলতা থাকিলে প্রত্যেক কাজ ভুলিয়া যাইতে হয়। যে বিষয় অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত পৌঁছোয় অর্থাৎ যার সম্বন্ধে ভাবনা হয়—তারই নাম উৎকণ্ঠা। সেরূপ কাজ প্রায় ভোলা যায় না। যখন নিজের মন বিশেষ দুঃখে, ভাবনায় কিংবা তীব্র বেদনায় ডুবিয়া থাকে তখনই ইহার ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু এইরূপ সময়েই কখন কখন ব্যতিক্রম হয়, এবং ব্যতিক্রম হইলেও দোষের হয় না।

১৮৯৬।৯৭ অব্দে যখন বোম্বায়ে প্রথম প্লেগ আরম্ভ হয়, তখন প্লেগ রোগের কথাও কেহ শুনে নাই। তখন তাহার একটা উগ্র স্বরূপের কল্পনা কিরূপে আসিবে? প্রথম প্রথম এই রোগের কথা সত্য বলিয়াই মনে করিতাম না। নীলের চারা না পাইলে, এইরূপ কোনপ্রকার অদ্ভুত ও অসম্ভাব্য গুজব নীলের ব্যাপারীরা উঠাইত,—এই কথা পুরাতন বৃদ্ধ লোকেরা বলেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া, "ঘাড়ভাঙ্গা", "হাঁটুভাঙ্গা" "হাঁকমারা" প্রভৃতি রোগসম্বন্ধে যে গুজব উঠে তাহার মধ্যে ইহাও এক, এইরূপ মনে হইত; কিন্তু টাইম্‌স্, গেজেট্, অ্যাড্‌ভোকেট্ পত্রে যখন এই রোগের উগ্রতাসম্বন্ধে স্তম্ভ-কে-স্তম্ভ ভরিয়া যাইতে লাগিল, তখন সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য গেল। তার কিছু দিনের পর, কোঠা-ঘরে, স্নানাগারে, নীচের তালার ঘুড়িতে, সেইরূপ আবার বহিরুদ্যানের খোলা জায়গায় বড় বড় ইন্দুর থামকা বাহিরে আসিয়া বসে এবং একটু হাঁপ লাগিলেই সেইখানেই মরে,—এইরূপ তিন চার জন চাকর আসিয়া আমাকে বলিল। কিন্তু দৈনিক পত্রে এই বৃত্তান্ত যত দিন না পড়িয়াছিলাম ততদিন সে বিষয়ে কিছুই মনে হয় নাই এবং আমি—ওঁকেও এই বৃত্তান্ত বলি নাই। বরং চাকরদিগকে আমি বলিলাম, ইন্দুরগুলা আপনা-আপনি মরচে সে ভালই! আজকাল ইন্দুর চারিদিকেই বড় বেশী হয়েছে। ওদের মারবার জন্য কমিটির লোকেরা নর্দামায় বিষ ঢেলে দিয়ে থাকবে, তাই খেয়ে মরচে।" এইরূপ ৭৮ দিন অতীত হইলে পর, একদিন টাইমস্-পত্রে এইরূপ লেখা হইয়াছে দেখা গেল যে—প্লেগের বিষ কাহারও বাড়ীর মধ্যে আসিয়াছে কি না তাহা বুঝিবার প্রধান চিহ্ন—ইন্দুর আপনা-আপনি মরিতেছে, এবং ইন্দুর এইরূপ মরিতে থাকিলে, সেই বাড়ীতে থাকা নিরাপদ নহে। একেবারে সেই বাড়ী ছাড়িয়া অন্য স্থানে গিয়া থাকা আবশ্যক। এই লেখা উনি পড়িবামাত্র আমাকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া বলিলেন যে, "এই লেখাটা পড়ে দেখে তুমি সতর্ক হয়ে থেকো। আমাদেরও কখন বাহিরে যেতে হবে তার ঠিক্ নেই"। আমি সমস্ত শুনিয়া চুপ্ করিয়া রহিলাম। সকাল বেলায় কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া আমি সংবাদপত্র দুকুর বেলায় পড়িব মনে করিয়া উঠাইয়া রাখিলাম এবং দুকুর বেলায় সুবিধা পাইলেই পড়িয়া দেখিলাম, এবং ঐ পত্রের লেখা অনুসারে প্লেগের বিষ আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছে এইরূপ আমি লক্ষ্য করিলাম। অতএব এখন এই বাড়ীতে থাকা নিরাপদ নহে, বাড়ী আসিলে এই বৃত্তান্ত ওঁর নিকট বলিয়া কালই অন্য কোথাও গিয়া থাকা যাইবে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বাড়ী আসিবামাত্র এই সমস্ত কথা আমি বলিলাম। তাহা শুনিয়া তাহার পর দিন সকালে বালকেশ্বর, মহালক্ষ্মী, চৌপাটী প্রভৃতি স্থানে আমরা ৫।৬ টা বাড়ী দেখিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন বাড়ীই আমাদের থাকিবার মতো নহে। প্লেগের প্রথম বৎসর হওয়ায় হাইকোর্টের উকীল লোকেরা কোর্টে এইরূপ দরখাস্ত করিল যে, প্লেগের জন্য স্থানান্তরিত হওয়া আমাদের আবশ্যক হইয়াছে এবং সেইজন্য কোর্টে ১১টার সময় হাজির হওয়া অসম্ভব হইবে। এইজন্য কোর্ট আমাদের জন্য কোনপ্রকার বন্দোবস্ত করিবেন। এই দরখাস্ত কোর্ট শুনিয়া ১১র বদলে ১২॥০ সময় নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং সপ্তাহের মধ্যে ৪ দিন কার্য্য চলিবে ও তিন দিন ছুটি হইবে এইরূপ স্থির করিলেন। সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার এই চারদিন কোর্টের কাজ চলিবে। বৃহস্পতিবারে ২টা হইতে সোমবারে ১২টা পর্য্যন্ত ছুটি থাকায় বোম্বাই ছাড়িয়া যে সকল লোকদিগের বাহিরে থাকিবার জন্য যাইতে হইবে সেই সব লোকদিগের এই ছুটি খুব সুবিধার ও সুখের হইল। সে যাক্। আমরা বাড়ী না পাওয়ায় এখনও প্রথমবার বাঙ্গলাতেই ছিলাম। একদিন সকালে উঠিয়া আমি নীচে আসিবামাত্র আমাদের পাচিকার মেয়েটি একটু খোঁড়াইয়া চলিতেছে এইরূপ আমার নজরে পড়িল। মেয়েটির বয়স ১৬।১৭ হইলেও স্বভাবে একেবারেই হাবলা রকমের ছিল। সে দুই ছেলের সঙ্গে খেলিতেছিল। তাকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরে কেশব খোঁড়াচ্ছিস কেন?" ইহা শুনিয়া সে বলিল, আমার জ্বর হয়নি, কোন অসুখ নেই," এই কথা

বলিয়া ভয়ের ভাবে এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। তাহার এই দৃষ্টি ও ভয়ের-ভঙ্গী দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল; এবং সখু ও নান্থ যে দুই ছেলে তাহার নিকটে ছিল উহাদিগকে উপরের ছাদে নিয়ে যা, ঐখানেই খেলা করতে দে, নীচে যেতে দিস’নে; আর দেখ্, উপরের থর্ম্মমেটারটা এনে দে”—এই কথা আমি একজন চাকরকে বলিলাম। এই কথা অনুসারে সে ছেলেদিগকে লইয়া গেল এবং থর্ম্মমেটারটা নীচে আমার নিকট আনিয়া দিলে পর আমি তাহা কেশবের গায়ে লাগাইলাম ও জিজ্ঞাসা করিলাম “তোমার কোথাও কি ব্যথা হয়েছে? কোথাও কি গাঁট ফুলেছে? সে স্পষ্ট ‘না’ বলিয়া, স্থানে স্থানে গাঁট টিপিয়া দেখাইল এবং গাঁট ফুলিয়া উঠে নাই—এইরূপ বিশ্বাস করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তার এই চেষ্টায় আমার সংশয় আরও বলবৎ হইল এবং সত্য কি না তাহা কোন ফিকিরে বাহির করিবার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলাম। তাহার নিকট হইতে থর্ম্মমেটর ফেরত লইয়া আমি দেখিলাম সেই পারা ১০২ ডিগ্রীর উপর চড়িয়াছিল। তখন থর্ম্মমেটারের পানে ও কেশবের পানে চাহিয়া দুই তিন মিনিট স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। কেশব ভয় পাইয়া আমাকে বলিল, “কি দেখছ? নাড়ীতে জ্বরটর কিছু নেইত? তখন আমি তাহার দিকে তাকাইয়া তখনি বলিলাম,—কি কেশব? তুই বোকা, আমাকেও তুই ঠকাতে চাস! অরে মূর্খ, জ্বর-ত-জ্বর, তোর গাঁট ফুলেছে এই নাড়িতেই দেখা যাচ্ছে; আর তুই আমাকে বল্‌চিসনে? এইবার সে একেবারে কাঁদো-কাঁদো হইয়া ও ভয় খাইয়া আমাকে বলিল; হাঁ সত্যই একটা সুপারির মত গাঁট ফুলে উঠেছে, কিন্তু কোন ব্যথা নেই। “আমি কি জানি তোর নাড়িতে যা দেখছি তাই বলছি।” এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া, ঠিক কি হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া যদিও একটু ভাল মনে করিলাম তথাপি সবশুদ্ধ আমার ভয় ও ভাবনা খুবই হইল। “ঐ ওদিককার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক্, বাহিরে আসিস্‌নে, আর বাড়ীময় ঘুরে বেড়াস্‌নে এইরূপ তাকে বলে পাঠিয়ে দিলাম এবং তারপর কি করা যাইবে তাই ভাবিতে লাগিলাম। সাড়ে দশটা সমস্তই হইয়া গিয়াছিল। আহার করিয়া কোর্টে যাইবার সময় হইয়াছিল। এই সময় এই কথা বলিব কি না, বলিলে উনি আর খাইবেন না ও উপবাস করিয়া থাকিবেন; কিন্তু না বলিলেও চলে না; কারণ সন্ধ্যাকালে এই বাঙ্গালাতে উনি খাইবেন না, শয়ন করিবেন না এইরূপ আমার মনে হইল। তাই, রোজকার জায়গায় পাত না পাড়িয়া বড় বৈঠকখানায় সমস্ত খিড়কি খুলিয়া দিয়া ও ফিনেল ছড়াইয়া তারপর পাত পাড়িলাম। রোজের চাইতে একটু দেরী হইয়াছিল, সেইজন্য খাবার দিকে কিংবা আজ জায়গা কেন বদল হল এইদিকে প্রথমে উনি লক্ষ্য করেন নাই; কিন্তু পরে ভাত খাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ জায়গা কেন বদল হল?” তখন আমি বলিলাম,—আজ বাড়ীতে ইন্দুর বেরিয়েছে। সন্ধ্যাকাল—এখন কোথায় সুবিধা করা যাবে? তখন উনি বলিলেন, “আজ থেকে তিন দিন কোর্টের ছুটি আছে। দুপুরের গাড়ীতে আমরা লোণাবড়িতে যাব। শীঘ্র তুমি জিনিস ও ছেলেদের নিয়ে গেবীবন্দরে যাও। আমি কোর্টের ফির্ত্তি ষ্টেশনে যাব ও তার পর আমরা যাত্রা করব।” তিনটে পর্য্যন্ত আমি বাড়ীর সমস্ত ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিয়া সেই রুগ্ন ছেলেকে ও তার মাকে হাসপাতালে পাঠাইলাম। পাহারাওয়ালা ও শিপাইকে, খোলা দেউড়ীতে যতটা পারিস সময় কাটাবি, বাসায় বড় একটা যাবিনে, সামলাবি মাত্র”—এইরূপ বলিয়া বাড়ীর বহুমূল্য জিনিসগুলা বাক্সোয় ভরিয়া সঙ্গে লইলাম। পাহারাওয়ালা ও শিপাই ব্যতীত ওঁর “রীডর,” সখুর মাষ্টার ও ৪।৫ জন ছাত্র সমেত ৬।৭ জনের খাইবার শুইবার ও থাকিবার বন্দোবস্ত ৪।৫ দিনের জন্য আমাদের সম্মুখের শেট বীরচন্দ দীপচন্দ ইহাদের আস্তাবলের উপরতলায় করিয়া দিলাম এবং তাহাদের আবশ্যকীয় আসবাব আনিবার পয়সা দিয়া আমি ষ্টেশনে গেলাম, উনিও তখনি আসিয়া পড়িলেন এবং গাড়ীর সময় হইয়াছে বলিয়া আমরা সবাই গিয়া গাড়ীর কামরায় বসিলাম এবং দশটা রাত্রে লোনাওলীতে উপনীত হইলাম। এ দিকে বাঙ্গলায় পাহারা দিবার বিদেশী পাহারাওয়ালা, এবং আমরা লোনাওলীতে যে শিপাইকে আনিয়াছিলাম মাতাদীন নামক তাহার ভাই এই দুই জন প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে এইরূপ বোম্বাই হইতে লোনাওলীতে আসিবার পর দিন ৯।১০ টার সময় তার আসিল। আমার যে ভাইপো লোনাওলীতে আসিয়াছিল তাহাকে ও দুর্গাপ্রসাদ শিপাইকে আমি বোম্বায়ে ফিরিয়া পাঠাইয়া সেখানকার বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম। এই কথা ওঁকে জানাইয়াছিলাম; কিন্তু ভাবনা হইয়াছে কিংবা ঐ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন এই ভাবের কোন কথাই বলিলেন না। এই দুজনকে কেবল আমি নিরালায় ডাকিয়া লইয়া বলিলাম, “সাবধানে থাকিবে”। সেইখানে গিয়েই রোগীদিগকে হাসপাতালে পৌছিয়ে দেবে। মেজিষ্ট্রেটকে চিঠি দেওয়া হয়েছে; সেই অনুসারে তিনি পেন্‌সনর পুলিস পাঠাইবেন; তাকে বাঙ্গালার পাহারা দিতে বোলে তুমি বাহিরে যেখানে ছাত্রেরা থাকে সেই বাঙ্গলায় থাকবে।” এই সমস্ত ব্যবস্থা আমি ওঁকে না জানাইয়া পরস্পর করিতেছিলাম। ইহার কারণ, কাহারও পীড়া হইলে, উনি তদন্ত করিয়া তাঁহার ঠিক ব্যবস্থা

যতক্ষণ না করিতে পারিতেন, তাঁহার মন শান্ত হইত না,—এইরূপ তাঁহার স্বভাব ছিল। অন্য রোগের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু এই রোগ ছোঁয়াচে; ইহা হইতে উনি যতটা দূরে থাকিতে পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত; তাই পারতপক্ষে ওঁকে পীড়িত লোকদের কথা জানান উচিত নয়; আমাদের বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে যত্নপূর্ব্বক উচিত বন্দোবস্ত করিলেই হইল; এই বিষয়ে অবহেলা করা ঠিক নয়, আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল এবং এইভাবেই আমি সমস্ত করিতেছিলাম। আমরা বোম্বাই হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে আমাদের পাচিকার মেয়ে এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এই কথা ওঁর কানে আসিলে সেইদিন বাড়ী হইতে লোনাওলীতে শুধু যাওয়া হইত না নহে, হাসপাতালে পাঠাইবার সময় সে এত কান্নাকাটি করিত, এত কাকুতিমিনতি করিত যে উনি তাহা দেখিলে. ছোঁয়াচে রোগের ভয় না করিয়া ঐ মা ও মেয়েকে "হাসপাতালে পাঠাইও না, বাড়ীতেই থাকিতে দেও", এইরূপ স্পষ্ট বলিতেন, এবং একবার এইরূপ বলিবার পর, ঐরূপ আমাদের করিতে হইত, এইরূপ আমার দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় লোণাওলীতে পৌছিয়া তারপর দিন তারের খবর আসা পর্য্যন্ত এই সংবাদ ওঁকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তারের খবর আসিবার পর এই সমস্ত গুপ্ত কথা ফাঁসিয়া গেল এবং আমার উপর অত্যন্ত রাগ করিলেন; কিন্তু এই কথা জানিতে পারিলে উনি কতটা রাগ করিবেন ইহা পূর্ব্বেই আমি জানিতাম এবং সমস্ত কাজ আমি জানিয়া বুঝিয়া করায়, উনি রাগ করিয়াছেন বলিয়া আমার ততটা খারাপ লাগে নাই। এক্ষণে এই দুই ব্যক্তিকে (বাসুদেব ও দুর্গাপ্রসাদ) পাঠাইবার ব্যবস্থা ওঁকে সাধারণ ভাবে জানানো হইয়া থাকিলেও উহারা বোম্বায়ে রওনা হইবার পর, সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত "এই সময় আমরা বোম্বায়ে থাকিতাম ত ভাল হইত," এইরূপ তিন চারবার আমার নিকটে উনি বলিলেন, ইহাতে আমার মনে হইল,—বাহির হইতে শান্তভাবে রোজকার মতো সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে এইরূপ দেখা গেলেও, ওঁর মনটা বোম্বায়েতে আছে। এদিকে, তাহারা দুজন বোম্বায়ে গিয়া ট্রামে উঠিল। তখন দুর্গাপ্রসাদ বলিল,—"বাসুদেব রাও, আমার কুচকিতে ব্যথা করচে ও শীত করচে"। এই কথা শুনিয়া বাসুদেব মনে করিল, বোম্বায়ে পাঠাইবার দরুন ভয় পাইয়া, এইরূপ মিথ্যা কল্পনা করিতেছে; এইরূপ মনে করিয়া উহার কথাটা বাসুদেব ঠাট্টা বলিয়া গ্রহণ করিল। বাড়ী যাইতে যাইতে বাসুদেব কমিটির গাড়ী ডাকাইল এবং বাঙ্গালায় যে দুইজন রোগী ছিল তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া ইহারা দুজন ছাত্রদের উপর তলাতেই রহিল। যাহার কুচকীতে ব্যথা করিতেছিল সেই দুর্গাপ্রসাদ সিপাইয়ের সেই রাত্রেই ১২টার সময় শীত করিয়া জ্বর আসিল ও ভোরের বেলা ৪৫টা পর্য্যন্ত তাহার দুই রগের নীচে বেলফলের মতো ফুলে উঠল। তৃতীয় দিন শনিবারে ১১টার সময় তারের খবর আসায় এই কথা জানা গেল। যখন ওঁর হাতে তার আসিয়া পড়ে, তখন খাবার সময় হইয়াছিল। কিন্তু তারের খবর পড়িয়াই উনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, ওঁর মুখ শুকাইয়া গেল;— উনি বলিলেন,—"আমি আজ দুটার গাড়ীতে বোম্বায়ে যাচ্ছি; আর সেখানে গিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে' আসব।" "আমি বলিলাম, "সেখানে গিয়ে আর বেশী বন্দোবস্ত করবার কি আছে?" এই কথা শুনিয়া উনি বলিলেন—"এ রকম পাগলের মতো কেন জিজ্ঞাসা করচ? কি রকম সময় বুঝতে পারচ না কি? এই সময়ে অন্য ব্যবস্থা কি করবার আছে? একটা ভাল জায়গা দেখতে হবে, আর সেইখানে জিনিসপত্র ও ছাত্রদের রাখব বলে' আজই আমায় যেতে হবে।" এই সময় ভয়ভাবনা হইবারই কথা ও রাগ হইবারই কথা, কিন্তু তাহা না হইয়া ওঁর কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। তখন আমি ভাত বাড়িতেছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে আমার যাইতে হইল। নচেৎ এই সময়ে আমার হাসি পাইয়াছে দেখিলে ওঁর খুবই রাগ হইত। এই সময় ওঁর কথায় হাসি পাবার কারণও ছিল। ওঁর স্বভাব অত্যন্ত মায়ালু ও উদ্বেগপ্রবণ হওয়ায়, এই পীড়িত লোকের সংবাদে ওঁর মন অতটা বিচলিত হইয়াছিল যে, আমরা যাহা করিব মনে করিয়াছি (আমাদের দ্বারা হইতে পারে এইরূপ ধরণের কাজ কিংবা ঘরের কোন কাজ) তাহা আজ পর্য্যন্ত আমরা ওঁকে অতিক্রম করিয়া কখন কি করিয়াছি? এই কথা ওঁর মনে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিল না, এইজন্যই আমার হাসি আসিয়াছিল। তথাপি আমি হাসি সম্বরণ করিয়া কোন উত্তর দিলাম না। খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, উনি যাহা কিছু বলিলেন আমি চুপ করিয়া সব শুনিলাম এবং ওঁর খাওয়া হইয়া গেলে, সেই থালাতেই ভাত বাড়িয়া ওঁর কাছেই কিন্তু একটু বাহিরে আমি খাইতে বসিলাম। প্রায় ছুটির দিনে আমার খাওয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত মুখশুদ্ধি করিতে করিতে এবং এটা-ওটা কথা বলিতে বলিতে সেইখানেই বসিয়া থাকিতেন। তদনুসারে আমি খাইতে বসিলে পর, বোম্বায়ের কথা ওঠায় সেই সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষ ওঁর মন একটু শান্ত হইয়াছে দেখিয়া আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আজ বোম্বাই সম্বন্ধে কি স্থির করলে?" উনি কোন উত্তর দিলেন না; এখনও চিন্তা করিতেছেন এইরূপ মনে হইল। তাই আবার আমি জিজ্ঞাসা করি-

লাম, "আমাকে বল্লে আমি আগেই যাই। পূর্ব্বে যে সব কাজ করতে বলা হয়েছে, সেই সব কাজ আমিই করব। জায়গা দেখে বাসা বদলিয়ে ছাত্রদের ও আমাদের সকলকার বন্দোবস্ত করে দিয়ে রাতের গাড়ীতে ফিরে আসব, নৈলে তারে খবর দেব। কেবল ছেলেদের আমি নিয়ে যাব না। তাদের তোমার কাছেই রেখে দেও। তারা আসিলে আমার কাজের গোলমাল হয়ে তাদেরই কষ্ট হবে। কল্যাণে একটা জায়গা আছে, আর একটা ভাণ্ডুপার আছে না? আমি দুই জায়গাতেই গিয়ে দেখব এবং ওর মধ্যে একটা পছন্দ করে তোমার ইচ্ছামত সমস্তই করব। তার জন্য কোন ভাবনা নেই। এ সব কাজ তুমি কখন কর নি, এ সব তোমার দ্বারা কি করে ভাল হবে? এর জন্য আমাকে বল, আমি যাই"। আমি এইরূপ আগ্রহের সহিত বলায়, উনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি যা বলচ তাই কর। কিন্তু তুমি একলা গিয়ে কি করবে? আর তোমাকে ছেড়ে ছেলেরা কি করে' থাকবে?" আমি বলিলাম, "তার আর উপায় কি? যা করা আবশ্যক তা আমাদের করতেই হবে। তাছাড়া দুই জায়গাতেই আমাদের চেনাশুনা ভাল লোক আছে, তারাই সাহায্য করবে। ছেলেদের থাকা সম্বন্ধে কোন ভাবনা নেই। ওরা আমার চেয়ে তোমার কাছেই বেশী আনন্দে থাকবে।" এই কথা শুনিয়া দুইটার গাড়ীতে রওনা হইবার জন্য উনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

(ক্রমশঃ)

উৎকলে শক্তিপূজা।

হিন্দুর দেবদেবী তেত্রিশ কোটী। অধিকারী ভেদে ইষ্টদেবতার উপাসনার ভেদ হয়। দুইজন লোক কখনই একভাবে উপাসনা করিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ আছে। আকাঙ্ক্ষা এবং মনোগত ভাব দুইজন লোকের কখনই এক হইতে পারে না। হিন্দুর দেবদেবীর সংখ্যা এত অধিক হইলেও দেবতামাত্রেই সমান সমাদৃত হন না বা সকলেই পূজা পান না। আজকালকার হিন্দুধর্ম্মের চারিটি প্রধান শাখা আছে। রাম, কৃষ্ণ, শিব ও শক্তি বর্ত্তমানযুগে ভারতবাসীর হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও রামাবতারের উপাসক আজকাল পনের আনা লোকের উপর হইবে। শাক্তের সংখ্যা অন্য সম্প্রদায়ের অপেক্ষা কোন ক্রমেই কম নয়। শক্তির উপাসনা অতি প্রাচীন। শক্তির উপাসনা যে কৃষ্ণের উপাসনার সমসাময়িক তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেই দেখা যায়।

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তেনন্দগোকুলে ॥
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥
অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্।
নানোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্ ॥
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানা শরদেত্যম্বিকেতি চ ॥

দশমঃ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ঃ।

বসুদেবের ঔরসে তৎপত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। তাঁহার জন্মের অব্যবহিত পরেই কংশের ভয়ে বসুদেব ইহাঁকে ব্রজধামে নন্দালয়ে রাখিয়া নন্দের সদ্যজাত কন্যা আনয়ন করেন। পরদিন প্রাতে কংস সেই কন্যাকে এক শিলাখণ্ডের উপর আছাড় দিয়া মারিবার উপক্রম করে। কিন্তু সেই সদ্যজাতা কন্যা তেজোরাশিতে চারিদিক আলোকিত করিয়া আকাশে উড়িয়া যান। তাঁহার নাম যোগমায়া। লোকে তাঁহাকে দুর্গা ও চণ্ডী নামে বলি দ্বারা পূজা করেন। সেই যোগমায়া সর্ব্বকামফলপ্রদা। কালিকা পুরাণে লেখা আছে—

নিহিতে রাবণেবীরে নবম্যাং সকলৈঃ সুরৈ।
বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ ॥

কালিকাপুরাণের এই প্রমাণ সত্য হইলে ত্রেতাযুগে দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। শিবপুরাণের জ্ঞান-সংহিতা এবং সনৎকুমার-সংহিতা পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে অসুরগণই শিবের লিঙ্গমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। লিঙ্গপুরাণে অসুরদিগের যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত আমাদের দেশের অনার্য্যগণের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। শিবের বরে অনুপ্রাণিত হইয়া অসুরগণ দেবতাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন।

বোধ হয়, এক সময়ে লিঙ্গ-উপাসনা অনার্য্য অসুর-দিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে শাস্ত্রে শিবের বিশেষ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায় না। শিবের মন্দির, গ্রামের প্রান্তদেশে নির্ম্মাণ করিবার বিধি আজিও দেশাচার বলবৎ রাখিয়াছে। শিব-পূজার আর একটী বিশেষত্ব এই যে জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই শিবের পূজা করিতে পারেন। অবশ্য অস্পৃশ্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিতেই হইবে। উড়িষ্যায় অনেক স্থানে আজিও মালীজাতি শিবের পূজা করে। অন্যান্য দেবদেবীর পূজায় ব্রাহ্মণের অধিকার। শিবপূজায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সকল জাতির অধিকার আছে। শিবের পূজা যে আর্য্যগণের মধ্যে অনেক পরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদিক পূজার ধরাকাট শিবপূজায় নাই। বৈদিক যজ্ঞ বৈদিক পশুবলি শিবপূজায় নাই, শক্তিপূজায় আছে। কোন্ সময় শক্তিপূজার উৎপত্তি, তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। সন তারিখের নির্ঘণ্ট-ইতিহাস আমাদের দেশে কস্মিনকালেও ছিল না। অনেকের মতে অথর্ব্ববেদের মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি বিধি, সুদূর অতীতেও তন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে।

প্রকৃতং কথ্যতে দেবি শৃণু সাবহিতা ভব।
চতুর্ব্বেদময়ী প্রোক্তা শ্রীমহাভবতারিণী॥
অথর্ব্ববেদাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমহাকালিকাপরা।
বিনা কালীং বিনা তারাং নাথর্ব্বণো বিধিঃ ক্বচিৎ॥
কেরলে কালিকা প্রোক্তা কাশ্মীরে ত্রিপুরা মতা।
গৌড়ে তারেতি সংপ্রোক্তা সৈব কালোত্তরা ভবেৎ॥

(শক্তিমঙ্গলতন্ত্রে উত্তর ভাগে ১ম খণ্ডে ৮ম পটলে)

কিন্তু তন্ত্রের মতে শিব ও শক্তি অভেদাত্মা। উভয়ের মধ্যে কোনও প্রকার ভেদ নাই। শিবকে কেহ কেহ ইষ্টদেবতা বলিয়া উপাসনা করেন বলিয়াই শৈব ও শাক্তমত যে বিভিন্ন তাহা বলা যায় না। কুলচূড়ামণিনিগমে স্পষ্ট লেখা আছে, "শিবশক্তি সমাযোগাৎ জায়তে সৃষ্টিকল্পনা।" তন্ত্রের মতে শিব ও শক্তি উভয়েই ব্রহ্মের বিকারবিশেষ। উভয়েই সর্ব্বেসর্ব্বা। শক্তিই জগন্মাতা। সৃষ্টি শিবশক্তিময়। দেব, দেবী, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি ভূচর খেচর মানসচর যত জীব আছে সকলেই সেই বিশ্বমাতৃকা, সর্ব্বজন্মদার পুত্র। এমন কি শিবও সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই জগন্মাতার পুত্র বলিয়াই গণ্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে শিব নিষ্কল। সৃষ্টির পরে সেই নিষ্কল শিব সকল ভাবেই প্রকাশ পান। তখন তিনি শক্তির পুত্র। তন্ত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শিবশক্তির সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব শৈবপূজা প্রাচীন কি শক্তিপূজা প্রাচীন তাহার বিচার করা নিরর্থক।

এখন দেখা যাক তন্ত্রের বিশেষত্ব কি? অধিকারীভেদ এবং ক্রমবিকাশ তন্ত্রের ভিত্তিমূল। ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য তন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন মার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দিব্যাচার, বীরাচার ও পশ্বাচার যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম উপাসকের জন্য। তুমি যে স্তরেই থাক, তোমার বুদ্ধি ও ধারণা হাজার নীচ হোক্না কেন, তোমার পরিত্রাণের উপায় সর্ব্বদা তোমার হাতেই রহিয়াছে। তুমি কি, সর্ব্বাগ্রে তাহাই ধারণা কর। 'তুমি কি' জানিলে তোমার অধিকার কতদূর তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। তন্ত্র বলেন সাধনা সকলের জন্য। তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধনা-বিধি। তোমার মানসিক অবস্থা এবং ইন্দ্রিয়-গ্রামের প্রাবল্য লক্ষ্য না করিয়া যদি উচ্চোপাসনা অবলম্বন কর তাহাতে বিপত্তি ঘটিবেই ঘটিবে। সাধনার স্তর দিয়া ক্রমশঃ তোমাকে উচ্চতর দেশে উঠিতে হইবে। কিন্তু কোনও একটী স্তর উল্লঙ্ঘন করিলে তোমার পদস্খলন অবশম্ভাবী। ধীরে, অতি ধীরে তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। ইষ্ট-সিদ্ধির পথ সর্ব্বদাই পিচ্ছিল। তন্ত্র যে উপাসনার সোপানাবলী রচনা করিয়াছেন তাহাই অবলম্বন কর; সদ্‌গুরুর উপদেশ লও, ক্রমশঃ ধ্যান ও ধারণার প্রসার বাড়াইতে চেষ্টা কর, দেখিবে তোমার ইষ্ট লাভ হইবে। প্রবল ইন্দ্রিয়গ্রামের হঠাৎ গতিরোধ করিলে তুমি গোমুখীর খরস্রোতের মুখে মত্ত ঐরাবতের মত ভাসিয়া যাইবে। ভোগলালসা যখন তোমার অস্থি-মজ্জাগত, তখন তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা ছাড়া একেবারে সমূলে উৎপাটনের প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। তাই তন্ত্র বলিতেছেন,—জীব! ভোগের মার্গ দিয়া ক্রমশঃ বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হও। মর্কট-বৈরাগ্যের ভাণ করিও না। ভাবের ঘরে চুরি করা আত্মপ্রবঞ্চনা এবং মহাপাপ। তাই তন্ত্রোক্ত পন্থা কঠোর এবং নির্ম্মম নয়। তাহা

সরস এবং সহজগম্য। তন্ত্রের আর একটা স্বতঃসিদ্ধের কথা বলিব। তন্ত্র বলেন,—'যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে'। এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে কেন্দ্রে যে শক্তির সমাবেশ দেখিতেছ, এই জগৎযন্ত্রের চক্র, প্রতিচক্র এবং অনুচক্র যে শক্তির আবেশে স্নেহবদ্ধ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই শক্তিই তোমার শিরা-প্রশিরা এবং অসংখ্য নাড়ীজালে নিবদ্ধ। যদি তুমি সাধনার দ্বারা তোমার সুপ্ত শক্তিনিচয় জাগ্রৎ করিতে পার তাহা হইলেই তোমার ইষ্টলাভ হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য পন্থা নাই। বিশ্বস্রষ্টা সৃষ্টি করিয়াই নিষ্ক্রিয় হইয়াছেন, এরূপ ধারণা তন্ত্রে নাই। কোনও নিবিড় মেঘপটলাবৃত বিরাট্ পুরুষের ধ্যান তন্ত্রে দেখা যায় না। আত্মতত্ত্বের ও আত্মার অনুশীলন ভিন্ন কখনই শক্তিলাভ হইতে পারে না। ইহাই তন্ত্রের মূলমন্ত্র। প্রত্যেক মানুষের মূলাধারে যে কুলকুণ্ডলিনী সুপ্তভাবে বিরাজিতা, তাঁহাকে জাগরিত করাই তান্ত্রিক সাধনার চরম উদ্দেশ্য। কালী, তারা কিম্বা অন্যান্য মহাবিদ্যার প্রতিমা উপলক্ষ্য মাত্র। চঞ্চল মনকে একাগ্র করিতে হইলে একটা মূর্ত্তি অগ্রে ধরিয়া সেই মূর্ত্তিতেই তাহাকে নিবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু পূজায় বসিলে ন্যাস এবং ভূতশুদ্ধির দ্বারা মনকে পূত করিয়া তোমার সূক্ষ্ম শরীর তোমার উপাস্য প্রতিমায় সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। সেই সন্নিবেশ হইলে পর প্রতিমা জাগরিত হইবেন। তোমার চেতনা দিয়া চৈতন্যময়ী দেবীর পূজা করিতে হইবে। ইহাই হইল তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির মূল কথা। প্রস্তর মৃত্তিকায় পূজা তন্ত্রে নাই। তন্ত্র বলেন, যদি তোমার দেহনিবদ্ধ সূক্ষ্মশক্তি তোমার উপাস্যা দেবীতে আরোপ করিতে না পার—তাহা হইলে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে না এবং তোমার পূজা হোম-যাগ সমস্তই মিথ্যা হইবে। শরীর, মন এবং সূক্ষ্মশরীর নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই ত্রিবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিতে হইবে। তোমার চৈতন্যের বিনিময়ে তুমি শ্রেষ্ঠতর চৈতন্য পাইবে। কিন্তু মূলে সাধনা। চেষ্টা ভিন্ন কিছুই হইবে না। যে সাধনার বলে ইহ-জন্মেই ইন্দ্রত্ব চন্দ্রত্ব লাভ হইবে, যে সাধনার বলে পরাবিদ্যার গুহ্য রহস্য তোমার করায়ত্ত হইবে, তাহাতে কতখানি পুরুষকার আবশ্যক তাহা আর বলিতে হইবে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাগ্যনিয়ন্তা। যাহার যেরূপ সাধনা, সেইরূপ সিদ্ধি। আজ আমাদের দেশ জড়তায় আচ্ছন্ন। আয়াস এবং তন্দ্রার মোহে আমরা গতানুগতিকের মত জীবন যাপন করিতেছি। আমরা মনে করি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মরজ্জু নাসারন্ধ্র আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইয়া বেড়াইতেছে। সে রজ্জু এড়াইবার কোনও উপায় নাই। তাই তন্ত্রোক্ত পুরুষকারবাদ আমাদিগকে আকৃষ্ট করে না। যেখানে চেষ্টা, পুরুষকারের ও প্রযত্নের আহ্বান সেইখানেই আমরা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার বশে পশ্চাৎপদ হই। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতাই তন্ত্রের মতে পাপ। পুরুষকার ও সাধনাই পুণ্য। আবার কবে পুরুষকারের পাঞ্চজন্যনিনাদ আমাদিগের অসাড় মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ক্রিয়ান্বিত করিবে? কবে আবার ভারতমহাদেশের গ্রামে গ্রামে প্রান্তরে প্রান্তরে সাধনার দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' যে দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতার, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করিত, আজ সেই দেশেই পুরুষকার মোহাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

পুরাকালে উৎকলখণ্ড কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহাভারতের যুদ্ধে কলিঙ্গসেনাপতি ভীমের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। বহুদিন কলিঙ্গনৃপতিগণ স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। মগধের মহারাজ মহানন্দ খৃষ্টের জন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে কলিঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার কলিঙ্গ-বিজয় স্থায়ী হয় নাই। খৃষ্টের জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোক পুনরায় কলিঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করেন। তখন মগধের ভাগ্যসূর্য্য মধ্যগগনে অবস্থিত। চাণক্যনীতির প্রভাবে অশোকের পিতামহ রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁহার একচ্ছত্র রাজ্য ছিল। মগধসেনার বিজয়দামামা চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছিল। কেবল কলিঙ্গরাজ্য এবং তৎসংলগ্ন অন্ধ্র রাজ্য মগধের বশ্যতা-স্বীকার করে নাই। তাহার কারণ আর কিছুই

নয়, কলিঙ্গ স্বভাবসুরক্ষিত। পূর্ব্বে মহাসাগর বীচিবিক্ষেপে মগধপ্রাধান্য উপেক্ষা করিত। পশ্চিমে মহাবন ও গিরিরাজি। উত্তরে অসংখ্য নদী মগধসৈন্যের গতিরোধ করিয়া বিদ্যমান। দক্ষিণে স্বাধীন অন্ধ্রদেশ। কিন্তু অশোকের সেনা বহু যুদ্ধে রণবিশারদ হইয়াছিল। তাঁহার নৌবাহিনী শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয় কলিঙ্গের উপকূল বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। অবশেষে কলিঙ্গনৃপতি বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে একলক্ষ কলিঙ্গসেনা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার বন্দী হইয়াছিল। এই ভয়াবহ রক্তপাতে অশোকের মনে ভাবান্তর হইল। যুদ্ধে লাভজয় করিয়া তাঁহার জিঘাংসা এবং অর্থলোলুপতা বাড়িয়া যায় নাই। পরন্তু তাঁহার মনে হইল, কিসের জন্য এত রক্তপাত, কিসের জন্য এত মর্ম্মবেদনা। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার বিশাল রাজ্যমধ্যে যাহাতে শাক্যসিংহের অমৃতময় উপদেশ প্রচারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের প্রান্তদেশ হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত নানাস্থানে তাঁহার অনুশাসন প্রস্তরে লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ একটী অনুশাসন ভুবনে-শ্বরের নিকটবর্ত্তী ধৌলী পর্ব্বতে আজিও বিদ্যমান আছে। সেই অনুশাসনে অশোক জীবে দয়া দেখাইতে প্রজাপুঞ্জকে অনুরোধ করিয়াছেন। অনুশাসনে স্পষ্ট লেখা আছে আহারার্থে বা ধর্ম্মের অনুরোধে কেহই জীবহিংসা করিতে পারিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে কলিঙ্গরাজ্যে ৩৫০ খ্রীঃপূর্ব্বে বলিদান প্রথা প্রচলিত ছিল। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেও কোনও দিন অন্যের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। রাজদণ্ডের ভয় দেখা-ইয়া লোকের মত পরিবর্ত্তন করা তাঁহার অভিমত ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে তন্ত্রবিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের পর যে তান্ত্রিক ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন করেন নাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হুয়েংসানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন-পরিব্রাজক হুয়েংসান্ উৎকলদেশে আসেন। তখন উৎকলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল; কিন্তু তিনি মন্দিরের পাশে পাশে অনেক হিন্দুদেবদেবীর মন্দির দেখিয়া-ছিলেন। হুয়েংসানের ভ্রমণ বৃত্তান্তে আর একটী ঘটনার উল্লেখ আছে। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে যখন হুয়েং-সান অযোধ্যা ও প্রয়াগের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া নৌকাযোগে যাইতেছিলেন তখন দস্যুগণ তাঁহার নৌকা আক্রমণ করে এবং তাঁহাকে সুপুরুষ দেখিয়া দুর্গার নিকট বলি দিবার সঙ্কল্প করে।

বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদে লোকের মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ দার্শনিকতা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য নয়। ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সকলেই সঙ্ঘে বাস করিতে পারে না। বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত মুক্তির পথ সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়। তাই লোকের মনে বৌদ্ধ দার্শনিকতার প্রতি ক্রমশঃ বিরাগ জন্মিল। ক্রমে ক্রমে নানা দেবদেবীর উপাসনা বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। শাক্তধর্ম্মই সর্ব্বপ্রাচীন; এবং বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় ভারতবর্ষে শক্তি-উপাসনার বহু প্রচলন ছিল। সেইজন্যই বোধ হয় বুদ্ধের তিরো-ধানের কিছুদিন পরেই তান্ত্রিক উপাসনা বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইল। তিব্বতদেশে আজিও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলন আছে। যে দেশে লামা বা প্রধান বৌদ্ধযাজক স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া পূজা পান, সে দেশেও আজ পর্য্যন্ত তারা, কালী অবলোকিতে-শ্বর মহাদেবের পূজার বিধি আছে। তন্ত্রের অভ্যু-ত্থানের পর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় হিন্দুধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের বিজয়কেতু তুলিয়া যখন ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম্মের নব প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁহাকে বৌদ্ধশ্রমণ এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক-দিগের সহিত বাক্‌যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইয়াছিল। তান্ত্রিক উপাসনা ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জাগত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দার্শনিকতা যেমন সর্ব্বসাধারণের পক্ষে নয়, সেইরূপ তন্ত্রের নিগূঢ় রহস্যও সকলের বোধগম্য নয়। কিন্তু তান্ত্রিকপূজা, বলিদান এবং বিলাসবহুল প্রক্রিয়ায় সাধারণের চঞ্চলচিত্তের ক্ষণিক ধর্ম্ম-প্রবণতার পরিতোষ হয়। বাহ্য আড়ম্বর এবং বিলাসের চাকচিক্যে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ লোক-সকলকে আকৃষ্ট করে। তাই তান্ত্রিক বিধি জন-সাধারণের প্রিয়। বোধ হয় এই আকর্ষণী শক্তির বলেই ভারতবর্ষের আপামরসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মের কঠোর দার্শনিকতা পরিত্যাগ করিয়া তান্ত্রিকবিধি পুনরবলম্বন করিয়াছিল। তন্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,

মোক্ষ এই চতুঃবর্গের সাধনা আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে কেবল শুদ্ধ মোক্ষ। অনেকেই প্রথম ত্রিবর্গের সাধক। তাই তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সর্ব্বজনপ্রিয়। অলৌকিক শক্তিলাভের আশা সাধকদিগের একটী দুর্ব্বলতা। তন্ত্রে লেখা আছে, সাধক ইষ্টদেবীর সাধনায় কিছুদূর অগ্রসর হইলেই তাহার বিভূতির সঞ্চার হয় অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিনিচয় ফুটিয়া উঠে। সেই বিভূতির মোহে সাধক অনেক সময় প্রতারিত হন। অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তি যখন সাধকের করায়ত্ত হয়, তখন সাধক সেই সকল শক্তি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে ভালবাসেন। শক্তির সংযমে যে পরমানন্দের আস্বাদ আছে তাহার জন্য ব্যগ্র না হইয়া সাধক স্বীয় শক্তির প্রয়োগেই বিড়ম্বিত হন। তন্ত্রের নিষেধসত্ত্বেও অধিকাংশ লোকে ক্ষণভঙ্গুর শক্তিলাভের প্রয়াস করেন। সাধারণ লোক সাধনার মার্গ অবলম্বন না করিয়া মনে করেন দুই একদিন দেবীর পূজা করিলেই দেবী প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিবেন। এই বর লাভের আশাতেই অধিকাংশ লোক তন্ত্রোক্তমতে পূজা করে। লোকপ্রিয়তাই তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহায়ক হইয়া অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল।

হাণ্টার সাহেবের মতে ৪৭৪ হইতে ১১৩২ অব্দ পর্য্যন্ত কেশরীরাজবংশ উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। এই রাজবংশ উড়িষ্যার আদিম রাজবংশ। পরবর্ত্তী গঙ্গাবংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও উড়িষ্যাদেশীয় বলা যাইতে পারে না। O'malley's Gazeteerএ কেশরী রাজ্যের আয়তন এইরূপ ছিল দেখিতে পাওয়া যায়—কেশরীবংশীয়ের রাজত্বকালে উড়িষ্যার সীমা বালেশ্বরের দক্ষিণ হইতে ঋষিকুল্যা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজবংশীয় রাজগণ যে শাক্ত ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যাজপুর কেশরীরাজাদিগের সর্ব্বপ্রথম রাজধানী। পরে ভুবনেশ্বর তাঁহাদিগের রাজধানী হয়। যাজপুর এবং ভুবনেশ্বর উভয়ই শক্তিক্ষেত্র ;—তবে একটু পার্থক্য আছে। যাজপুর বা বিরজাক্ষেত্রে শক্তির প্রাবল্য অত্যধিক। সেখানে বহু শিবের মন্দির আছে। বিরজামাহাত্ম্য পাঠে জানা যায়,—একসময়ে বৈতরণী নদীর গোমুখী হইতে যাজপুর পর্য্যন্ত এক লক্ষ শিবমন্দির ছিল ; কিন্তু শক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহাই তন্ত্রোক্ত মত। তন্ত্র বলেন সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত শিব বিকারগ্রস্ত এবং শক্তির পুত্রস্থানীয়। সর্ব্বলোকজননী এই বিশ্বসংসারে যে সৃষ্টিক্রিয়া প্রকট করিতেছেন সেই সৃষ্টিক্রিয়ার সহায়তা করিবার জন্য শিব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সংহার-নিরত। তাই শক্তির প্রথম স্থান। বিরজাক্ষেত্রে এই ভাব। শক্তির প্রাধান্য বিরজাক্ষেত্রে মূর্ত্তিমান হইয়া সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং পূজাবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ভুবনেশ্বরে কিন্তু এ ভাব নাই। কালক্রমে তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অপচয় হইয়াছিল। তন্ত্রের দার্শনিকতা ভুলিয়া গিয়া লোকে প্রকৃতির উপর পুরুষের প্রাধান্য মানিয়া লইল। বর্ত্তমানকালে এদেশে স্ত্রীলোককে যেরূপ অনাদরের চক্ষে দেখা হয় পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না ; ক্রমশঃ স্ত্রীলোকের প্রতি অনাদর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির প্রাধান্য কমিয়া গিয়া শিবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাই ভুবনেশ্বরে শিবের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তি পার্ব্বতীরূপে তাঁহার জায়া হইয়া পূজা পাইতেছেন। যে আদ্যাশক্তির তাণ্ডবে শিব জড়তা প্রাপ্ত হইয়া দশমহাবিদ্যারূপে শক্তি-উপাসনা করিয়াছিলেন সে আদ্যাশক্তির পূজা ভুবনেশ্বরে নাই। এখানে শিবের বৈভবদর্শনে শক্তি সঙ্কুচিতা। নববধূ যেরূপ পতিগৃহে আসিয়া এক কোণে বিষাদমালিন্যে দিন কাটায় শক্তিও সেইরূপ জায়ারূপে দীনহীনভাবে পূজা পাইতেছেন। তান্ত্রিক ধর্ম্মের এই অবনতির সহিত আমাদের ভারতীয় অবনতির বোধ হয় একটী সম্বন্ধ আছে। তন্ত্রের উপাসক কখনই স্ত্রীর অবমাননা বা অমর্য্যাদা করিতে পারেন না। তন্ত্র পদে পদে বলিতেছেন প্রত্যেক যুবতীই দশমহাবিদ্যাস্বরূপিনী ; স্ত্রী পরিতুষ্ট হইলে দেবী পরিতুষ্টা হন। যে সাধক স্ত্রীলোকের অবমাননা করেন কিংবা তাঁহাদিগের নিন্দা বা কুৎসা করেন তাঁহার সদগতি কখনই হইতে পারে না। স্ত্রীমর্য্যাদারক্ষা তন্ত্রোক্ত উপাসনার একটী অবশ্য পালনীয় বিধি। যেদিন হইতে উপাসনায় শক্তির অনাদর হইয়া শিবের প্রাধান্য হইয়াছে, বোধ হয় সেইদিন হইতেই আমাদিগের কুললক্ষ্মীগণেরও

অনাদরের সূচনা হইয়াছে। আবার যদি আমরা জাগিতে চাই তাহা হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে জগদম্বাস্বরূপিনী কুললক্ষ্মীর উপাসনা করিতে হইবে। শক্তিপূজার ক্ষুণ্ণতায় যে পুরুষের প্রাধান্য উপাসনা ক্ষেত্র হইতে প্রসারিত হইয়া আমাদিগের গৃহস্থলীর কুললক্ষ্মীদিগকে জড়তাগ্রস্ত করিয়াছে তাহা দূর করিতেই হইবে।

হরিদ্বার।

(শ্রীসারদারঞ্জন দত্তগুপ্ত)

আর্য্যাবর্ত্তের যে অংশ উত্তরাখণ্ড বলিয়া কথিত হয়, তাহা এতই মনোরম ও চিত্তাকর্ষক যে পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়াও নয়ন ও মনের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। এই কারণবশতঃ, যদিও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে একবার আমি হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লক্ষ্মণঝোলা, দেরাদূণ, মুসরী প্রভৃতি স্থান দর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তথাপি বিগত দশহরার অবকাশে আমার কনিষ্ঠ সহোদর ও দুইজন বন্ধুসঙ্গে পুনরায় ঐ সকল স্থান দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম।

আমরা সর্ব্বপ্রথমে পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে উপনীত হই। ইহা হিমালয়-পর্ব্বত-শ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত। এইস্থানে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী সূরযমল সিও-প্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালার এক প্রাসাদতুল্য অতি বৃহৎ ও সুশোভন ধর্ম্মশালা আছে। ইহা এক কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা দ্বারা পরিচালিত। কলিকাতার রায় শিবপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা বাহাদুর এই সভার অন্যতম সদস্য। জনকতক কর্ম্মচারী ও ভৃত্য যাত্রীদের সুবিধার দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখে। এই ধর্ম্মশালায় থাকিবার সুবন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আহারের বন্দোবস্ত নিজেদের করিয়া লইতে হয়। রন্ধনশালা আছে, পানীয় ও স্নানের জলের বন্দোবস্তও আছে। যাঁহারা রন্ধন করিয়া আহার করিতে চান, তাঁহাদিগকে বাসনপত্রাদিও দেওয়া হয়। যাঁহারা রন্ধন করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা "পবিত্রভোজন-ভবনে" (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হোটেলে), অথবা বাজারে খাদ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আহার করিতে পারেন।

ধর্ম্মশালায় একটি গৃহ আমাদিগকে দেওয়া হয়। সেইস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা স্নানার্থে গঙ্গার ধারে যাই। যাঁহারা "তীর্থ করিতে" আসেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট ও কুশাবর্ত্ত ঘাট অর্থাৎ যে দুই ঘাটে যাত্রীদের স্নান করিতে হয়, তাহা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকে কোনও স্থানে স্নান করা সুবিধাজনক। কারণ, উল্লিখিত ঘাটদ্বয়ে পুরোহিত, পাণ্ডা, ভিক্ষুক, এমন কি ক্ষৌরকারগণ পর্য্যন্ত বড়ই বিরক্ত করে। হিন্দুতীর্থমাত্রেই, "যাত্রী-শীকার" করা এই শ্রেণীর লোকদিগের একমাত্র ব্যবসায়।

হরিদ্বার গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। একটা শাখা তীর্থের উত্তর পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বগামিনী হইয়া পূর্ব্বধারে আসিয়া দক্ষিণবাহিনী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে গঙ্গা হিমালয়ের শাখা শিবা-লিক পর্ব্বতশ্রেণী হইতে সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। নদী অতিশয় খরস্রোতা ও কলকল-নাদিনী। তলদেশে ও তীরে অসংখ্য নির্ম্মল প্রস্তর-খণ্ড বিদ্যমান থাকাতে জল সতত স্বচ্ছ কাচের ন্যায় পরিষ্কার এবং স্বভাবতঃ শীতল। বিশেষতঃ যখন পার্ব্বত্য অঞ্চলে বরফ গলিতে আরম্ভ করে, তখন নদীর জল তুষারের ন্যায় শীতল বোধ হয়। জলের গভীরতা অল্প হইলেও স্রোতের বেগহেতু জলমধ্যে অধিকক্ষণ অবস্থান করা বা অধিকদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। স্নানকালে মৎস্যের ক্রীড়াদর্শন অত্যন্ত আনন্দজনক। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা কদাচ আহা-রার্থে মৎস্য হিংসা করে না ও করিতে দেয় না। কাজেই কোন ব্যক্তি জলে অবতরণ করিলে অসংখ্য মৎস্য আহারের লোভে তাহাকে পরিবেষ্টন করে অথবা কৌতূহল বশতঃ তাহার সহিত জলক্রীড়া করিতে আসে। ইহাদিগকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করি-লেও ইহারা বিশেষ ভীত হয় না।

আমরা গঙ্গার নির্ম্মল স্রোতে স্নান করিয়া আহারাদি সমাপনান্তর ভ্রমণে বহির্গত হই। এই স্থানের একটা বিশেষত্ব এই যে দোকান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সাধারণতঃ কোনও 'দামদস্তুর' করিতে হয় না। আমরা যত দোকান হইতে যত দ্রব্য ক্রয় করিয়াছি সর্ব্বত্রই 'একদর'। বিক্রেতা একবার যে মূল্য বলিয়া দিয়াছে, তাহা কিছুতেই

পরিবর্ত্তন করে নাই। পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা হরিদ্বারকে 'হরদোয়ার' বলে। 'হরদ্বার' বা 'হরিদ্বার' যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কার্য্যতঃ তীর্থ-যাত্রীদের ভিতরে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় শ্রেণীর লোকই দৃষ্ট হয়। এ স্থানে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুগণই পুণ্য-সঞ্চয়ার্থে আগমন করেন। প্রবাদ আছে যে হরিদ্বারে মহাত্মা কপিলমুনি সুদীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন; এই কারণেই প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই স্থানকে কপিলস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

হরিদ্বারে যে ঘাটে যাত্রীরা স্নান করিয়া পাপ ক্ষালন করেন, তাহার নাম 'ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট' বা 'গঙ্গাদ্বারঘাট'। ঘাটসংলগ্ন নদীর কতকটা অংশ বাঁধবেষ্টিত করিয়া "কুণ্ড" প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই কুণ্ডের তলদেশ বাঁধান। ইহার এক কোণ হইতে একটি বাঁধান উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী তীরসংলগ্ন হইয়া উত্তরপশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়াই নদীর জল কুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের উপরে কতকটা স্থান দানশীল লোকের অর্থে উত্তমরূপে ইষ্টক দ্বারা বাঁধান হইয়াছে। উহার চলিত নাম "হরকা পাহাড়ি"। এই স্থানে পাদুকাদি লইয়া যাইবার বিধি নাই। যুক্তপ্রদেশের জনৈক ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা হরিদ্বারের ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে স্বহস্তে এই 'হরকা-পাহাড়ি'র ভিত্তিস্থাপন করেন। পার্শ্বের প্রাচীরে একখানা মর্ম্মর প্রস্তরে ঐ মর্ম্মে কয়েক ছত্র লেখা রহিয়াছে। "কলৌ শ্বেতাঙ্গ ব্রাহ্মণাঃ খলু"। নতুবা হিন্দুর পবিত্র তীর্থের পবিত্রতম ঘাটের উপরে অবস্থিত "হরকা পাহাড়ি"র ভিত্তিস্থাপন জন্য একজন "লাট সাহেব"কে আহ্বান করা হইবে কেন?

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই ঘাটে পুরোহিত, পাণ্ডা ও ভিক্ষুক সদা বর্ত্তমান। হিন্দুর তীর্থস্থানের কথা স্মরণ হইলে প্রথমতঃ এই ত্রিতীযিকাত্রয়ই আমাদের মনে উদিত হয়। এই সকল ব্যক্তি প্রায়শঃ লোভান্ধ, নির্লজ্জ ও "নাছোড়-বান্দা"। প্রথমে সুমিষ্ট বাণী শুনাইয়া ও বিনামূল্যে কতিপয় উপদেশ দান করিয়া পরে নিরীহ যাত্রীদিগকে লাঞ্ছনা দিতে এই পুরোহিত ও পাণ্ডা-সম্প্রদায় অত্যন্ত পটু। ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে দীর্ঘ সোপানাবলী আছে; যাত্রীরা তদুপরি উপবেশন করিয়া মন্ত্রাদি পাঠ করেন। বলা বাহুল্য প্রত্যহ বহুলোক ঐ কুণ্ডের বদ্ধজলে উপবেশনান্তর শির অবনত করিয়া "অবগাহন" করেন ও আপনাদিগকে পবিত্রীকৃত মনে করেন; অথচ পার্শ্বেই স্বচ্ছসলিলা জাহ্নবী কুল কুল রবে বহিয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের উপরের মন্দিরে বিষ্ণুর চরণ-চিহ্ন ও নানাবিধ দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। "গঙ্গাদ্বারে" ঐ সমস্ত "প্রাপ্তি-দ্বার" মাত্র। এই ঘাটে কুম্ভ-যোগের সময় স্নান করিতে পারিলে নাকি আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। দ্বাদশ বৎসর অন্তর অন্তর এস্থানে কুম্ভমেলা হয়, এবং তাহাতে হিমালয় হইতে অনেক উচ্চশ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন হইয়া থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া যাত্রীরা তাহার দক্ষিণে কুশাবর্ত্ত ঘাটে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ এস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। সর্ব্বনাথের মন্দিরের বহির্দ্দেশে মহাবোধি বৃক্ষতলে বুদ্ধদেবের একটি মূর্ত্তি বিরাজমান। ইহাতে অনুমান হয় কোনও সময়ে এস্থানেও বৌদ্ধপ্রভাব যথেষ্টপরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

হরিদ্বারে প্রতিবৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে সুবৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে দিগ্‌দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র লোকের আগমন হয়।

অতঃপর আমরা ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। বামপার্শ্বে অনতি উচ্চ শৈলমালা—অন্যদিকে নদী ও নদী-তীরস্থ গৃহশ্রেণী। স্থানে স্থানে পর্ব্বতারোহণের নিমিত্ত প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী রহিয়াছে। পর্ব্বতশিখরে দুই একটি দেবমন্দির আছে। যাত্রীরা অনেকেই কৌতূহলবশতঃ একটু আয়াস স্বীকার-পূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক মন্দিরাদি ও চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্তও এই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে দেখা গিয়াছে। আমরা যে পথে চলিতেছিলাম তাহা শৈলশ্রেণী বেষ্টন করিয়া ক্রমে পশ্চিমমুখী হইয়াছে। এই স্থানে পথের উত্তর পার্শ্বে গঙ্গার একটি শাখাবিশেষ এরূপভাবে স্রোতমুক্ত হইয়া রহিয়াছে যে জলের বর্ণ সম্পূর্ণ নীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া রেলওয়ের পার্শ্বে

একটি ক্ষুদ্র বাঁধান পুষ্করিণী দেখিতে পাইলাম। ইহা গোলাকার ও ক্ষুদ্র; কূপ বলাই সঙ্গত। ইহা পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। তলদেশ ও তীর প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। জলে অসংখ্য মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। জলের গভীরতা অতি অল্প। চতুষ্পার্শ্বে গোলাকার সোপানাবলী। এস্থানে পর্ব্বতগাত্রে দুই একটি প্রকোষ্ঠে দেবমূর্ত্তি আছে। জলাশয়টির চলিত নাম "ভীমগোদা"। "ভীমগোদাকে" স্থানীয় অধিবাসীরা কেন যে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে তাহা আমাদের..বুদ্ধির অনধিগম্য। তবে ব্রহ্মকুণ্ডের সংশ্রবে যে পয়ঃপ্রণালীর কথা বলিয়াছি, তাহা দ্বারা ভীমগোদা ব্রহ্মকুণ্ডের ও নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। ভীমগোদা স্বাভাবিক জলাশয় নহে। ইহার তীরে চর্ম্মপাদুকা আনয়ন করা এবং ইহার জলে অবতরণ করা নিষিদ্ধ। এখানেও যাত্রীরা তর্পণাদি করেন, ইহাই অনুমান হয়। জলে পুষ্প বিল্বপত্রাদিও ভাসমান দেখা গিয়াছিল। আমরা 'ভীমগোদা' দর্শন করিয়াই সে দিবসের মত প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

আদিব্রাহ্মসমাজের গৃহবিক্রয়ের প্রস্তাব।

[আমাদের পরমহিতৈষী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয়ের নিকট হইতে যে পত্রখানি পাইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। যতদূর বুঝিতেছি আদিব্রাহ্মসমাজের গৃহ বিক্রয় করা জনসাধারণের অমত। আমাদের মতে আদিসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবিষয়ে পুনরায় বিবেচনা করিলে ভাল হয়। "আদিম স্মৃতি বজায় রাখা" এই অর্থে বলা হইয়াছে যে আদিব্রাহ্মসমাজ অটুট রাখিয়া অন্যত্র শাখাস্বরূপে নূতন সমাজগৃহ নির্ম্মিত হয় তো হউক। রসিক বাবু পল্লী খারাপ বলিয়া স্বীকার করেন না। এবিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। পতিতা রমণীদের ব্রহ্মোপাসনায় যোগদানে বাধা দেওয়া উচিত নয় ঠিক, কিন্তু যদি তাহারা সেই ভাবে আসিয়া যোগদান করে। যাই হোক এবিষয়ে মতভেদ আছে।
তঃ বোঃ সং]

শ্রদ্ধেয় মাননীয় শ্রীযুক্ত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" সম্পাদক মহাশয়েষু—

মহাশয়—

নিম্নলিখিত পত্রখানি আপনার পত্রিকার একপার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, ১৬ই নভেম্বর ১৯১৯ } নিবেদক শ্রীরসিকলাল রায়—

শ্রদ্ধেয় মাননীয় শ্রীযুক্ত সঞ্জীবনীসম্পাদক-মহাশয়েষু—

মহাশয়—

বিগত ১৫ই আশ্বিন তারিখের "সঞ্জীবনীতে" আদিব্রাহ্মসমাজ-বিক্রয়-বিরুদ্ধে আপনি যে সবল প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছেন, আমি সেই প্রতিবাদের সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। আপনি অতি যথার্থই লিখিয়াছেন যে, "যে সমাজ রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনার জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, যেখানে তিনি স্বয়ং উপাসনা করিতেন, যেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপূর্ব্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখান করিয়া বহুলোকের প্রাণে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন, সেই পবিত্র স্থান বিক্রয় করিতে যাঁহারা সাহসী হইয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত ভারতবাসীর ধিক্কারের পাত্র হইবেন। আমরা অবগত হইয়াছি ৯০৫০০ টাকায় আদিসমাজ বিক্রয় করা হইবে—রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের আত্মা ঐ দুরাচার দেখিয়া কি ভাবিতেছেন তাহা আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ কি একবার চিন্তা করিয়াছেন?" এই প্রতিবাদধ্বনিতে সমাজ বিক্রয়-প্রস্তাব যে চূর্ণ ও বিচূর্ণ হইবে ইহাই আমার বিশ্বাস। শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত হিসাবে আপনার প্রতিবাদে যোগ দিয়াছেন দেখিয়া আমি অতীব সুখী হইয়াছি। তবে তিনি যে কয়েকটি কথা কহিয়াছেন তাহা বিচারসাপেক্ষ। তিনি কহিতেছেন যে, "পল্লী খারাপ, এবং সেই কারণে আদিসমাজের অনেক সভ্য ইচ্ছা থাকিলেও উপসনায় যোগ দিতে পারেন না—সপরিবারে আসা তো দূরের কথা"—আমি জানি কোন পতিতা স্ত্রীলোক উপাসনাকালীন সমাজপার্শ্বস্থ জানালার নিকট দণ্ডায়মানা থাকিলে তাহাকে সরিয়া যাইতে কহা হইত। আমি মনে করি ঐরূপ পতিতা স্ত্রীলোক যদি উপাসনাকার্য্যে মনোযোগী হয় তাহাকে কোন বাধা না দেওয়া উচিত। সমাজগৃহ স্থাপনাবধি এতাবৎ বহু বৎসর কাল সমাজের সভ্যেরা ব্রহ্মানন্দ পান করিয়া আসিতেছেন। যে স্থানে স্ত্রীলোকেরা বসেন সেস্থান সমাজের এক প্রান্তে যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত। সুতরাং পল্লীদোষ তথায় পৌঁছিতে পারে না। সমাজগৃহের পার্শ্বস্থ দুই একটি জানালা বন্ধ করিয়া দিলে পতিতা রমণী সমাজগৃহাভ্যন্তর দর্শন করিতে পারে না। তিনি কহিতেছেন, "আমার মতে যদি একটি উপযুক্ত স্থানে উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বিবেচিত হয় তবে তাহা করা হউক, কিন্তু রামমোহন রায়ের 'আদিম স্মৃতি' বজায় রাখিয়া"—নূতন উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ ও রামমোহন রায়ের আদিম স্মৃতি বজায় রাখা—ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তিনি কহিতেছেন যে, "অর্থাভাবে আদিসমাজ গৃহ পুনর্নির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব" সুতরাং বিক্রয় প্রস্তাব বলবান হইয়া পড়িতেছে। অতি প্রাচীন আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরকে উপেক্ষা করিয়া সেই স্থানে নূতন উপাসনামন্দির স্থাপন করিলে আদিসমাজের পবিত্রতা ও রামমোহন রায়ের স্মৃতিকে দূষিতভাবে উপেক্ষা করা হইবে। যে আদি ব্রাহ্মসমাজে এতাবৎকাল ব্রহ্মনাম সঙ্কোষিত হইয়া প্রাণকে শান্তিনীরে ডুবাইয়াছে, মাড়োয়ারী করতলস্থ হইয়া সেই ভবন চাউল, দাউল, ও বস্ত্রাদির বিক্রয় স্থান হইবে—ইহা প্রাণে সহ্য হইবে না।

যেরূপে হউক প্রাচীন আদিসমাজগৃহকে রক্ষা করা হউক ও আদি স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখা হউক।

১৮৪১ শকের ৭ই ভাদ্র রবিবার দিবসের অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ।

গত ২৯শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার দিবসের আহ্বান অনুসারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিস্থিত ভবনের দালানে ৭ই ভাদ্র রবিবার অধ্যক্ষসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কার্য্যবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

উপস্থিত সভ্য।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
" হরিপদ ত্রিবেদী।
" যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি।
" সুরেশচন্দ্র চৌধুরী।
" পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী দাসগুপ্ত মহাশয়ের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সিটি কলেজ লাইব্রেরীর জন্য সুলভ মূল্যে পুস্তক পাইবার প্রার্থনা আলোচিত হইল।

স্থির হইল—সুলভ মূল্যে পুস্তক প্রদান অনুমোদিত হউক।

২। কুমার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়কে আদিসমাজ লাইব্রেরীতে "Chore Bagan Mullick Family পুস্তক প্রদানের জন্য ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—কুমার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয়কে পুস্তক প্রদানের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হউক।

৩। মাহিলং প্রবাসী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সরকার মহাশয়ের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্র আলোচিত হইল।

উক্ত পত্রে তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব করিয়াছেন।

(১) মহর্ষিদেবের উপদেশ, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি পুরাতন তত্ত্ববোধিনী হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ।

আপাতত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দুষ্প্রাপ্য সংখ্যাগুলি মুদ্রিত হইতেছে। সেগুলি মুদ্রিত হইবার পর এ বিষয়ে চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রস্তাবটি উপাদেয় নিঃসন্দেহ।

(২) আদিব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস।

একজন ভাল ইতিহাস লেখক পাইলে সম্পাদক তাঁহাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন। আদিব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের কতকগুলি অংশ গত ৬ বৎসরের তত্ত্ববোধিনীতে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) মহর্ষিদেবের সমগ্র জীবনী পূজনীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা লেখান।

তাঁহার বয়সের আধিক্যের কারণে এ প্রস্তাব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

পত্রখানি এই সঙ্গে প্রচারিত হইল।

সশ্রদ্ধ নমস্কারানন্তর নিবেদন,

আজ আপনার নিকট কয়েকটী প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইতেছি, বিনীত নিবেদন আমার অপরাধ লইবেন না ও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন প্রস্তাবগুলি প্রণিধানযোগ্য কিনা ও কতদূর কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে।

প্রথম প্রস্তাব :—মহর্ষিদেবের অনেক উপদেশ ও বক্তৃতা ও প্রবন্ধ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত ও শাস্ত্রাদির অনুবাদ যাহা "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে" বা কোন পুস্তকাকারে এখনও প্রকাশিত হয় নাই সেগুলি পুরাতন তত্ত্ববোধিনীতে প্রাপ্ত হওয়া যায় বা ক্ষুদ্র পুস্তকের আকারে আছে। এই সকল ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী একত্র করিয়া করিয়া যথাযথভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা উচিত ইহাই প্রথম প্রস্তাব ও নিবেদন এরূপ হইলে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে ও বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। উপদেশগুলি বা প্রবন্ধগুলি কিছু কিছু পড়িয়াছি—পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়াছি সে সকলের তুলনা আর কোথাও পাই না। আমার মনে হয় এই সকল উপদেশের জন্যই ব্রাহ্মসমাজ সে সময়ে এত জীবন্তভাব ধরিয়াছিল ও সে সকলের অভাবে ব্রাহ্মসমাজ এখন এমন হীনপ্রভ হইয়াছে। বড় দুঃখের বিষয় যে সে সকল অমূল্য উপদেশ পুরাতন তত্ত্ববোধিনীতে এখনও অবজ্ঞাতভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে পড়িয়া রহিয়াছে আর "ছাইপাঁশ" বক্তৃতা ও উপদেশ প্রকাশিত হইয়া বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। আপনার কাছে আমার সানুনয় নিবেদন যে আপনি ত্বরায় সে সকল উপদেশ ও বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পুস্তকাকারে সাধারণের নিকট আবার এখন প্রকাশ করিয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। এ কার্য্যের জন্য আপনিই উপযুক্ত সেইজন্য আপনাকে এ অনুরোধ করিতে সাহস করিয়াছি। অন্যান্য কার্য্য অপেক্ষা এ কার্য্য নিশ্চয়ই আপনার গৌরবের বিষয় হইবে। আপনার যদি সময় না থাকে তাহা হইলে দুতিন জন কর্ম্মচারী রাখিয়া এ কার্য্য শীঘ্র সমাধান করিতে পারেন;

আমার বিবেচনায় নিম্নলিখিত স্বতন্ত্র পুস্তক হইতে পারে :—

(১) উপদেশ ও বক্তৃতা—প্রথম পুস্তক।

অনেক উপদেশ আছে তার মধ্যে কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি, যথা—

(ক) তত্ত্ববোধিনী সভার ২য় অধিবেশনে বক্তৃতা।
(খ) ১৭৮২ শকে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে উপদেশ।
(গ) ১৭৮২ শকে ব্রাহ্মবন্ধু সভাতে বক্তৃতা যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত বিষয় :—ব্রাহ্মসমাজের ২৫ বৎসরের বৃত্তান্ত।
(ঘ) কেশবচন্দ্রের আচার্য্যপদে নিয়োগ ও উপদেশ।
(ঙ) ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে বক্তৃতা।
(চ) বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর উপাচার্য্যপদে নিয়োগ ও বক্তৃতা।
(ছ) হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে উপদেশ।
(জ) হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে বক্তৃতা।
(ঝ) ১৭৮৯ শকে অভিনন্দনের উত্তর।
(ঞ) ১৭৮৯ শকে "ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থান" বিষয়ে বক্তৃতা।

(ট) ১৭৯২ শকে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ।
(ঠ) ১৭৯৬ শকে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ।
(ড) ১৭৯৮ শকে সিন্দুরিয়াপটীতে উৎসব।
(ণ) সাধারণ ব্রাহ্মগণের অভিনন্দনের উত্তর—যাহা "উপহার" বলিয়া বিখ্যাত।

এইরূপ আরও কত অলস্ত বক্তৃতা ও উপদেশ তত্ত্ব-বোধিনী-পত্রিকাতে বিক্ষিপ্ত আছে তার সংখ্যা করা যায় না—কয়েকটী যাহা আমার সুন্দর বলিয়া বোধ হইল তাহাই লিখিলাম। এ সকল একত্র করিলে অতি বৃহৎ ও অতি সুন্দর পুস্তক হইবে মহর্ষিদেবের জীবনের ক্রম-বিকাশ ও সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

(২) মহর্ষিদেবের প্রবন্ধ—দ্বিতীয় পুস্তক।

তত্ত্ববোধিনীতে মহর্ষিদেবের অনেক প্রবন্ধ আছে—ভবসিন্ধু বাবু ও অজিৎ বাবু তাঁহাদের পুস্তকে সে সকলের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, ১৭৯২ শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ। শ্রদ্ধের সত্যেন্দ্র বাবু অনেক প্রবন্ধের বিষয় জানিতে পারেন। পরিবারের কেহ কেহ, বা পুরাতন ব্রাহ্মরাও কেহ কেহ সন্ধান বলিতে পারেন। সে সকল প্রবন্ধ একত্র করিলে কি একটী বৃহৎ পুস্তক হইবে না?

(৩) মহর্ষিদেবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত—তৃতীয় পুস্তক।

ভবসিন্ধু বাবু তাঁহার লিখিত জীবনচরিতে ৩৭১ পৃষ্ঠার ও অজিত বাবু ৪৭৭ পৃষ্ঠার মহর্ষিদেবের ভ্রমণ বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪) চতুর্থ পুস্তক—ছোট ছোট পুস্তকগুলি লইয়া একটী পুস্তক হইতে পারে, যথা—

(ক) ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।
(খ) আত্মতত্ত্ববিদ্যা।
(গ) জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।
(ঘ) পরলোক ও মুক্তি।

এমন সব অমূল্য পুস্তক ক্ষুদ্রাকারে থাকাতে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করে না ও আমার মনে হয় ক্রমে সে সকল দুষ্প্রাপ্য হইবে ও লোপ পাইবে—সেইজন্য এ সকল একত্র করিয়া পুস্তকাকারে রক্ষা করা ও প্রকাশ করা উচিত।

"জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি" আপনার প্রেরিত listএ পাইলাম না—ইহা কি আর আজকাল পাওয়া যায় না? "উপহার" (বাঙ্গলার) কি পাওয়া যায় না?

(৫) পঞ্চম পুস্তক—ঋগ্বেদের অনুবাদ।

১২৪৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা আছে—(তত্ত্ববোধিনী ১৭৬৯ শকের ফাল্গুন দ্রষ্টব্য)—ঋগ্বেদের অনুবাদ বাঙ্গলায় কি পাওয়া যায়? অনুবাদ না পাওয়া গেলে ক্ষতি নাই কিন্তু উপদেশ ও প্রবন্ধ সকলের বিশেষ দরকার আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় M. A. পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষাকে একটী বিষয়রূপে নিরূপণ করিতে চান—যদি ইহা নিরূপিত হয় তাহা হইলে মহর্ষিদেবের লেখনী নিঃসৃত প্রবন্ধ ও স্বর্গীয় অলস্ত উপদেশ সকলই বাঙ্গলাভাষায় Classics রূপে নির্ব্বাচিত হইবে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। এ সুযোগ ছাড়িলে বাঙ্গলাভাষার ও সমগ্র দেশের সমূহ ক্ষতি হবে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের ইহা ঈশ্বর প্রেরিত সুযোগ বলিয়া মনে হয়। আপনার নিকট বিনীত ভিক্ষা এ স্বর্গীয় সুযোগ হারাইবেন না।

এ সকল পুস্তক ব্যতীত আরও পুস্তকের অভাব আমরা অনেকে অনুভব করি। আপনার মণ্ডলীগঠনের প্রবন্ধ পড়িয়া সে অভাব আরও বোধ করিতেছি। যদিও মহর্ষিদেবের অলস্ত উপদেশ ব্যতীত মণ্ডলীগঠন হইতে পারে না ইহা একরূপ ধ্রুব সত্য, তথাপি আরও কয়েকটী পুস্তক প্রয়োজন—সেই জন্য আমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব নিবেদন করিতেছি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। আদিব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস (বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত) একখানি থাকা প্রয়োজন। ইহা বাঙ্গালা ভাষায় হইবে। আদিব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানি না বলিলে হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব। অনেকে আকাঙ্ক্ষা করেন যে আপনি বা শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্র বাবু মহর্ষিদেবের সমগ্র জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় লেখেন—ভবসিন্ধু বাবুর বা অজিত বাবুর জীবনী নানা কারণে সকলের মনোনীত হয় নাই বিশেষত ভাষার দোষের জন্য।

অবশেষে সানুনয় ভিক্ষা—কোন অপরাধ লইবেন না—মনের আবেগে অনেক কথা লিখিলাম—ক্ষমা করিবেন। প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

বিনত নিবেদক
শ্রীসিদ্ধেশ্বর সরকার।

স্থির হইল——

(১) সম্পাদক মহাশয় মহর্ষিদেবের উপদেশ প্রভৃতি সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলে ভালই হয়।

(২) আদিব্রাহ্মসমাজের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করা উচিত।

(৩) শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে মহর্ষিদেবের সমগ্র জীবনী লিখিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

৪। Secy All India Music Conferenceএর ২৬শে ফেব্রুয়ারীর পত্র আলোচিত হইল।

এই সভার সহিত আদিসমাজের যোগস্থাপনের উপায় স্থির করিলে ভাল হয়। আদিসমাজ হইতেই বলিতে গেলে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে তান লয় সমন্বিত সঙ্গীতের চর্চ্চার সূত্রপাত হয়।

স্থির হইল—সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি এ বিষয়ের যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবার ভার প্রদান করা হউক।

৫। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গত ২০ মার্চ্চ তারিখের আদিসমাজ লাইব্রেরীকে পুস্তক প্রদানের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

পত্রখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

"আদিব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরী দেশীয়গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত লাইব্রেরীসমূহের পথপ্রদর্শক ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইতিপূর্ব্বে আমি যখন আদিসমাজের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম, সেই সময়ে পাথুরেঘাটায় ৺হরনাথ

ঠাকুর মহাশয় তাঁহার নিজের লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক প্রায় ৪০০ খণ্ড আদিসমাজের লাইব্রেরিতে প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাহার একখানিও নাই। অধিক কি, এবারে সমাজের ভার গ্রহণের পর সে লাইব্রেরীই আর দেখিতে পাই নাই। সেই কারণে আমি কতকগুলি পুস্তক সমাজে প্রদান করিবার পূর্ব্বে অধ্যক্ষসভার এবং সেই সঙ্গে ট্রষ্টীদিগের এই নির্দ্ধারণ চাই যে, আদিব্রাহ্মসমাজের লাইবেরীর পুস্তকগুলি সমাজের গৃহেই থাকিবে; পুস্তকগুলি অন্য কোথাও স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে পুস্তকদাতার অভিমত জানিয়া অধ্যক্ষ সভার এবং ট্রষ্টীদিগের অনুমতি লইতে হইবে।" ইতি—

স্থির হইল—আদিব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরীতে পুস্তকপ্রদানসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাব গৃহীত হউক।

৬। কম্পোজিটর ও প্রেসম্যানের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব। আলোচিত হইল।

পুরাতন কম্পোজিটারদিগের মাসিক ২৲ টাকা এবং প্রেসম্যান তিনকড়ি দের মাসিক ১৲ টাকা বৃদ্ধি অনুমোদন করিলে ভাল হয়।

স্থির হইল—কম্পোজিটার রণগোপাল চক্রবর্ত্তী ও গোপীনাথ ঘোষ এবং প্রেসম্যান তিনকড়ি দে, ইহাদের প্রত্যেককে মাসিক ১৲ এক টাকা হিসাবে বৃদ্ধি দেওয়া হউক।

৭। বেজুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয়ের বেজুড়াতে ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আদিব্রাহ্মসমাজকে দানের প্রস্তাব। আলোচিত হইল।

ইহার স্বত্ব আদিব্রাহ্মসমাজকে প্রদান করিতে গেলে ট্রষ্টডীড্ করা আবশ্যক একথা তাঁহাকে লেখা হইয়াছে।

স্থির হইল—ট্রষ্টডীড্ পাইলে প্রস্তাব আলোচিত হইবে।

৮। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের, "জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির" স্বত্ব ব্রাহ্মসমাজকে দানের প্রস্তাব। আলোচিত হইল।

ক্ষিতীন্দ্র বাবু নিম্নলিখিত সর্ত্তে ঐ গ্রন্থের স্বত্ব দিতে সম্মত আছেন—"উক্ত গ্রন্থের এক সংস্করণ ফুরাইয়া গেলেই পরবর্ত্তী এক বৎসরের মধ্যে অন্তত ৫০০ পাঁচশত কাপির একটী সংস্করণ সমাজের ব্যয়ে প্রকাশ করা হইবে, এবং প্রতি বৎসরের শেষে ইহার হিসাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করা হইবে (এই সর্ত্তের অন্যথা হইলে উহার সত্ব তাঁহারই নিজস্ব থাকিবে।"

গত ৪ঠা ফাল্গুনের অধিবেশনে স্থির হয় যে উক্ত পুস্তক এক খণ্ড সভাপতি মহাশয়ের নিকট পাঠান হউক এবং তাঁহার মতামতসহ প্রস্তাব পুনরায় উপস্থিত করা হউক।

সভাপতি মহাশয় বলেন "অনেক কথায় note প্রয়োজন এবং মধ্যে মধ্যে নূতন কথা দেওয়া প্রয়োজন। স্থানে স্থানে correction ও দরকার; edit করিয়া বালা পাঠ্য হিসাবে ছাপাইলে ভাল হয়।

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির" স্বত্ব তাঁহার প্রস্তাবিত স্বত্ব অনুসারে গ্রহণ করা হউক।

৯। আদিব্রাহ্মসমাজপ্রেসের প্রিণ্টার শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তীর কন্যার বিবাহে সাহায্য প্রাপ্তির প্রার্থনা। আলোচিত হইল।

স্থির হইল—প্রিণ্টার শ্রীযুক্ত রণগোপাল চক্রবর্ত্তীর কন্যার বিবাহের সাহায্য ৮৲ আট টাকা মঞ্জুর করা হউক।

১০। খলগোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন রায়ের ২রা জুন তারিখের পত্র। আলোচিত হইল।

ইনি একজন পিতৃমাতৃহীন বালক, পড়ার খরচ প্রার্থনা করেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চাহেন।

স্থির হইল—বর্ত্তমানে প্রার্থিত সাহায্য দেওয়া যাইতে পারিবে না লেখা হউক।

১১। পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয়ের ২১শে মে তারিখর পত্র। আলোচিত হইল।

তিনি লিখিয়াছেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একটি বিপত্নীক ও আনুষ্ঠানিক (অর্থাৎ রেজেষ্ট্রি করিয়া বিবাহিত) কায়স্থ পাত্র একটী ২৫ বৎসরের ব্রাহ্মবিধবা পাত্রীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক। তিনি বিবাহের পূর্ব্বে আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষিত হইয়া আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। তজ্জন্য তিনি জানিতে চাহিয়াছেন যে বিবাহ সিদ্ধ হইবে কিনা এবং কোন আচার্য্য বা পুরোহিত যাইতে পারিবেন কিনা।

স্থির হইল—আইনানুসারে সিদ্ধ হইবে কি না দেখা হউক। যদি অসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে আদিসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।

১২। শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী মহাশয়ের ২৭শে আষাঢ় তারিখের পত্র আলোচিত হইল।

তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন।

১। পুরাতন নিয়ম অনুসারে এখন প্রতি বুধবারে উপাসনা হইতেছে, আমি এই বুধবার ভিন্ন আর একদিন (যেদিন সকলের সুবিধা হইবে) উপাসনা করিতে বলি, অর্থাৎ সপ্তাহে দুইদিন উপাসনা হওয়া কর্ত্তব্য।

২। এই দুই দিন ছাড়া এক একদিন এক একজন সভ্য অথবা সম বিশ্বাসী বন্ধুর বাড়িতে উপাসনা করা। এই উপাসনায় সকল সভ্য যোগ দিবেন। ইহাতে এই উপকার মনে করি যে পরিবারে উপাসনা হইলে মহিলাগণ পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা সম্ভোগ করিয়া পবিত্র হইতে পারিবেন। এই উপাসনায় জলযোগ দ্বারা অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হওয়া একেবারে নিষেধ। এইরূপ পারিবারিক উপাসনা প্রতি মাসে যতবার ইচ্ছা ও সুবিধা হইবে ততবারই করিতে পারা যাইবে। কোনদিন কাহার বাড়িতে উপাসনা হইবে, পূর্ব্ববারের উপাসনার শেষে বলিয়া দেওয়া হইবে।

৩। মাঝে মাঝে নিকটস্থ কোন গ্রামে যাইয়া সেই গ্রামের লোকদিগকে লইয়া খোলা জায়গায় কীর্ত্তনাদি সহ উপাসনা করিলে ভাল হয়। ইহাতে গ্রামের লোকজন ব্রহ্মোপাসনার আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪। প্রতি সভ্যের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা নিজ নিজ এলাকাস্থিত সভ্যগণের বাড়িতে যাইয়া পরস্পর দেখাশোনা, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা।

৫। আমাদের মধ্যে প্রচারকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, অতএব উপযুক্ত প্রচারক প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। সভ্যদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ বলিতে পারেন, তাঁহাকে বলিবার অবসর দেওয়া, এবং তাঁহাকে প্রচারকের কার্য্যাদি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

আরো অনেক কর্ত্তব্য আছে তাহা এক্ষণে তত দরকার নাই। আপাতক এই কয়টি কার্য্য আপাতক এই

কয়টি কার্য্য আরম্ভ করিলেই সমাজের অনেক উপকার আশা করা যায়।

প্রার্থনা করি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটি সভা আহবান করিয়া সেই সভায় ইহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঠিক করিবেন ইতি—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদীর উপর প্রতি রবিবারে একটী উপাসনা ও আলোচনা সভা সংস্থাপনের ভার দেওয়া হউক।

সভাপতি

ট্রষ্টী

—•—

একমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ কল্প
প্রথম ভাগ
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০

৯১৭ সংখ্যা ১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

বিবেকে ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ।

(ডাক্তার সার গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩-১-৮।

"চক্ষুর দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান হয় না, বাক্যের দ্বারাও নহে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও নহে, তপস্যা কিংবা কর্ম্মের দ্বারাও নহে; কিন্তু অন্তর্যামী জ্ঞান নির্ম্মল হইলে, প্রপঞ্চ হইতে উৎপন্ন যে মলিন সংস্কার তাহা হইতে মুক্ত হইলে এবং রজ ও তম এই পাপজনক গুণের নিরাস হইয়া কেবল সত্ত্বগুণ অথবা সাত্বিক ভাব হৃদয়ে উদিত হইলে মনুষ্য যখন ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সর্ব্বপ্রকারের পরিপূর্ণ যে পরমেশ্বর তাঁহাকে দেখিতে পায়।"

ভাল, মন্দ, যোগ্য, অযোগ্য, মঙ্গল, অমঙ্গল, পুণ্য, পাপ,—এই সকলের বিবেচক যে বিবেক, তদ্দ্বারা মঙ্গলময় পরমেশ্বর আপন বাণী মনুষ্যের অন্তঃকরণে উদিত করান, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাই সব নহে। এই বিবেকবুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে স্বকীয় মঙ্গলময় ও বিশুদ্ধ স্বরূপও প্রকটিত করেন। স্বকীয় বৃত্তি ও স্বকীয় আচরণ সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধ, মঙ্গলময়, পুণ্যময় অথবা যোগ্য বলিয়া কোন মনুষ্য প্রত্যয় করিতে না পারিলেও, আপন হৃদয় মলিন, পাপী ও দুষ্ট বাসনায় পরিপূর্ণ এইরূপ সকলেরই মনে হইলেও, পরিপূর্ণ, মঙ্গল, বিমল, অকলঙ্ক সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতে বিমুক্ত, শুদ্ধতার পরাকাষ্ঠা এইরূপ স্বরূপের জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবতই হইয়া থাকে। পরিপূর্ণ মঙ্গলের জ্ঞান অন্তরে না থাকিলে, অমঙ্গল এরূপ প্রত্যয়ই আমাদের হইতে পারে না; এইরূপ পরিপূর্ণ স্বরূপের জ্ঞান আছে বলিয়াই আমরা পাপী, আমরা দুষ্ট, এইরূপ আপনাদিগকে মনে করি এবং তাহা হইতে মুক্ত হইয়া, অন্তঃকরণ শুদ্ধ শান্ত ও মঙ্গলময় হউক এইরূপ বলবতী ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। এইপ্রকারে পরমেশ্বরের মঙ্গলভাবের জ্ঞান আমাদের অন্তরে উৎপন্ন হইলে তাহার অনুকরণ করিব, তাহার সাদৃশ্য আমরা প্রাপ্ত হইব, মনুষ্যের অন্তঃকরণে এই অভিলাষ হইয়া থাকে; সেইজন্যই তুকারাম বাবার ন্যায় সাধু "আমি পতিত, আমি পাপী, তোমার শরণাপন্ন হইলাম", "সেবাহীন দীন পাতকের রাশি"—এইরূপ বলিয়াছেন। সংসারে অতিশয় আসক্ত ও বিষয়সুখের মধ্যে নিমগ্ন যে সকল ব্যক্তি, তাহাদের অন্তঃকরণে এই পরিপূর্ণ মঙ্গলস্বরূপের জ্ঞানবিধায়ক বিবেক মলিন হইয়া যায়; রজোগুণ ও তমোগুণ প্রবল হইয়া, পাপের সংস্কার দৃঢ় হইয়া বিবেক নষ্টপ্রায় হয়। আত্মার এইরূপ অবস্থা হইলে, পরমেশ্বরের জ্ঞান তাহার হয় না, সে পাপ-পঙ্কের কীট হইয়া পড়ে। উক্ত হইয়াছে—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥
কঠ, ১-২-২৩।

"দুশ্চরিত্র হইতে যে নিবৃত্ত হয় নাই, যে শান্ত নহে, যাহার বৃত্তি সমাধানযুক্ত হয় নাই, মন শান্ত হয় নাই, তাহার পরমেশ্বরের জ্ঞান হয় না এবং তাহার পরমেশ্বরপ্রাপ্তিও হয় না।" কিন্তু অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, কামক্রোধাদি রিপু হইতে আত্মা মুক্ত হইলে, দয়া ক্ষমা শান্তি এই সকল হৃদয়ে বাস করিতে আরম্ভ করিলে, সেই অনন্ত শান্ত আনন্দময় পরিপূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত হন, এবং জীবাত্মা পরম শান্তিসুখ অনুভব করে। ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে ঃ—

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥
৫-২৬।

"যাঁহারা যতি, কামক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন যাঁহারা আপনার চিত্তকে সংযম করিয়া বিবেকের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন, ও আত্মার প্রকৃত যোগ্যতা জানিয়াছেন, তাঁহাদের চারিদিকে ব্রহ্মানন্দ বিদ্যমান থাকে"। সারাংশ, মনুষ্যের অন্তঃকরণে বিবেক বলিয়া যে তত্ত্ব আছে তাহার যোগে, কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহার জ্ঞান অর্থাৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছার জ্ঞান এবং তাঁহার পরিপূর্ণ মঙ্গলস্বরূপের জ্ঞান হইয়া থাকে; এবং এই বিবেক পাপমলায় কলঙ্কিত না হইয়া শুদ্ধ থাকিলে ও তদনুরূপ আপন বৃত্তি ও আচরণ হইলে, পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়।

মানব-ইতিহাসের বিচার করিলে ইহা নিঃসন্দেহরূপে দেখা যায় যে, সাত্ত্বিক ভাবের জ্ঞান আমরা এই প্রকারে সহজে প্রাপ্ত হই, এবং তাহার উত্তরোত্তর জয় হয়। দুষ্ট পাপী অধম যে ব্যক্তি, সে কখন কখন সাত্ত্বিক পুণ্য-পুরুষদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু এই অবস্থা অধিককাল টিকিয়া থাকে না। যে জনসমূহের মধ্যে অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় কিয়ৎকালের মধ্যেই তাহার বিলোপ হইই-হয়। ভালর সম্মুখে মন্দ টেকে না। মন্দের নাশ হইতে কখন ২৫ বৎসর, কখন ৫০, ১০০, ২০০ বৎসর লাগে; কিন্তু অন্তে তাহা নষ্ট হইয়া, ভালোর জয় হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। এবং মন্দ হইতে ভাল-পরিণাম হয়—এরূপও অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই। যাহা ভাল তাহা পরমেশ্বরের ইচ্ছা—এইরূপ আমরা বিবেকযোগে উপলব্ধি করিয়াছি; অতএব ভালর জয় হওয়াও যাহা পরমেশ্বরের ইচ্ছার জয় হওয়াও তাহা—একই। অতএব ভালর জয় হইয়া থাকে, মন্দ হইতেও ভাল উৎপন্ন হয়—ইহা যদি ঠিক হয়, তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছারই জয় হইতেছে এবং এই সমস্ত জগতে পরমেশ্বরই রাজত্ব করিতেছেন, তিনিই সকলের শাসয়িতা, এইরূপ সিদ্ধ হয়।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥
কঠ, ২-২-৮

"সমস্ত প্রাণী যখন গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে তখন যিনি জাগৃত থাকিয়া আপন ইচ্ছানুসারে উৎপত্তি করিয়া থাকেন, তিনিই দেদীপ্যমান, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই শাশ্বত, এইরূপ উক্ত হয়। সমস্ত বিশ্ব তাঁহারই আশ্রয়ে অবস্থিত; তাঁহাকে অতিক্রম করে এমন কেহ নাই।"

আমরা নিদ্রিত থাকি বা সাংসারিক কাজ-কর্ম্মের মধ্যে পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকি, কিংবা অজ্ঞান হইয়া কিছুই দেখি না—তখন পরমেশ্বরের সৃষ্টি-ক্রম যে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা নহে। আমরা দেখি কিংবা না দেখি, বুঝি কিংবা না বুঝি, তথাপি জাগতিক ব্যাপার সমান চলিতে থাকে। পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য অতীব গহন। আমরা তাহা জানিতে পারি না। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য জগতের ব্যাপার অকুণ্ঠিত ভাবে সতত চলিতেছে। আজ হইতে এক বৎসরের মধ্যে, কিংবা দশ বৎসরের মধ্যে, কিংবা শত, সহস্র, লক্ষ বৎসরের মধ্যে যে পরিণাম ঘটিবে তাহার বীজ আজ রোপন করা হইতেছে। পরমেশ্বরের গৃহে কাল-পরিমান বলিয়া কিছুই নাই। আমাদের নিকট শত বৎসর দীর্ঘ কাল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাঁহার যোজনার মধ্যে শত বৎসরের গণনা নাই। অনন্তের সম্মুখে শত বৎসরের গণনা কি? হয়ত আজ যে কাজ কোন রাজপুরুষ করিতেছেন, তাহা হয়ত পরমেশ্বরের হাতে শত বৎসরের পরে রাষ্ট্রবিপ্লবের

মূল কারণ হইবে। আজ আমরা যাহা করিতেছি তাহা হইতে, অমুক এক জনসমাজের মধ্যে কালান্তরে হয়ত এক মহা পরিবর্তন উপস্থিত হইবে, এইরূপ পরমেশ্বরের যোজনা। হিমালয় পর্বত কোটি বৎসরের পর বিনষ্ট হইবে এইরূপ যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য হয়, তবে প্রত্যেক বর্ষায় অল্প অল্প মৃত্তিকা, নদ-নদী, কাষ্ঠ-পাষাণ উহা হইতে বাহিত হইয়া আস্তে আস্তে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে থাকিবে। যেখানে এখন সমুদ্র আছে সেইস্থানে লক্ষ বৎসরের পর ভূমি উৎপন্ন হইবে এইরূপ যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে অসংখ্য কীটের দ্বারা মৃত্তিকার এক কণার উপর অপর কণা ক্রমশ রচিত হইয়া ঐ পরিণাম সংঘটিত হইবে। এবং পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কাল যেরূপ প্রতিবন্ধক হয় না, সেইরূপ দেশও প্রতিবন্ধক হয় না। পৃথিবীর উপর যে বৃষ্টি হয়, তাহা অনেকাংশে দূরবীক্ষণদৃষ্ট সূর্য্যবিম্বের উপরিস্থ কালো টিপের গতির উপর নির্ভর করে। ঐ কালো টিপ সূর্য্যমণ্ডলের উপর চক্রবায়ুর ঘূর্ণনে উৎপন্ন হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তাহার পর, পৃথিবীর উপর মেঘ উৎপন্ন হইয়া প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইয়া বৃষ্টি হইবে—এই ব্যাপারের বীজ ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরস্থ সূর্য্যমণ্ডলের উপর পরমেশ্বর রোপণ করেন। এবং এইরূপ সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ, নক্ষত্র—এই সমস্তের পরস্পরের নিকট-সম্বন্ধ আছে। অতএব দেশ ও কাল হইতে কোন প্রতিবন্ধক না হইয়া পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রম সতত সমানই চলিতেছে; ক্ষণকালের জন্যও তাহার বিরাম হয় না।

এই যে পরমেশ্বর, তিনি দেদীপ্যমান, তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহারই আলোক আমরা চতুর্দিকে দেখিতে পাই। তাঁহার নিকট অজ্ঞান অন্ধকার নাই। সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের জ্ঞান তাঁহার আছে। ভবিষ্যতের জ্ঞান আমাদের নাই, ভূতকালকে আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। মুখ্যরূপে ইন্দ্রিয়যোগেই আমাদের জ্ঞান হয়। ভূত-ভবিষ্যৎ বস্তুর সহিত ঐ ইন্দ্রিয়দিগের সংযোগ হওয়া অসম্ভব। বর্তমান বস্তুর সহিত সংযোগ হয় বলিয়াই আমাদের যা অল্প কিছু জ্ঞান হয়। আমাদের অনুমান দুর্ব্বল; যতটা আবশ্যক সেরূপ ঘটনাবলী আমাদের অনুমান প্রাপ্ত হয় না। তাই, তদ্দ্বারা ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান অতি অল্পই হয়। ভূতকাল-সম্বন্ধে আমাদের মতো লোকের লিখিত গ্রন্থ আছে, তাহা হইতে কিছু শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতেও বিবাদ ও বাধা বিস্তর; এবং এইরূপ গ্রন্থ হইতে কালের জ্ঞান অল্পই হয়। কিন্তু পরমেশ্বর আমাদের ন্যায় শরীররূপ কারাগৃহে বদ্ধ নহেন। আমাদের ন্যায় কারাগৃহের ইন্দ্রিয়রূপ গবাক্ষ দিয়াই তিনি জ্ঞানলাভ করিবেন এরূপ কোন কথা নাই; তিনি শরীরবিহীন, ইন্দ্রিয়রহিত কেবল আত্মস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানময়; তাই সমস্ত ভূত-ভবিষ্যবর্ত্তমান তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর। নিকটস্থ বস্তুর জ্ঞান, এখান হইতে কোটি যোজন দূরস্থ বস্তুর জ্ঞান, সকল দেশের জ্ঞান তাঁহার আছে। পরমেশ্বর ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সকলের মূলতত্ত্ব। তিনি শাশ্বত পুরাণ পুরুষ। বিশ্বজগতে বুদ্বুদবৎ অসংখ্য প্রাণী উৎপন্ন হয়, কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত থাকে এবং অন্তে লয় প্রাপ্ত হয়। আমাদের ন্যায় আজ পর্য্যন্ত কত লোক জন্মিয়াছে এবং আমাদের ন্যায় সংসার করিয়া অন্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিশ্বের রূপান্তর হইয়াছে ও হইতেছে। পৃথিবীর উপর লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কেবল বৃক্ষ ছিল, সর্পাকার প্রাণী ছিল; ঐ অবস্থা আস্তে আস্তে নষ্ট হইয়া এখনকার অবস্থা আসিয়াছে। এই প্রকারে এই ব্রহ্মচক্র ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু পরমেশ্বর একই সমান; তিনি বিনাশরহিত, তিনি বিকাররহিত, তিনি শাশ্বত, পরাৎপর, পরমাত্মা;—তাঁহার উপর কালের প্রভাব চলে না, তিনি কালের প্রভু। এই সমস্ত বিশ্ব তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহারই নিয়মে বদ্ধ হইয়া চলিতেছে, তাঁহারই আশ্রয়ে স্থিতি করিতেছে। বিশ্বের অসংখ্য লোকমণ্ডল, পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য বনস্পতি, অসংখ্য জড়পদার্থ, তাঁহারই শক্তিতে চালিত হইতেছে। ঐ সমস্ত একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। পরমেশ্বরই সকলের রাজা, সকলের শাসয়িতা। তাঁহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে এরূপ কাহারও সামর্থ্য নাই।

রাজা রামমোহন রায়।

(ডাক্তার শ্রীচুনীলাল বসু)

৮৭ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের স্বদেশবাসী যে মহাপুরুষ স্বদেশের হিতব্রতে প্রবাসে গমন করিয়া ব্রিষ্টল্ নগরে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ-বাসরে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-পূজার জন্য আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি লইয়া আমরা এই সভাগৃহে সমাগত হইয়াছি।

সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে মহাপুরুষদিগের পূজা প্রচলিত আছে। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য, মানবজাতির কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গুণাবলী স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া, তাঁহাদের চরিত্রের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহাদের আদর্শ মানসচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া, তাঁহারা যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন সেই পথে অগ্রসর হইতে শক্তিলাভ করিবার জন্য, আমরা মহাপুরুষদিগের পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। যখন আমাদের ক্ষুদ্র জীবন-তরী এই অকূল সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রবল তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন মহাপুরুষদিগের আদর্শ-জীবন স্নিগ্ধজ্যোতি ধ্রুবতারার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া সেই পথভ্রান্ত তরণীকে গন্তব্য পথে পরিচালিত করিবার সহায়তা করিয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথই অবলম্বনীয়। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি Longfellow লিখিয়াছেন :—

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,"

অর্থাৎ মহাপুরুষদিগের আদর্শ-জীবন আমাদিগের জীবনকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার প্রধান সহায়। মহাপুরুষেরা জগতের গুরু—তাঁহাদের আগমনে জগতে সত্যের আলোক প্রকাশিত হয়। সেই আলোকের সাহায্যে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট বিপথগামী মানব, সত্যের পথ, কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়া লইয়া সেই দিকে জীবনের গতি ফিরাইতে সমর্থ হয়। সুতরাং কেবল যে মহাপুরুষদিগের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য এই সকল অনুষ্ঠানের আবশ্যক, তাহা নহে; আমাদের আত্মোন্নতির জন্য তাঁহাদিগের স্মৃতি-পূজার আয়োজন অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজা রামমোহন রায় যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশ ধন্য হইয়াছে; যে জাতির মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে জাতি ধন্য হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে এই বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালী জাতির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যিনি চেষ্টা করিবেন, তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তিনি আজীবন সকল প্রকার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, তিনি যে সকল বিশ্বজনীন উদার-মতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্ত মানবজাতির কল্যাণপ্রদ। জগতের যে কোন মনুষ্য তাহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া, জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে, চিরদিন শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করিবে। এই জন্য তিনি বঙ্গবাসী বা ভারতবাসী হইলেও, সমগ্র বিশ্ববাসীর আপনার লোক ছিলেন—বঙ্গদেশ তাঁহার জন্মভূমি হইলেও আসমুদ্র পৃথিবীই তাঁহার প্রকৃত জন্মভূমি। তাঁহার ধর্ম্মমত এমনই উদার ছিল যে তাঁহার দেহ-ত্যাগের পর তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, ইহা লইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিষম মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল; অথচ তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের সহিত নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া, প্রচলিত প্রত্যেক ধর্ম্মের ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া স্বীয় স্বাধীন মত—একেশ্বরবাদ—অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। জগতে অতি অল্পলোকই এরূপ অসামান্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। এই প্রতিভাবলেই তিনি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন। তিনি মূল ভাষায় রচিত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হিব্রু ভাষায় রচিত বাইবেলে যীশুতে ঈশ্বরত্ব কল্পিত হয় নাই, খ্রীশ্বর-

বাদের (Doctrine of Trinity) উল্লেখ তন্মধ্যে নাই এবং খ্রীষ্টের রক্তে মনুষ্যের পাপ প্রক্ষালিত হইবে, এরূপ মতের প্রচারও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের এই সকল মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য মার্সমান্ প্রমুখ তৎকালীন মিসনরীদিগের সহিত তাঁহার বহু তর্ক ও বিচার হইয়াছিল। প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম যে একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা মিসনরীদিগের সহিত বিচার করিয়া অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে দুই একজন মিসনরী ত্রীশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ (Unitarianism) গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণ হইতে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে তথায় মহম্মদের পয়গম্বরত্বের কোথাও উল্লেখ নাই—কেবল একমাত্র একেশ্বরবাদই কোরাণে সমর্থিত হইয়াছে। বেদ ও উপনিষদ্ হইতে তিনি দেখাইয়াছেন যে সেই সকল গ্রন্থে প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা থাকিলেও উহা যে উপাসনার নিকৃষ্ট পদ্ধতি, ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে এবং এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না ; তিনি যাবতীয় মলিনতা ও আবর্জ্জনা দূর করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মধ্য হইতে সার পদার্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমি নিজে হিন্দু এবং আমার বিশ্বাস যে হিন্দুধর্ম্মের মত সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম জগতে আর নাই। যিনি যে মতেই ভগবানের আরাধনা করুন না কেন, হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম, সুপুত্র, কুপুত্র উভয়কেই তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মে, অধিকারীভেদে, পূজার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তবে একেশ্বরবাদ যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা হিন্দুদিগের সকল শাস্ত্রই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। যখন সমস্ত জগত অজ্ঞানতার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন আমাদের দেশেরই প্রাচীন ঋষিগণ সর্ব্ব প্রথমে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কল্পনা ও তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় ঋষি-উচ্চারিত সেই প্রাচীন মহাবাণী তাঁহার দেশের লোককে নূতন করিয়া শুনাইবার জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি কোন নূতন ধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন না ; তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক না বলিয়া আমরা তাঁহাকে ধর্ম্মসংস্কারক বলিব।

তাঁহার ভাষাজ্ঞান তাঁহার প্রতিভার অপূর্ব্ব পরিচয়। নয় বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আরবী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য পাটনা নগরে গমন করেন। তিন বৎসরে তথায় আরবী ভাষা মৌলবীদিগের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মূল কোরাণ গ্রন্থ আয়ত্ত করেন এবং এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াই একেশ্বর-বাদের প্রতি তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে আরবী ভাষা শিক্ষা শেষ করিয়া সংস্কৃতশিক্ষার জন্য কাশীধামে গমন করেন এবং তথায় প্রসিদ্ধ হিন্দু পণ্ডিতদিগের নিকট সংস্কৃতভাষা ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি অত্যন্ত উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি তিনটী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া এবং দুইটী ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ-সমূহ পাঠ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্ম্মের যে মূল ভিত্তি, তাহা এই বয়সেই তাঁহার মনে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয় এবং প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বঙ্গভাষায় গদ্যে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে মত পোষণ করিবার জন্য পুত্র পিতার বিষম বিরাগভাজন হন এবং ইহার ফলে তিনি সেই কিশোর বয়সে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারাই তাঁহার অসীম সাহস, দুর্জ্জয় মানসিক বল ও অসাধারণ দৈহিক শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষোল বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া একাকী নিঃসম্বল অবস্থায়, আত্মশক্তি ও ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, হিমালয় পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অপর প্রান্তে অবস্থিত তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। তখন যানাদির সুবিধা ছিল না, পথ অপরিচিত ও হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তিব্বত-অভিযান কোন বাঙ্গালীর কল্পনার মধ্যেও আসে নাই। এই নির্ভীক বাঙ্গালী বালক বৌদ্ধধর্ম্ম, লামাদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার জন্য, সকল বিপদ, সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া একাকী সেই দেশে উপনীত হইয়া-

ছিলেন। এরূপ সাহস ও আত্মনির্ভরতার পরিচয় জগতের ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে। তিনি সেখানে যাইয়া লামা-পূজার প্রতিবাদ করিলে লামাগণ তাঁহার প্রাণবিনাশের সংকল্প করেন কিন্তু স্নেহশীলা তিব্বত-রমণীগণ সেই সুকুমারমতি বালককে গোপনে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তিব্বত-রমণীগণের নিকট হইতে এই বিপদের সময় তিনি যে স্নেহ ও দয়া লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি যাবজ্জীবন বিস্মৃত হন নাই। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল, এই ঘটনা তাহার মূলে বর্ত্তমান।

তিনি ২৮ বৎসর বয়সে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ঐ ভাষায় কিরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত বিবিধ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি হিব্রু ভাষা যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়া উক্ত ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল-গ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উত্তরকালে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত ধর্ম্মমত বিচারসম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

বৃদ্ধ বয়সে দেশের কার্য্যে বিলাত যাত্রা তাঁহার সাহস ও মানসিক বলের আর একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তখন বিলাত গমন এখনকার মত সহজ ও সুসাধ্য ছিল না। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী বিলাতে গমন করেন নাই। তখন বিলাত যাইতে ছয়মাস সময় লাগিত এবং ধর্ম্ম ও দেশাচার উভয়ই ইহার প্রবল বিরোধী ছিল। তিনি সকল বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে ৫৮ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে গমন করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের গুণে হিন্দুজাতির প্রতি ইয়ুরোপীয় সুধীমণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার পবিত্র দেহ রক্ষা করিয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই উভয় দেশকে এক অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্দ্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছিল। তিনি আদর্শজ্ঞানী, আদর্শকর্ম্মী এবং আদর্শ ভক্ত ছিলেন। এই তিনের সমন্বয়ে তাঁহার জীবন পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। সাধারণ মানুষের জীবন এক, দুই, বড় জোর, আট বা দশ কলার সমষ্টি মাত্র, তাঁহার জীবন ষোল কলায় পূর্ণ ছিল। তিনি একজন পূর্ণ মনুষ্য ছিলেন এবং আমাদের দেশে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তক। দেশপূজ্য স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত এই নব যুগকে "রামমোহন-যুগ" বলিয়া গিয়াছেন। এই যুগের কার্য্য সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে—ইহা সম্পন্ন হইতে অনেক সময় লাগিবে। অনেক আত্মত্যাগ, অনেক স্বার্থ-বিসর্জ্জনের প্রয়োজন হইবে, অনেক বিপদ অনেক দুঃখ মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে হইবে, তবে এই যুগের সাধনা সম্পূর্ণ হইবে। রামমোহন রায়ের স্বদেশবাসী আমরা তাঁহার সেই প্রাণপণ সাধনার সিদ্ধিলাভের আনুকূল্যে কার্য্য করিতে কি পশ্চাৎপদ হইব?

ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার সংস্কারকার্য্যের জাজ্জ্বল্য প্রমাণ রহিয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে সংস্কারের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যখন সংস্কৃতভাষায় শিক্ষা-প্রচারের জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে উদ্যোগী হন এবং তজ্জন্য অর্থের ব্যবস্থা করেন, তখন রাজা রামমোহন রায় সেই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃতশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, তবে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শুদ্ধ সংস্কৃতশিক্ষায় দেশের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার দূরীভূত হইবে না। পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা দেশমধ্যে প্রচারিত না হইলে দেশের লোকের মনের অন্ধকার ও সংকীর্ণতা ঘুচিবে না, শাসনকার্য্যে এবং রাজনীতিক্ষেত্রে তাহারা উচ্চ অধিকার কখনই পাইতে পারিবে না। জীবনসংগ্রামে তাহারা চিরদিনই পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিবে। সুতরাং তিনি সংস্কৃতভাষায় শিক্ষা-প্রচারের বিরুদ্ধে লর্ড আমহার্ষ্টকে যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন, তাহা তাঁহার বহুদর্শিতা ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির সবিশেষ পরিচায়ক। হিন্দুকলেজ-স্থাপনে তিনি ডেভিড্ হেয়ারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, অথচ তাঁহার সংযোগ হিন্দুপ্রতিষ্ঠাতাগণের বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া তিনি প্রকাশ্যভাবে ইহার সহিত যোগদান করেন নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা

বিস্তারের জন্য নিজের ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। যখন ডাক্তার ডফ্ এদেশের লোকের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের জন্য কলিকাতায় প্রথম মিসনরী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি বিবিমতে তাঁহার সাহায্য করেন এবং সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এদেশে ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রচার কার্য্য সমাধান হইবার ব্যবস্থা তাঁহার মৃত্যুর অনেক দিন পরে বিলাতের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহার চিরদিনের আশা ফলবতী হইয়া ছিল। যদিও তিনি ইহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টা যে এই সুব্যস্থার আদি কারণ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ যে উচ্চ শিক্ষার ফলে দেশ উন্নতির দিকে এত অগ্রসর হইয়াছে, তাহার মূলে রাজা রামমোহন রায়ের হস্ত স্পষ্ট-ভাবে প্রতীয়মান হয়। ভারতবাসীমাত্রেই ইহার জন্য চিরদিন তাঁহার নিকটে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিবে।

রাজা-রামমোহন রায়ের মস্তিষ্ক যেরূপ উর্ব্বর ছিল, তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ কোমল ও উদার ছিল। হৃদয়ের এই উদারতা ও কোমলতাই তাঁহাকে বিবিধ সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিল। সতীদাহ নিবারণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণের স্থল। তাঁহার পূর্ব্বে সময়ে সময়ে কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই নৃশংস প্রথা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইবে বলিয়া কেহই আইনানুসারে ইহা নিবারণ করিতে সাহস করেন নাই। রাজা রামমোহন রায় যেখানে সতীদাহের ব্যবস্থা হইতেছে ইহা কর্ণে শুনিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেইখানে যাইয়া নানা উপদেশ ও স্নেহপূর্ণ বাক্যে সতীর সংকল্প পরিবর্ত্তন করাইবার চেষ্টা করিতেন। অবশ্য কোন কোন স্থলে সতী স্বামীবিয়োগ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বেচ্ছায় এই উপায়ে আত্মহত্যা করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় এবং সামাজিক অপযশের ভয়ে অনেকানেক বিধবা স্বামীর সহগমন করিতেন। সহগমনের সময় ভয় পাইয়া পশ্চাৎপদ হইলে অনেক স্থলে জোর করিয়া তাহাকে চিতায় প্রবেশ করান হইত এবং যদিও সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার নির্ম্মম আত্মীয়স্বজনগণ তাহাকে বলপূর্ব্বক চিতার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণ-বিনাশ করিত। স্ত্রীজাতির প্রতি এই পৈশাচিক সামাজিক অত্যাচার অনেকদিন পর্য্যন্ত রাজা রাম-মোহন রায়ের কোমল হৃদয়ে বিষম আঘাত করিতে-ছিল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয় এবং তাহার ফলে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ-নিবারণ আইন প্রচ-লিত হইয়া ভারতবাসী হিন্দুকে ধর্ম্মের নামে স্ত্রী-হত্যার পাতক হইতে রক্ষা করে। এই সংস্কার-সংসাধনের জন্য রাজা রামমোহন রায়কে অশেষবিধ সামাজিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এমন কি, এক সময়ে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত নিরাপদ ছিল না। তাঁহার দুর্জ্জয় মানসিক শক্তি ও সুদৃঢ় বিবেকবুদ্ধিবলে তিনি সকল বিপদকে তুচ্ছ করিয়া কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার সময়ে "হরকরা" নামক ইংরাজচালিত একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। কোন কারণে গভর্ণমেণ্ট এই পত্রিকার সম্পাদককে আটক করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের দ্বারা পরিচালিত "আকবর" নামক পারস্য ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের প্রচারও বন্ধ হইয়া যায়। ইহার জন্য তিনি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। এখানকার আন্দো-লনে কোন ফল হইল না দেখিয়া তিনি ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা চতুর্থ জর্জ্জের নিকট সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতাসম্বন্ধে এক সুচিন্তিত ও অকাট্য-যুক্তিপূর্ণ আবেদন প্রেরণ করেন। এই আবেদনের শেষ ফল দেখিয়া যাইবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই, কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের দুই বৎসর পরেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতারক্ষার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

তিনি যখন বিলাতে ছিলেন, তখন পার্লিয়া-মেণ্টের একটী কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবার সময়

এদেশের কৃষকদিগের হীনাবস্থার বিষয় বিশেষভাবে বিলাতের মন্ত্রীসভার গোচর করিয়া উহার উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। অধিকসংখ্যক এদেশবাসী লোক যাহাতে বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্যও তিনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালাসাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষায় যে দুই একখানি গদ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, সাহিত্য হিসাবে সেগুলি উল্লেখযোগ্য নহে। তিনি অনেকগুলি উপনিষদ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া ভাষার উন্নতি ও সৌষ্ঠবসাধন করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রনিহিত ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বসমূহ সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়া দেশে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে "সংবাদ কৌমুদী" নামক একখানি সংবাদপত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিসনরিগণ কর্ত্তৃক "সমাচারদর্পণ" নামক একখানিমাত্র সংবাদপত্র বাঙ্গালাভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি হিব্রুভাষার বাইবেল হইতে এবং আরবীভাষায় লিখিত কোরাণ হইতে অনেকানেক স্থান অনুবাদ করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন; অনেকানেক ইংরাজী গ্রন্থ ও সময়োপযোগী পুস্তিকা লিখিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া নিজ গৃহে "আত্মীয় সভা" স্থাপন করেন। "একেশ্বরবাদ" প্রচারই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া ১৮২৮ সালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "ব্রাহ্মসভায়" পরিণত হয় এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই মাঘ তারিখে বর্ত্তমান "আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহ" এই সভার স্থায়ী ভবনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধারণভাবে ব্রহ্মোপাসনা কলিকাতায় প্রচলিত হয়। এই উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং ইহার উপাসনাকার্য্য আরম্ভ হইবার প্রায় এক বৎসর পরে তিনি ১৮৩০ সালে বিলাত গমন করেন এবং তথায় তিন বৎসর স্বদেশের কল্যাণে কার্য্য করিবার পর সাঙ্ঘাতিক জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ব্রিষ্টল্ নগরে দেহরক্ষা করেন।

যদি আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের কল্যাণ কামনার জন্য—সেই মহাপুরুষের অনুষ্ঠিত কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তবেই আমাদের অদ্যকার এই স্মৃতিপূজার আয়োজন সার্থক হইবে।

বিবাহ মঙ্গল।

রাগিণী—সাহানা।

তোমারি আহ্বানে আজ
পরিয়া মিলন-সাজ
এসেছে আশীষ তরে
শুভ মিলনের পরে।
দীরঘ জীবন-পাথে
ধরি' যেন তব হাতে
তোমারি করুণা পরে
চলে নিরভর ক'রে—
তব এ আশীষ শিরে
ঘরে লয়ে যেন ফিরে।
সন্ততি ফেলুক ছেয়ে
শত কলতানে গেহ,
তব পুণ্য নাম গেয়ে
ধন্য হোক প্রাণ দেহ;
জ্ঞানেতে উজ্জ্বল হোক,
ঘুচে যাক দুখ শোক;
আনন্দ হউক নিত্য
অনুচর সদা সত্য—
তব এ আশীষ শিরে
ঘরে লয়ে যেন ফিরে।

বঙ্গের অভাব।

(শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত)

কালের শাসনে বাঙ্গালী আমরা, সুজলা, সুফলা বঙ্গমাতার আদরে পালিত শিশু আমরা, আজ অন্ন

* রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু কর্ত্তৃক বিবৃত, পরিচারিকা কার্ত্তিক ১৩২৬ হইতে উদ্ধৃত।

বস্ত্রের কাঙ্গাল। অনশন না হউক অর্দ্ধাশন আমাদের নিত্য সহচর। বস্ত্রের অভাবে নগ্ন হইতে বসিয়াছি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালকবালিকাগণকে বিলাতি ছাঁচের খাকীরঙ্গের হাফ্‌প্যান্ট পরাইয়াছি। গৃহলক্ষ্মীগণকে প্রায় ডোর-কৌপিন ধরাইয়াছি। এ দুর্দ্দশা কেন হইল?

বঙ্গদেশে ধনী বা ধনকুবেরের অভাব নাই একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশের সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় —একথাও অতি সত্য। তাঁহাদের হৃদয় তাঁহাদের প্রতিবেশী অসহায় দরিদ্রগণের দুঃখে এককালেই কাঁদে না, ইহাও সত্য নহে। নানাবিষয়ে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান বাঙ্গালীর মধ্যেও বিরল নহে। যে প্রবল পরাক্রান্ত রাজশক্তি আজ বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা, সে শক্তিও সুপ্ত নহে। সকলেই বাঙ্গালীর দুঃখ-মোচনে সচেষ্ট, তথাপি আমরা প্রতিদিন, প্রতিমাস, প্রতিবর্ষ অধিকতর অবসন্ন হইতেছি ইহাও ত নিত্য সত্য। শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এ দারুণ দুর্দ্দশা ছিল না। তখন অন্ন-বস্ত্রের জন্য প্রায় কোন বাঙ্গালীকে পরের দ্বারে যাইতে হইত না। এমন কি, বাঙ্গালার ভিক্ষুকগণ ও স্বচ্ছন্দলব্ধ ভিক্ষা-মুষ্টি দ্বারা স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারিত। বিগত শত বৎসরে বঙ্গের লোকসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনি কৃষিযোগ্য ভূমিও অধিক হইয়াছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সুন্দরবন নামধেয় বিশাল বনভূমির অনেকাংশ এবং উত্তুঙ্গশিখর হিমাচলের পাদবর্ত্তী বিস্তৃত কাননভূমি অপরিমেয় শস্যরাজি উৎপাদন করতঃ বঙ্গের অজস্র কল্যাণ সাধন করিতেছে। বঙ্গের বর্দ্ধমান বহির্বাণিজ্য রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বাঙ্গালীর গৃহে অধিকতর অর্থাগম করিতেছে। বিদেশী পণ্যের আমদানিও দ্রুতবেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল বিদেশী পণ্য আমরা অবাধে ক্রয় করিয়া বিদেশীয় বণিকগণের উদরপোষণের উপায় করিয়া দিতেছি, অথচ আমরা দিনে দিনে অন্নহীন হইতেছি। একি বিষম প্রহেলিকা! তবে কি আমাদের চির-করুণাময়ী জননী বঙ্গভূমির অফুরন্ত শস্য-ভাণ্ডারের বিনিময়ে আমরা বিদেশীয় বিলাসিনী ও বিলাসী-গণের চাকচিক্যময় বিলাসবিভ্রমের বাগুরাবদ্ধ হইয়া অন্নবিনিময়ে বিষ গ্রহণ করিতেছি? এ কথাটা যেন কিয়ৎ পরিমাণে সত্য বলিয়া মনে হয়। একদিন অপরাহ্ণে সমস্ত দিবার দারুণ পরিশ্রমের পরে অবসন্ন ও ক্লিষ্টদেহে ধনগরবে গরবিনী বঙ্গ-রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর সুশোভন রথ্যা-বলম্বনে পদব্রজে গৃহে ফিরিবার কালে ঐ সকল সংকীর্ণ বা প্রশস্ত বিবিধ রাজপথগুলির উভয়পার্শ্বে বিরাজমান অসংখ্য সৌধমালার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি বিস্তার করিতে করিতে উদ্‌ভ্রান্তমনে পদচালনা করিতেছিলাম। যে দিকে চাহিয়া দেখি সেই দিকেই কেবল অগণ্য বিপণিশ্রেণী আমার লুব্ধ-দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছিল। নানাবিধ মনোমুগ্ধ-কর পণ্যরাশি মনোমোহনসাজে সুশোভিত। তখন হঠাৎ মনে হইল যে ক্ষুদ্র মানব আমরা, আমাদের অভাবের পরিমাণ কি এত বৃহৎ, যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ এতঅধিক দ্রব্যরাজি আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বা-হের জন্য আবশ্যক হয়? লালসার দৃষ্টিকে দূরে রাখিয়া, বিলাসের মোহ-আবরণ ধীরে সরাইয়া নিরপেক্ষভাবে দেখিলাম যে আমাদের নিত্য অভাব মোচনোপযোগী নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ ঐ সকল সুশোভন বিপণিশ্রেণীর মধ্যে প্রায়শঃ নাই। নয়নরঞ্জন সুসজ্জিত পণ্যরাশির মধ্যে আমাদের ক্ষুৎপিপাসার অভাব-মোচনোপযোগী চাউল, ডাউল, তরি-তরকারি, দুগ্ধ ঘৃত, আটা ময়দা অথবা বাতাতপ হইতে আমাদের ক্ষুদ্র দেহগুলি রক্ষা করিবার উপযোগী প্রয়োজনীয় বস্ত্র কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হইল। চিরকরুণাকোমল বিশ্বপতির চির আশীর্ব্বাদরূপী এই সকল অন্ন পানীয় কোথাও বা আবর্জ্জনারাশির পশ্চাতে ক্ষুদ্র অন্ধকারাবৃত অপ্রশস্ত পথপার্শ্বে, কোথাও বা কোন ক্ষুদ্র কুটী-রের অভ্যন্তরে মুখ লুকাইয়া বসিয়া আছেন। আর যে সকল বস্তুর অভাবে আমাদের দেহযাত্রা নির্ব্বা-হের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না, সেই সকল খেলনার দ্রব্য মনোমোহন রূপ ধরিয়া আমাদের প্রলুব্ধ করি-তেছে। অভাগা আমরা, কাঞ্চন ফেলিয়া কাচকে অঞ্চলে বাঁধিতেছি, আর হা-অন্ন যো-অন্ন করিয়া তপ্তনিঃশ্বাসে করুণাময়ী শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার করুণা-শীতল বক্ষকে সন্তপ্ত করিয়া তুলিতেছি। বঙ্গের গৃহস্থ ছিলাম আমরা। ক্ষেতের শস্য,

গোয়ালের গরুর দুগ্ধ, পুষ্করিণী বা নদী-তড়াগের মৎস্য ও পানীয়, বনজাত বা উদ্যানজাত ফলমূল, জলাভূমিজাত তৃণের শয্যা, অযত্নপালিত শিমুলতুলার উপাধান, আর গৃহে গৃহে গৃহমাতৃকাগণের রোপিত কার্পাসবৃক্ষজাত তাঁহাদের স্বহস্তপ্রসূত কার্পাসতন্তু-জাত বস্ত্র আমাদের নিত্য অভাব অজস্রপরিমাণে নিত্য মোচন করিত। হতভাগ্য চিরভ্রান্ত আমরা, কোন্ কুহকে ভুলিয়া আজ সেই স্বভাবের শিশু আমরা, স্বভাবসুন্দরীর অফুরন্ত ভাণ্ডারের রত্নরাজি বিলাইয়া দিয়া—অন্তঃসারশূন্য বাহ্য চাকচিক্যময়ী বিদেশীয় বিলাসব্যসনা বুকে পুরিয়া বিলাসের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া নানাবিধ ক্ষণভঙ্গুর অপ্রয়োজনীয় অসার বস্তুরাশিকে অপরিত্যাজ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি। অভাবের এই কল্পিত মূর্ত্তিকে দূরে রাখিয়া আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ন বস্ত্র দ্বারা স্ব স্ব অভাব মোচন করিবার সরল ও সুগম পথে যদি আমরা আবার ফিরিতে পারি, যদি আমাদের বঙ্গীয় জনসমাজের শীর্ষস্থানে যাঁহারা আসীন, যাঁহাদের অনুকরণে জনসাধারণ পরিচালিত, তাঁহারা উচ্চ আদর্শ স্থাপন করতঃ আমাদের গন্তব্য পথে আমাদিগকে পরিচালিত করিতে পারেন, তবে বুঝিবা আমাদের এই দুর্দ্দশামোচনের পথ পুনরুন্মুক্ত হইতে পারে।

এ ত গেল মানসিক বিবর্ত্তনের কথা। এটি যেমন নিত্য প্রয়োজন তেমনি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপানীয় ও পরিধেয় সংস্থানকল্পে সাধারণ বঙ্গ-বাসীর আর একটি কর্ত্তব্য অন্যদিকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বঙ্গবাসীর সমাজগঠন, শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল একবার সেদিকে ফিরিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে তখনকার দিনে কৃষিকার্য্য দ্বারা ধানা, গম, মটর কলাই, ছোলা, সরিষা, তিসি, বেগুন, পটোল, উচ্ছে, আলু, মুলা প্রভৃতি শাক-সবজি প্রভৃতি উৎপাদিত হইত। পল্লীসংস্থানের মধ্যে এই সকল কঠোর পরিশ্রমী সরল ও মিতা-চারী পল্লীবাসীগণ সমাজের বিরাট দেহের মেরুদণ্ড ছিল। কৃষকপল্লীর গোময়পূত ক্ষুদ্র-বৃহৎ পর্ণ-কুটীরগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে চিরসুষমা বিস্তার করিয়া পুষ্টদেহ হৃষ্টমন বালকবালিকাগণের ক্রীড়া-ধ্বনিতে, কৃষকবধূর সুপুষ্ট বরবপুর অলঙ্কার-শিঞ্জিতে ও তুষ্ট প্রাণের সরল সলজ্জ ব্রীড়াময়ী ভাষার কলনিনাদে, দৃঢ়কায় বলশালী কৃষকযুবকের সরল প্রাণের সহজ সঙ্গীতে সদাসর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। পল্লীবাসী উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর প্রতি-বেশীবর্গ ইহাদের আনন্দপূতকুটীরে সময়ে অসময়ে সদাই গতায়াত করিতেন। দাদা, ভাই, কাকা, চাচা, মামু প্রভৃতি স্নেহের ও প্রীতির সম্বন্ধ পাতা-ইয়া পরস্পরকে সম্বোধন করা হইত। সুদর্শন কৃষি-পল্লীর অদূরে আভীরপল্লী। দলে দলে গো-মহি-ষাদি গৃহপালিত পশুগণ তৃণগুচ্ছ মুখে লইয়া কোথাও বা শ্বেত কোথাও বা কৃষ্ণ, কোথাও বা ধূসর নিটোল দেহগুলির কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত। রজতাভরণভূষিত সুপুষ্ট গোপবধূগণ কেহবা গোময়মর্দ্দন, কেহবা গাভীদোহন, কেহ বা দধিমন্থন এবং কেহবা নবনীতভ্রক্ষণ করিতেছে। গোবৃথের পশ্চাতে দলে দলে গোপশিশুগণ বেত্রহস্তে বালকণ্ঠের তরল সুধাবর্ষণ করিয়া গোচারণে ধাবিত হইতেছে। সুবলিষ্ঠ দেহে সদাতৃপ্ত গোপযুবকগণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃতভার বহন করিয়া প্রতিবেশীগণের গৃহে গৃহে অথবা অদূরবর্ত্তী নগরে বা গ্রামান্তরে গতায়াত করিতেছে। প্রাতে, অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে পল্লীশিরোমণি শিরোমণি মহাশয় হইতে পল্লীপ্রান্ত-বাসিনী ভিখারিণী পর্য্যন্ত আভীরপল্লীর সম্মান বর্দ্ধন করিতেন। সেই কাকা, দাদা প্রভৃতি মধুর সম্বোধন, সেই বিশ্বপরিবারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মধ্যে স্নেহ প্রীতির পবিত্র বন্ধন।

পল্লীর অন্য প্রান্তভাগে মৃত্তিকাজাত বর্ত্তুলাকার মৃৎপাত্রের প্রাচীরের অন্তরালে কি সুন্দর কুলালচক্রের আবর্ত্তন। মাটির দেহটির ভিতরে মৃত্তিকা-কোমল মনটি লইয়া কুম্ভকারবধূ মাটী ছেনিতেছে, হাঁড়ি কলসীতে রং কলাইতেছে, কুম্ভকার চাক ঘুরাইতেছে, পণ লেপিতেছে বা পণাখিতে ইন্ধন দিতেছে ও মুখে মৃদুমধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছে, কুম্ভকার-শিশু নৃত্য করিতেছে। কি স্বভাবসুন্দর দৃশ্য! কি স্বভাবসুন্দর অভাবমোচন!

অদূরে কতকগুলি গোলাকৃতি পর্ণকুটীর হইতে একটি সুস্বর লহরী ভাসিয়া উঠিতেছে। পল্লীর তৈলিক বলদ ঘুরাইয়া পল্লীকৃষকের শ্রমলব্ধ তিল,

সর্ষপ, নারিকেলাদি মর্দ্দন করত পল্লীবাসীগণের তৈলের অভাব দূর করিতেছে। এখানেও সেই সরল প্রাণের সরল খেলা, সেই উচ্চ-নীচ বিভিন্ন স্তরের জনমণ্ডলীর সদালাপ ও সদ্ভাবের সুন্দর বিনিময়। অদূরে স্বর্ণকারগণ পল্লীবধূগণের অঙ্গ-শোভাসম্পাদনে নানাবিধ ভূষণরচনায় ব্যস্ত এবং তৎসান্নিধ্যেই লৌহকারগণ লৌহস্তম্ভের দারুণ আঘাতে লৌহ নিষ্পেষিত করিয়া পল্লীবাসী জনগণের জন্য নানাবিধ লৌহ অস্ত্র গঠনে ক্ষিপ্রহস্ত। ভস্ত্রার দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্ভব ও অসম্ভব নানাবিধ রসালাপে পথিকগণের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতেছে। কত বা বলিব? কত বা বলিতে জানি! পল্লীর হাটে পল্লীর ধীবরেরা মৎস্য, পল্লীগোপের দধিদুগ্ধ, পল্লীর কৃষকের কৃষিলব্ধ শস্যসব্জী পল্লীতন্তুবায়ের বস্ত্র, পরস্পরে বিনিময় হইত। তখন সর্ষপবিনিময়ে ধান্য, ধান্যবিনিময়ে তণ্ডুল, তণ্ডুলবিনিময়ে বস্ত্র, কদলীবিনিময়ে কন্দমূল, শাকের বিনিময়ে খড় এইরূপে হাট বসিত। কেবলমাত্র সমুদ্রজাত কড়িরাশি অর্থনীতিবিদ্‌গণের দুর্ভাবনা দূর করিত। হায় মা বঙ্গভূমি! আর কি সেদিন ফিরিবে? আর কি তোমার স্বভাব-শিশু পল্লীকৃষক, পল্লীগোপ পল্লী তৈলিক, পল্লী-স্বর্ণকার, পল্লীকর্ম্মকার প্রভৃতিকে লইয়া পল্লীর সওদাগর, পল্লীর জমিদার ও পল্লীর অধ্যাপকগণ, পরস্পরের মধ্যে স্নেহের, প্রীতির বিনিময় করিবেন!

এখন উপায় কি! একই উপায় হইতেছে—বাঙ্গালীকে আবার বাঙ্গালী হইতে হইবে। বাঙ্গালার পল্লী আবার যথাসম্ভব পূর্ব্বের ছাঁচে গড়িতে হইবে। পল্লীবাসীগণের পরস্পরের মধ্যে সেবাধর্ম্মকে পুনরায় উদ্দীপিত করিতে হইবে। পল্লীবাসীগণকে পুষ্ট না রাখিলে দেশের কল্যাণ সাধন সম্ভবপর নহে। প্রজাসাধারণের বা জনসাধারণের উন্নতিকল্পে পাশ্চাত্য দেশে প্রথমে এই প্রয়োজন লক্ষিত হয় এবং তাহার পরিণামস্বরূপ জনমণ্ডলীকে লইয়া কো অপারেটিভ বা সম্মিলিত সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিভিন্ন জনসঙ্ঘকে বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্য কৃষিসমাজে মিলিত করিয়া তাহাদের সমবেত দায়িত্বলব্ধ মূলধনসংগ্রহের ও সমবেত শক্তি-নিয়োগের প্রণালী শিক্ষা দিয়া পল্লীজনগণকে পুষ্ট করা হইতেছে। উক্ত পাশ্চাত্য আদর্শে বঙ্গীয় রাজশক্তি বঙ্গীয় দরিদ্রকুলের মঙ্গল কামনায় এই প্রণালীতে অনেকগুলি কো-অপারেটিভ্ বা সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া একটি রাজকীয় নূতন বিভাগ সৃষ্টিকরতঃ তাহার হস্তে ইহার পরিচালন ও বর্দ্ধনের ভার অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গের জনসঙ্ঘ এখনও শৈশবের ধূলিখেলা অতিক্রম করে নাই। এই নূতন বিভাগকে রাজকীয় শাসনবিভাগের সহিত মিলিত করিয়া এবং শাসনবিভাগের কর্ম্ম-চারীগণের হস্তে এই জন-সাধারণের মিলন-মন্দির গুলিকে বহুল পরিমাণে সমর্পণ করিয়া রাজ-পুরুষগণ এই সকল সমিতিকে সাধারণের প্রীতি অথবা ইহাদের প্রতি আপন বলিয়া জন-সাধারণের মমতা আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। যে রাজপুরুষ দণ্ডবিধাতা, তাঁহার প্রচণ্ড কিরণের সান্নিধ্যে দরিদ্র চির অধীন জনগণ আসিতে সাহসী হন না; কোন কারণে সান্নিধ্যে আসিলেও তাহারা সাহসহারা ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

যে কোন উপায়ে জনমঙ্গল সাধন করিতে যাওয়া হউক না কেন, কৃষি শিল্প বা বাণিজ্য যাহা-কেই অবলম্বন করনা কেন সর্ব্বাগ্রে মূলধন সংগ্রহ প্রয়োজন। সেইজন্য এই সকল সমিতি প্রথমতঃ মূলধন সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা বঙ্গীয় পল্লীজনগণের জীবনের কালস্বরূপ ঋণভার মোচনের চেষ্টা করিতেছেন। একটী ঋণগ্রস্ত দরিদ্র অসহায় গৃহস্থের দায়িত্বে তাহার প্রয়োজন-পরিমিত অর্থ সংগ্রহ হয় না। এইজন্য কতকগুলি ব্যক্তিকে মিলিত করিয়া তাহাদের মিলিত দায়িত্বকে প্রতিভূ রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সকল ধনশালী ব্যক্তি বা কুসীদজীবিগণ একজনকে বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রয়োজনপরিমিত অর্থ ঋণ দিতে ভীত বা সঙ্কুচিত, তাঁহারাই ঐরূপ দশ বিশটী সম্মিলিত দরিদ্রের পার্থিব সম্পত্তি বা দায়িত্ব প্রতিভূ রাখিয়া সকলের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ঋণদানে মুক্তহস্ত হই-য়াছেন। কিন্তু স্বজাতীয় চরিত্রের উপর তাঁহাদের বিশ্বাসের অভাবহেতু তাঁহারা এইরূপে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীতে মিলিত কোন সমিতির সাহায্য করিতে

এত শীঘ্র বা এত সহজ বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হয়েন না। তাহার দুইটী প্রধান কারণ আছে। জয়েণ্টষ্টক কোম্পানিগুলির সভ্যদিগের দায়িত্ব সাধারণতঃ অংশ হিসাবে নিয়মিত। প্রত্যেক অংশী যে কয়টা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার দায়িত্ব সেইখানে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। তদতিরিক্ত কোন অংশীর অন্য কোন সম্পত্তি জয়েণ্টষ্টক সমিতিগুলির দেনার দায়ে দায়ী নহে। পক্ষান্তরে এই সকল কো-অপারেটিভ সমিতির প্রত্যেক অংশী বা সভ্যের সমগ্র সম্পত্তির সমস্ত দেনার দায়িত্বে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি দায়ী থাকে। ইহা অর্থসাহায্যকারী কুসীদজীবিগণের পক্ষে যেরূপ নিরাপদ অসীম দায়িত্ববিশিষ্ট কো-অপারেটিভ সমিতির প্রত্যেক সভ্যের পক্ষে তেমনি বিপদসঙ্কুল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের দোষে বা অপটুতায় যে কোন দায় উপস্থিত হইবে তজ্জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া উক্ত দায় পরিশোধিত হইতে পারিবে। সুতরাং পরস্পরের উপর প্রবল প্রীতি ও বিশ্বাস না থাকিলে এই সকল সমিতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। আর একটি কারণ এই যে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী রাজশক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত নহে, সেগুলি রাজবিধির অন্তর্গত ও তাহার আয়-ব্যয়াদি রাজকর্ম্মচারীবিশেষের পরিদর্শনাধীন হইলেও তাহাদের দেনা পরিশোধের জন্য উক্ত কোম্পানীর যৌথ অর্থসম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যতীত প্রত্যেক অংশীর অন্য কোন সম্পত্তির উপর কোন অধিকার রাজপুরুষগণের নাই। পক্ষান্তরে কো-অপারেটিভ সমিতির কার্য্যকালে রাজনিয়ম অপেক্ষাকৃত কঠোর,—রাজপুরুষগণের প্রত্যক্ষ পরিচালনের অন্তর্ভূত রাখিয়া প্রত্যেক সভ্যের সর্ব্বস্ব বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সম্মিলিত সমিতির ক্ষতির দায় পূরণ করিতে রাজপুরুষগণ অধিকারী। এই উভয় কারণে কো-অপারেটিভ সমিতিগুলিতে অর্থ নিয়োগ করিতে ধনী বা মহাজনগণ সাগ্রহে অগ্রসর হইতেছেন। প্রকৃত পক্ষে আমাদের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের এত অবনতি, ভগবৎ বিশ্বাস এত ক্ষীণ, সৎকর্ম্মে অনুরাগ এত সঙ্কীর্ণ যে আমরা পর-প্রতারণাকে অনেকস্থলেই পাপ বলিয়া মনে করি না। আমাদের যে কোন যৌথ কার্য্যে রাজার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

কো-অপারেটিভ সমিতিগুলি এইরূপ রাজসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াও যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহে সমর্থ হইয়াও আশানুরূপ সুফলের পরিবর্ত্তে অনেকস্থলে কুফল লাভ করিতেছে। এই সকল সমিতির কোন কোন সভ্য ঋণপ্রাপ্তি সহজসাধ্য হওয়াতে আত্মশক্তির অতিরিক্ত অপরিমেয় ঋণ গ্রহণে পরিশেষে পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সহযোগী প্রতিবাসীগণকে বিপন্ন, সমিতির উদ্দেশ্য বিফল এবং রাজপুরুষগণের কার্য্যভার কঠোরতর করিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন হইতেছেন। শিশুসমিতিগুলি এইরূপে অকালে জরাগ্রস্ত হইতেছেন বা জীবনলীলা পরিসমাপ্ত করিতেছেন। রাজপুরুষগণের এবং এই নবীন কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণশীল পরিচালকগণের ইহা বিষম চিন্তার বিষয় হইয়াছে। এই সকল সমিতির অধিকাংশ সর্ব্বজাতীয়, সর্ব্বশ্রেণীস্থ বিভিন্ন জীবিকাবৃত্তিধারী, ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রভৃতি দ্বারা মিলিত ভাবে গঠিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে স্ব স্ব অবলম্বিত বৃত্তির তারতম্য, অবস্থার বিপর্য্যয়, সামাজিক সম্বন্ধের অথবা কোন আভ্যন্তরিক আকর্ষণের অভাব এই সকল সমিতির 'সমবায়' নামকে সার্থক করিতে দিতেছে না। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল সমবায়-সমিতি কার্য্যোন্মুখী হইতেছে না, এবং সমবেদনা ও সহযোগিতা আত্মপ্রসার লাভের অবকাশ পাইতেছে না। কোন অনুষ্ঠানের শৈশবে তাহার ভবিষ্যৎ রূপ অনুমান করা যায় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। আপাতত সমিতিগুলির বিফলতার দুইটি প্রধান কারণ অনুমান করা যায়। আমাদের গুণকর্ম্মানুসারী প্রাচীন জাতিভেদকে অনাদৃত করিয়া প্রাচীন কর্ম্ম-সমবায়গুলিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমিতির সংযুক্ত সভ্যগণকে লইয়া এক একটি অভিনব জাতি বা দল পরোক্ষে গঠন করিতে গিয়া এবং ঋণগ্রহণের ব্যবস্থা সুগম করত ঋণ পরিশোধের উপযোগী অধিকতর অর্থাগমের চেষ্টা দূরে পরিহার করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াতে এই বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে রাজপুরুষগণ অপেক্ষা আমরা অধিকতর অপরাধী। তাঁহারা বিদেশী ; আমাদের সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা, আমাদের মনোবৃত্তি, আমাদের অভাব বুঝিবার

পক্ষে তাঁহারা অসমর্থ। আমরাও আমাদের স্বীয় হৃদয়কে বুঝিতে না পারায় বা বুঝিলেও পদস্থ রাজকর্ম্মচারীবিশেষের মন স্তুষ্টির জন্য দৌর্ব্বল্য লইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হওয়ায় বর্ত্তমান যুগের উদ্ভাবিত জনমণ্ডলের এইকল্যাণকর অনুষ্ঠানগুলিকে ডুবাইতে বসিয়াছি। বঙ্গের বর্ত্তমান দুরবস্থা মোচনপক্ষে পল্লীতে পল্লীতে উপনগরে উপনগরে এবং এমন কি নগরে নগরে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী দ্বারা হউক অথবা কোঅপারেটিভ সমিতি-গঠন দ্বারা হউক সমবেত দায়ীত্বে মূলধন সংগ্রহ করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ নিয়োগ করিয়া প্রতি সভ্যকে কুশীদজীবীগণের কঠোর কবল হইতে মুক্ত করিয়া এবং অপরার্দ্ধ তাহাদের পিতৃপিতামহের অবলম্বিত বৃত্তিবিশেষের উন্নতিকল্পে যতদূর সম্ভব আধুনিক উন্নত প্রণালীতে নিয়োগ করিয়া অধিকতর অর্থাগমের পথ সুগম করতঃ তদ্দ্বারা ক্রমশঃ পূর্ব্বার্দ্ধ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিচালকগণ এই প্রস্তাবের পূর্ব্বাংশে বর্ণিতরূপে স্বীয় স্বীয় অভাবের মাত্রা সঙ্কুচিত করিয়া সহজলব্ধ অন্ন-পরিধেয়-লাভে তুষ্ট থাকিয়া আদর্শ স্থাপন করিতে পারিলে আবার বুঝিবা বঙ্গপল্লী হাস্যময়ী সুষমা বিস্তার করিতে পারিবেন। পল্লীসমুহের পক্ষে কোঅপারেটিভ প্রণালী সর্ব্বথা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়। উপরোক্তরূপে কয়েকটী বৎসরের চেষ্টায় দরিদ্র সভ্যগণের ঋণভার স্কন্ধচ্যুত হইলে ক্রমশঃ প্রত্যেকের মূলধন গঠিত হইবে এবং যৌথ কার্য্যে প্রত্যেকে সুশিক্ষিত হইবেন। তখন অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগতভাবে অথবা জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী গঠনে তাঁহারা নিজ অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইবেন। এইরূপে সর্ব্বথা আত্মোন্নতিকর লাভজনক ব্যবসায়ে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকায় বহিশ্চাকচিক্যশালী কল্পিত অভাবমোচক উপলখণ্ড গুলিকে আর কেহ বাঞ্ছনীয় দ্রব্য মনে করিবে না। পল্লীগৃহে আবার হাসি ফুটিবে, পল্লীমাতা আবার মাতৃত্বের কিরণে প্রভাময়ী হইবেন, পল্লীবধূ আবার ব্রীড়াময়ী শান্তিসহচরী হইবেন। পল্লীবাসীগণ প্রজ্জলিত ঈর্ষ্যানল নির্ব্বাপিত করিয়া তাঁহাদের সদাতৃপ্ত হৃদয়ে, তাঁহাদের স্নেহ ও প্রীতিপ্রবণ বক্ষে প্রেমও প্রীতির শীতল স্পর্শ অনুভব করিবেন। বঙ্গপল্লীর সুসন্তানরূপে, বঙ্গবাসী জনমণ্ডলীর মেরুদণ্ডরূপে তাঁহারা সমাজের ও সাম্রাজ্যের নিয়ামকগণের প্রতি প্রীতিফুল্ল প্রাণে অনুরক্ত থাকিয়া তাঁহাদের হৃদয় সকল ঘটনার নিয়ন্তা বিশ্বপতির চরণতলে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বয়ং ধন্য হইবেন এবং বিশ্ববাসীগণকে ধন্য করিবেন। মাগো বঙ্গভূমি, এ স্বপ্ন কি পূর্ণ হবে না ?

উৎকলে শক্তিপূজা।

(শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়)

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

পূর্ব্বে বলিয়াছি কেশরীবংশীয়দিগের রাজ্যের সীমা বালেশ্বরের দক্ষিণ হইতে ঋষিকুল্যা নদী পর্য্যন্ত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানীতে বিরজা দেবী অধিষ্ঠান করিতেন। পুরী একটী প্রাচীন বন্দর। হুয়েংসন যখন উৎকলে আসিয়াছিলেন তখন পুরী বন্দরের নাম চরিত্রপুর ছিল। এই চরিত্রপুর হইতে পণ্যদ্রব্য লইয়া বহু নৌকা সমুদ্রপথ দিয়া যাতায়াত করিত। এইখানে বিমলার মন্দির। বিমলা ও বিরজা পীঠস্থান বলিয়া সমগ্র ভারতে পূজা পাইতেছেন। "বিরজা উড্রদেশে চ বিমলা পুরুষোত্তমে"। কথিত আছে দক্ষযজ্ঞে পার্ব্বতী প্রাণত্যাগ করিলে শিব তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মত্তভাবে মহা তাণ্ডবে প্রবৃত্ত হইলেন। উন্মত্ত ভৈরবের পদ-তাড়নে পৃথিবী রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল। পালনকর্ত্তা বিষ্ণু তখন শিবের অলক্ষ্যে সতীর মৃতদেহ সুদর্শন চক্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এক এক খণ্ড এক এক স্থানে পড়িয়া এক একটী পীঠস্থান হইল। এই পৌরাণিক গল্প অবিশ্বাস করিলেও বিরজা ও বিমলা যে প্রাচীন শক্তিক্ষেত্র তাহা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কুলালীকামনায় বা কুব্জিকামত তন্ত্র আন্দাজ ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। (Vide M. M. Haraprasad Shastri's Nepal catalogue of manscripts page 79 । LXXIX.) ঐ তন্ত্রে শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—

"গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে হবিকারায় সর্ব্বতঃ।
পীঠোপপীঠক্ষেত্রেষু কুরু সৃষ্টিরনেকধা।

গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে কুরু স্থিতিরমীদৃশঃ।
পঞ্চবেদাঃ পঞ্চৈব যোগিনঃ পীঠপঞ্চকঃ॥
এতানি ভারতে বর্ষে যাবৎ পীঠা ন স্থাপ্যন্তে।
তাবৎ ন মে ত্বয়া সার্দ্ধং সঙ্গমঃ প্রজায়তে॥

কেশরীবংশীয় রাজগণ আরও সাতটী প্রধান শক্তির মন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের রাজ্যের প্রধান প্রধান ঘাটিতে ঐ সাতটী শক্তিমন্দির আজিও বিদ্যমান আছে। যথা,—তালচেরে হিঙ্গুলা, অস্তুরেশ্বরে হরচণ্ডী, বাঁকীতে চর্চ্চিকা, বাণপুরে ভগবতী, কঙ্কড়ে সারলা, কাকটপুরে মঙ্গলা, কুজঙ্গে রামচণ্ডী। বোধ হয় তাঁহাদিগের ধারণা ছিল যে, শত্রু রাজ্য আক্রমণকরিলে একএক ঘাটি এক এক দেবী রক্ষা করিবেন। আজিও কটকনগরে বাটমঙ্গলা, বাঘমঙ্গলা, প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে যখন নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে কাষ্ঠসংগ্রহ কিংবা অন্য কোনও আবশ্যক কর্ম্মে যায়, তখন বাটমঙ্গলা ও বাঘমঙ্গলার পূজা মানসিক করে। তাঁহারা বনাকীর্ণ পথের সমস্ত ভয় হইতে পথিককে রক্ষা করেন। বাঘমঙ্গলার পূজা মানসিক করিলে ব্যাঘ্র পথিকের অনিষ্ট করিতে পারে না। কেশরীবংশীয় রাজগণ অযোধ্যা, উজ্জয়িনী এবং বঙ্গদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে বহু ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া যায় বল্লালসেন উৎকলে ৪০ জন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন।

গঙ্গাশ মগধে যষ্টি ভোটে ষষ্টিঃ রভাগকে।
চত্বারিংশচ্চ উৎকলে চ, গৌড়ঙ্গেপি তথাষ্টকঃ॥

উৎকলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অত্যধিক ছিল। ক্রিয়াকলাপ ও কর্ম্মকাণ্ড একেবারে লোপ পাইয়াছিল। তাই শাক্ত কেশরীবংশীয় রাজগণ বিদেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই আনীত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ আজিও বহু ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সকলেই শক্তিমন্ত্রের উপাসক এবং দুর্গাপূজার সময় অনেকেই বনদুর্গার পূজা করেন।

কেশরীবংশের অবসানে উৎকলে গঙ্গাবংশের অভ্যুত্থান হয়। গঙ্গবংশীয়গণ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। ঐ বংশীয় রাজগণ জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রতাপরুদ্রদেবের সময় চৈতন্য মহাপ্রভু উৎকলে আসেন। তিনি যে নামামৃত প্রচার করেন তাহার প্রভাবে উৎকলে ভাবের বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, আজ উৎকলের ঘরে ঘরে ভাগবতের পূজা হয়। হাড়ী, বাউরী এবং পাণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিরাও ভক্তিগদগদকণ্ঠে তুলসীর উপাসনা করে। এই ভাবের বিপ্লবে শক্তি-উপাসনার অনেক চিহ্ন লোপ পাইয়া আসিতেছে। দেশরক্ষাকর্ত্রী উপর্য্যুক্ত নয়টী দেবীর নিকট আজিও পশু বলি হয় বটে কিন্তু বলির সংখ্যা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। অনেক শাক্তপরিবার শক্তিমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর দারুময় মূর্ত্তি উপাসনা করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া উপাসনা বিষয়ে অনেকটা রক্ষণশীল; তাই তাঁহারা মন্ত্রান্তর গ্রহণ করেন নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শক্তি উপাসনা কেশরী রাজবংশীয়ের রাজ ধর্ম্মছিল। তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। উপরে কএকটী মাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। রাজধর্ম্ম এবং জন ধর্ম্ম অনেকস্থলে ভিন্ন হয়। কিন্তু উৎকলে কেশরী বংশীয়গণের রাজত্ব কালে জনসমাজ সর্ব্বতোভাবে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। আমাদিগের ধারণা এদেশে কোনও দিন সংহতি শক্তি ছিল না। কিন্তু শক্তি উপাসনায় সমাজের এই সংহতি-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। উৎকলের গ্রামে গ্রামে শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি অনেক দেবতার মন্দির আছে; পূজার জন্য দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর জমি বহুকাল হইতে নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের এক একটী পূজার স্থান আছে। সেটি ঠাকুরাণীগুড়া। নিম্বাদি বৃক্ষের মূলে কোন দেবীর ভগ্নাংশ সিন্দুর চর্চ্চিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতিদিন তাঁহার পূজা হয় না। তবে তাঁহার একজন পূজক নিযুক্ত আছেন। পূজা পার্ব্বনে কিংবা গ্রামে মারীভয় উপস্থিত হইলে গ্রাম্যদেবীর পূজার আয়োজন হয়। গ্রাম্যদেবীর পূজা সর্ব্বসাধারণের পূজা। পূজার সময় কাহাকে কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা বহু পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত আছে। হল প্রতি কত চাঁদা দিতে হইবে তাহাও ঠিক করা আছে। প্রবাদ আছে—গ্রাম্যদেবীর যোগিনীগণ অশান্ত হইয়া উঠিলে গ্রামে ওলাউঠা প্রভৃতি মারীভয় হয়। দেবীর পূজা করিলে যোগিনীগণ শান্ত

হয় মহামারীও উপশম হয়। গ্রাম্যদেবীর পূজায় পশু বলির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আজকাল সকল গ্রামে পশু বলি হয় না। অধিকাংশ গ্রাম্যদেবীর পূজা নাপিত প্রভৃতি জাতি করিয়া থাকে। কোন কোন গ্রামে ব্রাহ্মণ পূজকও আছেন। পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। কোনও ভুল ভ্রান্তি হয় না। কোনও উপকরণে পূজার অঙ্গহানি হয় না। নিরক্ষর উৎকল গ্রামবাসীর এই সংহতি-শক্তি কত ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া আজিও জীবিত আছে। গ্রামে গ্রামে সর্ব্বসাধারণের দেবী উপাসনা দেখিয়া কে বলিবে উৎকলে শক্তিপূজা নবপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? গঙ্গাবংশীয় দিগের রাজ-দণ্ডের প্রভাবে এবং শ্রীচৈতন্যের উন্মাদকর ভাব-বন্যার স্রোতে শক্তির পীট, নগর ও গণ্ডগ্রামে টলিয়াছে। কোন কোন স্থানে শক্তির আসনে চৈতন্য মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু নিরক্ষর শবর বাহুরী প্রভৃতির হৃদয়ে শক্তির আসন আজিও অটল রহিয়াছে। উৎকলে শক্তি পূজার বহু প্রচলন বিষয়ের একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি :—

Throughout the plains of Orissa every village has a titulary Goddess called Gram Devati or Thakurani. The Gram devati is generally established under the shade of a tree; sometimes a house is constructed for her protection from the rain and the sun and sometimes though very rareley, she has not the protection of even a tree. The Goddess is commonly represented by a piece of shapeless stone, surrorunded by several small pieces of stone also shapeless representing her children. All the pieces are smeared with vermilion. Carved images are also met with though very rarely, they are not uniform in details and many of them were probably constructed for other purposes. Sometimes the trunk of a tree supposed to possess supernatural properties like the Sahara is smeared with vermilion and worshipped as the village Goddess. Like the people of the plains, the Gondhs and Sudhas of Athmallik have stones to represent their female village Goddess, but curiously enough the Kondhs of Nayagarh believe this village diety to be of the male sex and use and wooden post 2½ feet high to represent it. The Gonds and Sudhas of Athmallik named their Goddess Pitabali or Kambecvari. The meaning of Pitabali is not known, but Khambecvari is probably derived from khumba or post which represent the male God of the Kandh. The most noticeable feature of the Gram Devati worship is the nonpriestly caste of men who conduct it. In the plains, the Bhandari, Mali, Raul or Bhopa is usually the priest. The aborigines select men from their own tribe to officiate as priest.

Journal of the Assiatic Society of Bengal.

Vol LXXII, Part III (No 2 of 1903).

উৎকলের গ্রামে গ্রামে যেরূপ সাধারণ লোকে মিলিত হইয়া গ্রাম্যদেবীর পূজা করেন সেইরূপ গড়জাত মহালের, সুধা, কন্দ, গন্দ, শবর প্রভৃতি জাতিরাও গ্রাম্যদেবীর উপাসক। কে ঐ সকল অসভ্য জাতিদিগকে শক্তিপূজা শিখাইয়াছে? রাজ আজ্ঞা বা অনুশাসনে তাহারা শক্তিভক্ত হয় নাই। তাহাদিগের বর্ব্বর জীবনের অমার্জ্জিত মনোবৃত্তি বোধ হয় স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া শক্তির চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। হিংসার প্রতিমূর্ত্তি মত্ত মাতঙ্গ, শার্দ্দুল, ভল্লুক প্রভৃতি কতশত হিংস্র জন্তু নিরন্তর পর্ব্বত কন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একজাতির সহিত অন্য জাতির যুদ্ধ এবং আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লব আদিমনিবাসী কন্দ প্রভৃতি জাতির নিত্যকর্ম্ম বলিলেও চলে। জীবন ধারণের জন্য কন্দরে কন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া মৃগ অন্বেষণ করিতে হয়। এরূপ নির্ম্মম ঘটনাবলীর মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে মানবের মন শক্তি সঞ্চয় এবং শক্তির উপাসনার জন্য নিত্য ব্যগ্র হইয়া উঠে।

কিছু দিন পূর্ব্বে আমি কতকগুলি গ্রাম্যদেবীর নাম সংগ্রহ করিয়াছিলাম। নামগুলি অতি অদ্ভুত। গুটিকতক নমুনা দিলাম :—আম্বার-ঘর-বাউত্তী, বুড়ীদেই ঠাকুরাণী, বায়াণী ঠাকুরাণী, বিশানায়ে

কাণী, মাছুদেই ঠাকুরাণী, বাটপশ্বেই, ডালথাই ঠাকুরাণী, কামড়া-স্থুঁই, জটীয়া-বাউতী, ঘাসথাই, গোকুলপুরিয়ানী, বাসুলী, মঙ্গলা, গড়বাউতী, দক্ষিণা চণ্ডী, চম্পানায়েকাণী, তারাদেই ঠাকুরাণী, কঙ্কটী ঠাকুরাণী, কেন্দুসুণী ঠাকুরাণী, ভগবতী।

আমার একটি অনুমান আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমার মনে হয় অতি প্রাচীন কালে উৎকল এবং তৎসংলগ্ন কলিঙ্গদেশে শক্তি উপাসনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে লেখা আছে

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং, চৈত্রবংশ সমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে॥
তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রা নিরৌরসান।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা॥

চৈত্রবংশীয় "সুরথ রাজা" যবন রাজগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পরাজিত হন। পরে মহামায়ার বরে স্বরাজ্য লাভ করেন। উদয়গিরি শৈলের হস্তীগুম্ফায় খারবেল নামক রাজার একটি প্রস্তরলিপি অল্পদিন হইল সম্পূর্ণ অনূদিত হইয়াছে। এই প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায়—কলিঙ্গের তৃতীয় রাজবংশের নাম চৈত্রবংশ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এ প্রস্তর লিপি আন্দাজ ১৭৩ হইতে ১৬০ খৃঃ পূঃ খোদিত হইয়াছিল। খারবেল চৈত্রবংশীয় রাজা ছিলেন। কলিঙ্গনগরী খারবেলের রাজধানী ছিল। হুয়েংসাং যখন উৎকলে আসিয়াছিলেন তখন পুরীর নাম ছিল চৈত্রপুর বা চরিত্রপুর। জগন্নাথদেবের মন্দিরের তালপত্র লিখিত ইতিহাসে দেখা যায় কেশরীবংশীয়-দিগের বহুপূর্ব্বে যবনগণ উড়িষ্যা জয় করিয়া কয়েক শতাব্দী এই দেশ শাসন করিয়াছিলেন। সুরথ রাজা যদি প্রকৃতই কলিঙ্গরাজ্যের চৈত্রবংশ সম্ভূত হন, তাহা হইলে কলিঙ্গে শক্তিপূজার প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে। রুদ্রযামল মন্ত্রে ৫৪ অধ্যায়ে কমলাকে কলিঙ্গনগরেশ্বরী বলা হইয়াছে।

অজমধিস্মিতিপ্রাণা কলিঙ্গনগরেশ্বরী
অভিভোজ তরঙ্গিণী গুপ্তচক্রাম্বিকাম্বদা
মণিনাগগতা নাশা ত্রিনাসা নামস্থ প্রিয়া॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ১৬০০ খৃষ্টাব্দের লোক। তিনি কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে কলিঙ্গদেশেই কালকেতুর আখ্যায়িকা সমাবেশ করিয়াছেন। কলিঙ্গরাজা চণ্ডীর ভক্ত কালকেতুকে বন্দী করিয়া রাখেন। রাত্রে কলিঙ্গরাজ বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিলেন :—

দেখিনু ভৈরব ভীমা লোচন বিশাল।
কাতি খর্পর, হাতে গলে মুণ্ডমাল॥
হান হান করিয়া ধরিলা মোর কেশ।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ॥
পৃষ্ঠদেশে লম্বমান শোভে জটাভার॥
শঙ্খের কুণ্ডলকর্ণে ভীষণ আকার॥
পরিধান সবাকার লোহিত বসন।
বাক্‌সনা কুলযেন ত্রদিকে দর্শন॥
বিভূতি ভূষণ শোভে সবাকার গায়।
চৌদিকে যোগিনীগণ নাচিয়া বেড়ায়॥
গজ ঘোড়া কাটি পিয়ে রুধিরের পানা।
নাচয়ে আপন তালে প্রেত ভূত দানা॥
মড়ার নাড়িতে কেহ করয়ে উত্তরি॥
অঙ্গুলিতে ধরে কেহ হাড়ের অঙ্গুরি॥
তিলক করয়ে কেহ হাড়ের চন্দনে
তর্পণ করয়ে কেহ কপাল ভাজনে।
গর্দ্দভে চাপায় মোরে দেয় হাড়মাল।
পশ্চাতে ঢোলের বাদ্য বাজায় বিশাল॥
পশ্চাতে যোগিনীগণ করে তাড়াতাড়ি।
মোর অঙ্গে মারে কেহ দোহাতিয়া বাড়ি॥
গজপৃষ্ঠে কালকেতু কৈল আরোহণ।
শিরে ছত্র ধরে ইন্দ্র আদি দেবগণে॥

শ্রীকবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁহার বহুপূর্ব্বের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চণ্ডীর একজন প্রধান ভক্ত এবং তাঁহার পূজার প্রবর্ত্তক কালকেতু কলিঙ্গরাজ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা কবেকার ঘটনা নির্ণয় করা কঠিন। তবে কবিকঙ্কন চণ্ডী হইতে জানা যায় যে চণ্ডীপূজা এক সময়ে কলিঙ্গদেশে কাল-কেতুর দ্বারায় প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বোধ হয় কাল-ক্রমে সুরথের রাজ্যে শক্তিপূজা আংশিক লোপ পাইয়াছিল, এবং কালকেতু সেই দেশে শক্তিপূজা পুনঃ প্রচারিত করেন। একই স্থানে ধর্ম্মবিশ্বাসের সাময়িক অপচয় এবং উপচয় প্রায়ই দেখা যায়।

শক্তি-ভিক্ষা।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

ধূলির মাঝারে লুটা'তে দিও না শির ;
হে দেব, তোমার বলে বলীয়ান, বীর,

স্থিরচিত্ত আমি; প্রতি রোমে রোমে মোর
জাগিতেছ তুমি; প্রতি প্রশ্বাসে নিশ্বাসে
তোমারি শক্তি অদৃশ্যে করিতেছে কাজ;
হে রাজরাজ, শক্তি দাও তোমারি কার্য্য
সাধিতে;
জাগ্রত যেন রহে সদা মনে
প্রতি অণু-রেণু মাঝে তুমি; বিলায়েছ
আপনারে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে মুক্ত-
হস্ত ধনীর মত; সুন্দর বসুন্ধরা
তোমারি সৌন্দর্য্যে লুটিয়া; বিহঙ্গ গায়
গান,—তোমারি সঙ্গীত সে; তপন তারা
তোমারি আদেশে নৃত্য করে, দীপ জ্বালে
দিবানিশি; আমি (ও) কবি গাহি তব বলে॥

কর্ণাটের পূর্ব্ব গৌরব।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত দুইখানি আলোকচিত্র প্রকাশ করিলাম। প্রথমটি বেলুড়ের জগতবিখ্যাত দেবমন্দিরের চিত্র। ইহা কারুকার্য্যখোদিত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বিষয়ে অদ্যাবধি ভারতের অতুলনীয় কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডাক্তার ফারগুসন (Dr. Fergusson) সাহেব এই মন্দিরসম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রদান করিয়াছেন:—

There are many buildings in India, which are unsurpassed for delicacy of detail, by any in the world; but the temples at Belur and Halebid surpass even these, for freedom of handling and richness of fancy. The amount of labour which each facet, of this porch (Belur) display is such as I believe never was bestowed on any surface of equal extent in any building in the world,

It may probably be considered, as one of the most marvellous exhibitions of human labour, to be found even in the patient East. No two facets of the temples are the same; every convolution of every scroll is different. No two canopies in the whole building are alike; and every part exhibits joyous exuberance of fancy scorning every mechanical restraint,

দ্বিতীয়টিতে সম্রাট দ্বিতীয় পুলোকেশীর সভায় পারস্য দূতের অভ্যর্থনার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা অজন্তার গুহামন্দিরের প্রস্তরখোদিত চিত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানদিগের শাসনকালে কোন দুষ্ট লোক পুলকেশীর মুখটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কর্ণাটের রাজবংশাবলী এবং তাঁহাদের শাসনাধীন সম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব।

১। চালুক্য বংশ। এই বংশীয় নয় জন ভূপতি প্রায় ২০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম পুলকেশী, কীর্ত্তিবীর্য্য, দ্বিতীয় পুলকেশী এবং বিক্রমাদিত্যের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। ইহাঁর ভ্রাতা বিষ্ণুবর্দ্ধন বর্গীদেশ অধিকার করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশীয় অপর এক শাখা গুজরাটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে জয়সিংহ বর্ম্মার অধীনে গুজরাট স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। নিম্নলিখিত স্থানে শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। পিপলনের, চিপলুন, কুন্দল গাঁ, রায়গড়, বাদামী, মহাকুট, খেড়া, আড়ুর, নেকর, ঐহোলী, পট্টদকল, হেদ্রাবাদ, ইত্যাদি।

ইহাঁদের রাজধানী বাদামী নগরে ছিল। এই বংশীয় নৃপতিগণ, মৌর, কন্দল, কুলাচার্য্য, রাষ্ট্রকুট, গঙ্গা, লাট, মালব, গুর্জ্জর, কলিঙ্গ, কোশল প্রভৃতির রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কুলোকেশী একশত জাহাজ লইয়া উড়িষ্যার পীঠস্থান পুরীনগরী আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনিই হর্ষবর্দ্ধনকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। উত্তরদেশীয় নৃপতিগণের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য ইনি নর্ম্মদাতীরে বহুসংখ্যক সৈনিক প্রহরী রাখিয়াছিলেন। ইনি পারস্য দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং পারস্য রাজদূতকে স্বীয় রাজসভায় স্থান দিয়া-

ছিলেন। রাজা পুলোকেশী কর্ত্তৃক পারস্য দূতের অভ্যর্থনার চিত্র অজন্তা গুহা মধ্যে অঙ্কিত আছে।

২। রাষ্ট্রকুট বংশীয় চতুর্দ্দশসংখ্যক রাজা ২২৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে দন্তিদুর্গ, কৃষ্ণ, ধ্রুব, গোবিন্দ (৩) এবং নৃপতুঙ্গ এই কয়জন নৃপতি বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। তথাপি অমোঘবর্ষণ নৃপতুঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বাষট্টি (৬২) বৎসরের অধিক রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা নৃপতুঙ্গ বিদ্যোৎসাহী নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিরাজমার্গ নামক অলঙ্কার-শাস্ত্রগ্রন্থ কন্নাড় ভাষার একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক। এই রাজ্যের রাজধানী মালখেড় নামক স্থানে ছিল। রাষ্ট্রকুট রাজ্য চালুক্য রাজ্য অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ছিল। রাজা ধ্রুব তাঁহার সৈন্যসমূহ লইয়া প্রয়াগের সন্নিকট কৈসম্বির রাজা বৎসের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা গোবিন্দ (তৃতীয়) মালব হইতে কঞ্চি পর্য্যন্ত সমগ্র দেশের সম্রাট ছিলেন এবং সম্ভবতঃ নর্ম্মদা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ নিজ শাসনাধীন রাখিয়াছিলেন। এই নৃপতি সম্বন্ধে বরদার শিলা-লিপিতে লিখিত আছে যে, তিনি লোককে রাজসিংহাসনে বসাইতে এবং তাহা হইতে নামাইতে পারিতেন। পূর্ব্বে চালুক্যদিগের অপেক্ষা এই বংশের রাজত্বকালীন অধিক শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল শিলালিপির স্থান অধিকতর স্থান জুড়িয়া আছে দেখা যায়। সামনগর, পৈঠন, বর্ণি, রত্নাপুর, বরোদা, তোড়খেড় খোনদেশ, বনদারী, বেকল, কনেরী, কামপুর, নীলগুন্দ, সবদত্তি, ক্যোবে, অটকুর, পট্টদকল প্রভৃতি স্থানে রাষ্ট্রকুটবংশীয় রাজাদিগের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই বংশীয় কৃষ্ণ রাজা ৭৬০ শকে, জগতপ্রসিদ্ধ কৈলাস নাথ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৩। রাষ্ট্রকুট বংশের পর চালুক্যগণ পুনরায় রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম চালুক্য নামে অনেক দিন বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। প্রথম কথিত পূর্ব্ব চালুক্য বংশের শেষ রাজা রাষ্ট্রকুটবংশীয় রাজা দন্তিদুর্গের দ্বারা পরাজিত হওয়ার পর উক্ত বংশ একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। সম্ভবতঃ এই বংশের পরবর্ত্তী রাজাগণ করদ বা মিত্র রাজার ন্যায় কালযাপন করিতে ছিলেন। তৎপরে এই বংশীয় রাজা তৈলপ বিশেষরূপে শক্তিসম্পন্ন হইয়া তৎকালীন রাষ্ট্রকুটরাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পশ্চিম চালুক্য নামে নিজ বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের একাদশ নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে তৈলপ, জয়সিন্ধু (২) সোমেশ্বর (১) এবং সপ্তম বিক্রমাদিত্যের নামই বিখ্যাত। তন্মধ্যে সপ্তম বিক্রমাদিত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইনি বিক্রমকেশরী বা চাতুঃক্রম বিক্রম নামে অভিহিত হইতেন। ইহাঁদের রাজধানী নিজামরাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণ নামক স্থানে ছিল। এই চালুক্য রাজগণ রাষ্ট্রকুট রাজ্যের অধিকারভুক্ত প্রদেশসমূহ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াও তালব, চোল, চের, ত্রমিল, ডাহল, বেংগি, বঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি স্থানের রাজাগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই বংশীয় রাজা দ্বিতীয় তৈলপ ভোজপ্রবন্ধোল্লিখিত ভোজরাজার খুল্লতাত মুঞ্জার শাসনাধীন মালব জয় করিয়াছিলেন। রাজা মুঞ্জা তাঁহার প্রবীণ মন্ত্রী রুদ্রাদিলের নিষেধসত্ত্বেও গোদাবরী নদী অতিক্রম করিয়া তৈলপ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং বন্দী হইয়াছিলেন। তৎপরে পলায়ন করিতে চেষ্টা করায় লাঞ্ছিত ও নিহত হয়েন। সপ্তম বিক্রমাদিত্য তাঁহার পিতার অধীনে সৈনাপত্যকালে উত্তরে বঙ্গদেশ এবং আসাম ও দক্ষিণে কেরক (মালাবার) এবং সিংহল পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি খৃঃ ১০৭৬ সালে শকনামীয় নব শতাব্দীর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই শক পূর্ব্ববর্ত্তী বিক্রম-শকের দিবসই অর্থাৎ কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদ দিবসে আরব্ধ হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য যেমন যুদ্ধনীতিবিশারদ ছিলেন তাঁহার রাজনীতিজ্ঞানও তদনুরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সময়েই কর্ণাট রাজ্য উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের সময় নিম্নলিখিত মিত্র বা করদ রাজ্যগুলি তাঁহার অধীনে ছিল :—

রাজ বংশ	স্থান
১। যাদব	দেবগিরি
২। শিলহরা	উত্তর এবং দক্ষিণ কঙ্কন
৩। ঐ	কোলাপুর
৪। কদম্বা	গোয়া

৫। ঐ হোঙ্গল
৬। সিন্দা এলবুর্গ
৭। গুপ্তা ঘুট্টল
৮। রট্টা সন্তাদত্তি
৯। কদম্বা বনবাসী
১০। পাণ্ডয়া নোলামবড়ি (চিতলদ্রুগ), কোলহার, টমকুর এবং বাঙ্গালোর (মহীসুর)
১১। হোয়সালা গঙ্গবড়ি অর্থাৎ মহীসুর এবং হাসান জেলা।
১২। তর্দ্দেকড়ি বিজাপুর

এতদ্ভিন্ন গম্বুর, কম্মার বাড়ি এবং সীতাবল্দি প্রভৃতি বর্ত্তমান নিজামরাজ্যের এবং মধ্য ভারতের অন্তর্গত স্থানসমূহে রাজপ্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার রাজ্যে চিরশান্তি বিরাজ করিত। কেবল মাত্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়সিংহ রাজদ্রোহী হইয়া কিছুদিন অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিল। উত্তরদেশীয় রাজগণও দুইবার মাত্র নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তন্নিবারণার্থ তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। নতুবা ৫০ বৎসরকাল তিনি নির্ব্বিঘ্নে এবং নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাশ্মীরদেশীয় বিহ্লন কবি ইহাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত নামক সংস্কৃত কাব্যে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই রাজার সময়ের প্রায় দুই শত শিলালিপির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলালিপি আছে। এই সকল শিলালিপি কন্নাড় ভাষায় লিখিত। গদগ, ভৈরমট্টি, খারেপট্টনম, কায়েম, বল্লেগবী, মিরাজ, বাংকাপুর, অনন্তপুর, সীতাবল্দি, করকুদ্রি, চিত্রকলদ্রুগ প্রভৃতি স্থানে বিক্রমাদিত্যের অনেক শিলালিপি বর্ত্তমান আছে।

৪। কুলাচার্য্য বংশের আদি পুরুষের নাম বিজলাল। ইহাঁর রাজধানী কল্যাণ নগরে ছিল। ইনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইহার মন্ত্রী বাসবালিঙ্গায়ত ধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। এই লিঙ্গায়ত ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ণাটের সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ইহাকে কর্ণাটকের প্রচলিত ধর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাসবা যে কেবল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা নহে—সমাজ সংস্কার বিষয়েও যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। আমি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপে আলোচনা করিতেছি।

৫। হোয়সালা মহীসুরের যাদব বংশের অন্যতম নাম মাত্র। এই বংশের রাজগণের মধ্যে বিষ্ণুবর্দ্ধন এবং বীরবল্লাল বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তক রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁহার সাহায্যে রামানুজ তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচারের অনেক সুবিধা পান। রামানুজস্বামীর জীবনচরিতে আমি এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। হোয়সালা বংশের শিলালিপি শ্রাবণ বেলগুল, হলেবিড়ু, চিতলদ্রুগ, হরিহর, বেলগামি, বেলুর, সোরাব, হোঙ্গল প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বেলুড় এবং হলেবিড়ুর ভারতের সুন্দরতম দেবমন্দিরগুলি এই বংশের রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। হলেবিড়ু হোয়সালাবংশের রাজধানী ছিল।

৬। পশ্চিম চালুক্য রাজগণের প্রতিভা যখন অস্তমিত হইতেছিল, সেই সময় হলেবিড়ুর হোয়সালা এবং দেবগিরির যাদব বংশ উন্নতির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। চালুক্যবংশের পর ওদ্‌রাজের দক্ষিণ অর্দ্ধ হোয়সালাদিগের হস্তগত হয় এবং দেবগিরির যাদবগণ উত্তরার্দ্ধ অধিকার করেন। সিঙ্ঘন, সিঙ্কন্না, জেত্রিপাল, রামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিগণ যাদববংশের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। চন্দনপুর, সঙ্গমনার, বসাই, অাজনেরী, খানদেশ অন্তর্গত পটনা, বগুিগিরি, তৈলাবল্লি, পৈথান প্রভৃতি স্থানে দেবগিরির যাদবদিগের শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বংশের মাধব রামচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র-লেখক হেমাদ্রি বর্ত্তমান ছিলেন।

৭। যাদব বংশের পর বিজয়নগরের রাজবংশের বিষয় উল্লেখ যোগ্য। এক সময় প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যই এই বিজয়নগর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বংশীয় রাজগণ খৃঃ ১৩৩৬ হইতে ১৫৫৬ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজগণের মধ্যে হরিহর, বক্ক, কৃষ্ণদেব রায় এবং তালিকোটের রামরাজার নামই প্রসিদ্ধ।

এই বংশ দাক্ষিণাত্যের রাজবংশের শীর্ষস্থানীয় ছিল। অদ্যাবধি ইহাঁদের রাজধানী বিজয়নগরের (বর্ত্তমান হম্পীর) ভগ্নাবশেষ দেখিলে এই সাম্রাজ্যের লুপ্তস্মৃতি জাগরিত হয়। বহু দেশ-দেশান্তর হইতে পর্য্যটকগণ এইস্থান দেখিতে আসেন। মান্দ্রাজের সিবিলিয়ান Mr. Robert Sewell সাহেব তাঁহার History of a Forgotten Empire গ্রন্থে বিজয়নগরের বিস্তৃত ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন। আমি এস্থলে উক্ত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

In the year 1336 A. D., during the reign of Edward III of England, there occurred in India an event which almost instantaneously changed the political condition of the entire south. With that date the volume of ancient history in that tract closes and the modern begins. It is the epoch of transition between the Old and New.

The event was the foundation of the city or kingdom of Vijayanagar. Prior to A D. 1336 all Southern India had lain under the domination of the ancient Hindu kingdoms,—kingdoms so old that their origin has never been traced, but which are mentioned in Buddhist edicts rock cut sixteen centuries earlier; the Pandiyans at Madura, the Cholas at Tanjore, and others. When Vijayanagar sprang into existence the past was done with for ever, and the monarchs of the new state became lords or overlords of the territories lying between the Deccan and Ceylon.

Its rulers in their day swayed the destinies of an empire far larger than Austria, and the city is declared by a sucession of European visitors in the 15th and 16th centuries to have been marvellous for size and prosperity—a city with which for richness and magnificence no western capital could compare.

এই বিজয়নগর রাজধানীতে পর্ত্তুগীজ সওদাগরগণ বাণিজ্য করিতে আসিত। Haes নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ সদাগর এই বিজয়নগর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

The cavalry most richly mounted and caparisoned, and the foot soldiers so many that they surround all the valleys and hills in a way with which nothing in the world can compare.

To see the grandeur of the nobles and men of rank, I cannot possibly describe it all, nor should I be believed if I tried to do so; then to see the horses and the armour that they wear, you would see them so covered with metal plates that I have no words to express what I saw, and some hid me from the sight of others; and to try and tell of all I saw is hopeless, for I went along with my head so often turned from one side to the other that I was almost falling backwards off my horse with my senses lost.

Naniz নামক আর একজন পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক লিখিয়াছেন যে, বিজয়নগর-সম্রাট ইচ্ছা করিলে অসংখ্য সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিতে পারেন। তাঁহার হিসাব মতে তৎকালে বিজয়নগরের ৭,০৩,০০০ সাত লক্ষ তিন সহস্র পদাতিক, ৩২,৬০০, বত্রিশ সহস্র ছয় শত অশ্বারোহী এবং ৫৫১ পাঁচ শত একান্ন রণহস্তী এবং অসংখ্য পরিচারক ছিল।

বিজয়নগর-সম্রাটগণ সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান-আক্রমণকারীগণকে হটাইয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় তাঁহার বাহুবলে এবং মানসিক তেজস্বিতার গুণে সমগ্র কর্ণাট প্রদেশে বাস্তবিক এক নব যুগ আনয়ন করিয়াছিলেন। বিজয়নগর কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্ম, সাহিত্য, কাব্য এবং কলাবিদ্যার আকরভূমি ছিল। ভবিষ্যতে বিজয়নগর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। বাদামী, হরিহর, কানচি, বেলুর, বেলগাবি, পুলবমালী, কৃষ্ণপুরম, প্রভৃতি স্থানে বিজয়নগরসম্রাজ্যের শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

গান।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

সহসা আনন্দ বীণা
বাজিল সবার প্রাণে।
যা কিছু বাসনা ছিল
দূরে সব পলাইল।
মাতিল সবার মন
ব্রহ্মানন্দ রস পানে॥
হৃদয় কমল ফুটি'
সুগন্ধ বহিল ছুটি';
জগতের জীবদল
ব্যাকুল-পরাণ হল
কস্তুরী মৃগের দল
যথা নিজ নাভিঘ্রাণে॥

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়িত লোকদিগের জন্য উৎকণ্ঠা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

সময় অল্পই ছিল। এখন আমার প্রথম কাজ, সখু ও নান্নুকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া ও আদর করিয়া, তাহাদের খেলনা কি চাই, মিঠাই কি চাই ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া "আমি আসবার সময় তোমাদের সব জিনিস আন্‌ব, ভুলব না," এইরূপ স্বীকার করিবার পর খুব মিনতির সহিত তাহারা একবার "আচ্ছা" বলিল। কিন্তু ছেলেরা আবার আমাকে খুব জোর করিয়া বলিল, "তুমি যদি কাল দুকুর পর্য্যন্ত না এসো তাহলে আমরা খাব না, আর তোমার সঙ্গে কথা কব না, আর কোথাও তোমাকে একলা যেতে দেব না"—তাহাদের এই সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া আমি ভাণ্ডুপায়ে একেবারেই বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমে কল্যাণে গেলাম। সেখানে দুই তিনটা বাঙ্গলা দেখিলাম, কিন্তু তাহা পছন্দ হইল না। সেখানে স্থানে স্থানে প্লেগ হইতেছে শুনিয়া ভাণ্ডুপায় যাত্রা করিলাম। ষ্টেশন হইতে পদব্রজে ৭ মিনিটের রাস্তার উপর ধুলিয়ার শ্রী বাবাসাহেব গরুড়ের বড় বাগান ও বাঙ্গলা আছে সেইখানে গিয়া সেই বাঙ্গলা দেখিলাম। বাঙ্গলা খুব বড় ও হাওয়াদার ছিল, কিন্তু একেবারেই বে-মেরামত ও উজাড় বলিয়া মনে হইল; তাহা হইলেও কম্পোউণ্ড বড়, বাগান সুন্দর, ও খোলা হাওয়া হওয়ায় সেই জায়গাই পছন্দ করিলাম এবং তখনই "কোন লোককে বোম্বায়ে পাঠাইয়া লেপন করিবার মজুর ও চুণকাম করিবার লোক ডাকাইয়া কাজে লাগাও, বেশী পয়সা লাগলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু রাত্রির মধ্যে সমস্ত জায়গা ঝাড়িয়া, লেপ দিয়া ও চুণকাম করিয়া বাসোপযোগী করা চাই," এইরূপ সেই বাঙ্গলা-বাসী কেরাণীকে বলিলাম। সে সকালে সমস্ত তৈরী করিবে এইরূপ স্বীকার করিবার পর আমি কাশীনাথকে এক চিঠি লিখিলাম যে, আমি ভাণ্ডুপায় গরুড়ের বাঙ্গলা পছন্দ করিয়াছি। কাল সকালের গাড়ীতে বাসুদেব মাষ্টার ও বারকোরা ইহাদিগকে সমস্ত জিনিসপত্রের সহিত ভাণ্ডপায় পাঠাইবে এবং তুমি সন্ধ্যাকালে কোর্ট হইতে আসিবার পর সমস্ত জিনিসপত্র ও দরকারী খাতাপত্র লইয়া আসিবে। কাল রবিবার। সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তোমরা আমাদিগকে তার করিবে তাহা হইলে আমরা চাকর বামন লইয়া সোমবারে সকালে সবাই ভাণ্ডুপায়ে আসিব। এই সমস্ত হইলে পর রাত্রি ১০টার গাড়ীতে বাহির হইয়া একটার সময় লোনাভলীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাড়ী আসিয়া সমস্ত দিন যে সব কাজ করিলাম, সে সমস্ত বলিয়াছি। তখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া উনি ভালই মনে করিয়া থাকিবেন এইরূপ দুই চারবার তাঁহার মুখ হইতে যে উচ্ছ্বাসোক্তি বাহির হইয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝিয়াছিলাম। তার পর দিন সন্ধ্যাকালে "সমস্ত প্রস্তুত" এইরূপ ভাণ্ডুপা হইতে তার আসিল, তখন সেই রাত্রেই, ১২টার গাড়ীতে ও "বজাবা"কে আগেই রওনা করিয়া দিয়া আমরা অন্য গাড়ীতে ভাণ্ডপায় আসিলাম। এই সব দিনে লোনাভলীতে ও ভাণ্ডুপায়, এই দুই স্থানেই হাঁড়ীকুড়ী, বিছানা, কাপড়, রান্নার মসলা ও চাকর-বাকরের ব্যবস্থা থাকায় আমরা গিয়া সেই সময় জিনিসের বোঝা বহা প্রভৃতি কোন কষ্ট আমাদিগকে পাইতে হয় নাই। কেবল এখান হইতে সেখানে বেড়াইতে যাইবার মতো গিয়াছিলাম। সোমবারে সকালে ৯টার সময় ভাণ্ডুপায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে বাসুদেব ও মাষ্টার আসিয়াছিল। আমার বাসায় গিয়া, কাশীনাথকে পড়িবার জন্য ডাকিয়া আনো এইরূপ বলিলাম, কিন্তু সে বোম্বায়ে গেছে জানা গেল। আমরা আজ এখানে আসিব এই কথা জানিয়াও কাল সন্ধ্যাকালে এখানে আসিয়া ছেলেটা আবার বোম্বায়ে গেল কেন? উনি প্রতীক্ষা করে থাকবেন বলে তার কি কোন ভাবনা হল না! এই কথা মনে করিয়া আমার রাগ হইল। কিন্তু উনি কিছুই মনে করিলেন না। বরং জিজ্ঞাসা করিলেন, বোম্বায়ে গিয়ে থাকে ত যেতে দেও; কিন্তু তার শরীর ভাল আছে ত? এই সব ব্যাপার হইবার পর স্নান ও আহার করিয়া কোর্টে যাইবার জন্য ষ্টেশনে গেলেন। সেই দিন কাশীনাথ দুকুরে খাইতেও আসে নাই। দুইটার সময় আমাদের "বজাবা" জলখাবার ডিবা লইয়া নিত্যানুসারে কোর্টে গেল, যাইতেই শিরেস্তাদার বলিল, "আমার নামে চিঠি এসেছে যে, "রবিবারে ভাণ্ডুপায় গিয়াছিলাম, কিন্তু সোমবারে ভোরের বেলায় জর আসিয়া কুচ্‌কী ফুলিয়াছিল বলিয়া এই কথা সেখানে কাহাকে না জানাইয়া আমি চুপি চুপি উঠিয়া ঘোঁড়াহতে ঘোঁড়াইতে ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম ও ভায়খলিতে নামিয়া হিন্দু হাসপাতালে আসিয়াছি। আমি ভাল আছি। দেশাই ডাক্তার আমাকে ভাল ঔষধ দেবেন এই কথা বজাবাকে দিয়া দিদি-ঠাকরুণকে জানাইবে—এই চিঠি আমি রাও-সাহেবকে ("ওঁকে") লিখিতাম, কিন্তু অকারণে বেশী ভাবনা হইবে এবং আমার এক্ষণে শারীরিক অবস্থা যেরূপ

তাহাতে ভাবনার বিষয় নাই ; ৩।৪ দিনের মধ্যে ভাল হইব" প্রভৃতি লিখিতে বলিয়া চিঠি বজাবার নিকট দিয়াছিল। বজাবা সন্ধ্যাকালে প্রায় ৬টার সময় তাগুপায় আইসে। সে এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বলিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভাবনায় পড়িলাম। মন অত্যন্ত বিভ্রান্ত হওয়ায় আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কারণ এই সংবাদ এখন রাত্রেই "উনি" জানিতে পারিলে আর খাইতে যাইবেন না সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইবে না ; শুধু তাহা নহে, এই রাত্রেই ফর্সা হইবার অপেক্ষা না করিয়াই হাসপাতালে গিয়া তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবেন। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত প্লেগের সংসর্গে অন্য লোকেরও খুব ছোঁয়াচে লাগে এইরূপ আমি শুনিয়াছিলাম, তখন এই সময়ে প্লেগ-রোগীর নিকট ওঁর যাওয়া উচিত নয় এইরূপ আমার ইচ্ছা ছিল বলিয়া আমি এই সঙ্কটে পড়িলাম। ভাল, যদি না জানাই তাহা হইলে আমার উপর শুধু দোষ আসিবে না, ওঁর রাগও হইবে। কারণ এই ছেলেটি আমাদের দূর-সম্পর্কীয় শাশুড়ীঠাকুরুণের বাপের বাড়ীর দিক হইতে আত্মীয় ; তাছাড়া ইংরেজী লেখাপড়ায় বেশ দখল ছিল। ও একবার কাজ করিতে বসিলে ৫।৬ ঘণ্টা ধরিয়া উহার ঘাড় নড়িত না কিংবা বিরক্তি হইত না। উহার ব্যবহার অন্যের সহিত উদ্ধত ও স্বভাবে নির্ভীক ছিল। এক "ওঁর" উপর তাহার ভক্তি থাকায় "উনি ছাড়া আমাকে হুকুম করবার কেহ নাই" এইরূপ উহার ধারণা ছিল। ইহা সত্ত্বেও সে কাজে হুসিয়ার হওয়ায় তাহার উপর "ওঁর" খুব অনুগ্রহ ছিল। কখন কখন আমি রাগ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে, তখনি উনি বলিতেন যে, "ও এখন ছেলেমানুষ, কাঁচা বয়স, এতটা সে কি বুঝতে পারে? তার কাজ আছে বলে হয়ত রাগ করে থাকবে, কোন কথা বলে থাকবে, সেদিকে লক্ষ্য না করলেই হল। কাজের লোকেরা প্রায়ই একটু রাগী হয়ে থাকে।" এই কথা আমি জানিতাম বলিয়াই কাশীনাথের অসুখের কথা সেই রাত্রে আমি তাঁর কানে আসিতে দিই নাই। আসল কথা, উনি আসিবামাত্র পড়িবার জন্য তাকে নিশ্চয়ই ডাকাইতেন, কিন্তু বৃহস্পতিবার হইতে এই সব লোকের পীড়ার সংবাদ পাইয়া ওঁর নিদ্রা ছিল না এবং তাতে আবার রবিবারে রাত্রি ছ'টার সময় লোণাওলীতে গাড়ীতে উঠায় গোড়াতেই ঘুম হয় নাই এবং পরের গাড়ীতে উঠিয়াও ঘুম হয় নাই ; সেইজন্য বাড়ী আসিয়া বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, পড়িবার নামও করেন নাই। বাড়ী আসিয়াই আহারে বসিলেন, কিন্তু খাইলেন খুবই কম এবং বিছানায় শুইয়া পড়িয়া আমাকে বলিলেন, "আজ আমার মাথা ও গা-হাত-পা বড় ব্যথা করচে। একটু গা টিপে দেও, আর বাদামের তেল মাথায় মাখিয়ে দেও তাহলে হয়ত ঘুম আসবে।" তারপর চাকরকে ডাকিয়া পায়ে নাগন মালিস করাইতে লাগিলাম এবং আমি গা টিপিয়া দিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া গা টিপিবার পর মাথায় ও রগে বাদামের তেল মালিস করিতে লাগিলাম। এই মালিসের দরুণ ১০টার সময় ওঁর ঘুম আসিল এবং আমার খুবই ভাল লাগিল। সেই রাত্রে আমার একটুও ঘুম হয়নি বলিলেও চলে। আমি ভোর চারিটার সময় উঠিলাম। চুল ধুইয়া ও বাঁধিয়া রান্নার সমস্ত মসলা উনুনের পাশে বাহির করিয়া রাখিলাম এবং রান্না কি করিতে হইবে পাচককে বলিয়া দিলাম। বেশ ফর্সা হইয়াছে দেখিয়া আস্তে আস্তে গিয়া ছেলেদিগকে উঠাইয়া আনিলাম, সখুর চুল বাঁধা, ও চুল ধোয়া হইয়া গেলে সে তাহার পোষাক পরিলে ; এবং আমি তাকে বলিলাম ;—"তোকে আজ বাসুদেব শেখাইবে, তোর মাষ্টারকে আজ আমি বোম্বায়ে নিয়ে যাচ্চি, শীঘ্রই ফিরে আসব, নানু ও তুই খেলা কর, ঝগড়া করিসনে।" এই কথা শুনিয়া সে তার নিজের কাজে লাগিয়া গেল। নানুরও কাপড় বদলাইয়া অন্য পোষাক পরাইয়া, কোকো পান করাইয়া বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য শিপায়ের জিম্মা করিয়া দিলাম। এই সমস্ত হইলে পর 'ওঁর' চায়ের সময় হইয়াছে বলিয়া চা দিয়া আমিও চা পান করিলাম এবং অবশিষ্ট অংশ ছাত্রী ছেলেদিগকে দিয়া "তোমরা সবাই চা পান কর, আমার দেরী হচ্চে, আমি যাই ৯টা ৯॥০টার সময় ফিরে আসব" এইরূপ বলিয়া ছেলেদের মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া আমি ষ্টেশনে গেলাম এবং ভায়খলিতে নামিলাম। সেখানে ভাড়া-গাড়ী করিয়া হিন্দু-হাসপাতালে গেলাম। সখুবাই ও কেশব পূর্ব্বে এই হাসপাতালেই আসিয়াছিল। আমি প্রথমে গিয়াই কেশবাকেই দেখিলাম। তাহার ছয় জায়গা গোলার মতো ফুলিয়াছিল কিন্তু জ্বর অল্পই ছিল এবং ভাল হইবার দিকে যাইতেছিল। তাহার মা শুশ্রূষা করিতেছিল। মাই তাই প্রধান অবলম্বন ছিল। তাহাকে দেখিয়া তারপর যেখানে কাশীনাথকে রাখা হইয়াছিল সেইখানে আসিলাম এবং গিয়া দেখি তাহাকে খাটে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, নিকটে ৪ জন ছাত্র ও ডাক্তার দেশাই দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার জ্বর ১০৫ ডিগ্রী হওয়ায় একসঙ্গেই তাহার তৃষ্ণা ও ক্ষুধা পাইয়াছিল। ডাক্তার দেশাই আমাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, "ও ভুল বকৃচে কিন্তু এখনো চেতনা আছে। তবু এরপর আরও ভুল বক্‌বে। ওর ওঠা উচিত নয়। বোধ হয় "হার্ট ফেল" হবার ভয় আছে ; কিন্তু ও কারও কথা শোনে না, ওর কারও কথা ভাল লাগে না ; তাই ওকে বেঁধে রাখতে হয়েছে ;" এই সব কথা ডাঃ দেশাই যখন বলিতেছিলেন তখন কাশীনাথ একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল। তখন আমিই সম্মুখে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি? কাশীনাথ ভাল আছিস? এখন তোর কেমন বোধ হচ্চে? ডাক্তার বলছেন কালকের চেয়ে আজ তুই অনেকটা ভাল আছিস।" এইরূপ যখন বলিতেছিলাম সে আপনার চোখ রগড়াইয়া ও আচ্ছাদন খুলিয়া আমার পানে তাকাইল। এবং উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল "দিদি তুমি এসেছ? আমার সংবাদ তোমাকে দিয়েছে? আমি বলিলাম "—হাঁ" ; এখন উনিও কোর্ট থেকে ফিরে যাবার সময় এইদিকে এসে তোকে দেখে যাবেন।" এই কথা শুনিয়া এবং ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া খুব গর্ব্বের সহিত বলিল :—

"Look at my master how kind he is specially to me. He has sent his own wife to see me, in this Plague Hospital. Besides he is comming personally to see me, He would have come yesterday but busy as he is, gets no time, you know. He is always busy in the day and night, till he gets fast

asleep. I am his reader, you know. I read so many hours a day. I never sit still. But you have made me prisoner, don't you know who I am? I am justice Ranade's reader. He will never do without me. You have no business to detain me. I am his private secretary. Don't you know whose man I am? will he like if I sit still doing nothing? I must get up and attend to my work, I shall not listen to any body" এইরূপ বলিয়া সে সজোরে চেঁচাইতে লাগিল এবং উঠিবার জন্য ধড়ফড় করিতে লাগিল। এ রূপ হইলে পর ডাঃ দেশাই আমাকে ইসারা করিলেন, আমি তদনুসারে বাহিরে চলিয়া আসিলাম এবং "জৈন হাসপাতালের দিকে গাড়ী নিয়ে যা" গাড়ীওয়ালাকে বলিলাম। সেইখানে গিয়া বৈদ্য এই ডাক নামের গুজরাটী ডাক্তারকে খবর পাঠাইলাম; তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমাদের পীড়িত চাকর যেখানে ছিল সেইখানে আমাকে লইয়া গেলেন। সেই হাসপাতালে আমাদের তিন পরদেশী চাকর ছিল। মাতাদীন ও পাহারাওয়ালা দুজনেই বেহোঁস্ ছিল। উহাদিগকে দেখিয়া আমি দুর্গাপ্রসাদের কাছে আসিলাম; তার আধা-আধি জ্ঞান ছিল, কিছু কথা বলিতেছিল। কিন্তু বর্ণোচ্চারণ স্পষ্ট হইতেছিল না, সে কি করিতেছে বুঝিতে পারিতেছিল না। ডাঃ বৈদ্য আমাকে বলিলেন;—"এই লোকটা ঔষধ কিংবা দুধ একটু পেটে পড়তে দেয় নি" এই কথা শুনিয়া আমি দুর্গাপ্রসাদ হাঁক দিয়া ডাকিলাম এবং আমি তোকে দেখ্‌তে এসেছি, তুই আমাকে চিন্‌তে পারচিস কি?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম, তার চোখ খুব লাল হইয়াছিল, আড়ষ্ট হইবার মত দেখাইতেছিল। আমি তাকে বলিলাম "তুই ঔষধ কিংবা দুধ কেন খাসনে বল্ দিকি? ভয় নেই। এই ডাক্তার খুব ভাল। উনি কখনই তোকে খারাপ ঔষধ দেবেন না। আমি ত এইখানে আছি, একটু দুধ খা দিকি। কাল ডাক্তার তোকে বাঙ্গালা পাঠিয়ে দেবেন।" এই কথা শুনিয়া সে "আ" বলিল এবং দুই তিন আউন্স দুধ খাইল। তাহার পর অন্য ওয়ার্ডের রোগী দেখিয়া আমি ষ্টেশনে আসিয়া প্রায় ১০॥০টার সময় ভাত্তপায় আসিলাম। সেই সময় উনি স্নান করিয়া টুলের উপর বসিয়া আমি কোথায় গিয়াছি খোঁজ লইতেছিলেন, "বালকেরো" পাতার উপর ভাত বাড়িল এবং আহার আরম্ভ হইল। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি তুমি কোথায় গিয়েছিলে?" এখন কি উত্তর দি ভাবিতেছি, এমন সময় দুই ছেলেই বলিতে লাগিল "তুই শীঘ্ঘির আসবি বলিছিলি, এলিনি তো?" তখন এই ভাল সুযোগ হইয়াছে মনে করিয়া ওঁর কথার উত্তর না দিয়া প্রথমে আমি ছেলেদের সহিত কথা কহিতে লাগিলাম। তখন অর্দ্ধেক আহার হইয়া গিয়া শেষের ভাত খাইবার সময় হইয়াছিল। তখন আমি বলিলাম, জৈন হাসপাতালে দুর্গাপ্রসাদ প্রভৃতি লোকদিগকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাদের অবস্থা বড় ভাল নয় এইরূপ ডাক্তার বলিলেন। এইরূপ কথা বলিবার দুই চার মিনিট পরে বলিলাম—"আমাদের কাশীনাথও পীড়িত হয়ে হিন্দু হাসপাতালে গেছে এই কথা বাজরা আমাকে রাত্রে বলেছিল। তাকেও দেখব বলে সকালেই শীঘ্র উঠে গিয়েছিলুম। ডাক্তার দেশাই তার ব্যবস্থা বেশ করেছেন। তার জ্বর ১০৫, তার একজায়গায় নারকেলের মতো একটা গোলা হয়েছে। সে অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় আছে ও প্রলাপ বক্‌চে। কারও কথা শোনে না, তাই ডাক্তার তাকে খাটে বেঁধে রেখেছে। আমি কাশীনাথের বৃত্তান্ত যখন বলিতেছিলাম, তখন শেষের ভাত দুই চার গ্রাস খাওয়া হইয়া গিয়াছে। কাশীনাথের নাম করবামাত্রই, খাইতে খাইতে হাত গুটাইয়া আমি যে বৃত্তান্ত বলিতেছিলাম তাহা স্তব্ধভাবে শুনিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন, চোখ জলে ভরিয়া আসিল এবং "আমরা এই ২৫ দিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা যদি ছেড়ে দিতাম তাহলে এ রকম হত না; এই ছেলেটির ভবিষ্যৎ বেশ আশাপ্রদ, বেশ কাজের, এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প ছেলে খুব কম আছে"—এই কথা বলিয়া খুব বিচলিত হইয়া আর এক গ্রাসও না খাইয়া আঁচাইলেন। সেই দিন মুখশুদ্ধি, সুপারি প্রভৃতি খাইবার দিকে লক্ষ্য ছিল না, তাই ঐ সব যেমন তেমনি পড়িয়া রহিল। পোষাক পরিতে পরিতে চোপদার বলিলেন,—"যাবার সময় কাশীনাথকে দেখে যাব।" চোপদার আস্তে আস্তে বলিল, "এখন যাইবার সময় ভায়খালিতে নামলে কোর্টে যেতে দেরী হয়ে যাবে"; তখন উনি তাকে বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, সন্ধ্যাকালে আসবার সময় ভায়খালিতে নামতে হবে এটা যেন মনে থাকে"। সে "হ্যাঁ" বলিয়া দপ্তর ও ছড়ি হাতে লইল এবং উনিও ৩টার সময় হাসপাতালের ডাক্তারের নিকট হইতে খবর আসিল যে "আপনার ৫ জন চাকরের মধ্যে ৩ জন আজ মরিয়াছে। তাহাদের গোর দিবার ব্যবস্থা আপনারা করিবেন কিংবা হাসপাতাল হইতে করা যাইবে তাহা জানাইবেন"। চিঠি পড়িয়া উনি এক কেরাণী ও এক চোপদারকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন এবং আর এক চোপদারের হাতে চিঠি দিয়া আমার নিকট পাঠাইলেন। সেই চোপদারের নিকট সমস্ত সংবাদ পাইলাম—এবং আমার মন বড় খারাপ হইল। চিঠির অনুসারে তখনি ৫০ টাকা দিয়া তাকে রওনা করিলাম। "কাশীনাথের ব্যবস্থা তুমি করিবে এবং অন্য দুই জনের ব্যবস্থা তাহাদের জাতওয়ালাদের নিকট আমাদের তরফ হইতে পয়সা দিয়া করাইবে" এইরূপ উনি বলিয়াছিলেন, সেই অনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইল।

(ক্রমশঃ)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

উপরে যাহা আলোচিত হইল তাহা হইতে, জগৎ, জীব ও পরমেশ্বর—অথবা অধ্যাত্মশাস্ত্রের পরিভাষা

অনুসারে মায়া (অর্থাৎ মায়ার দ্বারা উৎপন্ন জগৎ), আত্মা ও পরব্রহ্ম—ইহাদের স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহা জানা যাইবে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'নামরূপ' ও তাহাদের আবরণের নিম্নে 'নিত্য তত্ত্ব', জাগতিক সমস্ত বস্তু এই দুই বর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে নামরূপকেই সগুণ মায়া কিংবা প্রকৃতি বলে। কিন্তু নামরূপকেই একপার্শে সরাইয়া রাখিলে যে নিত্য দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা নির্গুণই থাকিবে। কারণ কোন গুণই নামরূপবর্জিত হইতে পারে না। এই নিত্য ও অব্যক্ত তত্ত্বই পরব্রহ্ম; এবং মনুষ্যের দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়ের নিকট এই নির্গুণ পরব্রহ্মেই সগুণ মায়ার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই মায়া সত্য পদার্থ নহে; পরব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ ত্রিকালাবাধিত ও অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু। দৃশ্য জগতের নামরূপ এবং তাহার দ্বারা আচ্ছাদিত পরব্রহ্ম, ইহাদের স্বরূপসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই ন্যায় অনুসারে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, মনুষ্যের বিচার করিলে মনুষ্যের দেহ ও ইন্দ্রিয়ও দৃশ্য জগতের অন্যান্য পদার্থের ন্যায় নামরূপাত্মক অর্থাৎ অনিত্য মায়ার বর্গে পড়ে; এবং এই দেহেন্দ্রিয়-আচ্ছাদিত আত্মা নিত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; কিংবা ব্রহ্ম ও আত্মা একই। যে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত এবং বৌদ্ধসিদ্ধান্ত এই অর্থে বাহ্য জগতকে স্বতন্ত্র সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে না তাহাদের উভয়ের ভেদ পাঠকের এখন অবশ্যই উপলব্ধি হইয়াছে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন যে, বাহ্য জগৎ নাই; তিনি একমাত্র জ্ঞানকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন; এবং বেদান্তশাস্ত্রী বাহ্য জগতের নিত্যপরিবর্ত্তনশীল নামরূপকেই অসত্য বলিয়া মনে করেন, এবং এই নামরূপের মূলে ও মনুষ্যের দেহে, উভয়েতেই একই আত্মস্বরূপী নিত্য দ্রব্য ব্যাপ্ত হইয়া আছে, এবং এই একপদার্থাত্মক আত্মতত্ত্বই চরম সত্য এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। সাংখ্যবাদী "অবিভক্তং বিভক্তেষু" এই ন্যায় অনুসারে সৃষ্ট পদার্থের নানাত্বের একীকরণকে জড়প্রকৃতির পক্ষেও স্বীকার করেন। কিন্তু বেদান্তীরা সৎকার্য্যবাদের বাধাটা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া স্থির করিয়াছেন যে, "যাহা পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে"; এইরূপ নির্দ্ধারণ করা প্রযুক্ত এক্ষণে সাংখ্যের অসংখ্য পুরুষের ও প্রকৃতির একই পরমাত্মার মধ্যে অদ্বৈতভাবে কিংবা অবিভাগে সমাবেশ হইয়াছে। শুদ্ধাধিভৌতিক পণ্ডিত হেকেল অদ্বৈত্য ধরিয়াছে। কিন্তু তিনি এক জড় প্রকৃতিতেই চৈতন্যেরও সংগ্রহ করেন; এবং বেদান্ত জড়কে প্রাধান্য না দিয়া দেশকালে অসীম, অমৃত ও স্বতন্ত্র চিদ্রূপী পরব্রহ্মই সমস্ত জগতের মূল এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। হেকেলের জড়াদ্বৈত ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের অদ্বৈত এই দুয়ের মধ্যে এই গুরুতর ভেদ। অদ্বৈত বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত গীতাতে আছে, এবং এক প্রাচীন কবি সমস্ত অদ্বৈত বেদান্তের সার এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

> শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
> ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

"কোটি গ্রন্থের সার অর্দ্ধ শ্লোকে বলিতেছি—(১) ব্রহ্ম সত্য (২) জগৎ অর্থাৎ জগতের সমস্ত নামরূপ মিথ্যা কিংবা নশ্বর; এবং (৩) মনুষ্যের আত্মা ও ব্রহ্ম মূলে একই, দুই নহে"। এই শ্লোকের মধ্যে 'মিথ্যা' শব্দ কাহারও কানে খারাপ লাগিলে তিনি বৃহদারণ্যকোপনিষদ অনুসারে তৃতীয় চরণের 'ব্রহ্মামৃতং জগৎ সত্যং' এইরূপ পাঠান্তর স্বচ্ছন্দে করিয়া লইতে পারেন; সেইজন্য ভাবার্থের বদল হইবে না ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তথাপি সমস্ত দৃশ্য জগতের অদৃশ্য অথচ নিত্য পরব্রহ্মরূপী মূলতত্ত্বকে সৎ বলিবে কি অসৎ (অসত্য-অনৃত) বলিবে, ইহা লইয়া কোন কোন বেদান্তী বড়ই অনর্থক বিবাদ করিয়া থাকেন। তাই এই মতবাদের প্রকৃত বীজ কি, তাহার একটু ব্যাখ্যা করিতেছি। সৎ কিংবা সত্য এই একই শব্দের দুই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হওয়ায় এই মতবাদ বিপুল হইয়া উঠিয়াছে; এবং 'সৎ' এই শব্দকে প্রত্যেক ব্যক্তি কি অর্থে প্রয়োগ করেন, তৎপ্রতি প্রথমে যদি ঠিক লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে কোন গোলযোগ থাকে না। কারণ ব্রহ্ম অদৃশ্য হইলেও নিত্য, এবং নামরূপাত্মক জগৎ দৃশ্য হইলেও প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, এই ভেদ সকলেরই সমান স্বীকার্য্য। এই সৎ কিংবা সত্য শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হইতেছে (১) চক্ষের সম্মুখে এক্ষণে জাজ্বল্যমান অর্থাৎ ব্যক্ত (কাল উহার বাহ্য রূপ বদলাক বা নাই বদলাক); এবং দ্বিতীয় অর্থ (২)—চক্ষের অগোচর অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেও যাহার স্বরূপ চিরকাল এক রকমই থাকে, কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। ইহার মধ্যে, প্রথম অর্থ যাহার সম্মত তিনি চক্ষুগোচর নামরূপাত্মক জগৎকে সত্য বলেন। এবং পরব্রহ্ম তাহার বিরুদ্ধ, অর্থাৎ চক্ষের অদৃশ্য সুতরাং তাহাকে অসৎ বা অসত্য বলা যায়। উদাহরণ যথা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে দৃশ্য জগতের প্রতি 'সৎ' ও দৃশ্য জগতের অতীতের প্রতি 'ত্যৎ' (অর্থাৎ যাহা অতীত) কিংবা 'অনৃত' (চক্ষের অদৃশ্য) শব্দ প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্মের এই প্রকার বর্ণন করা হইয়াছে যে, যাহা কিছু মূলে বা আরম্ভে ছিল সেই দ্রব্যই "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ। বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ। সত্যং চানৃতং চ।" (তৈ. ২. ৬)—সৎ (চক্ষের গোচর) এবং 'তাহা' (যাহা অতীত), বাচ্য ও অনির্বাচ্য, সাধার ও নিরাধার, জ্ঞাত ও অবিজ্ঞাত (অজ্ঞেয়), সত্য ও অনৃত—এইরূপ দ্বিধা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এইরূপ ব্রহ্মকে 'অনৃত' বলিলেও অনৃতের অর্থ মিথ্যা নহে; পরে তৈত্তিরীয় উপনিষদেই "এই অনৃত ব্রহ্ম জগতের 'প্রতিষ্ঠা' কিংবা আধার, তাহার অন্য আধারের অপেক্ষা নাই, এবং তাহাকে যে জানিয়াছে সে অভয় হইয়াছে" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, শব্দভেদে ভাবার্থের বদল হয় নাই। সেইরূপ আবার শেষে "অসদ্ বা ইদমগ্র আসাৎ"—"এই সমস্ত জগৎ প্রথমে অসৎ (ব্রহ্ম) ছিল, এবং ঋগ্বেদের (১. ১২৯. ৪) বর্ণন অনুসারে তাহা হইতেই পরে সৎ অর্থাৎ নামরূপাত্মক ব্যক্ত জগৎ নিঃসৃত হইয়াছে এইরূপ উক্ত হইয়াছে (তৈ. ২. ৭)। ইহা হইতেও স্পষ্টই দেখা যায়—অসৎ এই শব্দ এই স্থানে "অব্যক্ত অর্থাৎ "চক্ষের অদৃশ্য" এই অর্থেই যোজিত হইয়াছে; এবং বেদান্তসূত্রে বাদরায়ণাচার্য্য উক্ত বচনের এইরূপ অর্থই করিয়াছেন, (বেসূ. ২. ১. ১৭)। কিন্তু 'সৎ' কিংবা 'সত্য' এই শব্দের,—চক্ষে দেখা না গেলেও চিরস্থায়ী কিংবা নিত্য এইরূপ (অর্থাৎ উপরে প্রদত্ত দুই

অর্থের মধ্যে দ্বিতীয়) অর্থ যাঁহাদের সম্মত, তাঁহারা অদৃশ্য অথচ অপরিবর্ত্তনীয় পরব্রহ্মকেই সৎ কিংবা সত্য এই নাম দিয়া, নামরূপাত্মক মায়াকে অসৎ অর্থাৎ অসত্য সুতরাং নশ্বর এইরূপ বলিয়া থাকেন। উদাহরণ যথা—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ কথমসতঃ সজ্জায়েত"—হে সৌম্য, সমস্ত জগৎ প্রথমে সৎ (ব্রহ্ম) ছিল, যাহা অসৎ অর্থাৎ যাহা 'নাই' তাহা হইতে সৎ অর্থাৎ "যাহা আছে" তাহা কিরূপে উৎপন্ন হইবে—এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে (ছাং. ৬. ২. ১, ২)। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদেই এই পরব্রহ্মকে একস্থানে অব্যক্ত এই অর্থে 'অসৎ' এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে (ছাং. ৩-১৯.১)*। একই পরব্রহ্মের প্রতি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অর্থে একবার 'সৎ' ও একবার 'অসৎ' এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ নাম দিবার এই গোলযোগ—অর্থাৎ বাচ্য অর্থ একই হইলেও শুধু শব্দবাদ বাড়াইবার পক্ষে সাহায্যকারী পদ্ধতি পরে ভাঙ্গিয়া গিয়া শেষে ব্রহ্ম সৎ বা সত্য অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী, এবং দৃশ্য জগৎ অসৎ অর্থাৎ নশ্বর, এই একই পরিভাষা স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। ভগবদ্গীতাতে এই শেষের পরিভাষা স্বীকৃত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী দ্বিতীয় অধ্যায়ে (গী. ২. ১৬-১৮) পরব্রহ্ম সৎ ও অবিনাশী, এবং নামরূপ অসৎ অর্থাৎ বিনশ্বর, এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং বেদান্তসূত্রের সিদ্ধান্তও এইরূপ। পুনশ্চ দৃশ্য জগতকে 'সৎ' বলিয়া পরব্রহ্মকে 'অসৎ' বা 'ত্যৎ' (তাহা=অতীত) বলিবার তৈত্তিরীয়োপনিষদীয় সেই পুরাতন পরিভাষার চিহ্ন এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ওঁ তৎসৎ এইরূপ যে ব্রহ্মনির্দ্দেশ গীতাতে প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ১৭. ২৩) তাহার মূল অর্থ কি হইতে পারে—এই পুরাতন পরিভাষার দ্বারা ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা হয়। 'ওঁ' এই গূঢ়াক্ষররূপী বৈদিক মন্ত্র; উপনিষদে অনেক প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (প্র. ৫; মাং. ৮-১২; ছাং. ১. ১)। 'তৎ' অর্থাৎ তাহা কিংবা দৃশ্য জগতের অতীত, দূরবর্ত্তী অনির্ব্বাচ্য তত্ত্ব; এবং 'সৎ' অর্থাৎ চক্ষের সম্মুখস্থ দৃশ্য জগৎ। এই তিন মিলিয়া সমস্তই ব্রহ্ম, ইহাই এই সংকল্পের অর্থ। এবং সেই অর্থেই "সদসচ্চাহমর্জ্জুন" (গী. ৯. ১৯)—সৎ অর্থাৎ পরব্রহ্ম ও অসৎ অর্থাৎ দৃশ্য জগৎ দুই-ই আমি, এইরূপ ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন। তথাপি গীতায় কর্ম্মযোগ প্রতিপাদ্য হওয়ায় সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এই ব্রহ্মনির্দ্দেশের দ্বারাও কর্ম্মযোগের পূর্ণ সমর্থন হয়; "ওঁ তৎসৎ"-এর 'সৎ' শব্দের অর্থ লৌকিক দৃষ্টিতে ভাল অর্থাৎ সদ্‌বুদ্ধিতে কৃত কিংবা যাহার ভাল ফল পাওয়া যায় সেই কর্ম্ম; এবং তৎ এর অর্থ অতীত কিংবা ফলাশা ছাড়িয়া কৃত কর্ম্ম। এইরূপ সংকল্পে যাহাকে 'সৎ' বলা হইয়াছে তাহা দৃশ্য জগৎ অর্থাৎ কর্ম্মই হওয়ায় (পর প্রকরণ দেখ) এই ব্রহ্মনির্দ্দেশের এই কর্ম্মমূলক অর্থ মূল অর্থ হইতে সহজেই নিষ্পন্ন হয়। ওঁ তৎসৎ, নেতি নেতি, সচ্চিদানন্দ, এবং সত্যস্য সত্যং ব্যতীত আরও কতকগুলি ব্রহ্মনির্দ্দেশ উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু গীতার্থ বুঝিবার পক্ষে তাহাদের উপযোগ না থাকায় এখানে সেগুলি বুঝানো হয় নাই।

জগৎ, জীব ও পরমেশ্বর (পরমাত্মা) ইহাদের পরস্পর-সম্বন্ধের এইরূপ নিষ্পত্তি হইলে পর, "জীব আমারই অংশ" (গী. ১৫. ৭) এবং আমিই এক 'অংশের দ্বারা' এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি" (গী. ১০-৪২) এইরূপ যাহা ভগবান গীতায়—এবং বাদরায়ণাচার্য্যও বেদান্তসূত্রে ইহাই বলিয়াছেন (বেসূ. ২. ৩. ৪৩. ৪. ৪. ১৯)—কিংবা পুরুষসূক্তে "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—"স্থিরচর ব্যাপুনি অবঘা জো জগদাত্মা দশাংগুলে উরলা"—সমস্ত চরাচর ব্যাপিয়া যে জগদাত্মা দশাঙ্গুলে রহিয়াছেন—এইরূপ যে বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে 'পাদ' বা 'অংশ' শব্দের অর্থ নির্ণয়ও সহজ হয়। পরমেশ্বর বা পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও নিরবয়ব একপদার্থাত্মক ও নামরূপবিরহিত সুতরাং অচ্ছেদ্য, এবং নির্ব্বিকার হওয়া প্রযুক্ত তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা হওয়া সম্ভব নহে (গী. ২. ২৫)। তাই, চতুর্দ্দিকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত এই একপদার্থী পরব্রহ্ম এবং মনুষ্যের দেহান্তর্গত আত্মা, এই দুয়ের ভেদ দেখাইবার জন্য ব্যবহারে 'শারীর আত্মা' পরব্রহ্মেরই অংশ এইরূপ বলিতে হইলেও, 'অংশ' বা 'ভাগ' শব্দের 'কাটিয়া ফেলা বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা', বা 'ডালিমের অনেক দানার মধ্যে একটি দানা' এইরূপ অর্থ না করিয়া, তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে গৃহস্থিত আকাশ, ঘটস্থ আকাশ (মঠাকাশ, ঘটাকাশ) এই সকল যেরূপ সর্ব্বব্যাপী এক আকাশেরই ভাগ, সেইরূপ 'শারীর আত্মা'ও পরব্রহ্মের অংশ, এইরূপ অর্থ করিতে হয় (অমৃতবিন্দু উপনিষৎ ১৩ দেখ)। সাংখ্যদিগের প্রকৃতি এবং হেকেলের আধিভৌতিক জড়াদ্বৈতবাদে স্বীকৃত একপদার্থমূলক তত্ত্ব,—ইহাও এইরূপ সত্য নির্গুণ পরমেশ্বরেরই সগুণ অর্থাৎ সসীম অংশ। অধিক কি, আধিভৌতিক শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে ইহাই প্রকাশ পায় যে, যে কোন ব্যক্ত বা অব্যক্ত মূল তত্ত্ব (তাহা আকাশের মত যতই কেন ব্যাপক হউক না) আছে, সে সমস্ত দেশ ও কালের দ্বারা বদ্ধ নামরূপমাত্র সুতরাং অসীম ও নশ্বর। ইহা সত্য যে, সেই তত্ত্বসমূহের ব্যাপকতার কারণে ততটুকুই পরব্রহ্ম তাহাদের দ্বারা আচ্ছাদিত; কিন্তু পরব্রহ্ম তাহাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইয়া সেই সমস্তের মধ্যে ওতপ্রোত আছেন এবং তদতিরিক্ত জানি না তিনি কতটা বাহিরে আছেন, যাহার কোন সন্ধান নাই। পরমেশ্বরের ব্যাপকতা দৃশ্য জগতের বাহিরে কতটা, তাহা দেখাইবার জন্য 'ত্রিপাদ' শব্দ পুরুষসূক্তে প্রযুক্ত হইলেও তাহার অর্থ 'অনন্তই' বিবক্ষিত। বস্তুত দেখা যায় যে দেশ ও কাল, পরিমাণ বা সংখ্যা ইত্যাদি সমস্ত নামরূপেরই প্রকার; এবং ইহা বলিয়া আসিয়াছি যে পরব্রহ্ম এই সমস্ত নামরূপের অতীত। এই জন্য, যে নামরূপাত্মক 'কালের' দ্বারা সমস্ত কবলিত রহিয়াছে সেই কালকেও যিনি আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্ম, উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপের এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়

* অধ্যাত্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের মধ্যেও, সৎ এই শব্দ জগতের প্রতীয়মান আবির্ভাব (মায়া) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে, অথবা বস্তুতত্ত্ব (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কান্ট জগতের প্রতীয়মান আবির্ভাবকে সৎ বুঝিয়া (real) বস্তুতত্ত্বকে অবিনাশী বলেন। কিন্তু হেগেল ও গ্রীন প্রভৃতি উক্ত আবির্ভাবকে অসৎ (unreal) বলেন এবং বস্তুতত্ত্বকে (real) সৎ বলেন।

(মৈ. ৬. ১৫) ; এবং "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ"—পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিবার পক্ষে সূর্য্যচন্দ্র কিংবা অগ্নির সমান কোন প্রকাশক সাধন নাই, কিন্তু তিনি স্বপ্রকাশ, ইত্যাদি যে বর্ণনা গীতাতে ও উপনিষদে আছে (গী. ১৫. ৬ ; কঠ. ৫. ১৫ ; শ্বে. ৬. ১৩) তাহারও ইহাই তাৎপর্য্য। সূর্য্য চন্দ্র তারা সমস্তই নামরূপাত্মক নশ্বর পদার্থ। যাঁহাকে "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (গী. ১৩. ১৭ ; বৃ. ৪. ৪. ১৬)—জ্যোতির জ্যোতি বলা হয় সেই স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানময় ব্রহ্ম এই সমস্তের অতীত অনন্ত ব্যাপিয়া আছেন ; তাঁহার অন্য প্রকাশক পদার্থের অপেক্ষা নাই ; এবং উপনিষদেও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি যে আলোক প্রাপ্ত হয় তাহাও এই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম হইতেই তাহারা প্রাপ্ত হয় (মুং. ২. ২. ১০)। আধিভৌতিক শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে ইন্দ্রিয়গোচর অতি সূক্ষ্ম অত্যন্ত দূরের পদার্থ ধর না কেন, সে সমস্তই দেশকালাদি নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ, অতএব 'জগতে'ই উহাদের সমাবেশ হয়। সত্য পরমেশ্বর উহাদের মধ্যে থাকিয়াও উহাদের হইতে পৃথক্, উহাদের অপেক্ষা অধিক ব্যাপক, এবং নামরূপের জাল হইতে স্বতন্ত্র ; অতএব কেবল নামরূপেরই বিচারকারী আধিভৌতিক শাস্ত্রের যুক্তি সাধন বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা শতগুণ সূক্ষ্ম ও প্রগল্‌ভ হইলেও তাহার দ্বারা জগতের মূল "অমৃত তত্ত্বের" সন্ধান পাওয়া সম্ভব নহে। সেই অবিনাশী, নির্ব্বিকার ও অমৃততত্ত্বকে কেবল অধ্যাত্মশাস্ত্রের জ্ঞানমার্গের দ্বারাই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের যে মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রীয় রীতিতে তাহাদের যে সংক্ষিপ্ত উপপত্তি বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, পরমেশ্বরের নামরূপাত্মক সমস্ত ব্যক্ত স্বরূপ কেবল মায়িক ও অনিত্য এবং ইহা অপেক্ষা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ শ্রেষ্ঠ, এবং তাহারও মধ্যে নির্গুণ অর্থাৎ নামরূপরহিত স্বরূপই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; এবং নির্গুণই সগুণরূপে অজ্ঞানফলে প্রতিভাত হয় ইহা গীতায় বলা হইয়াছে। কিন্তু কেবল শব্দের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রথিত করিবার কাজ, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ন্যায় যাঁহাদের দুই অক্ষরের কোন জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারাই করিতে পারেন, ইহাতে কোন অসাধারণত্ব নাই। এ বিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বুদ্ধিতে আসিয়া মনের মধ্যে প্রবেশ করে, হৃদয়ের মধ্যে মগ্ন হয় এবং অস্থিমাংসের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া যায়। এই প্রকার হইবার পর একই পরব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, পরমেশ্বরের স্বরূপের এই প্রকার পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, এবং সেই ভাবের দ্বারা সংকটকালেও সম্পূর্ণ সমতার সহিত আচরণ করিবার স্থিরস্বভাব উৎপন্ন হয় ; কিন্তু ইহার জন্য বহুবংশাগত সংস্কারের, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের, দীর্ঘ উদ্যোগের এবং ধ্যান ও উপাসনার সহায়তা আবশ্যক হয়। এই সমস্তের সাহায্যে "সর্ব্বভূতে একই আত্মা" এই তত্ত্ব যখন কোন মনুষ্যের সঙ্কট সময়েও তাহার প্রত্যেক কর্ম্মে সহজ ভাবে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহারই ব্রহ্মজ্ঞান প্রকৃতই পরিপক্ক হইয়াছে এবং এই প্রকারেই মনুষ্যের মোক্ষলাভ হয় (গী. ৫. ১৮—২০ ; ৬. ২১, ২২)—ইহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপরি-উক্ত সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সারভূত ও শিরোমণিভূত চরম সিদ্ধান্ত। এই আচরণ যে ব্যক্তিতে দেখা যায় না তাহাকে কাঁচা বুঝিতে হইবে—ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নিতে এখনও সম্পূর্ণ পক্ক হয় নাই। প্রকৃত সাধু এবং নিছক্ বেদান্তশাস্ত্রী, ইহাদের মধ্যে ইহাই ভেদ এবং এই অভিপ্রায়েই গীতাতে জ্ঞানের লক্ষণ বলিবার সময় "বাহ্য জগতের মূল তত্ত্বকে শুধু বুদ্ধিতে জানা" জ্ঞান না বলিয়া "অমানিত্ব, ক্ষান্তি, আত্মনিগ্রহ, সমবুদ্ধি" ইত্যাদি উদাত্ত মনোবৃত্তি জাগৃত হইয়া যাহার দ্বারা চিত্তের পূর্ণ শুদ্ধি আচরণে সর্ব্বদা ব্যক্ত হয় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী. ১৩-৭-১১)। জ্ঞানের দ্বারা যাহার ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ আত্ম-অনাত্ম বিচারে স্থির হয় এবং যাহার মনে সর্ব্বভূতাত্মৈক্য-জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ পায় সেই ব্যক্তির বাসনাত্মক বুদ্ধিও নিঃসন্দেহ শুদ্ধ হয়। কিন্তু কাহার বুদ্ধি কিরূপ বুঝিতে হইলে তাহার আচরণ ব্যতীত অন্য বাহ্য সাধন না থাকায় এখনকার কেবল কেতাবী জ্ঞানপ্রচারের কালে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, 'জ্ঞান' বা 'সমবুদ্ধি' শব্দের মধ্যেই শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মক) বুদ্ধি, শুদ্ধ বাসনা (বাসনাত্মক বুদ্ধি) ও শুদ্ধ আচরণ, এই তিন শুদ্ধ বিষয়ের সমাবেশ করা হয়। ব্রহ্মসম্বন্ধে শুষ্ক বাক্‌পাণ্ডিত্য প্রদর্শক এবং তাহা শুনিয়া "বাঃ বাঃ" বলিয়া শিরঃসঞ্চালক, কিংবা অভিনয় দর্শকের ন্যায় "আরও একবার" বলিবার লোক অনেক আছে (গী. ২. ২৯ ; ক. ২.৭)। কিন্তু উপরি-উক্ত অনুসারে যে ব্যক্তি অন্তর্বাহ্যশুদ্ধ অর্থাৎ সাম্যশীল হইয়াছে সে-ই প্রকৃত আত্মনিষ্ঠ এবং তাহারই মুক্তি লাভ হয়, নিছক্ পণ্ডিতের হয় না—সে যতই কেন বুদ্ধিমান বা বিদ্বান হোক না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" এইরূপ উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (ক. ২·২২ ; মুং. ৩. ২. ৩) ; এইরূপ তুকারাম বাবাও বলিয়াছেন—"আলাসি পণ্ডিত পুরাণ সাঙ্গসী। পরী তুঁ নেণসি মী হেঁ কোণ॥" অর্থাৎ—"পণ্ডিত হইয়াছ, পুরাণ বলিতেছ। কিন্তু তুমি জান না যে 'আমি' কে।" (গা. ২৫ ৯৯)। আমাদের জ্ঞান কত কম তাহা দেখ। 'মুক্তি লাভ হয়' এই শব্দ আমাদের মুখ হইতে সহজেই বাহির হইয়া পড়ে! মনে কর আত্মা হইতে এই মুক্তি কোন পৃথক বস্তু! ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে দ্রষ্টা ও দৃশ্য জগতে ভেদ ছিল ঠিক ; কিন্তু আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্রে নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাত্মৈক্যের পূর্ণ জ্ঞান হইলে আত্মা ব্রহ্মেতে মিশিয়া যায় এবং ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ আপনিই ব্রহ্মরূপ হইয়া যান ; এই আধ্যাত্মিক অবস্থাকেই 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' মোক্ষ এই নাম দেওয়া হইয়াছে ; এই নাম কেহ কাহাকে দেয় না, ইহা অন্য কোথা হইতে আসে না, অথবা তাহার জন্য অন্য কোন লোকে যাইবারও প্রয়োজন নাই। পূর্ণ আত্মজ্ঞান যখন ও যেখানে হইবে সেইক্ষণে ও সেই স্থানেই মোক্ষ ধরা রহিয়াছে ; কারণ মোক্ষ তো আত্মারই মূল শুদ্ধাবস্থা ; উহা পৃথক স্বতন্ত্র কোন বস্তু বা স্থল নহে। শিবগীতাতে এই শ্লোক আছে (১৩. ৩২)—

> মোক্ষস্য ন হি বাসোঽস্তি ন গ্রামান্তরমেব বা।
> অজ্ঞান-হৃদয়-গ্রন্থি-নাশো মোক্ষ ইতি স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ মোক্ষ অমুক স্থানে লাভ হয়, কিংবা মোক্ষের জন্য অন্য কোন গ্রামে অর্থাৎ প্রদেশে যাইতে হয়, এরূপ

নহে; আপন হৃদয়ের অজ্ঞান-গ্রন্থির নাশ হওয়াকেই মোক্ষ বলে।" অধ্যাত্মশাস্ত্র হইতে নিষ্পন্ন এই প্রকার এই অর্থই "অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্‌।"—যাঁহার পূর্ণ আত্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার সকল স্থানেই ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপী মোক্ষ লাভ হয়, এবং "যঃ সদা মুক্ত এব সঃ" (গী. ৫. ২৮) ভগবদ্গীতার এই শ্লোকসমূহে এবং "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনি ব্রহ্মই হইয়াছেন (মুং. ৩. ২. ৯)—ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্যেও বর্ণিত হইয়াছে। মনুষ্যের আত্মার জ্ঞান-দৃষ্টিতে এই যে পূর্ণাবস্থা হয়, ইহাকেই 'ব্রহ্মভূত' (গী. ১৮. ৫৪), বা "ব্রাহ্মীস্থিতি" (গী, ২. ৭২), বলা হইয়া থাকে; এবং স্থিতপ্রজ্ঞ (গী. ২. ৫৫-৭২), ভক্তিমান্‌ (গী. ১২. ১৩-২০) বা ত্রিগুণাতীত (গী. ১৪. ২২-২৭) পুরুষদিগের ভগবদ্‌গীতায় যে বর্ণনা আছে তাহাও এই অবস্থারই বর্ণনা। 'ত্রিগুণাতীত' পদ হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে স্বতন্ত্র মানিয়া সাংখ্য যেরূপ পুরুষের কৈবল্যকে মোক্ষ বলেন, সেইরূপ মোক্ষই গীতারও অভিমত; এরূপ যেন বুঝা না হয়; তবে অধ্যাত্মশাস্ত্রের "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম—(বৃ. ১. ৪. ১০)—এই ব্রাহ্মী অবস্থা কখন ভক্তিমার্গের দ্বারা, কখন চিত্তনিরোধরূপ পাতঞ্জল যোগমার্গের দ্বারা এবং কখন বা গুণাগুণবিচাররূপ সাংখ্যমার্গের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই গীতার অভিপ্রায়। এই মার্গ-সমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিচার কেবল বুদ্ধিগম্য মার্গ হওয়া প্রযুক্ত পরমেশ্বরস্বরূপের জ্ঞানলাভার্থ সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ভক্তিই সুলভ সাধন ইহা গীতাতে উক্ত হইয়াছে। এই সাধনের সবিস্তার বিচার আমি পরে ত্রয়োদশ প্রকরণে করিয়াছি। সাধন যাহাই হোক না, ব্রহ্মাত্মৈক্যের অর্থাৎ প্রকৃত পরমেশ্বরের স্বরূপের জ্ঞান হইয়া জগতের সর্ব্বভূতের মধ্যে একই আত্মাকে উপলব্ধি করা এবং তদনুসারে কার্য্য করাই অধ্যাত্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা; এবং এই অবস্থা যাঁহার লাভ হইয়াছে সেই পুরুষই ধন্য ও কৃতকৃত্য হন—এইটুকুতো নির্ব্বিবাদ। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ পশু ও মনুষ্যের একই হওয়া প্রযুক্ত মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কিংবা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জ্ঞানলাভেই হইয়া থাকে। সমস্ত ভূতের বিষয়ে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা এই প্রকার সাম্যবুদ্ধি স্থাপন করিয়া সমস্ত কর্ম্ম করাই নিত্য মুক্তাবস্থা, পূর্ণযোগ বা সিদ্ধাবস্থা। গীতায় এই অবস্থার যে বর্ণনা আছে তন্মধ্যে দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিমান পুরুষের বর্ণনার উপর টীকা করিবার সময়—জ্ঞানেশ্বর মহারাজ অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া ব্রহ্মভূত পুরুষের সাম্যাবস্থার স্বরূপ ও চটক্‌দার নিরূপণ করিয়াছেন; এবং তাহাতে গীতার চারি স্থানে বর্ণিত ব্রাহ্মী স্থিতির সার বিবৃত হইয়াছে ইহা বলিতে বাধা নাই। যথা:—"হে পার্থ! যাঁহার হৃদয়ে বৈষম্য কিছুমাত্র নাই, যিনি শত্রুমিত্র সকলকে সমান ভাবেন; অথবা হে পাণ্ডব! যিনি প্রদীপের ন্যায় ইহা আমার ঘর বলিয়া এখানে আলোক প্রদান করিব এবং উহা অপরের ঘর বলিয়া ওখানে অন্ধকার করিয়া রাখিব, এপ্রকার ভেদজ্ঞান করেন না; বীজ যে বপন করে এবং গাছ যে কাটে, উভয়ের উপরেই বৃক্ষ যেমন সমভাবে ছায়াদান করে;" ইত্যাদি (জ্ঞা. ১২. ১৮)। সেইরূপ "পৃথিবীর ন্যায় তিনি এ প্রকার ভেদ একেবারেই জানেন না যে, উত্তমকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং অধমকে ত্যাগ করিতে হইবে; যেমন দয়ালু ব্যক্তি ইহা ভাবেন না যে, রাজার শরীর রক্ষা করি এবং দরিদ্রের শরীর বিনষ্ট করি; যেমন জল এই ভেদ করে না যে, গরুর তৃষ্ণা শান্তি করি এবং ব্যাঘ্রের পক্ষে বিষ হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করি; সেইরূপই সর্ব্বভূতে যাঁহার একই মৈত্রী; যিনি স্বয়ং মূর্ত্তিমান দয়া, এবং যিনি 'আমি' ও 'আমার' ব্যবহার করিতে জানেন না, এবং যাঁহাতে সুখদুঃখের আভাসও দেখা যায় না" ইত্যাদি (জ্ঞা. ১২. ১৩)*। অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা শেষে যাহা লাভ হয় তাহা ইহাই।

সমস্ত মোক্ষধর্ম্মের মূল অধ্যাত্মজ্ঞানের পরম্পরা আমাদের নিকট উপনিষদ্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, রামদাস, কবীরদাস, সুরদাস, তুলসীদাস, ইত্যাদি আধুনিক সাধুপুরুষ পর্য্যন্ত কিরূপ অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে, তাহা উপরি-উক্ত বিচার-আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু উপনিষদেরও পূর্ব্বে অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীন কালেই আমাদের দেশে এই জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং তখন হইতে পরে ক্রমে ক্রমে উপনিষদের বিচারের বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। ইহা পাঠককে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার আধারভূত ঋগ্বেদের এক প্রসিদ্ধ সূক্ত ভাষান্তর সহ এইখানে শেষে দিয়াছি। জগতের অগম্য মূলতত্ত্ব এবং তাহা হইতে এই বিবিধ দৃশ্য জগতের উৎপত্তির বিষয়ে এই সূক্তে যে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে সেরূপ প্রগল্‌ভ, স্বতন্ত্র ও মূলস্পর্শী তত্ত্বজ্ঞানের মার্ম্মিক বিচার অন্য কোন ধর্ম্মেরই মূল গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শুধু তাহাই নহে, এই প্রকার অধ্যাত্মবিচারে পূর্ণ এত প্রাচীন লেখাও অদ্যাপি কোথাও উপলব্ধ হয় নাই। তাই, মনুষ্যের মনের প্রবৃত্তি এই নশ্বর ও নামরূপাত্মক জগতের অতীত নিত্য ও অচিন্ত্য ব্রহ্মশক্তির দিকে সহজেই কিরূপ ধাবমান হয় ইহা দেখাইবার জন্য ধর্ম্ম-ইতিহাসের দৃষ্টিতেও এই সূক্তের গুরুত্ব বুঝিয়া আশ্চর্য্য হইয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত আপনাপন ভাষায় তাহার চমৎকার ভাষান্তর করিয়াছেন। ইহা ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১২৯তম সূক্ত হইতেছে; এবং এই সূক্তের প্রারম্ভিক শব্দ হইতে ইহাকে "নাস-

* পার্থা জয়াচিয়া ঠাইঁ। বৈষম্যাচী বার্তা নাহী।
রিপুমিত্রা দোহী। সরিসা পাডু ॥
কাঁ ঘরিচিয়াঁ উজিয়েড়ু করাবা। পারখিয়াঁ অঁধারু পাডাবা।
হে নেণেচি গা পাণ্ডবা। দীপু জৈসা ॥
জো খাণ্ডাবয়া ঘাকে ঘালী। কাঁ লাবণী জয়ানে কেলী ॥
দোঘাঁ একচি সাউলী। বৃক্ষ দে জৈসা ॥

কিংবা তৎপূর্ব্বে (জ্ঞা. ১২, ১৩) সেই অর্থে—

উত্তমাতে ধরিজে। অধমাতে অব্হেরিজে।
হে কাঁহীচি নেণিজে। বসুধা জেবীঁ ॥
কাঁ রায়াচে দেহ চাল্বূঁ। রঙ্কা পরৌতে গাল্বূঁ।
হেঁ ন ম্হণেচি কৃপালু। প্রাণু জৈসা ॥
গাঈচা তৃষা হরূঁ। কাঁ ব্যাঘ্রা বিষ হোঊনি মারূঁ।
ঐসে নেণেচি কাঁকরূঁ, তোয় জৈসেঁ ॥
তৈসী আঘবিয়াচি ভূতমাত্রীঁ। একপণে জয়া মৈত্রী ॥
কৃপেসী ধাত্রী। আপণচি জো ॥
আণি মী হে ভাষ নেণে। মাঝেঁ কাঁহীচি ন ম্হণে ॥
সুখদুঃখ জাণণেঁ। নাহীঁ জয়া ॥

দীয় সূক্ত” বলে। এই সূক্তই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২.৮.৯) প্রদত্ত হইয়াছে ; মহাভারতের নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম্মে, ভগবদিচ্ছায় সর্ব্বপ্রথমে জগতের সৃষ্টি কিরূপে হইল, ইহার বর্ণনা এই সূক্তেরই আধারে করা হইয়াছে (মভা. শাং. ৩৪২. ৮)। সর্ব্বানুক্রমণিকা অনুসারে ইহার ঋষি পরমেষ্ঠি প্রজাপতি এবং দেবতা পরমাত্মা ; ইহাতে ত্রিষ্টুভ্ বৃত্তের অর্থাৎ এগারো অক্ষরে চার চরণের সাত ঋক আছে। ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ শব্দ দ্ব্যর্থী হওয়া প্রযুক্ত জগতের মূল দ্রব্যকে ‘সৎ’ বলা সম্বন্ধে উপনিষৎকারদিগের যে মতভেদের কথা পূর্ব্বে এই প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছি সেই মতভেদ ঋগ্বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—এই মূল কারণ সম্বন্ধে কোন স্থানে উক্ত হইয়াছে “একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি” (ঋ. ১. ১৬৪. ৪৬) কিংবা “একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি” (ঋ. ১০. ১১৪-৫)—তিনি এক ও সৎ অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী, কিন্তু তাঁহাকেই লোকে বিভিন্ন নাম দিয়া থাকে ; আবার কোন কোন স্থলে ইহার উল্টাও বলা হইয়াছে যে, “দেবানাং পূর্ব্ব্যে যুগেঽসতঃ সদ-জায়ত” (ঋ. ১০. ৭২. ৭)—দেবতাদেরও পূর্ব্বে অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে ‘সৎ’ অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কোন-না-কোন এক দৃশ্য তত্ত্ব হইতে জগতের উৎপত্তি হওয়া সম্বন্ধে ঋগ্বেদেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেখা যায় ; যেমন জগতের মূলারম্ভে হিরণ্যগর্ভ ছিলেন, এবং অমৃত ও মৃত্যু এই দুই তাঁহারই ছায়া ; তিনিই পরে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন (ঋ. ১০.১২১.১,২) ; প্রথমে বিরাট্‌রূপী পুরুষ ছিলেন ; তাঁহা হইতে যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে (ঋ. ১০. ৯০) ; প্রথমে আপ (জল) ছিল, তাহাতে প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন (ঋ. ১০. ৭২. ৬ ; ১০. ৮২. ৬) ; ঋত ও সত্য প্রথমে উৎপন্ন হইল, অনন্তর রাত্রি (অন্ধকার) ও তাহার পর সমুদ্র (জল), সম্বৎসর প্রভৃতি উৎপন্ন হইল (ঋ. ১০. ১৯০. ১)। ঋগ্বেদে বর্ণিত এই মূল দ্রব্য সমূহের পরে অন্যান্য স্থানে এই প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে। যথাঃ—(১) জলের, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ‘আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ’ এই সমস্ত প্রথমে কেবল জল ছিল (তৈ. ব্রা. ১.১. ৩. ৫) ; (২) অসতের, তৈত্তিরীয় উপনিষদে ‘অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ’ ইহা প্রথমে অসৎ ছিল (তৈ. ২. ৭) ; (৩) সতের, ছান্দোগ্যে ‘সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ’ এই সমস্ত প্রথমে সৎই ছিল (ছাং. ৬. ২) ; কিংবা (৪) আকাশের, ‘আকাশঃ পরায়ণম্’ আকাশ সমস্তের মূল (ছাং. ১. ৯) ; (৫) মৃত্যুর, বৃহদারণ্যকে ‘নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃত-মাসীৎ’ প্রথমে ইহা কিছুই ছিল না, সমস্তই মৃত্যুর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল (বৃ. ১, ২. ১) ; এবং (৬) তমের, মৈত্র্যুপনিষদে ‘তমো বা ইদমগ্র আসীদেকম্’ প্রথমে এই সমস্ত একমাত্র তম (তমোগুণী, অন্ধকার) ছিল—পরে তাহা হইতে রজ ও সত্ত্ব হইল, (মৈ. ৫. ২) শেষে এই সকল বেদবচনের অনুসরণ করিয়া মনুস্মৃতিতে জগতের আরম্ভের বর্ণনা এই প্রকার করা হইয়াছে—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥

অর্থাৎ “এই সমস্ত প্রথমে তমের দ্বারা অর্থাৎ অন্ধকারের দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল, ভেদাভেদ উপলব্ধি হইত না, অগম্য ও নিদ্রিতের ন্যায় ছিল ; অনন্তর তাহার মধ্যে অব্যক্ত পরমাত্মা প্রবেশ করিয়া প্রথমে জল উৎপন্ন করিলেন”—(মনু. ১.৫-৮)। জগৎ আরম্ভের মূলদ্রব্যসম্বন্ধে উক্ত বর্ণনা কিংবা এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা নাসদীয় সূক্তের সময়েও অবশ্য প্রচলিত ছিল ; এবং সেই সময়েও ইহাদের মধ্যে কোন্ মূলদ্রব্য সত্য ধরা যাইবে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। উহার সত্যাংশ সম্বন্ধে এই সূক্তের ঋষি বলিতেছেন যে—

সূক্ত ও অনুবাদ।

নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম-
ন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্ ॥ ১ ॥

১। তখন অর্থাৎ মূলারম্ভে অসৎ ছিল না এবং সৎও ছিল না! অন্তরীক্ষ ছিল না এবং তাহারও অতীত আকাশও ছিল না। (এইরূপ অবস্থাতে) কে (কাহাকে) আবরণ করিল? কোথায়? কাহার সুখের জন্য? অগাধ ও গহন জলও কোথায় ছিল? *

ন মৃত্যুরাসীদ্ অমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥ ২ ॥

২। তখন মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত নশ্বর দৃশ্য জগৎ সৃষ্ট হয় নাই, সেইজন্য (অন্য) অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী নিত্য পদার্থ (এই ভেদ) ও ছিল না। (এই-প্রকার) রাত্রি ও দিনের ভেদ জানিবার কোন সাধন (=প্রকেত) ছিল না। (যাহা ছিল) তাহা একমাত্র আপন শক্তি (স্বধা) দ্বারাই বায়ু বিনা শ্বাসোচ্ছ্বাস করিত অর্থাৎ স্ফূর্ত্তিমান হইত। তাহা ব্যতীত কিংবা তাহার বাহিরে অন্য কিছুই ছিল না।

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽ
প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনাঽজায়তৈকম্ ॥ ৩ ॥

৩। যে (যৎ) এইরূপ বলা যায় যে, অন্ধকার ছিল, আরম্ভে এই সমস্ত অন্ধকারে ব্যাপ্ত (এবং) ভেদাভেদ-বিরহিত জল ছিল, কিংবা আভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম (আরম্ভেই) তুচ্ছের দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যা মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিলেন, তাহা (তৎ) মূলে এক (ব্রহ্মই) তপের মহিমার দ্বারা (রূপান্তরে পরে) প্রকট হইয়া-ছিলেন। †

* প্রথম ঋক্—চতুর্থ চরণে ‘আসীৎ কিং’ এই অন্বয় করিয়া আমি উক্ত অর্থ দিয়াছি ; এবং উহার ভাবার্থ হইতেছে ‘জল সে সময়ে ছিল না’ (তৈ. ব্রা. ২.২.৯ দেখ)।

† তৃতীয় ঋক্—কেহ কেহ ইহার প্রথম তিন চরণ স্বতন্ত্র কল্পনা করিয়া উহার এইরূপ বিধানাত্মক অর্থ করেন যে, “অন্ধকার, অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত জল, কিংবা তুচ্ছের দ্বারা আচ্ছাদিত আভু (শূন্যগর্ভ) ছিলেন”। কিন্তু আমার মতে তাহা ভুল। কারণ প্রথম দুই ঋকে, মূলারম্ভে কিছুই ছিল না এইরূপ যখন স্পষ্ট বিধান আছে, তখন তাহার বিপরীত অন্ধকার কিংবা জল মূলারম্ভে ছিল, এই সূক্তে ইহা উক্ত হইতে পারে না। তাছাড়া, তৃতীয় চরণের যৎ শব্দ

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪ ॥

৪। ইহার মনের যে রেত অর্থাৎ বীজ প্রথমে নিঃসৃত হয় তাহাই আরম্ভে কাম (অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি কিংবা শক্তি) হইয়াছে। জ্ঞানীরা অন্তঃকরণে বিচার করিয়া বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, (ইহাই) অসৎ-এর মধ্যে অর্থাৎ মূল পরব্রহ্মের মধ্যে সৎ-এর অর্থাৎ নশ্বর দৃশ্য জগতের (প্রথম) সম্বন্ধ, এইরূপ

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষাম্
অধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্
স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥

৫। (এই) রশ্মি বা সূত্র বা কিরণ ইহার মধ্যে অন্তরালরূপে প্রসারিত; এবং যদি বল যে ইহা নীচে ছিল তবে ইহা উপরেও ছিল। (ইহাদের ভিতর কিছু) রেতোধা অর্থাৎ বীজপ্রদ হইল এবং (বাড়িয়া) বড়ও হইল। তাঁহারই স্বশক্তি এদিকে ছিল এবং প্রযতি অর্থাৎ প্রভাব ওদিকে (ব্যাপ্ত) হইয়া রহিল।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনা-
থ কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬ ॥

৬। (সৎ-এর) এই বিসর্গ অর্থাৎ বিস্তার কাহা হইতে বা কোথা হইতে আসিল ইহা (ইহা অপেক্ষা অধিক) প্র অর্থাৎ বিস্তার পূর্ব্বক—এখানে কে বলিবে? কে ইহাকে নিশ্চিত জানে? দেবতারাও এই (সৎ জগতের) বিসর্গে পরে হইল। আবার উহা যেখান হইতে নিঃসৃত হইল, তাহা কে জানিবে?

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥

৭। (সৎ-এর) এই বিসর্গ অর্থাৎ বিস্তার যেখান হইতে আসিয়াছে, কিংবা সৃষ্ট হইয়াছে বা হয় নাই,—তাহাই পরম আকাশে অবস্থিত এই জগতের যে অধ্যক্ষ (হিরণ্যগর্ভ), তিনিই জানেন; কিংবা না জানিতেও পারেন (কে বলিতে পারে?)

চক্ষের বা সাধারণত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গোচর সবিকার ও বিনশ্বর নামরূপাত্মক নানা দৃশ্যের জালে বিজড়িত না থাকিয়া তাহার অতীত কোন এক ও অমৃত তত্ত্ব আছে ইহা জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি করাই সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের রহস্য। এই সাধনের সোপাই পাইবার জন্য উক্ত সূক্তের ঋষির বুদ্ধি একেবারেই দৌড়িয়া গিয়াছিল; ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি কত তীব্র ছিল! মূলারম্ভে অর্থাৎ জগতের নানা পদার্থ অস্তিত্বে আসিবার পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল তাহা সৎ বা অসৎ, মৃত্যু বা অমৃত, আকাশ বা জল, আলো বা অন্ধকার, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নকারীদিগের সহিত বিবাদ করিতে না বসিয়া, উক্ত ঋষি সকলের পুরোভাগে ধাবমান হইয়া ইহা বলিলেন যে, সৎ ও অসৎ, মর্ত্ত্য ও অমৃত, অন্ধকার ও আলো, আচ্ছাদনকারী ও আচ্ছাদিত, সুখদাতা ও সুখভোক্তা, এই প্রকার দ্বৈতের পরস্পর-সাপেক্ষ ভাষা দৃশ্য জগতের সৃষ্টির পরে হওয়ায়, জগতে এই দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ এক ও দুই এই ভেদও যখন ছিল না তখন, কে কাহাকে আচ্ছাদিত করিত? তাই এই সূক্তের ঋষি আরম্ভেই নির্ভয়ে বলিতেছেন যে, মূলারম্ভের এক দ্রব্যকে সৎ বা অসৎ, আকাশ বা জল, আলো বা অন্ধকার, অমৃত বা মৃত্যু ইত্যাদি পরস্পরসাপেক্ষ কোন নাম দেওয়া উচিত নহে; যাহা কিছু ছিল তাহা এই সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন ছিল এবং, তাহা একমাত্র একই, চতুর্দ্দিকে আপনার অপার শক্তিতে স্ফূর্ত্তিমান ছিল, তাহার জুড়ী কিংবা তাহার আচ্ছাদক অন্য কিছুই ছিল না। দ্বিতীয় ঋকে 'আনীৎ' এই ক্রিয়াপদের 'অন্' ধাতুর অর্থ শ্বাসোচ্ছ্বাস গ্রহণ করা বা স্ফুরণ হওয়া, এবং 'প্রাণ' শব্দও সেই ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু যাহা না সৎ আর না-অসৎ, তাহা সজীব প্রাণীর ন্যায় শ্বাসোচ্ছ্বাস গ্রহণ করিতেছিল এবং শ্বাসোচ্ছ্বাস চলিবার বায়ু তখন বায়ুই বা কোথায় তাহা কে বলিতে পারে? তাই 'আনীৎ' এই পদের সঙ্গেই 'অবাতং'=বায়ুহীন ও 'স্বধয়া'=আপনার নিজ মহিমাতে—এই দুই পদ জুড়িয়া "জগতের মূলতত্ত্ব জড় ছিল না" এই অদ্বৈতাবস্থার অর্থ দ্বৈতের ভাষায় খুব নিপুণভাবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, "তাহা এক বায়ু বিনা আপন শক্তিতেই শ্বাসোচ্ছ্বাস করিতেছিল কিংবা স্ফুরিত হইতেছিল" ইহাতে বাহ্য দৃষ্টিতে যে বিরোধ দেখা যায়, তাহা দ্বৈতীভাষার অপূর্ণতা-প্রযুক্ত উৎপন্ন হইয়াছে। "নেতি নেতি" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বা "স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ" (ছাং. ৭. ২৪. ১)—আপনারই মহিমাতে অর্থাৎ অন্য কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া একাই অবস্থিত—ইত্যাদি পরব্রহ্মের যে বর্ণনা উপনিষদে আছে তাহাও উপরোক্ত অর্থেরই দ্যোতক। সমস্ত জগতের মূলারম্ভে চারিদিকে এই যে অনির্ব্বাচ্য তত্ত্ব স্ফুরিত ছিল বলিয়া এই সূক্তে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত দৃশ্য জগতের প্রলয় হইলেও তাহাই নিঃসন্দেহ অবশিষ্ট থাকিবে। তাই গীতাতে "সমস্ত পদার্থের নাশ হইলেও যাহার নাশ হয় না" (গী. ৮. ২০), এইরূপ এই পরব্রহ্মেরই কোন পর্য্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং পরে এই সূক্ত ধরিয়াই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, "তাহা

নিরর্থক এরূপ অর্থ করিলেও মানিতে হয়। তাই তৃতীয় চরণের সৎ-এর সহিত চতুর্থ চরণের তৎ পদের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া উপরি-উক্ত অর্থ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। 'মূলারম্ভে জল প্রভৃতি পদার্থ ছিল' এইরূপ যাহারা বলে তাহাদের উত্তরস্বরূপে এই ঋক্ এই সূক্তে আসিয়াছে; এবং তোমার কথা অনুসারে তম, জল, প্রভৃতি পদার্থ মূলে ছিল না, উহা এক ব্রহ্মেরই পরবর্ত্তী বিস্তার, এইরূপ বলাই ঋষির উদ্দেশ্য। 'তুচ্ছ' ও 'আভু' এই দুই শব্দ পরস্পর-প্রতিযোগী হওয়া প্রযুক্ত তুচ্ছের বিপরীত আভু শব্দের অর্থ বড় কিংবা সমর্থ হইতেছে; এবং ঋগ্বেদে অন্য যে দুই স্থানে এই শব্দ আসিয়াছে (ঋ. ১০. ২৭. ১, ৪) তথায় সায়ণাচার্য্যও উহার এই অর্থই করিয়াছেন। পঞ্চদশীতে (চিত্র. ১২৯. ১৩০) তুচ্ছ এই শব্দ মায়ার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে (নৃসিং. উত্ত. ৯ দেখ), সুতরাং আভুর অর্থ তুচ্ছ না হইয়া 'পরব্রহ্ম'ই হইতেছে। 'সর্ব্বং আঃ ইদম্' এই স্থানে আঃ (অ + অস্) অস্ ধাতুর ভূতকালের রূপ; তাহার অর্থ 'আসীৎ'।

সৎও নহে অসৎও নহে" (গী. ১৩, ১২)। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত মূলারম্ভে যদি অন্য কিছুই ছিল না তবে "আরম্ভে জল, অন্ধকার, বা আভু ও তুচ্ছ ইহাদের দ্বন্দ্ব ছিল" ইত্যাদি যে বর্ণনা বেদেতে আছে তাহার ব্যবস্থা কি হইবে? তাই, তৃতীয় ঋকে ঋবি বলিতেছেন যে, জগতের আরম্ভে অন্ধকার ছিল কিংবা অন্ধকারে আবৃত জল ছিল, কিংবা আভু (ব্রহ্ম) ও তাঁহার আচ্ছাদনকারী মায়া (তুচ্ছ) এই দুই প্রথম হইতেই ছিল ইত্যাদি, ঐ সমস্ত সেই সময়েই যখন একমাত্র মূল পরব্রহ্মের তপমাহাত্ম্যে তাঁহার বিবিধ রূপে বিস্তার হইয়াছিল—এই বর্ণনা একেবারে মূলারম্ভের স্থিতিবিষয়ক নহে। এই ঋকে 'তপ' শব্দের দ্বারা মূল ব্রহ্মের জ্ঞানময় বিশেষ-শক্তি বিবক্ষিত হওয়ায় তাহার বর্ণনা চতুর্থ ঋকে করা হইয়াছে (মুং. ১. ১. ৯ দেখ)। "এতাবান্ অস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ" (ঋ. ১০. ৯০. ৩.) এই ন্যায় অনুসারে সমস্ত জগৎই যাঁহার মহিমা, সেই মূল দ্রব্য যে এই সমস্তের অতীত, সমস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন, ইহা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু দৃশ্য বস্তু ও দ্রষ্টা, ভোক্তা ও ভোগ্য, আচ্ছাদক ও আচ্ছাদ্য, অন্ধকার ও আলো, মৃত্যু ও অমৃত ইত্যাদি সমস্ত দ্বৈতকে এই প্রকার পৃথক করিয়া এক অমিশ্র চিদ্রূপী, অসাধারণ পরব্রহ্মই মূলারম্ভে ছিলেন ইহা নির্দ্ধারণ করিলেও যখন ইহা বুঝাইবার সময় আসিয়াছে যে, এই অনির্ব্বাচ্য নির্গুণ একমাত্র এক তত্ত্ব হইতে আকাশ, জল প্রভৃতি দ্বন্দ্বাত্মক নশ্বর সগুণ নামরূপাত্মক বিবিধ সৃষ্টি কিংবা এই জগতের মূলভূত ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি কিরূপে উৎপন্ন হইল, তখন তো আমাদের উল্লিখিত ঋষিকেও মন, কাম, অসৎ ও সৎ এইরূপ দ্বৈতের ভাষাই প্রয়োগ করিতে হইয়াছে; এবং শেষে ঋষি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, এই প্রশ্ন মনুষ্যের বুদ্ধির সীমার বাহিরে। চতুর্থ ঋকে মূল ব্রহ্মকেই 'অসৎ' বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহার অর্থ "কিছু নাই" ইহা গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কারণ দ্বিতীয় ঋকেই 'তাহা আছে' এইরূপ স্পষ্ট বিধান আছে। শুধু এই সূক্তে নহে, কিন্তু অন্যত্রও দৃশ্য জগতের সহিত যজ্ঞের উপমা দিয়া এই যজ্ঞ করিবার ঘৃত, সমিধ প্রভৃতি সামগ্রী প্রথমে কোথা হইতে আসিল (ঋ, ১০. ১৩০, ৩)? কিংবা গৃহের দৃষ্টান্ত লইয়া মূল এক নির্গুণ হইতে চক্ষুর প্রত্যক্ষগোচর আকাশ পৃথিবীর এই বৃহৎ অট্টালিকা গঠন করিবার কাষ্ঠ (মূল প্রকৃতি) কোথা হইতে মিলিল?—কিংস্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ. এইরূপ ব্যবহারিক ভাষা স্বীকার করিয়াই ঋগ্বেদ ও বাজসনেয়ীসংহিতার কঠিন বিষয়সমূহের বিচার এই প্রকার প্রশ্ন দ্বারা করা হইয়াছে (ঋ. ১০. ৩১, ৭; ১০. ৮১. ৪; বাজ. সং ১৭. ২০)। সেই অনির্ব্বাচ্য একমাত্র এক ব্রহ্মেরই মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার কাম রূপী তত্ত্ব কোন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বস্ত্রের সূত্রের ন্যায় কিংবা সূর্য্যালোকের ন্যায় তাহারই শাখা বাহির হইয়া নীচে উপর চারিদিকে প্রসারিত হইয়া সৎএর সমস্ত বিস্তার হইয়াছে অর্থাৎ আকাশ পৃথিবী-রূপ এই বৃহৎ আট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, উপরোক্ত সূক্তের চতুর্থ ও পঞ্চম ঋকে (বাজ. সং. ৩২, ১৪ দেখ) এইরূপ যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা এই প্রশ্নের বেশী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। এই সূক্তের অর্থও উপনিষদে আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে—"সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।" (তৈ. ২. ৬; ছান্দ. ৬, ২. ৩)—সেই পরব্রহ্মেরই বহু হইবার ইচ্ছা হইল—(বৃ. ১. ৪ দেখ); অথর্ব্ববেদেও এইরূপ বর্ণনা আছে যে, এই সমস্ত দৃশ্য জগতের মূলভূত দ্রব্য হইতেই সর্ব্ব প্রথমে 'কাম' উৎপন্ন হইল, (অথর্ব্ব. ৯. ২. ১৯)। কিন্তু এই সূক্তের বিশেষত্ব এই যে, নির্গুণ হইতে সগুণের, অসৎ হইতে সৎ-এর, নির্দ্বন্দ্ব হইতে দ্বন্দ্বের কিংবা অসঙ্গ হইতে সঙ্গের উৎপত্তির প্রশ্ন মানব বুদ্ধির অগম্য বলিয়া সাংখ্যের ন্যায় কেবলমাত্র তর্কের বশীভূত হইয়া মূলপ্রকৃতিকেই বা তাহার ন্যায় অন্য কোন তত্ত্বকে স্বয়ংভূ ও স্বতন্ত্র মানা হয় নাই; কিন্তু এই সূক্তের ঋষি বলিতেছেন যে, "যাহা বুঝা যায় নাই, স্পষ্ট বল যে তাহা বুঝা যায় নাই; কিন্তু সেই জন্য শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারাও আত্মপ্রতীতির দ্বারা অবধারিত অনির্ব্বাচ্য ব্রহ্মের যোগ্যতাকে দৃশ্য জগৎরূপ মায়ার যোগ্যতার সহিত সমান বুঝিও না, এবং পরব্রহ্মসম্বন্ধে অদ্বৈত বুদ্ধিও ছাড়িয়া দিও না"। তাছাড়া, ইহা দেখিতে হইবে যে, প্রকৃতিকে এক স্বতন্ত্র ত্রিগুণাত্মক ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মানিলেও তাহাতে জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য বুদ্ধি (মহান্) বা অহঙ্কার প্রথমে কি করিয়া উৎপন্ন হইল, এই প্রশ্নের উত্তর তো দেওয়াই হয় নাই। এবং এই দোষ যখন কিছুতে এড়ানো যায় না তখন প্রকৃতিকে আবার স্বতন্ত্র বলিয়া মানিলেই বা কি লাভ? মূল ব্রহ্ম হইতে সৎ প্রকৃতি অর্থাৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা জানা যায় না এইটুকুই বল। ইহার জন্য প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া মানিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। মানববুদ্ধির কথা দূরে থাক্, সৎএর উৎপত্তি কিরূপে হইল, দেবতারাও তাহা জানিতে পারেন না। কারণ দেবতারাও দৃশ্য জগৎ আরম্ভ হইবার পর উৎপন্ন হওয়ায়, আগেকার ব্যাপার তাঁহারা কি প্রকারে জানিবেন? (গী. ১০. ২ দেখ)। কিন্তু দেবতাদের অপেক্ষাও হিরণ্যগর্ভ অনেক প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ এবং ঋগ্বেদেই উক্ত হইয়াছে যে, একমাত্র তিনিই আরম্ভে "ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" (ঋ. ১০. ১২১. ১)—সমস্ত জগতের 'পতি' অর্থাৎ 'রাজা' বা অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তিনি এই বিষয় জানিতে পারিবেন না কেন? এবং তিনি যদি জানিয়া থাকেন, তবে উহা দুর্ব্বোধ কেন বলিতেছ, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাই, এই সূক্তের ঋষি প্রথমে তো উক্ত প্রশ্নের এই ঔপচারিক উত্তর দিলেন যে,—"হাঁ; তিনি এই বিষয় জানিয়া থাকিবেন"; কিন্তু আপন বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মদেবেরও জ্ঞানের গভীরতা দ্রষ্টা এই সূক্তে ঋষি আশ্চর্য্য হইয়া শেষে সভয়ে তখনই আবার বলিয়াছেন যে, "অথবা নাও জানিতে পারেন! কে বলিবে? কারণ তিনিও সৎএর শ্রেণীতে পড়ায়, 'পরম' বলা হইলেও 'আকাশের' মধ্যেই অবস্থিত জগতের সৎ, অসৎ, আকাশ ও জল ইহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান এই অধ্যক্ষের কোথা হইতে আসিবে?" কিন্তু এক 'অসৎ' অর্থাৎ অব্যক্ত ও নির্গুণ দ্রব্যেরই সহিত বিবিধ নামরূপাত্মক সৎ-এর অর্থাৎ মূলপ্রকৃতির সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইল ইহা বুঝা না গেলেও মূলব্রহ্ম যে একই সে বিষয়ে ঋষি নিজের অদ্বৈত বুদ্ধিকে অপসারিত হইতে দেন নাই!

এবিষয়ে এই একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ যে, অচিন্ত্য বস্তুর গহন-অরণ্যে মানব-বুদ্ধি, সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ও নির্ম্মল প্রতিভার বলে সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া সেখানে তর্কের অতীত বিষয় যথাশক্তি কেমন নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। ঋগ্বেদে যে এই সূক্ত পাওয়া যায় ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য ও গৌরবের! বিষয় এই সূক্তান্তর্গত বিষয়-সম্বন্ধে পরে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ (তৈত্তি. ব্রা. ২, ৮. ৯), উপনিষদে, এবং তাহার পরে বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থে সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হইয়াছে। এবং আধুনিককালে পাশ্চাত্য দেশেও কাণ্ট প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানী কর্ত্তৃক ঐ বিষয়েরই অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মনে রেখো যে, এই সূক্তের ঋষির শুদ্ধ বুদ্ধিতে যে পরম সিদ্ধান্তের স্ফুরণ হইয়াছে সেই সিদ্ধান্তই পরে প্রতিপক্ষকে বিবর্ত্তবাদের ন্যায় সমুচিত উত্তর প্রদান করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে—দৃঢ়, স্পষ্ট কিংবা তর্কদৃষ্টিতে নিঃসন্দেহ ইহার পরে এখনও কেহ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই, সমর্থ হইবে বলিয়া অধিক আশাও নাই।

অধ্যাত্মপ্রকরণ সমাপ্ত হইল! এক্ষণে অগ্রে চলিবার পূর্ব্বে 'কেসরী'র অনুকরণে যে রাস্তা ধরিয়া এতক্ষণ চলা গেল তাহার প্রতি আর একবার কটাক্ষপাত করা উচিত। কারণ, এইরূপ সিংহাবলোকন না করিলে, প্রকৃত বিষয়ানুসন্ধান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্য পথে বিচরণ করিবার সম্ভাবনা থাকে। গ্রন্থের আরম্ভে পাঠককে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া কর্ম্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ সংক্ষেপে বলিয়া তৃতীয় প্রকরণে কর্ম্মযোগশাস্ত্রই গীতার যে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা দেখান হইয়াছে। অনন্তর, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রকরণে সুখদুঃখ বিচারপূর্ব্বক প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রের আধিভৌতিক উপপত্তি একদেশদর্শী ও অপূর্ণ, এবং আধিদৈবিক উপপত্তি খঞ্জ। আবার কর্ম্মযোগের আধ্যাত্মিক উপপত্তি বলিবার পূর্ব্বে, আত্মা কি তাহা জানিবার জন্য ষষ্ঠ প্রকরণেই প্রথমে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার এবং পরে সপ্তম ও অষ্টম প্রকরণে সাংখ্যশাস্ত্রান্তর্গত দ্বৈতমতের ক্ষরাক্ষর বিচার করা হইয়াছে। এবং আবার এই প্রকরণে আসিয়া আত্মার স্বরূপ কি এবং পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে দুইদিকে একই অমৃত ও নির্গুণ আত্মতত্ত্ব কিরূপে ওত-প্রোত ও পরিপূর্ণ হইয়া আছে তাহার নিরূপণ করিয়াছি। এইপ্রকার এখানে ইহাও নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে যে, সর্ব্বভূতে একই আত্মা—এই সমবুদ্ধিযোগ সম্পাদন করিয়া তাহা সর্ব্বদাই জাগ্রত রাখাই আত্মজ্ঞান ও আত্মসুখের পরাকাষ্ঠা; এবং আরও বলা গিয়াছে যে, নিজের বুদ্ধিকে এইরূপ শুদ্ধ আত্মনিষ্ঠাবস্থায় আনাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অর্থাৎ নরদেহের সার্থকতা বা মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। এই প্রকার মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরমসাধ্যের নির্ণয় হইলে পর, সংসারে আমাদের যে ব্যবহার করিতে হয় তাহা কি ভাবে করিতে হইবে, কিংবা এই ব্যবহার যে শুদ্ধবুদ্ধিতে করিতে হইবে তাহার স্বরূপ কি—এই যে কর্ম্মযোগশাস্ত্রের মুখ্য প্রশ্ন তাহারও মীমাংসা সহজ হইয়া পড়ে। কারণ এই সমস্ত ব্যবহার পরিণামে ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ সমবুদ্ধির পোষক কিংবা অবিরোধীভাবে যে করিতে হইবে ইহা আর এক্ষণে বলিতে হইবে না। কর্ম্মযোগের এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মযোগের প্রতিপাদন কেবল ইহাতেই শেষ হয় না। কারণ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন নামরূপাত্মক জগতের ব্যবহার আত্মজ্ঞানের বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা জ্ঞানীপুরুষের ত্যাগ করা উচিত; এবং ইহা যদি সত্য হয়, তবে জগতের সমস্ত ব্যবহার ত্যাজ্য নির্দ্ধারিত হইবে কর্ম্মাকর্ম্ম এবং শাস্ত্রও নিরর্থক হইবে! তাই এই বিষয়ের নির্ণয় করিবার জন্য কর্ম্মের নিয়ম কি, ও তাহার পরিণাম কি, অথবা বুদ্ধি শুদ্ধ হইলেও ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম্ম কেন করিতে হইবে ইত্যাদি প্রশ্নেরও কর্ম্মযোগশাস্ত্রে অবশ্য বিচার করা আবশ্যক। ভাগবদ্গীতাতে তাহার বিচার করা হইয়াছে। সন্ন্যাসমার্গীয় লোকেরা এই প্রশ্নের কোন গুরুত্ব উপলব্ধি না করায় ভগবদ্গীতার বেদান্ত বা ভক্তিবিষয়ক নিরূপণ শেষ হইতে না হইতেই, তাঁহারা আপন পুঁথি গুটাইতে প্রায় সুরু করিয়া দেন। কিন্তু সেরূপ করিলে আমার মতে গীতার মুখ্য অভিপ্রায়ের প্রতি উপেক্ষা করা হয়। এইজন্য ভগবদ্গীতায় উক্ত প্রশ্নের কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এক্ষণে ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিব।

ইতি নবম প্রকরণ সমাপ্ত।

আসামের নদ-নদী।

(শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী—আসাম পরিব্রাজক)

আসাম প্রদেশে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ নদ-নদী প্রবাহিত। যোগিনী তন্ত্র মতে এই প্রদেশের কামরূপ জেলায় একশত নদী বিদ্যমান ছিল। সেখানে উল্লেখ আছে, "নদীশতসমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্"। কালপ্রভাবে এখানকার বহুসংখ্যক নদী বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তদ্বিষয়ে বৈচিত্র্য কি? এই প্রদেশের দক্ষিণদিকের নদীগুলি স্রোতঃশীলা নহে। উত্তরদিকের নদীসমূহ হইতে বন্যা আসিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ ও দক্ষিণদিকের নদীগুলিকে পরিপূর্ণ করে। এ কারণ জ্যৈষ্ঠমাস না হওয়া পর্য্যন্ত জলের স্রোত অধিক হয় না।

আসাম প্রদেশে যে সকল স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নে প্রধান কতকগুলির নামোল্লেখ করা হইল :—

১। অগ্রাণ, ২। আলী, ৩। করতোয়া, ৪। করঙ্গী, ৫। কল্যাণী, ৬। কাকদোঙ্গা, ৭। কালদিয়া, ৮। কপিলি, (Kapili) ৯। কৃষ্ণাই, ১০। কুলশী, ১১। কুণ্ডলপাণি, ১২। ককিলা, ১৩। খোয়াই (Khowi) ১৪। গঙ্গাধর, ১৫। ঘিলিধারী, ১৬। চম্পাবতী, ১৭। চাউলখোয়া, ১৮। জাজী (Jhangi) ১৯। জাতিঙ্গা, ২০। জিরাই, ২১। জিনারী, ২২। জিনঝিরাম, ২৩। জংলুং, ২৪। জগদুয়ার, ২৫। জিয়াধনশিরী, ২৬। ঝানঝি, ২৭। টাঙ্গনমারী, ২৮। টিপাই, ২৯। টিয়ক, ৩০। টেঙ্গাপাণি,

৩১। ডিবাং, ৩২। ডিচাং, ৩৩। ডিচৈ, ৩৪। ডিক্রু ৩৫। ত্তকি, ৩৬। ত্তিপকাই, ৩৭। ত্তিঙ্গরাই, ৩৮। ত্তেঙ্গাপানু, ৩৯। তুরঙ্গ, ৪০। দৈয়াং, ৪১। দিজু, ৪২। দিখৌ (দিখু), ৪৩। দিমৌ, ৪৪। দিজমুর, ৪৫। দিজমা, ৪৬। দিগরু (সোনাপুরীয়া), ৪৭। দিসই ৪৮। দিছাং, ৪৯। দিক্রুং, ৫০। দিহিং, ৫১। দুধ-নাই, ৫২। দেওপাণি, ৫৩। ডকাবনজুলি, ৫৪। দ্বারিকা, ৫৫। ধনশিরি (ধানশ্রী), ৫৬। ধোল-হাড়ী, ৫৭। নোনাই, ৫৮। নদিহিং (Noadihing) ৫৯। পরুয়া, ৬০। পাগলামানস, ৬১। ব্রহ্মপুত্র, ৬২। বরাকর (বরাক), ৬৩। বড়নদী, ৬৪। বড়পাণি, ৬৫। বলদি, ৬৬। বাটা, ৬৭। বামনাই, ৬৮। বিহানীমুখ, ৬৯। বুড়ীদিহিং, ৭০। বেগা-পাণি, ৭১। ভরলু, ৭২। ভেড়ামোহনা, ৭৩। ভোলা, ৭৪। ভৈরবী, ৭৫। মন্থ, ৭৭। মানস, ৭৮। মাতঙ্গ, ৭৯। মিচা, ৮০। যমুনা, ৮১। যন্ত্র-কাটা, ৮২। রঙ্গা, ৮৩। লথাইতারা, ৮৪। লক্ষ্মী, ৮৫। লাঙ্গাই (Langai) ৮৬। শিলাং, ৮৮। শিলপা, ৮৯। সজং, ৯০। সরল ভাঙ্গা, ৯১। সরু-মানস, ৯১। সিংগ্রা, ৯২। সিঙ্গলা, ৯৩। সিস্থু, ৯৪। সোনকোষ, ৯৫। সোনাই, ৯৬। সোবন-শিরি (স্বুবর্ণশ্রী) ৯৭। সোমেশ্বরী, * ৯৮। হরি-পাণি বাহাতবাটীয়া, ৯৯। কাকজান, ১০০। গরুয়া, ১০১। ছিগা, ১০২। টোকোলাই, ১০৩। নামডাং ১০৪। মিত্তং, ১০৫। মেলং, ১০৬। মুদৈজান, প্রভৃতি।

ব্রহ্মপুত্র।

আসামে প্রবাহিত নদ-নদীগুলির মধ্যে "ব্রহ্মপুত্র" সর্ব্বপ্রধান। এই নদীর উৎপত্তি বিবরণ কালিকাপুরাণে উক্ত আছে। ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের উত্তর পার্শ্বস্থ মানসসরোবর নামক হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া তিব্বতের রাজধানী লাসার নিকটস্থ হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন দিহিং নদীর সহিত মিলিত হইয়া পরশুরাম কুণ্ডে পতিত হই-য়াছে। অনন্তর উহা শদীয়া নগর হইতে ৯ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়া এবং ডিব্রুগড় হইতে ৩ মাইল উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়া আসাম প্রদে-শের শিবসাগর, কামরূপ প্রভৃতি জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। অতঃপর উহা পশ্চিমদিকে আসিয়া গারোপর্ব্বতমালা ঘুরিয়া গিয়া বঙ্গদেশে মেঘনা ও পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। মানসসরোবর হইতে লাসা পর্য্যন্ত এই প্রবাহিত নদ "সাম্পো" নামে অভিহিত।

ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন নাম অনেক ছিল, তন্মধ্যে এই কয়টী প্রধান :—হ্লদিনী, অস্তিবলী, থাটাই, পছি-লেহ, কামছ, ব্রথিছায়ান, ধৌনী, থামাউন, ছিয়ামে, ডুব্রৈনছ, কয়হতিকা, কর, ছেরছিলিহ কায়া প্রভৃতি।

Captain John Bryan Newfirlle ১৮২৪ খৃঃ অব্দের এবং Lieut R. Wilcox ১৮৩২ খৃঃ অব্দের Asiatic Researches নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় ব্রহ্মপুত্রকে "লোহিতনদী" বলিয়া স্পষ্ট-ভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মধ্য-ভারতের পশ্চিম "মালোয়া"র (সিন্ধিয়া রাজ্যান্তর্গত) মাণ্ডাসর নামক স্থানে গুপ্তবংশীয় মহারাজ যশোধর্ম্মণের প্রস্তরস্তম্ভলিপি (Stone pillar inscription) সমূহের মধ্যে এই "লৌহিত্য নদী"র নাম পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ আছে :—

"আ লৌহিত্যোপকণ্ঠাত্তালবনগহনোপত্যকাদা মহেন্দ্রাদা।
গঙ্গাশ্লিষ্টসানোস্তুহিনশিখরিণঃ পশ্চিমাদাপয়োধেঃ॥"

—Corpus Ins. Indi, Vol III, P. 146.

গঙ্গা ও সিন্ধুনদের ন্যায় "ব্রহ্মপুত্র" জলসেচন কার্য্যে (irrigation) উপকারে না আসিলেও প্রতিবৎসর বন্যার সময় ইহার তীরদেশস্থ ও সমীপবর্ত্তী স্থান সকল পলিতে দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় ঐ সকল স্থানে ধান্য, সর্ষপ, পাট প্রভৃতি শস্য আশানুরূপ উৎপন্ন হয়। পুণ্যনীর ব্রহ্মপুত্র নদ আসামদেশকে শস্যশালী করিয়া তুলিয়াছে। এই নদের উভয়পার্শ্বে পাহাড় পর্ব্বত; এই সকল পাহাড় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদীগুলি ব্রহ্মপুত্র নদে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ ডিব্রুগড়, বিশ্বনাথ, শিলঘাট (কলিয়াবর), তেজপুর, গৌহাটী, পলাশবাড়ী * নগরবেড়া, হাতিমোড়া, গোয়ালপাড়া, যোগীঘোপা বিলাসপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি স্থান বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বর্ষাকালে এই নদে শদিয়া পর্য্যন্ত ষ্টিমার যাতায়াত করে, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত যায়। ধুবড়ী হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া ষ্টিমার যোগে ডিব্রুগড় যাইতে হইলে উহার তীরস্থ যে সকল প্রধান বাণিজ্য-বন্দর অতি-ক্রম করিতে হয় তাহাদের নাম যথা :—ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, রাঙ্গামাটী (মঙ্গলদৈ যাত্রী) তেজপুর, শিলঘাট (নগাঁওযাত্রী), দিখুমুখ, দিবাং-মুখ (শিবসাগর যাত্রী), ডিহিংমুখ, ডিব্রুমুখ (ডিব্রু-গড় যাত্রী)। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে ও বুড়িদিহিং নদীর দক্ষিণস্থ ভূভাগে মরণজাতিরা বসবাস করে। আসামীরা ইহাদিগকে মতক বা মোয়ামরিয়া বলে।

(ক্রমশঃ)

* সোমেশ্বরী—গারোপাহাড় জেলায় এই নদীর তীর-দেশ থাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড় জেলায় "হরিণদী" পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত চূণা পাথরের খনি আছে।

* পলাশবাড়ী—এখানে মাড়োয়ারী সওদাগরেরা পার্ব্বত্য লোকদিগের নিকট হইতে কার্পাস, লাক্ষা, সরিষা ধান্য, চাউল, রেশম, পাট প্রভৃতি ক্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান করিয়া থাকে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০

৯১৮ সংখ্যা — ১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

মামেকং শরণং ব্রজ।

নবযুগ যে নেমে এসেছে আর পুরাতন যুগ যে চলে গেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের ঋষিরা বলে গেছেন যে মহাসমর মহামারী প্রভৃতি কোন-না-কোন সূত্রে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের বিনাশই যুগপরিবর্ত্তনের সূচনা করে দেয়। বাস্তবিক, ওরকম লক্ষ লক্ষ লোক যে কোন দেশে মরবে, সেই দেশেই তো ভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন না হয়ে যেতে পারে না। ভাবেরই পরিবর্ত্তনে যুগেরও পরিবর্ত্তন হয়। এবারে একা মহাসমর নয়, একা মহামারী নয়, আর একা করালমূর্ত্তি মহাদুর্ভিক্ষ নয়, কিন্তু এই তিনটী মিলেজুলে কেবল এদেশে নয়, কেবল ইউরোপে নয়, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কোটী কোটী লোকের ধ্বংস সাধন করেছে। এতেও যদি মানুষের ভাবের পরিবর্ত্তন না হয়, প্রাচীন যুগ চলে গিয়ে নবযুগের আবির্ভাব না হয়, তবে আর হবে কিসে? সমস্ত পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘরে ঘরে যখন দুঃখশোকের হাহাকার জেগে উঠল, অশান্তি যখন পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ফেল্ল, তখনই জগৎবাসীর প্রাণের ভিতরে অনুসন্ধান জেগে উঠল যে কি উপায়ে সেই অশান্তির প্রতিবিধান করা যায়, কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করলে জগতে এ রকম সর্ব্বব্যাপী দুঃখশোক না আসতে দেবার ব্যবস্থা করা যায়। এই অনুসন্ধান থেকেই নবযুগের উৎপত্তির সূত্রপাত হোল। লোকেরা বুঝতে পারল, দেখতে পেল যে, প্রাচীন যুগের কুসংস্কার, ধর্ম্মের নামে নানাবিধ অধর্ম্ম প্রভৃতি সঞ্চিত হোতে হোতে পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছিল, মানুষের বাসস্থানের অনুপযুক্ত করে তুলেছিল। তারা বুঝতে পারল যে, কুসংস্কার সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সত্যকার সরল সবল ধর্ম্মকে না ধরলে, ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর না করলে এই দুঃখশোকের মূল দূর হবে না, অশান্তির শান্তি হবে না। এই ভাবের উপরেই নবযুগের আবির্ভাব হোল। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্য ভারতভূমিতে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অস্ত্রের ঝনঝনার ভিতর থেকে যে সত্যবাণী জাগ্রত হয়ে ভারতে নবযুগের সূচনা করিয়ে দিয়েছিল, আজ হাজার হাজার বৎসর পরে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আর এক মহাসমরে মহা আর্ত্তনাদের ভিতর থেকে সেই সত্যবাণী জাগ্রত হয়ে নবযুগের শান্তিবার্ত্তার সূচনা করে দিয়েছে। সেই সত্যবাণী হচ্ছে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ কর। নবযুগের ভাবসাগরের মন্থনে যে সমস্ত সত্যবাণী উঠেছে, সে সমুদয়ের কেন্দ্র হচ্ছে ঐ এক কথা—ভগবানে নির্ভর কর—একান্ত নির্ভর কর, মানুষের উপর ষোল আনা নির্ভর কোরো না।

এবারে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নবযুগের উৎপত্তি হোলেও আমাদের দেশেও তার আঘাত বেশ অনুভব করা গেছে—এখানেও আমরা সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ এই সত্যবাণীই ভাল করেই শুনতে পেয়েছি। এই বাণী যদি গ্রহণ করি, আত্মস্থ করতে পারি, তবেই রক্ষা পেলুম; আর যদি এই বাণী পরিত্যাগ করি, তবেই প্রাচীন যুগের বিনাশের ঘূর্ণীতে আপনাকে বলিদান দিতে হবে। প্রাচীন যুগের মূল কথা হচ্ছে মানুষের উপর অতিরিক্ত নির্ভর। রাজনীতি বল, সমাজ বল, ধর্ম্ম বল, সকল বিষয়েই প্রাচীনযুগের লোকেরা মানুষের কথার উপর অতিরিক্ত নির্ভর করত। নিজের বিবেক কি বলে, বুদ্ধি কিসের সঙ্গে সায় দেয়, সে সমস্ত ভাববার বড় একটা লোকদের অবসরও ছিল না, আর বড় একটা প্রবৃত্তিও ছিল না। তার ফলে লোকেরা বড়ই পরবশ হয়ে উঠে-ছিল। এই পরবশ্যতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী নিজে-রই অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিল। এই অতিরিক্ত পরবশ্যতা যখন রাজনীতিকে স্পর্শ করল, তখনই মহাসংগ্রাম সম্ভব হোল। জর্ম্মনিতে রাজনীতিক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরবশ্যতার চর্চ্চা হয়ে-ছিল। তাই সেখানে লোকদের মন এমনি অবশ হয়ে গিয়েছিল যে তারা ন্যায় অন্যায় ভাববার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। সম্রাট বল্লেন যে যুদ্ধ করতে হবে, আর অমনি লোকেরা অন্ধ মেষ-পালের মতো সেই আদেশ শিরোধার্য্য করে মহা-সমরের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে কিছুমাত্র দ্বিধা করল না—ভেবে দেখল না যে ন্যায় বা অন্যায় কোনটীকে বজায় রাখবার জন্য লড়াই করতে যাচ্ছে। তার পর যেই নবযুগের অরুণালোকে উদ্ভাসিতচিত্ত হয়ে লোকেরা বুঝল যে একটী লোকের আদেশে অন্যায়কে বজায় রাখবার জন্য লড়াই করছিল, অমনি যেন জাদুকরের প্রভাবে অত বড় লড়াইটা হঠাৎ থেমে গেল। তখনই ন্যায়-ধর্ম্মের প্রসারের পথ আপনাআপনি চারিদিকে উন্মুক্ত হয়ে গেল। এ দেশেও রাজনীতিক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরবশ্যতা যখন দেশকে অধোগতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, অমনি ভগবান এই দরিদ্র ভারতের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে শাসনসংস্কারের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন। যে শাসনসংস্কার যে পরিমাণে আমাদিগকে আত্মনির্ভর আর সেই সঙ্গে ভগবানের উপর নির্ভর শিক্ষা দেবে, সেই শাসনসংস্কারকে সেই পরিমাণে আমরা আদরের সঙ্গে গ্রহণ করব।

প্রাচীন যুগে সমাজের মধ্যেও এই অতিরিক্ত পরবশ্যতা প্রবেশ করে স্বদেশ বিদেশ সকল দেশে-রই সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছিল। ইহারই ফলে পাশ্চাত্যভূখণ্ডে শ্রেণীভেদ প্রভৃতির নামে নানাবিধ কুপ্রথা স্থায়িত্ব লাভের জোগাড় করছিল, আর সমাজশক্তি শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার উপক্রম করছিল। কিন্তু ভগবান পাশ্চাত্যদের শরীরে মনে বল দিয়েছেন, তাই তারা সেই ধ্বংসের মুখ থেকে আত্মরক্ষা করে নব-যুগের নূতন আলোকে সমাজকে নূতনভাবে গড়বার চেষ্টা করছে। এই পরবশ্যতার ফলেই এদেশেও বজ্রের আঁটন ফস্কাগিরো-গোছের জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথাসমূহের অতিমাত্র বাঁধাবাঁধি সমাজকে যে কি রকম দ্রুতগতিতে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে, তা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্র একটু ধীরভাবে আলোচনা করলেই বুঝতে পারবেন। যে কোন প্রথাই বল না কেন, তার বাঁধাবাঁধির একটা সীমা চাই। সেই প্রথা যেটুকু ন্যায্য, যেটুকু দরকারী, সেইটুকুই রাখা উচিত; তার অতিরিক্ত রাখতে গেলেই সমাজশক্তিকে বিপন্ন করা হয়। মানুষের চোখের দিকে না দেখে ভগবানের মঙ্গলদৃষ্টির উপর নিজে-দের দৃষ্টি রেখে যে প্রথার যতটুকু ভাল তাই রাখ-বার চেষ্টা করলে তবেই আমাদের মঙ্গল। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখেও যদি আমরা চক্ষু বুজে থাকি, ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর কল্লতে না পারি, তবে আজ হোক আর কিছু বিলম্বে হোক, আমাদের বিনাশ নিশ্চিত।

ধর্ম্মের মধ্যেও পরবশ্যতা অতিরিক্ত মাত্রায় ঢুকে আসল ধর্ম্মকে ঢেকে ফেলেছিল। তারই ফলে মধ্যবর্ত্তীবাদ, গুরুবাদ, পৌরোহিত্যের বাড়া-বাড়ি, ধর্ম্মের আড়ম্বর প্রভৃতি মানুষের মধ্যে ঢুকে মনুষ্যত্বকে একেবারে শুকিয়ে দিয়েছিল। ধর্ম্মের আসন স্বার্থ অধিকার করে বসেছিল। অর্থ মান সম্পদ প্রভৃতি লাভের জন্য মানুষ পাগল হয়ে যাচ্ছিল। অর্থ প্রভৃতি লাভের অনুকূলে যে রাজ-

নীতি যে সমাজনীতি মন্ত্র প্রচার করতে লাগল, সেই রাজনীতি সেই সমাজনীতি ধর্ম্ম থেকে শত-ক্রোশ দূরে থাকলেও ধর্ম্ম বলে গৃহীত হতে লাগল। ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড থেকে সরে যেতে লাগলেন। তারই ফলে পাশ্চাত্যদের সর্ব্বাঙ্গীন পতন হোতে লাগল। এক সময়ে যেমন প্রাচ্য-ভূখণ্ড অনেক কাজ করে নিয়েছে, অনেক ধর্ম্মতত্ত্ব আবিষ্কার করেছে, সেই রকম এখন পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডের অনেক কাজ বাকী আছে, অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করতে বাকী আছে, তাই ভগবান পাশ্চাত্যভূখণ্ডকে বাঁচাবার জন্য পতনের শেষস্তরে পৌঁছতে না পৌঁছতে রুদ্রমূর্ত্তিতে তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে অধর্ম্মের পরাভব সাধন করে ধর্ম্মের দীপ্তদীপ জগতের সামনে আবার ধারণ করলেন। পাশ্চাত্যদের চিন্তাস্রোত এতটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, যে দর্শন শাস্ত্রের জন্ম প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে দেখাবার জন্য, সেই দর্শনশাস্ত্রও সত্য-ধর্ম্মকে ছেড়ে দিয়ে নানা উপায়ে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে আত্মনিয়োগ করেছিল। নবযুগের বিমল সত্যভাবের কাছে কি এই সমস্ত মিথ্যাভাব দাঁড়াতে পারে? সংগ্রামের আঘাত যেই অসহ্য হয়ে উঠল, অমনি নবযুগের বিমল বায়ু জনসমাজে প্রবেশ করল; সকলেরই প্রাণ থেকে একই কথা উঠতে লাগল যে, 'আমরা এ সমস্ত মিথ্যা ধর্ম্ম চাই নে—এ সমস্ত আমাদের প্রাণে শান্তি দিতে পারছে না; আমরা চাই সরল ও সবল ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম আমাদের সরল পথে ভগবানের আসনতলে পৌঁছিয়ে দিতে পারে'। সকলেই ভগবানকে একমাত্র সহায় বলে জানতে পারল। অতি পুরাকালে যেমন প্রাচীন ও নবীন যুগের আঘাত-সংঘর্ষণে এদেশে সকল সত্যের সার গায়ত্রীমন্ত্র উত্থিত হয়েছিল, তেমনি আজ পাশ্চাত্যদেশে দুই যুগের সংঘর্ষণে এই বাণীই উঠল—"সকল ধর্ম্ম ছেড়ে একমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ কর।"

এই মহাবাণী যখন এবারে পাশ্চাত্যভূখণ্ড গ্রহণ করেছে, তখন এ নিশ্চিত যে পাশ্চাত্যদেশ নিশ্চয়ই উদ্ধার পাবে। গীতাতে আমরা এই আশ্বাসবাণীই পাচ্ছি। গীতা বলছেন—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও, তাহলে আমিই সেই শরণাগতকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। এ আশ্বাসবাণী মিথ্যা নয়—খুবই সত্য।

পাশ্চাত্যদেশের মতো আমাদের দেশকেও ধর্ম্ম-বিষয়ে পরবশ্যতা একরকম গ্রাস করে রেখেছে। যে মহাবাণী আজ পাশ্চাত্যদেশের বলবিধান করতে উদ্যত, সেই মহাবাণী তো আমাদেরই দেশে সর্ব্ব-প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। তবে আমরা আজ ধর্ম্ম বিষয়ে এত দীনহীন হয়ে পড়েছি কেন? কারণ এই যে, আমরা সেই মহাবাণীর বিপরীত আচরণই করছি বল্লেও চলে। মহাবাণী বলছে সকল ধর্ম্ম ছেড়ে ভগবানের আশ্রয় লও, আর আমরা ভগবানকে ছেড়ে অন্য সকল ধর্ম্মকে বন্ধু বলে আলিঙ্গন করতে চাই। ধর্ম্ম—প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম তো একই, তবে "সকল ধর্ম্ম" ছাড়বার কথা বলার তাৎপর্য্য কি? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যে সকল ধর্ম্মপ্রতিরূপ বা ধর্ম্মের ছায়াকে ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করি তাদেরই উদ্দেশে সকল ধর্ম্ম ছাড়বার কথা বলা হয়েছে। সত্য ধর্ম্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম্ম বা ধর্ম্মপ্রতি-রূপকে ধরে আছি বলেই আমাদের মধ্যে গুরুবাদ, পৌরোহিত্যের বাড়াবাড়ি প্রভৃতি এসে দেশটাকে একেবারে নির্জীব করে ফেলেছে। উপযুক্ত লোককে গুরু করা মন্দ অথবা গৃহ্য অনুষ্ঠানসমূহের জন্য পুরোহিত লওয়া মন্দ সে কথা বলি না। কিন্তু যখন গুরুকে ভগবানের আসনে স্থান দেওয়া হয় অথবা পুরোহিতকে ছেড়ে কোনই ধর্ম্মকার্য্য হতে পারবে না বলে মনে করি, তখনই আমরা আসলে ধর্ম্মরাজ্যে সহস্রপদ নীচে নেমে গেলুম। তখনই আমাদের প্রাণের উপর অসাড়তার একটা আবরণ এসে পড়ল। আমাদের দেশের অবস্থা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা দেখাতে পারলেন, অমনি তাঁকে ভগবানবোধে পূজা করতে লাগলুম। ভাবলুম না যে জগতে আমার কাছে অতিপ্রাকৃত বোধ হলেও সমস্তই প্রাকৃত—অতিপ্রাকৃত বলে আসলে কিছুই নেই। দেশব্যাপী যেন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে যে কার গুরু ভগবান স্বয়ং। তার প্রমাণের জন্য দেখাতে হবে যে কে কতটা অতিপ্রাকৃত শক্তি বা জাদুগিরি দেখাতে পারেন। সেই রকম প্রতি পা ফেলব আর তার জন্য পুরো-

হিতকে ডাকব, এই রকম পৌরোহিত্যের বাড়াবাড়িটাও প্রকৃত ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হবার পরিপন্থী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতে আত্মনির্ভরের শক্তি একেবারে চলে যায়। তার ফলে প্রাকৃতিক নিয়মেই আমাদের আত্মা শক্তিচালনার অভাবে ক্রমে হীনতেজ হয়ে যায়।

নবযুগের সুবিমল বাতাসের হিল্লোল আজ আমাদেরও স্পর্শ করেছে। আমাদের উচিত প্রাচীন যুগের অতিরিক্ত পরবশ্যতার হাত থেকে মুক্তিলাভ করে আত্মনির্ভর এবং সেই সঙ্গে ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর করতে শিখি। আমাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে বলেই শ্রুতিস্মৃতি পুরাণতন্ত্রের দেশে দাঁড়িয়ে, কবীর নানক চৈতন্যদের রামপ্রসাদের দেশে দাঁড়িয়ে আজ বলতে হচ্ছে যে ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর আমাদের নূতন করে শিখতে হবে। মায়ের কোলে ছেলে দরকার হোলেই ছুটে যাবে, ছেলের যখন যা দরকার মায়ের কাছে চা'বে, ছেলের যাতে ভাল হবে মা তাই দেবেন, এ সব কথা আবার শিখতে হবে কি? কিন্তু উপায় নেই। আমাদের মনপ্রাণ জগন্মাতা থেকে এত দূরে সরে গেছে যে, তাঁর দিকে মনপ্রাণ ফিরিয়ে আনবার জন্য যত্ন চেষ্টা করতে হবে, সাধনা করতে হবে। এই পৃথিবীতেই দেখি, পিতা পুত্রে, মায়েছেলেতে, স্বামী-স্ত্রীতে কতনা পরস্পর নির্ভর করে; আর যিনি জগতের পিতামাতা, যিনি আমাদের প্রত্যেকের সখা, তাঁর উপর নির্ভর না করে যাব কোথায়? তাঁর উপর নির্ভর করে চলতে পারলেই আমরা নির্ভয় হতে পারব।

সমগ্র ভারতভূমিতে আবার সেই মহাবাণী জাগিয়ে তুলতে হবে—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। এই মহাবাণী আমাদের প্রাণের মধ্যে সত্যসত্য জাগিয়ে তুলতে পারলেই আমরা কেবল নির্ভয় হব না, আমরা সকল কার্য্যেই সফলকাম হব। গীতা ভগবানের এই আশ্বাসবাণী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, ভগবানের উপর যাঁরা একান্ত নির্ভরশীল হন, ভগবান তাঁদের সংসারভার নিজেই বহন করেন—"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং"। সংসারের কার্য্যে সফলকাম হব বলে তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে বলিনে, আর সেভাবে নির্ভর করতে গেলেও নির্ভর করতে পারব না; কিন্তু তাঁর উপর নির্ভর করে তাঁরই প্রিয়কার্য্য বলে সংসারের সকল কর্ম্ম করতে থাকলে আমরা নিশ্চয়ই সফলকাম হব—কারণ তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে যখন আমার ইচ্ছার যোগ হোল, তখন সে ইচ্ছার অপ্রতিহত বেগ কে প্রতিরুদ্ধ করতে পারে?

ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরশীল হওয়া উচিত; ধর্ম্মের যা কিছু ছায়া, ধর্ম্মের যা কিছু প্রতিরূপ, সমস্ত ছেড়ে দিয়ে একমাত্র তাঁরই পায়ের তলে পড়ে থাকা উচিত, তাঁরই কথা শুনে তাঁরই দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রেখে আমাদের চলা উচিত, তবেই আমরা নিজেরাও উন্নতির শিখরদেশে উঠতে পারব, বেদ-উপনিষদের ঋষিদের স্বদেশবাসী বলে গৌরব করতে পারব, আর ব্রাহ্মসমাজকে গৌরবান্বিত করে তুলতে পারব। এখন তো আমরা কেবল নামেমাত্র ব্রাহ্ম হয়ে আছি, আর সেই কারণে অন্যান্য যে সকল সমাজ সত্যধর্ম্মের পথে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের কাছে আজ আমরা অবনতমস্তক হয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছি। "ব্রাহ্ম" শব্দে মাত্র বিশেষ কোন মহিমা নেই—ব্রাহ্মের উপযুক্ত কার্য্যে ও ব্যবহারে আছে। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীমৎ বিজয় কৃষ্ণগোস্বামী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বতন আচার্য্য ও প্রচারকগণ ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরের বলে, স্বার্থের দিকে দৃষ্টিকে অন্ধ করে কার্য্যে ব্রতী হবার ফলে প্রচারকার্য্যে সফলকাম হয়েছিলেন আর ব্রাহ্মসমাজকে বড় করে তুলতে পেরেছিলেন। আমাদের সে নির্ভর কোথায়? আমরা প্রতি পদক্ষেপ করব, আর ভাবব যে এতে আমার কতটা স্বার্থহানি হবে অথবা এতে আমার কতটা মানমর্য্যাদা বা সমৃদ্ধি বাড়বে। আমি বক্তৃতা দেব,—ভগবানের নাম কে কতটা গ্রহণ করলেন সে দিকে বড় একটা লক্ষ্য করব না—আমার লক্ষ্য থাকবে, আমার বক্তৃতা কে কতটা ভাল বলেন, তাই শোনবার দিকে।

আসল কথা এই যে ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর করে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হলে, তাঁর নামে

সর্ব্বত্যাগী হতে প্রস্তুত না হলে আমরা কোন কার্য্যেই সফলকাম হতে পারব না, ব্রাহ্মসমাজকে গৌরবান্বিত করা তো দূরের কথা। আর তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে কার্য্যে প্রবৃত্ত হবার পক্ষে কোনই বাধা নেই। কোন্ মায়ের ছেলে নিজের মায়ের ভালবাসার অন্ত পেয়েছে? তখন, যে জগন্মাতা নিত্যকাল সমানরূপে অবস্থিতি করছেন, যাঁর অনন্ত জ্ঞান ও প্রেমের পরিচয় জগতের ইতিহাসের প্রতি অক্ষরে পাচ্ছি, যাঁর জ্ঞানের কণামাত্র পেয়ে পণ্ডিতেরা নিত্য নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছেন, যাঁর প্রেমের কণামাত্র পেয়ে মা নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও ছেলেকে রক্ষা করতে পশ্চাৎপদ হয় না, তাঁর উপর নির্ভর করে কাজ করব, এ বিষয়ে যে সংশয় আসে, সেইটাই আশ্চর্য্য। সংশয়ে ডুবে আপনাকে বিনাশের পথে নিয়ে যেও না। সেই প্রেমসাগর রসের ভাণ্ডারে আপনাকে ডুবিয়ে দাও—কোন ভয় থাকবে না। ক্ষণকালের জন্য নীরব হয়ে কান পেতে শোন, সেই জগন্মাতার অভয়বাণী—মাভৈ রব—শুনে নাও, আর অভয় হয়ে যাও—তোমাদের জীবন ধন্য হোক—ধন্য হোক। বেশী কথা না বলে, সকল ধর্ম্ম ছেড়ে প্রাণের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই ধরে রাখ, একমনে তাঁরই পূজা কর, তিনিই তোমাদের ভয় ভাবনা নিজে বহন করবেন। তোমাদের সকল পাপ তাপ থেকে মুক্ত করবেন। কোন চিন্তা কোরো না।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোচয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ব্রহ্মচক্রে ঈশ্বরজ্ঞান।

(ডাক্তার স্যর গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।

"হে গার্গি, এই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের শাসনে চন্দ্র-সূর্য্য বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।"

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।

"হে গার্গি, এই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবস ও রাত্রি, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু সংবৎসর বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।"

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যাঃ।

বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯

"হে গার্গি, এই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের শাসনে শ্বেতপর্ব্বত হইতে কতকগুলি নদী পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে, আর কতকগুলি পশ্চিমদিকে।"

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তৈত্তিরীয় ২।৮

"ইঁহার ভয়ে বায়ু বহিতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উঠিতেছে, ইঁহার ভয়ে অগ্নি, পর্জ্জন্য ও পঞ্চম মৃত্যু ধাবমান হইতেছে।"

এই সমস্ত বিশ্ব পরমেশ্বরের দ্বারা সুব্যবস্থিত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তাঁহারই নিয়মে চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, পর্জ্জন্য ও মৃত্যু আপন আপন কাজ করিয়া বিশ্বচক্র চালাইতেছে। ইহাদের ব্যাপার একটু কম হইলে সমস্তই গোলমাল হইয়া যাইবে। পৃথ্বী ও বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহ অন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, উহাদিগকে সূর্য্য নিজ আকর্ষণ শক্তির দ্বারা টানিয়া রাখিতেছে, উহাদিগকে আপনা হইতে অতি দূরে যাইতে দেয় না, তাই উহারা সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবী অপেক্ষা ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৩৬ গুণ বড়। আকর্ষণ শক্তির বলাবল গোলকের বৃহত্বের উপর নির্ভর করে। সূর্য্য সমস্ত গ্রহ অপেক্ষা অনেক বড়, তাই তাহার বল উহাদের উপর প্রকটিত হইতেছে এবং উহাদিগকে আপন মার্গের উপর ঠিক্ রাখিতেছে। সেইরূপ আবার, যদি সূর্য্যের বল প্রকটিত না হয়, তাহা হইলে পৃথিবী প্রভৃতি সকল গ্রহই সিধা পথ ধরিয়াই চলিবে এবং উত্তরোত্তর দূরে দূরে চলিয়া গিয়া যেখানে সূর্য্য দেখা যায় না, এইরূপ কোন স্থানে গিয়া পৌঁছিবে। এইরূপ প্রকারে পৃথিবী সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া গেলে আমাদের ন্যায় প্রাণীদিগের কি গতি হইবে! সূর্য্য হইতে যে তেজ ও উত্তাপ পৃথিবী প্রাপ্ত হয়, তাহারই যোগে সমস্ত প্রাণী সজীব থাকিয়া আপন আপন কার্য্য

করে; ঐ তেজ প্রাপ্ত না হইলে, আমাদের সমেত সমস্ত বিশ্ব তমোময় হইয়া যাইবে, ঐ উত্তাপ না পাইলে সমস্ত পৃথিবী বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হইবে, সমুদ্র জমিয়া গিয়া পাথরের মতো কঠিন হইবে; তার পর আমাদের মতো প্রাণী থাকিবে কি করিয়া? সমস্ত চেতন পদার্থ নষ্ট হইয়া, সমস্ত বনস্পতি বিলুপ্ত হইয়া, এই পৃথিবী কেবল পাষাণময় হইবে। পক্ষান্তরে সূর্য্যকে যথোপযুক্ত বৃহত্ত্ব দিয়া, তাহার ভিতর আকর্ষণ শক্তি স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা পৃথিবীকে আপন মার্গে সূর্য্যেরই নিকটে রাখিয়া, পরমেশ্বর প্রাণীদিগকে রক্ষা করিতেছেন এবং সমস্ত জীবের ব্যাপার যথোপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলেও এতটা অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছেন যে, ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত পৃথিবীতেও ঐ অগ্নির প্রখরতা অনুভূত হইতেছে। এবং সূর্য্য-কিরণ-গত অগ্নিযোগে বৃষ্টি পড়িতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং অন্য অনেক কাজ হইতেছে। এই প্রকারে একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ নিকট করিয়া দিয়া পরমেশ্বর সমস্ত ভূতকে নিয়মে রাখিতেছেন। পরমেশ্বর-যোজিত এই সকল নিয়ম অবাধ দেখিয়া, এবং সমস্ত জগৎ অচেতনের মতো চলিতেছে ও তাহার অন্তর্গত নিয়ম স্বভাবসিদ্ধ মনে করিয়া প্রমাণসিদ্ধ পদার্থজ্ঞানবেত্তারা চেতনস্বরূপ যে পরমেশ্বর তাঁহার কর্তৃত্বের দিকে লক্ষ্য করেন না; কিন্তু তাঁহাদের এই অভিপ্রায় নির্ম্মূল। কারণ, জগতের মধ্যে যে নিয়ম আছে তাহা সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা প্রকাশ করাই তাঁহাদের কাজ; কিন্তু এই নিয়ম স্বভাবসিদ্ধ, কিংবা পরমেশ্বরের দ্বারা স্থাপিত, তাহার নির্ণয় করা তাঁহাদের কাজ নহে। এইরূপ নির্ণয় করিবার মতো যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের মধ্যে আসে না। ঐ নির্ণয়, আমাদের অন্তর্যামী যে আত্মা এবং আত্মায় অবস্থিত যে স্বাভাবিক বুদ্ধি, তাহা দ্বারাই হইয়া থাকে এবং ঐ নির্ণয় ইহাই যে,—সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরই এই বিশ্বাস আমাদের অন্তরে স্থাপন করিয়াছেন।

কর্ণাটের পূর্ব্ব গৌরব।

(পূর্বানুবৃত্তি)

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কর্ণাটের পূর্ব্ববর্ণিত রাজবংশাবলীর রাজত্বকালীন তদ্দেশীয় ধর্ম্মমতের কথা উল্লেখ করিব।

পুরাকালে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। এজন্য ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণই দেশের, রাজ্যের এবং সমাজের নেতা হইতেন। তাঁহারাই রাজ্য স্থাপন এবং তাহার ধ্বংস সাধন করিতেন। তাঁহাদের দ্বারাই সমাজ গঠিত এবং সংবর্দ্ধিত হইত। তাঁহারাই কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতির গুরু ছিলেন। এই জন্যই রাজন্যবর্গ তাঁহাদের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করিতেন না।

রামায়ণ মহাভারতের সময় যেমন তাঁহাদের প্রতিপত্তি ছিল, হিন্দুর শেষ রাজন্যবর্গের সময়ও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দেশেও যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল তাহা নহে। রোমের ক্যাথলিক পুরোহিত পোপের ক্ষমতার কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এক সময় জার্ম্মনির সম্রাট চতুর্থ হেনরী কোন কারণে পোপ হিলডেব্রাণ্ডের (Pope Hildebrand) অপ্রিয়ভাজন হন। তিনি রোমনগরে আসিয়া পোপের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু পোপ হিলডেব্রাণ্ড তাঁহাকে নগ্ন পদে তুষারময় স্থানে তিন দিবস দাঁড় করাইয়া রাখিয়া তবে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হন। এমন কি তৎকালে জার্ম্মণীর সম্রাটনির্ব্বাচনের ক্ষমতাও সাত জন ধর্ম্মযাজকের উপর অর্পিত ছিল।

কর্ণাটের রাজবংশাবলীর বিষয়ও আলোচনা করিলে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ময়ূরশর্ম্মা ক্ষত্রিয়রাজ পল্লব কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া কদম্ব বংশ স্থাপন করেন। গঙ্গাবংশ সিংহানন্দী নামক একজন জৈনগুরু

কর্তৃক স্থাপিত হয়। বিজয়কীর্ত্তি রাজা অবনিলের গুরু ছিলেন এবং জৈন লেখক শব্দাবতার-সম্পাদক পূজ্যপাদ, রাজা দুর্ব্বিনীতের গুরু ছিলেন।

চালুক্যবংশ বিষ্ণুগোপ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্থাপিত হয়। জয়সিংহ বিজয়াদিত্য নামক একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা কর্ণাটের সৈন্যবিভাগে যোগদান করিয়া এ দেশে বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি রাজা পল্লবের সহিত যুদ্ধে হত হন। তাঁহার গর্ভবতী বিধবা স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর বিষ্ণুগোপের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছু দিন পরে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হয়। বিষ্ণুগোপ এই সন্তানটিকে রাজসিংহ নাম দিয়া নানা শাস্ত্র বিশেষতঃ যুদ্ধনীতি শিক্ষা দেন। রাজসিংহ পরে চালুক্য-বংশ স্থাপন করেন। বোধ হয় উপরি উক্ত কারণেই তিনি বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে অভিহিত হইতেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের প্রসিদ্ধ নৃপতি নৃপতুঙ্গ, তাঁহার জৈন গুরু জিনসেনের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতেন। এই জিনসেন আদিপুরাণ নামক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। হোয়সালা রাজ্য সুদত্ত নামক ধর্ম্মযাজকের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রামানুজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের মন্ত্রদাতা ছিলেন। এবং প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার বিদ্যারণ্য শঙ্করাচার্য্যের মঠ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া হক্কা এবং বক্কা নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে বিজয়নগর-সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই সকল হিন্দুরাজগণের সময়ে কোন্ কোন্ ধর্ম্ম কোন্ কোন্ রাজার রাজত্বকালে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল বলা সুকঠিন। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত দেশীয় হিন্দুরাজগণ প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলিকে অতি উদারচক্ষে দেখিতেন। জৈন, শৈব, বৈষ্ণব এবং বৌদ্ধধর্ম্ম খৃঃ প্রথম শতাব্দী হইতে একসঙ্গে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

কদম্বা বংশের প্রথম নৃপতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু উক্ত বংশের স্থাপনকর্ত্তা ময়ূর শর্ম্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। কদম্বা রাজকোষের অর্থে ময়ূর শর্ম্মা বহুবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। লালগুণ্ডীর ব্রাহ্মণগণ ময়ূরশর্ম্মার নিকট হইতে অষ্টাদশ অশ্বমেধ যজ্ঞের দানস্বরূপ ১৪০টি গ্রাম উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বংশের কৃষ্ণশর্ম্মা ৫ম শতাব্দীতে স্বয়ং অনেকগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কদম্বারাজের রাজত্বকালে বনবাসী-নিবাসী জনৈক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক কর্ণেয় প্রসিদ্ধ চৈত্রালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গঙ্গাবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মাধব ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি করিতেন এবং চতুর্বর্ণকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। কিন্তু এই বংশীয় রাজগণ জৈন ছিলেন। রাষ্ট্রকূটবংশীয় শেষ নৃপতিগণ, কুলাচার্য্যগণ এবং হোয়সালা-বংশীয় প্রথম নৃপতিগণও জৈন ছিলেন। কিন্তু কাহারও সময় প্রজাগণের ধর্ম্মস্বাধীনতার বিপর্য্যয় ঘটে নাই।

চালুক্যগণ কন্যায়ন গোত্রভুক্ত ছিলেন। রাজা পুলকেশী (প্রথম) অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সময় দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-সূর্য্য অস্তমিত হইতেছিল এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হইয়াছিল। চালুক্যদিগের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ অদ্বৈতমতপ্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্য বালসূর্য্যের ন্যায় ক্রমশঃ চারিদিকে দীপ্তি প্রসারিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সময়েই পুরাণসকল লিখিত হয়। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম দাক্ষিণাত্য হইতে একেবারে নিষ্কাসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আর্য্যাবর্ত্তে যেরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে তদনুরূপ হয় নাই। এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম শাখা জৈনধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে যখন রাজা চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার জৈন গুরু ভদ্রবাহুর সহিত দাক্ষিণাত্যে শ্রাবণবেলগুলা নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন সেই সময় হইতেই এদেশে জৈনধর্ম্মের প্রসার আরম্ভ হয়। যাহা হউক চালুক্যগণ বিষ্ণুর উপাসকসত্ত্বেও অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শক ছিলেন। তাঁহারা অনেক জৈনমন্দিরের জন্য দানপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। আইহলীর শিলালিপির জৈন লেখক রাবুকীর্ত্তি দ্বিতীয় পুলকেশীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কয়েকটি ভগ্ন জৈনমন্দির সংস্কার করাইয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থকার বিজয় পণ্ডিতকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই বংশীয় নৃপতি মঙ্গলীশ কর্তৃক বাদামির বিষ্ণুগুহামন্দির খোদিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা গোবিন্দের পুত্র

করক বৈদিকধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সময়ের ব্রাহ্মণগণ অনেক যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই বংশীয় রাজা প্রথম কৃষ্ণ শৈব ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক বিরূরের প্রসিদ্ধ শিব মন্দির নির্ম্মিত হয়। অমোঘবর্ষ রাজা নৃপতুঙ্গ জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈনসেন তাঁহার গুরু ছিলেন। ইঁহার সময়েই গঙ্গাভদ্র কর্ত্তৃক জৈন-পুরাণ রচিত হয়। তথাপি এই সময়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য খচিত শিব এবং বিষ্ণু-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাজা নৃপতুঙ্গের সময় করদরাজ প্রীতিবর্ম্মা সম্বদত্তি নামক স্থানে একটি জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করেন। মলগুন্দ নগরে চিত্ররায় নামক জনৈক বৈশ্য কর্ত্তৃক একটি জৈন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকুট বংশীয় রাজা চতুর্থ গোবিন্দ অনেক শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন।

পশ্চিম চালুক্যবংশের রাজত্বকালে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নবযুগের অধিষ্ঠান হয়। এই বংশের আদি রাজাগণ পূর্ব্ব চালুক্য এবং রাষ্ট্রকূট-দিগের ন্যায় সকল ধর্ম্মকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। আমরা দেখিতে পাই খৃঃ ৯৭০ সালের শিলালিপিতে বিষ্ণু এবং জৈন দেবতা উভয়েরই সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। এইবংশীয় রাজা চালুক্য বিক্রম বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। তিনি একটী বিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে পুষ্করিণী খনন করাইয়া-ছিলেন।

কুলাচার্য্য রাজা বিজ্জলাল জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী বাসবা-লিঙ্গায়ত ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তক ছিলেন। এই বংশীয় ত্রিভুবন-কীর্ত্তি রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ১৬ জন বৈশ্য মিলিত হইয়া ধর্ম্মবরাল বা ডোম্বল নামক স্থানে এক বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করে এবং উক্ত মন্দির ও লোকুন্দীর বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য ভূমি দান করে। যদিও কুলাচার্য্যরাজত্বের শেষ ভাগে বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল, তথাপি তৎপূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত ইঁহাদের সময় ধর্ম্মের উদারতা রক্ষিত হই-য়াছিল। এই সময় বৌদ্ধধর্ম্ম দাক্ষিণাত্য হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়।

বিজয়নগরের রাজগণ সকল ধর্ম্মা-বলম্বীকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। এই বংশের আদি পুরুষ বক্কারায় ইহার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজা কৃষ্ণরায় এরূপ অপক্ষপাতে অপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যবহার করিতেন যে এমন কি তাঁহার ঘোর শত্রু মুসলমানদিগকেও তিনি স্বীয় রাজধানীতে মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে দিয়া-ছিলেন।

কর্ণাটের নৃপতিগণের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ সমদৃষ্টি ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমি কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

বাদামির শিলালিপি দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের রাজত্বকালে বাতাবী নগরে এককালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এখানে হরিহর, অর্দ্ধনারী প্রভৃতি মূর্ত্তি আছে।

বাদামীর সন্নিকট বেলুর নামক স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি আছে।

সোমেশ্বরের রাজত্বকালীন (খৃঃ ৯৭০) মহা-মণ্ডলেশ্বর বনবাসীনিবাসী চাবুন্দ রায়ের এক শিলালিপিতে জৈন দেবতা জিন এবং হিন্দুদেবতা বিষ্ণু উভয়ের সংবর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ইহার শেষ ভাগে লিখিত আছে যে নৃপতি নাগবর্ম্ম জিন, বিষ্ণু এবং শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১০৩২ শকে কোলাপুর রাজ্যে শিলাহার রাজা কর্ত্তৃক একটি পুষ্করিণী খোদিত হয়। তিনি এই পুষ্করিণীর ধারে বুদ্ধ, শিব এবং অর্ক দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অমোঘবর্ষ রাজা নৃপতুঙ্গের কবিরাজমার্গ নামক অলঙ্কার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ১০৪ শ্লোকে একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অলঙ্কারশাস্ত্র মতে কাব্যে "সময়বিরুদ্ধ" শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এই উপলক্ষে রাজা নৃপতুঙ্গ উক্ত শ্লোকে "সময়" শব্দের অর্থ কপিল, সুগবর্ণ, কণাদ এবং চার্ব্বাক সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়াছেন। কবিগণ যাহাতে সাময়িক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কিছু না লিখেন সেই উদ্দেশেই তিনি উক্তরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে সাংখ্য, বুদ্ধ, বৈশেষিক বৌদ্ধ সম্বন্ধে লিখিবার সময় তৎতৎ মতবিরুদ্ধ কোন

শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নহে। যে লেখক এই নিয়ম অতিক্রম করেন তিনি "সময়বিরুদ্ধ" দোষে দূষিত হন। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, এমন কি ঘোর নাস্তিকবাদী লোকায়তিক এবং চার্ব্বিকগণের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে রাজা নৃপতুঙ্গ কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই।

হরিহরের মন্দিরও ধর্ম্মে উদারতার একটি উদাহরণ। এই মন্দির বিজয়নগররাজ কর্ত্তৃক ১২২৪ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই হরিহর মূর্ত্তি বৈদিক শিববিষ্ণুর একীভাবের সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

বেলুরের শিলালিপিতে লিখিত আছে—
যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিবমিতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনমিতি কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং শ্রীকেশবঃ সদা॥

৭। জৈন ও লিঙ্গায়ত এবং জৈন ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধের প্রমাণ পাওয়া যায় বটে কিন্তু রাজন্যবর্গ সাধারণতঃ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতেন। পশ্চিম চালুক্য বংশের শেষ সময়ে নৃপতিগণ সকল ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণকে যে অধিকতর সমদৃষ্টিতে দেখিতেন তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

খৃঃ ১৩৬৪ সালে বৈষ্ণবদিগের অত্যাচারে অতিপীড়িত হইয়া জৈনগণ সমবেত হইয়া রাজা বক্কুরায়ের নিকট আবেদন করে। রাজা বক্কু রায় উভয়পক্ষের নেতাগণকে আহ্বান করিয়া সেই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন এবং উভয় পক্ষকে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মস্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি জৈন দলপতির হস্ত ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দলপতির হস্তে রক্ষিত করিয়া বলেন "আজ হইতে তোমরা পরস্পরকে বন্ধুভাবে দেখিবে। আমি তোমাদিগের উভয়কেই আপনাপন ধর্ম্মানুরূপ ক্রিয়ায় স্বাধীনতা প্রদান করিলাম। আমি উভয় পক্ষকেই সমানভাবে দেখিব এবং রক্ষা করিব।" পরে এই আদেশবাণী সমস্ত বস্তিগুলিতে প্রচার করিয়াছিলেন। এবং নিয়ম করিয়া দেন যে জৈনগণ চাঁদা তুলিয়া সেই অর্থ ব্রাহ্মণদিগের হস্তে অর্পণ করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণ সেই অর্থ দ্বারা ২০জন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া জৈন মন্দির সকল রক্ষা করিবেন। অপরন্তু ব্রাহ্মণগণ যে সকল জৈন মন্দির নষ্ট হইয়াছিল নিজেদের অর্থে সে গুলির সংস্কার করিবেন।

আসামের নদ-নদী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

(শ্রীবিজয় ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ দুইটী প্রাচীন জনপদ।

প্রাচীন কামরূপ বা বর্ত্তমান আসাম প্রদেশ ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা "উত্তরকূল ও দক্ষিণকূল" এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। আকবর সাহের সময়ে এই দুই জনপদ "সরকার"রূপে পরিগণিত হইয়া রাজস্ব সংগৃহীত হইত। ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাংশ "উত্তরকূল" ও দক্ষিণাংশ "দক্ষিণকূল" নামে তৎকালেও অভিহিত হইত। গৌহাটী হইতে আরম্ভ করিয়া মিরি, মিসমি জাতিদিগের আবাসভূমি পর্য্যন্ত উত্তরকূলের সীমা ছিল; আর দক্ষিণকূলের সীমা ছিল নদীয়া হইতে শ্রীনগরের পাহাড় পর্য্যন্ত। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য—যিনি ৭১৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৭৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন তিনি—এই উত্তরকূল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন (Calcutta review 1867, P. 521)। "অহম "বুরঞ্জী"তে * তিনি কাশ্মীররাজ "ললিতাদিত্য" নামের পরিবর্ত্তে "পশ্চিম দেশীয় ক্ষত্রিয় জীতারি" নামে উল্লিখিত হইয়াছেন।

মাজুলী দ্বীপ।

ব্রহ্মপুত্র নদমধ্যে অনেকগুলি দ্বীপ আছে। চলিত কথায় আমরা যাহাকে "চর" বলি আসামীরা তাহাকে"চং" বলে। এই নদ দ্বারা গঠিত "মাজুলী" নামে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ "চং"টী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাজুলী দ্বীপ শিবসাগর জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত। এই দ্বীপের অন্তর্গত "রত্নপুর" নামক স্থানে জীতারিবংশীয় "ধর্ম্মপাল" নামক জনৈক সন্ন্যাসী ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিগত ১৯০১ খ্রীঃ অব্দের

* বুরঞ্জী=বু-প্রাচীন, রঞ্জ-বর্ণনা; অর্থাৎ প্রাচীন বিষয়ের বর্ণনাত্মক পুস্তক।

আদম শুমারী বিবরণে দৃষ্ট হয় "এই দ্বীপের আয়তন ৪৮৫ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৩৫০০০ জন। এই মাজুলী দ্বীপমধ্যে অসংখ্য স্রোতস্বতী প্রবাহিত। এখানকার কোন কোন স্থান অরণ্যানীতে সমাকীর্ণ। মাজুলী দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে বেত জন্মে। এই দ্বীপে আউনিয়াতি, দক্ষিণপাঠ, গরমুর, (১) কুরুয়াবাহী, কমলাবাড়ী প্রভৃতি কয়েকটী প্রধান সত্র সংস্থাপিত।

ভস্মাচল।

এই দ্বীপটী গৌহাটীর নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদ মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় ৪০ বিঘা কথিত আছে। "হরকোপানলে" কামদেব এই-স্থানে ভস্মীভূত হওয়ায় ইহার নাম "ভস্মাচল" হইয়াছে। এখানে তিনটী প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের মধ্যে দুইটী ভগ্নপ্রায়। আদি মন্দিরটী ভাল আছে। তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম উমানন্দ ভৈরব। ভস্মাচলে একটী গহবরের সম্মুখে নিম্নোল্লিখিত দ্বিচরণ হেঁয়ালী শ্লোক (২) দৃষ্ট হয়:—

"শিবাগম্যং শিবাগম্যং শিবযোগ্যং শিবাত্মকম্।
শিবগৌরী সদা সেব্যং শিবাশিবাশ্রয়ঃ প্রত্যে॥ ১॥
দেবদেবীস্তুতস্তোহয়ঃ শিবগৌরী সদাস্তু নঃ।
অনেকার্থমিদং বাক্যং সদা সাস্থস্থিতিং প্রতি॥ ২॥

ব্রহ্মপুত্র অতি খরস্রোত নদ। সমুদ্র হইতে ৮০০ মাইল দূরে "ডিব্রুগড়" পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ কোনরূপে নৌবাহ্য অতিক্রম্য; তৎপরে স্বভাবতঃই দুরতিক্রম্য। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রনদের সঙ্গমস্থলে "সংগ্রামগড়" নামক স্থানে এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেখানে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব মগ ও ফিরিঙ্গীদিগের রণপোতসমূহের প্রবেশপথ রোধ করিবার জন্য ঐ দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরস্থ নিম্ন ভূমিতে বহুসংখ্যক গণ্ডার বসবাস করে। কোর্ট অফ ডিরেক্টরগণের অনুমত্যনুসারে সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেল ব্রহ্মপুত্রনদের জরীপ করিয়াছিলেন। উহার বিবরণ Rennell's Memoir নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক De Barros ব্রহ্মপুত্রের নাম caos নদী রাখিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী ব্রহ্মপুত্র তীর্থরাজ বলিয়া আখ্যাত। ব্রহ্মপুত্রের মাহাত্ম্যসম্বন্ধে উল্লেখ আছে:—

অশোক অষ্টমী (৩) জন্য স্নানদানে মহাপুণ্য
প্রসঙ্গে প্রবল পাপ নাশ।
সংক্ষেপে সকল সার কহিতে শকতি কার
এই ব্রহ্মপুত্র ইতিহাস॥ (৪)

কলঙ্গ।

ব্রহ্মপুত্রের শাখানদীগুলির মধ্যে "কলঙ্গ" সর্ব্বপ্রধান। এই শাখানদীটী পারাপারের জন্য যোগী, রাহা, নগাঁও, কুয়াড়িতাল, এই কয়েকটী স্থানে, খেয়াঘাট (Ferry ghat) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যমুনা, দৈয়াং, বড়পাণি, উম্ইয়াম্ (umiam) কিলিং প্রভৃতি "কপিলি"র শাখানদীসমূহ কলঙ্গে পতিত হইয়াছে। ইহার তীরে কলিয়াবর, শ্যামাগুঁড়ি, পুরণিগুদম, রাহা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান অবস্থিত। জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে "কপিলল" এবং খাসিয়া পাহাড় হইতে "দিগরু" নদী নির্গত হইয়া এই কলঙ্গ নদীতে পড়িয়াছে। খাসিয়ারা এই দিগরুকে "উমথ্রু" বলে।

জেলান্তর্গত উল্লেখযোগ্য নদী।

আসাম প্রদেশ ব্রহ্ম-উপত্যকা, সুরমাউপত্যকা, পার্ব্বতীয় বিভাগ এই তিন ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগ আবার ১২টী জেলা লইয়া গঠিত। তাহাদের নাম যথা:—১। গোয়াল পাড়া, ২। কামরূপ, ৩। দরঙ্গ, ৪। শিবসাগর, ৫। লখিমপুর, ৬। নগাঁও, ৭। শ্রীহট্ট, ৮। কাছাড়, ৯। নাগাপাহাড়, ১০। খাসিয়া জয়ন্তীয়াপাহাড়, ১১। গারোপাহাড়, ১২। লুসাই পাহাড়।

গোয়ালপাড়া = চম্পাবতী, জিনজিরাম, কৃষ্ণাই, দুধনাই, সোনাই, কালানদী, জিনারী, তিপ্‌কাই, বামনাই, হরিপানি, বা হরতবাটিয়া প্রভৃতি।

(১) গরমুর—এই ছত্রের অভাব অভিযোগ দূরীকরণার্থ জনৈক অহম রাজা ৪০০০০ একর নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। এক্ষণে গভর্ণমেন্ট উহার পরিবর্ত্তে ৩৩১ একর নিষ্করসম্পত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। স্থানীয় লোকদিগের উপর এখানকার গোঁসাইদিগের যথেষ্ট প্রভুত্ব পরিচালন দৃষ্ট হয়।

(২) লেখক ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই।

(৩) চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে যদি পুনর্ব্বসু নক্ষত্র এবং বুধবার হয় তবে সেই অষ্টমীকে অশোকাষ্টমী বলে।

(৪) ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, চতুর্দ্দশ সর্গ, ২৪৬ শ্লোক, পৃঃ ৪৭৯।

কামরূপ=ব্রহ্মপুত্র, (৫) অগ্রাণ, কুলশী (শ্রী), কালদিয়া, দিজমা, দিগরু (সোনাপুরী) চাউলখোয়া, টাঙ্গনমারী, ডোকাবন, জুলি, তকি, তেকেলজ, তুরঙ্গ, বাতা, বড়নদী, বলদী, মানস (Manas) পাগলমানস, সরুমানস, নদিহিং, মাতঙ্গ, লখাইতারা সজং, সিঙ্গারী, সিন্ধু, প্রভৃতি।

দরঙ্গ=সিয়াধর্ণশিরী নোনাই, বিলাধারী, বড়নদী, ভৈরবী, ভোলা।

শিবসাগর=ব্রহ্মপুত্র, ককিলা, কাঞ্চ-দাঙ্গ, জাজী, বুড়ী দিহিং, দিখৌ, (৬) দিমৌ, দিসাই, দিছাং, দ্বারিকা, ধনশিরী প্রভৃতি।

লখিমপুর=ব্রহ্মপুত্র, কুণ্ডলপানি, ডিব্রু, নদিহিং, টেঙ্গাপানি, রঙ্গা, দিক্রং, দিজমুর, দিগরু, তিঙ্গরাই, বিহানীমুখ, ধোলহাড়ী, সুবর্ণশ্রী প্রভৃতি।

নগাঁও=কপিলি, কলঙ্গ, ধনশিরী, দিজু, দেওপানি, বড় পানি, ননাই, মিচা, যমুনা, সোনাই প্রভৃতি।

শ্রীহট্ট=করঙ্গী, বরাকর, বেজাপানি, বদ্ধুকাটা বা কিনচিয়াং (Kynchiang), ধনশিরী, ধলেশ্বরী বা ভেড়া মোহনা, মনু, সিঙ্গল প্রভৃতি।

কাছাড়=ঝরি, টিপাই, বরাকর, ধন-শিরী প্রভৃতি।

নাগাপাহাড়=দৈয়াঙ্গ, ধনশিরী, যমুনা প্রভৃতি।

খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড়=কপিলি, কুলশী, কুশিয়ারা, বডপানি, বদ্ধুকাটা প্রভৃতি।

গারোপাহাড়=সোমেশ্বরী প্রভৃতি।

লুসাইপাহাড়=ধলেশ্বরী (ট্লং), টুইভল সোনাই প্রভৃতি।

ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত উল্লেখযোগ্য নদীসমূহ।

কপিলি=জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া ১৬৩ মাইল প্রবাহিত হইবার পর নগাঁও জেলার পশ্চিম প্রান্তে "যোগী" নামক স্থানের নিকট "কলঙ্গ" নামক ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখানদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর দ্বারা নগাঁও জেলা হইতে কাছাড় জেলা পৃথক হইয়াছে। কাছাড়ের সীমানায় কপিলি নদীর তীরে একটী উষ্ণ প্রস্রবন আছে। কপিলি নদী অতিক্রম করিলেই খাসিয়া জয়ন্তীয়া জাতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বর্ষাকালে এই নদীতে নৌকাদ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্যের বেশ সুবিধা আছে। ছাপারমুখ, যমুনামুখ, থাড়িখানা, এবং ধর্ম্মতুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নগরসকল কপিলি নদীর তীরদেশে অবস্থিত।

কুলশী=শিলংয়ের কিঞ্চিৎ পশ্চিম প্রান্তস্থ খাসিয়া পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে। এই নদীর উপর "কুকুরমারী" নামক স্থানে একটী লৌহসেতু আছে। ট্রাংক রোড় তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

গদাধর=ভূটানের পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়া গোয়ালপাড়াস্থ ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে।

জিনঝিরাম=গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত "উরুপদ" বিল হইতে নির্গত হইয়া ঐ জেলার দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে ইহা ১২০ মাইল। ইহার তট-দেশে লক্ষ্মীপুর, দক্ষিণ শালমারা, সিংগীমারী প্রভৃতি নগর প্রতিষ্ঠিত।

জাজী=মকৃকচাং নামক স্থানের সন্নিকটে নাগা পাহাড় জেলায় উৎপন্ন হইয়া উত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়া শিবসাগরের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে.

দিশাই=নাগা পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িতেছে। এই নদীর বামতীরে সুপ্র-সিদ্ধ "যোড়হাট" নগর অবস্থিত।

দিহিং=মদীয়া নগরী হইতে কিছু দূরে পশ্চিম-দিকে অবস্থিত। এই নদী লখিমপুর জেলার পূর্ব্ব-প্রান্তস্থ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। দিহিং নদীর তীরদেশে অসভ্য "আবর" জাতিরা বসবাস করে।

দিখৌ=নাগা পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া শিব-সাগর জেলার উত্তরপশ্চিমাংশ দিয়া ব্রহ্মপুত্রনদে

(৫) কামরূপ জেলায় ব্রহ্মপুত্রে তীরবর্ত্তী জলাভূমি নল, খাগড়া ও নানাবিধ ঘাসের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উহাতে গণ্ডার ও বনামহিষের বসবাস দৃষ্ট হয়।

(৬-৭) লেপ্টন্যাণ্ট উইলকক্স দিখৌ ও দিছাং (কেহ কেহ ইহাকে ডিসাংও বলে) নদীদ্বয়ের তীরদেশে সর্ব্ব-প্রথম কয়লার নমুনা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় খনি বিদ্যমান আছে বলিয়া ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট দেন। Admo R. of Assam 1874-75.

পতিত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্র ইহাকে তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। সেখানে উক্ত হইয়াছে, "তীর্থশ্রেষ্ঠদিখুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে"। এই নদীর তীরে অহম রাজগণের প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজধানী "গরগাঁও" নগরীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ডিহাং = নাগা পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে শিবসাগর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪০ মাইল। নামরূপে এই নদীর উপর আসাম বেঙ্গল রেলের একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ডিহাং নদীর তীরস্থ "বড়হাট" নামক স্থানে অন্যূন ২০টী লবণের উৎস দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে নাগারা উহা হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া অন্য জাতির সহিত বিনিময় ব্যবসায় চালাইত।

ডিবাং = হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া মিশমি পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সদীয়ার নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। এই নদীর বামতটে "বোম-জুড়" নগর প্রতিষ্ঠিত। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তপ্রদেশ রক্ষার্থ তথায় গভর্ণমেণ্টের একটী ক্ষুদ্র সেনানিবাস আছে। ডিবাং নদীর তীরে শানজাতির শাখাসম্ভূত "খামতি"রা বসবাস করে।

বড়নদী = ইহা ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখা নদী, ভূটানের পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। এই বড় নদীরও কতকগুলি শাখানদী আছে, তন্মধ্যে ননাই, নলদী, বেলশিরী, পাঁচনাই, ভৈরবী, বড়গাং, বুড়াই, এই কয়টী প্রধান।

বাটা = খাসিয়া পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া কামরূপের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

বুড়িদিহিং = পাটকাই পর্ব্বত শ্রেণী হইতে নির্গত হইয়া লখিমপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে ইহা ১৫০ মাইল। আসাম বেঙ্গল রেলের গমনাগমনের জন্য ইহার উপর দুই স্থানে দুইটী সেতু এবং জন-সাধারণের পারাপারের জন্য পাঁচ স্থানে পাঁচটী খেয়াঘাট (Ferry ghat) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বুড়িদিহিং নদীর বাম পার্শ্বে পাটকাই পর্ব্বতের পাদদেশে সুপ্রসিদ্ধ "মার্থেরিটা" নগর প্রতিষ্ঠিত।

মানস = ভূটানের পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া "চাউল খোয়া" নদীর সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে প্রসিদ্ধ "বিজনী" নগর অবস্থিত। মানসের দক্ষিণ দিক দিয়া মরু, দলনী, আই, পোমাযান, বানদুরা এবং বামদিকে চাউলখোয়া প্রভৃতি শাখানদী প্রবাহিত হইয়াছে। মূল নদীটী দৈর্ঘ্যে ২০০ মাইল।

নদিহি = সিংফো পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া প্রথমে পশ্চিমদিকে ও তৎপরে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। এই নদীটী ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে তেমন সুবিধা-জনক নহে।

টেঙ্গাপাণি = সিংফো পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া লখিমপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে।

ধনশিরি (১) = বারাইল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ডিমাপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া উত্তর পূর্ব্বদিকে "গোলাঘাট" নামক স্থানে আসিয়াছে। সেখান হইতে উহা পশ্চিম দিকে বাঁক লইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে ইহা ১৮০ মাইল। এই নদীর তীরস্থ "ডিমাপুর" নামক স্থানে কাছাড়ী দিগের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হয়। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে (A. B. Ry.) "বোকাযান" নামক স্থানে এই নদীটীকে অতিক্রম করিয়াছে।

ধনশিরি (২) = লাসার নিকটস্থ টৌয়াং নামক স্থান হইতে নির্গত হইয়া ওজলগুড়ির কিঞ্চিৎ উত্তর দিক দিয়া দরঙ্গ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। তৎপরে ইহা দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রবা-হিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। এই নদীর উভয় পার্শ্বে অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে সমাকীর্ণ। ইহার দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্যের সৌকর্য্য অথবা সন্নিহিত স্থানগুলিতে জল সেচনের কার্য্য হয় না।

শিল্লা = মিরিপাহাড় হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পড়িতেছে।

সিংরা = খাসিয়া পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া কামরূপের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে।

সুবর্ণশ্রী = তিব্বতের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া "খেরকুটীয়াসূটী" নামক ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখানদীতে পড়িতেছে। অহম রাজগণের সময়ে

এই নদীর বালুকণা ধুইয়া সুবর্ণকণিকা (৮) বাহির করা হইত। ব্যবসায় বাণিজ্যার্থ এই নদীপথে নৌকাযোগে চা, রবার, শরিষা, আলু, চাউল, কাষ্ঠ, বেত্র প্রভৃতি দ্রব্য অন্যত্র আনীত হইয়া থাকে।

ভরলু=হিমালয়ের পাদদেশস্থ আকা, ডাফলা দিগের আবাসভূমি হইতে নির্গত হইয়া ডিক্রাই ও জুরাহোর নদীর সহিত মিলিত হইয়া দরঙ্গ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। ইহার তীরদেশে কোন উল্লেখ যোগ্য নগর নাই।

ভোগদই=নাগাপাহাড় হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। ইহার বামতটে মরিয়নি ষ্টেশন অবস্থিত।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজের গৃহপ্রতিষ্ঠায় উদ্বোধন।

আমাদের দেশে একটা প্রথা আছে এই যে, দেবমন্দিরে পূজা দিতে গেলে প্রথমেই ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে হয়। শুনেছি যে, এই ঘণ্টা বাজাবার উদ্দেশ্য এই যে, দেবতা ঘুমিয়ে থাকলেও জেগে উঠবেন এবং জানতে পারবেন যে অমুক লোক পূজা দিয়ে গেল। আমার কিন্তু মনে হয় যে এই প্রথার ভিতর একটা গূঢ় উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ঘণ্টা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সমস্ত ভয়ভাবনা ফেলে দিয়ে দেবতার সঙ্গে প্রাণ-মন সমস্ত এক করে লেওয়া। আজকের এই শুভ মুহূর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম আমাদেরও তেমনি ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছাকে, নিজেদের প্রাণমন সমস্তই এক করে নিতে হবে। তাই সর্ব্বপ্রথম আমাদের হৃদয়সিংহাসনে ভগবানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমি তাঁর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হই, আপনারাও সেই অর্চ্চনায় যিনি যে ভাবে পারেন আমার সঙ্গে যোগ দিন—ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু। মা মা হিংসীঃ। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥ তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার। মোহপাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদিগকে বিনাশ করিও না, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। হে দেব হে পিতা, পাপসকল মার্জ্জনা কর। যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। তুমি যে সুখকর, কল্যাণকর, সুখকল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর তোমাকে নমস্কার।

এখন, ভগবান যখন তাঁর জাগ্রত মূর্ত্তিতে আমাদের হৃদয়সিংহাসন অধিকার করে বসলেন, তখন আর নূতন করে আমাদের পরস্পরকে জাগিয়ে তোলবার অবকাশ কোথায়? তাঁর নিশ্বাসের স্পর্শে আমাদের চিত্তকমল তো আপনিই ফুটে গেছে, নূতন করে আর ফোটাব কি করে? আজকের এই পবিত্রভাব বক্তৃতা করে নষ্ট করতে ইচ্ছা করি নে। আজকের এই ধর্ম্মক্ষেত্র সম্মিলনসমাজে এই শুভমুহূর্ত্তে ভগবানের পবিত্র স্পর্শ আমাদের প্রত্যেককে অনুভব করতে হবে; আর সেই অনুভব করবার অবসর পাব বলেই, আপনাদের সকলের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আনন্দের সমুদ্রে ডুব দেবার একটা অবসর পাব বলেই আজ এখানে এসেছি।

সমস্ত ভারতবর্ষে একটা মহাজাগরণের ভাব এসে পড়েছে। তার ফলে ভারতবাসী ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়েই সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হতে চাচ্ছে। সমস্ত ভারতবাসী এখন বুঝেছে যে সকলের অন্তরে যখন সেই একই ভগবানের সিংহাসন, সেই বিগতবিবাদং একই পরমেশ্বর যখন ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তখন আমাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে কোনই লাভ নেই; তখন আমাদেরও উচিত বিগতবিবাদ হওয়া। তাই না আজ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে গভীর একতার সূত্রপাত হতে দেখতে পেলুম।

সমস্ত ভারতবর্ষ যখন একতার পথে দ্রুতপদে চলেছে, তখন ব্রাহ্মসমাজই কি কেবল কূপমণ্ডুকের মতো আপনাকে উন্নতির শিখরদেশে আরূঢ় ভেবে আসলে অবনতির মুখে অনৈক্যের উপর বসে থাকবে? এ হতে পারে না—আমরা কিছুতেই ব্রাহ্মসমাজকে এ অবস্থায় আসতে দেব না। ব্রাহ্মসমাজ যদি আমাদের প্রাণের জিনিস হয়, ব্রাহ্মসমাজ থেকে যদি আমরা সকল উন্নতি, সকল

(৮) পূর্ব্বে সুবর্ণশ্রী, ধনশিরি (ধানশ্রী), ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী হইতে বৎসরে প্রায় ২ মণ স্বর্ণ সংগ্রহ করা হইত।

স্বাধীনতার মূল আত্মার স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করে থাকি, তবে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঐক্য না এনে আমরা কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারব না। আজ ৩৩ বৎসর অতীত হতে চলল, পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব তাঁর ব্রাহ্মগণকে প্রদত্ত "উপহারে" এই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই প্রাণের সঙ্গে বলেছিলেন যে, "মৈত্রীই যেন তোমাদের ব্যবহারের নিয়ামক হয়"। তিনি একটী সুগম্ভীর বৈদিক মিলন মন্ত্রের দ্বারা "উপহার" আরম্ভই করিলেন—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং—এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে কথা বল, তোমরা পরস্পরের মন অবগত হও। এই মন্ত্রই আজকাল ভারতের মিলনের মহামন্ত্র হয়ে উঠেছে। সেই মহামন্ত্র আজ আমিও আমার এই ক্ষুদ্র কণ্ঠে উচ্চারণ করে তাহা দ্বারাই আপনাদিগকে যথাশক্তি উদ্বোধিত করবার চেষ্টা করছি—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং—এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে কথা বল, তোমরা পরস্পরের মন জান। পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের প্রাণের ইচ্ছাই ছিল যে, ব্রাহ্মোপাসক সকলেই যেন একহৃদয় হয়ে ভগবানের উপাসনায় সম্মিলিত হন। কে জানে যে আজ তাঁর আত্মা এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের মধ্যে মিলনের প্রাণস্পর্শী আগ্রহ দেখে আনন্দ উপভোগ করছেন না? কে জানে যে ব্রাহ্মসম্মিলনের প্রথম সূত্রধর ভাই প্রতাপচন্দ্র এখানে উপস্থিত নাই? কে বলতে পারে যে, আজ আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী এই মিলন দেখে আনন্দিত হচ্ছেন না? আমি বিশ্বাস করি যে, যে ক্ষেত্রে প্রাণের সঙ্গে ভগবানের নাম গীত হয়, যে ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে পরলোকগত ধর্ম্মাত্মাগণ উপস্থিত হয়ে নিজেরাও আনন্দ উপভোগ করেন, আর মর্ত্ত্য মানবেরও আনন্দবর্দ্ধনে সহায় হন।

এই ঐক্যসাধনের একটী প্রধান উপায় হচ্ছে ব্রহ্মসাধন। আমার মনে হয় যে, ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতার সময় চলে গেছে, অহমিকা প্রকাশের সময় চলে গেছে; দ্বন্দ্ববিবাদের সময় চলে গেছে; ছোটখাটো মান-অভিমানের সময় চলে গেছে। এখন নীরবে ব্রহ্মসাধনের সময় এসেছে। আমি ধর্ম্মপ্রাণ আচার্য্যদের উপদেশের মূল্য কম করতে চাইনে। আমার বক্তব্য এই যে, প্রাণের ভিতর সত্যসত্য বিগতবিবাদং পরমেশ্বরকে ধরে তাঁর উপাসনা করে আমাদের বিগতবিবাদ হতে হবে। সে দিন অমৃতসহরে আর্য্যসমাজের এক অধিবেশন হয়েছিল। সেই অধিবেশনের সভাপতি বল্লেন যে তর্কবিতর্কের পথ ধরে চলা আর চলবে না; এখন অবধি শান্তির পথ ধরতে হবে। তিনি নিজের বিশ্বাসমতে বল্লেন যে যোগ ও প্রাণায়াম না ধরলে শান্তির পথ ধরা যেতে পারে না। তার পর এই সে দিন মহনীয় ভারতসম্রাট দুই মিনিটকাল নীরব থাকবার উপদেশ দিয়াছিলেন। বিলাতে এক সভাই স্থাপিত হোল নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ ধরে নীরব ধ্যান অভ্যাস করবার জন্য। এই সমস্ত থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে নীরব সাধনের মূল্য লোকে ভালরকম বুঝতে আরম্ভ করেছে।

নীরব ব্রহ্মসাধন যে কি করে করতে হবে, তা আমি কি বোঝাব? আমি নিজে ব্রহ্মসাধনের পথে খুবই অল্প অগ্রসর; তখন অন্যকে ব্রহ্মসাধনের পথ ঠিক করে দেখাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবে এইটুকু বুঝি যে, যিনি বিশ্বজননী, যিনি আমাদের প্রত্যেকের মাতা, তাঁর কাছে সোজা পথ ধরে যাব, এতে আর বোঝাবুঝি কি? বাঁকা পথে গেলেই আবার বাঁকা পথ দিয়ে ফিরে এসে সোজা পথ ধরতে হবে। এই করতে গেলেই সাধন চাই, পরিশ্রম চাই। কিন্তু সোজা পথে সরল প্রাণে মায়ের কাছে যেতে গেলে কেহই আটকাতে পারে না। এটাও যেমন ঠিক, তেমনি এটাও ঠিক যে ব্রহ্মসাধন অথবা ভগবানকে প্রাণের ভিতর প্রত্যক্ষ দেখবার চেষ্টা ব্যতীত আমাদের বাঁচবার অন্য উপায় নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।

ভগবানের কাছে প্রাণের সঙ্গে এই প্রার্থনা করি যে, এই সম্মিলনসমাজ সত্যসত্য মৈত্রীকে ভিত্তি করে দণ্ডায়মান হোক। কে জানত যে সুদূর হিমালয় থেকে একটা নির্ঝরিণী বাহির হয়ে শত শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী এই বঙ্গদেশকে শস্যশ্যামল করে তুলবে? তেমনি কে জানে যে এই সম্মিলন সমাজ যথাসময়ে বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ হয়ে ব্রাহ্মসমাজের বলবিধান করবে না? আমাদের কেবল এইটুকু মনে রাখতে হবে

যে, যেমন সমস্ত নদনদী সরল পথে গিয়ে সমুদ্রেই পড়ে, তেমনি ভগবানের কাছে যাবার, মায়ের কোলে পৌঁছবার পথ অনন্ত—অনন্ত। সুতরাং কে কোন্ পথ দিয়ে মায়ের কোলে যেতে চায়, তা নিয়ে যেন আমরা ঝগড়া না করি। খাল কেটে যেমন উষর ভূমিকে সরস করা হয়, তেমনি দেখাতে শতবার চেষ্টা করব যে কোন্ পথে গেলে সরল পথ ধরা হবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে দ্বন্দ্ববিবাদ ছাড়তে হবে।

এই সম্মিলনসমাজ ব্রাহ্মদের সম্মিলনভূমি হোক; এই সম্মিলন সমাজ, যাঁরা প্রত্যক্ষ ব্রহ্মো-পাসক এবং যাঁরা পরোক্ষভাবে রূপকল্পনার ভিতর দিয়া ব্রহ্মোপাসক, সকলেরই মিলনভূমি হোক। এই সমাজ বক্তৃতা ও সাধনের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করুন। এই সম্মিলনসমাজ নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে যেন দ্বৈতী অদ্বৈতী কাহাকেও নিজের কোল থেকে দূরে ফেলে না দেন। এই সম্মিলনসমাজের ভিতর যেন জাতিভেদ রক্ষা অথবা জাতিভেদত্যাগ, পূর্ব্বজন্ম আছে কি নেই, আদেশবাদ ঠিক কি ঠিক নয় এ সমস্ত ছোটখাটো প্রমাণসাপেক্ষ দর্শন-সাপেক্ষ অবান্তর বিষয়ের তর্কবিতর্কে প্রবেশ করে প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজগুলির মতো একে দলাদলির ক্ষেত্র এবং কাজেই বলহীন করে না ফেলে। এ সমস্ত বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক করবার বিবাদকলহ করবার সময় চলে গেছে। এই সম্মিলনসমাজ মানবমাত্রকেই নির্ব্বিশেষে ভগবানের নাম প্রাণের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করতে যদি শিক্ষা দেন, তবেই ভগবান নিজেই প্রত্যেককে প্রত্যেকের নিজের নিজের উপযুক্ত উপায়ে তাঁর কাছে যাবার কোন্ পথটী সত্যসত্য সরল পথ তা দেখিয়ে দেবেন। তখনই সম্মিলনসমাজের প্রকৃতপক্ষে বিগতবিবাদ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং তখনই সম্মিলনসমাজ প্রকৃতপক্ষে সার্থকনাম ও সফলকাম হবেন। ভগবান্ এই সমাজের উপর তাঁর অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

স্বরলিপি।

জয়জয়ন্তী—দাদ্‌রা।

তোমার চরণ যদি নামে
আমার বুকের পরে—
(তবে) সব কালো কি আলো হয়ে
ফুটবে না?
কাঁটার বন যে হৃদয় আমার—
(ও তার) গায়ে গায়ে কুসুমরাশি
লুটবে না?
শুষ্ক কঠিন মরুভূমি
জানো আমার হৃদয় তুমি,—
(সেই) পাষাণ-পথে সহস্র-ধার
উৎস কি গো
ছুটবে না?

তোমার চরণ যদি নামে
আমার বুকের পরে—
(তবে) তারার মালা আঁধারে কি
দুলবে না?
গোপন প্রাণের বেদন-জ্বালায়
(ও সে) গভীর ধারে সুধার ধারা
গলবে না?
তোমায় ভুলেই আছি আমি
কত যুগ যে হৃদয়-স্বামী;
(ও গো) তুমি আমায় না জাগালে
এ মোহ-স্বপন
টুটবে না॥

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

```
   ১´              •               ১´              •              • ১´
II { মা  মা  -া |   গা  গা  -া I   রা  সা  -া |   সা  -া -গা I   রা  -া  -া |
     তো  মা  র্     চ   র   ণ্      য   দি  •      না  •  •       মে  •   •
     তো  মা  র্     চ   র   ণ্      য   দি  •      না  •  •       মে  •   •

 •             ১´              •               ১´                      •
| -া  -া  -া I  রা  গা  -া |  মা  পা  -া I  ধা  -পধপা  -মগা |  -রা  -গা  মা } I
  •   •   •     আ   মা  র্    বু  কে  র্    প   •••    •••      •    •    রে
  •   •   •     আ   মা  র্    বু  কে  র্    প   •••    •••      •    •    রে
```

১´ • ১´ ° ১´
I মা মা -া। পা ণা র্সা I র্সা -া -র্রা। র্সা ণা -া I ধা পা -া।
ত বে • স ব্কা লো কি • • আ লো • হ য়ে •
ত বে • তা রা্ মা না • • আঁ ধা • রে কি •

• ১´ •
। মা -া -গা I রা -গমা মা। -া -া -া II
ছু • ট্ বে •• না • • •
হ • ল্ বে •• না • • •

১´ • ১´ • ১´
I১ গা গা -া। গা -া সা I সা রা -া। রা রা -া I -া -া -া।
কাঁ টা র্ ব ন্ বে ঘ দ র্ আ মা • • • •
গো প ন্ ব্যা • শের্ বে দ ন্ আ মা • • • •

• ১´ • ১´ •
। -া রা রা I রা গা -া। মা পা -া I পধা পা -া। মা গা -া I
র্ ও তার্ গা য়ে • গা য়ে • কু সু ম্ রা শি •
র্ ও সে গ ভী র্ ধা রে • সু ধা র্ ধা রা •

১´ •
I রগা রগমা মা। -া -া -া II
লুট্ বে •• না • • •
গল্ বে •• না • • •

১´ • ১´ • ১´
II { মা -া পা। পা না -া I না না -া। -া র্সা র্সা I র্সা র্সা -া।
গু র্ ক ক ঠি ন্ ম রু • • তু মি আ লো •
হতা মা শ্ব ভু লে ই আ ছি • • আ মি ক ত •

• ১´ • ১´ •
। র্সা র্সনধা -া I ধা -নর্সর্রা -া। র্রা র্রা -র্না I -া -া -া। -া -া } না I
আ মা•র্ • ক •• র য্ তু মি • • • • • • সেই
যু •গ্যে • হ •• দ য্ স্বা মী • • • • • • ওগো

১´ • ১´ • ১´
I না না -র্সা। র্সা র্সা -র্রা I র্সা ণা -া। ধা পা -া I পধা পা মা।
পা ষা ণ্ প থে • স হ • অ ধা র্ উৎ স কি
তু মি • আ মা য্ না জা • গা লে এ মো হ স্ব

• ১´ •
। গা রা -গা I রা -গমা মা। -া -া -া II II
গো ছু ট্ বে •• না • • ৯
প্ন্ টু ট্ বে •• না • • •

(১) উপরকার পংক্তির বাণীগুলিকে ১ম "তোমার চরণ যদি" হইতে ধরিয়া "ছুটবে না" পর্য্যন্ত, উপরকার পংক্তিতেই আরম্ভ ও শেষ করা হইয়াছে।

(২) নীচেকার পংক্তির বাণীগুলিকে, ঠিক্ সেই হিসাবে, ২য় বারের "তোমার চরণ যদি" হইতে ধরিয়া "টুট্‌বে না" পর্য্যন্ত নীচেকার পংক্তিতেই আরম্ভ ও শেষ করা হইয়াছে

সম্রাটের ঘোষণা।

ভগবানের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে আমি পঞ্চম জর্জ্জ গ্রেট ব্রিটেন ও আয়রলাণ্ড যুক্তরাজ্যের এবং সমুদ্রের অপর পারের ব্রিটিশ অধিকৃত দেশ সকলের রাজা, খৃষ্টানধর্ম্মের রক্ষক ও বাহক এবং ভারতবর্ষের সম্রাট।

ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা গবর্ণরজেনারেল এবং আমার রাজপ্রতিনিধি, সামন্তরাজসকলের রাজা ও শাসনকর্ত্তা, এবং ভারতবর্ষের সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী আমার প্রজাবর্গকে অভিনন্দিত করিয়া এই ঘোষণা প্রচার করিতেছি।

(১) ভারতবর্ষের শাসনকেন্দ্রে এবং পদ্ধতিতে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইল—পরিবর্ত্তনের একটা নূতন যুগ সূচিত হইল। আজ আমি এমন একটা আইনে আমার রাজকীয় স্বীকৃতি এবং স্বাক্ষর যোগ করিয়াছি যাহা পূর্ব্বেকার ইতিহাস প্রসিদ্ধ, যে সকল শাসন-পদ্ধতি এই ব্রিটিশ রাজ্যের পার্লামেণ্ট আইনে পরিণত করিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের উন্নতিবিধানকল্পে এবং প্রজাবর্গের অধিকতর তুষ্টি-সাধনকল্পে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের যে সকল আইন মান্যবর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে রচিত হইয়াছিল, এ দেশে সুশাসনের ধারা এবং সুবিচারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল। পরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাবর্গকে শাসনসংযত কার্য্যে ও পদে নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে এক আইন রচিত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে আইন হয় সে আইনের প্রভাব ভারত-শাসনকার্য্যের ভার কোম্পানীর হস্ত হইতে তুলিয়া লইয়া রাজশক্তির অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং উহারই প্রভাবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকারে সাধারণের হিতচিকীর্ষার পক্ষে সুব্রতাচরণের বেদী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাতির সাধারণ জীবন এখনও ভারতবর্ষে সজীব রহিয়াছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আইনের কল্যাণে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ অধিকারে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রের বীজ বপন করা হয় এবং সে বীজ ১৯১৯ সালের আইনের প্রভাবে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন যে আইন পাশ হইল, সে আইনের দ্বারা প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণকে রাজ-শাসনের একটা নির্দ্দিষ্ট বিভাগের ভার দেওয়া হইল। ইহার ফলে ভবিষ্যতে পূর্ণ দায়ীত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হইল। আমি এমন আশা আশ্বস্তির সহিত করিতে পারি যে, এই আইন যে নব-নীতির ও পদ্ধতির সূচনা করিতেছে তাহা যদি সফলতার পথে অব্যাহতভাবে অগ্রসর হয়, তবে মানবজাতির উন্নতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহা একটা বড় স্থান অধিকার করিবে। সেই জন্য, শুভ অবসর বুঝিয়া এবং উপযোগী সময় জানিয়া আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, আমার মত আশ্বস্ত হইয়া আপনারা অতীতের আলোচনা করুন এবং ভবিষ্যতে কল্যাণের আশা করুন।

(২) যেদিন হইতে ভারতবর্ষের কল্যাণচিন্তার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে আমি এবং আমার রাজবংশের পূর্ব্বজগণ ইহাকে পবিত্র এবং অবশ্য-প্রতিপাল্য ন্যাসের ন্যায় গ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন। গত ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পুণ্যশ্লোকা রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ইহা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন যে, যে বাধ্য-বাধকতাসূত্রে তিনি তাঁহার অন্য প্রজাদের সহিত আবদ্ধ, ঠিক সেই সমসূত্রেই তিনি ভারতীয় প্রজাদের নিকট দায়ী ছিলেন। এই ঘোষণার পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের প্রজাবর্গকে ধর্ম্মাচরণে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে আইনের রক্ষাকবচ দান করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালে যখন আমার শ্রদ্ধাস্পদ জনক রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিদ্ধান্ত ও শাসনপদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালের ঘোষণাতেও তিনি এই অঙ্গীকারকে দৃঢ় করেন এবং পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে অভয়বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহার পুনরুক্তিও সমর্থন করেন। গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আমি যখন সিংহাসনে আরোহণ করি, তখন আমি ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গকে এবং প্রজাপুঞ্জকে তাহাদের প্রতি আমার আনুকূল্য, অনুরাগ ও অনুকম্পা যে নিত্য অব্যাহত আছে ও থাকিবে, সে সমাচার তাহাদিগকে শুনাই এবং তাহাদের রাজভক্তি এবং রাজানুগত্য স্বীকার করিয়া ইহাও অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, ভারতবাসীর কল্যাণ

ও উন্নতি আমার পক্ষে একটা প্রধান চিন্তার এবং আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া থাকিবে। পর বৎসর আমি মহারাণীকে সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলাম এবং সেই সময় ভারতবর্ষের প্রতি আমার হৃদ্গত অনুরাগ ও অনুকম্পার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলাম।

(৩) উপরে যাহার আবৃত্তি করিলাম তাহাতে এক পক্ষে স্নেহের ও অনুকম্পার অন্য পক্ষে অনুরাগ ও আনুগত্যের পরিচায়ক; এবং এই পরিচয়েই আমি এবং আমার পূর্বজগণ অনুপ্রাণিত হইয়া ভারত রক্ষা ও শাসন করিয়া আসিতেছি। পরন্তু আমার এই যুক্তরাজ্যের অধিবাসিগণ এবং পার্লামেণ্ট এবং ভারতশাসন উদ্দেশ্যে যাহারা আমার প্রতিনিধি কর্ম্মচারী হইয়া সে দেশে বাস করিতেছেন ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর আর্থিক, সাংসারিক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ভারতবর্ষের অধিবাসিবর্গকে, আমরা বিধাতার কৃপায় যে সকল সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি তাহার অংশভাগী করিতে কখনও সঙ্কোচ বোধ করি নাই, কিন্তু এখনও একটা সামগ্রী দিবার আছে—একটা অধিকার দান করিবার আছে, যাহা না পাইলে কোন জাতি ঐহিক উন্নতিতে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। তাহা এই—স্বজাতির এবং স্বদেশের শাসন এবং রক্ষাকার্য্য, স্বজাতির এবং স্বদেশের স্বার্থ ও সমৃদ্ধির পুষ্টিসাধন করিবার যে দাবী বা অধিকার প্রত্যেক জাতির ব্যষ্টির হৃদয়ে নিহিত আছে, তাহারই উন্মেষসাধন।

বহিঃশত্রুর অভিযান ও আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার যে দায়িত্ব আছে তাহা সাম্রাজ্যের রাজা প্রজা সকলেরই পক্ষে স্পর্দ্ধার কর্ত্তব্য। পরন্তু ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ও সামাজিক সুশাসনের ও রক্ষার ভার ভারতবাসী মাত্রেই নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিবার আশা ও আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে এবং সে আশা ও আকাঙ্ক্ষা অসঙ্গত বা অন্যায় নহে। কিন্তু ইহা অতি গুরুভার। ইহার গুরুত্ব এত অধিক যে, সদ্য সদ্য এ ভার কাহারও স্কন্ধে সহসা অর্পণ করা চলে না; কিছু কিছু করিয়া অধিকার দিয়া ভারতবর্ষের প্রজাবর্গকে অভিজ্ঞ এবং পর্য্যাপ্ত যোগ্যতায় উপেত করিবার ইচ্ছা আমার আছে এবং সেই সঙ্কল্প অনুসারেই আমি এই অবসর সৃষ্টি করিয়া দিতেছি। ইহার কল্যাণে আমার প্রজাবর্গ ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, ক্রমে ক্রমে পর্য্যাপ্ত যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে এবং সেই যোগ্যতালাভের অনুপাতে তাহাদের পক্ষে শাসনাধিকার সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

(৪) ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের হৃদয়ে প্রতিনিধিমূলক ও দায়িত্বপূর্ণ শাসন পদ্ধতির প্রতি যে অনুরাগের ভাব উপচিত হইতেছে তাহা আমি অনুকম্পা এবং উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিতেছি এবং অনুভব করিতেছি। সামান্য এবং অতি ক্ষুদ্র সূচনা হইতে এই আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর মস্তিষ্কে ধীরে ধীরে প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে এবং দৃঢ় সাধনায় পরিণত হইয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা বৈধ প্রণালীর ভিতর প্রবাহিত হইয়া দৃঢ় সঙ্কল্পে ও তেজস্বিতায় প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহারই মধ্যে অনেক বার অনেকে আইনের গণ্ডী কাটিয়া অত্যাচার উপদ্রব করিয়া নিন্দা ও গ্লানির কলঙ্ক লেপ দিয়া এই আকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, পরন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। দেশাত্মবোধের আবরণে যে দাঙ্গাফ্যাসাদ ঘটান হইয়াছিল তাহার কলঙ্কগঞ্জনাকে পরাজিত করিয়া আমার প্রজাবর্গের হৃদয়ে সে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই প্রবলতা লাভ করিয়াছে; কারণ বিগত মহাযুদ্ধের সময় যে মানবতার উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ব্রিটিশ জাতি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন সেই আদর্শের উদ্বোধনে ভারতবাসীও সংবুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং আমাদের সহিত সুখে, দুঃখে, জয়ে পরাজয়ে, সমভাগী হইয়া সে দুর্দ্দিন সহচররূপে অতিবাহন করিয়াছিল, এ সাহচর্য্য, এ সাধনা যে সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষাজাত—সেই সিদ্ধিলাভের অনুকূল তপস্যা ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না।

সত্য কথা বলিতে কি, ব্রিটিশ জাতির সহিত ভারতবর্ষের শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ হইতেই স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীদের মনে জাগিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ব্রিটিশ জাতির সহিত ভারতবাসীর সম্বন্ধের ফলে ভারতবাসী জগতে

মানবতন্ত্রে জাতীয় অভ্যুদয়ের এবং তৎসঙ্গে জাতি বিশেষের ইতিহাস-বিন্যাসের পরিচয় ও অধ্যয়ন করিয়া অনিবার্য্যরূপে এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে; এ চেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা বিটিশ শাসন ফলেই অপ্রতিহত-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন ভাব, এমন আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে কল্যাণময় ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে ব্যর্থই হইত এবং ব্রিটিশ জাতি ভারতবর্ষে যে ব্রত অবলম্বন করিয়া কাজ করিতেছিলেন সে ব্রতের উদ্‌যাপন পূর্ণ হইত না। সেই হেতু যথেষ্ট বিচার ও বিবেচনা করিয়া বহু বৎসর পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে প্রতিনিধিমূলক ও দায়ীত্বসূচক শাসনের বীজ বপন করা হয়। পরে স্তরে স্তরে, ক্রমে ক্রমে ইহার বিস্তার ও সম্প্রসারণ সাধন করা হয়। এখন আমাদের সম্মুখে আর একপদ চলিতে বাকী আছে, সেই পদ অবলম্বন করিলেই ভারতবর্ষে দায়ীত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রচলনের প্রতিষ্ঠা হইবে। আজ আমি তাহাই করিলাম।

(৫) ভারতবর্ষের প্রতি যে অনুরাগ ও অনুকম্পা আমি বংশানুক্রমে ধারণ করিয়া আসিতেছি তাহাকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া আমি এই পথে আমার প্রজা ভারতবাসী কি ভাবে অগ্রসর হন তাহা লক্ষ্য করিব। পথ বড় বন্ধুর, অনায়াসগম্য নহে। এই পথে সিদ্ধিলাভের পক্ষে অগ্রসর হইতে হইলে অনেক বাধা-বিঘ্ন ঘটিবে, অনেক দুঃখ-কষ্ট সহিতে হইবে এবং ভারতবাসী সকল শ্রেণীর প্রজার মধ্যে তিতিক্ষা ও ক্ষমা সম্যকরূপে প্রকট করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে সকল উচ্চগুণ না থাকিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না, তাহা আমার প্রজাবর্গের মধ্যে স্বতএব বিকশিত হইবে এবং আমার আশা আছে যে, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ নিজেদের দায়ীত্ব বুঝিয়া দেশের প্রজাসাধারণের অভাব অভিযোগ নিরসনে কৃতসঙ্কল্প হইবেন এবং তাহাদের কল্যাণ-সাধনে উদ্যোগী হইবেন; কেন না এখনও দরিদ্র জনসাধারণ নির্ব্বাচন-অধিকারে অধিকারী হইতে পারে নাই। যাহারা ভোট দিতে পারিবে না, তাহারা যেন উপেক্ষিত না হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমার প্রজাপুঞ্জের নেতৃবর্গ, ভাবিমন্ত্রিগণ দায়ীত্বভার গ্রহণ করিয়া দেশের ও জাতির কল্যাণসাধনের জন্য ব্রতী হইবেন এবং ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা শ্রেণীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সমগ্র রাষ্ট্রের ও জাতির কল্যাণকল্পে দীক্ষিত হইবেন।

কারণ, ইহা যেন স্মরণ থাকে যে, প্রকৃত দেশাত্মবোধ দল এবং শ্রেণীর গণ্ডী কাটাইয়া উচ্চ ও উদার কার্য্যে লিপ্ত হয়। তাই আমার অনুরোধ যে, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের অনুরাগ ও আনুকূল্য রক্ষা করিয়া মন্ত্রী সকল আমার ভারতবর্ষের শাসক-সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারিগণের সহিত একযোগে সাম্রাজ্যের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া কার্য্য করিবেন এবং ক্ষুদ্র ও সামান্য মতভেদ পরিহার করিয়া নিরপেক্ষ এবং সমবেদনাপূর্ণ শাসনপদ্ধতি প্রচলনে সচেষ্ট হইবেন। যেমন মন্ত্রিগণের কাছে আমি এই আশা করিতেছি তেমনই আমার নিযুক্ত শাসক-সম্প্রদায়ের নিকটও আমার এই দাবী যে, তাঁহারা উহাঁদের নূতন সহচরদের সহিত সদ্ভাব ও সমবেদনা রক্ষা করিয়া কার্য্য করিবেন এবং আমার প্রজা ও প্রজার প্রতিনিধিবর্গকে সংযতভাবে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের পথে পরিচালিত করিবেন। তাঁহারা পূর্ব্বে যেমন ধীরতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন এবং উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতির ও দেশের সেবা করিয়াছেন তাহা হইতে চ্যুত হইবেন না।

(৬) এই সন্ধিক্ষণে আমার এই বড় সাধ যে যতদূর সম্ভব আমার প্রজা এবং শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটু তিক্ত বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়াছিল তাহা মুছিয়া যায়। যাঁহারা রাজনীতিক উন্নতি-সাধনের আকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত হইয়া আইনের গণ্ডী কাটিয়া অত্যাচার উপদ্রব করিয়াছিলেন তাঁহারা যেন ভবিষ্যৎ আইন মানিয়া চলেন, ইহাই আমার অনুরোধ। আর ভারতশাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত আমার কর্ম্মচারীবর্গ যাহারা ভারতবর্ষে শান্তি ও আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ভার পাইয়াছেন এবং সেই হেতু প্রজাপক্ষের উৎপাত উপদ্রবকে কঠোর হস্তে দলন করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাঁহারাও যেন প্রজার আব্দার আধিক্যটা ভুলিয়া যান। তাঁহাদের স্মৃতিপট হইতে অতীতটাকে মুছিয়া ফেলেন। একটা নূতন যুগের সূচনা হইতেছে; এ সময়ে আমার প্রজা এবং রাজকর্ম্ম-

চারীদের সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহাতে শাসক ও শাসিত উভয়েই এক সঙ্কল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া একযোগে কাজ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই হেতু আমি আমার রাজপ্রতিনিধিকে আদেশ করিতেছি যে আমার পক্ষ হইতে এবং আমার প্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে সাধারণভাবে দয়াপ্রকাশ করুন অর্থাৎ যে সকল রাজনীতিক অপরাধী দণ্ডিত হইয়াছেন, দেশের শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়া তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা হউক। যাঁহারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইয়া কোন বিশেষ আইনের ধারা অনুসারে বা সহসাসঞ্জাত কোন বিধির বিধানানুসারে কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত বা অন্য কোন পদ্ধতি অনুসারে স্বাধীনতা উপভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পূর্ণ অব্যাহতি দিতে হইবে।

আমার বিশ্বাস আছে যে এই অনুকম্পার যাঁহারা ফলভোগী হইবেন বা অব্যাহতি পাইবেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে এমন ব্যবহার করিবেন এবং আমার প্রজা সাধারণও এমন ভাবে চলিবেন যাহার কল্যাণে এ সকল আইনের প্রয়োগ আবশ্যকই হইবে না।

(৭) এই সঙ্গে অর্থাৎ ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে শাসনাধিকার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সামন্তরাজগণের জন্য একটা মন্ত্রণা-মজলিসের প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এই মজলিসে সামন্তরাজগণ সমবেত হইয়া তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্যের কল্যাণ কামনার পরামর্শ করিবেন এবং নিজেদের সম্প্রদায়ে সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইবেন। এই মন্ত্রণা-মজলিস আমার বিশ্বাস, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এবং সমস্ত ভারতবর্ষের মঙ্গলাস্পদ হইবে। এই সঙ্গে আমি আমার সামন্তরাজগণকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্যে এবং রাজ্যশাসনকার্য্যে যে সকল অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা অব্যাহত এবং অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কোন ক্রমে তাহার কোন অংশের অপচয় ঘটান হইবে না।

(৮) আমার প্রিয় পুত্র যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্‌কে আগামী শীতকালে আমি ভারতবর্ষে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তিনি ভারবর্ষে যাইয়া সামন্তরাজ-সংসদের প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে নূতন শাসন-অধিকারের উদ্বোধন সাধন করিবেন। ভগবান করুণ, তিনি যেন ভারতবর্ষে যাইয়া শান্তি ও স্বস্তি দেখিতে পান, প্রজাবর্গের মধ্যে সদ্ভাব ও সাহচর্য্য দেখিতে পান, শাসক ও শাসিতের মধ্যে অনুরাগ ও অনুকম্পার পরিচয় পান। কেন না এই ভাবসমন্বয়ের উপরই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

এইবার আমার প্রজাবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া সমকণ্ঠে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহার কৃপায় এবং মহিমায় ভারতবর্ষ এমন ভাবে পরিচালিত হউক যাহার প্রভাবে ইহার সমৃদ্ধি ও শান্তি, তুষ্টি ও তৃপ্তি পূর্ণাঙ্গ হয় এবং ভারতবাসী পূর্ণ রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভে পর্য্যাপ্ত যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

হিন্দুস্থান, ৯ পৌষ ১৩২৮।

বরাবর পাহাড়ের নূতন প্রস্তরলিপি।

১। চীনপরিব্রাজক হিউয়েন-সিয়াং এর বর্ণনায় আছে যে পাটলিপুত্র ও গয়ার মধ্যবর্ত্তী দেশে একটী বড় পাহাড় ছিল। এই পাহাড় একাধারে ঋষি, বিষধর সর্প ও হিংস্র জীবজন্তুর আবাসভূমি ছিল। দেবতারা এই পাহাড়ের শীর্ষদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণি-মাণিক্য খচিত দশ ফিট উচ্চ একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে ঐ সকল বহু মূল্যবান্ বস্তু প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে এবং বহুকাল হইতে সেখানে কোন জনপ্রাণীর সমাগমও নাই। 'এই পাহাড়ের পূর্ব্বদিকের শীর্ষদেশে একটী স্তূপ আছে। এখানে দাঁড়াইয়া তথাগত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত মগধদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।'

এই পাহাড়ের অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ নাই। যদি তিলৌরা, ধরাবত এবং কোকোদলকে যথাক্রমে তিলোদক, গুণমতী ও শিলভদ্র বিহারের সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে এই সকল স্থানের দূরত্ব ও স্থিতি বিবে-

চনা করিলে বরাবর পাহাড়কে নিঃসন্দেহে পরিব্রাজকবর্ণিত পাহাড়ের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে হয় এবং বর্ত্তমান সিদ্ধেশ্বর নাথের মন্দির হইতেই ভগবান্ বুদ্ধদেব মগধদেশ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। এই স্থান নির্ণয়ের কথা সর্ব্বপ্রথমে মিঃ বেগলার ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন। কিছুকাল জেনারেল কানিংহাম ভ্রমবশতঃ পরিব্রাজক-বর্ণিত পাহাড় ও গিরিয়েক ও গয়ার মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণদিকের পর্ব্বতমালা অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। এই পর্ব্বতমালা ওয়াজীরগঞ্জের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে জেনারেল যখন তৃতীয়বারে বিহার ভ্রমণ করেন তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তীকালে (১৮৭৯-৮০ ও ১৮৮০-৮১ খৃঃ) তিনি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহাতে তিনি মিঃ বেগলারের সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং ইহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে আছে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন পূর্ব্বদিকে গিরিব্রজে যখন জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন তখন তাঁহারা—

'গোরথং গিরিমাসাদ্য দদৃশুর্মাগধং পুরম্ ॥'

গোরথগিরি হইতে মগধদেশের পুরী দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই গোরথগিরির কথা অপর কোন সংস্কৃতগ্রন্থে আছে কিনা বলা যায় না। খুব সম্ভবতঃ মিঃ বেগলারই সর্ব্বপ্রথমে এই পাহাড়কে বিহারের কোন পাহাড়ের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "গোরথ" ও "বাথান" একার্থবোধক এবং ইহাতে গৃহপালিত গবাদি পশু বুঝায়, এইজন্য রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান 'বাথান' পাহাড়ের প্রাচীন নাম মহাভারতের গোরথগিরি ছিল।

এই ক্ষেত্রে মিঃ বেগলারের অনুমান সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 'বাথান' ও 'গোরথ' এই দুইটী নামের অর্থগত সামঞ্জস্য এত সামান্য যে ইহা হইতে ইহাদের অভেদত্ব কোন দিক দিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বরাবর পাহাড়ের সিদ্ধেশ্বর পর্ব্বতচূড়া হইতে রাজগৃহ পর্ব্বতের উত্তরদিকের উপত্যকার দূরত্ব সরল রেখায় প্রায় তেইশ মাইল। বাথানি পর্ব্বত অতি নীচু এবং বরাবর হইতে রাজগৃহের তিন পোয়া ব্যবধানে এই সরল রেখার উপর অবস্থিত। এই পর্ব্বতমালার সন্নিকটে দক্ষিণদিকে অন্যান্য উচ্চতর পাহাড় আছে, কতকগুলি বাথানি অপেক্ষাও রাজগৃহের নিকটতর, কিন্তু সবগুলিই রাজগৃহ পর্ব্বতশ্রেণীর তুলনায় অতি নীচু এবং ইহাদের কোন পাহাড় হইতেই মগধদেশের চারিদিকের দৃশ্য একখানি চিত্রপটের মত পুরাপুরিভাবে প্রতিভাত হয় না।

গোরথগিরির স্থাননির্ণয় এতদিন সমস্যার বিষয় ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, মহাভারতের আমলে বরাবর পর্ব্বতই গোরথগিরি নামে পরিচিত ছিল। বরাবরে প্রাপ্ত দুইখানি প্রস্তরলিপি হইতে ইহার সবিশেষ প্রমাণ জানিতে পারা যায়। সম্রাট্ অশোকের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত গুহার নিকটেই পাহাড়ের উপর এই প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই প্রস্তরলিপি ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'এই লিপি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।' ইহা সম্ভবপর যে এই অক্ষরগুলি অশোক গুহার লিপির সমসাময়িক (অর্থাৎ ২৫৭-২৫০ খৃঃ পূঃ) এবং ইহাও সম্ভবপর যে একই শিল্পী উভয় স্থানের লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক ভিনেসণ্ট স্মিথ বলেন 'উত্তরে বা দক্ষিণে প্রাপ্ত কোন প্রস্তরলিপিই অশোকলিপির পূর্ব্বে উৎকীর্ণ বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।' গোরথলিপির স্থাননির্ণয়ে এই প্রস্তরলিপি যে সবিশেষ মূল্যবান্ ইহা আর বর্ত্তমানে অস্বীকার করা যায় না।

গোরথগিরির অবস্থিতি সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রমাণ গ্রহণ করিলে, মহাভারত ও হিউয়ান্‌সিয়াংএর বর্ণিত পাহাড় যে বর্ত্তমান সিদ্ধেশ্বর শৃঙ্গ ইহা স্বীকার করিতে কোনই আপত্তি দেখা যায় না। বরাবরের সিদ্ধেশ্বর শৃঙ্গে তিন্তিড়ী বৃক্ষে পরিবেষ্টিত একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এই স্থান হইতে রাজগির পর্ব্বতমালা অতি সুন্দর দেখায় এবং খুব নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। বহু দূরবর্ত্তী (প্রায় বিশ কি ত্রিশ মাইল) গুর্পা ও শৃঙ্গা পাহাড়দ্বয়ও চক্রবালের সীমান্ত রেখায় অতি পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

২। প্রথম সুবৃহৎ প্রস্তরলিপিখানি ১৯১৩ খৃঃ

৫ই মার্চ্চ মেসার্স জ্যাক্‌সন্ ও রাসেল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রস্তরলিপি বড় একখানা প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ এবং ইহা ভূমি হইতে ৮৷৷০ ফিট উচ্চ। এই লিপি পাহাড়ের যে অংশে উৎকীর্ণ সেই দিক্‌টা একেবারে মুক্ত। এই কারণে অক্ষরগুলি বৃষ্টি ও বাত্যায় ক্ষয় হইয়া একটু অস্পষ্ট হইয়াছে। প্রথমে 'গোরথ' শব্দটী বেশ পড়িতে পারা গিয়াছিল, কিন্তু শেষের বাক্যটী বুঝিতে পারা যায় নাই। ছয়-মাস পর প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হইতে এই লিপির ছাপ গ্রহণ করা হইল রাখাল বাবু উহা পড়িয়া রিপোর্টে লিখিয়াছেন, 'এই ছাপটী সম্পূর্ণ নয়। ইহাতে শেষের অক্ষরটী বাদ পড়িয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শেষাংশ 'গিরো' বা 'গিরৌ' (পাহাড়ে) হইবে। 'গোরথ' 'গোরট' শব্দের অপভ্রংশ হইবে।'

এই রিপোর্ট পাইয়া মিঃ জ্যাক্‌সন প্রস্তরলিপি-খানি বিশেষভাবে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মতে উহাতে কোন অক্ষরই বাদ পড়ে নাই এবং উহাতে যে শেষ অক্ষর ছিল এমন কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না।

দ্বিতীয় প্রস্তরলিপিখানা মিঃ জ্যাক্‌সন্ ১৯১৪খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর আবিষ্কার করেন। এই সময়ে তিনি সুদাম ও লোমশ ঋষিগুহার অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। লোমশ-ঋষি-গুহার প্রবেশদ্বারের কেন্দ্র হইতে বিশ ফিট দক্ষিণে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দরজার Lintel হইতে প্রায় সাত ফিটু উপরে স্থাপিত। ১৮৪৭ খৃঃ কাপ্তেন কিটো এই গুহার অভ্যন্তরের জল বাহির করিয়া দেওয়ায় জন্য একটী পরিখা খনন করিয়াছিলেন। এই প্রস্তরলিপির 'থ' অক্ষরটী ভিন্ন প্রথমোক্ত লিপিরই অনুরূপ। রাখাল বাবুর মতে এখানেও 'গোরথগিরি' লিপি-গুলি উৎকীর্ণ আছে। 'থ' লিপিটী বিভিন্ন প্রকা-রের হইলেও ইহা যে 'থ' তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রস্তরলিপির আকৃতি প্রথম খানার তুল-নায় অর্দ্ধেক। শেষ লিপির একটু পরেই 'ভা' লিপি যে ছিল তাহার কতকটা প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা ঠিক কিনা তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই।

একই নমুনার দুইটী প্রস্তরলিপি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হওয়ায়, বরাবর ও গোরথগিরির অভিন্নতা সম্বন্ধে অনেকটা সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে। তবে এই বিষয়টী অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য মিঃ জ্যাকসন দুইটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। সেই দুইটী এই:—(ক) শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সহিত গোরথগিরি হইতে মাগধপুর দর্শন করিয়াছিলেন। মহাভারতে আছে 'গোরথং গিরিমাসাদ্য দদৃশুর্মাগধং পুরম্।' যদি মহাভারতকার দুর্গবেষ্টিত প্রাচীন রাজগৃহ বা গিরিব্রজের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে বরাবরের শৃঙ্গ বা গোরথগিরি হইতে উহা দর্শন একরূপ অসম্ভব। 'মগধ দেশ তাঁহারা দেখিয়াছিলেন' ইহা বলিলে কোনই গোলযোগ থাকে না।

মাননীয় মিঃ ওল্ডহাম 'মাগধপুরম'এর ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন 'সম্ভবতঃ মাগধপুর বরাবর পর্ব্বতমালার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান ইব্রাহিমপুর ঐ নগর হইবে'। ইহা ঠিক যে প্রাচীনকালে এই স্থানে বড় একটী উপনিবেশ ছিল; ইব্রাহিমপুর ও জরুগ্রামের চারিদিকে মাঠে ঘাটে বহু প্রস্তর ও ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষকেরা জমি চাষের সময় ভগ্নস্তূপের ইতস্ততবিক্ষিপ্ত বহু ইট ও পাথর পাইয়া থাকে। এই সহরটী পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু এই ইটপাথরগুলি অতি প্রাচীনকালের বলিয়া মনে হয় না। মিঃ জ্যাকসন বিশেষ চেষ্টা করিয়াও প্রাচীন ভগ্নস্তূপের ইট পাথর পান নাই। ইহা হইতে তিনি মনে করেন সেই সময়ে শিল্পীরা সুন্দর সুন্দর তৈরী ইট পাথর প্রস্তুত করিতে পারিত না। প্রাচীন রাজগৃহে যেরূপ অতীতকালের সুন্দর সুন্দর ইট পাথর পাওয়া যায় সেরূপ ইট পাথর ইব্রাহিমপুরে দেখিতে পাওয়া যায় না।

সিদ্ধেশ্বরনাথশৃঙ্গের পাদদেশে একটি স্থানে অনেক সুন্দর সুন্দর ইট-পাথর পাওয়া যায়। দক্ষিণে শৈলবেষ্টিত স্থানে চারিটি অশোকনির্ম্মিত গুহা আছে। পূর্ব্বদিকে ফল্গুর পশ্চিম শাখা পর্য্যন্ত যে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি আছে সেই ভূমি সম্বন্ধে মিঃ বুকানন বলেন, 'স্থানীয় লোকেরা বলে এই স্থানেই শ্রীরামচন্দ্র গয়াসুরের উপর যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

ইহাই প্রকৃত রামগয়া, তবে এইস্থান দূরবর্ত্তী বলিয়া গয়ালীরা প্রাচীন গয়ায় নূতন রামগয়া স্থাপন করিয়াছিলেন'; এই জনশ্রুতির কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

উপরোক্ত প্রস্তরলিপি দুইখানি আবিষ্কারের অল্প কিছুদিন পর 'পাটনা কলেজ ম্যাগাজিনে' লিখিত হইয়াছে, 'বরাবর পর্ব্বতমালার বেষ্টনীর ভিতরে বহুস্থানে প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকার বনিয়াদ দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধেশ্বর শৃঙ্গের পাদ-দেশের পূর্ব্বদিকে এবং উপত্যকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে জঙ্গলের ভিতর এইরূপ বনিয়াদ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এই বেষ্টনী এত ক্ষুদ্র যে, ইহার ভিতর যে বড় একটি সহরের পত্তন হইয়াছিল তাহা মনে হয় না, তবে ইহা সুরক্ষিত এবং নিরাপদ বলিয়া বাহিরের লোকেরা এখানে আসিয়া বিপদের সময় আশ্রয় লইত। বেষ্টনীর পূর্ব্বদিকের সুরক্ষিত দ্বার হইতে যে রাস্তা গিয়াছে তাহারই 'শেষ প্রান্তে সহরটি অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়।'

সহরটি যে প্রাচীন রাজগৃহের সমসাময়িক, এই সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে। দক্ষিণ পর্ব্বত-মালার শৃঙ্গের উপরে একটা গুম্বজাকার প্রস্তর-নির্ম্মিত দুর্গ আছে, এই দুর্গের অনুরূপ বহু দুর্গ রাজগিরে দেখিতে পাওয়া যায়। বেষ্ট-নীর ভিতর দিয়া দুর্গ পর্য্যন্ত একটা রাস্তা আছে। রাম-গয়ার সমতল ভূমিতে যে মুরলী পাহাড় আছে, তাহার পশ্চিম প্রান্তে অষ্টকোণাকৃতি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে রাণাসুরের আখড়া ছিল। প্রাচীন রাজগৃহের কেন্দ্রে অবস্থিত মনিয়ার মঠও এইরূপ বহু দালানকোটা আছে।

গোরথগিরির স্থান-নিরূপণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে উপরোক্ত গুহাশিলালিপির এক-খানিতে বরাবর পাহাড়ের অপর নাম 'খলতিক' দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র গুহার শিলা-লিপিতে আছে,—

'লজিন পিয়দশিন দুভদশভসভিষিতেন ইয়ং
কুভ খলতিক পবতসি দিন অজিভিকেহি।'

খলতিক পাহাড়ে অবস্থিত এই গুহা রাজা প্রিয়দর্শী তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির ত্রয়োদশ বৎসরে অজিভিকদের দান করিয়াছিলেন। পাণিনীর বার্ত্তিকায়ও খলিতক পর্ব্বতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'খলি-তক' শব্দ উক্ত পাহাড়ের সংলগ্ন বনভূমিকে বুঝায়।

কানিংহাম সাহেব কর্ণ চৌপার গুহার প্রবেশ দ্বারের উত্তরদিকে শিলালিপিতে খলতি (বা খলন্তি) পর্ব্বতের উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেনার্ট, বার্ণফ অথবা বুলার আদ্যাক্ষর 'খ' ভিন্ন আর কিছুই পড়িতে পারেন নাই।

'খলতিক' শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। বার্ণফ 'খলিতক' স্থলে 'স্খলতিক' (পিচ্ছিল) ব্যবহার করিয়াছেন এবং বুলার 'খলতি' শব্দের অর্থ 'নেড়া' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পাহাড়ের কতকটা অংশ যে পিচ্ছিল ও নেড়া তাহাতে কোন ভুল নাই।

জ্যাকসন সাহেব বলেন 'ভাষাগত অর্থের আপত্তি না থাকিলে আমি বরাবর পাহাড়ের 'খল-তিক' 'গোরথ' বা 'গোরথক' প্রভৃতি বিভিন্ন নাম গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি দেখি না। ইহা ঠিক যে বরাবর পাহাড় রাজগৃহের গিরিব্রজ নামের মত বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। পরবর্ত্তীকালে ইহারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হিউয়েনসিয়াংএর সময়ে প্রাচীন রাজগৃহের নাম কুশাগরপুর ছিল। ১৮১১ খৃঃ বুকানন ইহাকে 'হংসপুর নগর' এবং ১৮৪৭ খৃঃ কিটো 'হংসুটানর' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ নামে রাজগৃহকে কেহ অভিহিত করে না। এইরূপে লোমশঋষি গুহার নাম সপ্তম শতাব্দের শিলালিপিতে 'প্রভর-গিরি-গুহা' দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই প্রভরগিরি' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানে 'বরাবর' হইয়াছে।*

ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ।

["স্যার" উপাধি ত্যাগে]

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

হে বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্র বঙ্গের!
ত্যাগের মহিমা-গর্ব্বে কি দীপ্তি চিত্তের

* এই প্রবন্ধ মিঃ V. H. Jackson, M. A. লিখিত ও বিহার ও উড়িষ্যার জার্ণালে প্রকাশিত 'Two new Inscriptions from the Barabar Hills, and an identification of Gorathagiri' প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

উদ্ভাসিল আজি তব! তুমি নহ আর
ধনীর দুলাল শুধু, ভারতীমাতার
সুধাস্রাবী সপ্ততন্ত্রী, বসন্তের পিক্
মধুকণ্ঠ অতুলন! মুগ্ধ দশ দিক্
হেরিতেছে সবিস্ময়ে মহর্ষি-সন্তান
উদার নির্ভীক প্রাণে ন্যায়ের সম্মান
রক্ষিবারে রাজদণ্ড মোহের শৃঙ্খল
ছিন্ন করি অনায়াসে তপোতেজোজ্জ্বল
প্রবোধিত ভারতের লাঞ্ছিত আত্মার
দাঁড়াল প্রতিভূরূপে! ত্যজিয়ে অ-'সার'
আজি সত্য সার-গ্রাহী ঋষি নরোত্তম
তুমি আর্য্যকুল-রবি! ভাতে নিরুপম
মেঘ মুক্ত দিনমণি! লহ নমস্কার
হে সবিতৃ বাঙ্গালার! কবি চট্টলার
করে তোমা অর্ঘ্য দান! প্রবুদ্ধ ভারত
প্রতীক্ষা করিছে আজি, ওগো সিদ্ধব্রত!
রুদ্র-গীতি তব কণ্ঠে শুনিতে এবার
সকল সুপ্তির অন্তে প্রণব-ঝঙ্কার!

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

দশম প্রকরণ।

কর্ম্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।*

মহাভারত, শান্তি, ২৪০.৭।

এই জগতে যাহা কিছু আছে তাহাই পরব্রহ্ম, পরব্রহ্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য কিছু নাই, এই সিদ্ধান্ত পরিণামে সত্য হইলেও মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-গোচর দৃশ্য জগতের পদার্থসমূহ অধ্যাত্মশাস্ত্রের চালুনী দিয়া সংশোধন করিতে গেলে উক্ত পদার্থ সকলের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ কিন্তু চির-পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং অনিত্য নামরূপাত্মক আবির্ভাব, এবং সেই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত অদৃশ্য অথচ নিত্য পরমাত্মতত্ত্ব, এইরূপ নিত্য-অনিত্য রূপী দুই বিভাগ হইয়া যায়। রসায়নশাস্ত্রে কোন পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উপাদান দ্রব্য যেরূপ পৃথক্‌রূপে বাহির করা হয়, সেই প্রকার এই দুই বিভাগকে চক্ষের সম্মুখে পৃথক্‌রূপে স্থাপন করা যাইতে পারে না সত্য। কিন্তু জ্ঞান-দৃষ্টিতে সেই দুইকে পৃথক্ করিয়া শাস্ত্রীয় উপপত্তির সুবিধার জন্য উহাদিগকে অনুক্রমে 'ব্রহ্ম' ও 'মায়া এবং কখন কখন 'ব্রহ্ম জগৎ' ও 'মায়া জগৎ' এইরূপ নাম দেওয়া হইয়া থাকে। তথাপি ইহা যেন মনে রাখা সত্য হওয়া প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে 'জগৎ' এইরূপ প্রনয়ে হয়, ব্রহ্ম মূলেই নিত্যও অনুপ্রাসার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'ব্রহ্ম জগৎ' এই শব্দের দ্বারা, ব্রহ্মকে কেহ উৎপন্ন করিয়াছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না। এই দুই জগতের মধ্যে, দেশকালাদি নামরূপের দ্বারা অনবদ্ধ অনাদি, নিত্য, অবিনাশী, অমৃত, স্বতন্ত্র, এবং সমস্ত দৃশ্য জগতের আধারভূত হইয়া তাহার অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত ব্রহ্মজগতে, জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বিচরণ করিয়া, আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ কিংবা আপনার পরম সাধ্যের বিচার পূর্ব্ব প্রকরণে করা হইয়াছে; এবং বস্তুত বলিতে গেলে শুদ্ধ অধ্যাত্মশাস্ত্র ঐ খানে শেষ হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের আত্মা মূলে ব্রহ্মজগতের হইলেও দৃশ্য জগতের অন্য বস্তুর ন্যায় তাহাও নামরূপাত্মক দেহে-ন্দ্রিয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এই দেহেন্দ্রিয়াদি নামরূপ নশ্বর। হওয়ায় তাহা হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব কিরূপে প্রাপ্ত হইবে, ইহাই প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাভাবিক ইচ্ছা হয়। এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিবে, কর্ম্মযোগশাস্ত্রের এই বিষয়ের বিচারার্থ, কর্ম্মের নিয়মে বদ্ধ, অনিত্য মায়া-জগতের দ্বৈতী রাজ্যেও আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড, দুয়েরই মূলে যদি একই নিত্য ও স্বতন্ত্র আত্মা থাকে তবে পিণ্ডের অর্থাৎ শরীরের আত্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বলিয়া জানায় কি বাধা আছে, এবং তাহা কিরূপে দূরে হইতে পারে, এই প্রশ্ন সহজেই উত্থিত হয়। এ প্রশ্ন নিরসন করিতে হইলে নামরূপের বিচার করা আবশ্যক হয়। কারণ, বেদান্তদৃষ্টিতে আত্মা কিংবা পরমাত্মা এবং তৎসম্বন্ধীয় নামরূপের আবরণ, সমস্ত পদার্থ এই দুই বর্গে বিভক্ত হওয়ায়, নামরূপাত্মক আবরণ ব্যতীত এক্ষণে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নামরূপের এই আবরণ কোন স্থানে ঘন কোন স্থানে তরল হওয়া প্রযুক্ত দৃশ্য জগতের পদার্থসমূহের মধ্যে সচেতন ও অচেতন, এবং সচেতনের মধ্যেও পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ইত্যাদি ভেদ হয়,—বেদান্তের এইরূপ মত। আত্মারূপী ব্রহ্ম কোথাও নাই এরূপ নহে। ব্রহ্ম প্রস্তরের মধ্যেও আছেন, মনুষ্যের মধ্যেও আছেন। কিন্তু দীপ একই হইলেও লোহার ভিতর কিংবা ন্যূনাধিক স্বচ্ছ কাচের লণ্ঠনের মধ্যে রক্ষিত হইলে তাহার যেরূপ ভেদ হইয়া থাকে সেইরূপ আত্ম-

* "কর্ম্ম দ্বারা জীব বদ্ধ হয় এবং বিদ্যার দ্বারা তাহার মুক্তি হয়"। গী. র. ৩৩।

ভয় সর্ব্বত্র একই হইলেও তৎসম্বন্ধীয় কোষের অর্থাৎ নামরূপাত্মক আবরণের তারতম্য-ভেদে অচেতন ও সচেতন এই ভেদ হইয়া থাকে। অধিক কি, সচেতনের মধ্যেও মনুষ্য ও পশুর জ্ঞানসম্পাদন করিবার সমান সামর্থ্য কেন নাই, উহাই তাহার কারণ। আত্মা সর্ব্বত্র একই সত্য; তথাপি তাহা মূলে নির্গুণ ও উদাসীন হওয়ায়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি নামরূপাত্মক সাধন ব্যতীত আপনা হইতে কিছুই করিতে পারে না; এবং এই সকল সাধন মনুষ্য-যোনি ব্যতীত অন্যত্র পূর্ণরূপে না থাকায়, মনুষ্যজন্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ হইলে, আত্মার এই নামরূপাত্মক আবরণের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভেদ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্থূল আবরণ শুক্রশোণিতাত্মক স্থূল দেহই মনুষ্যের শুক্র হইতে পরে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এবং শোণিত হইতে ত্বক্‌, মাংস ও কেশ উৎপন্ন হয় এইরূপ মানিয়া এই সমস্তকে বেদান্তী 'অন্নময় কোষ' বলেন। এই স্থূল কোষ ছাড়িয়া তাহার ভিতরে কি আছে দেখিলে, অনুক্রমে বায়ুরূপী প্রাণ অর্থাৎ 'প্রাণময় কোষ', মন অর্থাৎ 'মনোময় কোষ', বুদ্ধি অর্থাৎ 'জ্ঞানময় কোষ' ও শেষে 'আনন্দময় কোষ' পাওয়া যায়। আত্মা তাহারও অতীত। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে, অন্নময় কোষ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে, শেষে আনন্দময় কোষের কথা বলিয়া, বরুণ ভৃগুকে আত্মস্বরূপের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন (তৈ. ২. ১-৫; ৩. ২-৬)। এই সমস্ত কোষের মধ্যে স্থূলদেহের কোষ ছাড়িয়া অবশিষ্ট প্রাণাদি কোষ, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি ও পঞ্চতন্মাত্রকে বেদান্তী 'লিঙ্গ' কিংবা 'সূক্ষ্ম শরীর' বলেন। একই আত্মার বিভিন্ন যোনিতে কিরূপে জন্ম লাভ হয় সাংখ্যশাস্ত্রে যেরূপ বুদ্ধির অনেক 'ভাব' মানিয়া ইহার উপপত্তি করা হয়, সেরূপ না করিয়া তাহার বদলে এই সমস্ত কর্ম্মবিপাকের কিংবা কর্ম্মফলের পরিণাম,—ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এই কর্ম্ম, লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ে অর্থাৎ আধারে অবস্থিতি করে, এবং আত্মা স্থূলদেহ ছাড়িয়া গেলে এই কর্ম্মও লিঙ্গশরীর দ্বারা তাহার সঙ্গে গিয়া আত্মাকে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন জন্ম গ্রহণ করায়, এইরূপ গীতাতে, বেদান্তসূত্রে ও উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তাই, নামরূপাত্মক জন্মমরণের পুনরাবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য পরমেশ্বরস্বরূপী হইবার পক্ষে কিংবা মোক্ষলাভের পক্ষে দেহস্থ আত্মার প্রতিবন্ধক কি ইহার বিচার করিবার সময় লিঙ্গশরীর ও কর্ম্ম এই দুয়েরই বিচার করা আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে সাংখ্য ও বেদান্ত এই দুইয়ের দৃষ্টিতেই পূর্ব্বেই লিঙ্গশরীরের বিচার করা হইয়াছে; সুতরাং ইহার পুনরালোচনা এখানে করিব না। যে কর্ম্মের দরুন আত্মার ব্রহ্মজ্ঞান না হইয়া অনেক জন্মের ফেরে পড়িতে হয় সেই কর্ম্মের স্বরূপ কি এবং তাহা হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্য এই জগতে মনুষ্যের কিরূপ আচরণ করা উচিত, এই প্রকরণে তাহাই বিচার করিয়াছি।

সৃষ্টির আরম্ভকালে মূল অব্যক্ত ও নির্গুণ পরব্রহ্ম যে দেশকালাদি নানারূপাত্মক সগুণ শক্তি দ্বারা ব্যক্ত অর্থাৎ দৃশ্যজগৎরূপে প্রতীয়মান হয় বেদান্তশাস্ত্রে তাহারই নাম 'মায়া' (গী. ৭. ২৭; ২৫); এবং তাহার মধ্যেই কর্ম্মেরও সমাবেশ হয় (বৃ. ১. ৬. ১)। অধিক কি, 'মায়া' ও 'কর্ম্ম' দুই-ই সমানার্থক বলিলেও চলে। কারণ, প্রথমে কোন-না-কোন কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যাপার হওয়া ব্যতীত অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়া কিংবা নির্গুণের সগুণ হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য আমি আমার মায়া দ্বারা প্রকৃতিতে জন্মিয়া থাকি (গী. ৪. ৬), প্রথমে ইহা বলিয়া পরে অষ্টম অধ্যায়ে গীতা তাই "অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে পঞ্চমহাভূতাদি বিবিধ সৃষ্টি হইবার যে ক্রিয়া তাহাই কর্ম্ম" এইরূপ কর্ম্মের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ৮. ৩)। কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যাপার কিংবা ক্রিয়া; কিন্তু তাহা মনুষ্যকৃতই হউক, জগতের অন্য পদার্থেরই ক্রিয়া হউক, অথবা মূল জগৎ উৎপন্ন হইবারই হউক—এইরূপ ব্যাপক অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত। কিন্তু যে কোন কর্ম্মই ধর না কেন, তাহার পরিণাম সর্ব্বদা ইহাই হয় যে, এক প্রকারের নামরূপ বদলাইয়া তাহার বদলে অন্য নামরূপ করা; কারণ, এই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত মূল দ্রব্য কখন বদলায় না,—একই রকম থাকে। উদাহরণ যথা—বয়নক্রিয়ায় 'সুতা' এই নাম গিয়া সেই দ্রব্যেরই নাম হয় 'বস্ত্র'; এবং কুম্ভকারের ব্যাপারে 'মাটী' এই নামের বদলে 'ঘট' এই নাম হয়। তাই মায়ার ব্যাখ্যা করিবার সময় কর্ম্মকে ছাড়িয়া দিয়া নাম ও রূপ এই দুইকেই কেহ কেহ 'মায়া' বলেন। তথাপি যখন কর্ম্মের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হয় তখন কর্ম্মস্বরূপ ও মায়াস্বরূপ একই, তাহা বলিবার সময় উপস্থিত হয়। তাই মায়া, নামরূপ ও কর্ম্ম, এই তিনই মূলে একইস্বরূপই,—ইহা আরম্ভেই বলা অধিক সুবিধা। মায়া একটি সামান্য শব্দ; এই মায়ার আবির্ভাবের বিশিষ্টার্থক নাম "নামরূপ" এবং মায়ার ব্যাপারের বিশিষ্টার্থক নাম "কর্ম্ম"; উহার মধ্যেও এই সূক্ষ্মভেদ যে করা যাইতে পারে না তাহা নহে। কিন্তু সাধারণতঃ এই ভেদ দেখাইবার আবশ্যকতা না থাকায়, তিন শব্দকেই অনেক সময় সমান অর্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের এক অংশের উপর নশ্বর মায়ার এই যে আচ্ছাদন (কিংবা উপাধি=উপরে স্থাপিত আবরণ) আমাদের

চোখে দেখা যায় তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে 'ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি' বলে। সাংখ্যবাদী পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই তত্ত্বকে স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র ও অনাদি বলিয়া মানেন। কিন্তু মায়া, নামরূপ কিংবা কর্ম্ম, ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল হওয়ায় উহাকে নিত্য ও অবিনাশী পরব্রহ্মের ন্যায় স্বয়ম্ভু ও স্বতন্ত্র বলিয়া মানা ন্যায়দৃষ্টিতে অসঙ্গত। কারণ, নিত্য ও অনিত্য এই দুই কল্পনা পরস্পরবিরুদ্ধ হওয়ায়, দুয়ের অস্তিত্ব একই সময়ে থাকিতে পারে না। তাই বিনাশী প্রকৃতি কিংবা কর্ম্মাত্মক মায়া স্বতন্ত্র না হওয়ায়,—এক নিত্য সর্ব্বব্যাপী ও নির্গুণ পরব্রহ্মেতেই মনুষ্যের দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সমূহ মায়া-দৃশ দর্শন করে, এইরূপ বেদান্তীরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু মায়া পরতন্ত্র এবং পরব্রহ্মেতেই এই মায়া-দৃশ্য দেখা যায় বলিলেই সমস্ত কথার মীমাংসা হয় না। গুণপরিণামে না হইলেও বিবর্ত্তবাদে নির্গুণ ও নিত্য ব্রহ্মেতে নশ্বর সগুণ নামরূপের অর্থাৎ মায়ার রূপ দেখা সম্ভব হইলেও এখানে এই আর এক প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর এই সগুণ রূপ, নির্গুণ পরব্রহ্মের মধ্যে মূলারম্ভে, কিরূপ অনুক্রমে, কখন্ ও কেন প্রকাশ পাইল ? অথবা এই অর্থই ব্যবহারিক ভাষায় বলিতে হইলে, নিত্য ও চিদ্রূপী পরমেশ্বর, নামরূপাত্মক বিনাশী ও জড় জগৎ কখন্ ও কেন উৎপন্ন করিলেন ? কিন্তু ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের বর্ণন-অনুসারে এই বিষয় শুধু মনুষ্যের নহে, দেবতা ও বেদেরও অগম্য হওয়ায় (ঋ. ১০. ১২৯ ; তৈ. ব্রা. ২. ৮. ৯), এই প্রশ্নের—"জ্ঞান দৃষ্টিতে নির্দ্ধারিত নির্গুণ পরব্রহ্মেরই ইহা এক অচিন্ত্য লীলা"—ইহা অপেক্ষা বেশী কোন উত্তর দেওয়া যায় না (বেসূ. ২. ১. ৩৩)। যখন অবধি দেখিতেছি তখন অবধিই নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গেই নামরূপাত্মক নশ্বর কর্ম্ম কিংবা সগুন মায়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে—এইরূপ গোড়ায় ধরিয়া লইয়াই আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। এইজন্য মায়াত্মক কর্ম্ম অনাদি এইরূপ বেদান্ত-সূত্রে উক্ত হইয়াছে (বেসূ. ২. ১. ৩৫-৩৭) ; ভগবদ্গীতাতেও ভগবান, প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, উহা আমারই মায়া (গী. ৭. ১৪) এইরূপ বর্ণনা করিয়া পরে এই প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া ও পুরুষ উভয়ই 'অনাদি' বলিয়াছেন (গী. ১৩. ১৯)। সেইরূপ আবার শ্রীশঙ্করাচার্য্য আপন ভাষ্যে মায়ার লক্ষণ দিবার সময় বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্যাত্মভূতে ইবাঽবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসার প্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য 'মায়া' 'শক্তিঃ' 'প্রকৃতি'রিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলাপ্যতে" (বেসূ. শাংভা. ২. ১.১৪)। "(ইন্দ্রিয়গণের) অজ্ঞানবশত মূলব্রহ্মেতে কল্পিত নামরূপকেই শ্রুতি ও স্মৃতি গ্রন্থে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের 'মায়া', 'শক্তি' কিংবা 'প্রকৃতি' বলা হয়" ; এই নামরূপ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের আত্মভূত বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু ইহা জড় হওয়া প্রযুক্ত পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন (তত্ত্বান্যত্ব) এবং ইহাই জড়জগতের (দৃশ্য) বিস্তারের মূল, তাহা বলিতে পারা যায় না ; এবং "এই মায়ার যোগেই পরমেশ্বর হইতে এই জগত সৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ দেখা যায় বলিয়া এই মায়া নশ্বর হইলেও দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পক্ষে আবশ্যক ও অত্যন্ত উপযুক্ত এবং ইহাকেই উপনিষদে অব্যক্ত, আকাশ, অক্ষর, এই সকল নাম দেওয়া হইয়াছে" (বেসূ. শাংভা. ১. ৪. ৩)। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে চিন্ময় (পুরুষ) ও অচেতন মায়া (প্রকৃতি), সাংখ্য এই দুই তত্ত্বকে সাংখ্যবাদী স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র ও অনাদি বলিয়া মানে ; কিন্তু বেদান্তী, মায়ার অনাদিত্ব একভাবে স্বীকার করিলেও মায়াকে স্বয়ম্ভু ও স্বতন্ত্র স্বীকার করেন না ; এবং এই কারণে সংসারাত্মক মায়াকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করিবার সময় এইরূপ গীতায় উল্লেখ আছে—"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো নচাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা" (গী. ১৫. ৩)—এই সংসার বৃক্ষের রূপ, অন্ত, আদি, মূল কিংবা তল পাওয়া যায় না। সেইরূপ তৃতীয় অধ্যায়ে 'কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি' (গী. ৩. ১৫) ব্রহ্ম হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে ; 'যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ' (৩. ১৪) যজ্ঞও কর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয় ; কিংবা 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা' (গী. ৩. ১০) ব্রহ্মদেব প্রজা (জগৎ) ও যজ্ঞ (কর্ম্ম) একসঙ্গেই সৃষ্টি করিয়াছেন ;—এইরূপ যে বর্ণনা আছে তাহার তাৎপর্য্যও এই যে, "কর্ম্ম কিংবা কর্ম্মরূপী যজ্ঞ, জগৎ অর্থাৎ প্রজা, এই সমস্ত এক সঙ্গেই সৃষ্ট হইয়াছে"—কিন্তু এই জগৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদেব হইতে সৃষ্ট হইয়াছেই বলো কিংবা মীমাংসকের মতানুসারে সেই ব্রহ্মদেব নিত্য বেদশব্দ হইতে উহা উৎপন্ন করিয়াছেনই বলো, উভয়ের অর্থ একই (মভা. শাং. ২৩১ ; মনু. ১. ২১)। সারকথা, কর্ম্ম অর্থে দৃশ্য জগতের সৃষ্ট হইবার সময় মূল নির্গুণ ব্রহ্মেতেই দৃশ্যমান ব্যাপার। এই ব্যাপারেরই নাম নামরূপাত্মক মায়া ; এবং এই মূল কর্ম্ম হইতেই চন্দ্রসূর্য্যাদি জাগতিক সমস্ত পদার্থের ব্যাপার পরে পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে (বৃ. ৩. ৮. ৯)। জাগতিক সমস্ত ব্যাপারের মূলভূত এই যে জগৎ-উৎপত্তি-কালের কর্ম্ম কিংবা মায়া তাহা ব্রহ্মেরই কোন এক অচিন্ত্য লীলা, স্বতন্ত্র বস্তু নহে, এইরূপ জ্ঞানীপুরুষেরা বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। * কিন্তু জ্ঞানের গতি

* "What belongs to mere appearance is necessarily subordnated to the nature of the thing in itself", Kant's *Metaphysics of Morals* (Abbot's trans. in Kant's *Theory of Ethics* P. 81).

এখানে বাধিত হওয়া প্রযুক্ত এই লীলা, নামরূপ, কিংবা মায়াত্মক কর্ম্ম 'কখন' উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই, কেবল কর্ম্মজগতেরই বিচার যখন করিতে হইবে, তখন এই পরতন্ত্র ও নশ্বর মায়া এবং মায়ার সঙ্গে সঙ্গে তদঙ্গভূত কর্ম্মকেও 'অনাদি' বলা বেদান্তশাস্ত্রের রীতি (বেসূ. ২. ১. ৩৫)। ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, সাংখ্যের উক্তি অনুসারে মূলেতেই পরমেশ্বরের সমানই মায়া নিরারম্ভ ও স্বতন্ত্র অনাদি বলিবার এরূপ অর্থ নহে;—অনাদি শব্দে দুর্জ্ঞেয়ারম্ভ অর্থাৎ যাহার আদি (আরম্ভ) জানা যায় না, এইরূপ অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে।

কালিদাসের সময়নির্দ্দেশ।

(শ্রীধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল)

কালিদাস কোন্ সময়ে আবির্ভূত হন এবং কোন্ রাজার তিনি সভাপণ্ডিত ছিলেন এই বিষয়ে নানারূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে এতরূপ মতভেদ আছে দেখিয়া বোধ হয় যে এ বিষয়ে আর আলোচনা বৃথা। কিন্তু মহাকবি কালিদাস আমাদের কেন, জগতের একটি অমূল্য রত্ন। তাঁহার সময় নিরূপণ করিতে না পারা আমাদের কলঙ্ক। অধিকন্তু, কালিদাসের সময়নিরূপণের সহিত ভারতবর্ষের অনেক পুরাতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট। তাঁহার সময় নিরূপণ না হইলে প্রাচীন ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও অসম্বদ্ধ থাকে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উদ্যম ও পরিশ্রম শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদেরও উদ্যম কতকভাবে অসম্পূর্ণই থাকিবে। আমাদের দেশের রীতিনীতি ও হাবভাব তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। তাহা না বুঝিলে কোনও অনুসন্ধানই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। Egypt, Babylon, Crete এই সমস্ত স্থানে তাঁহারা যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেইগুলিকেই ঐতিহাসিক তত্ত্বের মূল ধরিয়া লন। কিন্তু excavations, inscriptions এবং coins ইত্যাদি দ্বারা যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে এতদ্দেশে তাহাকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। ভারতবর্ষ বৈরাগ্যের দেশ, এই ভাব অন্য দেশে খুব বিরল। নিজের নাম রাখিয়া যাইব, নিজের বা স্বজনবন্ধুর জীবনচরিত রাখিয়া যাইব এরূপভাব এদেশে সব সময়ে দেখা যায় না। যতটুকু আছে তাহারই ভিতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব সুবদ্ধ থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ থাকিবে। দুঃখের বিষয় আমাদের এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ অনেকস্থলেই পাশ্চাত্য মতেরই অনুসরণ করেন। তাঁহাদের শিক্ষা পাশ্চাত্য বিপশ্চিদ্গণের গ্রন্থ হইতে। কাজেই একটা কিছু নূতন কথা গ্রন্থের বিরুদ্ধে বলিলে নিন্দাস্পদ বা হাস্যাস্পদ হইব এইরূপ ভয় অনেক স্থলে দেখা যায়। তবে অনেক স্থলে একথা খাটে না। কালিদাসের সময়সম্বন্ধে প্রোফেসর সারদারঞ্জন রায় মহাশয় এভাব অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার যুক্তি অনেক স্থলেই সারগর্ভ। তাহার পর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এক প্রবন্ধ লেখেন; তাঁহার লেখা অনুসারে কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। তাঁহার মতে কালিদাস যশোধর্ম্ম ধর্ম্মবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। এই মত সমর্থন করিতে গিয়া তিনি যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া বড়ই দুঃখ বোধ হয়। যাহা হউক আমরা সমস্ত মতগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইব। এ বিষয়ে তিনটি মতই প্রধান বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

১ম মত। কালিদাস উজ্জয়িনী বা অবন্তির রাজা প্রথম বিক্রমাদিত্যের সভাপতি ছিলেন। এই বিক্রমাদিত্যের রাজ্য হইতেই সম্বৎ সনের প্রাদুর্ভাব—ইহার সময় খৃঃ পূঃ ৫৭ বৎসর।

২য় মত। কালিদাস সমুদ্রগুপ্তের পুত্র রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাপতি ছিলেন। এই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অর্ব্বাচীন গুপ্তবংশের প্রধান রাজা। মৌর্য্যবংশীয় অশোকের পিতা চন্দ্রগুপ্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি আলাকজেণ্ডারের সমকালীন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি বিক্রমাদিত্য; তাঁহার সময় খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ বা চতুর্থের শেষ।

৩য় মত। কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হন। তৎকালীন অবন্তির রাজা 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন এবং শকদিগকে পরাজিত করিয়া সম্বৎ স্থাপন করেন। তবে একবারে ১ম বৎসর হইতে আরম্ভ না করিয়া প্রথম

অব্দকে ৬০০ ছয় শত অব্দ বলিয়া গণনা আরম্ভ হয়। ৫৪৩ খৃঃ অব্দে এই শকবিজয় হয়; তজ্জন্যই আমরা দেখিতে পাই খৃঃ অব্দ হইতে সম্বৎ অব্দ ৫৭ বৎসর অগ্রগামী।

এই শেষোক্ত মত পণ্ডিতপ্রবর মাক্সমূলরের। তাঁহার মত সহজে উপেক্ষনীয় নহে। কিন্তু পরবর্ত্তী অনুসন্ধান ও প্রমাণ সকলের দ্বারা এই মত সম্পূর্ণ খণ্ডিত হইয়াছে। ৫৪৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেও মালবাব্দ নামে সম্বৎ অব্দ প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বৎসভট্টিরচিত মান্দালোরের প্রাচীন আলেখমালা প্রায় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত। বৎসভট্টির এই রচনাতে মালবাব্দের উল্লেখ আছে। বৎসভট্টির লেখায় মেঘদূত ও ঋতুসংহারের আধিপত্য স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। এতৎ সম্বন্ধে পরে বিবৃত হইবে। যদি পঞ্চম শতাব্দীতে আমরা কালিদাসের আধিপত্য দেখিতে পাই তাহা হইলে কালিদাস বা বিক্রমাদিত্য যে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকে না।

আজ কাল পাশ্চাত্য বিবুধমণ্ডলীতে দ্বিতীয় মতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রোঃ মাক্‌ডোনেল্ড এই মতের অধিনায়ক। তিনি কালিদাসকে বৎসভট্টির অন্তত এক শত বৎসর পূর্ব্বের বলিয়াছেন। কালিদাস হইতে বৎসভট্টি যদি এক শত বৎসর ধরা হয় তাহা হইলে আমরা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে উপস্থিত হই। এই মত অবলম্বন করিতে হইলে আমাদের নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় স্বীকার করিতে হয়।

(১) কালিদাস ৩৭৩-৪১৩ খৃঃ অঃ মধ্যে রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক এবং তাঁহার সভাপণ্ডিত।

(২) তিনি রাজা শালিবাহন বা সাতবাহন বা হালরাজের ৩০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হন। এই শালিবাহন রাজার সময় সম্বন্ধে এখন আর কোনও মতভেদ নাই। তিনি ৭৮ খৃঃ অব্দে নূতন সমা বা বৎসর প্রচার করেন। তাহাই এখন শকাব্দ বলিয়া পরিচিত।

(৩) বুদ্ধচরিতের প্রণেতা বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষের অনেক পরে কালিদাসের প্রাদুর্ভাব।

(ক্রমশঃ)

দান প্রাপ্তি ও প্রতিশ্রুতি।

আমরা কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, হুগলি নিবাসী শ্রীযুক্ত লালবেহারী বড়াল মহাশয় তাঁহার পুত্রের শুভ বিবাহোপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজে ১০৲ দশ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, স্বনামধন্য স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রীর উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আদিব্রাহ্মসমাজ-মেডিক্যাল মিশনে ১০৲ দশ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্য কন্যা সাজাহানপুরনিবাসী শ্রীমতী সুদক্ষিণা দেবী আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রের দেবনাগর অক্ষরের জন্য ৬০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

নবতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ রবিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিংশ কল্প
প্রথম ভাগ
ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০

৯১৯ সংখ্যা　　　　　　　　　　　　　　　　　১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"
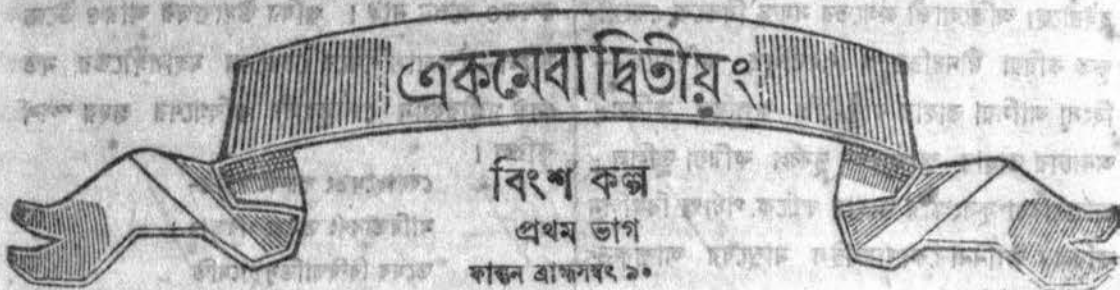
উৎসবের প্রাণ। *

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

শ্রুতি বলিতেছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" অর্থাৎ আনন্দ হইতে জীবগণ উৎপন্ন হয়, আনন্দের দ্বারা জীবিত রহে এবং অন্তে তাহারা আনন্দলোকে গমন করে। এই আনন্দের স্বরূপানুভূতিই উৎসব।

শ্রুতি এই মহাবাক্য প্রচার করিতেছেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই লীলা শুধু আনন্দেরই অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু হায় আনন্দ কোথায়? রোগ-শোক-জরা-মরণ ব্যথিত এ সংসারে আনন্দের স্থান কোথায়? বুকে নিদারুণ ক্ষত, পদতলে তীক্ষ্ণ কণ্টক, মাথার উপর অদৃষ্টের উদ্যত বজ্র—এ সংসারে আনন্দ পাইব কেমন করিয়া? হতাশার তীব্র ক্রন্দনে, অসহায়ের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায়, ভাগ্যহীনের নীরব দীর্ঘশ্বাসে, পদদলিতের আকুল আর্ত্তনাদে ধরিত্রী পরিপূর্ণ—কেমন করিয়া মনকে প্রবোধ দিব—"এ-ধরণী আনন্দলোক"? যেখানে মানুষের রক্তের স্রোতে নিরন্তর হিংসাদেবীর পূজা চলিয়াছে—সেখানে আনন্দের আশা বাতুলতা বলিয়াই মনে হয়।

তবে কি শ্রুতির এই মিথ্যাবাণী দুঃখপ্রপীড়িত অন্তরাত্মাকে আরও গভীরতর দুঃখে নিমজ্জিত করিবার নিমিত্ত স্তোকবাক্য মাত্র? মানুষ যদি আনন্দের অধিকারী নয়, তবে তাহার চারিদিকে বিপুল সৌন্দর্য্যের আয়োজন কেন রহিয়াছে—কেন আনন্দের লহরলীলা বিশ্বের হৃদপিণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত জগতকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতেছে? প্রভাতারুণের গলিত স্বর্ণরশ্মি, বিহঙ্গের মৃদুমধুর কাকলী, পুষ্পিত কুসুমকুঞ্জ, নবীনবসন্তে মধুলিহের গুঞ্জন, শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না, প্রশান্ত নদীতীরে নিদাঘের সূর্য্যাস্ত—কেন এইসকলে প্রকৃতি আনন্দের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। যেখানে নবীন মেঘ অম্বর ভেদ করিয়া পৃথিবীর বুকে সরস বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে, বর্ষার স্নেহস্পর্শে বসুন্ধরা দিগন্তে শ্যামশোভা বিস্তার করে, পাহাড়ের কঠোর হৃদয়ে স্রোতস্বিনীর জন্ম হয়, যে বিশ্ব আনন্দের নিত্য নিকেতন, সেখানে মানুষের এত দুঃখ কেন? এ আনন্দরসামৃতপানে কে তাহাকে বঞ্চিত করিল—এ দারুণ দুর্ভাগ্য কাহার ক্রুর অভিশাপে? সত্যই আনন্দ হইতে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আনন্দলোকের সে অস্পষ্ট স্মৃতি বোধ হয় শৈশবেও আমাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু জীবনে যতই অগ্রসর হই ততই "ছিন্নতুষারের প্রায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়—জীবনের তাপদগ্ধ ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রহারে"! মানুষ তাহার জন্মগত অধিকার নিজের কর্ম্মদোষে নষ্ট করিয়াছে। ইহা আর কাহারও দোষ নয়—তাহার স্বখাত সলিলে আত্মনিমজ্জন। লোভের পরিচর্য্যায় তাহার সমাজের সামঞ্জস্য ভঙ্গ

* আদি ব্রাহ্মসমাজে ১১ই মাঘে বিবৃত।

হইয়াছে। অতিলোভী জগতের সমস্ত বিত্তকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দীনদরিদ্রকে পদদলিত করিয়াছে—হিংসা আসিয়া তাহার রাষ্ট্রনীতি কলুষিত করিল; অনাচার তাহার স্বাস্থ্যকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিল; ভ্রান্তধারণা কুসংস্কার তাহার ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত বিমলিন করিল। জানিনা কোথায় ছিল মানুষের আত্মকৃত অপরাধের বীজ, যাহা মানবের অজ্ঞাতে সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার নাশে অগ্রসর হইয়াছে।

কে মানুষকে তাহার এই দারুণ দুর্দ্দিনে আশার সঞ্জীবনী সুধা পান করাইবে? সেই আশার বাণী যদি সত্যই হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, তাহাতে যদি আত্মনির্ভরে সমর্থ হই তবেই ত উৎসব যথার্থ উৎসব বলিয়া উপলব্ধ হইবে; নচেৎ মিথ্যা আলোকমালা, মিথ্যা আনন্দের সঙ্গীত; মিথ্যা আমাদের মিলন, যদি এই মিলনে পরস্পরের ভগ্ন হৃদয়ে নব প্রাণের নূতনতর প্রেরণা না জাগিয়া উঠে—পূর্ব্বেরই মত ক্ষুধিত হৃদয়ের হাহাকার যদি হৃদয়ে থাকিয়া যায়। যাঁহার জন্য এই জীর্ণ জন্মতরী বাহিয়া এতকাল চলিয়াছি, তাঁহার আভাস যদি উৎসবগৃহে না পাই তবে ত উৎসব অবসাদেই পরিণত হইবে। প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ অরণ্যের গম্ভীর নীরবতা বিদূরিত করিয়া একদিন এই আশার বাণী আমাদিগকে শুনাইয়াছেন—

"শৃন্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"

জরামরণভয়ে মানবকুল যখন ব্যাকুল তখন সেই ব্রহ্মবাদী ঋষি শঙ্কিত নরনারীকে আহ্বান করিয়া প্রবোধ দিলেন—"হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল তোমরা শ্রবণ কর"। এই সম্বোধনের মধ্যেই কত মধুরতা, মানবজাতির প্রতি তাঁহার কত গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইতেছে! তিনি 'অমৃতের পুত্র' এই সম্বোধনের দ্বারা আমাদের সকল শঙ্কা বিতাড়িত করিতেছেন—মানব অমৃতের পুত্র অতএব জরামৃত্যুবর্জ্জিত; মানব দিব্যধামবাসী সুতরাং পৃথিবীর কলুষ মর্ত্ত্যের মলিনতা তাঁহার নিকট ভ্রান্তিমাত্র।

এমনই স্নেহময় স্বরে আশার অমৃতময় আলোকে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আলোকিত করিয়া সেই দেবর্ষি উৎসুক শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—যাহা কোনও মানব কাহাকে কখনও বলেন নাই। ঋষির উদাত্তস্বর আরও উচ্চে উঠিল—কৈলাসশিখরে ভৈরবের মহাসঙ্গীতের মত সেই গম্ভীরধ্বনি কৌতূহলী ঋষিগণের হৃদয় স্পর্শ করিল।

> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
> মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
> তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
> নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে ঽয়নায়॥

আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়—তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। হে আধিব্যাধি দুঃখদৈন্য-কাতর সংসারবাসী মানবগণ মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! আর ভয়ের কারণ নাই—দূর কর তোমাদের চির-আশঙ্কাসঙ্কুল হৃদয়ের স্পন্দন; তোমরা দিব্যধামবাসী, তোমরা অমৃতের পুত্র—সংসারের বিস্মৃতিবারি পান করিয়া তোমরা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছ; তাই আজ সেই পরম সত্য তোমাদিগকে শুনাইতেছি—মিথ্যা মায়ার ছলনায় তোমরা আত্মতত্ত্ব পাশরিয়া মৃত্যুর অভ্রভেদী প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ মনে করিতেছ—একবার জ্ঞাননয়ন উন্মীলন করিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় বিরাট পুরুষকে, মানবের মধ্যে যে চৈতন্যময় ভূমা বাস করিতেছেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর; তাঁহাকে জানিলে—সূর্য্যোদয়ে তিমিরনাশের ন্যায় তোমাদের জন্মার্জ্জিত অজ্ঞানতা নাশ হইবে, মৃত্যুর কঠোর লৌহশৃঙ্খল তোমার পদতলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে—আমি এই ভূমাকে উপলব্ধি করিয়াছি তিনি সত্যই আছেন—তিনি অস্তি, ভাতি, প্রিয়; সন্দেহের কোন কারণ নাই; তোমরাও উপলব্ধি কর—তোমাদের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইবে—সমস্ত সংশয়ের অবসান হইবে—মা ভৈঃ মা ভৈঃ।

এই মহা অভয়বাণী যে দিন প্রথম উচ্চারিত হয়, সে দিন বনবিহঙ্গ কাকলী ত্যাগ করিয়া এই অমৃত পান করিয়াছিল—আকাশের গাঢ় নীলিমা আরও নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছিল—সামগান-মুখরিত তপোবনের হোমধেনুগণ যে অমৃত দুগ্ধ প্রদান করিয়াছিল আর কোনও দিন তাহার আস্বাদন তেমন মধুর হয় নাই; রোগশোকমৃত্যুবহা, সর্ব্বংসহা, লক্ষ দুঃখক্লিষ্টা ম্লানমুখী ধরণী সে দিন ব্রহ্মলোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল।

সেই দিন গিয়াছে মানবের যথার্থ উৎসবের দিন। তারপর কতদিন অতীত হইল—কত যুগ যুগান্ত অনন্ত কালের কোলে বিলয়-প্রাপ্ত হইল—প্রতিদিন কত ঋষি সুরলহরীতে গগন কম্পিত করিয়া এই উৎসবের গান গাহিয়াছেন—তাঁহাদের হৃদয়ের উপলব্ধি ও নব প্রেরণার দ্বারা ঐ শ্লোকের প্রতি ছন্দ প্রতি যতি নিত্য সুমধুর হইয়া বিশ্ববাসীর বেদনাপ্লুত প্রাণে অমৃতের ধারা সিঞ্চন করিয়াছে। উৎসবের প্রারম্ভে আমরাও এই বলিয়া আমাদের হৃদয়ে নূতন প্রেরণা নব শক্তি অনুভব করিতে চাই যে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই—যে অশুভ যে অমঙ্গল যে বিপদ পুঞ্জীভূত হইয়া আমাদের বুকের উপর পাষাণ-ভার চাপাইয়াছে তাহা মিথ্যা; যে তিমির আমাদের জ্ঞানসূর্য্যকে গ্রাস করিয়াছে তাহার নাশ হইবে—কেননা তিমির মিথ্যা সূর্য্যই সত্য, মিথ্যার দ্বারা সত্যের চিরন্তন গ্রাস অসম্ভব।

উৎসবের দিনে এই সত্য আমাদের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হউক। জীবনের প্রতিদিবসের দুঃখ-দৈন্যের সঞ্চিত গ্লানি দূরে যাউক। হে অন্তর-যামিন তুমি অন্তরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হও। তুমি যে পুত্র কলত্র হইতে প্রিয়—বিত্ত হইতে প্রিয়তর, এ সত্য আজ আমাকে অনুভব করাইয়া দাও—আজ পড়ে থাক পশ্চাতে আমার মোহগ্রস্ত জীবনের যত পুঞ্জিত অবসাদভার, আমার সমস্ত ক্ষতি পথের ধূলায় লুণ্ঠিত হউক। তুমি আমার প্রাণে, আমার শিরায় শিরায় আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে তোমার আগমনের উদ্বেলিত আনন্দস্রোত প্রবাহিত কর। তুচ্ছ হউক আমার সমস্ত মর্ম্ম-বেদনা। আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হে হৃদয়নাথ আমার সকল চেতনা মন্থন করিয়া জলদগম্ভীর মন্ত্রে একবার নব উৎসাহের বাণী শুনাও। আমি আমার সমস্ত জীর্ণতা অমৃত করিয়া নবজীবন যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করি—আমায় উদ্বোধনের অমোঘ মন্ত্র শুনাও—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত"।

জানি আমি, তোমাকে পাইবার পথ কুসুমাকীর্ণ নয়,—শাণিত, ক্ষুরধারের ন্যায় তাহা দুর্গম; পতন অভ্যুদয় হর্ষ অবসাদ রোগ শোক মৃত্যুর মধ্য দিয়াই আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে—সে পথ কখনও সূর্য্যকরোজ্জ্বল কখনও বা আবার গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। জানি মাঝে মাঝে বুকের উপর কঠোর অশনিপাত হইবে, কাল-বৈশাখের দুরন্ত ঝটিকা দিগন্ত সমাচ্ছন্ন করিয়া দিক্‌ভ্রান্ত করিবে—সেদিন হে মঙ্গলামঙ্গলের অতীত, তুমি আমার প্রাণে প্রাণে বলিও—ভয় নাই, ভয় নাই। জানি হে ভৈরব, শ্মশান ও সংসার তোমার নিকট সমান প্রিয়, মঙ্গল ও অমঙ্গল দুই-ই তোমার তুচ্ছ ক্রীড়নক। আমাকেও সেই বর দাও যেন আমি সমস্ত অবহেলা করিয়া আপনাকে তোমার পথে চালিত করিতে পারি—মানুষের মধ্যে তোমার যে বিরাট অবস্থিতি যে বিপুল অস্তিত্ব যে সত্য স্বপ্রকাশ আছে তাহা আমার জ্ঞাননয়নের সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠুক। তুমি ভূমা, তুমি বৃহৎ, তুমি অনন্ত আনন্দ-রসের আকর। আমি নিজের ক্ষুদ্রত্বে নিজের হীনতায় লজ্জায় অবসাদগ্রস্ত। এস তুমি প্রভু—আমার হৃদয়-মন্দিরে—সকল বিরোধ শান্ত হউক—সর্ব্ব দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হউক। হে রাজরাজেশ্বর তুমি বীরবেশে অবতীর্ণ হও—তোমার উপস্থিতিতে আমার পাপ-তাপ-লজ্জা-ভয় মূর্চ্ছিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক—তোমার শাণিত কৃপাণ স্বীয় দীপ্ত আলোকে দিগন্তবিস্ফুরিত করিয়া ভীরুর ভীতিসঙ্কুচিত জড়ত্ব দূর করুক—সে রাজবেশের সম্মুখে আমার স্তম্ভিত রিপুগণ প্রণত হইয়া তোমার জয় ঘোষণা করুক।

উৎসবের উদ্বোধন।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ এই সুনির্ম্মল প্রাতঃকালে আমরা সকলে যে মিলে জুলে বিশ্বমাতার চরণবন্দনা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি, ইহাতে আমাদের কত-না আনন্দ হইতেছে। এই উপাসকমণ্ডলীকে আমি আর উদ্বোধিত করিব কি—আমি এই ভক্ত-মণ্ডলীকে বেশী আর কি জাগাইয়া তুলিব? উৎসবের বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই তো সেই বিশ্বমাতা আমাদের সকলকেই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। যে অবধি বোধনের বাঁশী আমাদের কানের ভিতর

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভবনে ১১ই মাঘের প্রাতঃকালে বিবৃত।

প্রবেশ করিয়াছে, সেই অবধিই তো আমাদের সকলের প্রাণে জাগরণের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্বমাতা আমাদিগকে যে ভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা নূতন করিয়া আর কি প্রকারে সকলকে জাগাইয়া তুলিব, তাহা তো জানি না। ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের হৃদয়ে আজ অজস্রধারে নামিয়া আসিয়াছে, তাই আজ আমরা আপনারাই সজাগ হইয়া বিশ্বমাতার পূজার জন্য এখানে আসিয়াছি।

যিনি বিশ্বের মাতা, তিনি যে আমাদের প্রত্যেকেরও মাতা। যে ভক্তিশ্রদ্ধার ভাগীরথী আমাদের প্রাণে নামিয়া আসিয়াছে, সেই ভক্তিশ্রদ্ধা দিয়া প্রত্যক্ষভাবে সেই মাতার চরণবন্দনা করিতে হইবে, সেই মায়ের পূজা করিতে হইবে। তাঁহাকে এখনই এখানেই প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ করিব বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে তিনি ঈশ্বরকে কি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে কেবলই ঈশ্বর ঈশ্বর করেন? তাহার উত্তরে তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন যে সম্মুখের দেওয়াল অপেক্ষাও তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন। বাস্তবিক, প্রত্যেক সাধকেরই এই কথা। তাঁহারা যে বলেন যে, সাধনা করিলে ভগবানকে করতলন্যস্ত আমলকের মতো দেখা যায়, ইহার অপেক্ষা সত্য কথা আর কিছুই নাই। যে দেশের শতসহস্র লোক চকিতের মতোও তাঁহার দেখা পাইবার আশা পাইলে পাগল হইয়া উঠে, পদতলস্থ ধূলিকণার মত সমস্ত বিষয় বিভব আহ্লাদের সহিত পরিত্যাগ করিতে পারে, যে দেশের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার চরম লক্ষ্যই হইল তাঁহাকে লাভ করা, সে দেশের লোককে একথা বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি ঐ সাধনায় সিদ্ধ হইব বলিয়া, ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখিবার সাধনায় সিদ্ধ হইব বলিয়া। ঐ যে শতসহস্র বর্ষের প্রাচীন সৌম্যমূর্ত্তি ঋষি হিমালয়ের উন্নত শিখরদেশে দাঁড়াইয়া সমস্ত জগতবাসীর নাস্তিকতাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আমি এই মহান পুরুষকে জানিয়াছি, আমাদেরও প্রত্যেককে মহানাস্তিকতার সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামিয়া সেই অমিততেজা ঋষির সহিত একপ্রাণে বলিতে হইবে—আমি তাঁহাকে জানিয়াছি, প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কেবল সম্পদের মধ্যে বসিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে এক একটা উচ্ছ্বাসের মধ্যে ভগবানের কৃপার কথা মুখে বলিলে চলিবে না; সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে, আমোদ আহ্লাদের মধ্যে এবং কশাঘাতের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে, সকল অবস্থাতে, প্রত্যেক নিশ্বাসে প্রশ্বাসে যতাসত্য তাঁহাকে জাগ্রত মূর্ত্তিতে দেখিতে হইবে, তাঁহার মঙ্গলভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। হিন্দুজাতি এই ভাবেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা মানুষের নিশ্বাসপ্রশ্বাসকেও হংসমন্ত্র জপ বলিয়াই স্থির করিয়া বসিলেন। আমাদের সেইটাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা প্রাচীন ঋষিদের, ভারতের অগণিত সাধক ও সাধু পুরুষদিগের অমূল্য ধনের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা যত মূলধন পাইয়াছি, এত মূলধন অন্য কোন দেশ পাইয়াছে কি না সন্দেহ। সেই মূলধনকে অবহেলা না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদের প্রত্যেকের সেই মূলধন বৃদ্ধি করিবার পক্ষে সহায় হওয়া উচিত। ব্রাহ্মসমাজ এই কার্য্যে আমাদের বিশেষ সহায় জানি বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ আমাদের এত প্রিয়।

বর্ত্তমান যুগের যে একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে, সে অবস্থায় আমাদের আর ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবে না। এমন সুন্দর অবসরকে অবহেলা করিয়া হারাইলে চলিবে না। একদিকে গৃহে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মকে যত্নে পালন করিতে হইবে, আমাদের আচারে ব্যবহারে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শকে জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড় করাইতে হইবে; অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজে ভগবানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তি লইয়া আসিতে হইবে। এমনটী করিতে হইবে, যেন উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর ভক্তিশ্রদ্ধার কণাগুলি মিলিয়া মিলিয়া ভগবান ও আমাদের মধ্যে একটা ভক্তিস্তম্ভ রচিত হয়। সেই স্তম্ভ যথাসময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সমস্ত জনসমাজকে যেন ভাসাইয়া দিবার শক্তি ধারণ করে। এমনটী

করিতে হইবে, যেন ব্রাহ্মসমাজ ভক্তিশ্রদ্ধার তড়িৎ-আধার হইয়া উঠে—যথা সময়ে উপযুক্ত ভক্তের হৃদয়তন্ত্রী যখন তাহা স্পর্শ করিবে, তখনই তাহা জ্বলিয়া উঠিয়া চারিদিক অগ্নিময় করিয়া তুলিবে।

আজিকার এই উৎসবের মুখে আসুন আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের প্রাণমনকে বিশ্বমাতার পূজার উপযুক্ত করিয়া, বিশ্বের আরতির সঙ্গে আমাদেরও আরতি যোগ দিয়া উৎসবকে সত্য-সত্যই সার্থক করি। আমাদের প্রত্যেকের মাতাকে এইখানে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরাও যেন প্রাণ ভরিয়া এই আশ্চর্য্য বার্ত্তা শুনাইয়া দেশবিদেশকে জাগাইয়া তুলি যে, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং সেই তিমিরাতীত মহান পুরুষকে জানিয়াছি, আমাদের মাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তোমরাও নির্ভয়ে এখানে এসো এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হও।

ঘাত-প্রতিঘাত ও ব্রাহ্মসমাজ।*

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া জনসমাজ উন্নতির পথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। ছোট-খাট আঘাত তো দিবারাত্র চলিতেছে, কিন্তু তাহাতে জনসমাজ বিচলিত হয় না। বিপুল বিদ্যাবত্তায় যাঁহারা তেজস্বী, চরিত্রবলে যাঁহারা গরীয়ান, অমিত উৎসাহ লইয়া যাঁহারা অবতীর্ণ, সর্ব্বতোমুখী যাঁহাদের প্রতিভা, তাঁহারা জনসমাজের অবস্থা বুঝিয়া উহার হিতকল্পে যে আঘাত দান করেন, তাহা ব্যর্থ হয় না। কিন্তু এই আঘাতদানে তাঁহাদের সবিশেষ নিপুণতা দেখিতে পাই। প্রতিঘাতের এমন সামর্থ্য হয় না, যাহাতে সে আঘাতের বেগকে প্রতিহত করিতে পারে। সেই গুরু আঘাতের ফলে জনসমাজের মোহনিদ্রা চির অপসারিত হইয়া যায়।

বৈদিক দেবতাবাহুল্যের মধ্যে একেশ্বরবাদ অন্তঃসলিলা ফল্গু-নদীর ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে বহমান থাকিলেও, যখন জনসমাজ কূল হারাইবার উপক্রম করিতেছিল, তখন উপনিষদের গুরুগম্ভীর বাণী সমুত্থিত হইল। উপনিষদের ঋষিরা বলিয়া উঠিলেন, "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" এই যে বহুদেবতার কল্পনা, ইহা বহু দেবতার আরাধনা নহে, উহা একেরই পূজা। তাঁহারা আরও বলিলেন "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ, তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি," চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, বিদ্যুৎ অগ্নি আমাদের উপাস্য দেবতা নহে, তাহারা স্বয়ং-প্রভ নহে, কিন্তু সেই একেরই তেজে তাহারা তেজস্বী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। যখন যাগযজ্ঞ ধর্ম্মের প্রকৃত স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছিল, তখন উপনিষদ্ নির্ভয়ে ঘোষণা করিলেন, "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" যজ্ঞরূপ অদৃঢ় ভেলার সাহায্যে ঈশ্বরের সমীপস্থ হওয়া অসম্ভব। উপনিষদের এই যে আঘাত, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। প্রতিঘাত উপনিষদের সমুচ্চ কণ্ঠকে ডুবাইতে পারে নাই।

যখন ক্রিয়াকাণ্ডের ফললাভকামনা বিপুল হইয়া জনসাধারণের চিত্তকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বিজয়ভেরী ধ্বনিত হইয়া এক আঘাত প্রদান করিল। ফল-কামনারাহিত্য, কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ত্তব্যের সাধনা, "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং" ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মসাধন, এই যে নিষ্কাম ধর্ম্মের বাণী, তাহা প্রতিঘাতের ক্ষীণকণ্ঠকে ডুবাইতে পারিয়াছিল।

যূপবদ্ধ পশুর ভীষণ আর্ত্তনাদ যখন দারুণ হইয়া উঠিয়াছিল, যখন যাজ্ঞিকগণ পশুহননের নিষ্ঠুরতা নিজে অনুভব করিয়া যজমানকে স্তোক দিবার জন্য "বধোঽবধঃ" যজ্ঞার্থ পশুবধ বধই নহে, কিন্তু অবধের প্রতিরূপ, এই বাক্যের সহায়তা লইয়াছিলেন, তখন দুইটী বিভিন্ন যুগে দুইটি বিভিন্ন আঘাত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। "সদয় দর্শিতপশুঘাত" বুদ্ধদেব ও বহুশতাব্দী পরে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গদেব জনসমাজের চিন্তা ও সাধনার উপরে দুইটি স্বতন্ত্র আঘাত প্রদান করিয়াছিলেন। "জীবে দয়া" এই যে মহাসত্য তাঁহারা নির্ঘোষিত করিয়া গেলেন, তাহা মাংসলোলুপ জনগণের মধ্যে একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। প্রতিঘাত তাঁহাদের যুক্তির উপরে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই।

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে ১১ই মাঘ সায়ংকালে বিবৃত।

এইরূপে আমাদের দেশের চিত্তের উপরে কত যে আঘাত-প্রতিঘাত তরঙ্গের মত চলিয়া গিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আমরা বর্ত্তমানে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহা অতীতের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে। মনুষ্যজীবন ও মনুষ্যচরিত্র যে বিগঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা ঐ ঘাত-প্রতিঘাতের পরিণাম মাত্র।

ব্রাহ্মসমাজ কোন্ আঘাত লইয়া বঙ্গদেশে বলি কেন, সমগ্র ভারতে অবতীর্ণ, তাহা একটু আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব। আমাদের এই পুণ্যভূমি এইরূপ একটি আঘাত লাভ করিবার জন্য সত্য সত্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। ৯০ বৎসরের পূর্ব্ব সময়ের একটি জীবন্ত চিত্র কল্পনার মধ্যে আনয়ন করিবার জন্য সচেষ্ট হও। দেখিবে, পাশ্চাত্য শিক্ষার খরতর কিরণ এ দেশে পতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিবার আয়োজন করিতেছিল, আমরা জাতীয়ত্ব হারাইতে বসিয়াছিলাম; অন্যদিকে কাল-ব্যাপী প্রকৃত শিক্ষার অভাবে, আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা কতকটা হারাইয়াছিলাম, দেবার্চ্চনার ভার কতক পরিমাণে গুরুপুরোহিতের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলাম, কতকগুলি অন্ধ ধারণা লইয়া জীবন ক্ষেপণ করিতেছিলাম, আমরা ভাবে ও চিন্তায় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় দুন্দুভিনিনাদে আমাদের লুপ্ত চেতনা জাগ্রত করিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি অমিত তেজে যে আঘাত প্রদান করিলেন, তাহার প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিঘাতে সে আঘাত আরও তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

রামমোহন রায়ের নিপুণতা ঠিক এইখানে। তিনি নূতন ধর্ম্মপ্রচারের ভাণ করিয়া প্রচারে অবতীর্ণ হন নাই। বেদ-বেদান্ত বলিতে গেলে যাহা বঙ্গদেশ হইতে একভাবে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, তাহা তিনি ফিরাইয়া আনিলেন; সমাজের ধারার উপরে বিশেষ আঘাত প্রদান না করিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম সকলের সমক্ষে অনাবৃত করিয়া দিলেন, শিক্ষিত ও পিপাসু মণ্ডলী যে অধিকার চান, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের সেই প্রকৃত অধিকারে অধিকারী করিয়া দিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যখন এ দেশে জাতি-নির্ব্বিশেষে প্রদত্ত হইতেছে, মুদ্রাযন্ত্র যখন শাস্ত্র-ভাণ্ডার সকলের সমক্ষে অনাবৃত করিয়া দিয়াছে, ব্রাহ্মণেতর জাতির কথা দূরে থাকুক, ইউরোপের সুধীগণ যখন অবাধে বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যাতা ও প্রকাশকরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন প্রাচীন ধারাকে শিথিল করিবার সময় উপস্থিত, প্রাচীন পদ্ধতির সম্প্রসারণ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের গঠনকার্য্য ঠিক এইখানে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন জাতিগতভাবকে বিড়ম্বিত করিবার জন্য উহার সহিত অকারণ বিবাদ ঘোষণা করেন নাই। এই জাতিগতভাব যাহা শত শত বিপ্লবের মধ্যে, বহুসহস্র বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে চূর্ণ হইতে দেয় নাই, যে জাতিগত-ভাবের প্রভাবে এ দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের পঠন-পাঠন, সাহিত্য শিল্প, আয়ুর্ব্বেদ, কলাবিদ্যা, সমরকৌশল, বাণিজ্য-ব্যবসায়ের নিয়ম-প্রণালী, কৃষিবিদ্যার সৌষ্ঠব অন্তর্ধান করে নাই, সাত্ত্বিকতা, ধর্ম্মভাব, সভ্যতা ও বিনয় সমস্তই রক্ষা পাইয়াছে, এখনও পাইতেছে, আমরা চাই নব নব অধিকারদানে উহাকে সুসংস্কৃত করিয়া তুলিতে, উদারতার উপরে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে।

আমাদের এই হিন্দুসমাজ, হিন্দুপ্রকৃতি পাষাণের কাঠিন্যে বিগঠিত নহে। স্থিতিস্থাপকতা ইহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিরাজমান। রামমোহন রায় যে কয়েকটি সংস্কার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কেবল ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে কেন, সমগ্র শিক্ষিত হিন্দু-গণের মধ্যে তাহা বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই স্থিতিস্থাপকতার একটি সীমা আছে। সময়েরও একটি ব্যবধান আছে। সেই সীমাকে এক নিঃশ্বাসেই অতিক্রম করিতে চাহিলে, সময়ের ব্যবধানকে একেবারেই সঙ্কোচ করিতে গেলে, সংস্কারের নামে হিন্দুজাতির মৌলিকতা, তাহার অন্তর্নিহিত নিষ্ঠা, যাহা চিরদিন ধরিয়া সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহা একেবারেই নির্ব্বাসিত হইয়া যাইবে, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাবকে অচিরে নির্ম্মূল করিয়া দিবে।

আমাদের স্পর্দ্ধা করিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। অন্যদিকে সংস্কারের নামে স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাস সমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই চির-দরিদ্র ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, জনসাধারণের সরস চিত্তকে বিশুষ্ক করিয়া তুলিবে।

ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার আমাদের সকলের ব্রত হইলেও, ধর্ম্মসংস্কারকে উপরিতন সমুচ্চ আসন প্রদান করিতে হইবে; উহারই কল্পে আমাদের অধিকাংশ চেষ্টা নিয়োগ করিতে হইবে। যাহাতে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ আমাদের সহিত নির্ভয়ে মিলিত পারেন, তাহার পথ প্রমুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। যাহাতে আগন্তুক দল আমাদের সহিত অসঙ্কোচে মিলিত হইয়া একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমাদের সহিত সমস্বরে ও অসঙ্কোচে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারে, তাহার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে। নিষ্ঠার উপরে, পবিত্রতার উপরে, সাধনের উপরে সর্ব্বোপরি সত্যের উপরে, ত্যাগের উপরে, সংযমের উপরে আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে। সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া আমাদের আত্মীয়স্বজনকে বন্ধুবান্ধবকে তাহার বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। তাঁহাদের সহিত কোন বিষয়ে আমাদের সামান্য মতপার্থক্য থাকিতে পারে, তাই বলিয়া কেহই হেয় বা পরিত্যাজ্য নহেন, সকলেই আমাদের বন্ধু, সখা, সুহৃদ্‌, সকলেই ব্রহ্মধামের যাত্রী। আমাদের জ্ঞানে তাঁহাদিগকে উদ্ভাসিত করিয়া লইতে হইবে, তাঁহাদের নিষ্ঠায় আমাদের জীবনকে ধন্য করিতে হইবে। ধর্ম্মজগতে অভিমান অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের কোন স্থান নাই, এ কথা সকল অবস্থায় আমাদের অন্তরে জাগরূক রাখিতে হইবে। হইতে পারে সমাজসংস্কার লইয়া পরস্পরের মতদ্বৈধ রহিয়াছে। কিন্তু আলোচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে এই বিশাল হিন্দুসমাজ ঠিক এক অবস্থায় দাঁড়াইয়া নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে প্রধানতঃ হিন্দুসমাজ বিভক্ত হইলেও কত অবান্তর জাতির উৎপত্তিতে উহা আরও খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে,—কে তাহার গতিরোধ করিবে? বর্ত্তমান সমাজসংস্কার অনেকের চিরানুগত ও চিরঘোষিত মতের অনুকূল না হইতে পারে, কিন্তু তাহার দিক দিয়া ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ভাবকে বিচার করিলে চলিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম নিতান্তই সারবান। উহার সুশীতল ছায়ায় সকলেই শান্তি ও আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবেন; জ্ঞান প্রকৃত সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে; ভক্তি পরম চরিতার্থতা লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য করিয়া তুলিবে; মিলনের ডোরে একসূত্রে সকলকে গাঁথিয়া তুলিবে।

আমাদের এই আদিব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কারকে আপনার বিশেষ লক্ষ্যীভূত না করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্য পরিবেশন করিবার জন্য আবির্ভূত। মহাত্মা রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত পাত করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রবন্ধ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত ঠিক সেই এক উদ্দেশ্যে অমৃতধারা বরিষণে জনসাধারণের চিত্তকে বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন বৌদ্ধ-বহুল ভারতে প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতার উপরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে সত্যধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, যে সত্যের বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন, সে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিনষ্ট হইবার নয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব আমরা চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছি। নানা নামে নানা ভাবে ইহার প্রভাব ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আশার বাণী চারিদিক হইতে সমুত্থিত হইতেছে। বেদ-বেদান্ত উপনিষদের উপরে যদি এ দেশবাসীর শ্রদ্ধা থাকে, শ্রুতিপ্রমাণের উপরে যদি আমাদের নিষ্ঠা থাকে, সার্ব্বভৌমিক সত্যের প্রতি যদি সমাদর থাকে, তবে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলপ্রকার প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়া জীবন্তভাবে আপনাকে প্রসারিত করিয়া তুলিবে।

আমরা অতীতের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া, ভারতের সেই প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া এই মহামহোৎসবে মিলিত হইয়াছি। সেই বিশ্বজননী আমাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন।

এই পুণ্য মাসের পুণ্য তিথিতে শান্ত প্রাণে তাঁহার অশব্দ বাণী শ্রবণ কর। সংসারসংগ্রামের ভিতরে পড়িয়া যদি জীবনী শক্তি হারাইয়া থাক, তাঁহার নিকট নবজীবন ভিক্ষা কর, সন্দেহদোলায় পড়িয়া যদি জর্জ্জরিত হইয়া থাক, তাঁহার নিকট নব দীক্ষা প্রার্থনা কর। হৃদয় যদি বিশুষ্ক হইয়া থাকে, প্রার্থনা কর "সরস প্রেমের বরষা" তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে, তোমার দুঃখদুর্গতির অবসান হইবে।

ভগবন্! উৎসবের ভিতর দিয়া তুমি অন্তরে নব প্রেরণার সঞ্চার করিতেছ। সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তোমার আশীষ অন্তরে অবতীর্ণ হইতেছে, মন্ত্রের ভিতর দিয়া তোমার সত্যের আলোকে হৃদয়কে স্পর্শ করিতেছ। তুমি আজ অন্তরে যে জাগরণ প্রেরণ করিলে, তাহা যেন আমাদের দোষে সুষুপ্তিতে পরিণত না হয়; চিরজীবন ধরিয়া জাগ্রত করিয়া রাখ আমাদিগকে তোমার প্রেমে, তোমার আনন্দে—তোমার নাম গানে—তোমার মহিমা প্রচারে; জাগ্রত করিয়া রাখ আমাদিগকে মিলনে সদ্ভাবে; জাগ্রত করিয়া রাখ আমাদিগকে সত্যে ও ত্যাগে।

নূতন-ব্রহ্মসঙ্গীত।

রামকেলী—তেতালা।

মন জাগো মঙ্গল লোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে
জ্যোতি বিভাসিত চোখে।
হের গগন ভরি জাগে সুন্দর,
জাগে তরঙ্গে জীবন সাগর,
নির্ম্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে
জাগো অভয় অশোকে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—ঠুংরী।

নমি নমি চরণে নমি কলুষহরণে।
সুধারসনির্ঝর হে (নমি নমি চরণে)।
নমি চিরনির্ভর হে মোহ-গহন-তরণে।
নমি চিরমঙ্গল হে নমি চিরসম্বল হে।
উদিল তপন গেল রাত্রি, (নমি নমি চরণে)
জাগিল অমৃতপথযাত্রী নমি চির পথসঙ্গী,
নমি নিখিলশরণে।
নমি সুখে দুঃখে ভয়ে
নমি জয়পরাজয়ে।
অসীম বিশ্বতলে (নমি নমি চরণে)
নমি চিত-কমলদলে নিবিড় নিভৃত নিলয়ে,
নমি জীবনে মরণে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল একতালা।

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে,
তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য্য চন্দ্র তারা
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* * *

রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে,
রহি রহি প্রভু তব পরশ মাধুরী
হৃদয় মাঝে আসি লাগে।
রহি রহি শুনি তব চরণ পাত হে
মম পথের আগে আগে।
রহি রহি মম মন মগন ভাতিল
তব প্রসাদ রবি রাগে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল।

সদা থাক আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্ম্মল প্রাণে।
জাগ প্রাতে আনন্দে, কর কর্ম্ম আনন্দে,
সন্ধ্যায় গৃহে চলহে আনন্দগানে।
সঙ্কটে সম্পদে থাক কল্যাণে,
থাক আনন্দে নিন্দা অবমানে।
সবারে ক্ষমা করি থাক আনন্দে
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তি রসপানে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধু-বারোয়াঁ—ঠুংরী।

আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই,
তখন যাহা পাই
সে যে আমি হারাই বারে বারে।
তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে,
বন্ধ তালা ভেঙে দেখি, আপন মাঝে গোপন রতন ভার,
হারায় না সে আর।
প্রভাত আসে তাঁহার কাছে আলোক ভিক্ষা নিতে,
সে আলো তার লুটায় ধরণীতে।
তিনি যখন সন্ধ্যা কাছে দাঁড়ান উর্দ্ধকরে
তখন স্তরে স্তরে
ফুটে ওঠে অন্ধকারের আপন প্রাণের ধন,
মুকুটে তাঁর পরেন সে রতন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কালিদাসের সময়নির্দ্দেশ।

(শ্রীধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় মত যদি মান্দালোর আলেখমালার দ্বারা মৃষাকৃত হয় এবং ২য় মতটি যদি উপরোক্ত তিনটী প্রতিজ্ঞার খণ্ডনের দ্বারা অপ্রমাণিত হয় তাহা হইলে ১ম মত ভিন্ন অন্য কোনও মত থাকে না। তাহা হইলে প্রথম মতটি স্বীকার করিবার বিশেষ কোনও বাধা থাকে না।—তথাপি অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ না হইলে প্রথম মতও দাঁড়ায় না। এই সমস্ত মতামতের খণ্ডন বা মণ্ডনের পূর্ব্বে কয়েকটী অবশ্য স্বীকার্য্য বিষয়ে প্রণিধান প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। কালিদাস খৃঃ পূঃ অব্দের পরে প্রাদুর্ভূত হন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ক অগ্নিমিত্র একজন ঐতিহাসিক নৃপতি। তিনি পুষ্পমিত্র বা পুষ্যমিত্রের পুত্র এবং বসুমিত্রের পিতা ; এই পুষ্পমিত্রই মৌর্য্যবংশীয় রাজগণের সেনাপতি ছিলেন। তিনি মৌর্য্যরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মগধের রাজা হন। তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞের কথা মালবিকাগ্নিমিত্রে উল্লেখ আছে। অন্যদিকে দেখিতে গেলে কালিদাস রাজা হর্ষবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার কোনও সংশয় নাই। বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের একজন সভাপণ্ডিত ছিলেন। চীনপরিব্রাজক হুয়েনসাং তাঁহার কথা লিখিয়াছেন—হর্ষবর্দ্ধন খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে বিরাজমান ছিলেন। বাণভট্ট তাঁহার সভাপণ্ডিত। বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতের প্রারম্ভে সংস্কৃতসাহিত্যের প্রধান প্রধান উজ্জ্বলমণির উল্লেখ করিয়াছেন—এই হর্ষবর্দ্ধনের ও পুষ্পমিত্রের ঐতিহাসিকতা এবং সময় সম্বন্ধে কোনওরূপ মতদ্বৈধ নাই। কাজেই কালিদাস খৃঃ পূঃ ২য় অব্দ এবং ৭ম খৃঃ অব্দ এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করেন সিদ্ধ হইতেছে।

আমরা পরে দেখিব যে দ্বিতীয় মত অর্থাৎ প্রোফেসার ম্যাক্‌ডনালের মত কোনওরূপেই সমীচীন নহে। কালিদাসের গ্রন্থাবলী এই মতের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য দিতেছে। অন্য গ্রন্থ হইতেও এই মত খণ্ডিত হয়। তজ্জন্যই বোধ হয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই দ্বিতীয় মত খণ্ডন করিয়া তৃতীয় মতের ন্যায় আর একটি মত স্থাপনা করিতে চাহেন। তিনি মান্দালোর লেখমালা কৈফিয়ত দিয়া উড়াইতে চাহেন এবং কালিদাসকে যশোধর্ম্ম ধর্ম্মবর্দ্ধনরাজের সভাপণ্ডিত কল্পনা করেন। পরম্পরালব্ধ ইতিহাস বা কাহিনী তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। একটা অর্থাপত্তিও তিনি দিতে রাজি নহেন—এ বিষয়েও আমরা পরে বিচার করিব। তবে মোটামুটি বুঝিলেও দেখা যায় যে এই মত অনুসারে বাণভট্ট ও কালিদাসের মধ্যে বেশী দিনের পার্থক্য নাই। কিন্তু বাণভট্টের সময় কালিদাস লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। সংস্কৃত সাহিত্যে সূক্ত (বা সূক্তি) ঋষিবাক্যের নাম। বাণভট্ট কালিদাসের রচনাকে সূক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন "কালিদাসস্য সূক্তিষু"। বাণভট্টের সময় তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। পূর্ব্বে ছাপা দ্বারা বহি চলিত না। কবি বড় না হইলে তাঁহার রচনা কে নকল করিবে ? নিজদেশে বা নিজ সভায় কবি হইতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু অন্যত্র সমাদৃত হইতে এই নকল করিবার প্রথা দ্বারা অনেক .সময়ের প্রয়োজন হইত। হর্ষচরিতের উপক্রমণিকায় আমরা ভবভূতির নাম পাই না। কালিদাস হইতে বাণভট্ট অনেক দূর একথা সহজেই প্রতীত হইবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মতের আলোচনা আমরা পরে করিব। দ্বিতীয় মত খণ্ডনের সহিত এই মত খণ্ডিত হইবে।

এক্ষণে দ্বিতীয় মতের পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে কালিদাস মগধের রাজা চন্দ্রগুপ্তের সভাপণ্ডিত। ইনিও বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। রাজা শালিবাহনের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত কবিগণ নিজ বংশাবলী দিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের আশ্রয়দাতা নৃপতির প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন। উত্তরোত্তর আমরা দেখিতে পাই, নৃপতিপ্রশংসা প্রবল চাটুকারিতায় পরিণত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের প্রশংসাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কালিদাসের লেখায় এরূপ কোনও লক্ষণ পাই না। কিন্তু স্পষ্টভাবে আশ্রয়দাতার কোনও বর্ণনা না থাকিলেও তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বা ব্যঞ্জনার দ্বারা যাহা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। রঘুবংশের ষষ্ঠসর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরপাঠে আমরা অবন্তিপতির বর্ণনা

দেখিতে পাই—এই ষষ্ঠসর্গ সংস্কৃত সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন। অজরাজের সমসাময়িক বর্ণনা করাই মহাকবির উদ্দেশ্য কিন্তু এরূপ বর্ণনায় কালিদাসের সমসাময়িক ভাবের ছায়া পড়া অবশ্যম্ভাবী।

অবন্তিনাথোঽয়মুদগ্রবাহুর্বিশালবক্ষঃ পরিণদ্ধকক্ষঃ।
আরোপ্য চক্রভ্রমিমুষ্ণতেজা ত্বষ্ট্রেব চন্দ্রোল্লিখিতো বিভাতি॥

এই বীরত্বের উজ্জ্বল বর্ণনা বড়ই সুন্দর। ইহা পড়িয়া বোধ হয় যে মহাকবি অবন্তির কোনও রাজার সভাসদ ছিলেন। ইন্দুমতীর আচরণও কিছু বিচিত্র হইয়াছে। অজ হইলেন স্বয়ম্বরের নায়ক। অবন্তিনাথকে ছাড়িয়া অজকে বরণ করা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কালিদাস নায়ককে ছোট করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতিশয় কোমলপ্রকৃতি ইন্দুমতীর এই উজ্জ্বল বীরত্ব বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

তস্মিন্নভিদ্যোতিতবন্ধুপদ্মে প্রতাপসংশোষিতশত্রুপঙ্কে।
ববন্ধ সা নোত্তমসৌকুমার্য্যা কুমুদ্বতী ভানুমতীব ভাবম্॥

ইহা দ্বারা কালিদাস বীরত্বহিসাবে অজকে অবন্তিনাথ অপেক্ষা ছোট করিতেছেন। কে এই অবন্তিনাথ? উপরোক্ত প্রথম শ্লোকই ইহার উত্তর দিতেছে,—প্রথম চরণে শারীরিক ক্ষমতা অর্থাৎ "বিক্রম", দ্বিতীয় চরণে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের মূর্ত্তির বর্ণনা অর্থাৎ "আদিত্য"; এই শ্লোক দ্বারা মহাকবি বিক্রমাদিত্যের প্রচ্ছন্ন বর্ণনা করিতেছেন—দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ অংশটিরও একটু বিশেষত্ব আছে। পরম্পরালব্ধ কাহিনী বা দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাপাঠে আমরা অবগত হই যে ভানুমতী বিক্রমাদিত্যের রাজ্ঞী (দেবী); শেষ অংশে একটি শ্লেষ অনুমিত হয়—এই বীরশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিতে ভানুমতী যে ভাব ধারণ করিয়াছেন সেই ভাব অতি সুকুমার ইন্দুমতী ধারণ করিতে পারিলেন না। কিম্বা 'ভানুমতি' অর্থাৎ সূর্য্যে বা সূর্য্যস্বরূপ এই নৃপতিতে ইন্দুমতী সেরূপ ভাব ধারণ করিতে পারিলেন না।

এই শ্লোকদ্বয় হইতে আমরা দুইটি কথা বেশ বুঝিতে পারি:—

(১) কালিদাসের সময় প্রকাশ্যভাবে আশ্রয়দাতার প্রশংসা করা শ্লিষ্টতার বিরুদ্ধ ছিল নিজের প্রশংসাও অতিশয় গর্হিত ছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ খৃঃ শতাব্দী হইতে এই প্রথা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। সেই সময়ের লেখমালা ইত্যাদি পাঠে দেখা যায় কবিগণ নিজদের প্রশংসা ও বংশাবলী লইয়া ব্যস্ত—ভবভূতির মালতীমাধব এবং বাক্‌পতির "গৌড়বহো" এই প্রথা দ্বারা অভিভূত।

(২) এই শ্লোকদ্বয়ের ব্যঞ্জনা ও শ্লেষ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে কালিদাস অবন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

মহারাজ ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর অশোক বা প্রিয়দর্শী হইতে আরম্ভ করিয়া মৌর্য্যরাজগণ ও অন্যান্য মহামান্য বৌদ্ধরাজগণ আত্মপ্রশংসা বা আত্মকীর্ত্তি ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অনেক সময় তাঁহাদের আত্মকীর্ত্তিই তৎকালীন ইতিহাসের মূলভিত্তি। উচ্চ পর্ব্বতে শিলায় গুহায় এবং প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভসকলে এই আত্মকীর্ত্তি খোদিত। এখনও কতক বর্ত্তমান আছে। এই বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষে হিন্দুধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয়ের সময় এই আত্মকীর্ত্তি বড়ই বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল। আত্মপ্রশংসা মৃত্যুর সমান। পরবর্ত্তী হিন্দুরাজগণ ও কবিগণ এ কথা ভুলিয়াছেন। কিন্তু মহাকবি কালিদাস মেঘদূতের এক শ্লোকে এই কথা বড় সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥

যে সমস্ত প্রদেশে মহাবীর অশোকের শিলাস্তম্ভসকল এখনও বিরাজমান আছে তখন তাহা বিজয়কীর্ত্তির প্রস্তরস্তম্ভে পরিপূর্ণ ছিল। কেবল অশোক নহে, অন্যান্য নৃপতিগণও তাঁহার অনুকরণ করিয়াছেন। এই সকল স্তম্ভকে তিনি "স্থূলহস্তাবলেপান্" বলিয়াছেন। অহঙ্কার অর্থে "অবলেপ" শব্দের ব্যবহার কালিদাসের লেখায় আরও দেখা যায়। "মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাৎ" impertenince বা vanity এই উভয় অর্থও প্রতীয়মান হয়। বৌদ্ধগণ নিজদিগকে "নাগ" বলিতেন; দিগ্বিজয়ী নাগগণ "দিঙ্‌নাগ" শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য; "মোটা হাতের দেমাক" বলিলে বোধ হয় অনুবাদ অনেকটা ঠিক হয়।

ষষ্ঠসর্গে আমরা মগধরাজের বর্ণনা দেখিতে পাই। পুষ্পমিত্রের বংশধরগণ এবং পুষ্পমিত্র স্বয়ং হিন্দু ছিলেন। প্রথম পুনরাগমনের মঙ্গলসূচনাস্বরূপ তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞ হিন্দুদিগের বড়ই প্রিয় হইয়াছিল। কালিদাস তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু ষষ্ঠসর্গে মগধরাজবর্ণনায় বৈচিত্র্য আছে। "রাজা প্রজারঞ্জনলব্ধবর্ণঃ" "অজস্রমাহূতসহস্রনেত্রঃ" ইত্যাদি বর্ণনায় অশোকচরিত্রের উপর বিশেষ কটাক্ষ দেখিতে পাই। অশোকের edict পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি প্রতি বৎসরে চর বা দূত পাঠাইতেন; তাঁহারা প্রজাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিত। উৎসবের মধ্যে, যজ্ঞের মধ্যে রাজপুরুষ যাইয়া এইরূপ বক্তৃতা দেওয়ার ফল কিরূপ তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ফলকথা রাজা ধর্ম্মের মালিক হইয়াছিলেন। কালিদাস বলেন রাজার তাহা কাজ নয়। প্রজাকে রঞ্জন করাই তাঁহার কাজ, তিনি দীক্ষাগুরু নহেন। অন্যত্র ৪র্থ সর্গেও কালিদাস বলিয়াছেন "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ"। অশোক যজ্ঞ একেবারে স্থগিত করিয়া দেন। কিন্তু এই হিন্দুমগধরাজ পরন্তপ রাজার আমলে যজ্ঞের এতই প্রাবল্য যে শচীর তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। অশোকের উপর এই কটাক্ষপাত আমরা রঘুবংশের ৪র্থ সর্গে আরও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই—

গৃহীতপ্রতিমুক্তস্য স ধর্ম্মবিজয়ী নৃপঃ।
শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার ন তু মেদিনীং॥

বৌদ্ধরাজ অশোক কলিঙ্গ (মহেন্দ্র) জয় করিয়া তাহা তাঁহার রাজ্যভুক্ত করেন ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। কবির বর্ণনায় এইরূপ কার্য্যের উপর কটাক্ষপাত করিয়াই ধর্ম্মবিজয়ের লক্ষণা দিয়াছেন। অশোকের উপর এই কটাক্ষ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের নূতন পুনরাবর্ত্তন যে কালিদাসের সময় হইয়াছিল তাহা অনুমিত হইতেছে। এই সকল শ্লোক হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কালিদাস অবন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সময়েরও অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। তখনও পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধ সকলের মনে আছে। পূর্ব্বতন ধর্ম্মের পুনরাবর্ত্তনসূচক পুষ্পমিত্রের বংশধরগণ পরিবর্ত্তনের অব্যবহিত পরে বড়ই পূজ্য ছিলেন তাহা বুঝা যায়; তাই কালিদাস কবি ইন্দুমতীকে দিয়া মগধরাজকে প্রণাম করাইয়াছেন। এই বংশধরগণ কালিদাসের সময় ভোগবিলাসে অধঃপতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বংশের একটা মর্য্যাদা আছে—

গুরুপ্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা,

আর একটি উদাহরণ বড়ই স্পষ্ট আছে—রঘুর দিগ্বিজয়। আমরা এই দিগ্বিজয় অনুসরণ করিলে দেখিতে পাই—অযোধ্যা হইতে বঙ্গদেশ। মগধের স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তবে অযোধ্যা হইতে বঙ্গাভিযান করিতে হইলে মগধবিজয় অবশ্যম্ভাবী। কেবল খাতিরে নাম দেওয়া হয় নাই। বঙ্গ হইতে উৎকল, তৎপর কলিঙ্গ তাহারপর সমুদ্রবেলা অনুসারে দক্ষিণমুখে যাইয়া পুনরায় উত্তর দিকে গমনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির নাম উল্লেখ হয় নাই। তবে যানমার্গ (route) বুঝিতে কোনও কষ্ট নাই। এইরূপ উত্তর মার্গে আসিয়া সিন্ধুদেশে আগমন। সিন্ধুদেশ হইতে পারস্যদেশ—এখানেও ছোট ছোট প্রদেশের উল্লেখ নাই। পারস্য দেশ হইতে কাম্বোজ, তাহার পর হুন দেশ, তাহার পর হিমালয়পাদদেশস্থ রাজাসকল ধরিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন; তাহার পর প্রাগ্জ্যোতিষ ও কামরূপ (আসাম); তাহার পর অযোধ্যায় পুনরাবর্ত্তন। এইরূপ যানমার্গের বৈচিত্র্য বড়ই অভিনব। কিন্তু আসল কথা উজ্জয়িনী রাজ্য বাদ দেওয়া। এই যানমার্গের ভিতর বিক্রমাদিত্যের রাজ্য মালব ও ভোজ (বর্ত্তমান রাজপুতানা) পড়ে না। কালিদাসের সময় উজ্জয়িনীবিজয় অমঙ্গলঘোষণার ন্যায় বর্জ্জনীয়। আশ্রয়দাতার রাজত্বের পরাজয় তিনি কল্পনায় আনিতেও দিবেন না বলিয়া এই বিচিত্র যানমার্গের সূচনা করিয়াছেন। অন্য কোনও কবি এরূপ দিগ্বিজয়ের বর্ণনা করেন নাই। অতএব প্রতিপন্ন হইল কালিদাস অবন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক। তাঁহার সময় সম্বন্ধে আরও দৃঢ় প্রমাণ আছে।

দ্বিতীয় মত অনুসারে রাজা শালিবাহনের অনেক দিন পরে কালিদাসের প্রাদুর্ভাব বলিতেই হইবে। প্রফেসর বুলার শালিবাহনের সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এ বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই। কবি গুণাঢ্য তাঁহার সভাপণ্ডিত। তাঁহার সময় খৃঃ প্রথম শতাব্দী। এই শালিবাহনের অন্য নাম সাতবাহন ও হালরাজশেখর তাঁহার প্রবন্ধকোষে লিখিয়াছেন যে "মহাবীরের অন্তর্ধানের ৪৭০ বৎসর পর বিক্রমাদিত্য রাজা আবি-

ভূর্ত হন। তাঁহার শতাধিক বৎসরের পর প্রতিষ্ঠান নগরে শালিবাহন রাজা হইয়াছিলেন।" প্রতিষ্ঠান শব্দের অর্থ দুর্গ বা Camp। আর্য্যক্ষমতার বিস্তৃতির সহিত আমরা দেখিতে পাই আয়ুর পিতা পুরুরবার সময় প্রতিষ্ঠান (পাঠান) আফগানিস্থানে—তৎপরে প্রয়াগের নাম প্রতিষ্ঠান। তৎপরে দাক্ষিণাত্যে রাজপুতানার দক্ষিণে প্রতিষ্ঠান—কামসূত্রের প্রণেতা বাৎস্যায়ন, কলাপ ব্যাকরণের রচয়িতা এবং বৃহৎকথালেখক গুণাঢ্য এই রাজার সভাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই শালিবাহনের নামে গাথাসপ্তশতী নামক একটি কোষগ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় সংগৃহীত হয়। বাণভট্ট এই গাথার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥"

যদি এই গাথায় আমরা কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের প্রভাব বা উল্লেখ দেখিতে পাই তাহা হইলে ২য় ও ৩য় মত উভয় মতই খণ্ডিত হয়। আর যদি আমরা কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিভাব দেখিতে পাই তাহা হইলে কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য খৃঃ প্রথম শতাব্দীর অধিক দিন পূর্ব্বের নহেন তাহাও বুঝিতে পারি। এই গাথার পঞ্চমশতকে একটি শ্লোক (৬৪) এইরূপ—

সংবাহণ সুহরস তোসিএণ দেন্তেণ তুহ করে লক্খং।
চলণেণ বিক্কমাইত্ত চরিঅং অণুসিক্খিঅং তিস্সা॥

পুরাতন কাহিনী পাঠে বুঝা যায় বিক্রমাদিত্য রাজা অতিশয় দানশীল ছিলেন। তাঁহার এই দানশীলতাকে গাথা ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা উপহাস করিতেছেন—"লক্খং" এই কথার দুইটি অর্থ "লাক্ষাং" অর্থাৎ পায়ের আলতা কিম্বা "লক্ষং" অর্থাৎ লক্ষ মুদ্রা—সুন্দরীর পা টিপিলে যেমন সংবাহকের লাক্ষারস লাভ হয় সেইরূপ বিক্রমাদিত্যকে একটু চাটু করিলেই লক্ষ সুবর্ণের লাভ। কর্ম্মবীর বিক্রমাদিত্যের উপর এই কটাক্ষ স্পষ্ট প্রমাণিত করিতেছে যে বিক্রমাদিত্য শালিবাহনের পূর্ব্ববর্ত্তী।

উক্ত পঞ্চমশতকে আবার আমরা দেখিতে পাই কবি—শালিবাহনের প্রশংসা করিতেছেন—

আবণ্ণাইং কুলাইং দোবিঅ জাণন্তি উন্নইং ণেউং।
গোরীঅ হিঅঅ দইঅো অহবা শালাহন নরিন্দো॥

কিন্তু শালাহণ (শালিবাহন) রাজার দান প্রকৃত দান। বাস্তবিক বিপন্নকুলকে রক্ষা করিতে তিনি জানেন (অর্থাৎ কেবল চাটুকারে ভুলেন না)। এস্থলেও "আবণ্ণাইং" কথা দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; নৃপতি পক্ষে "আপন্নানি" বিপদ্‌গ্রস্ত। শিবপক্ষে "আপর্ণানি" "অপর্ণা"সম্বন্ধীয়। কুমারসম্ভবের অপর্ণা এবং গৌরীর বিবাহ এই শ্লোক পাঠে স্বতঃই মনে পড়িয়া যায়। এই শ্লোক লেখার সময় লেখক কুমারসম্ভবের কথাই ভাবিতেছিলেন। এই গাথাতে কালিদাসের প্রভাব অতি স্পষ্ট দেখা যায়। একটু আক্রোশও বেশ বুঝা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আমরা দেখিতে পাই বিক্রমসভার সাহিত্য সন্নিহিত দেশসকলকে মুগ্ধ করিতেছে। শালিবাহনের প্রথম অবস্থায় তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যের বিরোধী ছিলেন। গুণাঢ্য প্রাকৃতভাষায় বৃহৎকথা লেখেন। তৎপরে শালিবাহন কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। এস্থলে আমরা কেবল দুইটী উদাহরণ দিব। কালিদাস মেঘদূতে লিখিয়াছেন,—

"আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি"॥

কুসুমের ন্যায় কোমলপ্রকৃতি নারীহৃদয় উৎকট বিরহে ঝরিয়া যাইত, কেবল আশারূপ বৃন্ত (আশাবন্ধ) এই পতনোন্মুখ পেলব হৃদয়কে রক্ষা করে। গাথা বলিতেছেন ঠিক কথা কিন্তু একটি অপবাদ Exception আছে—

বিরহাণলো বিসজ্ঝই আসাবন্ধেন বল্লহজণস্স।
এক্কগ্গামপবাসো মাত্র মরণং বিসেসেই॥

প্রথম শতক গাথা ৪৩—

একই গ্রামে থাকিয়া যদি বল্লভ না আসেন তাহা হইলে আর এ "আশাবন্ধ" খাটে না—এস্থলে গাথাকার মেঘদূতের আশাবন্ধকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিতেছেন। মহাকবি কালিদাস যে গাথার পূর্ব্ববর্ত্তী তদ্‌বিষয়ে কোনও সন্দেহই রহিল না। যেখানে মহারাজ দুষ্মন্ত একবেণীধরা শকুন্তলা ও তাঁহার পুত্র ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন সেই দৃশ্য সংস্কৃতজগতের কেন, সমস্ত সাহিত্যজগতের অমূল্যরত্ন। চরণপতিত পতির উপরে

শকুন্তলার উক্তি দেবত্বের উজ্জ্বল ছবি। এই স্থানকে উল্লেখ করিয়াই মহাকবি Goethe বলিয়াছেন "All by which the soul is charmed enraptured fed : the Heaven and Earth in one sole name combine I name thee O Sakuntala and all at-once is said." মহাকবি শেক্সপীয়ার তাঁহার "All is well that ends well" নাটকে একটি নায়িকার ক্ষমার দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা পার্থিব ক্ষমা— তাহাতে অনেক কটাক্ষ ও বাক্যবাণ আছে। তাহা সংসারের চিত্র ; কালিদাসের এই দৃশ্য দেবত্বের চিত্র। গাথাকার এই উজ্জ্বল মহত্বের ছবিকে উপহাসের ছবি দ্বারা ছোট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,

"পাদপই অদ্দ পইণো পুট্টি পুত্তে সমারুহতম্ভি।
দড়্‌ঢ় মন্নু দুন্মিণা এবি হাসে ঘরণীএ ণেক্‌খন্তো ॥

ভাবটা এইরূপ যেন দুষ্ট বালক পাদপতিত পতির পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিল। তাহাতেই গৃহিণীর হাস্যরসের আবির্ভাব এবং সুতরাং ক্রোধের উপশম। ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে গাথার পূর্ব্বে কালিদাসের আবির্ভাব।

মহাকবি গুণাঢ্যের বৃহৎকথা বিলুপ্ত। প্রাকৃত ভাষার বিশালগ্রন্থ হারাইয়া যাওয়া ও বিলুপ্ত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তাঁহারই প্রাকৃত অবলম্বন করিয়া দুইটি সংস্কৃত সার হইয়াছে। একটি বৃহৎকথামঞ্জরী এবং আর একটি কথাসরিৎসাগরসার। এই উভয় গ্রন্থেই কালিদাসের ভাব প্রচুরভাবে দেখা যায়। কিন্তু এই দুই গ্রন্থের উপর ভরসা করিয়া বৃহৎকথা সম্বন্ধে কোনও অনুমান করা নিরাপদ নহে। কিন্তু উভয় গ্রন্থের মূলভিত্তি রাজা উদয়ন ও বাসবদত্তার কথা। এই উদয়ন ও বাসবদত্তার গল্প নিশ্চয়ই বৃহৎকথায় ছিল। কারণ ইহারই উপর সমস্ত কথা স্থাপিত। কালিদাসের মেঘদূতে আমরা নিম্নলিখিত চরণ দেখিতে পাই ;

সম্প্রাপ্যোনামুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্

কালিদাসের সময় এই উদয়নকথা লোকপরম্পরার কাহিনী ছিল। তখনও তাহা গ্রামবৃদ্ধগণের মুখে শুনা যাইত। অর্থাৎ তাহা তখনও ঠাকুরদাদার ঝুলির ভিতর ছিল। বহুদিবস পরে আমরা দেখি মহাকবি গুণাঢ্য এই কাহিনীকে তাঁহার বৃহৎকথার মূলভিত্তি করিয়াছেন। অন্যথা এই চরণের কোনও সঙ্গতিই থাকে না ; এই বৃহৎকথা সম্বন্ধে বাণভট্ট বলিয়াছেন "হরলীলেব কস্য নো বিস্ময়ায় বৃহৎকথা"। উপরোক্ত শ্লোকসমষ্টি পর্য্যালোচনায় সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয় যে কালিদাস খৃঃ প্রথম শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে। তখন কালিদাসের প্রতিপত্তি আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় মতের কোনও ভিত্তিই থাকে না। (ক্রমশঃ)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

দশম প্রকরণ।

কর্ম্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু চিদ্রূপ ব্রহ্ম কর্ম্মাত্মক অর্থাৎ দৃশ্যজগৎরূপে কখন্ ও কেন প্রকাশিত হইলেন ইহার সন্ধান আমরা না পাইলেও এই মায়াত্মক কর্ম্মের পরবর্ত্তী সমস্ত ব্যাপারের নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে এবং তন্মধ্যে অনেক নিয়মই আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি। মূল প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ অনাদি মায়াত্মক কর্ম্ম হইতে জগতের নামরূপাত্মক বিবিধ পদার্থ কিরূপ অনুক্রমে উৎপন্ন হইল, অষ্টম প্রকরণে সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে ইহার বিচার করা হইয়াছে ; সেইখানেই আধুনিক আধিভৌতিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও তুলনার জন্য কথিত হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্র প্রকৃতিকে পরব্রহ্মের ন্যায় স্বয়ম্ভু বলিয়া মানে না সত্য; কিন্তু প্রকৃতির পরবর্ত্তী বিস্তারের সাংখ্যোক্ত ক্রম বেদান্তেরও স্বীকৃত বলিয়া এখানে তাহার পুনরুক্তি করি নাই। কর্ম্মাত্মক মূল প্রকৃতি হইতে বিশ্বোৎপত্তির যে ক্রম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাতে মনুষ্যকে যে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় তৎসংক্রান্ত সাধারণ নিয়মাদির কোনই বিচার করা হয় নাই। তাই এই সকল নিয়ম এক্ষণে বিচার করা আবশ্যক। ইহাকেই 'কর্ম্মবিপাক' বলে। এই কর্ম্মবিপাকের প্রথম নিয়ম এই যে, কর্ম্ম একবার সুরু হইলে তাহার ব্যাপার কিংবা চেষ্টা পরে অখণ্ডরূপে সমান চলিতে থাকে ; এবং ব্রহ্মার দিন শেষ হইয়া জগতের সংহার হইলেও এই কর্ম্ম বীজরূপে অবশিষ্ট থাকে এবং পুনর্ব্বার জগতের আরম্ভ হইলে সেই কর্ম্মবীজ হইতেই পুনর্ব্বার অঙ্কুর পূর্ব্ববৎ উদ্গত হয়। মহাভারতে উক্ত আছে যে,—

যেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ॥

অর্থাৎ "প্রত্যেক প্রাণী পূর্ব্বের সৃষ্টিতে যে যে কর্ম্ম করিয়াছে সেই সেই কর্ম্ম (তাহার ইচ্ছা হউক বা না হউক) সে যথাপূর্ব্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে" (মভা. শাং. ২৩১. ৪৮, ৪৯ ও গী. ৮. ১৮ ও ১৯ দেখ)। "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ" (গী. ৪. ১১)—কর্ম্মের গতি কঠিন; শুধু তাহাই নহে, কর্ম্মের আসক্তিও অতীব কঠিন। কেহই কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় না। কর্ম্ম বশতই বায়ু বহিতেছে, কর্ম্মবশতই সূর্য্যচন্দ্রাদি পরিভ্রমণ করিতেছে; এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর আদি সগুণ দেবতারাও কর্ম্ম-বশতই কার্য্যে নিমগ্ন রহিয়াছেন, ইন্দ্রাদির কথা দূরে থাক্। সগুণ অর্থে নামরূপাত্মক, এবং নামরূপাত্মক অর্থে কর্ম্ম কিংবা কর্ম্মের পরিণাম। মায়াত্মক কর্ম্ম মূলারম্ভে কোথা হইতে আসিল ইহা যখন বলা যায় না, তখন তদঙ্গভূত মনুষ্য এই কর্ম্মের ফেরে প্রথমে কিরূপে আবদ্ধ হইল তাহাও বলা যায় না। কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক না, সেই কর্ম্মের ফেরে একবার আট্‌কা পড়িলে পরে, তাহার এক নামরূপাত্মক দেহের নাশ হইলে কর্ম্মের পরিণাম বশতঃ তাহাকে পরে এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে হয়। কারণ, আধুনিক আধিভৌতিক শাস্ত্রীরাও এক্ষণে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কর্ম্মশক্তির কখনই নাশ হয় না; যে শক্তি আজ এক নামরূপে দেখা যায় তাহাই সেই নামরূপের নাশ হইলে অন্য নামরূপে প্রকট হইয়া থাকে। * এবং এক নামরূপের নাশ হইলে পর তাহাকে যখন ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত হইতেই হয় তখন এই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ নির্জীবই হইবে, তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের কখনই হইতে পারে না, এইরূপও মানিতে পারা যায় না। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই নামরূপাত্মক পরম্পরাকেই জন্ম-মরণের ফের কিংবা সংসার বলে; এবং এই নাম-রূপের আধারভূত শক্তির নাম সমষ্টিরূপে ব্রহ্ম ও ব্যষ্টিরূপে জীবাত্মা হইয়াছে। বস্তুত দেখিতে গেলে, এই আত্মা জন্মেও না মরেও না; ইহা নিত্য ও চির-স্থায়ী। কিন্তু কর্ম্মের ফেরে আট্‌কা পড়ায় এক নামরূপের নাশ হইলে পর তাহাকেই অন্য নামরূপ প্রাপ্ত হইতেই হয়। আজ যাহা করিবে তাহার ভোগ কাল হইবে, কাল যাহা করিবে পরশ্ব তাহার ভোগ হইবে;—শুধু তাহা নহে, এই জন্মে যাহা করিবে তাহা পরজন্মে ভোগ করিতে হইবে,—এইরূপে এই ভবচক্র সর্ব্বদাই চলিতেছে। কেবল আমাদের নহে, কখন কখন আমাদের নাম-রূপাত্মক দেহ হইতে উৎপন্ন আপন পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদেরও এই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় এইরূপ মনুস্মৃতিতে ও মহাভারতে উক্ত হইয়াছে (মনু. ৪. ১৭৩; মভা. আ. ৮০. ৩)। শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলি-তেছেন;—

পাপং কর্ম্ম কৃতং কিঞ্চিদ্‌যদি তস্মিন্ন দৃশ্যতে।
নৃপতে তস্য পুত্রেষু পৌত্রেষ্বপি চ নপ্তৃষু॥

"হে রাজন্! কোন পাপকর্ম্মের ফল পাওয়া গেল না এইরূপ দেখা গেলেও সেই কর্ম্মফল পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌ-ত্রের ভুগিতে হয়" (শাং.১২৯.২১)। কোন কোন উৎকট রোগ বংশপরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে, এইরূপ আমরাও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার, কেহ জন্ম হইতেই কেন দরিদ্র এবং কেহ রাজকুলে কেন জন্মগ্রহণ করে, ইহার উপপত্তিও কর্ম্মবাদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; এবং কাহারো কাহারো মতে, ইহাই কর্ম্মবাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ। কর্ম্মের এই চক্র 'বা চাকীকল' একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে পরমেশ্বরও তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই চলিতেছে, এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় যে, কর্ম্মফলের বিধাতা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন আর কে হইবে (বেসূ. ৩. ২. ৩৮; কৌ. ৩. ৮)? এবং সেই জন্য, "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্" (গী.৭.২২)—আমার নির্দ্দিষ্ট বাঞ্ছিত ফল মনুষ্য প্রাপ্ত হয়—এইরূপ ভগবান্ বলিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মফল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার কাজ পরমেশ্বরের হইলেও যাহার যেরূপ ভালমন্দ কর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্মের যোগ্যতা, তদনুরূপই এই ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; পরমেশ্বর এই বিষয়ে বস্তুত উদাসীন; মনুষ্যে মনুষ্যে ভালমন্দের ভেদ হইলেও পরমেশ্বর বৈষম্য (বিষম বুদ্ধি) ও নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) দোষের পাত্র হন না, এইরূপ বেদান্তশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত (বেসূ. ২. ১. ৩৪)। এই অর্থেই গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" (গী. ৯. ২৯)—ঈশ্বর সকলের পক্ষেই সমান; কিংবা—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ॥

পরমেশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না, কর্ম্ম কিংবা মায়ার স্বাভাবিক চক্র চলিতে

* পুনর্জ্জন্মের এই কল্পনা কেবল হিন্দুধর্ম্মের কিংবা আস্তিক-বাদীদিগেরই স্বীকৃত এরূপ নহে। বৌদ্ধেরা আত্মা না মানিলেও বৈদিক ধর্ম্মান্তর্গত পুনর্জ্জন্মের কল্পনা তাহারা সম্পূর্ণরূপে আপন ধর্ম্মের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে; বিংশতি শতাব্দীতে "পরমেশ্বর মরিয়াছেন" এইরূপ যিনি বলেন সেই পাকা নিরীশ্বরবাদী জর্ম্মণ পণ্ডিত নিৎসেও পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন। কর্ম্মশক্তির যে রূপান্তর নিয়ত হইয়া থাকে তাহা সীমাবিশিষ্ট এবং কাল অনন্ত হওয়া প্রযুক্ত, যে নামরূপ একবার হইয়াছে তাহা কখন না-কখন পরে উৎপন্ন হইবেই এবং সেই জন্য কর্ম্মের চক্র কিংবা ফের নিছক্ আধিভৌতিক দৃষ্টিতেই সিদ্ধ হয়, এবং এইরূপ কল্পনা ও উপপত্তি আমাদের বুদ্ধিতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়—এইরূপ তিনি লিখিয়াছেন। Nietzche's *Eternal Recurrence*, (Complete Works, Engl. Trans, Vol. X/I, PP. 235 256.)

থাকায় প্রাণীমাত্রেরই আপন আপন কর্ম্মানুরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়, (গী. ৫, ১৪, ১৫)। সারকথা, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জাগতিক কর্ম্মের কখন্ আরম্ভ হইয়াছে কিংবা তদঙ্গভূত মনুষ্য প্রথমে কর্ম্মের চক্রে কিরূপে পতিত হইল ইহার উত্তর দেওয়া আমাদের বুদ্ধির অসাধ্য হইলেও কর্ম্মের পরবর্ত্তী পরিণাম অর্থাৎ ফল কেবল কর্ম্মের নিয়মেই হইয়া থাকে এইরূপ যখন দেখা যায়, তখন জগতের আরম্ভ হইতে প্রত্যেক প্রাণী নামরূপাত্মক অনাদি কর্ম্মের নিয়মের মধ্যে আটকাইয়া পড়িয়াছে তাহা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। 'কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ' এই যে-বচন এই প্রকরণের আরম্ভেই দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থই এই।

এই অনাদি কর্ম্মপ্রবাহের পর্য্যায়শব্দ অনেক, যথা, সংসার, প্রকৃতি, মায়া, দৃশ্য জগৎ, জাগতিক নিয়ম ইত্যাদি। কারণ সৃষ্টিশাস্ত্রের নিয়ম নামরূপের মধ্যে অবস্থিত পরিবর্ত্তনেরই নিয়ম; এবং এই দৃষ্টিতে দেখিলে, সমস্ত আধিভৌতিক শাস্ত্র নামরূপাত্মক মায়াপ্রপঞ্চের মধ্যেই আসে। এই মায়ার নিয়ম ও বন্ধন সুদৃঢ় ও সর্ব্বব্যাপী। তাই, এই নামরূপাত্মক মায়ার কিংবা দৃশ্যজগতের অতীত অথবা মূলস্থ অন্য কোন নিত্য তত্ত্ব নাই এইরূপ যিনি মানেন সেই হেকেলের ন্যায় নিছক্ আধিভৌতিকশাস্ত্রজ্ঞানী এই জগৎচক্র যে দিকে টানিবে মনুষ্যকে সেইদিকেই যাইতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিত এইরূপ বলেন যে, নামরূপাত্মক নশ্বর স্বরূপ হইতে আমি মুক্ত হইব কিংবা অমুক কাজ করিলে আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে, এইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যের যে ধারণা, তাহা নিছক্ ভ্রান্তি; আত্মা কিংবা পরমাত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, এবং অমৃতত্ব মিথ্যা ও শুধু তাহাই নহে, এই জগতে কোন মনুষ্যই আপন ইচ্ছাতে কিছুই করিতে পারে না—তাহার সে স্বাতন্ত্র্য নাই। মনুষ্য আজ যে কাজ করে, তাহা পূর্ব্বে তাহার নিজের কিংবা তাহার পূর্ব্বপুরুষের দ্বারা কৃত কর্ম্মেরই পরিণাম; সুতরাং উক্ত কাজ করা কিংবা না করা, তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। উদাহরণ যথা—অন্যের কোন ভাল জিনিস দেখিলে উহা চুরি করিব এইরূপ বুদ্ধি পূর্ব্বকর্ম্মবশতঃ কিংবা বংশপরম্পরাগত সংস্কারবশতঃ কোন কোন ব্যক্তির মনে, তাহার ইচ্ছা না হইলেও, উৎপন্ন হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে ঐ বস্তু চুরি করিতে প্রবৃত্ত করে। সারকথা, 'অনিচ্ছন্ অপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ' (গী. ৩. ৩৬) ইচ্ছা না থাকিলেও মনুষ্য পাপ করে—এইরূপ গীতাতে যাহা উক্ত হইয়াছে সেই তত্ত্ব সর্ব্বত্র একইরূপ উপযোগী, তাহার ব্যতিক্রম নাই, তাহা হইতে মুক্ত হইবারও পথ নাই, এইরূপ এই আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের মত। এই মতানুসারে দেখিলে, মনুষ্যের আজ যে বুদ্ধি কিংবা ইচ্ছা হইতেছে তাহা কল্যকার কর্ম্মের ফল, এবং কল্যকার বুদ্ধি পরশ্বের কর্ম্মের ফল; এবং শেষে এই কারণপরম্পরার অন্ত না হওয়ায় মনুষ্য নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে কখনই কিছু করিতে পারে না, যাহা কিছু ঘটে তাহা পূর্ব্বকর্ম্মের অর্থাৎ দৈবেরই ফল—কারণ, প্রাক্তন কর্ম্মেরই লোকে 'দৈব' নাম দিয়া থাকে। এইরূপ, যদি কোন কাজ করিবার কিংবা না করিবার স্বাতন্ত্র্যই মনুষ্যের নাই, তবে মনুষ্য আপন আচরণ অমুক প্রকারে সংশোধন করিবে, অমুক প্রকারে ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান সম্পাদন করিয়া বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিবে, এ কথাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। নদীর প্রবাহে পতিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়, মায়া, প্রকৃতি, সৃষ্টিক্রম, কিংবা কর্ম্মপ্রবাহ যেদিকে তাহাকে টানিবে নীরবে সেই দিকেই যাইতে হইবে—তাহাতে প্রগতিই হউক বা অধোগতিই হউক। এই সম্বন্ধে অন্য কতকগুলি উৎক্রান্তিবাদী এইরূপ বলেন যে, প্রকৃতির স্বরূপ স্থির নহে, নামরূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়; এই পরিবর্ত্তন কোন্ জাগতিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে তাহা দেখিয়া মনুষ্য আপনার লাভ যাহাতে হয় এইরূপে বাহ্য জগৎকে বদ্‌লাইয়া লইবে; এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহারে এই নীতিসূত্র-অনুসারেই অগ্নি কিংবা বিদ্যুৎ-শক্তিকে মনুষ্য আপনার কাজে লাগাইয়া থাকে, এইরূপ আমরা দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার, চেষ্টার দ্বারা মনুষ্যস্বভাবও ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাও অনুভূতির বিষয় কিন্তু জগৎসৃষ্টির কার্য্যে কিংবা মনুষ্যের স্বভাবে পরিবর্ত্তন হয় বা হয় না, কিংবা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে কি না—ইহা উপস্থিত প্রশ্ন নহে; এই পরিবর্ত্তন করিবার যে বুদ্ধি বা ইচ্ছা মনুষ্যের হইয়া থাকে, সেই বিষয়ে তাহার স্বাধীনতা আছে কিনা ইহাই অগ্রে স্থির করিতে হইবে। এবং আধিভৌতিক শাস্ত্রদৃষ্টিতে, এই বুদ্ধি হওয়া বা না-হওয়াই যদি 'বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী' এই নীতি অনুসারে প্রকৃতির, কর্ম্মের, কিংবা জগতের নিয়মে যদি প্রথমেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে তবে এই আধিভৌতিক শাস্ত্রানুসারে কোন কর্ম্ম করিবার কিংবা না করিবার স্বাতন্ত্র্য মনুষ্যের নাই, এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। এই মতবাদকে 'বাসনা-স্বাতন্ত্র্য', 'ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য', কিংবা 'প্রবৃত্তি-স্বাতন্ত্র্য' বলে। শুধু কর্ম্মবিপাকের কিংবা শুধু আধিভৌতিক শাস্ত্রের দৃষ্টিতেই যদি বিচার করা যায় তবে কোন মনুষ্যেরই কোন প্রকার প্রবৃত্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য নাই—কর্ম্মের অভেদ্য লৌহবেষ্টনে গাড়ীর চাকার মতো প্রত্যেক মনুষ্য চারিদিকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে, পরিণামে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু

এই সিদ্ধান্তের সত্যতার পক্ষে অন্তঃকরণ সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত নহে। প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তঃকরণ বলে যে, সূর্য্যকে পশ্চিমদিকে উদিত করিবার সামর্থ্য আমার না থাকিলেও আমার এইটুকু শক্তি নিশ্চয়ই আছে যে, আমি নিজে যে কাজ করিতে পারি, তাহার সারাসার বিচারপূর্ব্বক করা বা না করা, কিংবা যখন আমার সম্মুখে পাপ ও পুণ্যের বা ধর্ম্ম অধর্ম্মের দুই মার্গ উপস্থিত হয়, সেই দুই মার্গের মধ্যে ভালো কিংবা মন্দকে স্বীকার করা মনুষ্যের ইচ্ছাধীন অর্থাৎ মনুষ্যের আয়ত্তের মধ্যে। এই ধারণা সত্য কি মিথ্যা, এক্ষণে তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। যদি মিথ্যা বলো, তবে এই ধারণাকেই ভিত্তি করিয়া হত্যা প্রভৃতি অপরাধকারীকে অপরাধ স্থির করিয়া দণ্ড দেওয়া হয়; আর যদি সত্য বলিয়া মানো তবে কর্ম্মবাদ, কর্ম্মবিপাক, কিংবা দৃশ্যজগতের নিয়ম মিথ্যা প্রতীত হয়। আধিভৌতিক শাস্ত্রে কেবল জড়পদার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেরই বিচার কর্ত্তব্য হওয়ায় এই প্রশ্ন উত্থিত হয় না। কিন্তু যে কর্ম্মযোগ শাস্ত্রে জ্ঞানবান মনুষ্যকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের যে বিচার করিতে হয়, তাহাতে এই প্রশ্নটি গুরুতর হওয়ায় তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়। কারণ, মনুষ্যের কোনই প্রবৃত্তিস্বাতন্ত্র্য নাই এইরূপ একবার স্থির সিদ্ধান্ত হইলে, অমুক প্রকারে বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিবে, কিংবা অমুক কার্য্য করিবে এবং অমুক কার্য্য করিবে না, অমুক ধর্ম্ম্য, অমুক অধর্ম্ম্য ইত্যাদি বিধিনিষেধশাস্ত্রের সমস্ত গোলযোগও স্বতই অন্তর্হিত হইবে (বেসূ. ২. ৩. ৩১), * এবং পরম্পরাক্রমে কিংবা প্রত্যক্ষ রীতিতে মহামায়া প্রকৃতির দাসত্বে থাকাই পরম পুরুষার্থ হইবে। অথবা পুরুষার্থই কেন?—আপনার অধীনে থাকার কথা হয় তো পুরুষার্থ ঠিক। কিন্তু যেখানে আপনার বলিয়া তিলমাত্র সত্তা বা ইচ্ছা রহিল না, সেখানে পরতন্ত্রতা কিংবা দাস্য ছাড়া আর অন্য কি হইতে পারে? লাঙ্গলে জোড়া গরুর মতো সকলে প্রকৃতির হুকুমে খাটিয়া মরে, তাই শঙ্কর কবি বলেন "পদার্থধর্ম্মের শৃঙ্খল নিত্য আমাদের পায়ে পরিতে হয়।" আমাদের দেশে কর্ম্মবাদে কিংবা দৈববাদে এবং পাশ্চাত্য দেশে প্রথমে খৃষ্টধর্ম্মান্তর্গত ভবিতব্যতবাদে এবং আধুনিককালে শুদ্ধ আধিভৌতিক শাস্ত্রের সৃষ্টিক্রমবাদে ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যের দিকে পণ্ডিতগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় এই বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে; এখনও চলিতেছে। কিন্তু ঐ সমস্ত এইখানে বলা অসম্ভব বলিয়া বেদান্তশাস্ত্রে ও ভগবদ্গীতায় এই প্রশ্নের কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল তাহারই বিচার এই প্রকরণে করিয়াছি।

কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি এবং কর্ম্ম একবার শুরু হইলে কর্ম্মচক্রের উপর পরমেশ্বরও তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না সত্য। তথাপি অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত যে, দৃশ্যজগৎ শুধু নামরূপ অথবা কর্ম্মমাত্র নহে; কিন্তু এই নামরূপাত্মক আবরণের নীচে আধারভূত এক আত্মরূপী স্বতন্ত্র ও অবিনাশী ব্রহ্মজগৎ আছে এবং মনুষ্যের দেহান্তর্ভূত আত্মা সেই নিত্য ও স্বতন্ত্র পরব্রহ্মেরই অংশ। এই সিদ্ধান্তের সহায়তায় প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যাহা অনিবার্য্য বাধা বলিয়া মনে হয় সেই বাধা হইতেও মুক্ত হইবার এক পন্থা আছে, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বিচার করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মবিপাক প্রক্রিয়ার বর্ণনা শেষ অংশের সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। যেরূপ কর্ম্ম করিবে সেইরূপ ভোগ হইবে, এই নিয়ম কেবল এক ব্যক্তির প্রতিই প্রযুক্ত হয় এরূপ নহে; পরিবার, জাতি, রাষ্ট্র, এমন-কি সমস্ত জগতেরও ইহা উপযোগী। নিজ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিতেই হয়। এবং পরিবারের মধ্যে, জাতির মধ্যে কিংবা দেশের মধ্যে প্রত্যেক মনুষ্যের সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত প্রত্যেক মনুষ্যকে আপনার নিজের কর্ম্মফল শুধু নহে, পারিবারিক, সামাজিক কর্ম্মের ফলও অংশতঃ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যবহারে প্রায় এক মনুষ্যের কর্ম্মসম্বন্ধেই বিচার করা হয় বলিয়া কর্ম্মবিপাক প্রক্রিয়াতে কর্ম্মবিভাগ প্রায় একটী মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই করা হয়। উদাহরণ যথা,—মনুষ্যকৃত অশুভ কর্ম্মের—কায়িক বাচিক ও মানসিক—মনু এই তিন ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে ব্যভিচার, হিংসা ও চৌর্য্য এই তিনটাকে কায়িক; কটু, মিথ্যা, কম করিয়া বলা, প্রলাপ বকা এই চারিটীকে বাচিক এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, অন্যের মন্দ চিন্তা এবং মিথ্যা আগ্রহ করা এই তিনটীকে মানসিক—সবশুদ্ধ দশ প্রকার অশুভ কিংবা পাপ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া (মনু. ১২. ৫-৭; মভা. অনু. ১৩), সেই সব কর্ম্মের ফলও বলিয়াছেন। তথাপি এই ভেদ চিরস্থির নহে। কারণ এই অধ্যায়েই পরে সমস্ত কর্ম্মের—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন ভেদ করা হইয়াছে এবং প্রায় ভগবদ্গীতার বর্ণনানুসারেই এই তিন প্রকার গুণের কিংবা কর্ম্মের লক্ষণও প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ১৪. ১১-১৫; ১৮. ২৩-২৫; মনু. ১২. ৩১-৩৪)। কিন্তু কর্ম্মবিপাক প্রকরণে কর্ম্মের যে বিভাগ সাধারণত পাওয়া যায় তাহা এই দুই হইতে

* বেদান্তসূত্রের এই অধিকরণকে 'জীবকর্তৃত্বাধিকরণ' বলে। তাহার প্রথম সূত্রই "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" অর্থাৎ বিধিনিষেধশাস্ত্রে অর্থবত্ত্ব হইবার জন্য জীবকে কর্ত্তা বলিয়া মানা আবশ্যক হয়। পাণিনির "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" সূত্রের (পা. ১. ৪. ৫৪) 'কর্ত্তা' শব্দেই আত্মস্বাতন্ত্র্য বুঝায়, এবং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই অধিকরণ ইহারই সংক্রান্ত।

ভিন্ন; তাহাতে কর্ম্মের সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ও ক্রিয়মান, এই তিন ভেদ করা হইয়া থাকে। কোন মনুষ্য এই ক্ষণ পর্য্যন্ত যে কর্ম্ম করিয়াছে—তাহা এই জন্মেই করা হউক বা পূর্ব্ব জন্মেই হউক—সে সমস্তকে তাহার 'সঞ্চিত' কর্ম্ম বলে। এই 'সঞ্চিতের' অপর নাম 'অদৃষ্ট' এবং মীমাংসকদিগের পরিভাষায়, ইহারই নাম 'অপূর্ব্ব'। এই নাম হইবার কারণ এই যে, কর্ম্ম কিংবা ক্রিয়া যে সময় করা হয়, শুধু সেই সময়েই তাহা দৃশ্য হইয়া থাকে, এবং সেই সময় চলিয়া গেলে পরে সেই কর্ম্ম স্বরূপত অবশিষ্ট না থাকায় তাহার সূক্ষ্ম সুতরাং অদৃশ্য অর্থাৎ অপূর্ব্ব ও বিশিষ্ট পরিণামই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় (বে, সূ. শাং ভা. ৩. ২. ৩৯, ৪০)। যাহাই বলনা কেন, ইহা নির্ব্বিবাদ যে, 'সঞ্চিত', 'অদৃষ্ট' কিংবা 'অপূর্ব্ব' শব্দের অর্থে এই ক্ষণ পর্য্যন্ত যে যে কর্ম্ম করা হইয়াছে সেই সমস্তের পরিণামের সমষ্টি, এই সঞ্চিত কর্ম্ম সমস্ত একেবারে ভোগ করা যায় না। কারণ, এই সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে কিছু ভাল ও কিছু মন্দ অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী ফলপ্রদ থাকিতে পারে। উদাহরণ যথা—কোন সঞ্চিত কর্ম্ম স্বর্গপ্রদ এবং কোনটী নরকপ্রদ হওয়া প্রযুক্ত সেই সমস্তের ফল একই সময়ে ভোগ করা যায় না—একটার পর একটা ভোগ করিতে হয়। তাই 'সঞ্চিতের' মধ্যে যে কর্ম্মের ফল প্রথম আরম্ভ হয়, তাহাকেই 'প্রারব্ধ' অর্থাৎ সুরু-হওয়া 'সঞ্চিত' বলে। ব্যবহারে 'সঞ্চিতের' অর্থেই 'প্রারব্ধ' শব্দের অনেক প্রকার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভুল; শাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখিলে, 'সঞ্চিতের' অর্থাৎ সমস্ত ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মের যে সমষ্টি, তাহারই এক অবান্তর ভেদই 'প্রারব্ধ' এইরূপ উপলব্ধি হয়। প্রারব্ধ কিছু সমস্ত সঞ্চিত নহে; সঞ্চিতের মধ্যে যে অংশের ফলের (কার্য্যের) ভোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহাই প্রারব্ধ; এবং সেইজন্য এই প্রারব্ধেরই আর এক নাম—আরব্ধ কার্য্য। প্রারব্ধ ও সঞ্চিত ব্যতীত ক্রিয়মাণ বলিয়া তৃতীয় এক আর ভেদ আছে। "ক্রিয়মাণ"—ইহা বর্ত্তমান কালবাচক ধাতুসাধিত হওয়ায় তাহার অর্থ—"যাহা এক্ষণে হইতেছে কিংবা যাহা এক্ষণে করিতেছি সেই কর্ম্ম।" কিন্তু এক্ষণে আমরা যাহা কিছু করিতেছি তাহা সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্মের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহারই অর্থাৎ প্রারব্ধেরই পরিণাম; তাই 'ক্রিয়মাণ', কর্ম্মের এই তৃতীয় ভেদ মানিবার আমি কোন কারণ দেখিতে পাই না। প্রারব্ধ কারণ এবং ক্রিয়মাণ তাহার ফল অর্থাৎ কার্য্য, এই দুয়ের মধ্যে এইরূপ ভেদ করা যাইতে পারে সত্য; কিন্তু কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ায় এই ভেদের কোন উপযোগ হইতে পারে না। সঞ্চিতের মধ্যে প্রারব্ধ বাদ দিলে বাকী যে কর্ম্ম থাকে তাহা দেখাইবার জন্য ভিন্ন শব্দের প্রয়োজন হয়। তাই, বেদান্তসূত্রে প্রারব্ধকেই 'প্রারব্ধকার্য্য' এবং যাহা প্রারব্ধ নহে, তাহাকে অনারব্ধ কার্য্য বলা হইয়াছে (বেসূ. ৪. ১. ১৫)। আমার মতে, সঞ্চিত কর্ম্মে এই প্রকার অর্থাৎ প্রারব্ধকার্য্য ও অনারব্ধকার্য্য এইরূপ দ্বিধা ভেদ করাই শাস্ত্রদৃষ্টিতে অধিক যুক্তিসঙ্গত। তাই, 'ক্রিয়মাণ'কে ধাতুসাধিত বর্ত্তমানকালবাচক মনে না করিয়া "বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বা" এই পাণিনিসূত্র অনুসারে (পা. ৩. ৩. ১৩১) ভবিষ্যদ্‌কালবাচক মনে করিলে তাহার অর্থ "যাহা শীঘ্রই পরে ভোগ করিতে হইবে" এইরূপ করিতে পারা যায়; এবং তখন "ক্রিয়মাণ" অর্থ এরই অনারব্ধ কার্য্য' এইরূপ হইবে; 'প্রারব্ধ' ও 'ক্রিয়মাণ' এই দুই শব্দ অনুক্রমে বেদান্তসূত্রের 'আরব্ধকার্য্য' ও 'অনারব্ধকার্য্য এই দুই শব্দের সহিত সমানার্থক হইবে। কিন্তু ক্রিয়মাণ—ইহার সেরূপ অর্থ অধুনা কেহ করে না; ক্রিয়মাণ অর্থে চলিতেছে যে কর্ম্ম এইরূপ অর্থই করা হয়। কিন্তু এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে প্রারব্ধের ফলকেই ক্রিয়মাণ বলিতে হয় এবং যে কর্ম্ম অনারব্ধকার্য্য তাহা বুঝাইবার জন্য, সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ এই তিন শব্দের মধ্যে কোন শব্দই পর্য্যাপ্ত হয় না, এই একটা বড় রকমের আপত্তি উত্থিত হয়। ইহা ছাড়া, ক্রিয়মাণ শব্দের রূঢ়ার্থ ছাড়াও ভালো নহে। তাই সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের এই লৌকিক ভেদ কর্ম্মবিপাক-প্রক্রিয়ায় স্বীকার না করিয়া, আরব্ধকার্য্য ও অনারব্ধকার্য্য এই দুই বর্গে আমি উহাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি এবং তাহাই শাস্ত্রদৃষ্টিতেও সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়। 'ভোগ করা' এই ক্রিয়ার, ভুক্ত (অতীত), ভোগ করা এক্ষণে আরম্ভ হইয়াছে (বর্ত্তমান) এবং পরে ভোগ করিতে হইবে (ভবিষ্য), এইরূপ কালের তিন ভেদ হয়। কিন্তু কর্ম্মবিপাকক্রিয়াতে এইরূপ কর্ম্মের তিন প্রকার ভেদ হইতে পারে না। কারণ, সঞ্চিতের মধ্যে যে কর্ম্ম প্রারব্ধ হইয়া ভোগ করা যায়, তাহার ফল পুনর্ব্বার সঞ্চিতের মধ্যে গিয়াই মিলিত হয়। তাই কর্ম্মভোগের বিচার করিবার সময় সঞ্চিতে (১) ভোগ আরম্ভ হইলে প্রারব্ধ এবং ( ) আরম্ভ না হইলে অনারব্ধ—এই দুই ভেদ হইতে পারে; ইহার অধিক বর্গে "সঞ্চিত"কে বিভক্ত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ সমস্ত কর্ম্মফলের দ্বিধা বর্গীকরণ করিবার পর, তাহার উপভোগ সম্বন্ধে কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়া এই বলে যে, সঞ্চিত সমস্তই ভোগ্য। তন্মধ্যে যে কর্ম্মফলের ভোগ আরম্ভ হইয়া এই দেহ কিংবা জন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ সঞ্চিতের মধ্যে যে কর্ম্ম প্রারব্ধ হইয়াছে

তাহার ভোগ ব্যতীত অব্যাহতি নাই—"প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ" হাত হইতে বাণ একবার মুক্ত হইলে তাহা যেমন আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, শেষ পর্য্যন্ত তাহা চলিয়াই যায়; কিংবা কুম্ভকারের চাকা একবার গতিপ্রাপ্ত হইলে তাহা যেরূপ উক্ত গতির শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ঘুরিতেই থাকে, প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহার ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্ম্মেরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। যাহা শুরু হইয়াছে তাহার শেষ হওয়াই চাই; নচেৎ তাহা হইতে অব্যাহতি নাই। কিন্তু অনারব্ধকার্য্য-কর্ম্মের বিষয় সেরূপ নহে। এই সমস্ত কর্ম্মকে জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ নাশ করা যাইতে পারে। প্রারব্ধকার্য্য ও অনারব্ধকার্য্য ইহাদের মধ্যে এই যে গুরুতর ভেদ আছে সেই কারণে জ্ঞানীপুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু আসা পর্য্যন্ত অর্থাৎ দেহের জন্মাবধি প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হওয়া পর্য্যন্ত,—শান্তভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। সেইরূপ না করিয়া হঠাৎ দেহত্যাগ করিলে—জ্ঞানের দ্বারা তাহার অনারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলেও—দেহারম্ভক প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ অপূর্ণ থাকে এবং তাহা ভোগ করিবার জন্য পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং তাহার মোক্ষও দূরে পড়িয়া যায়। বেদান্ত ও সাংখ্য এই দুই শাস্ত্রেই এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে (বে, সূ. ৪. ১. ১৩-১৫ সাং. কা. ৬৭)। ইহা ব্যতীত হঠাৎ আত্মহত্যা করা—এক নূতন কর্ম্ম উৎপন্ন হইবে এবং তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য নব জন্ম গ্রহণ করা পুনরায় আবশ্যক হইবে। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, কর্ম্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে আত্মহত্যা করা নির্ব্বুদ্ধিতা।

কর্ম্মফলভোগদৃষ্টিতে কর্ম্মের কি কি ভেদ তাহা বলা হইল। এক্ষণে, কর্ম্মের বন্ধন হইতে কিরূপে অর্থাৎ কোন্ যুক্তিতে মুক্ত হওয়া যায় তাহার বিচার করিব। প্রথম যুক্তি কর্ম্মবাদীদিগেরই অনারব্ধকার্য্য অর্থে পরে ভোগার্থ সঞ্চিত কর্ম্ম, তাহা উপরে বলিয়াছি—তাহা এ জন্মেই ভোগ করিতে হউক কিংবা অন্য জন্মেই ভোগ হউক। কিন্তু এই অর্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কোন কোন মীমাংসক কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আপনার মতে মোক্ষলাভের এক সহজ উপায় বাহির করিয়াছেন। তৃতীয় প্রকরণে কথিত অনুসারে মীমাংসকদৃষ্টিতে সমস্ত কর্ম্মের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ এই চারি ভেদ হয়। তন্মধ্যে সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম না করিলে পাপ হয় এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই করিতে হইবে। তাই, এই দুই কর্ম্ম করিতেই হইবে, এইরূপ মীমাংসকেরা বলেন। বাকী রহিল কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম। তন্মধ্যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে পাপ হয় বলিয়া করিতে নাই; এবং কাম্য কর্ম্ম করিলে তাহার ফলভোগ করিবার জন্য পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়া তাহাও করিতে নাই। এই প্রকারে বিভিন্ন কর্ম্মের পরিণামের তারতম্য বিচার করিয়া মনুষ্য কোন কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে এবং কোন কর্ম্ম যথাশাস্ত্র করিতে থাকিলে সে আপনাআপনিই মুক্ত হইবে। কারণ, এই জন্মের ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধকর্ম্মের অবসান হয়; এবং এই জন্মে সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সাধন করিলে ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিহার করিলে নরকগতি ঘটে না, এবং কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলে স্বর্গাদি সুখভোগেরও আবশ্যকতা থাকে না। ইহলোক, নরক ও স্বর্গ এই তিন গতি হইতে এইরূপে অব্যাহতি পাইলে মোক্ষ ব্যতীত আত্মার আর কোন গতি থাকে না। এই মতবাদকে 'কর্ম্মমুক্তি' কিংবা 'নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি' বলে। কর্ম্ম করিলেও যাহা না করার সমান হয়, অর্থাৎ যখন কর্ম্মের পাপপুণ্যের বন্ধন কর্ত্তার হয় না, সেই অবস্থাকে 'নৈষ্কর্ম্ম্য' কিন্তু মীমাংসকদিগের উপরিউক্ত যুক্তিতে এই নৈষ্কর্ম্ম্য পূর্ণরূপে সাধিত হয় না, ইহা বেদান্তশাস্ত্র স্থির করিয়াছেন (বেসূ. শাং ভা. ৪. ৩. ১৪) এবং গীতাতেও এই অভিপ্রায়েই "কর্ম্ম না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য হয় না, এবং কর্ম্ম ছাড়িলে সিদ্ধিও হয় না"—উক্ত হইয়াছে (গী. ৩. ৪)। গোড়ায় সমস্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন করা দুঃসাধ্য; এবং কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহার সমস্ত দোষ খণ্ডিত হয় না, এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তথাপি উক্ত বিষয় সম্ভব বলিয়া মানিলেও প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগের দ্বারা এবং এ জন্মে কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপরি-উক্ত অনুসারে করিলে কিংবা না করিলে সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের সমষ্টি শেষ হয় মীমাংসকদিগের এই কথা আদৌ ঠিক মনে হয় না; কারণ, দুই 'সঞ্চিত' কর্ম্মের ফল পরস্পরবিরোধী—উদাহরণ যথা, একের ফল স্বর্গসুখ এবং অন্যটির ফল নরকযাতনা হইলে, তাহা একই কালে ও একই স্থানে ভোগ করা অসম্ভব হওয়ায়, কেবল এই জন্মে প্রারব্ধকর্ম্মের দ্বারা এবং এই জন্মে কর্ত্তব্য কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। মহাভারতে পরাশর গীতায় আছে—

> কদাচিৎ সুকৃতং তাত কূটস্থমিব তিষ্ঠতি।
> মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্ দুঃখাদ্ বিমুচ্যতে॥

"কখন কখন মনুষ্যের সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করা পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য (উহা নিজের ফল দিবার পথ দেখিয়া) চুপ করিয়া বসিয়া থাকে" (মভা. শাং. ২৯০. ১৭); এবং এই নীতিসূত্রই সঞ্চিত পাপ কর্ম্মের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। সঞ্চিত কর্ম্মভোগ
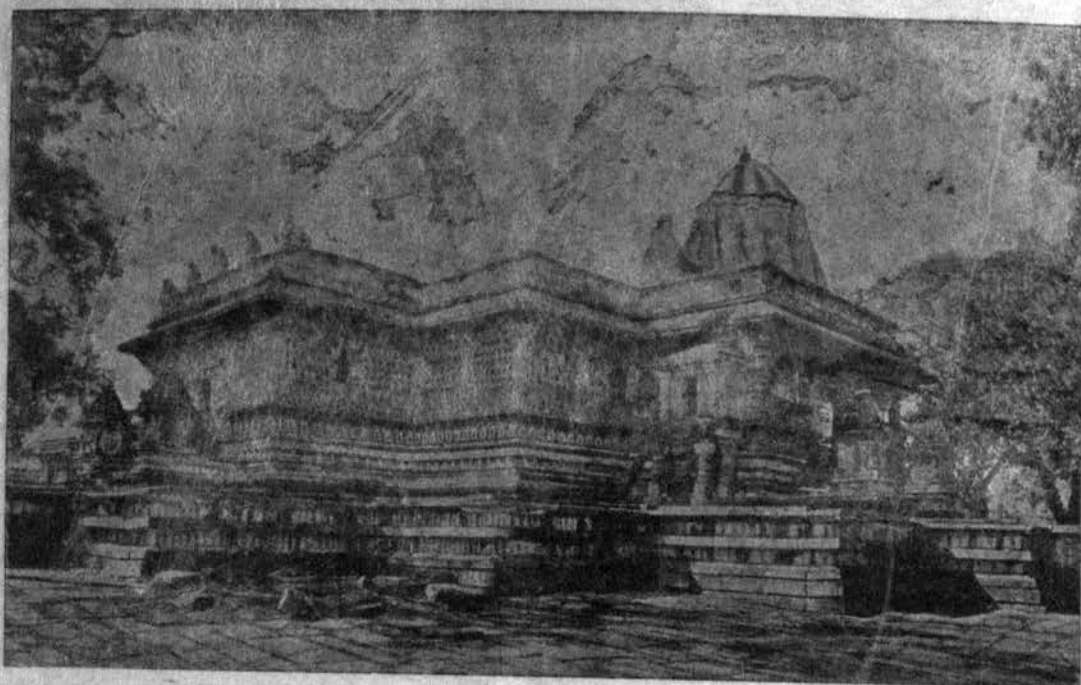
বেলুরের দেব মন্দির।

সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীর সভায় পারস্য রাজ-দূতের অভ্যর্থনা।

কর্ণাটের পূর্ব্ব-গৌরব।

এইরূপে এক জন্মেই শেষ না হইয়া এই সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে অনারব্ধকার্য্য বলিয়া এক অংশ সর্ব্বদাই অবশিষ্ট থাকে; এবং এই জন্মের সমস্ত কর্ম্ম উপরি-উক্ত যুক্তিতে সাধন করিলেও অবশিষ্ট অনারব্ধকার্য্যের সঞ্চিত ভোগ করিবার জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতেই হয়। তাই, মীমাংসকদিগের উপরি-উক্ত সহজ মোক্ষ-উপায়টি মিথ্যা ও ভ্রান্তিমূলক, এইরূপ বেদান্তের সিদ্ধান্ত। কোন উপনিষদেই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের এই পথের কথা বলা হয় নাই। কেবল তর্কের জোরে ইহাকে খাড়া করা হইয়াছে; ঐ তর্কও শেষ পর্য্যন্ত টি'কে না। সারকথা, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার আশা করা, অন্ধের অন্ধকে পথ দেখাইয়া পার করাইবার আশা করার ন্যায় ব্যর্থ। ভাল, মীমাংসকদিগের এই উপায় স্বীকার না করিয়া, আগ্রহের সহিত সমস্ত কর্ম্ম ছা'ড়িয়া নিরুদ্যোগী হইয়া বসিয়া থাকিলে কর্ম্মের বন্ধন ঘুচিবে এইরূপ যদি বলো, তবে তাহাও হইতে পারে না। কারণ, অনারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ তখনও অবশিষ্ট থাকে শুধু নহে, কর্ম্মত্যাগের আগ্রহ ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকা—এই দুই-ই তামসিক কর্ম্ম হইয়া যায়; এবং এই তামসিক কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতেই হয় (গী. ১৮. ৭ ও ৮ দেখ)। তাছাড়া, যতদিন দেহ থাকে সেই পর্য্যন্ত শ্বাসোচ্ছ্বাস কিংবা শোওয়া, বসা ইত্যাদি কর্ম্ম চলিতে থাকায় সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার আগ্রহও ব্যর্থই হয়,—এই জগতে কেহ ক্ষণকালের জন্যও কর্ম্ম ছাড়িতে পারে না, গীতায় অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে (গী. ৩. ৫; ১৮. ১১ দেখ)।

মাঘোৎসব।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

আজি নব-উষাকালে সোনার অরুণ করে
উদ্ভাসিল ধরাতল চারিদিক গেল ভরে।
বনমাঝে বিহঙ্গম গাহিছে মধুর গান
পশিয়া শ্রবণে তাহা জুড়ায় সবার প্রাণ॥
সিঞ্চিয়া সুধার ধারা মন্দে বহিছে মলয় বায়।
নানা নব ফুলবাসে ধরা আজি মধুময়॥

(২)

আজি এ প্রভাতকালে পবিত্র সবার প্রাণে
জাগিছে তাঁহার নাম অপূর্ব্ব নবীন তানে॥
একদিন যেই নাম হিমাচল শৃঙ্গ হ'তে
হয়েছিল বিঘোষিত পুণ্যভূমি এ ভারতে॥
জেনেছিল সেই দিন হ'য়ে সবে একপ্রাণ
অমৃতের পুত্র তারা তারা,—পূর্ণ শক্তিমান॥

(৩)

আজি এ মধুর প্রাতে মিলি যত ভক্তগণ
শুনহ তাঁহার বাণী হয়ে সবে একমন॥
অমৃত-স্বরূপ তিনি,—তিনি আমাদের পিতা
পুণ্যময় রাজ্য তাঁর, ভেদাভেদ নাহি সেথা॥
হইলে তাঁহার জ্ঞান দূরে যায় সব ভয়।
চল সবে তাঁর পথে—তিনি যে আনন্দময়॥

(৪)

উঠ সবে ভক্তগণ ছাড়ি মোহ ক্ষুদ্র জ্ঞান
চলহ তাঁহার পথে হয়ে সবে একপ্রাণ।
দুর্গম তাঁহার পথ কদাপি সুগম নয়
তাঁহারে জানিলে আর রবে না শমন-ভয়।
তপনবরণ তিনি পূর্ণ-শক্তি জ্ঞানময়
পুণ্যময় রাজ্য তাঁর আঁধারের পারে রয়।

(৫)

তাঁহারে জানিলে ধন্য হবে আমাদের জ্ঞান,
শান্ত হবে ভারতের পবিত্র সবার প্রাণ।
ধন্য হবে ধর্ম্ম এই ধ্রুব সত্য পুণ্যময়
দূরে যাবে আমাদের শোকতাপ ভবভয়॥
ধন্য হবে ভারতের ঋষি-প্রচারিত গান
রবেনা হৃদয়ে আর ক্ষুদ্র মোহ অভিমান॥

কর্ণাটের পূর্ব্ব গৌরব।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কন্নাড়-সাহিত্যসম্বন্ধে কিছু বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে (১৫০ খৃঃ অব্দে) Ptolemy তাঁহার গ্রন্থে বাদামি, ইণ্ডি, কলফেরি, পট্টদকল প্রভৃতি কন্নাড়-নামধারী নগরসকলের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কন্নাড় কবিগণের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে যে কন্নাড়ভাষা প্রচলিত ছিল তাহার পূর্ব্বে পূর্বদ দলে কন্নাড় নামক প্রাচীন কন্নাড় ভাষা বর্ত্তমান ছিল। অনুমান করা যায় যে উক্ত পূর্ব্বদ কন্নাড় ভাষা পরিপুষ্ট হইতে অন্ততঃ সাত আট শত বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে

পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রীক ভাষার নাটকে কন্নাড়শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে দ্বিতীয় শতাব্দীতেও কন্নাড় ভাষা কতক পরিমাণে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। তৎপরে আমরা দেখিতে পাই যে গঙ্গাবংশীয় রাজগণ খৃঃ তৃতীয় এবং পঞ্চম শতাব্দীতে কন্নাড় ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গা এবং কদম্ববংশীয়ের রাজত্বকালে সুমন্ত ভদ্র, কবি পরমেষ্টি, পুজ্যপাদ, দুর্বিনিতা প্রভৃতি কবিগণ কন্নাড় ভাষায় পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। "কর্ণাটক কবি চরিত্র" লেখকের মতে উক্ত সুমন্ত ভদ্র কবি খৃঃ ১৩৮ সালে বর্ত্তমান ছিলেন।

চালুক্যরাজগণের সময়ের সাহিত্যানুরাগী রাজার অভাব ছিল না। এই সময়েও কন্নাড়ভাষা বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। শ্রীবর্দ্ধ দেব, বিমল, উদয়, নাগার্জ্জুন, কবীশ্বর, পণ্ডিত, লোকপাল, রবিকীর্ত্তি, চন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ এই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। বাদামি নগরে কন্নাড় ভাষায় লিখিত শিলালিপি দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অদূরের কীর্ত্তিবর্গকৃত শিলালিপি প্রাচীনতম কন্নাড় শিলালিপি বলিয়া গণ্য হয়। ইহা খৃঃ ৫৬৭।৬৮ সালে খোদিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রকুট রাজাদিগের সময়েও বিশেষরূপে সাহিত্যচর্চ্চা ছিল। রাষ্ট্রকুটবংশীয় স্বনামখ্যাত রাজা অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গ একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি সাহিত্যিকগণকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং নিজেও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কন্নাড়ভাষায় সংগৃহীত পুস্তকাদির মধ্যে নৃপতুঙ্গ-বিরচিত কবিরাজমার্গ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ। ইহা সম্ভবত ৭৩৭-৭৯৭ শকের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। নৃপতুঙ্গের এই পুস্তকখানি অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রমাণস্বরূপ। রাজা নৃপতুঙ্গ প্রশ্নোত্তররত্নমালা নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। জনৈক তিব্বতদেশীয় পর্য্যটকও নৃপতুঙ্গ-বিরচিত রত্নমালার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ের বিজয়াঙ্কা নাম্নী একটি মহিলা গ্রন্থকর্ত্রীরও পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি বেঙ্কেশ নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। অকলঙ্ক, গুণনিধি, পম্প প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণও রাষ্ট্রকুট রাজ্য গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকুটরাজ কৃষ্ণ হলায়ুধলিখিত কবিরহস্য গ্রন্থের নায়ক ছিলেন। রাষ্ট্রকুট-রাজাদিগের দানপত্রসকল সংস্কৃতের ন্যায় কন্নাড় কবিতা-ছন্দে লিখিত হইত। প্রসিদ্ধ জৈন কবি জয়সেন এবং গুণবর্দ্ধও ইহাঁদের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। রাষ্ট্রকুট নৃপতিগণ কবিগণকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেন।

তৎপরবর্ত্তী চালুক্যরাজগণের সময় কন্নাড়-সাহিত্য আরও অধিক পরিমাণে পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিল। এই সময় কর্ণাট প্রদেশ যেমন রাজনীতিক্ষেত্রের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সাহিত্যসম্বন্ধেও তদনুরূপ শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল। এই সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকার দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকুটবংশের শেষ এবং চালুক্যবংশের প্রারম্ভকালে আর্য্যাবর্ত্তে কোন খ্যাতনামা রাজা ছিলেন না। এদিকে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য সাহিত্যানুরাগী বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত ছিলেন। এই জন্য উত্তরদেশীয় অনেক পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি বিহ্লন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ঘুরিয়া কোন পৃষ্ঠপোষক না পাইয়া পরে বিক্রমাদিত্যের নিকট সম্মানিত এবং "বিদ্যাপতি"র পদ লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইনি রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম চিরস্মরণীয় করিবার ইচ্ছায় "বিক্রমাঙ্ক-দেবচরিত" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে আদিপম্পা, রন্ন, চন্দ্ররাজা, দুর্গসিংহ, কীর্ত্তিবর্ম্মা, নাগবর্ম্মা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবি এবং সাহিত্যকগণ বিদ্যমান ছিলেন।

আদিপম্পা, পন্ন এবং রন্ন এই তিনজন কবি পরস্পরসমকক্ষ ছিলেন। ইহাঁদের তিন জনই কবিরত্ন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তৎকালীন নৃপতিগণ কবিদিগকে এতাদৃশ মান্য এবং শ্রদ্ধা করিতেন যে রাজা তৈলোক্য রন্ন কবিকে তাঁহার মান্যের জন্য ছত্র ও চামর প্রদান করিয়াছিলেন। মিতাক্ষরা নামক হিন্দু আইন পুস্তক বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের রাজধানী কল্যাণ নগরে লিখিত হইয়াছিল।

বিক্রমাদিত্যের পুত্র সোমেশ্বর মানসোল্লাস

অভিলষিতার্থচিন্তামণি নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে নানা বিষয় লিখিত আছে। যথা :—

(ক) কি প্রকারে রাজ্যলাভ হয়।

(খ) রাজ্যলাভ করিয়া কি প্রকারে উহা রক্ষা করিতে হয়।

(গ) নৃপতিগণের কোন্ কোন্ বিলাসের বশীভূত হওয়া উচিত।

(ঘ) বিষয়ান্তর-চিন্তা-প্রণালী।

(ঙ) আমোদ এবং মৃগয়াদি।

এক কথায়—তৎকালে সংস্কৃত ভাষায় এমন কোন পুস্তক ছিল না যাহার সার তত্ব এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। রাজনীতি, নক্ষত্রবিদ্যা, দৈব-বিদ্যা, সাহিত্য, অলঙ্কার, কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, কলাবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, অশ্ব, হস্তি ও কুক্কুরাদি চিকিৎসা, বশীকরণ বিদ্যা, প্রভৃতি সকল বিষয়ই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছিল। তাঁহার এই অসাধারণ বিদ্যাগৌরবের জন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞভূপ নামে আখ্যাত হইতেন।

হোয়সালা বংশের রাজত্বকালে অভিনব পম্পা, কাণ্ডি, রাজাদিত্য, সুমনোবল, মল্লিকার্জ্জুন, রুদ্র-ভট্ট, কেশরাজ প্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন।

বিজয়নগরবংশীয় নৃপতিদিগের রাজত্বকালে বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, আয়ুর্ব্বেদ, নীতি, যুদ্ধ-কলা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির লেখক প্রসিদ্ধ ভাষ্য-কার বিদ্যারণ্য বিদ্যমান ছিলেন। ময়ূর, মঙ্গরস এবং কমারব্যাস, নিত্যাত্মসুখ, লক্ষনদন্তেশ, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কন্নাড় কবিগণও এই সময়ের লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পুরন্দর দাস, কুমার দাস প্রভৃতি সাধুগণও এই সময়ের লোক। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সভায় অষ্টদিগ্গজ নামক পণ্ডিতা-ষ্টক বর্ত্তমান ছিলেন। অজয়দিক্ষিত নামক আল-ঙ্কারিক পণ্ডিতও ইহাঁদিগের মধ্যে একজন ছিলেন।

কর্ণাট প্রদেশে যত নৃপতি-কবি ছিলেন, বোধ হয় ভারতের আর কুত্রাপিও তত রাজকবি দেখা যায় না। আমরা এক্ষণে কয়েক জন কবিভূপতির নাম উল্লেখ করিব।

খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে গঙ্গাবংশীয় দ্বিতীয় মাধব দত্তক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পঞ্চম শতাব্দীতে দুর্ব্বিনিতা নামক উক্তবংশীয় আর একজন নৃপতি ভারবিকৃত কিরাতা-র্জ্জুনীয়ের ভাষ্য লেখেন। ইহাই কন্নাড়ভাষার প্রথম গদ্য গ্রন্থ বলিয়া উক্ত হয়।

অষ্টম শতাব্দীতে শ্রীপুরুস নামক গঙ্গাবংশীয় রাজা গজশাস্ত্র সম্বন্ধে পুস্তক লিখেন।

নবম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকুটবংশীয় রাজা নৃপতুঙ্গ তাঁহার কবিরাজমার্গ রচনা করেন।

খৃঃ ১১২৫ সালে চালুক্যরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মা গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়েই সোমেশ্বর তাঁহার মানসোল্লাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

খৃঃ ১১৫০ সালে উদয় নামক চোলারাজ উদয়াদিত্যালঙ্কার নামক গ্রন্থ লিখেন।

সৈনিকপুরুষদিগের মধ্যেও কবিত্বশক্তি পরি-স্ফুট হইয়াছিল। হোয়সালা রাজের চামুণ্ডরাম, এবং পোলব নামক দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষ কবিতা রচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অন্যতর হোয়সালা-সৈন্যাধ্যক্ষ সোম, ভারতীয় আটটি ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন।

অতঃপর আমরা কর্ণাটের বিদ্যামন্দির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। অমোঘবর্ষ রাজা নৃপতুঙ্গের রাজত্ব কালে ইণ্ডি তালুকের অন্তর্গত সালোতার্গ নামক স্থানে তথাকার অধিপতি চক্রায়ুধ কর্ত্তৃক একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। চক্রায়ুধ দুই শত ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে গোদাবরী নদী তীরে গমন করিয়া নিম্নলিখিত দানপত্র উৎসর্গ করেন—আমরা একখানি ইংরাজী পুস্তক হইতে এই দানপত্রের অনুবাদ অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

Rich, spacious and beautiful as by the creator who by his own will has established the threefold universe......this college full of intelligence is resplendent with Brahmins. Here there are scholars born in various districts. For the subsistence of them Chakrayudha gave land rentfree to the scholars of the college in this village known as Pahattige or Saralote the mine of virtues—rentfree land measures 500 Nivartanas and 12 Nivartanas, 27 rentfree dwellings and half as man more and a rentfree flower-

garden measuring 41 Nivartanas and 12 Nivartanas of lands., On the occasion of marriage the people being Brahmins shall give to the congregation of the scholars of the college five flowers of good money and at the time of thread ceremony as above and half at tonsure ceremoney. If for any cause a feast is given to Brahmins the people shall give according to their means a dinner to these members of the college. 50 Nivartanas of rentfree land and a rentfree house in the college quarters are given to the lecturer.

মহীশূরের অন্তঃর্গত মচ্ছঙ্গি নামক স্থানে হোয়সালা রাজ্যের মন্ত্রী পেরুমল কর্ত্তৃক খৃঃ ১২৯০ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা বে-সরকারী বিদ্যালয় ছিল। এখানে সমর-কলা (যুদ্ধনীতি), তহসিল (রাজ্য-নীতি), ধর্ম্ম, সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। রাজা তৃতীয় জয়সিংহের ভগিনী অক্কা দেবী এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে বেলুর নামক স্থানে ভূমি দান করিয়াছিলেন।

ফোড়ের সন্নিকট অক্কালুর নামক স্থানে তত্রস্থ মঠে কুমার পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য ভূমি দানের দানপত্র পাওয়া গিয়াছে।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

সেই দিন সন্ধ্যাকালে কাছারী হইতে বাড়ী আসিবার পর ওঁর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইল। একেবারেই নিদ্রা নাই। আমাদের হয়তো কোন ভুলচুক হইয়াছে এইরূপ একটা পরিতাপ মনে রহিয়া গেল। আবার রায় বাহাদুর চিন্তামন নারায়ণ ভট্ট—এই প্রাণের বন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ আসায় ওঁর অত্যন্ত দুঃখ হইল এবং মন এত উদ্বিগ্ন হইল যে, দুই চার দিন একটার পর একটা হওয়ায়, নিত্য কার্য্য করিতেও মন লাগিল না। বাস্ত সময় উনি লিখিতে বসিয়া-লেখা বন্ধ করিয়া ভাবিতে বসিয়া যাইতেন। অনেকক্ষণ পরে, আমি এ কি করিতেছি ইহা মনে হওয়ায় আবার কাজে প্রবৃত্ত হইতেন। "চিন্তামন রাও আমার ছোট ভায়ের মত ছিলেন, আমার ডান হাত ছিলেন, আমার সমস্ত কাজ হাতে লইয়া, খুব দৃঢ়তার সহিত চালাইবেন এইরূপ আমার ভরসা ছিল। তিনি খুব দৃঢ়সঙ্কল্প ও কাজের লোক ছিলেন" এইরূপ তাঁর মুখ হইতে আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাস বাক্য বাহির হইতে লাগিল, ব্যাকুল হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন ও চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যিনি কাজ-ছাড়া কখনই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন না, সেই তিনি এখন কাজ করিতে করিতে ৫।১০ মিনিট সচিন্তভাবে বসিয়া আছেন দেখা যাইত। পূর্ব্বাপেক্ষা কথা কম কহিতেন। আহারে রুচি হইত না। উঁহার নিত্য-প্রিয় টাট্‌কা ফল ও বাদাম পেস্তা খাবার দিকেও মন নাই এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। পর পর ৮।১০ দিন একেবারেই অন্ন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিছু খাবার তৈরী করিয়া দিলে ভাল লাগিত না। যদি বা আহারে বসিতেন,—অতিশয় টক্ দই, ও সেই দধিতে ভিজিবার মত ততটা ভাত ও একহাতা-ভোর ছোলা সিদ্ধ—এই মাত্র তাঁর আহার ছিল। আর অন্য সমস্ত জিনিস থাকিলে, খাইতেন না। চাট্‌নী তাঁর নিত্য প্রিয় ছিল। ঝাল্ নোন্‌তা জিনিস যতই করনা ওঁর তাতে কখনই অরুচি ছিল না। দুই বেলাই কলাই-ডালের জিনিস কিংবা অন্য ডালের দুই একটা রান্না না থাকিলে তাঁহার খাওয়াই হইত না। অন্য শাকসব্জি, আচার চাট্‌নী যতই থাক্ না কেন, ডালের কোন জিনিস না থাকিলে সমস্ত রান্নাই ব্যর্থ, এবং উনি বলিতেন,—"কি রকম রান্না হয়েছে! একটা জিনিসও খাবার মত নেই'"। এইরূপ যাঁর নিত্য অভ্যাস, তাঁর কি না আহার এখন একটু ছোলাসিদ্ধ ও ভাত! ইহার দরুন দুর্ব্বলতা ও মুখে ফ্যাকাসে রং স্পষ্টই দেখা যাইতে লাগিল এবং আমার দিনরাত ভয় ও ভাবনা হইতে লাগিল। কি জিনিস রাঁধিলে ওঁর ভাল লাগিবে! কিছু একটা ভাল লাগিলে এক গ্রাস অন্নও যদি পেটে পড়ে, তাহা হইলে নিদ্রা আসিবে; পেটে অন্ন নাই বলিয়া নিদ্রা হয় না; আজ তাহলে কি করা যাবে?" এইরূপ চিন্তা ও উদ্বেগে এবং কখন কখন, কি জিনিস করিব মনে মনে তাহার আলোচনায়, ওঁর কাছারী হইতে ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। এ জিনিস কিংবা ও-জিনিস ভাল লাগিবে মনে করিয়া ৫।১০টা জিনিস প্রতিদিন তৈয়ারী করিতাম, কিন্তু উনি তাহার কিছুই খাইতেছেন না ভাল লাগিতেছেনা দেখিয়া আমার বড় খারাপ লাগিত ও দ্বিগুণ ভাবনা হইত। কোন কোন দিন ইহা লক্ষ্য করায় উনি আমাকে বলিতেন, "তুমি এত রকম জিনিস কর কিন্তু আমি তা খাই না, আমার তাহা পছন্দ হয় না এইরূপ মনে করে' তোমার খারাপ লাগতে পারে এ কথা ঠিক। কিন্তু আমি সত্যি বলচি, আমি কোন খাবার

পাই না, আমি করব কি বল। একটু কিছু জিনিস মুখে দিলেই শুধু ছাই পাঁশ বলে মনে হয়। এর উপায় কি? তুমি এত মিহনৎ করে জিনিস তৈরী করেছ, আমি তা না খেলে তোমার খারাপ লাগবে মনে করে আমার ইচ্ছা না থাকলেও কেবল তোমার ভাল লাগবে বলেই আমি একটু মুখে দি, কিন্তু আস্বাদ পাইনে, এর উপায় কি? তখনি যদি বলি ও-সব কিছু কোরো না তাহলে তোমার ভাল লাগবে না এবং না ক'রে'ও তুমি থাকতে পার না। এর এখন কি করব!" এক মাস সওয়া মাস এইভাবেই গেল এবং মার্চ্চ মাস হইতে মে মাসের ছুটি যোগ করিয়া ৪ হপ্তা ছুটি বেশী দিয়া মার্চ্চ মাস হইতে কোর্ট বন্ধ হইল। এতে আমাদের খুব সুবিধা হইল। এ বৎসর, মহাবলেশ্বরে যাব, ওঁর শরীর ভাল নেই, সেখানে না গেলে ওঁর শরীর শোধরাবে না। সেখানকার আবহাওয়া ভাল, একবৎসর শ্রম-পরিহার করিবেন এবং সেখানে প্লেগও নাই সব-চেয়ে সুবিধা এই, এ বৎসর আড়াই মাস পৌনে তিন মাস ছুটি আছে। এইজন্য যাই হোক না, এ বৎসর আমরা মহাবলেশ্বরে যাইব এইরূপ অত্যন্ত আগ্রহ আমার হইল। নিদ্রা নাই, অন্নে রুচি নাই। এ সম্বন্ধে বেশী দিন উপেক্ষা করিলে এই পীড়া ক্ষয়রোগে পরিণত হইবে এইরূপ আমার কল্পনা হওয়ায় আমার অত্যন্ত ভয় হইল এবং কোন রকম করিয়া যাহাতে মহাবলেশ্বরে যাওয়া স্থির হয় আমি সেই চেষ্টা করিতে সুরু করিয়াছিলাম। ৫।৬ দিন রোজ ঐ কথা পাড়িয়া, অনেক আলোচনার পরে আমাদের মহাবলেশ্বরে যাওয়া ঠিক হইল। বোম্বায়ের লোকদিগকে মহাবলেশ্বরে যাইবার পথে, পাঁচগণীর বাহিরে ১০ দিনের জন্য কোয়ারান্‌টিনে রাখা হইয়াছিল। মহাবলেশ্বরের যাত্রী ভদ্রলোকদিগের সঙ্গে, আশ্রিত ও চাকর-বাকর কতজন যাইবে, তন্মধ্যে কত জন আগে যাইবে, কোন্ বাঙ্গালা ভাড়া করা হইয়াছে প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া মহাবলেশ্বরের বাজার-মাষ্টারের 'পাস' আনাইতে হইবে এবং যে সকল লোক আগে যাইবে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইতে হইবে। "এখন কাহাকে কাহাকে মহাবলেশ্বরে আগে পাঠান যাইবে তাহা স্থির করিয়া তাহাদের সহিত জিনিস পত্র ও হাঁড়ি-কুঁড়ি যাহা দিতে হইবে তাহা প্রস্তুত রাখো। হাইকোর্ট বন্ধ হইতে এখন দশ এগার দিন আছে; অতএব কালই আমাদের লোক পাঠান উচিত, তাহলে আমরা যে সময়ে যাব, সেই সময়ে তারা সব গুছিয়ে রাখতে পারবে" এইরূপ উনি বলিলেন। মহাবলেশ্বরে [illegible] বাঙ্গালা ঠিক করে রাখবার জন্য সেখানকার হোস-[illegible] দস্তোপন্ত দীক্ষিতকে পত্র লেখা হইয়াছিল। [illegible] উত্তর, তার পরদিন আসিল যে, আপনার লেখা অনুসারে বাঙ্গালা ঠিক হইয়া গিয়াছে। লোকজন শীঘ্র পাঠাইবেন। আমি এখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছি। এই অনুসারে, তারপর দিন সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণ, চাকর ও কেরাণীর সঙ্গে আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিসপত্র দিয়া তাহাদিগকে ভাণ্ডুপা হইতে রওনা করা হইল। পরে তাহারা সেখানে পৌছিয়া, সেখানকার সমস্ত ব্যবস্থা হইয়াছে এইরূপ আট দশদিনের পর দীক্ষিত পত্র পাঠাইলেন। অনন্তর আমরা তারপর দিন মহাবলেশ্বরে যাওয়া স্থির করিয়া আমি অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি ও আগ্রহের সঙ্গে বলিলাম,—"এই সময়ে কেবল ভাবনা-চিন্তায় শরীর এতটা অবসন্ন হয়েছে, একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, তাই এই দুই মাস লেখাপড়ার কাজ না করে' মহাবলেশ্বরের তাজা ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় দুই বেলা বেড়াইয়া শান্তমনে বিশ্রাম নিলে শরীরে নূতন রক্ত আসবে ও সমস্ত অসুখ সেরে গিয়ে অধিক বল হবে।" এই কথায় শুধু "হুঁ" বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু এই স্বীকার নিশ্চয় করিয়া করেন নাই বলিয়া আমি আবার বলিলাম;—"এ কথার কি হবে? আমাকে আশ্বাস দেবার মতো "হুঁ" বলে শুধু আমার বকবকানি থামাবে মনে করেছ। সত্যি হাঁ বলেছ এ রকম আমার মনে হচ্ছে না।" এই কথা শুনিয়া উনি খুব হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "ঠিক বলেছ; তুমি নিজেই কথাটা স্বীকার করেছ। ও রকম কোন শব্দ আমার মুখ থেকে বেরুলে তোমার ভাল লাগতো না। আমি কেমন করে মেয়েদের কথা বলাকে "বক্‌বকানি" বলব, তাই ঐ শব্দ আমার মুখ দিয়ে বেরুই নি। বিশ্রাম নেবার অর্থ কি? এ কথা আমি বুঝতে পারি নে। আমি রোজ যে কাজ করি তাতে আমার কাজও হয় বিশ্রামও হয়। আমি ত এই বুঝি। তোমার বিশ্রাম সম্বন্ধে ধারণাটা কি আমাকে বল দেখি। আমরা পুরুষ মানুষ আমাদের বিশ্রামের ধারণা তোমাদের ধারণার সঙ্গে কতটা মেলে সেই বিষয়ে আমার সংশয় আছে। তোমরা স্ত্রীলোক তোমরা পুণ্যবতী, তাই ভগবান তোমাদের প্রকৃতিকে আমাদের উল্টা করেছেন কিন্তু ভাল করেছেন। সমস্ত ভাবনা চিন্তা সমস্ত কষ্ট সহ্য করবার জন্য ভগবান আমাদের পুরুষজাতকে সৃষ্টি করেছেন আর ঘরের ছায়াতে বসে আরাম ও সুখভোগ করবার জন্য তোমাদের স্ত্রীজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা ওজন করে মেপেজুকে আহার করলে, পরিশ্রম বিনা তা হজম হয় না, আর সমস্ত দিনের মধ্যে নিদেন ছয় সাত ঘণ্টা একটা না একটা কাজে পর-পর ব্যাপৃত না থাকলে আমাদের মনের স্ফূর্ত্তি হয় না, সময় কাটে না। সেই রকম আবার তোমাদের দিক্‌টা দেখ, যতই খাওনা

খাই খাওনা, মেহনৎ না করেও, কেবল বসে থেকেও হজম হয়। বাড়ীর কোন কাজ কিংবা লেখাপড়া কিছুই নেই। তবু পাশা, দাবা ও তাস খেলে তোমাদের সময় কাটে ও আমোদ হয়। এতেই দেখা যাচ্ছে, ভগবান তোমাদের একটা বড় অধিকার দিয়েছেন। সেই অধিকার এই যে তোমরা কিছু না করলেও চলে, কিন্তু পুরুষ আমাদের সঙ্গে তোমরা শুধু তর্ক করতেই পার; সে বিষয়ে তোমাদের খুব দক্ষতা আছে।" এই সকল কথা যদিও উনি হাসিতে হাসিতে ঠাট্টা করিয়া বলিতেছিলেন তথাপি আমি এর ভিতর কোন কথা বলি নাই ও হাসি নাই। আমার এই কথা জানা ছিল, যে বিষয় ওঁর নিজের মনোগত অভিপ্রায় নহে, সেই সম্বন্ধে অন্যকে দুঃখ না দিয়া তর্কের দ্বারা কুণ্ঠিত করিয়া চুপ করাইয়া দেওয়া এবং শেষে নিজের যা অভিপ্রায় তাই অবাধে করিয়া যাওয়া এই ধাঁর চিরকেলে স্বভাব সেই অনুসারেই এখনো চলিতেছেন। অতএব এই সময় বেশী কথা না বলাই ভাল; এই মনে করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, তারপর দিন যাইবার তাড়া থাকায় আমি আপনার কাজে গেলাম। এ দিকে "উনি" 'এসিয়াটিক সোসাইটি"কে চিঠি লিখিয়া আপনার যত পুস্তক আবশ্যক তত পুস্তক আনাইয়া, "বেশ গুছিয়ে সঙ্গে নেও" এইরূপ ওঁকে যে ছেলে পুস্তক পড়িয়া শুনাইত তাহাকে বলিলেন। সেই অনুসারে সে সমস্ত বাঁধিয়া লইল, এ দিকে আমারও সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হওয়ায়, আমরা ভাণ্ডুপা ছাড়িয়া মহাবলেশ্বরে পৌছিলাম।

বাঙ্গলায় ঝরণা ও জলের সুবিধা বেশ ছিল। উহা দেখিবামাত্র আমাদের ভাল লাগিল। গত পাঁচ ছয় দিন হইতে, শুধু বালকোরার জ্বর ও কাসি চলিতেছে; সে একেবারেই উঠিতে পারে না; ডাক্তার আসিয়া তাহাকে রোজ দেখেন এবং ঔষধাদি দেন, আমাকে চাকর বলিল। তাহা শুনিয়া আমি নীরবে উঠিয়া হাত পা ধুইয়া এবং সন্ধ্যাকাল হওয়ায় কাপড় ছাড়িয়া রান্না করিতে লাগিয়া গেলাম। এই ক্ষেপে, ছেলেদিগের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে বলিয়া দুই ছেলেকেই সঙ্গে আনিয়াছিলাম। এই সময়ে তারা আমার খুব কাজে লাগিল। তাহাদিগকে হাঁড়িকুঁড়ি ও রান্নার মালমসলা বাহির করিয়া দিতে বলিয়া আমি রাঁধিতে লাগিলাম। এই সময়ে পুণায় প্লেগ ও রাস্তাহীর দেহপরীক্ষার ভয়ে আমার খুড়া ও খুড়শ্বশুর বিঠুকাকা আমাদের সঙ্গে মহাবলেশ্বরে আসিয়াছিলেন। তাঁর বয়স ৭০। ৭২; তাঁহার দেহযষ্টি খুব উচ্চ ছিল এবং শরীরের বাঁধনও মজবুৎ ছিল। ইনি গত ২০। ২২ বৎসর কাল পুণায় আমাদের কাছেই থাকিতেন। এঁর মেজাজ জেদী ও কড়া ছিল। তথাপি খুব প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন এবং শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের উপাসক ছিলেন। রাত্রিদিন ঈশ্বরের ভজন চিন্তন ও মননে তাঁর সময় অতিবাহিত হইত। এই বৃত্তান্ত পরে বলিব। আমার রান্না হইয়া গেলে, আমি বলিয়া পাঠাইলাম, তখন সকলেই আহার করিতে আসিলেন। আহারান্তে বিঠুকাকা ও আর সকলেই আঁচাইয়া আপন আপন জায়গায় গেলেন। কেবল উনি মুখশুদ্ধি করিবার জন্য সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। আমি নিত্যানুসারে ঐ থালাই নিকটে আনিয়া আমার ভাত বাড়িয়া লইলাম এবং "এখন আমার কিছুই দরকার নেই, তোমরা খেতে বোসো" এইরূপ ঐ দুই ছেলেকে বলিয়া আমি খাইতে বসিলাম। বালকোরার পীড়াসম্বন্ধে আমার কথা শুনিয়া উনি বলিলেন, "আজ দুপুরে আমাদের কাকার খুব আমোদ হয়েছিল। আমাদের রাণাডে বংশের সমস্ত পুরুষই মজবুৎ ও সাহসী, কিন্তু তাঁহাদের বলবীর্য্য আমাদের মধ্যে এখন আর নেই; এবং আমাদের পরের বংশের ছেলেরা আরও দুর্ব্বল হবে জেনো"। প্রথমেই পুণায় শরীর-পরীক্ষার ভয়ে কাকা আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। এবং এখানেও শরীর পরীক্ষা আছে দেখিয়া তাঁর ভাল লাগিল না। তাঁর একটু ভয় হইল। আমাদের গাড়ী শরীর-পরীক্ষার আড্ডায় দাঁড় করাইয়া ডাক্তার আমাদিগকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন; আমাকে ও ছেলেদিগকে পরীক্ষা করিবার পর ডাক্তার কাকার দিকে ফিরিলেন এবং নাড়ী দেখিবার জন্য সম্মুখে আসিলেন। কাকা বলিলেন, "কি, আমার নাড়ী দেখ্‌বে? আমার নাড়ী দেখে তুমি কি বুঝবে? আমার আয়ু কত বল দেখি? তোমার হাতে কি আছে? তুমি পেটের জন্য চাকরী করচ। আমার জ্বর আছে কি নেই, এই টুকুই তোমার দেখা আবশ্যক। আচ্ছা আমার হাত দেখ।" এই কথা বলিয়া তিনি ডাক্তারের হাতের কব্জি খুব দৃঢ়ভাবে ধরিলেন। ডাক্তার জাতিতে মুসলমান কিন্তু বেশ অভিজ্ঞ ও সুসভ্য ছিলেন। ডাক্তার কাকার মুখের দিকে চাহিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, "আমার হাত ছাড়ো বাবা। তোমার জ্বরটর কিছুই নেই। আমার চেয়ে তোমার জোর বেশী।" এই কথা শুনিয়া বিঠু কাকা তাঁর হাত ছাড়িয়া দিলেন; তাহার পর "উনি" বলিলেন, "আমাদের গাড়ী এখন চল্‌তে আরম্ভ করেছে।" এই সময় ছোটবেলায় "উনি" বিঠু কাকার বলবীর্য্যের আরও দুই একটা ব্যাপার যা' দেখিয়াছিলেন তাহার গল্প করিলেন। যখন এই সব কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, ইতিমধ্যে আমার খাওয়া হইয়া গেল এবং আমরা দুজনেই উঠিলাম। তার পর দিন হইতে বরাবর

৮ দিন দুই বেলারই রান্না আমাকেই করিতে হইয়াছিল। সেই সময়, উনি যে সব জিনিস খাইতে ভাল বাসিতেন আমি সেই সব জিনিস রাঁধিতাম। কিন্তু মহাবলেশ্বরে আসিবার ৫।৭ দিন পরেও, যতটা হওয়া উচিত শরীর ততটা ওঁর ভাল মনে হইতেছিল না। নিদ্রা অল্পই হইত, ষ্ট্রবেরী ছাড়া মুখে আর কিছুই রুচিতো না। এইখানে আসা অবধি ষ্ট্রবেরী ফল তবু ৮।১০ টা পেটে পড়িতে লাগিল এবং বোম্বাই অপেক্ষা অবসন্নতা কম হইয়া চলা-বলায় অধিক স্ফূর্তি দেখা যাইতে লাগিল। এইরূপ আরো ৫।৭ দিনের পর, এক দিন রাত্রে স্বামি মহাশয় রাত্রে জলযোগ করিবেন না বলিয়া রান্না করিবার পর আমি ছেলেদের বলিলাম, তোমরা সকলে ভাত বাড়ো আমি আজ এইখানে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিব।" তদনুসারে সবাই আসিলে ছেলেরা ভাত বাড়িল এবং আমি সেখানে উঁহার নিকটে একটা পিঁড়ি লইয়া বসিলাম। প্রথম ভাতের ৫।৭ গ্রাস খাইবার পর দুই তিনটা চাটনী খাইয়া দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কে রান্না করেছে। জিনিসগুলি বেশ হয়েছে। আজ আমার মুখে একটু রুচি হয়েছে। আমি মনে করিলাম, যেমন সব সময়ে ঠাট্টা, করেন এও সেই রকম ঠাট্টা, এই মনে করিয়া আমি বলিলাম, রান্না যেই করুক না কেন, তা জেনে কি ফল! খেতে ভাল লাগে তবেই ত? যে কোন জিনিসই করা যায় তা মুখে যদি না রোচে তাহলে সে রান্নার মূল্য কি?" এইরূপ বলিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন উনি বলিলেন, "আমি সত্যই বল্‌চি, ঠাট্টা করচি নে। আমার রুচি যেন ফিরে এসেছে বলে মনে হচ্চে; আজকের সমস্ত জিনিসই আমার ভাল লাগ্‌চে;" এইরূপ বলিতে বলিতে, একটা জিনিসে হাত দিয়া খাইতেছেন ইতিমধ্যে অন্য তরকারী ও "আম্‌টী" তৈয়ারী হওয়ায় পাতে দেওয়া হইল। তাহাও উনি খাইলেন। আমার মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। গত আড়াই মাস তিন মাস, হৃদ্‌রোগের মতো যে ভাবনা-চিন্তা মনে লাগিয়া ছিল তাহা এক্ষণে একটু দূর হইল। আজ আমার উপর ঈশ্বর কৃপা করিয়াছেন এইরূপ মনে করিয়া সেইখানেই ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া আমি মনে মনে কতই ধন্যবাদ করিলাম, প্রার্থনা করিলাম এবং "তোমার কৃপায় আমার এইরূপ সুখের দিন যেন স্থায়ী হয়" এইরূপ ভিক্ষা মাগিলাম। এই সময়ে আমার চোখে জল আসিল, কিন্তু তাহা অন্য কেহ লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই আমি আমার চোখ মুছিয়া অন্য কথা পাড়িলাম। সেই রাত্রে দুই গ্রাস বেশী পেটে পড়ায় রাত্রে বেশ ঘুম হইয়াছিল, সকালে বেশ চাঙ্গা মনে হইতেছিল। যখন মুখ ধুইতেছিলেন সেই সময় বেড়াইতে যাইবার জন্য আবা সাহেব কাহবকে, শিবরাম-হরি-সাটে, শ্রীরামকান্ত জটার প্রভৃতি মিত্রমণ্ডলী নিত্যানুসারে আসিলেন; তখন "উনি" তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"গত ৮।১০ দিনের পর, কাল রাত্রে আমার আহারে রুচি হয়েছে, ঘুমও বেশ হয়েছে, তাই আজ এখন বেড়াইতে যাইবার কোন বাধা নাই"। সেই দিন হইতে আহারে রুচি হইয়াছিল, পরিপাক বেশ হইতেছিল, নিদ্রাও বেশ হইতেছিল, এই জন্য আর ১৫ দিনের মধ্যে 'ওঁর' শরীর ভাল হইল ও পরমেশ্বরের কৃপায় এই সময়ে আমার উৎকট ভাবনা চিন্তা ও ভয় দূর হইল, আমরা আনন্দে বোম্বায়ে ফিরিয়া আসিলাম।

বিঠ্‌ঠল বাবাজী রাণাডে, ওর্ফে, আমাদের বিঠুকাকা।

ইনি আমার খুড়শ্বশুর ছিলেন। ইনি আমাদের সাঙ্গলীবংশের চার ভায়ের মধ্যে এক ভাই ছিলেন। আমাদের শ্বশুরের মৃত্যুর দুই বৎসরের পর, ১৯৭০ অব্দে ইনি পুণায় আমাদের বাড়ী আসিয়া রহিলেন, এবং শেষ-পর্য্যন্ত আমাদের কাছেই ছিলেন। লোকে বলে, ইনি পূর্ব্ববয়সে স্বভাবত রাগী ও জেদী ছিলেন। সেইরূপ আবার খুব লম্বা চওড়া শরীর ছিল, বেশ বলবান ছিলেন; এই সমস্ত খুড়তুতো ভায়েরা ও তাঁহাদের ছেলেরা প্রায়ই আমার শ্বশুরের নিকটেই থাকিত। ভুদবগড়, পন্থালা, গড়হিংলজ, আল্‌তে প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইঁহাদের ছোট-খাটো চাকরী ছিল। তাঁরা চাকরীতে থাকিয়া, স্ত্রীপুত্রদিগকে আমাদের কোল্হাপুরের বাড়ীতে রাখিয়া-ছিলেন, সেইজন্য তাহাদের শিক্ষা ও ভরণপোষণের সমস্ত ব্যবস্থা আমার শ্বশুর মহাশয়েরই করিতে হইত। ইঁহা-দের মধ্যে এই বিঠুকাকার ১৫।২০ টাকার একটা চাকরী ছিল। তাঁহার উপরিওয়ালা সাহেব কোন অপমানের কথা বলায় তিনি রাজীনামা দিয়া ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করেন, এবং সংসারবিরাগী হইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া, উপরে কথিতানুসারে ১৮৭৯ অব্দে পুণায় প্রত্যাগত হইয়া এক স্থানে থাকিতেন এবং শান্তচিত্তে দিবারাত্রি আপ-নার ভজনপূজনে নিমগ্ন থাকিতেন। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৬৫। তিনি সমস্ত হিন্দুস্থানে ১৫ বৎসর ধরিয়া তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ভ্রমণ ও প্রবাসের মধ্যে যে সব প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল ও যে সব সাধুসন্তের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তাহার দরুন ভক্তিমার্গই শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন এবং সেই মার্গের উপরেই তাঁর শ্রদ্ধা জন্মিল। এই নববিধ ভক্তিমার্গের উপ-দেশানুসারে তিনি অহোরাত্র দেবতার ধ্যান ভজন পূজন, গীতাপঠন ও নামদেব তুকারাম প্রভৃতির অভঙ্গের আবৃ-

ত্তিতে সদা নিমগ্ন থাকিতেন। পূজার আড়ম্বর বেশী ছিল না। তিনি কোন এক সময়ে আপনার ঘরেই পূজা করিতেন। একবার স্নান করিবার জন্য এবং দুই বেলা কেবল আহারের জন্য আপনার ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেন। বাকী সময় দরজা বন্ধ করিয়া নিজের ঘরে অভঙ্গ আবৃত্তি করিয়া ভজন করিতেন কিংবা তাহার পর, অন্যের সহিত কথা কহিবার মতো নিজেরই সহিত উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতেন। কখন রাগে, কখন লোভে, কখন "তুমি আমাকে মিথ্যা করে জানাচ্ছ" এইরূপ আশ্চর্য্যের উচ্ছ্বাসোক্তি বলিয়া, কখন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া দেবতার অসীম কর্ত্তৃত্বে ও লীলাসম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করিতেন, কখন কখন "দয়ালু বলিয়ে নিচ্চ কিন্তু দেখা দেওনা কেন," এইরূপ যেন রোষের ভাবে বলিতেন, কখন কখন আবেগ-ভরে রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিয়াও উঠিতেন। এইরূপ তাঁহার অবস্থা ছিল। বাড়ীর লোক ও অন্য লোক অপেক্ষা এই সব দুই একবার শুনিবার আমার সুবিধা হওয়ায়, আমার শুনিবার জন্য খুব ঔৎসুক্য হইয়াছিল। সকালে কিংবা সন্ধ্যাকালের শান্ত সময়ে কখন কখন রাত্রিতেও তাঁর ঘরের রুদ্ধদ্বারের কাছে কান পাতিয়া শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতাম এবং তিনি এই সব কথা বলিতেছেন,—'ওঁর' কাছে গিয়া বলিতাম। তিনি "দেবতা সহ কহি কথা" এইরূপ বিশ্বাস করিয়া যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক কথা কহে, তাহারা দেবতার কথাও শুনিতে পান বলিয়া মনে হয়। কখন কখন তাঁর এই রকম কথা-কহা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ আবেগে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাঁহার বিষয়ে মহাবলেশ্বরে সেই দিন, দুই এক বিষয় যাহা 'উনি' আমাকে বলিয়াছিলেন, সে তাঁর শক্তিসম্বন্ধে, ও তাঁর সাহস-সম্বন্ধে। যখন তাঁর চাকরী ছিল সেই সময়ে একবার তাঁর কাছারীর সাহেব, যে সকল মরাঠী কেরাণীর ২৫ বৎসর চাকরী হইয়াছে, তাহাদিগকে পেনশন দেওয়া হইবে বলিয়া হুকুম পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আসিলে পর, ২৫ বৎসর যাহাদের চাকরী হইয়াছিল সেই সব লোকদের একটা ফর্দ্দ তাঁহাকে দেওয়া হইল, এবং "তাঁহাকেও পেনশন দেওয়া হইবে" এইরূপ তিনি শুনিতে পাইলেন। এবং সেই ফর্দ্দ সাহেবের নিকট পাঠান হইল। বিঠুকাকা কাছারীর প্রধান কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এতগুলি লোকেদের সাহেব এরই মধ্যে পেন্‌শন কেন দিচ্ছেন?" তিনি উত্তর করিলেন—"সাহেব এই কথা বলছেন, "২৫ বৎসর যাদের চাকরী হয়েছে তাদের বয়স হয়েছে। তারা অক্ষম, তারা কাজের যোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয়। এইজন্য এই সব লোকদের পেন্সন দিয়ে, নবীন তরুণ কার্য্যক্ষম কেরাণীদের কাজে ভর্ত্তি করা হবে।" বিঠুকাকা এই সমস্ত শুনিলেন এবং তারপর দিন সকালে উঠিয়াই সাহেবের বাঙ্গলায় গিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ৮টা ৮৷৷৹টার সময় সাহেব বেড়াইতে যাইবার জন্য বাঙ্গলার বাহিরে আসিলেন ও রাস্তায় আসিবামাত্র বিঠুকাকা তাঁকে "রাম রাম" অভিবাদন করিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" বিঠুকাকা বলিলেন—"আমি বিঠ্ঠল বাবাজী রাণাডে, অমুক কাছারীর কেরাণী।" সাহেব বলিলেন—তুমি কি জন্য এসেছ? এই সময় আমি বাহিরে যাচ্ছি, অন্য কোন সময়ে এসে দেখা কোরো।" "আমি এখানে কোন কাজের জন্য আসিনি, আমার কিছু বলবারও নাই। আপনি দুই মিনিট ঐখানে শুধু দাঁড়িয়ে থাকুন, তাহলেই হইল।" এই কথা বলিয়া তিনি ধুতি কাছা মারিলেন এবং গায়ের জামা উপরে চড়াইয়া সেইখানেই, রাস্তার ও-ধারে চার গরুতে টানবার মত যে এক পাথরের রোলার পড়িয়াছিল তাহার নিকট গিয়া ও তাহার দাণ্ডা দুই হাতে ধরিয়া সেই রোলারটা—যেখানে সাহেব দাঁড়াইয়া ছিলেন সেইখানে হড়হড় করিয়া টানিয়া আনিলেন। সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন। এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি করচ?" বিঠুকাকা উত্তর করিলেন, "সাহেব আমি আপনার কাছারীতে এইরূপ শুনিলাম যে, ২৫ বৎসর যে সব কেরাণী চাকরী করেছে, তাদের বয়স হয়েছে, তারা অশক্ত হয়েছে বলে আপনি তাদের পেন্সন দিতে চাচ্চেন; দরখাস্ত করলে আমার মত গরীবের নালিশ কি আপনি শুনবেন? লিখিত দরখাস্তের গোলযোগের মধ্যে যাওয়া অপেক্ষা, আমি সাক্ষাতে এই দরখাস্ত করলুম। অসামর্থ্যের জন্য যদি পেন্সন দেবেন মনে করে থাকেন, তাহা হলে ইচ্ছা হয়ত এই রোলারটা একবার টেনে দেখুন, তাহলে আপনার বিশ্বাস হবে।" এই কথা বলিয়া "রাম রাম" করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর দিন পেন্সনের ফর্দ্দ হইতে বিঠ্ঠল বাবাজী রাণাডের নাম উঠাইয়া দিয়া তাঁকে কাজে বাহাল রাখা হয় এইরূপ সাহেব সেই কাছারীর প্রধান কর্ম্মচারীর নামে পত্র পাঠাইলেন। সকলের পেন্সনের হুকুম হইলেও তোমাকে বাহাল রাখার হুকুম কি করে হল?"—এই কথা আমার শ্বশুর মশায় বিঠুকাকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বিঠুকাকা পূর্ব্বদিনের সকলের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। "ওঁর" তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন আমার শাশুড়ীঠাকরুণ নিফড়া হইতে আম্বেগাঁয়ে গরুর গাড়ীতে যাইতেছিলেন, তখন পথে গাড়ী হইতে "উনি" নীচে পড়িয়া গেলে মার গাড়ী অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল। "উনি" গল্প করেন:—"কিন্তু পিছনে বিঠুকাকা ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছিলেন, তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিয়া

হাসিয়া বলিলাম "আমি পড়ে গেলুম" এবং তিনি আমাকে ঘোড়ার উপর উঠাইয়া লইলেন"—এই সেই বিঠুকাকা। এইটুকু বলিলেই পাঠক চিনিতে পারিবেন।

ইতি ২০শ অধ্যায় সমাপ্ত।

১৮৪১ শকের ৪ঠা মাঘের কার্য্য বিবরণ।

গত ৩রা মাঘ শনিবার দিবসের শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় গণের লিখিত অনুরোধে সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বান অনুসারে মাঘোৎসবের কার্য্য নির্দ্ধারণ জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিস্থিত ভবনের দালানে ৪ঠা মাঘ রবিবার দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় অধ্যক্ষ-সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কার্য্যবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উপস্থিত সভ্য।

শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক।
শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক।
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

১। মন্দিরে উৎসবের প্রস্তাব আলোচিত হইল। স্থির হইল—বাড়ী পুরাতন বলিয়া কোনরূপ দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা থাকায় প্রাতের উৎসব মহর্ষিদেবের বাটীতে হইবে। উহার পূর্ব্বে মন্দিরে কেবল ব্রহ্মের অর্চ্চনা ও "তুমি আমাদের পিতা" সঙ্গীতটী গীত হইবে।

২। উৎসবের কার্য্যপ্রণালী আলোচিত হইল। স্থির হইল ৬ই মাঘ মঙ্গলবার হইতে ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতভাবে উপাসনা হইবে।

৬ই মাঘ মঙ্গলবার — শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
৭ই মাঘ বুধবার — " "
৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার — শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি।
৯ই মাঘ শুক্রবার — শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
১০ই মাঘ শনিবার — শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি।
১১ই মাঘ রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১১ই মাঘ রবিবার রাত্রে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করিবেন।

উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থার ভার শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক। আবশ্যক হইলে উপরোক্ত প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।

৩। সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে অধ্যক্ষ সভা হইবার প্রস্তাব আলোচিত হইল। স্থির হইল—ভবিষ্যতে অধ্যক্ষ-সভার অধিবেশন বিশেষ অসুবিধা না হইলে সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে হইবে।

৪। সর্ব্বসম্মতিক্রমে আদিব্রাহ্মসমাজে একটী লাইব্রেরী করিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল। স্থির হইল—আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে একটী লাইব্রেরী করা হউক এবং তাহার সমস্ত ব্যবস্থার ভার শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর প্রদত্ত হউক।

৫। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে ১৭৲ বেতনে একজন সাময়িক কর্ম্মচারী লইয়া ব্রজেন্দ্র বাবুকে মাসিক ৮৲ টাকা দিয়া আপাততঃ মাঘ মাস হইতে ৬ মাসের ছুটী মঞ্জুর করা হউক। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে এই ৬ মাসের জন্য ১৭৲ বেতনে নিযুক্ত করা হউক।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক
২৩, ১, ২০

শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক
সভাপতি
২৩, ১, ২০

সংবাদ।

চট্টগ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। চট্টগ্রামবাসী আমাদের হিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন—"নিজ বাসাতে মাঘোৎসব উপলক্ষে ১১ই মাঘ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মোৎসব সপরিবারে ও সবান্ধবে সম্পন্ন করিবার জন্য একটু ব্যস্ত আছি সেইজন্য পত্রখানির উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হইল। মার্জ্জনা করিবেন। মধ্যে একদিন পাহাড়তলীতে ডাঃ কুঞ্জবাবুর বাটীতে সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ ও ব্যাখ্যান হতে কিছু কিছু পড়িয়া ব্রহ্মোপাসনা করা যায়; প্রায় ৩০ জন স্থানীয় লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও আগ্রহসহকারে ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। ফলে আমাকে এখন সর্ব্বদা সেখানে নিয়ে যাবার জন্য সকলকার আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। আজ সন্ধ্যার সময় আমার সেখানে উপাসনা করবার কথা আছে।" আমরা চাহি যে যেখানে যেখানে আমাদের হিতৈষী বন্ধুগণ আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই যোগেন্দ্রবাবুর ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের এক-একটী জলন্ত কেন্দ্র হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করুন।

গ্রন্থ-পরিচয়।

পল্লী-ছায়া। শ্রীরোহিণীকুমার গণ প্রণীত। কলিকাতা ৩৩নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, মেটকাফ্ প্রিন্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

"পল্লীছায়া" অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। লেখক ইহাতে পল্লীর অতীত ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে তাহার বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দিনের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাগুলি মন্দ হয় নাই; স্থানে স্থানে কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য শুভ; তিনি ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"সমাজের দোষ-ত্রুটীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, আয়ুকৃত ব্যাধির প্রতীকার করিয়া সমাজকে সুস্থ সবল হইতে ইঙ্গিত করিয়াছি"।

গায়ত্রী। সঙ্কলয়িতা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী, বি, এল্, পাবনা। ১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ।০ আনা মাত্র।

এখানি বৈদিক মহামন্ত্র গায়ত্রীর ব্যাখ্যা-পুস্তিকা। বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই গায়ত্রীর অনেকগুলি ব্যাখ্যা-পুস্তিকার প্রচলন দেখা যায় বটে কিন্তু এখানির মত এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ আর একখানিও দেখি নাই। ইহাতে সায়নাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্যের গায়ত্রীভাষ্য ও তাহার সরল মর্ম্মানুবাদ এবং সুবিস্তৃত তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে। গায়ত্রীর শাঙ্করভাষ্য যাহাতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য না হয়, তাহার জন্য লেখক ভূমিকায় সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদের আলোচনা করিয়াছেন। বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকায় তিনি ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অর্থ না জানিয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিলে কোনই ফল হয় না। নব্যবঙ্গের বর্ত্তমান যুগে আদিব্রাহ্মসমাজই এই মন্ত্রের আদিম প্রচারক। অর্থজ্ঞানের সহিত গায়ত্রীমন্ত্র ধ্যান করিবার আবশ্যকতা আদিব্রাহ্মসমাজই প্রথম মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া সর্ব্বসাধারণে তাহা প্রচলন করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু দেশের জনসাধারণ তখন এই সত্যতত্ত্ব সম্যগ্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; গতানুগতিকতার মোহ হইতে আপনাকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিবার ক্ষমতাও তখন সকলের ছিল না। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই; সমাজ এখন গতানুগতিকতার শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া তাহার শ্রেয়ের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। তাহার এই সচেতনতা, এই সক্রিয়তার জন্য সে পরোক্ষভাবে অনেকপরিমাণে আদিব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী। যুগোচিত শিক্ষা ও দীক্ষাও তাহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, আদিব্রাহ্মসমাজের সেই আদিম সাধনাই বর্ত্তমান যুগের সফলতার পথে দ্রুতপদে চলিয়াছে এবং নব নব উদ্যমে নিত্য নবীনভাবে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহাশয় যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সফল হউক।

সুনীতিবিকাশ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। "সাধনা-কুঞ্জ" চট্টগ্রাম হইতে শ্রীস্বর্ণকুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তি স্থান, আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫০।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট প্রভৃতি। প্রত্যেক ভাগের মূল্য ।৵১০ আনা।

কবিবর জীবেন্দ্রকুমারের এই শিশু-পাঠ্য পুস্তক দুইখানি পড়িয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থখানি পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের বালকদিগের উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির বিষয়নির্ব্বাচনবিষয়ে গ্রন্থকার তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। জাতি ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বিশ্বপ্রেমিকতা, মহাপ্রাণতা, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি নীতি ও ধর্ম্মের সাধারণ শ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলি মনোমুগ্ধকর দৃষ্টান্তের সহিত স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সরল ও সুমধুর ভাষায় বালকদিগের সুকোমল হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত করিবার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ধ্যানলোক ও তপোবনের কবি যে আজ বালকদিগের তুষ্টি, প্রীতি ও শিক্ষাদানে ব্যাপৃত হইয়াছেন, ইহা তাহাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই পুস্তক দুইখানি বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইবার বিশেষ উপযোগী।

একমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

চৈত্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০।

৯২০ সংখ্যা   ১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

উদ্বোধন।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ এই শুভ প্রাতঃকালে এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে মায়ের আহ্বানে তাঁহারই পূজা দিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছি, ইহাতে আমাদের কত-না আনন্দ হইতেছে। সরল প্রাণে তাঁহার নিকট যাইতে হইবে, শিশুর মতো সরল প্রাণে তাঁহার চরণবন্দনা করিতে হইবে, হৃদয়মনের সমুদায় ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হইবে, তবেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে। সরল প্রাণে তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কি যে অসাধ্যসাধনও করা যায়, যে ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া আজ সকলে মিলিয়া মায়ের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিবার অবসর পাইয়াছি, সেই ব্রহ্মমন্দিরই তাহার সাক্ষী। তাঁহাকে সত্য সত্য ভাল বাসিলে, তাঁহার উপর প্রাণের সহিত একান্ত নির্ভর করিলে আমাদের সমস্ত বাধা-বিঘ্নই কাটিয়া যায়। যাঁহার ইচ্ছাতে এই মহান ব্রহ্মচক্র নিয়মিত হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা সংযুক্ত হইলে যে বল আসে, সে বলের নিকট কোন বাধাবিঘ্নই দাঁড়াইতে পারে না। বর্ত্তমানকালে নানা কারণে নূতন ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপনে হস্তক্ষেপ করা দুঃসাহসের কর্ম্ম বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার সংস্থাপকগণের প্রাণে সেই বিশ্বমাতার উপর একান্ত নির্ভর ছিল বলিয়াই তাঁহারা সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে যিনি বিশ্বমাতা, যিনি জগতের মাতা তিনি আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ মাতা। সেই মাতা ও পুত্রের মধ্যে ব্যবধান কিছুই নাই। মায়ের কাছে যাইবার জন্য, তাঁহার কোলে পৌঁছিবার জন্য আমাদের দূরে যাইতে হইবে না। তিনি আমাদের রক্ষাকবচ হইয়া নিত্যই ঘিরিয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা এই শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ আমাদের এত প্রিয়।

ব্রাহ্মসমাজ যদি আমাদের সত্যসত্য প্রিয় হয়, ব্রাহ্মসমাজ যদি সত্যসত্য আমাদের প্রাণের বস্তু হয়, তবে আমরা সকলে যখন একই মায়ের সন্তান তখন আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে হিংসাদ্বন্দ্ব দূর হোক, দূর হইয়া যাক ছোটখাটো কথা লইয়া মান অভিমান। এ সমস্ত সংসারের ছোটখাটো বিষয় যেন আজ এই মহাপূজার কালে আমাদের হৃদয়ে এতটুকুও স্থান না পায়। মায়ের পূজার কাছে সংসারের পাপতাপ জ্বালাযন্ত্রণা, সংসারের ছোটখাটো আমোদ আহ্লাদ, বৃথা হাসিখুসি, সকলই বড়ই তুচ্ছ। সংসারের এই সমস্ত ছোটখাটো বিষয়ই আমাদের চক্ষের সম্মুখে এত বড় হইয়া দাঁড়ায় যে আমাদের মাতা আমাদের নিত্য সঙ্গী থাকিলেও আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না।

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজে ১০ই মাঘ প্রাতঃকালে বিবৃত।

আজ এই মাতৃপূজার দিনে আমাদের সে সমস্তই ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমাদের প্রত্যক্ষ জানিতে হইবে যে বিশ্বমাতা আমাদেরও মাতা এবং তিনি আমাদের নিত্যসাথী। তাঁহাকে মাতা বলিয়া জানিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃবিবাদ দূর করিতে হইবে। প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে আমরা পরস্পরের হৃদয়ে আনন্দ আনিতে পারি।

যাঁহার শক্তিতে আমরা শক্তিমান হইয়াছি, যাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির কণামাত্র পাইয়া আমরা মানুষ হইতে পারিয়াছি, তাঁহার সন্তান হইয়া সংসারের বাধা যেন আমাদের প্রতিপদে না মানিতে হয়। যখন তাঁহার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন সমস্ত বাধাবিঘ্নকে তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ বলিয়া মনে করিব। তখন আমাদের সেই ইচ্ছার সম্মুখে বাস্তবিকই সেই সমস্ত বাধা তুচ্ছ হইয়া পড়িবে।

মাকে যদি আমরা সত্যসত্যই ভালবাসি, তবে তাঁহার কার্য্যে আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করিতে হইবে। তাঁহার নাম প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক নিশ্বাসে প্রশ্বাসে আমাদের প্রচার করিতে হইবে। যে নামের বলে আমরা শতবার বিপথে পড়িয়াও, পাপেতাপে জর্জ্জরিত হইয়াও তাঁহার কোলে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছি, সেই নাম সকল ভাই-ভগ্নীকেই শুনাইতে হইবে; যে কোন ভাইভগ্নীর হৃদয় পাপতাপে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে দেখিব, তাঁহা-রই চক্ষের জল মুছাইতে ছুটিয়া যাইব; তাঁহাকেই প্রাণের ভাই বলিয়া প্রাণের ভিতরে ধরিয়া রাখি-বার জন্য ব্যাকুল হইব। সংসারের অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাঁহার দেহমন কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারই কর্ণে ব্রহ্মনামের মধুর মন্ত্র প্রদান করিয়া মাতা ও সন্তানের মধ্যে প্রেমের ধারা বহাইয়া দিব।

এইভাবে যদি আমরা কার্য্য করিতে পারি, তবেই ব্রাহ্মসমাজের জয়জয়কার হইবে। আমি জানি, যাঁহারা আজ এই উপাসনামণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের হৃদয় হইতে ভক্তিশ্রদ্ধার স্রোত নামিয়া এক প্রবল বন্যা আনয়ন করিয়া দেশবিদেশকে ভাসাইয়া দিক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি। আমরা সকলে কাতর প্রাণে জগন্মাতার নিকট এই প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই তাহা সফল করিবেন। নামেমাত্র ব্রহ্মোপাসক না হইয়া আমাদের কার্য্যে আচারে ও ব্যবহারেও ব্রহ্মোপাসকের উপযুক্ত হইলেই তিনি আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজকেও নিশ্চয়ই জয়যুক্ত করিবেন।

মৈত্রী-সাধন।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ।
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুং॥

হে দেব, পিতা যেমন পুত্রের অপরাধসকল সহ্য করেন, সখা যেমন সখার এবং প্রিয়জন যেমন প্রিয়জনের, তুমিও সেইরূপ আমার অপরাধ সহ্য কর।

ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া অর্জ্জুন যখন বিশ্বরূপ দেখিলেন, অর্জ্জুনের চক্ষের সম্মুখে যখন এই বিরাট-বিশাল বিশ্বচক্রের নিয়ম ও কৌশলসকল উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, এবং যখন অর্জ্জুন সেই বিশ্ব-পরিচালক নিয়ম ও কৌশলেরই একাঙ্গস্বরূপে ভীষ্মদ্রোণ প্রভৃতি মহা-মহা বীরপুরুষদিগকেও স্বীয় স্বীয় কর্ম্মবশে নিহত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তখন তিনি সেই সমস্ত সত্যনিয়মের মহান অলৌ-কিক ভাবের গুরুত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ভগ-বানেরই নিকট তাহা সহ্য করিবার শক্তিলাভের জন্য শরণাগত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিলেন যে, রাশি-রাশি বেদবেদান্তই পড়, আর রাশিরাশি দানধ্যানই কর, সর্বভূতে নির্বৈরভাব অবলম্বন না করিলে, এবং ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধন ও তাঁহাতে একনিষ্ঠ ভক্তি ব্যতীত ভগবানের বিশ্বরূপের তত্ত্ব তলাইয়া বুঝিতে পারিবে না; ভগবান যে কি প্রকারে বিশ্বচক্রের প্রতি অণু-পরমাণুর ভিতরে ওতপ্রোত থাকিয়া জগতের প্রত্যেক নিমেষটী পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, নির্বৈরভাবের সাধন ব্যতীত কোন প্রকারে সে তত্ত্ব কাহারও উপলব্ধিতে আসিতে পারিবে না। মৈত্রী-

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলনসমাজে ১০ই মাঘ প্রাতঃকালে বিবৃত।

ভাবের সম্যক্‌সাধন করিতে পারিলেই, তোমার আত্মা সকলের আত্মার ভিতরে প্রবেশলাভে সক্ষম হইবে, এবং তখনই তুমি ভগবানের বিশ্বরূপের প্রকৃত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। তাই গীতা আমাদিগকে পদে পদে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ববিবাদের অতীত হইতে হইবে; বিপদ-সম্পদ সমস্তই তুল্যচক্ষে দেখিয়া শত্রুমিত্র সকলের প্রতি নির্ব্বৈরভাব অবলম্বন করিতে হইবে।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, মহামৃত্যুর ভিতরে দাঁড়াইয়া, ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। আজ সেই কুরুক্ষেত্র-সমরের পরবর্ত্তী আর এক ভীষণতম সমরের অবসানেও সমস্ত প্রতীচ্য ভূখণ্ডে ঐ একই কথা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে— সর্ব্বভূতের প্রতি, দুর্ব্বল ও সবল সকল জাতির প্রতি নির্ব্বৈরভাব অবলম্বন করিতে হইবে; নচেৎ জগতের শান্তি সুদূরপরাহত। এই নবতিতম ব্রহ্মোৎসবের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আমরাও আজ সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি যে, জীবন লাভ করিতে চাহিলে, মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহিলে, সমুদায় প্রাণমন দিয়া ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে, তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত থাকিতে হইবে, এবং নির্ব্বৈরভাব অবলম্বন করিতে হইবে; পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারি যে, মৈত্রীকেই আমাদের ব্যবহারের নিয়ামক করিতে হইবে।

প্রতীচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীগণ যখন মহাসমরের ফলে প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর করালমূর্ত্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে লাগিল, শোকের করুণ আর্ত্তনাদ যখন প্রতীচ্যভূমির প্রত্যেক গৃহের কর্ণ বধির করিয়া তুলিল, তখনই সেখানে নির্ব্বৈরভাব অবলম্বন করিবার মন্ত্র আবির্ভূত হইল বটে; কিন্তু ইউরোপের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রতীচ্যবাসীর প্রাণের ভিতর এই মন্ত্র সত্যসত্য গৃহীত হইবার পক্ষে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। নিজেদের স্বার্থের জন্য আবশ্যক বলিয়াই ইউরোপীয়গণ এই মন্ত্রের কথা উঠাইয়াছেন, কিন্তু প্রাণের সহিত তাঁহারা এই মন্ত্র সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সম্মত আছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এই নির্ব্বৈরমন্ত্র এই মৈত্রীভাব কেবল ভারতের নহে, ইহা সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডেরও প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচ্য ভূখণ্ড বহুবর্ষব্যাপী পরাধীনতার কঠোর-নিষ্পেষণ মস্তকে বরণ করিয়া লইয়াও এই নির্ব্বৈরভাবকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়াছিল। এই ভাব হইতেই প্রাচ্য ভূখণ্ডে অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ, নামে রুচি জীবে দয়া প্রভৃতি মহাবাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই ভাব লইয়াই বৌদ্ধপন্থী, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, চৈতন্যপন্থী প্রভৃতি মৈত্রীপ্রাণ বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজ ভারতে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে যখন প্রাচ্যভূখণ্ডের মুখপাত্র এই প্রাচীন ভারতভূমির শত সহস্র বর্ষ ধরিয়া সংগঠিত মৈত্রীপ্রাণ প্রাচীন সভ্যতাকে একদিকে আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্রপ্রাণ বিচ্ছেদপ্রিয় নবোত্থিত ভাবসমূহ, অপরদিকে বাহির হইতে সমাগত আত্মসুখপরিপোষক পাশ্চাত্য সভ্যতা আক্রমণ করিয়া তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, সেই মহাসঙ্কটকালে ভারতের এক সুদূর প্রান্তের অধিবাসী ঐ নির্ব্বৈরভাবের ভিত্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভারতের প্রাচীনতম অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের আবিষ্কার করিলেন; এবং সেই সত্যধর্ম্মের উপর ব্রাহ্মসমাজকে দাঁড় করাইয়া চতুর্দ্দিকের ভীষণ আক্রমণ হইতে ঐ নির্ব্বৈরভাবের উদ্ধার সাধন করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ একদিকে শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়া তাহাদের দ্বন্দ্ববিবাদ যে কি মহাভ্রমাত্মক ক্ষুদ্র প্রাণের কার্য্য, তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বৃথা কলহ হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন; এবং অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন— "দাঁড়াও; প্রাচ্যভূমির প্রাচীনতম সভ্যতার বক্ষে অন্যায় অস্ত্রাঘাত করিয়া বৃথা রক্তারক্তি করিও না; কেবল সমস্ত প্রাচ্য ভূমির নহে, সমস্ত জগতের ইহাতে অকল্যাণ আসিবে—এরূপ কাজ করিও না; তোমরা যে বিজ্ঞান-সাহিত্য, যে ব্যবসায়-বাণিজ্য, যে রাজনীতি ও ধর্ম্মমত আমাদিগকে দিতে উদ্যত হইয়াছ, সে সমস্তের মধ্যে বাহিরে বাহিরে জীবনের

একটা চাঞ্চল্য দেখা গেলেও তাহার মধ্য হইতে মৃত্যুর করাল ছায়া সর্ব্বদাই উঁকিঝুঁকি মারিতেছে; কিন্তু আমরা যে প্রাচীনতম ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তাহাকে আপাতত মৃতবৎ দেখা গেলেও তাহার মধ্য হইতে জীবনের অঙ্কুর ফুটিয়া উঠিতেছে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।” নব্বই বৎসর পরে আজ আমরাও সেই মহাপুরুষের সহিত একপ্রাণে বলিতেছি—ছোটখাটো মতামত লইয়া দ্বন্দ্ব-বিবাদ, ছোটখাটো মান-অভিমান লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বৈরসাধনে নিরত হইতে হইবে, মৈত্রীসাধনেই সিদ্ধ হইতে হইবে।

সকল ধর্ম্মের সামঞ্জস্যসাধক এই নির্ব্বৈরভাব প্রাচ্যভূমির প্রাণ বলিয়াই, মৈত্রীই মূলে প্রাচ্যবাসীর ব্যবহারের নিয়ামক বলিয়াই এখানেই বেদ-উপনিষদ সকল প্রকাশিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত ভারতের প্রাণে জাগ্রত থাকিতে পারিয়াছে; একদিকে তান্ত্রিকধর্ম্ম অপরদিকে বৈষ্ণবধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত এক সঙ্গেই ভারতের বক্ষে বিচরণ করিতে পারিতেছে। নির্ব্বৈরভাব প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাণ বলিয়াই মহাত্মা কবীর রাম ও রহিমের অভিন্নতা প্রচার পূর্ব্বক শত সহস্র ভক্তিপিপাসু ব্যক্তির প্রাণমন স্বীয় বচনসুধায় সিক্ত করিতে পারিয়াছেন। এই নির্ব্বৈরভাব প্রাচ্যভূমির প্রাণ বলিয়া প্রাচ্যভূখণ্ডেই বেদ-উপনিষদের ঋষিগণ, এখানেই জরথুস্ত্র ও বুদ্ধ, এখানেই ঈশা, মূসা, ও কনফুসিয়স, এখানেই মহম্মদ, চৈতন্যদেব ও বাবা নানক, এখানেই রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, এবং এখানেই পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্থাপকগণ জন্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

নির্ব্বৈরভাবের মৈত্রীর মূলোচ্ছেদক হইতেছে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী। সর্ব্বভুক অগ্নির ন্যায় সাম্প্রদায়িকতা গণ্ডীবদ্ধ সমাজকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে। সাম্প্রদায়িকতার অর্থই হইল অপরের নিজত্বকে আমার নিজের ক্ষুদ্রতার পদে বলিদান করিতে চাওয়া। বাহিরের জগতে কি একটা বিশাল ভাব, বিরাট অনন্তপুরুষের কি একটা বিরাট অনন্তভাব নিত্য খেলা করিতেছে, সাম্প্রদায়িকতা তাহা উপলব্ধি করিতে দেয় না; কূপমণ্ডুকের মতো বাহিরের আলোককে ভীতির চক্ষে দেখে। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিই হইল অজ্ঞান, অসত্য। কিন্তু মানুষ চিরকাল সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র অজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। মানুষের ভিতরে এমন একটা স্বাধীনতার ভাব আছে, বিরাট বিশাল অনন্তের ভাবে নিজেকে ছাড়িয়া দিবার তাহার এমন একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে যে, তাহাকে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহিলে তাহার নির্ব্বৈরভাব চলিয়া যায়, সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চায়।

প্রকৃতিকেও আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী দেখিতে পাই। প্রকৃতি সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী বলিয়াই আমরা প্রকৃতিতে এত বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। প্রকৃতির কোন একটী পদার্থ যদি অন্য সকল পদার্থকেই নিজের ক্ষুদ্রতার গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিত, তবে জগতে এত বৈচিত্র্য আসিত কি প্রকারে? প্রকৃতির নিয়মই হইল বৈচিত্র্য। একেরই বিকাশ কতশত প্রকারে হইতে দেখা যায়। এক বীজ হইতে ডালপালা ফুলফল কতই না বিকশিত হইতে দেখা যায়। একমাত্র যদি বীজই জগতে থাকিত, তবে কোথায় বা গাছের ছায়া পাইতাম, কোথায় বা ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিতাম, আর কোথায় বা ক্ষুৎপিপাসানিবারক রাশি রাশি ফলের অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকিত! মানুষও তো প্রকৃতির এক অঙ্গ। যদি সকল মানুষ এক ও অভিন্ন একটী মানুষে পরিণত হইত, তবে কোথায় রহিত এই মানুষের বিচিত্র লীলা? সকল বিষয়ে নিজস্ব ছাড়িয়া দিয়া অপরের সহিত এক ও অভিন্ন হইয়া যাওয়াকে তো আত্মার মৃত্যু বলা যাইতে পারে। মানুষের মধ্যে অথবা মানুষের সমাজের মধ্যে জীবনী শক্তি থাকিলেই তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিবেই। তাই সাম্প্রদায়িকতা দূর করিতে বলিয়া আমরা কাহাকেও নিজের বিশেষত্ব মুছিয়া দিয়া অপরের সহিত এক ও অভিন্ন হইতে বলি না। আমরা বলিতে চাহি যে, বাহিরের সূর্য্যালোক আমাদের গৃহে প্রবেশ করিতে দাও—ঘন অন্ধকার দূর হইয়া যাক। যে ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বৈর মন্ত্রের প্রদীপ জ্বালাইয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মসমাজের আজ এই

উৎসবের দিনে আমাদের যেন এই প্রতিজ্ঞা হয় যে, নির্বৈরমন্ত্রের অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান প্রচারভূমি এই ভারতভূমিকে সাম্প্রদায়িকতার মৃত্যুনিশ্বাস স্পর্শ করিতে দিব না।

এই ভারতভূমিকে কেন্দ্র করিয়া, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, যে দেশে বা যে কালে যে কেহ ব্রহ্মোপাসক আছেন বা ছিলেন, সকলেরই নিকট আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া দিতেছি, সকলকেই আজ আমরা আমাদের বিরাট আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতেছি; শত বিভিন্নতা সত্বেও সকল সমাজের প্রতি আমাদের সহায়তার বিশাল বাহু প্রসারিত হৌক। পাপীতাপী সাধু অসাধু কাহাকেও ভগবান প্রত্যাখ্যান করেন নাই; আমাদেরও কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবার অধিকার নাই। যে সাম্প্রদায়িকতা সকল প্রকার হিংসাদ্বেষ বিবাদ-কলহের মূল, দূর হৌক সেই সাম্প্রদায়িকতা; যে আভিজাত্য সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার মূল, চূর্ণ হৌক সেই আভিজাত্যের বৃথা গর্ব। ভাইয়ে ভাইয়ে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে বিচ্ছেদ-বিরহ আনিলে আর চলিবে না। এই সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী চূর্ণ করিতে না পারিলে মুক্তির কথা আর বলিতে যাইব না, ভগবদ্ভক্তির কথা বলিবার অধিকার আমাদের থাকিবে না।

বিজ্ঞানপ্রকাশিত প্রত্যেক নিয়মই সর্বত্র একই ভাবে কার্য্য করে—সে কার্য্যে দেশের ভেদ নাই, কালের ভেদ নাই, অবস্থার ভেদ নাই। উত্তাপের শতবিধ বিকাশপ্রকাশের ভিতরেও উত্তাপের দাহিকতার বিরাম হয় না। এইরূপে দেখা যায় যে, জগতের বিভিন্ন কার্য্যের মধ্যে, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে এক একটী নিয়ম কেন্দ্রস্বরূপে অবস্থিতি করে—সেই কেন্দ্রের অভিব্যক্তিতেই ঐ সকল কার্য্য, ঐ সকল ঘটনা প্রকাশ পায়। পাঁচটী সুরের সম্মিলনের ফলে যে সঙ্গীত উত্থিত হইয়া আমাদের প্রাণের ভিতর ভাবলহরী তুলিতে থাকে, তাহার মধ্যে একটী সুরই কেন্দ্রস্বরূপে ঝঙ্কার দিতে থাকে। সেইরূপ এই জগতে যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, যত কিছু ধর্ম্মসমাজ উঠিতেছে পড়িতেছে, সকলেরই কেন্দ্রস্বরূপে একই নিত্য সত্য পরব্রহ্ম বিদ্যমান। তাঁহারই জ্ঞানের বিকাশে, তাঁহারই শক্তির বিকাশে সমস্ত ঘটনা অভিব্যক্ত হইয়া এক বিশাল পরিধি রচনা করিতেছে। যতই আমরা পরিধির দিকে অগ্রসর হইব, ততই আমরা পরস্পরের মধ্যে বৈচিত্র্য বিভিন্নতা দেখিতে পাইবই। আবার যতই আমরা তলাইয়া দেখিতে যাই, কেন্দ্রের অভিমুখে যতই অগ্রসর হই, ততই দেখি যে, সমস্ত বৈচিত্র্য, সমস্ত বিভিন্নতা ভেদ করিয়া সকল মানুষের ভিতরে, সকল সমাজের ভিতরে একটী সুস্বর ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। বিশ্বজগতের প্রত্যেক অণুপরমাণু, প্রত্যেক জীবজন্তু, প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক সমাজ সেই মহান বিশ্বসঙ্গীতকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, শত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে উপলব্ধি করিবার জন্য আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জড়জগতের সমস্ত ঘটনার ভিতর নিয়মকেন্দ্র আবিষ্কার করা যেমন জড়বিজ্ঞানের কার্য্য, তেমনি অধ্যাত্মরাজ্যের মূলভিত্তি অখণ্ড মহাসত্যকে আবিষ্কার করাও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কার্য্য। বিজ্ঞান যাঁহারা কিছুমাত্র চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা জগতের কোন ঘটনাই অন্ধদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। সেইরূপ ধর্ম্মের পথে অধ্যাত্মপথে যাঁহারা একপদও অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা রাশি-রাশি ধর্ম্মমতের ভিতরে ভগবানকে সারসত্য ভিত্তিরূপে উপলব্ধি না করিয়া থাকিতে পারেন না।

নির্বৈরসাধনের মন্ত্রই হইল এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যদর্শন, ভগবৎকেন্দ্রকে উপলব্ধি করা। সুখের মোহে মানুষ অনেক সময়ে আত্মহারা হইয়া যায় বলিয়া কেন্দ্রমুখী দৃষ্টি হারাইয়া ফেলে। দুঃখের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইলেই মানুষের দৃষ্টি স্বভাবতই কেন্দ্রমুখী হয়, স্বভাবতই প্রাণের ভিতর বললাভের জন্য ঐক্যের সন্ধানে ধাবিত হয়। বর্ত্তমান যুগে ৯০ বৎসর পূর্ব্বে যখন দুঃখের কঠোর কশাঘাতে দেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ব্রাহ্মসমাজ নির্বৈরমন্ত্রের পতাকা উড্ডীন করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি ভগবানের অভিমুখীন করিয়াছিলেন। সকল বিভিন্নতার মূলভিত্তি একের সন্ধানে সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। আজ আবার সমস্ত দেশ এক মহা হাহাকারের ভিতর

দিয়া চলিতেছে, তাই আমরা আজ আবার সেই প্রাচীন মন্ত্রের কথা দেশের সম্মুখে ধারণ করিতেছি। কেবল আমরা কেন, সমগ্র দেশের ভিতরেই ভগবৎকেন্দ্রক ঐক্য সাধনের একটা যেন বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বলপূর্ব্বক কেহ কাহারও মত বদলাইতে পারে না। তাই সকলেরই মনে যেন এই রকমের একটা ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে অনন্ত পুরুষের অনন্ত ভাব যখন অনন্ত পথে বিকাশ লাভ করিতেছে, তখন সেই অনন্ত বিচিত্রতা লইয়া মারামারি করিয়া কোনই লাভ নাই। সেই সমস্তের মধ্যে এককে উপলব্ধি করিতে হইবে; তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া সকলের মিলিতভাবে তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

এই যে ভাব আজ দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ তাহা সংক্ষেপে একটী বীজে প্রকাশ করিয়াছেন—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। এই মন্ত্রকেই আমি ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিয়া মনে করি। আমাকে ধন দাও, যশ দাও, মান দাও, এ প্রকার প্রার্থনাকে ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত উপাসনা বলেন না। ব্রাহ্মসমাজ বলেন, সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে একনিষ্ঠ ভক্তি অর্পণ করিতে হইবে এবং অকুতোভয়ে তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে—এক কথায় ভগবানকে আমাদের সকল কার্য্যের কেন্দ্ররূপে প্রত্যক্ষ জানিয়া তাঁহার সহিত অধ্যাত্মযোগে যুক্ত হইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ ইহাকেই প্রকৃত উপাসনা বলেন। সকল উন্নত ধর্ম্মসমাজেরই এই কথা, ব্রাহ্মসমাজেরও এই কথা।

এই অধ্যাত্মযোগের উপর দাঁড়াইলে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী আপনিই কাটিয়া যাইবে, নির্ব্বৈরমন্ত্র স্বতই সিদ্ধ হইবে। তখন আর কাহাকেও উচ্চ, আর কাহাকেও নীচ বলিয়া ভাবিতে পারিব না। তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে, একটী ধূলিকণারও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, যাহা আমা দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না; আবার আমারও একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, যাহা ধূলিকণা দ্বারা সংসাধিত হইবে না। এখন আমরা ভগবানকে আমাদের পিতা বলিয়া ডাকিতেছি, কিন্তু অধ্যাত্মযোগের উপর দাঁড়াইলে তাঁহাকে সত্যসত্যই প্রাণের ভিতর পিতা বলিয়া উপলব্ধি করিব। তখন সত্যসত্য মানুষকে নিজের ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব, সমস্ত জীবজন্তুই আমার প্রাণের বস্তু হইয়া পড়িবে। তখনই বুঝিতে পারিব যে মানুষ আপনাকে ছাড়িয়া পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে এত আগ্রহ প্রকাশ করে কেন। তখন আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির সহায় হইতে হইবেই। যেমন পরিবারের পাঁচটী লোকের পরস্পরের অবিরোধে স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে পরিবারস্থ পরিস্ফুট হয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজের মধ্যে, বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে থাক না কেন শত বৈচিত্র্য, শত বিভিন্নতা—সকলের মধ্যে প্রাণের একটা একতা থাকিলেই, মৈত্রীর উপর দাঁড়াইয়া পরস্পরের সহায়রূপে কার্য্য করিতে পারিলেই ভগবানের যে ইচ্ছার অভিব্যক্তিতে, যে উদ্দেশ্য লইয়া ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতে যে নবজাগরণের সন্ধিক্ষণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, মহাসমরের অবসানে যাহার প্রতিষ্ঠা, তাহার মূলমন্ত্র হইল মৈত্রীসাধন। আজ সেই নবজাগরণের মধ্যে দাঁড়াইয়া এই উৎসবের দিনে আসুন, আমরাও সকলে, যে দেবতা এই বিশাল আকাশে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, যে দেবতা আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের প্রাণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া জীবনকে ধন্য করি এবং মিলনের এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হই—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং—এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে কথা বল এবং পরস্পরের মন অবগত হও।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

খৃষ্টাব্দ ১৮৯৮—মহাবলেশ্বরে যাত্রা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

১৮৯৮ অব্দে আমরা মহাবলেশ্বরে যাইবার আগে, এপ্রিল মাসে য়ুনিভার্সিটির দুই তিন বৈঠক হইয়া গেল;

সেই বৈঠকে য়ুনিভার্সিটির উচ্চ পরীক্ষায় মরাঠী সাহিত্যের প্রবেশ হইবে কি না, এই প্রশ্ন উপস্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই সম্বন্ধে খুবই আলোচনা হইয়াছিল। তখন কোন প্রকারে সময় করিয়া এই সম্বন্ধে যতটা লিখিতে পারা যায় ততটা লিখিতে হইবে এবং এই প্রশ্নটা বহুমতে পাস করিয়া লইতে হইবে, এই উদ্দেশে উনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা উঁহারই কাজ, এবং "সুগার বাউন্টি" প্রশ্ন সম্বন্ধেও ওঁকে লিখিবার জন্য অন্য লোকে অনুরোধ করিয়াছিল। তখন মহাবলেশ্বরের যাইবার সময় কতকগুলি পুস্তক সঙ্গে লইবার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে পুস্তকতালিকা আনাইয়া এবং তাহার উপর চিহ্ন দিয়া তাহা আনিয়া এবং পার্শেল করিয়া যাহাতে মহাবলেশ্বরে আমার নিকট শীঘ্র পৌছোয় এইরূপে পাঠাইয়া দিবার জন্য কেরাণীকে বলিলেন এবং আমরা মহাবলেশ্বরে যাত্রা করিলাম। সমস্ত বৎসর কাজ করিয়া যে মন শ্রান্ত হইয়াছে সেই মনকে বিশ্রাম দিবার জন্য, মিত্রমণ্ডলীর সহবাসলাভের জন্য, এবং শরীর-মনের সামর্থ্য ও পুষ্টিপ্রদ আব্‌হাওয়া, টাট্‌কা ফল, শাক্‌-সব্‌জি প্রভৃতি উপভোগ করিবার জন্য মহাবলেশ্বরে যাত্রা করিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি উঁহার বিশেষ-প্রিয় সৃষ্টিসৌন্দর্য্য দর্শনে সকাল সন্ধ্যার শান্ত সময় ক্ষেপণ করিবেন,—এইরূপ মহাবলেশ্বরে যাত্রা করিবার মূল উদ্দেশ্য ছিল। মরাঠী সাহিত্য ও "সুগার বৌন্টি" এই দুই কাজ ত ছিলই। তদনুসারে সকালে ও সন্ধ্যাকালে ২ ঘণ্টা ২॥০ ঘণ্টা নিয়মিতরূপে বেড়াইতে যাইতেন, ইহাই তাঁর নিত্য নিয়ম ছিল। যাহা কিছু অবহেলা ও অনিয়মিততা সে কেবল আহার ও বিশ্রাম সম্বন্ধেই হইত। কোন দিন খাইতে উঠিতে বেশী বিলম্ব হইলে আমি কাছে গিয়া বলিতাম, "আজ কত দেরী হয়ে গেল! বাহির থেকে ফেরবার আগেই দশটা বাজে। তার পর অন্য কাজ কি করে করা যাবে। দেরী হয়ে গেলে খাওয়া যায় না, খাবার জিনিস জল হয়ে যায়। তা ছাড়া ছেলেপিলে 'খিদে খিদে' করে' অস্থির হয়।" এইরূপ আমি বলিতাম, এবং কাজ শেষ হইয়া আসিলে উঠিতে উঠিতে উনি বলিতেন; "এই আমি উঠ্‌লেম! বেলা হলে—মেয়ের জাত সুকুমার, তাদের পিত্তি পড়ে, আমরা তা লক্ষ্যই করি না!" কাজ শেষ না হইলে এবং উঠিতে দেরী হইলে বলিতেন—"এই দেখ, আমরা কাজ-ওয়ালা মানুষ! কোন একটা কাজে মন লাগ্‌লে ত লেগে গেল। আমাদের কাজে তোমাদের মন লাগ্‌বে কি করে! তোমরা খেয়ে নেও না। নিত্য আমি কি তোমাদের আগে খাইনে? কোনো দিন, তোমরাই নয় আগে খেলে, তাতে কি এল গেল। এতটা স্বাতন্ত্র্য না থাক্‌লে, "রাণীর রাজ্য" কিসে? এই কথা ঠাট্টা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেও, তার পর কাহারও কথা বলিবার কি সাহস হইত? ছেলেরাও যে-যার জায়গায় চুপ্‌ করিয়া বসিয়া থাকিত।

এই ভাবেই প্রথম দুই সপ্তাহ চলিল। তাহার পর, একদিন সকালে খুব কড়া গরম পড়িয়াছিল এবং বাহির হইতে ফিরিয়া আসিতে ১১টা বাজিয়া গেল, তাই আমার ভাবনা হইল। এবং দুই তিন জানাশুনা স্থানে খোঁজ করিতে পাঠাইলাম। এই সময় মহাবলেশ্বরে সাহেব—কাথবটে, জটার প্রভৃতি পুণার ও অন্য স্থানের মিত্র-মণ্ডলী অনেকেই ছিলেন। এই সমস্ত মণ্ডলী প্রতিদিন সকালে প্রথমেই আমাদের বাড়ী আসিয়া এবং ওঁকে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন। কথা কহিতে কহিতে, চলিতে চলিতে কত বেলা হইল, তাহা তাঁহাদের লক্ষ্য না হওয়ায়, বাড়ীতে শীঘ্র আসিবেন মনে করিলেও, সহজেই ১০॥০টা হইয়া যাইত। আজ অন্য দিনের অপেক্ষাও বেশী বিলম্ব হওয়ায় আমার ভাবনা হইল। যাহাদিগকে খোঁজ করিতে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একজন আসিয়া আমাকে বলিল যে,—সমস্ত মণ্ডলী এখনই ফিরিয়া আসিয়া কাথবটের বাঙ্গলায় কথাবার্ত্তা কহিতে বসিয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, তাহার আধ ঘণ্টা পরে উনি বাড়ী আসিলেন। বন্ধকরা-ছাতা হাতেই রহিয়াছে, কপালে ও মুখে ঘাম হইয়াছে; গরমে ওর মুখ প্রায় লাল হইত। কিন্তু আজ সেই লালের উপর খুব কালিমা পড়িয়াছে। বাড়ী আসিবামাত্র রোজকার মতো কাপড় ছাড়িবার জন্য আমি সামনে আসিলাম। অনেক কাপড় খুলিয়া ফেলিবার পর, ভিতরকার জামা একেবারে মোচড়াইয়া জল বাহির করিবার মতো ভিজিয়া গিয়াছে, উপরকার ফ্ল্যানেলের জামাও ভিজিয়া জব্‌জবে হইয়া গিয়াছে! ভিজা গায়ের উপর বাতাস লাগিবে বলিয়া আমি সমস্ত জান্‌লা বন্ধ করিয়া দিলাম এবং সমস্ত কাপড় ছাড়াইয়া শুক্‌নো ও পরিষ্কার তোয়ালে দিয়া সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া শুষ্ক করিয়া দিলাম এবং অন্য পঞ্জাবী পরাইয়া দিলাম। এইরূপ কাপড় ছাড়াইবার সময় "আজ না জানি কি হয়েছে? আজ এত শ্রান্ত দেখছি কেন"?—এইরূপ মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে দুই তিন বার ওঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজ এত ঘাম হয়েছে কেন? অনেক দূর যেতে হয়েছিল কি? কিংবা বেশী গরম পড়ায় একটা শ্রান্ত হয়ে পড়েছ? অন্য দিনের মত আজও ছাতা খোলা হয়নি বুঝি"? এই কথা শুনিয়া উনি কেবল আমার মুখের দিকে চাহিলেন। উত্তর দিলেন না। মনে হইল, কি উত্তর দিবেন যেন ভাবিয়া পাইতেছেন না,

এবং মন যেন ঘুলাইয়া গিয়াছে। চোখ্ খোলা ছিল। আমার দিকে এবং এদিক ওদিক চাহিতেছেন, কখনই যা হয় না আজ এরূপ কেন হইল? এই প্রশ্ন আমার মনে উপস্থিত হইয়া আমার যেন বুক ফাটিয়া গেল। তথাপি আমি বাহিরে কিছুই না দেখাইয়া বজাবাকে ডাকিয়া, "দুধ জ্বাল দিয়া শীঘ্র নিয়ে আয়" এইরূপ বলিয়া সেইখানেই কৌচের উপর ওঁর পা আস্তে আস্তে টিপিতে লাগিলাম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাড়ীতে প্রায় দশ মিনিট হইল আসিয়াছেন, তবু মন প্রকৃতিস্থ হয় নাই। কিন্তু নিত্য অভ্যাসানুসারেই হউক কিংবা কেন বলিতে পারি না—"ডাক নিয়ে আয়" বলিয়া রোজকার মতো ছেলেদিগকে ডাকিলেন। ছেলেরা ডাক লইয়া আসিল এবং ব্রাহ্মণ দুধ আনিল তাহা ঠাণ্ডা করিয়া পান করিতে দিলাম। ভাউজি ডাকের চিঠির মধ্যে একটা চিঠি খুলিয়া পড়িয়া শুনাইল। এই পত্র পুণা হইতে কনস্‌বতের নিকট হইতে আসিয়াছিল। পুণার বাড়ীতে যে সকল ছাত্র থাকিত তার মধ্যে রাম-নাতু নামে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল। ভাউজি পত্র পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার মধ্যে রামনাতুর নাম ও পীড়ার বৃত্তান্ত আছে লক্ষ্য করিয়া, "সমস্ত পত্র পোড়ো না" বলিয়া দুই তিনবার ইসারা করিলাম, কিন্তু সে তখন খুব উচ্চৈঃস্বরে পত্র পড়িতে থাকায় ওদিকে তাহার লক্ষ্য গেল না। সে সমস্ত পত্রখানই পড়িল। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই, পত্রের বৃত্তান্ত কিছুই ওঁর মনে প্রবেশ করিল না। কারণ উনি একটু রাগিয়া বলিলেন, "বাবা তুই কি পড়চিস? স্পষ্ট করে পড়, আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে। ভাউজী তখনি পত্র আবার পড়িতে আরম্ভ করিল এবং অর্দ্ধেক পড়া হইয়া গেলে, উনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন; "তোর আজ হয়েছে কি? এ রকম করে পড়চিস কেন? তোর পড়া একটা শব্দও আমি বুঝতে পারচিনে", আজিকার কড়া রদ্দুরে মাথায় কোন একটা বিকার উপস্থিত হইয়াছে শুধু এইমাত্র স্পষ্ট আমার মনে আসিল এবং আমি ভাউজীর উপর রাগ করিবার মতো স্বরে বলিলাম, "তুমি কি পড়ছ? একটা শব্দও ঠিক্ করে পড়তে পারচ না; তাই জন্য তোমার গোলযোগ হচ্ছে, যে শুনচে তারও কষ্ট হচ্চে। ওদিকে গিয়ে ভাল করে পত্র পড়ে আয়, এবং তার পর পড়ে শোনা। যা, ওঠ্।" এইরূপ আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া, ওঁর হাঁ-না বলিবার পূর্ব্বেই "শীঘ্রই উঠিয়া যা", এইভাবে হাতের ইসারা করিলাম। তাহা দেখিয়াই সে উঠিয়া গেল এবং নিদেন ১০।১৫ মিনিট কৌচের উপর চুপ করিয়া বিশ্রাম লওয়া হোক্—আমি ওঁকে অনুরোধ করিলাম। আমি কি বলিতেছি তাহার অক্ষর-অর্থ মনে না আসিলেও, শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় বিশ্রাম করিতেই হইল; তাই ইতস্তত না করিয়া সেইখানেই কৌচের উপর শুইয়া পড়িলেন। তখন এক সাফ্ হালুকা আচ্ছাদন-কাপড় ওঁর গায়ের উপর দিয়া, ঘাড় হইতে পা পর্য্যন্ত আমি আস্তে আস্তে গা টিপিতে লাগিলাম। সেই টেপার দরুন বেশ ঘুম আসিল। গা গরম হয় নাই। ঘুম আসিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিল। কেবল মাথাটাই খুব গরম হইয়াছিল এবং মুখের রক্তবর্ণ কমে নাই। ঘাম হইলে আমি আস্তে আস্তে মুছিয়া দিলাম, তবু ঘুম ভাঙ্গিল না। আরও দশ বারো মিনিট ঘুমের পর আলস ও হাই তুলিয়া চোখ খুলিলেন। তার দরুন হয় ত চোখে বেদনা হইয়া থাকিবে, কিন্তু এখন আগেকার চেয়ে দৃষ্টি ভাল হইয়াছে আমার মনে হইল। এখন আহার করিতে উঠিতে হইবে নাকি, ১২॥ টা হইয়াছে,—এই কথা বলিবামাত্র উনি চট্ করিয়া উঠিয়া স্নানের ঘরে গেলেন। আমি আবার বলিলাম। "আজ স্নান না করলেই ভাল হয়। আজ হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছাড়লেই কি চলবে না? আমি ভিজে গামচা দিয়ে গাটা মুছিয়ে দিচ্ছি।" এই কথা বলায় উনি বলিলেন— "আরে না, আজ রদ্দুর লেগে ঘাম হচ্চে, আজ স্নান করতেই হবে।" আমি আর বেশী কিছু বলিলাম না। স্নানের জল প্রস্তুতই ছিল। পাছে ঠাণ্ডা লাগে বলিয়া শীঘ্র স্নান সারিয়া লইলেন। স্নানের পর পাতের নিকট বসিয়া প্রথম ডাল-ভাতের তিন চার গ্রাস মাত্র নিয়েছেন কি, অমনি গায়ে খুব কাঁপুনী হয়ে শীত করিতে লাগিল; তখন "আমি খাব না, আমার শীত করচে;" এইরূপ বলিয়া হাত গুটাইলেন; তখনি ব্রাহ্মণ গাড়ু সম্মুখে ধরিয়া আঁচাইবার জন্য জল দিলেন; এবং আমি এদিকে আসিয়া চাকরকে দিয়া বিছানা প্রস্তুত করাইলাম ও জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম। উনি বিছানায় আসিয়া শুইলে ওঁর গায়ের উপর আচ্ছাদন কাপড় চাপাইয়া দিলাম, তখনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। গায়ে তেমন বেশী তাপ ছিল না; কিন্তু শুধু মাথা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গরম হইয়াছিল; এবং এতক্ষণ যা মনে করিতেছিলাম সেই সংশয় দৃঢ় হইল। আজ রোদ লাগিয়া মাথার কোন প্রকার পীড়া হইয়াছে নিশ্চয়। জ্বর হওয়া, গা ব্যথা করা ও মাথা গরম হওয়া এই সমস্ত লক্ষণ উহারই অঙ্গীভূত। মহাবলেশ্বরে আসিবার পূর্ব্বে বোম্বায়ে কোর্টের সময় ছাড়া, আপনার বিশ্রামের অনেকটা সময় এই নতুন-হাতে-লওয়া দুই কাজে ক্ষেপণ করিতেন, সেইজন্য ততটা বিশ্রাম পান নাই। সেইরূপ আবার, এইখানে আসা অবধি আজ ১৫ দিন প্রতিদিন সকালে ২।৩ ঘণ্টা রোদ খাসিয়া-

ছিল, এইটে আমার মনে ঠিক ধারণা হওয়ায় ডাক্তার পাটনকরকে ডাকিতে পাঠাইলাম এবং এইবারকার পীড়া সম্বন্ধে আমার ধারণা কি—সমস্তই তাঁকে বলিলাম। ডাক্তার বিছানার নিকট গিয়া ওঁর শরীর পরীক্ষা করিলেন এবং বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "তোমার ধারণাই ঠিক, আমারও তাই মনে হয়, এই পীড়ায় খুব ব্রোমাইড প্রয়োগ করা দরকার এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম করা চাই।" আমি বলিলাম—"এই বিষয়ে আমার খুব ভাবনা হয়েছে। যাই হোক না, আসল পীড়াটা কি, সেটা যেন ওঁকে জানিতে দেওয়া না হয়। "ঠাণ্ডা বাতাস ও হিম লেগে জর হয়েছে, আমি ডায়োফ্রেটিক পাঠাচ্ছি, ৩।৩ ঘণ্টা অন্তর লইবেন ও যতটা পারেন শুইয়া থাকিবেন। দুই একদিন ওঠবার শ্রম করবেন না এইরূপ ওঁকে আপনি বলুন এবং ডায়ফ্রেটিকের মধ্যে ব্রোমাইড দিন। দুয়েরই আস্বাদ কাছাকাছি হওয়ায় উহা তাহার মধ্যে দেওয়া যেতে পারবে। তাছাড়া, শুধু ব্রোমাইড দিলে খোঁজ পড়বে, এবং ওঁর মাথার কোন পীড়া হয়েছে কি?—এইরূপ সন্দেহ মনে আসিলেও মনের উপর তাহার ফল হইবে—এই সন্দেহ যেন হইতে দেওয়া না হয়" আমি ডাক্তারকে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম। তিনি 'আচ্ছা' বলিয়া 'ওঁর' কাছে গেলেন ও বলিলেন যে, "তাপ কিছুই নাই, গা ঠাণ্ডা আছে, 'ডায়ফ্রেটিক' পাঠাচ্ছি, তা খেলে ভাল বোধ করবেন; দুই একদিন বিছানায় শুয়ে থাকবেন। ঘামের উপর হাওয়া লাগা ভাল না;" এইরূপ বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। প্রতিদিন ৪৫ হইতে ৫০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ব্রোমাইড দিতে দিতে ৫।৬ দিনের পর একটু কমিয়া আসিল এবং শরীরও একটু ভাল বোধ করিতে লাগিলেন। পীড়া হওয়া পর্য্যন্ত, আগেকার মত ভাল স্মরণশক্তি আসিতে ও পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইতে প্রায় ১৫ দিন লাগিল। সেই পর্য্যন্ত নিত্য অভ্যাসানুযায়ী, যাহা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই কর্ম্মগুলি পর পর করিতেন। কেবলমাত্র লিখিবার সময় লিখিবার বিষয় মুখে যখন বলিতেন, তখন তাহাতে অসঙ্গতি এখনো রহিয়াছে বলিয়া আমি বুঝিতে পারিতাম। কাহারও নামে পত্র লিখিতেছেন, কিন্তু যা লিখিতে বলিতেছেন তাহা নিরর্থক, ইহা দেখিয়া, যে সকল ছেলে নিত্য পত্র লিখিত তাহারা আশ্চর্য্য হইত। এইরূপ যখন হইতে লাগিল, তখন আমি সেই ছেলেদিগকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া স্পষ্ট বলিলাম যে, "তোমরা যখন পত্র লিখিতে বসিবে, যে সব কথা উনি লিখিতে বলিবেন তাহা অক্ষরশ লিখিয়া যাইবে। 'এ কেন?' এইরূপ ওঁকে জিজ্ঞাসা কোরো না, কিংবা লিখবার সময় কিছু ছেড়ে দিও না। পত্র লেখা হলে আমার কাছে নিয়ে আসবে,—কাহার নামে পত্র লিখিতে হইবে, ও কি লিখিতে হইবে তা আমি বলে দেব।" কারণ, 'উনি' পত্র লিখিতে বলিবার সময় ছেলেরা কোন উল্টা কথা জিজ্ঞাসা করিলে এবং ওঁর কি চুক হইয়াছে তাহা ওঁর গোচরে আসিলে, একেবারে মনের উপর ধাক্কা লাগিবে ও তাহার ফল খারাপ হইবে, এই ভয়ে সব দিকেই আমার খুব সাবধান হইতে হইত। এইরূপ ৭।৮ দিন অতীত হইলে, একদিন রাত্রে প্রায় ১০৷৷০ টার সময় ওঁর বেশ নিদ্রা হইয়াছিল। আমি ওঁর কাছে প্রায়ই জাগিয়া থাকিতাম। কিন্তু সেইদিন খুব শ্রান্ত হওয়ায়, 'ওঁর' পায়ে "আজ তুই ঘি মালিশ কর্" এই কথা গঙ্গু চাকরকে বলিয়া আমি পাশের ছেলের খাটে শুইলাম এবং তখনি ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রায় আধ ঘণ্টার পর, খুব একটা হাসির আওয়াজ আমার কাণে আসিল, আমি ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। পীড়ার সম্বন্ধে ভয় সেত মনে আছেই; কিন্তু চোখে খুব ঘুমের ঘোর থাকায়, ব্যাপারটা কি, বুঝিতে পারিতেছিলাম না। ইতিমধ্যে আর একবার সজোরে হাসির শব্দ হইল। কাহার হাসি তাহা চিনিয়া আমি অত্যন্ত ভয় পাইলাম এবং আমি একেবারেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তবু সেই অবস্থাতেই ওঁর খাটের কাছে গিয়া, "কি হয়েছে? কি হয়েছে" এইরূপ বলিয়া ভীতি-সূচক অর্দ্ধস্ফুট শব্দে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন উনি বলিলেন, "ওগো ভয় পেয়ো না, আমি জেগে আছি, কিন্তু প্রদীপটা এনে তোমার বুদ্ধিমান চাকর কি করচেন, একবার দেখে যাও।" চাকর ঘি মালিশ করিতেছে আমি জানিতাম। তাই আমি বলিলাম, 'এ কেন? চাকর কি করবে? সে ঘি মালিস করচে।" তখন উনি বলিলেন, "আগে তুমি প্রদীপটা এনেই দেখনা। তারপর হাসবার কারণটা তোমাকে বলব। আমি বাহিরে গিয়া প্রদীপ আনিলাম—এবং আনিয়া দেখি কিনা, চাকর ওঁর এক পা আপনার কোলে লইয়া ঘি মালিস করিতেছে এবং ওঁর পায়ের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত মাথা ঢুলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দুই পায়েরই মোজা যেমন-তেমনি-ই আছে, এবং মোজার উপরেই ঘি মালিস করিয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া আমারও হাসি পাইল এবং চাকরের এই বোকামির দরুণ আমি হাঁক দিয়া উহাকে জাগাইয়া দিলাম। তারপর দিন, সকাল হইতে যে স্মরণশক্তি ১৫ দিন পূর্ব্বে লোপ পাইয়াছিল, সেই স্মরণশক্তি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে আমার বিশ্বাস হইল। কারণ, তারপর দিন সকালে চায়ের মজলিসে সমস্ত মণ্ডলী জমিলে পর, রাত্রে সংঘটিত গঙ্গু চাকরের বুদ্ধিমত্তার কথাটা উনি হাসিয়া ভাউজীর কাছে বলিলেন

এবং সেইদিন হইতে দিন দিন ক্রমশঃ উনি শরীর ভাল বোধ করিতে লাগিলেন। তখন আরও দুই তিনদিনের পর বোম্বায়ের এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে ওঁর পুস্তকের বাক্স পার্শেল ডাকে ১০।১২ দিন পূর্ব্বে আসিয়াছিল এবং এই পীড়ার জন্যই যাহা আমি এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম তাহা আজ বাহির করিয়া দিলাম। পীড়ার সময়ে বাক্সর কথা মনে পড়ায় "এখনো কেন বাক্স এল না" বলিয়া ৫।৭ বার খোঁজ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাউজীকে সিপাইকে, "বাক্স আসার কথা ওঁকে বলিও না," এইরূপ উহাদিগকে হুকুম দিয়াছিলাম, তাই ও কথা কেহই বলে নাই। এই সম্বন্ধে ভাউজীকে দিয়া বোম্বায়ে পুস্তক শীঘ্র পাঠাইবে এই মর্ম্মে দুই এক পত্রও লিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ পত্র উহারা আমাকে দিয়াছিল। এইরূপ সব দিক হইতেই বন্দোবস্ত থাকায় অল্পদিনের মধ্যেই পীড়া ভাল হইল এবং আমার ভাগ্যে ছিল বলিয়া আরও কিছুদিন ওঁর সহবাস সুখ লাভ করিলাম।

এই বৎসরে প্রায় সাংসারিক সকল বিষয় সম্বন্ধেই উনি অধিক উদাসীনতা দেখাইতে লাগিলেন। অভ্যাসানুসারে একটার পর-একটা কাজ হইতে থাকিলেও তাঁহাতে ওঁর মন শুধু বসিত না শুধু নহে, সেদিকে যথোচিত লক্ষ্যই করিতেন না। যাহারা শুধু উপর উপর দেখিত তাদের পক্ষে ইহা লক্ষ্য করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যাহারা দেখিত তাহারা ইহা না লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারিত না। এই বৎসরে ওঁর শরীর একটু নরমই ছিল। তাছাড়া কোন পারমার্থিক চিন্তায় ওঁর মন নিমগ্ন রহিয়াছে বলিয়া মনে হইত। কারণ, শারীরিক অসুস্থতার দরুণ ব্যবহারে কিছুই জানা যাইত না; কিন্তু তাঁর যে সকল প্রিয় বিষয়—যথা রাজকীয়, সামাজিক, ঔদ্যোগিক,—সেই সব বিষয়ে সংবাদপত্রে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইত, আজকাল সেই সকল প্রবন্ধের দিকেও তাঁর লক্ষ্য নাই এইরূপ দেখা যাইত। পুস্তক কিংবা সংবাদ পত্র পড়িবার জন্য হাতে লইয়াছেন, কতবার তাহা হাতেই রহিয়া যাইত,—অন্য কোন বিষয়ের চিন্তায় মন নিমগ্ন আছে দেখা যাইত। খাইতে বসিয়া প্রায়ই আমোদ করিয়া অনেক কথা বলিতেন, ঠাট্টা করিতেন। আমি যে জিনিস করিতাম তাহার খুব নিন্দা করিয়া হাসিতেন এবং আমাকে বলিতেন,—উঁঃ, সকাল থেকে-সময় কাটিয়েও এরকম জিনিস কেন করলে? আমরা পুরুষ মানুষ হলেও, এ-রকম জিনিস কখন্ করে ফেলতুম।" কোন মিষ্ট জিনিসের চেয়ে ছোলার ডালের ঝাল-নোস্তা জিনিস ওঁর খুব প্রিয় ছিল; উহার মধ্যে কোন জিনিস ভাল হইলে সেইদিন শেষের খাবার ভাত শেষ হইয়া গেলেও আবার সেই জিনিস একটু চাহিয়া খাইতেন। কিন্তু এটা আজকাল কম হইয়া গিয়াছে। সকল বিষয়ই উনি মনে মনে নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন এইরূপ আমার উপলব্ধি হইতে লাগিল, এই সম্বন্ধে কখন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, শুনেও যেন শুনিতেন না, পারতপক্ষে উত্তর দিতেন না। ভোজন, মুখশুদ্ধি, চা-পান, জলযোগ প্রভৃতি এই সমস্ত কি পরিমাণে করিবেন—এই সম্বন্ধে মনে মনে যেন একটা স্থির করিয়াছিলেন। এইজন্য, যে সব ফল ভালবাসিতেন, তাহাও বেশী খাইতেন না। (ক্রমশঃ)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

দশম প্রকরণ।

কর্ম্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কর্ম্ম ভালোই হউক মন্দই হউক, তাহার ফলভোগের জন্য কোন-না-কোন জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যের সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে; কর্ম্ম অনাদি, তাহার অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ব্যাপারে পরমেশ্বরও হস্তক্ষেপ করেন না; সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব; এবং মীমাংসকের কথা অনুসারে কোন কর্ম্ম করিলে এবং কোন কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না—এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর, কর্ম্মাত্মক নামরূপের নশ্বর চক্র হইতে মুক্ত হইয়া তাহার মূলে যে অমৃত ও অবিনাশী তত্ত্ব আছে তাহাতে মিলিত হইবার জন্য মনুষ্যের যে স্বাভাবিক ইচ্ছা হয়, তাহা তৃপ্ত হইবার কোন্ পথ এই প্রথম প্রশ্নটা পুনর্ব্বার উত্থিত হয়। বেদের মধ্যে কিংবা স্মৃতিগ্রন্থসমূহে, যাগযজ্ঞাদি পারলৌকিক কল্যাণের বহুবিধ সাধন বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু মোক্ষশাস্ত্রদৃষ্টিতে সে সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর সাধন। কারণ যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হইলেও পুণ্যকর্ম্মের ফল শেষ হইলে, দীর্ঘকালে হউক না কেন—কখন-না-কখন পুনর্ব্বার ফিরিয়া নীচের কর্ম্মভূমিতে আসিতেই হয় (মভা, বন. ২৫৯, ২৬০; গী. ৮. ২৫ ও ৯. ২০)। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মের কাঁইচী হইতে একেবারেই মুক্ত হইয়া অমৃততত্ত্বে মিশিয়া যাইবার এবং জন্মমরণের ঝঞ্ঝাট চিরকালের জন্য পরিহার করিবার পক্ষে ইহা প্রকৃত মার্গ নহে; ইহা দূর করিবার অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির অধ্যাত্মশাস্ত্রানুসারে জ্ঞানই একমাত্র পন্থা। 'জ্ঞান' অর্থে ব্যবহার-জ্ঞান বা নামরূপাত্মক সৃষ্টিশাস্ত্রের জ্ঞান নহে। এস্থলে

ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই উহার অর্থ। ইহাকেই ‘বিদ্যা’ও বলে; এবং “কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে”—মনুষ্য কর্ম্মের দ্বারাই বদ্ধ হয় এবং বিদ্যার দ্বারা মুক্ত হয়—এই প্রকরণের আরম্ভে এই যে বচন প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে “বিদ্যা” শব্দের অর্থ ‘জ্ঞান’ই বিবক্ষিত হইয়াছে। ভগবদ্‌গীতাতে—

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।

“জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম হয়” (গী. ৪. ৩৭), এইরূপ ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন; মহাভারতেও—

বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।

জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ।

“দগ্ধ বীজ যেরূপ গজায় না সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা (কর্ম্মের) ক্লেশ দগ্ধ হইলে তাহা আত্মাকে পুনঃ প্রাপ্ত হয় না” এইরূপ দুই স্থানে উক্ত হইয়াছে (মভা. বন. ১৯৯. ১০৬, ১০৭; শা. ২১১. ১৭)। উপনিষদেও এইরূপ “য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি” (বৃ. ১. ৪. ১০),—আমিই ব্রহ্ম এইরূপ যে জানে সেই অমৃত ব্রহ্ম হয়; যেরূপ পদ্মপত্রে জল লাগিয়া থাকে না সেইরূপ যাহার এই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাহাকে কর্ম্ম দূষিত করিতে পারে না (ছাং. ৪. ১৪. ৩); ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে লাভ করে (তৈ. ২. ১)—সমস্তই আত্মময় ইহা যে জানিয়াছে তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না (বৃ. ৪. ৪. ২৩); “জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ” (শ্বে. ৫. ১৩; ৬. ১৩) পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে পর সমস্ত পাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; “ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে” (মুং. ২. ২. ৮)—পরব্রহ্মের জ্ঞান হইলে পর তাহার সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয়; ‘বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে’ (ঈশা. ১১. মৈত্র্যু. ৭. ৯) বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ হয়; ‘তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়’ (শ্বে. ৩. ৮) পরমেশ্বরকে জানিলে অমর হয়, ইহা ব্যতীত মোক্ষলাভের অন্য পন্থা নাই;—এইরূপ জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিবার অনেক বচন আছে। এবং শাস্ত্রদৃষ্টিতে বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। কারণ, দৃশ্য জগতে যাহা কিছু আছে তৎ সমস্ত কর্ম্মময় হইলেও এই জগতের আধারভূত যে পরব্রহ্ম তাঁহারই এই সমস্ত লীলা হওয়া প্রযুক্ত কোন কর্ম্মই পরব্রহ্মকে যে বন্ধন করিতে পারে না তাহা সুস্পষ্ট; অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও পরব্রহ্ম অলিপ্তই থাকেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রানুসারে এই জগতের সমস্ত পদার্থ কর্ম্ম (মায়া) এবং ব্রহ্ম এই দুই বর্গে বিভক্ত, ইহা এই প্রকরণের আরম্ভেই বলা হইয়াছে। তাই, এই দুই বর্গের মধ্যে কোন এক বর্গ হইতে অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ করিতে হইবে—এই এক মার্গই তাহার নিকট উন্মুক্ত। কারণ, মূলে সমস্ত বিষয়ের কেবল দুই বর্গ হওয়ায় কর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া ব্যতীত ব্রহ্মস্বরূপের অন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপের এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মস্বরূপ কি, আগে তাহা ঠিক জানা আবশ্যক; নচেৎ এক করিতে গিয়া আর-এক হইয়া সমস্তই ব্যর্থ হইবে! “বিনায়কং প্রকুর্ব্বাণো রচয়ামাস বানরম্”—অর্থাৎ “গণেশ করিতে বানর” হইবে! এইজন্য, অধ্যাত্মশাস্ত্রের যুক্তিবাদেও প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মস্বরূপের অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্যের ও ব্রহ্মের অলিপ্ততার জ্ঞান পাইয়া তাহাই বিশেষরূপে মরণ পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখাই কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইবার প্রকৃত সাধন। “কর্ম্মে আমার আসক্তি নাই; তাই কর্ম্ম আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না—এবং ইহা যে জানিয়াছে সে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হয়” এইরূপ ভগবান্ গীতায় যাহা বলিয়াছেন (গী. ৪. ১৪; ১৩. ২৩) তাহার তাৎপর্য্যও এই। এই স্থানে ‘জ্ঞান’ অর্থে শুধু শাব্দিক জ্ঞান কিংবা শুধু মানসিক ক্রিয়া নহে; বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের আরম্ভেই কথিত-অনুসারে ‘জ্ঞান’ অর্থে “মানসিক জ্ঞান প্রথমে হইলে এবং ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিলে পর ব্রহ্মীভূত হইবার অবস্থা কিংবা ব্রাহ্মী স্থিতি”—এই অর্থই সকল সময়ে ও সকল স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহা বিস্মৃত হইবে না। পূর্ব্বপ্রকরণের শেষে জ্ঞানসম্বন্ধে অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তই দেওয়া হইয়াছে; মহাভারতেও “জ্ঞানেন কুরুতে যত্নং যত্নেন প্রাপ্যতে মহৎ”—জ্ঞান অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ারূপ জ্ঞান হইলে পর মনুষ্য যত্ন করে এবং এই যত্নের দ্বারাই মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়—এইরূপ জনক সুলভাকে বলিয়াছেন (শাং. ৩২০. ৩০)। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য কোন্ পথ দিয়া কোথায় যাইতে হইবে—ইহা অপেক্ষা অধ্যাত্মশাস্ত্র কখনই বেশী বলিতে পারে না। শাস্ত্রের দ্বারা এই বিষয় ব্যক্ত হইলে পর, শাস্ত্রোক্ত মার্গে কোন কণ্টক বা বাধা থাকিলে তাহা অপসারিত করিয়া পথ পরিষ্কার করা এবং সেই পথে ধ্যেয় বস্তুকে লাভ করা—এই কার্য্য প্রত্যেককে নিজের চেষ্টায় করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রযত্নও পাতঞ্জল যোগ, অধ্যাত্মবিচার, ভক্তি, কর্ম্মফলত্যাগ ইত্যাদি অনেক প্রকারে হইতে পারে (গী. ১২. ৮-১২), এবং সেই জন্য, অনেক সময় মনুষ্য গোলযোগে পড়িয়া যায়। তাই গীতায় প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মুখ্য মার্গ বলিবার পর, তৎসিদ্ধির জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণাধ্যান-সমাধিরূপ অঙ্গভূত সাধনাদিরও বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং পরে সপ্তম অধ্যায় হইতে, কর্ম্মযোগ আচরণ করিয়াই অধ্যাত্মবিচারের দ্বারা কিংবা তাহা

অপেক্ষা সহজ উপায় ভক্তিমার্গে এই পরমেশ্বরের জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী. ১৮. ৫৬)।

কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় কর্ম্মত্যাগ নহে; ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ রাখিয়া পরমেশ্বরের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকিলেই শেষে মোক্ষলাভ হয়; কর্ম্মত্যাগ করা ভ্রম; কারণ কর্ম্ম হইতে কেহই অব্যাহতি পায় না;—ইত্যাদি বিষয় নির্ব্বিবাদ নির্দ্ধারিত হইলেও এই মার্গে সিদ্ধ হইবার জন্য আবশ্যক জ্ঞানলাভের জন্য যে চেষ্টা আবশ্যক সেই চেষ্টা কি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত? কিংবা নামরূপ কর্ম্মাত্মক প্রকৃতি যে দিকে টানিবে সেই দিকেই যাইতে হইবে? এই প্রথমকার প্রশ্নটি আবারও উপস্থিত হয়। "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" (গী. ৩. ৩৩)—নিগ্রহ কি করিবে? প্রাণিমাত্রই আপন আপন প্রকৃতির গতিপথেই চলিয়া থাকে; "মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি"—তোমার প্রতিজ্ঞা নিরর্থক; তোমার যেদিকে যাওয়া উচিত নহে সেইদিকে প্রকৃতি তোমাকে টানিবে;—এইরূপ ভগবান গীতাতে (গী· ১৮. ৫৯ ও ২.৬০) বলিয়াছেন; আবার মনুও—"বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" (মনু. ২· ২১৫)—বিদ্বান্‌কেও ইন্দ্রিয়গণ আকর্ষণ করে—এইরূপ বলিয়াছেন। কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ার সিদ্ধান্তও তাহাই। কারণ, মনুষ্যের মনের সমস্ত প্রেরণা পূর্ব্বকর্ম্মবশতই উৎপন্ন হয় এইরূপ মানিলে, এক কর্ম্ম হইতে অন্য কর্ম্মে, এইরূপে সর্ব্বদাই তাহাকে ভবচক্রের মধ্যে থাকিতে হয়, এইরূপ অনুমান না করিলে চলে না। অধিক কি, কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার প্রেরণা ও কর্ম্ম ইহারা পরস্পরবিরুদ্ধ এইরূপ বলিলেও চলে। এবং ইহা যদি সত্য হয় তবে জ্ঞানলাভার্থ কেহই স্বতন্ত্র নহে এইরূপ আপত্তি আসে। অধ্যাত্মশাস্ত্র এই প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে, নামরূপাত্মক সমস্ত দৃশ্য জগতের আধারভূত যে তত্ত্ব তাহাই মনুষ্যের দেহের মধ্যেও আত্মরূপে ক্রীড়া করে বলিয়া মনুষ্যের কার্য্যের যে বিচার করিতে হইবে তাহা দেহ ও আত্মা এই দুই দিক হইতেই করা আবশ্যক। তন্মধ্যে,আত্মস্বরূপী ব্রহ্ম মূলে একমাত্র অদ্বিতীয় হওয়া প্রযুক্ত কখনই পরতন্ত্র হইতে পারেন না। কারণ, এক অপরের অধীনে আসিতে হইলে এক ও অন্য এই ভেদ নিয়ত স্থায়ী হওয়া চাই। প্রকৃতপক্ষে নামরূপাত্মক কর্ম্মই সেই অন্য পদার্থ। কিন্তু এই কর্ম্ম অনিত্য ও মূলে পরব্রহ্মেরই লীলা হওয়ায়, পরব্রহ্মের এক অংশের উপর তাহার আবরণ থাকিলেও তাহা পরব্রহ্মকে কখনই দাস করিতে পারে না, ইহা নির্ব্বিবাদ। তাছাড়া, যে আত্মা কর্ম্মজগতের ব্যাপারাদির একীকরণ করিয়া জগৎ-জ্ঞান উৎপন্ন করে তাহার কর্ম্মজগৎ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মজগতেরই হওয়া চাই ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাই পরব্রহ্ম ও তাহার অংশ শারীর আত্মা এই দুই-ই মূলে স্বতন্ত্র অর্থাৎ কর্ম্মাত্মক প্রকৃতি-সত্তার বাহিরের বস্তু, এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে পরমাত্মা অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী নিত্য, শুদ্ধও মুক্ত, ইহার বাহিরে পরমাত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান মনুষ্যের বুদ্ধিতে উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু এই পরমাত্মারই অংশ জীবাত্মা মূলে শুদ্ধ মুক্তস্বভাব, নির্গুণ ও অকর্ত্তা হইলেও দেহ ও বুদ্ধি-আদি ইন্দ্রিয়গণের গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া পড়ায় তাহা মনুষ্যের মনে যে স্ফুরণ উৎপন্ন করে তাহার প্রত্যক্ষ অনুভবরূপী জ্ঞান আমাদের হইতে পারে। মুক্ত বাষ্পের মধ্যে কোন বল না থাকিলেও তাহা কোন ভাণ্ডের ভিতর আবদ্ধ হইলে পরে তাহার উপর যেরূপ সেই চাপ পড়ে, সেই নিয়মেই অনাদি-পূর্ব্ব-কর্ম্মার্জ্জিত জড় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পরমাত্মারই অংশভূত জীব (গী. ১৫. ৭) আবদ্ধ হইয়া পড়িলে এই গণ্ডী হইতে তাহাকে মুক্তি দিবার মতো অর্থাৎ মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি দেহেন্দ্রিয়দিগের হয়; এবং ইহাকেই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 'আত্মার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি' বলে। 'ব্যবহার দৃষ্টিতে' বলিবার কারণ এই যে, শুদ্ধ মুক্তাবস্থায় কিংবা 'তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে' আত্মা ইচ্ছারহিত ও অকর্ত্তা, সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই (গী· ১৩· ২৯; বেসূ· শাংভা, ২· ৩. ৪০)। কিন্তু এই প্রকৃতি আপনা হইতে মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করে, সাংখ্যের ন্যায় বেদান্ত এইরূপ বলে না। কারণ তাহা মানিলে, জড়প্রকৃতি অন্ধভাবে অজ্ঞানীদিগকেও মুক্ত করিতে পারে এইরূপ বলিতে হয়। এবং মূলে যে আত্মা অকর্ত্তা সে স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ নিমিত্ত ব্যতীত আপনার স্বাভাবিকগুণেই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক হয়, ইহাও বলিতে পারা যায় না। তাই, আত্মা মূলে অকর্ত্তা হইলেও বন্ধনের নিমিত্ত সে এইটুকুর জন্য চক্ষুগোচর ও কর্ম্ম প্রবর্ত্তক হইয়া পড়ে, এবং যে নিমিত্তেই হউক একবার এইরূপ আগন্তুক প্রবর্ত্তকতা তাহাতে আসিলে,তাহা কর্ম্মের নিয়ম হইতে ভিন্ন অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, বেদান্তশাস্ত্রে আত্মস্বাতন্ত্র্যের উক্ত সিদ্ধান্ত এইপ্রকারে বিবৃত হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র অর্থে নির্নিমিত্তক নহে এবং আত্মা আপনার মূল শুদ্ধাবস্থায় কর্ত্তাও হয় না। কিন্তু বারম্বার এই লম্বা চৌড়া কর্ম্মকথা বলিতে না বসিয়া, ইহাকেই সংক্ষেপে আত্মার স্বতন্ত্রপ্রবৃত্তি কিংবা প্রেরণা এইরূপ বলিবার রীতি হইয়াছে। আত্মা বন্ধনের উপাধিতে বদ্ধ হওয়ায়, তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়গৃহীত স্বতন্ত্র প্রেরণা এবং বাহ্যজগতের পদার্থসমূহের সংযোগে ইন্দ্রিয়ে উৎপন্ন প্রেরণা এই দুই একেবারে ভিন্ন। 'খাও, পিয়ো মজা লুটো'—ইহা ইন্দ্রিয়ের প্রেরণা; এবং আত্মার প্রেরণা মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করিবার

জন্য হয়। প্রথম প্রেরণাটি শুধু বাহ্য অর্থাৎ কর্ম্মজগতের; দ্বিতীয় প্রেরণা আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মজগতের; এবং এই দুই প্রেরণা প্রায় পরস্পরবিরোধী হওয়ায় তাহাদের ঝগড়াতেই মনুষ্যের সমস্ত জীবন কাটিয়া যায়। ইহাদের ঝগড়ার সময় যখন মনে সন্দেহ হয় তখন কর্ম্মজগতের প্রেরণাকে স্বীকার না করিয়া (ভাগ. ১১. ১০. ৪), যদি মনুষ্য শুদ্ধ আত্মার স্বতন্ত্র প্রেরণা অনুসারে কাজ করে—এবং ইহাকেই প্রকৃত অধ্যাত্মজ্ঞান কিংবা আত্মনিষ্ঠা বলে—তবে তাহার সমস্ত আচরণ স্বভাবতই মোক্ষানুকূলই হইবে; শেষে—

> বিশুদ্ধধর্ম্মা শুদ্ধেন বুদ্ধেন চ স বুদ্ধিমান্।
> বিমলাত্মা চ ভবতি সমেত্য বিমলাত্মনা।
> স্বতন্ত্রশ্চ স্বতন্ত্রেণ স্বতন্ত্রত্বমবাপ্নুতে॥

"মূলে স্বতন্ত্র শারীর আত্মা, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ নির্ম্মল ও স্বতন্ত্র পরমাত্মাতে মিলিত হয় (মভা. শাং. ৩০৮. ২৭-৩০)। জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এইরূপ যাহা উপরে বলা হইয়াছে তাহার অর্থই এই। কিন্তু উল্টাপক্ষে, জড় ইন্দ্রিয়গণের প্রাকৃত ধর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্মজগতের প্রেরণার প্রাবল্য হইলে মনুষ্য অধোগতি প্রাপ্ত হয়। বদ্ধ শারীর আত্মার ইন্দ্রিয়দিগকে মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করাইতে এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভের এই যে স্বতন্ত্র শক্তি তাহা মনে করিয়াই ভগবান—

> উদ্ধরেদাত্মনাঽঽত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
> আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

"মনুষ্য আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে; আপনি আপনাকে অবসন্ন করিবেক না; কারণ (প্রত্যেকেই) আপনি আপনার বন্ধু (হিতকারী) এবং আপনিই আপনার শত্রু (অনিষ্টকারী)" (গী. ৬. ৫), এইরূপ আত্মস্বাতন্ত্র্যের অর্থাৎ স্বাবলম্বনের তত্ত্ব অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। এবং এই হেতুই যোগবাসিষ্ঠে দৈবের নিরাকরণ করিয়া পৌরুষের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে (যো. ২. সর্গ ৪-৮)। সর্ব্বভূতে একই আত্মা, এই তত্ত্বটি বুঝিয়া এই অনুসারে যে মনুষ্য আচরণ করে তাহারই আচরণকে সদাচরণ কিংবা মোক্ষানুকূল আচরণ বলে; এবং এই প্রকার আচরণের দিকে দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি উৎপাদন করাই বদ্ধ জীবাত্মারও স্বতন্ত্র ধর্ম্ম হওয়ায় দুরাচারী মনুষ্যের অন্তঃকরণ সদাচারের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং সেই হেতু নিজ কর্ম্মের জন্য দুরাচারী ব্যক্তিরও পশ্চাত্তাপ হইয়া থাকে। আধিদৈবতবাদী পণ্ডিত ইহাকে সদসদ্বিবেক-বুদ্ধিরূপ দেবতার স্বতন্ত্র স্ফুরণ বলেন। কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় জড়প্রকৃতিরই বিকার হওয়ায় উহা আপনারই প্রেরণা হইতে কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, এই প্রেরণা উহা কর্ম্ম-জগতের বাহিরের আত্মা হইতে পায়। এই প্রকার এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের 'ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য' শব্দও বেদান্ত-দৃষ্টিতে ঠিক্ নহে। কারণ ইচ্ছা মনের ধর্ম্ম। পূর্ব্বে অষ্টম প্রকরণে বর্ণিত অনুসারে বুদ্ধি ও বুদ্ধির সঙ্গে মনও কর্ম্মাত্মক জড়প্রকৃতির অসম্বেদ্য বিকার হওয়া-প্রযুক্ত এই দুই আপনা হইতে কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তাই প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য মনেরও নহে কিংবা বুদ্ধিরও নহে, তাহা আত্মারই—এইরূপ বেদান্তশাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আত্মার এই স্বাতন্ত্র্য কেহ দিতে পারে না, কেহ কাড়িয়াও লইতে পারে না। স্বতন্ত্র পরমাত্মার অংশরূপ জীবাত্মা বন্ধনের উপাধিতে আটকিয়া পড়িলেও সে আপনা হইতেই স্বতন্ত্রভাবে উপরি-উক্ত-অনুসারে বুদ্ধি ও মনে প্রেরণা করিয়া থাকে। অন্তঃকরণের এই প্রেরণার প্রতি উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ কাজ করে তাহা হইলে—

> যে যেঁ কোণাচেঁ কায় বা গেলে।
> জ্যাচে ত্যানেঁ অনহিত কেলেঁ॥

'সে আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতে প্রস্তুত' এইরূপ তুকারামবাবার মতো বলিতে হয় (গা. ৪৪৪৮)। ভগবদ্গীতায় 'ন হিনস্ত্যাত্মনাঽঽত্মানং'—যে আপনাকে আপনি হনন করে না তাহার উত্তম গতি লাভ হয়, এই তত্ত্বের উল্লেখ পরে করা হইয়াছে (গী. ১৩. ২৮); "দাসবোধে"ও ইহার স্পষ্ট অনুবাদ করা হইয়াছে (দাস. ১৭. ৭. ৭ ১০ দেখ)। যদিও দেখা যায় যে, মনুষ্য কর্ম্মজগতের অভেদ্য বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ, তথাপি মনুষ্য স্বভাবতই মনে করে যে, আমি যে কোন কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে করিতে পারি। অনুভবের এই তত্ত্বের উপপত্তি উপরি-উক্ত-অনুসারে জড় জগৎ হইতে ব্রহ্মজগৎ ভিন্ন বলিয়া না মানিলে অন্য কোনরূপেই সঙ্গত হয় না। তাই, যে অধ্যাত্মশাস্ত্র মানে না তাহাকে এই বিষয়ে মনুষ্যের নিত্য দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে অথবা প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন বুদ্ধির অগম্য বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে; অন্য পন্থা নাই। প্রবৃত্তি-স্বাতন্ত্র্যের কিংবা ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যের এই উপপত্তি,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলে একরূপ অদ্বৈতবাদের এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া দিয়াছি (বেসূ. শাং ভা, ২. ৩. ৪০)। কিন্তু এই অদ্বৈত মত যিনি মানেন না, কিংবা ভক্তির জন্য যিনি দ্বৈত স্বীকার করেন, তিনি বলেন যে, জীবাত্মার এই সামর্থ্য তাহার নিজের নহে, উহা পরমেশ্বর হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথাপি কখনও "ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ" (ঋ ৪. ৩৩. ১১)—শ্রান্ত হওয়া পর্য্যন্ত প্রযত্নকারী মনুষ্য ছাড়া অন্যকে দেবতারা সাহায্য করেন না—ঋগ্বেদের এই তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, এই সামর্থ্য লাভের জন্য জীবাত্মার প্রথমে আপনা হইতেই প্রযত্ন করা আব-

শ্যক অর্থাৎ আত্মপ্রযত্নের এবং পর্য্যায়ক্রমে আত্মস্বাতন্ত্র্যের তত্ত্ব পুনরূপি দৃঢ়রূপে স্থাপিতই থাকে (বেসূ. ২. ৩. ৪১, ৪২; গী. ১০. ৫ ও ১০)। আর কত বলিব? বৌদ্ধেরা আত্মার কিংবা পরব্রহ্মের অস্তিত্ব মানে না; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান তাহারা না মানিলেও তাহাদের ধর্মগ্রন্থেই "অত্তনা (আত্মনা) চোদয়ত্তানং"—আপনাকে আপনিই মার্গে প্রবৃত্ত করিতে হইবে—এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহার সমর্থনার্থ বলা হইয়াছে—

অত্তা (আত্মা) হি অত্তনো নাথো অত্তা হি অত্তনো গতি।
তস্মা সঞ্ঞময়ত্তানং অস্সং (অশ্বং) ভদ্রং ব বাণিজো॥

আপনিই আপনার কর্ত্তা, আপনার আত্মা ছাড়া অন্য ত্রাণকর্ত্তা নাই; অতএব কোন বণিক যেরূপ আপনার উত্তম অশ্বকে সংযত করে সেইরূপ আপনিই আপনাকে সংযমন করিবে"; (ধর্ম্মপদ ৩৮০) গীতার ন্যায় আত্মস্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব ও আবশ্যকতাও বর্ণিত হইয়াছে (মহাপরিনির্ব্বাণসুত্ত ২. ৩৩-৩৫ দেখ)। আধিভৌতিক ফরাসী পণ্ডিত কোঁৎ-এর নির্দ্ধারণও এই বর্গের মধ্যে ধরিতে হইবে। কারণ কোন অধ্যাত্মবাদকেই তিনি না মানিলেও, কোন উপপত্তি বিনা প্রযত্নের দ্বারা মনুষ্য নিজের আচরণ ও কেবল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া, পরিস্থিতি সংশোধন করিতে পারে এই বিষয় তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বভূতে এক আত্মা উপলব্ধি করিবার যে আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থা তাহা প্রাপ্ত হইবার ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই একমাত্র মহৌষধ, এবং এই জ্ঞান লাভ করা আমাদের আয়ত্তাধীন, ইহা সিদ্ধ হইলেও আর একটি কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, এই স্বতন্ত্র আত্মাও আপনার বক্ষস্থিত প্রকৃতির বোঝাকে একেবারে অর্থাৎ ক্ষণমাত্রে ফেলিয়া দিতে পারে না। কোন কারিগরের নিজের দক্ষতা থাকিলেও যন্ত্র না হইলে যেমন তাহার চলে না এবং যন্ত্র খারাপ হইলে তাহা মেরামৎ করিতে তাহার সময় লাগে, জীবাত্মারও সেইরূপ অবস্থা। জ্ঞান লাভের প্রেরণা করিবার সময় জীবাত্মা স্বতন্ত্র একথা সত্য, কিন্তু জীবাত্মা তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মূলে নির্গুণ ও কেবল, কিংবা পূর্ব্বে সপ্তম প্রকরণে উক্ত-অনুসারে চক্ষুষ্মান্ কিন্তু খঞ্জ হওয়া প্রযুক্ত (মৈত্র্য. ৩. ২, ৩; গী. ১৩. ২০), উক্ত প্রেরণা অনুসারে পরে কোন কর্ম্ম করিতে হইলে যে সামগ্রী কিংবা যে সাধন আবশ্যক হয় (যথা কুম্ভকারের চাকা ইত্যাদি) তাহা এই আত্মার নিজের নিকট থাকে না—যে সাধন উপলব্ধ হয় যথা দেহ ও বুদ্ধি-আদি ইন্দ্রিয় সেই সমস্ত মায়াত্মক প্রকৃতির বিকার। তাই, নিজের মুক্তির কার্য্যও জীবাত্মাকে প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত দেহেন্দ্রিয়াদি সাধন বা উপাধির দ্বারাই করিয়া লইতে হয়। এই সাধনগুলির মধ্যে বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় মুখ্য হওয়ায় কোন কার্য্য করিতে হইলে, আত্মা বুদ্ধিকেই সমুচিত প্রেরণা করে। কিন্তু পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে এবং প্রকৃতি-স্বভাব-বশতঃ এই বুদ্ধি যে সর্ব্বদা শুদ্ধ ও সাত্ত্বিকই থাকিবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। তাই, প্রথমে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইয়া এই বুদ্ধি অন্তর্মুখ, সাত্ত্বিক কিংবা আত্মনিষ্ঠ হইতে হইবে; অর্থাৎ এই বুদ্ধি এরূপ হইবে যে, জীবাত্মার প্রেরণার হুকুম শুনিয়া তাহার যাহাতে কল্যাণ হয় এইরূপ কর্ম্ম করিবে। ইহা হইতে গেলে বহুকাল বৈরাগ্য অভ্যাস করা আবশ্যক। এতটা করিয়াও ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি দেহ ধর্ম্ম এবং যে সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া ত যায়ই না। তাই, বন্ধন-উপাধি বদ্ধ জীবাত্মার দেহেন্দ্রিয়দিগকে মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করিবার প্রেরণা করিবার স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও পরে প্রকৃতির যোগেই সমস্ত কার্য্য করাই হয় বলিয়া সেই পরিমাণে ছুতার কুমোর প্রভৃতি কারিগরের ন্যায় সেই আত্মা পরাবলম্বী হইয়া যায় এবং তাহাকে দেহেন্দ্রিয়াদি যন্ত্র প্রথমে সাফ্ করিয়া তাহাদিগকে নিজের অধীনে আনিতে হইবে (বেসূ. ২. ৩. ৪০)। এই কার্য্য একেবারেই হইতে পারে না; ধৈর্য্য সহকারে ধীরে ধীরে করিতে হইবে; নচেৎ অশায়েস্তা ঘোড়ার মত ইন্দ্রিয় সকল থানার ভিতর নিশ্চয়ই পতিত হইবে। এইজন্য ভগবান বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহার্থ বুদ্ধিকে ধৃতির অর্থাৎ ধৈর্য্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে (গী. ৬. ২৫); এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বুদ্ধির ন্যায় ধৃতির সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন নৈসর্গিক ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে (গী. ১৮. ৩৩-৩৫)। তন্মধ্যে তামসিক ও রাজসিক পৈঠাকে ছাড়িয়া দিয়া বুদ্ধিকে সাত্ত্বিক করিবার জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে হয়; তাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই প্রকার ইন্দ্রিয়নিগ্রহাভ্যাসরূপ যোগের উপযুক্ত স্থান আসন ও আহার কি, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, 'শনৈঃ শনৈঃ' (গী. ৬. ২৫) অভ্যাস করিলে পর, চিত্ত স্থির হইয়া ইন্দ্রিয়গণ আয়ত্তাধীন হয় এবং পরে কালক্রমে (একেবারে নহে) ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া, "আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়"—সেই জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মের বন্ধন মোচন হয় (গী. ৪. ৩৮-৪১)। কিন্তু ভগবান একান্তে যোগাভ্যাস করিতে বলিতেছেন বলিয়া (গী. ৬. ১০) জগতের সমস্ত ব্যবহার ছাড়িয়া যোগাভ্যাসেই সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করাই গীতার তাৎপর্য্য এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে না। কোন ব্যবসায়ী যেরূপ নিজের অল্পস্বল্প যাহা কিছু থাকে তাহা

লইয়াই প্রথমে ব্যবসা আস্তে আস্তে সুরু করিয়া দিয়া শেষে অপার সম্পত্তি লাভ করে, সেইরূপই গীতার কর্ম্মযোগেরও কথা। আপনার যতটা সাধ্য ততটা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া প্রথমে কর্ম্মযোগ সুরু করিতে হইবে, এবং তাহার দ্বারাই শেষে অধিকাধিক ইন্দ্রিয়নিগ্রহসামর্থ্য লাভ করা যায়। তথাপি একেবারে হাত গুটাইয়া বসিয়াও যোগাভ্যাস করিলে চলে না। কারণ, তাহার ফলে বুদ্ধির একাগ্রতার অভ্যাস কমিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। তাই, যাহাতে কর্ম্মযোগ বরাবর সমান চালাইতে পারা যায় এইজন্য অল্প সময় নিত্য-নিয়মিত কিংবা মাঝে মাঝে কিছুকাল একান্তে থাকাও আবশ্যক হয় (গী. ১৩. ১০)। তাহার জন্য জাগতিক ব্যবহার ছাড়িবে এরূপ ভগবান্ কোথাও বলেন নাই। উল্টা, জাগতিক ব্যবহার নিষ্কামবুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, তাহার জন্যই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন। এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের সঙ্গেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগও যথাশক্তি প্রত্যেকের করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে না, এইরূপ গীতার উপদেশ। মৈত্র্যুপনিষদে এবং মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, মনুষ্য বুদ্ধিমান ও নিগ্রহী হইলে এইপ্রকার যোগাভ্যাসে ছয় মাসের মধ্যে সাম্যবুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে; (মৈত্র্য- ৬. ২৮; মভা. শাং. ২৩৯. ৩২; অশ্ব. অনুগীতা. ১৮. ৬৬)। কিন্তু ভগবান্ কর্ত্তৃক বর্ণিত বুদ্ধির এই সাত্ত্বিক, সম কিংবা আত্মনিষ্ঠ অবস্থা ছয়মাসে কেন, ছয় বৎসরেও প্রাপ্ত হয় না; এবং এই অভ্যাস অপূর্ণ থাকিবার কারণে এই জন্মে পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না শুধু নহে, পরজন্মে গোড়া হইতে আবার সুরু করিতে হইবে বলিয়া, পরজন্মের যোগাভ্যাসও পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মতোই অপূর্ণ থাকিবে; তাই এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, এইপ্রকার পুরুষ পূর্ণসিদ্ধি কখনই লাভ করিতে পারিবে না; ফলতঃ এইরূপ মনে করাও সম্ভব যে, কর্ম্মযোগের আচরণ করিবার পূর্ব্বে পাতঞ্জল-যোগের দ্বারা সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প সমাধির শিক্ষা করা প্রথমে আবশ্যক। অর্জ্জুনের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, এই প্রসঙ্গে মনুষ্যের কি করা উচিত এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে (গী. ৬. ৩৭-৩৯) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ভগবান এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন যে, আত্মা অমর হওয়ায় তাহার উপর লিঙ্গশরীর দ্বারা এই জন্মে যে অল্প-বিস্তর সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাই পরে দৃঢ়স্থায়ী হয় এবং এই 'যোগভ্রষ্ট' ব্যক্তি অর্থাৎ কর্ম্মযোগ সম্পূর্ণ সাধন না করিয়া তাহা হইতে যে ভ্রষ্ট হইয়াছে সেই ব্যক্তি পরজন্মে আপন প্রযত্নে সেখান হইতেই পরে আরম্ভ করে এবং এইরূপ হইতে হইতে ক্রমে "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্"—(গী. ৬. ৪৫)—অনেক জন্মের পর, শেষে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়া সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" (গী. ২. ৪০) এই ধর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্মযোগমার্গের স্বল্প আচরণেই মহা সঙ্কট হইতে উদ্ধার হয়—এইরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা এই সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ বাক্য। সারকথা, মনুষ্যের আত্মা মূলে স্বতন্ত্র হইলেও পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আপন প্রাপ্ত দেহের অশুদ্ধ প্রকৃতি-স্বভাববশতঃ একজন্মেই মনুষ্যের পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। কিন্তু তাহাতেও "নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ" (মনু. ৪-১৩৭)—কেহ যেন নিরাশ না হয়; একজন্মেই পরমসিদ্ধি লাভ করিবার দুরাগ্রহে পতিত হইয়া, পাতঞ্জল যোগাভ্যাসে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নিছক্ কসরৎ-কার্য্যেই সমস্ত জীবন যেন অনর্থক কাটিয়া না যায়। আত্মার কোন ত্বরা নাই, আজ যাহা সাধ্য ততটা যোগবলই আয়ত্ত করিয়া কর্ম্মযোগের আচরণ সুরু করিয়া দিবে অর্থাৎ তাহা দ্বারাই ধীরে ধীরে বুদ্ধি অধিকাধিক সাত্ত্বিক ও শুদ্ধ হইয়া কর্ম্মযোগের এই স্বল্পাচরণ কেন, জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত,—চর্কায় অর্পিতের ন্যায়, মনুষ্যকে বলপূর্ব্বক সামনে ক্রমশঃ ঠেলিতে ঠেলিতে শেষে,—আজ নয় তো কাল, এ জন্মে নয় তো পরজন্মে, তাহার আত্মাকে পূর্ণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইয়া দেয়। সেইজন্য কর্ম্মযোগমার্গের অত্যন্ত স্বল্পাচরণ কিংবা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্তও কখনই ব্যর্থ হয় না, ইহাই কর্ম্মযোগশাস্ত্রের বিশেষ গুণ—এইরূপ গীতাতেই ভগবান্ স্পষ্ট বলিয়াছেন (গী. ৬. ১৫ সম্বন্ধে আমার টীকা দেখ)। কেবল এই জন্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়া এবং ধৈর্য্যত্যাগ না করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার উদ্যোগ স্বাতন্ত্র্যসহকারে ও ধীরে ধীরে যথাশক্তি আমাদের করা কর্ত্তব্য। প্রাক্তনসংস্কারবশতঃ প্রকৃতির বন্ধন এই জন্মে আজ মোচন হইবার নহে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহাই ক্রমে ক্রমে বিবৃদ্ধমান কর্ম্মযোগের অভ্যাসে কাল কিংবা পরজন্মে আপনা-আপনিই শিথিল হইয়া যায় এবং এইরূপ হইতে হইতে "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" (গী. ৭. ১৯)—কখন না কখন পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা প্রকৃতির বন্ধন কিংবা পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া আত্মা অবশেষে আপন মূল পূর্ণ নির্গুণ মুক্তাবস্থা অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য কি না করিতে পারে? "নর করণী করে তো নরসে নারায়ণ হোয়"—নর যদি উচিত কাজ করে সে নর নারায়ণ হয়—এই যে চলিত কথা আছে তাহা এই বেদান্তসিদ্ধান্তেরই অনুরূপ বাক্য; যোগবাসিষ্ঠকার এই কারণেই মুমুক্ষু প্রকরণে উদ্যোগের প্রশংসা করিয়া, উদ্যোগের দ্বারাই সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ বিধান করিয়াছেন (যো. ২. ৪. ১০-১৮)।

যাক্। জ্ঞানলাভার্থে প্রযত্ন করিবার জন্য জীবাত্মা মূলে স্বতন্ত্র এবং স্বাবলম্বনপূর্ব্বক দীর্ঘ উদ্যোগের দ্বারা শেষে কখন-না-কখন প্রাক্তন কর্ম্মের বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত হয়, ইহা সিদ্ধ হইলেও কর্ম্মক্ষয় কি, ও কখন্ কর্ম্মক্ষয় হয় এবিষয়ে আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। কর্ম্মক্ষয় অর্থে সমস্ত কর্ম্মের বন্ধন হইতে পূর্ণরূপে অর্থাৎ নিঃশেষে মুক্ত হওয়া। কিন্তু পুরুষ জ্ঞানী হইলেও তাহার যতদিন দেহ থাকে ততদিন পর্য্যন্ত সে তৃষ্ণা, ক্ষুধা, শোয়া, বসা ইত্যাদি কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় না এবং প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়ও ভোগ ব্যতীত হয় না, তাই সে আগ্রহপূর্ব্বক দেহত্যাগাদি করিতে পারে না ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে কৃতকর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা নাশ নিঃসন্দেহ হয়; কিন্তু যখন জ্ঞানী পুরুষের যাবজ্জীবন জ্ঞানোত্তরকালেও ন্যূনাধিক কর্ম্ম করিতেই হয় তখন এইরূপ কর্ম্ম হইতে তাহার মুক্তি কি করিয়া হইবে? এবং মুক্ত না হইলে, পূর্ব্বকর্ম্মক্ষয় কিংবা পরে মোক্ষও হয় না, এই সংশয় উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে বেদান্তশাস্ত্র এইরূপ বলেন যে, নামরূপাত্মক কর্ম্ম জ্ঞানী ব্যক্তির নামরূপাত্মক দেহ হইতে মুক্ত না হইতে পারিলেও, আত্মার সেই কর্ম্ম আপনাতে গ্রহণ করা বা না করা বিষয়ে স্বাধীনতা থাকায়, ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিয়া, কর্ম্মে প্রাণীমাত্রের যে আসক্তি থাকে তাহাকে যদি ক্ষয় করা যায় তাহা হইলে কর্ম্ম করিলেও তাহার অঙ্কুর বিনষ্টপ্রায় হয়। কর্ম্ম স্বভাবতঃ অন্ধ, অচেতন, কিংবা মৃত। কর্ম্ম আপনা হইতে কাহাকে ধরে না এবং ছাড়েও না; উহা স্বত ভালোও নহে, মন্দও নহে। মনুষ্য আপনাকে এই কর্ম্মে আবদ্ধ রাখিয়া নিজ আসক্তির দ্বারা উহাকে ভালো কিংবা মন্দ, শুভ কিংবা অশুভ প্রস্তুত করিয়া লয়। তাই, এই মমত্বযুক্ত আসক্তি হইতে মুক্ত হইলে, কর্ম্মের বন্ধন স্বতই ভাঙ্গিয়া যায় এইরূপ বলা যায়;—তার পর সেই কর্ম্ম থাকুক বা চলিয়া যাক্। গীতারও স্থানে স্থানে এই উপদেশই দেওয়া হইয়াছে—প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য ইহাতেই, কর্ম্মত্যাগে নহে (গী. ৩·৪); কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফল লাভ করা বা না করা তোমার অধিকারের বিষয় নহে (গী. ২·৪৭); "কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ" (গী. ৩. ৭)—ফলের আশা না রাখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগকে কর্ম্ম করিতে দেও; "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গম্" (গী. ৪. ২০.)—কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া "সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে" (গী ৫. ৭)—সমস্ত ভূতে যাহার সমদৃষ্টি হইয়াছে সেই পুরুষ কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না; "সর্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু" (গী. ১২· ১১)—সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগ কর; "কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তে" (গী. ১৮· ৯)—কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে সে সাত্ত্বিক; "চেতসা সর্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য" (গী. ১৮· ৫৭)—সমস্ত কর্ম্ম আমাকে অর্পণ করিয়া কাজ কর। উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাদের ইহাই বীজ। জ্ঞানী মনুষ্য সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম করিবে কি করিবে না, এই প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তৎসম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কি, তাহার বিচার পরবর্ত্তী প্রকরণে করা যাইবে। এখন কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে, জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায় ইহার প্রকৃত অর্থ কি; এবং উপরি-প্রদত্ত বচনাদি হইতে, এই বিষয়ে গীতার কি অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত হয়। ব্যবহারেও এই নীতিসূত্রেই আমরা প্রয়োগ করি। উদাহরণ যথা—অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি যদি কাহাকে ধাক্কা মারে তাহা হইলে আমরা সেই ব্যক্তিকে গুণ্ডা বলি না; এবং ফৌজদারী আইনেও নিছক্ অপঘাতঘটিত হত্যাকে হত্যা বলিয়া ধরে না। আগুনে ঘর পুড়িয়া গেলে, কিংবা বৃষ্টির বন্যায় ক্ষেত ভাসিয়া গেলে, আগুনকে কিংবা বৃষ্টিকে কি কেহ অপরাধী মনে করে? শুধু কর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রত্যেক কর্ম্মে মনুষ্যের দৃষ্টিতে কিছু না কিছু ত্রুটি দোষ কিংবা মন্দ পাওয়া যাইবেই যাইবে,—"সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ" (গী. ১৭· ৪৮)। কিন্তু গীতা যে-দোষকে ছাড়িতে বলে তাহা ইহা নহে। মনুষ্যের কোন কর্ম্মকে আমরা যে শুভাশুভ বলি, তাহার ভালমন্দত্ব কর্ম্মে থাকে না, তাহা সেই কর্ম্মের কর্ত্তার বুদ্ধিতে থাকে। ইহা মনে রাখিয়া গীতায় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, কর্ম্মের মন্দত্ব ঘুচাইতে হইলে কর্ত্তার আপন বুদ্ধি ও মনকে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, (গী. ২· ৪৯·৫১); এবং উপনিষদেও—

মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গি মোক্ষে নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥

"মনুষ্যের (কর্ম্মের) বন্ধন কিংবা মোক্ষ প্রাপ্তির পক্ষে মনই (এব) কারণ; মন বিষয়াসক্ত হইলে, বন্ধন এবং নির্ব্বিষয় অর্থাৎ নিষ্কাম কিংবা নিঃসঙ্গ হইলে মোক্ষ"—এইরূপে কর্ম্মকর্ত্তা মনুষ্যের বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে (মৈত্র্যু. ৬· ৩৪; অমৃত বিন্দু· ২)। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধির এই সাম্যাবস্থা কিরূপে সম্পাদন করিবে ইহাই ভগবদ্গীতায় মুখ্যরূপে উক্ত হইয়াছে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম করিলেও সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। নিরগ্নি হইয়া অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কিংবা অক্রিয় থাকিলে অর্থাৎ কোন কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কর্ম্মের ক্ষয় হয় না (গী. ৬. ১)। মনুষ্যের ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, প্রকৃতির চক্র সর্ব্বদা চলিতে থাকায়

মনুষ্যকেও সেই সঙ্গে ঘুরিতে হয় (গী. ৩. ৩৩; ১৮. ৬০)। কিন্তু অজ্ঞান লোকেরা এইরূপ অবস্থায় প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া যেরূপ নাচিতে থাকে সেরূপ না করিয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির ও শুদ্ধ রাখিয়া যে ব্যক্তি সৃষ্টিক্রমানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া অনাসক্ত বুদ্ধিতে ও শান্তভাবে করে সে-ই প্রকৃত বৈরাগী, প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ ও ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত পুরুষ (গী. ৩. ৭; ৪. ২১; ৫. ৭-৯; ১৮. ১১)। জ্ঞানী পুরুষ কোন ব্যবহারিক কর্ম্ম না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যদি কদাচিৎ বনে গমন করেন, তাহা হইলে এই প্রকার ব্যবহারিক কর্ম্ম ত্যাগ করায় তাহার কর্ম্মের ক্ষয় হইল এরূপ মনে করা ভুল (গী. ৩. ৪)। সে কর্ম্ম করুক বা না করুক, তাহার কর্ম্মের যে ক্ষয় হয়, তাহা তাহার বুদ্ধি সাম্যাবস্থায় পৌঁছিয়াছে বলিয়াই হয় কর্ম্ম ছাড়িবার দরুন কিংবা না করিবার দরুন নহে, এই তত্ত্বটি সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। অগ্নির দ্বারা যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ হয় সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ হয়; এই দৃষ্টান্ত অপেক্ষা, পদ্মপত্রের উপর জল থাকিলেও উক্ত পত্রে যেমন জল লাগিয়া থাকে না সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষকে—অর্থাৎ ব্রহ্মার্পণ করিয়া অথবা আসক্তি ছাড়িয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে তাহাকে কর্ম্ম লেপিয়া ধরে না, উপনিষদের ও গীতার এই দৃষ্টান্ত (ছাং. ৪. ১৪. ৩; গী. ৫. ১০) কর্ম্মক্ষয়ের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইবার পক্ষে অধিক উপযোগী। কর্ম্ম স্বরূপত কখনই দগ্ধ হয় না, দগ্ধ করেও না। কর্ম্ম নামরূপ এবং নামরূপ দৃশ্য জগৎ ইহা যদি সিদ্ধ হয় তবে এই সমস্ত দৃশ্য জগৎ দগ্ধ হইবে কি করিয়া? এবং কচিৎ কখন দগ্ধ হইলেও সৎকার্য্যবাদ অনুসারে বড় জোর তাহার নামরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে, এইটুকুই তফাৎ। নামরূপাত্মক কর্ম্ম কিংবা মায়া নিত্য বদলায় বলিয়া, এই নামরূপকে আপন রুচি অনুসারে মনুষ্য যদি বদলাইয়া লয়, তাহা হইলেও মনুষ্য যতই আত্মজ্ঞানী হউক না কেন, এই নামরূপাত্মক কর্ম্মের সমূলে নাশ করিতে পারে না; তাহা কেবল পরমেশ্বরই করিতে পারেন, এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই (বেসূ. ৪. ৪. ১৭ দেখ)। কিন্তু মূলে এই জড় কর্ম্মের মধ্যে ভালমন্দের যে বীজ অবস্থিতই নাই এবং মনুষ্য আপন মমত্ববুদ্ধির দ্বারা তাহার মধ্যে যাহাকে উৎপাদন করিয়া থাকে তাহার নাশ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, এবং তাহার দ্বারা যাহা দগ্ধ করা যাইতে পারে তাহা ইহাই। সমস্ত ভূতে সমত্ববুদ্ধি স্থাপন করিয়া আপনার সমস্ত কর্ম্মের এই মমত্ববুদ্ধি যিনি দগ্ধ করিয়াছেন তিনিই ধন্য, কৃতকৃত্য ও মুক্ত; সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, এইরূপ উক্ত হয় (গী. ৪. ১৯; ১৮. ৫৯)। এই প্রকারে কর্ম্ম দগ্ধ হওয়া সম্পূর্ণরূপে মনের নির্ব্বিষয়তার উপর এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের অনুভূতির উপর নির্ভর করে বলিয়া, অগ্নি কখনও উৎপন্ন হইলেই যেরূপ তাহার দহন করিবার ধর্ম্ম তাহাকে ছাড়ে না, সেইরূপ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান যখনই হউক না কেন, তাহার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কর্ম্মক্ষয়রূপ পরিণাম সংঘটিত হইতে কালের অপেক্ষায় থাকিতে হয় না। জ্ঞান হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। তথাপি অন্য সমস্ত কাল অপেক্ষা মৃত্যুকাল এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া ধরা যায়। কারণ, মৃত্যুই আয়ুর চরম কাল; এবং তাহার পূর্ব্বে কোন এক সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া অনারব্ধ সঞ্চিতের ক্ষয় হইলেও প্রারব্ধ নষ্ট হয় না। তাই, এই ব্রহ্মজ্ঞান যদি শেষ পর্য্যন্ত বরাবর সমানভাবে স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে মরণ পর্য্যন্ত ভালমন্দ কর্ম্ম যাহা ঘটিবে সে সমস্ত সকাম হইবে এবং তাহার ফলভোগ করিবার জন্য পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে। যে সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত হইয়াছে তাহার এই ভয় থাকে না, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু এই বিষয়ের শাস্ত্রদৃষ্টিতে যখন বিচার করিতে হয় তখন মৃত্যুর পূর্ব্বে উৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান কখনও বা শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া না-ও থাকিতে পারে এ বিষয়েরও বিচার করা নিশ্চয় আবশ্যক। তাই মৃত্যুর পূর্ব্বের কাল অপেক্ষা শাস্ত্রকার মৃত্যুকালকেই বিশেষরূপে গুরুতর কাল বলিয়া মনে করেন; এবং তখন অর্থাৎ মৃত্যুকালে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের অনুভূতি সংঘটিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ মোক্ষলাভ সম্ভব নহে, এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন। এই অভিপ্রায়েই "অন্তকালে অনন্যভাবে আমাকে স্মরণ করিলে মনুষ্য মুক্ত হয়" এইরূপ উপনিষদের ভিত্তিতে গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী. ৮. ৫)। এই সিদ্ধান্তানুসারে বলিতে হয় যে, যাহার সমস্ত জীবন দুরাচারে কাটিয়াছে, কেবল মৃত্যু সময়ে তাহার পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে সেও মুক্ত হয়। অনেকের মতে এরূপ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই, এইরূপ প্রতীতি হইবে। যাহার সমস্ত জীবন দুরাচারে কাটিয়াছে তাহার কেবল মৃত্যুকালেই সুবুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অন্য বিষয়ের ন্যায় মনকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করিবার অভ্যাস করা চাই; এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে একবারও যাহার ব্রহ্মাত্মৈক্যের অনুভূতি হয় নাই তাহার কেবল অন্তকালেই তাহা একেবারে পাওয়া পরম দুর্ঘট, এমন কি, অসম্ভব। তাই, এই সম্বন্ধে গীতার আর একটা বড় কথা আছে (গী. ৮. ৬, ৭ ও ২. ৭২)। প্রত্যেকেই মনকে নির্ব্বিষয় করিবার অভ্যাস নিত্যকাল রাখিবে, যাহার ফলে

অন্তকালেও সেই অবস্থাটিই বজায় রাখিবার পক্ষে কোন বাধা না ঘটে, এবং মনুষ্য শেষে মুক্ত হয়। কিন্তু শাস্ত্র ছাঁকিয়া সত্য নির্বাচনের জন্য স্বীকার করা যাউক যে, পূর্ব্বসংস্কারাদি কারণবশতঃ কাহারও কেবল মৃত্যুকালেই সহসা পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ হইল। লক্ষ লক্ষ এমন কি কোটি কোটি মনুষ্যের মধ্যে এই প্রকারের এক-আধটী উদাহরণ পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা কত দুর্লভ বা দুর্ঘট তাহার বিচার একপাশে রাখিয়া দিয়া, এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কি হইবে, এক্ষণে আমাদের ইহাই আলোচ্য। মৃত্যুকালেই জ্ঞান হোক্ না কেন, তাহা দ্বারা মনুষ্যের অনারব্ধ-সঞ্চিতের ক্ষয় হইবেই; এবং আরব্ধকার্য্য-সঞ্চিতের ক্ষয় এই জন্মের ভোগের দ্বারা মৃত্যুকালে হয়। তাই, তাহার কোন কর্ম্ম ভোগেরই অবশিষ্ট থাকে না; এবং এইরূপ অগত্যা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, সমস্ত কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ সংসারচক্র হইতে সে মুক্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্" ইত্যাদি (গী. ৯.৩০)—খুব দুরাচারী মনুষ্যও পরমেশ্বরকে অনন্যভাবে ভজনা করিলে মুক্ত হয়ই হয়—ইহা গীতাবাক্যে উক্ত হইয়াছে; এবং এই সিদ্ধান্ত জগতের অন্য ধর্ম্মেও গ্রাহ্য হইয়াছে। 'অনন্যভাব' অর্থে পরমেশ্বরে যাহার চিত্তবৃত্তি পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় এইরূপ মনুষ্য; চিত্তবৃত্তি অন্যদিকে রাখিয়া মুখে "রাম রাম" বিড়্‌বিড়্‌ করা নয়, এইটুকু মাত্র এই স্থানে মনে রাখা চাই। মোট কথা, ব্রহ্মজ্ঞানের মহিমাই এইরূপ যে, জ্ঞান হইলেই সমস্ত অনারব্ধসঞ্চিতের একেবারেই ক্ষয় হয়। এই অবস্থা যখনই প্রাপ্ত হই না কেন, সর্ব্বদা ইষ্ট তো বটেই। কিন্তু সেই অবস্থাকেই মৃত্যুকালে স্থির রাখা, কিংবা পূর্ব্বে প্রাপ্ত না হইলেও অন্তত অন্তকালে প্রাপ্ত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। নতুবা মৃত্যুকালে কিছু বাসনা অবশিষ্ট থাকিলে পুনর্জন্ম এড়ানো যাইবে না, এবং পুনর্জন্ম এড়াইতে না পারিলে মোক্ষও পিছাইয়া পড়িবে এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির করিয়াছেন।

জননী-আমার।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

তুমি যদি ঘৃণাভরে দলি বারবার
দূর করি দিতে মোরে; যদি দিবানিশি
মোর সব আশা সাধ বজ্র-করে নাশি
লুটাইতে ধূলি মাঝে; যদি কেড়ে নিতে
যাহা কিছু প্রিয়তম আছে এ মহীতে
কহিবারে আপনার; যদি ভেঙ্গে দিতে
আমার প্রাণের খেলা তীব্র পদাঘাতে
পাষাণীর মত সদা; যদি পলে পলে
জ্বলন্ত কণ্টকরাজি মোর মর্ম্ম স্থলে
প্রদানিতে সকৌতুকে; যদি অবরত
বক্ষোপরি বসি মোর রাক্ষসীর মত
শুষিতে হৃদয় রক্ত—তবু তোমা আমি
মা বলিয়া ডাকিতাম সুখে দিন-যামি।

কৈকেয়ী-মন্থরা-শূর্পনখা।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

রামায়ণ গ্রন্থের মূলে আমরা দুইটী নারীচরিত্র দেখিতে পাই। এই দুই জনের দুইটী কার্য্যের ফলেই যেন রামায়ণের সমগ্র ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। এ দুইটী নারীচরিত্র,—মন্থরা ও শূর্পনখা। দশরথের সংসারে বিরোধ-ঘটনার মূল মন্থরা, আর রাবণকে সবংশে নিধন করাইবার মূল শূর্পনখা। যে সংসারের ভিতরে এরূপ দুর্জ্জন থাকে সেই স্থানেই বিপৎপাত হয়। দুর্জ্জনের মন্ত্রণা শুনিলেই অকল্যাণ ঘটে। শকুনির মন্ত্রণা শুনিয়া দুর্য্যোধন কতই না অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন! ইহারা উপকারীর ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া উপস্থিত হয়। ইহাদিগকে চেনা বড়ই কঠিন। রাম-নির্ব্বাসনের মন্ত্রণাকারিণী মন্থরা কত হিতৈষিণীর মত কৈকেয়ীকে কহিল—

তব দুঃখেন কৈকেয়ী মম দুঃখং মহদ্ভবেৎ
ত্বদ্‌বৃদ্ধৌমমবৃদ্ধিশ্চ ভবেদিহ ন সংশয়ঃ।

মন্থরার মুখে রামাভিষেক সংবাদ শুনিয়া কৈকেয়ী প্রথমতঃই ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া উঠেন নাই। যখন মন্থরা কহিল—

অক্ষয়ং সুমহদ্দেবী প্রবৃত্তং ত্বদ্বিনাশনম্
রামং দশরথোরাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।

ইহা শুনিয়া কৈকেয়ী—

উত্তস্থৌ হর্ষসম্পূর্ণা চন্দ্রলেখেব শারদী।
অতীব সা তু সন্তুষ্টা কৈকেয়ী বিস্ময়ান্বিতা
দিব্যমাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রদদৌ শুভম্
দত্ত্বাত্বাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রমদোত্তমা
কৈকেয়ী মন্থরাং হৃষ্টা পুনরেবাব্রবীদিদম্
ইদন্ত মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্
এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিং বাভূয়ঃ করোমি তে
রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজারামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।

মন্থরা নীচকুলোদ্ভবা দাসী। কৈকেয়ী উচ্চ-বংশসম্ভূতা, দশরথের প্রিয়তমা ভার্য্যা এবং মহানুভব ভরতের জননী। তাই তিনি প্রথমতঃ রামাভিষেকের কথা শুনিয়া মন্থরাকে দিব্যাভরণ পুরস্কার প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন—

রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।

ইহাতে কৈকেয়ীর বংশগত এবং পদোচিত মহত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।

অনেক পাঠকই কৈকেয়ীর সম্বন্ধে অবিচার করিয়া থাকেন। কৈকেয়ী অপরাধিনী সত্য; কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে যতখানি অপরাধিনী মনে হয় প্রকৃত পক্ষে অপরাধ তাঁহার তত নহে। কৈকেয়ীর অপরাধের জন্য দশরথই বেশী দায়ী।

রামায়ণ গ্রন্থে যে কয়টী নারী-চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে কৈকেয়ীচরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। মাত্র কাব্যহিসাবে রামায়ণের বিচার করিতে গেলে কৈকেয়ীচরিত্রেই কবির অধিকতর কৃতিত্ব। ঘটনাবৈচিত্র্যের ঘাত-প্রতিঘাতসঙ্কুল চরিত্রের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটাইয়া তোলাতেই কবির উচ্চতম কলা-কৌশলের অভিব্যক্তি।

প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই—কৈকেয়ী স্বামীসেবাপরায়ণা। অসুরযুদ্ধকালীন পতিশুশ্রূষাই তাহার প্রমাণ। তাঁহার সেবায় পতি তুষ্ট হইয়া দশরথ তাঁহাকে দুইটী বর দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কৈকেয়ী তখন সেই বর দুটী গ্রহণ না করিয়া, দশরথের নিকটে গচ্ছিত রাখিলেন। সেই প্রতিশ্রুত বর দুইটী দ্বারা কোনো অসদভিপ্রায় সাধন করিবেন, এরূপ কোনো অভিসন্ধি তখন তাঁহার ছিল না।

কিন্তু কৈকেয়ী বড় অভিমানিনী। দশরথ রাজার অত্যধিক আদরেই এরূপ হইয়াছে। কারণ তিনি "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা"। কোনো প্রকার পরাভব তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। স্ত্রীলোক সকল সহিতে পারে কিন্তু সপত্নীত্ব সহিতে প্রায়শঃ অক্ষম। যে কৈকেয়ী প্রাণপণ করিয়াও স্বামী-সেবাপরায়ণা, যে কৈকেয়ী রামচন্দ্র এবং ভরতকে একরূপ দেখিতেন তাঁহার ভিতরেও সপত্নীবিদ্বেষ ছিল। এই সপত্নীবিদ্বেষের সুযোগই মন্থরার কার্য্য-সাধনের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল। কৈকেয়ীর সপত্নীবিদ্বেষ সম্বন্ধে কৌশল্যার কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। রাম-নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়া কৌশল্যা কহিতেছেন—

নিত্যং ক্রোধতয়া তস্যাঃ কথং নু খরবাদিনীম্
কৈকেয্যা বদনং দ্রষ্টুং পুত্র শক্ষ্যামি দুর্গতা।

এই সপত্নী-বিদ্বেষ-সম্ভাবনাই বহুপত্নীত্বপ্রথার একতম দোষ। তাই দশরথ বহুবিবাহজনিত অপরাধে অপরাধী।

কৈকেয়ী দিব্যাভরণ পুরস্কার দিলেন বটে, কিন্তু মন্থরা অমনি—

মন্থরাত্বভ্যসূয়ৈনামুৎসৃজ্যাভরণং হি তৎ
উবাচেদং ততোবাক্যং কোপদুঃখসমন্বিতা
হর্ষং কিমর্থমস্থানে কৃতবত্যসি বালিশে
শোকসাগরমধ্যস্থং নাত্মানমববুধ্যসে।

মন্থরা দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া সেই আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসূয়াবশতঃ কৈকেয়ীকে কত রকম ভেদসূচক কথা কহিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকার অনাহূত পরমন্দকারিগণ অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে গিয়া জানিয়া শুনিয়া নিজেদের স্বার্থ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে। এই জাতীয় লোকগুলি বড়ই ভয়ানক প্রকৃতির। মন্থরা রামের মন্দ করিতে গিয়া রত্নাভরণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিল না! কৌশল্যাকে কাঁদাইলে, অথবা রামচন্দ্রকে বনবাস দিলে মন্থরার কোনোই স্বার্থ নাই। আবার কৈকেয়ীর স্বার্থরক্ষার জন্যই যে মন্থরা এই পরামর্শ দিতে আসিয়াছে তাহাও নহে। কি যে উদ্দেশ্য তাহা মন্থরা বুঝি নিজেও বুঝিতে পারে নাই। ইহাদের উদ্দেশ্যই যেন পরের মন্দ করা।

কি অপূর্ব্ব বাক্‌কৌশলে যে মন্থরা ধীরে ধীরে কৈকেয়ীর মতপরিবর্ত্তন সংঘটিত করিল তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই প্রকার লোকের অনিষ্টকারিণী বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখরা।

ক্রমেই মন্থরার কথা কৈকেয়ীর যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই দুর্জ্জনসংসর্গেই কৈকেয়ীর বুদ্ধিভ্রম ঘটিল। এবং মন্থরা হইতেই অযোধ্যার সোনার সংসারে দুঃখের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

দুইটী বিষয় চিন্তা করিয়াই কৈকেয়ীর প্রাণে বেশী আঘাত লাগিয়াছিল। একটি সপত্নীর নিকটে ভবিষ্যৎ-পরাভব-চিত্র। অপরটী ভরতের অসা ক্ষাতে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক। ভরতের অসা ক্ষাতে রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব করিয়া প্রকৃত পক্ষেই দশরথ কৈকেয়ী এবং ভরতকে অবমানিত করিয়াছিলেন। দশরথচরিত্র সমালোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে ইহা তাঁহার অতিরিক্ত সাবধানতা-জনিত রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা। কিন্তু শত্রুঘ্নও তো অনুপস্থিত। সুমিত্রার কেন অভিমান হইল না? ইহার কারণ এই যে সুমিত্রা তো আদরিনী নহেন। এবং মন্থরার মত পরামর্শদাত্রী তাঁহার কাছে কেহ উপস্থিত হয় নাই। এবং তিনি কৈকেয়ীর মত ততদূর অভিমানিনীও নহেন।

রাম-নির্ব্বাসন-সঙ্কল্পের প্রাক্কালে মন্থরার বাক্-চাতুর্য্যমুগ্ধা কৈকেয়ীর হৃদয়ে কবি যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব।

অবশেষে দেখিব যে কৈকেয়ী-চরিত্রের সর্ব্ব-প্রধান দুর্ব্বলতা কোথায়।

নিতান্ত আত্মীয় হইলেও উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় দুর্জ্জনকে পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রথমতঃ কৈকেয়ী অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন যে মন্থরার পরামর্শ নীচ হৃদয়সঞ্জাত ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা। কিন্তু চক্ষু-লজ্জায় মন্থরাকে একটীও শাসনবাক্য কহিয়া নিরস্ত করিতে পারিলেন না। কারণ মন্থরা কৈকেয়ীর হিতৈষিণীর বেশে আসিয়াছিল। এই জাতীয় চক্ষুলজ্জাই মানবচরিত্রের একটা বিশেষ দুর্ব্বলতা। যাহা অন্যায় বলিয়া বোধ হইবে, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া তখনই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। এ সময়ে বেশী দেরী করিলেই অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। কারণ—

> ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে
> সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
> ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

কিন্তু কৈকেয়ীর হৃদয়ে কি এই অন্যায়ের অঙ্কুর মাত্রই ছিল না? থাকিতে পারে, কিন্তু তত ছিল না। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই বিশেষভাবে তাঁহাকে অন্যরূপ করিয়া তুলিয়াছিল।

রামনির্ব্বাসনের জন্য তিন জনই দায়ী। মন্থরা, কৈকেয়ী এবং দশরথ। কিন্তু দশরথই সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী; তৎপর কৈকেয়ী, তারপরে মন্থরা। মন্থরা নীচকুলোদ্ভবা দাসী—কৈকেয়ী তাহার কথা শুনিলেন কেন? আবার হাজার হৌক, কৈকেয়ী নারী মাত্র; ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি দশরথ কৈকেয়ীর কথা শুনিলেন কেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুইটী নারীচরিত্রের প্রভাবেই যেন রামায়ণ গ্রন্থোক্ত সমগ্র ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। ইহার মন্থরাচরিত্র আমরা দেখিলাম। অতঃপর শূর্পনখা চরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমাংশের মূল মন্থরা; দ্বিতীয়াংশের মূল শূর্পনখা। কিন্তু শূর্পনখা ও মন্থরার বিস্তর প্রভেদ আছে। এতদুভয়ের তুলনায় মন্থরাই অধিকতর ক্রূরপ্রকৃতি বিশিষ্টা। একজনের প্রকৃতির মূলে পরের অনিষ্ট সাধন; অপরের প্রকৃতির মূলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা। প্রথমা নিঃস্বার্থভাবে পরানিষ্টকারিণী আর দ্বিতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্টা, প্রতিহিংসাপরায়ণা।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে রামচন্দ্র-শূর্প-নখা সংবাদে রামচন্দ্রই বেশী অপরাধী। বাস্তবিকই শূর্পনখা অবমানিতা হইয়াছিলেন। নারীর অপমান করা সভ্য সমাজরীতিবিরুদ্ধ। শূর্পনখাকে মূল ধরিয়া বিচার করিতে গেলে অত্যাচারী রাবণের অপরাধের ভার—আপাত দৃষ্টিতে যাহা অনুমান হয়—তদপেক্ষা অনেক লঘু হইয়া পড়ে। শূর্পনখা-চরিত্র সমালোচনায় অতঃপর ইহা প্রতিপন্ন হইবে।

শূর্পনখা।

কালকেয় দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধের সময়ে রাবণ শূর্পনখার স্বামীকে বধ করিয়াছিলেন। শূর্প-নখা রাবণের নিকটে বিলাপ করিলে, তিনি আদেশ করিলেন যে, "তুমি বন্ধুবান্ধব কাহাকেও ভয় না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভ্রমণ কর।" তদবধি শূর্পনখা খরের সহিত দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। অনার্য্যাদের ভিতরে বিধবাদের এরূপ স্বৈরাচার তৎকালে নিন্দনীয় ছিল না। বিধবাগণ পত্যন্তর গ্রহণ করিতেও পারিতেন। শূর্পনখা রামচন্দ্রকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কামরূপিণী রাক্ষসী মায়া-রূপে সুন্দরীর রূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের প্রণয় ভিক্ষা করিলেন। শূর্পনখা কহিলেন—

অহং শূর্পনখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী
অরণ্যং বিরোমীদমেকা সর্ব্বভয়ঙ্করা।

* * *

প্রখ্যাতবীর্য্যৌ চরণে ভ্রাতরৌ খরদূষণৌ।
তানহং সমতিক্রান্তা রাম ত্বা পূর্ব্বদর্শনাৎ
সমুপেতাস্মি ভাবেন ভর্ত্তারং পুরুষোত্তমম্।

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র হাস্য করিয়া কহিলেন—

কৃতদারোঽস্মি ভবতি ভার্য্যেয়ং দয়িতা মম
ত্বদ্বিধানান্তু নারীণাং সুদুঃখা সসপত্নতা

* * *

এনং ভজ বিশালাক্ষি ভর্ত্তারং ভ্রাতরংমম
অসপত্না বরারোহে মেরুমর্কপ্রভাযথা

আমি বিবাহ করিয়াছি ; ইনি আমার প্রেয়সী পত্নী। তোমার ন্যায় রমণীদিগের সপত্নী থাকা ক্লেশকর। হে বিশালাক্ষি সূর্য্যকিরণ যেমন মেরুপর্ব্বতকে ভজনা করে তুমি সেইরূপ সপত্নীশূন্যা হইয়া স্বামীরূপে আমার ভ্রাতাকে ভজনা কর।

তখন শূর্পনখা লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া তাঁহাকে কহিলেন—

ময়া সহ সুখং সর্ব্বান্ দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি।

ইহা শুনিয়া লক্ষ্মণ পরিহাস করিয়া তাঁহাকে কহিলেন—

কথং দাসস্য মে দাসী ভার্য্যা ভবিতুমিচ্ছসি
সোঽহমার্য্যেণ পরবান্ ভ্রাত্রা কমলবর্ণিনী
সমৃদ্ধার্থস্য সিদ্ধার্থ মুদিতামল বর্ণিনী
আর্য্যস্য ত্বং বিশালাক্ষি ভার্য্যা ভব যবীয়সী॥

আমি আর্য্য রামের অধীন দাস, অতএব তুমি আমার স্ত্রী হইয়া দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? তুমি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠা পত্নী হইয়া প্রীতা হও।

তখন পরিহাসানভিজ্ঞা শূর্পনখা রামচন্দ্রকে কহিলেন, যে "তুমি এই কুরূপা বৃদ্ধা স্ত্রী সীতার প্রতি অনুরক্তা হইয়াই আমাকে গ্রহণ করিতেছ না। অতএব তোমারি সমক্ষে আমি এই মানুষীকে ভক্ষণ করিব। ইহা বলিয়াই রাক্ষসী শূর্পনখা সীতার দিকে ধাবিতা হইলেন। তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন—

ক্রূরৈরনার্য্যৈঃ সৌমিত্রে পরিহাসঃ কথঞ্চন।

ক্রূরস্বভাব অনার্য্যদিগের সহিত কথনই পরিহাস করা উচিত নহে।

রাক্ষসীং পুরুষং ব্যাঘ্র বিরূপায়তুমর্হসি।

তুমি এই রাক্ষসীকে বিরূপা কর। অতঃপর লক্ষ্মণ খড়্গ দ্বারা শূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিয়া তাহাকে বিরূপা করিয়া দিলেন।

শূর্পনখা অপরাধিনী। তিনি অন্যায়ভাবেই শ্রীরামচন্দ্রের প্রণয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন সত্য। রামচন্দ্রকে দেখিয়া কে না মুগ্ধ হয়? স্বৈরচারিণী শূর্পনখা যে তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু রামচন্দ্রের তাঁহাকে লইয়া প্রথমতঃ এরূপ পরিহাস করা উচিত হয় নাই। রামচন্দ্র বলিলেন লক্ষ্মণের নিকটে যাও, আবার লক্ষ্মণ বলিতেছেন রামচন্দ্রের কাছে যাও, এবং সীতা উপস্থিত থাকিয়া এই সকল শুনিতেছেন। শূর্পনখা না হয় অনার্য্যা, কিন্তু রামচন্দ্র তো আর্য্য জাতি। তাঁহার কি একবার শূর্পনখাকে সদুপদেশ দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা উচিত ছিল না? রামচন্দ্রের মত ব্যক্তির সদুপদেশে হয় তো শূর্পনখার আন্তরিক গতির পরিবর্ত্তন হইত। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া প্রথম হইতেই পরিহাস করিতে আরম্ভ করিলেন। নারীর সম্মুখে নারী যদি প্রত্যাখ্যাতা হয়, তাহা বড়ই লজ্জার বিষয়। তাই শূর্পনখা ক্রুদ্ধা হইয়া সীতাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শূর্পনখা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই অনার্য্যার মতই, কিন্তু রামলক্ষ্মণের পরিহাস কথনই আর্য্যোচিত হয় নাই।

নিজ ভগ্নীর এরূপ অবমাননা কোন্ বীর ব্যক্তি সহ্য করে? রাবণের প্রথম ক্রোধের কারণই হইল শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদ। অতঃপর রামচন্দ্রের যাহা কিছু বিপৎপাত, তাহা এই শূর্পনখার অবমাননারই ফলস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল—এরূপ ভাবা যায় না কি?

সীতার মত স্ত্রী থাকিতে শূর্পনখাকে প্রত্যাখ্যান করাতে রামচন্দ্রের এস্থলে বিশেষ কোন মহত্ব প্রকাশ পায় নাই। আর লক্ষ্মণ, তিনি তো একান্তভাবেই রামচন্দ্রের আজ্ঞাবহ। অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ভাল, কিন্তু অন্যায়কারীকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুকম্পাতেই বেশী মহত্ব প্রকাশ পায়।

———

কালিদাসের সময় নির্দ্দেশ।

(শ্রীধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখন আমরা অশ্বঘোষের কথা বলিব। অশ্বঘোষ একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং বুদ্ধচরিত নামে সংস্কৃত ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার বুদ্ধচরিতে কতক শ্লোকের সহিত কালিদাসরচিত কতক শ্লোকের ভাবসাদৃশ্য আছে। অশ্বঘোষ খৃঃ প্রথম শতাব্দীর লোক। তিনি যদি কালিদাস হইতে এই ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কালিদাসের সময় খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হয়। পক্ষান্তরে কালিদাস যদি তাঁহার নিকট হইতে ভাবগ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে কালিদাস খৃঃ প্রথম শতাব্দীর পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাক কে কাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। অজ ও ইন্দুমতী যাত্রা করিতেছেন, তাহা দেখিবার জন্য কুলাঙ্গনাগণের ঔৎসুক্য ও ব্যস্ততার দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে—

ততস্তদালোকনতৎপরাণাং সৌধেষু চামীকরজালবৎসু
বভূবুরিত্থং পুরসুন্দরীণাং ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি॥
রঘু ৭ম সর্গ ৫ম-১২ শ।

কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গে উমামহেশ-দর্শনোৎকণ্ঠা ঠিক একই প্রকার শ্লোক সকলের দ্বারা বিবৃত হইয়াছে; কেবল প্রথম শ্লোকে ও শেষ শ্লোকে বাক্যবিন্যাসের কিছু প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলি একরূপ। প্রোঃ সারদারঞ্জন রায় মহাশয় Asiatic R. Societyর পত্রিকায় এ বিষয়ে সুন্দররূপে মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত যে অশ্বঘোষ কালিদাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি সমষ্টি অকাট্য। তথাপি কতকগুলি কথা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়।

(ক) একই শ্লোকসমষ্টি কুমার ও রঘু উভয়ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পুনরাবৃত্তি দ্বারা সৌন্দর্য্যের কিছু হানি হয় নাই। delicate humour কালিদাসের নিজস্ব। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে রাজন্যমণ্ডলীর বিভিন্ন বিভিন্ন হাব-ভাবের উদয় কালীন আমরা এই কৌতুকরস প্রস্ফুট দেখি। রঘুবংশে সিংহের বর্ণনায় "দংষ্ট্রাময়ূখৈঃ শকলানি (কুর্ব্বন্)"; ২য় সর্গ রঘু কুমারে শিবদূতের বর্ণনায় "অসোঢ় সিংহ ধ্বনিরুন্ননাদ"; পাণ্ড্যরাজের বর্ণনায় "সনির্ঝরোদগার ইবাদ্রিরাজঃ" (রঘু ষষ্ঠ সর্গ); শকুন্তলার শকারের উক্তিতে এবং অন্যান্য বহু স্থলে আমরা ইহার বিকাশ দেখিতে পাই। এই প্রকার ইঙ্গিতে আমরা একটু বিশেষত্ব দেখি। কালিদাস ছবির আভাসটি চোখের কাছে ধরিয়া দেন। বিশিষ্ট অংশগুলি (details) পাঠক বা শ্রোতার মনে আপনি উদয় হয়। ইহাই কালিদাসপ্রতিভার বিশেষত্ব। বাণভট্ট বা ভবভূতির মত তিনি সেগুলি অতিরিক্ত পল্লবিত করেন না। সে কার্য্য পাঠকের। এই অদ্ভুত ছবি তুলিবার এবং ছবির পর ছবি, কেবল কয়েকটি তুলির চিহ্ন দ্বারা সমুদ্ভাসিত করার অদ্ভুত ক্ষমতার—ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। এই কুলস্ত্রীগণের চপলতা হাস্যরসের ইঙ্গিতে (suggestion of pictures) পরিপূর্ণ। নকলকারিগণ যদি দুই স্থানেই নকল করিয়া থাকেন তাহা কি আশ্চর্য্য নয়? স্পষ্ট বা বাচ্য অপেক্ষা ব্যঞ্জনা বা suggestion এর আধিক্যই কালিদাসের নিজস্ব।

(খ) একই ভাব কিম্বা একই রকমের ভাব ভিন্ন ভিন্ন কবির হৃদয়ে উদ্ভূত হইতে পারে। তাহাতে পরস্পর আদান প্রদান অনুমিত হয় না। শেক্সপীয়ারের সিম্বেলীন নাটকে আইমোজেন সুন্দরীর চক্ষুর ভিতর উঁকি মারিবার জন্য আগুনের ইচ্ছা—এবং ইন্দুমতীর কানের দুল হইয়া ঝুলিবার জন্য অগ্নির অভিলাষ একই ভাবে অনুপ্রাণিত, কিন্তু এস্থলে আদান প্রদানের কোনও কথাই নাই। কিন্তু এক কবি যদি অন্য কবির বর্ণনার উপর কটাক্ষ করেন এবং তাঁহার লেখার কল্পিত বা প্রকৃত দোষ সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে প্রথম কবি যে অনুকরণ করিয়াছেন তদ্‌বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। কালিদাস লিখিয়াছেন

"তা রাঘবং দৃষ্টি ভিরাপিবন্ত্যো নার্য্যো ন জগ্মু র্বিষয়ান্তরাণি।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা॥

বৌদ্ধযোগী অশ্বঘোষের হৃদয়ে ইহা বড় বিসদৃশ বোধ হয়। তাহা হইলে নারীগণের মনে কি কুভাবের উদয় হইয়াছিল? তাই তিনি বর্ণনার প্রথমেই তাঁহার নিজবর্ণিত কুলাঙ্গনাগণকে এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রথমেই ভূমিকা করিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল ছিল। এই অল্পরেখাসমন্বিত ছবিগুলিকে তিনি বর্ণসমাবেশে ভর্ত্তি করিয়াছেন। এমন কি অধিক কথা বলিবার প্রয়াসে একস্থলে অশ্লীলতা অবলম্বন করিয়াছেন। এরূপ স্থলে তিনি যে অনুকরণ করিয়াছেন তদ্‌বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

(গ) "হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যঃ" কুমারে এইরূপ বর্ণনা আছে। অশ্বঘোষ এই কল্পার সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী নন। তাঁহার বিবেচনায় বুদ্ধদেবের মারজয় বা মদনজয় আরও সুন্দর। মারের উক্তিতে তিনি এই কথা প্রস্ফুট করিয়াছেন। কবি ভারবি আবার তাহাতেও সন্তুষ্ট

হন নাই। অর্জ্জুনের মদনজয় আরও বিচিত্র। তিনি কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না। অধিকন্তু প্রলোভিনীগণই প্রলুব্ধা হইয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। তিন কবিগণের মধ্যে কে আগে কে পরে, তাহার বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(ঘ) বৌদ্ধ ও জৈনগণ পালি ও প্রাকৃত ভাষায় তাঁহাদের শাস্ত্রাদি লিখিতেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনরাবর্ত্তনের সময় তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করেন। হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান। কিন্তু হঠাৎ কলার বিকাশে এক সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অশ্বঘোষ সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধচরিত লিখিলেন। কোন্ শক্তি এই বিচিত্র পরিবর্ত্তন আনিল? কালিদাস ও তৎকালীন সাহিত্যকে অশ্বঘোষের অন্ততঃ একশত বৎসর পূর্ব্বে না ধরিলে এই শক্তির কোনও কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় না।

(ঙ) পুরাণ, অলঙ্কার, কাব্য সর্ব্বত্রই কালিদাসের প্রভাব লক্ষিত হয়। শিবপুরাণে ও স্কন্দপুরাণে কালিদাসের শ্লোক অনেক স্থলে বিশেষতঃ উমার রূপ বর্ণনায় একবারে বর্ণে বর্ণে ঠিক রাখিয়া বসান হইয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলার গল্প মহাভারতের শকুন্তলা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পদ্মপুরাণ কালিদাসের গল্পকেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন—দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে কালিদাসের একটি ভাব "চন্দ্রংগতা পদ্মগুণান্ন ভুংক্তে" (কুমার ১ম সর্গ) লইয়া কতরকমে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কতরকমে বলিয়াছেন; তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই। দর্পণকার শকুন্তলার সর্ব্বদমনের চাপল্যের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বাৎসল্য রস বলিয়া একটি নূতন রসের অবতারণা করিয়াছেন। শূদ্রক কবি এই সর্ব্বদমনের বালকতার ভাব লইয়া অতি-প্রাকৃত অংশ বাদ দিয়া মৃচ্ছ-কটিকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। "ন যযৌ ন তস্থৌ", সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের নিকটও প্রচলিত কথা হইয়া গিয়াছে। মেঘদূতের পর হইতে আর দূতকাব্যের অভাব নাই। এরূপ স্থলে কোনও সুন্দর ভাব দেখিলে কালিদাস অনুকরণ করিয়াছেন, এ কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র। অশ্বঘোষের লেখা কখনও বৌদ্ধ গণ্ডী ছাড়াইয়া অধিক দূর যায় নাই। কিন্তু এই বিলোলনেত্রদিগের বাতায়ন পথে উঁকি ঝুঁকি অনেক ভারতীয় কবিকেই অভিভূত করিয়াছে। কথা বাড়িতে বাড়িতে শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় আসিয়া নারীগণের পতিনিন্দায় পরিণত হইয়া কলা বিষয়ে অনেক সৌন্দর্য্য হারাইয়াছে। এত প্রভাব মহাকবি কালিদাসের সম্ভব, অশ্বঘোষের নহে।

অতএব অশ্বঘোষ কালিদাসের শ্লোকগুলিকে উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি কালিদাসের পরবর্ত্তী সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় মতের তিনটি কথাই সম্পূর্ণ রূপে খণ্ডিত হইল। অধিকন্তু উপরোক্ত প্রমাণ সকলের দ্বারা আমরা তিনটি কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারি।

(১) কালিদাস মগধরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাপতি নহেন। তিনি অবন্তিনাথ বিক্রমাদিত্যের সভাপতি ছিলেন।

(২) শালিবাহনের পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ প্রথম শতাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব।

(৩) প্রথম শতাব্দীর অশ্বঘোষ তাঁহার বর্ণনা অবলম্বন করিয়াছেন—

ইহা দ্বারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় মতই নিরস্ত হইল এবং প্রথম মতের কাছাকাছি একটি সময় পাওয়া গেল। (ক্রমশঃ)

মহর্ষির অভিষেক।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বার্ষিক স্মৃতিসভায় পঠিত)

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

একটী মুমুক্ষু আত্মা তৃষিত হৃদয়
চেয়েছিল ঊর্দ্ধপানে, বুঝি জ্যোতির্ম্ময়
মধুময় লোক হতে অজ্ঞাতে কখন্
এসেছিল আবাহন;—তটিনী যেমন
সিন্ধুর মিলন মাগে! রুদ্ধ স্বর্গ-দ্বার
খুলে গেল অকস্মাৎ, মুক্ত-সুধা ধার
নেমে এল "ব্রহ্মময় সকল সংসার"*
কি অপূর্ব্ব বিশ্বরূপ! বিশ্ব-বিধাতার
বিশ্বমাঝে আত্ম-দান! "সকলি ত্যজিয়া
প্রশান্ত নির্ম্মলচিত্তে আপনা ভুলিয়া
তাঁর দানে—সে পরম হৃদয়-রতনে
কর শুধু উপভোগ!" পুলক-প্লাবনে
ভাসিল বিশুদ্ধ প্রাণ, জন্ম-জন্মান্তের
অন্তরের ক্ষুধা হায়, নিভৃত মর্ম্মের
ব্যাকুল সাধনা-সাধ-আশা আকিঞ্চন
তৃপ্ত হ'ল মুহূর্ত্তেকে, বুঝি সংগোপন
মধুকোষে প্রসূনের পিপাসু ভ্রমর
লভিল সন্ধান চির! মুগ্ধ চরাচর
নির্ব্বাক্ স্তম্ভিত হয়ে বিস্মিত-নয়নে
হেরিল অমৃতধামে মহা-শুভক্ষণে
জগতের ঋষিদলে বিমুক্ত আত্মার
সুশাশ্বত অভিষেক;—দেব-করুণার
কি অচিন্ত্য অভিনয়!
স্বদেশ আমার!

* মহর্ষির "আত্মজীবনী" ও "ঈশোপনিষৎ" দ্রষ্টব্য—জীঃ

প্রাণের তপস্যা তব বুঝিবা আবার
যুগ-যুগান্তের পরে হয়ে মূর্ত্তিমান
উঠেছিল উদ্ভাসিয়া আনন্দে মহান
অদ্বিতীয় দেবতার বিজয় নিশান
প্রতিষ্ঠিতে বসুধায়! কর অর্ঘ্যদান
ভক্তি-প্রীতি-শ্রদ্ধাভরে! অভিষেক করি
লহ আজি অন্তরের সিংহাসন পরি
প্রণম্য বরেণ্য পূজ্য মহর্ষি-আত্মায়—
কেবলি হইতে যোগ্য তাঁহারি পূজায়!!

প্রাচীন রাজগৃহে বৌদ্ধচিহ্ন।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

প্রাচীন রাজগৃহ বৌদ্ধগণের অতিপবিত্র তীর্থস্থান। তথাগত এই পুণ্যক্ষেত্রে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাজগৃহের প্রত্যেক পাহাড়, প্রত্যেক গুহা, প্রত্যেক নদী, প্রত্যেক ধূলিকণার সহিত বৌদ্ধযুগের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বে তথাগত ভক্ত শিষ্য আনন্দকে সম্বোধন করিয় বলিয়াছিলেন—'আনন্দ, রাজগৃহ বড়ই মনোরম। রাজগৃহের গৃহ্যকূট পর্ব্বত, গৌতম-নিগ্রোধ, চোর-পপাত, মধ্যপর্ণী গুহা কত না মনোরম। ইসিগিলির পার্শ্ববর্ত্তী কৃষ্ণপাহাড় কত মনোরম। সীতাবনের সপ্পশণ্ডিকা পাহাড় কত মনোরম। তপোদারম, বেণুবনের কালন্দক নিভাপ, জীবকবন ও মদকুচ্চি কতনা মনোরম'।* তথাগত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত। এই কারণে তিনি পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বে রাজগৃহের প্রিয়স্থানগুলির নামোল্লেখ করিয়াছিলেন।

পর্ব্বতবেষ্টিত গিরিব্রজ জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। পালি গ্রন্থে এই গিরিব্রজ 'মগধানাং গিরিব্রজ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে বর্ণিত গিরিব্রজ ও মগধের গিরিব্রজের বিভিন্নতা দেখাইবার জন্যই সম্ভবতঃ পালি গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে, কেকয় রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল গিরিব্রজ। রামায়ণে গিরিব্রজের যেরূপ অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান শতদ্রু নদীর পশ্চিমে এবং বিপাশা নদীর পূর্ব্ব পারে উহা অবস্থিত ছিল ধরিয়া লওয়া যায়। রামায়ণের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের কতকাংশ প্রাচীন কালে কেকয় রাজ্য ছিল এবং গিরিব্রজ সেই প্রদেশের রাজধানী ছিল। ভরতের গিরিব্রজ পরিত্যাগ ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন প্রসঙ্গে বাল্মীকি (অযো-৭১ সর্গ-১২ শ্লোক) লিখিয়াছেন—

স প্রাঙ্মুখো রাজগৃহাদভিনির্য্যায় বীর্য্যবান্।
ততঃ সুদামাং দ্যুতিমান্ সন্তীর্য্যাবেক্ষ্য তাং নদীম্॥
হ্লাদিনীং দূরপারাঞ্চ প্রত্যক্ স্রোতস্তরঙ্গিণীম্।
শতদ্রূমতরচ্ছ্রীমান্ নদীমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ॥

কানিংহাম সাহেবের মতে বিতস্তা (ঝিলাম) নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত জালালপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি কেকয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোগলশাসনকালে সেই প্রাচীন নগরী জালালপুর নামে পরিচিত হয়। জালালপুরের নিকটবর্ত্তী 'গির্জাক' পর্ব্বত রামায়ণবর্ণিত গিরিব্রজ নগরের শেষ চিহ্ন বলিয়া মনে হয়। উহা জালালপুর হইতে একশত ফিট উচ্চ। বর্ত্তমান জালালপুর পঞ্জাবের ঝিলাম জেলায় বিতস্তা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ কেকয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

'সামান্য ফল সুত্ত অদ্যকথা' গ্রন্থে আছে যে রাজগৃহের বত্রিশটী বড় সিংহদ্বার ও চৌষট্টিটি ক্ষুদ্র সিংহদ্বার ছিল।* রামায়ণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায় যে রাজগৃহ সমৃদ্ধশালিনী নগরী ছিল। এই জনপদের চতুর্দ্দিকে বৃক্ষাচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা ছিল এবং এখানে কোন প্রকার ব্যাধি ছিল না। 'মহাবস্তু অবদান' গ্রন্থেও ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক হিউয়ান সিয়াং এই স্থানে সুগন্ধ কনক বৃক্ষরাজি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ সব বৃক্ষ আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

'সম্মাউত্ত নিকায়' গ্রন্থে সুমাগধ পোকরণীর বর্ণনা আছে। ইহা রাজগৃহের প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত ছিল। সেই প্রাচীন কালে এখানে যে একটী হ্রদ ছিল তাহার সবিশেষ প্রমাণ আজিও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান 'অথারাই' ইহার শেষ চিহ্ন।

প্রাচীন ভারতে প্রাচীরবেষ্টিত জনপদের চারিটী অংশ ছিল। রাজপ্রাসাদের ভিতর ও বাহিরের দুই অংশ এবং নগরের ভিতরের ও বাহিরের দুই অংশ। 'রাজোভাদ জাতকে' আছে বোধিসত্ত তাঁহার নিজের কোন দোষ আছে কি না জানিবার জন্য তিনি প্রথমে রাজপ্রাসাদের ভিতরে অনুসন্ধান করিলেন। সেখানে কাহারও মুখে তাঁহার দোষের সংবাদ না পাইয়া রাজপ্রাসাদের বাহিরে অনুসন্ধান করেন। তারপর জনপদের ভিতর ও বাহিরেও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে খুব সম্ভবতঃ রাজগৃহের

---

* মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত—পৃঃ ৮৩।

* 'রাজগহ কিয় বাত্রিংশ মহাদ্বারানি চৌষট্ঠী ক্ষুদ্দ দ্বারানি।'

এই চারিটী অংশ ছিল। রাজা বিম্বিসারকেও একদা সন্ধ্যাকালে ভিতরের দ্বার বন্ধ ছিল বলিয়া বাহিরের দ্বারে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। 'বিমানবস্তু' গ্রন্থে আছে 'জনপদের বাহিরে ধান ও শস্যের ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়।' চীন পরিব্রাজকদের বর্ণনা হইতেও রাজগৃহ জনপদের চারিটী অংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

পালিগ্রন্থ 'রাজগহের' বর্ণনা হইতে জানা যায় যে রাজপ্রাসাদ কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া নগরবাসীরা প্রস্তরের গৃহ যে নির্ম্মাণ করিত না এমত নহে। 'ধর্ম্মপদের' ব্যাখ্যার এক স্থানে আছে, 'হায়, আমার পিতা রাজা বিম্বিসর শিশুর ন্যায় বুদ্ধিহীন ছিলেন। নগরবাসী বহুমূল্য প্রস্তরে নির্ম্মিত গৃহে বাস করে, আর আমার পিতা দেশের রাজা হইয়াও কাষ্ঠনির্ম্মিত রাজগৃহে বাস করেন। শেঠী জ্যোতিক প্রস্তরনির্ম্মিত সপ্ততল গৃহে বাস করিতেন। তথাগতের সময়ে রাজগৃহে বহু প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ এবং আঠারটী বৃহৎ বিহার ছিল।

পাটনা কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ জ্যাকসন্ তাঁহার 'প্রাচীন রাজগৃহ' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, এই নগরের দক্ষিণাংশে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভগ্ন স্তূপ বিদ্যমান আছে। এই স্তূপগুলি উচ্চভূমির উপর এবং চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। অতি প্রাচীন একটী চতুর্ভুজ দুর্গবিশেষের ভগ্নাংশ বলিয়া মিঃ জ্যাকসন্ এই স্তূপগুলিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দুর্গটী জ্যাকসন্ সাহেবের উদ্যমে ও ব্যয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে, পূর্ব্বে ইহা জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। এই দুর্গ সম্বন্ধে মিঃ জ্যাকসন্ লিখিয়াছেন, 'ইহা বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন রাজগৃহের অতি সীমাবদ্ধ অংশে ইহা স্থাপিত; এই দুর্গ হইতে গৃধ্রকূট পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। জনশ্রুতি যে, অজাতশত্রু যখন তাঁহার পিতা রাজা বিম্বিসরকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই দুর্গে বসিয়া তথাগতকে গৃধ্রকূট পর্ব্বতের উপর দেখিতে পাইতেন। সামান্য ফলসুত্তের টীকায় আছে অজাতশত্রু তাঁহার পিতা বিম্বিসরকে একটী ধূমগৃহে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে অজাতশত্রু একমাত্র তাঁহার মাতাকেই সেই কারাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই কারাগৃহ রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিল এবং এখান হইতে গৃধ্রকূট পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যাইত। এই প্রমাণ রাশি হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গের চতুর্দ্দিকে উচ্চ ভূমিই চীন পরিব্রাজকদের বর্ণিত রাজগৃহের রাজপ্রাসাদ। পরিব্রাজকদের বর্ণিত রাজপ্রাসাদ হইতে গৃধ্রকূট পর্ব্বত পর্য্যন্ত দূরত্ব আলোচনা করিলে এই স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে একটু গোলযোগ দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারা যখন গৃধ্রকূট পর্ব্বতের কথাই বলিয়াছেন, চূড়ার কথা বলেন নাই, তখন এই সমস্যা নিরাকরণে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। হিউয়েন সিয়াং বলিয়াছেন নগরের দক্ষিণাংশে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দালান ইমারৎ ছিল এবং এই ইমারতগুলির সন্নিকটে একখানি গ্রামে বিখ্যাত ধনী শেঠী জ্যোতিকের ইষ্টকনির্ম্মিত বসতবাড়ী ছিল। এই জনপদের দক্ষিণ দিকই যে সেই প্রাচীনকালে বিখ্যাত ছিল তাহার আরও কারণ আছে। বিগানডেট (Bigandet) তাঁহার লিখিত "ব্রহ্ম দেশীয় বুদ্ধের কাহিনী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'তথাগত প্রথমবারে নদী পার হইয়া পূর্ব্বদ্বার দিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করেন এবং প্রথম শ্রেণীর গৃহের পার্শ্ব দিয়া চলিতে চলিতে তিনি ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা বিম্বিসর নগরের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া এই সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষকে দেখিতে পান এবং তাঁহার অনুসন্ধানে পাণ্ডব গিরি (বর্ত্তমান রত্নগিরি) পর্য্যন্ত লোক পাঠাইয়াছিলেন। এই পাহাড়ে তখন তথাগত আহার করিতে বসিয়াছিলেন।' সম্ভবতঃ তথাগত গিরিয়েক উপত্যকার ভিতর দিয়া নগরের পূর্ব্বদ্বারে প্রথম প্রবেশ করেন। এই পূর্ব্ব দিকেই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। তিনি উত্তর দিক দিয়া নগরে প্রবেশ করেন নাই, কারণ ঐ উত্তর দিকের সন্নিকটে সীতাবন ছিল এবং এখানেই রাজগৃহপুরবাসীরা মৃতব্যক্তির সৎকার করিতেন। সাধারণতঃ জনসাধারণ এই পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দ্বার দিয়াই রাজগৃহে প্রবেশ করিতেন। বৌদ্ধসাহিত্যে আছে বর্ত্তমান রত্নগিরিই প্রাচীন পাণ্ডব শৈল; জনশ্রুতি এই যে পাণ্ডবেরা স্নাতক ব্রাহ্মণ বেশে জরাসন্ধের সহিত মল্ল যুদ্ধ করিতে এখানে আসিয়াছিলেন। সামান্য ফলসুত্তের টীকায় আছে, রাজগৃহের রাজবৈদ্য জীবক প্রতিদিন দুই তিনবার তথাগতকে দেখিতে যাইতেন। বেণুবন ও গৃধ্রকূটের এতটা ব্যবধান দেখিয়া তিনি আম্রবনে তথাগতের অবস্থিতির জন্য একটী বিহার প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। এই সময়ে জীবক রাজপুত্র অভয়ের গৃহে বাস করিতেন। বেণুবন ও গৃধ্রকূট রাজপ্রাসাদ হইতে বহুদূরে ছিল। এই কারণে তিনি আম্রবনে বিহার প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে যে দুর্গ ছিল ইহাও তাহার একটী প্রমাণ।

পাণ্ডব শৈল।

বুদ্ধঘোষ তাঁহার ধর্ম্মপদের টীকায় * লিখিয়া-

* ধর্ম্মপদ গ্রন্থ সুত্তপিটকের অন্তর্গত। এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন। বৌদ্ধগণ বলেন, তথাগতের পরিনির্ব্বাণের তিনমাস পরে, রাজগৃহ

ছেন, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করেন এবং সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবশৈলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে মগধাধিপতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।' পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বুদ্ধদেব পূর্ব্বদ্বার দিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করেন এবং এই দিক দিয়াই বাহির হইয়া পাণ্ডবশৈলে ফিরিয়া যান। বর্ত্তমানে এই পাহাড়ের নাম রত্নগিরি।

লঠ্ঠিবন।

উরুবেল কাশ্যপ, গয়াকাশ্যপ ও নদীকাশ্যপ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, তথাগত গয়াশীর্ষ পাহাড়ে তাঁহার বিখ্যাত উপদেশবাণী প্রচার করিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত রাজগৃহাভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন। এই সময়ে অসংখ্য শিষ্য তাঁহার অনুগমন করে, তিনি পথিমধ্যে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতে করিতে রাজগৃহে লঠ্ঠিবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সংস্কৃত যষ্ঠিবনকে পালিভাষায় লঠ্ঠিবন বলে। এখানে তথাগত সুপ্পতীত্থ চৈত্যে বাস করিতেন। বিম্বিসর তথাগতের এই আগমন সংবাদ পাইয়া সমস্ত পুরবাসীকে মহাপুরুষ দর্শনের জন্য ঘোষণাবাণী প্রচার করেন। সেই সময়ে রাজগৃহ নগরী সাজাইবার জন্য বিশেষ আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। অসংখ্য লোকজন সঙ্গে লইয়া রাজা বিম্বিসর নগরের বাহিরে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ইহার পর তথাগত রাজার বিশেষ অনুরোধে রাজগৃহে প্রবেশ করেন। 'মহাবস্তু' গ্রন্থে ইহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

বেণুবনে কলন্দক নিভাব।

এখানে তথাগত শিষ্যগণসহ বাস করিতেন। 'কলন্দক' অর্থে কাঠবিড়াল ও 'নিভাব' অর্থে শস্য বুঝায়। যেখানে কাঠবিড়াল শস্য খাইতে আসে। রাজবাটীতে আহারাদির পর রাজা বিম্বিসর স্বর্ণ ঘটে জল পুরিয়া তথাগতকে বেণুবন দান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'মহাত্মন্, আমি এই বেণু আপনাকে ও ভিক্ষু সম্প্রদায়কে দান করিলাম। তথাগত 'তথাস্তু' বলিয়া উহা গ্রহণ করেন।

বেণুবন তথাগতের অত্যন্ত প্রিয়স্থান ছিল। এখানে বসিয়া তিনি অনেক উপদেশ দিতেন এবং এই মঠে বিনয়সূত্র রচিত হয়। পালিগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে এই বিহার রাজগৃহের উত্তর দ্বারের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। ফাহিয়ানের বর্ণনায় আছে ইহা রাজগৃহের উত্তর দ্বার হইতে তিনশত পদ দূরে অবস্থিত ছিল।

তপোদারম্।

'সন্যুত্ত (সংযুক্ত) নিকায়' গ্রন্থে আছে, 'কোন সময়ে রাজগৃহের অন্তর্গত তপোদারমে তথাগত বাস করিতেছিলেন। একদিন প্রত্যূষে মহর্ষি সমিধি তপোদার জলে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। এই 'আরাম' বা বাগান তপোদার তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া ইহাকে 'তপোদারম' বলিত। তপোদা নদী যে বেণুবনের অতি নিকটে ছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটী হইতে সবিশেষ বুঝিতে পারা যায়। 'বিনয়' গ্রন্থে আছে, 'ভগবান্ তথাগত ভেলুবনের কলন্দক নিবাপ মঠে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে একদিন মগধের রাজা বিম্বিসর তপোদার জলে অবগাহন করিতে গিয়াছিলেন। আর্য্য বা ভিক্ষুরা যতক্ষণ স্নান করিতেছিলেন ততক্ষণ তিনি ঘাটের এক কোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি এইভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর স্নানশেষে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন নগর প্রবেশের দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি নগরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর ঠিক সময়ে উপস্থিত হইলে তিনি তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।' ইহা হইতে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় যে তপোদা নদী রাজগৃহের প্রবেশদ্বারের অতি নিকটেই অবস্থিত ছিল এবং ভেলুবনও এই নদীর সন্নিকটে ছিল।

মহামৌদ্গল্যায়নও * তপোদা প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন, 'হে বন্ধুগণ, প্রবাহিনী তপোদার জল গভীর, স্বচ্ছ, শান্ত শীতল ও উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ। ইহাতে সুন্দর সুন্দর ঘাট আছে, জলে অসংখ্য মৎস্য ও কচ্ছপ এবং চক্রাকার প্রস্ফুটিত পদ্মফুল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার স্রোত কুণ্ঠিতভাবে প্রবাহিত হয়।' মৌদ্গল্যায়নের প্রকৃতি রহস্যপূর্ণ ছিল, তাঁহার বাক্য ভিক্ষুরা অনেক সময় ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিতেন না, এই কারণে সময়ে সময়ে ভিক্ষুগণ তাঁহার বাক্যের প্রকৃত অর্থ লইয়া বাদানুবাদ করিতেন। 'তপোদার স্রোত কুণ্ঠিতভাবে প্রবাহিত হয়' এই বাক্যে মৌদ্গল্যায়নের ভুল আছে, ইহা মনে করিয়া তথাগতের নিকট ভিক্ষুগণ অভিযোগ করিলেন। বুদ্ধদেব ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছিলেন যে তপোদা যখন দুইটী 'মহানরকের' ভিতর দিয়া প্রবাহিতা তখন মৌদ্গল্যায়ন যথার্থই বলিয়াছে 'তপোদার স্রোত অতি কষ্টে প্রবাহিত হয়।' এই দুইটী 'মহানরকের' একটা গূঢ় অর্থ আছে। বর্ত্তমান সরস্বতী নদীর দুই তীরে দুইটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। অনোতত্ত হ্রদের সহিত

নগরে প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশনকালে ধর্ম্মপদ গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের প্রারম্ভে বুদ্ধঘোষ পালি ভাষায় ধর্ম্মপদের টীকা বিরচন করেন।

* ইনি তথাগতের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। ইনি বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন।

উষ্ণ প্রস্রবণের সম্বন্ধ আছে এবং জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে স্রোত মাটীর নীচ দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় নরকাগ্নির সংস্পর্শেই উষ্ণ হইত। প্রাচীন তপোদাই বর্ত্তমান সরস্বতী এবং ইহা বৈভার ও বিপুল এই দুইটী পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত উপত্যকার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তপোদার উত্তর তীরে আজিও স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ ইহা সেই প্রাচীনকালের বিহারের ভগ্নস্তূপ হইবে। (ক্রমশঃ)

নানা-কথা।

ধারওয়ারের পত্র :—[আমাদের পরম হিতৈষী ধারওয়ার ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস যে পত্র লিখিয়াছেন, আমরা সাদরে তাহা প্রকাশ করিলাম। তং বোং সং]

"আসিবার সময় বহরাম পুরে (গঞ্জাম) কয়েক ঘণ্টার জন্য নামিয়াছিলাম। তথায় ব্রাহ্মসমাজহিতৈষী অনরেবল এ, পি, পাত্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। উক্তদিন রবিবার থাকায় সমাজেও গিয়াছিলাম। পাত্র মহাশয় এই সামান্য গৃহটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে এই সমাজের নাম "প্রার্থনা" সমাজ ছিল সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজ করা হইয়াছে। এজন্য কয়েকজন অনুষ্ঠানিক সভ্য সমাজে আসা বন্ধ করিয়াছেন। নামের জন্য এত!

"সম্প্রতি আমি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে একটি মন্তব্য লিখিয়াছি। উক্ত মন্তব্য সম্বলিত একখানি পত্র সঞ্জীবনীতে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছি। যদি প্রকাশিত হয় অবশ্য আপনি দেখিতে পাইবেন। আমার বোধ হয় চৈত্রের তত্ত্ববোধিনীতে উহা সঞ্জীবনী হইতে লইয়া মুদ্রিত করিলে বড়ই ভাল হয়। উক্ত মন্তব্যের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক ইংরাজীতে একখানি পত্র লিখিয়া অদ্য বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের মুখপত্র সুবোধ পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইতেছি। সুবোধ পত্রিকা আপনার নিকট যায়। যাইলে আপনি অবশ্য দেখিতে পাইবেন।

"উপাসনাপ্রণালীর দেবনাগরী শ্লোক, ইংরাজী অনুবাদসহ প্রকাশ করিবার কি হইল? ইহা যে কতদূর আবশ্যক তাহা বারম্বার বলিবার আবশ্যক নাই।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রসারের বিশেষ ব্যবস্থা করাই আমাদের প্রধান কর্ম্ম। ইহার উপরেই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। এ বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ না করিলে এবং এজন্য স্বার্থত্যাগ না করিলে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হওয়া সুকঠিন। আপনাকে আমি অনেকবার এ বিষয়ে বুঝাইয়া বলিয়াছি। কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় প্রস্তাবটি উঠিয়াওছিল কিন্তু চাপা পড়িয়া আছে। এক্ষণে দেখা যাউক ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আমি এখন কতদূর কি করিতে পারি।"

মধ্যভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ—গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি হইতে ইন্দোর নগরে মধ্যভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ৩৭তম ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই উৎসবে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছি—একটী সাধুচরিত কথন এবং দ্বিতীয়, ধর্ম্মপরিষৎ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদিগের চরিত্র সদ্ভাবে আলোচিত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাব আমাদিগকেও স্পর্শ করিবে। সুগন্ধি পুষ্প হস্তে রাখিলে তাহার সুবাস আমাদের হস্তে সংলগ্ন হইতে বিলম্ব হয় না। সেইরূপ আবার প্রত্যেক উৎসবউপলক্ষে ধর্ম্মপরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইলে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতাগণ আপনাপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠভাব সকল বর্ণন করিতে থাকিলে ক্রমে বিভিন্ন ধর্ম্মের খোঁচগুলি কাটিয়া গিয়া অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের যে সুপ্রতিষ্ঠা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার :—[আমাদের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামে যেভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছি। তাঁহার উৎসাহঅনুকরণীয়। আমাদের কোন বন্ধু কি একটী বক্স হারমোনিয়া দিয়া সাহায্য করিবেন না? তং বোং সং]

"গত ১১ মাঘ আমার বাসায় প্রাতঃকালে আমরা সস্ত্রীক ও সন্ধ্যাকালে পাড়ার বন্ধুদের মধ্যে অপর ৭জন একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করি। উপাসনা অবশ্যই আদিসমাজের প্রণালীতে হইয়াছিল। আচার্য্যের কাজ আমিই করি। প্রাতঃকালীন উপাসনাতে বিবৃতি ও সায়ংকালের উপাসনায় ব্যাখান হইতে পাঠ করি। যে কয়টি লোক যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিলেন যে এ প্রকার ব্রহ্মোপাসনায় তাঁহাদের যোগদান করিতে কাহারও আপত্তি নাই, বরং তাঁহারা আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন। উপস্থিত প্রতি রবিবার অপরাহ্ন ৩টায় পাড়ার যুবকদিগকে লইয়া আমার বাসার সামনের খোলা যায়গায় বা কোন পাহাড়ের উপর বা অন্য কোন মনোরম স্থানে ঘণ্টাখানেক ব্রহ্মোপাসনা ও ব্যাখ্যান বা বিবৃতি হইতে পাঠ করিব স্থির করিয়াছি। ইতিমধ্যে দুটী রবিবার ঐ রকম কাজও করিয়াছি—একটি রবিবার আমার বাসার সামনের যায়গায়, অপরটি দেব-পাহাড়ের উপর। প্রথম রবিবারে ১১টী যুবক উপস্থিত ছিল, পর রবিবার ১৪টি উপস্থিত ছিল। আগামী কাল দোলযাত্রা উপলক্ষে ছুটী আছে; ইচ্ছা করিতে উহাদিগকে লইয়া পাহাড়গুলিতে যাইব। দেখি কতদূর কি হয়।

"দুটি বিষয়ের বড় অভাব বোধ করিতেছি—প্রথমটি ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তকের ও দ্বিতীয়টি একটি সুরের যন্ত্র (অর্থাৎ বক্স হারমোনিয়ম)। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম (পকেট এডিসন্ যাহার প্রুফ আমাকে গত জুলাই মাসে দেখাইয়াছিলেন) প্রকাশিত হইয়া থাকে, কয়েক খানি পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে সেইগুলি ঐ যুবকদিগকে দিলে খুবই প্রচারের পক্ষে সুবিধা হয়। অবশ্য উহার মূল্য তাহারা দিবে কিন্তু কিছু কম। যদি পারেন ত কয়েক খণ্ড পাঠাইবেন। বক্স হারমোনিয়ম বা অল্প দামের একটি

* * *

হারমোনিয়ম পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়।

* * *

"এ রকম প্রচারটা আমার বড় ভাল বলে মনে হয়। কারণ এতে শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া আর কোন খরচ

নাই। আর চাঁদার জন্য কাহারও কাছে মুখাপেক্ষা করিবার আবশ্যকতা থাকে না।"

বিক্রমপুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার—বিক্রমপুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য বিগত ১৩ই জানুয়ারি কলিকাতাস্থ বিক্রমপুরবাসীগণ কর্ত্তৃক এক সভা আহূত হইয়াছিল। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বিগঠিত হইয়াছে অনেকগুলি খ্যাতনামা ব্যক্তি ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিক্রমপুরে প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র আছে বলিয়া আমাদের ধারণা। আদি-ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দাসগুপ্ত এক বৎসরের জন্য প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায়ও টাকার সচ্ছলতা হইলে দ্বিতীয় প্রচারক নিযুক্ত হইবেন স্থির হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সেও কেদার বাবুর উৎসাহ অদম্য। আমরা আশা করি বিক্রমপুর ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক সভা সহজে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে না। অনেকেই সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রায় প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত মাসিক ১০৲ দশ টাকা করিয়া সাহায্য দান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা এই সভার উদ্যোগী তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

সমালোচনা।

দেবালয় রিভিউএর তৃতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যা (জানুয়ারী ১৯২০) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দিন দিন এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি বিষয় আছে তন্মধ্যে 'বাহাইসম' নামক সন্দর্ভটি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। "হ্যাপি নিউইয়ার" নামক প্রবন্ধে "ক্রিসমাসকার্ড" এর উৎপত্তিকথা আলোচিত হইয়াছে। বার্লিনের একটী জার্ম্মাণ মহিলা উহার প্রথম উদ্ভাবিকা। মোটের উপর পত্রিকাটি ভালই চলিতেছে। আমরা ইহার আরও উন্নতি দেখিতে ইচ্ছা করি। শ্রীক্ষেঃ

বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩১শে চৈত্র মঙ্গলবার বর্ষ শেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিংশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

১৮৪২ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২৭। খৃঃ ১৯২০। সম্বৎ ১৯৭৭ কলিগতাব্দ ৫০২১।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বিংশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ।

১৮৪২ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯১।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী।

———

একমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৯১

৯২১ সংখ্যা　　　　　　১৮৪২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

নিবেদন।

(শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

আর যে পারিনা প্রভু! এ বক্ষ দুর্ব্বল
যায় বুঝি ভেঙে! এ যে একান্ত বিকল
দারুণ পীড়নে। জীবনের উষাকালে
ক্ষুদ্র এ মুকুল-প্রাণ ফুরাক্ অকালে।
তুমি তো জান গো প্রভু কত খানি সহে
এ আমার বুকে। হে দয়াল, হের দহে
তুষানল সম প্রাণে।
　　　　　আমি যে তোমার
নিতান্ত অবোধ পুত্র। এই যে সংসার
দারুণ নির্ম্মম ; এতটুকু দোষ প্রভু
—ক্ষুদ্র হোক্—তবু তার ক্ষমা নাহি কভু!
বুঝি' সব কোন্ প্রাণে রহিয়াছ ভুলি?
লহ নাথ, লহ মোরে আজি কোলে তুলি।
যে দিন প্রথম তুমি আনিলে ভুবনে
মরু-মরীচিকা সম এ মায়া কাননে—
তখন প্রভাত বেলা ; রবির কিরণ
ছিল না প্রখর—ধরা শীতল তখন।
যেন এক বসন্তের মুক্ত উচ্ছৃঙ্খল
—নিশ্চিন্ত-আনন্দ সম আবেগ-চঞ্চল—
সুন্দর কোকিল সম, হেথা অনুক্ষণ
অশ্রান্ত করিতেছিনু বিহ্বল কূজন।
ভেবেছিনু এইরূপ শুধু গাব গান
এ সুখের কভু নাহি হবে অবসান।
সে দিন তো বুঝি নাই, এ সুখ বসন্ত
অন্ত করে, নিদাঘের প্রখর অনন্ত
খর তাপে। পূর্ণিমা যামিনী যায়, আসে
অমা, অন্তহীন অন্ধকারে ধরণীরে গ্রাসে।
বুঝি নাই কীট আছে কুসুমের মাঝে ;
যেমনি রয়েছে সুখ তেমনিই রাজে
দুঃখ—হাসি-কান্না দুই হেথা ধরণীর
কঠিন নিয়ম। কিছু নাহি থাকে স্থির
চির দিন হেথা। প্রাণপণে ভালবেসে
লভে তাহে প্রত্যাখ্যান, প্রতারণা শেষে।
পূর্ণ কভু নাহি হয়, অসম্ভব আশা
করে তবু লোকে। ভাঙি এ সাধের বাসা
চলে' যায় প্রিয়জন কঠিন পরাণে
কাতর বিলাপ হায় নাহি শুনি' কাণে!
মিথ্যাদ্বন্দ্ব, হিংসা ক্ষতি ঈর্ষা দ্বেষভরা
বুঝি নাই, ভাবিয়াছি কি সুন্দর ধরা!
আজি তাই কাঁদে প্রাণ, চাহে না রহিতে ;
এ ধরার দুঃখভার পারি না বহিতে।

ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান।

(ডাক্তার সার গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।

"হে গার্গি, এই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের শাসনে
চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।"

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি
নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা
ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।

"হে গার্গি, এই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের শাসনে, নিমেষ মুহূর্ত্ত, দিবস ও রাত্রি, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু সংবৎসর বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।"

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি
প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ
পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যাঃ।

বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯

"হে গার্গি, এই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের শাসনে শ্বেত পর্ব্বত হইতে কতকগুলি নদী পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে, আর কতকগুলি পশ্চিমদিকে।"

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ॥
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ॥ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তৈত্তিরীয় ২।৮

"ইঁহার ভয়ে বায়ু বহিতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উঠিতেছে, ইঁহার ভয়ে অগ্নি, পর্জ্জন্য ও পঞ্চম মৃত্যু ধাবমান হইতেছে।"

এই সমস্ত বিশ্ব পরমেশ্বরের দ্বারা সুব্যবস্থিত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তাঁহারই নিয়মে চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী আকাশ বায়ু অগ্নি পর্জ্জন্য ও মৃত্যু আপন আপন কাজ করিয়া বিশ্বচক্র চালাইতেছে। ইহাদের ব্যাপার একটু কম হইলে সমস্তই গোলমাল হইয়া যাইবে। পৃথ্বী ও বুধ মঙ্গল বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহ অন্তর্বর্ত্তী আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, উহাদিগকে সূর্য্য নিজ আকর্ষণ শক্তির দ্বারা টানিয়া রাখিতেছে. উহাদিগকে আপনা হইতে অতি দূরে যাইতে দেয় না, তাই উহারা সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবী অপেক্ষা ৩ লাখ ৫৬ হাজার ৯৩৬ গুণ বড়। আকর্ষণশক্তির বলাবল গোলকের বৃহত্ত্বের উপর নির্ভর করে। সূর্য্য সমস্ত গ্রহ অপেক্ষা অনেক বড়, তাই তাহার বল উহাদের উপর প্রকটিত হইতেছে এবং উহাদিগকে আপন মার্গের উপর ঠিক্ রাখিতেছে। সেইরূপ আবার, যদি সূর্য্যের বল প্রকটিত না হয়, তাহা হইলে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ সকলেই সিধা পথ ধরিয়াই চলিবে এবং উত্তরোত্তর দূরে দূরে চলিয়া গিয়া, যেখানে সূর্য্য দেখা যায় না, এইরূপ কোন স্থানে গিয়া পৌঁছিবে। এইরূপে পৃথিবী সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া গেলে আমাদের ন্যায় প্রাণীদিগের কি গতি হইবে! সূর্য্য হইতে যে তেজ ও উত্তাপ পৃথিবী প্রাপ্ত হয়, তাহারই যোগে সমস্ত প্রাণী সজীব থাকিয়া আপন আপন কার্য্য করে; ঐ তেজ প্রাপ্ত না হইলে, আমাদের সমেত সমস্ত বিশ্ব তমোময় হইয়া যাইবে, ঐ উত্তাপ না পাইলে সমস্ত পৃথিবী বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হইবে, সমুদ্র জমিয়া গিয়া পাথরের মতো কঠিন হইবে; তার পর আমাদের মতো প্রাণী থাকিবে কি করিয়া? সমস্ত চেতন পদার্থ নষ্ট হইয়া, সমস্ত বনস্পতি বিলুপ্ত হইয়া, এই পৃথিবী কেবল পাষাণময় হইবে। পক্ষান্তরে, সূর্য্যকে যথোপযুক্ত বৃহত্ত্ব দিয়া, তাহার ভিতর আকর্ষণশক্তি স্থাপন করিয়া তদ্দারা পৃথিবীকে আপন মার্গে সূর্য্যেরই নিকটে রাখিয়া, পরমেশ্বর প্রাণীদিগকে রক্ষা করিতেছেন এবং সমস্ত জীবের ব্যাপার যথোপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলেও এতটা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছেন যে, ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত পৃথিবীতেও ঐ অগ্নির প্রখরতা অনুভূত হইতেছে; এবং সূর্য্য-কিরণ-গত অগ্নিযোগে বৃষ্টি পড়িতেছে,বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং অন্য অনেক কাজ হইতেছে। এই প্রকারে একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ নিকট করিয়া দিয়া পরমেশ্বর সমস্ত ভূতকে নিয়মে রাখিতেছেন। পরমেশ্বর-যোজিত এই সকল নিয়ম অবাধ দেখিয়া, এবং সমস্ত জগৎ অচেতনের মতো চলিতেছে ও তাহার অন্তর্গত নিয়ম স্বভাবসিদ্ধ মনে করিয়া প্রমাণসিদ্ধপদার্থ-জ্ঞান-বেত্তারা চেতনস্বরূপ যে পরমেশ্বর তাঁহার কর্ত্তৃত্বের দিকে লক্ষ্য করেন না। কিন্তু তাহাদের এই অভিপ্রায় নির্ম্মূল। কারণ, জগতের মধ্যে যে নিয়ম আছে তাহা সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা প্রকাশ করাই তাঁহাদের কাজ; কিন্তু এই নিয়ম স্বভাবসিদ্ধ, কিংবা পরমেশ্বর দ্বারা স্থাপিত তাহার নির্ণয় করা, তাঁহাদের কাজ নহে। এইরূপ নির্ণয় করিবার মতো যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের মধ্যে আসে না। ঐ নির্ণয়, আমাদের অন্তর্যামী যে আত্মা এবং আত্মায় অবস্থিত যে স্বাভাবিক বুদ্ধি তাহার দ্বারাই হইয়া থাকে এবং ঐ নির্ণয় ইহাই যে,—সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরই এই বিশ্বাস আমাদের অন্তরে স্থাপন করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়।

(শ্রীউমাচরণ সেন এম-এ, বি-এল কর্তৃক মুন্সিগঞ্জ (ঢাকা) ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব উপলক্ষে বিবৃত)

সমাগত সহযাত্রী বন্ধুগণ ও সম্মিলিত ভদ্র-মহিলাগণ,—

মাঘোৎসবের উদ্যোক্তাগণ আজ একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুমতি দিয়া আমাকে বিশেষ ঋণী করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যাঁহার ডাক শুনে আমরা এই তীর্থে আসিয়াছি, তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানকে সফল করুক। আমাদের প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক বাক্য তিনি অনুপ্রাণিত করুন।

অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ পাঠে আমরা দেখিতে পাই অতি প্রাচীনকালে অঙ্গিরস মুনি সর্ব্ব বিদ্যায় আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা পরিজ্ঞাত ছিলেন। গৃহস্থ ঋষি শৌনক, অঙ্গিরসের সমীপে যথাবিধি উপস্থিত ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

"কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং
বিজ্ঞাতং ভবতীতি।"

হে ভগবন্, কি জানিলে এই সমস্ত জানা যায়। অঙ্গিরস মুনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতিহস্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা অপরা চ।

ব্রহ্মবিদেরা বলেন দুইটী বিদ্যা জ্ঞাতব্য, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা।

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদো সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ ইহারা অপরা বিদ্যা। পক্ষান্তরে যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তাহাই পরাবিদ্যা।

তৎপর অক্ষর পুরুষের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—যিনি অদৃশ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অগোত্র বর্ণরহিত অচক্ষুঃ কর্ণরহিত সেই হস্তপদবিরহিত নিত্য সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত সুসূক্ষ্ম অব্যয় ভূতযোনিকে জ্ঞানীগণ দর্শন করেন।

একটী বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ঋষি বেদগুলিকেও অপরাবিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। কেবল যে বিদ্যা অনুশীলন করিলে অক্ষর অমৃতময় পুরুষকে জানা যায়, যাহা সকল বিদ্যার ভিত্তিভূমি, তাহাকে পরাবিদ্যা নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

ঈশোপনিষদ্ পাঠে ইহা প্রতীতি হয় যে যখন এই ব্রহ্মবিদ্যার আদর্শ প্রচারিত হয় তখন তৎ-কালীন সমাজবক্ষ বিশেষ ভাবে আন্দোলিত হইয়াছিল। এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা জন-সমাজের মন তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছিল। সে আজ কাহারও কাহারও মতে খৃষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। সম-য়টা যাহাই হউক সেই সময়টা যে অতি প্রাচীন, তৎবিষয় অবিতর্ক্য। সেই প্রাচীন সময়ের ইতি-হাস লুপ্তপ্রায় এবং গভীর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। তবে উপনিষদের মুখে আমরা সেই সময়ের লোক-চরিত্র পাঠ করিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি।

অবিসংবাদিতরূপে এই বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-ষ্ঠাপিত হইলে দলে দলে লোক সংসারাশ্রম পরি-ত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাজবক্ষ জনশূন্য হইবার আশঙ্কা ঘটিল। সংসার ও ধর্ম্ম বিখ-ণ্ডিত হওয়ায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের দেশ সন্ন্যাসের দেশে পরি-ণত হইল। মানবসমাজের এই উদ্দাম গতি নিবারণের জন্য সংসার ও ধর্ম্ম অথবা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড মধ্যে সন্ধি স্থাপন মানসে ঋষিগণ যে মন্ত্র গ্রথিত করেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয় বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠে। ঈশোপনিষদ্ পাঠে আমরা তাহার আভাস দেখিতে পাই। এই গ্রন্থে সন্ন্যাস ধর্ম্মকেই প্রথমতঃ সংসারধর্ম্ম অপেক্ষা হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা দেখা যায়।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা কেবল অবিদ্যার অনুসরণ করে তাহারা অজ্ঞানরূপ গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা কেবল বিদ্যার উপাসনা করে তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। ঈশোপনিষদের এই মন্ত্রটী প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হয়। ঋষি একনিষ্ঠ অবিদ্যার অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের উপাসককে তীব্রভাবে তো আক্রমণ করিয়াছেনই, অধিকন্তু যাহারা একনিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞান-মার্গের উপাসক তাহাদিগকে আরও কঠোর ভাবে তিরস্কৃত করিয়াছেন।

ইহার পর ঋষি কেমন সুন্দর ভাবে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাসকের বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন শুনিলে প্রাণ বিস্ময় সাগরে নিমজ্জিত হয়। ঋষি বলিয়াছেন—

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।"

যাহারা যুগপৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং বিদ্যা দ্বারা অমৃতকে বরণ করে। অর্থাৎ মানব বিদ্যা ও অবিদ্যা কিছুই পরিত্যাগ করিতে পারে না, অথবা একটী পরিহার করিয়া একমাত্র অপরটীর একনিষ্ঠ সেবক হইতে পারে না। কারণ, তদ্দ্বারা মানবজীবনের পূর্ণ সার্থকতা লাভ করা যাইতে পারে না।

পরা বিদ্যার সহিত অপরা বিদ্যার যে পার্থক্য, বিদ্যার সহিত অবিদ্যার সেই পার্থক্য নাই; পরা বিদ্যা ও অপরাবিদ্যা, বিদ্যারই দুইটী শাখা। এবং অবিদ্যা বলিলে যদিও কর্ম্মময় সংসার ও বিদ্যা বলিলে ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায়, তবু আমার পরবর্ত্তী বক্তব্য সুগম করিবার মানসে বিদ্যাকে পরাবিদ্যার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। ঋষিগণও জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম-কেই পরাবিদ্যা রূপে আখ্যাত করিয়াছেন।

প্রবন্ধটীর মূল ভাবটী বুঝিতে সুগম হইবে মনে করিয়া আমি প্রারম্ভে এই অবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলাম। এখন আমরা বক্তব্য বিষয়ে প্রবেশ করিতেছি।

হুগলী জিলার অধীন রাধানগর গ্রামে রামমোহন ভূমিষ্ঠ হন। রাজা রামমোহন রায় ঠিক কোন্ সনে জন্ম ধারণ করেন তৎসম্বন্ধে সকলে একমত নহে। কেহ ১৭৭২ সনে, কেহ ১৭৭৪ সনে, কেহ বা ১৭৮০ সনে তাঁহার জন্মকাল নির্দ্ধারণ করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কোন মীমাংসার আবশ্যকতা নাই। অধিকাংশের মতে তিনি ১৭৭৪ সনে জন্মধারণ করেন। ১৮৩৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি ইংলণ্ডের অন্তর্গত ব্রিষ্টলনগরে দেহত্যাগ করেন। তিনি মাত্র ৫৯ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের তাঁহার জীবনী সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রাধানগর পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে লাঙ্গলপাড়ায় বাস করেন; পরে রামমোহন মাতৃ-ঠাকুরাণী ফুলঠাকুরাণীর সহিত বিরোধ করিয়া তন্নি-কটবর্ত্তী রঘুনাথপুরে বাটী প্রস্তুত করেন। রাম-মোহন নবম বৎসর বয়সে পার্শীভাষায় উন্নতির ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য পাটনায় প্রেরিত হন। তথায় তিন বৎসর অবস্থিতি করিয়া উভয় ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জন করেন। তদনন্তর তাঁহার পিতা তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর বয়সে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কাশীতে প্রেরণ করেন। ষোড়শ বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে ধর্ম্মমতের বিরোধ উপস্থিত হওয়ার পর তিব্বত দেশে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতা কর্ত্তৃক পুনঃ গৃহীত হন এবং বিবাহ করেন। ২২ বৎসর বয়সে ইংরাজি পাঠ আরম্ভ করেন। এই সময় মধ্যে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করেন। পিতার সহিত আবার ধর্ম্মমত লইয়া বিরোধ হওয়ায় তিনি গৃহ হইতে বিতাড়িত হন। ১৮০৫ সন হইতে ১৮১৪ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল সরকারী কার্য্য করেন। ১৮১৪ সনে ৪০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হন। তৎপর দেশপ্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বিবিধ গ্রন্থ প্রচার করেন। এই সময়ের মধ্যে রামমোহন রায় সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উর্দ্দু, বাঙ্গলা, ইংরেজি, গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু এই দশটী ভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্ন হন। ১৮২৮ সনের ২০শে আগষ্ট অর্থাৎ ১২৩৫ সনের ৬ই ভাদ্র সর্ব্ব প্রথম ব্রহ্ম-উপাসনা আরম্ভ করেন। ১৮৩০ সনের ২৩শে জানুয়ারী বাং ১২৩৭ সনের ১১ই মাঘ প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপর দিল্লীর তৎকালীন বাদশাহ হইতে

রাজা উপাধি লাভ করিয়া বিলাত গমন করেন এবং বিলাতে অবস্থান কালে ব্রিষ্টল্ নগরে তাঁহার অমর আত্মা অমৃত লোকে গমন করে।

রাজা রামমোহনের অনন্ত মহিমাময় জীবনের মধ্যে যে সকল উপাদান আমাদের দেশীয় যুবকগণের পক্ষে বিশেষভাবে অনুসর্তব্য আজ আমরা তাহার কিঞ্চিৎ এখানে আলোচনা করিব এবং তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশ সন্ন্যাসের দেশ। ধর্ম্ম বলিলেই আমরা সংসারবিমুখতা বুঝি। সাধারণতঃ সংসার ও ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন; শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণ এই ভাবটা আমাদের জাতীয় চরিত্রে বিশেষভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। অন্ততঃ তাঁহাদের পদানুসরণকারী ধর্ম্মপ্রচারকগণের হস্তে সংসার অপেক্ষা সন্ন্যাসেই যে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ হয় এইরূপ ধারণা সমাজ মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। ধর্ম্ম করিতে হয়, কাশী বৃন্দাবন যাও, গৈরিক বস্ত্র পরিধান কর, কমণ্ডলু গ্রহণ কর, স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ কর, সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ কর। "কা তব কান্তা কস্তে-পুত্রঃ" শঙ্করাচার্য্যের এই সন্ন্যাসবাদ দীর্ঘ নিশ্বাস-পূর্ব্বক যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে পারে সেই আমাদের দেশের ধার্ম্মিকপদবাচ্য। বানপ্রস্থ যে অবলম্বন করিল, সংসার যে ছাড়িল সেই ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইল। এই সন্ন্যাসবিপ্লুত দেশে এই মায়াবাদ যে দেশের কি অনিষ্ঠ করিয়াছে তাহা ভাষা দ্বারা বুঝান সুকঠিন। কর্ম্ম ও জ্ঞান, অবিদ্যা ও বিদ্যা পরস্পর বিসদৃশ, একের স্থানে অন্যের ঠাঁই নাই, ব্রহ্মবিদ্যা চাও ত বনে যাও এই মতবাদ আমাদের সমাজকে বহুকাল বিপ্লুত ও বিধ্বস্ত করিয়াছে। আমার যুবক বন্ধুদের কাহার কাহারও মধ্যে এখনও এই ঝোক বর্ত্তমান আছে। ইহাও বলিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হইবে না যে আধুনিক নব্য বঙ্গসমাজে যে স্রোত চলিয়াছে তাহাতেও সংসারবিমুখতা অথবা বৈরাগ্যের প্রতিই যেন অতিশয় আদর প্রদর্শিত হইতেছে। রামমোহন রায় ঈশোপনিষদের ঋষির মত মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সন্ধিস্থাপনের উদ্যোগ করিলেন। তিনি শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া সংসার ও ধর্ম্মের একত্ব ঘোষণা করিলেন, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মিলনভূমি প্রদর্শন করিলেন। অবিদ্যার ও বিদ্যার, সংসারধর্ম্মের ও ব্রহ্মজ্ঞানের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার গৌরবমণ্ডিত কর্ম্মময়জীবনে ব্রহ্মজ্ঞানের একত্র সমাবেশ দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিলেন। জীবনে এমন কোন বিভাগ ছিল না, সংসারধর্ম্মের এমন কোন কার্য্য ছিল না যাহাতে তিনি পূর্ণ উৎসাহের সহিত হস্তার্পণ না করিয়াছেন; অথচ সকল বিষয়ে জীবনের সকল কার্য্যেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অপরিসীম মহিমা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিতচিত্রে যখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন মহত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি তখন তাঁহাকে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বলিয়া বরণ করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি মাতৃভূমির দুর্দ্দশা ও দৈন্য দূর করিবার জন্য কতই না পরিশ্রম করিয়াছেন। আমাদের দেশের সমাজনীতি, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতির জন্য আমরা এখন যে সমস্ত সংস্কার প্রার্থী হইয়া রাজদ্বারে সজোরে আঘাত করিতেছি এবং সমাজবন্ধনকে বিলোড়িত করিতেছি, তন্মধ্যে এমন একটী বিষয়ও নাই যাহাতে রাজা রামমোহন হস্তক্ষেপ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে রাজা যে সমস্ত সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়া অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন আমরা আজ পর্য্যন্তও প্রায় সেই সকল বিষয় লইয়াই আন্দোলন করিতেছি। এক কথায় বলিতে গেলে রাজা নব্য বঙ্গের কেন, নব্যভারতেরও জন্মদাতা ও শিক্ষাগুরু ছিলেন।

রামমোহন রায়ের অশ্রান্ত চেষ্টায় লর্ড বেণ্টিকের সময় সতীদাহ প্রথা নিবারণ হয় এবং ভারতে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। সেই ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমরা অনেক সামাজিক দুর্গতির হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। বঙ্গীয় যুবক, বর্ত্তমান যুগের জন্মদাতা রাজা রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ কর, শীঘ্রই তোমাদের তমিস্রা রজনীর অবসান হইবে। ধর্ম্মে ঐকান্তিকতা, কর্ম্মে বিপুল উৎসাহ রামমোহন রায়ের জীবনকে মধুময় ও শক্তিশালী করিয়াছিল। ব্রহ্মনিষ্ঠার পীযুষধারা তাঁহার সমস্ত কার্য্যকে সবল ও সরস করিয়াছিল। তাঁহার জীবনচরিত পাঠে আমরা অবগত হই, তিনি যখন

গাড়ীতে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন তখনও সর্ব্বদা ধ্যানস্তিমিতনেত্রে অবস্থিত থাকিতেন। যুবকগণ, ভাবিয়া দেখ এই ব্রহ্মধ্যান তাঁহাকে এত শক্তিশালী করিয়াছিল।

নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। প্রত্যেক মানব ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী, এই সত্য প্রচার করিয়া তিনি ভারতে কেন সমস্ত জগতে এক আলোকমণ্ডিত নবযুগের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সার্ব্বভৌমিক ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়া আমাদের জাতিকে শক্তিশালী, গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি যবন সকলে এস ভ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ হইয়া এক নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা কর। যে জাতি, যে বর্ণ, যে সম্প্রদায়ভুক্ত হওনা কেন, সকলে এস সার্ব্বভৌমিকভাবে একমাত্র নিরাকার অগম্য অনাদ্যনন্ত পরমব্রহ্মের উপাসনা কর।" দাবানলে দগ্ধীভূত হইয়া অজগর সর্প যেমন গর্জ্জিয়া উঠে, আমাদের প্রাচীন সমাজ সেইরূপ গর্জ্জিয়া উঠিল,—ঘাটে মাঠে, বিদ্যালয়ে, বিচারালয়ে, টোলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে, সমৃদ্ধগণের বৈঠকখানার সর্ব্বত্র এক সাড়া "ধর্ম্ম লোপ পাইল, ধর্ম্ম লোপ পাইল।" সেই সময় এই বিপ্লবের মধ্যে একা রামমোহন দণ্ডায়মান, অভ্রচুম্বী মহীরুহের ন্যায় অচল অটল, গম্ভীর অথচ প্রশান্ত। রামমোহন রায়ের প্রভূত শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য ছিল। কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাত তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইল, তিনি অচল হিমাদ্রির মত কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। যে সময় তিনি এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন, সেই সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন "মহাশয়, আপনি যে সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, প্রতিমা পূজার অসারত্ব দেশের লোককে বুঝাইয়া দিতেছেন, তজ্জন্য গোঁড়া পৌত্তলিকেরা আপনার প্রতি এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছে যে, একদিন পথে তাহারা আপনাকে প্রহার করিবে।" রামমোহন এই কথা শুনিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন "আমাকে মারিবে? কলিকাতার লোক আমাকে মারিবে? তাহারা কি খায়!" আত্মশক্তিতে তাঁহার কি অটুট বিশ্বাস ছিল! এইরূপ বিশ্বজয়ী শৌর্য্য কমই দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তিপূজিতস্থল দেশে এইরূপ স্পর্দ্ধার ভাব আর কোথায়ও শুনি নাই। ধন্য রামমোহন, ব্রহ্মবিদ্যার তুমিই উপযুক্ত সেবক ছিলে।

রামমোহন কি উদ্দেশ্যে প্রবুদ্ধ হইয়া পৌত্তলিকতা বর্জ্জন ও ব্রহ্মসমাজ স্থাপন ও ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্ত্তন করেন তাঁহার লিখিত ট্রাষ্টডীড হইতে আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি। ইহা শুনিলেই আপনারা বুঝিবেন তাঁহার ধর্ম্মমত কত উদার, কত গভীর ও বিশাল ছিল। তিনি লিখিয়াছেন :—

'এই মন্দিরে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পাতা অনাদি অনন্ত অগম্য অপরিবর্ত্তনীয় পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে। কিন্তু কোন মানুষ কিম্বা সম্প্রদায়ের প্রদত্ত নামে তাঁহার উপাসনা হইবে না।

'এখানে বিনয়ের সহিত ভদ্রভাবে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যিনি আসিবেন এবং ব্যবহার করিবেন তিনিই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এখানে উপাসনা করার অধিকার পাইবেন।

এই মন্দিরে কি ইহার প্রাঙ্গণে কি বহির্দ্দেশে, কি নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন খোদিত মূর্ত্তি বা প্রতিমূর্ত্তি পট বা ছবি কিম্বা তৈলচিত্র অথবা তদ্রূপ অন্য কোন জিনিস দেওয়া হইবে না। এখানে কোন বলি বা নৈবেদ্য গৃহীত হইবে না। এখানে কোন প্রকার প্রাণিহিংসা হইবে না, ধর্ম্মোদ্দেশ্যে অথবা আহার-উদ্দেশ্যেও নহে। জীবনরক্ষার নিমিত্ত ভিন্ন এখানে কোন আহারবিহার বা ভোজ হইতে পারিবে না। যে কোন জীব বা মনুষ্য কিম্বা পদার্থ যদি কোন মানুষের কিম্বা সম্প্রদায়ের উপাস্য হয় তবে এখানকার বক্তৃতায় কি উপদেশে কিম্বা সঙ্গীতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ঘৃণা বা অবজ্ঞার সহিত তাহার প্রসঙ্গ করা হইবে না, কিন্তু যাহাতে জগতের স্রষ্টা পাতা পরমেশ্বরের ধ্যানধারণার উন্নতি হয়, প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া সাধুতার উন্নতি হয় এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ় হয়, এখানে তদ্রূপ উপাসনা প্রার্থনা বক্তৃতা ও সঙ্গীত হইতে পারিবে।'

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে ও ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্ত্তনে রামমোহন রায়ের যে মহান্ উদ্দেশ্য ছিল,

তাহা দেখাইবার জন্য আমি এখানে তাঁহার লিখিত ট্রাক্টগুলির অংশ বাহুল্যভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার শব্দে শব্দে রাজা রামমোহন রায়ের মহানুভবতা ও উদারতা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি বিশ্বাস করিতেন অমূর্ত্ত চিন্ময় ব্রহ্মের উপাসনা অমৃতের সোপান "অমৃতস্য এষ সেতুঃ"।

মুরশিদাবাদে থাকিতে, কেহ কেহ বলেন রংপুর থাকা-কালীন, তিনি সর্ব্ব প্রথম "তোহফতুল-মহদীন" নামক একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতেই সর্ব্বপ্রথম তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেন; তৎপর উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, কোরাণ, বাইবেল পাঠ করিয়া তাহাতে তিনি আরও দৃঢ়মত হন। সমস্ত উপনিষদ মন্থন করিয়া তিনি এক অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। উপনিষদসমূহের মহিমা তিনি সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। উপনিষদগুলি যে কি অক্ষয় জ্ঞানের ভাণ্ডার আমরা রাজার গবেষণার ফলেই কিঞ্চিৎ উপভোগ করিতেছি। আমার দুঃখ হয় বঙ্গীয় যুবকগণের এখনও এই অমূল্য রত্নরাশির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

রাজা রামমোহন রায় এই লুপ্তপ্রায় উপনিষদগুলি এদেশে প্রথম প্রচার করেন এবং কখন কখন অনুবাদ করিয়া বিতরণ করেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য অলৌকিক প্রতিভা স্মরণ করিলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়। উপনিষদগুলি ব্রহ্মজ্ঞানের মর্ম্মপ্রতিস্বরূপ। হায়, আমাদের কি দুর্দ্দশা, আমরা এমন অমূল্য রত্নের অধিকারী হইয়াও পানা ডোবা বিলে আত্মার পিপাসা মিটাইতে বদ্ধপরিকর রহিয়াছি। বঙ্গীয় যুবকগণ! তোমরা রাজা রামমোহন রায়ের চরিতচিত্র পাঠ কর, দেখিবে সেই মহাপুরুষ তোমাদের সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিবার পথগুলি কত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ সমস্ত জগৎকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আমেরিকার উন্নতিশীল খৃষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণ গ্রেটব্রিটেনের ইউনিটেরিয়ান মিশনারীগণ, জর্ম্মাণ দেশীয় ধর্ম্মযাজকগণ, পারস্য দেশের বাবী সম্প্রদায় সকলই রামমোহন রায়ের পন্থা অনুসরণ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকের প্রবাহিত ধর্ম্মস্রোত অনুধ্যান করিলে ইহাই প্রতীতি হয় রাজা বঙ্গদেশে যে ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা সর্ব্বদেশীয় মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হইতেছে। এই ভারতবর্ষেও বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোরদেশীয় স্বদেশবাসিগণ রাজার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। আমি একান্তমনে প্রার্থনা করি রাজা রামমোহন যে ব্রহ্মপূজার পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন আমার দেশবাসিগণ তাহা বহন করিবার শক্তি লাভ করুন। ইহাই আমাদের মুক্তির পথ ও মুক্তির সোপান। জাতীয় দুর্গতি বহুকালের পুঞ্জীকৃত কুসংস্কার চিরপোষিত কাপুরুষতা দূর করিবার অন্য কোন পন্থা নাই।

আজ মাঘোৎসব উপলক্ষে সকলের হৃদয়-তন্ত্রীতে একটী সুরই বাজিয়া উঠুক, সকল হৃদয়-তন্ত্রীও নিষ্ঠার সঙ্গে একটী মন্ত্রই অনুধ্যান করুক!

"তমেবৈকং জানথ আত্মানম্।

অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্য এষ সেতুঃ॥"

একমাত্র সেই আত্মাকেই জান, অন্য প্রসঙ্গ পরিত্যাগ কর, তিনিই অমৃত লাভের সেতুস্বরূপ।

রাজা রামমোহন নারী জাতির প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতলেখকগণ সকলেই এই কথার সাক্ষ্য দিতেছেন। তিব্বতদেশীয় রমণীগণের সাধু ব্যবহারই তাঁহার মনে এই শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কথিত আছে ধর্ম্মমত লইয়া রাজার সঙ্গে তিব্বতদেশীয় ধর্ম্মাচার্য্য লামাগণের সহিত মতভেদ হওয়ায় তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। রামমোহন তখন তিব্বতদেশীয় দয়াবতী নারীগণের করুণাতেই প্রাণে প্রাণে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ রমণীজাতির স্নেহপ্রবণ হৃদয়ই রাজাকে রমণীজাতির প্রতি ভক্তিমান করে।

রাজা আমাদের দেশের রমণীজাতির দুর্দ্দশা দেখিয়া বিরলে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। রাজার বিশাল হৃদয় সর্ব্বদাই নারীজাতির দুর্গতি নিবারণ জন্য প্রস্তুত ছিল। রমণীজাতির দুঃখবিমোচন জন্য তাঁহার অকরণীয় কিছুই ছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সতীদাহ নিবারণ তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। বহুবিবাহ নিবারণ জন্য তিনি অনেক যুক্তিতর্ক প্রদর্শন ও পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন :—

"নার্য্যস্তু যত্রপূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ ॥"

যে গৃহে নারীগণ প্রফুল্লচিত্ত ও পূজিত, তথায় দেবগণ চিরপ্রসন্ন।

বিধবা রমনীগণের জন্য রাজার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত। তিনি তাঁহাদের দায়াধিকারের জন্য কত খাটিয়াছেন এবং পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। রমনীজাতির শিক্ষার জন্য তিনি কত উৎসাহী ছিলেন। তিনি বলিতেন রমনীজাতি পুরুষের মত জ্ঞান ও বুদ্ধিতে তুল্যস্থল অধিকার করিতে সমর্থ। তাঁহার সমক্ষে কোন মহিলা উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে পূর্ব্বে আসন দিতেন এবং ঐ মহিলা আসন গ্রহণ করিলে তিনি উপবেশন করিতেন। রমনীজাতির প্রতি রাজার শ্রদ্ধা অতুলনীয় ছিল। আমরা কিন্তু এখন পর্য্যন্তও সর্ব্বসাধারণ নারীজাতির শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই। বালকদের জন্য শিক্ষার স্রোত যেমন প্রবলবেগে প্রবাহিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে, বালিকাদের জন্য আমরা তদ্রূপ কোন বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই বা তাহার বিশেষ একটা অভাব বোধ করিতেছি না। আমাদের বুঝা উচিত নারীজাতি সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ। তাহাদিগকে পশ্চাৎ ফেলিয়া আমরা যদি অগ্রসর হই তাহা হইলে আমাদের বিশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। আমরা যেন রমনীজাতির শিক্ষাপ্রচলনে শিথিলপ্রযত্ন না হই। আমাদের দেশীয় যুবকগণের দৃষ্টি আমি এই দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। এই বিষয়েও যুবকগণ! তোমরা রাজার পথ অনুসরণ কর। আমাদের মেয়েরা যেমন ঘর-কন্না করিবে তেমনি তাহারা ভাল বিষয়ে বক্তৃতা উপদেশ করিবে না কেন? গৃহে যেমন সমস্ত গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, স্কুল কলেজেও তেমনি শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিবে না কেন? রাজা রামমোহন এই আদর্শই রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের বিদুষী ও মনস্বিনী নারীগণ তাঁহারই আদর্শের ক্রমবিকাশের ফল। তিনি নারীজাতির মধ্যে ব্রহ্মেরই প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতেন এবং নারীজাতিকে পুরুষের সমান সম্মান করিতেন।

ব্রহ্মের উপাসনায় সঙ্গীতপ্রচলন রাজা রামমোহন রায়ের আর একটী সংস্কার। তদ্দ্বারা তিনি দেশবাসীকে অমৃতলোকের আভাস প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ব্রহ্মপূজার শ্রেষ্ঠতম উপাদান। রাজা সঙ্গীত বড়ই ভাল বাসিতেন। সর্ব্বদা তাঁহার নিকট সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি গমনাগমন করিতেন। গায়কগণ রাজার অভিপ্রায় না বুঝিয়া সময় সময় ব্রহ্মপূজায় কি ব্রহ্মধ্যানের বিরুদ্ধ সঙ্গীত গান করিতেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া বলিতেন "অলখ নিরঞ্জন গাও"। আহা, ব্রহ্মপূজায় তাঁহার কিরূপ দৃঢ়নিষ্ঠা ছিল। অন্যভাবের সঙ্গীত গীত হইলে রাজা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর রাজা কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল মাত্র এদেশে ছিলেন। যখন উপাসনামন্দিরে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইত গণ্ডপ্রবাহী অশ্রুধারা রাজার তন্ময়তা সূচিত করিত। "গানাৎ পরতরং নহি" বাক্যের সার্থকতা তাঁহার জীবনে বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মসঙ্গীত আজকাল আমাদের দেশে গৃহপঞ্জীর মত ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইতেছে। দেশবাসী এই সঙ্গীতগুলি গান করিয়া এবং শুনিয়া অক্ষয় তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিতেছেন।

রাজার স্বরচিত সঙ্গীতগুলি অতি হৃদ্য, অতি মনোহর। তাহাতে যুগপৎ বৈরাগ্য ও কর্ম্মের সমাবেশ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই।

রাজার একটী সঙ্গীতের আরম্ভ এইরূপ—"কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে।" তৎকালীন দেশীয় প্রথামতে রাজার বাউরি চুল ছিল। তিনি চুলগুলির খুব যত্ন করিতেন এবং অনেক সময় দর্পণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ কেশবিন্যাসে সময় যাপন করিতেন। রাজা প্রতিদিন স্নানের পর দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশবিন্যাসে অনেক সময় যাপন করিতেন। তাঁহার একজন শিষ্য তাঁহাকে উপহাসছলে বলিয়াছিলেন "মহাশয়, 'কত সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে' এই গানটী কি পরের জন্যই রচিত হইয়াছিল?" রাজা স্মিতমুখে বলিলেন—ঠিক বলিয়াছ, ঠিক বলিয়াছ। এই ঘট-

নাটী হইতেই প্রতীয়মান হয় রাজার ব্যবহার কেমন উদার ও মহৎ ছিল।

রাজার আর একটী সঙ্গীতের মুখবন্ধ এইরূপ "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর"। অপর একটী সঙ্গীতের আরম্ভ এইরূপ "একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ"। এই সব সঙ্গীত রাজার পরলোকবিশ্বাস সূচিত করিতেছে। মৃত্যুর বিভীষিকা কাহাকে না বিচলিত করে? প্রিয়জন যখন সংসারের বন্ধন-বিমুক্ত হয়ে পরপারে চলে যায় ধীরচিত্তে কে সেই বৃশ্চিকদংশন সহ্য করিতে পারে? প্রিয়জন-বিয়োগ-বিধুর কত নরনারী আজ এই স্থানে সম্মিলিত। কত নরনারী আজ প্রিয়জনবিয়োগে আত্মহারা হইয়া এই উৎসবক্ষেত্রে শান্তিপিপাসু হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতি রাজার উপদেশ শুনিলে বাস্তবিক প্রাণে আনন্দ ও উৎসাহ জাগিয়া উঠে। রাজা বলিতেছেন, হে ম্লান-মুখ, হে মলিনবদন, শোকার্ত্ত নরনারী সত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি ব্রহ্মপরায়ণ হও! তিনি বৈদিক ঋষির মত বলিতেছেন যে ব্রহ্মকে জানে সে—

তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং।
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥

শোকসাগর উত্তীর্ণ হয়, সকল কলুষ হইতে বিমুক্ত হয়, হৃদয়ের সন্দেহ তাহার বিদূরিত হয়। সে অমৃতময়ের প্রেমস্পর্শে অমৃত হয়। মৃত্যুযন্ত্রণা আর তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারে না। যুবকগণ, "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ" তোমরা এই ঋষিমন্ত্র স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা পরপারের জন্য প্রশান্তভাবে প্রস্তুত থাকিবে। ইহকাল যেমন হৃদ্য পরকালও তেমনই হৃদ্য। ব্রহ্মই সেতুস্বরূপ হইয়া উভয়লোক বিধৃত করিয়া রহিয়াছেন। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশাসন।

যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা তিনি ঋষিপদবাচ্য। আমাদের দেশে তপঃসিদ্ধ ঋষির অভাব নাই। কিন্তু সংসার ও ধর্ম্মকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া আধুনিক অসংখ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মৃতপ্রায়, অসার ও স্পন্দন-শূন্য ভারতের জন্য মৃত-সঞ্জীবনী সুধারূপ প্রাচীন অপূর্ব্ব বৈদিক মন্ত্র যাঁহার বিশাল হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল, যিনি একমাত্র পরাৎপর মঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতার অপার করুণার উপর নির্ভর করিয়া নিজ জীবনে শত সহস্র বাধা তুচ্ছ তৃণগুচ্ছের ন্যায় পদদলিত করতঃ সেই মন্ত্রের উদ্‌যাপনে অসীম সাহস ও শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া জীবনের সকল কার্য্যেই অসীম কৃতিত্ব ও অলৌকিক প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন এবং সফলতালাভে প্রতিপদবিক্ষেপেই ধন্য ও বরেণ্য হইয়াছেন, পুরাকালের একমাত্র রাজর্ষি জনক ব্যতীত তাঁহার দৃষ্টান্তস্থলে আর কাহারও নাম আমরা খুঁজিয়া পাই না। রাজর্ষি জনক যেমন রাজরাজেশ্বর হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ঋষি, প্রাচীন কালের সংসারনিস্পৃহ অথবা সংসারে বীতস্পৃহ ত্যাগী সন্ন্যাসী, অসংখ্য ঋষিগণের পুরোভাগে সংসার ও ধর্ম্মের সমন্বয়ের অতি সুন্দর মধুর শান্তিময় চিত্র; এযুগে রাজর্ষি রামমোহনের মধ্যে আমরা সেই ভাব পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়ি। নব্য ভারতের নিকট পুনরায় সময়ের অবস্থানুসারে এই মন্ত্র ঘোষণার প্রয়োজন হইয়াছিল। ধর্ম্ম লইয়া জগতে বাদবিসম্বাদের অন্ত নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই ধর্ম্মান্ধতা বা ধর্ম্মোন্মাদ মানবজাতির মধ্যে অসংখ্য মতবাদের সৃষ্টি করিয়া নানাবিধ জটিল রহস্যের সৃষ্টি করিয়া জাতিতে জাতিতে দারুণ ঈর্ষ্যা ও শত্রুতার সৃষ্টি করিয়াছে। এমন কি এই সুন্দর ধরণীর বক্ষ শোণিতস্রোতে রঞ্জিত করিতেও বিরত হয় নাই। ধর্ম্মের নামে এত অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই চিরবিবদমান মানবজাতির নিকট ধর্ম্মের মূলসূত্র ও সকল মানবজাতির মিলনভূমি, উপনিষদের ঋষির ন্যায় যিনি দিব্য চক্ষে দেখিয়া এই বিচিত্র ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ভারতে পৃথিবীর সকল জাতির সম্মিলনক্ষেত্র বুঝিতে পারিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে প্রচার করিয়া দিয়াছেন, তিনি আর কেহই নহেন, তিনিই রাজর্ষি রামমোহন।

পুরাণকল্পিত সমুদ্রমন্থনে বিশ্বপ্লাবী হলাহলের উদ্ভবের শেষে অমৃতভাণ্ড করে লইয়া ধন্বন্তরি যেমন উদ্ভূত হইয়াছিলেন, অথবা লোকমনোহর চন্দ্র যেমন অমৃত রশ্মিতে বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন ধর্ম্মান্ধতাহলাহলে মুহ্যমান সমস্ত মানবজাতির নিকট রাজর্ষি রামমোহন রায় সেইরূপ এই অপূর্ব্ব অমৃতপূর্ণ trust deed

হস্তে এই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে ততই এই trust deed ধন্বন্তরির সুমধুর সুধা-ভাণ্ডের ন্যায়, এই চন্দ্রের অমৃত রশ্মির ন্যায় মানবসমাজের নিকট সমাদৃত হইতেছে; এ আশা করা অসঙ্গত নহে যে সুদূর ভবিষ্যতে ইহার স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়ায় সমগ্র মানবজাতি পূর্ণ শান্তি ও পরা তৃপ্তি লাভ করিবে।

রাজর্ষি রামমোহন এমনই অপূর্ব্ব অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী যে তিনি যে হৃদয়ে সমস্ত মানবজাতির অশেষ কল্যাণ চিন্তা করিয়াছেন সেই হৃদয়েই স্বদেশের দারুণ দুর্দ্দশা ভাবিয়া তাহা মোচনের সদুপায় উদ্‌ঘাটনে ও তদবলম্বনে মুহূর্ত্তের জন্য বিরক্ত হন নাই। তাই আমরা এই মহামনা ঋষির নিকটই আমাদের দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা মোচনের যত কিছু সদুপায় অবলম্বনের সূত্রপাত দেখিতে পাই।

বস্তুতঃ আধুনিক ভারতে বা বঙ্গে যে সমস্ত বিষয়ের আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে জাতীয় congress, conferenceই বল homerule propaganda বল, শিল্পসমিতি, শিক্ষাসমিতিই বল, যে দিকেই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওনা কেন, হে যুবকবৃন্দ, সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষেত্রেই রাজর্ষি রামমোহনের অঙ্গুলিসঙ্কেত পরিদৃষ্ট হইবে। আমরা এই মনীষীর প্রচার এতদিনের শিক্ষার পরেও ছাড়াইয়া উঠিতে পারি নাই এবং এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার আধার, এমন সর্ব্বগুণাকর মনুষ্য যে এদেশে এমন শোচনীয় অধঃপতনের সময়ও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই বিস্ময়কর বোধ হয়। আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, যুবকগণ তোমরা সকল বিষয়ে রাজা রামমোহনকে অনুসরণ করিয়া জ্ঞানে ও ধর্ম্মে এক একটী জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইয়া জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল কর।

করুণা।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

জননী! করুণা তব চিরদিন,—নাহি
দেশ-কাল পাত্র; লক্ষধারায় পড়িছে,
ঝরিয়া আকাশ হইতে ভূতলে; আমি
অবোধ—আমি জানি না গো কিছু; নীরবে
যেন করি যাই তব কাজ,—আজ্ঞা তব
বহিয়া;
তোমারি করুণা নিশীথাকাশে
তারকা হইয়া ফুটে;—তোমারি করুণা
লক্ষশত ফুলদলে ঝরি' লুটে;—এ যে
তোমারি করুণা-প্রদীপ জ্বলে গো নিত্য
জননী-বুকে, প্রিয়ার প্রেমে, পুত্র-স্নেহে;
করুণা-নির্ঝর তব প্রতি নিমেষেই
ঝরে জীবনে; হে আনন্দময়ী জননী!
কথা নাহি মম—গীতি নাহি মম কণ্ঠে
শ্রীচরণ ধরি যেন নিতি মম বক্ষে॥

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

দশম প্রকরণ।

কর্ম্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কর্ম্মবন্ধন কি, কর্ম্মক্ষয় কাহাকে বলে এবং তাহা কি প্রকারে ও কখন্ হয়, ইহা বলিয়াছি। এখন উপস্থিতপ্রসঙ্গে, যাহাদের কর্ম্মফল নষ্ট হইয়াছে তাহারা এবং যাহারা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় নাই তাহারা মৃত্যুর পর বৈদিক ধর্ম্মানুসারে কোন্ গতি প্রাপ্ত হয় ইহার একটু বিচার করিয়া এই প্রকরণ শেষ করিব। এই সম্বন্ধে উপনিষদে অনেক আলোচনা হইয়াছে (ছাং. ৪. ১৫; ৫. ১০; বৃ. ৬. ২. ২-১৬; কৌ. ১. ২-৩) তাহাদের একবাক্যতা বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয়:পাদে করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনা বিবৃত করিবার এখানে কোন প্রয়োজন নাই। কেবল ভগবদ্‌গীতায় যে দুই মার্গ (গী. ৮. ২৩-২৭) প্রদত্ত হইয়াছে সেই সম্বন্ধেই এক্ষণে আমাদের বিচার কর্ত্তব্য। বৈদিক ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই প্রসিদ্ধ ভেদ আছে। তন্মধ্যে, কর্ম্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র ইত্যাদি বৈদিক দেবতাদিগকে যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিয়া, তাঁহাদের প্রসাদে ইহলোকে পুত্র-পৌত্রাদি সন্ততি এবং গো অশ্ব ধনধান্যাদি সম্পত্তি লাভ করিয়া শেষে মৃত্যুর পর সদ্‌গতি লাভ করা। বর্ত্তমানকালে এই যাগযজ্ঞাদি শ্রৌত ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হওয়ায় উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য দেবভক্তি ও দানধর্ম্মাদি শাস্ত্রোক্ত পুণ্যকর্ম্ম লোকে করিয়া থাকে। ঋগ্বেদ হইতে স্পষ্ট

দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে লোক শুধু স্বার্থের জন্য নহে, সমস্ত সমাজের কল্যাণার্থও যজ্ঞের দ্বারাই দেবতাদের আরাধনা করিত। উক্ত কার্য্যের জন্য যে দেবতার আনুকূল্য সম্পাদন করিতে হয় সেই ইন্দ্রাদি দেবতাদের স্তবস্তুতির দ্বারাই ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি পূর্ণ; এবং তাহাতে স্থানে স্থানে "হে দেব! আমাদিগকে সন্ততি দেও, সমৃদ্ধি দেও" "আমাদিগকে শতায়ু কর" "আমাদিগকে, আমাদের সন্তানসন্ততিকে, আমাদের বীরপুরুষদিগকে এবং আমাদের গরুবাছুরকে মারিও না" এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে।* এই যাগযজ্ঞ তিন বেদেরই বিধান হওয়ায় এই মার্গের পুরাতন নাম—'ত্রয়ীধর্ম্ম'; এই যজ্ঞ কিরূপে করিতে হইবে ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কিন্তু বিভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থে যজ্ঞের বিভিন্ন বিধি বর্ণিত থাকায় কোন্‌টি গ্রাহ্য তৎসম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল; তাই জৈমিনি এই পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যগুলির সমন্বয় কিরূপে করা যাইবে তৎসম্বন্ধীয় অর্থনির্ণায়ক নিয়মসমূহের সংগ্রহ করিলেন। জৈমিনির এই নিয়মকেই 'মীমাংসা সূত্র' কিংবা 'পূর্ব্ব মীমাংসা' বলে; এবং সেই জন্য এই প্রাচীন কর্ম্মকাণ্ডের নাম পরে 'মীমাংসক মার্গ' হইয়াছে; ঐ নামই এক্ষণে প্রচলিত হওয়ায় আমিও এই গ্রন্থে অনেকবার উহার উপযোগ করিয়াছি। কিন্তু 'মীমাংসা' শব্দই পরে প্রচলিত হইলেও যাগযজ্ঞাদির এই মার্গ অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, ইহা মনে রাখা উচিত। এই কারণে গীতায় 'মীমাংসা' শব্দ কোথাও আসে নাই; তাহার বদলে 'ত্রয়ীধর্ম্ম' (গী. ৯. ২০, ২১) কিংবা 'ত্রয়ী বিদ্যা' নাম আসিয়াছে। যাগযজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম্মপ্রতিপাদক ব্রাহ্মণগ্রন্থাদির পরবর্ত্তী বৈদিক গ্রন্থ—আরণ্যক ও উপনিষদ। ইহাতে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম গৌণ ও ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়ায় ইহার ধর্ম্মকে 'জ্ঞানকাণ্ড' বলা হয়। তথাপি, বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন বিচার থাকায় উহাদেরও সমন্বয় করা আবশ্যক হয়। এই কার্য্য বাদরায়ণাচার্য্য স্বকীয় বেদান্তসূত্রে করিয়াছেন। এই গ্রন্থকে ব্রহ্মসূত্র কিংবা শারীরসূত্র বা উত্তরমীমাংসা বলে। এই প্রকার পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা অনুক্রমে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে প্রধান গ্রন্থ। বস্তুতঃ এই দুই গ্রন্থ মূলে, মীমাংসারই অর্থাৎ বৈদিক বচনাদির অর্থের আলোচনা করিয়া থাকে। তথাপি কর্ম্মকাণ্ডপ্রতিপাদককে শুধু 'মীমাংসক' এবং জ্ঞানকাণ্ডপ্রতিপাদককে 'বেদান্তী' বলাই এক্ষণে রীতি হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড-ওয়ালারা অর্থাৎ মীমাংসকেরা বলেন যে শ্রৌতধর্ম্মে চাতুর্ম্মাস্য, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মই প্রধান; এবং তাহা যে ব্যক্তি করিবে, তাহারাই বেদের আদেশ অনুসারে মোক্ষলাভ করে। এই যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম কেহই ছাড়িতে পারিবে না। যদি ছাড়ে, তবে শ্রৌত ধর্ম্ম হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইল এইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ, জগতের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বৈদিক যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়াছে; এবং মনুষ্য যজ্ঞ করিয়া দেবতাদিগকে তৃপ্ত করিবে, এবং দেবতারাও মনুষ্যের যে যে বিষয় আবশ্যক তাহা পূরণ করিবেন, এই চক্র অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে আমি এই বিচারের বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে করি না, কারণ, যাগযজ্ঞরূপ শ্রৌতধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত নাই। কিন্তু গীতাকালের অবস্থা ভিন্ন হওয়ায় ভগবদ্‌গীতাতেও (গী. ৩. ১৬-২৫) যজ্ঞকর্ম্মের মাহাত্ম্য উপরি-উক্ত-অনুসারেই বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি গীতা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, সে সময়েও উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষদৃষ্টিতে এই যজ্ঞকর্ম্মাদির গৌণত্ব উপলব্ধ হইয়াছিল (গী. ২. ৪১-৪৬)। এবং এই গৌণত্বই অহিংসাধর্ম্মের বিস্তারের পর ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছিল। যাগযজ্ঞ বেদবিহিত হইলেও তাহার জন্য পশুবধ প্রশস্ত নহে, ধান্যের দ্বারাই যজ্ঞ করিবে, এইরূপ ভাগবতধর্ম্মে স্পষ্ট প্রতিপাদন করা হইয়াছে (মভা. শাং. ৩৩৬. ১০, ৩৩৭ দেখ)। সেই জন্য (এবং কিয়দংশে পরে জৈনেরাও এইরূপ কথাই উত্থাপন করায়) এখনকার কালে শ্রৌত যজ্ঞমার্গের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, নিত্য শ্রৌতাগ্নিহোত্রপালনকারী অগ্নিহোত্রী কাশীর ন্যায় বড় বড় ধর্ম্মক্ষেত্রেও খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়; এবং দশ কুড়ি বৎসরের মধ্যে জ্যোতিষ্টোমাদি পশু যজ্ঞ হইয়াছে বলিয়া কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। তথাপি শ্রৌতধর্ম্মই সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মের মূল হওয়ায় তৎসম্বন্ধে আদরবুদ্ধি অদ্যাপি বজায় আছে এবং জৈমিনীয় সূত্র অর্থনির্ণায়ক শাস্ত্রে তৌলের উপর প্রমাণ গণ্য হয়। শ্রৌত যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্ম এইরূপ শিথিল হইলেও মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থে বর্ণিত অন্য যজ্ঞ—যাহাকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলে—অদ্যাপি প্রচলিত আছে এবং এই সম্বন্ধেও উক্ত শ্রৌতযাগযজ্ঞচক্রাদিরই উক্ত নিয়ম প্রযুক্ত হয়। উদাহরণ যথা, মন্বাদি স্মৃতিকারেরা বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞ, হোমরূপ দেবযজ্ঞ, বলিরূপ ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসন্তর্পণরূপ মনুষ্যযজ্ঞ, এইরূপ পাঁচ অহিংসাত্মক ও নিত্য গৃহযজ্ঞের কথা বলিয়াছেন; এই পাঁচ যজ্ঞেই অনুক্রমে ঋষি, পিতৃগণ, দেবতা, ভূত ও মনুষ্যাদিগকে প্রথমে তৃপ্ত করিয়া তাহার পর গৃহের কোন এক স্থানে নিজে অন্ন

---

* এই মন্ত্র অনেক স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু সে সমস্ত না দিয়া এই প্রচলিত মন্ত্রটি এই স্থানে বলিলেই যথেষ্ট—"মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে॥" (ঋ. ১. ১১৪. ৮)

গ্রহণ করিবে এইরূপ গার্হস্থ্যধর্ম্মের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে (মনু. ৩. ৬৮-১২৩)। এই যজ্ঞ করিয়া যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম 'অমৃত'; এবং সমস্ত লোকের আহার হইয়া যে অন্ন উদ্‌বৃত্ত হয় তাহাকে 'বিঘস' বলে (মনু. ৩. ২৮৫)। এই 'অমৃত' ও 'বিঘস' অন্নই গৃহস্থের পক্ষে বিহিত ও শ্রেয়স্কর। এইরূপ না করিয়া যে কেহ কেবল আপনার উদরের জন্য অন্ন পাক করিয়া খায় সে অঘ অর্থাৎ পাপ ভক্ষণ করে, এবং তাহাকে মনুস্মৃতি ঋগ্‌বেদ ও গীতা প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই 'অঘাশী' বলা হইয়াছে (ঋ. ১০. ১১৭. ৬; মনু. ৩. ১১৮; গী. ৩. ১৩)। এই স্মার্ত্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ ছাড়া দান, সত্য, দয়া, অহিংসা প্রভৃতি সর্ব্বভূতহিতপ্রদ অন্য ধর্ম্মও উপনিষদে ও স্মৃতিগ্রন্থে গৃহস্থের পক্ষে বিহিত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে (তৈ. ১. ১১); এবং তাহাতেই, পরিবারের বৃদ্ধি করিয়া বংশ বজায় রাখিবে—'প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ'—এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সমস্ত কর্ম্মকে একপ্রকার যজ্ঞ বলিয়াই মানা যায় এবং তাহা করিবার কারণ তৈত্তিরীয় সংহিতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ জন্মতই আপনার পৃষ্ঠের উপর তিন প্রকার ঋণ লইয়া আসে—এক ঋষিদের, দ্বিতীয় দেবতাদিগের ও তৃতীয় পিতৃগণের। তন্মধ্যে ঋষিদের ঋণ বেদাভ্যাসে, দেবতাদের ঋণ যজ্ঞের দ্বারা এবং পিতৃগণের ঋণ পুত্রোৎপত্তির দ্বারা শোধ করা আবশ্যক, নচেৎ তাহার সদ্‌গতি হইবে না (তৈ. সং. ৬. ৩. ১০. ৫)*। জরৎকারু যখন এই প্রকার না করিয়া বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন তখন সন্তানক্ষয় প্রযুক্ত তাঁহার যাযাবর নামক পিতৃপুরুষ আকাশে ঝুলিয়া আছেন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল এবং তাঁহার আদেশক্রমে পরে তিনি বিবাহ করিলেন, এইরূপ মহাভারতের আদি পর্ব্বে এক কথা আছে (মভা. আ. ১৩)। এই সমস্ত কর্ম্ম অথবা যজ্ঞ কেবল ব্রাহ্মণদিগেরই করিতে হইবে এরূপ নহে। বৈদিক যাগযজ্ঞ ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্ম যথাধিকার স্ত্রী শূদ্রের পক্ষেও বিহিত হওয়ায় স্মৃতিকারদিগের কথিত চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞ; উদাহরণ যথা, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধও এক যজ্ঞ, যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাপক অর্থ এই প্রকরণে বিবক্ষিত হইয়াছে। যাহার পক্ষে যাহা বিহিত, তাহাই তাহার তপ (১১. ২৩৬) এইরূপ মনু বলিয়াছেন। মহাভারতেও—

আরম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রাশ্চ হবির্যজ্ঞা বিশঃ স্মৃতাঃ।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাশ্চ জপযজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ॥

আরম্ভ (উদ্যোগ), হবি, সেবা ও জপ এই চার যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও ব্রাহ্মণ এই চার বর্ণের পক্ষে যথানুক্রমে বিহিত এইরূপ উক্ত হইয়াছে (মভা. শাং. ২৩৭. ১২)। সার কথা, এই জগতের সমস্ত মনুষ্য এবং তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যজ্ঞার্থই ব্রহ্মদেব সৃষ্টি করিয়াছেন (মভা. অনু. ৪৮. ৩; ও গী. ৩. ১০ ও ৪. ৩২ দেখ)। ফলত চাতুর্বর্ণ্যাদি সমস্ত শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই একপ্রকার যজ্ঞ; এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ অধিকারানুসারে এই যজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম—ধন্দা, ব্যবসায় বা কর্ত্তব্য ব্যবহার যদি তাহারা প্রচলিত না রাখে তাহা হইলে সমস্ত সমাজের ক্ষতি হইয়া অবশেষে তাহার ধ্বংস হইবারও সম্ভাবনা হইয়া থাকে। তাই এই ব্যাপক অর্থে সিদ্ধ হইতেছে যে, লোকসংগ্রহার্থ যজ্ঞের আবশ্যকতা সর্ব্বদাই হইয়া থাকে।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে যে, যদি বেদ-অনুসারে এবং চাতুর্বর্ণ্যাদি স্মার্ত্ত ব্যবস্থানুসারে গৃহস্থের পক্ষে সেই যজ্ঞপ্রধান বৃত্তি বিহিত বলিয়া স্বীকৃত হইল যে সমস্ত কর্ম্মময়, তবে কি এই সাংসারিক কর্ম্ম ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি (অর্থাৎ নীতি ও ধর্ম্মের আদেশ অনুসারে) করিলে তাহার দ্বারাই মনুষ্য জন্ম-মরণের ফের হইতে মুক্ত হয়? আর যদি বলা যায় যে সে মুক্ত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের মাহাত্ম্য যোগ্যতা কি রহিল? ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হইয়া কর্ম্মে বিরক্ত না হইলে নামরূপাত্মক মায়া হইতে কিংবা জন্মমরণের ফের হইতে মুক্তি নাই, এইরূপ জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ্‌ স্পষ্ট বলেন; এবং শ্রৌতস্মার্ত্ত ধর্ম্ম যদি দেখ, তবে প্রত্যেকের সমস্ত জীবন কর্ম্মপ্রধান কিংবা ব্যাপকার্থে যজ্ঞময়, এইরূপ দেখা যায়। তাছাড়া যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধক হয় না এবং যজ্ঞের দ্বারাই স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এইরূপ বেদও স্পষ্ট বলিয়াছেন। স্বর্গের কথা একপাশে সরাইয়া রাখিলেও ইন্দ্রাদি দেবতারা সন্তুষ্ট না হইলে বৃষ্টি পড়ে না এবং যজ্ঞ না করিলে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন না, এইরূপ নিয়ম ব্রহ্মদেব স্থাপন করিয়াছেন। তবে যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্যের কাজ চলিবে কি করিয়া?

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

"যজ্ঞে হুত দ্রব্যাদি অগ্নি দ্বারা সূর্য্যের নিকট পৌঁছায় এবং সূর্য্য হইতে পর্জন্য, পর্জন্য হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়" ইহলোকে মনুস্মৃতি, মহাভারত, উপনিষদ ও গীতাতে এইরূপ ক্রম দেওয়া হইয়াছে (মনু ৩. ৭৬; মভা. শাং. ২৬২. ১১; মৈত্র্য. ৬. ৩৭; ও গী. ৩. ১৪ দেখ)। এবং এই যজ্ঞ যদি কর্ম্মের দ্বারাই সাধ্য হয় তবে কর্ম্ম ছাড়িলে কাজ চলিবে কি করিয়া?

* তৈত্তিরীয় সংহিতার বচনটি এই—"জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবা জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণর্ষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারিবাসীতি"।

যজ্ঞময় কর্ম্ম ছাড়িলে জগতের চক্র বন্ধ হইয়া যাইবে, কেহ খাইতেও পাইবে না! ইহার উত্তরে ভাগবত ধর্ম্ম ও গীতা শাস্ত্র বলেন যে, যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কিংবা অন্য কোন স্মার্ত্ত বা ব্যবহারিক যজ্ঞময় কর্ম্ম ছাড়ো আমরা এ কথা বলি না; অধিক কি, পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে এই যে যজ্ঞের চক্র ইহা বন্ধ হইয়া গেলে জগৎ উৎসন্ন হইবে, তোমাদের এই কথা আমাদেরও মান্য। তাই, কর্ম্মপর যজ্ঞ কখনই ত্যাগ করা উচিত নহে ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত (মভা. শাং. ৩৪০; গী. ৩. ১৬)। কিন্তু জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় না হইলে মোক্ষ নাই এইরূপ জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তাই, এই দুই সিদ্ধান্ত মিলাইয়া সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ ফলাশা ছাড়িয়া নিষ্কাম কিংবা বিরক্ত বুদ্ধিতে করিতে হইবে ইহাই আমাদের শেষ কথা (গী. ৩. ১৭-১৯ দেখ)। স্বর্গফলের কাম্য বুদ্ধি মনে স্থাপন করিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি যাগযজ্ঞ করিলে, বেদের কথা অনুসারে তুমি স্বর্গফল পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, বেদাজ্ঞা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু স্বর্গফল নিত্য অর্থাৎ স্থায়ী হয় না বলিয়া উক্ত হইয়াছে—

প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥*

"ইহলোকে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের ফল স্বর্গ-ভোগের দ্বারা শেষ হইলে, যজ্ঞকারী কর্ম্মকাণ্ডী প্রাণীকে স্বর্গলোক হইতে এই কর্ম্মলোকে অর্থাৎ ভূলোকে পুনর্ব্বার আসিতে হয় (বৃ. ৪. ৪. ৬; বেসূ. ৩. ১. ৮; মভা. বন. ২৬০. ৩৯) এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গ হইতে নীচে আসিবার কোন্ রাস্তা তাহাও ছান্দোগ্য-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (ছাং. ৫. ১০. ৩-৯)। "কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ" কিংবা "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" (গী. ২. ৪৩, ৪৫) এইরূপ কিছু গৌণত্বসূচক যে বর্ণনা ভগবদ্গীতায় আছে তাহা এই কর্ম্মকাণ্ডী লোকদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা; এবং নবম অধ্যায়ে আরও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, "গতাগতং কামকামা লভন্তে" (গী. ৯. ২১)—তাহাদিগকে স্বর্গলোকে ও ইহলোকে—যাতায়াত করিতে হয়। এই যাতায়াত জ্ঞানপ্রাপ্তি ব্যতীত ঘুচে না। এই যাতায়াত না ঘুচিলে আত্মার প্রকৃত শান্তি, পূর্ণাবস্থা কিংবা মোক্ষলাভ হয় না। তাই, গীতার সমস্ত উপদেশের সার এই যে, শুধু যাগযজ্ঞাদি কেন, চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমস্ত কর্ম্মই তুমি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা ও সাম্যবুদ্ধির দ্বারা আসক্তি ছাড়িয়া কর, এই প্রকারে কর্ম্মচক্র বজায় রাখিয়াও তুমি মুক্ত হইবে (গী. ১৮. ৫, ৬)। দেবতাদের উদ্দেশে, তিল তণ্ডুল কিংবা পশু "ইদং অমুকদেবতায়ৈ ন মম" বলিয়া অগ্নিতে হবন করিলেই যজ্ঞ হয় এরূপ নহে। প্রত্যক্ষ পশুবধ করা অপেক্ষা প্রত্যেকের শরীরে কাম-ক্রোধাদি যে পশুবৃত্তি আছে, সাম্যবুদ্ধিরূপ সংযম-অগ্নিতে তাহাদের হোম করাই অধিক শ্রেয়স্কর যজ্ঞ (গী. ৪. ৩৩)। এই অভিপ্রায়েই "যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ গীতায় ও নারায়ণীয়ধর্ম্মে ভগবান্ বলিয়াছেন (গী. ১০. ২৫; মভা. শাং. ৩৩৭)। মনুস্মৃতিতেও জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করে—তারপর আর যাহা করুক বা না করুক,—এইরূপ উক্ত হইয়াছে (মনু. ২. ৮৭)। অগ্নিতে আহুতি দিবার সময় 'ন মম'—ইহা আমার নয়—এইরূপ বলিয়া উক্ত দ্রব্যের উপর নিজের মমত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করাই যজ্ঞের মুখ্য তত্ত্ব; এবং দানাদি কর্ম্মেরও ইহাই বীজ, তাই এই কর্ম্মের যোগ্যতাও যজ্ঞের সহিত সমান। অধিক কি, যাহাতে নিজের কিছু মাত্র স্বার্থ নাই এইরূপ কর্ম্ম শুদ্ধ বুদ্ধিতে করিলে তাহাকে যজ্ঞ বলিলেও চলে। যজ্ঞের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে, বুদ্ধিকে নির্ম্মম কিংবা নিষ্কাম রাখিয়া অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই ব্যাপক অর্থে—যজ্ঞ; এবং দ্রব্যময় যজ্ঞের পক্ষপাতী মীমাংসকের 'যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, বন্ধকারণ হয় না' নিয়মসূত্র সমস্ত নিষ্কাম কর্ম্মেও প্রযুক্ত হয়। এই কর্ম্ম করিবার সময় ফলাশাও ত্যাগ করা প্রযুক্ত স্বর্গের যাতায়াত ঘটে না এবং এই কর্ম্ম করিলেও শেষে মোক্ষরূপ সদ্গতি লাভ হয় (গী, ৩, ৯)। সার কথা, সংসার যজ্ঞময় কিংবা কর্ম্মময় হইলেও কর্ম্ম অনুষ্ঠানকারীদিগকে দুই বর্গে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। এক, শাস্ত্রোক্তরীতিতে কিন্তু ফলাশা রাখিয়া যাহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে (কর্ম্মকাণ্ডী লোক); আর এক, নিষ্কাম বুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া যাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে (জ্ঞানী লোক)। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ নিছক কর্ম্মকাণ্ডী লোকদিগের স্বর্গপ্রাপ্তির ন্যায় অনিত্য ফল, এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা কিংবা নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্মকারী জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিত্য মোক্ষফল লাভ হয়, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত। মোক্ষের জন্য কর্ম্ম ছাড়িতে গীতা কোথাও বলেন নাই। উল্টা, অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, 'ত্যাগ = ছাড়া' শব্দে গীতাতে কর্ম্মত্যাগের পরিবর্ত্তে ফলত্যাগই সর্ব্বত্র বিবক্ষিত।

কর্ম্মকাণ্ডী ও কর্ম্মযোগীদিগের প্রাপ্য ফল বিভিন্ন হওয়ায়, প্রত্যেককে, মৃত্যুর পর ভিন্ন ভিন্ন পথদিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে যাইতে হয়। এই মার্গের নাম অনুক্রমে 'পিতৃযান' ও দেবযান' (শাং. ১৭,

* এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণ পড়িবার সময় 'পুনরেতি' এবং 'অস্মৈ' এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া পড়িলে এই চরণে অক্ষরের কমী পড়িবে না। বৈদিক গ্রন্থ পড়িবার সময় অনেক সময় এইরূপ করা আবশ্যক হয়।

১৫, ১৬ দেখ); এবং উপনিষদের ভিত্তিতে এই দুই মার্গই গীতার অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। যাহার জ্ঞানলাভ হইয়াছে সেই ব্যক্তির—এবং এই জ্ঞান অন্ততঃ অন্তিমকালে তো অবশ্যই হইয়া গিয়াছে (গী. ২. ৭২)—শরীর মৃত্যুর পর চিতায় দগ্ধ হইলে, সেই অগ্নি হইতে জ্যোতি (জ্বালা), দিবা, শুক্লপক্ষ, এবং উত্তরায়ণের ছয় মাসে—প্রয়াণ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মপদে গিয়া পৌছায় এবং সেখানে তাহার মোক্ষলাভ হওয়ায় সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া এই মৃত্যুলোকে ফিরিয়া আসে না; কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু কর্ম্মকাণ্ডী অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হয় নাই, সে সেই অগ্নি হইতে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয় মাস এই ক্রমানুসারে চলিয়া চন্দ্রলোকে পৌছিয়া তাহার কৃত পুণ্যের সমস্ত ফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে; এই দুই মার্গের এইরূপ ভেদ (গী. ৮. ২৩-২৭)। 'জ্যোতি' (জ্বালা) শব্দের স্থানে উপনিষদে 'অর্চ্চি' (জ্বালা) এই শব্দ থাকায় প্রথম মার্গের "অর্চ্চিরাদি" এবং দ্বিতীয়ের 'ধূম্রাদি' এইরূপ নামও আছে। আমাদের উত্তরায়ণ উত্তর ধ্রুবস্থানে অবস্থিত দেবতাদের দিন এবং আমাদের দক্ষিণায়নই তাহাদের রাত্রি, এই পরিভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই দুই মার্গের মধ্যে অর্চ্চিরাদি (জ্যোতিরাদি) কিংবা প্রথম মার্গ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশময় এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ ধূম্রাদি মার্গ অন্ধকারাচ্ছন্ন, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। জ্ঞান প্রকাশময় এবং পরব্রহ্ম 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' (গী. ১৩. ১৭)—জ্যোতির জ্যোতি—হওয়া প্রযুক্ত মৃত্যুর পর জ্ঞানী ব্যক্তির মার্গ প্রকাশময় হওয়াই সঙ্গত; গীতায় এই দুই মার্গের—'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' এই যে দুই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, প্রকাশময় ও অন্ধকারময়ই তাহার অর্থ। গীতায় উত্তরায়ণের পরবর্ত্তী পৈঠার উল্লেখ নাই। কিন্তু যাস্কের নিরুক্তে উদগয়নের পর দেবলোক, সূর্য্য, বৈদ্যুত, ও মানস পুরুষের বর্ণনা আছে (নিরুক্ত ১৪. ৯); এবং উপনিষদে দেবযানের যে বর্ণনা আছে তাহার সমন্বয় করিয়া বেদান্তসূত্রে উত্তরায়ণের পরে সম্বৎসর, বায়ুলোক, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও পরিশেষে ব্রহ্মলোক এইরূপ পরবর্ত্তী সমস্ত পৈঠা প্রদত্ত হইয়াছে (বৃহ. ৫. ১০; ৬. ২. ১৫; ছাং. ৫. ১০; কৌষী. ১. ৩; বেসূ. ৪. ৩. ১-৬)।

দেবযান ও পিতৃযান এই দুই মার্গের পৈঠা বা আড্ডার বর্ণনা করা হইল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে দিবস, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ প্রভৃতির যে বর্ণনা আছে তাহার সাধারণ অর্থ কালবাচক হওয়ায় দেবযান ও পিতৃযান এই দুই মার্গের সহিত কালের কোন সম্বন্ধ আছে কিংবা প্রথমে কখন ছিল কি না, এই প্রশ্ন স্বভাবতই উপস্থিত হয়। দিন, রাত্রি, শুক্লপক্ষ প্রভৃতি শব্দের অর্থ কালবাচক হইলেও অগ্নি, জ্যোতি, বায়ুলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অন্য যে সকল পৈঠা বর্ণিত হইয়াছে তাহাদের অর্থ কালবাচক হইতে পারে না; এবং জ্ঞানী ব্যক্তি দিন কিংবা রাত্রে মরিলে তাঁহার ভিন্ন গতি লাভ হয় এইরূপ মানিলে জ্ঞানেরও কোন মাহাত্ম্য থাকে না। তাই, অগ্নি দিন উত্তরায়ণ প্রভৃতি সমস্ত শব্দই কালবাচক স্বীকার না করিয়া বেদান্তসূত্রে ঐ সকল শব্দের দ্বারা তত্তদভিমানী দেবতা কল্পনা করিয়া এই সকল দেবতা, জ্ঞানী ও কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তির আত্মাকে বিভিন্ন মার্গ দিয়া ব্রহ্মলোকে ও চন্দ্রলোকে লইয়া যান, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (বেসূ. ৪. ২. ১৯—২১; ৪. ৩. ৪)। কিন্তু এই মত ভগবদ্গীতার অভিমত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। কারণ, উত্তরায়ণের পরবর্ত্তী পৈঠা যাহা কালবাচক নহে, গীতায় বর্ণিত হয় নাই। তাহাই নহে, এই মার্গ বলিবার সময় প্রথমেই—"যে সময়ে মরিলে কর্ম্মযোগী ফিরিয়া আসে কিংবা আসে না, সেই কালের কথা এক্ষণে তোমাকে বলিব" (গী. ৮. ২৩) এইরূপ ভগবান্ স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন; এবং মহাভারতেও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়িলে দেহত্যাগ করিবার জন্য উত্তরায়ণ কালের অর্থাৎ সূর্য্য উত্তরদিকে গমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন (ভী. ১২০; অনু. ১৬৭)। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, দিন, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ কালই কোন-না-কোন সময়ে মরণের প্রশস্ত কাল বলিয়া মানা হইত। ঋগ্বেদেও দেবযান ও পিতৃযান এই দুই মার্গের যেখানে বর্ণনা আছে (ঋ. ১০. ৮৮. ১৫ ও বৃ. ৬. ২. ১৫), সেখানে কালবাচক অর্থই বিবক্ষিত। এই এবং অন্য অনেক প্রমাণ হইতে আমি স্থির করিয়াছি যে, উত্তর গোলার্দ্ধের যে স্থানে সূর্য্য ক্ষিতিজের উপর বরাবর ছয় মাস দৃশ্য হইয়া থাকে সেই স্থানে অর্থাৎ উত্তর ধ্রুবের নিকট অথবা মেরুস্থানে বৈদিক ঋষিদিগের যখন বসতি ছিল তখন হইতেই ছয় মাস উত্তরায়ণের প্রকাশকালকেই মৃত্যুর প্রশস্ত কাল বলিয়া মানিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে ইহার সবিস্তর বিচার আমি আমার অন্য গ্রন্থে করিয়াছি। কারণ যাহাই হউক না কেন, এই ধারণাটি যে খুবই প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং এই ধারণাই দেবযান ও পিতৃযান এই দুই মার্গের মধ্যে স্পষ্ট পরিস্ফুট না থাকিলেও পর্য্যায়ক্রমে উহাদের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে। অধিক-কি, এই দুই মার্গেরই মূল এই প্রাচীন ধারণার ভিতরেই আছে, এইরূপ আমার মনে হয়। নচেৎ ভগবদ্গীতায় দেবযান ও পিতৃযান

ব্যক্ত করিয়া একবার যে 'কাল' (গী. ৮, ২৩) এবং অপর একবার 'গতি' বা 'সৃতি' অর্থাৎ মার্গ (গী. ৮. ২৬ ও ২৭) বলা হইয়াছে, অর্থাৎ দুই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের শব্দ যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের উপপত্তি ঠিক্ লাগানো যায় না। বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে দেবযান ও পিতৃযানের কালবাচক অর্থ স্মার্ত্ত, যাহা কর্ম্মযোগের পক্ষেই খাটে; এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী উপনিষদে বর্ণিত শ্রৌত অর্থাৎ দেবতাপ্রদর্শিত প্রকাশময় মার্গের দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন এইরূপ ভেদ করিয়া 'কালবাচক' ও 'দেবতাবাচক' অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে (বেসূ. শাং ভা: ৪. ২, ১৮-২১)। কিন্তু মূল সূত্রে দেখা যায়, যেন কালের অপেক্ষা না রাখিয়া উত্তরায়ণাদি শব্দের দ্বারা দেবতা কল্পনা করিয়া দেবযানের যে দেবতাবাচক অর্থ বাদরায়ণাচার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার মতে সর্ব্বত্র অভিপ্রেত হইয়া থাকিবে; এবং গীতায় বর্ণিত মার্গ উপনিষদের এই দেবযান গতিকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র হইতে পারে এরূপ মনে করাও সঙ্গত নহে। কিন্তু এ স্থলে এত গভীর জলে প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, দেবযান ও পিতৃযানের দিন, রাত্রি, উত্তরায়ণ প্রভৃতি শব্দ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মূলারম্ভে কালবাচক ছিল কি না এই সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এই কালবাচক অর্থ পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইহা নির্ব্বিবাদ। কালের অপেক্ষা না রাখিয়া মনুষ্য যে সময়েই মরুক না কেন, জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্মানুসারে প্রকাশময় মার্গ দিয়া এবং নিছক কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তি অন্ধকারময় মার্গ দিয়া পরলোকে যাত্রা করে, দেবযান ও পিতৃযান এই দুই শব্দের এই অর্থই শেষে নির্দ্ধারিত ও রূঢ় হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর, দিন ও উত্তরায়ণ প্রভৃতি শব্দে বাদরায়ণাচার্য্যের [illegible] অনুসারে দেবতাই মনে কর কিংবা উহার লক্ষণ হইতে প্রকাশময় মার্গের ক্রমবর্দ্ধনশীল পৈঠাই মনে কর, দেবযান ও পিতৃযান ইহাদের রূঢ় অর্থ যে মার্গবাচক এই সিদ্ধান্তে কোনপ্রকার ভেদ হয় না।

কিন্তু কি দেবযান, কি পিতৃযান,—শাস্ত্রোক্ত পুণ্য কর্ম্মকারীই ঐ দুই মার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ, পিতৃযানমার্গ দেবযান অপেক্ষা নিম্ন পৈঠার হইলেও, তাহাও চন্দ্রলোকে অর্থাৎ একপ্রকার স্বর্গলোকেই উপনীত হইবার মার্গ। তাই ইহলোকে শাস্ত্রোক্ত কোনপ্রকার পুণ্য কর্ম্ম করিলেই সেখানকার সুখভোগের যোগ্যতা হয়, ইহা স্পষ্টই দেখা যায় (গী. ৯. ২০, ২১)। যাহারা কিছুমাত্র শাস্ত্রোক্ত পুণ্যকর্ম্ম না করিয়া সংসারে যাবজ্জীবন পাপাচরণে নিমগ্ন থাকে তাহারা ঐ দুয়ের মধ্যে কোন মার্গ দিয়াই যাইতে পারে না। তাহারা মৃত্যুর পর একেবারেই পশুপক্ষী আদি তির্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং পুনঃ পুনঃ যমলোকে অর্থাৎ নরকে গমন করে এইরূপ উপনিষদে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকেই 'তৃতীয়' মার্গ বলে (ছাং. ৫. ১০. ৮; কঠ. ২. ৬, ৭); এবং ভগবদ্গীতাতেও, নিছক্ পাপী অর্থাৎ আসুরী পুরুষেরা এই নিরয়গতিই প্রাপ্ত হয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী. ১৬. ১৯. ২১; বেসূ. ৩. ১. ১২-১৩; নিরুক্ত ১৪. ৯)।

বৈদিক ধর্ম্মের প্রাচীন পরম্পরাক্রমে মনুষ্য স্বীয় কর্ম্মানুরূপ মরণান্তর তিনপ্রকার গতি কি ক্রম-অনুসারে হয় তাহা উপরে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে দেবযান মার্গের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়; তথাপি ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ অর্চিরাদি আড্ডায় পর-পর আরোহণ করিয়া তবে পরিশেষে এই মোক্ষ লাভ হয়, তাই এই মার্গের আর এক নাম 'ক্রমমুক্তি', এবং মরণান্তর ব্রহ্মলোকে গিয়া সেইখানে শেষে মুক্তিলাভ হয় বলিয়া ইহার 'বিদেহমুক্তি' এই নামও হইয়াছে। কিন্তু খাঁটি অধ্যাত্মশাস্ত্র ইহার পরে আরও এই কথা বলেন যে, ব্রহ্ম ও নিজের আত্মা এক—এই পূর্ণ সাক্ষাৎকার যাঁহার মনে নিত্য জাগৃত আছে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য অন্য কোন স্থানে কেন যাইবে? কিংবা মরণের পথই বা কেন দেখিবে? উপাসনার জন্য স্বীকৃত সূর্য্যাদি প্রতীকের অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাহা প্রথমে একটু অপূর্ণ হইয়া থাকে সত্য, কারণ, তাহার দরুণ সূর্য্যলোক কিংবা ব্রহ্মলোক ইত্যাদির কল্পনা মনে উদিত হইয়া তাহা মরণ সময়েও ন্যূনাধিক পরিমাণে স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে। তাই, এই ত্রুটি পরিহার করিয়া মোক্ষলাভার্থ এই সকল লোককে দেবযান মার্গ দিয়াই যাইতে হয়,—(বেসূ. ৪. ৩, ১৫)। কারণ, মরণ সময়ে যাহার যেরূপ ভাবনা কিংবা যজ্ঞ হয় সেইরূপ তাহার গতি হয় ইহা অধ্যাত্মশাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত (ছাং. ৩. ১৪. ১)। কিন্তু সগুণোপাসনার দরুণ কিংবা অন্য কারণে, ব্রহ্ম ও নিজের আত্মার মধ্যে কোন দ্বৈতী অন্তরাল (তৈ. ২. ৭) যাহার মনে একটুও অবশিষ্ট থাকে না, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদাই ব্রহ্মরূপে থাকায় তাহাকে ব্রহ্মলাভের জন্য অন্য কোথাও যাইতে হয় না, ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে। এইজন্য শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা যে ব্যক্তি পূর্ণ নিষ্কাম হইয়াছে, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"—তাহার প্রাণ আর কোথাও যায় না, সে নিত্য ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মেতেই লয় প্রাপ্ত হয়—এইরূপ বৃহদারণ্যকে (বৃ. ৪. ৪, ৬) যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিয়াছেন; এইপ্রকার ব্যক্তি "অত্র ব্রহ্ম

সমশ্নুতে", (কঠ. ৬. ১৪) এইখানেই ব্রহ্ম লাভ করেন, এইরূপ বৃহদারণ্যক ও কঠোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রুতির ভিত্তিতে, মোক্ষার্থে স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই এইরূপ শিবগীতাতেও উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম এরূপ বস্তু নহে যে, তাহা অমুক স্থানে আছে ও অমুক স্থানে নাই (ছাং. ৭. ২৫ ; মুং. ২. ২. ১১)। তবে, কোন সময়ে পূর্ণ ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য পূর্ণজ্ঞানী পুরুষকে উত্তরায়ণ, সূর্য্যলোক আদি মার্গ দিয়া ক্রমে ক্রমে যাইতে হইবে কেন? "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুং. ৩. ২. ৯) যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই হয়। কারণ একজনের আর একজনের কাছে যাইতে হইলে, 'এক' ও 'অন্য' এই স্থলকৃত কিংবা কালকৃত ভেদ থাকেই থাকে; এবং এই ভেদ, শেষের অদ্বৈত ও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে থাকিতে পারে না। তাই, "যস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" (বৃ. ২. ৪. ১৪), কিম্বা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাং ৩. ১৪. ১), অথবা আমিই ব্রহ্ম "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃ. ১. ৪. ১০) এইরূপ যাহার মনের নিত্য অবস্থা দাঁড়াইয়াছে সে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির জন্য অন্যস্থানে কেন যাইবে?—সে সর্ব্বদাই ব্রহ্মীভূত হইয়া থাকে। পূর্ব্বপ্রকরণের শেষে যাহা বলা হইয়াছে তদনুসারে গীতাতে এই অভিপ্রায়েই পরম জ্ঞানীপুরুষের এই প্রকার বর্ণন করা হইয়াছে যে, "অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্" (গী ৫. ২৬) যাঁহারা দ্বৈতভাব ত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ার্থ মৃত্যুর পথ দেখিতে হইলেও মোক্ষলাভের জন্য কোথাও যাইতে হয় না, কারণ ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষের থালা সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে বিদ্বিত হইয়াই থাকে; কিংবা "ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ" (গী. ৫. ১৯)—যাঁহাদিগের মনে সর্ব্বভূতান্তর্গত ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ সাম্য প্রতিভাত হয় তাঁহারা (দেবযান মার্গের অপেক্ষা না রাখিয়া) এখানেই জন্মমরণকে জয় করিয়াছেন; অথবা "ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি"—সমস্ত ভূতের নানাত্ব নষ্ট হইয়া সেই সমস্ত একস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া যাহার মনে হয়, সে-ই 'ব্রহ্ম সম্পদ্যতে'—ব্রহ্মে মিলিত হয় (গী. ১৩. ৩০)। সেইরূপ আবার, "দেবযান ও পিতৃযান এই দুই মার্গ তত্ত্বতঃ যাহারা জানে সেই কর্ম্মযোগীরা মোহপ্রাপ্ত হয় না" (গী. ৮. ২৭), এইরূপ গীতায় যে বচন উপরে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যেও "তত্ত্বত যাহারা জানে" এই পদের অর্থ "পরম ব্রহ্মস্বরূপ যাহারা জানে" এইরূপ বিবক্ষিত দেখা যায় (ভাগ. ৭. ১৫. ৫৬ দেখ)। ইহাই পূর্ণ ব্রহ্মীভূত কিংবা পরাকাষ্ঠা ব্রহ্মস্থিতি; এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আপন শারীরক ভাষ্যে (বেসূ. ৪. ৩. ১৪) ইহাই অধ্যাত্মজ্ঞানের অত্যন্ত পরাকাষ্ঠা কিংবা পূর্ণাবস্থা এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। অধিক কি, এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে মনুষ্যকে এক প্রকার পরমেশ্বরই হইতে হয়, এইরূপ বলাতেও বাধা নাই। এবং এই প্রকারে ব্রহ্মীভূত ব্যক্তি কর্ম্মজগতের সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত অবস্থায় উপনীত হন, ইহাও আর বলিতে হইবে না; কারণ, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বদাই জাগৃত থাকা প্রযুক্ত তাঁহারা যাহা কিছু করেন তাহা সর্ব্বদাই নিষ্কাম বুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হয় অতএব পাপপুণ্যের দ্বারা নির্লিপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য অন্য কোথাও যাইবার কিংবা মরণেরও কোন আবশ্যকতা না থাকায় এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষকে 'জীবন্মুক্ত' বলে (যো. ৩. ৯ দেখ)। বৌদ্ধেরা আত্মা কিংবা ব্রহ্ম না মানিলেও জীবন্মুক্তের এই নিষ্কাম অবস্থাই মনুষ্যের পরম সাধ্য এই কথা তাঁহারা স্বীকার করেন। অল্প শব্দভেদে এই মতকে তাঁহারা আপন ধর্ম্মে গ্রহণ করিয়াছেন। (পরিশিষ্ট প্রকরণ দেখ)। পরাকাষ্ঠার নিষ্কামত্বের এই অবস্থা এবং সাংসারিক কর্ম্মের মধ্যে স্বভাবতই পরস্পর বিরোধ থাকা প্রযুক্ত এই অবস্থা যে প্রাপ্ত হইয়াছে সে কর্ম্ম হইতে স্বতই মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়, এইরূপ অনেকে বলেন। কিন্তু এ মত গীতার মান্য নহে; স্বয়ং পরমেশ্বর যেরূপ কর্ম্ম করেন সেইরূপ জীবন্মুক্তেরও নিষ্কাম বুদ্ধিতে লোকসংগ্রহার্থ আমরণ সমস্ত ব্যবহার করাই অধিক শ্রেয়স্কর, কারণ, নিষ্কামত্ব ও কর্ম্ম এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ নাই, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত। ইহা পরবর্ত্তী প্রকরণের নিরূপণে স্পষ্ট দেখা যাইবে। গীতার এই তত্ত্ব যোগবাশিষ্ঠেও স্বীকৃত হইয়াছে (যো. ৬. উ. ১৯৯)।

ইতি দশম প্রকরণ সমাপ্ত।

সাগর ঢেয়ে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভবের নায়ে আমি চলেছি ভেসে।
কোথা কোন্ অসীম অজানা দেশে॥
দুখের সুখের ঢেউ হুহুঙ্কারে আসি।
দিতেছে প্রবল ধাক্কা রোষে পাশাপাশি॥
মাথার উপর দিয়ে কখনো মলয় বায়।
গাহিয়া আনন্দগীত ধীরে ধীরে বহে যায়॥
ঝড়ের বাতাস কভু সহসা জাগিয়া উঠি।
ছোট মোর তরী চাহে করে দিতে কুটিকুটি॥

হাল ধ'রে তুমি যবে—ছোট হোক তবু বড়—
ঢেউ কেটে চলে তাই—বজ্রঘাতে কড়কড় ॥
গ্রহতারা খেলা দেখে নীরব আনন্দে চেয়ে।
আমিও ডরি না কারে, শুধু চলি গান গেয়ে ॥
কে আছিস ডাঙ্গা-পরে—আয় তোরা চলে আয়।
মাতাল ঢেয়ের সুখ কে বুঝিবি চলে আয় ॥
মাতাল না খেয়ে মদ হতে যদি চাস তোরা।
মাতাল ঢেয়ের তবে গানে তানে প্রাণ পোরা ॥
যুবক বালক নারী কত কে যৌবন চাও ?
অসীমের প্রাণে সবে আপনে ঢালিয়া দাও ॥
জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ কেবা।
আনন্দের কর সেবা ॥
যুবক হইয়া যাও।
যৌবনের বল পাও ॥
নীচে রে অসীম সিন্ধু মাথা' পরি মহা ব্যোম।
অসীম যে আশেপাশে ;—কর সবে তারি স্তোম ॥
চোখের সমুখে যত বাধা সব ভেঙ্গে যাক।
অসীম আনন্দ-দৃশ্য খুলে যাক খুলে যাক ॥
আনন্দের উলুধ্বনি উঠুক গগন ভরি'।
তারি তালে নাচি এস বলি' হরি হরি হরি ॥

কালিদাসের সময় নির্দ্দেশ।

(শ্রীধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই অবন্তিনাথ বিক্রমাদিত্য সমন্ধে যে ভারত-কাহিনী (Traditions) আছে তাহার অতি-প্রাকৃত বা অতিরঞ্জিত অংশ বাদ দিলে আমরা এইরূপ বুঝিতে পারি যে, গন্ধর্ব্বসেনের দুই পুত্র ভর্তৃহরি এবং বিক্রমসেন। মনের দুঃখে ভর্তৃহরি, সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমসেন রাজা হন। তিনি কর্ম্মবীর ও উদার-প্রকৃতি ছিলেন এবং তাঁহার দান অজস্র এবং বিদ্বৎপ্রেম গভীর ছিল। গোপনে ভ্রমণ করিয়া ছদ্মবেশে পরের উপকার করা কিম্বা বিপদে পতিত হইয়া বীরত্বের বিকাশ করা তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। এই অভ্যাসই তাঁহার হঠাৎ প্রাণনাশের হেতু। ভোজদেশের ভানুমতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি অবন্তিনগরে জ্যোতিঃশাস্ত্রের জন্য মানমন্দির স্থাপনা করেন। তিনি ইন্দ্রপ্রস্থ জয় করিয়া রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে অবন্তীতে লইয়া আসেন। বোধ হয় সামরিক কারণে এইরূপ করা হয়। তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুগণের নিকট ইহা বড়ই বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল। বোধ হয় তজ্জন্যই তিনি অযোধ্যা জয় করিয়া পুনরায় রাম-কীর্ত্তির স্থাপনা করেন। এবং সূর্য্যবংশ বলিয়া দাবী রাখিবার জন্য তিনি আদিত্য উপাধি ধারণ করেন। তিনি বিক্রমাব্দ বা মালবাব্দ চালাইয়া যান। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় অমাত্যগণ পরামর্শ করিয়া সসত্ত্বা রাজ্ঞীর গর্ভাভিষেক করান। এমনও প্রবাদ আছে যে তাঁহার posthumous অর্থাৎ মৃত্যুর পরে সঞ্জাত পুত্র ময়াদিত্য বৌদ্ধ হইয়াছিলেন এবং হিন্দুদিগের অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র অগ্নিতে আহুতি দেন (যথা, কথামঞ্জরী ও দ্বাত্রিংশৎ সিংহাসন)।

এই পরম্পরাকাহিনী অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ নাই। তথাপি বিক্রমাদিত্য মহারাজের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও কালিদাসের সময় খৃঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে ধার্য্য করা যায়। কিন্তু এই বিক্রমচরিত্রই কালিদাসের কুমার, রঘু, শকুন্তলা প্রভৃতিতে সম্পূর্ণরূপে জড়িত আছে। বিক্রম-চরিত্র না বুঝিলে কালিদাসের এই নবশক্তি বুঝা যায় না। ঋতুসংহার ও মালবিকাগ্নিমিত্রে আমরা কালিদাসের অদ্ভুত চিত্রাঙ্কনক্ষমতা, সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি, এবং রূপলালসা ও রূপভোগের কলাময় অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। এই গুণসকল আমরা তাঁহার সমস্ত গ্রন্থেই দেখিতে পাই। তাঁহার কৌতুকরসের প্রথম স্তরও অনুভূত হয়। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে বীরত্বের অনুভূতি অনেক স্থানে প্রতিছত্রে যেন ছড়াইয়া পড়িয়াছে—

"সেনাপরিচ্ছদস্তস্য দ্বয়মেবার্থসাধনং
শাস্ত্রেষকুণ্ঠিতা বুদ্ধির্মৌর্ব্বী ধনুষি চাততা"

দিলীপের এই বর্ণনায় আমরা যেন সেই ভীমকান্ত অধৃষ্য অথচ অবিগম্য "যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ" বিক্রম-চরিত্রের ছায়া দেখিতে পাই ; "ক্ষতাৎকিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ" এ যেন সেই ছদ্মবেশধারী আত্মনির্ভর কর্ম্মবীর বিক্রমেরই বর্ণনা। এই বীরত্বেই অনুপ্রাণিত হইয়া রঘুরাজ ইন্দ্রকে বলিতেছেন,—"গৃহাণ শস্ত্রং যদি সর্গ এষ তে ন

খধ্বনির্জিত্য রঘুং কৃতী ভবান্”, পুরোরবার উর্ব্বশী-উদ্ধার, দারুণ যন্ত্রণায় বিবশচিত্ত দুষ্মন্তের আর্ত্তত্রাণ বীরত্বের মহান অভিব্যক্তি এই বীরত্বেরই সূচনা। রামায়ণ ও মহাভারতের পর এইরূপ বীরচরিত্রের অভিব্যক্তি অর্ব্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। এই বহির্জ্জগতের বীরত্ব ছাড়া আরও একটি অন্তর্জ্জগতের বীরত্ব কালিদাসে প্রস্ফুট হইয়াছে। কুমারসম্ভবের মহেশ "পাগল শিব প্রমথেশ" নহেন। তাঁহার অদ্ভুত আত্মসংযম ; ভোগবাসনায় উপর তীব্র ক্রোধ "পুনর্ব্বশিত্বাৎ বলবন্নিগৃহ্য" "ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি" ইত্যাদি শ্লোকে পরিচয় দিতেছে। কালিদাসের "নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্" "প্রফুল্ল-রাজীবমিবান্তর্ম্মধ্যে" এই সমস্তই অন্তরের বীরত্বের অভিব্যক্তি। কণ্ব, শার্ঙ্গরব প্রভৃতিও এই ভাবের অভিব্যক্তি। দুষ্মন্তচরিত্রেও আমরা ভোগ-লালসার সহিত সংযম অদ্ভুতভাবে সংমিশ্রিত দেখিতে পাই। স্ত্রীচরিত্রেও উর্ব্বশী, শকুন্তলা, উমা খেলার পুতুল নহেন, তাঁহাদের নিকট মাথা আপনি নত হইয়া আসে। রঘুর অদ্ভুত দানশীলতা "মৃৎপাত্রশেষামকরোদ্ বিভূতিম্" সেই বিক্রমের দানশীলতার প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। দুষ্মন্তের ছদ্মবেশে শকুন্তলার সহিত সাক্ষাৎ, মহেশ্বরের ছদ্মবেশে উমার সহিত আলাপ—"শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা" এ যেন বিক্রমেরই ছদ্মবেশের প্রতিধ্বনি। বিক্রমের চরিত্র বা personality ছাড়িয়া দিয়া পরম্পরালব্ধ কাহিনীতে বিক্রমনৃপতির যে সমস্ত ঘটনা আমরা পাই কালিদাসের লেখায় তাহারও প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়—

প্রথমতঃ গর্ভাভিষেক—শাস্ত্রানুসারে এই গর্ভাভিষেক হইবে কিরূপে? ছেলে কি মেয়ে কি হইবে তাহার স্থির নাই ; নামকরণ, চূড়াকরণ কিছুই ঠিক নাই একবারে অভিষেক কিরূপ? বড় দায়ে পড়িয়াই বিক্রমের অমাত্যগণ এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালিদাস তাহারই নজির যেন সংগ্রহ করিয়া অগ্নিবর্ণের মৃত্যুর পর গর্ভাভিষেকের বর্ণনা করিয়াছেন। রাজ্ঞীর শোকের বর্ণনা ও তাহার অন্তর্গূঢ় অবস্থিতি কবি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

তস্যাস্তথাবিধনরেন্দ্রবিপত্তিশোকাদ্
উষ্ণৈর্বিলোচনজলৈঃ প্রথমাভিতপ্তঃ।
নির্ব্বাপিতঃ কনককুম্ভমুখোজ্ঝিতেন
বংশাভিষেকবিধিনা শিশিরেণ গর্ভঃ॥
তং ভাবার্থং প্রসবসময়াকাঙ্ক্ষিণীনাং প্রজানাং
অন্তর্গূঢ়ং ক্ষিতিরিব নভো বীজমুষ্টিং দধানা।
মৌলৈঃ সার্দ্ধং স্থবিরসচিবৈর্হৈমসিংহাসনস্থা
রাজ্ঞী রাজ্যং বিধিবদশিষদ্ ভর্ত্তুরব্যাহতাজ্ঞা॥

এ যেন বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্ঞীরই বর্ণনা।

কালিদাসের নামে একটি জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রচলিত দেখা যায়। কালিদাস জ্যোতিঃশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা দেখাইতে অনেক স্থলে প্রয়াস পাইয়াছেন,—যথা রঘুর জন্মে, উমার জন্মে, তাঁহার বিবাহতিলকে ইত্যাদি।

রঘুবংশ সূর্য্যবংশেরই বর্ণনা। গর্ভাভিষেকেই তাহার হঠাৎ সমাপ্তি। বিক্রমের মৃত্যুর পর মহাকবির মহালেখনী আর চলিল না। রঘুর ষোড়শ সর্গে কুশরাজের দ্বারা অযোধ্যার পুনরুদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে।

মেঘদূতে কুরুক্ষেত্রের একটি বর্ণনা না দিলেই নয় তাই আছে ; কিন্তু পাণ্ডবদিগের বর্ণনা কোনও স্থানেই নাই, কেবল গোপবেশ বিষ্ণুর বর্ণনা আছে,—

"বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ"

এ বিষয়ে আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত বিষয়সকলই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়।

বিক্রমাদিত্যের ঐতিহাসিক সত্তার বিরোধী চারিটি যুক্তি অবলম্বিত হইয়া থাকে।

১। কোনও মুদ্রা বা আলেখ তাঁহার নামে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখনও এ বিষয়ে বিশিষ্ট অনুসন্ধান হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মের প্রথম পুনরাবর্ত্তনে আত্মপ্রশংসার নিন্দনীয়তা কালিদাসের লেখা হইতে অনুমিত হয় পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। যতদূর জানা আছে পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, ইহাদেরও কোনও আলেখ্য বা মুদ্রা নাই।

২। দ্বিতীয় কথা মালবাব্দ লইয়া—প্রথম অবস্থায় ইহার বিক্রমাব্দ নাম দেখা যায় না। এ যুক্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের। তাঁহারা আমাদের

বিষয় ঠিক বুঝিতে পারেন না। হিন্দুধর্ম্মের পুনরাবর্ত্তনে পঞ্জিকার অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্রত উপবাস সমস্তই পঞ্জিকাসাপেক্ষ। মালবদেশে (উজ্জয়িনীতে) এইজন্য জ্যোতিষচর্চ্চার প্রথম বন্দোবস্ত হয়। তাঁহাদেরই গণনা স্বীকৃত হয়। সেই পঞ্জিকাতে অবশ্যই বিক্রমাব্দের উল্লেখ হইত। এই মালবদেশের পঞ্জিকাই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইত। তজ্জন্যই "মালবগণনয়া" "মালবস্থিত্যা" এইরূপ ভাষায় উল্লেখ; অর্থাৎ মালবপঞ্জিকার গণনানুসারে। আমরা এখনও বলি "গুপ্তপ্রেস অনুসারে" কিম্বা "ভাটপাড়ার মতে"—ইহাও তদ্রূপ। পরে প্রতিষ্ঠানের জ্যোতিষচর্চ্চা সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করে। কাশী ও অন্যান্য স্থানের মানচর্চ্চার উন্নতিতে মালব জ্যোতিষচর্চ্চার প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়। তখন আর "মালবগণনানুসারে" আমরা পাই না। তখন "বিক্রমাব্দ" নাম পাই; কেবল "সম্বৎ" নামও পাইয়া থাকি। আমাদের দেশে গুরুভক্তির আদর রাজার সম্মান অপেক্ষা অনেক বেশী। মালবে শিক্ষিত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের "মালবগণনয়া" বলাই সম্ভব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন "Conquest of Malwa" মালবগণের বিজয় হইতে এই অব্দের আরম্ভ। যখন আরম্ভ আছে তখন তাহা একটা বিজয়কেই নির্দ্দেশ করিতেছে; নচেৎ অনেকগুলি মালবাব্দ হইত। এই একটা বিজয় যদি খৃঃ পূঃ ৫৭ বৎসরে হইয়া থাকে তবে সেই বিজয়ের নেতা কে? বিক্রমাদিত্য তাহার নেতা। অন্য কোনও মালবরাজের আমরা সন্ধান পাই না।

৩। তৃতীয় কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন,—বিক্রমাদিত্য একটি উপাধিমাত্র; তাহা কোনও নৃপতির নাম নহে। এখানেও ভারতবর্ষের একটু বিশেষত্ব আছে। আমাদের নামের সাধারণতঃ ব্যাকরণগত অর্থ আছে। পাশ্চাত্য দেশে ঠিক তাহার বিপরীত। পরবর্ত্তী রাজারা বিক্রমাদিত্য নাম ধারণ করেন কিন্তু সে কেবল প্রথম বিক্রমাদিত্যের নিকট পূজোপহার। য়ুরোপেই আমরা দেখি Caesar সিজার নামক একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হন, তাহার পর শত শত নৃপতি প্রতাপশালী হইলেই সিজার নাম গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কি বলিতে পারি সিজার বলিয়া কোনও লোক ছিল না, সিজার কেবল উপাধি মাত্র?

৪। পুরাণে তাঁহার নাম নাই—এই কথার কৈফিয়ত আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। পুরাণ বিক্রমাদিত্যের উপর সন্তুষ্ট নহে। অধিকন্তু, পুরাণ কেবল বংশাবলী বর্ণনা করিতে বাধ্য তো করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য কোনও বংশাবলী রাখিয়া যান নাই। বীর নেপোলিয়ানের মত তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ রাজত্ব রাখিতে পারেন নাই। ইহাতে কিছুই অসম্ভব নাই; করনেল টড্ তাঁহার রাজস্থানে, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার সত্যার্থপ্রকাশে যুধিষ্ঠির হইতে বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত এবং তৎপর জয়পাল পর্য্যন্ত সমস্ত নৃপতিগণের রাজত্বকালের তালিকা মুদ্রিত করিয়াছেন। কেন তাহা অবিশ্বাস্য তাহা বুঝা যায় না। সহস্র সহস্র বৎসরের তালিকায় ভ্রম অনিবার্য্য। ভ্রম ও অতিরঞ্জন দেখিয়া মিশর দেশের ম্যানেথোর ইতিহাস বা বংশাবলী কিম্বা হেরোডোটাসের ইতিহাস কেহ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন নাই। ভারতবর্ষের জন্য এ কঠোরতা দুর্ব্বোধ্য।

উপরোক্তরূপে আমরা দেখিতে পাই যে এই বিক্রমাদিত্যকে স্বীকার করিলে কালিদাসের প্রতিভা ও লেখা সুন্দরভাবে বুঝা যায়। বিক্রমচরিত্রই যেন সহস্রটা বিভক্ত হইয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে "সহস্রধাত্মা ব্যরুচদ্বিভক্তঃ পয়োমুচাং পংক্তিষু বিদ্যুতেব"; কিন্তু বিক্রমাদিত্য বলিয়া কোনও নৃপতির সত্তা স্বীকার না করিলেও কালিদাস যে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এক্ষণে আরও দুই একটী যুক্তি দিয়া এই অংশ শেষ করিব।

১ম রাজা অগ্নিবর্ণ—খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে পুষ্যমিত্রের বংশধরগণ অতিশয় ভোগাসক্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন; অগ্নিবর্ণ সেই নৃপতিদিগের চিত্র। মহাকবি তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতায় কামিনী-ভোগাভিলাষের কলাসৌন্দর্য্য হইতে ধীরে ধীরে কুৎসিৎ ও ঘৃণাস্পদ অবস্থার দিকে লইয়া গিয়া এক ঘোর tragedy দুঃখের কাহিনী দেখাইয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত পশুর ন্যায় দূতী

দাসীর সহিত ব্যবহার, তাহার পর রাজযক্ষা। অগ্নিবর্ণের এই বর্ণনা বিবুধমণ্ডলীকে উদ্বেলিত করিয়াছিল। কিন্তু ফল বিপরীত ফলিল; নানাবিধ রসায়ন ও উপায়ের আবিষ্কার আরম্ভ হইল। কিন্তু কলাক্ষেত্রে কিছু ফল ফলিল না; বন্ধের আবিষ্কার হইল। ভারবি এই বন্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের ক্ষাত্রশক্তি এই অগ্নিবর্ণতায় মূর্চ্ছিত ও পরাভূত। আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ খৃঃ অব্দে এই রতিশাস্ত্রের অত্যন্ত প্রভাব দেখিতে পাই। কালিদাস তাহার বহুপূর্ব্বে।

২য় দেবী ধারিণী—সংস্কৃত সাহিত্যে এই প্রকার নাটকই বহুল—রাজার অনেক স্ত্রী বর্ত্তমান; তিনি আর একটি অল্পবয়স্কা সুন্দরীর উপর অনুরক্ত; তজ্জন্য পাটরাণী ঈর্ষাবতী; শেষপর্য্যন্ত রাজার সহিত কিশোরীর বিবাহ। মালবিকাগ্নিমিত্রও সেই ধরণের; তবে একটুকু বিশেষত্ব আছে। পাটরাণী দেবী ধারিণীর কোনও প্রেম বা অসূয়া অঙ্কিত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে আর একটি ছোট রাণীর ঈর্ষা সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ধারিণীদেবীর প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করা কালিদাসের নিকট বড়ই সহজ হইত। গভীর প্রেম কিম্বা diplomacy তাহাও প্রস্ফুট করা তাঁহার পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু তিনি, রাজার লাম্পট্যে ধারিণীর বিরক্তি অঙ্কন করিয়াছেন। ধারিণী ও অগ্নিমিত্রের মধ্যে কোনও প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেন নাই। অধিকন্তু আমরা দেখি অগ্নিমিত্র ও বিদূষক উভয়েই ধারিণীকে ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেছেন। ইহার কারণ কি? এই গ্রন্থপাঠে অনুমান হয় বসুমিত্রের মতো ধারিণী দেবী ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। লোকে তাঁহার কথা মনে রাখিয়াছিল ও তাঁহাকে জননীর ন্যায় মান্য করিত। হিন্দুজাতি পার্থিব মাতার পার্থিব প্রেমের চিত্র দেখিতে চায় না। তাহা কুৎসিত ও অবমাননা বলিয়া মনে করে। আমরা আজকাল রাণী ভবানীকে যে চক্ষে দেখি বোধ হয় ধারিণীকেও কালিদাসের সময় লোকে সেই চক্ষে দেখিতেন।

৩য়—অভিজ্ঞান শকুন্তলা—শকুন্তলা জাতিতে ক্ষত্রিয়া নহেন। তিনি সম্ভবত বর্ণশঙ্কর জাতি হইবেন। তবে কেন দুষ্মন্ত বলিতেছেন—"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা"? তখন অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠে ঠিক তাহাই দেখা যায়, পরে আর সেরূপ সম্ভব হয় নাই। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, কালিদাস দুষ্মন্তের সময় যে অনুলোম বিবাহ ছিল তাহাই দেখাইয়াছেন। তাহা অসম্ভব নহে। নচেৎ আর একটি উদাহরণের কোনও কৈফিয়ত দেখা যায় না। পুরাতন স্মৃতিতে অপুত্রকের সম্পত্তি পত্নী গ্রহণ করিবেন তাহার স্পষ্ট বিধি আছে; কালস্রোতে সেই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

"অপুত্রস্য সোদরাঃ ভ্রাতরঃ সহজীবিনো বা হরেয়ুঃ কন্যাশ্চ, পুত্রবতঃ পুত্রা দুহিতরো বা ধর্ম্মিষ্ঠেষুবিবাহেষু জাতাঃ, তদভাবে পিতা, পিত্রভাবে ভ্রাতরঃ ভ্রাতৃপুত্রাশ্চ, অদায়াদকং রাজা হরেৎ"

"চাতুর্ব্বর্ণ্যপুত্রাণাং ব্রাহ্মণঃ পুত্রাঃ চতুরোংংশান্ হরেৎ।"

হিন্দুধর্ম্মের পুনরাবর্ত্তন ঠিক লোপের পূর্ব্বে প্রচলিত আচার ধারণ করিবে ইহা নিশ্চিত। কৌটিল্য মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। তাঁহারই নাম চাণক্য। শকুন্তলা নাটকে শ্রেষ্ঠী মৃত। রাজপুরুষ দুষ্মন্তকে সংবাদ দিতেছেন, তাঁহার কোনও পুত্র নাই; সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হউক। দুষ্মন্তের বিচার উদারতাব্যঞ্জক—"কোনও স্ত্রী গর্ভবতী আছে কি? অনুসন্ধান কর; আর তাই বা শুধু কেন? যদি পুত্রকন্যা না থাকার জন্য কোনও রমণী সম্পত্তি না পান তবে সেই স্থলে আমিই সেই রমণীর পুত্র কন্যা" এইরূপ উদারতার চরিত্র বড় সুন্দর। কিন্তু আসল কথা তখন বিধবা পত্নী ওয়ারেস ছিলেন না। কালিদাস যখন ছিলেন তখন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রই আইন এবং কালিদাস তাহাই অঙ্কিত করিয়াছেন।

৪র্থ—দুর্ব্বোধ্য ব্যাকরণকূট বা দুর্ব্বোধ্য বিরোধাভাস ও শ্লেষ ইত্যাদি প্রয়োগের প্রয়াস নাই।

* * *

এরূপ আরও অনেক প্রমাণ উল্লিখিত হইতে পারে; কিন্তু বোধ হয় বাহুল্যের আর প্রয়োজন নাই, এই কয়েকটি সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারে।

১। কালিদাস মগধের চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক নহেন। তিনি উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত।

২। তিনি শালিবাহনের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খৃঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন।

৩। তিনি অশ্বঘোষের পূর্ব্ববর্ত্তী।

৪। বিক্রমাদিত্যকে অত সহজে বাদ দেওয়া চলে না। কিন্তু তাঁহাকে বাদ দিলেও কালিদাস খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে—ইহার দ্বারা ২য় ও ৩য় মত খণ্ডিত হইয়া প্রথম মতই স্থির সিদ্ধান্ত হয়।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

খৃষ্টাব্দ ১৮৯৮ – মহাবলেশ্বরে যাত্রা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

অনেক দিন পরে, একদিন, কালো ভাল আঙ্গুর পাওয়া গেল। উনি আঙ্গুর খুব ভাল বাসিতেন বলিয়া আমি ১০।১২টা আঙ্গুর একটা পিরিচে মুখশুদ্ধির জন্য রাখিলাম। কিন্তু আহারান্তে উহার মধ্য হইতে ৫।৬টা আঙ্গুর খাইয়া বাকীগুলা তেম্‌নিই ফেলিয়া রাখিলেন। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম, "আজ ভাল আঙ্গুর পাওয়া গেছে, আর তাও আবার কতদিনের পর পাওয়া গেল; সব না খেয়ে কতকগুলা ফেলে রাখলে কেন? ওগুলোও খাও।" তখন উনি বলিলেন, "তোমার আশ্চর্য্য স্বভাব। খুব খেতে হবে, খুব পান করতে হবে, এই-রূপ তুমি মনে কর, কিন্তু এইরূপ অনেক খেলে, কখন কি প্রাণের তৃপ্তি হয়? তৃপ্তি পাবার ইচ্ছা হলেও, তাতে তৃপ্তি ত হয় না, কেবল লালসাই বাড়ে। এ কেবল আমার সম্বন্ধেই বল্‌ছিনে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ এই সম্বন্ধে অল্পবিস্তর একটা নিয়ম রাখলে ভাল হয়, এই-রূপ সহজ ভাবে উনি বলিলেন। ওঁর এই কথা থেকে, আজ পর্য্যন্ত আমার যে সংশয় ছিল তাহা দূর হইল; এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, উনি সকল বিষয়েরই একটা নিয়ম বাঁধিয়াছেন; এই কথাটা বুঝিয়া লইবার জন্য আমি বেশী মনোযোগ দিলাম এবং আসল কথাটা শীঘ্রই জানিতে পারিলাম। প্রতিদিন চা খাইবার সময়েও ঢোক্ গুনিয়া চা খাইতেন। তাহার অধিক খাইতেন না। প্রতিদিন, চা লইয়া গেলে, ঠাণ্ডা করিয়া পিরিচে ঢালিয়া হাতে দিতে হইত। যে সময় মন কাজে নিমগ্ন থাকিত সেই সময় পিরিচে-ঢালা চা-য়ের এক ঢোক্ বেশী হইলেই তাহা ফেলিয়া রাখিতেন। কখন কখন, ওঁর মুখপ্রিয় কোন জিনিস বিশেষ করিয়া রাঁধিলে ও তাহা ভাল হইলে, দুই চার গ্রাস যাহাতে আরও বেশী খান এই উদ্দেশে আমি আগ্রহপূর্ব্বক একটু বেশী করিয়া পাতে দিতাম। তখন তাহা হইতে একটু লইয়া, বাকিটা সরাইয়া রাখিতেন। ইহা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতাম,—"জিনিস্‌টা ভাল হয় নি কি?" একবার দুইবার জিজ্ঞাসা করিলেও, যেন উনি আর কোন বিষয়েরই চিন্তা করিতেছেন এইরূপ দেখাইয়া, উত্তর দিতেন না। কিন্তু আমি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া বলিতেন,—"জিনিস্‌টা কে রেঁধেছে আগে বল। তুমি যদি রেঁধে থাক, তাহলে উত্তম হয়েছে আমি বলচি।" "আমি রেঁধেছি বলেই ভাল বলতে হবে না; পাতে-বাড়া রান্নাটার একটুখানি নিয়ে বাকীটা সরিয়ে রাখলে। এতেই বুঝা যাচ্চে রান্নাটা ভাল হয় নি" এইরূপ আমি বলায়, উনি বলিলেন,—"সত্যিই জিনিসটা ভাল হয়েছে। কিন্তু জিনিসটা ভাল হয়েছে বলেই কি সব্‌টা খেতে হবে। একটা সীমা থাকা আবশ্যক।" প্রতি-দিন মুখশুদ্ধির জন্য ঋতু অনুসারে যখন যে ভাল ফল পাওয়া যাইত তাহা আনিয়া দিতে লাগিলাম। আমার কখনই স্মরণ হয় না, যে, অমুক ফল ভাল লাগিয়াছে বলিয়া আরও চাহিয়া খাইয়াছেন। রোজ যাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল ততটাই খাইতেন। বেশী থাকিলে একপাশে সরা-ইয়া রাখিতেন। কোন দিন তাড়াতাড়ির দরুণ চাখিয়া না দেখিয়া মুখশুদ্ধির জন্য যেমনটি তেমনি রাখিয়া দিতেন এবং তাহা খারাপ লাগিলে নীরবে পিরি-চের একপাশে সরাইয়া রাখিতেন। কোন কথা বলি-তেন না। এবং আবার সেই সময় ভাল ফল খাইবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করিলেও, সেই দিন তাহা খাইতেন না। একবার পুণা হইতে নারাণভাই দাণ্ডে-কর আপন বাগানের 'হাপুস' ও 'পায়রী' আম পাঠাইয়া-ছিলেন এবং পত্র লিখিয়াছিলেন যে "আমার নিজ হাতে লাগানো গাছের এই আম। এর মধ্য হইতে ২।৪টি আপনি খাইলে আমি খুসী হইব।" এই আমগুলা হইতে একটি আম লইয়া তাহার সমস্ত চাক্‌লা আমি পিরিচে রাখিয়া দিলাম। আহারান্তে, পিরিচ হাতে লইয়া এই সকল কাটা-চাক্‌লা হইতে এক চাক্‌লা খাইলেন এবং এই আঁবের আস্বাদ খুব ভাল বলিয়া তাহার খুব প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, "তোমরা সবাই খাও, আর চাকর-বাকরদেরও দেও।" এই কথা বলিয়া পিরিচ হইতে নিয়ম-মতো আর এক চাক্‌লা উঠাইয়া লইয়া, পিরিচ একপাশে সরাইয়া রাখিলেন। ইহা দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য মনে হইল এবং আমি বলিলাম—খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে 'পিঠলে,' ফলের মধ্যে আঁব সকলেরই ভাল লাগে।" তখন উনি বলিলেন;—"ওগো ভাল লাগে না কার? ভাল জিনিস হলে সক-

লেরই ভাল লাগে। আমিও কি আঁবের চাক্‌লা খাই নি?" তখন আমি বলিলাম,—"এই জন্যই আমার আশ্চর্য্য মনে হচ্চে যে, আঁবের মত জিনিস হজম করা শক্ত নয়। তোমার শরীরও এই সময় ভাল আছে। তাছাড়া, আঁব ভাল বলে' বন্ধুর কাছ থেকে এসেছে। এই সমস্ত পাশে সরিয়ে রেখে কিনা শুধু দুই চাক্‌লা খেলে। এই সমস্ত চাক্‌লাই একটা আঁব থেকে কাটা। আজকের দিন ঐ সমস্ত খেলেই ভাল হত। আমি কাট্‌বার সময় চেখে দেখেছিলাম, তখনই আমার মনে হয়েছিল, আজকে আঁব তোমার ভাল লাগবে, হয় তো আরও চেয়ে খাবে।" তখন উনি বলিলেন:—"ফলগুলা বাস্তবিকই ভাল, সেই জন্যই আমি রেখে দিয়েছি। তুমি খাও ও ছেলেদের দেও। আরও দুই এক চাক্‌লা আমি সহজে খেতে পারতাম, কিন্তু আজ আমি আমার রসনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। এই সম্বন্ধে একটা গল্প আমার মনে পড়ছে—বলি শোনো। ছেলেবেলায় আমরা যেখানে বোম্বায়ে শিক্ষা করতাম, তখন ফনস-বাড়িতে দিমোটার "চালী"তে থাক্‌তাম। আমাদের প্রতিবেশীর কাম্‌রায় মায়দেব নামে এক মিত্র ও তাঁর মা এই দুজনে থাক্‌তেন। তাঁদের বংশ পূর্ব্বে বেশ সম্পন্ন ছিল। আহারের খুব ঘটা ছিল। কিন্তু সে সুসময় তাঁদের আর রইল না। মায়দেবের বাপের মৃত্যুর পর, তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় তাঁদের বড়ই টানাটানি হল এবং এই সময় মায়দেবের ছেলেদের ২৫। ৩০ টাকার ছাত্রবৃত্তিতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হত। মায়দেবের স্ত্রী প্রথমে ধনশালী ও ভোগবতী ছিলেন। এখন তাঁর খুব কষ্ট বোধ হতে লাগ্‌ল। কখন কখন ছেলেরা যদি শাক সব্‌জি না আন্‌ত, তখন তিনি জোর গলায় আমাদের শুনিয়ে বল্‌তেন,—"এই জিভ্‌টা বড়ই লোভী। আমি তাকে কত বলি যে, সাত আটটা তরকারী, সাত আটটা চাট্‌নী, দুই তিন পক্কান-বাড়া থালা ও তাহারই আনুসঙ্গিক "শিকরণ," ঘি, দুধ, মাখন প্রভৃতিতে ভরা-থালা—সে দিন এখন গেছে, সে সব কথা মনে করে এখন কি ফল? কিন্তু না, ৫৬ রকম জিনিসের রান্না ছাড়া তাঁদের চল্‌ত না এবং এখন কি না শাকসবজিরও অভাব! "ওদের শাকসবজি না হলেও চলে কিন্তু আমার চলে না" এইরূপ তিনি বলিতেন। এর থেকে দেখ, জিবকে একটু নাই দিলে, কোন সময়ে তার লোভ বৃদ্ধি হলে, সময় অনুকুল না হলেও তাকে একেবারেই আটকে রাখা যায় না। এই-জন্য মনুষ্য, সবসময়ে চলতে পারে এইরকম অভ্যাসই তাহার অবলম্বন করা উচিত; তাহলে কোন অবস্থাই কষ্টকর হবে না। কিংবা প্রত্যেক মনুষ্য আপনার বয়স অনুসারে ও বুদ্ধি অনুসারে আপনার ভিতরকার পশুবৃত্তি কম করবার দিকে ও দৈবী গুণ বাড়াবার দিকে মনের একটা টান রাখবে। কোন ভাল কাজ করতেই কষ্ট হয়, তাই তার সাহায্যের জন্য আমাদের অল্পবিস্তর যমনিয়মাদি অবলম্বন করা উচিত।" আমি বলিলাম—"এই রকম নিয়ম করলেও, গোলযোগ ঘটে।" তখন উনি বলিলেন, "তোমরা মেয়েরা "করণে"র জন্য ও ভূষণের জন্য চাতুর্মাসে এই নিয়ম ত পালন করে থাক। এই রকম কিছু করবার জন্য অমুক সময়ই কেন দরকার? যখনই মনে আসবে তখনই কিছু না বলে, তা কতদূর করে উঠতে পার তা দেখবে। এই কাজ গোলমাল না করে নীরবে করা যেতে পারে। প্রতিদিন এই কাজ যদি অল্প অল্পও করব বলে মনে মনে নিশ্চয় করা যায়, তাহলে বিলম্বে হলেও তা সিদ্ধ হবেই। দৈবী গুণ বাড়াবার জন্য ও মনের উন্নতিসাধনের জন্য যে ব্যক্তি কাজ করে, তার কল্যাণ হয়ই হয়। অন্যের এইরূপ কোন কাজ লক্ষ্য করলেও তাই নিয়ে এত গোলমাল ও বলাবলি কেন করবে? খুব বেশী হয়ত নিরালায় জিজ্ঞাসা করবে। এই রকম কাজ সকলকে দেখিয়ে করা কিংবা সর্ব্বদা বলবার নয়। সমস্ত দিন কাজ আমার দ্বারা ভাল কাজ কি কি হল ও খারাপ কাজ করে' শোবার সময় আজ কি-কি হল—মনে মনে হিসাব করে দেখবে। ভাল কাজ বৃদ্ধি করবার দিকে মনের প্রবৃত্তি রাখবে এবং খারাপ কাজ করবে না বলে দৃঢ়নিশ্চয় করে সেই সম্বন্ধে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করবে। প্রথম প্রথম এই কাজ কঠিন মনে হয়, স্বেচ্ছাক্রমে সেইদিকে মন যায় না, কিন্তু দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়ে এই অভ্যাস অবলম্বন করলে পরে ক্রমশঃ ভাল লাগে। আমরা যদি বলি আমরা ঈশ্বরের অংশ, তাহলে তাঁহার গুণ দিনে দিনে আমাদের মধ্যে আসবে না কি? যাঁরা অধিকারী ও ভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁরা খুব কড়াক্কড়ির সঙ্গে যমনিয়ম ও যোগসাধন করেন; কিন্তু আমাদের ততটা সৌভাগ্য নেই। আমরা নানা কাজের মধ্যে ডুবে আছি। তাতে আবার কাণ চোখ বিকৃত, দুর্ব্বল; তাই যদি তাঁদের মতো ততটা সাধন করতেও না পারি, তবু আপনার অল্প সামর্থ্য অনুসারে অল্প অল্প কিছু করতে পারলেও যথেষ্ট।" এ সম্বন্ধে আর জিজ্ঞাসা করিব কি? আমি বলিলাম "এই সমস্ত কথা আমার খুব ভাল লাগল। কিন্তু আমি নিত্য যে প্রশ্ন আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছি তার উত্তর দেও, সেটা যে এড়িয়ে যাচ্চ। ভাল, ঢোক গুণে চা খাবার কথা যেমন বুঝেছি, আহার করা সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝব। একটু বেশী লক্ষ্য রাখলেই হবে। সেটা ত আমার হাতেই

আছে।” তখন উনি বলিলেন,—“আমি প্রথমেই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দেও। তোমরা ছোটবড় সকল মেয়েরা বাড়ীতে সকল সময়ে অকর্ম্মা হয়ে থাক, কিংবা কি খাও, কি পান কর, কত-বার ঘুমোও, কেউ এলে তার সঙ্গে কি রকম করে কি কথা কও, ইত্যাদি বিষয়সম্বন্ধে আমরা কখন কিছু খোঁজ নিয়েছি কি? তবে আমাদের পুরুষ মানুষের কাজ সম্বন্ধে তোমরা কেন খোঁজ নেবে? আমরা কি খাই, কতটা খাই, কতটা চা পান করি; লোকের সঙ্গে আমরা কি কথা কই, কেমন করে কথা কই, রাত্রে বিছানায় চিন্তা করি কিনা, কিংবা ঘুম এসেছে কিনা—এই সমস্ত নিয়ে তোমাদের এত তোলা-পাড়া কেন? পুরুষ মানুষের যা ইচ্ছা তাই করে, সে দিকে লক্ষ্য করা উচিত নয়—এই-রূপ আগেকার মেয়েদের চাল ছিল। কিন্তু তোমরা উল্টো রকম দেখ। আমার প্রত্যেক চাল-চলনের উপর তুমি গুপ্ত পুলিশ হয়ে বসে আছ, বলতে হয়! এই সব কথার পর আমরা আপন আপন কাজে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু তার পরদিন হইতে, ওঁর আহারের গ্রাস নীরবে গুণিয়া দেখিতে আমার ইচ্ছা হইল। কিছুদিন পরে, নিয়মপূর্ব্বক প্রায় ৩২ গ্রাস খাওয়া হইতেছে, তাহার অধিক নহে, এইরূপ আমি বুঝিতে পারিলাম। এই সমস্ত বিষয়, যারা উপরি-উপরিভাবে দেখে তারা লক্ষ্য করিতে পারে না, যারা এই বিষয় বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখে তারাই জানিতে পারে।

খৃষ্টাব্দ ১৮৯৯।

এই বৎসরে আমরা মহাবলেশ্বরে না গিয়া লোনৌ-লিতেই ছিলাম। সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় বাহির হইয়া বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইত এবং গায়ে খুব ঘাম হইত। এই অবস্থাতে বাড়ী আসিয়াই ভিতরে ঢুকিয়া কাপড় বদলাইয়া আবার তখনই বাহিরের বারা-ন্দাতে উনি পুস্তক পড়িতেন কিংবা পড়া শুনিতেন; আহারের সময় পর্য্যন্ত সেইখানেই বসিয়া থাকিতেন। জুনমাসের আরম্ভে দুই এক পসলা বৃষ্টি পড়বার পরেই, উনি নিত্যক্রমানুসারে দুইবার বেড়াইয়া আসিয়াই আবার বাহিরের বারান্দায় বসিতেন। প্রথমেই হাওয়া একটু ঠাণ্ডা হইয়াছিল এবং ঘাম-গায়ে গা খুলিয়া থাকায় ঠাণ্ডা লাগিয়া কিডনীর (মূত্রগ্রন্থীর) পীড়া হইল। তখনি আমরা বোম্বায়ে গেলাম। ঔষধোপচার ও সেক দিবার পর পীড়ার জোর একটু কম হইল; কিন্তু এই সময়ে আবার জোরে পীড়াটা ফিরিয়া আসিল, এবং ইহার দরুণ অনেকদিন কষ্টভোগ হইল। জুনের শেষে এক রবিবারে সমস্ত সকালবেলাটা কোর্টের কোন কাজ ও সেই সম্বন্ধীয় আইনের কেতাব দেখিয়া, তাহার উপর চিহ্ন দিয়া যাইতে লাগিলেন। দুপুরের সময় আহারান্তে আমাকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—“আজ আমার কিছু বিশেষ কাজ আছে, কেহ সাক্ষাৎ করিতে এলেও আমি কাজে আছি এইরূপ বলতে চোপদারকে হুকুম দেও এবং তুমি আজ ছেলেদের এ দিকে আসতে দিও না, এই কথা বলিয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। আমি চোপ-দারকে আদেশ শুনাইয়া বলিলাম—“তোমাদের মধ্যে একজন কাছে থাক, হয়ত দরকার হতে পারে। আমি বাহিরের ঘরে ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি। ডাক দিলে শুনতে পাব না বলে বলচি।” এইরূপ বলিয়া আমি অন্য ঘরে ছেলেদের লইয়া গেলাম। প্রায় তিনটা, সাড়ে তিনটার সময় ফলের চাকলা ও আঙ্গুর পিরিচে রাখিয়া সেই পিরিচ ওঁর সম্মুখে রাখিলাম এবং “চা আনব কি?” এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। এই সময়ে খুব একাগ্রতার সহিত লিখিতেছিলেন; তাই উপরদিকে না চাহিয়া বলিলেন—“এখন আমাকে একটি কথাও বোলো না, আমি কাজে আছি।” আমার কাজ হয়ে গেলে আমি তোমাকে ডাকব। আমি নীরবে বাহির হইয়া গেলাম। তার পর প্রায় পোনে ঘণ্টার পর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—“এখন তোমার জলখাবার, চা, জল যা থাকে আনো।” এই কথা বলিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া আসিয়া উনি বাহিরে যাইবার জন্য কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন। আমি চা ও অন্য কিছু জিনিস উপরে লইয়া আসিয়াছিলাম, এমন সময় প্রার্থনাসমাজ হইতে শিবরাম সিপাই আসিয়া বলিল—“আজ উপাসনা আপনাকে করতে হবে, এইরূপ সেক্রেটারি বলেছেন।” এই কথা শুনিয়া আমার একটু রাগ হইল এবং আমি বলিলাম—“বলেছেন” এইরূপ বলা অপেক্ষা “হুকুম করেছেন” এইরূপ বল্লে আরও শোভা পেত!! ছি? তিনি একটা চিঠিও লিখলেন না? তোকে দিয়ে বলে পাঠালেন—আর তাও পাঁচটার সময়!! শিবরাম কি আর বলবে, সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু উনি বলিলেন—“ওর অপরাধ কি—ওর কাজ কথা নিয়ে আসা! ও বেচারাকে ধম্‌কাচ্ছ কেন!” শিবরাম তুই যা, বলগে আমি আস্‌ছি। তখন পুস্তক আগাইয়া দিয়া আমি একটু রাগের সহিত বলিলাম—“আমার মনে হচ্চে যে, যত কোর্টকানা তোমার খাওয়া দাওয়া নিয়েই। এতক্ষণ কোর্টের কাজ হল। এখন সমাজের ধর্ম্মের কাজ এল। একদিকে কাপড় পরা চলচে, আমার হাতের জিনিস ও চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে, সেদিকে এক-বারও সময় হয় না।” এই কথা শুনিয়া পোষাক পরার ক্ষান্ত হইলেন। এবং আমার হাত হইতে জলখাবার লইয়া একটু খাইলেন ও চাও পান করিলেন; তখন

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজ পাঁচ ছয় ঘণ্টা বসে; কাজ করবার মত বড় কাজ ছিল?" তখন উনি বলিলেন "আমার সঙ্গে তুমি ত প্রার্থনা সমাজে আসচ, তাহলে গাড়িতেই বলব।" আমি "আচ্ছা" বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলাম এবং ছেলেদের কাপড় পরাইয়া সিপাইর সঙ্গে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। খানিকক্ষণ ওঁর প্রার্থনা সঙ্গীত দেখা হইলে পর, আমারদিকে চাহিয়া বলিলেন—একটু আগে আমার কাজ সম্বন্ধে তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে, আজকের মোকদ্দামাটা খুব গুরুতর রকমের। আমরা যে কয়জন জজ ছিলাম, আমরা সবাই ৫।৬ দিন ধরে তর্কবিতর্ক করেও একমত্ হতে পারি নি। তথাপি কাল আমাদের রায় দিতে হবে। এবং ঐ রায় আমাকে লিখতে হবে,—আমার জুড়িদার জজদের চিঠি কাল সন্ধ্যার সময় এসেছিল সেইজন্য আজ সকালে ও সন্ধ্যাকালে একটু বেশীক্ষণ বসতে হয়েছিল। খুনের মোকদ্দামা তার মধ্যে ধাববড়া:কর ৬ জন ব্রাহ্মণ লিপ্ত আছে। এই কথা বলিতে বলিতে গাড়ী প্রার্থনা সমাজের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং আমরা নামিয়া সমাজে গেলাম। সকাল হইতে কাজ করিয়া ক্লান্ত হইলেও সেই দিনের প্রার্থনা ও উপাসনা পূর্ব্বেরই মতো অতিশয় প্রেম-রসাপ্লুত ও ভক্তিপূর্ণ হইয়াছিল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ওঁর একটু অসুখ করিতে লাগিল। এবং যেন জ্বর আসিবে এইরূপ মনে হইল। রাত্রিতে আহারের পর নিত্যানুসারে কিছুই পাঠ করিলেন না। "আমার শীত করচে ও গা বেদনা করচে", "একটু গা টিপে দিলেই ভাল হবে" বলিয়া আমি গা টিপিতে বসিলাম। হঠাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে গা খুব গরম হয়ে উঠিল ও চার পাঁচ মিনিটের পর বারম্বার উঠিতে হইতেছিল বলিয়া গমের পুল্টিস ও গরম-জলে-ভরা রবার-ব্যাগের শেক পেটের উপর ও পিঠের দিকে, কিড্‌নীর উপর দিকে দেওয়া হইতে লাগিল। কিন্তু উপরে-কথিত-অনুসারে বারম্বার উঠিতে হইতেছিল বলিয়া ঘুম একেবারেই হয় নাই। তার পর দিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হালে দশ বারো দিন বেশ ভাল বোধ করছিলে, তার পর আজ এরকম কেন হল? পেটে ও পিঠে বাতাস লেগেছিল কি?" তখন উনি বলিলেন "বাতাস লাগে নি, কিন্তু একটু আলুসেসি করে একটা চুরুট খেয়েছিলেম, মনে হয়। দুপর বেলায় জজমেণ্ট লিখতে বসেছিলাম সেই সময় মনের মধ্যে যে সকল যুক্তি আঁটছিলাম তার কোন ব্যত্যয় না হয়, একেবারে সমস্ত লিখে ফেলব মনে করে লেখা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যে উঠে বাহিরে যেতে আলস্য করেছিলাম। কিন্তু এই সমস্ত শেষ করতে ৪ মাস লাগল, এটা সে সময় আমি বুঝতে পারি নি, তাতেই এই রকম হয়েছে। আমি বলিলাম—"এখন পীড়া অল্প হয়েছে, এখন একটু অবহেলায় কি আর হবে? জজ্‌মেণ্ট লেখা হয়েছে, তাতেই বা কি হয়েছে? কিন্তু একটা কাজের মধ্যে কি উঠতে নেই? একটু আলস্যের দরুন দেখ দেখি এখন কত ভুগতে হচ্চে। কাল সমস্ত দিন কত কষ্ট গেছে। সন্ধ্যাকালে যে একটু বিশ্রাম করবে তাও হয় নি; সমাজের কাজের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। তার, রাত্রে যদি ভাল ঘুম হত তাহলেও কতকটা শ্রান্তি দূর হয়ে সকালে একটু স্ফূর্ত্তি, হত, কিন্তু তাও হল না। তাছাড়া, কাল ও আজ কোর্টের কাজ থাকায় আদপে বিশ্রাম পাওয়া যায় নি। আজও কোর্ট আছে। এই রকম পরিশ্রম পূর্ব্বের মতো করলে শরীর বেচারা আর কি করবে? মন সদাসর্ব্বদাই আপনার ভাবে আছে। মন যা ইচ্ছা তাই করে কিন্তু তার জন্য শরীরের সকল দিকেই দুরবস্থা হয়। শরীর শ্রান্ত হয়ে পড়ে।" আমার এই সমস্ত কথা উনি শান্তভাবে শুনিয়া গেলেন। নিত্যকার অভ্যাস ওঁর এইরূপ ছিল যে, কোন লোক যদি আবেশ ভরে কিংবা রাগিয়া কোন কথা বলিত,—তিনি তার কথা একটু হাসিয়া শান্তভাবে শুনিয়া যাইতেন এবং তার কথা শেষ হইলে এইরূপ উত্তর দিতেন যে, তাহা হইতে সেই ব্যক্তি নিজের বিচারণার দোষ দেখিতে পায় এবং মনে মনে লজ্জিত হয়। আমার উপরি উক্ত কথা শেষ হইলে, অনেকক্ষণ পরে উনি বলিলেন যে, "এই দেখ, আমি প্রথমে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দেও।" আমি বলিলাম, "আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে না, আমি উত্তরও দেব না। তর্কের দ্বারা অন্যকে কুণ্ঠিত করবার তোমার অভ্যাস আছে।" আমার এই কথায় লক্ষ্য না করিয়া উনি বলিলেন—"পাগলের মতো একটা কিছু ধরে বসে আছ কেন? আমার কথাটাই শোন।" আমার একটু শ্রমের দ্বারা একজন জীব হয়ত বাঁচতে পারে, এরকম মনে হলে তুমিও একটু কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হও কি না?" আমি বলিলাম—"আমি শুধু না, যে-কোন ব্যক্তি আনন্দের সহিত প্রস্তুত হবে।" তখন উনি বলিলেন—"এরূপ যদি হয় তবে আগে জিজ্ঞাসা না করে নিরর্থক মনে মনে রাগ্‌লে কেন! ব্যামো বাধাবার কারও কি সখ্ আছে? মনুষ্য প্রত্যেক বিষয় বিচার করেই করে থাকে; এই রকম যখন জান তখন মিছামিছি কষ্ট পাও কেন? পরশুদিনের মোকদ্দমায় আমার জুড়িদারেরা ফাঁসি দেওয়াই স্থির করেছেন। এ বিষয়ে আমারই কেবল ভিন্ন মত। তাই কালকে জজ্‌মেণ্ট

লিখ্‌তে একটু বেশী সময় দিতে হয়েছে ও শ্রম করতে হয়েছে; মনে মনে যে যুক্তি এঁটেছি তা কাগজে যত-ক্ষণ না প্রকাশ করতে পারি, ততক্ষণ আর কিছু কর-বার জো নেই—তার মধ্যে উঠে গেলে কিংবা কারও সঙ্গে কথা কইলে একটা ব্যাঘাত হয়ে ঐ বিচার যুক্তি বিশৃঙ্খলিত হয়ে যায় এবং পুনর্ব্বার সেই যুক্তি জুড়তে কষ্ট হয়; তাই যদিও দুই একবার উঠ্‌ব বলে মনে করেছিলাম, তবু ওঠায় আলস্য করিলাম।" এই কথা বলিবার পর, নিত্যক্রম আরম্ভ হইল। রাত্রে জর আসিলেও, আহারের পর কোর্টে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা-কালে বাড়ী আসিয়া বলিলেন—"আজ দুই জনের প্রাণ বাঁচলো। তাদের ফাঁসি স্থির হয়েছিল; সেই জায়গায় কালাপানির দণ্ড হল।

এই জুন মাসের মধ্যে প্রায় তিনবার,—চার দিন ভাল ও চার দিন শরীর খারাপ গেছে। তার পর ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় একমাস ওঁর শরীর বেশ ভাল ছিল। এই মাসে খাওয়া দাওয়া যাহা হওয়া উচিত তাহা হইত, নিদ্রাও বেশ হইত। তদনুসারে কোর্টের কাজ বাড়ীর নিত্যকার পুস্তকপাঠ, ব্যায়াম, এবং রাত্রে শুইবার সময় দাবা খেলিয়া শুইতে যাইতেন, এইরূপ নিত্যক্রম ছিল। জুলাই ২০শে তারিখ সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিয়া বলিলেন, "আজ আমার পেট ভাল নেই, অসুখ বোধ হচ্ছে। "রাত্রে ভাল না হলে, সকালে কিছু ঔষধ খেতে হবে"—এইরূপ বলিলেন। সেই রাত্রে খাবার সময় প্রথম ভাত ছাড়া অন্য কিছুই খাইলেন না। উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলে প্রথমে বেশ নিদ্রা হইল। প্রায় দুইটার সময় আমাকে জাগাইয়া বলিলেন—"আমায় বাহিরে যেতে হবে, আলো রাখ্‌তে বলে দেও," এই কথা বলিয়া পায়ে জুতা পরিলেন। আমার হাতে প্রদীপ ছিল, তাহা লইয়া আমি আগে আগে গেলাম এবং প্রদীপটা রাখিয়া নীচে গেলাম এবং উনানের জল উপরকার গরম জল আনিয়া অর্দ্দাযার উপর রাখিলাম। শৌচাদি করিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং আমাকে বলিলেন,—"এখনো আমার শরীরটা ভাল হয় নি মনে হচ্ছে। কাল থেকে পেট খারাপ হওয়ায় আমার সন্দেহ হচ্ছিল; যা সন্দেহ করেছিলুম তাই হল।" এইরূপ বলিবার পর আমি লোকজনদের উঠা-ইয়া, "সেক দিবার জন্য ফুটন্ত গরম জল রবারের ব্যাগে ভরে নিয়ে আয়" বলিলাম। তাহারা ঐ গরম-জলে-ভরা ব্যাগ আনিলে পর আমি ওঁর গায়ে সেক্ দিতে আরম্ভ করিলাম। সকালে ৮টা পর্য্যন্ত এইরূপ চলিতে লাগিল। একেবারে প্রভাত হইলে ডাক্তার আসিয়া শরীর পরীক্ষা করিয়া যে ঔষধ দিলেন তাহা এই সময় পর্য্যন্ত দুই তিন বার পেটে পড়িয়াছিল। কিন্তু ভাল হইল না বলিয়া, চীফ্-জষ্টিসকে চিঠি লিখিলেন যে, "পীড়ার দরুন আজ কোর্টে যাইতে পারিব না এবং কাল হইতে এক মাসের ছুটি চাহি তাহা যেন মঞ্জুর হয়।" এইরূপ পত্র পাঠাইবার পর উত্তর আসিল চীফ-জষ্টিস ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন। তার দুই তিন দিন পরে, একটু ভাল বোধ করিলে, এক মাস বান্দ্রায় সমু-দ্রের ধারে হাওয়া বদ্‌লাইবার জন্য ডাক্তার উপদেশ করিলেন। আমরা বান্দ্রায় গেলাম। সেখানে ডাক্তার রোজ আসিতেন এবং ঔষধপত্রও আরম্ভ হইল। তাতে করিয়া এই নূতন পীড়ায় যে দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল, তাহা কমিয়া গেল। কিন্তু দশটা ও সাড়ে দশটার মধ্যে হাত পায়ে সুরসুর্ করিয়া উঠিয়া একটু জোরে ভিতর-কার শিরায় খট্‌কা লাগিয়া হঠাৎ বুক আট্‌কাইবার মতো হইল। তাহার দরুণ ১০।১৫ মিনিট একেবারে হত-বুদ্ধির মতো হইয়া যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন! কোন প্রকার উগ্র গন্ধদ্রব্য আঘ্রান করিবার পর কিংবা উদ্গার উঠিবার পর, এই বুকের বাধা কম হইয়া ভাল বোধ করিতেন এবং তখনই ঘুমাইয়া পড়িতেন। আবার তার পরদিন রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত এই পীড়া আছে বলিয়া জানিতে পারাও যায় নাই। বাকী সমস্ত বিষয় নিত্য-ক্রমানুসারে পর-পর হইতে লাগিল, রোজকার খাওয়া দাওয়াও বাদ পড়ে নাই। ছুটি শেষ হইলে বান্দ্রা হইতে ফিরিয়া বোম্বায়ে আসিবার পর রোজ কোর্টে যাওয়া আরম্ভ হইল; এই নূতন নবাগত ও দারুণ পীড়ার জন্য আমরা যতটা মনে করিয়াছিলাম ততটা ভয় পান নাই। কিন্তু এই পীড়া ১৯০০ আগষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পুরাপুরী ছিল। বান্দ্রায় এই পীড়া যখন আরম্ভ হয় তখন হইতে কেবল উঁহারই এই পীড়া সম্বন্ধে কিছু বিশেষ সংশয় আসিয়াছিল এবং ইহার গতি কোন্‌দিকে তাহা বুঝিবার জন্য রাতদিন চিন্তা করিতেন। দুই তিন জন ডাক্তার প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আসিতেন এবং ঔষধ দিতেন। অনেক সময় তাঁহাদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা হইত—"তোমরা আমাকে ঔষধ দিচ্ছ এবং আমিও তা খাচ্ছি, কিন্তু কোন উপকার বোধ হচ্ছে না। তোমা-দের ঔষধের ফল হচ্ছে না, এইজন্য তোমরা দুই তিন জনে মিলে এক জায়গায় বসে ও ব্যামোটার লক্ষণ ঠিক্ করে তার পর কি ঔষধ দিতে হবে স্থির কর। এই-রূপ তিনজনের মতানুসারে যে ঔষধ স্থির হইল তাহা একমাসকাল সেবন করিলেন, তথাপি উপকার হইল না এবং পীড়াটার নিয়মিত সময় ও স্বরূপের একটুও ইতরবিশেষ হইল না। এই জন্য ওঁর ভাবনা বৃদ্ধি হইল। সত্য কথা বলিতে গেলে এই সকল ঐহিক

বিষয়ের ভাবনা দিন দিন কমিয়া আসিতে লাগিল এবং সেই জায়গায় উদাসীনতা আসিয়া জুড়িয়া বসিল। এই বৎসরে প্রথম প্রথমই ছোটখাট ব্যবহারিক বিষয় সম্বন্ধে উদাসীনতা ত হইতই—এখন আবার প্রত্যেক বিষয়েই বেশী বেশী উদাসীন্য দেখা যাইতে লাগিল। কোর্টের কাজ ব্যতীত, অন্য সব সময়েই পুস্তক পাঠ করিতেন, কিন্তু তাহাতে সমস্ত সময় সমানভাবে মনোযোগ দিতেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ একদিকে যখন পুস্তক পাঠ চলিতেছে, সেই সময় মন অন্য কোন বিষয়ে নিমগ্ন দেখা যাইত; এইরূপ যে ছেলে পুস্তক পড়িয়া শুনাইত সে ভুল করিলেও এই সময় তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন না,—তাই আমার এইরূপ মনে হয়। ঘর কন্নার কোন কথা সম্বন্ধে উঁকে জিজ্ঞাসা করিলে উনি বলিতেন যে, "সাংসারিক ঘরকন্না সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে অনর্থক আমাকে কষ্ট দিও না; এ সব কাজ তোমার। তুমিই তা দেখবে।" এই প্রকারের কোন-কিছু উত্তর দিতেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

নববর্ষের উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমাদের প্রভু, আমাদের পিতা আজ এখানে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন, আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর। তিনি আমাদের মুখ খুলিয়া দিন, হৃদয়মন উন্মুক্ত করিয়া দিন, যাহাতে নিরবধি তাঁহার গান করিয়া সকলের প্রাণমন টানিয়া আনিয়া তাঁহার পূজায় নিযুক্ত করিতে পারি। আমাদের সকলের হৃদয় হইতে আজ এই আনন্দ সঙ্গীত উঠুক—"ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম।" আমরা ক্রমাগত তাঁহারই পথে নির্ভীকহৃদয়ে অগ্রসর হইব আর গাহিতে থাকিব—"ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম।" যতই অগ্রসর হইব, ততই তাঁহারই নামের আনন্দগীতে হৃদয় উথলিয়া উঠিবে। আজিকার প্রভাতের অরুণকিরণের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে আনন্দের সহস্রধারা নামিয়া আসুক।

আজিকার শুভ দিবসের শুভ মুহূর্ত্তে দীনবন্ধু প্রাণেশ্বর আমাদের হৃদয়ে কতই কথা বলিতেছেন—পবিত্র হও, মানবের সেবা করিয়া ধন্য হও, সকলকে মাতৃভাবে আলিঙ্গন কর। কাণ পাতিয়া শোন, তাঁহার এই সমস্ত বাণী স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে। তাঁহার পবিত্র চরণে আপনাকে নিবেদন করিয়া দাও, তাঁহার অনাহত সুরের বাণী নির্ঝরিণীর মত পরিষ্কার ও মিষ্ট হইয়া নামিতেছে শুনিতে পাইবে। আজি আমরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি—তাঁহার অরূপ রূপের কি আশ্চর্য্য জ্যোতি! এই অরূপ জ্যোতির রূপ ছাড়িয়া দিয়া অন্য কোন রূপের চরণে আপনার হৃদয়মন সমর্পণ করিব? সমস্ত ছাড়িয়া আজ অবধি তাঁহার অরূপ রূপেরই গাথা গাহিতে থাক—হৃদয়ে আশ্চর্য্য বল পাইবে। আজ তাঁহার রূপের কি-ই বা দেখিতেছি —যতই আত্মনিবেদনে অগ্রসর হইয়া চলিব, ততই নিত্য নূতন নূতন রূপের নবতর সৌন্দর্য্য চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। সেই আশাতেই আজ আমাদের হৃদয় অধীর হইয়া উঠিতেছে। তিনি দয়াময় প্রভু, তাঁর কৃপা ক্রমেই ফুটিয়া উঠিবে, তাঁর অনাহত সুরে নূতন নূতন বাণী, নূতন নূতন সঙ্গীত শুনিতে পাইব, নিত্য নব নব দান হৃদয়ে উপলব্ধি করিব, এই আশা লইয়াই আজ আমরা তাঁর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি।

এই ব্রহ্মাণ্ডচক্রে তাঁর জ্ঞান ও শক্তি কত রকমে প্রকাশ পাইতেছে। আজ পর্য্যন্ত প্রতিদিনই তো তাঁর করুণার পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু সেই অনন্ত স্বরূপের করুণার সীমা কোথায়? সেই অনন্ত পুরুষের অসীম করুণার আরও অজস্র পরিচয় পাইব, নূতন বৎসরে সেই আশাই হৃদয়ে জাগিতেছে। তাঁরই নামের জয়জয়কার করিয়া কত আশ্চর্য্য লীলা আমাদের জীবনে দেখিতে পাইব, সেই আনন্দেই আমরা সকলে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি আমাদের নেতা; তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা বিধাতা। সাক্ষ্যশিশিরের মত তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকে শতধারে নামিতেছে প্রত্যক্ষ কর। তাঁর করুণা রক্ষাকবচ হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে হৃদয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর—একদিন সহসা তাঁর সর্ব্বপ্রকাশ মূর্ত্তি উপলব্ধি করিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। তাঁর প্রেম যতই উপলব্ধি করিব, ততই তাঁর মহিমা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় নয়নের সম্মুখে

উদ্ভাসিত দেখিয়া ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনেঅর্জ্জুনের মত আত্মবিহ্বল হইয়া পড়িত।

এই সংসারে দুঃখ যে আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সহস্র দুঃখবিপদ আসুক, সেই রুদ্রদেব সমস্ত দুঃখদুর্দিন নিজের মাভৈঃ মূর্ত্তিতে আসিয়া কাটাইয়া দেন; তিনি সবলে বলিয়া দেন—মাভৈঃ মাভৈঃ—ভয় করিও না, কোন চিন্তা নাই। তিনি যে আমাদিগকে ভাল বাসেন, তিনিই যে আমাদের ভয়ভাবনা নিজেই বহন করিবেন। আমরা স্থির জানি যে, তিনিই যথা সময়ে সুদিন দিবেন, আর তিনিই নিত্যই আমাদের পার্শ্বে থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। দুঃখকষ্ট আসিলেই বা কি? তিনি যে দুঃখকষ্টের অতীত। আমরাও যখন তাঁর সন্তান, তখন আমাদেরও তাহাই হইতে হইবে। আমরাও দুঃখকষ্টের অতীত হইব এবং তাঁরই জয়গান গাহিব। সম্মুখে শতসহস্র বিপদ আসিয়া যতই কেন ভয় দেখাক না, ভয়ের কোনই কারণ নাই; তিনি যখন আমাদের নিত্যসঙ্গী, তখন আমাদের কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য?

ঋষিরা বলিয়াছেন ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হইয়া যান। কি আশ্চর্য্য কথা, কি মহান, কি গভীর, কি সুন্দর কথা! তাঁকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিলেই তো তাঁর সঙ্গে এক হইয়া যাইব—কি আশ্চর্য্য কথা। ঋষিরা ঠিকই বলিয়াছেন যে সেই পুণ্য স্বরূপকে একটীবারও প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিলে সমস্ত পাপ সমস্ত দ্বন্দ্ব দগ্ধ হইয়া যাইবে—দগ্ধ হইয়া যাইবে।

তাঁহার কাছে থাকিব, তাঁহার সহর অনুচর হইয়া থাকিব, তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন করিব—ইহা মনে করিলেও আনন্দে ডুবিয়া যাইতে হয়। পশ্চাতে আমরা চাহিব না। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ফিরিবার নহে। তাহার ফলাফলের জন্য কিছুমাত্র ভাবিবার প্রয়োজন নাই—মঙ্গলবিধাতা পুরুষ সমস্তই তাঁর মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করিবেন। এই আশা তিনি আমাদের হৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছেন—এ আশা একদিন নিশ্চয়ই সফল হইবে। এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমরা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিবে।

এই পথ ধরিয়া পূর্ব্বে পূর্ব্বে কত আত্মীয় স্বজন চলিয়া গিয়াছেন! তাঁহাদের সঙ্গে আমরাও যখন এই পথে মিলিতে পারিব তখন কত আনন্দ, কত সুখ! তখন দেখিব, বুঝিব যে ঈশ্বরকে যাঁরা প্রীতি করেন, সকলেই একই প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। তখন তাঁর মহিমা কত উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিব! শক্তিময় মহাপুরুষেরা যাঁহাকে জানিবার জন্য পাগল, আমরাও তাঁহাকে জানিয়া শক্তিময় হইয়া উঠিব।

তাই আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে বন্ধুগণকে বলিতে চাহি—উঠ, জাগ, শ্রদ্ধা ও প্রীতির কুসুমাঞ্জলি তাঁর চরণে নিবেদন করিয়া তাঁকে জান, এবং ধন্য হও। সংসারের মেঘকুজ্ঝটিকা ছাড়িয়া উপরে উঠ, সূর্য্যের আলোকে আপনাকে ভাসাইয়া দাও। নীচে ঘুরিয়া বেড়াইও না, প্রাণেশ্বরের হাত ধরিয়া নির্ভয়ে পর্ব্বতের শিখরে চড়িয়া যাও। যে আনন্দ হাসি চারিদিকে ছড়াইয়া আছে, নিজের চক্ষে তাহা দেখিয়া, নিজের প্রাণে তাহা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হও। তাঁহার আহ্বান আমাদের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠুক; আমাদের সঙ্গীত মিষ্ট হউক; আমাদের সমবেত হৃদয় হইতে এমন জয়ধ্বনি উত্থিত হউক, যেন সমস্ত জগতে ব্রহ্ম নামের একটা সাড়া পড়িয়া যায়।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

শঙ্করা—চৌতাল।

জাগিতে হবে রে;
মোহ নিদ্রা কভু না রবে চিরদিন,
ত্যজিতে হইবে সুখ-শয়ন অশনি-ঘোষণে।
জাগে তাঁর ন্যায় দণ্ড সর্ব্ব ভুবনে।
ফিরে তাঁর কাল চক্র অসীম গগনে;
জ্বলে তাঁর রুদ্র-নেত্র পাপ তিমিরে॥

নববর্ষে বিশ্বরাজ।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

শুভাগত ঋতুরাজ আজি ধরাতল মাঝে।
শোভাময় ধরাধাম তাই নানা নব সাজে ॥
নব কিশলয়দলে সাজিয়াছে তরুদল।
তরুশাখে বসি গায় পিকবধূ অবিরল ॥
সুবাসিত চারিদিক চ্যুতমুকুলের বাসে।
মলয় অনিল সাথে অমৃতে হৃদয় ভাসে ॥
প্রাণঘাতী শীতঋতু ধরা হ'তে গেছে চলি।
নানা নব ফলে ফুলে শোভাময় বনস্থলী ॥
ধরিয়া অতুল শোভা তপন উদিত হয়।
প্রকৃতির নব সাজে জগত আনন্দময় ॥
ধরিয়া প্রকৃতি হেন মানসমোহন রূপ।
জানায় প্রকাশ তাঁর যিনি অসীমের ভূপ ॥
ওই যে বৃক্ষের শাখে নব কিশলয়দল।
ওই যে সুগন্ধময় কুসুম সুরস ফল ॥
ওই যে তরুর শাখে বসিয়া কোকিল গায়।
ওই যে বহিছে ধীরে সুখদ মলয়বায় ॥
একত্র শোভিত হয়ে ওরা বিশ্বজনে কয়।
সুখময় রাজ্য তাঁর নাহি তথা কোন ভয় ॥
তমিস্রা রজনী আজি চন্দ্রকরোজ্জ্বল হ'য়ে।
অনন্ত শোভার রাশি আপন শরীরে লয়ে ॥
জানায় জগতজনে শোন বিশ্ববাসিগণ।
আনন্দ স্বরূপ তিনি জগতের সারধন ॥
অনন্ত রাজত্ব তাঁর সতত আনন্দময়।
শোভাময় রাজ্যে তাঁর নাহি জরামৃত্যুভয় ॥
নক্ষত্র মণ্ডল ওই দূর দিগন্তের কোলে।
কি সুন্দর শোভা পায় অসীম গগন তলে ॥
দূর দূরান্তর হতে ওরা বিশ্বজনে কয়।
তোমার ক্ষুদ্রত্ব হের হে মানব ক্ষুদ্রাশয় ॥
নিজের মহত্ত্ব ল'য়ে হয়োনা গর্বিত আর।
মহত্ত্ব তাঁহার যিনি "ভূমা" জগতের সার ॥
অনন্ত স্বরূপ তিনি অসীম আনন্দকায়।
অনাদি কারণ তাঁরে কেহ জ্ঞানে নাহি পায় ॥
হে মানব ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিশ্বের নগণ্য জন।
বৃথা গর্ব্ব দূর করি লহ তাঁহার শরণ ॥
জানিলে তাঁহারে দূরে যাবে চলি সব ভয়।
অসীম রাজত্ব তাঁর অনন্ত আনন্দময় ॥

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে নববর্ষ উপলক্ষে নিম্ন লিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
শ্রীমতী মনীষা দেবী	১৲
শ্রীমতী সরোজিনী দেবী	১৲
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল	১৲

আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভা ১৭ই ফাল্গুন ১৮৪১শক।

গত ১৭ই ফাল্গুন রবিবার সভাপতি মহাশয়গণের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বালীগঞ্জস্থ ভবনে আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার অধিবেশন হয়।

উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক, শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র বড়াল, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অধ্যক্ষসভার সভ্য নিযুক্ত হউন এবং মহিলাসভ্যগণ সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলেও পত্র দ্বারা তাঁহাদের মতামত জানাই-বার অধিকার দেওয়া হউক :—

(১) শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চৌধুরী, (২) শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়, (৩) শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, (৪) শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, (৫) শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী, (৬) শ্রীমতী নলিনী দেবী, (৭) শ্রীমতী শোভনা দেবী এবং (৮) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

স্থির হইল — সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হউক এবং উপরোক্ত ব্যক্তিগণ অধ্যক্ষসভার সভ্য হইতে সম্মত কি না তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হউক।

২। শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী প্রস্তাব করেন যে, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায়কে অধ্যক্ষসভার সভ্য করা হউক এবং তিনি সভ্য হইতে সম্মত আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হউক। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় সমর্থন করিলেন।

সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তদনন্তর ১৩ই ফাল্গুনের বিজ্ঞাপনোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত হইল।

৩। নূতন ট্রষ্টী নিযুক্ত করা যাইতে পারে কিনা আলোচিত হইল।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় আদিসমাজের ট্রষ্ট-ডীড পাঠ করিয়া বলিলেন যে বর্ত্তমান ট্রষ্টীগণ ইচ্ছা করিলে তিনজন বা ততোধিক ট্রষ্টী নিয়োগ করিতে পারেন।

স্থির হইল—বর্ত্তমান ট্রষ্টীগণ ইচ্ছা করিলে তিন বা ততোধিক ট্রষ্টী নিয়োগ করিতে পারেন।

৪। শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক প্রস্তাব করিলেন—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অন্যতর ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবার জন্য বর্ত্তমান ট্রষ্টীগণকে অনুরোধ করা হউক।

সভাপতি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের পোষকতায় বলিলেন যে, ক্ষিতীন্দ্রবাবু আদিব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনে যেরূপ পরিশ্রম করেন, তাহাতে তাঁহাকে ট্রষ্টী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বলা যাইতে পারে।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এবং সভাপতি মহাশয়দিগের অভিপ্রায়মতে স্থির হইল—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আদিসমাজের অন্যতর ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবার জন্য বর্ত্তমান ট্রষ্টীগণকে অধ্যক্ষসভা হইতে অনুরোধ করা হউক।

৫। আদিসমাজের গৃহবিক্রয়ের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী বলিলেন যে, আদিসমাজের বর্ত্তমান স্থান উপাসনামন্দিরের উপযুক্ত স্থান নহে। বিশেষতঃ মহিলাদিগের তথায় যাইবার পক্ষে অনেক অন্তরায় আছে। কলেজ স্কোয়ারের সন্নিহিত স্থানের ন্যায় কোন স্থানে সমাজকে স্থানান্তরিত করিলে উপাসকসংখ্যা এবং আদিসমাজের কার্য্যক্ষেত্রপ্রসারের বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

স্থির হইল—বর্ত্তমান ট্রষ্টীগণ কিভাবে আদিসমাজ গৃহ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, পত্রদ্বারা সে বিষয়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানা হউক।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদিসমাজকে স্থানান্তরিত করিবার সমর্থক পত্র সভাপতি মহাশয়ের হস্তগত ও পঠিত হইল।

৬। জোড়াসাঁকোস্থ মহর্ষি-ভবনের উপাসনার দালান ইত্যাদি বিক্রয় হইলে কি করা কর্ত্তব্য আলোচিত হইল।

স্থির হইল—এ সম্বন্ধে মহর্ষিপরিবার কি করিতে চাহেন, তাহা জানা হউক।

৭। আদিসমাজের দ্বারা সমাজ-সংস্কার কতটা হইতে পারে তদ্বিষয়ে আলোচিত হইল।

স্থির হইল—ট্রষ্টডীড অনুসারে আদিসমাজ গৃহ উপাসনাক্ষেত্র মাত্র। সমাজ-সংস্কার আদিসমাজের সভ্যদিগের উপর ব্যক্তিগত ভাবে রাখিয়া দিলেই ভাল হয়।

৮। উপাসনাপদ্ধতির সংস্কার বিষয় আলোচিত হইল।

সিতিকণ্ঠ বাবু বলিলেন যে, আদিসমাজের উপাসনাপদ্ধতি হইতেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-পদ্ধতি গৃহীত এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্রাহ্মসমাজদ্বয়ের উপাসনাপদ্ধতির ভিতরে "ওঁ নমস্তে সতে তে" এবং "অসতোমা সদ্গময়" মন্ত্র দুইটি সংস্কৃত ভাষায় থাকিলেই ভাল হয়, কারণ "অসতোমা" মন্ত্রের বাঙ্গালা অর্থ সংস্কৃত মন্ত্রের ন্যায় শ্রুতিমধুর হয় না। আদিসমাজের উপাসনায় "ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" মন্ত্রের সংক্ষেপ ও বিবৃত ব্যাখ্যা থাকিলে ভাল হয়। তিন সমাজই যখন ব্রাহ্মসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত, তখন উপাসনাপদ্ধতি বিষয়ে কতকটা সামঞ্জস্য থাকিলে ভাল হয়। "ওঁ সপর্য্যগাৎ" মন্ত্রটী সুখোচ্চারণ নহে বলিয়া সেটী পাঠ করা বা না করা বিষয়ে আচার্য্যকে স্বাধীনতা দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৯। অনুষ্ঠানপদ্ধতির সংস্কারের ঔচিত্য আলোচিত হইল।

মহর্ষিদেব প্রচারিত অনুষ্ঠানপদ্ধতির সংস্কারসাধনের ঔচিত্য সকলেই স্বীকার করিলেন। সকলেই যাহাতে অনুষ্ঠানপদ্ধতির সাহায্যে গৃহ্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারেন, সেই ভাবেই উহার সংস্কার সাধন আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইল।

স্থির হইল—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণে গঠিত সমিতির উপর অনুষ্ঠানপদ্ধতির সংস্কার সাধনের ভার অর্পিত হউক :—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সহকারী সম্পাদক সভাপতি
২৫ চৈত্র, ১৮৪১ শক ১লা বৈশাখ, ১৩২৭ সাল।

বিংশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৯১

৯২২ সংখ্যা ১৮৪২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

ভগবৎ মহিমা।

(ডাক্তার সার গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বে অস্মাৎস্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ॥
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা॥

মুণ্ডক ২।১।৯

"ইঁহা হইতে সমস্ত সমুদ্র ও পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে, ইঁহারই দ্বারা সমস্ত নদী বহিতেছে, ইঁহা হইতেই সমস্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষ উৎপন্ন হয় ও তাহাতে রসের আবির্ভাব হয় এবং সেই রসের দ্বারা এই মানবের অন্তরাত্মা ভৌতিক শরীরের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে (মনুষ্য জীবিত থাকে)"।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

মুণ্ডক ২।১।৩

"ইঁহা হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং সমস্ত বিশ্বের ধরিত্রী এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।"

পরমেশ্বর সমুদ্রের জলকে রূপ দিয়া তাহাকে বৃষ্টিরূপে পর্ব্বতের উপর নিপাতিত করেন; তাহার পর নদীসকল চারিদিকে বহিতে থাকে। বৃষ্টি ও নদীর জলে বৃক্ষাদির চারা গজাইয়া উঠে এবং ধান্য উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। এই সমস্ত পদার্থ পরমেশ্বর-কৃত এবং এই সমস্ত রচনা তাঁহারই। তিনি পৃথ্বী, জল প্রভৃতি পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঐ সকল ভূত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইবে বলিয়া তদনুরূপ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু বাহ্য ইন্দ্রিয়াদি হইতে অন্তরাত্মায় যে অনুভূতি হয় তাহা মনোরূপ অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা মনের উপর কোন বিষয়ের ছাপ না পড়িলে আমাদের সেই জ্ঞান হয় না। মন অন্যত্র নিমগ্ন থাকিলে সেই বিষয়ের জ্ঞান হয় না। এই মন পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং এই সমস্ত দেহাত্মব্যাপার চলিবার জন্য দেহের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার তিনিই করিয়াছেন। পরমেশ্বর, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক জগতের পরস্পর যোগ এই প্রকারেই সংসাধন করিয়াছেন। তিনিই চক্ষুরিন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু আলোক না থাকিলে ঐ ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা কি? উহা যাহাতে সার্থক হয় এইজন্য আলোক সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্ন আমাদের আবশ্যক বলিয়া, পৃথিবীতে যাহাতে অন্ন উৎপন্ন হয় এইরূপ আশ্চর্য্য যোজনা তিনি করিয়াছেন। এইরূপ অনেক বিষয় আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে কে সমর্থ? সারাংশ, ঈশ্বরের মহিমা অগাধ, তাঁহার নিয়ম সূক্ষ্ম ও ব্যাপক, তাঁহার ব্যবস্থা ও যোজনা পরিপূর্ণ ও অবাধ।

———

বিদায়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঝিঁঝিট।

হে সংসার তোমার কাছে
আজি লইনু বিদায়।
শুনিতে আর পারি নাকো
ছোটখাটো হায় হায়॥
অনন্তের সাগর পানে
ভাসায়ে দিয়েছি তরী।
সব দিয়েছি ছেড়ে ছুড়ে
হাল ধরেছেন হরি॥
কাঁদছ সবাই কেন গো
আকাশ জুড়িয়া আজ?—
যেন কত পাপ করেছি,—
কতই অন্যায় কাজ॥
কেঁদে কেটে আর আমাকে
ডেকোনা ডেকোনা পিছে।
এতদিনে সব বুঝেছি—
সবি ফাঁকি—সবি মিছে॥
তবু আমি যাবার আগে
দিচ্ছি সবে আলিঙ্গন।
নিতে যদি হওগো রাজী
খুলে প্রাণ খুলে মন॥

রাণাডের-স্মৃতিকথা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

খৃষ্টাব্দ ১৯০০ সেপ্টেম্বর মাস।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

আগষ্ট মাসে যে সময় আমরা বাম্বায় ছিলাম সেই সময় আর এক নূতন পীড়ায় আক্রান্ত হইবার কথা উপরে লিখিয়াছি; সেই পীড়ার দরুণ ডাক্তারের যে ঔষধো-পচার চলিতেছিল ও সর্ব্বাঙ্গে এক প্রকার ঔষধী তৈল রোজ রাত্রে মালিস করিতে হইত তাহাও বলিয়াছি। তদনুসারে প্রতিদিন রাত্রে আহারান্তে আমি ও ছেলেরা মালিস করিতাম এবং কখন কখন আমার ননদও মালিস করিয়া দিতেন। এই সময় চিরঞ্জীব সখু, তারা, নানু ও শান্তা সেইখানেই খেলিত ও কথাবার্ত্তা কহিত; শাশুড়ী-ঠাকুরুণ ও অন্যান্য ব্যক্তিও সেই সময় বৈঠকখানায় আসিয়া বসিতেন। একদিকে তৈল মালিস হইতেছে, সেই সঙ্গে সমস্ত দিন কি কি কাজ করা হইল তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে; সেই সম্বন্ধে টীকা টিপ্পনী করিয়া উনি ঠাট্টা তামাসা করিতেন। এই চার ছেলে যখন তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া খেলা করিত তখন তিনি ১০টা ১০৷৷০ পর্য্যন্ত এইরূপ আমোদ আহ্লাদে কাটাইতেন। বড় মেয়েরা যে দিন কোন কাজে নীচে ব্যাপৃত থাকিতেন সেইদিন আমরা দাবা খেলিতাম। কখন কখন যেদিন ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িত সেইদিন আমি, ছেলেরা ও আমার ননদ আমরা পালায় পালায় গান গাহিতাম। আমাদের সবার চেয়ে ননদের গলা খুব ভাল ও মধুর ছিল। এবং ভগবদ্ভক্তদিগের প্রেমপূর্ণ ও ভক্তিপর গান, মীরাবাই ও কবিরের পদাবলী প্রভৃতি গান তাঁর অনেক জানা ছিল। তাঁর গানে নূতন শিক্ষায় কোন সংস্কার না থাকায় তিনি পুরাতন সাদাসিধা ভাবেই গাহিতেন, কিন্তু খুব ভাল গাহিতেন। তাঁর গানের মধ্যে "রাঙ্গাবাই," "কাহ্নু পাত্রা" "কাতারী," "চিন্ধী," "আটী," "গাঠোড়ে" প্রভৃতি গান ওঁর খুব ভাল লাগিত এবং ঐ সকল গানই উনি ননদকে গাহিতে বলিতেন। চার শিশুর মধ্যে সকলের যে ছোট শান্তা (এ আবা-ভাউজীর মেয়ে) সে অতিশয় বক্তার ও লীলাময়ী ছিল। তার কথা আদুরে ও কোমল, তার স্বভাব মনমুগ্ধকর চিত্তাকর্ষক ও মধুর ছিল। কিন্তু আমা-দের সবার চেয়ে ওঁকেই সে খুব ভাল বাসিত এবং বাপমায়ের চেয়েও ওঁর উপরেই তার বেশী টান ছিল। এ স্বভাবতই খুব নকুলে। নিভুর্ল নকল করিয়া সকলকেই খুব হাসাইত। একদিন 'উনি' তাকে নিকটে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "অমুক অমুক লোকের বলা-কওয়া ও চাল-চলন কিরূপ দেখাও দিকি।" এইরূপ বলিমাত্রই তার নকল সুরু হইত। তারপর, পাচক ব্রাহ্মণ "বজারা" হইতে শাশুড়ীঠাকুরুণ পর্য্যন্ত পর-পর সকলের হুবহু নকল করিয়া ওঁকে ও আমাদের সবাইকে খুব হাসাইত। অন্য তিন ছেলে ঠাট্টা করিয়া তাহাকে জব্দ করিত। এইপ্রকারে কতকটা খেলা, কতকটা আমোদ-আহ্লাদ, কতকটা গল্প-গানে, আহারের পর ১০৷৷-টা পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইত। ইহার কারণ এই,—দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে বুকের মধ্যে যে অসুখ করিত, তাহা 'অর্‌গ্যানিক' নহে, তাহা শুধু 'নর্ভস',—এইরূপ ডাক্তার বলায়, অমুক সময়েই এই অসুখটা হইবে এইরূপ চিন্তা ও সেই সম্বন্ধে একটা অসোয়াস্তি ওঁর মধ্যে সর্ব্বদাই থাকিত; একটা নিয়মিত সময় ঐ অসুখটা আসে আমরা জানিতাম; তাই অন্য কোন বিষয়ে মন ব্যাপৃত হইয়া যাহাতে ঐ অসুখের কথা ভুলিয়া যান, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপ অন্য বিষয়ে মনকে ব্যাপৃত করিবার চেষ্টা করা সত্বেও একদিনের জন্যও এই ব্যামোটার সময়ের

ব্যতিক্রম হয় নাই। দশটা সাড়ে দশটার সময় বুকের মধ্যে যেন একটা আটক হইয়াছে এইরূপ মনে হইয়া প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত এবং হাত-পায়ে প্রথমে সুড়্সুড়ির মত হইয়া পরে সজোরে একটা ঝট্‌কার মত আসিত। তাহার পর, কোন উগ্র গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অনেকক্ষণ পরে, দুই চারিটা উদ্গার ও দুই একটা হাঁই উঠিত, তাহার পরেই সব সারিয়া যাইত ও ভাল বোধ হইত। কিন্তু এতটা শ্রমের পর শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়িত এবং তখনি বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িতেন। এইরূপ নিত্য হইত।

আমার নিজের সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখিব না, গোড়া হইতেই এই কথা আমি মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সংসারে স্বামীর সহিত স্ত্রীর সম্বন্ধ ছায়ার মতো হওয়ায়, ইহা যতই এড়াইবার চেষ্টা করিনা কেন, এড়াইতে পারি নাই। তাই 'ওঁ'র' বিষয় কিংবা মনের অবস্থা ঠিক বুঝিবার জন্যই যেখানে আমার নিজের সম্বন্ধে কথা আসিয়াছে, সেইখানেই আমার কথা বলিয়াছি। আমারও এক পুরাতন রোগ এই সময়েই আবার দেখা দিয়াছিল,—জোর করিয়াছিল বলিলে আরও ঠিক হয়। কখন্ ব্যামোটা আরম্ভ হইবে, কখন থামিবে তাহার কোন নিয়ম ছিল না।

এই বৎসরে জুনের শেষ হইতে ওঁর শরীর বরাবর সমান ভাল ছিল এরূপ নহে। জুন মাসে যে কিড্‌নীর পীড়া হইয়াছিল সেই সময় রাত্রিদিন ওঁর বিছানার কাছে প্রায় ৮।১০ দিন আমায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মাঝে মাঝে আমি খাটের কাছেই কেদারায় বসিয়া থাকিতাম, কিন্তু প্রতি পাঁচ মিনিটের পর ওঁর উঠিতে হইত বলিয়া ১০।১৫ দিন ক্রমাগত কাজ করায় ১৯ বৎসরের আমার একটা পুরাতন ব্যামো হালে আবার বাড়িবার মতো হইয়াছিল—এই উপলক্ষে আবার চাগিয়া উঠিল।

এক দিন নিত্যানুসারে আমি তেল মাখাইবার জন্য ওঁর নিকটে গেলাম এবং নীচে ঝাঁকিয়া যেমন তেল মাখাইতে যাইব অমনি পেটে একটা বেদনা হইল, আমি নীচে বসিয়া পড়িলাম। হাত-পায়ের সমস্ত শিরা টানিয়া ধরিল, অনেকক্ষণ সেইখানেই আমাকে আট্‌কিয়া থাকিতে হইল। সম্প্রতি আমি মিস্ বেন্‌সনের ঔষধোপচার সুরু করিয়াছিলাম; কিন্তু তার পর দিন তিনি আসিয়া আমার শরীর পরীক্ষা করিয়া স্পষ্ট বলিলেন—এই পীড়া অনেক দিনের পুরাতন। কেবল ঔষধোপচারে ইহা ভাল হইবে না। 'অপরেশান' করিলে তবে ভাল হইবে। এই কথা শুনিয়া উনি বলিলেন, "প্রথমে তোমার ঔষধোপচারই চলুক না। 'অপরেশান' করতে দিতে আমার সাহস হয় না। বিনা অপরেশানে যত দিন চলে ততই ভাল আমার মনে হয়; একেবারে নিরুপায় হলে তখন দেখা যাবে। মিস্ বেন্‌সন স্পষ্ট আমাকে বলিলেন, "ছাতের উপর বেড়াতে পার, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা একেবারেই করবে না। তদনুসারে আমি উপরেই সাধারণতঃ ঘোরা-ফেরা করিতাম। ৫।৬ দিন পরে অনেকটা ভাল বোধ করায় আমি আবার তেল মালিস করিবার জন্য ওঁর কাছে গেলাম; তাহা দেখিয়া উনি বলিলেন, "লক্ষ্মিটি, না, তুমি তেল মাখাইয়ো না, আবার সেই দিনের মত হলে তোমারও কষ্ট হবে, আমারও ভাবনা হবে। তার চেয়ে তুমি চুপচাপ্ করে বসে থেকে, আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখো, সেই ভাল।" এই কথা শুনিয়া আমার বড়ই খারাপ লাগিল এবং এইরূপ আক্ষেপ হইল যে, এখন ওঁর শরীর ভাল নাই। যে সময়ে আমার কাজ করা বাস্তবিকই দরকার সেই সময়ে কিনা একটা ব্যামোর বাধা এসে পড়ল! কিন্তু এটা কি আমার আজকালের নূতন রোগ? আজ ১৮ বৎসর হইল আমি এই ব্যামো অল্প-বিস্তর ভোগ করিতেছি; কখনই ত একেবারে যায় নাই, কিন্তু এত জোর করিয়া এখন কেন এল কে জানে। নিত্য 'পীড়িত' ব্যক্তির মত থাকিবার সময় যদি আমার আসিয়া থাকে তবে আমার বাঁচিয়া কি ফল? অপরেশানের পর আমি ভাল হইব কি না, এই না সন্দেহ? আমি ভাল হইলে এবং আমার দ্বারা ওঁর সেবা হইতে পারিলে এবং ওঁর এই অসুখের সময় আমি ওঁর কাজে লাগিলে তবেই ত বেঁচে থাকা সার্থক। নচেৎ, বাঁচিয়া এইরূপ শুধু বসিয়া থাকার চেয়ে ও আক্ষেপ করার চেয়ে মরা কি খারাপ? এই অবস্থার চেয়ে আমার মরণই ভাল মনে হয়। এইরূপ চিন্তা আমার মনে আসিয়া আমার মনকে খুব দখল করিয়া বসিল, আমার সব স্ফূর্ত্তি চলিয়া গেল। তাই আমার ননদকে উপরে ডাকিয়া আনিলাম এবং তাঁকে বলিলাম;—"কাল মিস্ বেন্‌সন যা বলছিলেন তা শুনেছ ত? তিনি বলেন, বিনা-অপরেশানে এই ব্যামো একেবারে ভাল হবে না; কিন্তু উনি বল্লেন, "যেমন টুকিটাকি চল্‌ছে তাই চলুক, অপরেশান করায় আমার মত নেই, আমাদের ভয় হয়, ঔষধোপচারে যতটা হয় তাই কর।' আমার এই ব্যামোটা কি নতুন ব্যামো? এই জন্য ওঁর এত ভাবনা কেন? আমি একটুও অশক্ত হই নি। আমি অপরেশান সহ্য করতে পারব, এর জন্য সকলে কেন এত ভয় করচে? এই ব্যামোর দরুন আর্ত্তনাদ করতে করতে এক জায়গায় পড়ে থাক্‌তে আমার বড় লজ্জা করে। হাসপাতালে যে রোগীদের অপরেশান হচ্ছে

তাতে কি তারা মরে যাচ্ছে ? ওঁর মনে অকারণে একটা ভয় হয়েছে। ননদ বলিলেন "যদি সত্যি কোন ভয় না থাকে ত অপরেশান করাও না। আমরা ওর কিছুই বুঝি না। কিন্তু দাদার এই বিষয়ে বেশী ভয় ও ভাবনা হয়েছে, তার এখন কি করা যায় ? দাদা স্বভাবতই মায়ালু, ওঁর সব তাতেই বেশী ভাবনা হয়। তাছাড়া এই রোগের অঙ্গই এই, এই বিষয়ে তোমার আবার নতুন ভাবনা কেন এল ?" এই কথা শুনিয়া আমি নিরুত্তর হইলাম এবং চুপ্ করিয়া রহিলাম। কিন্তু মনের চাঞ্চল্য কিছুতেই কমিল না। এইরূপ অনাবশ্যক জীবনে ফল কি ? এইরূপ মনে করিয়া, সে রাত্রে আমার ভাল ঘুম হইল না, মনের অশান্তি ত ছিলই।

তার পর দিন সকালে দশটার সময় আহার করিবার জন্য ওঁর নীচে যাইতে হইল এবং ১১ টার সময় আহার করিয়া হাইকোর্টেও গেলেন। আমি সিঁড়ি দিয়া ওঠা-নামা করিতে না পারায় উপরেই আহার করিলাম। প্রায় ১২ টার সময় রোজকার মতো মিস্-বেন্‌সন আসিলেন এবং আমার নিকট আসিয়া আমার ঔষধোপচার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার ফল কি হইল কে জানে। আমার ব্যামোটা একেবারেই সুরু হইল এবং হাত-পা শক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। ১৫। ২০ মিনিটের পর, হাতের চুড়ি এত আঁটিয়া ধরিয়াছিল যে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা আবশ্যক হইল। আমার জ্ঞান বেশ ছিল, তাই যাতনা হইতেছিল তাহা বলিতে পারিতেছিলাম। আরেবিয়ান-নাইটের পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় আমার পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত শরীর অসাড় হইয়া যাইতেছিল এবং শরীরের সেই অংশে স্পর্শ বোধ হইতেছিল না। আবার, জিভ্ ও কেমন হুগ্‌হুড় করিতে লাগিল। এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া মিস্ বেন্সনও একেবারে ঘাবরাইয়া গেলেন এবং তিনি হাইকোর্টে এক চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মিসেস্ রাণাডের শরীর হঠাৎ বেশী খারাপ হয়েছে, আপনি শীঘ্র বাড়ী আসিবেন। এই চিঠি উনি পড়িবামাত্র উঠিয়া বাড়ী আসিবার সময় দুই একজন ডাক্তার সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এই সময় চারিটা বাজিয়াছিল ; এবং তিনটার পূর্ব্বেই আমার অসুখটা কিছু কমিতে আরম্ভ হইয়াছিল। এখন ততটা ভয় নাই দেখিয়া তিনটা বাজিলে মিস্ বেন্সন নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। এদিকে ওঁর সঙ্গে যে ডাক্তারণী আসিয়াছিলেন তিনি ভিতরে আসিয়া আমার নাড়ী দেখিলেন এবং রোগের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া লইয়া দুই ডাক্তারই ওঁকে বলিল যে, "অপারেশন করাই উত্তম মার্গ। এইরূপ চলিতে থাকিলে ধনুষ্টঙ্কার হওয়া সম্ভব। ইহা শুনিয়া ওঁর বড়ই ভাবনা ও ভয় হইল। এবং তখনই মিস্ বেন্সনকে চিঠি লিখিলেন যে, "কাল সকালে তুমি ডাক্তার ডিমক এবং অন্য একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ ডাক্তারকে লইয়া ৯টার সময় এইখানে আসিবে, তাহা হইলে চারিজনের বিচারে যাহা স্থির হইবে তাহাই করা যাইবে।" সিপায়ের হাতে চিঠি দিয়া ভিতরে আসিয়া আমার খাটের পাশেই রাত্রে আহারের সময় পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন। সেইদিন রোজকার পাঠ কিংবা সকালের ডাকের উত্তর লেখা প্রভৃতি কিছুই করিলেন না। আমার হাত আপনার হাতে লইয়া সচিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহা আমার ভাল লাগিল না ; তাই আমি যাহা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিলাম। কারণ, কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, তবু কতকটা ব্যামোর ভাবনা কম হইবে অন্ততঃ ভুলিয়া যাইবেন ; কিন্তু না ; আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, 'হাঁ' কিংবা 'না' বলিয়াই কথা শেষ করিতেন, অধিক কিছু বলিতেন না। সম্মুখের বৈঠকখানায় সখু, নানু, তারা ও শান্তা এরা আপনাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, খেলা করিতেছিল ; তা দেখিয়া আমি শান্তাকে ডাকিলাম। এখন তার মিষ্টি কথা শুনিয়া তবু ওঁর সময়টা ভাল কাটিবে এইরূপ আমি মনে করিলাম। শান্তা ভিতরে আসিল। আমি তার সঙ্গে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেই উনি আমাকে বলিলেন, "তুমি কথা কয়ে শ্রম কোরো না। কথা কইলে আমি ছেলেদের বাহিরে পাঠিয়ে দেব। আমি এতক্ষণ তোমার কাছে আছি, তোমার সঙ্গে কি কথা কয়েছি ? তোমার কথা কওয়া উচিত নয়। চুপচাপ করে পড়ে থেকে বিশ্রাম করা আবশ্যক ; সেইজন্যই আমি এইখানে বসে আছি।" আহার প্রস্তুত, জানাইবার জন্য ৮টা, ৮॥০ টার সময় বজায়া উপরে আসিল। উনি তাকে বলিলেন "আগে এঁর থালার ভাত বাড়িয়া আনিবার জন্য ছেলেদের বল, এঁর খাওয়া হয়ে গেলে তারপর আমি খাব।" তদনুসারে আমার খাওয়া হইয়া গেলে, উনি নীচে গিয়া ও খাইয়া আবার তখনই আমার নিকট আসিয়া বসিতেন। ইহাতে আমার মনে হইল যে, আমার ঘুম না আসা পর্য্যন্ত উনি আমার পাশ থেকে নড়বেন না, এইরূপ ওঁর মনোগত অভিপ্রায় দেখা যাচ্ছে। তাই আমি একেবারেই নড়াচড়া বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টার পর আমার ঘুম আসিয়াছে মনে করিয়া উনি আস্তে আস্তে উঠিয়া বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন। সেইদিন রাত্রে পড়াশুনা কিংবা গায়ে তেল মাখা প্রভৃতি কিছুই করিলেন না। যে সময় রোজ নিদ্রা যাইতেন সেই সময় না আসা পর্য্যন্ত এক কৌচের উপর সচিন্তভাবে বসিয়া কিছু চিন্তা আলোচনা করিতেন। নিদ্রার সময় হইলে নিজের বিছানায় শুইয়া

পড়িতেন। আমি যেখানে শুইতাম সেই হল-ঘরের মাঝামাঝি এক কাঠের পর্দা ছিল, তার ওদিকে ওঁর শোবার খাট ছিল। সেইজন্য একটু নড়াচড়া হইলেই আমার কাণে আসিত। রোজকার নিত্য নিয়মিত সময়ে বিছানায় গিয়া শুইলেন বটে কিন্তু সে রাত্রে আদৌ নিদ্রা হইল না। এ বালিস হইতে ও বালিসের দিকে ফিরিবার সময় তাঁর অভ্যাস মত "রাম রাম" শব্দ কাণে আসিল। তাছাড়া সেই রাত্রির মধ্যে চার পাঁচবার আমার খাটের কাছে উনি আসিয়া, আমার ঘুম আসিয়াছে কিনা কাণ পাতিয়া দেখিতেন। প্রথমবার যখন উনি আসিলেন তখন "এখন কেন এলে, ঘুম হয়নি কি"—এই কথা বলিবার জন্য আমার ঠোঁট পর্য্যন্ত আসিয়াছে কিন্তু আমি কথা কহিলেই উনি ভাবিবেন আমার আদৌ ঘুম হয় নাই এবং তাহা হইলে আমার কাছে বসিয়া থাকিবেন। এইজন্য আমি চুপটি করিয়া পড়িয়া রহিলাম। উনি আসিয়া নীচে নত হইয়া কাণ পাতিয়া দেখিয়া তারপর পা টিপিয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া যাইতেন। এইরূপ সমস্ত রাত্রি আমরা দুজনেই জাগিয়া থাকিতাম। সকালে উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল ত? এখন শ্রান্তিবোধ হচ্চে না ত?" আমি বলিলাম, "কিছু মাত্র না। বেশ ঘুম হয়েছিল।" এই শুনিয়া উনি বলিলেন,"আমি বাহিরে গিয়ে কাজ করিগে। তুমি চুপচাপ করে পড়ে বিশ্রাম কর। ছেলেদের সঙ্গে কিংবা কারও সঙ্গে কথা কয়ো না।" আমি 'আচ্ছা' বলিলে উনি বাহিরের বৈঠকখানায় গিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিতেন। প্রায় ৯ টার সময় মিস্ বেন্সন্ এবং দুই জন ডাক্তার আসিলেন। তাঁহাদিগকে ভিতরে আনিয়া আমার শরীর পরীক্ষা করাইলেন এবং "এখন আমরা বাহিরে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহি" এইরূপ বলিয়া তিন জনকেই বাহিরে লইয়া গেলেন। তার পর বাহিরে গিয়া ওঁদের কি কথাবার্ত্তা হইল তাহা কে জানে। পর দিন, অপরেশান করা হইবে হয়ত স্থির হইল। কারণ ওঁর মুখ যেন একেবারেই বসিয়া গিয়াছে যেন খুব উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এইরূপ মনে হইল। তথাপি কোর্টের দিন বলিয়া, নীচে গিয়া ও আহার করিয়া কোর্টে চলিয়া গেলেন। কোর্টের কাজ শেষ করিয়া সেই দিন পায়ে না হাঁটিয়া গাড়ী করিয়া তখনই বাড়ী আসিলেন। উপরে উঠিয়াই পোষাক ছাড়িবার জন্যও বাহিরের বৈঠকখানায় না থামিয়া আমার খাটের নিকট আসিয়া কেদারায় বসিয়া পড়িলেন।

অনুমান।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

নদীজলে ভেসে' যায় খসে-পড়া পাতা
নেচে নেচে মৃদু বায়,
তরলিত জোছনায়
স্নান করি'—বুকে লয়ে' বনানীর গাথা।
তরল সঙ্গীত তুলি
ছোট ছোট ঢেউগুলি
ফুটিছে ছুটিছে কত নিমেষে নিমেষে
রূপালি নদীর নীরে
তরীগুলি ধীরে ধীরে
চলিয়াছে কেবা জানে সে কোন্ বিদেশে।
অগণিত তারা লয়ে'
আকাশ স্তবধ হয়ে'
চেয়ে আছে অধোপানে স্থির অপলক
পড়েছে তারার ছায়া
চিত্রিত চাঁদের মায়া
নদীনীরে—কাঁপিতেছে অসহ্য পুলক।
আনন্দে কি বেদনায়
মুরছি তটের গায়
পড়ে এসে উর্ম্মিরাশি, জেগে উঠে গান
ও-পারে বনের রেখা
যেন শ্যাম মধ্য-লেখা
—দ্বিখণ্ডিত বিশ্ববৃত্ত; দ্বিভাগ-সমান।—
যেন এক দিব্য ছবি
আঁকি কোন্ মহাকবি
কোথায় চলিয়া গেছে রহস্যের পারে
হেরিয়া রচনা হায়
স্বপনের মত প্রায়
মাঝে মাঝে মনে হয় চিনি বুঝি তাঁরে
অর্থহীন একি সবি,—
সে কিরে উন্মাদ ক'বি—
আঁকিয়াছে ভাবহীন কেবলি অক্ষর?
এই ছবি এই প্রাণ
এই হাসি এই গান
নাহি কি ইহার মাঝে কিছু অনশ্বর?

৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।)

১৭৬১ শকের ২১এ আশ্বিন তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ১৭৬৫ শকের ভাদ্র হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হয়। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত পূর্ণ উদ্যমে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাষায় বিবিধ তত্ত্ব ইংরাজি হইতে অনুবাদ করিয়া উহাতে প্রকাশ করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বৎসর হইতেই ঋগ্বেদের মূল ও অনুবাদ উক্ত পত্রিকাতে বাহির করেন। পরবর্ত্তী সময়ে পণ্ডিত মোক্ষমুলার তাঁহার প্রকাশিত ঋগ্বেদে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পত্রিকার প্রথম কল্পের প্রথম বৎসরে মহাভারতের মূল শ্লোক পত্রিকাতে স্থান পায়। ক্রমে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের উদ্যোগে মহাভারত অনূদিত হইয়া উহাতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ক্রমে পত্রিকার ১ম ও ২য় কল্পে আদিপর্ব্বের ৯০ই অধ্যায় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত কলিকাতার যাবতীয় কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের যোগ হইল। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, আশুতোষ দেব প্রমুখ সকলই তত্ত্ববোধিনী সভার সাহায্য দাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভাই সাহায্যদানে, ও সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া দিতেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যোগরক্ষা করা শিক্ষিত ও ধনশালীগণ গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের মতাবলম্বী না হইয়াও অনেকে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। একদিকে ধর্ম্মের উন্নতি অন্যদিকে সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক উন্নতি, সর্ব্ববিধ উন্নতিই ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা ও তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বারা সাধিত হইত। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ তত্ত্ববোধিনী সভার টানে উহার সহিত মিলিত হন। বর্দ্ধমানরাজবাটী হইতে ঐ সময়ে মহাভারতের অনুবাদ বাহির হইতেছিল। তত্ত্ববোধিনীতে যে অনুবাদ বাহির হইত তাহা দেখিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পুস্তকাকারে বাঙ্গালা মহাভারত বাহির করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার আদর্শে তিনি নিজেই "বিদ্যোৎসাহিনী" সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। উহার তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব, ১৭৭৮ শকের ২রা মাঘ হইয়াছিল, ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিজ্ঞাপনস্তম্ভে দেখিতে পাই। ১৭৭৮ শকের কার্ত্তিক মাসে ব্রাহ্মসমাজের হিতকল্পে তাঁহার দানের পরিচয় পাই। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ উভয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতম যোগে আবদ্ধ হন। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের বিশেষ উৎসাহ পাইয়াই তিনি মহাভারত প্রচারে ব্রতী হন। ১৭৭৮ শকের ২৯ এ পৌষ তারিখে ব্রাহ্মসমাজের যে সাধারণ অধিবেশন হয়, তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ট্রষ্টী নিযুক্ত হন এবং শ্যামাচরণ সরকার, নীলকমল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রের যন্ত্রাধ্যক্ষ হন।

১৭৭৭ শকের পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক সুলেখকের পরিচয় পাই। তিনিও ব্রাহ্মসমাজের সহিত পূর্ব্ব হইতে মিলিত হইয়াছিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই নিদারুণ মানসিক পরিশ্রমে কাতর ও শিরোরোগগ্রস্ত অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি লইয়া গৌরবের সহিত অবসর গ্রহণ করিলে নবীনকৃষ্ণ বাবুর উপরে সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার পড়ে। ১৭৮০ শকের শ্রাবণ মাসের বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাই মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৭৮০ শকের ফাল্গুন মাসের পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদিত বলিয়া মহাভারতের আদিপর্ব্ব তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে বিতরিত হইতেছে। বিজ্ঞাপনদাতার নাম ছিল শ্রীযুক্ত রাধানাথ বিদ্যারত্ন, বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক।

১৭৬১ শক হইতে ১৭৮৫ শক পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের তুমুল উত্তেজনার দিন চলিয়া গিয়াছে। যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তখন উহা যে সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা কল্পনার ভিতরে আনিতে পারি না। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার

যাহাতে ধর্ম্ম ও সাহিত্য আলোচনার জন্য নানা স্থানে তত্ত্ববোধিনী সভার আদর্শে নানা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরাতন তত্ত্ববোধিনীতে তাহার কয়েকটির নাম মিলে, যেমন বিদ্যামোদিনী, হিন্দুহিতৈষী, সত্য-জ্ঞানসঞ্চারিণী, নিত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী ইত্যাদি। বিদ্যামোদিনী সভা ১৭৬৬ শকের চৈত্র মাসে কলিকাতাতেই স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সকল সভার অন্তরালে ব্রাহ্মসমাজের ভাব অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইত। সে সময়ে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অনেক ধনাঢ্য জ্ঞানবিস্তার কল্পে অকাতরে দান করিতে মুক্তহস্ত হন। মহাত্মা রাধাকান্ত দেব লক্ষ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে "শব্দকল্পদ্রুম" অভিধান বাহির করেন। বর্দ্ধমানের রাজা মহতাপচাঁদ বিপুল অর্থ ব্যয়ে মহাভারতের মূল ও অনুবাদ বাহির করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহও ইহাঁদের আদর্শে ও তত্ত্ববোধিনী সভার প্রেরণায় নিজের মস্তকে সমস্ত ব্যয়ভার লইয়া মহাভারতের অনুবাদ বাহির করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের বড়লোকেরা গাড়ী ঘোড়া ও মোটারগাড়ীতে ও গৃহসজ্জাতে বৈভব দেখান। কিন্তু এ আদর্শ ঐ যুগের আদর্শ ছিল না। শাস্ত্রগ্রন্থপ্রচার, কন্যাদায়গ্রস্তের উদ্ধারে দান, অবৈতনিক দাতব্য-চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অধ্যাপক লইয়া নিজ সভা রচনা, সঙ্গীতের চর্চ্চা, বড়মানুষীর অঙ্গ ছিল। মহাভারতের প্রথম অংশ তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন নিজে একটি প্রেশ কিনিয়া তত্ত্ববোধিনী সভাকে দান করেন। তাহা আজও আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে লাগিতে রহিয়াছে। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঐ সময়ে মিশিয়াছিলেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে আদিব্রাহ্মসমাজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি ঝাড় দিয়াছিলেন। সেটী রূপান্তরিত হইয়া আজও সমাজের ত্রিতলে বিরাজমান। মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিদায়দানের আংশিক ভারও তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাভারতের অনুবাদের সুবিধার জন্য তিনি আপন আবাসে কার্য্যালয় স্থাপন করেন, এবং অনুবাদ কার্য্য ঐ খানেই চলিতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদ সংশোধন করিয়া দিতেন। ব্রাহ্মসমাজেরই বাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং আরও বাহিরের কয়েকজন সুপণ্ডিত অনুবাদ কার্য্য করিতেন। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের মুখে শুনিয়াছি যে উত্তরকালে বিদ্যাসাগরমহাশয়কে আর সংশোধন করিতে হইত না। কোন একজন অনুবাদকের পদ খালি হইলে বিদ্যাসাগর নিজেই উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। অনুবাদকগণকে সিংহমহাশয় যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করিতেন। ১৭৮২ শক পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সিংহমহাশয়ের দানাঙ্ক দেখি। উত্তরকালে তিনি মহাভারতের অনুবাদ লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৭৮১ শক হইতে কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজের অনেক কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ঐ সময় হইতে তত্ত্ববোধিনী সভা ক্রমে ম্লান হইয়া পরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৭৮২ শক পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দানাঙ্ক পাই। নবীনকৃষ্ণ বাবু ঐ সময়ের একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল। তাঁহার মত মজলিসি লোক কখন দেখি নাই। তিনি তাঁহার কাহিনীর ভঙ্গিমাতে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। ইহা ছাড়া তিনি অনেক বিষয়ের সন্ধান রাখিতেন। সংস্কৃত ও ফারসীতে, সঙ্গীতে ও সেতারে তাঁহার বতক দক্ষতা ছিল। তাঁহার সহিত সিংহমহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা এতই অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার আকর্ষণে নবীন বাবু ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং যতদিন সিংহমহাশয় জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। নবীন বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে "হুতুম পেঁচার" সমস্তই সিংহমহাশয়ের নিজের লেখা, দুই চারি স্থানে সামান্য অংশ নবীন বাবুর লেখনীপ্রসূত। কালীপ্রসন্ন বাবু স্বাস্থ্য হারাইয়া যখন গঙ্গাতীরে (বোধ হয় বরাহনগরের নিকটে) অবস্থান করিতেন, তখনও নবীনকৃষ্ণ বাবু তাঁহার সঙ্গী। প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া নবীন বাবু সিংহমহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। শেষ জীবনে পৈতৃক ও নিজ ঋণের চাপে কালীপ্রসন্ন বাবু বিব্রত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার মত উদারচেতা, বিনয়ী, দানশীল, সুশিক্ষিত সাহিত্যসেবী ও নিরহং-

কারী, ধনাঢ্যগণের মধ্যে নিতান্তই বিরল ছিল এবং চিরকালই থাকিবে। মহাভারতপ্রকাশে তিনি যে মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন ধরিয়া জনসাধারণকে বিশেষতঃ ধনীসম্প্রদায়কে উদ্বোধিত করিতে থাকিবে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম পরিম্লান হইবে না। শ্রীযুক্ত বিজয় সিংহ ৺ কালীপ্রসন্নের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহার মৃত্যু অন্তে দত্তক গৃহীত হন। তিনি হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন ও তৎসম্বন্ধীয় গবেষণা লইয়া জীবন ক্ষেপ করিতেছেন। তিনি স্বেচ্ছাব্রতী হইলেও একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুচিকিৎসক। তিনি এই বিদ্যার অনুশীলনে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু কাহারও নিকট পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। তিনি সিংহবংশের একটি উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহার ও অমায়িকতা সত্যসত্যই অনুকরণীয়।

সপ্ততীর্থ শ্লোকের ঐতিহাসিক ভিত্তি।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

পিতৃতীর্থ গয়াধামের প্রাচীনত্বে সন্দিগ্ধ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি, আই, ই মহোদয় বাংলা জেলা গেজেটিয়ারের সম্পাদক সিভিলিয়ান মিঃ এল, এস্, এস্ ওমেলি সাহেবকে জানাইয়াছিলেন যে সপ্ততীর্থের শ্লোকে গয়ার কোন উল্লেখ নাই বলিয়া মনে হয় যে, গয়া ৮ম শতাব্দের পূর্ব্বে তীর্থপ্রাধান্য লাভ করে নাই। তিনি নিজ মত সমর্থনের জন্য উক্ত শ্লোকের দুইটী মাত্র চরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকাংশ এই—

'অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥'

শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে এই শ্লোকটী সম্ভবতঃ ৮ম শতাব্দে রচিত হইয়াছিল এবং ইহাতে গয়ার নামোল্লেখ নাই বলিয়া, তিনি মনে করেন যে গয়া ৮ম শতাব্দ পর্য্যন্ত শুধু স্থানীয় জন সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল।*

পূজ্যপাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের সংক্ষিপ্ত অভিমত পড়িয়া আমি এই সপ্ততীর্থ শ্লোকের প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। হিন্দুজনসাধারণের মুখে শ্লোকটী শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় অনেকেই ঐ শ্লোকটী শাস্ত্রগ্রন্থের কোথায় যে আছে তাহা ঠিক ঠিক ভাবে বলিতে পারেন না। আমি বাংলার কোন খ্যাতনামা পণ্ডিতকে এই বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া উত্তরে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১। 'আমি পুরাণশাস্ত্রে একেবারেই অনভিজ্ঞ—কোন খানিই সম্পূর্ণ পড়ি নাই। এই অবস্থায় আমি উত্তর দানে অসমর্থ। ভাটপাড়ার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় আপনার প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ হইবেন আশা করি। তাঁহাকে লিখিবেন। * * * আপনি প্রত্নতাত্ত্বিকদের কথায় বিচলিত হইবেন না। ৺ গয়া সম্বন্ধে পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের ভূমিকাই যথেষ্ট। কখন কোন্ ভাব প্রকট হইতেছে, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। ভগবান্ বুদ্ধ এখানেই নির্ব্বাণলাভ করেন—এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এখানেই ভাগবৎ স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। শত সহস্র "বিশ্বাসী" এ যুগেও ফল পায়—কত প্রেত গয়াপিণ্ডের জন্য আত্মীয়-স্বজনের উপর উৎপাত করিয়াছে—সকল কাহিনীই যে অলীক তাহা নহে।' 'কুরুক্ষেত্রগয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ' কবেকার বচন? যে সকল পুরী মোক্ষদায়িনী তাহা বাস করিবার জন্য; গয়ায় কেহ বাস করে না। অতএব এ বিষয়ে বৃথা ক্ষোভ করিবেন না।

২। 'মোক্ষদায়ক সপ্ততীর্থের মধ্যে গয়ার নাম উল্লেখ না থাকার কারণ এই যে গয়া মোক্ষদায়ক তীর্থ নহে। গয়া পিতৃগণের প্রেতত্বমুক্তির স্থান।'

* 'It is probable that Gaya did not acquire a pan-Indian celebrity before this time (at least as early as the 10th century A. D.) * * This couplet (Saptatirtha) was composed probably in the 8th century A. D., and from the absence of any mention of Gaya, it appears that any importance, it may have had then, was only local. Gaya Gazetter Page 61.

৩। 'আমার স্মরণ হয়, গয়ায় মৃত্যু হইলে তাহার সদ্গতি হয় না। কাশী প্রভৃতি স্থানে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয়; যে সকল তীর্থে মৃত্যু হইলে মোক্ষ হয়, তাহারই উল্লেখ এই বচনে আছে। গঙ্গা মুক্তিক্ষেত্র, কিন্তু পুরী নয়; এই জন্য তাহারও উল্লেখ পাই।'

৪। 'বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও আপনার লিখিত বিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই।'

৫। 'সপ্ততীর্থের শ্লোকটী অতি বাল্যকাল হইতেই আমার মুখস্থ রহিয়াছে; কিন্তু শ্লোকটী কোথা হইতে উৎপন্ন তাহার মূল এখনও পাই নাই। আপনার পত্র লিখার পূর্ব্বেও অর্থাৎ গত বর্ষে এখানকার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সদাশিব মিশ্র প্রমুখ পণ্ডিতগণের নিকট উক্ত শ্লোকটীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনার পত্র পাইয়াও পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তাঁহারা উদ্ভট শ্লোক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'স্কন্দপুরাণ' দেখিবার অবকাশ ঘটিয়া উঠে নাই। ঐ শ্লোকটীর সপ্ততীর্থই বা কিরূপে হয়? আটটী তীর্থ হইয়া দাঁড়ায়, তবে "পুরী" শব্দটী লইয়া প্রত্যেক শব্দের সহিত যোগে "অযোধ্যাপুরী", "মথুরাপুরী" প্রভৃতি গঠন করিয়া সপ্ততীর্থ হইতে পারে। উহার মধ্যে যে কোন একটীকে কাহারও সহিত যোগ না করিলে কেমন করিয়া সপ্ততীর্থ হয়? ইহার কি মীমাংসা করিয়াছেন? জানাইলে সুখী হইব।'

এইভাবে পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত লইয়া আমি শ্লোকটীর মূলানুসন্ধান করিতে থাকি। বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম অভিধানের (হিতবাদী সংস্করণ) সপ্ততীর্থ প্রবন্ধে শ্লোকটী এইভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা:—

'অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥
তাসু বাসং প্রকুর্ব্বন্তি যে মৃতা বা নরাঃ পরম্॥
লভন্তে ন পুনর্জ্জন্ম মাতৃগর্ভেষু কুত্রচিৎ॥'

(ইতি পাদ্মে ভূমিখণ্ডম্)

'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ড গ্রন্থের আগাগোড়া খুঁজিয়া আমি ঐ শ্লোকটী কোথায়ও পাই নাই। তখন মনে বড় একটা সন্দেহ আসিল। 'শব্দকল্পদ্রুমের' 'অবন্তিকা' প্রবন্ধেও ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই প্রবন্ধের নিম্নে লেখা আছে 'ইতি স্কন্দপুরাণে'। এত বড় প্রামাণিক সংস্কৃত অভিধানের সম্পাদকমণ্ডলী 'পদ্মপুরাণ' ও 'স্কন্দপুরাণ', এই উভয় গ্রন্থেই শ্লোকটী আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছাপা-গ্রন্থবিশেষ অথবা হাতের লেখা পুঁথিতে এই শ্লোক আছে কি না জানি না। আমি যে যে সংস্করণ পড়িয়াছি তাহাতে ঐ শ্লোক পাই নাই। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৬৮ শ শ্লোকে আছে—'কাশী কাঞ্চিচ মায়াখ্যাস্বযোধ্যা দ্বারবত্যপি মথুরাবন্তিকা চৈতাঃ সপ্ত পুর্য্যোত্র মোক্ষদাঃ।' দুঃখের বিষয় উপরোক্ত দুইখানি পুরাণের কোথায়ও সপ্ততীর্থ শ্লোকটী যথাযথভাবে অর্থাৎ যাহা আমরা সচরাচর শুনিতে পাই সেইভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে 'মায়াতন্ত্রের' ৬ষ্ঠ পটলে সুষুম্না নাড়ীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় আছে—

'সুষুম্নাখ্যা নদী যত্র সাক্ষাৎ স্বস্বরূপিণী।
গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থানি প্রয়াগবদরী তথা।
হরিদ্বারশ্চ চার্ব্বাঙ্গি গয়া কাশী সরস্বতী॥
সিন্ধু ভৈরবশোনাদ্যা ব্রহ্মপুত্রশ্চ সুন্দরি।
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা॥
দ্বারাবতী চ তীর্থেশী ভুবা প্রকৃতিমূর্ত্তিতঃ।
গয়াদিসর্ব্বতীর্থানি তত্র তিষ্ঠন্তি সন্ততম্॥'

মায়াতন্ত্র অতি প্রাচীন। 'আগমতত্ত্ববিলাস' ও 'বারাহী তন্ত্রে' মায়াতন্ত্রের উল্লেখ আছে। হিন্দু তন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র রচিত; খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১ শতাব্দের মধ্যে বহু সংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। মূল বৌদ্ধতন্ত্র ৭ম খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। হিন্দুতন্ত্রের আদর্শেই বৌদ্ধতন্ত্র রচিত, কাজেই বলিতে হয় মায়াতন্ত্রের শ্লোকটী সপ্তম শতাব্দের বহু পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। এই শ্লোকটী যে সপ্ততীর্থেরই অনুরূপ শ্লোক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কাহারও মতে শ্লোকটী ভূতশুদ্ধি তন্ত্রের অন্তর্গত। আমি ঐ তন্ত্রখানি বিশেষ করিয়া পড়িয়া দেখিয়াছি, উহাতে এই শ্লোক নাই। যদি 'পদ্মপুরাণ' ও 'স্কন্দ পুরাণের' সংস্করণবিশেষে শ্লোকটী আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ঐ

পুরাণ দুইখানিতে গয়ার উল্লেখও বিভিন্ন স্থানে বিশেষভাবে আছে, যথা—

পদ্মপুরাণে—

"গঙ্গাদীনাং সুতীর্থানাং যাত্রাং কৃত্বা হি যদ্ভবেৎ ॥"

"গঙ্গায়াং পুষ্করে তীর্থে গয়ায়াঞ্চ বিশেষতঃ।
পিতৃপিণ্ড-প্রদাতারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥"

স্কন্দপুরাণে—

"মুণ্ডনঞ্চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।
বর্জ্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশালাং বিরজাং তথা।"

একদিকে সপ্ততীর্থের শ্লোকে গয়ার উল্লেই না থাকিলেও অপরদিকে স্থান বিশেষে বিশেষভাবে গয়াতীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, গয়া শুধু লৌকিক-ভাবে নয়, পুরাণকারদের নিকট পিতৃতীর্থরূপেও সুপরিচিত ছিল।

এখন প্রশ্ন এই, প্রচলিত সপ্ততীর্থ শ্লোকে গয়ার নামোল্লেখ নাই কেন? উক্ত শ্লোকের শেষের দুইটী চরণে ইহার সমাধান দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে—

'তাসু বাসং প্রকুর্ব্বন্তি যে মৃতা বা নরাঃ পরম্।
লভন্তে ন পুনর্জ্জন্ম মাতৃগর্ভেষু কুত্রচিৎ ॥'

এই সপ্ততীর্থে বাস করিয়া যাঁহারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন তাঁহারা কখনও মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন না। পূর্ব্ব চরণের সহিত মিল রাখিয়া এই শ্লোকের পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'মেদিনীতে' আছে—'মোক্ষদসপ্তপুর্য্যন্তর্গতপুরীবিশেষঃ।' এই সপ্তপুরীতে বাস করিলে মোক্ষলাভ হয়। গয়া পিতৃতীর্থ, এখানে বাস করিয়া দেহত্যাগ করিলে কখনও মুক্তিলাভ হয় না, ইহাই শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। এই কারণে সপ্ততীর্থ শ্লোকে গয়ার নামোল্লেখ নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিক্ দিয়া ঋষিগণ যাহা বিধি মনে করিয়াছেন তাহাই শাস্ত্রের ভিতর প্রকাশিত হইয়াছে। 'পিতৃতীর্থ গয়া' অযোধ্যা মথুরা প্রভৃতি সপ্তপুরী বা তীর্থের মত মোক্ষদায়ক নহে বলিয়া সপ্ততীর্থের শ্লোকে উহার উল্লেখ নাই। ইহা শাস্ত্রসম্মত; যাহা শাস্ত্রের বিধি তাহা আমাদিগকে সেই যুগবিশেষের দেশ ও সমাজের প্রচলিত অভ্রান্ত সত্য বলিয়া অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। 'সপ্ততীর্থের' শ্লোকে গয়ার নাম নাই বলিয়া গয়া ৮ম শতাব্দে তীর্থরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই এই অভিমত হিন্দুজনসাধারণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ শাস্ত্রীমহাশয় এ বিষয়ে কোন প্রমাণও দেন নাই।

সপ্ততীর্থের শ্লোক যে ৮ম শতাব্দের রচনা তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর যদিই বা ইহা ৮ম শতাব্দের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও ঐ শ্লোকে গয়ার উল্লেখ কখনও থাকিতে পারে না। ভারতে সপ্ততীর্থ নয়, অসংখ্য তীর্থ বিদ্যমান; তবে কি বলিতে হইবে ঐ সপ্ততীর্থের শ্লোকে যে যে তীর্থের নাম নাই সেগুলি ৮ম শতাব্দের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই? পুরী (জগন্নাথ) হিন্দুর একটী প্রধান তীর্থ, এই শ্লোকে পুরীর উল্লেখ নাই, তাই বলিয়া ৮ম শতাব্দের পূর্ব্বে পুরী তীর্থ ছিল না এ কথা প্রত্নতত্ত্ববিদেরাও বলিবেন না। একটী শ্লোকবিশেষ ধরিয়া অতি প্রাচীন পিতৃতীর্থ গয়ার প্রাচীনত্বে সন্দেহ করা কোন মতেই সমীচীন নয়। গয়া যে ভারতের অতি প্রাচীন পিতৃতীর্থ তাহার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে সে দিক্ দিয়া সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

পূজ্যপাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের অভিমত অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই গয়াতীর্থের প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিয়াছেন। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন—

নমস্কার নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

অতুল বাবু, আপনার দুইখানি পত্রই পাইয়াছি। 'অযোধ্যা মথুরা মায়া' শ্লোকটী বরাবরই মুখে শুনিয়া আসিতেছি। কোন্ পুরাণের শ্লোক তাহা আমি জানিতাম না। আপনি বলিয়া দিলেন পদ্মপুরাণের ভূখণ্ডে আছে। * ইহাতে আমার বিশেষ উপকার হইল। গয়ার নাম এ কবিতায় নাই তাহাতে আমার অনুমান হয় যে গয়া তীর্থ বলিয়া যে সময় কবিতা লেখা হইয়াছিল তখন খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। করিলে এ ফর্দ্দে থাকিত। গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দিরের কাছে একখানি শিলালিপি দেখিয়াছিলাম তাহাতে নয়পাল রাজার সময়ে অর্থাৎ ১১ শতকের গোড়ার দিকে বজ্রপাণি দত্ত নামক

* 'শব্দকল্পদ্রুমের' অভিমতানুযায়ী আমি জানিয়াছিলাম সপ্ততীর্থের শ্লোকটী পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে আছে। এখন দেখিতেছি তথা সম্ভবতঃ ঠিক পড়ে। এ বিষয়ে প্রবন্ধের প্রারম্ভে আলোচনা করিয়াছি।

একজন রাজপুরুষ বলিতেছেন আমি গয়াকে অতি সামান্য অবস্থা হইতে অমরাবতী করিয়া তুলিয়াছি। তাহা হইলেই ত বোধ হয় গয়া একাদশ শতকের পূর্ব্বে বড় সহর ছিল না। বড় সহর না হইলে বারমেসে তীর্থ হইতেও পারে না। এইমাত্র আমার অনুমান—ইহার অধিক আর কিছুই জানি না।

বশম্বদ—

(স্বাঃ) শ্রীংরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

এই সপ্ততীর্থের ফর্দ্দে কেন যে গয়ার নামোল্লেখ নাই তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পিতৃ-তীর্থের নাম এই শ্লোকে থাকিতে পারে না, থাকিলে শাস্ত্রকারের ভুল হইত ; শাস্ত্রকারেরা যে ভুলভ্রান্তির অতীত, ইহা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে।

সপ্ততীর্থ শ্লোক মোক্ষদায়িনী সাতটা পুরীর মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্যই রচিত হইয়াছিল, ইহার সহিত পিতৃতীর্থ গয়ার কোন সম্বন্ধ নাই। কাজেই পুরাণের রচনার কাল নির্ণয় করিয়া এখানে কোনই ফল নাই। আরত এভিন্ন পুরাণে যে এই শ্লোকটী আছে তাহারও কোন মুখ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। সপ্ততীর্থের শ্লোকে যে গয়ার নাম থাকিতে পারে না তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অবস্থায় এই শ্লোকের রচনা কাল ৮ম শতাব্দের পূর্ব্বে কি পরে তাহা আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। পিতৃতীর্থ গয়া অতি প্রাচীন, বেদেও ইহার উল্লেখ আছে, এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "গয়া-কাহিনীর" ভূমিকায় করিয়াছেন। অলমিতি বিস্তরেণ।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

একাদশ প্রকরণ।

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥*

গীতা. ৫. ২।

পূর্ব্বপ্রকরণে সবিস্তর বিচার করিয়াছি যে, সর্ব্বভূতের মধ্যে একত্বে অবস্থিত পরমেশ্বরের অনুভবাত্মক জ্ঞান হওয়াই—অনাদি কর্ম্মের ফের হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র মার্গ ; এবং এই অমৃত ব্রহ্মের জ্ঞানলাভে মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য আছে কি না এবং এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, মায়াজগতের অনিত্য ব্যবহার কিংবা কর্ম্ম মনুষ্য কেন করিবে। শেষে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, বন্ধন কর্ম্মের ধর্ম্ম বা গুণ নহে, উহা মনের ধর্ম্ম ; তাই ব্যবহারিক কর্ম্মের ফলে আমাদের যে আসক্তি হইয়া থাকে তাহা ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা ক্রমশ হ্রাস করিয়া উক্ত কর্ম্ম শুদ্ধ অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে করিয়া গেলে, কিছুকাল পরে সাম্যবুদ্ধিরূপ আত্মজ্ঞান দেহেন্দ্রিয়াদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও পরিশেষে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়। মোক্ষরূপ পরম সাধ্য কিংবা আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থা লাভ করিতে হইলে তাহার জন্য কিরূপ সাধন করিতে হয়, ইহার নিষ্পত্তি এইরূপ হইয়াছে। এক্ষণে, এই প্রকার আচরণের দ্বারা অর্থাৎ যথাশক্তি ও যথাধিকার নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকিলে, কর্ম্মবন্ধন মোচন হইয়া চিত্তশুদ্ধির দ্বারা শেষে পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পর, সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞানী ও স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মই করিতে থাকিবে, কিংবা যাহা কিছু পাইবার তাহা পাইয়া কৃতকৃত্য হওয়ায় মায়াজগতের সমস্ত ব্যবহার নিরর্থক ও জ্ঞানের বিরুদ্ধ বুঝিয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিবে এই গুরুতর প্রশ্নের বিচার উপস্থিত হয়। কারণ, সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা (কর্ম্মসন্ন্যাস) বা তাহাই আমরণ নিষ্কামবুদ্ধিতে করা (কর্ম্মযোগ), এই দুই পক্ষ তর্কদৃষ্টিতে এই স্থলে সম্ভব। এবং ইহার মধ্যে যে পক্ষ শ্রেষ্ঠ স্থির হইবে, তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রথম হইতে অর্থাৎ সাধনাবস্থাতেই আচরণ করা সুবিধাজনক বলিয়া এই দুয়ের তারতম্যের বিচার ব্যতীত কর্ম্মাকর্ম্মের কোন আধ্যাত্মিক বিচারই সম্পূর্ণ হয় না। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, কর্ম্ম করা আর না করা দুই-ই সমান (গী. ৩. ১৮) ; কারণ, সমস্ত ব্যবহারে কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বভূতে যাহার সমত্ব বুদ্ধি হইয়াছে, তাহার উপর কোন কর্ম্মেরই শুভাশুভত্বের লেপ লাগে না (গী. ৪. ২০, ২১), অর্জ্জুনকে কেবল এইটুকু বলিলে কার্য্যনির্ব্বাহ হইত না। তুমি যুদ্ধ কর—যুদ্ধ্যস্ব! তাঁহার প্রতি ভগবানের ইহাই নিশ্চিত উপদেশ ছিল (গী. ২. ১৮) ; এবং এই বক্তুনাদী স্পষ্ট

---

* "সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ মোক্ষদায়ক ; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।" দ্বিতীয় চরণের "কর্ম্মসন্ন্যাস" পদ হইতে বুঝা যায় যে, প্রথম চরণের "সন্ন্যাস" শব্দের কি অর্থ করিতে হইবে। গণেশ-গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভে গীতার এই প্রশ্নোত্তরই লওয়া হইয়াছে। সেখানে এই শ্লোক অল্প শব্দভেদে এই প্রকার আসিয়াছে—
"ক্রিয়াযোগো বিয়োগশ্চাপ্যুভৌ মোক্ষস্য সাধনে।
তয়োর্মধ্যে ক্রিয়াযোগস্ত্যাগাত্তস্য বিশিষ্যতে ॥"

উপদেশের সমর্থনে 'যুদ্ধ করিলেও ভাল এবং না করিলেও ভাল' এইরূপ ধরা-ছাড়া রকমের উত্তর অপেক্ষা অন্য কোন বলবত্তর কারণ দেখান আবশ্যক ছিল। অধিক কি, কোন কর্ম্মের ভয়ঙ্কর পরিণাম চোখের সম্মুখে দেখা গেলেও, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা কেন করিবে, ইহা বলিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের সৃষ্টি; ইহাই গীতার বৈশিষ্ট্য। কর্ম্মের দ্বারা জীব বদ্ধ হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়, ইহা সত্য হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম করিবে কেন? কর্ম্মক্ষয় অর্থে কর্ম্মত্যাগ নহে; কেবল ফলের আশা ছাড়িলেই কর্ম্মের ক্ষয় হয়, সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না; ইত্যাদি সিদ্ধান্ত সত্য হইলেও, ইহা হইতে পূরাপূরী সিদ্ধ হয় না যে, যাহা ত্যাগ করা সাধ্য সেরূপ কর্ম্মও ত্যাগ করিবে না; এবং ন্যায়তঃ দেখিলেও এই অর্থই নিষ্পন্ন হয়। কারণ, চতুর্দ্দিক জলে জলময় হইলে যেরূপ জলের জন্য কূপের দিকে ছুটিয়া যাইবার আবশ্যকতা থাকে না, সেইরূপ কর্ম্মের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় সেই জ্ঞান হইলে জ্ঞানী পুরুষকে কর্ম্মের কোন অপেক্ষা রাখিতে হয় না, এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী. ২·৪৬)। এই জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমে ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার মতে কর্ম্মাপেক্ষা নিষ্কাম কিংবা সাম্যবুদ্ধি যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় আমারও বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিলেই হইল; এই ঘোর যুদ্ধকর্ম্মে কেন আমাকে স্থাপন করিলে? (গী. ৩. ১)। এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ভগবান্ 'কর্ম্ম ত্যাগ করিতে কেহ পারে না,' ইত্যাদি কারণ বলিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্মের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য (সন্ন্যাস) ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গই যদি শাস্ত্রে বলা হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানলাভের পরেও ইহার মধ্যে যাহার যে মার্গ ভাল মনে হইবে সেই সে মার্গ স্বীকার করিবে, এইরূপ বলিতে হয়। তাই পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন আবার এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দুই মার্গ মিশামিশি করিয়া আমাকে না বলিয়া এই দুয়ের মধ্যে ভালো যেটি তাহাই আমাকে ঠিক্ করিয়া বলো (গী. ৫. ১)। জ্ঞানোত্তর কর্ম্ম করা কিংবা না করা যদি সমানই হয় তবে আমার ইচ্ছামতো তাহা আমি করিব কিংবা করিব না। কর্ম্ম করাই উত্তম পক্ষ হইলে, আমাকে তাহার কারণ বলো, তাহা হইলে আমি তোমার কথা অনুসারে চলিব। অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন কিছুই অপূর্ব্ব নহে। যোগবাসিষ্ঠে রাম বসিষ্ঠকে (যো. ৫·৫৬. ৬) এবং গণেশ-গীতায় (৪. ১) বরেণ্য নামক রাজা গণেশকে এই প্রশ্নই করিয়াছেন। কেবল আমাদের দেশে নহে, য়ুরোপখণ্ডের যেখানে তত্ত্বজ্ঞানের বিচার সর্ব্বপ্রথম সুরু হয় সেই গ্রীস দেশেও প্রাচীন কালে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থে দেখা যায়। এই প্রসিদ্ধ গ্রীক জ্ঞানীপুরুষ স্বীয় নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থের শেষে (১০. ৭ ও ৮) এই প্রশ্ন উপস্থিত করিয়া, সংসারের কিংবা রাজকার্য্যের ব্যস্ততায় আয়ুক্ষেপ করা অপেক্ষা জ্ঞানীপুরুষের শান্তভাবে তত্ত্ববিচারে আয়ুক্ষেপ করিলেই প্রকৃত ও পূর্ণ আনন্দ হয়, এইরূপ নিজের মত প্রথমে বলিয়াছেন। তথাপি, ইহার পর লিখিত স্বীয় রাজধর্ম্মসম্বন্ধীয় অ্যারিষ্টটল গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, 'বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্ববিচারে এবং কেহ কেহ রাষ্ট্রকার্য্যে ব্যাপৃত এইরূপ দেখা যায়; এবং এই দুই মার্গের মধ্যে কোন্‌টি ভাল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেক মার্গই অংশতঃ সত্য। তথাপি কর্ম্ম অপেক্ষা অকর্ম্ম ভাল এ কথা ভুল।* কারণ, আনন্দও এক কর্ম্মই এবং প্রকৃত শ্রেয়োলাভও অনেকাংশে জ্ঞানযুক্ত ও নীতিযুক্ত কর্ম্মেতেই আছে, এইরূপ বলিতে বাধা নাই"। অ্যারিষ্টটল দুই স্থানে দুই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিধান করিয়াছেন দেখিয়া "কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ" (গী. ৩·৮), অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ—এইরূপ যাহা গীতায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে, ইহার গুরুত্ব পাঠকের উপলব্ধ হইবে। বিগত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত অগষ্টস্ কোঁৎ স্বকীয় আধিভৌতিক তত্ত্বজ্ঞানে বলিয়াছেন যে,—"তত্ত্ববিচারেই নিমগ্ন হইয়া আয়ুক্ষেপণ করা শ্রেয়স্কর—এই কথা ভ্রান্তিমূলক; যে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ এইপ্রকারে জীবন অবলম্বন করিয়া সাধ্যমত যত লোকের কল্যাণসাধনে বিরত হন, তিনি নিজের সাধনগুলির অপব্যবহার করেন, এইরূপ বলিতে হইবে।" উল্টাপক্ষে জর্ম্মান তত্ত্ববেত্তা শোপেনহোয়ের প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, জগতের সমস্ত ব্যবহার, এমন কি জীবনধারণ করাও দুঃখময় হওয়ায়, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই সমস্ত কর্ম্মের যতটা সম্ভব শীঘ্র নাশ করাই এই জগতে মনুষ্যের প্রকৃত কর্ত্তব্য। কোঁতের মৃত্যু হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং সোপেনহোয়ের মৃত্যু হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। শোপেনহোয়ের পন্থা হার্টমন পরে বজায় রাখিয়াছেন। স্পেনসর মিল প্রভৃতি ইংরেজ-তত্ত্বশাস্ত্রজ্ঞের মত কোঁৎ-এরই ন্যায়, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ইহাদিগকেও ছাড়াইয়া গিয়া একেবারেই আধুনিক আধিভৌতিক জর্ম্মান পণ্ডিত নিৎশে স্বকীয় গ্রন্থে

* "And it is equally a *mistake to place inactivity above action* for happiness is activity, and the actions of the just and wise are the realization of much that is noble." (Aristotle's *Politics*, trans. by Jowett. Vol I P. 212. The italics are ours).

ইহা জোরে বলিয়াছেন যে, 'মূর্খশিরোমণি' অপেক্ষা সৌম্যতর নাম কর্ম্মসন্ন্যাসীদিগের প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না।*

য়ুরোপখণ্ডে আরিষ্টটল হইতে এখন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যে রূপ দুই পক্ষ আছে, সেইরূপই প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের বৈদিকধর্ম্মেও এই সম্বন্ধে দুই মার্গ সমান চলিয়া আসিতেছে (মভা. শাং. ৩৪৯. ৭)। তন্মধ্যে এক মার্গের নাম—সন্ন্যাসমার্গ, সাংখ্যনিষ্ঠা কিংবা শুধু সাংখ্য (অথবা জ্ঞানের মধ্যেই নিত্য নিমগ্ন থাকায় জ্ঞাননিষ্ঠাও) বলা হয় ; দ্বিতীয় মার্গের নাম কর্ম্মযোগ, কিংবা সংক্ষেপে শুধু যোগ, অথবা কর্ম্মনিষ্ঠা বলা হয়। সাংখ্য ও যোগ এই দুই শব্দে—অনুক্রমে কাপিলসাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগ অর্থ বিবক্ষিত নহে ইহা পূর্ব্বে তৃতীয় প্রকরণেই আমি বলিয়াছি। কিন্তু 'সন্ন্যাস' শব্দও একটু সন্দিগ্ধ হওয়ায় তাহার অর্থ একটু বেশী ব্যাখ্যা করা এখানে আবশ্যক। 'সন্ন্যাস' শব্দে 'বিবাহ না করা' কিংবা বিবাহ করিলে, 'স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করা', অথবা 'কেবল চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করা' এই অর্থই এইস্থানে বিবক্ষিত নহে। কারণ, বিবাহ না করিয়াও ভীষ্ম আমরণ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং ব্রহ্মচর্য্য হইতে একেবারেই চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, কিংবা আমাদের মহারাষ্ট্রদেশে আমরণ ব্রহ্মচারী গোস্বামী থাকিয়া শ্রীসমর্থ রামদাস, জ্ঞানবিস্তারের দ্বারা জগতের উদ্ধার চেষ্টা করিয়াছেন। জ্ঞানোত্তর জগতের ব্যবহার কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া লোকের কল্যাণার্থ করিবে কিংবা তাহা মিথ্যা বলিয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিবে ইহাই এখানে মুখ্য প্রশ্ন। এই ব্যবহার যে করে সে-ই কর্ম্মযোগী ; তারপর সে বিবাহ করুক বা না করুক অথবা গেরুয়া বসন পরুক বা না পরুক তাহাতে কিছুই আসে যায় না। অধিক কি, এইরূপ কর্ম্ম করিতে হইলে বিবাহ না করা কিংবা গেরুয়া বসন পরা কিংবা সহরের বাহিরে বৈরাগী হইয়া থাকাই অনেক সময় বিশেষ সুবিধাজনক হয়। কারণ, তাহা হইলে নিজের পশ্চাতে পরিবারপোষণের ঝঞ্ঝাট না থাকায় আমাদের সমস্ত সময় ও পরিশ্রম লোককার্য্যার্থে ব্যয় করিবার পক্ষে কোন বাধাই থাকে না। এইরূপ পুরুষের সন্ন্যাসী বেশ থাকিলেও, সে তত্ত্বদৃষ্টিতে কর্ম্মযোগীই। কিন্তু উল্টাপক্ষে অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত ব্যবহারকে অসার ভাবিয়া ও ত্যাগ করিয়া যাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলিতে হয়,—তাহার পর তাহারা প্রত্যক্ষ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করুক বা না করুক। মোদ্দা কথা, গীতার কটাক্ষ গেরুয়া বস্ত্রের উপরে কিংবা শুভ্র বস্ত্রের উপরে, অথবা বিবাহ কিংবা ব্রহ্মচর্য্যের উপরেও নহে ; জ্ঞানীপুরুষ জাগতিক ব্যবহার করে কিংবা করে না এই এক বিষয়ের উপরেই নজর রাখিয়া সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ, গীতায় এই দুই মার্গের ভেদ করা হইয়াছে। বাকী বিষয় গীতাধর্ম্মের মধ্যে গুরুত্বসূচক বিষয় নহে। সন্ন্যাস কিংবা চতুর্থাশ্রম এই শব্দ অপেক্ষা কর্ম্মসন্ন্যাস কিংবা কর্ম্মত্যাগ এই শব্দ এস্থলে অধিক অন্বর্থক ও নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু এই দুয়ের অপেক্ষা শুধু সন্ন্যাস শব্দ প্রয়োগ করিবারই অধিক চলন থাকায় তাহার পারিভাষিক অর্থ এইখানে খুলিয়া বলিয়াছি। যাহারা জাগতিক ব্যবহারকে অসার মনে করে তাহারা সংসার হইতে নিবৃত্ত হয় এবং অরণ্যে গিয়া পরে স্মৃতিধর্ম্মানুসারে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করে বলিয়া কর্ম্মত্যাগের এই মার্গকে সন্ন্যাস বলে। কিন্তু তাহার প্রধান অংশ কর্ম্মত্যাগ, গেরুয়া বসন নহে।

পূর্ণজ্ঞান হইবার পর কর্ম্ম করিবে (কর্ম্মযোগ) কিংবা কর্ম্ম ত্যাগ করিবে (কর্ম্মসন্ন্যাস), এইরূপ দুই পক্ষ প্রচলিত থাকিলেও শেষে মোক্ষলাভ করিবার দুই মার্গ স্বতন্ত্র অর্থাৎ সমানরূপেই সমর্থ, কিংবা কর্ম্মযোগ পূর্ব্বাঙ্গ অর্থাৎ প্রথম পৈঠা এবং শেষে মোক্ষলাভার্থ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসই গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ প্রশ্ন গীতার সাম্প্রদায়িক টীকাকারেরা এই স্থানে উপস্থিত করিয়াছেন। গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে এই দুই মার্গ স্বতন্ত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, দেখা যায়। কিন্তু যখনই হউক না কেন, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া সাংসারিক কর্ম্ম ত্যাগ না করিলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না এইরূপ যাহাদের মত—এবং তাহাই গীতারও প্রতিপাদ্য হইবে এই বুদ্ধিতে গীতার টীকা করিতে যাহারা প্রবৃত্ত হইয়াছে—তাহারা গীতার এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ বাহির করিয়া থাকে যে, "কর্ম্মযোগ স্বতন্ত্ররূপে মোক্ষলাভের মার্গ নহে, প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া শেষে সন্ন্যাসই গ্রহণ করিতে হইবে, সন্ন্যাসই চরম অর্থাৎ মুখ্য নিষ্ঠা" কিন্তু এই অর্থ স্বীকার করিলে 'সাংখ্য (সন্ন্যাস) ও যোগ (কর্ম্মযোগ)

* কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মত্যাগ (সাংখ্য কিংবা সন্ন্যাস) এই দুই মার্গেরই নাম ইনি আপন *Pessimism* নামক গ্রন্থে—অনুক্রমে Optimism ও Pessimism দিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে এই নাম ঠিক নহে। Pessimism শব্দের অর্থ—"উদাস, নিরাশাবাদী কিম্বা কাঁদুনে কিংবা গোমশা মুখো"। কিন্তু সংসার অনিত্য ভাবিয়া যাহারা সংসার ত্যাগ করে তাহারা আনন্দে থাকে এবং সংসার ত্যাগ করিলেও তাহা আনন্দের সহিতই ত্যাগ করে। তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে Pessimist শব্দ প্রয়োগ করা আমার মতে ঠিক নহে। ইহা অপেক্ষা কর্ম্মযোগের Energism এবং সাংখ্য কিংবা সন্ন্যাসমার্গের Quietism এইরূপ নাম দেওয়াই অধিক প্রশস্ত। বৈদিক ধর্ম্মানুসারে দুই মার্গে ব্রহ্মজ্ঞান একই হওয়ায় দুয়েতেই আনন্দ ও শান্তি একই হইয়া থাকে ; এক মার্গ আনন্দময় এবং অন্য মার্গ দুঃখময় কিংবা এক আশাবাদী এবং অন্য নিরাশাবাদী এইরূপ ভেদ আমি করি না।

এইরূপ এই জগতে দ্বিবিধ নিষ্ঠা আছে' (গী. ৩, ৩), এইরূপ ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, সেই দ্বিবিধ পদের সার্থকতা আদৌ থাকে না। কর্ম্মযোগ শব্দের তিন অর্থ হইতে পারে—(১) জ্ঞান হউক বা না হউক, যাগযজ্ঞাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের কিংবা শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্ম করিয়াও মোক্ষলাভ হয় এই প্রথম অর্থ। কিন্তু মীমাংসক-দিগের এই পক্ষ গীতার মান্য নহে (গী. ২. ৪৫)। (২) চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করা (কর্ম্মযোগ) আবশ্যক বলিয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্ম করা—এই দ্বিতীয় অর্থ। এই অর্থে কর্ম্মযোগ সন্ন্যাসমার্গের পূর্ব্বাঙ্গ কিংবা পূর্ব্বায়োজন। কিন্তু গীতায় বর্ণিত কর্ম্মযোগ ইহা নহে। (৩) নিজের আত্মার কল্যাণ কিসে হয় তাহা যিনি জানেন সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষ যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মোক্ত সাংসারিক কর্ম্ম আমরণ করিবেন কি করিবেন না ইহাই গীতার মুখ্য প্রশ্ন; এবং ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞানী পুরুষকেও চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে করিতে হইবে (গী. ৩. ২৫), ইহাই কর্ম্মযোগ শব্দের তৃতীয় অর্থ; এবং এই কর্ম্মযোগই গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা সন্ন্যাসমার্গের পূর্ব্বাঙ্গ কখনই হইতে পারে না। কারণ, এই মার্গে কর্ম্ম হইতে কখনই মুক্তি নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে মোক্ষলাভের বিষয়ে। এই বিষয়ে গীতায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানলাভ হইলে, নিষ্কাম কর্ম্ম বন্ধন না হইয়া, সন্ন্যাসের দ্বারা যে মোক্ষ লাভ করিবার কথা, সেই মোক্ষ কর্ম্মযোগের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় (গী. ৫. ৫)। তাই, গীতার কর্ম্মযোগ সন্ন্যাসমার্গের পূর্ব্বাঙ্গ নহে; কিন্তু জ্ঞানোত্তর এই দুই মার্গই মোক্ষদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ তুল্যবল (গী. ৫. ২); "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা" (গী. ৩. ৩) এই গীতা-বাক্যের এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এবং এই কারণেই, ভগবান্ পরবর্ত্তী চরণে "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং" এই দুই মার্গকে পৃথক্ রূপে ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন। পরে ১৩শ অধ্যায়ে "অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে" এই শ্লোকের 'অন্যে' (এক) ও 'অপরে' (দ্বিতীয়) এই দুই পদ দুই মার্গকে স্বতন্ত্র বলিয়া না মানিলে অন্বর্থক হয় না (গী. ১৩. ২৪)। তাছাড়া, যে নারায়ণীয় ধর্ম্মের প্রবৃত্তি-মার্গ (যোগ) গীতায় প্রতিপাদিত হইয়াছে, মহাভারতে প্রদত্ত তাহার ইতিহাস দেখিলেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। জগতের আরম্ভে ভগবান্ হিরণ্যগর্ভকে অর্থাৎ ব্রহ্মদেবকে জগৎ সৃষ্টি করিতে বলিলে, তাঁহা হইতে মরীচি-আদি সাত মানসপুত্র উৎপন্ন হয় তাঁহারা সৃষ্টিক্রম ঠিক্ শুরু করিবার জন্য যোগ অর্থাৎ কর্ম্মময় প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন। সনৎকুমার, কপিল প্রভৃতি অন্য সাতপুত্র জন্মিলেই নিবৃত্তিমার্গ অর্থাৎ সাংখ্য অবলম্বন করিলেন। এইরূপ দুই মার্গের উৎপত্তি বলিয়া এই দুই মার্গ মোক্ষদৃষ্টিতে তুল্যবল অর্থাৎ বাসুদেবস্বরূপী একই পরমেশ্বর প্রাপ্তির ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র মার্গ, এইরূপ পরে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (মভা. শাং. ৩৪৮. ৭৪; ৩৪৯. ৬৩-৭৩)। সেইরূপ আবার, যোগের অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গের প্রবর্ত্তক হিরণ্যগর্ভ এবং সাংখ্যমার্গের মূলপ্রবর্ত্তক কপিল এইরূপ ভেদও করিয়াছেন, কিন্তু হিরণ্যগর্ভ পরে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন এরূপ কোথাও উক্ত হয় নাই। উল্টা, জগতের ব্যবহার যাহাতে সুচারুরূপে চলে এই জন্য ভগবান্ কর্ম্মরূপ যজ্ঞচক্র উৎপন্ন করিয়া তাহা সতত চলমান রাখিবার জন্য তাঁহাকে এবং অন্য দেবতাকে বলিয়াছিলেন, এই-রূপ বর্ণনা আছে (মভা. শাং. ৩৪০. ৪৪-৭৫ ও ৩৩৯. ৬৬, ৬৭ দেখ)। ইহা হইতে সাংখ্য ও যোগ এই দুই মার্গ প্রথম হইতেই যে স্বতন্ত্র, তাহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয়। ইহা হইতে আরও দেখা যায় যে, গীতার সাম্প্রদায়িক টীকা-কারেরা কর্ম্মযোগকে যে গৌণত্ব দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিছক্ সাম্প্রদায়িক আগ্রহের পরিণাম; এবং কর্ম্মযোগ জ্ঞানলাভের কিংবা সন্ন্যাসের কেবল সাধন মাত্র এই টীকাকারেরা স্থানে স্থানে যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের নিজের কথা, গীতার প্রকৃত ভাবার্থ সেরূপ নহে। আমার মতে, সন্ন্যাসমার্গীয় গীতার টীকাসমূহের ইহাই দোষ; এবং টীকাকারদিগের এই সাম্প্রদায়িক আগ্রহ হইতে মুক্ত না হইলে গীতার প্রকৃত রহস্যের জ্ঞান হওয়া কখনই সম্ভব নহে।

কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই-ই স্বতন্ত্রভাবে সমান মোক্ষপ্রদ, এক অন্যটির পূর্ব্বাঙ্গ নহে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইলেও সব কথার মীমাংসা হয় না। কারণ, যদি দুই মার্গই সমান মোক্ষপ্রদ হয় তবে উহাদের মধ্যে আমাদের যেটি ভাল লাগে আমরা তাহাই অবলম্বন করিব, এইরূপ বলিতে হয়। এবং তাহা হইলে, অর্জ্জুনের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য এইরূপ সিদ্ধ না হইয়া, ভগবানের উপদেশে পরমেশ্বরজ্ঞান হইলেও অর্জ্জুন আপন অভিরুচি অনুসারে যুদ্ধ করিবে কিম্বা যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, এইরূপ দুই পক্ষই সম্ভব হয়। তাই "এই দুই মার্গের মধ্যে অধিক প্রশস্ত যেটি সেই এক মার্গের কথাই আমাকে ঠিক করিয়া বল" (গী. ৫.) অর্থাৎ যে আচরণ করিলে গোলযোগ হইবে না, অর্জ্জুন সহজ-ভাবে ও সরলভাবে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন এই প্রশ্ন করিলে পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান তাহার এই স্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন যে "সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গ নিঃশ্রেয়স

অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ কিংবা মোক্ষদৃষ্টিতে সমতুল্য হইলেও এই দুয়ের মধ্যে কর্ম্মযোগের মাতব্বরী কিংবা যোগ্যতা বিশেষভাবে আছে (বিশিষ্যতে)" (গী. ৫. ২); এবং এই শ্লোক আমি এই প্রকরণের আরম্ভেই দিয়াছি। কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্বসম্বন্ধে এই একটি মাত্র বচন যে গীতায় আছে তাহা নহে। অনেক বচন আছে; যথা "তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব" (গী. ২. ৫০)—অতএব তুমি কর্ম্মযোগই স্বীকার কর; "মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি" (গী. ২. ৪৭)—কর্ম্ম না করিবার আগ্রহ রাখিও না;

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

কর্ম্ম একেবারে ছাড়িবার ঝগড়ায় না পড়িয়া "ইন্দ্রিয়দিগকে মনের দ্বারা নিয়মিত করিয়া অনাসক্তবুদ্ধিতে কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা 'বিশিষ্যতে' অর্থাৎ বিশেষ" (গী. ৩. ৭); কারণ যখন যাহাই হউক না কেন, "কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ" (গী. ৩. ৮) অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ; "অতএব তুমি কর্ম্মই কর" (গী. ৪. ১৫); কিংবা "যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ" (গী. ৪. ৪২)—কর্ম্মযোগ স্বীকার করিয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হও; "(যোগী) জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ" জ্ঞানমার্গী (সন্ন্যাসী) অপেক্ষা কর্ম্মযোগীর যোগ্যতা অধিক; "তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন" (গী. ৬. ৪৬)—অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি (কর্ম্ম-) যোগী হও; কিংবা "মামনুস্মর যুধ্য চ" (গী. ৮. ৭)—আমাকে স্মরণ করিয়া যুদ্ধ কর; এই প্রকার অনেক বচনে গীতায় অর্জ্জুনকে স্থানে স্থানে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও সন্ন্যাস বা অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মযোগ অধিক যোগ্য এইরূপ দেখাইবার জন্য 'জ্যায়ঃ', 'অধিকঃ', 'বিশিষ্যতে' এইরূপ স্পষ্ট পদ আছে। ১৮শ অধ্যায়ের উপসংহারেও "নিয়ত কর্ম্মসন্ন্যাস করা উচিত নহে; আসক্তিবিরহিত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বদা করিতে হইবে, ইহাই আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত," এইরূপ ভগবান পুনর্ব্বার বলিয়াছেন (গী. ১৮. ৬, ৭)। ইহা হইতে নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয় যে, সন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই গীতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

কিন্তু সন্ন্যাস কিংবা ভক্তিই চরম ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য; কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির কেবল সাধনমাত্র, মুখ্য সাধ্য বা কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ যাঁহাদের সাম্প্রদায়িক মত, এই সিদ্ধান্ত তাঁহাদের রুচিবে কি করিয়া? সন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা গীতায় কর্ম্মযোগের অধিক গুরুত্ব স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, এই কথা তাঁহাদের যে মনে হয় নাই এরূপ নহে। কিন্তু ইহা মানিলে, নিজের সাম্প্রদায়িক যোগ্যতা কমিয়া যাইবে, ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে। তাই, পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন-কৃত প্রশ্ন এবং ভগবান-প্রদত্ত উত্তর এই দুই-ই সরল, সযুক্তিক ও স্পষ্টার্থক হইলেও, ইহার কোন্ অর্থ কি প্রকারে করা যাইবে, এই সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক টীকাকারগণ বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছেন। প্রথম মুস্কিল এই ছিল যে, 'সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গের মধ্যে কোন্ মার্গ শ্রেষ্ঠ'? এই প্রশ্নই উপস্থিত হয়ই না, যদি না এই দুই মার্গকে স্বতন্ত্র বলিয়া মানা যায়। কারণ, টীকাকারদিগের কথা অনুসারে কর্ম্মযোগ যদি জ্ঞানের কেবল পূর্ব্বাঙ্গ হয়, তবে পূর্ব্বাঙ্গ গৌণ এবং জ্ঞান কিংবা সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বতই সিদ্ধ হয়। এবং তাহার পর, প্রশ্ন করিবার কোন অবসর থাকে না। ভাল; এই প্রশ্নকে উচিত প্রশ্ন বলিলেও, এই দুই মার্গ স্বতন্ত্র ইহা স্বীকার করিতে হয়; এবং এইরূপ স্বীকার করিলে, নিজের সম্প্রদায়ই একমাত্র মোক্ষমার্গ, এই কথার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়! এই জন্য, অর্জ্জুনের প্রশ্নই ঠিক্ নহে এইরূপ ব্যাখ্যা প্রথমে করিয়াছেন; এবং ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভগবানের উত্তরের তাৎপর্য্যও এইরূপই। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও "কর্ম্মযোগের যোগ্যতা কিংবা প্রামাণ্য অধিক" (গী. ৫. ২) ভগবানের এই স্পষ্ট উত্তরের অর্থ লাগাইতে পারেন নাই! তাই, শেষে "কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে"—কর্ম্মযোগের প্রামাণ্য বিশেষরকমের—এই বচন কর্ম্মযোগের স্তুতিমাত্র অর্থাৎ অর্থবাদাত্মক, ভগবানেরও মতে সন্ন্যাসমার্গই শ্রেষ্ঠ, (গী. শাং ভা. ৫. ২; ৬. ১, ২; ১৮. ১১ দেখ) এইরূপ পূর্ব্বাপর সন্দর্ভবিরুদ্ধ নিজের মনে গড়া আর একটা টিপ্পনী করিয়া কোন প্রকারে মনকে আশ্বস্ত করিতে হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্যে শুধু নহে, রামানুজভাষ্যেও এই শ্লোক কর্ম্মযোগের স্তুতিবাচক অর্থাৎ অর্থবাদাত্মক বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে (গী. রা ভা. ৫. ১)। রামানুজাচার্য্য অদ্বৈতী না হইলেও তাঁহার মতে ভক্তিই মুখ্য সাধ্য হওয়ায়, কর্ম্মযোগ জ্ঞানযুক্ত ভক্তির সাধনই হইয়া যায় (গী. রাভা. ৩. ১ দেখ)। মূলগ্রন্থ হইতে টীকাকারদিগের সম্প্রদায় ভিন্ন; কিন্তু টীকাকার, নিজের মার্গই মূল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এই দৃঢ় ধারণায় সেই গ্রন্থের টীকা করিতে প্রবৃত্ত হন। মূলগ্রন্থের কিরূপ টানা-বুনা ব্যাখ্যা হয় তাহা পাঠক দেখুন। "অর্জ্জুন! তোমার প্রশ্নটি ঠিক্ নহে" এইরূপ কৃষ্ণের কিংবা ব্যাসের সংস্কৃত ভাষায় স্পষ্টশব্দে বলা আসে নাই কি? কিন্তু তাহা না করিয়া যখন "কর্ম্মযোগই বিশেষরূপে যোগ্য" এইরূপ অনেক স্থানে স্পষ্ট উক্তি আছে তখন সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের উক্ত অর্থ সরল নহে, এ কথা বলিতেই হয়; এবং পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ দেখিলেও এই অনুমান দৃঢ় হয়। কারণ গীতাতেই, জ্ঞানীপুরুষ

কর্ম্মের সন্ন্যাস না করিয়া, জ্ঞানোত্তরেও অনাসক্ত বুদ্ধিতে নিজের সমস্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন, এইরূপ অনেক স্থানে বর্ণনা আছে (গী. ২. ৬৪ ; ৩. ১৯ ; ৩. ২৫ ; ১৮. ৯ দেখ)। ইহার উপর শ্রীশঙ্করাচার্য্য আপন ভাষ্যে প্রথমে এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, কিংবা জ্ঞান ও কর্ম্ম ইহাদের সমুচ্চয়ে মোক্ষলাভ হয় ; এবং পুনরায় এই গীতার্থে স্থির করিয়াছেন যে, কেবল মাত্র জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া গিয়া মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভের জন্য কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। ইহা হইতে পরে এই করা হইয়াছে যে, যখন গীতার দৃষ্টিতেও মোক্ষের জন্য কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই তখন চিত্তশুদ্ধি হইলে সমস্ত কর্ম্ম নিরর্থকই হইয়া থাকে ; এবং তাহা স্বভাবতই বন্ধক অর্থাৎ জ্ঞানের বিরুদ্ধ হওয়ায়, জ্ঞানোত্তর জ্ঞানী পুরুষকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়'—এই মতই গীতায় ভগবানেরও গ্রাহ্য হইয়াছে। 'জ্ঞানোত্তর জ্ঞানী পুরুষকেও কর্ম্ম করিতে হয়'—এই মতের নাম "জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয় পক্ষ" ; এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যের উপরি-উক্ত যুক্তি-বাদই তদ্বিরুদ্ধ মুখ্য আপত্তি। এইরূপ যুক্তিবাদই মধ্বাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন (গী. মা. ভা. ৩. ৩১. দেখ)। কিন্তু এই যুক্তিবাদ আমার মতে সন্তোষজনক কিংবা নিরুত্তরও নহে। কারণ, (১) কাম্য কর্ম্ম বন্ধন হওয়ায় জ্ঞানের বিরুদ্ধ হইলেও ঐ যুক্তি নিষ্কাম কর্ম্মের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় না ; এবং (২) জ্ঞানোত্তর মোক্ষের জন্য কর্ম্ম অনাবশ্যক হইলেও অন্য কোন বলবৎ কারণের জন্য জ্ঞানী পুরুষের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্কাম কর্ম্ম করা আবশ্যক, এইরূপ সিদ্ধ হইবার পক্ষে উহাতে করিয়া কোন বাধা হয় না। মুমুক্ষুর চিত্ত শুদ্ধ করাই জগতে কর্ম্মের উপযোগ নহে, কিংবা ইহারই জন্য কর্ম্ম উৎপন্নও হয় নাই ; তাই, মোক্ষ ব্যতীত অন্য কারণবশতঃ স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্মজগতের সমস্ত ব্যবহার জ্ঞানী পুরুষেরও নিষ্কাম বুদ্ধিতে করা আবশ্যক, এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই কারণগুলি কি, তাহার সবিস্তর বিচার এই প্রকরণে পরে করা হইয়াছে। এক্ষণে এই-টুকুই বলিতেছি যে, সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত অর্জ্জুনকে এই সমস্ত কারণ বলিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়াছে ; এবং এইরূপ অনুমান করিতে পারা যায় না যে, চিত্তশুদ্ধির পর মোক্ষের জন্য কর্ম্মের অনাবশ্যকতা বুঝাইয়া গীতায় সন্ন্যাসমার্গই প্রতিপাদ্য হইয়াছে। জ্ঞানোত্তর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতেই হইবে এইরূপ শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের মত সত্য ; কিন্তু তাহা হইতে ইহা সিদ্ধ হয় না যে গীতার তাৎপর্য্যও তাহাই হইবে, কিংবা শাঙ্কর অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়কে এ[illegible]এক 'ধর্ম্ম' মানিয়া লইয়া তাহারই অনুকূল গীতার কোনরূপ অর্থ করিতেই হইবে। জ্ঞানোত্তরও সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন অপেক্ষা কর্ম্মযোগ স্বীকার করাই উত্তম পক্ষ, ইহাই তো গীতার স্থির সিদ্ধান্ত। তারপর, তাহাকে তুমি পৃথক সম্প্রদায়ই বল, কিংবা তাহার আর কোন নাম দেও, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু গীতা কর্ম্মযোগকেই এইরূপ শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও, সন্ন্যাসমার্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে, অন্য পরমতাসহিষ্ণু সম্প্রদায়ের ন্যায় গীতার এরূপ আগ্রহ নাই ইহা মনে রাখা আবশ্যক। সন্ন্যাস-মার্গসম্বন্ধে গীতার কোথাও অনাদরবুদ্ধি প্রদর্শিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গ একই প্রকার নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ কিংবা মোক্ষ-দৃষ্টিতে সমান মূল্যবান, এইরূপ ভগবান স্পষ্ট বলিয়াছেন। এবং পরে "একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" (গী. ৫. ৫) এই দুই মার্গ একই অর্থাৎ তুল্যবল ইহা যে জানে সেই প্রকৃত তত্ত্ব জানে, কিংবা 'কর্ম্মযোগ' হইলেও তাহাতে ফলাশার 'সন্ন্যাস' করাই আবশ্যক হয়—"ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন" (গী. ৬. ২),—এইরূপ যুক্তি দ্বারা এই দুই ভিন্ন মার্গ একরূপতা করিয়াও দেখানো হইয়াছে ; জ্ঞানোত্তর (প্রথমেই নহে) কর্ম্ম ত্যাগ করা বা কর্ম্মযোগ স্বীকার করা, দুই মার্গ মোক্ষদৃষ্টিতে একই যোগ্যতার হইলেও লোকব্যবহারদৃষ্টিতে বিচার করিবার সময় বুদ্ধিতে সন্ন্যাস রাখিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিকে নিষ্কাম করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদিযোগে আমরণ লোক-সংগ্রহকারী কর্ম্ম করিতে থাকা,—এই মার্গই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, সন্ন্যাস ও কর্ম্ম এই দুই-ই তাহাতে বজায় থাকে, এইরূপ ভগবানের নিশ্চিত উপদেশ ; এবং তদনুসারে অর্জ্জুন পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ইহাদের মধ্যে ইহাই যাহা কিছু ভেদ। কেবল শারীরকর্ম্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সংঘটিত কর্ম্ম দেখিলে, ঐ দুই একই হইবে ; কিন্তু অজ্ঞান মনুষ্য তাহা আসক্ত বুদ্ধিতে এবং জ্ঞানী মনুষ্য অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিয়া থাকে (গী. ৩. ২৫)। গীতার এই সিদ্ধান্তই ভাস কবি স্বীয় নাটকে বলিয়াছেন—

> "প্রাজ্ঞস্য মূর্খস্য চ কার্য্যযোগে।
> সমত্বমভ্যেতি তনুর্ন বুদ্ধিঃ ॥

"জ্ঞানী ও মূর্খ ইহাদের কর্ম্ম করিবার পক্ষে দেহ এক-রকমই, কেবল বুদ্ধিই ভিন্ন হইয়া থাকে (অবিমার ৫. ৫)।

কতকগুলি সন্ন্যাসমার্গের ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোক এই সম্বন্ধে আরও এই কথা বলে যে "গীতায় অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সত্য ; কিন্তু অর্জ্জুন অজ্ঞান বলিয়া চিত্তশুদ্ধকারক কর্ম্ম করিবারই তাহার অধিকার

ছিল; এই কথা মনে করিয়াই ভগবান এই উপদেশ করিয়াছেন। সিদ্ধাবস্থায় ভগবানের মতেও কর্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ"। এই যুক্তিবাদের সরল ভাবার্থ ইহাই দেখা যায় যে, ভগবান অর্জ্জুনকে—"তুমি অজ্ঞানী" এইরূপ বলিলে, কঠোপনিষদে নচিকেতা যেরূপ পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য জেদ করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ অর্জ্জুন জেদ করায় তাঁহাকে পূর্ণ জ্ঞানের কথা বলিতে হইয়াছিল এবং সেইরূপ পূর্ণজ্ঞানের উপদেশ তাঁহাকে দিলে সে যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এবং যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্পে বিচলিত হইবে এই ভয়ে আপনার অত্যন্ত প্রিয় ভক্তকে ঠকাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন এবং কেবল নিজ সম্প্রদায়ের সমর্থনার্থ ভগবানেরও উপর যাহারা এই প্রতারণারূপ গর্হিত কার্য্য আরোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাদের সহিত কোন প্রকার বাদানুবাদ না করাই শ্রেয়স্কর। কিন্তু সাধারণ লোক এই ভ্রান্ত যুক্তিবাদের দ্বারা পাছে প্রতারিত হয় সেইজন্যই বলিতেছি যে "তুমি অজ্ঞানী, সেইজন্য কর্ম্ম কর" অর্জ্জুনকে এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল না; এবং ইহার পরেও যদি অর্জ্জুন কোন গোলযোগ করিত, তাহা হইলে অর্জ্জুনকে অজ্ঞানী রাখিয়াই তাহাকে দিয়া প্রকৃতি-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করাইবার সামর্থ্য শ্রীকৃষ্ণের ছিল (১৮. ৫৯ ও ৬১ দেখ)। কিন্তু সেরূপ না করিয়া 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান'ই পুনঃ পুনঃ বলিয়া (গী. ৭. ২; ৯. ১; ১০. ১; ১৩. ২; ১৪. ১), ১৫ম অধ্যায়ের শেষে "এই শাস্ত্র বুঝিয়া লইতে পারিলে মনুষ্য জ্ঞাতা ও কৃতার্থ হয়" (গী. ১৫. ২০), এইরূপ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। এইরূপে তাহাকে পূর্ণ জ্ঞানী করিয়া তাহাকে দিয়া তাহার স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধ করাইয়াছেন (গী. ১৮. ৭৩ দেখ)। ইহা হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হয় যে, জ্ঞাতা পুরুষ জ্ঞানলাভের পরেও নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেই থাকিবে—এই মতই সর্ব্বোত্তম, এইরূপ ভগবানের অভিপ্রায় ছিল। তাছাড়া, অর্জ্জুন অজ্ঞানী ছিলেন একবার মানিয়া লইলেও, তাঁহাকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহার সমর্থনার্থ, জনকাদি প্রাচীন কর্ম্মযোগীদিগের এবং ভগবান নিজেরও যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অজ্ঞানী ছিলেন এরূপ কথন বলা যাইতে পারে না। তাই, সাম্প্রদায়িক আগ্রহের এই শুষ্ক তর্ক সর্ব্বথা অনুচিত ও ত্যাজ্য, এবং গীতায় জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগের উপদেশই দেওয়া হইয়াছে, একথা বলিতেই হইবে।

যাক্। জ্ঞানোত্তর সিদ্ধাবস্থাতেও কর্ম্মত্যাগ (সাংখ্য) ও কর্ম্মযোগ (যোগ) এইরূপ দুই মার্গ শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্য দেশেও পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়। অনন্তর এই বিষয়ে, গীতাশাস্ত্রের দুই মুখ্য সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে—(১) এই দুই মার্গ স্বতন্ত্র অর্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে পরস্পরনিরপেক্ষ ও তুল্যবল, একটি অপরটির অঙ্গ নহে; এবং (২) উহাদের মধ্যে কর্ম্মযোগই অধিক প্রশস্ত। এই দুই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট হইলেও টীকা-কারেরা কেন ও কি-করিয়া তাহাদের বিপর্য্যয় করিয়াছে তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য এই সমস্ত প্রস্তাবনা লিখিতে হইয়াছে। এক্ষণে, সিদ্ধাবস্থাতেও কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কামবুদ্ধিতে আমরণ কর্ম্ম করিবার মার্গ অর্থাৎ কর্ম্মযোগই অধিক শ্রেয়স্কর, এইরূপ উপস্থিত প্রক-রণের যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য গীতায় যে সকল কারণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার নিরূপণ করিব। তন্মধ্যে দুই এক বিষয়ের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে. সুখ-দুঃখ-বিবেচন-প্রকরণে করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিচার কেবল সুখদুঃখসম্বন্ধেই হওয়ায় সেখানে. এই বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা করিতে পারা যায় নাই। তাই, এই প্রকরণ তাহারই জন্য স্বতন্ত্র আরম্ভ করা হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড: ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগ আছে। তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা পূর্ব্ব প্রকরণে বলিয়াছি। কর্ম্মকাণ্ডে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি শ্রৌতগ্রন্থে এবং অংশতঃ উপনিষদেও এইরূপ স্পষ্ট বচন আছে যে, প্রত্যেক গৃহস্থ—আর সে গৃহস্থ ব্রাহ্মণই হউক বা ক্ষত্রিয়ই হউক—অগ্নিহোত্র পালন করিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ-যজ্ঞ অধিকারানুসারে করিবে এবং বিবাহ করিয়া প্রত্যেকে বংশ বৃদ্ধি করিবে। উদাহরণ যথা—"এতদ্বৈ জরামর্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রম্"—অগ্নিহোত্ররূপ এই সত্র মরণ পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে হইবে (শ. ব্রা. ১২. ৪. ১. ১); "প্রজা-তন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ"—বংশের ধারা ভঙ্গ করিবে না (তৈ. উ. ১. ১১. ১); কিংবা "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং"—জগতে যাহা কিছু আছে তাহা পরমেশ্বরের দ্বারা অধি-ষ্ঠিত করিবে, অর্থাৎ আমার নহে তাঁহার এইরূপ বুঝিবে এবং এই নিষ্কাম বুদ্ধিতে

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

"কর্ম্ম করিতে থাকিয়াই শত বৎসর অর্থাৎ পুরুষের পরমায়ুর শেষ সীমা পর্য্যন্ত বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে, এবং এইরূপ ঈশাবাস্য বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম তোমার (অর্থাৎ পুরুষের) বন্ধন হইবে না; ইহা ব্যতীত (উক্ত বন্ধন পরিহার করিবার জন্য) অন্য মার্গ নাই, (ঈশ. ১ ও ২);" ইত্যাদি বচন দেখ। কিন্তু কর্ম্ম কাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডে উঠিলে "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈ. ২. ১. ১)—ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়; "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বে. ৩. ৮)—(জ্ঞান

ব্যতীত) মোক্ষলাভের অন্য পন্থা নাই; "পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে। কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" (বৃ. ৪. ৪. ২২ ও ৩. ৫. ১)—পূর্ব্বকালের জ্ঞানী পুরুষেরা পুত্রাদি ভাল বাসিতেন না, এবং সমস্ত লোকই যখন আমার আত্মা হইল, তখন আমার (অন্য) সন্তান কি জন্য আবশ্যক, এইরূপ বলিয়া তাঁহারা সন্ততি, সম্পত্তি ও স্বর্গাদির মধ্যে কোন কিছুর 'এষণা' অর্থাৎ ইচ্ছা না করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল ভিক্ষা করিয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেন; কিংবা "এই প্রকারে বিরাগী পুরুষদিগের মোক্ষলাভ হয়" (মুং. ১. ২. ১১); অথবা পরিশেষে "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবা. ৪)—যে দিন বুদ্ধি বিরক্ত হইবে সেই দিন সন্ন্যাস লইবে;—এইরূপ বিরুদ্ধপক্ষীয় বচনাদিও বৈদিক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এই প্রকার বেদাজ্ঞা দ্বিবিধ হওয়ায় (মভা. শাং. ২৪০. ৬) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কিংবা কর্ম্মযোগ ও সাংখ্য, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্‌টি ইহা নির্ণয় করিবার জন্য অন্য কোন সাধন আছে কি নাই, ইহা দেখা আবশ্যক হয়। আচার অর্থাৎ শিষ্ট লোকদিগের আচরণ, রীতি কিংবা চাল কিরূপ, তাহা দেখিয়া এই প্রশ্নের নির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে শিষ্টাচারও উভয়বিধ, এইরূপ দেখা যায়। শুক যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সন্ন্যাসমার্গ, এবং জনক, শ্রীকৃষ্ণ, জৈগীষব্য প্রভৃতি জ্ঞানীপুরুষ কর্ম্মমার্গই অবলম্বন করিয়াছিলেন, এইরূপ ইতিহাস হইতে প্রকাশ পায়। এই অভিপ্রায়েই "তুল্যং তু দর্শনং" (বেসূ. ৩. ৪. ৯) অর্থাৎ আচারদৃষ্টিতে এই দুই পন্থা তুল্যবল, এইরূপ সিদ্ধান্তপক্ষের যুক্তিক্রমে বাদরায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন।

বিবেকী সর্ব্বদা মুক্তঃ কুর্ব্বতো নাস্তি কর্ত্তৃতা।
অলেপবাদমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণজনকৌ যথা॥

যে ব্যক্তি পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছে সে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ও জনকের ন্যায় অকর্ত্তা, অলিপ্ত, ও সর্ব্বদা মুক্তই থাকেন"—এইরূপ স্মৃতি বচনও আছে*। সেইরূপ আবার, ভগবদ্গীতাতেও কর্ম্মযোগীদিগের পরম্পরা বলিতে গিয়া মনু, ইক্ষ্বাকু ইত্যাদির নাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে—"এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ" (গী. ৪. ১৫)—ইহা জানিয়া পূর্ব্বে জনকাদি জ্ঞানীপুরুষ কর্ম্ম করিয়াছেন। জনক ব্যতীত এই প্রকার আরও অনেক উদাহরণ যোগবাসিষ্ঠে ও ভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে (যো. ৫. ৭৫; ভাগ. ২.৮. ৪৩-৪৫)। জনকাদির পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই এইরূপ কাহারও সন্দেহ হইতে পারে। তাই বলিতেছি যে, ইঁহারা সকলে জীবন্মুক্ত ছিলেন এইরূপ যোগবাসিষ্ঠে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। শুধু যোগবাসিষ্ঠে নহে—মহাভারতেও ব্যাস আপন পুত্র শুককে মোক্ষধর্ম্মের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য শেষে জনকের নিকট পাঠাইলেন এইরূপ কথা বিবৃত হইয়াছে (মভা. শাং. ৩২৫ ও যো. ২. ১ দেখ। সেইরূপ উপনিষদেও অশ্বপতি কৈকয় রাজা উদ্দালক ঋষিকে (ছাং ৫. ১১-২৪), এবং কাশিরাজ অজাতশত্রু গার্গ্য বালাকীকে (বৃ. ২. ১) ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন এইরূপ কথা আছে। তথাপি অশ্বপতি কিংবা জনক রাজকার্য্য ছাড়িয়া দিয়া কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোথাও বর্ণনা নাই। উল্টা, জনকসুলভা-সংবাদে জনক "আমি মুক্তসঙ্গ হইয়া আসক্তি না রাখিয়া রাজ্য করিতেছি এবং আমার এক হাতে চন্দন মাখিলেও এবং অন্য হস্ত কাটিয়া ফেলিলেও আমার পক্ষে দুই-ই সমান" ইত্যাদি আপন অবস্থার বর্ণনা প্রথমে করিয়া (মভা. শাং. ৩২০. ৩৬) পরে স্থূলভাবে বলিতেছেন—

মোক্ষে হি ত্রিবিধা নিষ্ঠা দৃষ্টাঽন্যৈর্মোক্ষবিত্তমৈঃ।
জ্ঞানং লোকোত্তরং যচ্চ সর্ব্বত্যাগশ্চ কর্ম্মণাম্॥
জ্ঞাননিষ্ঠাং বদন্ত্যেকে মোক্ষশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
কর্ম্মনিষ্ঠাং তথৈবান্যে যতয়ঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ॥
প্রহায়োভয়মপ্যেবং জ্ঞানং কর্ম্ম চ কেবলম্॥
তৃতীয়েয়ং সমাখ্যাতা নিষ্ঠা তেন মহাত্মনা॥

অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য তিন প্রকার নিষ্ঠা মোক্ষশাস্ত্রবেত্তারা বলিয়া থাকেন। (১) 'জ্ঞান' লাভ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা; ইহাকেই কোন কোন মোক্ষশাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞাননিষ্ঠা বলেন। (২) সেইরূপ আবার, অন্য সূক্ষ্মদর্শী লোকে কর্ম্মনিষ্ঠা বলেন; কিন্তু কেবল জ্ঞান ও কেবল কর্ম্ম এই দুই নিষ্ঠা ছাড়িয়া দিয়া (৩) এই তৃতীয় (অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা আসক্তির ক্ষয় করিয়া কর্ম্ম করিবার) নিষ্ঠা (আমাকে) সেই মহাত্মা পঞ্চশিখ) বলিয়াছেন" (মভা. শাং. ৩২০. ৩৮-৪০)। নিষ্ঠা শব্দের সাধারণ অর্থ অন্তিম স্থিতি, আধার কিংবা অবস্থা। কিন্তু এই স্থানে এবং গীতাতেও নিষ্ঠা শব্দের "যে প্রকার জীবন যাপন করিয়া শেষে মোক্ষলাভ হয় সেইরূপ জীবনযাত্রার মার্গ" এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত। গীতার শাঙ্করভাষ্যেও নিষ্ঠা = অনুষ্ঠেয়তাৎপর্য্য—অর্থাৎ জীবনে যাহা কিছু অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ আচরণীয় তাহার প্রতি তৎপরতা অর্থাৎ তাহাতে মগ্ন থাকা, এই অর্থই করা হইয়াছে। জীবনের এই মার্গ মধ্যে জৈমিনি প্রভৃতি মীমাংসকেরা জ্ঞানের গুরুত্ব না দিয়া কেবল যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলেই মোক্ষলাভ হয় বলিয়াছেন—

* ইহা স্মৃতির বচন বলিয়া আনন্দগিরি কঠোপনিষদের (কঠ. ২. ১৯) শাঙ্করভাষ্যের টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার মূল বচনটি কোথাকার তাহা আমি জানি না।

ঈজানা বহুভিঃ যজ্ঞৈঃ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
শাস্ত্রাণি চেৎ প্রমাণং স্যুঃ প্রাপ্তাস্তে পরমাং গতিম্ ॥

কারণ, ঐরূপ না মানিলে শাস্ত্রের অর্থাৎ বেদের আজ্ঞা ব্যর্থ হইবে, (জৈসূ. ৫. ২. ২৩ শাঙ্করভাষ্য দেখ)। এবং উপনিষৎকার ও বাদরায়ণাচার্য্য সমস্ত যাগযজ্ঞাদি গৌন স্থির করিয়া কেবল জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, জ্ঞানব্যতীত আর কিছুরই দ্বারা ব্রহ্মলাভ হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (বেসূ. ৩. ৪. ১, ২)। কিন্তু এই দুই নিষ্ঠাকে ছাড়িয়া দিয়া আসক্তিবিরহিত কর্ম্ম করিবার তৃতীয় নিষ্ঠাই পঞ্চশিখ (নিজে সাংখ্যমার্গী হইলেও) আমাকে বলিয়াছেন, এইরূপ জনক বলেন। "দুই নিষ্ঠা ছাড়িয়া দিয়া" এই শব্দগুলি হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে,—এই তৃতীয় নিষ্ঠাটি, পূর্ব্বের দুই নিষ্ঠার মধ্যে, কোন নিষ্ঠারই অঙ্গীভূত নহে,—প্রত্যুত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্তসূত্রেও (বেসূ. ৩. ৪. ৩২-৩৫) জনকের এই তৃতীয় নিষ্ঠার উল্লেখ করা হইয়াছে; ভগবদ্গীতায় জনকের এই তৃতীয় নিষ্ঠাই—তাহার ভিতর ভক্তি নূতন যোগ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মীমাংসকদিগের নিছক কর্ম্মমার্গ অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত কর্ম্মমার্গ মোক্ষপ্রদ নহে—শুধু স্বর্গপ্রদ এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত (গী. ২. ৪২-৪৪; ৯. ২১); তাই যে মার্গ মোক্ষপ্রদ নহে তাহার 'নিষ্ঠা' নামই দেওয়া যায় না। কারণ, যাহার দ্বারা শেষে মোক্ষলাভ হয় সেই মার্গকেই নিষ্ঠা বলা উচিত—এই ব্যাখ্যা সকলেরই স্বীকৃত। অতএব সকলের মতের সাধারণ বর্ণনা করিবার সময় জনক তিন নিষ্ঠার কথা বলিলেও মীমাংসকদিগের নিছক্ অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত কর্ম্মমার্গ 'নিষ্ঠা' হইতে বাহির করিয়া দিয়া সিদ্ধান্তপক্ষে স্থির নির্দ্ধারিত দুই নিষ্ঠাই গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে বর্ণিত হইয়াছে (গী. ৩. ৩)। নিছক্ জ্ঞান (সাংখ্য) ও জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম (যোগ) এই দুই-ই নিষ্ঠা; এবং সিদ্ধান্তপক্ষীয় এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে দ্বিতীয় (অর্থাৎ জনকের কথা অনুসারে তৃতীয়) নিষ্ঠার সমর্থনার্থ "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" (গী. ৩. ২০) জনকাদি এইরূপ কর্ম্ম করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—এই পুরাতন দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। জনকাদি ক্ষত্রিয় রাজার কথা ছাড়িয়া দিলেও ব্যাস বিচিত্রবীর্য্যের বংশ বজায় রাখিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুই ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করিলেন এবং তিন বৎসর সতত পরিশ্রম করিয়া জগতের উদ্ধারার্থ মহাভারত লিখিলেন; এবং কলিযুগে স্মার্ত্ত অর্থাৎ সন্ন্যাসমার্গের প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করাচার্য্যও স্বকীয় অলৌকিক জ্ঞানের দ্বারা ও উদ্যোগে ধর্ম্মসংস্থাপন করিলেন; ইহা সর্ব্বশ্রুত কথা। অধিক কি, স্বয়ং ব্রহ্মদেব যখন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হয়; ব্রহ্মদেব হইতেই মরীচি-আদি সাত মানসপুত্র উৎপন্ন হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া সৃষ্টিক্রম বজায় রাখিবার জন্য আমরণ প্রবৃত্তিমার্গই অঙ্গীকার করেন এবং সনৎকুমারাদি অন্য সাত মানসপুত্র জন্মতই বিরক্ত অর্থাৎ নিবৃত্তিপন্থী হইয়া বাহির হন—এইরূপ মহাভারতে নারায়ণীয় ধর্ম্মনিরূপণে বর্ণিত হইয়াছে (মভা. শাং. ৩৩৯ ও ৩৪০)। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষেরা এবং ব্রহ্মদেবও কর্ম্ম করিবারই এই প্রবৃত্তিমার্গ কেন স্বীকার করিলেন? বেদান্তসূত্রে তাহার এই প্রকার উপপত্তি কথিত হইয়াছে—যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিণাম" (বেসূ. ৩. ৩. ৩২)—যাহার ঈশ্বরপ্রদত্ত যে অধিকার, তাহা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ হয় না। এই উপপত্তির বিচার-আলোচনা পরে করা যাইবে। উপপত্তি যাহাই হউক না কেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই পন্থা জগতের আরম্ভ হইতে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে—এ কথাও নির্ব্বিবাদ; এবং সেইজন্য ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহার নির্ণয় কেবল আচার দেখিয়াই করা যাইতে পারে না ইহাও স্পষ্ট রহিয়াছে।

কালিদাসের সময় নির্দ্দেশ।

(শ্রীধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা এইবার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের কথা বলিব। তিনি তৃতীয় মতকে সমর্থন করিতে চাহেন। বাণভট্টের এত সন্নিকটে কালিদাসের অবস্থিতি অসঙ্গত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শাস্ত্রীমহাশয় বলেন যে কালিদাস যশোধর্ম্ম ধর্ম্মবর্দ্ধন রাজার সভাপতি ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ তিনি কক্কের পুত্র বাসুল্যলিখিত আলেখমালা উল্লেখ করিয়াছেন। যশোধর্ম্ম খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। তখন সভাপণ্ডিত দ্বারা নৃপতির অতিরঞ্জিত চাটুকারিতা বিশেষ পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কবি অতিশয় সরলভাবেই তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়াছেন—

ইতি তুষ্টুষয়া তস্য নৃপতেঃ পুণ্যকর্ম্মণঃ।
বাসুলেনোপরচিতাঃ শ্লোকাঃ কক্কস্য সূনুনা ॥

এই তুষ্টুষায় প্রণোদিত হইয়া তিনি যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতি সন্তর্পণে গ্রাহ্য "Cuni grano salis"। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় বাসুল হইতেও অনেক দূরে গিয়াছেন। বাসুল বলিতেছেন :—

"যস্যাশ্লিষ্টো ভুবাভ্যাং বহতি হিমগিরির্দুর্গশব্দাভিমানং"

শাস্ত্রীমহাশয় অনুবাদ করেন যে যশোধর্ম্ম সর্ব্ব-প্রথম হিমালয়কে লোকগম্য করেন, "He was the first to make Himalayas accessible" এই অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কালিদাসের হিমালয় বর্ণনা হইতে কালিদাসের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন !!

এই আলেখমালার ভাষা প্রাঞ্জল নহে। অর্ব্বাচীন সময়ের বলিয়াই বোধ হয়। সে যাহা হউক, যদি যশোধর্ম্ম রাজার সভায় কালিদাস ছিলেন তাহা হইলে অজ্ঞাতনামা বাসুল আলেখ লেখেন কেন? তাহার কোনও কারণ দেওয়া নাই। এই আলেখমালায় কালিদাসের ভাবের অনুকরণ ও অতিরঞ্জন দেখা যায় যথা :—

"বেপন্তে যস্য ভীমস্তনিলয়াদুদ্ভ্রান্তদৈত্যা দিগন্তাঃ
শৃঙ্গাঘাতৈঃ সুমেরোর্বিঘটিতদৃষদঃ কন্দরা যঃ করোতি"

মহাদেবের বৃষের বর্ণনা—এ কেবল "দৃষ্টঃ কথঞ্চিৎ গবয়ৈর্বিবিগ্নৈঃ" শুধু গবয় নয়, সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত দৈত্য-দিগন্ত ভয়ে বেপমান! এ কবি যে কালিদাসের অনেক পরে তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী চরণে আমরা রঘুবংশের পঞ্চম সর্গে বৈতালিক পাঠে বর্ণিত মহিষের অনুকরণ ও অতিরঞ্জন দেখিতে পাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই মতের মূলঘাতক মান্দালোরে বৎসভট্টি রচিত আলেখমালা। শাস্ত্রী মহাশয় তাহার কৈফিয়ত দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি দুইটি কথা বলেন—

(ক) বৎসভট্টি কালিদাস হইতে ভাবের অনুকরণ করেন নাই। তিনি ঋতুসংহার হইতে নকল করেন নাই। তখন ঋতুবর্ণনার কতকগুলি প্রথা বা নিয়ম ছিল; উভয়েই সেই নিয়ম ধরিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এই মাত্র—

(খ) ঋতুসংহার এমন কি সুন্দর কবিতা, যে বৎসভট্টি তাহাকে অনুকরণ করিবেন।

ঋতুবর্ণনার প্রথা বা নিয়মের কোনও প্রমাণ নাই। অনেক সময় কোনও সুন্দর বর্ণনায় লোকে মুগ্ধ হইলে তাহা হইতে নিয়মের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এস্থলে তাহারও প্রমাণ নাই। বৎসভট্টি যে কেবল ঋতুবর্ণনা অনুকরণ করিয়াছেন তাহা নহে; তিনি লিখিয়াছেন,—

চলৎপতাকানাবলাসনাথান্যত্যর্থশুক্লান্যধিবেগশচল্লতানি।
তড়িল্লতাচিত্রসিতাভ্রকূটতুল্যোপমানানি গৃহাণি যত্র॥
কৈলাসতুঙ্গশিখরপ্রতিমানি চান্যান্যা ভা স্ব দীর্ঘবলভীনি সবেদিকানি।
গান্ধর্ব্বশব্দমুখরাণি নিবিষ্টচিত্রকর্ম্মাণি লোলকদলীবন-শোভিতানি॥

উত্তর মেঘের প্রথম শ্লোক এই—

বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষং।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥

ললিতবনিতাবিমণ্ডিত, প্রহতমুরজ প্রাসাদগণের সহিত বিদ্যুত্বান্ গম্ভীরঘোষ মেঘের উপমাকেই বৎসভট্টি অনুকরণ করিয়াছেন এবং "অভ্রংলিহাগ্রা" এই ভাব অবলম্বন করিয়া তাহা সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ঋতুবর্ণনার ত একটা Convention কল্পনা করা হইল। এখন গৃহবর্ণনারও কি একটা Convention কল্পনা করা হইবে? বৎসভট্টি কালিদাসের ভাব গ্রহণ ও সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আরও দেখুন, কালিদাস নিদাঘবর্ণনায় লিখিয়াছেন—

নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ
ক্বচিদ্ বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং
শুচৌ প্রিয়ে যান্তি জনস্য সেব্যতাং॥
সুবাসিতং হর্ম্ম্যতলং মনোহরং

বৎসভট্টি শীতের বর্ণনায় এই সকল সুখের অভাব বর্ণনা করিয়াছেন—

"চন্দ্রাংশুহর্ম্ম্যতলচন্দনতালবৃন্তহারোপভোগরহিতে।"

এইরূপ Negative বর্ণনার দ্বারা কালিদাসের শ্লোকগুলি তাঁহার মনে ছিল বেশ বুঝা যায়।

শাস্ত্রীমহাশয় বলিতেছেন, "ঋতুসংহার এমন কি সুন্দর যে দুই শত বৎসর ধরিয়া কবিগণ তাহার অনুকরণ করিবেন?" কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্‌ডোনেল বলিয়াছেন—

"Ritusamhara is a highly poetical description of the six seasons with glowing description of the beauties of nature in which erotic scenes are interspersed and the poet adroitly interweaves the expressions of human emotions. Perhaps no other work of Kalidasa manifests so strikingly the poet's deep sympathy with nature, his keen powers of

observation and his skill in describing an Indian landscape in vivid colours" প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সহিত মনুষ্যের অভিলাষমাখা এমন সুন্দর সৌন্দর্য্য সংস্কৃত সাহিত্যে খুব বিরল। দুই শত বৎসর কেন, কালিদাস হইতে সংস্কৃত-সাহিত্যের জীবদবস্থা পর্য্যন্ত সমস্ত কবিগণ ঋতু-সংহারের অনুকরণ ও ভাবের পরিবর্দ্ধন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কালিদাস গ্রীষ্মবর্ণনায় বলিয়াছেন "উৎপ্লুত্য ভেকস্তৃষিতস্য ভোগিনঃ ফণাত পত্রস্য তলে নিষীদতি"। ভবভূতি এই ভাবকে আরও সংবর্দ্ধিত করিয়া বলিলেন, "অজগর-স্বেদদ্রবঃ পীয়তে"; কালিদাসের ভেক নিঝুম হইয়া গ্রীষ্মের তাপে সাপের তলায় আশ্রয় লইয়াছিল, ভবভূতির ভেক অজগরের স্বেদদ্রব পান করিল। অনেকেই অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় ভট্টি (২য় সর্গ) ব্যতীত আর কেহই সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

এই ঋতুসংহারপাঠে বোধ হয় যে, কালিদাস কিছুদিন মগধে ছিলেন। তাঁহার অন্যত্র বর্ণনা আছে "নেত্রোৎসবঃ পুষ্পপুরাঙ্গনানাং" (ষষ্ঠ সর্গ রঘু); কল্পনা হয় যেন তাঁহাকে বা তাঁহার সহিত কোনও রাজাকে দেখিবার জন্যই পুষ্পপুর-মহিলাগণের হুড়াহুড়ি পড়িয়াছিল।

বৎসভট্টির কালিদাস হইতে অনুকরণ স্থিরীকৃত হইল। ৩য় মত এরূপ অবস্থায় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। মনে হয়, শাস্ত্রীমহাশয়ও যেন তাহা বুঝিলেও স্বীকার করিতে চাহেন না।

"It we once concede to this, we shall have to put the date of Kalidasa to at least the middle of 4th century A. D. This nobody is prepared to accept". স্বীকার করিতে গেলে কালিদাসকে অনেক আগে দিতে হয়। ইহা একটা অসহ্য sentoimint ও prejudice ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমরা এইবার শাস্ত্রীমহাশয়ের অন্যান্য যুক্তির কথা সংক্ষেপে বলিব। অধিকাংশই মর্ম্মগ্রাহী নহে। তবে যে কয়েকটি প্রধান বলিয়া বোধ হয় তাহারই উল্লেখ করিতেছি—

আমরা পূর্ব্বে রঘুর যানমার্গ সম্বন্ধে বলিয়াছি। পারস্য ও ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও ব্যবহিত দেশ ছিল না, এরূপ কোনও স্থলেই বোধ হয় না। এই যানমার্গে কালিদাস কেবল প্রধান দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মগধেরও উল্লেখ করেন নাই। অযোধ্যা ও বঙ্গদেশ অব্যবহিত রূপে অবস্থিত ছিল ইহা কোনও মতেই সম্ভবে না। কালিদাস বলিতেছেন "তাহার পর তিনি পারসীকদিগকে জয় করিতে স্থলপথে প্রস্থান করিলেন"। পারস্য ও সিন্ধুর মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে এই স্থলপথের কোনও অর্থই হয় না; বরঞ্চ তিনি যাহা উপমা দিয়াছেন তাহাতে পারস্য বহু দূর; স্থলপথ আয়াসসাধ্য এবং জলপথ নিরাপদ নহে এই ভাবই বুঝা যায়। যেমন তত্ত্বজ্ঞানে ইন্দ্রিয়জয় আয়াসসাধ্য, কিন্তু ফল অবশ্যম্ভাবী। পারসীকগণ ক্ষমতাশালী ছিলেন একথা ত কোনও স্থানেই নাই। তাঁহারা যুদ্ধে অশ্ব ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহাদের কুঞ্চিত কূর্চমণ্ডল দেখিয়া মধুমক্ষিকার ভ্রম হইত এই কথাই কালিদাস বলিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে বীরত্বের কোনও আভাস নাই। তিনি বলিয়াছেন:—

"যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ"

আমরা দেখিতে পাই যবন অর্থে Greeks:—Ionians:—খৃঃপূঃ প্রথম শতাব্দীতেও Bactriaর প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহা গ্রীকদিগের একটি অবস্থিতি। এই বাক্‌ট্রিয়ার রাজা মিলাণ্ডার মিলিন্দা নামে খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে বিরাজিত ছিলেন। ইহা হইতে কালিদাস যে খৃঃপূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক তাহা বেশ বুঝা যায়।

হূন—Huns—শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে কালিদাসের সময় হূনগণ ভারতবর্ষের এক অংশে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং কালিদাসের রঘুবিজয়ে তাহার উল্লেখ আছে। এ কথাও সঙ্গত নহে; এই হূনগণের নিবাস তখন ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল, তাহার কোনও চিহ্ন নাই। কালিদাস হূনদিগকে ভারতবর্ষের মধ্যে স্থান দেন নাই। কালিদাসের বর্ণনানুসারে হূনগণ পারস্যের উত্তরে, "কৌবেরীং দিশং," উদীচ্যাং Persia এবং Caspian seaর মধ্যে বাস করিতেন। পারস্য দেশ হইতে কাম্বোজ এবং হিমালয়তলস্থিত দেশে আসিবার সময় হূনদেশ পড়ে। তাহা ভারতবর্ষের বাহিরেই হইবে। কাজেই শাস্ত্রীমহাশয়ের সমস্ত যুক্তিই অমূলক। হূনগণ খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে

য়ুরোপ আক্রমণ আরম্ভ করেন। সে সময়ে তাঁহারা খুব ক্ষমতাশালী। তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে যদি ভারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি?

তিব্বত—কালিদাস লিখিয়াছেন

তত্রোৎসবসঙ্কেতান্ স জিত্বা বিরতোৎসবান্।
জয়োদাহরণং বাহ্বোর্গাপয়ামাস কিন্নরান্॥

শাস্ত্রীমহাশয় বলেন এই "উৎসবসঙ্কেতান্" কথাটি তিব্বতীয় উচাং বোটাং এবং কোটাং এই তিনটি কথা মিশাইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রীমহাশয় কৌতুক করিতেছেন না ত? সঙ্কেত কথার অর্থ চিহ্ন; উৎসবই যাহাদের চিহ্ন বা লক্ষণ তাহারাই উৎসবসঙ্কেত;—বহুব্রীহি সমাস। ইহাতে উচাং বোটাং কোটাং নাই। কিন্নর বা কিম্পুরুষগণ উৎসবপ্রিয় ছিলেন। গান আমোদ লইয়াই থাকিতেন; যথা কুমারসম্ভব ৩য় সর্গ।

গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ কিঞ্চিৎ সমুচ্ছ্বাসিতপত্রলেখং।
পুষ্পাসবাঘূর্ণিতনেত্রশোভি প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুম্বে॥

কালিদাস লিখিয়াছেন:—

"তত্রাক্ষোভ্যং যশোরাশিং নিবেশ্যাবরুরোহ সঃ।

অক্ষোভ্য অর্থে ক্ষোভের অযোগ্য এ সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় বলেন "অক্ষোভ্য" এক তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী; রঘু তাঁহাকে বসাইয়া নামিয়া আসিলেন। রঘু বৌদ্ধ নহেন কালিদাসও বৌদ্ধ নহেন; এখন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে পাহাড়ের উপর বসাইলেন কে? কেনই বা বসাইলেন?

এইরূপ যুক্তিসকলের খণ্ডন নিষ্প্রয়োজন।

ভিনসেন্ট স্মিথের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে চোল ও পাণ্ড্য এই দুই রাজবংশ অশোকের পূর্ব্ব হইতে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। কখনও চোল কখনও পাণ্ড্য ম্লান হইয়াছে। এরূপ স্থলে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে তাঁহারা পরাজিত হন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা দেখিতে পাই খৃঃ ২য় শতাব্দীতে চোলগণ ক্ষমতাশালী হইয়াছেন। রঘুবংশে তাঁহাদের নাম নাই এ কথা প্রথম মতকেই সমর্থন করিতেছে।

স্কন্দ ও লবলী:—মেঘদূতে স্কন্দের বর্ণনা আছে। স্কন্দ অর্থাৎ কার্ত্তিক। শাস্ত্রীমহাশয় বলেন এই স্কন্দ কার্ত্তিক নন, ইনি স্কন্দ গুপ্ত। ইহাতে ত কার্ত্তিকের অদ্ভুত জন্মের আভাস আছে। স্কন্দ গুপ্তের জন্ম অবশ্যই সেরূপ হয় নাই। স্কন্দের মন্দির আমরা বুঝিতে পারি। কোনও ঐতিহাসিক রাজার মূর্ত্তি লইয়া মন্দির Egypt বা মিশর দেশে হইতে পারে। এইরূপ শাস্ত্রীমহাশয় বলেন লবলীলতা আর এমন কি সুন্দর! সৌন্দর্য্য অনেক সময় Association of ideas ভাবের সাহচর্য্যে হয়। ইংরাজ ভাবী দম্পতির হৃদয়ে ছেঁড়া জুতা যে ভাব বহন করে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

বিদ্যাধরীর অনঙ্গলেখ—

ভূর্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ।
ব্রজন্তি বিদ্যাধরসুন্দরীণাম্
অনঙ্গলেখক্রিয়য়োপযোগং॥

অনেক সময় জোগাড়ের অভাবে পত্র লেখা হয় না। কালিদাস বলিতেছেন হিমালয়ে বিদ্যাধরীগণের সে কষ্ট নাই। সেই খানেই ধাতুরস, সেই খানেই ভূর্জত্বক্, আর গাছের পাতার খড়িকাও আছেই। প্রেমপত্র লিখিলেই হইল। ইহা হইতে অশোকলিপি মগধলিপি বা বঙ্গলিপি কিছুরই আভাস পাওয়া যায় না এবং সর্ব্বত্র এই সমস্ত বিচারে সিদ্ধান্ত এক বৈ দুই হয় না—

কালিদাস খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন।

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের প্রতি।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

হে কবি, হে তপস্বী নির্ভীক তোমায় নমি;
শুনাইলে যে উদাত্ত সঙ্গীত মহান্
রণিবে তা' জীবনে প্রতিদিন শয়নে
স্বপনে; অন্তরে দিল তা' বল—মরমে
গভীর আনন্দ; স্বাধীন প্রমুক্ত আত্মা
তব গেয়ে গেছে গান অবিশ্রাম মুক্ত-
কণ্ঠ বিহঙ্গম সম; দৈন্য নাই দ্বিধা
নাই,—নাই ভয়-লেশ; সত্যের বারতা
তুমি শুনায়েছ অসঙ্কোচে,—গাহিয়াছ
সত্যের মহিমা গান; সত্যে যেন ফিরি

প্রতিপদে এই কর আশীর্ব্বাদ ; তিল
ঠাঁই যেন নাহি পায় মিথ্যা ; চিত্তে যেন
প্রতিক্ষণে মাগি সারা বিশ্বের কল্যাণ ;
নমি পায়,—হে সুন্দর তপস্বী মহান্॥

আসামের নদ-নদী।

(আসাম পরিব্রাজক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের ২৭৫ পৃষ্ঠার পর)

বরাকর।

বরাকর যাহা "বরচক্রে মহানদঃ পূর্ব্বদেশেষু সংস্থিতঃ" বলিয়া পরিচিত। নগাপাহাড় জেলার পূর্ব্বপ্রান্তস্থ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া মণিপুর, কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া অবশেষে ত্রিপুরা ও মৈমনসিংহের সন্ধিস্থ ভৈরববাজারের (১৩) নিকট ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হইয়া "মেঘনা" নাম ধারণ করত বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই বরাকর শ্রীহট্ট জেলায় "শ্রীহা" নামক স্থানে আসিয়া দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখার নাম "সুরমা"" অন্য শাখার নাম "কুশিয়ারা"। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল হইতে পদ্মার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত "মেঘনা" প্রায় ৯০ মাইল দীর্ঘ। কাছাড় জেলার মধ্যে বরাকরের কয়েকটী প্রধান শাখা আছে। উত্তরাংশে যথা—জাতিঙ্গা, সিরি বা সিরাই, ছিরি, মাদুরা ও বদরী। দক্ষিণাংশে ধলেশ্বরী, সোনাই ও আগ্রা। শ্রীহট্ট ও কাছাড় দেশজাত দ্রব্যাদি ব্যবসায়বাণিজ্যার্থ এই নদী দিয়া মেঘনার তীরবর্ত্তী ভৈরব বাজারে আনীত হয়। কাছাড় জেলার পূর্ব্বাংশে "ঝিরি" নদীর সহিত যেখানে "বরাকর" সঙ্গ লাভ করিয়াছে তথায় লক্ষীপুর (লখীপুর) নামে একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম আছে। ধলেশ্বরী, সোনাই, মনু, জিরাই, জাতিঙ্গা প্রভৃতি কতকগুলি নদী বরাকর নদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীতটে শ্রীহট্টের "বদরপুর" নামক স্থানে আসাম-বেঙ্গল রেলের একটী প্রসিদ্ধ জংসন ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে এই নদীর উপর প্রায় ৯০০ শত হস্ত দীর্ঘ একটী সেতু আছে। ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় বরাকরের মধ্যেও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

(১৩) ভৈরববাজার=মৈমনসিংহ জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব-প্রান্তস্থ স্থান।

বরাকরে পতিত উল্লেখযোগ্য নদীসকল।

ধলেশ্বরী=লুসাই পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া পেলিচর নামক স্থানের সমীপবর্ত্তী হইয়া কাছাড় জেলায় প্রবেশ করতঃ এখানে বরাকর নদীতে পতিত হইয়াছে। লুসাইয়েরা ধলেশ্বরীকে "ক্ল্যাংভং" বলে। এই নদীর দ্বারা বহুসংখ্যক চা বাগানের উন্নতি হইয়াছে। "ধলেশ্বরী বা ভেড়ামোহনা"র তীরে কাকাইলছেও, বিথঙ্গল, আদনা প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য।

সোনাই=লুসাই পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া বরাকর নদীতে পতিত হইয়াছে।

খোয়াই=ত্রিপুরার পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া হবিগঞ্জের নিকট বরাকর নদীতে পতিত হইয়াছে। ইহার তীরে মুচিকান্দি, লস্করপুর নামক দুইটী উল্লেখযোগ্য স্থান অবস্থিত। "তীর্থ চিন্তামণি" গ্রন্থে শ্রীহট্টের ক্ষমা (খোয়াই) নদীর নাম পাওয়া গিয়াছে।

মনু=ত্রিপুরার পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া মৌলবী বাজারের অদূরে "কুশিয়ারা" নামক বরাকরের একটী শাখা নদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে কদমহাটা, কমলগঞ্জ, মৌলবীবাজার (দক্ষিণ শ্রীহট্ট) অবস্থিত। "ধলাই" নামে মনুর একটী উল্লেখযোগ্য শাখানদী আছে। ভগবান মনু এক সময়ে এই নদীর তীরে শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া তন্ত্রে উল্লেখ আছে:—

"পুরা কৃতে যুগে রাজন্ মনুনা পূজিত শিবঃ।
তত্রৈব বিরলে স্থানে মনুনাম নদী তটে॥"
—প্রাচীন রাজমালাধৃত যোগিনী তন্ত্র বচনম্।

জাতিঙ্গা=বরাকরের একটী শাখানদী। ইহার দ্বারা কতকগুলি চা-বাগানের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে। ইহার তীরে বায়খোলাবাজার, বালচর, দামচর নামক কয়েকটি আয়কর রেলওয়ে ষ্টেশন অবস্থিত। নদীটী দৈর্ঘে ৩৬ মাইল।

জিরাই=বারাইল পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া বরাকর নদীতে পতিত হইয়াছে।

সুরমা।

ইহা বরাকরের একটি শাখানদী। শ্রীহট্ট জেলার "ভাঙ্গা" নামক স্থানে বরাকর নদী হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে শ্রীহট্ট ও ছাতক দিয়া প্রবাহিত হইয়া সুনামগঞ্জের নিকটে "কালনী ও পৈন্দা" নামক দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই শাখাদ্বয় আজমীরগঞ্জের অদূরে পরস্পর মিলিত হইয়াছে। "কালনী" শাখা "সাকুলী" নামক স্থানের নিকট "ভেড়ামোহনা" নামে পরিচিত। সুরমাতীরে শ্রীহট্ট জেলার সদরস্থান (শ্রীহট্ট) ও সুপ্রসিদ্ধ গোলাপগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ দোয়ারাবাজার, ছাতক, পাথরিয়া, দিরাই প্রভৃতি স্থানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুরমানদী দিয়া একটি ষ্টীমার পথ আছে। নারায়ণগঞ্জ হইতে এই পথ আরম্ভ হইয়াছে। এই পথে ষ্টীমার বর্ষাকালে শ্রীহট্ট ও শিলচর এবং অন্য সময়ে বদরপুর পর্য্যন্ত যায়। এই পথের মার্কুলি ষ্টেশন হইতে আর একখানি ষ্টীমার সুনামগঞ্জ হইয়া ছাতক পর্য্যন্ত যায়।

লঙ্গাই।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরদিকে করিমগঞ্জের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তৎপরে ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া "হাকালুকি" হাওরে মিলিত হইয়াছে। এই নদীতীরে লঙ্গাই, পাথরকান্দি, নীলামবাজার, লাতু, চাঁদখিরা, হাতিখিরা, জলঢুপ প্রভৃতি স্থানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাঙ্গাখালি।

ইহা কছিমার নিকটস্থ পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া "বাগাতি হারিয়া ও জাদনাক্ষর" নদীর জল লইয়া "কল্যাণী" নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

সিঙ্গলা।

লুসাই পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরদিকে করিমগঞ্জ মহকুমার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া শ্রীহট্ট জেলাস্থ "সোন" নামক হ্রদে পতিত হইয়াছে। উহার উৎপত্তি স্থান হইতে পতিত স্থানের দূরত্ব প্রায় ৪৫ মাইল। এই নদীর দ্বারা চা ও স্থানীয় অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে।

সোমেশ্বরী।

সুসঙ্গের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বর পাঠকের * নামানুসারে রংরং গিরি (গারোপাহাড় জেলার অন্তর্গত) হইতে নির্গত নদীটি কিছুকাল হইতে সোমেশ্বরী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নদীটি মেঘনায় পতিত হইয়াছে। পার্ব্বত্য গারো-পাহাড় জেলার অন্য কোন নদী ইহার সঙ্গলাভ করে নাই। নৌকা ব্যতীত কোন ঋতুতে এই নদীতে ষ্টীমার চলে না। সকল সময়ে ইহার জল পানীয়রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই নদীতে প্রচুর মহাসোল (রুইমাছের মত) লাচো (বাটামাছের মত) প্রভৃতি মৎস্য পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে সোমেশ্বরীর জল এত কমিয়া যায় যে স্থানে স্থানে হাটিয়া পারাপার হওয়া যায়। বাঘমারী ও সিজু ইহার তীরস্থ উল্লেখযোগ্য স্থান। বাঘমারীতে ফরেষ্ট অফিস, পোষ্ট-অফিস ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের হেড কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখান হইতে নৌকাযোগে সোমেশ্বরী নদী দিয়া পার্ব্বত্য গারোদেশজাত শাল, চাম, জারুল, পথা প্রভৃতি কাষ্ঠ দেশান্তরে ব্যবসায়-বাণিজ্যার্থ চালান দেওয়া হইয়া থাকে। সিজু হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে দারাং পর্ব্বতে কিছুদিন হইল কয়লার খনি বাহির হইয়াছে। রংরং গিরি হইতে বাঘমারী পর্য্যন্ত সোমেশ্বরী নদীর অংশটুকু গভর্ণমেণ্ট নিজ খাসে রাখিয়াছেন।

---

* সোমেশ্বর পাঠক—ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া শ্রীহট্ট ও মৈমনসিংহ জেলার মধ্যস্থ গারো দেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লন; তৎপরে ইনি ক্রমশঃ স্বীয় পরাক্রমে রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করিতে থাকেন।

ধলেশ্বরী ও ভেড়া মোহনা—ইহার একই নদীর বিভিন্ন স্থানের নাম; ইহারা মূল কিম্বা শাখা নদী নহে—কতিপয় নদীর সম্মলনে সমুৎপন্ন। সুতাঙ্গ নদী লখাই নামক স্থানের নিকট এই ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

সুরমা (শরমা)—কালনী শরমার একটী শাখানদী। ইহা মশাখুলির নিকট ভেড়ামোহনার সহিত মিলিত হইয়াছে। শরমার তীরে কশবা শ্রীহট্ট অবস্থিত। এখানে শ্রীহট্ট বিজেতা পীর সাহাজালালের সেনাপতি সৈয়দ নাছির উদ্দিনের খানে বাড়ী ছিল বলিয়া উহা নিষ্কর আছে। *

* অশুদ্ধি শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৩	১	বরচক্রে	বরবক্রে
ঐ	১০	শ্রীহা	ভাঙ্গা
৫৪	২	সোন্ হ্রদে	সোণ বিল বা হ্রদে

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

ভৈরবী—একতালা।*

আর দুখেরে ভয় করবো না—
দুঃখ-রূপে তুমিই আস,
আমি মরণ এলেও মরব না!
আসচো তুমি প্রাণে আমার
সুখে আমার—দুখে আমার;
যে দিন আকাশ ঘন আঁধার
সে দিনও যে ডরব না!

আসে আসুক্ নিবিড় কালো,—
জানি তোমার স্নেহ-করুণ
দৃষ্টি আছে সমান ভালো!
মৃত্যু হানা দিক্ না দ্বারে
জানবো তোমায় বারে বারে,
আমার নূতন করে ফুটা'তে চাও
আমি মরব না যে মরব না॥

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা। গান ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ, বি-এল।

আস্থায়ী।

১´ ২ ০ ৩
[র্সা জ্ঞা সা]
সা II { জ্ঞা জ্ঞা -া। জ্ঞা জ্ঞা ঋসা। সঋজ্ঞমজ্ঞা -া ঋা। সা -া সা } I
আর্ দু খে ০ রে ভ য়্ ০ কর্ ০ ০ ০ ০ ব না ০ "আর্"

১´ ২ ০ ৩ ১´
I সা -া সা। সঋা ঋণ্া -া। সা রজ্ঞা -া। রা মজ্ঞা -া I দ্া দ্া -া।
দু ঃ খ রূ পে ০ ০ তু মিই ০ আ স ০ ০ আমি মরণ্ ০

২ ০ ৩
। ণ্া সা -া। সঋজ্ঞমজ্ঞা -া ঋা। সা -া সা II
এ লেও ০ মর্ ০ ০ ০ ০ ব না ০ "আর"

অন্তরা।

১´ ২ ০ ৩ ১´
[দা দা মা]
II { -পা মপা দা। দা দা -ণা। ণা ণা -র্সা। র্সা র্সা -া I র্সজ্ঞা জ্ঞা -া।
০ আস্ চো তু মি ০ প্রা ণে ০ আ মা র্ সু খে ০

২ ০ ৩ ১´
। জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋর্সা -া। র্সা র্সর্ঋর্জ্ঞর্মর্জ্ঞা -র্ঋজ্ঞা। র্ঋা র্সা -া } I র্সা র্সা -া।
আ মা ০ ০ র্ দু খে ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মার্ ০ যে দি ন

* বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত।

২ ০ ৩ ১´ ২
| ঋা ণর্সা -া | ণা ণদণর্সণা -দণা | দা পা -া I পা পা -া | পা পজ্ঞা -া |
আ কা শ ধ ন০০০ ০০ আঁ ধায় ০ সে দিন্ ০ ও যে০ ০

০ ৩ ১´ ২
| জ্ঞপা -মা মপা | দণা -া -পা I মা মজ্ঞা -া | ঋা জ্ঞা -ঋসা |
ভ র্ ব না০ ০ ০ সে দিন্ ০ ও যে ০০

০ ৩
| সঋজ্ঞমজ্ঞা -া ঋা | সা -া সা II
ভর্০০০ ০ ব না ০ "আর"

সঞ্চারী ও আভোগ।

১´ ২ ০ ৩ ১´
[ঋা সা -ণ্ঋা । দা দাঃ ণঃ]
II { সা সা -া | ঋা সাঃ -ণ্ঃ | সা রজ্ঞা -া | রা মজ্ঞা -ঋসা I সা সা -ঋা |
আ সে ০ আ ষ্ক্ ক্ নি বি০ ড় কা লো০ ০০ আ নি ০

২ ০ ৩ ১´ ২
| ঋা ঋা -া | ঋঋা ঋা -া | ঋা ঋা -জ্ঞা I সা -া ঋা | ঋা ঋা -জ্ঞা |
তো মা র্ মে০ হ ০ ক রু ণ্ দৃ ০ ষ্টি আ ছে ০

০ ৩ ১´ ২ ০
| সা ঋসা -া | ণ্া সা -া } I -পা; মপা দা | দা দা -ণা | ণা -র্সা র্সা |
স মা০ ন্ তা লো ০ ০ মৃ০ ত্যু হা না ০ দি ক্ না

৩ ১´ ২ ০
| ণা র্সা -া I র্সর্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | র্ঋা র্জ্ঞা র্ঋর্সা | র্সা র্সর্ঋর্জ্ঞর্মর্জ্ঞা -র্ঋর্জ্ঞা |
ধা রে ০ আন্ ০ বো তো মা র০ স্ব রে০০০ ০০

৩ ১´ ২ ০ ৩
| র্ঋা র্সা -া I দদা র্সা র্সর্সা | র্ঋা র্সা -া | ণা ণদণর্সণা -দণা | দা পা -া I
বা রে ০ আমায়্ নূ তন্ ক রে ০ ফু টা০০০ ০০ তে চা ও

১´ ২ ০ ৩ ১
| পপা পা পা | পা পজ্ঞা -া | জ্ঞপা মা মপা | দণা -া -পা I মা -া মজ্ঞা |
আমি মর্ ব না দে০ ০ ত র্ ব না০ ০ ০ মর্ ০ ব

২ ০ ৩
| রা জ্ঞা -ঋসা | সঋজ্ঞমজ্ঞা -া ঋা | সা -া সা II II
না রে ০০ মর্০০০ ০ ব না ০ "আর"

——০——

মহাজনের উক্তি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সংগৃহীত)

কর্ম্মের সফলতা—ভবিষ্যতের উপর আস্থা রাখিবে, :কিন্তু তদপেক্ষা সত্যকার কর্ম্ম এবং প্রাণপণ পরিশ্রমের উপর অধিক আস্থা রাখিতে হইবে। ইউরোপে এমন একটী জাতি নাই, পৃথিবীতে এমন জাতি নাই, যে জাতি কঠোর, তীব্র ও অবিশ্রাম সংগ্রাম ও পরিশ্রম না করিয়াই নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমরাও যদি, আমাদের প্রত্যেকে যদি দেশের জন্য সত্য সত্য কাজ করিতে শিখি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই সফলকাম হইব। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

দুঃখশান্তির উপায় :—মিথ্যা স্বদেশহিতৈষিতার ভাব লইয়া এমন একটীও কথা যেন না বলি, যাহা দ্বারা, যে সকল মন্দ চক্ষে দেখিতেছি তাহারই আবার বৃদ্ধির উপায় হইতে পারে ; কিন্তু কাহারও অসন্তোষের ভয়ে যেন স্বদেশবাসীর দুঃখকষ্ট চাপিয়া রাখিবার অথবা কম করিয়া বলিবার চেষ্টা না করি। এই ভাবে চলিলে সমস্ত নিরাশার মধ্যেও সত্যের সপক্ষে আছি, ঋতের সপক্ষে সংগ্রাম করিতেছি, এই জ্ঞান আমাদিগকে নতশির হইতে দিবে না। আমাদের বিচারে এবং কাজেই সেই বিচারের সিদ্ধান্তে যদি ভুল থাকিয়া যায়, তবে আমাদের উদ্যম নিষ্ফল হইবে এবং হওয়াই উচিত। কিন্তু যদি আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, তাহা হইতে দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য দেশের অবস্থার উপযোগী যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক এবং দেশের লোকেরা যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে চায়, কোন শিক্ষিত ও অবিকৃতমস্তিষ্ক গভর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া দীর্ঘকাল নীরব থাকিতে পারে না। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

দেশের ধন :—দেশের ধনের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। দেশের বিভিন্ন শ্রমজীবীশক্তির সমবায়-নিয়োগের উপর উহা নির্ভর করে। দেশের যে সকল শ্রমশিল্প প্রস্তুত হয় তাহার উপর যে যন্ত্র প্রযুক্ত হয় তাহার উপর দেশের ধন নির্ভর করে ; মূলধন ফেলিবার সাহস ও বিদ্যার উপর দেশের ধন নির্ভর করে ; এবং সর্ব্বোপরি দেশের ধন দেশের মধ্যে নিয়োগ করিবার উপর দেশের ঋদ্ধি নির্ভর করে। ব্যালফর।

গ্রন্থ-পরিচয়।

বৃদ্ধের বচন বা জীবন্মুক্তের উপদেশ। শ্রীপূর্ণানন্দ যোগাশ্রমী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ৬।১০০ কালীঘাট, গুদর মঠ, বেনারেস সিটি। প্রাপ্তি-স্থান শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত সেনগুপ্ত, উকিল, হুগলি। মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থপ্রণেতা এখানে বৃদ্ধ নাম গ্রহণ করিয়াছেন বোধ হইল ; তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি যখন "জীবন্মুক্ত" নাম গ্রহণ করেন, তখনই আমাদের আপত্তি। আপত্তির একটী প্রধান কারণ এই যে, জীবন্মুক্তের উপদেশগুলি সর্ব্বাংশে নির্ভুল দেখিলাম না। তাঁহার যুক্তিগুলিও—জীবন্মুক্তের আবার যুক্তিপ্রদর্শন কি ?—সকল স্থলে বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইল না। তিনি প্রথমেই যে বচন দিয়াছেন, আমরা সে বিষয়ে কোন প্রসিদ্ধ বৈদ্যের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলাম ; তিনি উক্ত বচনকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিলেন। বৃদ্ধ লবণ, লঙ্কা ও মিষ্ট খাইতে নিষেধ করেন। এই তিনটাই বন্ধ করিলে সত্য কথা বলিতে কি, আহারাদি বন্ধ করিয়া বসিতে হয়। উক্ত বৈদ্যের সহিত এবিষয়েও আলোচনা হইল। তিনি বলেন যে অতিমাত্রায় সকলই নিষিদ্ধ। মিষ্ট যদি নিষিদ্ধ হয়, তবে কবিরাজী ঘৃত প্রভৃতিতে চিনি সংযুক্ত হয় কেন, অথবা চিনি অনুপানার্থে ব্যবহৃত হয় কেন ? লবণের পক্ষেও দেখা যায় যে লবণ না খাইলে শরীর নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বৈদ্যমহাশয় এক্ষেত্রেও অতিমাত্রায় ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিলেন। তিনি তৈলকে বিদাহী বলিয়াছেন। সকল তৈল কি বিদাহী ? তিল-তৈল তো শিরঃশূলের এক প্রধান ঔষধ। তিনি নারীদের বিরুদ্ধে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থে স্থান না পাইলেই ভাল হইত। সাধারণভাবে নারীগণের প্রতি এপ্রকার কটূক্তি অমার্জনীয়। আহারের পর নাভির চতুর্দ্দিকে হাত বুলাইলে যে তড়িৎশক্তি সহসা কতটা বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে, তাহা আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। এইরূপ আরও দুই চারিটী স্থান ঠিক জীবন্মুক্তের উপদেশের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। এইগুলি ছাড়িয়া দিলে আমরা বলিতে পারি, গ্রন্থে অনেক ভাল কথা আছে ; সহজ স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ক অনেক সত্য কথা আছে। বৃদ্ধের ভুলগুলি বেশী ফুটাইয়া দিবার কারণ এই যে, ব্রহ্মচারী, যোগী, স্বামী, পরমহংস প্রভৃতি নামের আবরণে কেহ একটী কথা বলিলেই তাহা নির্ব্বিচারে শিরোধার্য্য করা আজকালকার একটা প্রথায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এটী আমরা চাহি না। আমাদের মত এই যে, "যুক্তিহীন-বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।" দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার ভুলগুলি সংশোধিত করিয়া এবং অতিমাত্র গ্রাম্যভাষাগুলি :পরিবর্ত্তিত করিয়া ছাত্রদের উপযুক্ত আকারে

গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলে ছাত্রদের বিশেষ উপকারে আসিবে সন্দেহ নাই। আশা করি আমাদের মন্তব্য যথাযথ বলাতে গ্রন্থপ্রণেতা আমাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হইবেন না।

সমাজ সংস্কার সমস্যা। শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রণীত। ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক আনা।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই কলিকাতা নগরীতে যে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সোশ্যাল কনফারেন্স" বসিয়াছিল, প্রবন্ধটী সেই কনফারেন্সের সভাপতি মহাশয়ের ইংরাজি অভিভাষণের বাঙ্গালা অনুবাদ। এই মূল্যবান প্রবন্ধটী যাহাতে দেশের সর্ব্বসাধারণে পড়িবার সুযোগ পায় তাহার জন্য ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সমগ্র দেশের বিরাট জনসঙ্ঘের তুলনায় জনকয়েক মুষ্টিমেয় আভিজাত্যগর্ব্বী উচ্চশ্রেণীর মিথ্যা সম্মান ও সুবিধা নষ্ট হইবার ভয়ে দেশকে চির অন্ধকারের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা যে কত বড় নিবুদ্ধিতার কাজ, তাহা শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধকার মহাশয় স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন; তিনি ইহা দেখাইয়াছেন যে, আমরা যে আভিজাত্যগর্ব্বে অন্ধ হইয়া আমারই মত যে ব্যক্তি তুল্য মনুষ্যত্বের অধিকারী তাহাকেও কত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি, আমাদের সেই আভিজাত্যের মূল কত শিথিল! এই আভিজাত্যগর্ব্ব আমাদের দেশের মস্তকে যেন ভগবানের অভিসম্পাতের মত আসিয়া পড়িয়াছে। যদিও ইহার হস্ত হইতে কোন দেশই একেবারে পরিত্রাণ লাভ করে নাই—সকল দেশই ইহার দ্বারা অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং হইতেছে—কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের দেশে ইহা যেমন সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এমন আর কোথাও নহে। প্রধানতঃ এই একটী কারণেই আমাদের দেশে সমাজ-সংস্কারের সমস্ত পথই একেবারে রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইহার সমস্ত সমস্যাই অমীমাংসিত থাকিয়া যাইতেছে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে প্রবন্ধকার অতি সাবধানে সমাজসংস্কারের কয়েকটী গুরুতর সমস্যার সুমীমাংসা করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকখানি সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি।

পারিজাত। শ্রীভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা ২৫।এ, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, "নিউ সরস্বতী প্রেসে" শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ৷৷৵০ আনা। ইহা একখানি কবিতা পুস্তক।

পারিজাত একখানি কবিতা পুস্তক। ইহাতে ছোট-বড় অনেকগুলি কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলির অধিকাংশই বেশ সরল, সুললিত ভাষায় লিখিত ও উপদেশ পূর্ণ।

ব্রাহ্মণ্যপ্রজানীতি। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা। মহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশক সমিতি লিমিটেড প্রেসে শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা।

কিছু দিন পূর্ব্বে রাজাবাহাদুর তাঁহার পরিচালিত ত্রিশূল পত্রিকায় "রাজনীতি, প্রজানীতি এবং ধর্ম্মনীতি" নামে যে একটী সুচিন্তিত, তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাই এখন "ব্রাহ্মণ্যপ্রজানীতি" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "বলসেভিজম্" বলিতে কি বুঝায়, কোথায় কিরূপে ইহার আদি-উৎপত্তি ঘটিয়াছিল প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্যপ্রজানীতির অন্তস্তত্ত্ব কি এবং তাহার সহিত এই "বলসেভিজিমের" কোন্ কোন্ বিষয়ে কতটুকু সৌসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে ইত্যাদি নানা জটিল প্রশ্নের গভীর আলোচনা রাজাবাহাদুর এই প্রবন্ধে করিয়াছেন। যাঁহারা নবোত্থিত এই "বলসেভিজম্" সমস্যার ভিতরের কথা বুঝিতে চাহেন তাঁহারা এই প্রবন্ধটী পড়িলে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

"মা আমার কাল কেন?" শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২৬ নং কাঁসারী পাড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা বার্ত্তাবহ প্রেসে শ্রীবামাচরণ রায় দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ✓০ এক আনা।

লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "মা আমার কাল কেন?" পুস্তিকায় 'আসল কথার কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই" বলিয়া তাঁহার এই উদ্যম। এই পুস্তিকা খানিতেও আমরা আসল কথার উত্তর পাই নাই। সে উত্তর কখনও পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

সৎপ্রসঙ্গ। শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক প্রণীত; মূল্য আট আনা। ভবানীপুর কলিকাতায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। শিতিকণ্ঠ বাবু ব্রাহ্মসমাজের একজন সর্ব্বপরিচিত পুরাতন লোক। ব্রাহ্মসমাজের সেবায় জীবন কাটাইয়া দিলেন। প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সেও তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়। তিনি "সৎপ্রসঙ্গে" তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য ও সুন্দর হইয়াছে। ধর্ম্ম ও সমাজ লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকবর্গমাত্রেই যে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা এই পুস্তকের প্রচার কামনা করি।

Religious life of Brahmarsi Sasipada :— শ্রীযুক্ত ব্রহ্মর্ষি সেবাব্রত শশীপদ বাবুর ধর্ম্ম-জীবনী সম্প্রতি ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছে। দেবালয়ের শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী উহার লেখক। শশীপদ বাবুর ধর্ম্মজীবন কেমন করিয়া ঘটনাপরম্পরায় স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত। শশীপদ বাবু নিষ্কামভাবে অনেক সৎকার্য্য সাধন করিয়াছেন। সেবা-ব্রতে তাঁহার জীবন কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার মত ত্যাগী পুরুষ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অতি বিরল। তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইলেও, এখনও তাঁহার অনির্ব্বাণ উৎসাহ। তাঁহাতে যে উদারতা আছে তাহা অন্যত্র দুর্লভ। তিনি পরের জন্য—তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের জন্য সবই ছাড়িয়াছেন, অন্য সমস্ত কার্য্যই পরিহার করিয়াছেন, যথেষ্ট ধর্ম্মবল ও আধ্যাত্মিক বলের পরিচয় দিয়াছেন, এ সবই সত্য; কিন্তু কোন ব্যক্তির জীবনীকালে এবং তাঁহার নিজের উক্ত ঘটনামাত্র অবলম্বনে জীবনী লেখার আমরা পক্ষপাতী নহি।

তাঁর বাণী।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

নীরব সন্ধ্যায় শোন
নামে তাঁর বাণী।
অনুপম শান্তি দেয়
চিত্ত মাঝে আনি'॥
সন্ধ্যার শিশির সম
ধীরে—অতি ধীরে।
অনাহত বাণী তাঁর
সিক্ত করে শিরে॥
প্রতিধ্বনি জাগে শোন
মধুর তাহার।
মহাশূন্য হতে ফিরি'
অন্তরে সবার॥
আনন্দ-বেপথু উঠে
জগতের মাঝে।
প্রাণের বাতাসে নব
হৃদিপদ্ম নাচে॥
মলয় বাতাস যেন
সঙ্গীতের সুরে।
ভেসে আসে তাঁরি বাণী
হৃদয়ের পুরে॥
প্রভাতে অরুণ-কর
তপনের সাথে।
জ্যোতির্ম্ময় রূপে তাহা
নয়নেতে ভাতে॥
আলো ছায়া যেথা যাহা,
সকলের মাঝে।
এক শুধু তাঁর বাণী
সদা জেগে আছে॥
হে দেব হে পিতা রাখ
হৃদয়ে সবার।
প্রেমের ঐ বাণী সদা
জাগায়ে তোমার॥
দূর কর সংসারের
দুঃখজ্বালা শত।
প্রণমি তোমারে মোরা
মাথা করি' নত॥

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

কুমারী এলা চ্যাটার্য্যির ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা।—গত ১লা বৈশাখে রাঁচিতে নববর্ষ উপলক্ষে কুমারী এলা দেবীর ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উপাসনা অনুষ্ঠানাদি গিরিমন্দিরে হইয়াছিল। প্রায় ২০।২৫ জন পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্তসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। আমাদের রাঁচিস্থ ব্রাহ্মবন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্ত মহাশয়ও দীক্ষার্থীকে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন। দীক্ষার্থী এলা দেবী পরলোকগত কর্ণেল নিত্যানন্দ চ্যাটার্য্যির কন্যা। সর্ব্বদা বিদেশে থাকাতে তিনি মাতৃভাষা ভালরূপ শিক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই দীক্ষার উপদেশ প্রভৃতি ইংরাজীতেই দেওয়া হইয়াছিল। "সুশীতল সমীরণে প্রাতঃকাল বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। শেষে কুসুমতলায় জলযোগ হয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ"। ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথের উপদেশ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

Beloved Ella,

You have expressed an ardent desire to get yourself initiated into the Brahma Dharma. It is with great pleasure that we admit you into the sacred fold of our religion on this auspicious occasion. I may

tell you it is not a new religion you are about to embrace; you are rather coming back to the old—to your very own. Through stress of circumstances, beyond your control, you strayed away from us and adopted a new country and a new religion; but now that you have come back to us to claim your heritage, we welcome you, with all our heart, like the long-lost prodigal child of old, returning home from foreign lands.

উপদেশ।

These few words of wisdom and good counsel that I am now going to address to you, lay them well to heart. They will be good for your soul's progress and lead to your salvation.

Brahma Dharma is the religion of the spirit. It teaches the close affinity between the finite and the Supreme Spirit. Dive into the depths of your soul, and you will find that God is its aid and support.

The soul is not helpless, nor is it left floating in the void, but it lives and has its being in God, its Creator.

Think not that thou art alone. Thy God is thy life-long companion, friend, and father, and thy everlasting support. All the good, all the happiness that thou enjoyest spring from Him. Let this be the end and aim of your life,—to find God, to feel Him near and ever nearer, every day of your existence. The body will be left behind as an inert mass, but the soul will take its flight to God, and find its home in Him for evermore.

This is the doctrine of the spirit (atmagnyan). Now I will propound to you the principles of the Brahma Dharma.

1. In the beginning there was one God, the Supreme Spirit, naught else did exist. He created all that there is.

2. The Supreme Brahma is He, the primal cause, unborn, infinite in wisdom and goodness; formless and unchanging, all-pervading, omniscient, all-sustaining, self-dependent and perfect; One only, without a second (ékamèvàdwitiyam).

3. In His worship lies our salvation in this world and the next.

4. Loving Him and doing the works He loveth, constitutes His worship.

Put your faith in these fundamental principles of the Brahma-Dharma, and live up to them.

1. The Creator and Preserver of the universe, the Giver of all good here and hereafter, the one only Supreme Brahma—Him do thou worship with love and reverence, doing the works of charity and righteousness that He loveth.

This is your first pratijnyà.

The second is this:—

2. You shall not worship any idol or created object as the Supreme Brahma.

This vow is the life and soul of the Brahma-Dharma. We call ourselves "Bràhmas" because we are the worshippers of the Supreme Brahma.

We must not bow down in adoration before any idol or any created object.

3. Unless incapacitated by illness or other causes, you shall daily worship in and commune with the Lord your God with all love and reverence.

If you do not take any food for the sustenance of your body, you cannot maintain yourself in health. The worship of God is the sustenance of the soul. So to keep it in health, you must keep yourself in touch with Brahma through daily worship and prayer. In order to hold communion with Him, it is not necessary that you should cling to any ritual or particular form of worship. Om or Gayatri, or Satyam Jnanamanantam Brahma or any suitable prayer that you consider helpful towards

the advancement of your soul to God, you are at liberty to adopt.

Do not neglect to cherish your soul by this daily worship. There are various avenues open to you, for approaching God. When we are full of love for Him, we look upon Him as our friend. In trouble and distress, He is our comforter. When we fall into sin, He is our deliverer. When we go to Him seeking salvation—He is our Saviour. This being so, what materials are wanting for His worship ? It is not necessary for us to cull flowers or to go to any particular spot, in order to attain our object. In trouble and distress, in prosperity and adversity, in health and sickness, in solitude or crowded places, in all circumstances we are privileged to call upon Him. So what is said in this 3rd *pratijna* is easy for you to achieve.

The 4th *pratijna* is :—you shall earnestly practise every good work.

And the 5th :—you shall use your best endeavour to keep away from sin and impurity.

God dwelleth in the souls of men and women, and silently conveys these commandments to their conscience :—

Speak the truth—do the right. Righteousness is highest of all, and is honey sweet for all.

Thou shalt not earn money by unjust means.

Thou shall not covet thy neighbour's riches, nor be jealous of his good fortune.

Forgive one another's treaspasses.

Thou shall not indulge in intoxicating drinks.

Acquire knowledge with diligence.

Bear thy burden of duty with patience.

Be moderate in food and recreation.

Do thy house-work with cheerfulness and wifely devotion.

Forbear from wrangling, quarrelling and foolish talk.

Be queen of thy household, devoted to go d works, and armed with self-control.

Obey and honour thy elders.

Have pity on the poor and down-trodden. Give up extravagant and miserly habits.

Neglect not thy spiritual and temporal welfare.

Shrink not from sacrificing life itself at the call of duty.

Such are the silent admonitions of the spirit in every soul.

He who performs his life-work in obedience to these commandments—conquers death.

Oh worship Him, the Infinite Spirit—and do His bidding unflinchingly through all the vicissitudes of this life.

6. Should you ever fall into sin, through the temptations and allurements of the world, you shall not fail to seek deliverance with a contrite heart and sincere repentance.

7. For the advancement of religion, you should contribute your mite to the Brahma Samaj, from year to year, or as occasions may arise.

Not only by gifts of money, but in other ways you will do your best to spread the religion you have adopted this day. Om Ekamévâdwitiyam.

THE VOW (PRATIGNYA)

1. In the beginning there was only one Supreme Spirit, naught else did exist. He created all that there is.

2. The Supreme Brahma is he. The Primal Cause, unborn, infinite in wisdom and goodness, formless and unchanging, all-pervading omniscient, all-sustaining, self-dependent and perfect.

3. In His worship lies our salvation in this world and the next.

tell you it is not a new religion you are about to embrace; you are rather coming back to the old—to your very own. Through stress of circumstances, beyond your control, you strayed away from us and adopted a new country and a new religion; but now that you have come back to us to claim your heritage, we welcome you, with all our heart, like the long-lost prodigal child of old, returning home from foreign lands.

উপদেশ।

These few words of wisdom and good counsel that I am now going to address to you, lay them well to heart. They will be good for your soul's progress and lead to your salvation.

Brahma Dharma is the religion of the spirit. It teaches the close affinity between the finite and the Supreme Spirit. Dive into the depths of your soul, and you will find that God is its aid and support.

The soul is not helpless, nor is it left floating in the void, but it lives and has its being in God, its Creator.

Think not that thou art alone. Thy God is thy life-long companion, friend, and father, and thy everlasting support. All the good, all the happiness that thou enjoyest spring from Him. Let this be the end and aim of your life,—to find God, to feel Him near and ever nearer, every day of your existence. The body will be left behind as an inert mass, but the soul will take its flight to God, and find its home in Him for evermore.

This is the doctrine of the spirit (atmagnyan). Now I will propound to you the principles of the Brahma Dharma.

1. In the beginning there was one God, the Supreme Spirit, naught else did exist. He created all that there is.

2. The Supreme Brahma is He, the primal cause, unborn, infinite in wisdom and goodness; formless and unchanging, all-pervading, omniscient, all-sustaining, self-dependent and perfect; One only, without a second (ékamèvàdwitiyam).

3. In His worship lies our salvation in this world and the next.

4. Loving Him and doing the works He loveth, constitutes His worship.

Put your faith in these fundamental principles of the Brahma-Dharma, and live up to them.

1. The Creator and Preserver of the universe, the Giver of all good here and hereafter, the one only Supreme Brahma—Him do thou worship with love and reverence, doing the works of charity and righteousness that He loveth.

This is your first pratijnyà.

The second is this :—

2. You shall not worship any idol or created object as the Supreme Brahma.

This vow is the life and soul of the Brahma-Dharma. We call ourselves "Bràhmas" because we are the worshippers of the Supreme Brahma.

We must not bow down in adoration before any idol or any created object.

3. Unless incapacitated by illness or other causes, you shall daily worship in and commune with the Lord your God with all love and reverence.

If you do not take any food for the sustenance of your body, you cannot maintain yourself in health. The worship of God is the sustenance of the soul. So to keep it in health, you must keep yourself in touch with Brahma through daily worship and prayer. In order to hold communion with Him, it is not necessary that you should cling to any ritual or particular form of worship. Om or Gayatri, or Satyam Jnanamanantam Brahma or any suitable prayer that you consider helpful towards

the advancement of your soul to God, you are at liberty to adopt.

Do not neglect to cherish your soul by this daily worship. There are various avenues open to you, for approaching God. When we are full of love for Him, we look upon Him as our friend. In trouble and distress, He is our comforter. When we fall into sin, He is our deliverer. When we go to Him seeking salvation—He is our Saviour. This being so, what materials are wanting for His worship? It is not necessary for us to cull flowers or to go to any particular spot, in order to attain our object. In trouble and distress, in prosperity and adversity, in health and sickness, in solitude or crowded places, in all circumstances we are privileged to call upon Him. So what is said in this 3rd *pratijna* is easy for you to achieve.

The 4th *pratijna* is :—you shall earnestly practise every good work.

And the 5th :—you shall use your best endeavour to keep away from sin and impurity.

God dwelleth in the souls of men and women, and silently conveys these commandments to their conscience :—

Speak the truth—do the right. Righteousness is highest of all, and is honey sweet for all.

Thou shalt not earn money by unjust means.

Thou shall not covet thy neighbour's riches, nor be jealous of his good fortune.

Forgive one another's treaspasses.

Thou shall not indulge in intoxicating drinks.

Acquire knowledge with diligence.

Bear thy burden of duty with patience.

Be moderate in food and recreation.

Do thy house-work with cheerfulness and wifely devotion.

Forbear from wrangling, quarrelling and foolish talk.

Be queen of thy household, devoted to go d works, and armed with self-control.

Obey and honour thy elders.

Have pity on the poor and down-trodden. Give up extravagant and miserly habits.

Neglect not thy spiritual and temporal welfare.

Shrink not from sacrificing life itself at the call of duty.

Such are the silent admonitions of the spirit in every soul.

He who performs his life-work in obedience to these commandments—conquers death.

Oh worship Him, the Infinite Spirit—and do His bidding unflinchingly through all the vicissitudes of this life.

6. Should you ever fall into sin, through the temptations and allurements of the world, you shall not fail to seek deliverance with a contrite heart and sincere repentance.

7. For the advancement of religion, you should contribute your mite to the Brahma Samaj, from year to year, or as occasions may arise.

Not only by gifts of money, but in other ways you will do your best to spread the religion you have adopted this day. Om Ekamévâdwitiyam.

THE VOW (Pratignya)

1. In the beginning there was only one Supreme Spirit, naught else did exist. He created all that there is.

2. The Supreme Brahma is he. The Primal Cause, unborn, infinite in wisdom and goodness, formless and unchanging, all-pervading omniscient, all-sustaining, self-dependent and perfect.

3. In His worship lies our salvation in this world and the next.

4. Loving Him and doing the works He loveth, constitutes His worship.

Fully accepting these principles, do I now embrace the Brahmo Dharma.

1. I believe in the Supreme Brahma—the true, the good, the holy, infinite Being allpervading and omniscient, without form or shape, invisible to mortal eyes, the creator of heaven and earth, the world's everlasting refuge, the giver of all good here and hereafter. One only without a second. (ēkamevadwitiyam)

Him will I worship, and devote my life to works of charity and righteousness, such as are pleasing in His sight.

2. I shall not worship any idol or created object as the Supreme Brahma.

3. Unless incapacitated by illness or other causes, I do hereby bind myself daily to worship in communion with the Lord my God with all love and reverence.

4. I shall earnestly practise every good work.

5. I shall use my best endeavour to keep away from sin and impurity.

6. Should I ever fall into sin through temptation and allurements of the world, I shall not fail to seek deliverance with a contrite heart and sincere repentance.

7. For the advancement of religion, I shall contribute my mite to the Brahmo Samaj from year to year, or as occasions may arise.

O Thou Supreme Spirit.

May I live up to the noble principles of this blessed religion—So help me God.

Om namah Shambhavaya cha Mayobhavaya cha namah Shankaraya cha Mayaskaraya cha namah Shivaya cha Shivataraya cha.

(Signed) Ella Chatterjie

শোক সংবাদ।

৺ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিগত ১২ই বৈশাখ রবিবার রাত্রি ৯॥০ টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। গত কয়েক মাস ধরিয়া তিনি পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছিলেন; সম্প্রতি তিনি ধীরে ধীরে এই রোগ হইতে মুক্তি লাভও করিতেছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তিনি হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইলেন এবং ইহাতেই শেষে তাঁহার জীবনান্ত ঘটিল। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৪৯ বৎসর হইয়াছিল। ধর্ম্মমতে তিনি বড় উদার ছিলেন; তাই তাঁহার সহিত আদিব্রাহ্মসমাজের যোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার মত স্নিগ্ধপ্রকৃতি মিষ্টালাপী বন্ধু আমরা আর খুব কমই পাইব। বিদ্যামন্দিরেরও তিনি একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন; পালী ও তিব্বতীয় ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। জর্ম্মাণ ভাষাতেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি বড় কম ছিল না। এরূপ একজন উচ্চাশয় গুণবান বন্ধুকে অকালে হারাইয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণসাধন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনের শান্তিবিধান করুন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

গণিতজ্ঞ ৺রামানুজম্। সভ্য জগতের গণিতবেত্তাদিগের মধ্যে অন্যতর শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপক মিঃ এস রামানুজম্ গত ১৩ই বৈশাখ সোমবার স্বীয় জন্মভূমি মাইলাপুর গ্রামে ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের গৌরব, এই মান্দ্রাজী যুবকের অকাল মৃত্যুতে আমরা বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। ইংলণ্ডে রোগাক্রান্ত হইয়া ইনি গত বৎসর মার্চ্চমাসে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং শেষে ঐ রোগেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে। ভগবান ইঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল বিধান করুন।

POSTAL NOTICE.

Insertion of the names and addresses of senders on the covers of Articles posted.

Attention is specially invited to clause 43 of the Post Office Guide which requires the sender of a postal article to add his name and address on the lower left-hand corner of the cover so that it may be returned to him unopened in case of non-delivery. A large number of imperfectly addressed articles is destroyed every year in the Dead Letter office for want of this information.

Calcutta } The 15th April 1920.

G. R. Clarke
Director-General of Posts & Telegraphs.

বিংশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৯১

৯২৩ সংখ্যা | ১৮৪২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

নববর্ষ।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

Ring out the old Ring in the new—Tennyson

১

পুরাতন বর্ষ শেষ, স্বাগত নবীন!
স্মৃতিতে রহিয়া গেল পুরাণো সে দিন।
যায় সে যে, অশ্রুজলে বিদায়ি তাঁহারে
বর' নব অতিথিরে আদর সৎকারে।

২

গেছে কত ব্যথা ক্লেশ, অতৃপ্ত বাসনা,
সুখ-আশা গেছে ভেঙ্গে, অসিদ্ধ সাধনা;
নববর্ষে ধর আজি উদ্যম নূতন,
নূতন উৎসাহে গড়' নূতন জীবন।

৩

ঘুচুক অভাব দৈন্য দুঃখ পাপভার,
অবিশ্বাস, ভ্রান্তিপাশ, সংশয় আঁধার;
নিবে যাক্ শোকানল চিরদিন তরে
কালের ইন্ধনে যাহা জলে ঘরে ঘরে।

৪

খর্ব্ব হোক্ বৃথা গর্ব্ব মান অভিমান,
জাতিকুল-ভেদাভেদ বিচ্ছেদ-নিদান,
বাঁধুক জগতজনে মৈত্রের বন্ধন
একপ্রাণ রাজাপ্রজা সধন নির্ধন।

৫

আলস্য প্রমাদ লোভ, যাক্ এ জঞ্জাল,
ক্ষমা দয়া ধৃতি হৃদি থাক্ চিরকাল;
অনাচার অত্যাচার হোক্ নিবারিত,
হউক সত্যের জয়, মিথ্যা পরাজিত।

৬

আধিব্যাধি অমঙ্গল যাক্ দূরে যাক্,
স্বাস্থ্য কান্তি পরিমলে জীবন জুড়াক্;
যুদ্ধ বিগ্রহের হোক্, হোক্ অবসান,
উড়ুক্ ধরণী মাঝে শান্তির নিশান।

৭

দুর্জ্জয় বিষয় তৃষ্ণা যাক্ থেমে যাক্,
বিবেক বৈরাগ্য দুই থাক্ কাছে থাক্;
শকতি অপরাজিত, দেবভক্তি সাথে
পথের চিরসম্বল থাক্ সাথে সাথে।

৮

এস দেব বিশ্বজয়ী, হস্তে বরাভয়,
পথপানে চেয়ে আছি ব্যাকুল হৃদয়,
গগন মেদিনী ভরি ভৈরব আরবে
জাগায়ে তুলিবে কবে প্রসুপ্ত মানবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন।

(আচার্য্য ৺ শিবনাথ শাস্ত্রী)

ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন একটি গুরুতর বিষয়; এ বিষয়ে সাধনার্থীদের বিশেষ প্রণিধান কর্ত্তব্য। যাঁহারা সাকার দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন, বা গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ; কারণ কতকগুলি বাহিরের নিয়ম পালন করিলেই তাঁহাদের ধর্ম্মসাধন হইয়া যায়। একজন প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া

আসিলেন; ফুল তুলিয়া পাত্র ভরিলেন; যথাসময়ে ঠাকুরঘরে গিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ফুলগুলি দেবতার চরণে অর্পণ করিলেন; অবনত মস্তকে দেবতার চরণে প্রণত হইলেন; তার পর গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার ধর্ম্মসাধন হইয়া গেল। সেই সাধন তাঁহার হৃদয়মনকে স্পর্শ করিল কিনা, তাঁহার ধর্ম্মভাবকে উদ্দীপ্ত করিল কিনা, পুণ্যে রুচি পাপে অরুচি আনিয়া দিল কিনা, সেদিকে দৃষ্টি নাই।

ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মসাধন এরূপ নহে, তাহা আধ্যাত্মিক, আন্তরিক ও চরিত্রের গূঢ় সংগ্রাম-জনিত। উপনিষৎকার ঋষিরা বলিয়াছেন,—

"যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন লোকে জুহোতি, যজতে, তপস্তপ্যতে, বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।"

"হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরম পুরুষকে না জানিয়া, এই লোকে বহু সহস্র বৎসর কাল যজ্ঞ, তপস্যা করে, সে সমুদয় বৃথা হয়।"

ভগবানে চিত্ত অর্পণ না করিয়া, তাঁহাতে ভক্তিস্থাপন না করিয়া, মানুষ কেবল বাহিরের নিয়ম পালন করিলে তাহা বৃথা হয়।

তবে ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে এই প্রধান কথা আমাদের নিকট আসিতেছে যে, তদ্দ্বারা ভগবানে চিত্ত স্থাপন করিতে হইবে; তাঁহার সহিত প্রেমে আবদ্ধ হইতে হইবে; সুখ, স্বার্থের উপরে উঠিতে হইবে; জীবনের আধ্যাত্মিক সংগ্রামকে বরণ করিতে হইবে; এবং এই দেহ যেমন দৈহিক সংগ্রামাদির দ্বারা বললাভ করে, তেমনি জীবনের পাপ-তাপ-প্রলোভনাদির সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মাকে বলশালী করিয়া তুলিতে হইবে।

এইস্থানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলি, যাহা ব্রাহ্মসমাজের নরনারীর মনে রাখিবার উপযুক্ত। তাহা এই,—কেবল ধর্ম্মের কতকগুলি উন্নত মত প্রচারের জন্য ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন হয় নাই। যেমন সহরের তাড়িত কার্য্যালয় কেবল তাড়িতের গতি ও কার্য্যের ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু তড়িতকে ধরিয়া, আকাশ হইতে নামাইয়া কলকারখানার মধ্যে পূরিয়া, বাড়ী বাড়ী পাঠাইবার জন্যই স্থাপিত হইয়াছে; তেমনি ব্রাহ্মসমাজ কেবল আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বভৌমিক মহাধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবার জন্যই স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বভৌমিক মহাধর্ম্মকে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই স্থাপিত হইয়াছে।

এই আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বভৌমিক মহাধর্ম্মকে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করা মহা কঠিন কার্য্য; নিগূঢ় সাধন ভিন্ন তাহা ঘটে না। এইজন্য এই ধর্ম্মসাধন বিষয়ে কিছু বলিতে যাইতেছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরণে বসিয়া এ বিষয়ে যাহা শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি তাহাই ব্যক্ত করিতে যাইতেছি।

তাঁহার চরণে বসিয়া দেখিয়াছি, আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সাধনের প্রথম ও প্রধান উপাদান সাধুভক্তি; অর্থাৎ জগতের সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বশ্রেণীর সাধুভক্তদিগের জীবনচরিত পাঠ করা ও তাঁহাদের উক্তির আলোচনা করা—ধর্ম্মসাধনের প্রথম উপায়। এরূপ দেখা যাইত যে, মহর্ষি শেষ রাত্রে চারিটার পূর্ব্বে উঠিয়া নিজ উপাসনাতে বসিয়াছেন, মুখে মুখে হাফেজের ও বৈদিক ঋষিদের উক্তি সকল আবৃত্তি করিতেছেন, পার্শ্বের ঘর হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা নিজ চক্ষে দেখিয়াছি উপনিষৎকার ঋষিদের বচন ভক্তির সহিত উচ্চারণ করিলে তাঁহার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিত। মহর্ষি উপনিষৎকার ঋষিদের চরণে বসিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেন বলিবার এ অভিপ্রায় নয় যে, আমাদের সকলকে কেবল বৈদিক ঋষিদের চরণেই বসিতে হইবে; অভিপ্রায় এই যে দেশবিদেশের সাধুগণের চরিত আলোচনা করা, তাঁহাদের বিশ্বাস ও ভক্তির ভাব ধ্যানে জ্ঞানে আনিবার চেষ্টা করা, তাঁহাদের জীবনের আদর্শ উজ্জ্বলরূপে প্রাণে ধারণ করিবার চেষ্টা করা, ধর্ম্মসাধনের প্রথম ও প্রধান উপায়। ব্রাহ্মদিগের ন্যায় উদার, আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বভৌমিক মহাধর্ম্মের সাধকদিগের পক্ষে এ পথ কি উদার পথ! অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মানুষেরা সাধুভক্তিকেই তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনের প্রধান ভূমি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সাধুভক্তি অভ্রান্ত গুরুরূপ ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ। ব্রাহ্মদিগের সাধুভক্তি সেরূপ নহে; ইহা উদার ও সার্ব্বভৌমিক।

সকল দেশের ও সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণ ইহাঁদের গুরুস্থানীয়। এই সাধুভক্তি কেবল মতে না রাখিয়া সাধনা দ্বারা নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি প্রধান উপাদান স্বরূপ করিতে হইবে।

ধর্ম্মসাধনের দ্বিতীয় উপায়,—সাধুদিগের প্রচারিত মহাসত্যগুলিকে ধ্যানস্থ হইয়া নিজ আত্মাতে উজ্জ্বলরূপে প্রতীতি করিবার চেষ্টা করা। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে একটি উপদেশ আছে, তাহা এই,—"খনন খনিত্রেণ যথা নরো বার্য্যধিগচ্ছতি" অর্থাৎ মানুষ খনিত্রের দ্বারা খনন করিয়া করিয়া তবে মৃত্তিকার ভিতর হইতে বারি পাইতে পারে, তেমনি সাধুদের আধ্যাত্মিক উক্তির মধ্যে নিবিষ্টচিত্তে নিমগ্ন হইলে ধর্ম্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন,—"তোমরা সত্যং জ্ঞানমনন্তং প্রভৃতি বচন বড় লঘুভাবে উচ্চারণ কর; আমি ঐ সকলের মধ্যে অতলস্পর্শ সাগর দেখিতে পাই।" আমি মহর্ষির নিকট হইতে উঠিয়া আসিয়া প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে সেই কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন যে, তিনি অনেক দিন দেখিয়াছেন যে, মহর্ষি একটি উপনিষদের বচন আবৃত্তি করিতে করিতে বারাণ্ডাতে দুই তিন ঘণ্টা বেড়াইতেছেন। অতএব ধর্ম্মসাধনের দ্বিতীয় উপায় এই যে, গ্রন্থাদিতে ভগবদ্ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ যে সকল উক্তি পাওয়া যায় তাহার এক একটি লইয়া অনুধ্যান করিবার সময় রাখা।

ধর্ম্মসাধনের তৃতীয় উপায় এই—আত্মচরিতে নিমগ্ন হইয়া নিজের আধ্যাত্মিক অভাব, নিজের ধর্ম্মজীবনের অবস্থা, নিজের চরিত্রের গূঢ় দুর্ব্বলতা, নিজের হৃদয়মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সকলের বিষয় চিন্তা করিবার জন্য সময় রাখা। নিজের হৃদয় মন চরিত্র প্রভৃতিকে শাসনে রাখিবার দিকে যার দৃষ্টি নাই, তার ধর্ম্মসাধনে মতি নাই। আত্মপরীক্ষা ও নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থা বিষয়ে ধ্যানপরায়ণতা ধর্ম্মসাধনের একটি প্রধান পথ, ইহা কাহারও বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

ধর্ম্মসাধনের চতুর্থ উপায়—প্রত্যেকের এক একটি বাঁধা ধর্ম্মসাধনের প্রণালী থাকা উচিত। প্রতিদিন সেই প্রণালী অনুসারে উপাসনাদি করিবেন। এই প্রণালী নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও অভাবাদি হইতে গঠিত করিয়া লইতে হইবে। মনে কর, নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও নিজের আধ্যাত্মিক অভাবাদি বিষয়ে ভাবিতে ভাবিতে একটি সত্য তোমার মনে জাগিয়া উঠিল। অমনি সেটিকে মন হইতে উড়িয়া যাইতে না দিয়া, তুমি একটি বচনে তাহাকে আবদ্ধ করিলে এবং সেটিকে তোমার দৈনিক উপাসনা-প্রণালীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া লইলে। মনে কর, চিন্তা করিতে করিতে তোমার মনে হইল যে, প্রশংসা-প্রিয়তা তোমার মনে বড়ই প্রবল। অমনি তুমি তোমার দৈনিক উপাসনা প্রণালীর মধ্যে দুইপংক্তি কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়া লইলে,—

লোকের প্রশংসা চাই নিজে ভুলি বলে,
দলুক দলুক মোরে সবে পদতলে।

এই দুই পংক্তি তোমার দৈনিক উপাসনা-প্রণালীর মধ্যে আসিল। এইরূপে নিজের দৈনিক উপাসনা-প্রণালী, নিজের আধ্যাত্মিক অভাব অনুসারে গঠন করিয়া লইতে হইবে। দুই একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এই সত্যটিকে আরও সুব্যক্ত করিবার চেষ্টা করি। মনে কর, একটি পাখী তোমার ঘরের খোলা জানালা দিয়া তোমার ঘরে প্রবেশ করিল। সে আসিয়া তোমার ঘরের এক ধারে বসিয়া সুন্দর ডাক ডাকিতে লাগিল। তুমি তাহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলে। কিয়ৎক্ষণ পরে পাখিটী আর এক জানালা দিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। তুমি হায় হায় করিতে লাগিলে। এই এক প্রকার অবস্থা; আর এক প্রকার অবস্থা এই, পাখিটী আসিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া ডাকিতেছে, এমন সময়ে তুমি উঠিয়া ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া পাখিটীকে ধরিলে এবং তাহাকে খাঁচার ভিতর পুরিলে; সে তোমার নিত্য সঙ্গী হইল; এবং প্রাতে সন্ধ্যাতে মিষ্ট ডাক শুনাইতে লাগিল। তেমনি তোমার মনে শুভক্ষণে যে ধর্ম্মভাব জাগিল তাহাকে উড়িয়া যাইতে না দিয়া, তুমি তাহাকে একটি মন্ত্র বা বচনের মধ্যে পুরিয়া তাহাকে প্রতিদিনের দৈনিক উপাসনার অঙ্গ করিয়া লইলে।

আমার জীবনে একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করিতে পারি। আমি যখন কলিকাতার হেয়ার

স্কুলে সংস্কৃত অধ্যাপকের কাজ করি, তখন একদিন বৈকালে স্কুল হইতে বাড়ীতে আসিয়া যেই শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াছি, অমনি আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশু-কন্যা, এক বৎসরের বালিকা, হামা দিয়া দেয়ালের নিকট গিয়া, দেয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া "বাবা! বাবা!" করিয়া হাতে তালি দিতে লাগিল; অর্থাৎ তাহার মনের ভাব এই, "বাবা! দেখ, আমি দাঁড়াইয়াছি!" তাহার এই ভাব দেখিয়া আমার মনে হঠাৎ এক ধর্ম্মভাবের উদয় হইল। আমি ভাবিলাম এ শিশু জানে যে, ইহার দাঁড়াইবার শক্তি নাই, তাই দেয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল; আমি ত জানি আমারও ঠিক দাঁড়াইবার শক্তি নাই, তবে কেন ঈশ্বর-কৃপায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইবার বুদ্ধি হয় না; এই ভাবটা আমার হৃদয়কে ও চিন্তাকে অধিকার করিয়া ফেলিল। অবশেষে আমি একজন সুলেখককে দিয়া একটা বোর্ডে এই কথাগুলি লিখাইলাম,—"Lean on the Divine will, oh my soul." সেই বোর্ডখানি আমার শয়নগৃহের খাটের পায়ের দিকে দেয়ালে লাগাইয়া রাখিলাম; আসিয়া শয়ন করিলেই কথাগুলি চক্ষে পড়িত। আমার দৈনিক উপাসনা প্রণালীর মধ্যে ঐ কথাগুলি বহুদিন স্মৃতিতে আনিতাম। বাঁধা উপাসনা-প্রণালীকে এইরূপে গঠন করা যাইতে পারে।

ধর্ম্মসাধনের পঞ্চম উপায়—নিজের দৈনিক সাধন-প্রণালীর মধ্যে নিজের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অনুসারে, ভগবানের স্বরূপের যে দিক নিজের মনে জাগে তাহা উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে নিবিষ্ট করিতে হইবে। মনে কর "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি উপনিষদুক্ত বচনের সকল কথা তোমার মনে লাগে না, "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" কথাটি যেমন লাগে; তিনি ধর্ম্মের বিজয়বিধাতা ও পাপের বিনাশকর্ত্তা এইটি তোমার পক্ষে বড় আশ্বাস-বাণী। তুমি এইটি অনুভব করিয়া আপনার দৈহিক উপাসনার মধ্যে এই উক্তিগুলির সঙ্গে "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং" এই কথাগুলি যোগ করিয়া লইলে—অর্থাৎ হে ভগবান! তুমি ধর্ম্মের বিজয়দাতা ও পাপের বিনাশকর্ত্তা। সেটি তোমার সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ হইল। ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এইরূপ করিয়া লইয়াছিলেন, তাই এ কথা বলিতেছি।

ধর্ম্মসাধনের ষষ্ঠ উপায়—ধর্ম্মভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সঙ্গে সম্মিলন ও আলোচনার সময় রাখা। অনেক সময়ে আমরা দেখিয়াছি যে, নিজে যে আধ্যাত্মিক ভাব অগ্রে অনুভব করি নাই, তাহা ভক্তসঙ্গে বসিয়া কথা কহিতে কহিতে মনে জাগিয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিলাম,—"ও মা! তাই ত এ ত আগে বুঝি নাই?" অমনি সেই সত্যের চিন্তাতে মন মগ্ন হইল। এটা ধর্ম্মসাধনের একটা প্রধান সহায়।

ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান উপায়—মনকে একান্তে লইয়া, জগতের দিকে পশ্চাৎ ও ভগবানের দিকে মুখ ফিরাইয়া শ্রবণ, মনন ও চিন্তনে আপনাকে নিয়োগ করা ও তাঁহার চরণে মাথা রাখিবার অভ্যাস রাখা। প্রতিজনের দৈনিক জীবনের মধ্যে এমন একটা সময় রাখা উচিত, যখন এটা নিশ্চিন্ত মনে করিতে পারা যায়। গড়ের উপর প্রতিজনের জন্য এই কথাটা বলিয়া রাখা যায় যে, তাঁহারা নিয়ম রাখিবেন যে, প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবেন, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একান্তে গিয়া কিছু সময়ের জন্য সাধুচরিত পাঠ, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও তদনন্তর ঈশ্বরচরণে স্তুতিবন্দনা ও তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিবেন।

ঈশ্বর-চরণে মতি রাখার অভ্যাস হইলে, মানুষ পথে চলিতে চলিতে, রেলগাড়িতে যাইতে যাইতে, ট্রামে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার চরণে মতি রাখিতে পারে। তাহাও করিতে হইবে, কিন্তু উপাসনার সময় ও উপাসনা-প্রণালী দৃঢ়রূপে রক্ষা করা উচিত। তাহার প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়।

সর্ব্বশেষে একটি কথা বলিয়া উপসংহার করি। ধর্ম্মসাধনার্থীর পক্ষে ধ্যানপরায়ণতা অভ্যাস করা অতীব প্রয়োজনীয়। তিনি মনে করিলেই চিন্তাশক্তিকে একাগ্র করিয়া লইতে পারেন, ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্যে মগ্ন হইতে পারেন, জগৎকে ও বিষয়-চিন্তাকে ভুলিয়া যাইতে পারেন, ঈশ্বরের শ্রবণ ও নিদিধ্যাসনে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারেন, এরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি থাকা উচিত। এই ধ্যান-

পরায়ণতা সমুদয় আধ্যাত্মিক প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষের ধর্ম্মসাধনে দেখা গিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধকদিগের পক্ষে ইহা অতীব প্রয়োজনীয়।*

নীরব রাতে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মিশ্র বেহাগ—তেওরা।

তোমার ভাতি নীরব রাতে
বিছানো আছে গগন মাঝে॥
মেঘেরা ভেসে চলিছে হেসে
কে জানে কোন্ অজানা দেশে॥
জোছনা খেলে মেঘের কোলে
দেখিয়ে গানে জাগিছে প্রাণে॥
কাটাব আমি সারাটী যামি
উরধ মুখে পরম সুখে॥
ধরণী ছেড়ে বেড়াব খেলে
মেঘের সনে পাগল মনে॥
ফুলের পুটে সুবাস লুটে
হরষে টুটে বাতাস ছুটে॥
তোমারে ঘেরি তারকা সারি
দিতেছে বলি চরণে ঢালি॥

পরমেশ্বর মূল কারণ।

(ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ জি ভাণ্ডারকর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং
জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ
পৃথ্ব্যাপ্যতেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।২

"এই সমস্ত যাঁহার দ্বারা নিত্য আবৃত রহিয়াছে, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, কালের কর্ত্তা, সমস্ত কল্যাণ-গুণে পরিপূর্ণ, সমস্তের জ্ঞাতা, তাঁহারই সত্তায় পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই যে পঞ্চভূত, যাহার সম্বন্ধে আমরা চিন্তা আলোচনা করিয়া থাকি, তাহারা নানাবিধ ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়।"

পঞ্চভূতের নিয়মিত ক্রিয়া দেখিয়া কোন কোন পদার্থবিজ্ঞানবেত্তার এইরূপ ভ্রম উৎপন্ন হয় যে, এই সমস্ত ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ এবং এই সমস্ত ক্রিয়া আপনা-আপনিই সতত চলিয়া জগতের কালমাহাত্ম্যযোগে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এইরূপ বলিবার সময় আপন অন্তঃকরণে প্রথমত যে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে তাহার বীজ কি, তাহা তাঁহারা সর্ব্বথা বিস্মৃত হন। জগৎ-নিয়মের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি মানুষের কেন হয়? কোন কিছু নূতন ঘটনা ঘটিলেই তাহার কারণ কি এইরূপ স্বভাবতই মনুষ্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। এই ঘটনা স্বভাবসিদ্ধ, ইহার কোন কারণ নাই, এইরূপ বলায় তাহার সন্তোষ হয় না। মনে কর, আমি ভোরে উঠিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া সম্মুখে দেখিলাম, যাহা গত কল্য ছিল না এমন এক বৃক্ষ অঙ্গনে খাড়া হইয়াছে। তদনন্তর, তখনি আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, "এই বৃক্ষ এখানে আনিয়া কে লাগাইল"? আমাকে যদি কেহ এইরূপ উত্তর দেয় যে, উহা আপনা-আপনি অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মে উৎপন্ন হইয়াছে, কিংবা অন্য স্থান হইতে আপনিই উঠিয়া আসিয়া এইখানে রহিয়াছে, তাহা হইলে আমি এই কথা কি সত্য বলিয়া মনে করিব? তাহাতে আমার বুদ্ধির তৃপ্তি হইবে কি?—না। কেননা, স্বাভাবিক নিয়ম অথবা অচেতন কারণকে বুদ্ধি জিজ্ঞাসা করিতে চাহে না। পূর্ব্বে ছিল না এইরূপ নূতন কিছু করিবার সামর্থ্য অচেতন পদার্থের নাই; কার্য্য উৎপন্ন করিবার জন্য আবশ্যক যে ব্যাপার তাহা অচেতন পদার্থের দ্বারা হইতে পারে না, তাই অচেতনের কর্তৃত্বধর্ম্ম নাই, অচেতন পদার্থের কারণ বলিবার যোগ্যতা নাই। এই জন্য, অমুক এক ব্যক্তি রাত্রিতে এই বৃক্ষ অন্যস্থান হইতে আনিয়া এইখানে রোপণ করিয়াছে, এইরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইলে আমার জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হয়। এইরূপ হইলে, তাহার পর,—একটি ক্ষুদ্র বীজ জমির উপর নিক্ষেপ করায়, তাহার উপর জল পড়িয়া তাহার ভিতরে অঙ্কুর উৎপন্ন হইল, তার পর আস্তে আস্তে পাতা গজাইয়া স্কন্ধ কাণ্ড প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া একটা গাছ হইয়া দাঁড়াইল, এইরূপ বর্ণনার

---

* ১৬ই কার্ত্তিক, ১৮৩৮ শক তত্ত্বকৌমুদী হইতে উদ্ধৃত।

দ্বারা আমাদের পৃচ্ছা অথবা সমস্ত আকাঙ্ক্ষার কি নিবৃত্তি হয়? না, তাহা হয় না। যদি হয় তো, সে কেবল অভ্যাসের যোগে; এবং হয় না বলিয়াই উদ্ভিদ্‌-শাস্ত্রবেত্তা অধিকাধিক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এই কথাটা বাহির করিয়া আনেন যে, জলের যোগে ভূমির কোন অংশে রস জন্মে, তাহার পর ঐ রস ঐ বৃক্ষের মূলে প্রবিষ্ট হয় এবং সেখান হইতে, শেষ পর্য্যন্ত যে সকল নাড়ী আছে তাহা দিয়া উপরে উঠিয়া যায়। পরে, সূর্য্যকিরণের যোগে উহার উপর এক ব্যাপার ঘটে, বৃক্ষের পাতা বায়ু হইতে কোন এক জিনিস গ্রহণ করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়, এবং ঐ রস স্থানে স্থানে সঞ্চিত হইয়া বৃক্ষের সমস্ত অবয়ব উৎপন্ন হয়,—এইরূপ জ্ঞান হইলেও আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয় কি? না, তাহা হয় না। কেন না, এইখানে আরও অনেক প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। যেমন মনে কর—বৃক্ষের মূল অচেতন,—ঐ মূল, রসের সান্নিধ্য হইলে রস শোষণ করিয়া লয় কি করিয়া? অচেতন রস উপরে উঠিল কি করিয়া এবং পার্থিব ও বায়বীয় জিনিসের দ্বারা মিশ্রিত যে জল তাহা হইতে কাষ্ঠস্বরূপ বৃক্ষের অবয়ব কিরূপে উৎপন্ন হয়? সেই জন্যই, ইহা অপেক্ষা উত্তরোত্তর গূঢ় গূঢ় বিষয়ের অনুসন্ধান হইয়া থাকে। আচ্ছা তবে, এই আকাঙ্ক্ষা অথবা ইচ্ছার নিবৃত্তি হইবে কখন্? তখনই হইবে যখন আমরা মনে করিব যে, চেতন জ্ঞানী পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই সমস্ত ব্যাপার চলিতেছে। সেই জন্যই, অভ্যাসের যোগে যাহাদের পৃচ্ছাবুদ্ধি মন্দীভূত হয় নাই এইরূপ বালকেরা জাগতিক পদার্থ সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন আপন মাতা পিতার নিকট করিয়া থাকে। অতএব মানুষ যে কারণের অন্বেষণ করে তাহা এইরূপ চেতন কারণ। উহা প্রাপ্ত হইলে তাহার পর কোন প্রশ্ন থাকে না। সর্ব্ব প্রযত্ন বিফল হইলে, বুদ্ধি আর চলে না এইরূপ হইলে, শেষে বিজ্ঞানবেত্তারা এইরূপ কল্পনা করেন যে, পদার্থদিগের শক্তি আছে। বৃক্ষমূলের শক্তি আছে, বৃক্ষপত্রের শক্তি আছে, অগ্নির উষ্ণতা শক্তি আছে, তাহারই যোগে রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহারই যোগে অগ্নির উপর নিক্ষিপ্ত পদার্থ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় এবং পরে উহা দগ্ধ হয়—এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি। কিন্তু শক্তি শব্দের অর্থ কি? অগ্নির উপর এক বস্ত্র নিক্ষেপ করায় দগ্ধ হইল, ইহাই আমরা দেখিতে পাই। ফাঁকা জায়গায় পাথর ফেলায় উহা নীচে পড়িল—ইহাই আমরা দেখিতে পাই। অগ্নির দাহকতা শক্তি আছে, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে, কিংবা গাছের পাতার বায়বীয় জিনিস টানিয়া লইবার শক্তি আছে,—তাহা কে দেখিয়াছে? বাহ্য পদার্থের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। আমাদের আত্মায় যে শক্তি অধিষ্ঠিত তাহাই আমরা অনুভব করিতে পারি। উহা হইতেই আমাদের শক্তিরূপ পদার্থের জ্ঞান হয়, অন্য প্রকারে হয় না। আমার এইরূপ প্রতীতি আছে যে, ইচ্ছা করিলেই আমি ঐ বোঝা ভূতল হইতে উপরে উঠাইতে পারিব। আমার মধ্যে এই শক্তি আছে। এই জন্য, বাহ্য পদার্থের মধ্যে কোন এক শক্তি আছে এইরূপ যখন আমরা বলি তখন এইরূপ অর্থ হওয়া চাই যে, আমরা যেরূপ কাজ করি বাহ্য পদার্থও সেইরূপ কাজ করে। কিন্তু বাহ্য পদার্থ অচেতন। তবে কাজ করিবে কি করিয়া? কিন্তু বাহ্য পদার্থ ত কাজ করিতেছে। উহার মধ্যে কাজ করিবার শক্তি আছে; ইহা বলিবার অর্থ এই যে, আমাদের মতন এক চেতন পুরুষ বাহিরে আছেন, যিনি ঐ শক্তির দ্বারা কাজ করিতেছেন। তাঁহারই এই শক্তি। অতএব জগতের মধ্যে এই যে আশ্চর্য্য ভৌতিক ক্রিয়া চলিতেছে তাহা পরমেশ্বরের শক্তিতে, তাঁহারই ইচ্ছায়, তাঁহারই সত্তায়, তাঁহারই আজ্ঞায় চলিতেছে। নচেৎ অচেতন পদার্থ এইরূপ ক্রিয়া করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে? এই সমস্তে তিনি ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। যেখানে তাঁহার সত্তা নাই এমন স্থানই নাই। তিনি কেবল আত্মস্বরূপ, দেশ কালের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হন নাই; কালান্তরে পৃথিবীতে যে সব আশ্চর্য্য পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা তাঁহারই নির্ম্মিত। তিনি কালেরও কর্ত্তা, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি মঙ্গলস্বরূপ, তিনি শুদ্ধ, তিনি আনন্দময়। তিনি এইরূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়াই

জগতের সমস্ত ব্যাপার সুচারুরূপে চলিয়া পরিণামে শুভ হয়।

> সর্ব্বা দিশ উর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
> প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড়ুান্।
> এবং স দেবো ভগবান্বরেণ্যো
> যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥
> শ্বেতাশ্বতর ৫ । ৪

"উপরে, নীচে, তির্য্যক এইরূপভাবে সমস্ত দিকে সূর্য্য যেরূপ আপন কিরণ নিক্ষেপ করে, সেইরূপ সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক দেব অশেষ উপকারণের উপর অধিষ্ঠিত।"

পৃথিবী, জল, অগ্নি ইত্যাদি যে সকল ভূত নানাবিধ কার্য্য করে তাহা উপকারণ অথচ উপ-করণ অর্থাৎ পরমেশ্বরের হাতেরই কাজ। বিশ্বের মধ্যে উহাদের যে ব্যাপার চলিতেছে তাহা সর্ব্ব-শক্তি, সর্ব্বোত্তম পরমেশ্বরই তাহাদিগের দিয়া করাইতেছেন।

রাসায়ন আকর্ষণ।

(৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

যোগাকর্ষণে মিলিত হইয়া যে পদার্থ হয় তাহা যেমন উপাদানের সহিত গুণেতে ভিন্ন হয় না, তেমনি এই যোগের সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট পরি-মাণও নাই। এক ছটাক চাউল এক মণ চিনিতে মিশাও, এক মণ এক ছটাক পদার্থ হইবে। কিন্তু রাসায়ন আকর্ষণ দ্বারা যাহার সঙ্গে যাহা মিলিবে, তাহা একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মিলিবে। যেমন, দুই পরমাণু হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক পর-মাণু অক্সিজেন মিলিবে জল হইবে। জল হইতে গেলেই এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মিলিতে হইবে। যদি তিন পরমাণু হাইড্রোজেন থাকে এবং দুই পরমাণু অক্সিজেন থাকে, আর তাহাতে যদি তড়িৎ প্রয়োগ করা যায়, তবে ঐ দুই পরমাণু হাইড্রোজেনে এক পরমাণু অক্সিজেন মিলিয়া জল হইবে। অবশিষ্ট হাইড্রোজেনের যে এক পরমাণু এবং অক্সিজেনের যে এক পরমাণু রহিল, তাহারা মিশিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাদের যোগ হইবে না। কিন্তু আর এক পরমাণু হাইড্রোজেন তাহাতে দিয়া যদি তড়িৎ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে হাইড্রোজেন দুই পরমাণু হইয়া, এক পরমাণু যে অক্সিজেন আছে, তাহার সঙ্গে মিলিয়া জল হইবে—অবশিষ্ট আর কিছুই থাকিবে না।

এই হাইড্রোজেন পরমাণুর আয়তন এবং অক্সিজেন পরমাণুর আয়তন সমান। এই হেতু যদি দুই আয়তন হাইড্রোজেনের সহিত এক আয়-তন অক্সিজেন মিশাইয়া উভয়কে উত্তাপ বা তড়ি-তের দ্বারা সংযুক্ত করা যায়, তাহা হইলেই সমস্তটা বাষ্প হয়, নচেৎ এটা কিম্বা ওটা অবশিষ্ট থাকে। আবার দেখা যায় যে, আট কুঁচ ওজনের বা আট সের ওজনের বা আট মণ ওজনের অক্সিজেনের সঙ্গে এক কুঁচ বা একসের বা এক মণ ওজনের হাইড্রোজেন যথাক্রমে যুক্ত হইলে নয় কুঁচ বা নয় সের বা নয় মণ জল প্রস্তুত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দুই পরমাণু হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক পরমাণু অক্সিজেন যোগ হইলে জল হয়। সুতরাং বলিতে হয় যে, অক্সিজেনের প্রত্যেক পরমাণু হাইড্রোজেনের প্রত্যেক পরমাণু অপেক্ষা ষোলগুণ ভারী।

আবার আমরা এই অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সংযোগের সময় আর একটা তামাসা দেখিতে পাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দুই পরমাণু হাই-ড্রোজেন এক পরমাণু অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিয়া জল হয়; এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে হাইড্রোজেন পরমাণুর আয়তন এবং অক্সিজেন পরমাণুর আয়তন সমান। মনে কর যেন হ হ [হ] [হ] এই দুই আয়তন হাইড্রোজেনের চিহ্ন; অ [অ] যেন অক্সি-জেনের চিহ্ন। মনে কর এক এক আয়তন হাইড্রোজেনের ওজন ১ কুঁচ। তাহা হইলে দুই আয়তনের ওজন হইল দুই কুঁচ। অক্সিজেন আয়-তনের ওজন যেন ১৬ কুঁচ। এই তিন আয়তন মিলিয়া যখন বাষ্প হইবে, তখন যদিও বাষ্পের ওজন ১৮ কুঁচ হইবে, কিন্তু আয়তন তিন থাকিবে না; উহারা এত গাঢ়রূপে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে যে, অযুক্তাবস্থা হইতে যুক্তাবস্থায় উহাদের আয়তন কম হইয়া যায়। অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সমষ্টি তিন ছিল, সংযুক্ত হইয়া বাষ্পের আয়তন

দুই মাত্র হয়। যেমন হ হ অ মিলিয়া বা বা দুই

হ	হ	অ	বা	বা
১ কুঃ চ	১ কুঃ চ	১৬ কুঃ চ	৯ কুঃ চ	৯ কুঃ চ

হইয়া গেল। সুতরাং এক এক বাষ্পায়তনের মধ্যে অক্সিজেনের ভার হাইড্রোজেন অপেক্ষা ৮ গুণ বেশী দেখা যাইতেছে। রাসায়নিক আকর্ষণ এত প্রবল হইল যে, তিন আয়তনকে দুই আয়তন করিয়া ফেলিল। কিন্তু যোগাকর্ষণের ফল হয় তো বেশী হইল না, যেহেতু সংযোগ-পরিণত রেণুগুলি কেবল বাষ্পভাব ধারণ করিল।

দেখ রাসায়ন আকর্ষণ দ্বারা যাহার সহিত যাহা মিলিবে, তাহা একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যতীত মিলিবে না। যেমন, পারা ও গন্ধক মিলিলে হিঙ্গুল হইবে। কিন্তু এই উভয়ের মিলিবার একটী নির্দ্দিষ্ট ভাগ—পরিমাণ আছে—তাহাতেই মিলিবে; যাহা কিছু বেশী কম থাকিবে, তাহা মিলিবে না—অবশিষ্ট পড়িয়া থাকিবে। যোগা-কর্ষণের মধ্যে যতই দাও না, মিলিয়া থাকিবে। রাসায়নিক আকর্ষণ একতো স্বতন্ত্র রকম পদার্থ প্রস্তুত করে; আবার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ না হইলে রাসায়ন আকর্ষণ হইতে পারে না। আবার এক এক পদার্থের সঙ্গে এক এক পদার্থের আকর্ষণ অথবা যোগাবনতি অথবা ঘনিষ্টতা আছে। আবার, পদার্থবিশেষের সঙ্গে পদার্থবিশেষের ঐ আকর্ষণ বা যোগাবনতি বা ঘনিষ্টতার তারতম্য হয়; এমন কি, কতকগুলি পদার্থ কতকগুলি পদার্থের সঙ্গে আদতেই মিলিতে পারে না। রাসায়ন আকর্ষণ হইতে যোগাকর্ষণের ইহাও একটা বিভিন্নতা দেখা যায়। যোগাবনতির অর্থ এক পদার্থের সহিত অপর এক পদার্থের আকর্ষণ—এবং এক পদার্থ অপেক্ষা অন্য পদার্থের সহিত অধিক আকর্ষণ। যথা, গন্ধকের সঙ্গে পারারও যোগ হয়, আবার লোহার সঙ্গে গন্ধকের তাহা অপেক্ষা বেশী যোগ হয়; পারার সঙ্গে গন্ধকের যুক্ত হইবার যে ইচ্ছা আছে, লৌহের সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য তদপেক্ষা অধিক ইচ্ছা আছে।

যেমন বিশেষ বিশেষ পদার্থের পরস্পরের মধ্যে যোগাবনতি আছে, তেমনি বিশেষ বিশেষ পরি-মাণেরও মধ্যে যোগাবনতি আছে দেখা যায়। যদি তিনটী বস্তুকে রাসায়নিক যোগে ফেলা যায়, তবে, যে দুইটী পদার্থের পরস্পরের মধ্যে অধিক যোগাবনতি আছে, সেই দুইটীই মিলিবে, তৃতীয়টী পড়িয়া থাকিবে। যদি হিঙ্গুলের সঙ্গে লোহার জ্বাল দেওয়া যায়, তাহা হইলে হিঙ্গুলের গন্ধক লোহাকে পাইয়া পারাকে ছাড়িয়া লোহার সঙ্গে যুক্ত হইবে; আবার অন্য পদার্থ পাইলে হয় তো লোহাকে ছাড়িয়া তাহার সহিত মিলিবে। রাসায়নিক ক্রিয়ার এই কারিগিরি দ্বারা কোন এক বস্তুতে কি কি বস্তু আছে তাহা আমরা জানিতে পারি। হিঙ্গুল পদার্থে কি কি বস্তু আছে আমাদের যদি জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমরা নানা উপায়ে সেই সকল বস্তুকে পৃথক করিবার চেষ্টা করিব। চেষ্টা করিতে করিতে হিঙ্গুলের সঙ্গে লোহার জ্বাল দিলাম—জ্বাল দিতেই গন্ধকের সঙ্গে লোহা মিশিয়া এক পদার্থ হইয়া গেল, পারা পৃথক হইয়া গেল। তখন জানা গেল যে—উঃ হিঙ্গুলে পারা ছিল। সেই পারাটাকে পৃথক রাখিয়া দিলাম। এখন দেখিব যে হিঙ্গুল হইতে পৃথক হইয়া কোন্ বস্তু আমার প্রদত্ত লৌহের সঙ্গে সংযুক্ত হইল। ইহা দেখিতে গেলে এমন কোন পদার্থ তাহাতে দিতে হইবে, যাহার সহিত লৌহের অধিক যোগাবনতি। এই-রূপ করিলেই সেই পদার্থের সহিত লোহা মিশিয়া যাইবে, গন্ধকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে। তখন সেই পারা ও গন্ধক ওজন করিলেই বুঝিতে পারিব যে, এত পরিমাণ পারা এত পরিমাণ গন্ধকে মিলিয়া এত পরিমাণ হিঙ্গুল হয়।

মনে কর তামার সঙ্গে পারা দিলাম। এই দুইটাকে একত্র খুঁটিলেও ইহারা মিলিত হইবে, আবার জ্বাল দিলেও উভয়ে মিলিত হইয়া আর এক পদার্থ হইবে। আমাদের দেখিতে হইবে যে, পারা ও তামার মধ্যে যে যোগাবনতি আছে, তদপেক্ষা ঐ উভয়ের কোন একটার সঙ্গে অন্য কোন পদার্থের যোগাবনতি কি বেশী নাই? পারায় তামায় যে যোগাবনতি আছে, তদপেক্ষা ক্লোরিনে ও তামায় অধিক যোগাবনতি। এই জন্য ক্লোরিন যোগ করিলে কপরিক ক্লোরাইড (copperic chloride) হইবে, পারা পৃথক হইয়া

পড়িবে। কোন যৌগিক পদার্থের মধ্য হইতে কোন বস্তুকে পৃথক করিতে চাহিলে এমন পদার্থ মিলাইতে হইবে, যাহার সহিত সেই বস্তু যুক্ত হইয়া পৃথক হইয়া পড়িবে; তখন আবার ঐ যুক্ত পদার্থ হইতে আর কোন পদার্থ দ্বারা যেটা আমরা চাই, সেই বস্তুকে পৃথক করিয়া লইতে হইবে। অথবা, একেবারেই এমন কোন পদার্থ দিতে হইবে, যাহার সঙ্গে, আমরা যে বস্তু চাই, তাহার তত যোগাবনতি নাই, যত অন্যটির সঙ্গে। যেমন, ক্লোরিণ ও তামাতে মিলিয়া যে কপরিক ক্লোরাইড হইল, তাহা হইতে আমরা তামাকে তফাৎ করিতে চাহিলে তাহাতে হাইড্রোজেন দিতে হইবে। ক্লোরিণ তামাকে ছাড়িয়া দিয়া হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিবে, তামা পৃথক পড়িয়া যাইবে। তামা ও ক্লোরিণের যোগে প্রথমে যে পদার্থ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার নাম খ দিলাম; আর শেষকালে ঐ ক্লোরিণ হাইড্রোজেনের সহিত মিলিয়া যে পদার্থ হইল তাহার নাম গ দিলাম; এবং যারা হইতে যে তামা স্বতন্ত্র হইয়াছিল তাহার নাম ক দিলাম। প্রথমে দেখিলাম যে, ক-য়ের ওজন এত পরিমাণ ছিল; খ প্রস্তুত হইলে তাহার ওজন এত পরিমাণ বেশী হইল। বুঝা গেল যে, যেটি বেশী হইল, তাহা ক্লোরিণের ওজন। আবার এই পরিমাণ ক্লোরিণ ক-তে যোগ করিয়া যদি ঠিক খ-কে প্রস্তুত করিতে পারি, তবেই পরীক্ষা একেবারে ঠিক হইল। এতক্ষণে রাসায়নিক আকর্ষণের মর্ম আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।

কঠিন পদার্থে কঠিন পদার্থে যোগাকর্ষণ ভাল হয় না, রাসায়নিক আকর্ষণও ভাল হয় না, কারণ পরমাণুসকল কাছাকাছি হইয়া মিলিতে পারে না। এইজন্য অনেক সময়ে পদার্থগুলিকে তরল করিতে হয়। কখনও কখনও খুব গুঁড়া করিলেও কাজ চলে। কিন্তু তরল করিলে, তবে যে যে পরমাণু বা রেণুর সঙ্গে যে যে পরমাণু বা রেণুর সহিত যোগাবনতি আছে, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজিয়া লইতে পারে। যেমন, এই

ক খ গ ঘ ঙ চ

একটি ক অণু সকল রেণুর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; খ-তে গেল কিন্তু মিশিল না; গ-তে গেল মিশিল না। যেই ক কোণেতে

ছ জ ঝ ঞ ট ঠ

ড ঢ ণ ত থ দ

গেল, তখন হয়তো চ-য়ের সঙ্গে মিলিয়া গেল, কেন-না চ-য়ের সঙ্গে উহার চেনা পরিচয় আছে। খ হয়তো দুই পরমাণু না হইলে মিলিতে পারে না, তাই সে হয়তো ড ও চ-য়ের সঙ্গে মিলিয়া গেল। যাহাদের মধ্যে মিল হইল না, তাহাদের মধ্যে বিকর্ষণ হইবে। সে বিষয় পরে বলিব।

যোগাকর্ষণ এমন করিয়া বাছে না। রাসায়নিক আকর্ষণে পরমাণুগুলির পরস্পর সংলগ্ন হওয়া চাই, ভিতরে প্রবেশ করা চাই। রাসায়নিক আকর্ষণ অণুতে অণুতে অত্যন্ত যোগাকর্ষণ। প্রকৃত আকর্ষণই সেই পারমাণবীয় বা রেণবীয় আকর্ষণ। রাসায়নিক আকর্ষণ অপেক্ষা কম পরিমাণের আকর্ষণ যোগাকর্ষণ।

গ ক

ঘ ঙ খ

এই চৌকার মধ্যে নানাবিধ অণু আছে। ক খ গ ঘ ঙ যদি বাছিয়া গুছিয়া মিলিতে পারে তাহা হইলেই রাসায়নিক আকর্ষণ হইল। যথা,—ক খ-তে গেল, ঙ-তে গেল, মিলিল না, কিন্তু শেষকালে ঘ-তে যাইয়া মিলিয়া গেল। যোগাকর্ষণে ক-য়ের গ-তে আসিবার কথা; কিন্তু তাহা না হইয়া ক ঘ-তে আসিয়াই রহিয়া গেল। যদি কোন পরমাণু প্রিয় পদার্থকে দেখিতে পায়, তবেই রাসায়নিক আকর্ষণ হয়, নচেৎ অন্য স্থানে পড়িয়া স্বল্পতর আকর্ষণ যে যোগাকর্ষণ তদ্দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া থাকিয়া যায়। যখন যোগাকর্ষণ খুব প্রবল হয়, তখনই রাসায়নিক আকর্ষণে পরিণত হয়। যথা, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে পাঁচ দিন বোতলে পুরিয়া রাখ, যোগ হইবে না; তাহাদের মধ্যে যোগাকর্ষণ প্রবল করিতে পারিলে জল হইয়া পড়িবে।* যোগাকর্ষণে গুণের পরিবর্তন হয় না বলিয়াছিলাম। ঠিক তাহা নহে। যেমন চিড়ে ও গুড় মাখিয়া খাইলে আর-এক প্রকার আস্বাদ হয় বটে, কিন্তু উভয়েরই পৃথক আস্বাদ চেনা যায়, যোগাকর্ষণের ফলও সেইরূপ হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে রাসায়নিক আকর্ষণের কম পরিমাণের আকর্ষণ যোগাকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণও আর কিছুই নহে, যোগাকর্ষণেরই রূপান্তর। যোগাকর্ষণ নিকটে

* আমার বোধ হয় যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসরূপে থাকাতে গ্যাসের গুণানুযায়ী তাহাদের পরমাণু পরস্পর হইতে দূরে থাকে, সুতরাং তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে না। তড়িৎ প্রয়োগ করিলে পরমাণু সকল আকৃষ্ট হইয়া নিকটবর্তী হওয়ায় পরমাণুর যোগাবনতি অনুসারে রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইবার অবকাশ ঘটে।

নিকটে আকর্ষণ এবং মাধ্যাকর্ষণ দূরে দূরে আকর্ষণ। নিকটে নিকটে আকর্ষণ প্রবল হইবে, দূরে দূরে আকর্ষণ কম হইবে। সেই আকর্ষণ কমবেশী হইবার আবার নিয়ম আছে। * পৃথিবীর আকর্ষণ সমস্তই টানিয়া রাখিয়াছে। এই আকর্ষণ যদি অনেক দূরে দূরে হয়, তবে ইহার গুরুত্ব থাকিবে না। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, যাহার ভার এখানে ৫ সের, খুব উচ্চ পর্ব্বতের উপর তাহা লইয়া গেলে তাহার ভার কমিয়া যায়। আবার আকর্ষণের গুরুত্ব অনুসারেই দ্রব্যের ভার। এই আকর্ষণ কম হওয়াতেই উল্কাখণ্ডসকল প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইয়া এক লোকের আকর্ষণ ছাড়াইয়া অন্য লোকে পতিত হয়; কত উল্কা অন্য লোক হইতে ধাবিত হইতেই পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যে পতিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। পারমাণব আকর্ষণ যোগাকর্ষণেও আছে, মাধ্যাকর্ষণেও আছে, রাসায়নিক আকর্ষণেও আছে। তন্মধ্যে রাসায়নিক আকর্ষণেই উহা সম্পূর্ণভাবে থাকে। একই আকর্ষণ তিন আকার ধারণ করিয়াছে, সেই কারণে উহা তিন নামে খ্যাত হইয়াছে।

ঈশ্বর অণুকে প্রথম সৃষ্ট করিয়া যেমন আকার দিয়াছেন, তেমনি তাহাকে মিলিত হইবার শক্তিও দিয়াছেন। সেই শক্তি অবলম্বনে, যেখানে যে অণু থাকুক না, ক্রমে মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা একত্রিত হইয়া যোগাকর্ষণ ও রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা একই ভাব ধারণ করিতে করিতে প্রথমে উল্কাখণ্ড হয়; উল্কাখণ্ড হইতে হইতেই বৃহদায়তন পৃথিবীরূপে পরিণত হয়। ধূমকেতুর লাঙ্গুল বা ন্যাজ বলিয়া যাহা আমাদের নয়নগোচর হয় তাহা হয়তো পরমাণুরাশি। সেইগুলি ধূমকেতুর তারা কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিয়া উহার সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করে। ক্রমে হয়তো তাহারা উহার তারার সহিত সংলগ্ন হইয়া তারার আয়তন বৃদ্ধি করিতে থাকিবে এবং তাহাকে জীব জন্তুর বাস স্থলের উপযুক্ত করিবে।

ইহা দ্বারা পরমেশ্বরের কি মহতী জ্ঞানশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে তিনি যেমন মহতো মহীয়ান, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, অপরদিকে তিনি আবার অণু হইতে অণু হইয়া পরমাণুর মধ্যে বিরাজ করিয়া প্রতি পরমাণুকে চালাইতেছেন, যোগ করিতেছেন, বিয়োগ করিতেছেন, এবং তাহা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের পরিপাটী রচনা করিতেছেন। যন্ত্রকার কি-বা যন্ত্র প্রস্তুত করে, চিত্রকর কি-বা চিত্র পটে সন্নিবেশ করে, ভাস্কর কি-বা মূর্ত্তি গঠন করে, কবিরা কি-বা কাব্য প্রণয়ন করে, তিনি এরূপ এক আকর্ষণের নিয়ম করিয়া দিলেন যে তাহারই ফলে অনন্ত আকাশ জরির কাজে খোদিত হইয়া গেল, তাহারই ফলে নদ নদী সাগর সমুদ্র পর্ব্বত উদ্যান কানন মেঘ বৃষ্টি শিলা বরফ পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ড সকলই রচিত হইতেছে—নিমেষের তরে বিরাম নাই; আদি-কবির নিকট সকল কবি সকল কারিগর পরাভব প্রাপ্ত হয়।

এই রাসায়নিক আকর্ষণ কোন্ স্থলে খাটিতে পারে না? কঠিন বস্তুসমূহের মধ্যে রাসায়নিক আকর্ষণ খাটিতে পারে না। অতএব রাসায়ন আকর্ষণকে সম্পূর্ণরূপে খাটিতে দিতে চাহিলে যোগাকর্ষণকে প্রথম কম করিয়া পরমাণুদিগকে শিথিল করিয়া দিতে হয়, যাহাতে উহারা ইচ্ছামত নিজের নিজের অংশীদারকে খুঁজিয়া লইতে পারে। ইহার একটা প্রধান প্রতিবন্ধক পরমাণুসমূহের দূরতা। মরুৎ অবস্থায় পরমাণুসকল পরস্পর হইতে দূরে থাকে। তখন উপায় করিয়া তাহাদের মধ্যে যোগাকর্ষণ বর্দ্ধন করিতে হয়। আর একটা প্রতিবন্ধক পরমাণুসমূহের পরস্পরের মধ্যে বিকর্ষণ। তাহাদের মিলিত হইবার ইচ্ছা হইলেই তাহারা মিলিত হইতে যায়, কিন্তু মিলিত হইলেই আবার পৃথক হইতে চায়। যেমন, রেশমের কাপড় দিয়া কাচ ঘসিয়া তাহার পরে তাহার নিকট যদি একটা ক্ষুদ্র পালক ধরা যায়, তাহা হইলে সে প্রথমে আকৃষ্ট হয়; কিন্তু সে যখনি কাচকে স্পর্শ করিল, অমনি আবার তফাৎ হইয়া আসিল। সেইরূপ আকর্ষণ দ্বারা দুই রেণু যুক্ত হইল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যদি বিকর্ষণ প্রবল হয়, তাহা হইলে আর তাহারা মিলিতে পারে না; বিকর্ষণ অপেক্ষা আকর্ষণ বেশী থাকিলেই তাহারা মিলিতে পারে। বিকর্ষণ যদি বি হয়, আর আক-

* তাহা এই অধ্যায়ের শেষে বলা যাইবে।

র্ষণ যদি আ হয়, এবং আ যদি ৫ হয়, বি যদি ৫ হয়, তবে তাহাদের দেখাদেখি মাত্র হয়—তাহারা যে যেখানে আছে, সেইখানে সে থাকিয়া যায়, মিলিতও হয় না, তাড়িতও হয় না। আ যদি ৫ হয়, আর বি যদি ৩ হয়, তাহা হইলে এই অতিরিক্ত আকর্ষণ যে ২ রহিল, এই ২ এর দ্বারা তাহারা মিলিয়া থাকিবে। যদি কাহারও অতিরিক্ত আকর্ষণ ৪ হয়, তবে সে খুব বেশী মিলিয়া থাকিবে।

বিকর্ষণ বাদ দিয়া আকর্ষণের প্রবলতা অনুসারে পদার্থ কঠিন, তরল বা মরুৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিকর্ষণ শক্তি বেশী থাকিলে পরমাণুগুলো কাছাকাছি আসিতে পারে না। তাপ বিকর্ষণের প্রধান কারণ। দুইটী পদার্থ আকর্ষণের মধ্যে আছে। তাহাতে তাপ লাগাইলে বিকর্ষণ বাড়িয়া গেল, তাহারা পৃথক হইয়া গেল। তাপহীনতা আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। সকল বস্তুতেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুই শক্তি আছে। তাহারই কারণে তাহাদের মধ্যে যোগবিয়োগ হয়। তাপ-তড়িৎ বিষয়ক আলোচনায় সময় দেখিবে যে, সকল অণুর ভিতর তড়িৎ থাকে বলিয়াই আকর্ষণ হয় এবং তাপ থাকে বলিয়াই বিকর্ষণ হয়। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ—ইহা অণুর কার্য্য নহে; অণুর সহিত তাপ-তড়িৎ যে পদার্থ আছে, তাহারই ফলে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ হইতেছে।

তবেই বস্তুর সাধারণ গুণ হইল—(১) অণুসমষ্টি, (২) বিস্তৃতি-আকৃতি, এবং (৩) আকর্ষণ-বিকর্ষণ। অনেক গ্রন্থে আরও অনেক সাধারণ গুণের উল্লেখ থাকে—যথা, বিভাজ্যতা, সচ্ছিদ্রতা, স্থিতিস্থাপকতা, নিশ্চেষ্টতা ইত্যাদি। ইহাদিগকে বস্তুর গুণ বলা ঠিক নহে, এ সকল বস্তুর অভাব-গুণ।

ছুটী।

(শ্রীমতী অভ্ররেণু দেবী)

আজকে আমার ছুটি;
বাঁধন যাহা ছিল আমার
গিয়াছে টুটি,
তাইত আমি সকল ছেড়ে
প্রাণটা আমার আমায় বেড়ে
এসেছি ছুটি।
কাজ যে আমার ফুরিয়ে গেছে
পেয়েছি ছুটী।

আজ যে আমার ছুটী;
তোমায় আমায় এই বারেতে
মিলিব ছুটী;
এতদিনের দেখা বিনা
পরাণ আমার থাকে কিনা
বলিব খুঁটি;
বল্‌তে আজি সময় হ'বে
পেয়েছি ছুটী।

আজকে আমার ছুটী;
তাই মুখে হাসি অনেক দিনে
উঠেছে ফুটি';
দেখ্‌বো বলে ডেকে ডেকে
পাইনি তোমায়; এবার থেকে
থাকিব দু'টী—
একটীখানে থাক্‌বো আমি
পেয়েছি ছুটী।

আজকে আমার ছুটী;
দেখবো বলে তোমায় আমোদ
উঠেছে ফুটি';
সেথায় আমার আপন ঘরে
তোমায় আমার আপন করে
থাকিব দু'টী—
চির দিনেও মিলন মোদের
যাবে না টুটি';
কাজ যে আমার ফুরিয়ে গেছে
পেয়েছি ছুটী।

বৈয়াসিক-ন্যায়মালা।

আনন্দময়তা নামক ষষ্ঠ অধিকরণ।

(শ্রীরামচন্দ্রশাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

মূল। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥
বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১৫ ॥

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৬ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৭ ॥

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ১৯ ॥

টীকা। ষষ্ঠাধিকরণমেকদেশিমতেনাহহ—

সংসারী ব্রহ্ম বাঽনন্দময়ঃ সংসার্য্যয়ং ভবেৎ।
বিকারার্থময়টশব্দাৎ প্রিয়াদ্যবয়বোক্তিতঃ ॥২৫॥
অভ্যাসোপক্রমাদিভ্যো ব্রহ্মাঽনন্দময়ো ভবেৎ।
প্রাচুর্য্যার্থো ময়ট্‌শব্দঃ প্রিয়াদ্যাঃ স্যুরুপাধিগাঃ ॥২৬॥

তৈত্তিরীয়কে দেহপ্রাণমনোবুদ্ধ্যানন্দরূপা অন্নময়—প্রাণময়—মনোময়—বিজ্ঞানময়—আনন্দময়সংজ্ঞকাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ ক্রমেণৈকৈকস্মাদান্তরাঃ পঠিতাঃ। তত্র—'সর্ব্বান্তর আনন্দময়ঃ সংসারী পরমাত্মা বা'—ইতি সন্দেহঃ। 'সংসারী' ইতি প্রাপ্তং। কুতঃ 'আনন্দস্য বিকার আনন্দময়ঃ' ইতি ব্যুৎপত্তেঃ সংসারিণি সম্ভবাৎ। অবিকৃতে তু পরমাত্মন্যসৌ ন সম্ভবতি। কিন্তু "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যানন্দময়স্য পঞ্চাবয়বা উচ্যন্তে। অপেক্ষিতবিষয়দর্শনজন্যং সুখং প্রিয়ং। তল্লাভজন্যো মোদঃ। তদ্ভোগজন্যঃ প্রমোদঃ সুষুপ্ত্যাদৌ ভাসমানমজ্ঞানোপহিতং সুখসামান্যমানন্দঃ। নিরুপাধিকং সুখং ব্রহ্ম। প্রিয়াদীনাং পঞ্চাবয়বানাং শিরআদিরূপত্বং প্রতিপত্তিসৌকর্য্যায় কল্প্যতে। পক্ষিত্বেন কল্পিতস্যাঽনন্দময়স্য শিরঃ পক্ষৌ চ ইত্যবয়বত্রয়ং আত্মশব্দেন মধ্যশরীরং চতুর্থাবয়বত্বেনোচ্যতে পুচ্ছমপরভাগঃ প্রতিষ্ঠা পাদৌ অয়ং পঞ্চমোঽবয়বঃ। ন চ নিরংশস্য পরমাত্মনো ঽবয়বাঃ যুক্তাঃ। তস্মাৎ সংসার্য্যেবাঽনন্দময়ঃ।

ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

আনন্দময়ঃ পরমাত্মা। কুতঃ অভ্যাসাৎ "সৈষাঽনন্দস্য মীমাংসা ভবতি" "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" ইত্যাদিনাঽনন্দময়োঽভ্যস্যতে। অভ্যাসশ্চ তাৎপর্য্যলিঙ্গং তাৎপর্য্যং চ বেদান্তানাং ব্রহ্মণ্যেব—ইত্যবোচাম। কিঞ্চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্মোপক্রমাৎ "ইদং সর্ব্বমসৃজত" ইতি সর্ব্বস্রষ্টৃত্বাদিভ্যশ্চাঽনন্দময়ো ব্রহ্ম। ন চ ব্রহ্মণি ময়ট্‌শব্দানুপপত্তিঃ প্রাচুর্য্যার্থত্বসম্ভবাৎ। প্রিয়াদ্যবয়বা অপি বিষয়দর্শনাদ্যুপাধিকৃতা ভবিষ্যন্তি। তস্মাৎ পরমাত্মাঽনন্দময় ইত্যেকদেশিনাং মতং ॥

মূলের অনুবাদ। (ব্রহ্ম) আনন্দময় (শ্রুতিতে) অভ্যাস (পুনরুক্তি) হেতু। ১২। বিকার (বাচী) শব্দহেতু নহে ইহা যদি, নহে—প্রাচুর্য্যহেতু। ১৩। তাহার (আনন্দের) হেতুর নির্দ্দেশকারণেও। ১৪। ইতর (জীব) নহে, যুক্তির সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যের অভাব হেতু। ১৫। এবং মন্ত্রবর্ণে কথিতরূপেই গীত হয়েন। ১৬। এবং ভেদনির্দ্দেশ হেতু। ১৭। এবং কামনা হেতু অনুমানের (প্রধানের) অপেক্ষা নাই। ১৮। এবং তাহাতে ইহার তদ্ (তাদাত্ম্য) যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

টীকার অনুবাদ। ষষ্ঠ অধিকরণ সম্প্রদায়বিশেষের মতে বলা হইতেছে—

আনন্দময় (অর্থে) সংসারী (জীব) অথবা ব্রহ্ম? ইনি সংসারী হইবেন। বিকারার্থ ময়ট্‌শব্দ হেতু (এবং) প্রিয় প্রভৃতি অবয়ব উক্ত হইবার কারণে ॥ ২৫ ॥ অভ্যাস (পুনরুক্তি) এবং উপক্রমাদি হেতু ব্রহ্ম আনন্দময় হইবেন। ময়ট্‌শব্দ প্রাচুর্য্য বোধক (এবং) প্রিয় প্রভৃতি উপাধিগামী ॥ ২৬ ॥

তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-আনন্দরূপ পঞ্চ পদার্থকে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পঞ্চ সংজ্ঞা দিয়া যথাক্রমে পরে পরে বলা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে সর্ব্বশেষোক্ত আনন্দময়, সংসারী (জীব) অথবা পরমাত্মা, ইহাই হইল সন্দেহ। সংসারী, ইহাই পাওয়া যায়। কারণ—আনন্দের বিকার আনন্দময়, এই ব্যুৎপত্তি সংসারী অর্থাৎ জীবের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু অবিকৃত পরমাত্মাতে ঐ ব্যুৎপত্তি লাগিতে পারে না। আরও, "তাঁহার প্রিয়ই মস্তক, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠারূপ পুচ্ছ" এইরূপে আনন্দময়ের পাঁচ অবয়ব কথিত হইয়াছে। অপেক্ষিত বিষয়ের দর্শনজনিত সুখ হইল প্রিয়। সেই বিষয়ের লাভজনিত (সুখ) হইল মোদ। তাহার ভোগজনিত (সুখ) প্রমোদ। সুষুপ্তি প্রভৃতি (অবস্থাতে) প্রকাশমান অজ্ঞানোপাধিক সাধারণ

সুখ হইল আনন্দ। নিরুপাধি বা উপাধিহীন সুখ ব্রহ্ম। প্রিয় প্রভৃতি পঞ্চ অবয়বের মস্তক প্রভৃতি রূপ বুঝিবার সুবিধার জন্য কল্পিত হইয়াছে। পক্ষীরূপে কল্পিত আনন্দময়ের মস্তক ও দুই পক্ষ, এই গেল তিনটী অবয়ব; আত্মা শব্দের দ্বারা মধ্য শরীর চতুর্থ অবয়ব হিসাবে উক্ত হইয়াছে; পুচ্ছ অর্থাৎ অপরভাগ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পাদদ্বয়—ইহাই পঞ্চম অবয়ব। অংশহীন পরমাত্মার অবয়ব বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কাজেই সংসারীই (বা জীবই) আনন্দময়।

এই প্রকার পাওয়া গেলে—

বলিতেছি—আনন্দময় পরমাত্মা। কারণ, পুনরুক্তি আছে, (যথা) "এই সেই আনন্দের মীমাংসা হইতেছে", "এই আনন্দময় আত্মাকে লাভ করে" ইত্যাদি দ্বারা আনন্দময়ই বারম্বার উক্ত হইয়াছে। অভ্যাসও তাৎপর্য্যসূচক এবং বেদান্তের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেতেই (পর্য্যবসিত), ইহা বলিয়া আসিয়াছি। আরও, "সত্য (স্বরূপ), জ্ঞান (স্বরূপ), অনন্ত (স্বরূপ) ব্রহ্ম", এই প্রকারে ব্রহ্মই উপক্রমে বা আরম্ভে উক্ত হওয়া প্রযুক্ত, এবং "এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন" এই মন্ত্রে সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি উক্ত হইবার কারণে আনন্দময় (অর্থে) ব্রহ্ম। ব্রহ্মেতে ময়ট্ শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত নহে, প্রাচুর্য্য অর্থের সম্ভাবনা হেতু। প্রিয় প্রভৃতি অবয়বও বিষয়দর্শন প্রভৃতি উপাধিকৃত হইবে। অতএব পরমাত্মা আনন্দময়, ইহা এক সম্প্রদায়ের মত।

তাৎপর্য্য। তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের যে শ্রুতির উপর এই অধিকরণকে দাঁড় করানো হইয়াছে, সেই শ্রুতিতে "আনন্দময়" শব্দই বিচারের মুখ্য লক্ষ্য হওয়াতে এই অধিকরণকে আনন্দময়াধিকরণ বলা হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিতে দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আনন্দ, এই পাঁচটী পদার্থ যথাক্রমে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচ নামে উক্ত হইয়াছে। এখন সর্ব্বশেষে যে আনন্দময় শব্দ বলা হইয়াছে, সেই আনন্দময় শব্দের দ্বারা সংসারী অর্থাৎ জীব অথবা পরমাত্মা নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন, ইহাই হইল প্রশ্ন। পূর্ব্বপক্ষের মতে "আনন্দময়" শব্দের অর্থে সংসারী অর্থাৎ জীবই বুঝাইতেছে আনন্দ শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয়ের যোগে আনন্দময় শব্দের উৎপত্তিই হইল তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রধান যুক্তি। তিনি বলেন যে ব্যাকরণশাস্ত্রে ময়ট্ প্রত্যয় বিকার বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হয়, যথা মৃন্ময় ঘট—এখানে মৃত্তিকার বিকার হইয়া ঘটাকারে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই মৃৎ-শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় যুক্ত করিয়া ঘটকে মৃন্ময় বলা হইয়াছে। কিন্তু, কি পূর্ব্বপক্ষ, কি সিদ্ধান্তপক্ষ সকল পক্ষই যখন ব্রহ্মকে বিকারহীন বা নির্ব্বিকার বলিয়া স্বীকার করেন, তখন যে আনন্দময় শব্দে আনন্দের বিকার বুঝাইতেছে, সে আনন্দময় শব্দের দ্বারা সেই নির্ব্বিকার স্বভাবশুদ্ধ ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন না। কাজেই পূর্ব্বপক্ষের মতে শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়া উল্লেখ করা কথনই সম্ভবপর নহে।

পূর্ব্বপক্ষ আর একটী যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। উক্ত উপনিষদের আর একটী শ্রুতিতে আনন্দময়কে পক্ষীরূপে কল্পনা করিয়া তাহার পাঁচটি বিভিন্ন অঙ্গ বা অবয়ব উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—"সেই আনন্দময়ের 'প্রিয়'ই মস্তক, 'মোদ' দক্ষিণপক্ষ, 'প্রমোদ' উত্তর বা বামপক্ষ, 'আনন্দ' আত্মা বা কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্যভাগ এবং 'ব্রহ্ম' পুচ্ছ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাভূমি।" একটি পক্ষীর অবয়বকে যেমন পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যাইতে পারে, সেইরূপ পূর্ব্বপক্ষের মতে আনন্দময়েরও পাঁচটী বিভিন্ন অংশ এই শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার মতে আনন্দময়ের প্রিয়, মোদ প্রভৃতি পঞ্চ অবয়ব ঠিকই আছে, কিন্তু সেগুলিকে পক্ষীর মস্তকাদিরূপে কল্পনা কেবল বুঝিবার সুবিধার জন্য করা হইয়াছে এইমাত্র। পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ, উভয়পক্ষের মতে ব্রহ্ম অখণ্ড ও অংশবিহীন। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত করেন যে, শ্রুতিতে উপরোক্ত অংশাত্মক আনন্দময় শব্দ ব্রহ্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে এবং কাজেই তাঁহার মতে আনন্দময় শব্দে সংসারী জীবই বুঝাইতেছে। এই স্থলে টীকাকার আনন্দময়ের উপরোক্ত বিভাগসূচক শব্দগুলির যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা বলা হইতেছে। যে কোন বিষয় বা পদার্থকে দেখিবার জন্য আমরা অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা

করিয়া থাকি, সেই বিষয়কে দেখিলে যে সুখ হয়, তাহাই হইল 'প্রিয়'। সেই বিষয়কে লাভ করিলে যে সুখ হয়, তাহার নাম হইল 'মোদ'। সেই বিষয়কে ভোগ করিতে পারিলে যে সুখ হয় তাহার নাম 'প্রমোদ'। সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ়নিদ্রা প্রভৃতির অবস্থায় যে সুখ অন্তরে ভাসমান থাকে এবং যাহা অজ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং যে সুখ কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান নহে, সেই সাধারণ নির্বিষয়ক সুখের নাম আনন্দ। যে সুখের কোন প্রকার উপাধি নাই, অর্থাৎ কোন কিছুর দ্বারা যে সুখ সীমাবদ্ধ নহে, সেই অখণ্ড সুখের নাম ব্রহ্ম।

পূর্ব্বপক্ষ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলে পর সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে আনন্দময় শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে। সিদ্ধান্তপক্ষ নিজের সিদ্ধান্তের সপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম যুক্তি হইতেছে "অভ্যাস"। কোন একটি বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বা আবৃত্তি করার পারিভাষিক নাম হইল "অভ্যাস"। এইরূপ অভ্যাস বা একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইতেই সন্দর্ভের তাৎপর্য্য সহজেই উপলব্ধ হয়। তৈত্তিরীয়ক উপনিষদেই "এই সেই আনন্দের মীমাংসা হইতেছে" "এই আনন্দময় আত্মাকে লাভ করে" ইত্যাদি শ্রুতিতে আনন্দময়ের কথাই বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত উপনিষদের মধ্যে যদিও উপরোক্ত একটীমাত্র শ্রুতিতে "আনন্দময়" শব্দ এবং অন্যান্য শ্রুতিতে মাত্র "আনন্দ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, উপনিষদে "আনন্দময়" শব্দের সংক্ষিপ্ত আকাররূপেই "আনন্দ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ বৈদিক প্রয়োগের অসদ্ভাব নাই। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আলোচ্য শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য হইল "আনন্দময়"। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে চতুর্থ সূত্রের আলোচনাকালে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে সমগ্র উপনিষদ বা বেদান্তেরই তাৎপর্য্য হইতেছে ব্রহ্ম। কাজেই এই শ্রুতিগুলি সমগ্র উপনিষদের অংশ হওয়ায় ইহাদের তাৎপর্য্য যে সমগ্র বেদান্তের তাৎপর্য্যের বিরোধী হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং উপরোক্ত শ্রুতিতে "আনন্দময়" শব্দের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে।

সিদ্ধান্তপক্ষের আর একটী যুক্তি এই যে, তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের যে বল্লীতে "আনন্দময়"-শব্দ-সংশ্লিষ্ট শ্রুতি রহিয়াছে, সেই বল্লীর উপক্রম বা আরম্ভেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মবাচক শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে। সমন্বয়াধিকরণের চতুর্থ সূত্রের আলোচনায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে উপক্রম ও উপসংহার প্রভৃতি ছয়টী উপায়ের একটী বা একাধিক উপায় অবলম্বনে যে কোন সন্দর্ভের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সিদ্ধান্তপক্ষ এখানে আপাততঃ ধরিতেছেন যে, যখন আলোচ্যবল্লীর উপক্রমে ব্রহ্মকেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন সেই বল্লীর তাৎপর্য্য যে ব্রহ্ম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, যে বল্লীতে উপক্রমেই "ব্রহ্ম" বিষয়ক শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে, সেই বল্লীরই অন্যান্য অংশে "আনন্দময়"-বিষয়ক অনেকগুলি শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই ইহাও দেখিয়া আসিলাম যে উক্ত বল্লীতে বা প্রকরণে পুনঃপুনঃ উক্তির কারণে আনন্দময়ই উক্ত বল্লীর মুখ্য বিষয় এখন আবার দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মই এই বল্লীর মুখ্য বিষয়। এখন, একই সন্দর্ভের দুইটী মুখ্য বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং দাঁড়াইতেছে এই যে, আনন্দময় এবং ব্রহ্ম এই দুইটীর মধ্যে একটীমাত্র আলোচ্য প্রকরণের প্রকৃত মুখ্য বিষয় হইবে। প্রশ্ন এই যে, উহাদের মধ্যে কোনটী মুখ্য বিষয়। যখন ব্রহ্ম হইলেন সর্ব্ববাদসম্মত অসন্দিগ্ধ বিষয় এবং যখন "আনন্দময়" শব্দের প্রয়োগ লইয়াই বিচার চলিতেছে, তখন অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, আলোচ্য প্রকরণের মুখ্য বিষয় হইল ব্রহ্ম এবং "আনন্দময়" সেই ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত অথবা ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন।

সিদ্ধান্তপক্ষ এই সূত্রে আরও বলেন যে, এই বল্লীতেই বা প্রকরণেই "ইদং সর্ব্বমসৃজত" অর্থাৎ ইনিই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন, এই শ্রুতি দ্বারা আনন্দময় যে সর্ব্বস্রষ্টা তাহাই সূচিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মলক্ষণ (২য়) অধিকরণে প্রমাণিত হইয়াছে যে,

সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি একমাত্র ব্রহ্মোতেই সম্ভব হয়। সুতরাং আলোচ্য প্রকরণের "আনন্দময়" শব্দের দ্বারা যে ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, পূর্ব্বপক্ষ ব্রহ্মের প্রতি আনন্দময় শব্দের প্রয়োগসম্বন্ধে এই এক আপত্তি তুলিয়াছেন যে আনন্দ শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয়যোগে আনন্দময় শব্দ হইয়াছে এবং ময়ট্ প্রত্যয় যখন বিকারার্থে প্রযুক্ত হয়, তখন বিকারার্থক আনন্দময় শব্দ নির্বিকার ব্রহ্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে এ যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ ময়ট্ প্রত্যয় কেবল যে বিকারার্থে প্রযুক্ত হয় তাহা নহে, প্রাচুর্য্য প্রভৃতি আরও নানা অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। যথা, অন্নময় যজ্ঞ—এস্থলে অন্নময় শব্দের ময়ট্ প্রত্যয় প্রাচুর্য্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—যে যজ্ঞে অন্নেরই প্রচুর পরিমাণে আয়োজন হয়, সেই যজ্ঞকেই অন্নময় যজ্ঞ বলা হয়। সিদ্ধান্তপক্ষের মতে আনন্দময় শব্দের ময়ট্ প্রত্যয়ও প্রাচুর্য্য অর্থেই অর্থাৎ "যাঁহার আনন্দ প্রচুর" সেই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মের প্রতি আনন্দময়ের প্রয়োগ অসঙ্গত নহে।

পূর্ব্বপক্ষের আর একটী আপত্তি এই যে, "তাঁহার প্রিয়ই মস্তক" ইত্যাদি শ্রুতিতে আনন্দময়কে যখন বিভক্ত করিয়া দেখানো হইয়াছে, তখন যে ব্রহ্ম অখণ্ড ও অবিভক্ত বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত, সেই ব্রহ্মের প্রতি শ্রুত্যুক্ত ঐ আনন্দময় শব্দের প্রয়োগ সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, এই আপত্তিও নিরর্থক। তাঁহার মতে আনন্দময়ের প্রিয়, মোদ প্রভৃতি বিভাগগুলির বাস্তব কোন অস্তিত্ব নাই; সেগুলি বিষয়সমূহের দর্শন, লাভ প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদিগকে উপাধিকৃত বা আরোপিত মাত্র বলা যাইতে পারে। সমগ্র আকাশকে যদি অখণ্ড ধরা যায়, তাহা হইলে ঘটস্থিত আকাশ, গৃহস্থিত আকাশ ইত্যাদি বলা যায় কি প্রকারে? এইখানে আমাদের জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা বা অজ্ঞানের কারণে সমগ্র আকাশকে ঘট, গৃহ প্রভৃতি দ্বারা যেন খণ্ডীকৃত বা পরিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হই। পারিভাষিক ভাষায় বলা যায় যে, এই ঘট, গৃহ প্রভৃতি দ্বারা আমরা আকাশকে উপাধিবিশিষ্ট করিয়া বলি এবং তখন ঘট, গৃহ প্রভৃতিকে আকাশের উপাধি বলিয়া ধরা হয়। সেই প্রকার আনন্দময়ের সুখ বা আনন্দকে অখণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিলেও আমাদের অজ্ঞানের পরিমাণে তাহাকে উপাধিবিশিষ্ট বা সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখি। সেই অবস্থায় আমরা দর্শন, লাভ, ভোগ প্রভৃতি যে যে বিষয়ের উপর দাঁড়াইয়া ঐ আনন্দকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখি, সেই সেই বিষয়কে পারিভাষিক ভাষায় আমরা উপাধি নামে অভিহিত করি। এই ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতে চাহেন যে, যখন পূর্ব্বপক্ষপ্রদর্শিত আনন্দময়ের ভেদগুলি উপাধিকৃত বা উপাধি দ্বারা সঙ্কীর্ণ দেখা গেল, তখন আনন্দময়কে নিরবয়ব অর্থাৎ অখণ্ড বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। শ্রুতিতে ব্রহ্মই যে আনন্দময় শব্দের প্রতিপাদ্য তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছেই। মধ্যে কেবল পূর্ব্বপক্ষ আনন্দময়ের বিভাগের আপত্তি তোলাতে সিদ্ধান্তপক্ষ সেই আপত্তি খণ্ডন করিলেন। এখন সমস্ত আপত্তির নিরাকরণ করিয়া সিদ্ধান্ত পক্ষ তাঁহার এই সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইলেন যে পরমাত্মাই আনন্দময়। ইহাই এক সম্প্রদায়ের মত।

সিদ্ধান্তপক্ষের আরও কয়েকটী যুক্তি যথাক্রমে উল্লিখিত হইতেছে। তন্মধ্যে একটী এই যে, ব্রহ্মই যে আনন্দের কারণ, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের আলোচ্য বল্লীতেই একটী শ্রুতি আছে "এষহ্যেবানন্দয়াতি" অর্থাৎ ইনিই আনন্দ বিতরণ করেন। যিনি নিরানন্দ, যাঁহাতে আনন্দের অভাব, তিনি কখনও আনন্দ বিতরণ করিতে পারেন না। যিনি যে বস্তুর প্রচুর পরিমাণে অধিকারী, তিনিই সেই বস্তু বিতরণ করিতে পারেন। শ্রুতিতে যখন আছে যে "ইনিই অর্থাৎ ব্রহ্মই আনন্দ বিতরণ করেন", তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ব্রহ্মই প্রচুর আনন্দের অধিকারী, অর্থাৎ তিনিই আনন্দময়।

সংসারী জীবকেই আনন্দময় বলিয়া ধরিলে যুক্তিরও অভাব হয়, পূর্ব্বাপর-সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যও থাকে না। ইতিপূর্ব্বে এই অধিকরণের দ্বিতীয়

(জন্মাদ্যস্য যতঃ) সূত্রে স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে যে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপ কার্য্য একমাত্র ব্রহ্মেতেই সম্ভবে। সে কার্য্য জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না। তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের আলোচ্য বল্লীতেও ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই যে আনন্দময়, তাহা সবিশেষ বর্ণন করিয়া পরবর্ত্তী শ্রুতিতেই "সোঽকাময়ত" প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা পরমাত্মার জগৎস্রষ্টৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই, এই শ্রুতিগুলির সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিগুলির সঙ্গতি রক্ষা করিতে চাহিলে ধরিতে হয় যে, পরমাত্মাই বা ব্রহ্মই আনন্দময়। জীবের যখন জগৎস্রষ্টৃত্ব নাই, তখন জীবকে আনন্দময় বলিলে এই সকল শ্রুতির মধ্যে উপপত্তি বা যুক্তি বা সঙ্গতির অভাব ঘটে।

আলোচ্য বল্লীর প্রথমেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া পরবর্ত্তী শ্রুতিসমূহে তাহারই ব্যাখ্যাসূত্রে আনন্দময় শব্দ আনা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলেও ইহা সুস্পষ্ট যে আনন্দময় শব্দ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

আলোচ্য উপনিষদের উপরোক্ত বল্লীতেই দেখা যায় যে, "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দীভবতি।" অর্থাৎ "তিনি রসস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ; এই জীব সেই রসস্বরূপকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়" এই শ্রুতিতে আনন্দময়ের সহিত জীবের স্পষ্ট ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্রুতিতে আমরা দেখিতেছি যে একজন আনন্দদাতা এবং আর একজন আনন্দ-গ্রহীতা রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে আনন্দময় ব্রহ্মই আনন্দ বিতরণ করেন। কাজেই ধরিতে হয় যে এই শ্রুতিতে জীবকেই আনন্দগ্রহীতা বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আনন্দগ্রহীতা জীব আনন্দময় হইতে পারে না, ব্রহ্মই আনন্দময়।

বেদান্তের ভাষ্যকার ও টীকাকারদিগের মতে বেদান্তকার এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া প্রধানত উপনিষদের শ্রুতিসমূহের সাহায্যে স্বমত স্থাপন করিয়া ১৮শ সূত্রের দ্বারা সাংখ্যোক্ত "প্রধানের" জগৎস্রষ্টৃত্ব নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সূত্রের "অনুমান" শব্দের অর্থে ভাষ্যকার সাংখ্যোক্ত "প্রধান" বা "প্রকৃতি" করিয়াছেন। "অনুমান" শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন "অনুমীয়তে যৎতৎ" অর্থাৎ যাহা অনুমানের দ্বারা জানা যায়, যাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। সাংখ্যের "প্রধান" অনুমানগম্য বলিয়া তাহাকে "অনুমান" বলা হইয়াছে। এই অর্থ ধরিয়া ভাষ্যকার এই সূত্রের তাৎপর্য্য দিয়াছেন এই যে, উপনিষদে "সোঽকাময়ত" অর্থাৎ "তিনি জগৎসৃষ্টি করিবার কামনা করিলেন" "স তপোঽতপ্যত" অর্থাৎ "তিনি জগৎসৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টির কামনার কথা থাকাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে এই জগৎস্রষ্টৃত্ব বিষয়ে "প্রধানের" কোনই অপেক্ষা নাই। কারণ, সাংখ্যমতে প্রধান অচেতন, কিন্তু কামনা করা চেতন-ধর্ম্ম; অচেতনের পক্ষে চেতনধর্ম্মের কার্য্য সম্ভব নহে। কাজেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে "প্রধান" আনন্দময় হইতে পারে না, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মই আনন্দময়।

এই অধিকরণের সর্ব্বশেষ সূত্রে ভাষ্যকারের মতে পূর্ব্বসূক্তের মত সমর্থিত হইতেছে। আলোচ্য বল্লীর কয়েকটী শ্রুতিতে আছে যে "সেই আনন্দময়ে জীবাত্মার তাদাত্ম্যযোগ হয়" অর্থাৎ জীবাত্মা সত্যজ্ঞানের দ্বারা প্রতিবুদ্ধ হইলে সেই আনন্দময়ের সহিত তাহার একীভাব হয়। এখন কথা হইতেছে এই যে সমধর্ম্মী না হইলে দুইটী বস্তুর এরূপ একীভাবের সম্ভাবনা থাকে না। জীবাত্মা যে চেতন তাহা সর্ব্ববাদসম্মত এবং "প্রধান" যে অচেতন তাহাও সর্ব্ববাদসম্মত। সুতরাং অচেতন প্রধানের সহিত চেতন জীবাত্মার তাদাত্ম্যভাব সম্ভব নহে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যে আনন্দময়ের সহিত জীবাত্মার একীভাব হইতেছে, সেই আনন্দময়ও চেতনধর্ম্মী এবং সুতরাং সেই আনন্দময় শব্দের দ্বারা "প্রধান" নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। যখন আনন্দময় শব্দের দ্বারা জীব অথবা প্রধান, এই দুইটীর কোনটাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে না, তখন ব্রহ্মই যে আনন্দময় শব্দের প্রতিপাদ্য, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ রহিল না।

(ক্রমশঃ)

স্তোত্র।

(শ্রীরসময় লাহা)

১

জয় বিশ্বনাথ করি প্রণিপাত
তোমার চরণ-প্রান্তে ;
জীবের কল্যাণ করিতে বিধান
এসহে যুগ-যুগান্তে।

২

তোমার চরণ করিয়া শরণ
রাখিয়া তোমাতে লক্ষ্য,
পাই যেন প্রভু—বিচলিত কভু
না হ'য়ে—পরম মোক্ষ।

৩

তুমি মনোদ্যুতি, জীবনবিভূতি
শোভন সরল শিক্ষা ;
মানব-হৃদয় কর প্রেমময়
বিতরি কর্ম্মের দীক্ষা।

৪

তোমার করুণ কিরণ অরুণ
বিনাশি' মোহের ভ্রান্তি,
জ্ঞানের নয়ন করে উন্মীলন
ঘুচায়ে ত্রিতাপ শ্রান্তি।

৫

ভবব্যাধি যত হোক পরাহত
লভিয়া তোমার শক্তি ;
কর আশীর্ব্বাদ, দাও বিশ্বনাথ
তোমাতে অচলা ভক্তি।

রাণাডের-স্মৃতিকথা।

ছাবিংশ পরিচ্ছেদ।

খৃষ্টাব্দ ১৯০০ সেপ্টেম্বর মাস।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

কাপড় ছাড়িয়া আমার শরীরসম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন এবং অনেকক্ষণ থামিয়া আমাকে বলিলেন, "অপরেশানের বিষয় এখন কি করা যাবে? ডাক্তার অনুমানের উপর বলুছেন। খুব ভরসা দিচ্ছেন না বলে' সাহস করে তাঁর কাছ থেকে অপরেশনের সম্মতি নিতে সাহস হচ্ছে না, ভয় হচ্চে।" এই কথা বলিবার সময়, কণ্ঠস্বর মৃদু হইয়া গিয়াছিল এবং কোন প্রকারে মনের আবেগ সম্বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উঁর গলার আওয়াজে একটু আবেগের স্বর আমার কাণে আসিবামাত্র, এই সম্বন্ধে আমার কোন ভয় নাই ইহা দেখাইবার জন্য এবং ওঁকে সাহস দিবার জন্য, আমি একটু হাসিয়া জোর গলায় স্ফূর্ত্তির স্বরে বলিলাম "তাতে কি হয়েছে? এত ভয় কেন? ক্লোরোফর্ম দিয়ে অপরেশন করবে। তাতে কি-কষ্ট আমি ত বুঝ্তে পারিনে। আমাকে দেখ্বার জন্য যদি যাওয়া আসা না করতে পার, মনকে দৃঢ় করে বৈঠকখানাতেই বসে থাক্লেই হল। অপরেশনের ঘরে কেউ যেন না আসে। ডাক্তারণী ব্যতীত আর কাকেও ঐ ঘরে আস্তে দেওয়া হবে না—এইরূপ আমি মিস্-বেন্সকে দিয়ে সকালে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছি। যাই হোক্ না, অপরেশন করতেই হবে। আমার কোন ভয় হচ্চে না। তুমি এই জন্য অনর্থক ভাবনা কোরো না। নিত্যানুসারে কাজ করে যেতে পারলেই আমার বাঁচা সার্থক হবে। নতুবা ধনীলোকের অন্তঃপুরে বস্ত্রাভরণে মণ্ডিত এইরূপ চলৎশক্তি রহিত স্ত্রীলোক আর্ত্তনাদ করতে করতে চুপ করে বসে আছে, আর তার সেবা শুশ্রূষার জন্য দু' চার জন লোক নিযুক্ত রয়েছে—সেরকম ধন-ঐশ্বর্য্য আমাদের নাই। তা অপেক্ষা যদি আমার ব্যামো একেবারেই ভাল না হয়, তাতেও ক্ষতি নাই।" তখন উনি বলিলেন—"এই রকম পাগলামির কথা আপনার মাথার মধ্যে পুরে কেন আপনাকে কষ্ট দিচ্ছ? আপনারই জেদ কি তুমি বজায় রাখ্বে! অন্যের মনে কি হচ্চে সেটাও তো একটু ভেবে দেখ্তে হয়। চুপ্‌চাপ্ করে পড়ে থেকে কিংবা একজায়গায় বসে যদি আজ অপরেশনটা এড়ান যায় তাহলে সেটা কি ভাল না? বাড়ীর মধ্যে ঘোরা ফেরা করে নিজের হাতে কাজ না হলেও, বসে-বসে সমস্ত বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া লেখা পড়ায় তুমি ত বেশ আমোদ পেতে পার। কেদারায় বসে দুজন লোক সেই কেদারা নীচে নিয়ে গেলেই গাড়ী করে' বাহিরে বেড়াতে যেতেও পারা যাবে। আমার এই ভাল মনে হয়। তুমি যদি ভাল করে ভেবে দেখ, তাহলে আমি যা বল্‌চি তোমারও তাই ঠিক্ মনে হবে। মিছামিছি জেদ্ করে' আপনার প্রাণকে সংশয়ের মধ্যে রেখে কি হবে?" এই রকম কথাবার্ত্তা যখন চলিতেছিল তখন আমি ওঁর মুখের দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়াছিলাম; তাই বাক্য বলিবার সময় ওঁর মনের অবস্থা কিরূপ হইতেছিল, তাহা হুবহু আমার সামনে থাকায় আমার অন্তঃকরণে কি একটা ভাব আসিয়া আমার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল; এবং তখনই

উনি কিছু বলি বলি করিতেছেন এমন সময়ে চোপ্‌দার আসিয়া ওঁকে বল্লিল, "মিস্‌-বেল্সন্ নীচে এসেছেন ও আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্চেন।" তখন উনি বল্লিলেন, "তাঁকে উপরে নিয়ে এসো, আমি বাহিরে যাচ্চি।" এই কথা বলিয়া উঠিতে উঠিতে আমাকে বলিলেন—"আমি এখনি আস্‌চি, তুমি মনে মনে একটু ভেবে দেখো।" উনি বাহিরে যাইবার পর, মিস্‌ বেল্সনের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিল। কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া লইবার জন্য ননদকেও উপরে ডাকা হইয়াছিল। তারপর তাঁরা সকলে কি বলিলেন আমি তাহা জানিতে পারি নাই। কিন্তু শেষে অপরেশান করাই স্থির হইল। কারণ কথাবার্ত্তা শেষ হইলে ডাক্তারণী ভিতরে আসিয়া এক ঔষধ পান করিবার জন্য আমাকে দিলেন এবং "এখন রাত্রে কিছু খেও না। একটু দুধমাত্র খেতে পার। কিন্তু সকালে আদপে দুধ কিংবা চা খাবে না" এই কথা আমাকে বলিলেন। আমি 'আচ্ছা' বলিয়া ঔষধ পান করিলাম এবং তিনি চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে উনি আবার আমার নিকট আসিয়া বসিলেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটি কথাও হইল না। আহার প্রস্তুত এই কথা জানান হইলে, আমার সেইদিন খাওয়া নিষেধ জানিতেন; তাই একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। আহারের পরেও আমার কাছে আসিয়া বসিলেন। আমার হাত আপনার হাতে লইয়া কি একটা যেন চিন্তা করিতেছিলেন, এবং দৃষ্টি কোন এক দিকে নিবদ্ধ ছিল। এইভাবে কত সময় কাটিয়া গেল তাহা আমরা দুজনেই জানিতে পারি নাই; কিন্তু ঘড়িতে ১২টা বাজিবামাত্র, উনি কয়টা বাজিল বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২টা বাজিয়াছে জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ঘড়ি কি ঠিক আছে? ঘড়ি বোধ হয় এগিয়ে চলচে। আজ রোজকার ১০॥০টা কি করে কাট্‌ল?" তখন আমরাও সকলে আশ্চর্য্য হইলাম। কিন্তু এর-থেকে মনে হইল, রোজ রাত্রি ১০॥০টার সময় নিয়মিত যে অসুখটা হয় তাহা নিশ্চয়ই 'অর্গ্যানিক' নহে—তাহা 'নর্ভস্'। আজ ওঁর লক্ষ্য এদিকে ছিল না, বলিয়া সময়টা আসিলেও ওঁর রোজকার অসুখটা আর দেখা দেয় নাই; এই কথা মনে হওয়ায় আমার খুব ভাল লাগিল। আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আপনার খাটে উনি শুইয়া পড়িলেন। কেবল, এক বালিশ হইতে আর এক বালিশের উপর গিয়া পাশ ফিরিতেছেন এবং নিত্যানুসারে কিন্তু আজ একটু বেশী উদাসভাবে 'রাম রাম' এই শব্দ মধ্যে মধ্যে উচ্চারণ করিতেছেন শুনা যাইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া এবং গত দুই চারি দিন হইতে ওঁর মনের বর্ত্তমান অবস্থা ও সন্ধ্যাকালের কথা যাহা খুব কষ্টে চাপিয়া থাকিলেও এক-একবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা রকমে অল্প অল্প বাহির হইয়া পড়িতেছিল—এই সমস্ত স্মরণ করিয়া আমার মন আবেগে পূর্ণ হইল। এবং আমি কান্না কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না। কাল আমি চলিয়া গেলে ওঁর অসহ্য দুঃখ হইবে। মন অত্যন্ত উদাস ও খিন্ন হইবে। ওঁর নিজের কোন বিষয়ই উনি আজ পর্য্যন্ত কখনই দেখেন নাই। কোন্ সময় কি চাই, আমিই মনে করিয়া তাহা করিয়া আসিতেছিলাম; এখন তাহা কে করিবে? রাত্রে কোন-কিছু হইলে তাহা কে জানিবে? বাড়ীর সকল লোকই ভাবনা চিন্তায় মগ্ন; উনি কোন কথা উচ্চারণ করিলে ওঁরা কি শুনিতে পাইবেন? এইরূপ সন্দেহের মধ্যে থাকিলে আমার কি কষ্টের অবস্থাই হইবে। ইহা অপেক্ষা একটু ভাল না হইলেও, খাওয়ান দাওয়ান, ঔষধ দেওয়া, গা-মাথা টিপিয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজ আমি ছাড়া আর কেহ করিলে ওঁর পছন্দ হয় না। আজ তিন চার মাস ওঁর অসুখই চলিতেছে। কিন্তু এই সময় আমি চলিয়া গেলে তাহাতে খারাপটা কি হইবে! এতটা সুখ ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করা সার্থক হইবে এবং সকলে ধন্য ধন্য বলিবে। ইহাই আমি ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। সংসারের মুখ্য সুখের উপাদান যে অপত্য তাহা আমাদের আদৌ নাই তবু আমরা দুজনেই এই অবস্থাতেও আনন্দে আছি। কখন বিষণ্ণ হই নাই কিংবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ি নাই। বরং সেই সন্তানের অভাব পূরণ করিবার জন্য আমরা বন্দোবস্ত করিয়াছি। তখন, আমাদের এই বর্ত্তমান অবস্থায় কিছু বদল না করিয়া শেষে আমাকেই ঈশ্বর আগে লইবেন এই বিশ্বাস আমি আজ পর্য্যন্ত পোষণ করি নাই কি? কারণ আমাদের মধ্যে কুলীনের ঘর ছাড়া ওঁর সহিত মিলন ঘটিবার যোগ্য রূপ, রং গুণ কিংবা বিদ্যা—ইহার কিছুই আমার ছিল না; কেবল পরমেশ্বরের কৃপাপ্রসাদে ওঁর সহিত চিরজন্মের মিলন ঘটিয়া আমার জীবন ধন্য হইয়াছে। এই মিলন আমরণ স্থায়ী হইবে, ইহাই আমার সম্পূর্ণ আশা ও ভরসা।" এইরূপ ভাবে যখন আমি মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম সেই সময়, পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যাকালে আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে ওঁর মুখ হইতে "অন্যের মনে কি হচ্চে তার একটু চিন্তা করে দেখবে" এই বাক্য যাহা বাহির হইয়াছিল এবং আস্তে আস্তে উচ্চারিত হইলেও তাঁহার কণ্ঠস্বর যেরূপ আবেগে গদগদ হইয়াছিল এবং তাঁহার বিষণ্ণ মুখ—এই সমস্ত আমার মনে পড়িল; তাঁহার সেই বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত আমার এই চিন্তার যখন তুলনা করিলাম, তখন আমি বিস্মিত হইলাম, এবং আপনার

উপর একটু ধিক্কারও হইল। আমি গেলে ওঁর মনের অবস্থা কিরূপ হইবে আমার মনে আসিবামাত্র আমি বিহ্বল হইয়া পড়িলাম এবং আমার মনে হইল যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনের দুঃখ সহিতে হইবে, এইরূপ যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয় তবে ওঁর জন্য আমিই দুঃখ সহিব। কিন্তু আমার জন্য ওঁর যেন কোন দুঃখ না হয়। সেই কোমল মনে দুঃখ একেবারেই সহ্য হইবে না। স্ত্রীর প্রকৃত ব্রতই এই যে, তাহার প্রিয় পতি কোন বিষয়েই দুঃখ না পান। আমরণ ইহাই তাহার ইচ্ছা এবং ছোট বড় সকল বিষয়েই ঐ দিকে তাহার চেষ্টা হইয়া থাকে। ইহা স্ত্রীলোকের প্রকৃত সৌভাগ্য এবং ইহাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ব্রত। যে স্ত্রী, পতির অন্তঃকরণ ভাল করিয়া চিনিয়াছে এবং অপরিসীম প্রেমের মূল্য জানিয়াছে, "আমি মরিলাম, জগৎও ধ্বস্ত হইল" এইরূপ স্বার্থপর চিন্তায় তাহার মনের শান্তি কি করিয়া হইবে? এইরূপ ভাবিয়া আমি মনে মনে ঈশ্বরচিন্তা করিতে লাগিলাম। উনি শয্যা হইতে উঠিয়া আমার খাটের কাছে আসিয়া বসিলেন। এবং রাত্রে কেমন্ ঘুম হইয়াছিল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও শান্তভাবে উত্তর দিলাম—"বেশ ঘুম হয়েছিল," উনি আধঘণ্টাকাল সেইখানে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু অপরেশনের কথা কিংবা অন্য কোন কথাই হইল না, কিংবা আমার সম্মুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবেন না এইরূপ যেন মনে মনে স্থির করিয়াছেন বোধ হইল। কিন্তু মনের এই চাপিয়া রাখা অবস্থা বেশীক্ষণ টিকিবে না এইরূপ মনে করিয়াই— কিংবা কে জানে কি জন্য, উনি একেবারেই আমার কাছ থেকে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এটা আমার একটু ভালই লাগিল; কারণ, গোড়ায় শান্তভাবে থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াও উনি আসিয়া আমার বিছানায় বসিবামাত্র, ওঁর সঙ্কল্পের বাঁধ ভাঙ্গিয়া, অন্তকরণ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। উনি উঠিয়া গেলে পর আমি কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া ১০।২০ মিনিট চুপ্ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। এই প্রকারে যতটা সম্ভব মন একটু ছাড়ান পাইয়া একটু সুস্থির হইল। সত্য বলিতে গেলে, গোড়া হইতেই অপরেশান করান সম্বন্ধে উনি সর্ব্বপ্রকারে অসম্মত থাকায় আমিও উহার খুব বিরোধী হইয়াছিলাম। এখন আবার আমার মন কেন উহাতে সায় দিল তাহা আমি বুঝিতে পারি না। যাক্। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া উনি আমার নিকট আসিয়া বসিলেন। তারপর ঐখানেই চা খাইলেন। কিন্তু পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকা ছাড়া, কথা কহা প্রভৃতি কিছুই হয় নাই। কেবল উনি কি একটা কথা বলিবেন বলিয়া ভাবিতেছেন মনে হইল। কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। ইতিমধ্যে, পুণা হইতে রাঘোপন্ত নগরকার আসিয়াছেন চোপদার আসিয়া খবর দিল। তাহা শুনিয়া নীরবে উঠিয়া উনি বাহিরে চলিয়া গেলেন। অপরেশান করা স্থির হইলে, উনি মিত্রমণ্ডলীর মধ্যে কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে চান বলিয়া আমার ননদ রাঘোপন্ত নগরকারকে বোম্বায়ে আসিবার জন্য লিখিয়াছিলেন, তাই তিনি ঠিক সেই দিনই আসিয়াছিলেন। দশটা সাড়ে দশটার সময় অপরেশানের বন্দোবস্ত ঠিক্ঠাক্ করিবার জন্য দুই জন লোক আগে আসিয়াছিল। তাহারা বলিল, মিশ-বেন্সন্ এবং আর এক ডাক্তারণী বারোটার সময় আসিবেন। এই সংবাদ শুনিয়া উনি স্নান ও আহার করিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিলেন। সেই সব অভ্যাগত লোকেরা আহার করিতে বসিলে পর, মিশ-বেন্সন ও অন্য ডাক্তারণী আসিলেন। তখন আমি মিশ-বেন্সনকে অন্তরালে বলিলাম যে, "নীচে সকলে আহার করিতে গিয়াছেন, তাঁদের ফিরিয়া আসিবার পুর্ব্বেই তুমি আমাকে ক্লোরোফর্ম্ম দিয়া অপরেশান সুরু করিয়া দেও।" তিনি বলিলেন, "অনুমতি না নিয়ে আমি কেমন করে আরম্ভ করব? হয়ত রাগ করবেন।" তখন আমি বলিলাম—"এই সময় কেন জিজ্ঞাসা করা হয় নি, উনি বুঝতে পারবেন এবং রাগ করবেন না। এই জন্য আমি বল্‌চি আমার কথা শোনো, যত শীঘ্র পার কাজ শেষ কর। ওঁরা সবাই উপরে আসিলে কাহারই সাহস হবে না। মিথ্যা একটা গণ্ডগোল হয়ে তোমার সময় বৃথা নষ্ট হবে। এই জন্য শীঘ্র শেষ কর। উনি যদি কিছু বলেন তখন আমি জেদ করেছি বলে আমার নাম কোরো। তার পর আর কি হবে?" এই কথা শুনিয়াই তিনি ক্লোরোফর্ম্ম তৈয়ারী করিতে বলিলেন। ক্লোরোফর্ম্ম দেবার জন্য দুই জন স্ত্রীলোক সঙ্গে আসিয়াছিল। তারা একটু পরেই, সব তৈরী আছে এইরূপ বলায় মিস্-বেন্সন আমাকে শুইতে বলিলেন। আমি মনে মনে ওঁকে ও ঈশ্বরকে নমস্কার করিয়া শান্ত মনে শুইলাম এবং তাহার পর তাঁহার সেই দুই স্ত্রীলোক আমাকে ক্লোরোফর্ম্ম দিল। ডাক্তার কৃষ্ণবাই কেল্‌কর সেই সময় ডাক্তারীতে পাশ না হইলেও শেষ বৎসরের ছাত্রী হওয়ায় সাহায্য করিবার জন্য মিস্ বেন্সনের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। ক্লোরোফরমের কাজ আরম্ভ হওয়ায় অজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে আমার মনে হইল, ওঁর অনুমতি লইয়া এবং ওঁকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমি টেবিলের উপর আসি নাই এই কথা আমার মনের ভিতর থাকিয়া যাইবে। তাহা হইলেও, আমার মনের

কথা উনি নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম; পৌনে দুই ঘণ্টার পর অপরেশান শেষ হইলে এই ৩।৪ জন স্ত্রীলোক টেবিল হইতে উঠাইয়া আমাকে খাটে রাখিবার জন্য লইয়া গেল, তখন আমার প্রথম জ্ঞান হইল এবং ওঁকে ডাকিতে বলিলাম। তদনুসারে উনি আসিয়া এবং অনেকক্ষণ ঐখানে বসিয়া—"এখন আর ভয় নেই অপরেশান হয়ে গেছে, আমি তোমার কাছ থেকে যাচ্ছিনে, এইখানেই বসে থাকচি প্রভৃতি কথা সাহস দিবার জন্য বলিয়া সেইখানেই খাটে বসিয়া রহিলেন। আমি ওঁর দুই হাত আমার হাতে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখিলাম, কিন্তু আধাআধি জ্ঞান হওয়ায় আমার কথা ফুটিল না। কয়েক ঘণ্টার পর একটু ভাল বোধ করিলাম এবং বেশ জ্ঞান হইল। তারপর আমি দুগ্ধ পান করিলে পর উনি বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন। পরে আমি তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিছানাতেই পড়িয়া রহিলাম। খাটের উপর বা কেদারায় বসিবে না, এইরূপ বেন্সন বলিয়া গেলেন।

এইখানে বলিবার মতো একটা বিশেষ কথা এই যে, জুলাইমাস হইতে, রোজ রাত্রি দশটা ও সাড়ে দশটার মধ্যে যে (Spasm) তড়্‌কা আসিত, তাহা, আমার অপরেশানের দিন হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত আদপেই আসে নাই; সেইজন্য আমাদের দুজনার ও বাড়ীর সকলেরই ভাল মনে হইল, কিন্তু এই ভাল মনে হওয়া পূরা এক সপ্তাহও টিকিল না। এই সময় দেওয়ালীর ছুটি হওয়ায় উনি আমার নিকট আসিয়া মাথেরাণে যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। আসবাব-পত্র, পাচক, ও ব্রাহ্মণীকে আগে পাঠাইয়া দিয়া তারপরদিন মিস্ বেন্সন আসিলে পর, তাঁকে উনি বলিলেন—"কাল থেকে আমার তিন হপ্তা ছুটি আছে, এই ছুটিতে আমি এঁকে লইয়া মাথেরাণে যাব বলে মনে করেছি। সঙ্গে যে ঔষধপত্র দিতে হবে তা লিখে দেও এবং আর কি কি করতে হবে আমাকে বল।" তখন তিনি বলিলেন—"আরও ১৫ দিন এঁকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে না। আজ পর্য্যন্ত যে সব ব্যবস্থা চলচে, কিছুদিন সেই রকমই চলা চাই।" এই কথা শুনিয়া উনি বড়ই নিরাশ হইলেন। তাহা দেখিয়া আমারও খারাপ লাগিল, কিন্তু কোন উপায় ছিল না। লোকজন ও জিনিসপত্র পূর্ব্বদিনে আগেই পাঠান হওয়ায় এখন তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে বলা ভাল দেখায় না এইজন্য উনি আগে যাইবেন এবং আমি ১০।১২ দিন পরে যাইব স্থির হইল। "গত মাসে ১৫ দিনের জাগরণে ও ভাবনা চিন্তায় অবসন্ন মন যাতে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠে, সেইজন্য এই সময়ে তোমায় যেতেই হবে আমি যত শীঘ্র পারি পরে যাব" এইরূপ বলিয়া খুব আগ্রহ প্রকাশ করিলে, উনি যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তারপরদিন দুপরের সময় ভাউজীকে লইয়া উনি মাথেরাণে চলিয়া গেলেন। তারপর ৮।১০ দিন হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিন কুশল সংবাদের পত্র চালাচালি হইতেছিল। ৩।৪ দিন পর এক পত্র আসিল। তাহাতে লিখিয়াছেন—পূর্ব্বের ন্যায় আবার তড়্‌কা আসিতে আরম্ভ হয়েছে, ঠিক সেই সময়েই আসে ও পূর্ব্বের মতোই ১৫।২০ মিনিট টিকিয়া থাকে। ইহা পড়িয়া আমাদের সকলেরই খুব ভাবনা হইল এবং যত শীঘ্র পারি দুই ছেলেকে লইয়া যাইব মনে করিলাম। ছেলেদিগকে না লইয়া গেলে ওঁর সময় কাটিবে না; ছেলেরা সেখানে থাকিলে উনি আমোদে থাকিবেন ও ভাল বোধ করিবেন, এইরূপ ভাবিয়া, মিস্ বেন্‌সন্ যখন আমার নিকট আসিলেন তাঁহাকে বলিলাম, "ওঁর শরীর ভাল নেই। আজ একমাস যে ব্যামো থেমে ছিল, সেই ব্যামো ওঁর আবার হয়েছে; তাই আমি আর এখানে থাকতে পারব না। আমার ব্যামোর একটু কসুর থাকলেও কোন চিন্তা নেই। আমি পরে ঔষধ খাব, কিন্তু এখন ছেলেদের নিয়ে আমার যাওয়া চাই। ঔষধের কোন গুলি বা বটিকা—যা বিনা হাঙ্গামে খাওয়া যায় এমন যদি কিছু থাকে ত আমাকে দেও। নৈলে আপাতত কিছুই চাইনে, আমার মন অস্থির হয়েছে, তাই আমি কালই যাব স্থির করেছি।" এই মতানুসারে ননদ ও শাশুড়ীঠাকরুণের মত লইয়া, তারপরদিনই দুই ছেলেকে লইয়া মাথেরাণে গেলাম। Spasm যাহা আবার সুরু হইয়াছিল, গিয়া দেখিলাম সেইরকম এখনও চলিতেছে। কিন্তু আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম সধু ও নাথু যাওয়ায় তাঁহার বেশ আমোদ হইল। চিরঞ্জীব নাথু ৫।৬ বৎসরের ছোট ছিল, এবং সধুর বয়স এখন ১১বৎসর পূরা হইয়াছিল। সে "আলেকজান্ড্রা হাইস্কুলে" তৃতীয় আদর্শ পাঠ পড়িতেছিল। তাহার সমস্ত মারাঠী পাঠাভ্যাসে ঘরে মাষ্টার রাখিয়া পড়ান হইত। সে খুব বুদ্ধিমতী, চালাক-চতুর, সুশ্রী ও গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী; তাই উনি সর্ব্বদাই তার প্রশংসা করিতেন এবং সেও মনের সহিত ওঁকে ভালবাসিত। তার ভালমানুষী স্বভাব বলিয়া উনি যখন তখন ওর পক্ষ লইতেন; আমি তার উপর রাগ করিলে উল্টে উনি আবার আমার উপর রাগ করিতেন। চিরঞ্জীব নাথুর স্বভাব দৃঢ়, সাহসী, গরম-মেজাজী কিন্তু খুব দৃঢ়সঙ্কল্প ও অভিমানী; খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া চার বৎসর বয়স হইতেই ও লিখিতে পড়িতে সমর্থ হইয়াছে। সেইরূপ সে কবিতাও সুন্দর আবৃত্তি করে। সর্ব্বাপেক্ষা সে গল্প শুনিতে ও গল্প বলিতে ভালবাসে। সে একবার

যে গল্প শোনে তাহা নিভূ'ল করিয়া বলিতে পারে। বাড়ীতে কোন ছেলে বা মেয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেই "একটা গল্প বল" এইরূপ ছেলেমানুষের মতন আব-দার করিত। সেইরূপ. আবার, নিজের গল্প অন্য সকলের চেয়ে ভাল, ওর গল্পের চেয়ে আর কারও গল্প ভাল নহে এইরূপ ছোট বেলা হইতেই তাহার ধারণা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল; অন্য কোন ছেলের ভাল ও নূতন গল্প হইলেও এবং আপনার খারাপ ও পুরানো গল্প হইলেও সে চটিত না। বরং "আমার ভাল ও তোমার খারাপ" এইরূপ বলিয়া অন্য ছেলেদের রাগাইয়া দিয়া হাসিত। এইরূপ ওর স্বভাব দেখিয়া ওঁর বেশ মজা লাগিত। যাক্। রোজ আহারের পর দুই বেলাই ছেলেদের লইয়া বসিতেন। সখুর ইংরাজি ও মারাঠী পাঠ লইতেন। তাকে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাকে দিয়া গান করাইতেন, নামুকে দিয়া কবিতা আবৃত্তি করাইতেন, গল্প বলাইতেন। এইরূপে ওঁর অনেকটা সময় কাটিত। বৈকালের জলযোগ ও চা সখুকে তৈয়ারী করিতে বলিতেন। সে সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছে কি না তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, "খুব সুন্দর হয়েছে, পরিষ্কার হয়েছে" এইরূপ বলিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইতেন। "ও খুব সুশীলা স্ত্রী হবে, তুমি সমস্ত দিন এই কথা ওকে বল, কিন্তু কাল ও তোমাকে শেখাতে আরম্ভ করবে," এইরূপ উনি আমাকে বলিতেন। এইরূপে ছেলে মেয়ে দুই জনের কাছেই আমোদে অনেকটা সময় কাটিয়া যাইত। বাকী সময়, বোম্বাই হইতে যে সকল পুস্তক আনিয়াছিলেন তাহা ভাউজী ওঁকে পড়িয়া শুনাইত। এই প্রকারে ছুটির দিন মাথেরাণে কাটাইয়া আমরা বোম্বায়ে ফিরিয়া আসিলাম।

মাথেরাণে ওঁর মনের যেরূপ স্ফূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল, বোম্বায়ে আসিয়া তাহা আর রহিল না। বোম্বায়ে আসিয়া এই রোগ আবার কেন সুরু হইল, এই সম্বন্ধে ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তাহা না হইলে কি কারণে হইয়াছে তাহা আমরা আপনারাই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিব—এইরূপ ওঁর মনের ঝোঁক হইল। "আমার রোগের নাম তোমরা কি দেও" এইরূপ দুই তিন ডাক্তারকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তাঁহারা ঠিক্ উত্তর দিলেন না; ইহাতে করিয়া ওঁর মনে হইল, ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা রোগের নামটা বলিতেছেন না। তখন, আর কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজের রোগটা কি, ও তার নামটা কি, তাহা নিজেই অনুসন্ধান করিবেন এইরূপ স্থির করিয়া মেডিক্যাল কালেজ হইতে কতকগুলি পুস্তক আনাইয়া সে সমস্ত পড়িয়া দেখিলেন। এক দিন সন্ধ্যাকালে আমাকে ডাকিয়া এটা ওটা কিছু কথা বলিতে বলিতে, বিষ্ণুপন্থ-রাণাডে নামক নিজের এক পুরাতন বন্ধুর কথা আমাকে বলিলেন যে, "প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপন্থ-রাণাডে নামে আমার এক পুরাতন মিত্র এখানে ছিলেন। তাঁর সুন্দর স্বভাব, শান্ত ও উদার বুদ্ধি ছিল। সেইরূপ আবার তাঁর দেহও লম্বা চৌড়া ও বলিষ্ঠ ছিল। তাঁর কোন খারাপ অভ্যাস বা আসক্তি কিছুই ছিল না। একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি Angina Pectoris নামে এক রোগে আক্রান্ত হন। পরে তা তিন বৎসর ছিল, কিন্তু কোন্ সময় কি হবে, তার কোন নিয়ম ছিল না। এই জন্য যতটা সম্ভব বাড়ীতেই বিছানায় পড়ে সময় কাটাতেন। পড়াশুনা কিংবা ঐ রকম কিছু করে কিছুক্ষণ সময় কাটানো যেতে পারে, কিন্তু শ্রমের কাজ একেবারেই কিছু করবে না এইরূপ ডাক্তার তাঁকে বলিয়া রাখায়, তিনি প্রায় বাড়ীতেই বসিয়া থাকিতেন। বাহিরে কোথাও যাইতেন না। খুব আবশ্যক না হইলে, তিনি কখনই একলা থাকিতেন না। কেহ-না-কেহ তাঁর কাছে সর্ব্বদাই থাক্‌ত। এই রকম করে খুব সাবধানে থেকেও শেষে বহির্দ্দেশে যাবার সময় সেইখানেই তাঁর সব শেষ হয়ে গেল। এইরূপ মানুষের কখন্ কি হয় তার ঠিকানা নেই।" এই কথা শুনিয়া আমার ভারী আশ্চর্য্য মনে হইল এবং আমি বলিলাম, "এ কথাটা কেন বলা হল? নিজের রোগের সঙ্গে এর কি কোন সম্বন্ধ আছে?" তখন উনি বলিলেন,—"পাগলের মত তুমি ও কি-কথা বলছ? সম্বন্ধ কেন থাকবে? কথা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়লে তা কি পরস্পরের কাছে সহজভাবে বলা যায় না? তবে, একথা কেন জিজ্ঞাসা করলে? একটা কথা মনে পড়ায় সহজভাবে তুমি শুনবে বলেই তোমাকে বলেছিলুম। দিনকে-দিন তোমার এই তর্ক করা স্বভাব বেড়েই চলেছে, তোমার সঙ্গে কোন কথা কওয়াই মুস্কিল।" আমি বলিলাম, আমি কি সকল বিষয়েই তর্ক করি? আজ পর্য্যন্ত তোমার কি কোন ব্যামো হয়নি? দুই এক বৎসর অন্তর এই রকম কোন-না-কোন ব্যামো চলেইচে। এই অবস্থায়, এইবারকার রোগ সম্বন্ধে তুমি কি বুঝেছ তা কে জানে? প্রত্যেক বিষয়ে নিরাশার উচ্ছ্বাস-উক্তি ও বিষণ্ণভাবের আচরণ দেখে ভাল মনে করব কি করে? আমার ভাল মনে করা না করা দূরে থাক্, কিন্তু রাত্রি-দিন এই রোগের চিন্তাই করলে তোমার শরীরের উপর কি ফল হবে বল দেখি? প্রথম প্লেগের সময়ে এর চেয়েও ভাবনার মতো রোগ হয়েছিল। তখন আমার খুবই ভয় হয়েছিল। দুই মাস একেবারে অন্নে রুচি

ছিল না ও নিদ্রা একেবারেই চলে গিয়েছিল। তবু শুধু মহাবলেশ্বরে যাবার দরুণ সেখানকার হাওয়ায় এক হপ্তার মধ্যে কত ভাল বোধ হল। তার চেয়ে এখনকার রোগ কিছু বেশী নয়। কি একটা মনে করেছ, তাই ডাক্তারের কথাও তোমার ঠিক বলে মনে হচ্চে না, তার এখন কি করা যাবে?" আমার এই কথা শান্ত-ভাবে শুনিলেন এবং বলিলেন যে, "সেরূপ কিছু নয়, মনে আবার কি করেছি? আজ দুপরে পুস্তকগুলায় কোন এক রোগ সম্বন্ধে পড়েছিলুম, তাই এই কথাটা মনে পড়ল, তাই তোমাকে বল্লুম। আজ সকালে সংবাদপত্র আমার পড়া হয়নি। তাতে বিশেষ কি আছে তা দেখে রেখো ও খাবার সময় আমাকে বোলো।" এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি তাহা আমি বুঝিলাম এবং এইরূপ বিষয়ের চর্চ্চা বেশী না হইলেই ভাল এই কথা আমার মনে হওয়ায়, ওঁর কথামতো আমি সংবাদপত্র হস্তে লইয়া অন্য বৈঠকখানায় গেলাম। তার পরদিন দুপরে ডাক্তার রাও ও নায়ক আসিলেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমরা আজ পর্য্যন্ত দুই তিন জনে মিলে যে যে ঔষধ দিচ্চ, তা আমি খাচ্চি; কিন্তু আমার রোগটা কি, অন্তত তার পরীক্ষা ঠিক করে তোমরা ত ঔষধ প্রয়োগ করেছ? তোমরা যদি এই রোগের নাম না বল, তা শোনবার জন্য আমার তেমন কিছু আগ্রহ নেই; কিন্তু যে ঔষধ দেওয়া হচ্চে অন্তত তা সেই রোগেরই ঔষধ এই, তা হলেই হল। ঔষধে উপকার হবে কিনা এ কে বিচার করতে বসবে? এবং এ বিষয় কার হাতে আছে? তোমাদের বুদ্ধি অনুসারে তোমরা রোগের মূল কারণ ঠিক করে ঠিক ঔষধ প্রয়োগ করবে এবং যা লিখে দেবে তাই আমি নীরবে ব্যবহার করব, এইটুকুই কেবল তোমাদের হাতে ও আমার হাতে আছে। ঔষধ খেলে না, অবহেলা করলে—এই বলে কাছের লোকেরা দোষ দিতে না পারে, এই জন্যই লোকে ঔষধ খায়, তা নৈলে আবার কি?" উনি এই সব কথা বলিলেও ডাক্তার রাও কোন কথা বলিলেন না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া উনি বলি-লেন যে তোমরা রোগের নামটা না বল্লেও আমি তোমা-দের নামটা বল্‌চি, 'আমার রোগের নাম Angina Pectoris—এই না? এই সম্বন্ধে গত পাঁচ সাত দিন আমি অনেক পুস্তক পড়ে দেখেছি; এবং তাতে যে সব লক্ষণ লেখা আছে, আমার রোগের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখেছি; তা থেকে, আমার রোগের এই নাম আমার বেশ বিশ্বাস হয়েছে। এই রোগ আমার এক মিত্রের হয়েছিল।" এই কথা শুনিয়া ডাক্তার রাও দুই এক মিনিট হতবুদ্ধির মতো হইয়া গেলেন। কিন্তু তাহা বাহিরে না দেখাইয়া তখনই বলিলেন যে, "আপনি লক্ষণ মিলিয়ে আপনার Angina Pectorisই হয়েছে এইরূপ যদি মনে করে থাকেন তা ঠিক নয়; ওটা আপনার কল্পনা। এই রোগের নাম "Pseudo Angina Pectoris", এই রোগ রোগীর কেবল কল্পনায় প্রকৃত রোগ বলে মনে হয়, এবং ঐ রোগের সমস্ত লক্ষণও প্রকাশ পায়; কিন্তু তবু তা আসলে সে রোগ নয়। এই রকমের অনেক রোগ আছে, যা সত্য না হলেও, রোগীর মনের উপর কাজ করে। তার মধ্যে এই একটা রোগ; এবং তাই এই রোগকে Pseudo Angina Pectoris বলে।" এই কথা শুনিয়া উনি বলিলেন যে, "এর মধ্যে কিছু Pseudo আছে সত্যি, নৈলে আমাকে তোমার বোঝাবার চেষ্টাটাও Pseudo।" এইরূপ উনি বলিতে লাগিলেন।

কবি।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

মরণেও আমি র'ব সুন্দর
আমি যে কবি
জীবনেও আমি আছি সুন্দর
আমি যে কবি।
অন্তরে মোর তারার মালা
নানা বরণ ফুলের ডালা
তায় মালঞ্চ মোর নিত্য আলা
আমি যে কবি।
পাখীর সনে গেয়ে উঠি
নিশানাথের হাসি লুটি
ফুলের সনে উঠি ফুটি
আমি যে কবি।
আকাশ যখন তাকায় মুখে
নিমেষ-হারা সুনীল চোখে
গেয়ে উঠি মনের সুখে
আমি যে কবি।
বাতাস যখন কুঞ্জবনে
কি কথা কয় গুঞ্জরণে
ঢেউ লাগে মোর মনে মনে
আমি যে কবি।
আলো যখন প্রভাত বেলা
নীল আকাশে করে খেলা;—
অঙ্গনে মোর বসায় মেলা
আমি যে কবি।
প্রতি তৃণ আমি ভালবাসি
প্রতি ধূলিকণা ভালবাসি
বিশ্বভুবন ভালবাসি
আমি যে কবি।
সবায় আমি প্রণাম করি
মনুষ্য কীট সবায় বরি
প্রতি অণুরেণু বক্ষে ধরি
আমি যে কবি॥

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

গৌড়সারঙ্গ—কাওয়ালি।

তোমার লাগি আছি জাগিয়া
দিবা নিশি একা বসি আকুল হিয়া।
যেও না ছেড়ে নাথ দুখী বলে মোরে;
পূজিব সকল হৃদয় দিয়া॥

কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুর—হিন্দুস্থানী।

০ ১ ২´ ৩
II পা পা মা গা | -া রা সা ন্া I সা গা -া -মা | -রগা -রগমা গা -া |
তো মা র লা ৽ গি আ ছি জা গি ৽ ৽ ৽৽ ৽৽৽ য়া ৽

০ ১ ২´ ৩
| গা ক্ষা পা পা | পা পা ক্ষা পা I র্পা ধনা -র্সা না | ধপা -পা মা -গা II
দি বা নি শি এ কা ব সি আ কু৽ ৽ ল হি৽ ৽ য়া ৽

০ ১ ২´ ৩
II { পা -া নধা না | র্সা র্সা র্সনা র্রর্সনা I -া র্সর্গা র্সা না | ৼনধা -র্সনা ধপপা -া } |
যে ৽ ও৽ না ছে ড়ে না৽ থ৽৽ ৽ দুখী ব লে মো৽ ৽৽ রে৽৽ ৽

০ ১ ২´ ৩
| পা নধা না র্রা | নর্রা -র্সর্সা ;ধা পা I ক্ষপা -ধনা -ক্ষধা -পপা | গা মা গা -া II II
পূ জি৽ ব স ক৽ ৽৽ ল হৃ দ৽ ৽৽ ৽৽ ৽৽ য় দি য়া ৽

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

একাদশ প্রকরণ।

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

পূর্ব্বাচার এইরূপ দ্বিবিধ হওয়ায়, কেবল আচার দেখিয়াই নিবৃত্তি শ্রেষ্ঠ কিংবা প্রবৃত্তি শ্রেষ্ঠ ইহার নিষ্পত্তি করিতে না পারিলেও, সন্ন্যাসমার্গী লোকদিগের আর একটা যুক্তিক্রম এই যে, কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ব্যতীত মোক্ষ নাই ইহা যদি নির্ব্বিবাদ হয়, তবে জ্ঞান-লাভ হইলে পর তৃষ্ণামূলক কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট যত শীঘ্র হয় দূর করিয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কর। মহাভারতের শুকানুশাসনে—ইহাকেই 'শুকানুপ্রশ্ন'ও বলে—সন্ন্যাসমার্গেরই প্রতিপাদন আছে। সেইস্থানে শুক—

যদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ।
কাং দিশং বিদ্যয়া যান্তি কাং চ গচ্ছন্তি কর্ম্মণা॥

"বেদ কর্ম্মত্যাগ করিতে বলেন এবং কর্ম্ম করিতেও বলেন; এরূপ স্থলে, বিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানের দ্বারা এবং নিছক্ কর্ম্মের দ্বারা কোন্ গতি লাভ হয়, তাহা আমাকে বল" (শাং. ২৪০. ১), এইরূপ ব্যাসকে প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তরে ব্যাস—

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥

"কর্ম্মের দ্বারা জীব বদ্ধ হয় ও বিদ্যার দ্বারা মুক্ত হয়; তাই পারদর্শী যতি কিংবা সন্ন্যাসী কর্ম্ম করে না" (শাং. ২৪০. ৭) এইরূপ বলিয়াছেন। এই শ্লোকের প্রথম চরণের বিচার পূর্ব্বপ্রকরণে আমি করিয়াছি। "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে" এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই। কিন্তু মনে থাকে যেন, সেখানে ইহাই দেখানো হইয়াছে যে, "কর্ম্মণা বধ্যতে" এই কথার বিচারে সিদ্ধ হয় যে, জড় কিংবা চেতন, কর্ম্মের দ্বারা কেহ বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না; মনুষ্য ফলাশায় কিংবা নিজের আসক্তিনিবন্ধন কর্ম্মে বদ্ধ হয়; এই আসক্তির মোচন হইলে সে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম করিলেও মুক্ত। এই অর্থই মনে করিয়া অধ্যাত্মরামায়ণে (২. ৪. ৪২) রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে—

প্রবাহপতিতঃ কার্য্যং কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।
বাহ্যে সর্ব্বত্র কর্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব॥

"কর্ম্মময় সংসারের প্রবাহে পতিত মনুষ্য বাহ্যতঃ সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াও অলিপ্ত থাকে"। অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে কর্ম্ম দুঃখময় বলিয়া তাহা ছাড়িবার আবশ্যকতা থাকে না; মনকে শুদ্ধ ও সম করিয়া ফলাশা ছাড়িলেই সমস্ত কর্ম্ম হয় এইরূপ দেখা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান ও কাম্য কর্ম্মের মধ্যে বিরোধ হইলেও নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞান ইহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ হইতে পারে না; তাই অনুগীতায় "তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্বন্তি"—অতএব কর্ম্ম করে না—এই বাক্যের বদলে—

তস্মাৎ কর্ম্মস্থ নিস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ ॥
"অতএব পারদর্শী পুরুষ কর্ম্মেতে আসক্তি রাখে না" (অশ্ব ৫১. ৩১) এইরূপ বাক্য আসিয়াছে। তৎপূর্ব্বে—

কুর্বতে যে তু কর্ম্মাণি শ্রদ্দধানা বিপশ্চিতঃ।
অনাশীর্যোগসংযুক্তাস্তে ধীরাঃ সাধুদর্শিনঃ ॥

"যে সকল জ্ঞানী পুরুষ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ফলাশা না রাখিয়া (কর্ম্ম-) যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করে তাহারাই সাধুদর্শী" (অশ্ব. ৫০. ৬, ৭),—এইরূপ কর্ম্মযোগ স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেইরূপ—

যদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ।

এই কথার পূর্ব্বার্দ্ধে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শৌনকের এই উপদেশ—

তস্মাদ্ধর্ম্মানিমান্ সর্ব্বান্নাভিমানাৎ সমাচরেৎ ॥

"বেদ, কর্ম্ম কর এবং কর্ম্ম ছাড়ো উভয়ই বলেন; তাই (কর্তৃত্বের) অভিমান না রাখিয়া আমাদিগের সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে" (বন. ২. ৭৩)। শুকানুপ্রশ্নেও ব্যাসদেব শুককে দুইবার স্পষ্ট বলিয়াছেন—

এষা পূর্বতরা বৃত্তির্ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
জ্ঞানবানেব কর্ম্মাণি কুর্বন্ সর্ব্বত্র সিধ্যতি ॥

"জ্ঞানবান্ হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়াই সিদ্ধিলাভ করা, ইহাই ব্রাহ্মণের পূর্ব্বকালের (পূর্বতন) পুরাতন বৃত্তি" (মভা. শাং. ২৩৭. ১; ২৩৪. ২৯), "জ্ঞানবানের" এই পদের দ্বারা জ্ঞানোত্তর ও জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মই এইস্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যাক্; দুই পক্ষের এই বচনগুলি নিরাগ্রহ বুদ্ধিতে শান্তভাবে বিচার করিলে "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" এই যুক্তিক্রমে "তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্বন্তি"—অতএব কর্ম্ম করে না—এই কর্ম্মত্যাগ মূলক একই অনুমান নিষ্পন্ন না হইয়া, "তস্মাৎকর্ম্মসু নিঃস্নেহাঃ"—অতএব কর্ম্মে আসক্তি রাখে না—এই নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার অন্য অনুমানও ততটাই যোগ্য এইরূপ সিদ্ধ হয়। কেবল আমিই এইরূপ দুই অনুমান করিতেছি এরূপ নহে, স্বয়ং ব্যাস এই অর্থই শুকানুপ্রশ্নের নিম্নোক্ত শ্লোকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন—

দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যস্মিন্ বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মঃ নিবৃত্তিশ্চ বিভাষিতঃ ॥*

"এই দুই মার্গের উপর বেদ প্রতিষ্ঠিত—একটি প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম, অন্যটি নিবৃত্তিমূলক অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণের ধর্ম্ম" (মভা. শাং. ২৪০-৬)। সেইরূপ আবার নারায়ণীয় ধর্ম্মেতেও এই দুই পন্থাই পৃথক্ পৃথক্ ও স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টির আরম্ভ হইতে প্রচলিত থাকার বর্ণনা আছে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে প্রসঙ্গানুসারে এই দুই পন্থা বর্ণিত হওয়ায় প্রবৃত্তিমার্গেরই ন্যায় নিবৃত্তিমার্গের সমর্থক বচনাদিও ঐ মহাভারতেই পাওয়া যায়। গীতার সন্ন্যাসমার্গীয় টীকায় এই নিবৃত্তিমার্গের বচনই মুখ্য মনে করিয়া, তাহা ছাড়া যেন আর কোন পন্থাই নাই কিংবা যদি থাকে তো সে গৌণ অর্থাৎ সন্ন্যাসমার্গের অঙ্গ, এইরূপ প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রতিপাদন সাম্প্রদায়িক আগ্রহমূলক; এবং সেইজন্য গীতার্থ সরল ও স্পষ্ট হইলেও আজিকার কালে তাহা অনেকের দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা" (গী. ৩. ৩) গীতার এই শ্লোকের জুড়ী "দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ" এই শ্লোক; অর্থাৎ এই স্থানে দুই তুল্যবল মার্গ বুঝাইবার হেতু আছে, এইরূপ স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু এই সুস্পষ্ট অর্থের প্রতি কিংবা পূর্ব্বাপর সন্দর্ভের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই শ্লোকেই দুয়ের বদলে এক মার্গই প্রতিপাদ্য এইরূপ কেহ কেহ দেখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন!

এই প্রকারে সুস্পষ্ট হইল যে, কর্ম্মসন্ন্যাস (সাংখ্য) ও নিষ্কাম কর্ম্ম (যোগ) বৈদিক ধর্ম্মের দুই স্বতন্ত্র মার্গ এবং সে বিষয়ে গীতার এই সিদ্ধান্ত যে, উহারা বিকল্পাত্মক নহে, কিন্তু "সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগের যোগ্যতা বিশেষ রকমের"। এক্ষণে কর্ম্মযোগের সম্বন্ধে গীতা পরে আরও এইরূপ বলেন যে, যে জগতে আমরা থাকি সেই জগৎ ছাড়িয়া এবং তাহাতে ক্ষণকালও জীবিত থাকাও যদি কর্ম্ম হয়, তবে কর্ম্ম ছাড়িয়া কোথায় যাইব? এবং এই জগতে অর্থাৎ কর্ম্মভূমিতেই যদি থাকিতেই হয় তবে কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবই কি প্রকারে? যতদিন দেহ থাকে সে পর্য্যন্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি বিকার আমাদিগকে যেমন ছাড়ে না প্রত্যক্ষ দেখি, (গী. ৫. ৮, ৯), এবং তন্নিবারণার্থ ভিক্ষা মাগিবার লজ্জাজনক কর্ম্ম করাও যদি সন্ন্যাসধর্ম্মানুসারে বৈধ হয় তবে অনাসক্তবুদ্ধিতে অন্য ব্যবহারিক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে কি প্রত্যবায় আছে? কর্ম্ম করিলে কর্ম্মপাশে মন বদ্ধ হইয়া ব্রহ্মানন্দ হারাইবে কিংবা ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ বুদ্ধি বিচলিত হইবে এই ভয়ে অন্য কর্ম্ম যদি কেহ ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহার মনোনিগ্রহ অদ্যাপি দৃঢ় হয় নাই এইরূপ বলিতে হইবে; এবং মনোনিগ্রহ অদৃঢ় থাকিতে, যে কর্ম্মত্যাগ তাহা গীতানুসারে মোহাত্মক অর্থাৎ তামস কিংবা মিথ্যাচার (গী. ১৮. ৭; ৩. ৬)। এই অবস্থায় এই অর্থ স্বতই প্রকাশ পায় যে, এইরূপ অদৃঢ় মনোনিগ্রহকে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা পূর্ণ করিতে হইলে, নিষ্কামবুদ্ধিপরিবর্দ্ধক যজ্ঞদানাদি গৃহস্থাশ্রমের শ্রৌত কিংবা স্মার্ত্ত কর্ম্মসকলই মনুষ্যের করিতে হইবে। ফলকথা, এইপ্রকার কর্ম্মত্যাগ কখনই শ্রেয়স্কর হয় না। ভাল; যদি বলো, মন নির্ব্বিষয় এবং তাহা উহার অধীন, তবে উহার কর্ম্মের ভয়ই কেন, কিংবা কর্ম্ম না করিবার ব্যর্থ আগ্রহই বা সে করে কেন? বর্ষার জন্য যে ছত্র, তাহার পরীক্ষা যেরূপ বর্ষাকালেই হইয়া থাকে, সেইপ্রকার কিংবা—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥

"যে সকল কারণে বিকার উৎপন্ন হয় সেই সব কারণ কিংবা বিষয় চোখের সামনে থাকিলেও যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ মোহের বিকারে পতিত হয় না, সেই সকল পুরুষকেই ধৈর্য্যশালী বলা যায়" (কুমার ১. ৫৯) কালিদাসের এই ব্যাপক নীতিসূত্র অনুসারে মনোনিগ্রহকে কর্ম্মের কষ্টিপাথরেই পরোখ করিয়া, তাহা পূর্ণ হইয়াছে কিনা তাহার সাক্ষ্য শুধু অন্যের নিকট নহে, আপনার নিকটেও পাওয়া যায়। অতএব এই পক্ষেও শাস্ত্রত প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রবাহপতিত কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য এইরূপ সিদ্ধ হয় (গী. ১৮. ৬)। ভাল; যদি বল, মন বশে থাকিয়া শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি বিগড়াইয়া যাইবার কোন ভয় নাই; কিন্তু মোক্ষলাভের পক্ষে অনাবশ্যক ব্যর্থ কর্ম্ম

* এই চরণের 'নিবৃত্তিশ্চ সুভাষিতঃ' 'নিবৃত্তিশ্চ বিভাবিতঃ' এইরূপ পাঠান্তরও আছে। যে কোন পাঠই গ্রহণ কর না কেন, প্রথমে 'দ্বাবিমৌ' এইরূপ উক্ত হইয়াছে; ইহা হইতে দুই পন্থা স্বতন্ত্র এই কথা নির্ব্বিবাদরূপে সিদ্ধ হইতেছে।

করিয়া দেহকে কষ্ট দিতে চাহি না", তবে কায়ক্লেশভয়ে অর্থাৎ কেবল দেহের কষ্ট হইবে এই ক্ষুদ্র ভয়ে যে কর্ম্ম-ত্যাগ তাহা রাজসিক; ত্যাগের ফল এইরূপ রাজস কর্ম্ম-ত্যাগে পাওয়া যায় না (গী. ১৮. ৮)। তবে কর্ম্মত্যাগ করিব কেন? সমস্ত কর্ম্ম মায়াজগতের অতএব অনিত্য হওয়া প্রযুক্ত ব্রহ্মজগতের নিত্য আত্মার ইহার মধ্যে পতিত হওয়া উচিত নহে, এ কথা যদি কেহ বলেন,—তাহাও ঠিক নহে। কারণ পরব্রহ্ম যদি নিজেই মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন তবে এইরূপ মায়ার মধ্যে মনুষ্যেরও কাজ করিতে বাধা কি? ব্রহ্মজগৎ ও মায়াজগৎ, সমস্ত জগতের যেরূপ এই দুই ভাগ আছে, সেইরূপ মনুষ্যেরও আত্মা ও দেহেন্দ্রিয়াদি এইরূপ দুই ভাগ আছে। তন্মধ্যে আত্মা ও ব্রহ্মের যোগ করিয়া দিয়া ব্রহ্মেতে আত্মার লয় কর এবং এই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধিকে নিঃসঙ্গ রাখিয়া কেবল মায়িক দেহেন্দ্রিয়ের দ্বারা মায়া-জগতের ব্যবহার কর। এইরূপ করিলে, মোক্ষের কোন প্রতিবন্ধক আসিবে না; এবং উক্ত দুই ভাগের যোগ আপোষে নিবদ্ধ হইলে জগ-তের কোন ভাগের উপেক্ষা বা বিচ্ছেদ করিবার দোষও আসিবে না; এবং ব্রহ্মজগৎ ও মায়াজগৎ—পরলোক ও ইহলোক—এই দুই লোকেরই কর্ত্তব্য করাতে তোমার শ্রেয় লাভ হইবে। ঈশোপনিষদে এই তত্ত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে (ঈশ. ১১)। এই শ্রুতিবচনের সবিস্তার বিচার পরে করা যাইবে। এক্ষণে এইটুকুই বলিতেছি যে, ব্রহ্মাত্মৈক্যের অনুভবকারী জ্ঞানী পুরুষ মায়াজগতের ব্যবহার কেবল শরীরের দ্বারা অথবা কেবল ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা করিয়া থাকে, এইরূপ গীতাতে যাহা বর্ণিত হই-য়াছে (গী. ৪. ২১; ৫. ১২) তাহার তাৎপর্য্যও ইহাই; এই হেতু, ১৮ম অধ্যায়ে "নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে ফলাশা ছাড়িয়া কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্ম করাই প্রকৃত 'সাত্ত্বিক' কর্ম্মত্যাগ"—কর্ম্ম না করা প্রকৃত কর্ম্মত্যাগ নহে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (গী. ১৮. ৯)। কর্ম্ম মায়া-জগতের হইলেও তাহা পরমেশ্বরই কোন অজ্ঞেয় কারণে উৎপন্ন করিয়াছেন; তাহা বন্ধ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা পরমেশ্বরেরই অধীন; এবং বুদ্ধিকে নিঃসঙ্গ রাখিয়া কেবল শারীর কর্ম্ম করিলে মোক্ষের বাধা হয় না, ইহা নির্ব্বিবাদ। তবে, চিত্তাতে বৈরাগ্য রাখিয়া কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শাস্ত্রপ্রাপ্ত কর্ম্ম করিতে বাধাই বা কি? "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" (গী. ৩. ৫; ১৮. ১১)—এই জগতে ক্ষণকালও কর্ম্ম ছাড়া থাকিতে পারা যায় না, এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে; আবার অনুগীতায় "নৈষ্কর্ম্যং ন চ লোকেঽস্মিন্ মুহূর্ত্তমপি লভ্যতে" (অশ্ব. ২০. ৭)—এই লোকে (কেহই) এক মুহূর্ত্তও কর্ম্ম হইতে মুক্ত নহে—এইরূপ বলা হইয়াছে। শুধু মনুষ্য কেন, সূর্য্যচন্দ্রাদি পর্য্যন্ত সকলে নিরন্তর কর্ম্মই করিতেছে! অধিক কি, কর্ম্মই জগৎ, আর জগৎই কর্ম্ম ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; তাই জগতের ভাঙ্গাগড়ার কিংবা কর্ম্মের ক্ষণমাত্র বিরাম নাই, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। একদিকে ভগবান গীতাতে বলিতেছেন—"কর্ম্ম ছাড়িলে, খাওয়া পর্য্যন্ত হইবে না" দেখ, (গী. ৩. ৮); অপরদিকে বনপর্ব্বে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—"অকর্ম্মণা বৈ ভূতানাং বৃত্তিঃ স্যান্ন হি কাচন" (বন. ৩২. ৮), কর্ম্মব্য-তীত প্রাণীমাত্রের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না; সেইরূপ দাসবোধেও প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া তাহার পর "প্রপঞ্চ সাণ্ডূন পরমার্থ কেলা। তরী অন্ন মিলে না খায়ালা।" অর্থাৎ—"প্রপঞ্চ ছাড়িয়া পরমার্থ করিল, তবু খাইতে অন্ন মিলিল না" (দা. ১২. ১. ৩) এইরূপ শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীও বলিয়াছেন। ভাল; স্বয়ং ভগবানের চরিত্র আলোচনা কর; দেখিবে যে, ভগবান ভিন্ন ভিন্ন অবতার হইয়া, এই মায়িক জগতে সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্টের বিনাশসাধন রূপ কর্ম্ম যুগে যুগে করিয়াই আসিতেছেন (গী. ৪. ৮ ও মভা. শাং. ৩৩৯. ১০৩ দেখ)। এই কর্ম্ম যদি আমি না করি তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এইরূপ তিনিই গীতাতে বলিয়াছেন (গী. ৩. ২৪)। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, যখন স্বয়ং ভগবান্ জগতের ধারণার্থ কর্ম্ম করিতেছেন, তখন জ্ঞানোত্তর কর্ম্ম নিরর্থক, এই কথার কোন ফল নাই। তাই, "যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ" (মভা. বন. ৩১২. ১০৮)—যে ক্রিয়াবান্ সে-ই পণ্ডিত—এই নীতি-সূত্র অনুসারে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ সকল-কেই এই উপদেশ করিতেছেন যে, এই জগতে কর্ম্ম হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না; কর্ম্মের বাধা হইতে বাঁচিবার জন্য মনুষ্যের সর্ব্বদা নিজ ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ত্তব্য, ফলাশা ছাড়িয়া, বিরক্ত বুদ্ধিতে করা—এই একমার্গ (যোগ) মনুষ্যের আয়ত্তাধীন এবং ইহাই উত্তমও বটে। প্রকৃতি তো নিজের কাজ সর্ব্বদা করিতেই থাকিবে; কিন্তু উহাতে কর্তৃত্বের-অভিমান-বুদ্ধি ছাড়িয়া দিলেই তুমি মুক্তই (গী. ৩. ২৭; ১৩. ২৯; ১৪. ১৯; ১৮. ১৬)। মুক্তির জন্য কর্ম্মত্যাগ কিংবা সাংখ্যের অনু-সারে কর্ম্ম সন্ন্যাসরূপ বৈরাগ্যের আবশ্যকতা নাই; কারণ এই কর্ম্মভূমিতে সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ করাও সম্ভবই নাই।

এই সম্বন্ধেও কেহ এইরূপ ফ্যাক্ড়া বাহির করেন যে, কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিবার জন্য কর্ম্মছাড়িবার আব-শ্যকতা না হইয়াও কেবল কর্ম্মফলাশা ত্যাগ করিলেই সমস্ত নির্ব্বাহ হয়, মানিলেও যখন জ্ঞানের দ্বারা আমার বুদ্ধি নিষ্কাম হয় তখন সমস্ত বাসনা ক্ষয় হয় এবং কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবার কোন কারণই অবশিষ্ট থাকে না; এবং এইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ কায়ক্লেশভয়ে নহে—বাসনাক্ষয় প্রযুক্ত সমস্ত কর্ম্ম আপনা হইতেই ছাড়িয়া যায়। এই জগতে মোক্ষই মনুষ্যের পরম-পুরুষার্থ। যে সেই মোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা লাভ করে তাহার প্রজা, সম্পত্তি কিংবা স্বর্গলোকাদির সুখ—এই সমস্তের কোন 'এষণা'ই (ইচ্ছা) থাকে না বলিয়া (বৃ. ৩. ৫. ১ ও ৪. ৪. ২২), কর্ম্ম না ছাড়িলেও শেষে সেই জ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণাম ইহাই হয় যে, কর্ম্ম আপনিই ছুটিয়া যায়। এই অভি-প্রায়ে—

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ ॥

"জ্ঞানামৃত পান করিয়া যে কৃতকৃত্য হইয়াছে সেই পুরু-ষের পরে কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না; এবং যদি থাকে তো সে তত্ত্বজ্ঞানী নহে" এইরূপ উত্তরগীতায় (১. ২৩) উক্ত হইয়াছে)* ইহা জ্ঞানী পুরুষের

* ইহা শ্রুতির শ্লোক—এই ধারণা ঠিক্ নহে। বেদান্ত-সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে এই শ্লোকটি নাই। কিন্তু সনৎসুজাতীয়ের ভাষ্যে আচার্য্য তাহা গ্রহণ করিয়া সেখানে তিনি লিঙ্গপুরাণে ইহা

দোষ বলিয়া যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তাহা ঠিক্ নহে; কারণ ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের এক অলঙ্কার—"অলঙ্কারো হ্যয়মস্মাকং যদুব্রহ্মাত্মাবগতৌ সত্যাং সর্ব্বকর্ত্তব্যতাহানিঃ" (বেদ্‌· শাং. ভা. ১. ১. ৪)—এইরূপ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন। সেইরূপ গীতাতেও "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" (গী. ৩. ১৭) জ্ঞানীর পক্ষে আর কিছুই করিবার থাকে না; তাহার সমস্ত বৈদিক কর্ম্মের কোনই প্রয়োজন নাই (গী· ২. ৪৬); অথবা "যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে" (গী· ৬. ৩) যে যোগারূঢ় তাহার শমই কারণ এইরূপ বচন আছে। তাছাড়া "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী" (গী. ১২. ১৬) অর্থাৎ সমস্ত উদ্যোগ যে ত্যাগ করে, এবং "অনিকেতঃ" (গী. ১২. ১৯) অর্থাৎ যাহার গৃহ নাই ইত্যাদি বিশেষণও জ্ঞানীপুরুষের বর্ণনায় গীতাতে সংযোজিত হইয়াছে। ইহা হইতে—জ্ঞানলাভের পর কর্ম্মবন্ধন আপনা আপনিই মোচন হয়—এই কথা ভগবদ্‌গীতার মান্য এইরূপ কাহারও কাহারও মত। কিন্তু আমার মতে, গীতা-বাক্যগুলির এই অর্থ এবং উপরি-উক্ত যুক্তিবাদও ঠিক্ নহে। তাই তদ্বিরুদ্ধে আমার যে বক্তব্য তাহা এইখানে সংক্ষেপে বলিতেছি।

ধারবারের পত্র।

গত ২৩শে মে রবিবার আমি বাঙ্গালোরের ব্রাহ্ম-বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। এখানে তিনটি সমাজ আছে। তন্মধ্যে ক্যান্টনমেন্টের সমাজই বড়। এই সমাজের নিজের গৃহ আছে। সভ্যসংখ্যা প্রায় ৩০ জন। এখানে সাধারণতঃ তামিল ভাষায় উপাসনা হইয়া থাকে। বাঙ্গালোর সিটিতে দুইটি সমাজ আছে। কটন পেটের সমাজ ষ্টেশনের সন্নিকট। সভ্য-সংখ্যা ৩০ জন। কল্কিগারী পেটের সমাজের সভ্যসংখ্যা অল্প। শ্রীযুক্ত হনুমান তাপ্পা এই দুই সমাজেরই প্রাণ-স্বরূপ। এই দুই স্থানেই কানাড়ী ভাষায় উপাসনার কার্য্য হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত হনুমান তাপ্পা ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তকের কানাড়ী ভাষান্তর এবং একখানি ভজন পুস্তক আমাকে দিয়াছেন। এই দুইখানি পুস্তক দ্বারা আমাদের দেশীয় ভাষায় সঙ্গীত ও উপাসনাদি করিবার বিশেষ সাহায্য হইবে।

আদিব্রাহ্মসমাজের প্রথানুযায়ী উপাসনাপুস্তক মারহাটি এবং কানাড়ী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছি। এক্ষণে ছাপিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই উপাসনাপুস্তকে "সপর্য্যাগৎ" শ্লোক বাদ দিয়া "ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং" শ্লোকের শেষে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" যোগ করিয়া দিয়াছি। সমাজ হইতে কি কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে? যদি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে ঐ সকল পুস্তক অধিক সংখ্যায় ছাপাইয়া নানা স্থানে বিতরণ করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালোর যাত্রাকালে ট্রেনে বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের শ্রীযুক্ত স্যর নারায়ণ চন্দবরকারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার-সম্বন্ধীয় অনেক কথা হইয়াছিল। তাঁহার অদম্য উৎসাহ। তাঁহাকে লইয়া একবার ভারতের নানা স্থানে প্রচার-বাহিনী বাহির করিতে পারিলে অনেক কাজ হইতে পারে। আমার বোধ হয় একটু বিশেষ চেষ্টা করিলে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। সকল সমাজ হইতে প্রচারক লইয়া এই প্রচারবাহিনী গঠিত হওয়া উচিত এবং স্থানীয় প্রাদেশিক সমাজ হইতে যাঁহারা নিজ ব্যয়ে এই প্রচারবাহিনীর সহিত আপনাপন সীমা পর্য্যন্ত যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে Co-operating সভ্যরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। এইরূপ স্থানীয় Co-operative সভ্যদিগের সাহায্য পাইলে প্রচারকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই ইহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

মেডিকেল মিশনের কার্য্য বেশ চলিতেছে।

সম্প্রতি ধারবারে প্রথম কর্ণাটক কনফারেন্সের বৈঠক বসিয়াছিল। কর্ণাটকের নানা স্থান হইতে প্রায় ১৫০০ প্রতিনিধি এবং ৫।৬ শত দর্শক একত্রিত হইয়াছিলেন। আমরা পোষ্টার মিশন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক বাক্যাবলী বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া গেটের সম্মুখে লাগাইয়া দিয়াছিলাম। অনেকেই ঐ সকল পোষ্টার আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস।

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺ কালীপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের সুযোগ্য মধ্যম পুত্র বহুবাজারনিবাসী ব্যারিষ্টার-প্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ রায় মহাশয়ের এক কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবীর সহিত গত ২৫ শে বৈশাখ আদি-ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেয়ারম্যান ৺ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রজতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের এবং শ্যামাপদ বাবুর অন্যতর কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যময়ী দেবীর সহিত গত ৩১ শে বৈশাখ রমণী বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জগতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ আদিব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উভয় দিবসেই শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেদী গ্রহণ করিয়া দম্পতীদ্বয়কে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব অনেক লোক উপস্থিত হইয়া অনুষ্ঠানে এবং কন্যাপক্ষের আদর-আপ্যায়নে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

আছে বলিয়াছেন। সুতরাং শ্লোকটি সন্ন্যাস মার্গের, কর্ম্মযোগের নহে নিঃসন্দেহ। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থেও এইরূপ বচনাদি আছে (পরিশিষ্ট প্রকরণ দেখ)।

বিংশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
শ্রাবণ ব্রাহ্মসংবৎ ৯১

৯২৪ সংখ্যা | ১৮৪২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তব নামে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রাণনাথ শোন তুমি
শোন মোর কথা—
যেকোনা থেকোনা দূরে
প্রাণে দিয়ে ব্যথা॥
ভকত জনের তব
দেখ বক্ষ চিরি'—
তোমারি অঙ্কিত নাম—
তাই লয়ে ফিরি।
জানি না তোমায় এত
কেন বাসি ভাল—
তুমিই আমার প্রাণ
নয়নের আলো।
তুমি মম প্রাণবঁধু—
সকলি আমার—
তোমারে ছাড়িয়া যাব
কোথা বল আর?
তোমারে বাসিলে ভাল
এত দুঃখ আছে—
এ কথা বলনি কেন—
কেবা যেত কাছে?
তবুও কি জানি কেন
তব নামে উঠে
হৃদয়কমল মম
হরষেতে ফুটে॥

ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন।

(ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ৬৮তম উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক গত ৯ই আষাঢ় বিবৃত)

আমরা সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রাহ্মসমাজেও যাই এবং বৎসরে বৎসরে তাহার উৎসবাদিতেও যোগদান করি বটে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রভৃতি কার্য্যে যে জ্বলন্ত উৎসাহ আমরা ব্রাহ্মদিগের নিকট প্রত্যাশা করি, আজকাল ব্রাহ্মদিগের ভিতর উৎসাহের সেই প্রজ্জ্বলিত বহ্নি দেখিতে পাই বলিয়া মনে হয় না। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ আমাদের মনে হয় এই যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ এবং আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ তাঁহাদের সমসাময়িক অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন যেরূপ তীব্রভাবে প্রাণের ভিতর অনুভব করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজেরই কল্যাণে আমাদের দেশের অবস্থা, সমাজের অবস্থা সেই দুর্দ্দিনের ঘন অন্ধকার কাটাইয়া উন্নতির সমুন্নত শিখরে আরোহণ করাতে, সমগ্র দেশ আজ প্রাণের অনুপ্রাণনে উদ্বুদ্ধ হওয়াতে আমরা ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন তত তীব্ররূপে অনুভব করিবার অবকাশ পাই না। ঘন অন্ধকারের ভিতর আলোকের প্রয়োজন যেমন তীব্রভাবে আমাদের উপলব্ধিতে আসে, সন্ধ্যার আলো-আঁধারের ভিতর অথবা দিনের প্রখর আলোকের ভিতর নূতন কোন আলোকের প্রয়োজন তত তীব্রভাবে উপলব্ধ হয় না। এই কারণে সময়ে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে বাহিরে একটা কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে শোনা যায় যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সংসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে—এখন আর ব্রাহ্মসমাজের বৃথা দাঁড়াইয়া থাকিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দেশের, সমাজের আস্থা স্থাপন করিতে গেলেই, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্রাহ্মদিগেরও অনুরাগ আকর্ষণ করিতে চাহিলেই আমাদের প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, কোন্ প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিবার জন্য, কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া, কোন্ অভাব পূর্ণ করিবার জন্য পৃথিবীর এত দেশ থাকিতে এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব হইল? যে প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই প্রয়োজন সংসিদ্ধ হইয়াছে কি না? এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করিয়া যদি আমরা দেখি যে, যে প্রয়োজন লইয়া ব্রাহ্মসমাজ এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে প্রয়োজন সংসিদ্ধ হইতে এখনও অনেক বাকী আছে; যদি আমরা দেখি যে, দেশের মঙ্গলের জন্য, জাতীয় কল্যাণের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের দীপ্ত প্রদীপ এখনও সমুজ্জ্বল রাখা আবশ্যক; যদি আমরা দেখি যে, সমগ্র দেশকে প্রকৃত মঙ্গলের কল্যাণতম পথে পরিচালিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের বিজয়বৈজয়ন্তী এখনও সমুন্নত রাখা আবশ্যক, তাহা হইলে স্বভাবতই আমাদের সমুদয় প্রাণের টান, হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধা ও প্রীতি ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইবে; তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক কার্য্যকে আমাদের আপনাদেরই বাঁচিবার একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না; তখন আপনিই আমাদের উৎসাহবহ্নি প্রবল আকার ধারণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে এক অপ্রতিহত অগ্নিময় শক্তিরূপে দাঁড় করাইবে নিঃসন্দেহ।

ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবকালে তাহার আবির্ভাবের একটা যে প্রয়োজন আসিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। প্রকৃতিতে আমরা দেখি যে, যে কালের বা যে স্থানের জন্য যাহা আবশ্যক, সেই স্থান বা কালের উপযুক্ত বস্তু মহাপাষাণ কাল ও মহাপাষাণ স্থানও ভেদ করিয়া অভিব্যক্ত হয়, এবং অভিব্যক্ত হইয়া শতসহস্র বাহুর আলিঙ্গনে সেই স্থান ও কালকে আপনার করিয়া লয়। ব্রাহ্মসমাজেরও আবির্ভাবসময়ে এই বঙ্গদেশে প্রাণের অরুণ আভা দেখা দিলেও বঙ্গদেশের এবং ভারতের অবস্থা যে শোচনীয় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই সময়েই সতীদাহ সহমরণ মনুষ্যের সহ্যসীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল; সেই সময়েই দলাদলি দ্বেষহিংসা বিবাদকলহ দেশের মধ্যে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; সেই সময়েই গুরুবাদ, পৌরোহিত্য প্রভৃতির অতি বাড়াবাড়ি দেশের মধ্যে দুর্নীতিবিস্তারের সহায়তা করিয়া দেশকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজ যখন সেই ঊষরকাল ও সেই ঊষরভূমি ভেদ করিয়া এই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে, এবং জন্মস্থান এই বঙ্গদেশকে, এই ভারতভূমিকে নিজের ভাবরাজির শতসহস্র বেষ্টনীর আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে, তখন স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় একটা কোন সমাজের প্রয়োজন আসিয়াছিল; ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চয়ই দেশের কোন গুরুতর অভাব পূর্ণ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

সত্য কথা বলিতে কি, প্রকৃতির রাজ্যে বিনা প্রয়োজনে কোন কিছুরই অভিব্যক্তি হইতে দেখা যায় না। ভগবানের মঙ্গল বিধানের ব্যবস্থাই এই যে, তাঁহার রাজ্যে কোন কিছুই বিনা প্রয়োজনে সংঘটিত হইবে না। ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণু অবধি বৃহত্তম সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর, প্রতি নিশ্বাসের, প্রতি ঘটনার প্রয়োজন আছে বলিয়াই তাহাদের অস্তিত্ব আছে। ব্রাহ্মসমাজও যখন দেশের প্রাণ হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখন কাজেই বলিতে হয় যে, তাহার প্রয়োজন আসিয়াছিল; এখনও তাহার প্রয়োজন আছে, তাই ব্রাহ্মসমাজ আজও সমুন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে; আর যতদিন তাহার প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচিয়াও থাকিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস যে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজ যে নামেই অভিহিত হৌক না কেন, ব্রাহ্মসমাজের গঠনপ্রণালীতে যে প্রকার পরিবর্ত্তনই সাধিত হৌক না কেন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, যে প্রয়োজন সংসিদ্ধির জন্য, যে উদ্দেশ্য লইয়া ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, যতদিন মানবজাতির অস্তিত্ব থাকিবে, এবং মানবজাতি সাধারণত বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, ততদিন সেই প্রয়োজনও সমগ্রভাবে সংসিদ্ধ হইতে পারিবে না এবং কাজেই ততদিন সেই উদ্দেশ্যেরও অভাব হইবে না। সেই উদ্দেশ্য ছাড়িয়া কোন মানব, কোন সমাজ, কোন জাতিই দাঁড়াইতে পারে না। সে উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানবের, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক সমাজের অন্তরে চিরনিহিত—সহজাত বলিতে পারি। সুতরাং মানবজাতির বিলোপসাধন না হইলে ব্রাহ্মসমাজেরও বিলোপসাধন অসম্ভব। মানবজাতির অন্তর্নিহিত সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য, সেই প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় একটা সমাজকে মানবজাতির সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিতেই হইবে।

যে প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই প্রয়োজনটী কি? সেই উদ্দেশ্যটী কি? ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে,

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্যের পথে—এদেশবাসীকে এবং সেই সঙ্গে পরিণামে সমগ্র জগতবাসীকে পরিচালিত করাই ব্রাহ্মসমাজের জন্মগ্রহণের কারণ। মনে হয়, যেন জগতের সম্মুখে মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূলসূত্র ধরাইয়া দিয়া এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিকে জগতগুরুর পদে স্থিরতর রাখাই সেই উদ্দেশ্য। এই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সংসাধনের ইচ্ছা ও আশা যতদিন প্রত্যেক মানবাত্মার অন্তরে, প্রতি মানবজাতির হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে, ততদিন সেই উন্নতির একটা আদর্শ ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় একটা সমাজকে মাথা তুলিয়া থাকিতেই হইবে।

যে উদ্দেশ্য লইয়া ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই উদ্দেশ্যের—সেই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল কেন্দ্র হইতেছে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় অলখ নিরঞ্জনের উপাসনা—তাঁহাকেই হৃদয়ে ধরিয়া রাখা, তাঁহাকেই প্রীতি করা এবং তাঁহারই আদেশ জানিয়া তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধন করা। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইলেই আমাদিগকে প্রকৃতিতে তাঁহার মুদ্রিত নিয়ম সকল অনুসরণ করিতে হইবে, এবং তাহা করিলেই আমাদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি যে সংসাধিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। আর, প্রকৃতির সমস্ত মঙ্গল নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা যিনি, সমুদয় হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে প্রীতিভক্তি করিলে আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা যে চরিতার্থতা লাভ করিবে, এবং কাজেই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি যে পরাকাষ্ঠা লাভ করিবে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের ঋষিরা তাঁহাদের অন্তস্ফূর্ত্ত জ্ঞানের দ্বারা এই সত্য প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই কারণে তাঁহাদের সমুদয় উক্তিই বলিতে গেলে একেশ্বরবাদেরই অভিমুখে কেন্দ্রীকৃত। সেই একেশ্বরবাদ ভারতের স্মৃতিতন্ত্রপুরাণদর্শনের ভিতর দিয়া ভারতবাসীর মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজও তাই একেশ্বরবাদকেই কেন্দ্রে রাখিয়া নিজের মূল শক্তি একেশ্বরবাদ-প্রচারেই প্রধানত নিয়োগ করে।

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল কেন্দ্র যেমন একেশ্বরবাদ, তেমনি তাহার সর্ব্বপ্রধান সহায় হইতেছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে, হৃদয়ের অনুজ্ঞাকে ছাড়িয়া দিলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে কি না সন্দেহ। ইহা তো সকলেরই প্রত্যক্ষ যে, কোন বৃক্ষের সুবৃহৎ আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহাকে প্রথম অবধি কঠিন আবরণের নীচে ঢাকা দিয়া রাখিলে তাহার বৃহদাকার ধারণ করা দূরে থাকু, তাহা মরণের অভিমুখে অগ্রসর হয়। সেইরূপ যে মানবাত্মা সেই মহাস্বাধীন পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতেই নিঃসৃত এক একটী বিস্ফুলিঙ্গ, সেই মানবাত্মা স্বাধীনতা ছাড়িয়া দিয়া স্বেচ্ছাবৃত অথবা পরপ্রদত্ত পরাধীনতার কঠিন আবরণের নিম্নে আপনাকে রাখিলে উন্নতির পথে চলা দূরে থাকু, বাঁচিবে কি প্রকারে? এই কারণে, যে ব্রাহ্মসমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন; যে ব্রাহ্মসমাজের মূল কেন্দ্র হইলেন ভগবান, সেই ব্রাহ্মসমাজ একেশ্বরবাদের বিস্তৃত প্রচারক্ষেত্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতারও এক মহান পত্তনভূমি ও আশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে, এবং স্বাধীনতার একমাত্র ভিত্তিভূমি আত্মপ্রত্যয়কে নিজেরও অন্যতর ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বলিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতা একার্থবাচী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই স্বাধীনতার অর্থে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা নহে—ইহা জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্মের দ্বারা সংযত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে গিয়া মানুষ নিজের দুর্ব্বলতায় সময়ে সময়ে আত্মপ্রত্যয়ের প্রকৃত স্বরূপ না বুঝিয়া, স্বাধীনতার প্রকৃত ভাব হৃদগত করিতে না পারিয়া উচ্ছৃঙ্খলতাকে আলিঙ্গন করে এবং তাহার ফলে নিজের পতনও ডাকিয়া আনে বটে; কিন্তু তাহা ধরিয়া সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে বিচার করিলে চলিবে না। ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বারা সংযত স্বাধীনতারই পক্ষপাতী।

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির যেমন দক্ষিণ পক্ষ হইতেছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, তেমনি তাহার বাম পক্ষ হইতেছে মৈত্রীসাধন অথবা পরিপার্শ্বের সহিত মিলিতভাবে অগ্রসর হওয়া। নিজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং পরিপার্শ্বের উন্নতি পরস্পরসাপেক্ষ। একদিকে নিজের উন্নতি করিলেই তাহার জ্যোতিতে পরিপার্শ্বও আলোকিত হইতে বাধ্য; অপরদিকে পরিপার্শ্বের উন্নতি ব্যক্তিগত উন্নতির সহায়ক এবং পরিপার্শ্বের অবনতি ব্যক্তিগত উন্নতির পরিপন্থী। ভগবানের সংসার এমনই কৌশলে সংরচিত যে, সমস্ত জীবজন্তু—কেবল জীবজন্তু কেন, আমার মনে হয় যে অণুপরমাণু হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকলেই, শুধু নিজেদের উন্নতির জন্য কেন, নিজেদের অস্তিত্বের জন্যই পরস্পরের সাহচর্য্যের উপর নির্ভর করে—পরস্পরের সহায়তা ব্যতীত বাঁচিতে পারে কি না সন্দেহ। জন্মগ্রহণকালেই বল, আর রোগের যন্ত্রণাভোগের সময়েই বল, পরস্পরের সহায়তা ব্যতীত এ সংসারে এক পদ চলাও আমাদের শক্তিতে কুলায় না। পূর্ব্বপুরুষেরা যে জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন সেই জ্ঞানভাণ্ডারের সাহায্য না লইয়া আমরা যদি প্রত্যেকেই প্রথম অবধি প্রত্যেক জ্ঞানবিন্দু নূতন করিয়া আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদের উন্নতি যে সুদূরপরাহত তাহা আর কাহাকেও

বলিয়া দিতে হইবে না। তেমনি আধ্যাত্মিক বিষয়েও পরস্পরের সাহায্য পাইলে যত শীঘ্র উন্নতির পথে চলা যায়, সাহায্য না পাইলে তত শীঘ্র চলা যায় না। প্রধানত আধ্যাত্মিক বিষয়ে পরস্পরের সাহায্য পাইবার জন্যই বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়সকল গঠিত হইয়া উঠে। ব্রহ্মোপাসনা-বিষয়ে প্রধানতঃ পরস্পরের সাহায্য পাইবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। রাজা রামমোহন রায়প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ এই মৈত্রীসাধনের গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই আমরা ব্রাহ্ম সমাজের ট্রষ্টডীডে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ দেখিতে পাই, অপরদিকে তেমনি নির্ব্বৈরসাধনের ব্যবস্থারও বিশেষ চেষ্টা দেখিতে পাই। যদি কোন ব্রাহ্ম কোন কারণে সেই মৈত্রীসাধনে ব্যাঘাত আনয়ন করিয়া ব্রহ্মোপাসকের অনুচিত কার্য্য করেন, তাহার জন্য সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ অথবা ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র নিন্দার্হ হইতে পারে না।

তবেই আমরা দেখিতেছি যে, একেশ্বরবাদকে কেন্দ্রে রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকে মূল লক্ষ্য করিয়া মৈত্রী-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করাই ব্রাহ্মসমাজের জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য। ব্রাহ্ম-সমাজের পূর্ব্বেও এই ভারতবর্ষে অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায় উঠিয়াছে বটে, কিন্তু আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে তাহাদের মধ্যে কোনটাই ব্রাহ্মসমাজের সমগ্র উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হয় নাই—তাহার এক বা একাধিক অঙ্গকেই ভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বে ভারতে যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে, বোধ হয় তাহাদের সকলেরই চরম লক্ষ্য সন্ন্যাস অবলম্বন। কাজেই সেই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, যে, যে মত অবলম্বন করিলে সন্ন্যাসগ্রহণ সহজ হইবে ভাবিয়াছে, সে সেই মতই চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ প্রথম অবধিই সন্ন্যাসগ্রহণের বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদমূলক সত্য-ধর্ম্মকে গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় স্বভাবতই মৈত্রীসাধন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতারূপ দুই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংপ্রতিষ্ঠিত মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকে চরম সাধ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সাধুসন্ন্যাসীগণকে প্রণাম করিয়া আমি বলিতে চাহি যে, অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীর পক্ষে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা যত সহজ, একজন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের পক্ষে সে চেষ্টা তদপেক্ষা অনেক বেশী সহজ—বলিতে গেলে তাহার নিজের ও পারিবারিক জীবন রক্ষার জন্যই সেই চেষ্টা আবশ্যক।

যে উদ্দেশ্য লইয়া ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য, ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিবার জন্য আমরা কি-ই করিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের বৃথা দাঁড়াইয়া থাকা আবশ্যক নাই বলিয়া আমরা ঘোষণা করিতে পারি? মৈত্রীসাধনেই আমরা কতদূর সিদ্ধিলাভ করিয়াছি? আমরা মুখে বলি বটে যে আমরা বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসক; "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং" প্রভৃতি যে শ্রুতিমন্ত্র বর্ত্তমানে ভারতের জাতীয় মিলনের মহামন্ত্রে পরিণত হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজই সেই মহামন্ত্র আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত মৈত্রীসাধনে আমরা অতি অল্পই অগ্রসর হইয়াছি—এত অল্প যে, তাহা স্বীকার করিতেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। যে দিন আমরা আমাদের ছোটখাটো মনের পরদা সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া সত্যসত্য পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিব, বিশ্ববাসীকে একই পিতামাতার সন্তান বলিয়া সত্যসত্য গ্রহণ করিতে পারিব, সেই দিন ব্রাহ্মসমাজের আর প্রয়োজন নাই বলিয়া আমরা স্পর্দ্ধা করিতে পারিব—তাহার পূর্ব্বে নহে।

মৈত্রীসাধনের ন্যায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতারও পথে আমরা খুবই অল্প দূর অগ্রসর হইয়াছি। আজও আমরা সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের বাড়াবাড়ির হাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। পৌরোহিত্যেরও বাড়াবাড়ির মধ্যে আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বলিতে গেলে পা বাড়াইয়া দিতেছি—ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনে যেমন লৌহভীম চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ অতিমাত্র পৌরোহিত্যেরও সমগ্র আলিঙ্গনে পড়িলে আত্মার স্বাধীনতা নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইবে। যে অভ্রান্তবাদ, মধ্যবর্ত্তীবাদ, গুরুবাদ প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ দিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সমস্ত ভ্রান্ত মত দেশকে তো ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে; এমন কি, ব্রাহ্মসমাজেরই কতক অংশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার পরেও কে বলিবে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সংসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে? মানুষেরা নিজেদের দুর্ব্বলতার কারণে, সীমাবদ্ধ হইয়া জন্মিবার কারণেই সমস্ত জীবন আদর্শের সরল উন্নত পথে চলিতে পারে না—তাহারা উঠিবে আর পড়িবে, পড়িবে আবার উঠিবে। কিন্তু পড়িবার সময় উঠা সহজ হইবে বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজকে তাহার আদর্শদীপ উচ্চে ধরিয়া মাথা তুলিয়া থাকিতেই হইবে। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নামে, ব্রহ্মোপাসনার কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে আমরা অনেক চীৎকার করিয়াছি বটে, এবং আজও করিতেছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনের কেন্দ্র করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই? আমাদের

মধ্যে কয়জন সর্বাঙ্গীন উন্নতিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের সকল কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই? তাহা যখন করি না, এবং যতদিন না আমরা তাহা করিব; যতদিন না আমরা ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনের কেন্দ্র করিব, যতদিন না আমরা কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জনকে তুচ্ছ বোধ করিয়া সর্বাঙ্গীন উন্নতিকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া তুলিব, যতদিন না আমরা দেশবাসীর সহিত, বিশ্ববাসীর সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার উপর দাঁড়াইতে পারিব, ততদিন, যিনিই যাহাই বলুন না কেন, সাগরপ্রান্তে বিপদনিবারক পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজকে আদর্শ-দীপহস্তে অবিচলিতভাবে শত সহস্র নিন্দাঝঞ্ঝার মধ্যেও দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, ব্রহ্মেশ্বরবাদের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে হইবে, সর্বাঙ্গীন উন্নতির সরল পথ প্রদর্শন করিতে হইবে, স্বাধীনতার অনুপম আনন্দ সাধারণের উপলব্ধিতে আনিতে হইবে এবং নির্বৈরতার মৈত্রীর অপূর্ব্বশক্তি অসাধারণ বল প্রত্যক্ষ করাইতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সমগ্ররূপে সংসিদ্ধ হয় নাই, তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় নাই বলিয়া আমাদের নিরাশার কোনই কারণ নাই। ব্রাহ্মসমাজ ইতিমধ্যেই যাহা করিয়াছে, তাহারই জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। স্বদেশে বিদেশে, সমস্ত জগতে সরল সবল ধর্ম্মের জন্য যে একটা উন্মুখতা আসিয়াছে, একমাত্র অদ্বিতীয় ভগবানের পূজা করিবার জন্য যে একটা আগ্রহ জন্মিয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, ব্রাহ্মসমাজ তাহার অন্যতর মূল কারণ। ভারতের মধ্যে সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টার যে এক তীব্র অন্তঃসলিল স্রোত চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে যাহার বেগ ভারতের প্রাণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, আমাদের বিশ্বাস যে, ব্রাহ্মসমাজ ঐ যে গৃহে গৃহে সত্যধর্ম্মকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছে, উহা তাহারই ফল। ব্রাহ্মসমাজই যে ভারতভূমিকে মৈত্রীর পথে মিলনের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, সে কথা বোধ করি ইতিহাসজ্ঞ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মসমাজই ভারতবাসীর প্রাণে নবযুগে সর্ব্বপ্রথম স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছে। ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস বর্ত্তমান যুগে ভারতবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতালাভের জন্য প্রথম প্রয়াসের ইতিহাস। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম বিলাতযাত্রা করিয়া, যে পরাধীনতা ভারতবাসীকে বিশ্বজগতে ভগবানের মহিমা-দর্শনে বঞ্চিত রাখিয়াছিল, সে পরাধীনতা হইতে উদ্ধার করিল। যে পরাধীনতা ভারতবাসীকে বেদাদি অধ্যয়ন ও তজ্জনিত জ্ঞানলাভে বঞ্চিত করিয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজই বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি অনুবাদের সহিত সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত করিয়া এবং আত্মপ্রত্যয়কে নিজের সুদৃঢ় ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া সেই পরাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিল। ব্রাহ্মসমাজই মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া, পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগের কথা ঘোষণা করিয়া ভারতবাসীকে আধ্যাত্মিক পরাধীনতা হইতে মুক্তির পথে সহস্র পদ অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

সত্য সত্যই যদি আমরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের মঙ্গলের জন্য, নানাবিধ পরাধীনতা হইতে মুক্তি দিবার জন্য কৃতজ্ঞ থাকি, তবে বর্ত্তমানই তো সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত অবসর। আমাদের কর্ত্তব্য যে, আমরা ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সমগ্রভাবে সংসিদ্ধ করিবার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়োজিত করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমাদের কর্ত্তব্য যে, ভগবানকে আমাদের জীবনের কেন্দ্র করিয়া, মৈত্রীভাব ও স্বাধীনতার উপর দাঁড়াইয়া আমরা আপনাদিগকেও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে পরিচালিত করি এবং সমগ্র জগতবাসীকেও সেই পথের পথিক করিয়া লই।

প্রার্থনা।

(শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দত্ত)

আজিকার এ সুখদ প্রভাতের মত
সকল সুখের ওগো পরম আশ্রয়!
দেখা দাও তুমি মোর অন্তর মাঝার
পূর্ণ করি তৃপ্ত করি সব কামনার
সকল পিপাসাটুকু! ব্যাকুল হৃদয়
হোক্ শান্ত নিরখিয়া হল অপগত
গভীর তমিস্রা রাতি,—মুক্ত পূর্ব্বাশার
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ পশরা লইয়া
বিচিত্র তোরণখানি! হে প্রিয় আমার!
একান্ত বান্ধব পাশে তোমারে লভিয়া
প্রগাঢ় নিবিড়তর, সব জ্বালা আজ
ভুলে যাব মুহূর্ত্তেকে! বিহঙ্গ সঙ্গীতে
বিকশিত পুষ্পদলে মোর সারা চিতে
উৎসর্গ করিব তোমা, প্রেম-অধিরাজ!

পরমেশ্বর বিশ্বরক্ষক।

(ডাক্তার স্যার রামকৃষ্ণ জি ভাণ্ডারকর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেহস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায় ॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।১৭

তিনি বিশ্বময়, শাশ্বত সত্তাধারী, জ্ঞানী, সর্ব্বব্যাপী, এই ভুবনের পালনকর্ত্তা, তিনিই নিত্য জগৎকে শাসন করিতেছেন। শাসনের অন্য হেতু নাই।"

পরমেশ্বর, অগ্নি জল বায়ু প্রভৃতিকে নিয়মে রাখিয়া, তাহাদিগকে স্থানভ্রষ্ট হইতে না দিয়া এই বিশ্বকে পালন করিতেছেন। এবং সমস্ত জীব জন্তুর যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা তিনি উৎপন্ন করিতেছেন। তাহা সমস্তই বিশ্বের মধ্যে আছে: সেই অনন্ত যোজন দীর্ঘ আকাশ মণ্ডলের মধ্যে আছে। একমাত্র তিনিই সকলের রাজা। এই অনন্ত বিশ্বের ব্যবস্থা করিতে সেই অনন্ত শাশ্বত পুরাণ পুরুষই সমর্থ। এই সামর্থ্য অন্য কাহারও নাই।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী।

যস্মাৎপরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর ৩৮

"যাঁহার পর আর কেহ নাই, যাঁহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম কিংবা বৃহৎ আর কেহ নাই—এইরূপ এক পুরুষ, বৃক্ষ যেরূপ নিশ্চল সেইরূপ নিশ্চল এবং দিব্য মহিমাবিশিষ্ট। সেই পুরুষের দ্বারাই এই সমস্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে।"

পরমেশ্বরের অপেক্ষা বৃহৎ আর কে? পৃথিবীতে কোন এক মনুষ্য বড় রাজাধিরাজ, তাঁহার শাসন চারিদিকে সকল লোকেই মানিতেছে, তিনি সুন্দর বড় বাড়ীতে বাস করেন, অনেক মনুষ্য তাঁহার সেবায় তৎপর, সর্ব্বপ্রকার বিষয়ই তাঁহার অনুকূল, ঐহিক সুখের সমস্ত সাধন তাঁহার সুলভ; এইরূপ হইলেও যে বিশ্বের মধ্যে এই সমস্ত পৃথিবী সমুদ্রের এক জলবিন্দুবৎ, সেই অসীম বিশ্বকে যিনি একতন্ত্রে শাসন করিতেছেন, যাঁহার সামর্থ্য অচিন্তনীয়, সেই পরমেশ্বরের বৈভবের নিকট এই রাজার বৈভব কত তুচ্ছ ও হাস্যাস্পদ! এবং পরমেশ্বর এত বড় বলিয়া, ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি যে তাঁর লক্ষ্য নাই, তাহারা তাঁহার আজ্ঞায় চলে না, তাহাদের মধ্যে তাঁহার আশ্চর্য্য লীলা দৃষ্টিগোচর যে হয় না এরূপ নহে। তাঁহার রচনা ও যোজনা সূর্য্যের ন্যায় বিশাল পদার্থের মধ্যে যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ, এমন কি তাহা অপেক্ষাও অধিক,—জলের এক বিন্দুর মধ্যে, যেকোটি কোটি প্রাণী সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্মবীক্ষণ যন্ত্রযোগেই দৃষ্ট হয়, সেই সব ক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যেও সেই রচনা ও যোজনা দেখিতে পাওয়া যায়। এবং আজকাল যেরূপ অনুসন্ধান চলিতেছে তাহা হইতে জানা যায় যে, বড় বড় রোগের অত্যন্ত সূক্ষ্ম বীজ ভূমির মধ্যে এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিতি করে; রোগেরই বীজ থাকে এরূপ নহে, আরোগ্য উৎপাদক বীজও থাকে। বিশ্বের সমস্ত দেশে ঈথর বলিয়া এক অত্যন্ত বিরল পদার্থ আছে যাহা সূক্ষ্মবীক্ষণ যন্ত্রযোগেও দেখা যায় না। তাহার মধ্যে, যে আলোক পদার্থ আমরা উপলব্ধি করি, সেই আলোক পদার্থ অত্যন্ত বেগযুক্ত লহরী উৎপন্ন করে এবং সেই লহরী আসিয়া আমাদের চক্ষের উপর আঘাত করিলে আমাদের আলোকের জ্ঞান হয়। এই সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থ ঈশ্বরের শাসনাধীন এবং উহা সূক্ষ্ম হইলেও তাহা হইতে স্থূল, বৃহৎ, সকলের অনুভবযোগ্য পরিণাম উৎপন্ন হয়।

অতএব পরমেশ্বরের নিকট সূক্ষ্মতা ও বিশালতা গণনার মধ্যে নাই। তিনি সর্ব্বত্র সমান পরিব্যাপ্ত। অণুরেণুর মধ্যেও তাঁহার প্রভাব দেদীপ্যমান। তাই, তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং বিশাল হইতেও বিশাল; তিনি সর্ব্বব্যাপী; আর কিছুরই সহিত তাঁহার মহিমার তুলনা নাই। তিনি অনুপম, তিনি অপ্রতিম। তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব মানব-বুদ্ধির অগোচর।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

মিশ্র বেহাগ—তেওরা।

তোমার ভাতি নীরব রাতে বিছানো আছে গগন মাঝে।
মেঘেরা ভেসে চলিছে হেসে কে জানে কোন্ অজানা দেশে॥
জোছনা খেলে মেঘের কোলে দেখিয়ে গানে জাগিছে প্রাণে।
কাটাব আমি সারাটী যামি উরধ মুখে পরম সুখে॥
ধরণী ছেড়ে বেড়াব খেলে মেঘের সনে পাগল মনে।
ফুলের পুটে সুবাস লুটে হরষে টুটে বাতাস ছুটে॥
তোমারে ঘেরি তারকা সারি দিতেছে বলি, চরণে ঢালি॥

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II র্সা র্সা না। ধনা -ধপা। পা -া I পা মা মপা। গাঃ -রঃ। সা -া I
তো মা র ভা •• তি • নী র ব• রা • তে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা ন্‌া ন্‌া। সা -া। গা -মা I পা র্সা র্সা। না -ধনা। পা -া II
বি ছা নো আ • ছে • গ গ ন মা •• ঝে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II { পা ধা পা। না -া। না -া I না র্সা র্রা। র্সনা -নর্সা। র্সা -া I
মে ঘে রা ভে • সে • চ লি ছে হে• •• সে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা র্সা র্সা। র্গা -া। -র্গর্মা -র্মর্পা I র্গা র্গা র্গা। র্গাঃ -র্রঃ। র্সা -া } I
কে জা নে কো • •• •ন্ অ জা না দে • শে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা র্সা র্সা। র্সা -া। র্গর্সা -া I র্সা না ধা। না -ধা। পা -া I
জো ছ না খে • লে • মে ঘে র কো • লে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা সা। গা -া। গমা -পধা I মপা পা মা। গাঃ -রঃ। সা -া II
দে খি য়ে গা • নে• •• জা গি ছে প্রা • ণে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II { সা সা ন্‌া। গা -া। গা -মপা I পা পা পা। পা -পা। ধপা -র্সপা I
কা টা ব আ • মি •• সা রা টী যা • মি• ••

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ধা ধা পা। ধা -পা। মপা -া I মপা মা গা। রা -গমা। মা -া I
উ র ধ মু • খে • প র ম সু •• খে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I গা গা গা। গা -া। গাঃ -রঃ I গা গা গা। গাঃ -রঃ। গা -মপা I
ধ র ণী ছে ০ ড়ে ০ বে ড়া ব খে ০ লে ০০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মা মা গা। গা -রা। গমা -পধা I মপা পা মগা। গাঃ -রঃ। সা -া } I
মে ঘে র স ০ নে০ ০০ পা গ ল০ ম ০ নে ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I { পা ধা পা। না -া। না -া I না র্সা র্রা। র্সনা -নর্সা। র্সা -া I
ফু লে র পু ০ টে ০ সু বা স লু০ ০০ টে ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা র্সা র্সা। র্গা -া। র্গর্মা -র্মর্পা I র্গা র্গা র্গা। র্রগাঃ -র্রঃ। র্সা -া } I
হ র ষে টু ০ টে০ ০০ বা তা স ছু ০ টে ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা র্সা র্সা। র্সা -া। র্রর্সা -া I র্সা না ধা। না -ধা। পা -া I
তো মা রে যে ০ রি ০ তা র কা সা ০ রি ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা সা। গা -া। গমা -পধা I মপঃ পা মা। গাঃ রঃ। সা -া II II
দি তে ছে ব ০ লি০ ০০ চ র ণে ঢা ০ লি ০

পরহিতব্রত

পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

উপক্রমণিকা।

জগতে সচরাচর দুইশ্রেণীর বড়লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একশ্রেণীর বড়লোক আছেন যাঁহারা জগতের উপকার করিয়া থাকেন কিন্তু তাহার বিনিময়ে যশেরও কামনা করেন। যশের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা অন্যান্য অনেক বিষয়ে স্বার্থ-ত্যাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। উচ্চতন যশো-লাভের সহিত তাঁহাদের পরহিতৈষণাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

আর একশ্রেণীর বড়লোক আছেন যাঁহারা নীরবে জগতের হিতসাধন করিয়া যান। তাঁহারা কখনও যশের কামনা করেন না। সৎকার্য্য সম্পাদনজনিত সন্তোষই তাঁহারা যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া বিবেচনা করেন। অন্য লোকে পাছে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দেখিয়া প্রশংসা করে এই ভয়ে যেন তাঁহারা সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর বড়লোকেরা সর্ব্বদা লোক-চক্ষুর সম্মুখে থাকেন, তাঁহাদের যশঃপ্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া থাকে। শেষোক্ত শ্রেণীর বড়লোকেরা সর্ব্বদা আত্মগোপন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নীরব জনহিতসাধনার ইতি-হাস কদাচিৎ সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। তথাপি, যাঁহারা সৌভাগ্যবলে কখনও শেষোক্ত শ্রেণীর কোন মহাত্মার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিবেন যে এই শ্রেণীর মহাপুরুষগণ মানবহৃদয়ে যেরূপ গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে পারেন, মানবের জীবন-পথ যেরূপে আলোকিত করিতে পারেন, আর কেহই সেরূপ পারেন না। সূর্য্যের প্রতি-ফলিত জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া যখন পূর্ণিমার চন্দ্র সগৌরবে উদিত হয় তখন আমরা কয়জন

অস্তাচলগত দুনিরীক্ষ্য ভাস্করের নিকট তাহার ঋণের কথা স্মরণ করি? যে সকল পরহিতব্রত নীরব সাধকের যত্ন, চেষ্টা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আমাদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, আমরা কয়জন সেই নীরব কর্ম্মীদিগের নিকট তাঁহাদের ঋণের কথা স্মরণ করি?

আমাদের দেশের আদর্শ, প্রতীচ্য আদর্শ হইতে বিভিন্ন। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে, আমাদের নীতি-শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই নিষ্কাম কর্ম্মের প্রাধান্য ও প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমরা পূর্ব্ব আদর্শ হইতে বোধ হয় বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছি। সেই জন্য অনেক সময়ে যাঁহারা নিষ্কামভাবে নীরবে পরহিতব্রত পালন করিয়া যান তাঁহাদের উপযুক্ত পূজা করি না—তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি না।

আমরা যে মহাত্মার জীবন-কথার আলোচনা করিবার মানসে বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি, তিনিও চিরদিন নীরবে দেশের কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে তিনি এক হিসাবে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিলেও তাঁহার যশঃসৌরভ অনেকের ন্যায় তাদৃশ বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা সৌভাগ্যবলে তাঁহার কার্য্যের পরিচয়-লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন এক গৌরবময় আসন অধিকার করিয়া থাকিবে। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব্ব মনীষা, মহান্ স্বার্থত্যাগ ও পরহিতচিকীর্ষা, বিদ্যোৎ-সাহিতা ও শিক্ষাবিস্তারে অসীম আগ্রহ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সরল, উদার ও কমনীয় স্বভা-বের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার। তাঁহার নীরব জনহিতসাধনার ইতিহাস সঙ্কলন করা অতিশয় দুঃসাধ্য। আমরা তাঁহার জীবন কথা যতটুকু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই আজি আমাদের অক্ষম লেখনীর সাহায্যে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

হুগলী জিলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমায়, দ্বারকেশ্বর নদীর তটভূমিতে অবস্থিত রাধানগর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। পূর্ব্বে সাধারণে এই গ্রামের নামও জানিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি বলিয়া এক্ষণে উহা ভারতবর্ষবাসীমাত্রেরই মহাতীর্থ-রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। মনীষী রমাপ্রসাদ রায়, ভক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ধন্বন্তরীকল্প ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি বহু বঙ্গবিখ্যাত মনীষীর জন্ম-স্থান বা শৈশবের লীলাভূমি বলিয়া বঙ্গবাসীর নিকট এই তীর্থক্ষেত্রের মহিমা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই রাধানগরের উপকণ্ঠে সাহানপুর নামক স্থানে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে (১২৩২ বঙ্গাব্দে) প্রসন্নকুমার তদীয় মাতামহ গোপীমোহন ঘোষ মহাশয়ের আবাসে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রসন্নকুমার সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে বংশে তিনি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আদিশূর কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন তাঁহাদের সহিত পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে দশরথ বসু অন্যতম। ইনিই বাঙ্গালা দেশের যাবতীয় 'বসু' উপাধিধারী কায়স্থগণের আদিপুরুষ।

কথিত আছে যে দশরথের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ সুরেশ্বর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে উড়িষ্যার দেওয়ান বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তদীয় সহোদর ঈশানেশ্বর তখন দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহের উজীর ছিলেন। সুরেশ্বরের শাসনকালে উড়িষ্যায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁহার চেষ্টায় পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রাচীরবেষ্টিত হয় এবং উড়িষ্যার প্রশস্ত রাজবর্ত্মসমূহ নির্ম্মিত হয়। জগ-ন্নাথদেবের মন্দিরের পুরোহিতগণ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ সুরেশ্বরকে এই মন্দিরে অবাধ প্রবেশাধিকার প্রদান করেন এবং এই সম্মানজনক অধিকার সুরে-শ্বরের বংশধরগণ এখনও ভোগ করিতেছেন। সুরেশ্বরের বংশধরগণ এই সময় হইতে আরও একটি সম্মানজনক অধিকার লাভ করেন। সচরাচর কাহাকেও মন্দিরের অভ্যন্তরে মস্তকে ছত্রস্থাপন করিতে দেওয়া হয় না; কিন্তু সুরেশ্বরের সময়

হইতে তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করিলে তাঁহাদের সম্মানের জন্য মস্তকে ছত্র স্থাপিত হইয়া থাকে। সুরেশ্বর যেরূপ লোকরঞ্জন শাসনকর্ত্তা ছিলেন সেইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া দিল্লির বাদশাহ বার্ষিক তিলক্ষাধিক আয়ের রঘুনাথপুরের জমিদারী জায়গীর ও বংশানুক্রমে 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধি প্রদান করেন। 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধি দ্বারা এই উপাধিধারীদিগের সর্ব্ববিষয়ক শ্রেষ্ঠতা সূচিত হয়।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় তৎসম্পাদিত 'তীর্থভ্রমণ' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে প্রাগুল্লিখিত প্রবাদের মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই সিদ্ধান্ত কোন্ যুক্তিমূলক জানি না; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ হইতে সম্ভ্রান্ত সর্ব্বাধিকারী বংশের প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইতেছে সন্দেহ নাই।

উনবিংশ পর্য্যায়ে রত্নেশ্বর সর্ব্বাধিকারী সর্ব্বপ্রথমে উড়িষ্যা হইতে হুগলী জিলায় রাধানগরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বেশ্বর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের জমিদার সিংহবংশীয় কিশোর রায়ের কন্যাকে আদ্যরসে বিবাহ করেন।

এই বংশের (২৩ পর্য্যায়ে) রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। শেষোক্ত ভাষায় অসাধারণ অধিকারের জন্য তিনি "মুন্সী রামনারায়ণ" এই গৌরবজনক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুন্সী রামনারায়ণ রাজা রামমোহন রায়ের পিতা, স্বগ্রামবাসী মুন্সী রামকান্ত রায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রামনারায়ণ অতি পরোপকারী ও ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দরিদ্রগণকে বিদ্যাদানের জন্য রাধানগরে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং অনেক ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার ভার সানন্দে বহন করিতেন। উনি কর্ম্মসূত্রে কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। এই স্থান এখনও মুন্সীর বাগান নামে পরিচিত। এই স্থানে অবস্থিতিকালে রামনারায়ণ স্বীয় ব্যয়ে মুন্সীর বাগান হইতে ওয়াটগঞ্জ পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই রাস্তা এক্ষণে 'মুন্সীগঞ্জ' রোড নামে খ্যাত। শুনা যায়, এই রাস্তা নির্ম্মাণে রামনারায়ণের লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই অর্থ প্রত্যার্পণ করিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

মুন্সী রামনারায়ণ আভিজাত্য বৃদ্ধির জন্য স্বীয় বংশের প্রথানুসারে "নবরঙ্গ কুল" করেন। অর্থাৎ পুত্র-কন্যা নয়টীকে পর্য্যায়ক্রমে উপযুক্ত কুলীন পাত্রী ও পাত্রে বিবাহ দেন। তিনি যে নবরঙ্গ কুল করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতীর খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী নবকিশোর ঘোষের পুত্র কালিপ্রসাদ ঘোষের সহিত বিবাহ হয় এবং তাঁহার পঞ্চম কন্যা গোলকমণির হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পিতামহের সহিত বিবাহ হয়। দেওয়ান তুলসীরাম ঘোষের পুত্র শিবপ্রসাদের সহিত রামনারায়ণের অপর এক কন্যার বিবাহ হয়। এই কন্যার গর্ভে বিখ্যাত কবি কাশীপ্রসাদ * জন্মগ্রহণ করেন। নবরঙ্গ কুল করিবার জন্য রামনারায়ণকে বিস্তর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল।

অপরিমিত দানশীলতার ফলে রামনারায়ণ অধিকাংশ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় রামনারায়ণ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধারযোগ্য :—

"কথিত আছে, খাজনার টাকা কিছু কম থাকাতে রামনারায়ণ পুত্র মদনমোহনকে অর্থসংগ্রহ করিতে বলেন। মদনমোহন নিজে টাকার জোগাড় না করিয়া শ্বশুরের নিকট হইতে আনিয়া দেন এবং পিতার নিকট তাহা উল্লেখ করেন। উপযুক্ত পুত্র অন্য উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিবার উপায় সত্ত্বেও বৈবাহিকের নিকট ঋণ করিয়াছে বলিয়া খাজনার টাকা খাজানাঘরে আবদ্ধ রাখিয়া রামনারায়ণ তাহার চাবি পুকুরে ফেলিয়া দেন। পুত্রকে অনুমতি করেন যে, চাবি খুলিয়া অগ্রে তাঁহার শ্বশুরের টাকা যেন প্রত্যর্পণ করা হয়, কারণ এরূপ অবস্থায় বিষয়রক্ষা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে জ্যেষ্ঠ পুত্র

* সন ১৩২৩ সালের কার্ত্তিকের যমুনায় আমরা কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের জীবন-কথা প্রকাশিত করিয়াছি। লেখক।

মদনমোহনের উপর রাগ করিয়া কটক জেলার রঘুনাথপুর ও অন্যান্য অধিকাংশ সম্পত্তির রাজস্ব না দিয়া লাটে চড়াইয়া বিক্রয় করাইয়া দেন।"

রামনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনমোহন সদর আমীনের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। মদনমোহনের পুত্র সীতানাথ প্রথমে রাজপ্রতিনিধির দেওয়ান এবং পরে মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম হুমায়ুনজার দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইনি রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র মথুরামোহন ভূকৈলাসের ঘোষালদিগের জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ইঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী প্রসন্নকুমারের জনক।

যদুনাথ ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে (১২১২ বঙ্গাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তাৎকালীন রীত্যনুসারে তিনি সংস্কৃত ও পারস্যভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে রাধানগরের নিকটবর্ত্তী সাহানপুর গ্রামে কৃতনিবাস গোপীমোহন ঘোষের কন্যা লবঙ্গলতাকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে চারি পুত্র প্রসন্নকুমার, সূর্য্যকুমার, আনন্দকুমার, রাজকুমার ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি হুগলীর গুড়োপ গ্রামে প্রসিদ্ধ নাগবংশীয় জমিদার বাড়ীতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে তাঁহার চারিপুত্র—অক্ষয়কুমার, অমৃতকুমার, অনন্তকুমার ও উপেন্দ্রকুমার এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ নিম্নে একটি বংশলতা মুদ্রিত হইল।

১। দশরথ বসু
|
২। শ্রীকৃষ্ণ
|
৩। ভব
|
৪। হংস
|
৫। শুক্তি (বালাণ্ডা) ৫। মুক্তি (মাহীনগর) ৫। অলঙ্কার (বস)
|
৬। দামোদর
|
৭। অনন্ত
|
৮। গুণানন্দ
|
৯। মাধব
|
১০। লক্ষণ
|
১১। মহীপতি
|
১২। সুরেশ্বর
|
১৩। বিশ্বনাথ
|
১৪। জন্মেজয়
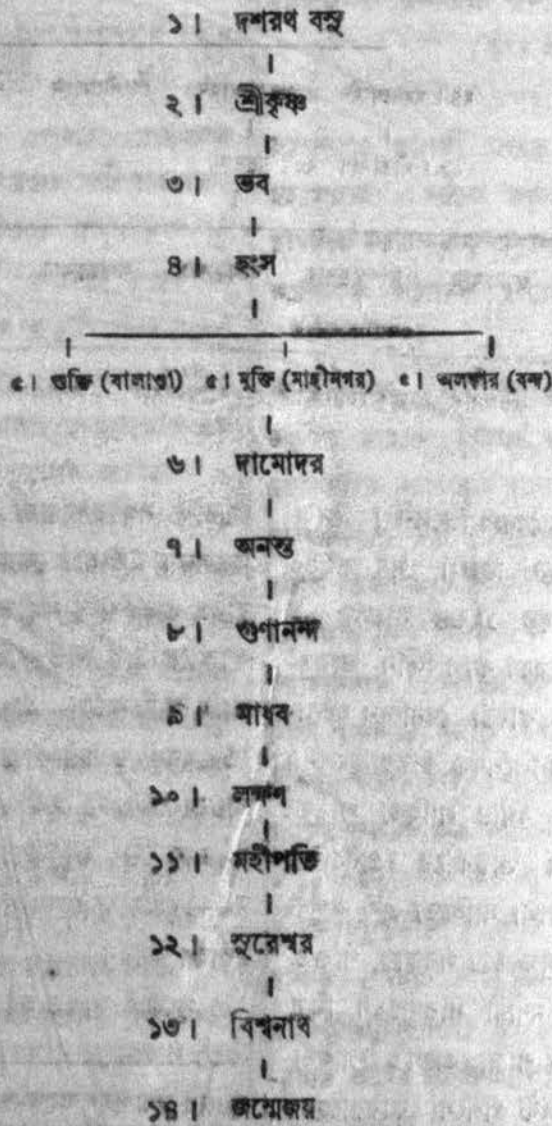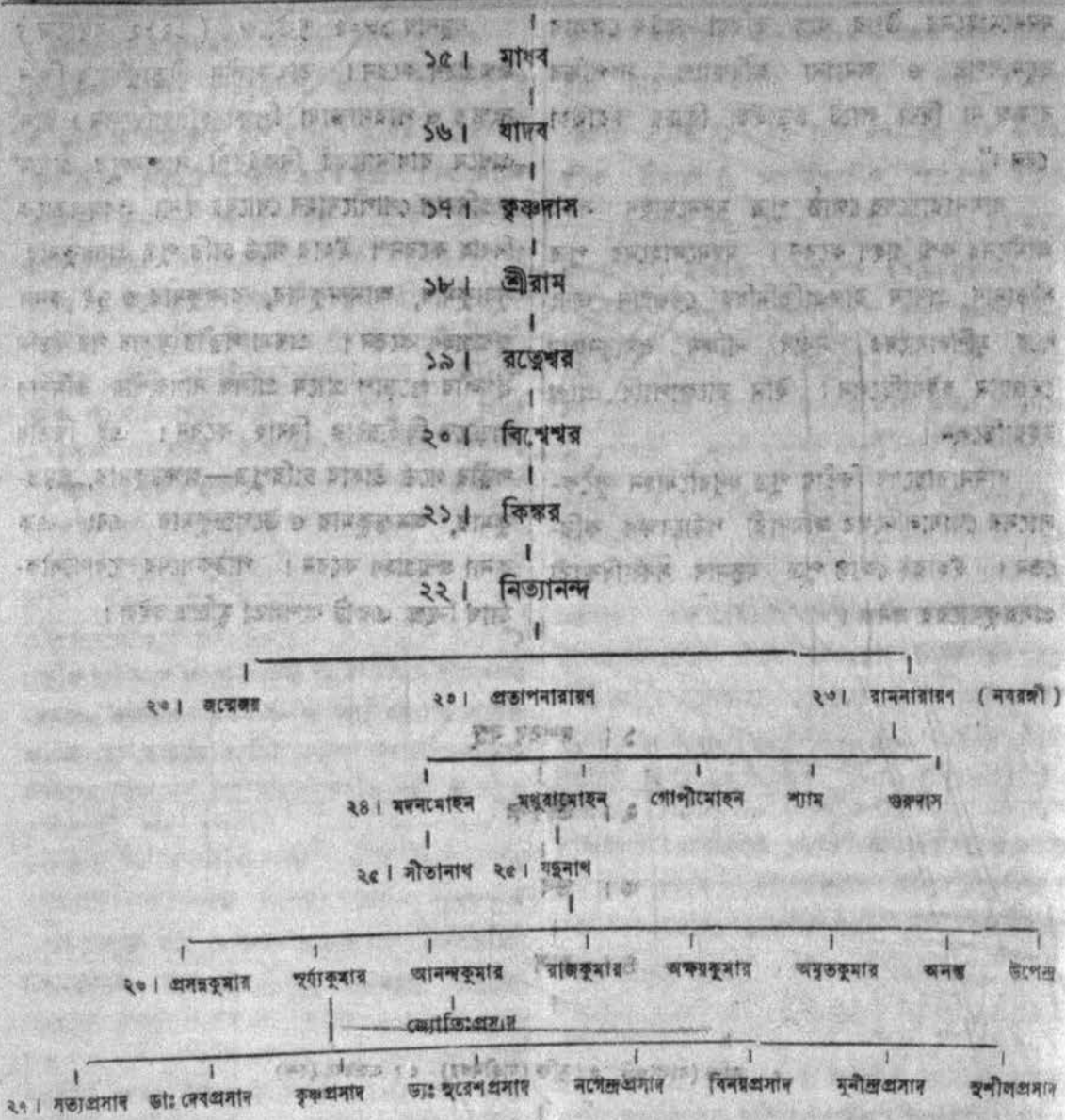
যদুনাথ অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। দেবদ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। সন ১২৬০ সালের ১১ই ফাল্গুন হইতে ১২৬৪ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত প্রায় চারিবর্ষ কাল তিনি ভারতবর্ষের নানা তীর্থ সন্দর্শন করিয়া দৈনন্দিন ঘটনাসমূহ তাঁহার রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই রোজনামচা সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক 'তীর্থভ্রমণ' নামে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব জিনিষ। সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পণ্ডিতবর তারাকুমার কবিরত্ন, মনীষী সারদাচরণ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ এই গ্রন্থের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। যদুনাথ সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ও সঙ্গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসন্নকুমার তাঁহার রচিত কতকগুলি সঙ্গীত 'সঙ্গীত-লহরী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। যদুনাথ কয়েকখানি গীতিনাট্যও প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'উষাহরণ' ও 'চন্দ্রকান্ত' উল্লেখযোগ্য। যদুনাথের রচিত সুললিত সঙ্গীতগুলিতে তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, রসজ্ঞান ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭১খৃষ্টাব্দে ঝুলনপূর্ণিমার দিবস যদুনাথ স্বর্গারোহণ করেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে রাধানগরের উপকণ্ঠে সাহানপুর নামক গ্রামে মাতামহালয়ে প্রসন্নকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সূতিকাগারের নিকটে

একটি প্রচুর ফলবান কাঁঠাল বৃক্ষ বহুদিবস পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। গ্রামের লোকপরম্পরায় এই একটি কথা প্রচলিত ছিল যে, যে স্থানে প্রসন্নকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ঐ স্থানটি অতি তেজস্কর সেইজন্য কাঁঠাল বৃক্ষটি এত ফলবান।

প্রসন্নকুমারের জন্মকালে তাঁহার প্রপিতামহ মুন্সী রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী জীবিত ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি জীবিত থাকায়, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিবার প্রয়োজন না থাকায়, প্রসন্নকুমারের অন্নপ্রাশনের সময় তিনি তাঁহার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের সহিত একত্র আহার করিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহার অন্নপ্রাশনের অন্য কোন কার্য্য হয় নাই।

প্রসন্নকুমার অল্পবয়সেই মাতৃহীন হন। প্রসন্নকুমারের জননী লবঙ্গলতা অতি পবিত্রস্বভাবা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। প্রসন্নকুমার অধিক কাল এই সাধ্বী রমণীর স্নেহময় অঙ্কে বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সহোদর ও সহোদরাদিগের এ বিষয়ে ক্ষোভের কোন কারণ ছিল না। কারণ, প্রসন্নকুমার বাল্যকাল হইতেই অতি ধীর, শান্তপ্রকৃতি, কোমল-হৃদয় ও স্নেহশীল ছিলেন এবং তাঁহার যত্নে ও স্নেহে তাঁহার সহোদর সহোদরাগণ কখনও মাতৃস্নেহের অভাব অনুভব করেন নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয় বলেন যে তাঁহার সহোদরগণকে 'মানুষ' করিয়া তুলিতে প্রসন্নকুমারের চরিত্রের যে সকল বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়াছিল, সে গুলির প্রতি স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার প্রতি আমাদিগকে শ্রদ্ধাপরায়ণ করিয়া তুলে।

প্রসন্নকুমার প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় হৃদয়রাম মজুমদার নামক একজন গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ভাষা ও শুভঙ্করী শিক্ষা করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই সুশীল সুবোধ ও অধ্যবসায়শীল ছিলেন। পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রসন্নকুমার রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট তাঁহার রঘুনাথপুরস্থ বাটীতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে) প্রসন্নকুমারের পিতামহ মথুরামোহন তাঁহাকে রীতিমত ইংরাজী শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত কলিকাতায় লইয়া আসেন। কলিকাতায় আগমন করিবার কিছুদিন পরে প্রসন্নকুমার তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রাজা সীতানাথ সর্ব্বাধিকারীর সাহায্যে হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন।

প্রসন্নকুমারের পিতামহ খিদিরপুরে থাকিতেন। চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক প্রসন্নকুমার প্রত্যহ পদব্রজে খিদিরপুর হইতে পটলডাঙ্গায় হিন্দুকলেজে পড়িতে আসিতেন। এই সময় তাঁহাকে কিরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু প্রসন্নকুমারের জ্ঞানপিপাসা এত প্রবল ছিল যে তিনি এই পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়া গণ্য করিতেন না। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে প্রসন্নকুমার তাঁহার পাঠ্য পুস্তকগুলি কণ্ঠস্থ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বাটী ফিরিয়া রন্ধনাদিও করিতে হইত। অত্যধিক পরিশ্রমবশতঃ তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়। তজ্জন্য তিনি খিদিরপুর পরিত্যাগ করিয়া শ্যামবাজারে তাঁহার আত্মীয় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের বাটীতে অবস্থান করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকেন। তিনি যে গৃহে পাঠাভ্যাস করিতেন সেই গৃহে অনেকগুলি চঞ্চলমতি বালক নানাপ্রকার বাজে গান গল্প করিয়া তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত করিত। এইজন্য প্রসন্নকুমার প্রতিদিন সকলে নিদ্রিত হইবার পর অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া অসাধারণ মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠাভ্যাস করিতেন। প্রদীপের তৈল নিঃশেষিত হইলে মধ্যে মধ্যে জ্যোৎস্নালোকে বা রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া গ্যাসের আলোকে পাঠাভ্যাস করিতেন। কি অদ্ভুত সাধনা! কি অপূর্ব্ব অধ্যবসায়! আজকাল এ সকল কথা উপন্যাসের ন্যায় কাল্পনিক বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, এ সকল কথা তিনি প্রসন্নকুমারের নিজমুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং উহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

(ক্রমশঃ)

Worship.

THE REV. JAMES HARRY HOLDEN.

Worship has its passive and its active moods. In its passive mood, it is a waiting upon God; an attitude of receptivity towards truth; a waiting for the dews of the spirit to distil upon the soul; a readiness to have God enter the chambers of consciousness and make His appeal to the unorganized will. It is the "listening ear" which is the "secret of the golden tongue." In its active mood, worship is a reaching forth: an intense, eager listening, a searching for a revelation; an appropriation of the spirit;

a purposeful effort to obtain help in so organizing the will as to identify it with the will Universal. Worship is an art, too, as well as a duty. As a whole, viewed in its passive and its active moods, the ultimate aim of worship is to bring the individual soul into conscious dynamic relations with God; to fortify man against the appeals of all that is of the earth earthy; to help him to maintain the integrity of his life; and to bring every child of the Infinite back from the desolations of selfishness into the cumulative satisfactions of a life lived in accordance with the standards of the Christ's religion. Worship should help to grow character. "Who rises from prayer a better man *his* prayer is answered." Worship has served, if it has not fulfilled its purpose, when the worshiper turns from the altar feeling that something vital and real has been added to his equipment for life's tasks, that he has been strengthened for life's varied experiences, and protected against the world's seductive appeals.

A well ordered, carefully balanced Service of Worship will serve this ultimate purpose of worship; no part, no feature of the service will offend the requirements of art, interfere with the play of the Great Spirit upon the spirit of the individual, or obscure the reality for which that soul is searching. It will be so carefully woven together as to make an impression of a *whole* and not of various parts, up n those who worship. In such a Service of Worship, there are no preliminaries, and no accessories. Each part is a contributing part, and helps to generate the atmosphere and to create the impression of a unit.

How can the sermon, make such a contribution to the essential unit, and serve the large purpose of worship? How can the sermon so help to unify the Service of Worship that it may answer the deep needs of the human soul for "ideal companionship, moral reinforcement, inner harmoney or peace, forgiveness and moral recovery, moral leadership, and the desire for the preservation of all values?"

The Service of Worship may answer these needs, the atmosphere may be saturated with the spirit of worship, warm with the fires of divine sympathy, and appealing in its reverent fervor, until the minister begins to preach, when every one will be conscious of a distinct letting down. The atmosphere changes, icicles begin to from, people draw their garments a bit closer about them, and, feeling a draught, look around to see who has left a door or a window open. The whole service may drop from the high plane of the Eternal Realities to the humdrum routine of the very commonplace; the invisible line which is stretched from the aspiring human soul to the Great Soul of the Universe may be severed, and the worshipper may be made to feel a sense of soul loneliness, and begin to wish that he had not come, and all because of the way in which the minister begins the sermon. The approach to the sermon either helps to unify or it tends to interfere with the unity of the service.

There are three points to which attention may be invited when thinking of the part which the sermon is to play in this drama of worship.

1. *The Message.* There is the truth to be proclaimed; the duty to be emphasized; the sin to be rebuked; the doubts to be banished; the faith to be enthroned; the will to be enlisted. It is imperative that the minister be quite sure that he has a message and that he has it developed and organized. The man who enters the pulpit not knowing what he is to preach about, but expects the tides of inspiration to flow towards him and to flood his mind with a theme pertinent and well developed, is a religious faker. He may get along fairly well for a time, he may be in luck, and able to say worth while things, but it is absolutely sure that more frequently he will find to his dismay that the tides are ebbing, and if he does not know it, the congregation will be speedily made aware of the fact that he is high and dry upon the rocks. The message must be thought out, thought through, prepared, well in hand. That the spirit of worship may be kept warm and inspiring, the message should be a modern message, not one that has gathered mildew by being buried in the proverbial barrel. Sermons repeated "on request" may serve a splendid purpose at times. But a too frequent repetition of the same sermon to

the same people may invite slumber, and it will not inspire courage and enthusiasm, nor will it help to keep the fires of worship burning brightly. Moreover, a distinctly partisan message, persistent discussion of social fads and grievances, a too frequent and emphatic consideration of industial or economic problems and burdens, does not magnify the idea of worship. The question as to whether these themes should be looked upon as out of place for the pulpit discussion is not under consideration. No theme which is born of the needs of humanity is out of place in a Christian pulpit. But the matter under consideration at present is the contribution which the sermon is to make towards the spirit of worship. Any discussion which arouses animosity, appeals to selfish prejudice, or aims at the development of class antagonism, will not help to unify the Service of Worship. The sermon is to teach truth, most assuredly ; it must urge the application of truth to life in its every day realities and experiences ; and it must seek to project upon life some rich vision caught from the Land of the Ideal, if it is to send the worshipper from the sanctuary feeling that he has received a baptism of the spirit, and that his life has somehow been reinforced, newly equipped for the morrow's conflict. Moreover, the message is not complete until it has made an appeal which will direct the worshiper to keep firm hold of God's hand, and to recognize the necessity of soliciting orders from the Heights every day.

II. *The Manner*. The message being well in hand, the question then arises as to the manner in which that message shall be given. It should be given as a message and not as an exhibition. The manner of the preacher should express an eagerness to make appeal to the individual consciousness, but not burdened by the necessity of putting on a pulpit air or calling to his aid a pulpit voice. These never help. They always tend to turn back the tides of the spirit. Let the preacher be himself, and always his best self. Let him be natural. But let him remember that a sane and wise art may assist nature to express herself.

Shall the message be read or spoken ? The ideal method to my mind—is to preach without a manuscript. But each man must learn for himself how he can proclaim his message to the best advantage. Each man must work in the harness which fits him. A method which breeds self-consciousness is sure to interfere with the message. Let no man offend against good taste. If a manuscript is used, let it be an orderly one, and not a heterogeneous mass of notes written upon waste scraps of paper. If, on the other hand, a preacher has earned the right to preach without a manuscript (and this right must be earned), let him be well assured of full-time preparation.

But how shall he begin ? Some men say : "You will find the words of my text in the first book of Kings, the twelfth chapter, and the fifteenth verse." But why take so long to get started ? As a matter of fact, no man really wishes his congregation to take up their Bibles, just as he is beginning to preach, turn to neighbours and ask what he said, then consult the table of contents, and proceed to search for the passage indicated. He is not starting a Bible hunt, but, as a disciple of Jesus Christ, as a prophet of righteousness, he is seeking to establish a quick point of contact with his hearers claiming their attention, that he may tell them what he is convinced may at once interest, inspire and help them. He is asking their co-operation with him and with God, that a transformed social order, a transfigured humanity, and the establishment of the Great Commonwealth of the Spirit, may be assured. Let the text, if stated, be given clearly but with such brevity as the text makes possible.

The beginning is important, but not more so than the finish. If the atmosphere is to be kept strong and buoyant with the real spirit of worship, then the minister must stop when he is through. Many a spledid sermon has lost the effectiveness of its appeal, because the appeal did not come soon enough ! We cut the cord which binds the soul consciously with God when we forget to stop. When the attentive ear has become inattentive, and the listening mind has become restless, then the purpose of the service has been sacrificed, and the influence of the sermon as a contribution

to the Service of Worship has been dissipated.

III. *Spirit and Motive.* Every sermon should be saturated with a love for God and a love for mankind. It should radiate the warmth which a passion for humanity will help to generate. The real motive must not be to emphasize the preacher, but to emphasize truth, exalt life as a divine privilege, bring faith into clear relief as a workable factor in daily experiences, and help to make God a near-by and pervasive Reality. As a structural part of a Service of worship, the sermon should make such an appeal to the potential powers of men as to send them back to their tasks resolved to magnify their best in all human relations. It should also strengthen in each one the consciousness of need, and help men to feel that the poise of their life can be maintained and the dignity of their character can be assured only as they walk in glad fellowship with the Eternal.—*Universalist Leader.**

বৈয়াসিক-ন্যায়মালা।

আনন্দময়ত্বা অধিকরণ—দ্বিতীয় বর্ণক।

(শ্রীরামচন্দ্রশাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

ইদানীং স্বমতানুসারেণাধিকরণং রচ্যতে—
অন্যাঙ্গং স্বপ্রধানং বা ব্রহ্ম পুচ্ছমিতি শ্রুতং।
স্যাদানন্দময়স্যাঙ্গং পুচ্ছেঽঙ্গত্বপ্রসিদ্ধিতঃ ॥ ২৭ ॥
লাঙ্গূলাঽসম্ভবাদত্র পুচ্ছেনাঽধারলক্ষণা।
আনন্দময়জীবোঽস্মিন্নাশ্রিতোঽতঃ প্রধানতা ॥২৮॥

"ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি যচ্ছ্রুতং ব্রহ্ম তৎকিমানন্দময়স্যাঙ্গত্বেন নির্দ্দিশ্যতে, উত স্বয়ংপ্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যতে—ইতি সংশয়ঃ। আনন্দময়স্যাবয়বত্বেন ইতি তাবৎ প্রাপ্তং। লোকে পুচ্ছশব্দস্যাবয়ববাচিত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ।

উচ্যতে—ন পুচ্ছশব্দোঽবয়ববাচী। কিন্তু লাঙ্গূলবাচী। ন চাঽনন্দময়স্য লাঙ্গূলং সম্ভবতি। লাঙ্গূলস্য গবাদিলক্ষণান্নময়াবয়বত্বাদানন্দময়স্যাবয়বত্বাঽযোগাৎ। অতঃ পুচ্ছশব্দেন মুখ্যার্থাসম্ভবে সতি যোগ্যতাবশাদত্রাঽধারো লক্ষ্যতে। ব্রহ্ম আনন্দময়স্য জীবস্যাঽধারঃ তৎকল্পনাধিষ্ঠানত্বাৎ। ন চ আনন্দময়ঃ পরমাত্মা প্রাচুর্য্যার্থস্বীকারেঽপ্যল্পদুঃখসম্ভাবপ্রতীতেঃ। তস্মাৎ জীবাধারো ব্রহ্ম প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যতে। তথাচ—

অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥

ইত্যাদি ব্রহ্মাভ্যাসঃ, "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" ইতি ব্রহ্মোপক্রমশ্চানুকূলো ভবতি।

টীকার অনুবাদ। এক্ষণে নিজের মতানুসারে অধিকরণ রচিত হইতেছে—

(যে) ব্রহ্ম শ্রুতিতে পুচ্ছ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, (তাহা) অন্যের অঙ্গ অথবা স্বপ্রধান? পুচ্ছশব্দের অঙ্গত্বপ্রসিদ্ধির কারণে আনন্দময়ের অঙ্গই হউক। এস্থলে লাঙ্গূল (অর্থ হওয়া) অসম্ভব, সেই কারণে লক্ষণা দ্বারা (বা ভাবার্থে) পুচ্ছশব্দের আধার (অর্থ ধরিতে হইবে)। এই ব্রহ্মে আনন্দময় জীব আশ্রিত (হইয়া আছে), অতএব (ব্রহ্মের) প্রাধান্য।

"ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠারূপ পুচ্ছ" এই শ্রুতিতে যে ব্রহ্ম (শব্দ) উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম আনন্দময়ের অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, অথবা স্বয়ং প্রধানরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে—ইহাই হইল সংশয়। আনন্দময়ের অঙ্গ—ইহাই পাওয়া যাইতেছে, কারণ সাধারণত পুচ্ছ শব্দের অঙ্গ অর্থে ব্যবহার প্রসিদ্ধ।

(উত্তরে) উক্ত হইতেছে—পুচ্ছ শব্দ অঙ্গবাচক নহে, কিন্তু লাঙ্গূলবাচক। আনন্দময়ের লাঙ্গূল সম্ভব নহে। কারণ লাঙ্গূল গো প্রভৃতি (জীবের) অন্নময় (কোষের) অঙ্গ (বিশেষ) (এবং) আনন্দময়ের অঙ্গ (হিসাবে) লাঙ্গূল অসঙ্গত (হয়)। অতএব পুচ্ছশব্দের মুখ্য অর্থ বাধিত হওয়াতে সঙ্গতিরক্ষার জন্য এস্থলে আধার (অর্থ) ধরিতে হইবে। আনন্দময়ের কল্পনা (ব্রহ্মেতে) অধিষ্ঠিত হইবার কারণে ব্রহ্ম আনন্দময় জীবের আধার। আনন্দময় (অর্থে) পরমাত্মা নহে, কারণ (আনন্দের) প্রাচুর্য্য অর্থ স্বীকার করিলেও অল্প দুঃখের অস্তিত্ব প্রতীত হয়। অতএব জীবের আধার ব্রহ্ম প্রধানরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। আরও—

"অসৎ হয় সে নিশ্চয়, ব্রহ্ম অসৎ যে বা জানে।
লোকে তারে সাধু বলে, যেবা ব্রহ্ম সত্য মানে॥"

ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মশব্দের পুনঃ পুনঃ উক্তি এবং "ব্রহ্মবিৎ শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয়েন" শ্রুতিতে ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা (আলোচ্য) বল্লীর উপক্রম (বা আরম্ভ করাও) (সিদ্ধান্ত পক্ষের) অনুকূল হইতেছে।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব বর্ণকে উল্লিখিত "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ" ইত্যাদি শ্রুতির মধ্যে "আনন্দময়" শব্দকেই মুখ্য বিচার্য্য ধরিয়া দেখানো হইয়াছে যে

---

* From the Indian Messenger
September 9, 1917.

"আনন্দময়" শব্দ ব্রহ্মের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাই হইল সূত্রকার স্বয়ং ব্যাসদেবের মত। কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মতে ঐ "আনন্দময়" শব্দ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে না। তাহার মূল কারণ তিনি বলেন এই যে, উপরোক্ত শ্রুতির পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিসমূহে উক্ত "অন্নময়" "প্রাণময়" প্রভৃতি শব্দগুলির ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই প্রথমোক্ত শ্রুতির একমাত্র "আনন্দময়" শব্দেরই ময়ট্ প্রত্যয় প্রাচুর্য্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বলা সঙ্গত নহে। শঙ্করাচার্য্যের এই মত অনুসরণ করিয়া টীকাকার নূতন বিচারের অবতারণা করিতেছেন। তিনি পূর্ব্ব বর্ণকে কথিত শ্রুতি ছাড়িয়া অপর একটী শ্রুতিকে এই অধিকরণের ভিত্তি করিলেন। পূর্ব্ব বর্ণকে শ্রুতি ধরা হইয়াছে—"তস্মাৎ বা এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ অন্য অন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" "সেই এই বিজ্ঞানময় হইতে পৃথক্ অন্তঃস্থিত আত্মা আনন্দময়"; বর্ত্তমান বর্ণকে শ্রুতি ধরা হইয়াছে—"তস্য প্রিয়মেব শিরঃ মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" "তাহার (আনন্দময়ের) প্রিয়ই মস্তক, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দ আত্মা (এবং) ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠারূপ পুচ্ছ"। পূর্ব্ববর্ণকধৃত শ্রুতির উপর সংশয় উঠিয়াছিল—আনন্দময় অর্থে সংসারী জীব অথবা ব্রহ্ম; বর্ত্তমান বর্ণকধৃত শ্রুতির উপর সংশয় উঠিতেছে—ব্রহ্ম আনন্দময়ের অংশ অথবা স্বপ্রধান। পূর্ব্ববর্ণকে আনন্দময় অর্থে ব্রহ্ম কিনা, এই সংশয় উপস্থিত করাতেই প্রকারান্তরে ব্রহ্মকে আনন্দময়ের অংশ বা অন্তর্ভুক্তরূপে ধরিয়া বিচার করা হইয়াছে। সেই কারণেই বর্ত্তমান বর্ণকে এই সংশয় উপস্থিত করিয়া বিচার করা হইল যে, ব্রহ্ম আনন্দময়ের অংশ কিনা, এবং অংশ না হইলে ব্রহ্মশব্দকে স্বপ্রধান বলিয়া ধরা হইবে কিনা অর্থাৎ ব্রহ্মশব্দে তাহার মুখ্য অর্থ পরমাত্মা গৃহীত হইবে কিনা। বর্ত্তমান বর্ণকে যে শ্রুতি বিচারের মুখ্য বিষয় হইতেছে, সেই শ্রুতি পূর্ব্ববর্ণকেও প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময়ের পুচ্ছ বলিয়া বলা হইয়াছে। এখন পুচ্ছ শব্দ শুনিলেই হঠাৎ পক্ষীর অবয়ববিশেষ মনে আসে। কাজেই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময়ের পুচ্ছরূপে উক্ত হইতে শুনিলেই হঠাৎ মনে হইতে পারে যে পক্ষীর পুচ্ছের ন্যায় ব্রহ্মকেও হয়তো আনন্দময়ের সেইরূপ কোন অংশবিশেষ বলাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। কিন্তু তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের যে বল্লীতে উক্ত শ্রুতি আছে, সেই বল্লীর উপক্রমে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে; তাহার বিভিন্ন শ্রুতিতে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে। এবং তাহার উপসংহারেও ব্রহ্মের উল্লেখ আছে। এখন, ব্রহ্মশব্দের স্বপ্রধান বা মুখ্য অর্থ যে পরমাত্মা এবং উপরোক্ত বল্লীর "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" ইত্যাদি শ্রুতি ব্যতীত অন্যান্য শ্রুতিতে ব্যবহৃত ব্রহ্ম শব্দ যে সেই পরমাত্মা অর্থে প্রযুক্ত তাহা সর্ব্ববাদসম্মত। কাজেই সংশয় উঠিতেছে যে, "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্যবহৃত ব্রহ্ম শব্দ সত্য সত্য আনন্দময়ের কোন অংশবিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে অথবা স্বপ্রধান বা মুখ্য পরমাত্মা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষের কথা এই যে, পুচ্ছ বলিতে যে পক্ষীর শরীরের অংশবিশেষ ইহা যখন প্রসিদ্ধই আছে এবং যখন শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময়ের পুচ্ছ বলিয়াই বলা হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে আনন্দময়ের অংশবিশেষরূপে বলাই শ্রুতির উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত ভাষায় প্রায় প্রত্যেক শব্দেরই মুখ্য বা প্রধান অর্থ এবং গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থাৎ তাৎপর্য্যার্থ থাকে। রীতি এই যে, মুখ্য অর্থ প্রকরণসূত্রে অসঙ্গত না হইলে সাধারণতঃ মুখ্য অর্থই ধরিতে হইবে, গৌণ অর্থ ধরিতে হইবে না; যেখানে মুখ্য অর্থ বাধিত বা অসঙ্গত হইবে, সেই স্থলেই গৌণ অর্থ ধরিতে হইবে। পুচ্ছ শব্দেরও মুখ্য অর্থ হইল লাঙ্গুল এবং গৌণ অর্থ হইল অংশ ইত্যাদি। সিদ্ধান্তপক্ষ পূর্ব্বপক্ষকে প্রথমেই এক কথায় নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন যে পুচ্ছ শব্দের মুখ্য অর্থ যখন লাঙ্গুল, তখন পূর্ব্বপক্ষের প্রথমেই গৌণ "অংশ" অর্থে পুচ্ছ শব্দ ধরা অসঙ্গত হইয়াছে। সিদ্ধান্তপক্ষ প্রথমে ধরিয়া লইলেন যে শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময়ের লাঙ্গূল বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরে পরীক্ষাসূত্রে বলিলেন যে, লাঙ্গূল যখন গোপ্রভৃতি জীবজন্তুর অন্নময় কোষের বা স্থূল শরীরের অংশবিশেষ, তখন উহা সূক্ষ্ম আনন্দময়ের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। সিদ্ধান্তপক্ষ প্রথমেই পূর্ব্বপক্ষধৃত পুচ্ছ শব্দের "অংশ" অর্থ উড়াইয়া দিয়া "লাঙ্গূল" অর্থ ধরিলেন; ধরিয়া দেখাইলেন যে উহা অসঙ্গত হয়। তবে কি শ্রুতিতে "পুচ্ছ" শব্দ নিরর্থক ব্যবহৃত হইল? সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে—না, পুচ্ছ শব্দ নিরর্থক ব্যবহৃত হয় নাই, উহার অন্যতর গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থ ধরিতে হইবে। কোন শব্দের মুখ্য অর্থ বাধিত হইলে যোগ্যতা অনুসারে অর্থাৎ পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া সঙ্গতি রক্ষার জন্য যে কোন প্রসিদ্ধ অর্থ ধরা হয় তাহাকেই লাক্ষণিক অর্থ বলা যায়। সিদ্ধান্তপক্ষ স্বমত স্থাপনের উদ্দেশ্যে বলিলেন যে আলোচ্য শ্রুতির পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে পুচ্ছ শব্দের লাক্ষণিক অর্থ "আধার" ধরিতে হইবে। শ্রুতিতে আছে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"—ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠারূপ

পুচ্ছ। সিদ্ধান্তপক্ষের মতে পুচ্ছ অর্থে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ 'যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত' এইটুকু বলাই আলোচ্য শ্রুতির মূল উদ্দেশ্য। "যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত" বলিলেই 'আধার' বুঝায়। এই আধার অর্থ ধরিয়াই সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, ব্রহ্ম আনন্দময়ের আধার; এই অর্থ ব্যক্ত করাই "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই শ্রুতির উদ্দেশ্য।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ব্রহ্ম যে আনন্দময়ের আধার, সেই আনন্দময় কি? সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, আনন্দময় অর্থে জীব ধরিতে হইবে এবং 'ব্রহ্ম আনন্দময়ের আধার' অর্থে "ব্রহ্ম জীবেরই আধার" বুঝিতে হইবে। স্থূল কোন বস্তুকে আধার বলিলে যাহা বুঝায়, ব্রহ্মকে জীবের আধার বলিলে ঠিক তাহা বুঝায় না। ব্রহ্ম জীব-কল্পনার অধিষ্ঠান ভূমি অর্থাৎ ব্রহ্ম না থাকিলে জীবের কল্পনাই আসিতে পারে না, এই অর্থেই ব্রহ্মকে জীবের আধার বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্তপক্ষ এই যে জীব-কল্পনার কথা বলিয়াছেন, উহা আলোচ্য বল্লীর নিম্নোক্ত শ্রুতির উপর অবলম্বিত—"সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ॥" অর্থাৎ "তিনি কামনা করিলেন—বহু হই, প্রসৃষ্ট হই। তিনি আলোচনা করিলেন—তিনি আলোচনা করিয়া এই যাহা কিছু সমস্তই সৃষ্টি করিলেন। তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন।" এই জীব-কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত জীব অর্থেই যে আনন্দময়-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, পূর্ব্ব বর্ণকধৃত পরমাত্মা অর্থে যে হয় নাই, তাহার সমর্থনে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, আনন্দময়শব্দের ময়ট্ প্রত্যয় পূর্ব্ব বর্ণকের যুক্তি অনুসারে প্রাচুর্য্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে স্বীকার করিলেও, যে ব্রহ্ম অখণ্ড বা পূর্ণ আনন্দ বলিয়া সর্ব্ববাদসম্মত, সেই ব্রহ্মের প্রতি আনন্দময় শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না; কারণ আনন্দময়ের অর্থে প্রচুর-আনন্দ হইলেও পূর্ণ-আনন্দ তো হইল না, কাজেই তাহার ভিতরে একটু-না-একটু দুঃখের অস্তিত্ব প্রতীত হয়, কিন্তু ব্রহ্মেতে এতটুকু দুঃখেরও অস্তিত্ব সম্ভব নহে। তাই সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে অখণ্ড আনন্দ ব্রহ্ম আনন্দময় জীবের আধাররূপে স্বপ্রধানভাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন। সিদ্ধান্তপক্ষ স্বীয় যুক্তির সমর্থনে আর একটু দেখাইয়াছেন এই যে, তাঁহার টীকার শেষভাগে আলোচ্য বল্লী হইতে উদ্ধৃত শ্রুতিতে ব্রহ্মশব্দই বারম্বার উক্ত হইয়াছে, আনন্দময় হয় নাই; এবং বল্লীর উপক্রমেই "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয়, এই শ্রুতিতেও ব্রহ্মশব্দই উক্ত হইয়াছে। চতুর্থ বা সমন্বয়াধিকরণের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রকরণের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার যে ছয়টা পরিচায়ক লিঙ্গ উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে অভ্যাস বা পুনরুক্তি এবং উপক্রম ধরিয়া এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মই আলোচ্য শ্রুতির মুখ্য বিষয় বা স্বপ্রধান; এবং আনন্দময় অর্থে ব্রহ্ম নহে, জীবই। তবেই ভাষ্যকারের মতে দাঁড়াইতেছে এই যে "আনন্দময়ঃ" শব্দসংশ্লিষ্ট শ্রুতির পরবর্ত্তী শ্রুতিতে উক্ত ব্রহ্ম শব্দ এই প্রকরণে পুনঃ পুনঃ উক্ত হওয়াতে প্রকরণের তাৎপর্য্য সেই ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত ধরিতে হইবে।

দ্বাদশ সূত্রের আনন্দময় শব্দ জীব অর্থে ধরিলে বর্ত্তমান প্রকরণের অবশিষ্ট সূত্রগুলির অর্থ ভাষ্যকার যে ভাবে করিয়াছেন, তাহারও ইঙ্গিত আমরা এস্থলে করিয়া রাখিব। ভাষ্যকারপ্রচারিত সেই অর্থগুলি অনেক স্থলে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে একটু বেশী টানিয়া বুনিয়া করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ১৩ম সূত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে তিনি বলেন যে "বিকার" শব্দের অর্থে অবয়ব এবং "প্রাচুর্য্য" শব্দের অর্থে প্রায়াপত্তি ধরিতে হইবে। এই অর্থ ধরিয়া সূত্রের ভাব হইবে এই যে, অবয়ব-বাচক পুচ্ছ শব্দ ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত করাতে যদি বল যে ব্রহ্ম অর্থে পরমাত্মা নহে, ব্রহ্ম এখানে স্বপ্রধানভাবে ব্যবহৃত হয় নাই, ব্রহ্মশব্দ এস্থলে গৌণভাবে আনন্দময়ের অংশ-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। ঐ যে অবয়ববাচক পুচ্ছ শব্দ ব্রহ্মের সহিত একত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, উহা কেবল রূপকের খাতিরেই হইয়াছে। আনন্দময় জীবকে একটী পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলায়, রূপকসূত্রে তাহার বিভিন্ন ভাবকে একটী পক্ষীর বিভিন্ন অঙ্গরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন, রূপকসূত্রে পক্ষীর অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ আনন্দময়ের বিভিন্ন ভাবের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইল, কেবল কি তাহার পুচ্ছ পড়িয়া থাকিবে? তা নয়, পুচ্ছকেও কোনরূপে মিলাইয়া দেওয়া হইল। পুচ্ছ যেমন পক্ষীর প্রতিষ্ঠা-ভূমি অর্থাৎ ইহার উপর নির্ভর করিয়াই পক্ষী যেমন ঠিক দাঁড়াইতে পারে, সেইরূপ ব্রহ্মের উপরেও নির্ভর করিয়া জীব ঠিকভাবে দাঁড়াইতে পারে—তাই ব্রহ্ম আনন্দময় জীবের পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠাভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইল। ভাষ্যকার বলেন যে আসলে অবশ্য ব্রহ্ম জীবের পুচ্ছ নহে—রূপক বজায় রাখিবার খাতিরে মাত্র ব্রহ্মকে জীবের পুচ্ছ বলা হইয়াছে—আসল অর্থ এই যে ব্রহ্ম জীবের প্রতিষ্ঠাভূমি। রূপকেতে পক্ষীর অবয়ব

সমূহেরই বহুল প্রয়োগ হইয়াছে, কাজেই সেই বহুলপ্রয়োগের জন্য বা "প্রাচুর্য্যের" জন্য, যে একটী বিষয় অবশিষ্ট রহিল, তাহাকেও ঐ পক্ষীর কোন অবয়বরূপে উল্লেখ করিতে হইল—এইরূপ করাকেই প্রায়াপত্তি বলে।

এই আনন্দময় জীবসহ এই যে নিখিল বিশ্ব-জগত, "ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ" এই শ্রুতিতে সেই আনন্দময়-সহ বিশ্বজগতের কারণ বা স্রষ্টা বলিয়াই ব্রহ্ম উল্লিখিত হইয়াছেন বলিয়া ব্রহ্ম নিজেই স্বপ্রধান হইলেন—তিনি আনন্দময়ের কারণ হইয়া আনন্দময়ের অঙ্গ হইতে পারেন না।

আরও, আনন্দময়শব্দে আনন্দময়শব্দবাচ্য জীব হইতে ভিন্ন ব্রহ্ম বাচ্য হইতে পারে না; কারণ আনন্দময় শব্দের অর্থে ব্রহ্ম ধরিলে অসঙ্গতি দোষ আসিবে। উপনিষদে যে ব্রহ্মকেই সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়ের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয়-সূত্রের আলোচনায় স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। আর এই বর্ণকের আলোচনার আরম্ভেই প্রমাণিত হইয়াছে যে আনন্দময় শব্দের অর্থে জীব। কাজেই এই সূত্রে আনন্দময় শব্দের অর্থে ব্রহ্ম ধরিলে আনন্দময়কেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ বলিতে হয়। সুতরাং এখানে পূর্ব্বাপর-অসঙ্গতি দোষ আসিয়া পড়ে। যে ব্রহ্ম "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই যে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই শ্রুতিরও মুখ্য বিষয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। প্রথমোক্ত শ্রুতি একটী মন্ত্র এবং দ্বিতীয় শ্রুতিটী "ব্রাহ্মণে" উক্ত। ব্রাহ্মণ হইল মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যান। কাজেই ইহা ধরা যাইতে পারে যে, মন্ত্রোক্ত ব্রহ্মশব্দ এবং ব্রাহ্মণোক্ত ব্রহ্ম-শব্দ একই পদার্থ বা পরমাত্মার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রোক্ত শব্দ যে পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত, তাহা সর্ববাদসম্মত।

শ্রুতিতে আনন্দময়পদবাচ্য জীব এবং ব্রহ্মের ভেদ দৃষ্ট হয়। "রসং হ্যেবায়ংলব্ধ্বাহনন্দী ভবতি" আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ইনি আনন্দিত হয়েন—এই শ্রুতিতে একজন আনন্দ পাইতেছেন এবং একজন আনন্দ দিতেছেন, এইরূপ স্পষ্ট ভেদ প্রকাশ পাইতেছে।

আলোচ্য প্রকরণ হইতে দেখা যায় যে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই আলোচনা করিয়া সৃষ্টি করিলেন এবং সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন, এই আলোচনা বা চিন্তা বা কামনার ভাব সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধান বা প্রকৃতিতে সম্ভব হয় না।

সর্বোপরি দেখা যায় যে শ্রুতিতে এই আনন্দ-ময়বাচ্য জীবের সেই ব্রহ্মেতে তদযোগ বা তাদাত্ম্য-যোগ উক্ত হইয়াছে—যথা, "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ন-দৃশ্যে...হভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোহভয়ং গতো ভবতি" অর্থাৎ যখন এই জীব এই অদৃশ্য ইত্যাদি ব্রহ্ম বা পরমাত্মাতে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন। এস্থলে "অভয়ং প্রতিষ্ঠা" শব্দের দ্বারা তাদাত্ম্যযোগ সূচিত হইতেছে।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

একাদশ প্রকরণ।

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত)

মনুষ্য জ্ঞানী হইলে তাহার সকল প্রকার ইচ্ছা কিংবা বাসনা বিলুপ্ত হওয়া উচিত, এই কথা গীতার আদৌ মান্য নহে, ইহা সুখদুঃখবিবেকপ্রকরণে আমি দেখাইয়াছি। শুধু বাসনা বা ইচ্ছা থাকাতে কোন দুঃখ নাই, আসক্তিই দুঃখের প্রকৃত মূল। তাই, সর্ব্ব-প্রকার বাসনা বিনষ্ট না করিয়া জ্ঞানী কেবল আসক্তি ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম্ম করিবে, ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত। আসক্তি চলিয়া যাইবার সঙ্গেই সমস্ত কর্ম্মও যে ছাড়িয়া যাইবে তাহা নহে। অধিক কি, বাসনা হইতে মুক্ত হইলেও সমস্ত কর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। বাসনা থাকুক বা না থাকুক, শ্বাসোচ্ছাসাদি কর্ম্ম নিত্য সমান চলিতে থাকে, এইরূপ আমরা দেখিতে পাই। বেশী দূরে যাইতে হইবে কেন? ক্ষণমাত্র জীবিত থাকাও তো কর্ম্ম; পূর্ণজ্ঞান হইলেও আপনার বাসনা দ্বারা কিংবা বাসনা-ক্ষয়ের দ্বারা উহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। বাসনা হইতে মুক্ত বলিয়া কোনও জ্ঞানী পুরুষ প্রাণ বিসর্জ্জন করে না, এ কথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; এবং সেই জন্যই "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" (গী. ৩. ৫.) যে-ই হউক না কেন, সে কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না—এই বচন গীতায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম তো নিসর্গতঃ প্রাপ্ত, প্রবাহপতিত ও অপরিহার্য্য, তাহা মনুষ্যের বাসনার উপর ঝুলিয়া নাই, ইহা গীতাশাস্ত্রের কর্ম্মযোগের প্রথম সিদ্ধান্ত। কর্ম্ম ও বাসনার পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ নাই এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইলে পর বাসনাক্ষয়ের সঙ্গেই কর্ম্মেরও ক্ষয় স্বীকার করা ভিত্তিহীন ও খোঁড়া হইয়া পড়ে। তাহার পর, বাসনাক্ষয়ের পরেও প্রাপ্ত কর্ম্ম জ্ঞানী-পুরুষের কি প্রকারে করিতে হইবে এই প্রশ্ন সহজেই উত্থিত হয়। এই প্রশ্নের উত্তর গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ৩. ১৭-১৯ ও তাহার উপর আমার টীকা দেখ)। জ্ঞানীপুরুষের জ্ঞানোত্তর নিজের বলিয়া কোন কর্ত্তব্য থাকে না, এ কথা গীতার মান্য। কিন্তু ইহার পর গীতা ইহাও বলিতেছেন যে, যে কেহই হউক না কেন, কর্ম্মবন্ধন হইতে কেহই মুক্ত হয় না। জ্ঞানীপুরুষের কর্ত্তব্য থাকে না এবং কর্ম্ম মোচন

হয় না, এই দুই সিদ্ধান্ত কেহ কেহ পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করেন; কিন্তু গীতার কথা সেরূপ নহে। গীতা উহাদের এই মিল করিয়া বলেন যে, যখন কর্ম্ম অপরিহার্য্য, তখন জ্ঞানী পুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু তাহার নিজের জন্য কোন কর্ত্তব্য থাকে না, অতএব তাহার আপনার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করাই কর্ত্তব্য। সার কথা, তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭ম শ্লোকের "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" এই বাক্যে, 'কার্য্যং ন বিদ্যতে' এই শব্দগুলি অপেক্ষা 'তস্য' (অর্থাৎ সেই জ্ঞানী পুরুষের) এই শব্দ অধিক গুরুত্বসূচক; এবং তাহার ভাবার্থ এই যে, 'তাহার নিজের' জন্য প্রাপ্ত কোন কর্ম্ম থাকে না, এই কারণেই, এক্ষণে অর্থাৎ জ্ঞানোত্তর, তাহার আপন কর্ত্তব্য তাহাকে নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে করিতে হইবে। পরে ১৯ম শ্লোকে 'তস্মাৎ' এই কারণবোধক পদ প্রয়োগ করিয়া অর্জ্জুনকে এই অর্থের উপদেশ করিয়াছেন, "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর" (গী. ৩. ১৯)—তাই শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত নিজ কর্ত্তব্য তুমি আসক্তি না রাখিয়া করিয়া যাও, কর্ম্ম ছাড়িও না। তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭-১৯ এই তিন শ্লোকে পরিব্যক্ত কার্য্যকারণভাব এবং অধ্যায়ান্তর্ভূত সমস্ত প্রকরণের সন্দর্ভের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সন্ন্যাসমার্গীর কথা অনুসারে "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" এই স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত মানা যুক্তিসিদ্ধ নহে এইরূপ উপলব্ধি হইবে। নিম্ন-প্রদত্ত দৃষ্টান্তই তাহার উত্তম প্রমাণ। 'জ্ঞানলাভের পর কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট না থাকিলেও, শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয়', এই সিদ্ধান্তের পুষ্টিসাধনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে—

> ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥

"হে পার্থ! 'আমার' বলিয়া ত্রিভুবনে কোন কর্ত্তব্য (অবশিষ্ট) নাই, অথবা অপ্রাপ্ত কোন বস্তু পাইবার (বাসনা) নাই; তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি" (গী. ৩. ২২)। 'ন মে কর্ত্তব্যমস্তি'—আমার কর্ত্তব্য নাই—এই শব্দ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"—তাহার কোন কর্ত্তব্য থাকে না—এই শব্দগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। ইহা হইতে "জ্ঞানের দ্বারা কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকিলেও, অধিক কি, এই কারণে, শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্ম অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিতেই হইবে" এই অর্থ এই চার পাঁচ শ্লোকের প্রতিপাদ্য এইরূপ স্পষ্ট সিদ্ধ হয়। নতুবা, 'তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে' ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত সিদ্ধান্তের দৃঢ়ীকরণার্থ ভগবান্ নিজের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা একেবারেই অসংবদ্ধ হইবে, এবং সিদ্ধান্ত এক, আর তাহার উদাহরণ একেবারেই বিরুদ্ধ—এইরূপ অনবস্থা দোষ ঘটিবে। এই অনবস্থা পরিহারার্থ সন্ন্যাসমার্গীয় টীকাকার, 'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর' ইহার মধ্যে 'তস্মাৎ' এই শব্দেরও অর্থ ভিন্ন প্রকার করিয়া থাকেন। উঁহার কথন এই যে, জ্ঞানীপুরুষ কর্ম্মত্যাগ করিবেন ইহাই গীতার মুখ্য সিদ্ধান্ত; কিন্তু অর্জ্জুন সেরূপ জ্ঞানী ছিলেন না বলিয়া—'তস্মাৎ'—তাঁহাকে ভগবান্ কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু 'গীতা-উপদেশের পরেও অর্জ্জুন অজ্ঞানীই ছিলেন' এই যুক্তি ঠিক্ নহে আমি উপরে দেখাইয়াছি। তাছাড়া 'তস্মাৎ' এই শব্দের এইরূপ টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিলেও "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্ "আমার কোন কর্ত্তব্য না থাকিলেও আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি" এই মুখ্য সিদ্ধান্তের সমর্থনার্থ আপনার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহার সঙ্গতিও এই পক্ষে সুচারুরূপে হয় না। তাই "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" এই বাক্যে 'কার্য্যং ন বিদ্যতে' এই শব্দগুলিকে মুখ্য বলিয়া না মানিয়া, 'তস্য' এই শব্দকেই প্রধান বলিয়া মানিতে হইবে; এবং তাহা করিলে "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর" ইহার অর্থ "তুমি জ্ঞানী বলিয়াই তোমার স্বার্থের জন্য তোমার কর্ম্ম নাই এ কথা সত্য; কিন্তু তোমার নিজের কর্ম্ম নাই বলিয়াই, এক্ষণে যাহা শাস্ত্রত প্রাপ্ত হইয়াছে সেই কর্ম্ম 'আমার নহে' এই বুদ্ধিতে অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে কর" এইরূপ করিতে হয়। সংক্ষেপে এই অনুমান হয় যে, 'আমার অনাবশ্যক' ইহা কর্ম্ম ছাড়িবার কারণ হইতে পারে না। কিন্তু কর্ম্ম অপরিহার্য্য অতএব শাস্ত্রতঃপ্রাপ্ত অপরিহার্য্য কর্ম্ম স্বার্থত্যাগবুদ্ধিতে করাই উচিত। ইহাই গীতা বলেন; এবং প্রকরণের সমতার দিকে দেখিলেও, এই অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুয়ের মধ্যে যে বড়রকম ভেদ আছে তাহা ইহাই। তোমার কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই; অতএব তুমি কোন কর্ম্ম করিও না," এইরূপ সন্ন্যাসপক্ষীয় লোকেরা বলেন; এবং "তোমার কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই, বলিয়াই, এখন তোমার যে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা স্বার্থপর বাসনা ছাড়িয়া অনাসক্ত বুদ্ধিতে কর" এইরূপ গীতা বলেন। একই হেতুবাক্য হইতে এই প্রকারে দুই ভিন্ন ভিন্ন অনুমান কেন বাহির হয়? ইহার উত্তর এই যে, গীতা কর্ম্ম অপরিহার্য্য মানেন বলিয়া, 'কর্ম্ম ছাড়ো' এই অনুমান, গীতার তত্ত্ব বিচারানুসারে বাহির হইতেই পারে না। তাই, 'তোমার অনাবশ্যক' এই হেতুবাক্য হইতেই স্বার্থবুদ্ধি ছাড়িয়া কর্ম্ম কর, গীতায় এই অনুমান বাহির করা হইয়াছে। রামচন্দ্রকে সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞান বলিবার পর, নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যোগবাসিষ্ঠে বসিষ্ঠ যে যুক্তি বলিয়াছেন তাহাও এই প্রকার। যোগবাসিষ্ঠ গ্রন্থের শেষে ভগবদ্গীতার উক্ত সিদ্ধান্তই অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে (যো. ৬. উ. ১৯৯ ও ২১৬. ১৪; এবং গী. ৩. ১৯-এর অনুবাদের উপর আমার টিপ্পনী দেখ)। যোগবাসিষ্ঠেরই ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযানপন্থার গ্রন্থেও এই বিষয়ে গীতার অনুসরণ করা হইয়াছে। কিন্তু বিষয়ান্তর হইবে বলিয়া তাহার আলোচনা এখানে না করিয়া তৎসম্বন্ধীয় বিচার আমি পরে পরিশিষ্ট প্রকরণে করিয়াছি।

আত্মজ্ঞান হইলে পর 'আমি' ও 'আমার' এই অহঙ্কারের ভাষাই থাকে না (গী. ১৮. ১৬ ও ২৬), এবং সেই জন্য জ্ঞানীপুরুষকে "নির্-মম" বলে। নির্ম্মম অর্থে "যে আমার-আমার বলে না"। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করিবার সময় এই অর্থই এই আর্য্যাশ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন—

> আণি মী হে ভাষ নেণে। মাঝেঁ কাঁহিঁচ ন ম্হণে।
> সুখ দুঃখ জাণণেঁ। নাহি জয়া॥

অর্থাৎ—'আমি' এই বাক্য জানি না, 'আমার' বলিয়া কিছুই নাই—সুখ দুঃখ জ্ঞান নাই। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা 'আমি' ও 'আমার' এই বুদ্ধি চলিয়া গেলেও এই

শব্দের বদলে ‘জগৎ’ ও ‘জগতের’—কিংবা ভক্তিদৃষ্টিতে ‘পরমেশ্বর’ ও ‘পরমেশ্বরের’—এই শব্দ আসে, ইহা বিস্মৃত হইবে না। জগতের প্রত্যেক সাধারণ মনুষ্য নিজের সমস্ত কর্ম্ম ‘আমার’ :কিংবা ‘আমার জন্য’ বলিয়া করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি জ্ঞানী হইয়াছেন তাঁহার মমত্ববুদ্ধি চলিয়া যাওয়ায় তিনি ঈশ্বর সৃষ্ট জগতের সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরের এবং তাহা করিবার জন্যই পরমেশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ বুদ্ধিতে (অর্থাৎ নির্ম্মম বুদ্ধিতে) সেই কর্ম্ম করিতে থাকেন। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে ইহাই ভেদ (গী. ৩. ২৭, ২৮)। গীতার এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে যানা যায় যে, “যোগারূঢ় পুরুষের জন্য শমই কারণ হয়” (গী. ৬. ৩ ও তাহার উপর আমার টীকা দেখ) এই শ্লোকের সরল অর্থ কি। গীতার টীকাকার বলেন যে, এই শ্লোকে যোগারূঢ় ব্যক্তি পরে (জ্ঞান হইলে পর) শম অর্থাৎ শান্তি অবলম্বন করিবে, সে আর কিছু করিবে না, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থ ঠিক্ নহে। শম মনের শান্তি; তাহা চরম ‘কার্য্য’ না বলিয়া শম কিংবা শান্তি ইহা অন্য কিছুর কারণ—শমঃ কারণমুচ্যতে—ইহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এখন শমকে কারণ বলিয়া মানিয়া তাহার পরে ‘কার্য্য’ কি, দেখিতে হইবে। পূর্ব্বাপর সন্দর্ভের বিচার করিলে. ‘কর্ম্ম’ই সেই কার্য্য এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। এবং তখন যোগারূঢ় ব্যক্তি চিত্তকে শান্ত করিয়া সেই শান্তির বা শমের দ্বারাই পরে নিজের সমস্ত কর্ম্ম করিবেক এইরূপ এই শ্লোকের অর্থ হয়; টীকাকার যেরূপ বলেন তদনুসারে ‘যোগারূঢ় ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করিবে’ এই অর্থ করা যাইতে পারে না। সেইরূপ আবার, “সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী” ও “অনিকেত” প্রভৃতি শব্দের অর্থও কর্ম্মত্যাগমূলক নহে, ফলাশা-ত্যাগমূলকই করা উচিত; গীতার অনুবাদে যে সকল স্থলে এই পদ আসিয়াছে, সেইস্থলে সংযোজিত টিপ্পনীতে আমি এই বিষয় খুলিয়া দেখাইয়াছি। ফলাশা ছাড়িয়া জ্ঞানী পুরুষেরও চাতুর্বর্ণ্যাদি সমস্ত কর্ম্ম যথাশাস্ত্র করা উচিত, ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য আপনার নিজের দৃষ্টান্ত ছাড়া ভগবান আর একটী জনকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। জনক একজন বড় কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার স্বার্থবুদ্ধি কতটা চলিয়া গিয়াছিল ‘আমার রাজধানী দগ্ধ হইলেও তাহাতেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় নাই’—‘মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন’ (শাং ২৭৫.৪ ও ২১৯. ৫০) তাঁহার মুখের এই বাণী হইতেই তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ আমাদের নিজের স্বার্থ কিংবা লাভালাভ কিছুই না থাকিলেও আমি রাজ্যের সমস্ত কর্ম্ম কেন করি ইহার কারণ বলিবার সময় জনক নিজেই বলিতেছেন—

> দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ ভূতেভ্যোঽতিথিভিঃ সহ।
> ইত্যর্থং সর্ব এবৈতে সমারম্ভা ভবন্তি বৈ॥

“দেবতা, পিতৃগণ, সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণী ও অতিথি ইহাদের জন্য এই সমস্ত কর্ম্ম চলিতেছে, আমার জন্য নহে” (মভা. অশ্ব. ৩২. ২৪)। নিজের কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট না থাকিলেও কিংবা নিজের কোন বস্তু লাভ করিবার বাসনা না থাকিলেও জনক শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পুরুষ জগতের কল্যাণ করিতে যদি প্রবৃত্ত না হয়েন, তাহা হইলে এই জগৎ উৎসন্ন হইবে—উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ—(গী. ৩. ২৪)।

কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, ‘ফলাশা ত্যাগ করিবে, সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই,’ এবং গীতার এই সিদ্ধান্ত এবং বাসনাক্ষয়ের সিদ্ধান্তে অধিক তফাৎ করা যায় না। কারণ, বাসনাই ছাড়া হউক কি ফলাশাই ছাড়া হউক, উভয়পক্ষে কর্ম্মের প্রবৃত্তি হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না; তাই কোন এক পক্ষকে স্বীকার করিলেও শেষে তাহার পরিণাম কর্ম্ম-ত্যাগই ঘটে। কিন্তু এই আপত্তি অজ্ঞানমূলক, কারণ ‘ফলাশা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝিবার কারণেই ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, ফলাশা ত্যাগের সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা ত্যাগ কিংবা আমার কর্ম্মের ফল কেহ কখনই পাইবে না, কিংবা পাইলেও কেহ গ্রহণ করিবে না—ইহা বুদ্ধিতে ধারণা করা অর্থ নহে; প্রত্যুত পঞ্চম প্রকরণে প্রথমেই আমি বলি-য়াছি যে,—অমুক ফল পাইবার জন্যই আমি এই কর্ম্ম করিতেছি এই প্রকার ফলবিষয়ক মমত্বযুক্ত আসক্তি কিংবা বুদ্ধির আগ্রহকে,—গীতা নাম দিয়াছেন ‘ফলাশা’, ‘সঙ্গ’ কিংবা ‘কাম’। কিন্তু, ফল-লাভের আগ্রহ কিংবা বৃথা আসক্তি না রাখিলেও, প্রাপ্ত কর্ম্ম কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া করিবার বুদ্ধি ও উৎ-সাহকেও উক্ত আগ্রহের সহিত আমাদের মন হইতে বিদূরিত করিতে হইবে এরূপ নহে। নিজের লাভ ছাড়া এই জগতে যে আর কিছুই দেখে না, এবং যে কেবল ফলাশার আগ্রহেই কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, সে ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্ম করা সম্ভব বলিয়া মনে করে না; কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি সম ও বিরক্ত হইয়াছে তাঁহার পক্ষে কিছু কঠিন নহে। আমি কোন কর্ম্মের যে ফল প্রাপ্ত হই তাহা কেবল আমারই কর্ম্মের ফল, এই ধারণাই প্রথমতঃ ভ্রান্তিমূলক। জলের দ্রবত্ব কিংবা অগ্নির উষ্ণতার সাহায্য না পাইলে, মনুষ্য যতই মাথা ঘামাক না কেন, তাহার চেষ্টায় পাক-কার্য্য কখনও সম্পন্ন হইতে পারে না; এবং অগ্নিপ্রভৃতিতে এই গুণ-ধর্ম্ম থাকা বা না-থাকা—মনুষ্যের আয়ত্তাধীন কিংবা প্রযত্নাধীন নহে। তাই, কর্ম্মজগতের এই স্বতঃসিদ্ধ বিবিধ ব্যাপারের কিংবা ধর্ম্মের প্রথমে যথাশক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া যাহাতে উহা আমাদের প্রযত্নের অনুকূল হয় সেই ভাবেই মনুষ্যকে নিজের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সুতরাং মনুষ্য স্বীয় প্রযত্নের দ্বারা যে ফল লাভ করে তাহা কেবল তাহারই প্রযত্নের ফল নহে, বরং উহা তাহার কর্ম্ম ও তদনুকূল কর্ম্মজগতের অনেক স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম এই দুয়ের সংযোগজাত ফল, এইরূপ বলিতে হয়। কিন্তু মনুষ্যের প্রযত্ন সফল হইবার পক্ষে এইরূপ যে সমস্ত জগৎব্যাপারের অনুকূলতা আবশ্যক হয়, সেই সম-স্তের যথার্থ জ্ঞান অনেক সময় লাভ হয় না; এবং কোন কোন স্থলে, হওয়া সম্ভবও নহে, ইহাকেই ‘দৈব’ বলে। আমাদের আয়ত্তাধীন নহে এবং আমাদের অজ্ঞাত জগৎ-ব্যাপারের সাহায্য ফলসিদ্ধির জন্য যদি নিতান্তই আবশ্যক হয় তবে “কেবল নিজের প্রযত্নের দ্বারাই আমি অমুক কর্ম্ম করিব” এইরূপ অভিমান পোষণ করা যে মূর্খতামাত্র, তাহা বলিতেই হইবে না (গী. ১৮. ১৪-১৬ দেখ)। কারণ, কর্ম্মজগতের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ব্যাপারের মানবীয় প্রযত্নে সংযোগ সাধিত হইলে পর

যে ফল হয়, তাহা কেবল কর্ম্মের নিয়মেই হয় বলিয়া, আমরা ফলাশায় আগ্রহ রাখি বা না রাখি, ফলসিদ্ধিসম্বন্ধে কোন তফাৎ হয় না; আমাদের ফলাশা অবশ্য আমাদের দুঃখজনক হয়। কিন্তু মনে রেখো যে, শুধু মনুষ্যের জন্য আবশ্যক বিষয় জগৎ-ব্যাপার আপনা হইতেই উহা ঘটাইয়া আনে না। রুটি রুচিকর হইতে হইলে যেরূপ আটার নেচীতে একটু নুন দিতে হয় সেইরূপ কর্ম্মজগতের এই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার মনুষ্যের উপযোগী হইতে হইলে তাহার উপর মনুষ্যের একটু প্রযত্নের চাপ দিতে হয়। তাই জ্ঞানী ও বিবেকী ব্যক্তি সাধারণ লোকের ন্যায় ফলের আসক্তি কিংবা আগ্রহ না রাখিয়া জগতের কর্ম্মসাধনার্থ প্রবাহ-পতিত কর্ম্মের (অর্থাৎ কর্ম্মের অনাদি প্রবাহের মধ্যে শাস্ত্রতঃপ্রাপ্ত যথাধিকার কর্ম্মের) ছোট বড় অংশ শান্তভাবে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া করিয়া থাকেন; এবং ফলপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্মসংযোগের উপর কিংবা ভক্তিদৃষ্টিতে পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। "তোমার কেবল কর্ম্ম করিবারই অধিকার আছে ফললাভ তোমার আয়ত্তাধীন নহে" (গী. ২. ৪৭) ইত্যাদি যে উপদেশ অর্জ্জুনকে দেওয়া হইয়াছে তাহার বীজও ইহাই। ফলাশা না রাখিয়া এইরূপ কর্ম্ম করিতে থাকিলে পরে কোন কারণে কদাচিৎ নিষ্ফল হয়; তবু উদ্যোগ করিয়া আমাদের নিজের অধিকারের কর্ম্ম করায়, নিষ্ফলতা হইতে দুঃখ পাইবার কোন কারণ থাকে না। উদাহরণ যথা, পরমায়ুর বন্ধনরজ্জু (অর্থাৎ শরীরপোষক ধাতুসমূহের নৈসর্গিক শক্তি) দৃঢ় না হইলে শুধু ঔষধে রোগীর কখনই উপকার হয় না, এইরূপ বৈদ্যশাস্ত্র স্পষ্ট বলে; এবং এই বন্ধনরজ্জুর দৃঢ়তা অনেক প্রাক্তন কিংবা বংশানুক্রমিক সংস্কারের ফল। এই বিষয় বৈদ্যের দ্বারা সিদ্ধ হইবার নহে, এবং তৎসম্বন্ধে বৈদ্যের নিশ্চয়াত্মক পূর্ণ জ্ঞানও হইতে পারে না। তথাপি রোগীকে ঔষধ দেওয়া নিজের কর্ত্তব্য মনে করিয়া কেবল পরোপকার-বুদ্ধিতে হাজার হাজার রোগীকে বৈদ্য যথাজ্ঞান ঔষধ দিয়া থাকেন, এইরূপ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এইরূপ কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে করিলে পর, কোন রোগী ভাল না হইলে তাহার দরুণ সেই বৈদ্য উদ্বিগ্ন হন না শুধু নহে, কিন্তু অমুক রোগে অমুক ঔষধের দ্বারা শতকরা লোকের উপকার হইয়া থাকে এইরূপ শাস্ত্রীয় নিয়মই তিনি অতীব শান্তচিত্তে খুঁজিয়া বাহির করেন। কিন্তু এই বৈদ্যের পুত্র পীড়িত হইলে তাহাকে ঔষধ দিবার সময় তিনি পরমায়ুর বন্ধনরজ্জুর বিষয় ভুলিয়া গিয়া "আমার ছেলেকে আরাম করিতেই হইবে" এই মমত্বযুক্ত ফলাশাবশতঃ উৎকণ্ঠিতচিত্ত হওয়ায় অন্য বৈদ্যকে ডাকিতে হয়; কিংবা অন্য বৈদ্যের পরামর্শ লওয়া আবশ্যক হয়। কর্ম্মফলে মমত্বরূপ আসক্তি কাহাকে বলে এবং ফলাশা না থাকিলেও কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কোনও কর্ম্ম কিরূপে করিতে পারা যায়, এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতে তাহা উপলব্ধি হইবে। এইরূপ ফলাশা বিলোপের জন্য জ্ঞানের দ্বারা মনে বৈরাগ্য অটল হইতে হইলেও কোন কাপড়ের রং (রাগ) উঠাইয়া ফেলিতে বলিলে যেমন সেই কাপড়কে নষ্ট করিতে বলা হয় না, সেইরূপ 'কর্ম্মে বাসনা, আসক্তি কিংবা অনুরাগ রাখিবে না' এইরূপ বলিলে, সেই কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে এমন নহে। বৈরাগ্য-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাই যদি অসম্ভব হয় তো সে কথা আলাদা। কিন্তু বৈরাগ্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে পারা যায় শুধু নহে, কর্ম্ম হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না, ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। তাই অজ্ঞানী লোক যে কর্ম্ম ফলের আশায় করিয়া থাকে, তাহাই জ্ঞানী পুরুষ, জ্ঞানলাভের পরেও, লাভালাভ ও সুখদুঃখ সমান মনে করিয়া ধৈর্য্য ও উৎসাহ-সহকারে, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধিতে অর্থাৎ ফলসম্বন্ধে বিরক্ত কিংবা উদাসীন থাকিয়া (গী. ১৮. ২৬), কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া আপন আপন অধিকারানুসারে শান্তচিত্তে করিতে থাকেন (গী. ৬. ৩)। ইহাই নীতিদৃষ্টিতে ও মোক্ষদৃষ্টিতে উত্তম জীবনযাপনের প্রকৃততত্ত্ব। অনেক স্থিতপ্রজ্ঞ, মহাভগবদ্‌ভক্ত ও পরম জ্ঞানী পুরুষেরা, এমন-কি স্বয়ং ভগবানও এই মার্গই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা কর্ম্মযোগশাস্ত্রেরই পুরুষার্থের পরাকাষ্ঠা বা পরমার্থ, এই 'যোগে'র দ্বারাই পরমেশ্বরের ভজন-পূজন হয় এবং পরিশেষে সিদ্ধিলাভও হয় (গী. ১৮. ৪৬); ভগবদ্‌গীতা ইহা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন। তাহার পরেও যদি আপনা হইতে কেহ ভুল বুঝে তবে তাহা দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আত্মদৃষ্টি স্পেন্সর সাহেবের অভিমত ছিল না, তথাপি তিনিও স্বপ্রণীত 'সমাজশাস্ত্রের অভ্যাস' গ্রন্থের শেষে গীতার ন্যায়ই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এই বিষয় আধিভৌতিক পদ্ধতি অনুসারেও সিদ্ধ যে, এই জগতে কোন কিছুই একেবারে সংঘটিত করা সম্ভব নহে, তাহার কারণীভূত ও অবশ্যম্ভাবী অন্য হাজার বিষয় পূর্ব্বে যেরূপ ঘটিয়াছে তদনুসারে মনুষ্যের প্রযত্ন সফল, নিষ্ফল কিংবা ন্যূনাধিক পরিমাণে সফল হইয়া থাকে; এই কারণে সাধারণ লোক ফলাশায় কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও, বুদ্ধিমান ব্যক্তির ফলের আশা না রাখিয়া শান্তভাবে ও উৎসাহসহকারে কর্ত্তব্য করাই উচিত। *

ফলাশা ছাড়িয়া নিষ্কামবুদ্ধিতে সংসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম জ্ঞানীপুরুষকে অবশ্য আজীবন করিতে হইবে ইহা সিদ্ধ হইলেও এই কর্ম্ম কিসের দরুণ ও কেন প্রাপ্ত হয় ইহা

---

* "Thus admitting that for the *fanatic* some *wild anticipation* is needful as a stimulus, and recognizing the usefulness of his delusion as adapted to his particular nature and his particular function, the *man of higher type* must be content with greatly *moderated expectations*, while he perseveres with undiminished efforts. He has to see how comparatively little can be done, and yet to find it worth while to do that little: so uniting philanthrophic energy with philosophic calm."—Spencer's *Study of Sociology*. 8th Ed. P. 403. The italics are ours. এই বাক্যে fanatics এর বদলে 'প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিমূঢ়' (গী. ৩. ২৯) কিংবা 'অহঙ্কারবিমূঢ়' (গী. ৩. ২৭) অথবা ভাসকবির 'মূর্খ' শব্দ এবং man of higher type এর স্থানে 'বিদ্বান' (গী. ৩. ২৫) এবং greatly moderated expectations এস্থানে 'ফলোদাসীনা' অথবা 'ফলাশাত্যাগ' এই সমানার্থক শব্দ বসাইলে গীতা-সিদ্ধান্তের স্পেন্সর সাহেব যেন এক-রকম অনুবাদ করিয়াছেন এইরূপ মনে হইবে।

না বলিলে কর্ম্মযোগের বিচার পূরাপূরি হয় না। তাই, "লোকসংগ্রহমেবাহপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি" (গী. ৩. ২০)—লোকসংগ্রহের হিসাবে দেখিলেও তোমার কর্ম্ম করাই উচিত—কর্ম্মযোগের সমর্থনে অর্জ্জুনকে শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটি বলিয়াছেন। লোকসংগ্রহ অর্থে 'মনুষ্যদিগকে শুধু জমা করা' কিংবা নিজের কর্ম্মত্যাগ করিবার অধিকার হইলেও, কর্ম্মত্যাগ করা অজ্ঞানী লোকদের উচিত নহে বলিয়া তাহাদের যাহা ভাল লাগে এই কারণে কাজ করিবার ভাণ করুন' এরূপ অর্থ নহে। কারণ, লোকেরা অজ্ঞানী থাকিবে কিংবা তাহাদিগকে অজ্ঞানী রাখিবার জন্য জ্ঞানীপুরুষ কর্ম্ম করিবার ভাণ করিবে, গীতার ইহা শিখাইবার কোন হেতু নাই। ভাণ করা দূরে থাক্; কিন্তু 'লোকে তোমার অপকীর্ত্তি গাহিবে' (গী. ২. ৩৪) ইত্যাদি সাধারণ লোককে বুঝাইবার মতো যুক্তিবাদেও যখন অর্জ্জুনের সন্তোষ হইল না তখন তাহা অপেক্ষা গুরুতর ও তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে বলবত্তর কারণ ভগবান এক্ষণে বলিতেছেন। তাই 'সংগ্রহ' এই শব্দের জমা করা, রাখা, পালন করা, নিয়ন্ত্রিত করা প্রভৃতি যে সকল অর্থ অভিধানে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত অর্থ যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে হয়; এবং ঐরূপ করিলে লোকসংগ্রহ করা অর্থাৎ "তাহাদিগকে একত্র সম্বদ্ধ করিয়া তাহাদের পরস্পরানুকুল্যের দ্বারা যে সামর্থ্য উৎপন্ন হয় তাহা তাহাদের মধ্যে যাহাতে আসে এই প্রকারে তাহাদের পালন পোষণ কিংবা নিয়মন করা, এবং তদ্দ্বারা তাহাদের সুস্থিতি বজায় রাখিয়া, তাহাদিগকে শ্রেয়োলাভের পথে প্রবর্ত্তিত করা". এইরূপ ইহার অর্থ হয়। 'রাষ্ট্রের সংগ্রহ' শব্দ এই অর্থে মনুস্মৃতিতে প্রদত্ত হইয়াছে (মনু. ৭. ১৪), এবং শাঙ্কর ভাষ্যে লোকসংগ্রহ = লোকস্যোন্মার্গপ্রবৃত্তিনিবারণং" এইরূপ এই শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, সংগ্রহ শব্দের আমি যে অর্থ করিতেছি তাহা অপূর্ব্ব কিংবা ভিত্তিহীন নহে। সংগ্রহ শব্দের অর্থ ত এই হইল; কিন্তু 'লোকসংগ্রহ' শব্দে 'লোক' শব্দ কেবল মনুষ্যবাচী নহে, ইহাও এখানে বলা আবশ্যক। জগতের ইতরপ্রাণী অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, 'লোকসংগ্রহ' শব্দে মুখ্যরূপে মানবজাতিরই কল্যাণের সমাবেশ হয়, একথা সত্য; তথাপি ভূলোক, সত্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক প্রভৃতি যে অনেক লোক অর্থাৎ জগৎ ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদেরও উত্তমরূপে ধারণ-পোষণ হইয়া সেই সমস্তও সুচারুরূপে চলিবে এইরূপ ভগবানের ইচ্ছা; তাই মনুষ্যলোকের ন্যায় এই সমস্ত লোকের ব্যবহারও সুব্যবস্থিতরূপে চলিবে (লোকানাং সংগ্রহঃ) এই ব্যাপক অর্থ 'লোকসংগ্রহ' পদের দ্বারা এই স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হয়। জনক-কৃত আপন :কর্ত্তব্যের যে বর্ণনা উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেবতা ও পিতৃগণেরও উল্লেখ আছে, এবং ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এবং মহাভারতের নারায়ণীয়-উপাখ্যানে যে যজ্ঞচক্রের বর্ণনা আছে তাহাতেও দেবলোক ও মনুষ্যলোক এই দুয়েরই ধারণ-পোষণ হইবে বলিয়া ব্রহ্মদেব যজ্ঞ উৎপন্ন করেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী. ৩. ১০-১২)। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, শুধু মনুষ্যলোকের নহে, দেবাদি সমস্ত লোকের ধারণপোষণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের শ্রেয়সম্পাদন করিবে, এই অর্থই লোকসংগ্রহপদে ভগবদ্গীতায় বিবক্ষিত হইয়াছে। সমস্ত জগতের পালন-পোষণ করিয়া লোকসংগ্রহ করিবার ভগবানের এই যে অধিকার, তাহাই জ্ঞানী পুরুষ নিজের জ্ঞানপ্রযুক্তই প্রাপ্ত হয়েন। জ্ঞানীপুরুষেরা যাহা প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, তাহাই অন্য লোকেরাও প্রমাণ মনে করিয়া সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে (গী. ৩. ২১)। কারণ, সমস্ত জগতের ধারণ-পোষণ কিসে হইবে, শান্তচিত্তে ও সমবুদ্ধিতে তাহার বিচার করিয়া তদনুসারে ধর্ম্মবন্ধন স্থাপন করা জ্ঞানীপুরুষদিগের কাজ, ইহা সাধারণ লোকের ধারণা। এই ধারণা ভ্রান্তিমূলকও নহে। অধিক কি, সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে এই বিষয় ঠিক্ আসে না বলিয়া জ্ঞানীপুরুষদিগের উপর তাহারা ভরসা রাখে, এরূপ বলিলেও চলে। এই কথা মনে করিয়াই শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

লোকসংগ্রহসংযুক্তং বিধাত্রা বিহিতং পুরা।
সূক্ষ্মধর্ম্মার্থনিয়তং সতাং চরিতমুত্তমম্॥

"লোকসংগ্রহকারক সূক্ষ্মধর্ম্মার্থনিয়ত সাধুদিগের উত্তম চরিত্র বিধাতারই বিধান"—(মভা. শাং. ২৫৮. ২৫)। লোকসংগ্রহ অর্থে, নিরর্থক কোন প্রকার মনগড়া মিথ্যা কিংবা লোকদিগকে অজ্ঞানে রাখিবার কৌশল নহে; জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া জগতের বিনাশ সম্ভাবনা হয় বলিয়া ইহাই সিদ্ধ হয় যে, বিধাতাবিহিত সাধুপুরুষদিগের কর্ত্তব্যসমূহের মধ্যে ইহা এক মুখ্য কর্ত্তব্য, এবং "আমি এই কর্ম্ম না করিলে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইবে" (গী. ৩. ২৪) এই ভগবদ্বচনের ভাবার্থও এই। জ্ঞানীপুরুষ সমস্ত জগতের চক্ষু; ইহাঁরা যদি নিজের কর্ম্ম ত্যাগ করেন তাহা হইলে অন্ধসমাচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত জগৎ ধ্বংস না হইয়া যায় না। লোকদিগকে জ্ঞানী করিয়া উন্নতির পথে আনয়ন করা জ্ঞানীপুরুষদিগেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কার্য্য কেবল মুখভারতীতে অর্থাৎ শুষ্ক উপদেশের দ্বারাই কখনও সিদ্ধ হয় না। কারণ যাহাদের সদাচরণের অভ্যাস নাই, যাহাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয় নাই, তাহাদিগকে শুধু শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান শুনাইলে "তুমি সে আমি, আমি সে তুমি" এই প্রকারে তাহাদিগকে জ্ঞানের অপব্যবহার করিতে সর্ব্বদাই দেখা যায়। তাছাড়া, কোন উপদেশের সত্যতার পরীক্ষাও লোকেরা তাহার আচরণ দেখিয়াই করিয়া থাকে। তাই, জ্ঞানী মনুষ্য নিজে কাজ যদি না করেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণ লোককে অলস করিবার এক বড় কারণ হইবেন। ইহাকেই 'বুদ্ধিভেদ' বলে। এবং এই বুদ্ধিভেদ না হইয়া লোকেরা সত্যসত্যই নিষ্কাম হইয়া নিজেদের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে জাগৃত হইবে বলিয়া সংসারে থাকিয়াই নিজ কর্ম্মের দ্বারা লোকদিগকে সদাচরণের অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেওয়াই জ্ঞানীপুরুষের কর্ত্তব্য (ভড়ং নহে) হইয়া পড়ে। তাই কর্ম্মত্যাগের অধিকার তিনি (জ্ঞানীপুরুষ) কখনই প্রাপ্ত হন না; নিজের জন্য না হইলেও লোকসংগ্রহণার্থ চাতুর্বর্ণ্যের সমস্ত কর্ম্ম যথাধিকার তাঁহার করিতে হইবে এইরূপ গীতার উপদেশ। কিন্তু জ্ঞানীপুরুষের চাতুর্বর্ণ্যের কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে করাও

আবশ্যক নহে, এমন-কি করা উচিত নহে, এইরূপ সন্ন্যাসমার্গীদিগের মত হওয়ায়, “জ্ঞানীপুরুষ লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিবেন” এই গীতাসিদ্ধান্তের সন্ন্যাসমার্গীয় টীকাকারেরা কতকগুলো গোলমেলে অর্থ করিয়া, প্রত্যক্ষভাবে নহে পরন্তু পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ কথা বলিতেও তাঁহারা প্রস্তুত যে, স্বয়ং ভগবানও ভড়ং করিবার উপদেশ করিতেছেন, কিন্তু গীতার লোকসংগ্রহ শব্দের এই তৈলাক্ত রকমের অর্থ ঠিক নহে, ইহা পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। জ্ঞানী পুরুষ কর্ম্মত্যাগের অধিকার প্রাপ্ত হন এই মতই গীতার আদৌ মান্য নহে; এবং তাহার সমর্থনে গীতায় যে সকল কারণ দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে লোকসংগ্রহ একটি মুখ্য কারণ। তাই, জ্ঞানীপুরুষের কর্ম্ম থাকে না ইহা প্রথমে মানিয়া লইয়া লোকসংগ্রহ পদের ভড়ং-মূলক অর্থ করা সর্ব্বথাই অন্যায্য। মনুষ্য এই জগতে কেবল নিজের জন্যই জন্মে নাই। অজ্ঞতাবশতঃ সাধারণ লোক নিজ স্বার্থের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে ইহা সত্য। কিন্তু “সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি” (গী. ৬. ২৯)—আমি সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত ভূত আমাতে—এই প্রকার সমস্ত জগৎই যাঁহার আত্মভূত হইয়াছে তিনি “আমার মোক্ষ লাভ হইয়াছে, এক্ষণে লোকেরা দুঃখী হইলেও আমার তাহাতে কিসের ভাবনা” এইরূপ কথা বলিলে, তাঁহার নিজমুখেই জ্ঞানের হীনতা স্বীকার করা হয়। জ্ঞানী পুরুষের আত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আছে কি? তাঁহার আত্মার উপর যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানের আবরণ ছিল সে পর্য্যন্ত “আমি” ও “লোক” এই ভেদ বজায় ছিল। কিন্তু জ্ঞানপ্রাপ্তির পর সমস্ত লোকের আত্মাই তাঁহার আত্মা। তাই যোগবাসিষ্ঠে বসিষ্ঠ রামকে এইরূপ বলিয়াছেন—

যাবল্লোকপরামর্শো নিরূঢ়ো নাস্তি যোগিনঃ।
তাবদ্রূঢ়সমাধিত্বং ন ভবেত্যেব নির্ম্মলম্॥

“যে পর্য্যন্ত লোকের পরামর্শ লইবার (অর্থাৎ লোকসংগ্রহের) কাজ একটুও অবশিষ্ট থাকে, সমাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত যোগারূঢ় পুরুষের অবস্থা নির্দ্দোষ, এরূপ কখনই বলা যাইতে পারে না” (যো. ৬ পূ. ১২৮. ৯৭)। কেবল আপন সমাধিসুখেই নিমগ্ন থাকা এক প্রকার নিজের স্বার্থসাধনা মনে হয়। সন্ন্যাসমার্গীয় লোকেরা ইহার প্রতি লক্ষ্য করে না, ইহাই তাহাদের যুক্তিবাদের মুখ্য দোষ। ভগবান অপেক্ষা কেহই অধিক জ্ঞানী, অধিক নিষ্কাম কিংবা অধিক যোগারূঢ় হইতে পারে না। কিন্তু ভগবানও “সাধুদিগের সংরক্ষণ, দুষ্টদিগের নাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন” এইপ্রকার লোকসংগ্রহের কাজ করিবার জন্যই যদি সময়ে সময়ে অবতার হন (গী. ৪. ৮), তবে জ্ঞানী পুরুষের লোকসংগ্রহের কাজ ছাড়িয়া দিয়া “যে পরমেশ্বর এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাঁহার ইচ্ছামতো ভরণপোষণ করিবেন, সে দিক্ দেখা আমাদের কাজ নহে” এইরূপ বলা সর্ব্বথাই অনুচিত। কারণ জ্ঞানপ্রাপ্তির পর, ‘পরমেশ্বর,’ ‘আমি’ ও ‘জগৎ’—এই ভেদই থাকে না; এবং যদি থাকে, তবে তিনি জ্ঞানী নহেন, তিনি জ্ঞানী বলিয়া ভড়ং করেন—বলিতে হইবে। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী পুরুষ যদি পরমেশ্বররূপী হন, তবে পরমেশ্বর যে কাজ করেন তাহা পরমেশ্বরের ন্যায় অর্থাৎ নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে করিবার আবশ্যকতা হইতে জ্ঞানী পুরুষ কি করিয়া অব্যাহতি পাইবেন (গী. ৩. ২২ ও ৪. ১৪ ও ১৫)? তাছাড়া, পরমেশ্বর যাহা কিছু করেন তাহাও জ্ঞানীপুরুষের রূপে কিংবা জ্ঞানীপুরুষের দ্বারাই করিয়া থাকেন। তাই, “সকল ভূতে এক আত্মা” পরমেশ্বরের স্বরূপের এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তাঁহার মনে সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পাদি উচ্চবৃত্তি পূর্ণ জাগৃত থাকিয়া স্বভাবতই লোককল্যাণের দিকে তাঁহার মনের প্রবৃত্তি হইবে। এই অভিপ্রায়ে তুকারাম বাবা সাধুপুরুষের লক্ষণ এই প্রকার বলিয়াছেন—

জে কাঁ রঁজলে গাঁজলে। তাঁসি ভণে জো আছুলে।
তোচি সাধু ওড়্খাবা। দেব তেথেঁ চি জাণাবা॥

অর্থাৎ “সকলের সুখদুঃখকে যে আপনার বলে তাহাকেই সাধু বলিয়া জানিবে। দেবতা সেইখানেই জানিবে।” এইরূপ (গা. ৯৬০. ১-২) কিংবা—

পরউপকারী বেঁচিয়েল্যা শক্তী। তেণে আত্মস্থিতী জাণীতলী (গা. ৪৫৬২) অর্থাৎ “পরোপকারে যিনি ব্যয় করিয়াছেন তিনিই আত্মস্থিতি জানেন।”

এবং শেষে সাধুদিগের (অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বরের পূর্ণজ্ঞান যাঁহারা লাভ করিয়াছেন সেই-সকল মহাত্মাদের) কার্য্যের বর্ণনা এই প্রকার করিয়াছেন—

জগাচ্যা কল্যাণা সন্তাঞ্চ্যা বিভূতি।
দহে কষ্টবিতো উপকারেঁ॥

অর্থাৎ “জগতের কল্যাণই সাধুদিগের বিভূতি, উঁহারা কষ্ট করিয়াও দশজনের উপকার করেন” (গা. ৯২৯); “স্বার্থো যস্য পরার্থ এব স পুমানেকঃ সতামগ্রণীঃ”—পরার্থই যাহার স্বার্থ হইয়াছে সেই ব্যক্তিই সাধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এইরূপ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকার কি জ্ঞানী ছিলেন না? কিন্তু তৃষ্ণাদুঃখরূপ রজ্জুর একটা মস্ত জুজু তৈরী করিয়া তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গেই পরোপকারবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত উচ্চ বৃত্তিকে বিদলিত না করিয়া লোকসংগ্রহকারক চাতুর্বর্ণ্যাদি শাস্ত্রীয় সীমা স্থাপনের কার্য্য তাঁহারা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ, বৈশ্যের কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্যব্যবসায় কিংবা শূদ্রের সেবা, এই যে গুণকর্ম্মস্বভাবানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহা কেবল প্রত্যেক ব্যক্তির হিতেরই জন্য এরূপ নহে; প্রত্যুত মনুস্মৃতিতে আছে যে, চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবসায়বিভাগ লোকসংগ্রহার্থই প্রবৃত্ত হইয়াছে; সমস্ত সমাজের রক্ষণার্থে কতকগুলি ব্যক্তির যুদ্ধকলা নিত্য অভ্যাস করিয়া প্রস্তুত থাকা আবশ্যক এবং কাহারও কাহারও কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য, জ্ঞানার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা সমাজের অন্য অভাব পূর্ণ করা আবশ্যক, গীতার অভিপ্রায়ও ঐরূপ (মনু. ১. ৮৭; গী. ৪. ১৩; ১৮. ৪১ দেখ)। এই চাতুর্বর্ণ্যধর্ম্মের মধ্যে কোন এক ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে সমাজ ততটুকু পঙ্গু হইয়া যাইবে এবং শেষে তাহার নাশ হইবারও সম্ভাবনা থাকে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তথাপি কর্ম্মবিভাগের এই ব্যবস্থা একই প্রকার থাকে না, যেন স্মরণ থাকে। প্রাচীন গ্রীক তত্ত্বজ্ঞ প্লেটো এই বিষয়ক আপন গ্রন্থে এবং আধুনিক ফরাসী শাস্ত্রজ্ঞ কোং আপন “আধিভৌতিক তত্ত্বজ্ঞানে” সমাজধারণার্থ যে ব্যবস্থা সূচিত করিয়াছেন তাহা চাতুর্বর্ণ্যের সদৃশ হইলেও বৈদিক ধর্ম্মের চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা হইতে উহা অল্পাধিক অংশে যে ভিন্ন, ইহা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলেই

উপলব্ধি হইবে। ইহার মধ্যে কোন্ সমাজব্যবস্থা উত্তম, অথবা এই উত্তমতা আপেক্ষিক, এবং যুগকালানুসারে. ইহাতে কোন ফেরফার হইতে পারে কি না, ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন এইস্থানে উঠে; এবং 'লোকসংগ্রহ' এখনকার কালে পাশ্চাত্যদেশে একটা বড় রকমের শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু গীতার তাৎপর্য্যনির্ণয়ই আমাদের উপস্থিত বিষয় হওয়ায় এখানে এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কারণ নাই। গীতাকালে চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা জারী ছিল এবং উহা গোড়ায় লোকসংগ্রহ করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হয়, ইহা নির্ব্বিবাদ। তাই চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা অনুসারে নিজনিজ প্রাপ্ত কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে যেরূপ করিতে হইবে তাহার প্রত্যক্ষ শিক্ষা নির্দ্দেশ করাই গীতার এই লোকসংগ্রহ পদের অর্থ। ইহাই এখানে মুখ্য বক্তব্য। জ্ঞানী পুরুষ সমাজের শুধু চক্ষু নহে, সমাজের গুরুও বটে। তাই ইহা স্বতই সিদ্ধ হয় যে, উক্ত প্রকার লোকসংগ্রহ করিবার জন্য তিনি আপন কালের সমাজ ব্যবস্থায় যদি কোন ত্রুটি দেখেন, তবে তিনি তাহা শ্বেতকেতুর ন্যায় দেশকালানুরূপ পরিমার্জ্জিত করিবেন এবং সমাজের ধারণ-পোষণ শক্তিকে হ্রাস হইতে না দিয়া, তাহা যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে পারে এইরূপ উদ্যোগ করিবেন। এই প্রকার লোকসংগ্রহের জন্যই জনক সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া আমরণ রাজত্ব করিতে থাকিলেন এবং মনু প্রথমে রাজা হইবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন; এবং এই কারণেই "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি (গী. ২. ৩১) স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম সম্বন্ধে কাঁদিতে বসিয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে. কিংবা "স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্" (গী. ১৮. ৪৭) স্বভাব ও গুণানুরূপ নির্দ্ধারিত চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সাধন করিলে তোমার কোন পাপ হইবে না, ইত্যাদি প্রকার চাতুর্ব্বর্ণ্যকর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত যুদ্ধ করিতে অর্জ্জুনকে গীতায় বারংবার উপদেশ করা হইয়াছে। পরমেশ্বরের জ্ঞান যথাশক্তি অর্জ্জন করিও না, এরূপ কেহই বলে না। অধিক-কি, এই জ্ঞান অর্জ্জন করাই এই জগতে মনুষ্যের ইতিকর্ত্তব্য, ইহা গীতারও সিদ্ধান্ত। কিন্তু পরে গীতার বিশেষ উক্তি এই যে, নিজের আত্মার কল্যাণেই সমষ্টিরূপ আত্মার কল্যাণার্থ যথাশক্তি চেষ্টারও সমাবেশ হয় বলিয়া লোকসংগ্রহ করাই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের প্রকৃত পর্য্যবসান, তথাপি কোন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেই সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম স্বহস্তে করিবার যোগ্য হয় এরূপ নহে। ভীষ্ম ও ব্যাস দুইজনেই মহাজ্ঞানী ও পরম ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন। কিন্তু ব্যাসও ভীষ্মের ন্যায় যুদ্ধের কাজই করিয়াছেন, এরূপ কেহ বলে না। দেবতাদের দিকে দেখিলেও সেখানেও জগতের সংহার করিবার কাজ শঙ্করের বদলে বিষ্ণুর উপর সমর্পিত হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না। জীবন্মুক্তাবস্থা—মনের নির্ব্বিষয়তার, সম ও শুদ্ধবুদ্ধির এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ পৈঠা; উহা আধিভৌতিক কর্ম্মবুদ্ধির পরীক্ষা নহে। তাই, স্বভাব ও গুণানুরূপ প্রবৃত্ত চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি ব্যবস্থা অনুসারে যে কর্ম্ম আমরা চিরজন্ম করিয়া আসিতেছি স্বভাব অনুসারে সেই কর্ম্ম বা ব্যবসায় জ্ঞানীপুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও লোকসংগ্রহার্থ চলিত রাখিতে হইবে, কারণ তাহার ভিতরেই বিশেষজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা থাকে, অন্য ফালতো ব্যবসায় করিলে তাহাতে সমাজের ক্ষতি হইবে, গীতার এই বিশেষ উপদেশ পুনর্ব্বার এই প্রকরণেই বিচার করা হইয়াছে (গী. ৩. ৩৫; ১৮-৪৭)। প্রত্যেক মনুষ্যে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রকৃতি, স্বভাবও গুণের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতাকেই অধিকার বলা হয়; এবং "পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেও এই অধিকার অনুসারে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম, লোকসংগ্রহার্থ আমরণ করিয়া যাইবে, কর্ম্মত্যাগ করিবে না"—"যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিণাম্" (বেসূ. ৩. ৩. ৩২) এইরূপ বেদান্তশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বেদান্তসূত্রকারের এই উপপত্তি কেবল বড়-অধিকারের ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই খাটে, কেহ কেহ এইরূপ বলেন; এবং এই সূত্রের ভাষ্যে, তৎসমর্থনার্থ যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সমস্ত উদাহরণই ব্যাস-আদি বড় বড় অধিকারী পুরুষদিগেরই দেওয়া আছে। কিন্তু মূলসূত্রে অধিকারের ছোট-বড়ত্ব সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, তাই, "অধিকার" শব্দে ছোট-বড় সমস্ত অধিকার ধরিতে হয়; এবং এই অধিকার কে কি প্রকারে প্রাপ্ত হয় ইহার সূক্ষ্ম ও স্বতন্ত্র বিচার করিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যের সঙ্গেই সমাজ ও সমাজের সঙ্গেই মনুষ্য পরমেশ্বর উৎপন্ন করায়, যাহার যতটা বুদ্ধিবল, প্রাণবল, দ্রব্যবল কিংবা শরীরবল স্বভাবত হইতে পারে কিংবা স্বধর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জন করা যাইতে পারে, সেই হিসাবেই যথাশক্তি জগতের ধারণপোষণ করিবার ন্যূনাধিক অধিকার (চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি কিংবা অন্য গুণকর্ম্মবিভাগরূপ সামাজিক ব্যবস্থা হইতেই) প্রত্যেকেই জন্মত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কল ভাল চালাইবার জন্য বড় চাকার মতো খুব ছোট চাকারও যেমন দরকার হয়, সেইরূপই সমস্ত জগতের এই বৃহৎ বিরাট সৃষ্টিসংহারের কাজ অথবা চক্র সুব্যবস্থিতরূপে চলমান রাখিবার জন্য ব্যাস আদির বড় বড় অধিকারের সমানই অন্য মনুষ্যের ছোট ছোট অধিকারও পূর্ণ ও যোগ্যরীতিতে করিয়া আমলে আনা কর্ত্তব্য। কারণ, কুমার ঘট এবং তাঁতি বস্ত্র তৈয়ার না করিলে, রাজা দ্বারা যথোচিত রাজ্যরক্ষণ হইলেও লোকসংগ্রহের কাজ পূরাপূরি হইতে পারে না; কিংবা আগ্‌-গাড়ীতে সামান্য নিশান-ওয়ালা কিংবা পয়েন্টস্মেন (রেল-জুড়িবার শিপাই) যদি নিজের কর্ত্তব্য না করে, তবে এখন যেমন আগ্‌গাড়ী বায়ুবেগে নির্ভয়ে ছুটিয়া চলে, সেরূপ আর চলিতে পারিবে না। তাই বেদান্তসূত্রকারেরই উপরি-উক্ত যুক্তিবাদের দ্বারা এক্ষণে নিষ্পন্ন হইল যে, ব্যাস আদি বড় বড় অধিকারী শুধু নহে অন্য লোকেরও —তা তিনি রাজাই হউন বা প্রজাই হউন—লোকসংগ্রহার্থ যথানির্দ্দিষ্ট ছোটবড় অধিকারের কর্ম্ম জ্ঞানলাভের পরেও ত্যাগ না করিয়া নিষ্কামবুদ্ধিতে কর্ত্তব্য জানিয়া যথাশক্তি, যথামতি ও যথাসম্ভব করিয়া যাওয়া উচিত। আমি না করি, অন্য কেহ এই কাজ করিবে এরূপ বলা উচিত নহে। কারণ, তাহা হইলে সমগ্র কর্ম্মে আবশ্যক ব্যক্তির মধ্যে একজন কম হইয়া যায় এবং সংঘশক্তি কমিয়া যাইবে শুধু নহে কিন্তু জ্ঞানীপুরুষ সেই কর্ম্ম যতটা বিশুদ্ধভাবে করিবেন সেরূপ অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে; ফলত এই হিসাবে লোকসংগ্রহও খোঁড়া হইয়া পড়িবে। তাছাড়া জ্ঞানী পুরুষের কর্ম্মত্যাগরূপ উদাহরণ হইতে লোকের বুদ্ধিও বিগড়াইয়া যায় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবার পর নিজের আত্মার মোক্ষলাভ হইলেই সন্তুষ্ট হইয়া

জগতের উচ্ছেদ হইলেও তাহার পরোয়া না রাখিয়া "লোকসংগ্রহধর্ম্মং চ নৈব কুর্য্যান্ন কারয়েৎ"—লোক-সংগ্রহ করিবে না, করাইবেও না (মভা. অশ. অনুগীতা ৪৬. ৩৯) এইরূপ সন্ন্যাসমার্গীয় লোক কখন কখন বলিয়া থাকেন সত্য। কিন্তু ব্যাসাদির আচরণের তাহারা যে উপপত্তি দেয় তাহা হইতে, এবং বসিষ্ঠ, পঞ্চশিখ প্রভৃতি রাম-জনকাদিকে আপনাপন অধিকার অনুসারে সমাজের ধারণ-পোষণাদি কর্ম্মই আচরণ করিতে যে বলিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সন্ন্যাসমার্গীর কর্ম্মত্যাগের উপদেশ একদেশদর্শী, সর্ব্বথা-সিদ্ধ শাস্ত্রীয় সত্য নহে। তাই বলিতে হয় যে, এই প্রকার একপক্ষীয় উপদেশের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, ভগবানের নিজেরই উদাহরণ অনুসারে জ্ঞানলাভের পরেও আপন অধিকার বুঝিয়া তদনুসারে লোকসংগ্রহকারী কর্ম্ম আচরণ করিতে থাকাই শাস্ত্রোক্ত ও উত্তম মার্গ; তথাপি এই লোকসংগ্রহ ফলাশা রাখিয়া করিতে নাই। কারণ, লোকসংগ্রহই হউক না কেন, ফলের আশা রাখিলে কর্ম্ম নিষ্ফল হইলে দুঃখ না হইয়া যায় না। তাই আমি 'লোকসংগ্রহ করিব' এই অভিমান বা ফলাশার বুদ্ধি মনে না রাখিয়া লোকসংগ্রহও কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেই করিতে হয়। 'লোকসংগ্রহার্থ' অর্থাৎ লোকসংগ্রহরূপ ফললাভের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে গীতা এইরূপ না বলিয়া 'লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্' লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও (সংপশ্যন্) তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে এইরূপ বলিয়াছেন (গী. ৩. ২০)। এই প্রকার গীতায় যে একটু লম্বাচোড়া শব্দযোজনা করা হইয়াছে—ইহাই তাহার বীজ। লোকসংগ্রহ মহৎ কর্ত্তব্য সত্য; কিন্তু এই শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকে (গী. ৩. ১৯) অনাসক্তবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিবার ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ করিয়াছেন সেই উপদেশ লোকসংগ্রহের জন্যও উপযুক্ত, ইহা বিস্মৃত হইবে না।

রাণাডের-স্মৃতিকথা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

খৃষ্টাব্দ ১৯০০ সেপ্টেম্বর মাস।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

শেষ বৎসর—লাহোরের কংগ্রেস্।

এই বৎসরে ওঁর শরীর ভাল না থাকায়, ডাক্তার ওঁকে কংগ্রেসে যাইতে অনুমতি দিবেন কিনা এই সম্বন্ধে ওঁর সন্দেহ ছিল। তথাপি কংগ্রেসে যাবার দিকে ওঁর সম্পূর্ণ মনের টান ছিল। এই সময়ে পীড়িত হইলেও প্রতি বৎসরের মতো এ বৎসরেও সোশ্যাল-কংগ্রেসের রিপোর্ট আনাইয়াছিলেন, লম্বা লম্বা পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং প্রাপ্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া তাহার উত্তর দিবার কাজ প্রতিদিন নিত্য নিয়মানুসারে চলিয়াছিল। তাহার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে যে সব রিপোর্ট আসিত তার সংক্ষিপ্ত-সার লেখা আরম্ভ হইয়াছিল। শেষাশেষি, এই কাজ কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া চলিত। কন্‌ফারেন্সের সম্মুখে পাঠ করিবার জন্য "বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র" এই প্রবন্ধ লিখিবার জন্য ঠিক ৫।৬ দিন বসিতে হইয়াছিল। কাজকর্ম্মের পর যে সময় অবশিষ্ট থাকিত সেই সময়ে লাহোরে যাত্রা করিবার সম্বন্ধে প্রস্তুত হইবার কথা বলিতেন। ২।৩ দিন পরে যাইবার সময় উপস্থিত হইল, এইবার আমি ওঁর সঙ্গে যাইব; ওঁর শরীর ভাল নাই এই সময়ে উনি একলা গেলে আদপেই আমার ভাল লাগিবে না। আমি সঙ্গে যাইব এই কথা একবার ওঁকে বলিয়া রাখিব। তারপর সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া ওঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই যাইব বলিয়া স্থির করিলাম। কিন্তু এই কথা পাড়িবার পূর্ব্বেই উনি আপনা হইতেই আমাকে বলিলেন "এবার আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে।" এই কথা শুনিয়া আমার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এবং খুব ঔৎসুক্যের সহিত আমি সমস্ত ঠিক্-ঠাক্ করিলাম। আবার, ওঁর জিনিস ও কাপড় যা কিছু দরকার সমস্ত মনে করিয়া প্যাক করিলাম। সেই সময় শ্বাশুড়ীঠাকরুণ, ননদ শ্রীমতী গঙ্গাবাই, শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই, আবা সাহেব এবং তাঁর ছেলেপিলে বোম্বায়েতেই থাকায় আমরা লাহোরে যাইবার সময় সখু ও নান্নুকে সঙ্গে না লইয়া কেবল আমরা দুজনে যাইব এইরূপ স্থির হইয়াছিল; কিন্তু ওঁর আবার কি মনে হইল কে জানে। রাত্রে শোবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্ত ঠিকঠাক্ করেছ ত? আমি মনে করচি সখুকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তার কাপড়-চোপড় প্যাক্ কর। কাল পুণা থেকে আমার যে-সব বন্ধু আসবেন, তাঁদের "সিট রিজার্ভ" করতে বলে দেব, সেখানে খুব ঠাণ্ডা, গরম কাপড় বেশী নিও। সখুরও গরম কাপড় বেশী নিও।" আমি বলিলাম, নান্নুকে এখানে রেখে শুধু সখুকেই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা কি ভাল দেখতে হবে? এই নিয়ে অনর্থক একটা চর্চ্চা উপস্থিত হবে। নিয়ে গেলে দুজনকেই নিয়ে যেতে হয়, নৈলে দুজনেই এখানে থাক্। তাহলে কারও কিছু বল্‌বার থাকে না।" তখন উনি বলিলেন, এ মুস্কিলে তোমার পড়তে হবে না। আমি যে রকম বলচি তাই কর। যে কাজ করতেই হবে তা নিয়ে হ্যাঙ্গামা করলে চল্‌বে না। যা বল্‌চি তাই কর। নান্নুকেও সঙ্গে নিতাম কিন্তু সেখানে বড় ঠাণ্ডা। দুই চাকরকেই সঙ্গে নিচ্চি। সে ছোট বলে একজন চাকর তো তার কাজেই আট্‌কে থাক্‌বে। তাছাড়া তার জন্য তোমারও অনেকটা সময় যাবে। সে সমস্ত ব্যবস্থা ও কাজকর্ম্ম তোমায় একলাই করতে হবে এবং আমার রোগের দরুন সে সমস্ত করে উঠ্‌তে পারবে না। এই জন্য তাকে এইখানেই রাখ্‌তে হবে। সখু এখন অনেকটা বুঝতে পারে, সে তোমাকে কষ্ট দেবে না। তাকে তোমার সঙ্গে রাখ্‌লে তোমার অনেকটা সাহায্য হবে, সাহচর্য্যও হবে। তাই আমি বল্‌চি সখুকে এখানে রাখার চেয়ে সঙ্গে নেওয়াই ভাল। যাবার জন্য তার সমস্ত প্রস্তুত করে রাখ।" এই কথা সখুকে বলায় তার খুব আনন্দ হইল। কিন্তু নান্নুকে এখানে একলা রাখিয়া যাইতেছি মনে করিয়া আমার বড় খারাপ লাগিল। আমাদের এই সঙ্কল্প সম্বন্ধে বাহিরে কাহাকে বলি নাই; এবং যাত্রা করা পর্য্যন্ত বলিব না এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম। আমরা কেবল

দুজনে যাইতেছি, ছেলেদিগকে সঙ্গে লইতেছি না ইহাই সকলে জানিত বলিয়া যে-সে লোক সখুকে রাগাইত; এবং এই জন্য সে মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে বসিয়া যাইত। এবং যখন যখন সুযোগ পাইত, উঁর নিকট আসিয়া "আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও" বলিয়া অনুনয় করিত। ওকে এখানে রাখিয়া যাইতে আমারও খুব কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু একলা নান্নুকে কি করিয়া রাখিয়া যাইব এই মনে করিয়া সখুকেও রাখিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। নান্নু ছোট বলিয়া ইহার কিছুই বড় একটা বুঝিতে পারে নাই। বাড়ীর লোকেরা যখন ওকে রাগাইত তখনই সেও দুই একবার "আমি তোমার সঙ্গে যাব" এই কথা আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছে; কিন্তু একটা ছোট কাগজের মোড়কের মধ্যে ৫৲ টাকা রাখিয়া তাকে বলিলাম, "ছবি কেন্‌বার জন্য তোকে এই টাকা দিলাম, এই মোড়কটা তোর আপনার কাছে রেখে দিবি, কাকেও দিবি না।" এই টাকা পেয়ে সে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

পুণা হইতে, কংগ্রেসে যাইবার জন্ত নগরকর, গোখ্‌লে, ভিডে, প্রভৃতি ৫।৬ জন মিত্র সকালের গাড়ীতে আসিলেন। দুপরে, আমাদের "সীট্ রিজার্ভ" করিবার জন্ত ভাঙজীকে উনি বলিলেন। তদনুসারে তিনি ষ্টেশনে গিয়া "সীট রিজার্ভ" করিয়া আসিলেন। এবং কাল সন্ধাকালে ছাড়িতে হইবে এইরূপ তিনি বলিলেন। সকাল হইতে রাত্রিতে শুইবার সময় পর্য্যন্ত উঁর সমস্ত দিন, সখান বসিয়া কাজ করিতে এবং পুণা হইতে সমাগত বন্ধুদিগের সহিত কথাবার্ত্তা করিতে কাটিয়া গেল। দুপরে ১০।৫ মিনিট্ একটু শুইয়া বিশ্রাম করিতেও পারেন নাই। সেই জন্য রাত্রে নিত্যকার Spasm একটু সজোরে আসিল এবং বেশীক্ষণ রহিল। তাই রোজকার চেয়ে আজ বেশী ক্লান্তও হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিছানায় দেড় ঘণ্টা পড়িয়া রহিলেন তবু নিদ্রা আসিল না। সমস্ত গত সপ্তাহ লেখায় কাজ বেশী পড়ায়, চোখে বেদনা হওয়ায় নিদ্রা হয় নাই; এইরূপ আমার মনে হওয়ায় আমি উঠিলাম এবং নীচে গিয়া মাখন লইলাম, এবং আসিবার সময় পাহারাওয়ালাকে বলিলাম যে, "বাগান হইতে এরণ্ডের কচি পাতা পাঁচ সাতটা নিয়ে এস।" সে আমাকে পাতা আনিয়া দিল। তার পর আমি উপরে গেলাম এবং রগের উপর অনেকক্ষণ মাখন মালিস্ করিয়া, এরণ্ডের পাতা তালুর উপর রাখিয়া দিলাম, এবং যাহাতে কোন প্রকারে নিদ্রা হয় তজ্জন্য পায়ে মাখন মালিস করিতে লাগিলাম। উনিও চুপ্ চাপ্ করিয়া শুইয়া থাকিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঘুম আসিল না। ঘড়িতে একটা বাজিল, ঘুম আসা দূরে থাক্ বুকের ব্যথা আরম্ভ হইল। এতক্ষণ নিদ্রা না হইলেও বিছানায় চুপ্‌চাপ্ করিয়া শুইয়া কেবল শরীরের বিশ্রাম হইয়াছিল, সে বিশ্রামটুকুও আর পাইবেন না। পালঙ্গের উপর উঠিয়া বসিয়া এবং এক তাকিয়া লইয়া তাহাতে ঠেস্ দিয়া বসিলেন। ঐরূপ উঠিয়া বসিবার পর আমি নীচে গেলাম এবং চুলা ধরাইয়া একটু জল গরম করিয়া রবরের ব্যাগে ভরিয়া রাখিলাম। এবং বজারাকে উঠাইয়া বলিলাম যে, "তুই আর খানিকটা জল গরম করে আর একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে আয়" তার পর আমি উপরে গেলাম এবং পিঠের যেখানটা ব্যথা করিতেছিল সেইখানে জল-ভরা ব্যাগটা রাখিলাম; এবং বুকের উপর মোহা-ফলের পটি লাগাইলাম। কিন্তু কিছুতেই ব্যথা গেল না; এবং ৭।৭॥০ টা পর্য্যন্ত চোখ্ বুজিয়া রহিলেন। ব্যাথাটা বন্ধ হইয়া চোখ্ বুজিবামাত্র আমি ডাক্তার ভালচন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলাম। নগরকর, গোখলে প্রভৃতি বন্ধুদিগকে এই সমস্ত বিবরণ বলা হইল। এক্ষণে লাহোরে যাওয়া সম্বন্ধে কি করা হইবে, আমরা এই লইয়া মুস্কিলে পড়িলাম। ৭॥০ টার সময় উঁর নিদ্রা আসিল এবং প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ৮ টার সময় বৈঠকখানায় আসিলেন। তখন, "রাত্রে বুকে ব্যথা হয়েছিল কি? ঘুম হয় নি কি?" এইরূপ পুণার বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিলে উনি বলিলেন, "আঃ! এ আমার নিত্যই হয়, এতে এত ভাবনা কিসের? আমার সেই রকম ব্যামো আবার একটু হয়েছে; তাই এই রকম কখন কখন হয়।" এই রকম বলিতেছেন এমন সময় ডাক্তার ভালচন্দ্র আসিলেন এবং উঁর শরীর পরীক্ষা করিয়া এবং সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিলেন যে, "যাই হোক্ না কেন, এইরূপ দীর্ঘ প্রবাস করতে আমি কিছুতেই পরামর্শ দিতে পারি না। শুধু তা নয়, এবার একেবারেই যাওয়া না হয় এই আমার স্পষ্ট কথা।" এই কথা শুনিয়া উঁর অত্যন্ত খারাপ লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে কতক্ষণ ধরিয়া কাহারও সহিত একটি কথা না কহিয়া একেবারে সচিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন। তার পর, গোখ্‌লের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন যাওয়ার কি করা যাবে স্থির কর"। তখন গোখলে বলিলেন, "আপনার শরীর সম্বন্ধে আমরা কি কিছু বল্‌তে পারি? ডাক্তার ভাটবডেকর বল্‌চে এইরূপ করলেই ভাল হয়। যা করতে হবে তা আমাকে বল্‌লে আমি গিয়ে আপনার কথা-মতো সব করব।" তখন উনি বলিলেন—"এখন এই সমস্ত কাজের ভার তোমার উপরেই পড়বে; কিন্তু এই সময় আমার যাওয়া উচিত নয়, এই যদি তোমাদের সবারই মত হয় তাহলে আগেই একটা টেলিগ্রাম পাঠান আবশ্যক। এবার না যাওয়াই ভাল এইরূপ সকলে বলিলে পর, দোয়াত-কলম ও কাগজ লইয়া টেলিগ্রাম লিখিলেন এবং তাহা উপস্থিত বন্ধুদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন এবং "১৮ বৎসরের পর আমার যাওয়ায় একটা থামা পড়ে গেল" এইরূপ বলিতে বলিতে গলা ভারী হইয়া আসিল এবং নেত্র হইতে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। যাক্। এইরূপে লাহোর যাত্রা রহিত হইল। কনফারেন্সে পড়িবার জন্য যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা গোখলের নিকট দিয়া চিরঞ্জীব আবাসাহেবকে পুণার বন্ধুবর্গের সহিত লাহোরে পাঠাইলেন। সেইদিনেই সন্ধ্যাকালে সমস্ত লোক চলিয়া গেলে, তার পরদিন আমরা লোণাওয়ালীতে চলিয়া আসিলাম। সেখানে আসিবার পর, পুণার কতকগুলি মিত্র সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহারা, পুণায় থাকিয়া ঔষধপত্র করিবার সম্বন্ধে উঁকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। তখন উনি বলিলেন—"আমি বোম্বায়ে থেকেই শীঘ্র ঔষধপত্র ব্যবহার করে দেখব। সেখানে ভাল মনে হলে তারপর পুণায় যাবার কথা বিবেচনা করব।" তিন চারদিন

পরে যাহারা লাহোরের কংগ্রেসে গিয়াছিলেন, সেই মিত্র-মণ্ডলী ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সের সমস্ত বিবরণ মুখে বলিলেন। এবং তার পরদিন পুণায় চলিয়া গেলেন। ঐ সব বিবরণ শুনিয়া ওঁর মনের ভার একটু লাঘব হইয়া যেন ভাল বোধ করিতেছেন মনে হইল।

তারপর, এই সভার বিবরণ টাইমস, অ্যাডভোকেট, সোশ্যাল রিফর্ম্মার, পঞ্জাবী প্রভৃতি পত্রে আগাগোড়া সমস্ত দেওয়া হয়। তাহাতে গোখলে ও চন্দাবরকরের বক্তৃতা পাঠ করিয়া, তখনই—"এখন ইহার পর তোমরা দুজনেই এই ভার লইবার যোগ্য ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম; এই সম্বন্ধে আমার যে ভাবনা হইয়াছিল তাহার লাঘব হইল" প্রভৃতি কথা নিজের হাতে দুজনকে দুই পত্র লিখিলেন। এই ক্ষেপে লোণাওয়ালীতে আমাদের থাকা সবশুদ্ধ ১০দিন হইয়াছিল। ঐ সময়ে ওঁর শরীর ত ভাল ছিলই না, তাছাড়া ছোটখাটো অসুখ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সেইরূপ আবার মনে ঔদাসীন্যও খুব আসিয়াছিল। আমাকে কিংবা আমার ননদকে বলিতেন—"অমুক খর্চ্চাটা বেশী হচ্চে, এই খরচটা কম কর। বাগান জমা দেও, গরু-বাছুর কম কর, বোম্বায়ের উৎপন্ন দ্রব্য এবং অন্য জায়গায় ক্ষেতের জিনিষপত্রের যতটা পারা যায় বিক্রীর বন্দোবস্ত কর। এখন আমি ছ-মাসের ছুটি নেব এবং ছুটি শেষ হলে সেই ছুটির সময়টা যোগ করে পেন্সন নেব। তখন বোম্বায়ে শীঘ্র ফিরে আসা হবে বলে মনে হয় না। তাই বোম্বায়ের জিনিসপত্রগুলি পুণায় এনে ফেলতে হবে।" এই প্রকারে শেষ বন্দোবস্তের কথা, কিন্তু বাহিরে যেন সহজ সুবিধার কথাই বলিতেছেন এইভাবে বলিতেন। মধ্যে মধ্যে ওঁর এইরূপ কথা শুনিয়া ওঁর সংসারে বৈরাগ্য হইয়াছে মনে করিয়া আমার বড় খারাপ লাগিল ও দুঃখ হইল; কিন্তু তবু বাহিরে দেখাইবেন না এইরূপ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছুটি শেষ হইলেই আমরা লোণাবলী হইতে বোম্বায়ে ফিরিয়া গেলাম এবং ৮ তারিখে ৬ মাসের ছুটির জন্য উনি হাইকোর্টে দরখাস্ত করিলেন। তখন আমাকে উপরে ডাকাইয়া বলিলেন যে, "আজ আমি ৬ মাসের ছুটীর দরখাস্ত করেছি এবং ছুটি শেষ হইলেই পেন্সন নেব। তখন পেন্সন ছাড়া ৭।৮ শত টাকা পর্য্যন্ত সবশুদ্ধ আমাদের আয় থাকবে। তাতে তোমার পুণার খরচ এবং আমাদের এখানকার খরচ, চালাতে পারবে ত?" আমি বলিলাম, "বোম্বায়ে বাড়ী কেনা না হওয়া পর্য্যন্ত একটু টানাটানি হবে, এখানে বাড়ী ভাড়ার হিসাবে ৩০০।৩৫০ টাকা প্রতি মাসে দিতে হয়। এইজন্য পুণার বাসা ভেঙ্গে আমরা যদি সবাই একজায়গায় থাকি তাহলে ঠিক হয়।" তখন উনি বলিলেন, "তা নয়। পুণার বাসা ভাঙ্গা হবে না এবং সেখানকার লোকদেরও স্থানান্তরিত করা হবে না। তাঁদের আজ পর্য্যন্ত যে অভ্যাস সেই অভ্যাস অনুসারেই কথাকীর্ত্তন, পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার সেইখানেই তাঁদের মনের মতো হবে এবং তাঁদের বেশী ভাল লাগবে। আমাকে এখন বোম্বায়ে থাকতে হবে। তখন দুই খরচই এতে কুলবে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করতেই তোমাকে ডেকেছি।" আমি বলিলাম, "কুলোবে। বেশ কুলোবে। কুলোবে না কেন' অমুক একটা বিষয় ছাড়া আমাদের আটকাবার মতো তেমন কোন অভ্যাস বা আসক্তি নেই। অকারণে যে সব খরচ হয় তা কম করা যেতে পারবে। বরাবর যাতে চলে তাই করতে হবে—এই রকমই ত আমরা প্রায়ই বলে থাকি, আমাদের মনের গতিও ঐদিকে, তখন একটু পয়সা কম হয়েছে বলে কি আটকাবে? তা আটকাবে না। পেন্সনের টাকাটাও কিছু কম নয়। তবু একটা বাড়ী যদি করতেই হয়, যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। এখানকার বাড়ী ভাড়ার খরচটা খুব বেশী।" এই কথা শুনিয়া উনি বলিলেন—"বাড়ী কিনব বলেই ত মনে করচি। এখন হয়ে উঠলে হয়। আজ পর্য্যন্ত পাঁচ সাতটা বাড়ী দেখেছি, সেগুলি তেমন কিছু খারাপ নয়। পুরোণো বাড়ী তোমার পছন্দ হয় না। সুবিধাজনক নূতন বাড়ী ভাল বস্তিতে পাওয়া এবং তোমাদের সবার তা পছন্দ হওয়া—এই দুটো যদি ঘটে তাহলে বাড়ী কেনা হবে।" এইরূপ বলিবার পর ছুটির দরখাস্তটা লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তার পরদিন, ছুটি মঞ্জুর সম্বন্ধে চীফ-জষ্টিসের পত্র আসিল। তাহা পাঠ করিয়া আমাকে বলিলেন আমার নিকট মোতাইনী সিপাই ও চোপদারদিগকে কিছু দিয়া আজ কোর্টে গিয়া হাজির হইতে বলে দেও। ছুটি নেবার পর সরকারী সিপাই আমার মোতাইনী আর নয়।" আমি "আচ্ছা" বলিয়া তাহাদিগকে কিছু বকসিস্ দিয়া বলিলাম "আজ তোমাদের চারজনকে ১১টার সময় কোর্টে গিয়ে হাজির হতে বলে দিয়েছেন।" এই কথা শুনিয়া, সে বেচারাদের মুখ ম্লান হয়ে গেল। চোপদার ত একেবারে কাঁদো কাঁদো। এবং সে আমাকে বলিল, "মা-ঠাকরুন! মনিব ছুটি নিলেন, তাতে কি হল? আমাদের দুজনকে কোর্টে পাঠিয়ে দিলে, বাকী দুজন আমরা তাঁর মোতাইনে থাকব। ছুটি নিলেও মোতাইনী সিপাইকে রাখা দস্তর আছে। কেবল মুনিব একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেই হল।" আমি বলিলাম,—কোর্টের দস্তর থাকতে পারে কিন্তু আমাদের দস্তর নয়। তাই তোমরা এ সম্বন্ধে ওঁর কাছে কোন কথা বোলো না। আমার এই কথা মতো তোমরা কোর্টে গিয়ে হাজির হও। তেমন আবশ্যক হলে তোমাদের আবার ডেকে পাঠাব।" এই কথা শুনিবার পর সে বেচারারা আর বেশী কি বলিবে? একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে আমার পায়ে এসে পড়ল এবং ঐরূপ ওঁর পায়ে পড়িবার জন্য বৈঠকখানার দিকে গেল। তারা এক একজন করিয়া পর পর ওঁর পায়ে মাথা রাখিয়া পায়ে পড়িল। সকলের শেষে চোপদার পায়ে পড়িবার সময় মনের আবেগ চাপিয়া না রাখিতে পারিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই চোপদার বড় ভাল লোক ছিল। ওঁর কাছে সে সর্ব্বদাই মোতাইন থাকিত এবং ওঁকে খুব ভক্তি করিত। সে বলিল—"আজ আপনার হুকুম মতো কোর্টে গিয়ে হাজির হচ্ছি, কিন্তু শীঘ্রই আমাদের আপনার চরণপ্রান্তে আনিয়ে নেবেন।" এইটুকু বলিয়া সে আর বেশী কিছু বলিল না। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ওঁর অন্তঃকরণও বিগলিত হইয়াছে মনে হইল। কেবল একদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন কিন্তু কিছুই বলিলেন না। আমি ওঁর কোচের নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। সেখান হইতে, "শীঘ্র চলিয়া যাও"

বলিয়া খুব আস্তে আস্তে চোপদারকে ও সিপাইদিগকে ইসারা করায় তাহারা খুব মৃদুপদক্ষেপে আমার দিকে দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। এই সময় আমার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল, এবং আর সেখানে দাঁড়াইতে না পারায় একেবারে ওদিক-কার গ্যালারীতে গেলাম এবং এতক্ষণ জোর করিয়া মনকে চাপিয়া ছিলাম এখন প্রবাহের আকারে মুক্ত করিয়া মনকে একটু হাল্‌কা করিলাম। তারপর চোখে খানিকটা ঠাণ্ডা জল দিয়া এবং কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া করিয়া দুই ছেলের সহিত কথা কহিতে কহিতে তাহাদিগকে ও শান্তাকে লইয়া বৈঠকখানায় আসিলাম।

সেই সময় ওঁর চেহারা একেবারে গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে, মনে হইল যেন কি-একটা চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। আমি শান্তাকে লইয়া হাসিতে হাসিতে ও তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতেছি দেখিয়া শান্তাকে লইবার জন্য উনি হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং তাকে আমার নিকট হইতে লইয়া বলিলেন—"তুমি বোসো, এই কোচের উপর বোসো,—দাঁড়িয়ে রইলে কেন?" এই কথা শুনিয়াই আমি কোচের উপর বসিলাম। কিন্তু আমার মনে হইল যে, যে বিষয়টা আমি ক্রমাগত ভাবিতেছিলাম তাহার সুযোগ হইয়াছে। এখন মনকে একটু দৃঢ় করিতে হইবে। উনি ছেলেদের সহিত একটু কথা কহিয়া আমার দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন,—"এই দেখ আজ আমরা সিপাইদের ফেরৎ পাঠিয়েছি। এখন তোমার জন্য ৮৷৯ টাকা পর্য্যন্ত বেতনে একজন সিপাইকে কাজে নিযুক্ত কর।" আমি বলিলাম—সিপাই রেখে কি হবে? চাকর, ব্রাহ্মণ, কোচম্যান, পাহারাওয়ালা সব চাকরই ত আছে। তারপর, আর স্বতন্ত্র সিপাই রেখে কি হবে?" তখন উনি বলিলেন,—"কি হবে, সে কথা নয়। সিপাই না থাকলে আমাদের কখনই আট্‌কায় না, সিপায়ের আবশ্যকও নাই; কিন্তু তোমার ছেলেবেলা থেকে সিপাই না নিয়ে কোথাও যাওয়া আসার অভ্যাস নেই। তাছাড়া, সিপাই সঙ্গে থাকা ছেলেদের বেশী অভ্যাস থাকায় তাদের ভারী অভাব মনে হবে। তাই বলছি একজন সিপাই রাখলে সকলেরই সুবিধা হবে। খরচ হবে বলে সংকোচ করবার কোন কারণ নেই।" এই কথা বলিবার সময় গলার আওয়াজ যেন কমিয়া গিয়াছে এবং যেন একটু টানিয়া টানিয়া কথা বলিতেছেন বলিয়া মনে হইল। তখন আমি সাহসের আওয়াজে একটু হাসিয়া বলিলাম—"বাঃ! তোমার সিপায়ের গরজ নেই এবং তাদের না হলেও কিছু আটকায় না। কেবল আমার জন্য ও ছেলেদের জন্যই কি স্বতন্ত্র লোক রাখতে হবে? সিপাই না হলেও আমাদের কাজ আটকায় না। গাড়ী করে যাবার সময় সিপাই ত সঙ্গে থাকত না। তবে তার জন্য এত ভাবনা কিসের? আর ছয়-মাসের জন্য এই অসুবিধা বৈত নয়। তারপর আবার সিপাই ত আসবেই।" এই কথা যখন আমি বলিতেছিলাম ওঁর মন আবেগে পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আমি যাহাতে জানিতে না পাই,—খুব শান্তভাবে কথা কহিতেছিলেন। আমিও তাই চাহিতেছিলাম। ওঁর দিকে আমার লক্ষ্য নাই এইরূপ দেখাইয়া আমিও শান্তভাবে হাসিতে লাগিলাম। যদিও আমরা দুজনেই, বাহিরে সাহস দেখাইয়া, ব্যামোর দরুণ কিছু ভয় নাই, আমাদের তেমন কিছু ভাবনা হইতেছে না, এইরূপ আমাদের পরস্পরকে দেখাইবার চেষ্টা করিতাম, তথাপি অন্তঃকরণের ভাব ঢাকা যাইত না। এই প্রকারে ঘণ্টা পনে ঘণ্টা চলিয়া গেলে আহারের সময় হইয়াছে বলিয়া উনি স্নান করিতে উঠিলেন এবং আমিও ছেলেদিগকে লইয়া নীচে গেলাম। স্নানের পর আহার করিবার সময় ননদ ওঁকে বলিলেন—"ছুটি ত মঞ্জুর হয়েছে, ভালই হল। এখন বিশ্রাম পাওয়া যাবে, শরীরও ভাল হবে। তবে, এই ডাক্তারদের ঔষধের চেয়ে বৈদ্যের ঔষধ সুরু করলে ভাল হয়।" তখন উনি বলিলেন,—"তাই হোক্। বৈদ্যই বা কি, ডাক্তারই বা কি? একটা কিছু চললেই হল। কিন্তু এখন এখান থেকে সমস্ত পুণায় পাঠাও। গাড়ী, ঘোড়া, গরু-বাছুর প্রভৃতি শীঘ্র পা-রাস্তায় পুণায় রওনা করে দিলে অনেক হাঙ্গাম কমে যাবে। সেইরূপ আবার, অনেক জিনিসপত্র পা-রাস্তায় পাঠালে, জিনিসের গাড়ী ও জানোয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাবে" প্রভৃতি কথাতেই এই দিনটা কাটিয়া গেল।

ইহার ২।৩ দিন পরে বাঙ্গালার মালিককে উনি পত্র লিখিলেন যে, "আমি ৬ মাসের ছুটি লইয়াছি এবং ঐ সময়ের মধ্যে আমাকে বহিঃগ্রামে যাইতে হইবে বলিয়া এই মাসের শেষে আমি বাঙ্গালা ছাড়িয়া দিব মনে করিতেছি" এই পত্র পাঠ করিয়া বাঙ্গালার মালিক To Let বলিয়া তারপর দিনই বিজ্ঞাপন তক্তা ঝুলাইয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া উনি ছাড়া আমাদের কাহারও ভাল লাগিল না। আমরা এই বাড়ীতে যতদিন আছি ততদিন পর্য্যন্ত এই বিজ্ঞাপন-তক্তা না ঝুলানই উচিত ছিল, কেননা এই মাসের শেষে আমাদের পূরা ভাড়াই দিতে হইবে। আমরা চলিয়া গেলে তারপর এই বিজ্ঞাপন-তক্তা উঠালেই হইত, এইরূপ আমার মনে হওয়ায়, অপমান হইয়াছে বলিয়া আমার রাগ হইল। তাই আমরা দুপুরের আহারের পর যখন কথাবার্ত্তা কহিতে বসিলাম, তখন বাড়ীওয়ালা আজ বাঙ্গালার ভাড়া দেবার বিজ্ঞাপন তক্তা উঠাইয়াছে, আমি বলিলাম। এই কথা শুনিয়া উনি বলিলেন—"তাতে অন্যায়টা কি হয়েছে? তুমি বাড়ী ছেড়ে দেবে, তারপর ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেওয়ায় হীনতা বোধ কচ্ছ কেন? তাদের বাড়ীটা শীঘ্র ভাড়া দেওয়া দরকার নয় কি? তাই তারা বিজ্ঞাপন-তক্তা উঠিয়েছে। তারা বুদ্ধির কাজই করেছে। এতে তোমার কি এল গেল?" এই কথা শুনিয়া আমার আশ্চর্য্য মনে হইল এবং আমি কিছুই বলিলাম না। কিন্তু ননদ বলিলেন—"এর মধ্যেই বাড়ীওয়ালাকে বাড়ী ছাড়বার কথা কেন লেখা হল? ছুটি শেষ হলে ফিরে এসে পেন্সন নেওয়া স্থির হলে তারপর বাড়ী ছেড়ে দেও। কিন্তু এখনি ছেড়ে কি করবে? আমরা যদি কোথাও যাই তখন এই জিনিসপত্র ৬ মাসের জন্য কোথায় নিয়ে যাওয়া যাবে? ছ মাস হয়ে গেলে যদি এই বাড়ী আর কেউ নেয় তখন এরকম বাড়ী পাওয়া মুস্কিল হবে। প্রথমে উনি দুই একবার উত্তর দিলেন না। এই বাড়ী না ছাড়বার কথা পুনঃ পুনঃ বলায় উনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"কোন লোক কথা কইবে না বলে ঠিক করলেও, তোমরা তাকে ত্যক্তবিরক্ত করে কথা কওয়াও। বুঝেও যেন বুঝ্‌ছ না—এ রকম করচ কেন? আমি যা বলব তা নীরবে করে যাবে; তা না করে' তোমরা আবার ভাবতে বসে গেছ—এর অর্থ কি?

আমার শরীরের অবস্থা কি তোমরা দেখ্‌ছ না? এই ছুটি শেষ হলে আবার আমি ফিরে আসব এইরূপ কি তোমরা মনে করচ?" আমি বলিলাম, "এ রকম তোমার কেন মনে হচ্চে কে জানে! ১৮৯৭ সালে তোমার শরীর এর চেয়েও খারাপ হয়েছিল, তবু মহাবলেশ্বরে গিয়ে সাত আট দিনের মধ্যেই তোমায় ভাল মনে হতে লাগ্‌ল। সে সময় শরীর বেশ ভাল হয়েছিল, সেই রকম মহাবলেশ্বরে গিয়ে এবারও ভাল হবে এই রকম মনে করলে শরীরের উপর এর ফল ভাল হবে না কি? এই বিষয়ে ডাঃ রাও ভাটবডেকারের কথাও তোমার ঠিক্ বলে মনে হচ্চে না,—এতে আর কি করা যাবে?" এই কথা শুনিয়া কোন উত্তর না দিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। আমি ও ননদ বসে কথা বার্ত্তা কইতে লাগিলাম। ওঁর এইরূপ ধারণা হওয়াতেই রোজ রাত্রে তড়কা বেশী বেশী করিয়া আরম্ভ হইল। উহা 'স্নায়ু ঘটিত ব্যামো, ডাক্তার এই কথা সর্ব্বদাই বলিতেন এবং আমাদেরও তাই ঠিক্ বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এই সম্বন্ধে ওঁর ধারণা না জানি কিরূপ এই লইয়া আমরা ভাবিতে বসিতাম। এই ব্যামোর পরিণাম নিশ্চিত নহে। খুব কষ্ট হয় বলিয়াই উনি এতটা মনে করিতেছেন। মহাবলেশ্বরে কিংবা অন্য কোথাও বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গেলেই এবং কাজের বোঝার লাঘব হইয়া ভালরকম বিশ্রাম পাইলেই ওঁর শরীর ভাল হতে আরম্ভ হবে। বস্তুতঃ এই রোগে ভাবনার কথা কি আছে? জ্বর নাই, কাসি নাই, অন্নে অরুচি নাই; তবে এ কথা সত্য, রোজ রাত্রে নিয়মিত সময় এই ব্যামোটা আসে, আর গা যেন হিম হইয়া যায়। এ কেন হয়, এই সম্বন্ধে উনি কি জানিয়াছেন এবং ওঁর কেন এত ভাবনা হইয়াছে, ইহাই কেবল আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু এই সম্বন্ধে বাস্তবিকই ভয় করবার কিছু আছে কি? এই সব কথা সকল ডাক্তারকেই আড়ালে লইয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছি এবং তাঁরাও বিশ্বস্তভাবে আমাকে বলিয়াছেন যে, এই রোগে বাস্তবিকই ভয় করিবার মতো কিছুই নাই। উনি যে রকম মনে করিতেছেন এই রোগ সেরূপ ভাবনা করিবার মতো রোগ নয়, ইহা শুধু বাহিরের স্নায়ুগত রোগ মাত্র। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে ওঁর কেন এরূপ উল্টা ধারণা হইল? খুব বিশ্বাস না হইলে এইরূপ ধারণা কখনই হয় না। তবে, এ রোগটা কি ডাক্তাররা আমাদের ভুল বোঝাচ্চেন না তো?—এইরূপ কাল পরশু হইতে আমার মনে হওয়ায় আমার মন বড় খারাপ হইল। ওঁর সহিত কথা কহিবার সময় যতই সাহস দেখাই না কেন, সমস্ত দিন আমার বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। এবং অনর্থক উদ্বিগ্ন হইয়া এবং একটা কি মনে করিয়া মন অত্যন্ত বিচলিত হইল। এখন তবে কি করা যায়! কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই সমস্ত বলিবার পর আমারসম্মুখে ওরা কিছুই বলিবে না। ইহা দেখিয়া আমার ননদেরও বড় খারাপ লাগিল। অনেকক্ষণ এই ভাবে গেলে পর ননদ বলিলেন—"ডাক্তাররা যাই বলুন না কেন, এই রোগটা ভয় করবার মতো রোগ মনে হচ্চে। আমাদের যা কিছু ভয়-ভাবনা ঈশ্বরই তা সাম্‌লাবেন। প্রকৃত ডাক্তার ও বৈদ্য একমাত্র তিনিই। তাঁর হাতে যতটা আছে তিনি তা করবেন। ঠাকুরদের ক্রিয়াকর্ম্ম অনুষ্ঠান চল্‌চে। সমস্ত ভাবনা তাঁরই। তাঁর উপর সমস্ত ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তুমি ভরসা ছেড়ো না। ডাক্তার ফাক্তার আমরা বুঝি না। কিন্তু তুমি বুঝে সুঝে চল্‌লে আমরাও সাহস পাই, তাই বল্‌ছি তুমি ভাই ভরসা ও সাহস ছেড়ো না। এই সময় গৃহলক্ষ্মীর চোখ দিয়ে জল পড়া ঠিক্ না। তাহলে অকল্যাণ হবে।" এই কথা বলিবার পর, ঔষধ দিবার সময় হওয়ায় আমি উঠিয়া উপরে গেলাম। ঔষধ দিলাম, অনেকক্ষণ উনি বসিয়া রহিলেন, এ দিকে ও দিকের নানা কথা বলিলেন; সকালে যে সকল পত্র আসিয়াছিল তাহার উত্তর কি লিখিব বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বাহিরে এই সমস্ত করিতেছিলেন কিন্তু অন্তঃকরণ তাঁর ঠিক্ জায়গায় ছিল না। ওঁর সঙ্গে বসে বেস কথাবার্ত্তা কহিতেছি কিন্তু কোন কারণ-বিনা বুক ভরিয়া আসিল, চোখে জল আসিতে লাগিল। আমি এই অবস্থাটা ঢাকিবার চেষ্টা করিলাম এবং কোন একটা উপলক্ষ করিয়া অন্য দিকে চাহিলাম ও চট্ করিয়া গ্যালারীতে উঠিয়া গেলাম। এই রকম করা উচিত নয় ভাবিয়া মনে মনে অনেক চেষ্টা করিয়াও আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এখন আমার এই অবস্থা উনি জানিতে না পারেন—ইহাই আমার উৎকট ইচ্ছা হওয়ায়, আমার যতটা সাধ্য ঐ ভাবে চলিয়াছিলাম।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আনন্দ।

বেহাগ—তেওরা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কি যে গান শুনিলাম
হিয়ার মাঝারে আনন্দ ঝঙ্কারে।
নীরব নিশীথে সব-অলখিতে
শিশির নীরে আসিয়া ধীরে
শোনাও গানে পাগল প্রাণে—
মোহিয়া লওহে ভবের পারে।
গ্রহের সাথে জোছনা রাতে
বেড়াব ঘুরে হৃদয় পূরে—
বাতাসে খোলা পরাণ ভোলা
অসীম নীল আকাশ পরে।
আনন্দ-সাগরে ডুবি চিরতরে
পূজিব গোপনে তোমারি চরণে
জীবন যৌবন সোণার বরণ
উঠিবে ফুটিয়া মরম মাঝারে॥

১০—ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী।

(ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ জি ভাণ্ডারকর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥
শ্বেতাশ্বতর ৩।৩

"পৃথিবী ও আকাশের উৎপাদক একমাত্র তিনিই। তাঁহার নেত্র সর্ব্বত্র, তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র, তাঁহার হাত সর্ব্বত্র, তাঁহার পদ সর্ব্বত্র। তিনি আপন হাত ও পায়ের দ্বারা সকলের উপর ব্যাপার ঘটাইতেছেন।"

যে পদার্থের দিকে আমরা মুখ ফিরাই এবং যাহার দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি, শুধু সেই পদার্থই আমরা দেখিতে পাই, সেই পদার্থেরই জ্ঞান আমাদের হয়। যে বস্তুর দিকে আমাদের হাত পা পৌঁছায়, তাহারই উপর আমরা কোন ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হই। কিন্তু পরমেশ্বরের ব্যাপার সমস্ত বিশ্বের উপর চলিতেছে। তিনি সমস্ত ব্রহ্মচক্র একসঙ্গে ফিরাইতেছেন। অমুক ক্ষণে, একস্থানে এক ব্যাপার চলিতেছে, সেই ক্ষণেই অন্যস্থানে দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানে তৃতীয় ব্যাপার চলিতেছে। এইরূপ সমস্ত পৃথিবীর উপর অতি সূক্ষ্ম স্থানেও, সমুদ্রের গভীর জলের মধ্যেও কিছু না-কিছু পরমেশ্বরের ব্যাপার চলিতেছে। সেই একই সময়ে পরমেশ্বর সূর্য্যমণ্ডলের উপর, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহের উপর, সূর্য্যাপেক্ষাও অতি বৃহৎ এইরূপ অসংখ্য নক্ষত্রের উপর অন্য আশ্চর্য্য ক্রিয়া ঘটাইতেছেন। অতএব তাঁহার হাত পা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে,—এমন স্থান নাই যেখানে তাহ পৌঁছায় না। সেইরূপ সমস্ত বিশ্বের মধ্যে একই সময়ে নিয়মিত, উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়মিত ক্রিয়া সংঘটিত করা—সমস্ত বিশ্বের জ্ঞান সেই সময়ে না

থাকিলে হয় না। তাই, পরমেশ্বরের চোখ সর্ব্বত্রই আছে। তিনি যাহা কিছু সমস্ত একই সময়ে দেখিতেছেন।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

শ্বেতাশ্বতর ৩। ১৬

"বিশ্বের মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরের হাত-পা চারিদিকে রহিয়াছে, তাঁহার চক্ষু মস্তক ও মুখও চারিদিকে রহিয়াছে, তাঁহার কর্ণ চারিদিকে রহিয়াছে। তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।"

এইরূপ, পরমেশ্বরের হাত-পা, চোখ ও কান যে সর্ব্বত্র রহিয়াছে সে কি প্রকারের? আমাদের যেরূপ, সেরূপ অবশ্য নহে; কারণ আমাদের হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার কেবল ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্থানেই হয়। আমাদের চক্ষু আলোর অপেক্ষা রাখে, কর্ণ বায়ুর ও হস্তপদাদি দেহান্তর্গত স্নায়ুর অপেক্ষা রাখে এবং যে পর্য্যন্ত শরীরে প্রাণ ও শক্তি থাকে সেই পর্য্যন্তই উহারা আমাদের ব্যাপার সকল চালাইয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যাপার কালত্রয়ে ও সর্ব্বস্থলেই চলিতেছে তাহার সংসাধন এই প্রকারে হওয়া অসম্ভব। মূলে ঐ সকল ব্যাপারের যেরূপ সাধনই হোক্ না, এই কল্পনা মিথ্যা। অতএব জগদীশ্বরের এই জ্ঞান ও কর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপার স্বভাবসিদ্ধ, উহার কোন সাধনের অপেক্ষা নাই। এই প্রকার ইন্দ্রিয় শরীর ব্যতীত থাকে না এবং পরমেশ্বর অশরীর।

ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ।

শ্বেতাশ্বতর ৬। ৮

"তাঁহার কার্য্যমূলক শরীর নাই, ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কিছুই দেখা যায় না। তাঁহার মহত্ত্বের ইয়ত্তা নাই, ন্যূনাধিকভাব নাই, তাঁহার পরা শক্তি, মহতী শক্তি বিচিত্রপ্রকারের এবং তাঁহার জ্ঞান ও তাঁহার কর্ম্ম স্বাভাবিক।"

অতএব, তাঁহার হাত-পা, চোখ ইত্যাদি সর্ব্বত্র আছে—ইহা বলিবার অর্থই এই যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সমস্ত বিশ্বের পরিচালক ও সর্ব্বশক্তিমান।

১১—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

শ্বেতাশ্বতর ৩। ১৮

"হাত পা না থাকিলেও তিনি সমস্ত বস্তুই গ্রহণ করেন, চক্ষু না থাকিলেও দেখেন এবং কাণ না থাকিলেও শোনেন। সকল বিষয়ই তিনি জানেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা কেহ নাই; তিনি বৃহৎ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আদিপুরুষ বলিয়া কথিত হন"।

এই জন্য, আমাদের মত দুর্ব্বল প্রাণীর দুর্ব্বল জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় পরমেশ্বরের নাই। তাঁহার এইরূপ ইন্দ্রিয়াদি আছে বলিয়া কল্পনা করিলে, অর্থাৎ তাঁহাকে ক্ষুদ্র প্রাণীর সমান করিলে, তাঁহার অবমাননা করা হয়। এই কল্পনা মিথ্যা বলিয়া, এইরূপ সশরীর পরমেশ্বরের পূজায় শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না। মিথ্যা দেবতা হইতে ফল লাভ কি প্রকারে হইবে? অতএব, পরমেশ্বর সমস্ত বিষয় চক্ষু ব্যতীত দেখিতেছেন, কান ব্যতীত শুনিতেছেন এবং হাত-পা ব্যতীত ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। এই সামর্থ্য যে কিরূপ তাহার কল্পনাও আমাদের হয় না। আমরা মানব, কেবল বস্তুর বাহ্য স্বরূপই অবগত হই। এই গাছ বাড়িতেছে এই মাত্রই জানি কিন্তু তাহা কিরূপ তাহা কে জানে? চক্ষুযোগে অমুক বস্তুর রূপ ও আকার মাত্র আমরা জানি; কিন্তু তত্ত্বতঃ ঐ বস্তু কিরূপ তাহা কে জানে? ভূমির অভ্যন্তরে, পর্ব্বতের উপরে, উপত্যকায়, নদীতে, সমুদ্রে, বায়ুমণ্ডলে, মানবব্যবহারে, আকাশে ভ্রমণ করিতেছে যে প্রকাণ্ড গোলক তাহার মধ্যে, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, পরমেশ্বরের শক্তি নানা প্রকারে নানা পরিণাম ঘটাইতেছে,—সে বিষয়ে আমরা কি জানি? অল্প কিছু যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহাতে তাহার উদ্দেশ্য কি, এবং পরে তাহা হইতে অন্য পরিণাম কি ঘটিবে, তাহা জানিতে কে সমর্থ? এবং তিনি এই সমস্ত ব্যাপার কিপ্রকারে কেমন করিয়া করেন, তাহার পারদর্শী প্রজ্ঞা কাহার আছে? পরমেশ্বরের তত্ত্ব অতিগুহ্য। আজ পর্য্যন্ত যে সকল বড় বড় প্রাজ্ঞপুরুষ জন্মিয়াছেন, তাঁহারা তাহার অংশমাত্র অবগত হইয়া-

ছেন। অতএব পরমেশ্বর সমস্তই জানেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা কেহ নাই। তথাপি যতটুকু তত্ত্ব আমরা জানিতে পারি তাহাও কত বড়, কি রমণীয়, কি মধুর। আপনার সম্বন্ধে মানবের অন্তঃকরণে বিস্ময়, পূজ্যবুদ্ধি, আনন্দ, পরমভক্তি, অনন্যভাব উৎপন্ন হইয়া ঐ দীন প্রাণী উত্তরোত্তর যাহাতে উন্নত দশা প্রাপ্ত হয়, তদুপযুক্ত জ্ঞান সেই পরম-বৎসল পিতা আমাদের জন্য সুলভ করিয়া রাখিয়াছেন।

১২—ঈশ্বর অপাপবিদ্ধ।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ংভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্‌ব্যদধাচ্ছা-
শ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

ঈশ—৮

তিনি পরম জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহার শরীরে ব্রণ ও স্নায়ু নাই; তিনি শুদ্ধ, তাঁহাতে পাপের স্পর্শ নাই; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসাক্ষী, সকলকে বেষ্টন করিয়া আছেন; তিনি স্বতঃসিদ্ধ, শাশ্বতকাল পর্য্যন্ত তিনি সমস্ত বস্তুর চলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

পরমেশ্বর শরীরবিহীন, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, অনন্ত, ব্রহ্মচক্রের চালক, সকলের ব্যবস্থাপক; শুধু তাহাই নহে,—তিনি শুদ্ধ, নিষ্পাপ, অকলঙ্ক, মঙ্গলময়। তাই আমাদের অন্তঃকরণে, অমুক বিষয় উচিত, অমুক বিষয় অনুচিত, এই প্রকার জ্ঞান হয় এবং সর্ব্বদাই উচিত যে সকল কাজ তাহা করিবার অভিলাষ উৎপন্ন হয়। এবং আমা কর্তৃক যদি কোন অনুচিত কাজ হয়, যেরূপ করা কর্ত্তব্য তাহা যদি না করিয়া থাকি এবং যাহা কর্ত্তব্য নহে তাহা যদি করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি দুষ্ট, আমি পাপী এইরূপ আপনাকে মনে করিয়া অন্তঃকরণে পরিতাপ হয়। সত্য অর্থাৎ উচিত বলিয়া যাহা কিছু আছে তাহা পরমেশ্বরের; এই জন্য তাহার জয় হইবেই হইবে। তাই যে ব্যক্তি তাহা অবলম্বন করে, সে এপ্রকার ধৈর্য্য ও স্ফুরণ প্রাপ্ত হয় যে, সমস্ত লোক তাহার বিরুদ্ধ হইলেও এবং তাহার কার্য্য লোকাচারের বিপরীত বলিয়া তাহাকে আঘাত করিয়া, তাহাকে উৎপীড়ন করিয়া অনেক সঙ্কট তাহার উপর আনিয়া ফেলিলেও সে বিচলিত হয় না। সে সত্য অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া সত্যের পক্ষপাতী যে পরমেশ্বর, তিনিই তাহার অন্তঃকরণে সর্ব্বদা থাকিয়া কাজ করেন; তবে আর তাহার ভয় কিসের? সমস্ত ঐহিক সুখের নাশ হইয়া সমস্ত ঐহিক দুঃখ যতই সে অধিকাধিক প্রাপ্ত হয় ততই সে পরমেশ্বরের অধিকাধিক সান্নিধ্য লাভ করে, অধিকাধিক তাঁহাতেই গাঢ়রূপে সংসক্ত হইয়া থাকে এবং সেই সত্যজননী বিশ্বমাতা তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়া আপন বক্ষে ধারণ করিয়া রাখেন। তার-পর ভয় নাই শুধু নহে, যে উৎপীড়নকারী তাহার স্বপ্নেও যাহা নাই এইরূপ আনন্দ, এই প্রকার শান্তি ও উন্নতি সেই সাধু ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়। সত্য, উচিত, প্রকৃত সৌজন্য, সাধুতা যাহার অন্তঃকরণে নাই সে পরমেশ্বরের দাস নহে, সে ভক্ত নহে। এই সকল যাহার হৃদয়ে বাস করে সে পরমেশ্বরকে চতুর্দ্দিকে অবলোকন করে। পরমেশ্বর সকলের স্রষ্টা, সকলকেই তিনি সত্যের অথবা মঙ্গলের নিয়ম প্রদান করিয়াছেন। সত্যের জ্ঞান হইবে বলিয়া তিনি বিবেকরূপে অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন এবং তখন অসত্য বিলুপ্ত হয়। অতএব সত্যকে অবহেলা করিয়া অসত্যকে স্বীকার করা, উচিত ছাড়িয়া অনুচিতকে গ্রহণ করা, সদাচরণ ত্যাগ করিয়া দুরাচরণ অবলম্বন করা, আর পরমেশ্বরকে ত্যাগ করা তাঁহার প্রতি বিমুখ হওয়া, আপনার মাকে ছাড়িয়া শত্রুর নিকটে থাকা—একই কথা এবং এইরূপ হইলে শান্তি ও প্রকৃত সুখ মিলিবে কি-করিয়া?

বৈয়াসিক-ন্যায়মালা।

সপ্তম অধিকরণ—পরমেশ্বরের হিরণ্ময়-পদবাচ্যতাধিকরণ।

(শ্রীরামচন্দ্রশাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

সূত্র। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ॥ ২০॥
ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ॥ ২১॥

টীকা। সপ্তমাধিকরণমারচয়তি—
হিরণ্ময়ো দেবতাত্মা কিং বাঽসৌ পরমেশ্বরঃ।
মর্য্যাদাধাররূপোক্তের্দেবতাত্মৈব নেশ্বরঃ॥২৯॥

সার্ব্বাত্ম্যাৎ সর্ব্বদুরিতরাহিত্যাচ্চেশ্বরো মতঃ।

মর্য্যাদাদ্যা উপাস্ত্যর্থমীশেঽপি স্যুরুপাধিগাঃ॥২০॥

ছান্দোগ্যস্য প্রথমাধ্যায় উদগীথোপাসনায়ামুপসর্জ্জনান্যুপাস্যান্যভিধায় প্রধানমুপাস্যমভিধাতুমিদমাম্নায়তে—"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি। তত্র—আদিত্যমণ্ডলে বিদ্যাকর্ম্মাতিশয়বশাৎ কশ্চিজ্জীবো দেবভাবমুপেত্য জগদধিকারং নিষ্পাদয়ন্নবতিষ্ঠতে, ঈশ্বরশ্চ সর্ব্বগতত্বাৎ মণ্ডলেঽপি বর্ত্ততে। অতস্তয়োঃ সংশয়ঃ। তত্র 'দেবতাত্মা' ইতি তাবৎ প্রাপ্তং। কুতঃ—মর্য্যাদাধাররূপাণামুচ্যমানত্বাৎ। "যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাঃ তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চ" ইত্যৈশ্বর্য্যমর্য্যাদোক্তিঃ "অন্তরাদিত্যে" ইত্যাধারোক্তিঃ 'হিরণ্ময়ঃ' ইতি রূপোক্তিঃ। ন হি সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বাধারস্য নীরূপস্য পরমেশ্বরস্যৈশ্বর্য্যমর্য্যাদাধাররূপাণি সম্ভবন্তি। তস্মাৎ দেবতাত্মা। ইতি প্রাপ্তে—

উচ্যতে—হিরণ্ময় ঈশ্বরো ভবেৎ। কুতঃ সর্ব্বাত্মত্বশ্রবণাৎ। "সৈবর্ক্ তৎসাম তদুকথং তদ্‌যজুঃ তদ্‌ব্রহ্ম" ইতি বাক্যে তচ্ছব্দৈঃ প্রকৃতং হিরণ্ময়ং পুরুষং পরামৃশ্য তস্য ঋকসামাদ্যাশেষজগদাত্মকত্বমুপদিশ্যতে। তচ্চাদ্বিতীয়ে পরমেশ্বরে মুখ্যমুপপদ্যতে। নতু সদ্বিতীয়ায়াং দেবতায়াং। তথা—"স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ" ইতি শ্রূয়মাণং সর্ব্বপাপরাহিত্যং ব্রহ্মণোঽসাধারণং লিঙ্গং। যদ্যপি দেবতায়াঃ কর্ম্মণ্যনধিকারাৎ ক্রিয়মাণকরিষ্যমাণপাপয়োরভাবঃ। তথাঽপ্যসুরাদিজনিতদুঃখসম্ভাবাত্তদ্ধেতুভূতং জন্মান্তরসঞ্চিতদুরিতমনুবর্ত্তত এব। মর্য্যাদাধাররূপাণি তূপাধিধর্ম্মতয়া সোপাধিকে পরমাত্মন্যুপাস্যে বর্ত্তিতুমর্হন্তি। তস্মাৎ ঈশ্বরো হিরণ্ময়ঃ॥

সূত্রের অনুবাদ। (আদিত্যের) অন্তরে (যিনি আছেন) তাঁহার ধর্ম্মের উপদেশ হেতু॥ ২০॥

এবং ভেদ কথন হেতু (সূর্য্য হইতে) অন্য (বা ভিন্ন)॥ ২১॥

টীকার অনুবাদ। সপ্তম অধিকরণ রচিত হইতেছে—

হিরণ্ময় (পুরুষ) দেবতাত্মা অথবা তাহা পরমেশ্বর? (ঐশ্বর্য্যের) মর্য্যাদা (বা সীমা), (অবস্থিতির) আধার এবং রূপ উক্ত হওয়ায় (হিরণ্ময় পুরুষ) দেবতাত্মাই, ঈশ্বর নহে। সর্ব্বাত্মকত্ব হেতু এবং সর্ব্বপাপমুক্তত্বহেতু ঈশ্বরই ধরিতে হয়। মর্য্যাদা প্রভৃতি ঈশ্বরেও উপাসনার নিমিত্ত উপাধিকৃত।

ছান্দোগ্যের প্রথম অধ্যায়ে উদগীথ-উপাসনাতে গৌণ উপাস্য বিষয় বলিয়া মুখ্য উপাস্যের কথা বলিবার জন্য এই শ্রুতি উক্ত হইতেছে—"অনন্তর যে এই আদিত্যের অন্তরে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন।" সেই বিষয়ে—আদিত্যমণ্ডলে জ্ঞান ও কর্ম্মের আতিশয্যনিবন্ধন কোন জীব দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া জগৎ (-পালনের) অধিকার নির্ব্বাহ করত অবস্থিতি করিতেছেন, ঈশ্বরও সর্ব্বগত হওয়া প্রযুক্ত (আদিত্য-) মণ্ডলেও আছেন। অতএব ঐ উভয়ের (বিষয়ে) সংশয়। এস্থলে 'দেবতাত্মা'ই স্থির হইতেছে। কারণ (ঐশ্বর্য্যের) মর্য্যাদা, (অবস্থিতির) আধার এবং রূপ উক্ত হইয়াছে। "উহা হইতে যে সকল শ্রেষ্ঠ লোক আছে, তাহাদিগের এবং দেবগণের কামনার উপরেও আধিপত্য করিতেছেন" এই শ্রুতিতে (ঐশ্বর্য্যের) মর্য্যাদা উক্ত হইয়াছে; "আদিত্যের অন্তরে" (শ্রুতি-মধ্যস্থ) এই শব্দে আধারত্ব উক্ত হইতেছে; (উক্ত শ্রুতির) "হিরণ্ময়" শব্দে রূপ বর্ণিত হইয়াছে। সকলের ঈশ্বর, সকলের আধার এবং রূপহীন পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা (বা সীমা), আধার এবং রূপ সম্ভব নহে। অতএব (হিরণ্ময় শব্দে) দেবতাত্মাই বুঝাইতেছে। ইহা উক্ত হইলে—

বলা যাইতেছে—"হিরণ্ময়" শব্দে ঈশ্বর বুঝাইবে। কারণ তাঁহার সর্ব্বাত্মকত্ব শ্রুত আছে। "তিনিই ঋক্, তিনিই সাম, তিনিই উকথ, তিনিই যজু, তিনিই ব্রহ্ম" এই বাক্যে "তিনি" শব্দে প্রকৃত বা প্রকরণপ্রাপ্ত বা পূর্ব্বোক্ত হিরণ্ময় পুরুষকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহার ঋক্, সাম প্রভৃতি অশেষ জগতের আত্মভূতত্ব উপদিষ্ট হইতেছে। সেই (অশেষ জগতের আত্মভূতত্ব) অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে মুখ্যরূপে উপপন্ন হয়। কিন্তু তাহা স-দ্বিতীয় দেবতায় যুক্তিযুক্ত হয় না। এবং "সেই এই (হিরণ্ময় পুরুষ) সকল পাপ হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত" এই

শ্রুতিতে উক্ত সর্ব্বপাপরাহিত্য ব্রহ্মের অনন্যসাধারণ লিঙ্গ বা নির্দ্দেশক লক্ষণ। দেবতার কর্ম্মে অধিকার না থাকায় বর্ত্তমান এবং উত্তরকালীন পাপের অভাব হইলেও অসুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক উৎপাদিত দুঃখের অস্তিত্ব হেতু তাহার মূল কারণ জন্মান্তরসঞ্চিত পাপ (তাহাদিগের) অনুসরণ করিতেছেই। মর্য্যাদা, আধার ও রূপ কিন্তু উপাধির ধর্ম্ম হওয়া প্রযুক্ত উপাধিবিশিষ্ট ও উপাস্য পরমাত্মাতে থাকিতে পারে। অতএব ঈশ্বরই হিরণ্ময়।

তাৎপর্য্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে উদ্গীথ-উপাসনাবিষয়ক এক সন্দর্ভ আছে। উদ্গীথ হইল সামবেদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ কারণ তাহাতে ওঙ্কার শব্দ আছে। ওঁকার হইল উদ্গীথ কথার কেন্দ্র বা মূল। এখন, ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে বিবিধ পদার্থকে ওঁকারমূলক উদ্গীথরূপে ভাবনা করিয়া তাহাদের বিভিন্ন প্রকারে উপাসনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সেই স্থলে উপনিষৎকার সূর্য্যচন্দ্র প্রভৃতি গৌণ-উপাস্য পাত্রদিগের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বশেষে শ্রেষ্ঠ উপাস্যপাত্রের কথা বলিতে গিয়াই তাঁহাকে নিম্নোক্ত শ্রুতিতে "হিরণ্ময় পুরুষ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"যে এই আদিত্যের অন্তরে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে"। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম যে সর্ব্বগত তাহা সর্ব্ববাদসম্মত। অথচ উপরোক্ত শ্রুতিতে যখন বিশেষভাবে আদিত্যের অন্তরস্থিত হিরণ্ময় পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তখন এমনও হইতে পারে যে, কোন জ্ঞানে কর্ম্মে উন্নত জীব আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্য প্রভৃতি জগতের পালন করিবার অধিকার রাখেন—এই কথা বলাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। এইখানেই সংশয় আসিল এই যে, হিরণ্ময় পুরুষ অর্থে ব্রহ্ম অথবা আদিত্যের অন্তর্বর্ত্তী কোন দেবতা।

পূর্ব্বপক্ষের মতে হিরণ্ময় পুরুষ অর্থে ব্রহ্ম নহে, অন্য কোন দেবতা, কারণ এই হিরণ্ময়পুরুষসম্বন্ধীয় পরবর্ত্তী একটী শ্রুতি হইতে অনুমান হয় যে, উপনিষৎকারের মতে হিরণ্ময় পুরুষের নিখিল বিশ্বের উপর প্রভুত্ব নাই, কেবল আদিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ লোকসমূহ ও তাহার অধিবাসী দেবতাদিগের উপর প্রভুত্ব আছে। শ্রুতিটী এই—"উহা (আদিত্য) হইতে যে সকল শ্রেষ্ঠ লোক আছে, তাহাদিগের এবং দেবগণের কামনার উপরেও আধিপত্য করিতেছেন।" পূর্ব্বপক্ষ ধরিয়া বসিয়াছেন যে, এই শ্রুতি হইতে পাওয়া যায় না যে উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ লোক এবং দেবগণ ছাড়িয়া অন্য কাহারও উপর হিরণ্ময় পুরুষের আধিপত্য আছে। সেইরূপ, ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সর্ব্বাধার, ইহা সর্ব্ববাদসম্মত; কিন্তু শ্রুতিতে হিরণ্ময় পুরুষকে একমাত্র "অন্তরাদিত্যে" বা আদিত্যেরই অন্তঃস্থিত বলা হইয়াছে। কাজেই পূর্ব্বপক্ষের মতে একমাত্র আদিত্যের আধারে অবস্থিত হিরণ্ময় পুরুষ সর্ব্বাধার ব্রহ্ম হইতে পারেন না। তারপর, পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে "তোমরা বল যে ব্রহ্মের রূপ নাই, অথচ শ্রুতিতে হিরণ্ময় পুরুষকে হিরণ্ময় বা স্বর্ণরূপধারী বলিয়া বলা হইয়াছে।" এ অবস্থায় তাঁহার মতে হিরণ্ময় পুরুষ কিছুতেই ব্রহ্ম হইতে পারেন না—ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন দেবতা হইবেন।

সিদ্ধান্ত পক্ষের মতে অবশ্য হিরণ্ময় পুরুষ অর্থে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। এই হিরণ্ময় পুরুষকে উদ্দেশ করিয়াই এই একটী শ্রুতি আছে—"তিনিই ঋক, তিনিই সাম, তিনিই উক্থ, তিনিই যজু, তিনিই ব্রহ্ম"। সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে এই শ্রুতিতে যে "তিনি" শব্দ আছে, সেই "তিনি" শব্দের দ্বারা সেই হিরণ্ময় পুরুষেরই ঋক, সাম প্রভৃতি দ্বারা উপলক্ষিত অশেষ জগতের আত্মভূতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ তিনিই ঋক, তিনিই সাম ইত্যাদি যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা "তিনি" যিনিই হউন না কেন, "তিনি" কেবল যে ঋকেরই আত্মা, সামেরই আত্মা বোঝানো হইয়াছে তাহা নহে; ঐ গুটীকয়েক শব্দের দ্বারা আসলে নিখিল বিশ্ব সূচিত হইয়াছে এবং "তিনি" যে সেই নিখিল বিশ্বেরই আত্মা, তাহাই বলা শ্রুতির উদ্দেশ্য। শাস্ত্রমতে সৃষ্টি হইল বেদমূলক; কাজেই বেদের আত্মা বিশ্বজগতেরও আত্মা। এখন, "তিনি" শব্দের দ্বারা যখন সেই হিরণ্ময় পুরুষই নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন এবং এই "তিনি"ই যখন নিখিল বিশ্বের আত্মা হইলেন, তখন কাজেই সেই হিরণ্ময় পুরুষকেই নিখিল বিশ্বের আত্মা বলা হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই যে মুখ্যভাবে নিখিল-

বিশ্বের আত্মা বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন, তাহা সর্ববাদসম্মত। সুতরাং সিদ্ধান্তপক্ষের মতে সেই নিখিল বিশ্বের আত্মা পরমেশ্বর অর্থেই হিরণ্ময় পুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দেবতা একটীমাত্র নহে—অনেক দেবতা আছেন; কাজেই "নিখিল বিশ্বের যিনি আত্মা" সেই হিরণ্ময় পুরুষ অর্থে একাধিক দেবতা বুঝাইতে পারে না।

সিদ্ধান্তপক্ষ তাঁহার মতের সমর্থনে আর একটী যুক্তি ধরিয়াছেন এই যে শ্রুতির মতে ব্রহ্মের একটী অনন্যসাধারণ লক্ষণ হইল "অপাপবিদ্ধতা" অর্থাৎ তাঁহাতে কোন প্রকার পাপের অস্তিত্ব সম্ভবই হইতে পারে না। দেবতারাও তো অপাপবিদ্ধ—কারণ, শাস্ত্রমতে দেবভূমি হইল ভোগভূমি; সেখানে দেবতাদিগের কর্ম্ম করিবার অধিকার নাই, নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিবার মাত্র অধিকার আছে। কাজেই দেবতাদিগের কর্ম্মের অভাব হেতু বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে কোনপ্রকার পাপের সংস্পর্শ থাকা সম্ভব নয়; অথচ দেখা যায় যে দেবতাদের উপর অসুরগণ মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিল এবং তাহার জন্য দেবতাদিগকে অনেক দুঃখই পাইতে হইয়াছিল। দুঃখ যে পাপের ফল, ইহা সিদ্ধান্তপক্ষ পূর্ব্বপক্ষ উভয়পক্ষেরই স্বীকৃত। দেবতাদের এই দুঃখের কারণ পাপ আসে কোথা হইতে? সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে ইহা তাঁহাদিগের পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত পাপ। সেই পাপ দেবতাদিগকে স্বর্গেতেও অনুসরণ করে। যখন দেবতাদিগের পাপসংস্পর্শের সম্ভাবনা রহিল, তখন "হিরণ্ময় পুরুষ" কোন দেবতারই প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না—তাহা "অপাপবিদ্ধ" ব্রহ্মেরই প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ একটী শ্রুতিতে—"সেই এই সর্ব্বপ্রকার পাপের ঊর্দ্ধে অবস্থিত"—হিরণ্ময় পুরুষকেই সর্ব্বপ্রকার পাপের অতীত বলিয়া বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষ যে ঐশ্বর্য্যের সীমা প্রভৃতির আপত্তি তুলিয়াছেন, সিদ্ধান্তপক্ষের মতে সেগুলি কোন কাজেরই নহে। ঐশ্বর্য্যের সীমা বা আদিত্যরূপ আধার বা সুবর্ণ-রূপ যে বলা হইয়াছে, সিদ্ধান্তপক্ষের মতে সেগুলি আসলে উপাসনার সুবিধার জন্য পরমাত্মার প্রতি আরোপ করা হয় মাত্র, এবং সেভাবে আরোপ করিলে বাস্তবিক কোনই দোষ হয় না। অতএব "হিরণ্ময় পুরুষ" শব্দে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বুঝাইতেছে।

শ্রুতিতে একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম "সূর্য্যের অন্তরে থাকিয়া সূর্য্যকে নিয়মিত করিতেছেন, সূর্য্য তাঁহাকে জানে না।" এই শ্রুতিতে ভেদ যখন দেখা যাইতেছে, তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সূর্য্য ও তাহার অন্তর্বর্ত্তী ব্রহ্ম এক নহে। এবং শ্রুতির উদ্দেশ্য স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা।

অষ্টম প্রকরণ—ব্রহ্মের আকাশ শব্দবাচ্যতা অধিকরণ।

সূত্র। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ২২ ॥

টীকা। অষ্টমাধিকরণমারচয়তি—

আকাশ ইতি হোবাচেত্যত্র খং ব্রহ্ম বাহত্র খং।

শব্দস্য তত্র রূঢ়ত্বাদ্বায়্বাদেঃ সর্জনাদপি ॥ ৩১ ॥

সাকাশজগদুৎপত্তিহেতুত্বচ্ছ্রুতিরূঢ়িতঃ।

এবকারাদিনা চাত্র ব্রহ্মৈবাহকাশশব্দিতং ॥৩২॥

পূর্ব্বোক্তাক্ষিরণ্ময়বাক্যাদুত্তরস্মিন্ বাক্যে শালাবত্যেন মহর্ষিণা সর্বলোকাধারবস্তুনি. পৃষ্টে সতি প্রবাহণো রাজোত্তরমাহ। তত্রত্যং বাক্যমেতৎ—"আকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণং" ইতি। তত্র আকাশশব্দার্থো বিয়ৎ ব্রহ্ম বা ইতি সন্দেহঃ। রূঢ়ত্বাৎ বিয়ৎ ইতি প্রাপ্তং। সর্ব্বভূতোৎপত্তিলয়হেতুত্বং চ বিয়ত উপপদ্যতে। "আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ—" ইত্যাদৌ বায্বাদীনাং সর্ব্বভূতানাং বিয়ৎকার্য্যত্বশ্রবণাৎ ॥

অত্রোচ্যতে ব্রহ্মৈবাকাশশব্দার্থঃ। "সর্ব্বাণি হ বৈ" ইত্যত্রাসঙ্কুচিতসর্ব্বশব্দেন বিয়ৎসহিতসর্ব্বভূতোৎপত্তিহেতুত্বশ্রবণাৎ। ন চ বিয়তো বিয়দ্ধেতুত্বং সম্ভবতি। রূঢ়িস্তু লৌকিকী বিয়ত্যেবাস্তু। শ্রৌতী তু ব্রহ্মণ্যপি। "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" ইতি প্রয়োগদর্শনাৎ। কিঞ্চ "আকাশাদেব" ইত্যেবকারঃ কারণান্তরং ব্যুদস্যতি। ন চৈতৎ বিয়ৎপক্ষে সম্ভবতি ঘটাদিষু বিয়দ্ব্যতিরিক্তানাং মৃদাদিকারণানামুপলম্ভাৎ। ব্রহ্মপক্ষে তু

ব্রহ্মণঃ সদ্রূপস্য সর্ব্বানন্যতয়া কারণান্তরব্যুদাস উপপদ্যতে। জ্যায়স্ত্বপরায়ণত্বে চ শ্রুত্যন্তরে ব্রহ্মণঃ শ্রূয়েতে—"জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতের্দাতুঃ পরায়ণং" ইতি। 'কর্ম্মফলং দাতুং সমর্থম্' ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ ব্রহ্মৈবাকাশশব্দেন বিবক্ষিতং ॥

সূত্রের অনুবাদ। (ব্রহ্ম) আকাশ (শব্দ-বাচ্য) তাঁহার লিঙ্গ হেতু।

টীকার অনুবাদ। অষ্টম অধিকরণ রচিত হইতেছে—

"আকাশ, ইহা বলিয়াছিলেন" এই শ্রুতিতে আকাশ অথবা ব্রহ্ম (বুঝাইতেছে)? এস্থলে আকাশ (বুঝাইতেছে), কারণ (আকাশ) শব্দের তাহাতে (আকাশ অর্থে) রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধি (আছে) এবং (আকাশ হইতে) বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টিও (উক্ত হইয়াছে)। এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে আকাশ (ব্যবহৃত), কারণ (ব্রহ্মই) আকাশ-সহিত জগতের উৎপত্তিহেতু এবং শ্রুতিতে (আকাশশব্দের ব্রহ্ম অর্থ) প্রসিদ্ধ। আরও, 'এব' শব্দের (বা ইকারের) প্রয়োগ প্রভৃতি কারণে এস্থলে ব্রহ্মই আকাশ শব্দের বাচ্য।

পূর্ব্বোক্ত হিরণ্ময় বাক্যের পরবর্তী বাক্যে মহর্ষি শালাবত্য সকল লোকের আধার কি বস্তু প্রশ্ন করিলে রাজা প্রবাহণ উত্তর দিয়াছিলেন। সেই উত্তর-সূত্রে এই বাক্য (বলা হইয়াছিল)—"আকাশ ইহা বলিলেন, এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়, আকাশেতেই অস্ত প্রাপ্ত হয়, আকাশই এই সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, আকাশই পরম গতি।" এই শ্রুতিতে আকাশ শব্দের অর্থ বিয়ৎ বা নৈসর্গিক আকাশ অথবা ব্রহ্ম, ইহাই হইল সন্দেহ। রূঢ়ত্ব বা প্রসিদ্ধি হেতু বিয়ৎ, ইহাই পাওয়া গেল। সকল ভূতের উৎপত্তি এবং লয়ের হেতুত্ব, আকাশেরই উপপন্ন হয়, কারণ "আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি" ইত্যাদি শ্রুতিতে বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বভূত, বিয়ৎ বা আকাশেরই কার্য্য বলিয়া শ্রুত আছে।

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্মই। কারণ "সর্বাণি হ বৈ" অর্থাৎ "সমস্তই" এই স্থলে ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহৃত "সর্ব" শব্দে বিয়ৎ বা নৈসর্গিক আকাশসহিত সকল ভূতের উৎপত্তিহেতু বলিয়া শোনা যায়। বিয়ৎ বা নৈসর্গিক আকাশ বিয়তের বা নৈসর্গিক আকাশের কারণ হইতে পারে না। লৌকিক প্রসিদ্ধি (আকাশ শব্দে) বিয়ৎ বা নৈসর্গিক আকাশেই থাক্। কিন্তু শ্রুতিপ্রসিদ্ধি ব্রহ্মেতেও (আছে)। কারণ "আকাশই নামরূপের নির্বহিতা" এইরূপ প্রয়োগ (শ্রুতিতে) দেখা যায়। আরও, "আকাশ হইতেই" এই শব্দের "ই-কার" (সংস্কৃত এব শব্দ) অন্য কারণ নিরসন করিতেছে। এই (কারণান্তর-নিষেধ) বিয়ৎ-পক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ ঘটাদি পদার্থে বিয়ৎ-ব্যতীত মৃত্তিকা প্রভৃতি অন্যান্য কারণও উপলব্ধি হয়। কিন্তু ব্রহ্ম-পক্ষে ব্রহ্মের সৎ-রূপের সকল হইতে অপৃথক হওয়া প্রযুক্ত কারণান্তরের নিরসন উপপন্ন হইতেছে। এবং অন্য (দুইটী) শ্রুতিতে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরম গতিত্বও উল্লিখিত আছে—"পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ, অন্তরীক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ" "বিজ্ঞান-স্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম যজমানের পরমগতি"। 'কর্ম্মফল দিতে সমর্থ' ইহাই ভাবার্থ। অতএব ব্রহ্মই আকাশ শব্দে বিবক্ষিত বা বাচ্য।

তাৎপর্য্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটী গল্প আছে যে পুরাকালে শিলক, চৈকিতায়ন এবং প্রবাহণ এই তিন ঋষি উদ্গীথবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রবাহণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। এক সময়ে, সম্ভবত তাঁহাদের গুরুর নিকটে অধ্যয়ন সমাপন হইলে পর, তাঁহারা অধীত উদ্গীথ বিষয়ে আলোচনা ও বিচার করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে প্রবাহণ বলিলেন যে,—"আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনারাই অগ্রে বিচার করুন, আমি শ্রবণ করি।" বিচারের বিষয় হইল উদ্গীথের আশ্রয় কি? এই প্রশ্নের সূত্রে চৈকিতায়ন যেমন একটীর পর একটী উত্তর দিতে লাগিলেন, শিলকও তেমনি একটীর পর একটী প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে চৈকিতায়ন স্বর্গলোককে উদ্গীথের শেষ আশ্রয়রূপে নির্দেশ করিয়া নিজের উত্তরের শেষ করিলেন। তখন শিলক নিজের জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়া পৃথিবীর যাগযজ্ঞ হইতে স্বর্গলোকবাসী দেবতারা পুষ্ট হন এই সূত্র ধরিয়া পৃথিবীকে স্বর্গলোকের আশ্রয় বলিয়া চৈকিতায়নকে

নিরস্ত করিয়া দিলেন। প্রবাহণ তখন শিলকের ভুল ধরিয়া বলিলেন যে পৃথিবীরও আশ্রয় আছে এবং সেই আশ্রয় হইতেছে আকাশ। ইহা হইতেই শ্রুতি আসিল "আকাশ ইতি হোবাচ" ইত্যাদি।

সূত্রকার বলিতেছেন যে ঐ প্রবাহণোক্ত আকাশই ব্রহ্ম, কারণ আকাশ হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তিই হইল তাঁহার পরিচায়ক লক্ষণ। এই বিষয়ের আলোচনায় সংশয় উঠিল যে আকাশ শব্দে নৈসর্গিক আকাশ বুঝাইতেছে অথবা ব্রহ্ম বুঝাইতেছে? পূর্ব্বপক্ষের মতে নৈসর্গিক আকাশই বুঝাইতেছে। তাঁহার যুক্তি এই যে, আকাশ অর্থে বিয়ৎ বা নৈসর্গিক আকাশই প্রসিদ্ধ; এবং শ্রুতিতে দেখা যায় যে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি সূত্রে নৈসর্গিক আকাশই সকল ভূতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবাহণ যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে তিনি আকাশ হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও লয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই পূর্ব্বপক্ষের মতে নৈসর্গিক আকাশের বিষয় বলাই প্রবাহণোক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য।

তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে আকাশ শব্দের অর্থে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে। তাঁহার যুক্তি এই যে, শ্রুতিতে "সর্ব্বাণি হ বৈ" অর্থাৎ "সমস্তই" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "সর্ব্বাণি" শব্দের সহিত "হ বৈ" (অর্থাৎ "সমস্ত" শব্দের সহিত "ইকার") সংযুক্ত হওয়াতে এই "সর্ব্বাণি" বা "সমস্ত" কথাটী ব্যাপকতম অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ এই "সমস্ত" হইতে একটী পদার্থও, এমন কি, এই বিয়ৎ বা নৈসর্গিক আকাশেরও বাদ পড়িবার অবকাশ নাই। শ্রুতিতে আছে "আকাশ হইতেই সমস্ত ভূতই উৎপন্ন হয়।" এখন, এই সমস্ত ভূতের মধ্যে বিয়ৎও অন্তর্ভুক্ত হইলে, পূর্ব্বপক্ষের যুক্তিতে অর্থাৎ "আকাশ" শব্দের অর্থে বিয়ৎই ধরিলে বিয়ৎকেই বিয়ৎএর কারণ বলিতে হয়—যাহা সম্ভব নহে।

আর, পূর্ব্বপক্ষ যে বলেন আকাশ শব্দের অর্থে নৈসর্গিক আকাশই প্রসিদ্ধ, তদুত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে নৈসর্গিক আকাশের নাম আকাশ থাক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না; কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্ম অর্থেও যে আকাশ শব্দের ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে। যথা—"আকাশই নামরূপের নির্ব্বহিতা।" এখন, নাম ও রূপের মূল কারণ একমাত্র ব্রহ্মই, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। কাজেই দেখা যায় যে, ব্রহ্ম অর্থেও আকাশ শব্দের ব্যবহার শ্রুতিতে আছে। তদ্ব্যতীত প্রথমোক্ত শ্রুতিতে আছে "আকাশ হইতেই সমস্ত ভূতই উৎপন্ন হয়"—এই "আকাশ হইতেই" শব্দের "ইকার" (সংস্কৃত "এব" শব্দ) প্রয়োগের ফলে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হিসাবে আকাশ ব্যতীত অন্য কোন কারণের কথা আসিতেই পারে না। এই যে উক্তি যে "একমাত্র আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়" এবং ইহা দ্বারা সমস্ত ভূতের অন্য উৎপত্তি কারণ যে নিরসন হইতেছে, তাহা বিয়ৎপক্ষে সম্ভব হয় না অর্থাৎ আকাশ শব্দে নৈসর্গিক আকাশ ধরিলে ইহা সম্ভব হয় না। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাউক। একটা ঘট আছে; সেই ঘট প্রস্তুত হইবার কার্য্যে বিয়ৎকে আশ্রয় করিয়া হইয়াছিল, কাজেই বিয়ৎ সেই ঘটের অন্যতম কারণ হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা যায় যে মৃত্তিকা, কুম্ভকার প্রভৃতি না হইলে কেবল একমাত্র বিয়ৎকে অবলম্বন করিয়া ঘট প্রস্তুত হইতে পারিত না, কাজেই বিয়ৎ-এর সঙ্গে মৃত্তিকা কুম্ভকার প্রভৃতিও ঘটের কারণ হইল। কিন্তু যখন বলা যায় যে, "আকাশ হইতেই সমস্ত ভূতই (বিয়ৎসহ) উৎপন্ন হয়", তখন দেখি যে শ্রুতির বলা উদ্দেশ্য যে আকাশ ব্যতীত অন্য কোন কিছু হইতে "সমস্ত" ভূতের উৎপত্তিরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। এখন আকাশ শব্দে ব্রহ্ম অর্থ ধরিলেই এই শ্রুতির ভাবটী ঠিক বজায় থাকে; কারণ, শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ম সৎ-রূপ অর্থাৎ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে ও সকল অবস্থায় ব্রহ্ম আছেন—ব্রহ্মের সত্তা আছে। সত্তা যে ব্রহ্মের ধর্ম্ম তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এখন সর্ব্বভূতে যখন এই সত্তা আছে, তখন এই সত্তা বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বভূত হইতে অনন্য বা অ-পৃথক ধরিতে হয় অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাতেই সর্ব্বভূতের সত্তা। কাজেই বলিতে হয় যে সত্তা বিষয়ে ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের কারণ। শ্রুতিতে আরও দেখা

যায় যে ব্রহ্মের কারণ কেহই নাই, ব্রহ্মই বরঞ্চ সমস্ত বিশ্বজগতের জন্মাদির মূল কারণ। সুতরাং যে আকাশ হইতে সমস্ত ভূতেরই উৎপত্তি বলিয়া শ্রুতিতে উল্লেখ আছে, সেই আকাশ শব্দে যে ব্রহ্ম বুঝাইতেছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

প্রথমোক্ত শ্রুতিতে আছে—"আকাশই এই সকল (ভূত) হইতে শ্রেষ্ঠ"। এখানেও নৈসর্গিক আকাশ ধরা ঠিক নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদেরই আর একটী শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে তিনি "পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ, অন্তরিক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ"। এই শ্রুতির সঙ্গে প্রথমোক্ত শ্রুতির একবাক্যতা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে ঐ শ্রুতিতে আকাশ শব্দ ব্রহ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঐ শ্রুতিতে "আকাশ পরম গতি" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের একটী শ্রুতিতে আছে "বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ধনদাতার (যজমানের) পরম গতি"। এস্থলে ব্রহ্মকেই স্পষ্টভাবে পরমগতি বলা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে প্রথমোক্ত শ্রুতির একবাক্যতা করিলে বুঝা যাইবে যে, যে আকাশকে পরম গতি বলা হইয়াছে, সেই আকাশ ব্রহ্মই। সকল দিক হইতেই আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে বর্ত্তমান অধিকরণধৃত শ্রুতিতে "আকাশ" শব্দ ব্রহ্ম অর্থই ব্যবহৃত হইয়াছে।

গান।

(কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ)

নিশার আঁধার চিরি' চিরি'
দেখি কোথায় কিরণ জ্বলে—
ওগো সাত রাজার ধন মাণিক আমার
খুঁজে বেড়াই নয়নজলে।
অরূপ মাঝে রূপের খেলা
চল্‌ছে ওগো সারাবেলা,—
নীরবতার মাঝে ওগো
বাজে বাঁশী কতই ছলে!
কোথায় আমার গোপন হরষ?
তোমার পাইনা দরশ, পাচ্ছি পরশ,
ছুঁইয়ে দে' যাও সোনার কাটি
আমার মৃত মর্ম্মতলে!

রাসায়ন আকর্ষণে তাপ ও তড়িৎ।

(৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৮ই বৈশাখ, ১৭৯৫ শক, রবিবার)

আকর্ষণের কথা ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত রাসায়নিক আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ও যোগাকর্ষণ, এই তিনটীর সম্বন্ধে আরও বলিবার আছে। রাসায়ন আকর্ষণের যে নিয়ম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া আর একটী নিয়ম এই যে, যখন রাসায়নিক আকর্ষণ কার্য্য করিতে থাকে, তখন তড়িৎ ও তাপ উৎপন্ন হয়। তড়িৎ ও তাপ, এই দুইটী এক পদার্থ অথবা বিভিন্ন, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই।

যদি ঘন সলফ্যুরিক অ্যাসিডের ভিতর শুধু জল দেওয়া যায়, তবে সেই জলের কতক ভাগ সলফ্যুরিক অ্যাসিডের সঙ্গে এত বেগে মিলিত হয় যে, যদিও সলফ্যুরিক অ্যাসিডের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না, কতকটা পরিবর্ত্তন হয় মাত্র, তবু যে পাত্রে অ্যাসিড ও জল একত্র করা যায়, সেই পাত্র খুব গরম হইয়া উঠে। সলফ্যুরিক অ্যাসিড ও জলের পরমাণুতে যে তাপ গূঢ়ভাবে ছিল, জলের পরমাণুর সঙ্গে সলফ্যুরিক অ্যাসিডের সবেগে যোগ হওয়াতে কতক তাপ বাহির হইয়া প্রকাশভাব ধারণ করে।

আবার কোন কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় তড়িৎ প্রকাশ পায়। সেই তড়িৎ দুই প্রকার। যদি সলফ্যুরিক অ্যাসিডের সঙ্গে কোন ধাতুর যোগ করা যায়, তাহা হইলে একবিধ তড়িৎ সলফ্যুরিক অ্যাসিডে দেখা দেয়, অপরবিধ তড়িৎ ধাতুতে দেখা দেয়।

এই দস্তার চোঙ্গার ভিতর যদি সলফ্যুরিক অ্যাসিড পোরা যায়, তাহা হইলে সলফ্যুরিক অ্যাসিডের সঙ্গে আর দস্তার সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া নূতন এক পদার্থ প্রস্তুত হইবে। সেই সংযোগ হইবার সময় তড়িৎ উদ্ভব হইবে এবং সেই তড়িৎ অ্যাসিডে এক রকম দেখা দিবে, আর দস্তাতে আর রকম দেখা দিবে। এখন এই চোঙ্গার ভিতরে দুইটা তার দুইদিকে ধরিলে একটা তার দিয়া এক রকম তড়িৎ চলিয়া আসিবে, এবং অপর তার দিয়া আর এক ভাবের তড়িৎ বাহির হইয়া আসিবে। সলফ্যুরিক অ্যাসিডের পরি-

বর্ত্তনে খুব সামান্য পদার্থও—জল বা তৈল—দিয়া রাখিলে অল্প রাসায়নিক সম্বন্ধের দরুণ খুব কম তড়িদুদ্গম হইবে। সেই তড়িৎও দুই ভাগ হইয়া একটা জলে বা তৈলে, অপরটা সেই পদার্থে থাকিবে।

দ্রাবকের সঙ্গে ধাতুর রাসায়নিক যোগ তো স্পষ্টই দেখা যায়। যেখানে রাসায়নিক কার্য্যের প্রকাশ্য কোন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেখানেও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তড়িদুদ্গম্ হয়, এবং সুতরাং অনুমান হয় যে রাসায়নিক কার্য্যও চলে। সামান্য সামগ্রী মসলা যখন রন্ধন দ্রব্যের সহিত মিলিতেছে, চিনি যখন জলে গুলিয়া যাইতেছে,—যখনি মিলিতেছে, তখনি তড়িৎ উদ্গত হইতেছে, যদিও খুব কম পরিমাণে বটে; রাসায়নিক আকর্ষণ যত কম, সেই অনুসারে তড়িৎও কম—বিশেষ যন্ত্র ব্যতীত তাহা অনুভূত হয় না। ক্ষুদ্র হউক বৃহৎ হউক, রাসায়নিক কার্য্যমাত্রেই তড়িৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উপাদানকে আশ্রয় করে।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, রাসায়নিক কার্য্যে তড়িতের সঙ্গে তাপেরও উৎপত্তি হয়। সলফ্যুরিক অ্যাসিড জলের সহিত মিলিত হইলে অত্যন্ত তাপোৎপত্তি হয়। জলের ভিতরে যে দুই পদার্থ আছে, সেই দুই পদার্থ—অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন—মিলিত হইয়া যখন জল প্রস্তুত হয়, তখন তাহারা এত বেগে মিলিত হয় যে, যেমন তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তেমনি তাপও উৎপন্ন হয়—তাপ এত অধিক উৎপন্ন হয় যে, জল প্রস্তুত হইয়াই বাষ্পাকারে পরিণত হয়। প্রবল রাসায়নিক কার্য্যে তাপের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; রাসায়নিক কার্য্য ধীরে ধীরে হইলে তাপ কম হয়। দুই বস্তুর সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়। দুইটা চকমকির ঘর্ষণে যে তাপ নির্গত হয়, সেই তাপের যোগে চকমকির রেণু লাল হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে পতিত হইয়া সোলা টিকা প্রভৃতিতে আগুন ধরাইয়া দেয়। তেমনি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যদিও দুইটী সূক্ষ্ম গ্যাস, কিন্তু জল প্রস্তুত হইবার কালে ইহার অণু উহার অণুর সঙ্গে এত বেগে মিলিত হয় যে, সেই ঘর্ষণে তাপোৎপত্তি হয়।

দুইটী কারণে আমরা সকল সময়ে তাপ জানিতে পারি না—এক, রাসায়নিক কার্য্য কম হইলে যখন তাপও কম হয়; দ্বিতীয়, তাপ উৎপন্ন হইলেও যখন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। কোন কোন পদার্থ তাপকে ধরিয়া রাখিতে পারে না—যে মুহূর্ত্তে তাপ উৎপন্ন হয়, অমনি বাহির হইয়া যায়। আবার এমন পদার্থ আছে যাহা হইতে তাপ শীঘ্র বাহির হইতে পারে না। যাহা হইতে তাপ শীঘ্র বাহির হইয়া যাইতে পারে তাহার নাম তাপ-পরিচালক পদার্থ, যেমন ধাতু। কাচ, মাদুর, কাঠ, এই সকল অপেক্ষাকৃত কম পরিচালক। যে সকল পদার্থে তাপ কতকক্ষণ থাকিতে পায়, সেই সকল পদার্থে তাপ পরীক্ষা করিয়া জানিবার অবকাশ হয়। রাসায়নিক আকর্ষণ যেখানে, তড়িদুৎপত্তিও সেখানে, তাপোৎপত্তিও সেখানে—কেবল পদার্থের পরিচালকতা অনুসারে আমরা তাহা ধরিতে পারি বা না পারি।

রাসায়নিক ক্রিয়ায় বাধা—দূরতা ও কঠিনতা। যদি পরমাণুদের মধ্যে দূরতা থাকে, তাহা হইলে রাসায়নিক আকর্ষণ বল পায় না, দূরতা না থাকিলে রাসায়নিক কার্য্য শীঘ্র হয়। কঠিন সমষ্টির মধ্যেও রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে পারে না; কেননা, রেণুসকল পরস্পরের যোগাকর্ষণ ভেদ করিয়া মিলিতে পারে না। ইহার জন্য কঠিন পদার্থকে তরল করিবার প্রণালী আছে। কখনো কখনো তরল করিবার প্রয়োজন হয় না—যে দুই পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া করাইতে হইবে, সেই দুই পদার্থকে খুব গুঁড়া করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কখনো কখনো তরল পদার্থও মিলিত হয় না—তখন তাহাদিগকে বায়বীয় অবস্থাতে পরিণত করিতে হয়। আবার বায়বীয় অবস্থায় সকল সময়ে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে পারে না, যেহেতু বায়বীয় অবস্থাতে যোগাকর্ষণ যেমন থাকে না, তেমনি বিকর্ষণ অত্যধিক থাকে, রেণুসকল পরস্পর হইতে দূরেই থাকিতে চাহে। সে সময়ে এমন উপায় করিতে হয়, যাহাতে যোগাকর্ষণ প্রবল হইতে পারে।

রাসায়নিক ক্রিয়ার পোষক হইতেছে তাপ ও তড়িৎ। ইহাদের সংযোগে রাসায়নিক ক্রিয়া শীঘ্র

সম্পাদিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মধ্যে এক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যুৎ চালাইয়া দিলেই উভয়ে মিলিত হইয়া জল হইয়া যায়। তড়িৎ প্রয়োগ না করিলেও স্বাভাবিক তাপতড়িতের গুণে অনেক দিনে জলও হইতে পারে, অথবা অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে মিলিত হইয়া অন্য পদার্থও হইতে পারে। পারা ও গন্ধক একত্র খুব ঘুঁটিলে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং উভয়ে মিলিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক রাসায়নিক ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতে গেলে অর্থাৎ হিঙ্গুল প্রস্তুত করিতে গেলে তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে।

তাপ ও তড়িৎ রাসায়নিক ক্রিয়ার যেমন বিশেষ পোষক, তেমনি আবার হানিজনকও বটে। পারাতে যদি তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে পারা বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া একরূপ সিন্দুরে পরিণত হয়। কিন্তু আবার, যত তাপের সংযোগে ঐ সিন্দুর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা যদি অনেক অধিক তাপ উহাতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে আবার অক্সিজেন ভিন্ন ও পারা ভিন্ন হইয়া পড়ে। এই একটী পদার্থ খড়ি—ইহা কার্ব্বনিক অ্যাসিড ও চুন মিলিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। যদি অন্য কোন পদার্থের যোগ না দিয়া কেবল তাপ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলেই ইহার চুন পৃথক হইয়া পড়িবে, কার্ব্বনিক অ্যাসিড পৃথক হইয়া পড়িবে। আবার চুন গুলিয়া যদি তাহাতে তড়িৎ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে চুনের মূল ধাতু ক্যালসিয়ম পৃথক হইয়া পড়িবে, আর অক্সিজেন পৃথক হইয়া পড়িবে। এমন পদার্থ নাই, যাহাকে তড়িৎ বিযুক্ত না করে। তড়িৎ প্রয়োগের ফলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, দুই মরুৎ মিলিয়া জল হইবে; আবার সেই জলে তড়িৎ প্রয়োগ করিলে হাইড্রোজেন একদিকে যাইবে, আর অক্সিজেন আর একদিকে যাইবে। তাপ ও তড়িতের ন্যূনাধিক পরিমাণ অনুসারে যোগবিয়োগ ঘটে। উহারা বহুরূপী—সকল পদার্থের ভিতরে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেই, আমরা লক্ষ্য করিতে পারি বা না-ই পারি।

তড়িৎকে ভালরূপে বুঝিতে পারিলেই জগতের একটা গভীর ভাব বুঝিতে পারিব। অন্নপরিপাক শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি শারীরিক কার্য্যসকল নিজে নিজে হইতেছে বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু এই সকল কার্য্যে তাপ ও তড়িতের কত যে খেলা আছে, তাহা বলা যায় না। এইমাত্র এক যুবা বলবান পুরুষ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে; যদি তাহার শরীরের তাপতড়িতের একটু বিশৃঙ্খলতা ঘটে, অমনি সে মুহূর্ত্তের মধ্যে হতচেতন হইতে পারে। আত্মা পৃথক, শারীরিক জীবন পৃথক। আত্মারি কেহ কিছু করিতে পারে না। সেদিন জর্ম্মনি দেশে এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একজন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত ফ্রান্সের বর্ত্তমান শাসক টিয়ারের (M. Thier) নিকট হইতে দুইজন প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তিকে লইয়া রক্তনির্গম দ্বারা তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল। তিন মাস পরে যখন সেই দুইটী মৃতদেহ পচিতে আরম্ভ হইল, তখন তাহাতে মেষের রক্ত প্রবাহিত করিয়া নিরন্তর তড়িৎ প্রয়োগ করিতে করিতে একজন জীবিত হইল, দ্বিতীয় জন জীবিত হইল না। দ্বিতীয় জন জীবিত না হইবার কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় এই যে, যখন রক্তনির্গম দ্বারা মারিয়া ফেলা হয়, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি পীড়িত ছিল। এই ঘটনার তথ্যাতথ্য কিছুই জানি না; ইহা বাস্তবিক না হইলেও না হইতে পারে, হইলেও যে কিছু অলৌকিক ব্যাপার হইবে তাহাও নহে—সংবাদ পত্রে যখন ঘটনাটী প্রকাশ হইয়াছে, তখন তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া গেল। তড়িৎ বিদ্যা সম্যক আয়ত্ত হইলে আপনাকে হয়তো আপনার বশে আনিতে পারি।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

একাদশ প্রকরণ।

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধ তাহা জ্ঞান ও কাম্য কর্ম্মেরই বিরোধ; জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম্মে অধ্যাত্মদৃষ্টিতেও কোন বিরোধ নাই; কর্ম্ম অপরিহার্য্য এবং লোকসংগ্রহদৃষ্টিতে উহার আবশ্যকতাও যথেষ্ট হওয়ায়, যাবজ্জীবন

যথাধিকার নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে চাতুর্বর্ণ্যের কর্ম্ম জ্ঞানীপুরুষের করিতেই হইবে। যদি এই বিষয়ই শাস্ত্রীয় যুক্তিবাদের দ্বারা সিদ্ধ হয়, এবং গীতারও যদি ইহাই অর্থ হয়, তবে বৈদিক ধর্ম্মের স্মৃতিগ্রন্থে কথিত চারি আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসাশ্রমের কি দশা হইবে, এই সন্দেহ সহজেই মনে উদয় হয়। মনু প্রভৃতি স্মৃতিসমূহে, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারি আশ্রমের কথা বলিয়া, অধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ, দান কিংবা চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম্মানুসারে নির্দ্দিষ্ট অন্য কর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত আচরণের দ্বারা প্রথম তিন আশ্রমে আস্তে আস্তে চিত্তশুদ্ধি হইলে পর শেষে সমস্ত কর্ম্ম স্বরূপত ত্যাগ করিবে এবং সন্ন্যাস লইয়া মোক্ষ অর্জ্জন করিবে এইরূপ উক্ত হইয়াছে (মনু. ৬. ১ ও ৩৩-৩৭ দেখ)। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, যাগযজ্ঞ ও দানাদি কর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমে বিহিত হইলেও তাহা চিত্তশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ বিষয়াসক্তি বা স্বার্থপরবুদ্ধি চলিয়া গিয়া পরোপকারবুদ্ধি বাড়িয়া বাড়িয়া সর্ব্বভূতে একই আত্মা রহিয়াছে এই উপলব্ধিতে আসিয়া পৌঁছিবার শক্তি পাওয়া যাইবে; এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য শেষে সমস্ত কর্ম্ম স্বরূপত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমই গ্রহণ করিবে, ইহাই সমস্ত স্মৃতিকারদিগের অভিপ্রায়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কলিযুগে যে সন্ন্যাসধর্ম্মের স্থাপনা করিয়াছেন, সেই মার্গ ইহাই; এবং স্মার্ত্তমার্গীয় কালিদাসও রঘুবংশের আরম্ভে—

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥

"বাল্যকালে অভ্যাস (ব্রহ্মচর্য্য) করা, যৌবনে বিষয়োপভোগরূপ সংসার (গৃহস্থাশ্রম) করা, শেষ বয়সে মুনিবৃত্তি কিংবা বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করা এবং শেষে (পাতঞ্জল) যোগের দ্বারা সন্ন্যাসধর্ম্মানুসারে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আত্মাকে লইয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করা" এইরূপ পরাক্রান্ত সূর্য্যবংশীয় রাজাদের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে (রঘু. ১. ৮)। সেইরূপ আবার মহাভারতে শুকানুপ্রশ্নে—

চতুষ্পদী হি নিঃশ্রেণী ব্রহ্মণ্যেষা প্রতিষ্ঠিতা।
এতামারুহ্য নিঃশ্রেণীং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

"চারি আশ্রমরূপ চারি পৈঠার এই সোপান শেষে ব্রহ্মপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; এই পৈঠা দ্বারা অর্থাৎ এক আশ্রম হইতে অন্য উপরের আশ্রমে আরোহণ করিতে থাকিলে পর মনুষ্য শেষে ব্রহ্মলোকে মহত্ত্ব লাভ করে (শাং. ২৪১. ১৫) এই কথা বলিয়া, পরে, এই ক্রমপরম্পরায় বর্ণনা করিয়াছেন—

কষায়ং পাচয়িত্বাশু শ্রেণিস্থানেষু চ ত্রিষু।
প্রব্রজেচ্চ পরং স্থানং পারিব্রাজ্যমনুত্তমম্॥

"এই সোপানের তিন পৈঠায় মনুষ্য আপন কিল্বিষের (পাপের) অর্থাৎ স্বার্থপর আত্মবুদ্ধির কিংবা বিষয়াসক্তিরূপ দোষের শীঘ্রই ক্ষয় করিয়া আবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে; পারিব্রাজ্য অর্থাৎ সন্ন্যাসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান" (শাং. ২৪৪. ৩)। এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে যাইবার এই ক্রমপরম্পরাই মনুস্মৃতিতে প্রদত্ত হইয়াছে (মনু. ৬.৩৪)। কিন্তু ইহার মধ্যে অন্তিম অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমের দিকে লোকের অতিরিক্ত প্রবৃত্তি হইলে সংসারের কর্তৃত্ব নষ্ট হইয়া সমাজও পঙ্গু হইবে এই কথা মনুর পূর্ণ উপলব্ধি হইয়াছিল। তাই, পূর্ব্বাশ্রমে গৃহধর্ম্ম অনুসারে পরাক্রমের ও লোকসংগ্রহের সমস্ত কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য মনু এই কথা বলিয়া, পরে—

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥

"শরীরে বলি পড়িতে আরম্ভ হইলে ও পৌত্রমুখ দেখিতে পাইলে গৃহস্থ বানপ্রস্থ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে"—এইরূপ মনু স্পষ্ট সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন (মনু. ৬. ২)। এই সীমা পালন করিতে হইবে, কারণ মনুস্মৃতিতেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মনুষ্য জন্মতই আপন পৃষ্ঠের উপর ঋষিগণ পিতৃগণ ও দেবগণের তিন ঋণভার (কর্ত্তব্য) গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। তাই, বেদাধ্যয়নের দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ এবং যজ্ঞকর্ম্মের দ্বারা দেবঋণ এইরূপ তিন ঋণই প্রথমে পরিশোধ না করিয়া মনুষ্য সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে না। সেরূপ না করিলে, জন্মত-প্রাপ্ত এই ঋণ না শোধ করিবার দরুণ সে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে (মনু. ৬. ৩৫-৩৭ ও পূর্ব্বপ্রকরণে প্রদত্ত তৈ. সং. মন্ত্র দেখ)। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পিতার ঋণ কালসীমা নির্দ্দেশ না করিয়া পুত্রের ও পৌত্রেরও শোধ করিতে হইবে, এবং কাহারও ঋণ রাখিয়া মরা অত্যন্ত দুর্গতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, এই কথা মনে করিলে জন্মতঃ প্রাপ্ত উক্ত বড় রকমের সামাজিক কর্ত্তব্যকে 'ঋণ' বলায় আমাদের শাস্ত্রকারদিগের কি হেতু ছিল, ইহা পাঠকের সহজেই উপলব্ধি হইবে। স্মৃতিকারদিগের নির্দ্দিষ্ট এই সীমা অনুসারে সূর্য্যবংশীয় রাজারা কাজ করিতেন, এবং পুত্র রাজ্য চালাইতে সমর্থ হইলে তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া পরে (পূর্ব্বে নহে) নিজে গৃহস্থাশ্রম হইতে নিবৃত্ত হইতেন এইরূপ কালিদাস রঘুবংশে বলিয়াছেন (রঘু. ৭. ৬৮)। এই নিয়ম পালন না করিয়া দক্ষপ্রজাপতির হর্য্যশ্ব নামক পুত্রদিগকে প্রথমে এবং তাহার পর শবলাশ্ব নামক অন্য অনেক পুত্রকেও, তাহাদের বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই, নারদ নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ করিয়া ভিক্ষু করিয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া এই অশাস্ত্র ও গর্হিত আচরণ সম্বন্ধে নারদকে ভর্ৎসনা করিয়া দক্ষ-

প্রজাপতি তাঁহাকে শাপ দিয়াছিলেন, ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে (ভাগ. ৬. ৫. ৩৫-৪২)। ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, আমরা গার্হস্থ্য জীবন যথাশাস্ত্র সম্পূর্ণ করিয়া আমাদের ছেলেরা সস্ত্রীক কর্তা হইলে, বার্দ্ধক্যের অনর্থক কর্ত্তৃত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের আশার পথে অন্তরায় না হইয়া নিছক্ মোক্ষপরায়ণ হইয়া আমরা আপনা হইতেই সংসার হইতে আনন্দে নিবৃত্ত হইব, এইরূপ এই আশ্রমব্যবস্থার মূল হেতু ছিল, এই হেতুই বিদুরনীতিতে—

উৎপাদ্য পুত্রাননৃণাংশ্চ কৃত্বা বৃত্তিং চ তেভ্যোঽনুবিধায় কাঞ্চিৎ।
স্থানে কুমারীঃ প্রতিপাদ্য সর্ব্বা অরণ্য সংস্থোঽথ মুনির্বুভূষেৎ॥

"গৃহস্থাশ্রমে পুত্র উৎপাদন করিয়া, তাহাদিগকে অঋণী করিয়া, তাহাদের জীবিকায় কিছু সুবিধা করিয়া দিয়া, এবং সমস্ত কন্যাকে যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত দেখিয়া, পরে বানপ্রস্থ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিবে" (মভা. উ. ৩৬. ৩৯), এইরূপ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে সাধারণ লোকের সংসারসম্বন্ধে বর্ত্তমান ধারণাও প্রায় বিদুরের কথারই মতো। তথাপি কখন-না-কখন সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণই মনুষ্যমাত্রের পরমসাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, জাগতিক কর্ম্মের সংসিদ্ধির জন্য স্মৃতিকারদিগের নির্দ্দিষ্ট প্রথম তিন আশ্রমের শ্রেয়স্কর সীমা আস্তে আস্তে পিছাইয়া পড়িতেছে; এবং কেহ জন্ম হইতেই, কিংবা অল্পবয়সেই জ্ঞানলাভ করিলে, তাহার এই তিন পৈঠায় ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিবার আবশ্যকতা নাই—একবারেই সন্ন্যাসগ্রহণে তাহাদের কোন বাধা নাই—'ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্গৃহাদ্বা বনাদ্বা' (জাবা. ৪) এই শেষের পৈঠায় আসিয়া থামিয়াছে! এই অভিপ্রায়েই—

শরীরপক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানং তু পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে রসজ্ঞানে চ তিষ্ঠতি॥ *

"কর্ম্ম, শারীরিক (বিষয়াসক্তিরূপ) রোগ বহিষ্কৃত করিবার জন্য হওয়ায়, জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম কিংবা চরম গতি; কর্ম্মের দ্বারা শরীরের কষায় কিংবা অজ্ঞানরূপ রোগ বিনষ্ট হইলে পর, রসজ্ঞানের আস্বাদ উৎপন্ন হয়" (শাং. ২৬৯. ৩৮), এইরূপ মহাভারতে গোকাপিলীয় সংবাদে কপিল স্যূমরশ্মিকে বলিয়াছেন। সেইরূপ মোক্ষধর্ম্মে পিঙ্গলগীতায় "নৈরাশ্যং পরমং সুখং"—কিংবা "যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্"—তৃষ্ণারূপ প্রাণান্তিক রোগ না গেলে সুখ নাই (শাং. ১৭৪. ৬৫ ও ৫৮) এইরূপ উক্ত হইয়াছে। জাবাল ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের বচন ব্যতীত "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" কর্ম্মের দ্বারা, প্রজার দ্বারা, ধনের দ্বারা নহে—ত্যাগের দ্বারাই (কিংবা ন্যাসের দ্বারা) কোন কোন ব্যক্তি মোক্ষ অর্জ্জন করে—এইরূপ কৈবল্য ও নারায়ণোপনিষদেও বর্ণিত হইয়াছে (কৈ. ১. ২; নারা. উ. ১২. ৩ ও ৭৮ দেখ)। জ্ঞানী পুরুষকেও শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মই করিতে হইবে এইরূপ যদি গীতার সিদ্ধান্ত হয় তবে এই বচনগুলির কি প্রকার প্রয়োগ কি করিয়া লাগাইতে হইবে তাহা বলা আবশ্যক। অর্জ্জুনের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে "তাহা হইলে আমাকে সন্ন্যাস কি, ও ত্যাগ কি, তাহা পৃথক্ করিয়া বলো" (১৮. ১) এইরূপ ভগবান্‌কে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ এই প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন তাহা দেখিবার পূর্ব্বে স্মৃতিগ্রন্থে প্রতিপাদিত এই আশ্রমমার্গ ব্যতীত অন্য এক তুল্যবল বৈদিক মার্গেরও বিচার এখানে কিছু করা আবশ্যক।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও শেষে সন্ন্যাসী এইরূপ আশ্রমের পর-পর-উচ্চ চার পৈঠার এই যে সোপান তাহাকেই 'স্মার্ত্ত' অর্থাৎ 'স্মৃতিকারগণের প্রতিপাদিত মার্গ' বলে। কর্ম্ম কর ও কর্ম্ম ছাড়ো—এইরূপ উভয় প্রকারের পরস্পরবিরুদ্ধ বেদের যে আজ্ঞা তাহার সমন্বয়ার্থ স্মৃতিকারেরা বয়োভেদানুরূপ আশ্রমের এই ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং স্বরূপত কর্ম্মসন্ন্যাসকেই যদি চরম ধ্যেয় বলিয়া মানা যায় তবে উহা সাধ্যের পূর্ব্বায়োজন অর্থাৎ সাধন বলিয়া স্মৃতিকারগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত জীবনের চারি পৈঠার এই মার্গ কিছু অসঙ্গত নহে। জীবনের এই প্রকার ক্রমোচ্চ পৈঠা কল্পনা করায় জাগতিক ব্যবহারের লোপ না ঘটিয়া, যদিও বৈদিক কর্ম্ম ও ঔপনিষদিক জ্ঞানকে একত্র সংযুক্ত করিতে পারা যায় সত্য; তথাপি গৃহস্থাশ্রমই অন্য তিন আশ্রমের পরিপোষক হওয়ায় (মনু. ৬. ৮৯) মনুস্মৃতিতে ও মহাভারতেও শেষে—

যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
এবং গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য বর্ত্তন্ত ইতরাশ্রমাঃ॥

"মায়ের (পৃথিবীর) আশ্রয়ে সমস্ত জন্তু যেরূপ জীবিত থাকে, সেইরূপ গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয়ে অন্য আশ্রম সকল রহিয়াছে" (শাং. ২৬৮. ৬; ও মনু. ৩. ৭৭ দেখ) এইরূপ গৃহস্থাশ্রমের মাহাত্ম্য স্পষ্ট স্বীকার করা হইয়াছে। মনু তো অন্য আশ্রমগুলিকে নদী এবং গৃহস্থাশ্রমকে সাগর বলিয়াছেন (মনু. ৬. ৯০; মভা. শাং. ২৯৫. ৩৮)। গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপে যদি নির্ব্বিবাদ হইল তবে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া 'কর্ম্ম সন্ন্যাস কর' এইরূপ উপদেশ করায় লাভ কি? জ্ঞানলাভের

* বেদান্ত-সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে (৩. ৪. ২৬) এই শ্লোক গৃহীত হইয়াছে; তাহাতে, উহার পাঠ "কষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানং তু পরমা গতিঃ। কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে"।—এইরূপ আছে। আমি এই শ্লোক, মহাভারতে যেমনটি পাইয়াছি তাহাই দিয়াছি।

পরেও গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম করা কি অসম্ভব? অসম্ভব না হইলে জ্ঞানী পুরুষ সংসার হইতে নিবৃত্ত হইবেক এইরূপ বলার অর্থ কি? নূনাধিক স্বার্থবুদ্ধিতে যাহারা কাজ করে সেই সাধারণ লোকদিগের অপেক্ষা নিষ্কামবুদ্ধিতে যাঁহারা কাজ করেন সেই পূর্ণ জ্ঞানীপুরুষেরা কাজেকাজেই লোকসংগ্রহে অধিক সমর্থ ও যোগ্য হইয়া থাকেন। তাই, জ্ঞানের দ্বারা যখন জ্ঞানীপুরুষের এই সামর্থ্য পূর্ণাবস্থায় উপনীত হয় তখনও সমাজ ছাড়িয়া যাইবার স্বাধীনতা জ্ঞানী পুরুষের জন্য রাখিলে, চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা যাহার হিতের জন্য করা হইয়াছে সেই সমাজেরই তাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হয়। শরীরের সামর্থ্য না থাকিলে কেহ যদি সমাজ ছাড়িয়া বনে যায়, তো সে আলাদা কথা; তাহা হইতে সমাজের কোন বিশেষ হানি হইবে না। সন্ন্যাসাশ্রমের সীমা বৃদ্ধকালে নির্দ্দেশ করায় মনুর বোধ হয় এই অভিপ্রায়ই ছিল। কিন্তু এই শ্রেয়স্কর সীমা পরে ব্যবহারে বজায় থাকে নাই ইহা উপরে বলিয়াছি। তাই, কর্ম্ম কর ও কর্ম্ম ছাড়ো এই উভয়বিধ বেদবচনের মিল করিবার জন্যই স্মৃতিকারগণ আশ্রমের ক্রমোচ্চ শ্রেণী-পরম্পরা স্থাপন করিলেও এই বিভিন্ন বেদবাক্যসকলের সমন্বয় করিবার নির্ব্বিবাদ অধিকার—স্মৃতিকারদিগেরই ন্যায়, এমন কি তাঁহাদের হইতেও অধিক—যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আছে, তিনিই ভাগবত ধর্ম্মের নামে জনকাদির প্রাচীন জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক মার্গের পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। ভাগবতধর্ম্মে শুধু অধ্যাত্মবিচারের উপরেই নির্ভর না করিয়া বাসুদেব-ভক্তির সুলভ সাধনারও উপর ভর দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয় পরে ত্রয়োদশ প্রকরণে সবিস্তার বিচার করা যাইবে। ভাগবতধর্ম্ম ভক্তিমূলক হইলেও, তাহাতেও পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ হইলে পর কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস না লইয়া, কেবল ফলাশা ছাড়িয়া জ্ঞানীপুরুষদিগকেও লোকসংগ্রহার্থ সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে আচরণ করিতে হইবে, জনকমার্গের এই মহৎ তত্ত্বটি বজায় আছে; তাই কর্ম্মদৃষ্টিতে এই দুই মার্গ একই প্রকার অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক কিংবা প্রবৃত্তিমূলক। পরব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ অবতার নর ও নারায়ণ ঋষি এই প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক এবং সেইজন্যই এই ধর্ম্মের প্রাচীন নাম—'নারায়ণীয় ধর্ম্ম'। এই দুই ঋষি পরম জ্ঞানী ও নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেষ্টা ছিলেন এবং নিষ্কাম কর্ম্ম নিজেও করিতেন (মভা. উ. ৪৮. ২১); এবং সেইজন্যই "প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধর্ম্মো নারায়ণাত্মকঃ (মভা. শাং. ৩৪৭. ৮১), কিংবা "প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং ঋষির্নারায়ণোঽব্রবীৎ"—নারায়ন ঋষি-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আমরণ প্রবৃত্তিমূলক (মভা. শাং. ২১৭. ২) মহাভারতে এই ধর্ম্মের এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ভাগবতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, ইহাই সাত্বত কিংবা ভাগবতধর্ম্ম; এবং এই সাত্বত কিংবা মূল ভাগবত ধর্ম্মের স্বরূপ 'নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণ'—অর্থাৎ নিষ্কাম-প্রবৃত্তিমূলক (ভাগ. ১. ৩. ৮ ও ১১. ৪. ৬ দেখ)। এই প্রবৃত্তিমার্গের আর এক নাম ছিল 'যোগ', তাহা "প্রবৃত্তি-লক্ষণো যোগঃ জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণং" অনুগীতার এই শ্লোক হইতে স্পষ্ট দেখা যায় (মভা. অশ্ব. ৪৩. ২৫)। এইজন্যই নারায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণ নরের অবতার অর্জ্জুনকে গীতায় যে ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, গীতাতেই তাহার নাম 'যোগ' উক্ত হইয়াছে। ভাগবত ও স্মার্ত্ত দুই পথ উপাস্য-ভেদপ্রযুক্ত প্রথমে উৎপন্ন হয়, অধুনা কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা। কিন্তু আমাদের মতে এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। কারণ এই দুই মার্গের উপাস্য ভিন্ন হই-লেও উহাদের অন্তর্ভূত অধ্যাত্মজ্ঞান একই। এবং অধ্যাত্ম-জ্ঞানের ভিত্তি একই হইলে এই উচ্চাঙ্গ জ্ঞানে পারদর্শী প্রাচীন জ্ঞানী পুরুষ কেবল উপাস্যভেদের জন্য বিবাদ করিতে বসিবেন ইহা সম্ভব নহে। এই কারণেই, যাহাকেই ভক্তি কর না কেন, সেই ভক্তি একমাত্র পর-মেশ্বরেই গিয়া পৌঁছায় এইরূপ ভগবদ্গীতা (৯. ১৪) ও শিবগীতা (১২. ৪) এই দুই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। যাহারা রুদ্রের ভক্ত তাহারা নারায়ণেরও ভক্ত এবং যাহারা রুদ্রের দ্বেষী তাহারা নারায়ণেরও দ্বেষী,—এইরূপে এই দুই দেবতার অভেদ বর্ণিত হইয়াছে (মভা. শাং. ৩৪১. ২০-২৬ ও ৩৪২. ১২৯ দেখ)। শৈব ও বৈষ্ণব এই ভেদ প্রাচীনকালে ছিল না এ কথা আমি বলি না। কিন্তু স্মার্ত্ত ও ভাগবত এই দুই ভিন্ন পন্থা হইবার পক্ষে, শিব কিংবা বিষ্ণু এই উপাস্যভেদই কারণ নহে; জ্ঞানোত্তর নিবৃত্তি কিংবা প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ত্যাগ করিবে কি করিবে না, এই কেবল ইহারই মহত্বের সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় এই দুই পন্থা প্রথমে উৎপন্ন হয়, ইহাই আমার বলিবার তাৎপর্য্য। পরে, কালক্রমে মূল ভাগবতধর্ম্মের প্রবৃত্তি-মার্গ কিংবা কর্ম্মযোগ লুপ্ত হইয়া তাহাও যখন কেবল বিষ্ণু-ভক্তিমূলক অর্থাৎ বহু-অংশে নিবৃত্তিমূলক আধুনিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল এবং তৎপ্রযুক্ত তোমার দেবতা 'শিব', আমার দেবতা 'বিষ্ণু' এই রকম বৃথাভিমানে মনুষ্যেরা যখন ঝগড়া করিতে লাগিল, তখন 'স্মার্ত্ত' ও 'ভাগবত' শব্দ অনুক্রমে 'শৈব' ও 'বৈষ্ণব' শব্দের সহিত সমানার্থক হইয়া পরিশেষে এই আধুনিক ভাগবতধর্ম্মীদিগের বেদান্ত (দ্বৈত কিংবা বিশিষ্টাদ্বৈত) ভিন্ন হইল এবং বেদান্তেরই ন্যায় জ্যোতিষের রীতিও অর্থাৎ একাদশী করিবার ও কপালে ফোঁটা কাটিবার রীতিও স্মার্ত্তমার্গ হইতে ভিন্ন হইল! কিন্তু এই ভেদ প্রকৃত ভেদ নহে অর্থাৎ মূলগত প্রাচীন ভেদ নহে—ইহা 'স্মার্ত্ত' এই শব্দ হইতেই ব্যক্ত হইতেছে।

ভাগবতধর্ম্ম ভগবানই প্রবর্ত্তিত করায়, তাহার উপাস্য দেবতাও যে শ্রীকৃষ্ণ কিংবা বিষ্ণু, তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু 'স্মার্ত্ত' শব্দের ধাত্বর্থ 'স্মৃত্যুক্ত'—কেবল এটুকুই—হওয়ায় স্মার্ত্তধর্ম্মের উপাস্য দেবতা শিবই হইবেন এরূপ বলা যায় না। কারণ, মন্বাদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে একমাত্র শিবেরই উপাসনা করিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম প্রদত্ত হয় নাই। উল্টা, বিষ্ণুরই অধিক বর্ণনা আছে; কোন কোন স্থানে গণপতি প্রভৃতি উপাস্য দেবতার কথাও উক্ত হইয়াছে। তাছাড়া শিব ও বিষ্ণু এই দুই দেবতা বৈদিক অর্থাৎ বেদেতেই বর্ণিত হওয়ায় ইহাদের মধ্যে একটিকেই স্মার্ত্ত বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে স্মার্ত্তমতের প্রবর্ত্তক বলা হইয়া থাকে। কিন্তু শঙ্করমঠে উপাস্য দেবতা—শারদা এবং শাঙ্করভাষ্যে প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে বলিবার যেখানে যেখানে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানেই শিবলিঙ্গের নির্দ্দেশ না করিয়া শালগ্রামের অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রতিমারই উল্লেখ আচার্য্য করিয়াছেন (বেদ্. শাংভা. ১. ২. ৭; ১. ৩. ১৪ ও ৪. ১. ৩; ছাং. শাংভা. ৮. ১. ১)। সেইরূপ পঞ্চায়তন-পূজাও প্রথমে শঙ্করাচার্য্যই প্রবর্ত্তিত করেন, এইরূপ কথা প্রচলিত আছে। ইহা হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, প্রথম প্রথম স্মার্ত্ত ও ভাগবত পন্থার মধ্যে 'শিবভক্ত' কিংবা 'বিষ্ণুভক্ত' এই সব উপাস্যভেদের কোন ঝগড়া ছিল না; কিন্তু যাঁহার দৃষ্টিতে স্মৃতিগ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আশ্রম-ব্যবস্থানুসারে যৌবনকালে যথাশাস্ত্র সংসার করিবার পর, বার্দ্ধক্যে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চতুর্থাশ্রম কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণ চরম সাধ্য তিনিই স্মার্ত্ত, এবং যিনি ভগবানের উপদেশ অনুসারে জ্ঞান ও উজ্জ্বল ভগবদ্‌ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরণ গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে করিতে হইবে এইরূপ বুঝিয়া থাকেন তিনিই ভাগবত—ইহাই এই দুই শব্দের মূল অর্থ; এবং এই অর্থে এই দুই শব্দ সাংখ্য ও যোগ কিংবা সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই সকল শব্দের সহিত অনুক্রমে সমানার্থক। ভগবানের অবতার-কার্য্যের কথা ধরিয়াই বলো, কিংবা জ্ঞানযুক্ত গার্হস্থ্যধর্ম্মের মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলো, সন্ন্যাসাশ্রম লুপ্তপ্রায় হইয়া কলি-বর্জ্জিতের মধ্যে অর্থাৎ কলিযুগে যে সকল বিষয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাস পরিগণিত হইয়াছিল। *

আবার জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তকেরা কাপিল সাংখ্যের মত স্বীকার করিয়া সংসার হইতে বাহির হইয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ ব্যতীত মোক্ষ নাই এই মত বিশেষরূপে প্রচলিত করেন। স্বয়ং বুদ্ধ ত যৌবনেই রাজ্য ও স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। জৈন ও বৌদ্ধ মত শ্রীশঙ্করাচার্য্য খণ্ডন করিলেও জৈন ও বৌদ্ধেরা যে সন্ন্যাসধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহাই শ্রৌতস্মার্ত্ত সন্ন্যাস বলিয়া আচার্য্য বজায় রাখিয়াছেন এবং সেই জন্য গীতায় সেই সন্ন্যাসধর্ম্মই প্রতিপাদ্য হইয়াছে, গীতার এইরূপ অর্থও তিনি বাহির করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুত গীতা স্মার্ত্তমার্গের গ্রন্থ নহে; সাংখ্য কিংবা সন্ন্যাসমার্গ হইতেই গীতার আরম্ভ হইলেও পরে সিদ্ধান্তপক্ষে প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্ম্মই তাহাতে প্রতিপাদ্য হইয়াছে। ইহা স্বয়ং মহাভারতকারের বচন এবং প্রথম প্রকরণেই আমি তাহা দিয়াছি। এই দুই পন্থাই বৈদিক হওয়ায় সর্ব্বাংশে না হউক বহুলাংশে উভয়ের সমন্বয় করিতে পারা যায়। কিন্তু এইরূপ সমন্বয় করা আলাদা, এবং গীতায় সন্ন্যাসমার্গই প্রতিপাদ্য হইয়াছে, কর্ম্মমার্গকে যদি কোথাও মোক্ষপ্রদ বলা হইয়া থাকে সে শুধু অর্থবাদ কিংবা ফাঁকা স্তুতিমাত্র, এইরূপ বলা আলাদা। রুচিবৈচিত্র্যপ্রযুক্ত ভাগবত ধর্ম্মাপেক্ষা স্মার্ত্তধর্ম্ম কাহার বেশী মিষ্ট লাগিবে না কিংবা কর্ম্মসন্ন্যাসার্থ সাধারণতঃ যে সকল কারণ বলা হইয়া থাকে, তাহাই অধিক বলবত্তর কেহ মনে করিবে না এরূপ কে বলিতে পারে? উদাহরণ যথা—স্মার্ত্ত কিংবা সন্ন্যাসধর্ম্মই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মান্য হওয়ায় অন্য সমস্ত মার্গ তিনি অজ্ঞানমূলক বলিয়া মনে করিতেন, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই জন্যই গীতার ভাবার্থও তাহাই হইবে এইরূপ বলিতে পারা যায় না। গীতার সিদ্ধান্ত তোমার মান্য না হইলে, তুমি তাহা স্বীকার করিও না। কিন্তু সেই জন্য "এই জগতে জীবনের দুই প্রকার স্বতন্ত্র মোক্ষপ্রদ মার্গ কিংবা নিষ্ঠা আছে" এইরূপ যাহা গীতার আরম্ভে উক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ "সন্ন্যাসনিষ্ঠাই একমাত্র প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ মার্গ" করা সঙ্গত নহে। গীতায় বর্ণিত এই দুই মার্গ বৈদিক ধর্ম্মে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ব্ব হইতেই স্বতন্ত্রভাবে চলিয়া আসিয়াছে। তন্মধ্যে জনকের ন্যায় সমাজের ধারণপোষণ করিবার অধিকার ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে, বংশপরম্পরাক্রমে কিংবা নিজ সামর্থ্যে যিনি প্রাপ্ত হইতেন তিনি জ্ঞানলাভের পরেও আপন কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাকিয়া জগতের কল্যাণসাধনেই নিজের সমস্ত জীবিতকাল ক্ষেপণ করিতেন, এইরূপ পাওয়া যায়। সমাজের এই অধিকারের প্রতি দৃষ্টি করিলেই "সুখং জীবন্তি মুনয়ো ভৈক্ষ্যবৃত্তিং সমাশ্রিতাঃ"

* নির্ণয়সিন্ধু তৃতীয় পরিচ্ছেদ, কলিবর্জ্য প্রকরণ দেখ। উহাতে "অগ্নিহোত্রং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্। দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥" এবং "সন্ন্যাসশ্চ ন কর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণেন বিজানতা" ইত্যাদি স্মৃতিবচন প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ,—অগ্নিহোত্র, গোবধ, সন্ন্যাস, শ্রাদ্ধপ্রসঙ্গে মাংস ভক্ষণ ও নিয়োগ, কলিযুগে নিষিদ্ধ। তন্মধ্যে সন্ন্যাসের নিষিদ্ধতাও শ্রীশঙ্করাচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন।

(শাং. ১৭৮. ১১)—অরণ্যবাসী মুনি আনন্দে ভিক্ষাবৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন—আবার, "দণ্ড এব হি রাজেন্দ্র ক্ষত্রধর্ম্মো ন মুণ্ডনম্" (শাং. ২৩. ৪৬)—দণ্ডের দ্বারা লোকের ধারণপোষণ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, মুণ্ডন করিয়া নহে—এইরূপ মহাভারতে অধিকারভেদে দুয়েরই বর্ণনা আছে। কিন্তু ইহা হইতে এমনও বুঝিতে হইবে না যে, কেবল প্রজাপালনের অধিকারী ক্ষত্রিয়েরই তাহার অধিকার হেতুই কর্ম্মযোগ বিহিত ছিল। যাহার যে কর্ম্মে অধিকার আছে, জ্ঞানলাভের পরেও তাহাকে সেই কর্ম্ম করিতে হইবে ইহাই কর্ম্মযোগের উক্ত বচনের প্রকৃত ভাবার্থ; এবং এই কারণেই "এষা পূর্ব্বতরা বৃত্তি র্ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে" (শান্তি. ২৩৭)—জ্ঞানলাভের পর ব্রাহ্মণও আপন অধিকারানুসারে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রাচীন কালে প্রচলিত রাখিতেন—এইরূপ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। মনুস্মৃতিতেও সন্ন্যাসাশ্রমের বদলে সমস্ত বর্ণের পক্ষে বৈদিক কর্ম্মযোগই বিকল্পে বিহিত বলিয়া ধৃত হইয়াছে (মনু. ৬. ৮৬-৯৬)। ভাগবত ধর্ম্ম কেবল ক্ষত্রিয়ের জন্যই, এরূপ কোথাও উক্ত হয় নাই; উল্টা, স্ত্রীশূদ্রাদি সমস্ত লোকের উহা সুলভ এইরূপ তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে (গী. ৯. ৩২)। মহাভারতে তুলাধার (বৈশ্য) ও ব্যাধ (বহেলিয়া) এই ধর্ম্মই আচরণ করিতেন, তাঁহারা ঐ ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ-দিগকেও উপদেশ দিয়াছেন এইরূপ আখ্যায়িকা আছে (শাং. ২৬১; বন. ২১৫)। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আচরণ করিতে অগ্রসর পুরুষদিগের যে সকল উদাহরণ ভাগবত ধর্ম্মগ্রন্থে প্রদত্ত হয় তাহা কেবল জনকশ্রীকৃষ্ণ-আদি ক্ষত্রিয়দেরই নহে—তাহাতে বসিষ্ঠ, জৈগীষব্য ও ব্যাস প্রভৃতি জ্ঞানী পুরুষদিগেরও সমাবেশ করা হইয়া থাকে।

গীতায় কর্ম্মমার্গই প্রতিপাদ্য হইলেও শুধু অর্থাৎ জ্ঞানবর্জ্জিত কর্ম্ম করিবার মার্গকে মোক্ষপ্রদ বলিয়া গীতা স্বীকার করে না এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। এই জ্ঞানবর্জ্জিত কর্ম্ম করিবারও দুই প্রকারভেদ আছে। এক, দম্ভের সহিত কিংবা আসুরী বুদ্ধিতে কর্ম্ম করা এবং অন্যটি শ্রদ্ধার সহিত। তন্মধ্যে দম্ভের মার্গ কিংবা আসুরী মার্গ গীতা (গী. ১৬. ১৬ ও ১৭. ২৮), এবং মীমাংসকেরাও গর্হিত ও নরকপ্রদ বলিয়া স্বীকার করেন; ঋগ্বেদেও অনেক স্থানে শ্রদ্ধার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে (ঋ. ১০. ১৫১; ৯. ১১৩. ২ ও ২. ১২. ৫)। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থাৎ জ্ঞানব্যতীত অথচ শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া কর্ম্ম করিবার মার্গসম্বন্ধে মীমাং-সকেরা বলেন যে, পরমেশ্বর-স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান না হইলেও শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখিয়া কেবল শ্রদ্ধার সহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম আমরণ করিতে থাকিলে শেষে মোক্ষলাভই হয়। মীমাংসকদিগের এই মার্গ, কর্ম্মকাণ্ডরূপে বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে ইহা পূর্ব্ব প্রকরণে বলিয়াছি। বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণ-সমূহে সন্ন্যাসাশ্রম অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া কোথাও উক্ত হয় নাই। বরং, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই মোক্ষলাভ হয় এইরূপ বেদের স্পষ্ট বিধান থাকার কথা জৈমিনি বলেন (বেসূ. ৩. ৪. ১৭-২০ দেখ); তাঁহার এই উক্তি কিছু ভিত্তিহীনও নহে। কারণ, কর্ম্মকাণ্ডের এই প্রাচীন মার্গ গৌণ বলিয়া স্বীকার করা উপনিষদেই প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে দেখা যায়। উপনিষদ্ বৈদিক হইলেও যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী, তাহা উপনিষদের বিষয় প্রতিপাদন হইতেই প্রকাশ পায়। পরমেশ্বরের জ্ঞান তৎপূর্ব্বে হয় নাই এরূপ নহে। হাঁ; মোক্ষলাভের জন্য, জ্ঞানোত্তর বৈরাগ্যের দ্বারা কর্ম্মসন্ন্যাস করা বিধেয়, এই মত উপ-নিষৎকালেই প্রথমে আমলে আসে; এবং তদনন্তর সংহিতা ও ব্রাহ্মণে বর্ণিত কর্ম্মকাণ্ডের গৌণত্ব আসিয়াছে। তৎপূর্ব্বে কর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া মানা হইত। উপনিষদের কালে বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞানের অর্থাৎ সন্ন্যাসমার্গের এইরূপ প্রাধান্য হইলে, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রতি কিংবা চাতুর্বর্ণ্য-ধর্ম্মেরও প্রতি জ্ঞানীপুরুষ উপেক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং সেই অবধিই লোকসংগ্রহ করা আমাদের কর্ত্তব্য এই ধারণা মন্দীভূত হইল। স্মৃতিকারেরা স্ব স্ব গ্রন্থে, গৃহ-স্থাশ্রমে যাগযজ্ঞাদি শ্রৌত কিংবা চাতুর্বর্ণ্যের স্মার্ত্তকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, এইরূপ বলিয়া গৃহস্থাশ্রমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু স্মৃতিকারদিগের মতেও শেষে বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসাশ্রম শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, উপনিষদের জ্ঞান-প্রভাবে কর্ম্মকাণ্ডের যে গৌণত্ব আসিয়াছিল, সেই গৌণত্ব স্মৃতিকারদিগের আশ্রমব্যবস্থায় হ্রাস হইতে পারে নাই। এই অবস্থায়, জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড ইহাদের মধ্যে কাহা-কেই গৌণত্ব না দিয়া, ভক্তির সহিত এই দুয়েরই সমন্বয় করিবার জন্য গীতা প্রবৃত্ত হইলেন। জ্ঞানব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না এবং যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা বড়জোর স্বর্গ-প্রাপ্তি হয়, উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত গীতার মান্য (মুণ্ড. ১. ২. ১০; গী. ২. ৪১-৪৫)। কিন্তু ইহাও গীতার সিদ্ধান্ত যে, সৃষ্টিক্রম চলিত রাখিতে হইলে যজ্ঞ কিংবা কর্ম্মচক্রও বজায় রাখা আবশ্যক, যখনই হউক না কেন কর্ম্মত্যাগ করা পাগ্‌লামি বা মূর্খতা। তাই যাগযজ্ঞাদি শ্রৌত কিংবা চাতুর্বর্ণ্যাদি ব্যবহারিক কর্ম্ম অজ্ঞানপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত না করিয়া জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া কর; তাহা হইলে এই চক্রও বিশৃঙ্খলিত হইবে না, এবং তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধকও হইবে না, এইরূপ গীতার উপদেশ। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের

(অর্থাৎ সন্ন্যাস ও কর্ম্মের) সমন্বয় করিবার গীতার এই নৈপুণ্য স্মৃতিকারদিগের অপেক্ষা যে অধিক সরস তাহা আর বলিতে হইবে না। কারণ, ব্যষ্টিরূপ আত্মার কল্যাণ একটুও কম না করিয়া তাহার সঙ্গে জগতের সমষ্টিরূপ আত্মার কল্যাণও গীতামার্গের দ্বারা সংসাধিত হয়। কর্ম্ম অনাদি ও বেদপ্রতিপাদিত হওয়ায় তোমার জ্ঞান না হইলেও শ্রদ্ধার সহিত তাহা করাই আবশ্যক, এইরূপ মীমাংসক বলেন। অনেকগুলি উপনিষৎকার (সকলে নহে) কর্ম্মকে গৌণ স্থির করিয়া, বৈরাগ্যের দ্বারা তাহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য এইরূপ বলেন; কিংবা নিদানপক্ষে তাঁহাদের সেই দিকে ঝোঁক্ এইরূপ মানিতে বাধা নাই। এবং পূর্ব্বাশ্রমে এই সকল কর্ম্ম করিতে থাকিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে পর বার্দ্ধক্যে বৈরাগ্যের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইবে, স্মৃতিকার বয়োভেদ অর্থাৎ আশ্রমব্যবস্থা দ্বারা উক্ত দুই মতের এইরূপ সমন্বয় করেন। কিন্তু গীতার পন্থা এই তিন পন্থা হইতে ভিন্ন। জ্ঞান ও কাম্যকর্ম্মের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও, জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে বিরোধ নাই; তাই, নিষ্কামবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বদা করিয়া যাও, তাহা কখনও ছাড়িও না, এইরূপ গীতা বলিয়াছেন। এখন এই চারি মতের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মের আবশ্যকতা আছে এই মত সকলেরই মান্য। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল স্বর্গ ছাড়া আর কিছু নহে, এইরূপ উপনিষদ ও গীতায় উক্ত হইয়াছে। ইহার পরে অর্থাৎ জ্ঞান-লাভ হইলে পর কর্ম্ম করিবে কি করিবে না এই সম্বন্ধে উপনিষৎকার-দিগের মধ্যেও মতভেদ আছে। জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কাম্যবুদ্ধির হ্রাস হইলে পর যে ব্যক্তি মোক্ষের অধি-কারী হইয়াছেন তাঁহার কেবল স্বর্গপ্রাপ্তিকর কাম্য কর্ম্ম করিবার কোন প্রয়োজনই থাকে না এইরূপ কোন কোন উপনিষৎকার বলেন; কিন্তু ঈশাবাস্যাদি অন্য কতক-গুলি উপনিষৎ, মৃত্যুলোকের ব্যবহার চালাইবার জন্য কর্ম্ম করাই আবশ্যক, এইরূপ প্রতিপাদন করি-য়াছেন। উপনিষদে বর্ণিত এই দুই মার্গের মধ্যে দ্বিতীয় মার্গই গীতার প্রতিপাদ্য, ইহা স্পষ্ট দেখা যায় (গী ৫.২)। কিন্তু মোক্ষের অধিকারী জ্ঞানী পুরুষ লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কামবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিবেক এই-রূপ বলিলেও যে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের স্বর্গপ্রাপ্তি ছাড়া অন্য কোন ফল নাই সেই কর্ম্ম তিনি কেনই করিবেন এই সন্দেহ এই স্থানে স্বভাবতই উপস্থিত হয়। তাই ঐ সন্দেহও ১৮শ অধ্যায়ের আরম্ভে উপস্থিত করিয়া, "যজ্ঞ, দান, তপ" প্রভৃতি কর্ম্ম সর্ব্বদাই চিত্তশুদ্ধিকারক অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধি উৎপাদক ও বর্দ্ধক হওয়া প্রযুক্ত "এই সকল কর্ম্মও" (এতান্যপি) অন্য নিষ্কাম কর্ম্মেরই ন্যায় লোকসংগ্রহার্থ, ফলাশা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া জ্ঞানী-পুরুষের নিয়ত করা কর্ত্তব্য এইরূপ ভগবান্ স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (গী. ১৮.৬)। পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম এইরূপ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাকিলে, ব্যাপকার্থে ইহাই এক বড়-রকমের যজ্ঞ হয়; এবং তাহার পর, এই যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধনস্বরূপ হয় না (গী. ৪.২৩); কিন্তু সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, যজ্ঞ হইতে স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ যে বন্ধনাত্মক ফল পাইবার কথা ছিল তাহাও পাওয়া যায় না, এবং এই সকল কর্ম্ম মোক্ষের অন্তরায় হইতে পারে না। মোদ্দা কথা, মীমাংসকদিগের কর্ম্মকাণ্ড গীতায় বজায় রাখা হইলেও এরূপ কৌশলে বজায় রাখা হইয়াছে যে তাহার দরুন স্বর্গে গমনাগমন না ঘটিয়া সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় শেষে মোক্ষলাভ না হইয়া যায় না। মীমাংসকদিগের কর্ম্মমার্গ এবং গীতার কর্ম্মযোগ ইহাদের মধ্যে এই গুরুতর ভেদ আছে, দুই এক নহে, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

ভগবদ্গীতায় প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্ম্ম কিংবা কর্ম্ম-যোগই প্রতিপাদ্য, এবং এই কর্ম্মযোগে ও মীমাংসক-দিগের কর্ম্মকাণ্ডে কি প্রভেদ তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে গীতার কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানকাণ্ডকে ধরিয়া স্মৃতিকার-দিগের বর্ণিত আশ্রমব্যবস্থার মধ্যে প্রভেদ কি, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তাহার একটু বিচার করিব। এই ভেদ অতীব সূক্ষ্ম এবং বাস্তবিক বলিতে হইলে এই সম্বন্ধে বাদবিতণ্ডা করিবার কোন কারণও নাই। জ্ঞানলাভ হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধির জন্য, প্রথম দুই আশ্রমের (ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ) কার্য্য সকলেরই করা কর্ত্তব্য ইহা উভয় পক্ষেরই মান্য। পূর্ণ জ্ঞান হইলে পর কর্ম্ম করিবেক কিংবা সন্ন্যাস লইবেক এইটুকুই যা মতভেদ। কিন্তু এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ প্রায় অল্পই দেখা যায়; তাই, এই অল্পজ্ঞানী লোকের কর্ম্ম করা বা না করা একই, সে সম্বন্ধে বিশেষ দাপাদাপি করিবার আবশ্যকতা নাই, এইরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কিন্তু এ কথা বলা ঠিক নহে। কারণ জ্ঞানী পুরুষের আচরণ অন্য সমস্ত লোক প্রমাণ বলিয়া মানায় এবং চরমে যাহা সাধ্য সেই অনুসারে মনুষ্য প্রথম হইতেই আপন আচরণের গতিপথ নির্দ্ধারণ করা প্রযুক্ত 'জ্ঞানী পুরুষের কি করা কর্ত্তব্য' এই প্রশ্ন লৌকিক দৃষ্টিতে একটা বড় প্রশ্ন বলিয়া ধরা হয়। স্মৃতিগ্রন্থে জ্ঞানীপুরুষ শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেক ইহা বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু স্মার্ত্তমার্গেরই ন্যায় এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে তাহা উপরে বলা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক উপদেশ

করিয়াছেন ; কিন্তু "তুমি এখন রাজ্য ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কর" এরূপ তিনি জনককে কোথাও বলেন নাই। বরং যে জ্ঞানী পুরুষ জ্ঞানোত্তর সংসার ত্যাগ করেন, সংসার তাঁর ভাল লাগে না (ন কাময়ন্তে) বলিয়াই তিনি ত্যাগ করেন—এইরূপ বলিয়াছেন (বৃ. ৪. ৪. ২২)। ইহা হইতে বৃহদারণ্যকের অভিপ্রায় এইরূপ প্রকাশ পায় যে, জ্ঞানোত্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করা বা না করা প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন—অর্থাৎ বৈকল্পিক, ব্রহ্মজ্ঞান ও সন্ন্যাসের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ নাই। এবং বেদান্তসূত্রে বৃহদারণ্যক-উপনিষদের এই বচনের অর্থ ঐরূপই করা হইয়াছে (বেসূ. ৩. ৪. ১৫)। জ্ঞানোত্তর কর্ম্মসন্ন্যাস ব্যতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে না, ইহা শঙ্করাচার্য্যের স্থির সিদ্ধান্ত ; এবং সমস্ত উপনিষদ এই সিদ্ধান্তের অনুকূল এইরূপ দেখাইবার জন্য আপন ভাষ্যে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি জনকাদির ন্যায় জ্ঞানোত্তরও যথাধিকার আমরণ কর্ম্ম করিবার কোন বাধা নাই এইরূপ শ্রীশঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন (বেসূ. শাংভা. ৩. ৩. ৩২ ; এবং গী. শাংভা. ২. ১১ ও ৩. ২০ দেখ)। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, সন্ন্যাস কিম্বা স্মার্তমার্গেও জ্ঞানোত্তর কর্ম্ম সম্পূর্ণই ত্যাজ্য বলা হয় না ; কোন কোন জ্ঞানী পুরুষকে ব্যতিক্রমস্থল মানিয়া, এই মার্গেও যথাধিকার কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা দেওয়া যায়। এই ব্যতিক্রমের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়া চাতুর্বর্ণ্যবিহিত কর্ম্ম জ্ঞানলাভ হইবার পরেও লোকসংগ্রহার্থ কর্ত্তব্য বলিয়া নিষ্কামবুদ্ধিতে প্রত্যেক জ্ঞানী পুরুষের করা কর্ত্তব্য এইরূপ গীতা বলেন। তাই, গীতাধর্ম্ম ব্যাপক হইলেও তাহার তত্ত্ব সন্ন্যাসমার্গীয়দিগের দৃষ্টিতেও নির্দ্দোষ এইরূপ সিদ্ধ হয় ; এবং বেদান্তসূত্র স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহাতেও জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগ সন্ন্যাসের বিকল্প বলিয়া গৃহীত হইয়াছে (বেসূ. ৩. ৪. ২৬ ; ৩. ৪. ৩২-৩৫)।* নিষ্কামবুদ্ধিতে হউক বা না হউক, যদি আমরণ কর্ম্মই করিতে হয় তবে স্মৃতিগ্রন্থে কথিত কর্ম্মত্যাগরূপ চতুর্থাশ্রম কিংবা সন্ন্যাসাশ্রমের কি অবস্থা হইবে তাহা এক্ষণে বলা আবশ্যক। ভগবান কখন-না-কখন কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না এইরূপ বলিবেনই, এবং তখন ভগবানের মুখেই যুদ্ধ ছাড়িয়া দিবার পক্ষে আমার স্বাধীনতা পাইব, এইরূপ অর্জ্জুনের মনে হইয়াছিল। কিন্তু যখন অর্জ্জুন দেখিলেন যে, ১৭শ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ভগবান কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের একটি কথাও বলিলেন না, ফলের আশা ত্যাগ কর, সর্ব্বক্ষণ এই উপদেশই করিলেন, তখন ১৮শ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করিলেন—"তবে, সন্ন্যাস ও ত্যাগের ভেদ কি তাহা আমাকে বলো"। অর্জ্জুনকে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময়, ভগবান বলিতেছেন, "অর্জ্জুন, এতক্ষণ তোমাকে যে কর্ম্মযোগের কথা বলিয়াছি তাহার মধ্যে সন্ন্যাস নাই এরূপ যদি তোমার ধারণা হয় তবে তাহা ভুল। কর্ম্মযোগী পুরুষ সমস্ত কর্ম্মের 'কাম্য' অর্থাৎ আসক্তবুদ্ধিতে কৃত এবং 'নিষ্কাম' অর্থাৎ আসক্তি ছাড়িয়া কৃত এই দুই ভেদ করেন। (ইহাকেই মনুস্মৃতি ২৩. ৮৯-এ অনুক্রমে 'প্রবৃত্ত' ও 'নিবৃত্ত' কর্ম্ম—নাম দিয়াছেন)। তন্মধ্যে 'কাম্য' বর্গের যে সকল কর্ম্ম সেই সমস্ত কর্ম্ম কর্ম্মযোগী একেবারেই ত্যাগ করেন, অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্মের 'সন্ন্যাস' করেন। বাকী রহিল নিষ্কাম কিংবা নিবৃত্ত কর্ম্ম। এই নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ম্মযোগী করেনই তো ; কিন্তু সেই সমস্তের মধ্যে তিনি ফলাশা সর্ব্বথাই ত্যাগ করিয়া থাকেন। সারকথা, কর্ম্মযোগ মার্গেও 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ' হইতে অব্যাহতি হইল কৈ ? স্মার্তমার্গী স্বরূপতঃ কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া থাকেন, আবার, কর্ম্মমার্গের যোগী তাহা না করিয়া কর্ম্মের ফলাশা সন্ন্যাস করেন। সন্ন্যাস দুই পক্ষেই বজায় আছে (গী. ১৮. ১-৬ ; এই সম্বন্ধে আমার টীকা দেখ)। অধিক কি, সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরে অর্পণপুর্ব্বক নিষ্কামবুদ্ধিতে যিনি করেন, তিনি গৃহস্থাশ্রমী হইলেও 'নিত্যসন্ন্যাসীই' বলিতে হইবে (গী. ৫. ৩), ইহাই ভাগবত ধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্ব ; এবং এই তত্ত্বই ভাগবত পুরাণেও সমস্ত আশ্রমধর্ম্মের কথা প্রথমে বলিয়া, শেষে নারদ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ করিয়াছেন। বামন পণ্ডিত গীতাসম্বন্ধীয় আপন টীকায় অর্থাৎ যথার্থদীপিকায় (১৮. ২) যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে "শিখা বোড়ুনী তোড়িলা দোরা' কিংবা মুণ্ডিতমস্তকে হস্তে দণ্ড গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা মাগিতে লাগিল, অথবা সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া বাস করিল, এইরূপ করিলেই যে সন্ন্যাস হয় তাহা নহে। সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য বুদ্ধির ধর্ম্ম ; বুদ্ধির অর্থাৎ জ্ঞানের ধর্ম্ম নহে, দণ্ড আদিরই ধর্ম্ম যদি বলো তবে যে ব্যক্তি রাজচ্ছত্র কিংবা ছত্রদণ্ড হস্তে ধারণ করে তাহারাও সন্ন্যাসগ্রহণের মোক্ষলাভ করিবে ;

ত্রিদণ্ডাদিষু যদাস্তি মোক্ষো জ্ঞানে ন কস্যচিৎ।
ছত্রাদিষু কথং ন স্যাৎ তুল্যহেতৌ পরিগ্রহে॥

এইরূপ জনক-সুলভ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে (শাং. ৩২০. ৪২)। কারণ, হস্তে দণ্ডপরিগ্রহে এই মোক্ষের হেতু উভয় স্থানে একই। তাৎপর্য্য,—কায়িক, বাচিক ও মানসিক সংযমই প্রকৃত ত্রিদণ্ড (মনু. ১২. ১০) ; এবং কাম্যবুদ্ধির

* বেদান্তসূত্রের এই অধিকরণের অর্থ শাঙ্করভাষ্যে একটু ভিন্নরূপে করা হইয়াছে। কিন্তু বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি (৩. ৪. ৩২) ইহার অর্থ আমাদের মতে, "জ্ঞানীপুরুষ আশ্রমকর্ম্মও করিলেও উত্তম, কারণ ইহা বিহিত"। মোদ্দাকথা, জ্ঞানীপুরুষ কর্ম্ম করুন বা না করুন, এই দুই পক্ষই আমার মতে বেদান্তসূত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস (গী· ১৮. ২); এবং ভাগবতধর্ম্মে উহা হইতে যেরূপ নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না (গী. ৬. ২) সেইরূপ বুদ্ধি স্থির রাখিবার কর্ম্ম কিংবা ভোজনাদি কর্ম্ম হইতেও সাংখ্য মার্গে শেষ পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পাওয়া যায়ই না। আবার ত্রিদণ্ডী কিংবা কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস কর্ম্মযোগমার্গে নাই বলিয়া ঐ মার্গ স্মৃতিবিরুদ্ধ কিংবা ত্যাজ্য, এইরূপ বৃথা সন্দেহ করিয়া গেরুয়া বস্ত্র কিংবা সাদা বস্ত্রের জন্য ঝগড়া করিতে বসায় লাভ কি ?

পরম সুখ।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

পরম সুখ—সে পেয়েছি গো,
তোমায় ভালবেসে বঁধু
তোমায় ভালবেসে।
সুধা নিঝর পিয়েছি গো
তোমায় ভালবেসে বঁধু
তোমায় ভালবেসে।
সকাল বেলায় হেরি তব আলো,
সকল গগন উচ্ছ্বসিয়া ঢালো,—
সন্ধ্যাবেলা সাঁঝের পুষ্পরূপে
তারা হয়ে ফোট চুপে চুপে ;
জীবন আমার সার্থক এই
তোমায় ভালবেসে বঁধু
তোমায় ভালবেসে।
সকাল সাঁঝে শুনি পাখীর গান
পাষাণ-বুকে নির্ঝরিণীর তান
সারা আকাশ যে গো গাহে তব নাম
ফুলে ফুলে দুলে বেড়ায় গান।
ধন্য হ'ল জীবন আমার
তোমায় ভালবেসে বঁধু
তোমায় ভালবেসে।
সুন্দর এই লাগে জীবনখানি
আসন তব বক্ষতলে টানি ;—
তুমিও যে খুসী মনে জানি
আছ ঘরে পরম ভাগ্য মানি।
ধন্য আমি—ধন্য তুমি
তোমায় ভালবেসে বঁধু
তোমায় ভালবেসে॥

রাণাডের-স্মৃতিকথা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

খৃষ্টাব্দ ১৯০০ সেপ্টেম্বর মাস।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

শেষ বৎসর—লাহোরের কংগ্রেস্।

সম্প্রতি অক্টোবর মাস হইতে ওঁর মনের অবস্থা অন্য প্রকার হইয়াছিল। অগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এই তিন মাসের মধ্যে নিজের রোগসম্বন্ধে ওঁর যে ভাবনা হইয়াছিল,—এই রোগ কি করিয়া উৎপন্ন হইল, কি ঔষধে ভাল হইবে, এই সম্বন্ধে নিজের অনুমান কি ? ডাক্তাররা কি বলেন প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিদিনই বলা-কওয়া করিতেন। তাহাতে ভাবনা চিন্তা ও অনুসন্ধানের চেষ্টা বুঝা যাইত। কিন্তু উদাসীনতা কিংবা নিরাশা দেখা যাইত না। তখনও নিত্যানুসারে কাজ কর্ম্মে সমস্ত সময় কাটিত। কিন্তু যে সময় মন কাজে নিমগ্ন থাকিত, তখন বাড়ীর কিংবা বাহিরের কোন লোক আসিলেও কাজ এক দিকে রাখিয়া কিংবা বন্ধ করিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে বসিতেন না। লেখা কিংবা পড়া যাহা চলিতেছিল তাহাই চলিত। তাহার মধ্যেই, একবার "বোসো" বলিতেন এবং মধ্যে মধ্যে কথা বল, আমি শুনিতেছি—এই ভাবে তাহার দিকে চাহিতেন; অথবা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে কোন কথা বলা আবশ্যক হইলে, কথা আবার আরম্ভ হইত। এই ভাবে দুই কাজই চলিত। বাড়ীর লোক কেহ উপরে গেলে—"কেও এলে ? কি কাজ আছে ?" এই-রূপ জিজ্ঞাসা করিতেন। অল্প কথাই কহিতেন। এবং আজকাল সব উল্টা মনে হইতে লাগিল। আজকাল রোগসম্বন্ধে ভাবনার কোন কথাই বলিতেন না। অন্য কেহ রোগসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, শুধু বলি-তেন, "এখনও চল্‌চে। কখনও ভাল কখনও মন্দ। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধিও থাকে—তাতে কি ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ কর্ম্মে মন নিমগ্ন থাকে, ততক্ষণ কোন কিছুই মনে হয় না। ঔষধ ত চল্‌চে, বোধ হয় আর কিছু দিন পরে বল্‌তে পারব ভাল হয়েছে। এখন যে কষ্ট-যন্ত্রণা হবে তা নীরবে সহ্য করতে হবে"। যতটা পারেন অন্যকে জানিতে দিবেন না এইরূপ তাঁর সঙ্কল্প হইয়াছে মনে হইল। সমস্ত দিন লেখা পড়া নিত্যানুসারে সমান চলিত, একটুও সময় নষ্ট হইতে দিতেন না। সমস্ত দিন এক জায়গায় সমান বসিয়া থাকায় কিংবা বুকের ব্যামোর দরুণ সন্ধ্যাকালে হাত-পা ব্যথা করিলে কিংবা পিঠে টান ধরিলে তখনও পড়া বন্ধ করিতেন না।

বেশী ব্যথা করিলে বলিতেন "ঐ জায়গাটা টিপে দেও, কিংবা মালীস কর"। কোন কোন দিন বুকে খুব ব্যথা, হইত এবং হাত-পায়ে টান্ ধরিত। তবু এই কষ্টের মধ্যেও বাহিরে কিছুই দেখাইতেন না, নীরবে সহ্য করিতেন এবং মনকে শান্ত রাখিতেন। আমি পা কিংবা পিঠ টিপিয়া দিবার জন্য যখন নিকটে বসিতাম তখন শরীরসম্বন্ধে যদি কিছু বলিতাম, তবে দুই চারবার জিজ্ঞাসা করিবার পর কোন বিষয়ের এড়ানো রকমের উত্তর দিতেন, আর তা না হইলে, পড়িবার ঝোঁকে শুনিতে পান নাই এইরূপ ভাব দেখাইতেন। পাঠ চলিবার সময়েও মন সমস্তক্ষণ কোন গম্ভীর ও গভীর বিষয়ে নিমগ্ন থাকিত। তথাপি মন শান্ত আছে এইরূপ দেখা যাইত। মানসিক শক্তির সম্মুখে শারীরিক ব্যথা থাকিতে দিবেন না এইরূপ যেন একটা কিছু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন বলিয়া বারংবার মনে হইত। শুধু বিছানায় শুইলে এই নিয়ম আর থাকিত না। তখন ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বলিতেন, "অমুক জায়গায় বেশী ব্যথা করচে, টিপে দেও, শেক্ দেও, কিংবা মালীস কর" এই টেপা কিংবা মালীশের আরামে কখন কখন ঘুম আসিত এবং ৩।৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঘুম হইত। কখন কখন আদৌ ঘুম আসিত না, সেই সময় কেবল বিছানায় চুপ্ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া যেন ঘুম আসিয়াছে এইরূপ দেখাইতেন। তাহার কারণ, যে লোক নিকটে বসিয়া আছে সে না জাগিয়া থাকে। আমার ঘুম আসিয়াছে মনে করিলে দুই এক ঘণ্টা সেও ঘুমাইতে পারিবে। এই ভাবে তিন কিংবা চার ঘণ্টা মাঝে মাঝে ঘুম হইত। তবু সকালে ঠিক্ উঠিতেন। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া নিত্যক্রম অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিতেন।

ছুটি লইবার পর হইতে ৪।৫ দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা দুই এক ঘণ্টা সবাই এক জায়গায় গল্প করিতে বসিতাম। এই সময় উনি সহজভাবে যে এক একটা কথা বলিতেন, তাহার গম্ভীর অর্থ থাকিত; সেই প্রত্যেক বাক্য হইতে, যে শুনিত সে উপদেশ পাইত। আজকাল উদ্বেগ কিংবা নিরাশার কোন কথা বলিতেন না। সাহসের সহিত বলিতেন, 'রোগের জন্য কোন ভয় নাই এইরূপ দেখাইতেন। ছেলেদের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতেন ও হাসিতেন। এইরূপ চলিত সত্য, কিন্তু এই সমস্ত বাহিকভাবে আমাদের ভাল লাগাইবার জন্যই করা হইতেছে, এইরূপ আমার মনে হইয়া আমার ভাল লাগিত না। এই ভাবে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। ১৪ তারিখে সকাল বেলায় দুই পা খুব ফুলিয়া উঠিয়াছে মনে হইল। রোজকার মতো দুই তিন জন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেল। তাহাদের সকলকেই এইরূপ ফুলিয়া উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তাঁহারা বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে কোন ভাবনা নাই। দুর্ব্বলতার দরুন রক্ত সমানভাবে নীচের দিকে নামচে না এই মাত্র।" তবু ১৪ তারিখের সমস্ত দিনটা আমাদের ভাবনায়-ভাবনায় গেল। রাত্রে খাবার পর, আধ ঘণ্টা পড়া হইল। রোজকার মতো ঔষধী তৈল আমি যখন গায়ে মাখাইতেছিলাম, সেই সময় ছেলেরা গান করিতেছিল এবং ননদও কবির ও মীরা-বাইর ভক্তিপর পদাবলী আবৃত্তি করিতেছিলেন। তখনই ঘড়িতে ১০॥০ টা বাজিল এবং নিত্যানুসারে খেচুনী হইতে আরম্ভ হইল। ১৫।২০ মিনিট্ হইয়া গেল তবু হাই কিংবা হাঁচি হইল না। দুই তিন জন লোক জোরে পাখার বাতাস করিতে লাগিল কিন্তু তবু সোয়াস্তি বোধ হইল না। প্রাণ যেন আরও হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় গন্ধ আঘ্রাণ করিবার জন্য ডাক্তার এক প্রকার লম্বাটে গুলি রাখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে এক-একটা রুমালের ভিতর দিয়া তাহাই শোঁকানো হইল। দুই তিন গুলি আঘ্রাণ করাইবার পর, একটা হাঁচি হইল এবং দুই তিনটা হাই উঠিল, তারপর রোগটা থামিয়া গেল। প্রতিদিন এই সময়টা চলিয়া গেলে পর, আজকের দিনটা পার পাওয়া গেল—এইরূপ মনে হইয়া আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতাম। ওঁর যেরূপ এই ব্যামোটা মারাত্মক বলিয়া মনে হইত, আমি সেরূপ মনে করিতাম না। ভিতরে ভিতরে আমার ভয় ছিল তথাপি ঈশ্বর নিজ ভক্তদিগকে অত্যন্ত সঙ্কটে ফেলিয়া তারপর সেই ঘোর সঙ্কট হইতে তাহাকে মুক্ত করেন এইরূপ তাঁহার যে-সহজ লীলার কথা আমরা পাঠ করি কিংবা শুনিতে পাই, ইহাও একটা সেই লীলা নয় কি? করমালির ভয়ঙ্কর পীড়া হইতে তিনি রক্ষা করিয়াছেন, এখন কি তিনি উপেক্ষা করিবেন? ইহা কখনই সম্ভব নহে, এইরূপ আমার দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায়, এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটে আমাকে ফেলিবেন না এবং এই রোগ ভাল হইবে এইরূপ শেষ পর্য্যন্ত আমার আশা ছিল।

এইরূপ সেই রাত্রিতে ৩টা ৩॥০টা পর্য্যন্ত নিদ্রা হইল না। তারপর, ওঁর নিদ্রা আসিল। তাই আমিও এখন ঘণ্টাখানেক শুইব বলিয়া মনে করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে ননদ আসিলেন এবং বলিলেন,—"কিগো, কিছু ঘুমটুম হয়েছিল কি? রাত্রে বেশী কষ্ট হয়নি ত?" আমি বলিলাম, কষ্ট বেশী কিছু হয়নি; কিন্তু রাত্রির খেচুনীটা রোজকার চেয়ে জোরে এসেছিল এবং অনেকক্ষণ ছিল। উনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ৩টা ৩॥০টা পর্য্যন্ত আদপেই ঘুম হয় নি। আজ বড় পাখাটা

সমান চলচে। আজ ঐ সব লোকেরা ঘুমতে পায়নি। আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ওঁর ঘুম এসেছে।” তখন ননদ বলিলেন,—“তুমি এখন বসে থেকো না। ছেলেদের খাটে গিয়ে ঘণ্টাখানেক শোওগে। এখন যাও। বোসো না। আমি এইখানে বসচি। নীচে যাচ্ছিনে। তুমি শান্ত-মনে ঘণ্টাখানেক শুয়ে থাক।” এই কথা শুনিয়া আমি উঠিলাম এবং ওদিকে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। প্রথমে আধ ঘণ্টা পৌনে আধ ঘণ্টা ঘুম হইল; কিন্তু আমাকে যেন কে ডাকিতেছে এইরূপ মনে হওয়ায় আমি ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম, তখন ফর্সা হইয়াছে। তাই উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া, ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া, ওঁর খাটের কাছে গেলাম; ঠিক সেই সময় ওঁর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, উনি চোখ খুলিয়াছেন :এবং আস্তে আস্তে নিত্যকার শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন। মুখ নিস্তেজ হইয়াছে এবং তাহাতে একটা ক্লান্তির ভাব আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল। ইহা দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া গেল, আমি ওঁর পায়ের দিকে গিয়া কাপড় টানিয়া দিবার ওছিলা করিয়া ওঁর দুই পা দেখিয়া লইলাম। গত দুই দিন অপেক্ষা আজ দু-পাই বেশী ফুলিয়াছে মনে হইল। ইহা দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। হাত-পা কাঁপিতে লাগিল এবং বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। তথাপি আমি সেই ভাবেই পিঠের দিকে বসিয়া পিঠ ও পা টিপিতে লাগিলাম। তাহাতে ওঁর একটু ভাল মনে হইল এবং তখনি উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া নিত্যানুসারে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন এবং যে ছেলেরা ওঁকে পুস্তকাদি পড়িয়া শুনাইত, তাহাদের পড়া আরম্ভ হইল। প্রায় ১০॥০টা পর্য্যন্ত এই কাজ হইবার পর স্নান করিতে উঠিলেন। স্নানের সময় আমি ছিলাম। ওঁর নজর সহজে পায়ের দিকে পড়ায় আমাকে বলিলেন—“আজ কি ফুলোটা বেশী হয়েছে?” আমি বলিলাম—“তা কিছু না। একস্থানে অনেকক্ষণ বসে থাকায় পায়ে ভার বোধ হচ্চে। খাইতে বসিয়া ননদকে আবার বলিলেন,—“ফুলোটা বেশী হয়েছে”, তখন ননদ বলিলেন,—“আর ডাক্তারের ঔষধ খেয়ে কাজ নেই। তাদের নাড়ীজ্ঞান মূলেই নেই, কেবল নল লাগিয়ে ওরা কি বুঝবে? এটা ব্যামোরই একটা লক্ষণ। কাজ-কর্ম্ম একটু কম করবে। সমস্ত দিন পড়া শুনা করতে কি বিরক্তি বোধ হয় না? কিছুদিন বিশ্রাম করেই দেখ না।” ননদের এই কথা শুনিয়া উনি কিছুক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না। খাওয়া চলিতেছিল, কিন্তু সেদিকেও লক্ষ্য ছিল না। গ্রাস মুখের মধ্যে না গিয়া, হাতের গ্রাস খানিকক্ষণ হাতেই থাকিত; একবার হাত উঠাইতেন, আবার নীচে নামাইয়া রাখিতেন। “এই জিনিসটা কাছে নিয়ে এসো; ও-জিনিসটা দূরে সরিয়ে রাখো।” অশান্তভাবে সময় কাটিত। মন কোন এক বিষয়ে নিমগ্ন ছিল নিশ্চয়। ইহা ননদও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যা-হয় একটা কিছু বলিবার হিসাবে ননদ বলিলেন—“এখন মহাবলেশ্বরে যাবে ত? সেখানে গেলেই সব ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু কাজকর্ম্ম, পড়াশুনা প্রভৃতি বেশী করলে চলবে না। ডাক্তারের কথামতো চুপচাপ করে শুয়ে থাকলে ভাল মনে হবে, কিন্তু এখানকার মতো চল্লে, কোথাও যাওয়া না যাওয়া সমান।” এইরূপ বলিয়া ননদ চুপ করিয়া রহিলেন। তখন উনি বলিলেন—“কে জানে তোমার কি বিশ্বাস; আমার ত মধ্যে মধ্যে এই সম্বন্ধে আশ্চর্য্য মনে হয়। তোমরা কি মনে করচ আমি শুধু জেদ্ করে, জেনে বুঝে রোগটাকে বাড়িয়েছি? তোমার দোষ না থাকে এই এক, আর-এক, যত দিন মানুষের আয়ু থাকে সেই পর্য্যন্ত কাজকর্ম্ম করতে পারা—এই দুই উদ্দেশে রাত্রিদিন যে কোন ঔষধ দেবে তাই আমি গ্রহণ করচি। নৈলে, ঔষধ ও ডাক্তারে কি করবে? তীব্র ব্যথা কম করবার তারা সাধন ও যন্ত্র মাত্র, এই টুকুই সত্য জানবে। এটা কি তোমরা বুঝতে পার না? ইনিও আমাকে যখন তখন বলেন কি না—বিশ্রাম লও, বিশ্রাম লও; বিশ্রামের মানে কি? তার মধ্যে মন সুখ পায়, শান্তি পায়, ছোট খাটো বেদনা সহজে ভুলে যায়—যাতে অভ্যস্ত ও যাতে আমোদ পাওয়া যায় সেই পড়াশুনার কাজ ছেড়ে দিলে কি বিশ্রাম পাওয়া যায়? বিশ্রাম হচ্চে মনে করে, নিরর্থক বসে থেকে যাদের সুখ হয়, তারা সে সুখ ভোগ করুক। হাতে কোন কাজ নেই, কেবল পড়ে থেকে নিরর্থক জীবন যদি কাটাতে হয়, তা হলে সে জীবন এখনি শেষ হলে কোন ক্ষতি নেই এইরূপ মানুষের মনে হয়।” এইরূপ বলিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন এবং সকলের খাওয়া হইয়াছে কি না তাহা দেখিয়া বলিলেন—“তোমরা ওঠো, আমারও হয়েছে।” এইরূপ বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া এবং অকারণে হাসিবার ভাবে হাসিয়া বলিলেন, আজ তোমার রান্না মন লাগিয়ে খাওয়া যায় এরূপ হয় নি। তাতে আজ আমার ক্ষিধেও হয় নি;” আমি কোন উত্তর দিলাম না। কারণ এতক্ষণ ওঁর কথা শুনিয়া এবং বিশেষতঃ শেষের কথাটায় আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। কেবল, উনি এখনি আহার করিবেন বলিয়া, আমার মনের আবেগ সম্বরণ করিয়া নিরুপায়ে এতক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম। কিন্তু এখন আর ধৈর্য্য রহিল না। মুখশুদ্ধির কথ ও সুপারী নিকটে রাখিয়া আমি উপরে চলিয়া গেলাম। উপরে গিয়া দরজায় আল

ভিতর হইতে কড়া লাগাইলাম এবং একটা খাটের উপর শুইয়া পড়িলাম। আমার বুক্‌টা ধড়ফড় করিতে লাগিল, কিছুতেই তা থামে না। অনেকক্ষণ পরে, ধড়ফড়ানির বেগ একটু কমিল। কিন্তু মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কি সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে এবং আমি এ কি-করিতেছি এইরূপ আমার নিজের উপর রাগ হইয়া মনে মনে আপনাকে নিষেধ করিলাম এবং নীচে চলিয়া গেলাম। কিন্তু মন ভাল হইল না। মনের অশান্তি সমান চলিতে লাগিল। অনর্থক গলা ভারী হইয়া আসিয়া চোখ হইতে জল ঝরিতে লাগিল। তাহার কোন সময় ও ঠিকানা ছিল না। এমন অবস্থা হইল যে আমি আর সামলাইতে পারিতেছিলাম না। ক্ষণেক আশা ক্ষণেক নিরাশা এবং তার কু-কল্পনা ঘনাইয়া আসিয়া আমার মনকে পাগল করিয়া ছাড়িয়াছিল। রোজকার কাজ নিজের হাতেই সব করিতাম। ওঁর নিকট বসিতাম, ঔষধপত্র দিতাম, যা কিছু সমস্তই করিতাম। কিন্তু এই সমস্ত অভ্যাসের দরুন হইত। কিছুতেই মন লাগিত না। অনেকক্ষণ ধরিয়া কোথাও বসিতে পারিতাম না; মন একটু শান্ত হইলেও, মনে সুখ থাকিত না। নীচে মেয়েদের মধ্যে গিয়া বসিতাম কিন্তু কি-যেন-কি-নাই এইরূপ মনে হইয়া আমি চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িতাম এবং বৈঠকখানায় ওঁর কাছে গিয়া বসিতাম। তবু মনের অবস্থা সমানই থাকিত। নিজের মনের ন্যায় শত্রু জগতে আর কোথাও নাই। মনেই বৈরী ও মনেই অবৈরী এই যা লোকে বলে তা খুবই ঠিক্, এইরূপ আমার ক্ষণে ক্ষণে মনে হইতে লাগিল। আমার দুষ্ট মন কোন খারাপ কল্পনা না করে এই জন্য আমি মনকে কত শাসন করিতাম। আমি মনে করিতাম যেন আমার মন নিরর্থক শূন্যভাবে না থাকে। তাহার কি উপায় করি? কাহার চরণ শরণ লই? কে আমার মা হইয়া এই সঙ্কট নিবারণ করিবে? ঈশ্বর! আমার লাজ তোমার উপর থাকতে দেও। আজ পর্য্যন্ত অল্প-স্বল্প আমার জীবনের উপর দিয়ে যে-সব অসুখ-বিসুখ গিয়েছে তুমিই তা দূর করেছ এবং ওঁকে সময়ে সময়ে রক্ষা করে' সৌভাগ্যের যে শিখরদেশে আমাকে চড়িয়ে দিয়েছ, সেই শিখরদেশ থেকে আমাকে কি নীচে পা-দিয়ে ঠেলে ফেল্‌বে? কখনই তা করবে না,—আমার ভরসা আছে। যখন হইতে আমি বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমার সমস্ত সুখ ও আনন্দের ভিত্তি এইখানেই, তা তুমিই জান। তুমিই তা বজায় রাখ। এইটুকু আমাকে ভিক্ষা দেও। ইহা অপেক্ষা বেশী সুখ আর কোথাও আছে বলে আমি স্বীকার করিনি। সংসারে আমার সন্তান-সন্ততি নাই, এ অভাবও কখন আমি বোধ করিনি, ওঁর সহবাসে আমি এতটাই সন্তুষ্ট ও তন্ময় হয়ে আছি। রাজ-রাজড়া, আমীর-ওমরাও ও জায়গীরদারদের স্ত্রী সন্ততি-সম্পদে ও অধিকার-বৈভবে যতই বড় হউন না কেন, আমা অপেক্ষা তাঁরা অধিক সুখী নন। ওঁর সহিত উদ্বাহবন্ধনে যুক্ত হওয়ায় আজ আমি যেরূপ ধন্য হয়েছি ও সুখী হয়েছি তার আর তুলনা হয় না। ঈশ্বর! এ সব তুমিই দিয়েছ এবং এ সব রক্ষা করতে তুমিই সমর্থ।"—এই প্রকার চিন্তা আমার মনে সর্ব্বদাই চলিতে থাকায়, মনের স্ফূর্ত্তি থাকিত না। এদিকে ওঁরও এইরূপ একটা কোন বিশেষ অবস্থা হইয়া থাকিবে। মনে সুখ-দুঃখ কিংবা আশা-নিরাশা কোন-কিছু উদয় হইলেও, সহজ চেহারায় এই সমস্ত বিকারের ছায়া পর্য্যন্ত প্রায়ই দেখা যাইত না। কিন্তু এখন জানিয়া বুঝিয়া সমস্ত বিষয় এবং মন ও শরীরের সমস্ত কষ্ট সংযমের দ্বারা চাপিয়া রাখিয়াছেন, এইরূপ আমার মনে হইতে লাগিল। আজকাল কেবল আমিই ওঁর কাছে সর্ব্বদাই বসিতাম; এদিকে ওদিকে আমি কোথাও না যাই এইরূপ ওঁর মনের ভাবটা ছিল এবং আমারও এই ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল মনের দুর্দ্দমনীয় অবস্থা ঢাকিবার জন্য কোন-একটা উপলক্ষ্য করিয়া মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য আমায় উঠিয়া যাইতে হইত। এইরূপ আমি উঠিয়া যাইতাম বলিয়া আমার হাতের আঙ্গুল ধরিয়া থাকিয়া বলিতেন—"কোথাও যেও না।" এখন কোথায় যাচ্ছ? অনর্থক উঠে কষ্ট করছ কেন? অনর্থক উপর নীচে করে কত ঘোরাঘুরি করবে? কি করতে হবে ছেলেদের বল না, কিংবা কোন চাকরকে উপরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বল, তাহলে তোমার আর যাওয়া আসা করতে হবে না।" এইরূপ বলিবার পর, আমি শুধু 'আচ্ছা' বলিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু মনের অবস্থা আরও অদ্ভুত রকমের হইয়া উঠিল। সমস্ত দিন আমি প্রায়ই ওঁর কাছে বসিতাম, কথা কহিতাম; কিন্তু পারতপক্ষে ওঁর মুখের দিকে চাহিতাম না। চোখাচোখি হইলেই কি যেন একটা ভুল করিয়াছি এইরূপ মনে হইত। এই অবস্থা আমার হইয়াছিল। কিন্তু ওঁর মনেও এই রকম কিছু একটা হইয়া থাকিবে আমার মনে হইত। সমস্ত সময় আমার মনটা দুশ্চিন্তা ও কু-কল্পনায় অন্ধকার হইয়া থাকিত; বুক যেন ফাটিয়া যাইবার মতো হইত। উনি মনকে সংযত করিয়া মনের আবেগ চাপিয়া রাখিয়াছেন, চোখাচোখি হইলে ওঁরও মনের বাঁধ নিশ্চয়ই ধসিয়া যাইবে, তার পর, আমার ত কথাই নাই। এই রকম আমার মনে হইত। ভীমরুল যেন কুরে-কুরে ভিতরটা গর্ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে অথচ তোপদণ্ডের মত দেখিতে থাকে ও

৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী

মজবুৎ—এইরূপ আমাদের মনের অবস্থা হওয়ায়, আমরা অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটাইতেছিলাম। তবু আমি নিতান্তই পাগল। এখনো, এই রোগ ভাল হইবে এই আশার মোহে কত ঘণ্টা কাটাইয়া দিলাম এবং মনে একটু সুখও পাইলাম। কিন্তু ঈশ্বরী ইচ্ছা অন্যরূপ হইল। এই বুক-ফাটা ভাবনা চিন্তার মধ্যেও এই যে আমার একটু সুখ বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহাও ২৪ ঘণ্টাও টিকিল না। যে দেদীপ্যমান তেজোময় সৌভাগ্যসূর্য্যের আলোকে আমি সুখ ও আনন্দে ২৮ বৎসর কাল সমানে অতিবাহিত করিয়াছি সেই সূর্য্য অস্তমিত হইয়া আমাকে নিবিড় আঁধারে আচ্ছন্ন করিবার উপক্রম করিল। একদিন এই দিব্য সূর্য্য সহসা অস্তমিত হইল, চারিদিক অন্ধকারে আবৃত হইল। শিব! শিব!! আমি কি ভাগ্যহীন!!!

গ্রন্থ সমাপ্ত।

আলোক-স্তম্ভ।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

শূন্য বিজন আঁধার পথের
আলো করি' কতখানি
আলোক-স্তম্ভ দাঁড়াইয়া আছে
কবে হতে নাহি জানি!
মাথার উপরে জলে ছোট দীপ
অচপল তার শিখা,
সুপ্ত বীথিটি চরণে লুটায়
লাঞ্ছিত অহমিকা!
কভু শোনা যায় নরের কণ্ঠ
কেহ চলে যায় ধীরে,—
লক্ষ্য নাহিক কারো পানে তার
কর্ত্তব্য বহি' শিরে!
সারাটী রজনী একা জেগে রয়
আশ্বাস দিয়ে সবে,
পথিক-বন্ধু এমন সুজন
কে আর দেখেছে কবে?
দীর্ঘ যামিনী কত হল শেষ
বর্ষার কত ধারা
নীরবে ঝরিয়া গিয়াছে কেবল
করে নি আত্ম-হারা!
মোর সদা সাধ! এই সাধ যায়
আলোক-স্তম্ভ সম
তব পথখানি দেখায়ে সবায়
জেগে রহি নিরুপম!
অমনি অটল অমনি অচল
মোহন দ্যুতি তব
শিরে ধরি' মোর আঁধার ভুবন
আলো করি অভিনব!

পরহিতব্রত

পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

এই অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে প্রসন্নকুমার হিন্দুকলেজে পাশ্চাত্য সাহিত্যবিজ্ঞানাদিতে অতি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুকলেজে জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের প্রধান শিক্ষক মিষ্টার জোন্স, কলেজবিভাগের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন ও মিষ্টার কার, গণিতাধ্যাপক মিষ্টার রীজ, বাঙ্গালার অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র এবং ষ্টাইন, মিড্‌লটন, হানফোর্ড প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষকগণ তাঁহার বিবিধ গুণগ্রামে মোহিত হইয়া যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। কি সাহিত্য, কি গণিত, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি ইতিহাস সকল বিষয়েই প্রসন্নকুমারের অনুরাগ দৃষ্ট হইত। প্রথম শ্রেণীতে উঠিবার পূর্ব্বেই প্রসন্নকুমার আট টাকা মাসিক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি চারি বৎসর কাল উচ্চ বৃত্তি (senior scholarship) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেকালে প্রথম শ্রেণীতে চারি বৎসর কাল পড়িলে একালের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের অপেক্ষা অল্প বিদ্যালাভ হইত না। ১৮৪৭ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র স্কলারশিপের পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ বিষয়ে পাঠকগণের একটি স্থূলধারণা জন্মিবে।

১৮৪৭

সাহিত্য—Bacon's Advancement of Learning. So much of Milton & Pope as is contained in Richardson's selections.

দর্শন—Smith's Moral Sentiments. Abercrombie's moral & Intellectual powers.

ইতিহাস—Rome—Arnold's 3rd Vol. Greece—The Peloponesian war. India—Elphinstone's India.

অর্থনীতি—Smith's Wealth of Nation Part no Vol I. ইত্যাদি।

১৮৪৮।

ইংরাজী সাহিত্য—

Prose—Bacon's Essays.

Addison's Essays from the Spectator.

Shakespeare's Tempest and Mid-Summer Night's Dream.

Poetry—As much of Drydem as is contained in Richardron's selections.

দর্শন—

Mental & Moral Philosophy—Reid's Enquiry, Mill's Logic First Volume.

ইতিহাস—

England—Mackintosh's History of England, from the commencement to the accession of James I.

Greece—From the close of the Peloponnesian war to the death of Philip of Macedon.

India—Stewart's History of Bengal (Calcutta Edition.)

গণিত—

Algebraical Equations.

Analytical Geometry of two dimensions.

Analytical Geometry of three dimensions as applied to straight lines and planes.

Mechanics as treated of by Whewell.

Hydrostatics, Pneumatics so far as they can be studied without the aid of Differential & Integral Calculus.

সেকালের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী বিবরণ পাঠে প্রসন্নকুমারের ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালে উচ্চবৃত্তি পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট উত্তর লিখিতেন তাঁহাদের উত্তর শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে প্রকাশিত হইত। প্রসন্নকুমারেরও অনেক উত্তরপত্র ঐ সকল বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মাননীয় সি, এইচ্ ক্যামিয়ন ইতিহাস ও অর্থনীতির পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া বলেন :—"Cally Prsanno Dutt and Prsanno Coomar Sarbadhicary have given the best answers in Political Economy." ১৮৪৮-৯ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে লিখিত আছে যে দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া মিষ্টার কার এই মন্তব্য প্রকাশ করেন "The answers of the Hindu college students in Mental Philosophy are generally good. The answers of Cally Prsanno Dutt, Gopal Lall Mitra, Prsanno Cumar Sarbadhicary, Haragobinda Sen are particularly good and so nearly equal that it is not easy to decide between them.

যাঁহারা সাহিত্য ইতিহাস দর্শনাদিতে অনুরক্ত তাঁহারা প্রায়ই গণিতশাস্ত্রে তাদৃশ অনুরাগী হন না। কিন্তু প্রসন্নকুমার গণিতশাস্ত্রেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ৯ই অক্টোবর সূর্য্যগ্রহণ হয়; তৎকালীন গণিতের অধ্যাপক রীজ্ সাহেব (Mr. Rees) কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ যাহাতে এ বিষয়ে গণনা করিতে ও চিত্র প্রস্তুত করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করেন। হরগোবিন্দ সেন, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন।

সেকালে হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ ইংরাজী সাহিত্যে পারদর্শিতা লাভ করাই সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। মাতৃভাষাকে তাঁহারা নিতান্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন। প্রসন্নকুমারে কিন্তু বাল্যাবধি মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। বাঙ্গালা প্রবন্ধ রচনাদিতে তিনি সতীর্থগণকে প্রায়ই প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিতেন। পরীক্ষাস্থলে লিখিত তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ এত সুন্দর হইয়াছিল যে তৎকালীন শিক্ষাবিষয়ক সরকারী বিবরণীতে সেগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৪৬-৭ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট হইতে আমরা একটি প্রবন্ধ নিম্নে পুনর্মুদ্রিত করিলাম। প্রবন্ধটির বিষয় "পূর্ব্বতন গ্রীক ও হিন্দুজাতিদের মধ্যে কোন্ জাতি সাহিত্য, পদার্থ ও দর্শনবিদ্যার চালনাতে অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিল।"

পূর্ব্বতন গ্রীক ও হিন্দুজাতিদের মধ্যে কোন্ জাতি সাহিত্য পদার্থ ও দর্শন বিদ্যার চালনাতে অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

বিদ্যা বিষয়ে ভারতবর্ষের যাদৃশ দুরবস্থা এক্ষণে দর্শন করা যাইতেছে পূর্ব্বকালে তাদৃশ ছিল না, মহা-মহা পণ্ডিতদিগের এককালে এই ভারতভূমি বাসস্থান ছিল, এক সময়ে বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রণেতা প্রভৃতি এই ভারতবর্ষে কালযাপন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের জ্ঞান ও যশঃপ্রভাব দ্বারা এককালীন ভারতবর্ষের সুদীপ্ত হইয়াছিল।

প্রাচীন গ্রীকজাতিরা যাঁহাদিগের সভ্যতা ইদানীন্তন ইউরোপীয় সভ্যতার বীজরূপ হইয়াছিল কোন কোন বিষয়ে তাঁহারাও এতদ্দেশবাসীগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন না।

সাহিত্য বিদ্যার চালনায় বোধ করি গ্রীকদেশীয় এবং এতদ্দেশীয় মহাত্মারা সমরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যাদৃশ কবিতা বিষয়ে হোমর গ্রীকদিগের আদি এবং রত্ন-বিশেষ বাল্মীক মহামুনিও আমাদিগের তাদৃশ। ইলিয়দ-গ্রন্থে এমত কোন উৎকৃষ্ট বর্ণনা নাই যাহার তুল্য অথবা উৎকৃষ্ট রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত উভয় গ্রন্থই সুরচিত হইয়াছে। হিতোপদেশ এবং নীতিবাক্য উভয়েরই গ্রন্থে ভূরি ভূরি স্থানে বিস্তৃত আছে। গ্রীক জাতীয় কবিদিগের মধ্যে হিসিয়দ যেরূপ হিন্দুজাতির মধ্যে মাঘও সেইরূপ। বর্ণনা বিষয়ে উভয়েরই তুল্য ক্ষমতা বরং বোধ করি হিসিয়দ অপেক্ষা মাঘ উৎকৃষ্ট। আমাদিগের কালিদাসের কবিতা স্থানে স্থানে যাদৃশ সুকোমল, অহঙ্কার করিয়া বলা যাইতে পারে যে তাদৃশ সুকোমল কবিতা কথিত অন্য ভাষার দুষ্প্রাপ্য। উত্তম পাঠক কর্ত্তৃক কালিদাসের কবিতা পাঠ হইলে শ্রোতা আনন্দে পুলকিত হইয়া বোধ করিতে থাকেন যে বুঝি কোকিলধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, আহা বিক্রম উর্ব্বশির এবং শকুন্তলার মধ্যে কত কত স্থান আছে যাহা শ্রবণ মাত্রেই শরীর আর্দ্র হইতে থাকে। রঘুবংশ মধ্যে অজ রাজার বিলাপবর্ণনা শ্রবণ করিলে কোন্ মূঢ় ব্যক্তির না দুঃখের উদয় হয় এবং সেই মুহূর্ত্তে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে ইচ্ছা না হয়। পুনর্ব্বার কালিদাসের কবিতার রসাস্বাদন হইলে বোধ হইতে থাকে যে, যে ব্যক্তি কবি বুঝি তাহার সত্যই "তুচ্ছ ব্রহ্মপদ"। বিদূষক ব্যক্তিরা নলোদয় গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া কহিয়া থাকেন যে যমক কবিতা লিখিয়া ইহাতে যেরূপ বালকতা প্রকাশ আছে গ্রীক এবং লাটিন কবিরা তদ্রূপ কবিতা রচনা দ্বারা বালকতা প্রকাশ করিতে হেয়জ্ঞান করিতেন। একজন মহাকবির উপর এরূপ দোষারোপ করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত যে নলোদয় গ্রন্থ রচনা করিবার মূলীভূত কারণ কি? বররুচি কতকগুলিন যমক কবিতা রচনা করিয়া অহঙ্কারের সহিত কহিয়াছিলেন যে যে ব্যক্তি এরূপ কবিতা রচনা করিতে পারিবেক তাহাকে আমি এক ক্রোশ স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইব ইহা শ্রবণ করিয়া কালিদাস তাঁহাকে উত্তর করিলেন যে নবরসে বর্জ্জিত যে যমক কবিতা তাহা রচনা কবির মুখ্য কর্ম্ম নহে এবং অনায়াসপূর্ব্বক হইতে পারে ইহা বলিয়া তদনন্তর মহাকবি নলোদয় রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশ্য স্বীকার করি যে সংস্কৃত কবিরা গ্রীক অথবা লাটিন কবিদের অপেক্ষা যমক কবিতা অধিক রচনা করিয়া থাকেন কিন্তু সে কেবল অপেক্ষাকৃত দোষ এবং সে দোষের পরিশোধনার্থে বিস্তর গুণ আছে। এক আধুনিক কবি কহিয়াছেন যে কবিতারূপ কন্যা বাল্মীকি কর্ত্তৃক জন্ম প্রাপ্ত হইয়া ব্যাস কর্ত্তৃক পোষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিবাহ কালিদাসের সহিত হইয়াছিল। অল্প বাক্যের মধ্যে কি নিগূঢ় কথা! আশঙ্কা করি যে বুঝি স্বদেশের কবিকে পাইয়া মূল কথা ছাড়িয়া তাঁহার প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করা হইয়াছে। নাটকরচনায় গ্রীক কবিরা সংস্কৃত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহেন সংস্কৃত নাটকের সংখ্যা অপেক্ষা তাহাদের নাটকের সংখ্যা অধিক বটে, ইউরিপিডিস সফোক্লিস প্রভৃতির রচিত নাটক যেরূপ সুশ্রাব্য এবং উত্তম গ্রথিত আমাদিগের শকুন্তলা রত্নাবলি বিক্রম উর্ব্বসি বেণিসংহার নাটকও সেইরূপ। গদ্যরচনায় গ্রীকদিগের উত্তম উত্তম লেখক আছে, সংস্কৃত উত্তম গদ্য লেখক প্রায় কেহই নাই, কিন্তু সংস্কৃত পুরাণসকল যাহা পুরাবৃত্ত বিষয়ে কুত্রাপি বিশ্বাস্য নহে কবিতা বিষয়ে আমাদের সাহিত্যের অত্যন্ত গৌরবের জন্য গ্রীক ভাষা যেরূপ মিষ্ট এবং সংক্ষেপে অধিক ভাব প্রকাশ করিতে পারে, সংস্কৃত ভাষারও সেই গুণ বরং উভয় ভাষার সুপণ্ডিত কোন্ কোন্ ব্যক্তি কহিয়াছেন যে মিষ্টতা জন্য এবং সংক্ষেপে ভাব প্রকাশ করণ জন্য গ্রীক অপেক্ষা সংস্কৃত উৎকৃষ্ট।

পদার্থ বিদ্যার চালনাতে গ্রীকরা কি হিন্দুরা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিল তাহা মীমাংসা করা অতি সুকঠিন যেহেতুক হিন্দুদিগের পদার্থবিদ্যাসম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ একেবারে বিনাশক পাইয়াছে। অধুনা ইউরোপ মহাদ্বীপে পদার্থ বিদ্যার যেরূপ সুসিদ্ধরূপে চালনা হইয়া খগোল ভূগোল পাতালবৃত্তান্তের জ্ঞান লাভ হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা অকুতোভয়ে সমুদ্র পথে গমন হইতেছে এবং মনুষ্যের উপকার জন্য নানা প্রকার যে নির্ম্মিত হইতেছে তাহা চিন্তা করিলে এই ভাবের উদয় হয় যে যেরূপ বিড়ালে এবং সিংহে তুলনা গ্রীক কি হিন্দুদিগের পদার্থবিদ্যা সম্প্রতি ইউরোপীয় পদার্থবিদ্যার সহিত তুলনায় সেইরূপ। পদার্থ বিদ্যার মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা উভয় জাতি অধিক চালনা করিয়াছিল উভয় জাতিরই এমত ক্ষমতা হইয়াছিল যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণের কাল নিরূপণ করিতে পারিত এবং আমাদেরও সূর্য্যসিদ্ধান্ত পৃথিবীর আকার কদম্বকুসুমের ন্যায় বলিয়া যাহা স্থির করিয়াছিলেন গ্রীক জ্যোতির্বেত্তারাও অবশেষে সেইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে পৃথিবী অচলা টলমি প্রভৃতি গ্রীক জ্যোতির্বেত্তাদেরও সেই মত। গ্রীকেরা ও হিন্দুরা চন্দ্রসূর্য্য কতদূর যাহা গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন তাহা উভয় কাল্পনিক। এ বিষয়ে জ্যোতির্বিদ্যায় দুই জাতিই তুল্য। পদার্থবিদ্যার চালনায় অন্যান্য অংশে হিন্দুদিগের অপেক্ষা গ্রীকেরা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিল। আর্কিমিডিস প্রভৃতি গ্রীক মহা-

পুরুষেরা অনেক অনেক বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন এবং অনেক বিষয়ের নির্দ্ধারিত করিয়াছেন সুতরাং পূর্ব্বতন হিন্দুজাতির পদার্থবিদ্যার অবস্থা যাহা তাঁহাদের গ্রন্থ দর্শন দ্বারা জানা যাইতেছে বলিতে হইবে যে গ্রীকদিগের পদার্থ বিদ্যার অবস্থা অপেক্ষা অপকৃষ্ট ছিল।

কিন্তু দর্শন বিদ্যায় হিন্দুরা গ্রীকজাতি অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। বেদান্ত দর্শনের ন্যায় গ্রীক শাস্ত্রে কোন দর্শন নাই। আমাদের ষড়দর্শনের অন্য পঞ্চ দর্শন যদ্যাপিও উৎকৃষ্টতাতে বেদান্ত দর্শনের তুল্য নহে তথাপি গ্রীকদিগের কোন দর্শন তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। আহা আমাদের দর্শন শাস্ত্রে যেরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইয়াছে তাহা শুনিলে পূর্ব্বকালের প্রতি কি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মে। আত্মার অক্ষয়তা গ্রীক ও হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে উভয়েই প্রমাণ করিয়াছেন। মনের গতির নিয়ম সূক্ষ্মরূপে গ্রীকেরা কি হিন্দুরা কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। পরকাল নিয়মে উভয় দেশীয় দর্শন শাস্ত্রেই গোলযোগ করিয়াছেন। অনন্তর এই বাচ্য যে আমাদের স্বদেশীয় দর্শন শাস্ত্রের যাদৃশ কোন প্রশংসা করি না অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক পূর্ব্বকালের কোন দর্শনশাস্ত্রের নির্ণয়করণের বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে সিদ্ধান্ত কহিতে পারেন নাই

পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন কলেজে স্বতন্ত্র পরীক্ষা গৃহীত হইত। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পরিষদের নির্দ্দেশে ঢাকা, কৃষ্ণনগর, ও হিন্দুকলেজের ছাত্রগণকে একসঙ্গে পরীক্ষা করা হয়। এই সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রসন্নকুমার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ৪০৲ টাকা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ রচনাতেও ইনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। উভয় প্রবন্ধই ১৮৪৮-৪৯ সালের সরকারী রিপোর্টে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। আমরা প্রসন্নকুমারের তাৎকালীন বাঙ্গালা রচনার নমুনা দেখাইবার জন্য এস্থলে উহা পুনরুদ্ধৃত করিলাম। ইংরাজী রচনাটির বিষয় ছিল "জাতীয় চরিত্রের উপর জল বায়ুমৃত্তিকার প্রভাব।" বাঙ্গালা রচনাটির বিষয় ছিল "সত্যের মহিমা বর্ণন কর।"

সত্যের মহিমা।

সত্যই সার সদার্থ। সত্যের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন হইতেছে। অতি সামান্য গৃহকর্ম্ম অবধি পুরাবৃত্ত লেখক ও জ্যোতির্ব্বেত্তার নিগূঢ়ানুসন্ধান পর্য্যন্ত সত্যই সকলের আধার। পরম অনুকম্পাবান জগদীশ্বর যদ্যপি মনুষ্যের মনোমধ্যে সত্যের প্রতি প্রেম সংস্থাপন না করিতেন তবে মনুষ্যসমাজ কুত্রাপি স্থায়ী হইতে পারিত না। কোন বিপুল-বিদ্যা-বিশারদ গ্রন্থকর্ত্তা উল্লেক করিয়াছেন যে এই পৃথিবী-মণ্ডলস্থ অত্যন্ত মিথ্যাবাদী ব্যক্তিও জীবনকালের মধ্যে শতাংশের একাংশের অধিক মিথ্যাবাক্য ওষ্ঠ হইতে নির্গত করে না। অতএব সত্য প্রতিপালন করা জগদীশ্বরের প্রধান আজ্ঞাবৎ জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তদীয় আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনে যে দোষ স্পর্শে মিথ্যাবাদী ব্যক্তি সেই দোষের অপরাধী।

সত্যের অবহেলাই সকল পাপের মূল। সত্যের প্রতি আদর থাকিলে কোন পাপ প্রবেশ করিতে পারে না। মনুষ্য লজ্জাবশত আপনকৃত অপকর্ম্ম অন্য অন্য লোকের নিকট প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক কিন্তু সত্যবাদী হইলে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হয় এবম্বিধায়ে সত্য পরায়ণ ব্যক্তির নিকটে পাপ সমাগম করিতে পারে না।

ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের প্রতি যত্নবান হইলে সত্যের অনাদর কুত্রাপি শ্রেয়স্কর নহে। মিথ্যাবাদী ব্যক্তিকে সর্ব্বদা চিন্তাকুল থাকিতে হয় কি জানি কখন তাহার মিথ্যা কথা প্রকাশ হইয়া তাহার প্রতি লোকের অবিশ্বাস জন্মে এবং তদ্দ্বারা তাহার মানের ও সুখের হানি হয়। কিন্তু সত্যবাদীকে এরূপ ভাবনায় কোন কালেই পতিত হইতে হয় না। সত্য স্বয়ংসিদ্ধ কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করে না। অপিচ "অদ্য বা অব্দশতান্তে" মনুষ্যের মরণই নিশ্চয়। অতএব যদ্যপিও ইহলোকে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগের দ্বারা কাহারও সুখ সম্ভাবনা হয় তথাপি জীবনান্তে বিশ্বকর্ত্তার বিচারাধীন হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত দুঃখভোগ করিতে হইবেক ইহা বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত থাকা উচিত।

সর্ব্বদেশেরই উত্তম উত্তম গ্রন্থে সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও মিথ্যার অপকৃষ্ট স্বভাব বর্ণিত আছে। মহাভারতীয় স্বর্গারোহণ পর্ব্বে লিখিত আছে যে ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। কুরুপাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন কৃষ্ণ প্রভৃতি অনেকে দ্রোণাচার্য্যকে ম্লান এবং হতবল করিবার নিমিত্তে ধ্বনি করিতে লাগিলেন "দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে" কিন্তু তাহাতে যুধিষ্ঠিরের বাক্য না শুনিয়া আচার্য্য বিশ্বাস না করাতে কৃষ্ণের পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠির উচ্চৈস্বরে কহিলেন "অশ্বত্থামা হত" এবং অতি মৃদুস্বরে কহিলেন "ইতি গজ"। চিরকাল সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির জীবনের মধ্যে এক মুহূর্ত্ত কাল সত্যের প্রতিবন্ধক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; মহাকবি ব্যাসদেব বর্ণনা করিয়াছেন যে এজন্যও তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল।

মহাত্মা লর্ড বেকন গ্রীকদেশীয় কবি লুক্রিয়স্ হইতে এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যে "জ্ঞানময় পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া সত্যের অবলম্বন করত যে ব্যক্তি নিম্নস্থ কুজ্ঝটিকাস্বরূপ অজ্ঞান ও অসত্যের সহিত সংশ্রব না করিয়া তদুপরি দৃষ্টিপাত করেন তিনিই পরম সুখী।" ফলত মানবজীবন ধারণ করিয়া সত্যের সহিত বিসম্বাদ করিলে সে জীবন কেবল বিষময়। তাহাতে সুখের লেশমাত্র নাই।

পরন্তু সত্যের আলোচনায় মনের স্ফূর্ত্তি জন্মে, মানসিক গুণসকল সুন্দররূপে বিকশিত হয় এবং স্বভাবের সৌন্দর্য্যতার প্রভাব হয়। দর্শনশাস্ত্রের নিগূঢ় বিতর্ক, জ্যোতির্ব্বিদ্যার পারদর্শিতা ও ভূতত্ত্বের সম্যক জ্ঞান কেবল সত্যের মহিমাসূচক। সত্য মূলীভূত না হইলে সে সকল হইতে পারিত না।

অবশেষে এই বক্তব্য যে সত্য পরিত্যাগ করিয়া অসত্যের উপাসনা কেবল বিচলিত মনের কর্ম্ম।

উপরি-উদ্ধৃত বাঙ্গালা প্রবন্ধটি পরীক্ষক আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Rev. K. M. Banerjee) প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহন শিক্ষা-পরিষদের নিকট যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"বাঙ্গালাভাষার বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমি হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের বাঙ্গালা রচনা প্রশংসার যোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। এতদ্দেশে একটি সংস্কার অত্যন্ত প্রবল যে, সংস্কৃত-ভাষায় অধিকার না থাকিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপণ্ডিত হওয়া যায় না; ইহার ফলে, সংস্কৃত-ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ না করিয়া কেহই বিশুদ্ধ বাঙ্গালারচনা লিখিবার প্রয়াস পান না। যাঁহারা মনে করেন যে, সংস্কৃত ব্যতীত বাঙ্গালা-ভাষার অনুশীলন অসম্ভব, আমি তাঁহাদের যুক্তির সমর্থন করিতে অসমর্থ। যদিও এই দুইটী ভাষার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ বর্ত্তমান, এবং সংস্কৃতভাষার নিকট বাঙ্গালাভাষা অশেষ প্রকারে ঋণী, তথাপি পূর্ব্বোক্ত ভাষায় অধিকার লাভ না করিয়া শেষোক্ত ভাষার অনুশীলন অসম্ভব নহে। যদি যথেষ্ট যত্ন লন, তাহা হইলে ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় একেবারে অনভিজ্ঞ হইয়াও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, তবে এই ভাষার আদর্শ ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থের অভাবনিবন্ধন প্রবন্ধ লেখকগণকে মধ্যে মধ্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে হইবে। বাঙ্গালার জন্সন্ বা ম্যরে এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং অন্য দুই এক জন ছাত্রের রচনা যদিও সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ নহে, তথাপি অত্যন্ত সন্তোষজনক, এবং তাঁহাদের পক্ষ হইতে এইরূপ ত্রুটীর কারণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই।

টাউনহলে পুরস্কার-বিতরণ-সভায় বাঙ্গালার তদানীন্তন ডেপুটী গবর্ণর মাননীয় স্যর হার্বার্ট ম্যাডক বাঙ্গালা রচনায় পারদর্শী প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি ছাত্রগণকে কিরূপে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধারযোগ্য :—

"দেশীয় ভাষার অনুশীলনের প্রতি শিক্ষা-পরিষদ এবং ইহার অধীনস্থ সকলে যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি আনন্দপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মাতৃভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ নিজের এবং স্বদেশবাসীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী, এ কথা আমাদের বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রগণের মনোমধ্যে আমি গাঢ়রূপে অঙ্কিত করাইয়া দিতে চাহি। আমাদের বর্ত্তমান স্কুল এবং কলেজসমূহে ভারতবাসিগণকে যে য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই বিতরিত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ ভারতের কোটী কোটী প্রজার মধ্যে অধিকাংশই আমাদের ভাষা জানেন না, এবং তাঁহারা যে কোন কালেও জানিবেন, এরূপ আশাও নাই। কিন্তু তাঁহাদের মাতৃভাষার সাহায্যে আমাদের উচ্চতর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত জ্ঞানের অধিকাংশ কেন তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইবে না, ইহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই; এবং ইংরাজীর সহিত যাঁহারা মাতৃভাষাতেও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই এই মহাকার্য্য সম্ভব। ছাত্রগণ যে এক্ষণে মাতৃভাষায় অনুশীলনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন, এবং আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে আমাদিগের নিকটে উপস্থাপিত পাঁচটী বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রশংসার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, ইহা যথার্থই অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। সংক্ষেপে আমি আমাদের স্কুল ও কলেজের সকল ছাত্রকে এই অত্যাবশ্যক বিদ্যার চর্চ্চা করিতে অনুরোধ করিতেছি; কেবলমাত্র য়ুরোপীয় সাহিত্যজ্ঞানের অনন্যসাধারণ পরিচয়-প্রদান অপেক্ষা ইহাই অধিককাল স্থায়ী যশঃ ও প্রশংসার পথ। আমার আশা আছে যে, স্বদেশপ্রেম এবং উচ্চকাঙ্ক্ষা ইঁহাদিগকে মাতৃভাষায় য়ুরোপীয় সদ্‌গ্রন্থাদির অনুবাদ এবং শিক্ষাপ্রদ মৌলিক গ্রন্থাদির প্রণয়ন দ্বারা দেশের মহদুপকারক বলিয়া সুখ্যাতি-অর্জ্জনে প্রণোদিত করিবে। আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে' আপনাদিগকে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়।"

প্রসন্নকুমার হিন্দুকলেজের যে একজন অতি উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন তাহা উপরিলিখিত বিবরণ হইতে পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। এই সময়ে একবার মুর্শিদাবাদের নবাব ফরেদুন জা বাহাদুর হিন্দুকলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়া ছাত্রগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা বিতরণের সঙ্কল্প করেন। প্রসন্নকুমার তাহার ২৫টা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্রজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচায়ক—লাইব্রেরী মেডেল প্রাপ্তি। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরী মেডেল পরীক্ষা প্রচলিত হয়। কলেজের ছাত্রেরা বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারে ইচ্ছামত যে কোন বিষয়ের পুস্তকাদি পাঠ করিত, পরে সেই সকল পুস্তকের উপর পরীক্ষা গৃহীত হইত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালককে একটি সুবর্ণপদক প্রদান করা হইত। লাইব্রেরী মেডেল অধিকার করা সেকালে ছাত্রগণের সর্ব্বা-

পেক্ষা কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার এই দুরূহ লাইব্রেরী পরীক্ষায় সাফল্য-লাভ করিয়াছিলেন।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক।

বিগত ১লা আগষ্ট লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নিজের চরিত্রের গুণে, বিদ্যাবত্তার বলে সমস্ত ভারতবাসীর চিত্ত অধিকার করিয়াছেন এবং রাজদুর্লভ উপাধি "লোকমান্য" লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যের ফল ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে—আমাদের পক্ষে বর্ত্তমান কালে তাহা বিচার করা বড়ই কঠিন। কিন্তু ইহা বলিতেই হইবে যে, তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন, তদনুসারেই শত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও আপনাকেও পরিচালিত করিতে বিধিমতে সচেষ্ট হইতেন। তাঁহার পিতা ব্যাকরণ ও ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধীয় কতকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; বালগঙ্গাধরেরও অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবুদ্ধির উত্তরাধিকারসূত্রে নামিবার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও ভারতবাসীদের মানুষ করিয়া গড়িবার উদ্দেশ্যে পুণাতে পাঁচজনে মিলিয়া একটীবিদ্যালয় খুলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তাঁহার প্রকাশিত কেশরী ও মারহাট্টা নামক দুইটী সংবাদপত্র বোম্বাই অঞ্চলে অতুল শক্তি ধারণ করিত। শোনা যায় যে একমাত্র কেশরীরই ত্রিশ হাজার গ্রাহক, অথচ উপহারের কোনই প্রলোভন নাই। বেদের পুরাতত্ত্ব এবং আর্য্যদিগের আদিম নিবাস সম্বন্ধে তাঁহার দুইটী সন্দর্ভ মনীষীদিগের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্লেগের সময় তিনি হিন্দু হাসপাতাল খুলিয়া নিজের প্রাণের শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া যে ভাবে দেশের লোকদিগের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব এবং নিঃস্বার্থপরতা পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে গিয়া অনেকবার তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, এমন কি, তাঁহাকে জেলেও যাইতে হইয়াছিল। শেষ বারে যেবার তাঁহার প্রতি দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইয়াছিল এবং যে আদেশ পরিবর্ত্তিত হইয়া বিনাশ্রমে কারাবাসের আদেশে পরিণত হইয়াছিল, তাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ মনোযোগের বিষয়। এই কারাবাসের ফলেই তাঁহার জীবনের অক্ষয়কীর্ত্তি গীতারহস্য লিখিত হইয়াছিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নামে রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য মকদ্দমা আনা হয়। সেই মকদ্দমাতে জুরি ছিলেন ৭ জন ইউরোপীয় এবং ২ জন পার্শি। এই মকদ্দমাতে বিচারক ছিলেন একটী পার্শি, যিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন তিলকের আর একটী সজাতীয় মকদ্দমায়। এই মকদ্দমার শেষে তিলককে দোষী সাব্যস্ত করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে তাঁহার আর কিছু বলিবার আছে কিনা। তদুত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর স্মরণীয়। কথাগুলি এই—There are higher powers that rule the destiny of things, and it may be the will of Providence that the cause which I represent may prosper more by my suffering than by remaining free!" প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে রাখা উচিত যে দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে উঠিতে হইবে।

এই মকদ্দমার ফলে তিলকের দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইয়াছিল, কিন্তু পরে তাহা বিনাশ্রমে কারাবাসে পরিবর্ত্তিত হইল এবং তাঁহাকে মাণ্ডালেতে কারাগারে রাখা হইল। এই কারাগারেই তিনি যে গীতারহস্য লিখিয়াছিলেন, তাহা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কারামুক্তির পর প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই গীতারহস্যের বঙ্গানুবাদের ভার প্রাপ্ত হইয়া আদিব্রাহ্মসমাজ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আদিব্রাহ্মসমাজকে কি অনুরাগের চক্ষে তিনি দেখিতেন, একটী কথা বলিলেই তাহা বুঝা যাইবে। গীতারহস্যের বঙ্গানুবাদ বিক্রয়ের ফলে ব্যয় বাদে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা তিনি আদিসমাজকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

লোকমান্য তিলক মহারাজ দেহান্তরিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু দেশবাসীর হৃদয়ে তিনি চিরজাগরূক থাকিবেন তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মার অনুপ্রাণনে সমগ্র ভারতবর্ষ অটল একনিষ্ঠ দেশভক্তির পথে জাগ্রত হইয়া উঠুক।

শোক-সংবাদ।

সৌদামিনী দেবীর দেহান্তর—আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠকন্যা সৌদামিনী দেবী গত ৩০শে শ্রাবণ রবিবারের শেষ রাত্রে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে ৪টা ১০ মিনিটে পরলোক গমন করিয়াছেন। মহর্ষির দেহান্তরের পরে প্রাচীনের সহিত নবীনের অন্যতর যোগ অন্তর্হিত হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার শিরোদেশে ব্রহ্মোপাসনা হওয়াতে তিনি বিশেষ শান্তিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। আদিসমাজপ্রচারিত একেশ্বরবাদসম্মত অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার স্মৃতিশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠ কন্যা ৺ইরাবতী দেবীর পরলোকগমনে তিনি বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বহুকাল পর্য্যন্ত মাঘোৎসবের সুব্যবস্থা করিতেন। সত্যপ্রসাদের অমায়িকতা ও সাদর আপ্যায়ন ভুলিবার জিনিস নহে। আমরা তাঁহার এই মাতৃবিয়োগে গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি। ভগবান তাঁহাকে সপরিবারে এই দুর্ব্বহ শোক সহ্য করিবার শক্তি প্রদান করুন।

শরৎকুমারী দেবীর পরলোকগমন—গত ১০ই আষাঢ় বেলা ২টার সময় মহর্ষিদেবের তৃতীয় কন্যা ৺শরৎকুমারী দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার কন্যাগণ এবং জামাতৃগণ এবং দৌহিত্রগণকে আমাদের গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি।

বিংশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৯১

৯২৬ সংখ্যা | ১৮৪২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সফলতা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
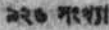
সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ পথ এসেছি চলিয়া—
জন্মিবার পূর্ব্ব হতে চলেছি জন্মিয়া—
ভারতের পুণ্যভূমে জন্ম লব বলি',
প্রাণের আনন্দ হাসি বিতরিব বলি',
ধর্ম্মের আলোকদীপ সু-উচ্চে ধরিয়া,
অধর্ম্মের অন্ধকার সমূলে নাশিয়া॥
দাঁড়ায়ে ধর্ম্মের পরে ত্রিশ কোটী যবে
ভারতসন্তান মিলে একপ্রাণে সবে
করিবে আপন কাজ দূর করি' ভয়—
সফল আমার আশা;—তথনি হৃদয়
নাচিবে আনন্দে নিত্য অনন্ত অক্ষয়;—
দিন রাত গাব—জয় ভারতের জয়॥
কিবা ছেলে, কিবা মেয়ে—জননীর জাতি—
জ্ঞানে ধর্ম্মে জেগে উঠি' আনন্দের ভাতি
জাগায়ে তুলিবে যবে প্রতি গেহে গেহে,
সবল হইবে সবে প্রাণে মনে দেহে—
হইব সফলকাম সেদিন;—সেদিন
দুর্ব্বল নমিয়া মাথা লাজে দীন হীন
ভারত সন্তান সবে রবে নাকো আর
ক্রীতদাস যথা ভুলি' নিজ অধিকার॥

১৩—ঈশ্বর ধর্ম্মাবহ।

(ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ জি ভাণ্ডারকর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ৩। ১২

"পরমেশ্বর মহান্ প্রভু, তিনি সত্ত্বের প্রবর্ত্তক; নির্ব্বিকার জ্যোতির্ম্ময় তিনি এই সত্ত্বরূপ মঙ্গলময় ধনের স্বামী।"

সত্ত্বের অর্থ—ভাল গুণ; শুদ্ধ মঙ্গলময় যে বৃত্তি তাহা সাত্বিক বৃত্তি। সত্ত্বের প্রবর্ত্তক পরমেশ্বর; তাই তিনি উত্তরোত্তর মন্দ নষ্ট করিয়া ভালো প্রবর্ত্তিত করেন। ভালোর বীজ আমাদের অন্তঃকরণে তিনি রোপণ করিয়াছেন, তাই ভাল ও মন্দ, সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণ ও তমোগুণ, ইহাদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে পরিণামে সত্ত্বেরই জয় হওয়া সম্ভব হইয়া থাকে। যে ঠিক্ কাজ করে তাকে পরমেশ্বর ধৈর্য্য, শান্তি ও সুখ দেন। ভালোর পক্ষপাতী ব্যক্তিকে তিনি উৎপন্ন করেন, এবং তাহাকে দিয়া মন্দের পরাভব করান। তাঁহার এই ক্রম সতত চলিয়াছে। তিনি স্বতঃ মঙ্গলনিধান, পরম পাবন, আমরা পাপী। তিনি মঙ্গলের স্বামী, এই জন্য তাঁহার আদেশ বিনা মঙ্গলস্বভাব আমরা পাইতে পারি না। পরমেশ্বরের

কৃপা ব্যতীত আমাদের পাপবাসনা নষ্ট হইবার নহে। আমাদের অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করিতে তিনিই সমর্থ।

> স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
> যস্মাৎপ্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
> ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
> জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম॥
>
> শ্বেতাশ্বর ৬।৬

"সংসাররূপ বৃক্ষ, কাল, এবং আকারবিশিষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্ন এই যে অন্য একজন আছেন, যাঁহা হইতে এই সমস্ত প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহাকে বেষ্টন করিয়া এই প্রপঞ্চ অবস্থিতি করিতেছে যিনি ধর্ম্মকে প্রবর্ত্তিত ও পাপকে বিনষ্ট করেন এবং যিনি মঙ্গলের স্বামী তিনি আমাদের আত্মায় স্থিতি করেন—এইরূপ জানিয়া কাজ করিবে।"

এই বিশ্বরূপ প্রপঞ্চ চক্রসদৃশ। তাহার নাভি পরমেশ্বর। নাভির চতুর্দ্দিকে চক্রের অরগুলা যেরূপ ঘুরিতেছে, সেইরূপ এই সমস্ত বিশ্ব পরমেশ্বরের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে, তাই তাঁহার আদেশে চলিয়া তাঁহারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। তাঁহারই ইচ্ছায় সমস্ত চলিতেছে। মনুষ্যের অন্তঃকরণ হইতে পাপ বিনষ্ট করিয়া পুণ্যের উৎপাদন তিনিই করিতেছেন। পাপী মনুষ্য দুরাচরণ করে; সেই দুরাচরণ হইতে আমার বিনাশ হইবে, আমি অধম, ইহা সে ঠিক্ বুঝে, এবং পাপ হইতে মুক্ত হইব, এইরূপ অনিবার ইচ্ছা সে প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহার মনোরথ সিদ্ধ হয় না। বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়দিগকে আকর্ষণ করিয়া কামক্রোধাদিকে বিক্ষুব্ধ করিলে বিবেক চলিয়া যায় এবং আমরা পাপাচরণ করি। উপলক্ষ্যটা চলিয়া গেলে আবার সাধুচিন্তা হৃদয়ে প্রকট হয় এবং পরিশেষে পরম শোচনীয় অবস্থা আমরা প্রাপ্ত হই। এখন, এই অবস্থা হইতে আমরা মুক্ত হইব কি করিয়া? দুর্ব্বল বিবেক বলপ্রাপ্ত হইয়া কামক্রোধাদিকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে কি করিয়া? এক উপায় আছে। পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণ ভক্তি স্থাপন করিয়া, তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া যদি আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই তবেই উত্তরোত্তর বলপ্রাপ্ত হইয়া আমাদের বিষয়-লালসা দূরীভূত হইবে এবং বিবেক স্থির হইয়া অন্তঃকরণের মধ্যে শুদ্ধি অথবা মঙ্গলভাব প্রবিষ্ট হইবে। তাই সেই ধর্ম্মাবহ, পাপনাশক সমস্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন পরমেশ্বর আমাদের আত্মাতে বাস করেন। এইরূপ বাস করেন বলিয়াই পানাহার ও দৈহিক সুখের অন্যান্য সাধন প্রাপ্ত হইলেও মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট না হইয়া এই বিশ্ব কি, এই সম্বন্ধে তাহার জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় এবং এই বিশ্বের মধ্যে বিরাজমান যে অনন্ত মহিমা, যে অচিন্ত্য শক্তি, যে অনুপম সৌন্দর্য্য, যে অসীম উন্নতি এবং যে অগাধ গাম্ভীর্য্য তাহা দেখিয়া বিস্মিত হয়, বিনম্র হয় এবং ঈশ্বরকে ডাকিতে আরম্ভ করে। মনুষ্যের আত্মা পার্থিব, নশ্বর, মলিন ক্ষুদ্র বিষয়ে কখনই তৃপ্ত হইবার নহে। তাহার স্পৃহা নিয়ত উচ্চ হইয়া থাকে। নীচ আচরণ, কামক্রোধাদির দাসত্ব, পাপাচরণ, অধম-ভাবাবিষ্টতা—এই সমস্ত বিষয়ে তাহার লজ্জা-বোধ হয় এবং পরম মঙ্গল ও উদার যে ভাব, পরমেশ্বরের শুদ্ধ মঙ্গলময় যে স্বরূপ তাহা হৃদয়ে আবির্ভূত হয়; এবং তদনুরূপ আমাদের আচরণ যাহাতে হয়, পাপের নির্দ্দলন হয়, পরমেশ্বর ও আমাতে ঐক্য হয়, এইরূপ উৎকট মনোরথ উদয় হইয়া থাকে।

১৪—ঈশ্বর কর্ম্মাধ্যক্ষ।

> একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
> কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥
>
> শ্বেতাশ্বতর, ৬।১১।

দেব একমাত্র। তিনি সর্ব্বভূতে গূঢ় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী; তিনি সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা। যে সমস্ত কর্ম্ম বা ব্যাপার চলিতেছে, তাহার উপর নজর রাখিয়া তাহার ব্যবস্থা তিনিই করিতেছেন, তিনিই তাহার অধিষ্ঠাতা; তিনি সর্ব্ব-ভূতে বাস করেন; তিনি সকল বিষয়ের সাক্ষী, তিনি সকলের চেতয়িতা। তাঁহার দেশ কাল ও বস্তু এই সমস্ত উপাধি নাই; তাই, অমুক দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার বিস্তার, অমুক কাল পর্য্যন্ত তাঁহার

স্থিতি কিংবা অমুক বস্তুর সদৃশ তিনি—এরূপ নহে; তাঁহার গুণ অসীম, তিনি পরিমিত নহেন।”

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥
কঠ, ৩৷১২।

“সর্ব্বভূতে এই আত্মা গূঢ় আছেন, তাই তিনি স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হন না; কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্ম অবলোকন করেন, তাঁহাদের সূক্ষ্ম ও উত্তম বুদ্ধির যোগে তিনি দৃষ্ট হন।”

প্রপঞ্চের মধ্যে সর্ব্বোপরি যাহাদের চিত্ত নিমগ্ন, তাহাদের নিকট শুধু স্থূল, ভৌতিক, বহিরিন্দ্রিয়-গোচর পদার্থই প্রকাশিত হয়। তাই, জলস্থল-পাষাণাদি সমস্ত জগৎকে দেখিয়া তাঁহারা পরমাত্মাকে দেখিতে পান না এবং তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে সন্দেহ করেন। কিন্তু এইরূপ প্রপঞ্চের যোগে, সর্ব্বথা স্বাভাবিক বুদ্ধির যদি লোপ হইয়া না যায় কিংবা কোন দুর্ঘট প্রসঙ্গের যোগে প্রপঞ্চের অসারতা চিন্তা করিয়া যদি সেই স্বাভাবিক বুদ্ধি জাগৃত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে বাস করিতেছেন যে পরমেশ্বর এবং তাঁহার বিস্ময়জনক গুণ তাহার নিকট প্রকাশ পায়। প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থের মধ্যে কোন না কোন ক্রিয়া চলিতেছেই। তাহার যোগে উহা কালান্তরে বিশেষরূপ প্রাপ্ত হয় কিংবা সেই ক্রিয়ার পরিণাম অন্য পদার্থের উপর সংঘটিত হইয়া উভয় হইতে এক আশ্চর্য্য কার্য্য উৎপন্ন হয়। এইরূপ, পদার্থ-সমূহের ব্যাপার চলিতেছে এবং সমস্ত বিশ্বচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে। এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীর উপর এই বিশাল নভোমণ্ডলের মধ্যে এবং আমাদের ন্যায় মানবগণের রাজকীয় সামাজিক ও ব্যক্তি-সম্বন্ধীয় ব্যবহারের মধ্যে অনিবার অনন্ত শক্তির অগম্য ক্রিয়া চলিতেছে। এই শক্তি কাহার? এই শক্তি প্রত্যেক ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ, অতিসূক্ষ্ম কিংবা অতিবিশাল পদার্থের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। অতএব সমস্ত পদার্থ ঈশ্বরেরই হস্তগত। এই অভিপ্রায়েই ভগবদ্‌গীতায় উক্ত হইয়াছে:—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

অর্থাৎ “হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সমস্ত ভূতের হৃদয়দেশে বাস করেন এবং স্বকীয় বিচিত্র শক্তি দ্বারা, চক্রের উপর তাহাকে স্থাপন করিয়া ঘুরাইতেছেন,” অর্থাৎ তাহাকে দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার করাইতেছেন; কিন্তু তিনি সেই সকল ভূতের মধ্যে গূঢ়রূপে রহিয়াছেন, সেই গূঢ়রূপ অনন্ত, আত্মময় বলিয়া ইন্দ্রিয়-গোচর নহে; কিন্তু বুদ্ধির গম্য। মনুষ্যের আত্মাও কি আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়? আমাদের নিকটস্থ মিত্রের হস্তপদাদি অবয়বই আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়; কিন্তু তাঁহার আত্মা দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল বাহ্য চিহ্নের দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব জানা যায়। তদ্বৎ জাগতিক পদার্থের মধ্যে শক্তি প্রভৃতি যে চিহ্ন দেখা যায়, তাহার দ্বারাই পরমেশ্বরকে জানিতে হইবে। এবং কেবল এই সমস্ত ভূত পরমেশ্বরের শক্তিই প্রকাশিত করিতেছে তাহা নহে। কোন সুন্দর, রমণীয়, চিত্তরঞ্জক পুষ্প যে শক্তির দ্বারা ও যে যোজনায় উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তি ও যোজনা যাঁহার, তিনি না জানি কত রমণীয়, সুন্দর ও আনন্দদায়ী হইবেন। এবং এই প্রকার রম্যতা কেবল পুষ্পসদৃশ ক্ষুদ্র পদার্থের মধ্যেই আছে এরূপ নহে। এই সমস্ত বিশ্ব, চন্দ্র-সূর্য্য, নভোমণ্ডল, এই পৃথিবী, এই মহাসাগর, এই অতি উচ্চ খাড়া পর্ব্বত, এই গভীর উপত্যকা—এ সমস্তই অত্যন্ত মহৎ, রমণীয় ও আনন্দজনক এবং পরমেশ্বরের প্রভাব, উন্নতি, আনন্দ, শান্তি, সৌন্দর্য্য অনন্ততা এই সকল গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ, শান্তচিত্ত একাগ্রদর্শী ধ্যানপরায়ণ যে যোগী তাঁহার নিকট জগদীশের সেই উন্নত স্বরূপ প্রত্যক্ষ প্রকাশ পায়। হাসা, কথা কওয়া, মমতা-যোগে মুখ সুপ্রসন্ন হওয়া, আনন্দে প্রফুল্লিত হওয়া ইত্যাদি চিহ্নযোগে মনুষ্যের আত্মা, ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখা যায় সেইরূপ বিশ্বের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের মিত্রের আত্মাপেক্ষা, আমাদের আত্মার সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ অতি নিকট, অন্তরতম। মৃত্তিকাময়, বস্তুত জড় হইয়াও সচেতনের চলা-ফেরা প্রভৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ এই যে আমাদের শরীর সেই শরীরের মধ্যে পরমেশ্বরের প্রভাব কতই না বিদ্যমান! এবং চিত্তের মধ্যে, উচিতানুচিত বিবেকরূপে পরমেশ্বর ত অবতীর্ণ হইয়াই থাকেন।

এই ক্ষুদ্র সাংসারিক বিষয়ে মানবাত্মার তৃপ্তি হয় না। প্রবাসে অবস্থিতি কালে যেরূপ মনুষ্যের মনে সুখ থাকে না, এই সংসারে মানবাত্মারও ঐরূপ দশা। মনুষ্যের যে নিজ ধাম সেই পরমেশ্বর সম্বন্ধে মনুষ্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে। এইজন্য মনুষ্যের অন্তঃকরণে, আত্মায় এবং শরীরেও পরমেশ্বর আছেন। অতএব পরমেশ্বর সর্ব্বত্র, সর্ব্ব চরাচর ভূতের মধ্যে বাস করেন; যিনি সূক্ষ্মদর্শী তিনি তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষবৎ দেখেন, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দ, শান্তি ও উন্নতি প্রাপ্ত হয়।

তুমি।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল.)

এই তো তুমি সূর্য্য-আলোকে
এই তো তুমি অরুণ-আকাশে
এই তো তুমি প্রভাত-পুলকে
এই তো তুমি পুষ্প-বিকাশে।
এই তো তুমি পাখীর কণ্ঠে
গেয়ে ওঠ এমন আনন্দে
বর্ষা-ধারার গভীর ছন্দে
বেজে ওঠ দখিণ বাতাসে।
এই তো তুমি আমার হৃদয়ে
চলেছ আজ বিশ্ব-বিজয়ে
এই তো তুমি প্রাণের আনন্দে
বাজাও আমায় এমন ছন্দে;
এই তো তুমি গানে গানে
জেগেছ মোর প্রাণে প্রাণে
বর্ষা শরৎ কতই বসন্তে
লিখে গেছ হৃদয় আকাশে॥

বাবা গম্ভীরনাথ।

(অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রীশ্রী বাবা গম্ভীরনাথ যোগী সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। এই সম্প্রদায়কে নাথ সম্প্রদায়ও বলা হইয়া থাকে। আদিনাথ এই সম্প্রদায়ের প্রথম গুরু বলিয়া খ্যাত। কিন্তু গোরক্ষনাথ হইতেই এই সম্প্রদায় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গোরক্ষনাথ নিজেকে "আদিনাথকে নাতী, মচ্ছেন্দ্রনাথকে পূত, মৈঁ যোগী গোরক্ষ অবধূত" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সম্প্রদায় কতদিন হইতে প্রচলিত, তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণের মতে গোরক্ষনাথজি ত্রেতাযুগে ছিলেন। রামচন্দ্র গোরক্ষনাথজির নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের অনেক পণ্ডিত তাঁহার আবির্ভাব চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নাথসম্প্রদায়ের বিশ্বাস গোরক্ষনাথজি শিবের অবতার এবং সূক্ষ্ম শরীরে তিনি এখনও বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়।

গোরক্ষনাথজি তৎপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত নানা যোগী-সম্প্রদায়-সকলকে একত্র করিয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যোগীসম্প্রদায় প্রধানতঃ বারটী শ্রেণীতে বিভক্ত। তাই ইহাদিগকে বারপন্থী বলা হয়। ইহাদের নাম সত্যনাথী, ধর্ম্মনাথী, বৈরাগ, রাওয়াল, কাপ্‌লানী, আইপন্থী, মন্নাথী, পাগন্থী, নাটেশ্বরী, গঙ্গানাথী, রামপন্থী কছর। এতদ্‌ভিন্ন অর্দ্ধপন্থী নামে আর একটী বিভাগ আছে। ইহাদের আবার শাখাবিভাগ আছে। শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথ ধর্ম্ম-নাথ-যোগীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

নাথসম্প্রদায়ের সাধকগণের তিন প্রকার দীক্ষা বা সংস্কারের প্রচলন আছে। প্রথমতঃ মন্ত্রদীক্ষা। এই দীক্ষা পাইলে উপদেশী বা সাধকচেলা বলা হয়। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থশিষ্যগণ গুরুর উপদেশী বা সাধক চেলা বলিয়া কথিত হয়। সন্ন্যাসের প্রথম সংস্কার গুরু কর্ত্তৃক ঝুঁটি কাটা। ঝুঁটী কাটা সাধুগণ 'অওঘর' নামে পরিচিত হন। বলা বাহুল্য যে এই অওঘরদের অঘোরপন্থীদিগের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে গলদেশে 'নাদ' ও 'শেলি' লম্বিত রাখা সাম্প্রদায়িক নিয়ম। তৃতীয়স্তরে সাধুগণ গুরুকর্ত্তৃক কাণ কাটাইয়া লইয়া কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া কণ্‌ফট্ যোগী আখ্যা প্রাপ্ত হন। এই তিন প্রকার দীক্ষা যে একই গুরুর নিকট পাইতে হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই। প্রথম

দীক্ষাই প্রকৃত সাধনগ্রহণ। দ্বিতীয় দীক্ষা সন্ন্যাসের জন্য এবং তৃতীয়টা সাম্প্রদায়িক একটা বিশেষ সংস্কার। নাথসম্প্রদায়ের অনেক সিদ্ধ মহাত্মার কথা শুনা যায়, যাঁহারা ঔওঘর ছিলেন, কণ্ফট্ হন নাই। কিন্তু কণ্ফট্ হইলে সাম্প্রদায়িক হিসাবে কতকগুলি বিশেষ অধিকার জন্মে। শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথজি কণ্ফট্ যোগী ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নাদ ও শেলি ধারণ করিতেন।

শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথ হিন্দু সাধকদিগের আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন। তিনি সংসার ও যাবতীয় সুখ-ভোগের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া প্রবল বৈরাগ্য-বশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং সদ্গুরু লাভ করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সাধনে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। সিদ্ধাবস্থায় যখন তিনি লোকালয়ে বাস করিতেছিলেন এবং জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষুদিগকে মাঝে মাঝে উপদেশ ও দীক্ষাদানে অনুগৃহীত করিতেছিলেন, তখনও তিনি সদা অন্তর্মুখ থাকিতেন ও ব্রাহ্মী স্থিতির আদর্শ দেখাইতেন। স্বীয় পূর্ব্ব জীবনের ঘটনাসম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতেন না। কেহ সাহস করিয়া এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা"। এরূপ জীবনে এমন ঘটনাপুঞ্জের বাহুল্য থাকে না যাহা বাহিরের লোকে বাহির হইতে দেখিয়া একত্র করিয়া জীবনচরিত লিখিতে পারেন। সাধনজীবনের রহস্য ও ক্রমপরিণতিও নিজে ব্যাখ্যা না করিলে অন্যের পক্ষে তাহা বিবৃত করা অসম্ভব। শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধনরহস্যজ্ঞ কোন ভক্তও বরাবর নিয়তভাবে তাঁহার সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার জীবনের কোন আলেখ্য সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার উপকরণের একান্তই অভাব।

যতদূর জানা যায়, তিনি কাশ্মীর দেশের অন্তর্গত জম্বু নামক স্থানে এক রাজপুরোহিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বংশমর্য্যাদা হিসাবে যেমন উচ্চ ছিলেন, তেমনি তাঁহার বিস্তর জায়গীর ছিল। সুতরাং মানুষের অভীপ্সিত আভিজাত্য ও লৌকিক ভোগের উপকরণের কোনরূপ অভাব বাল্যজীবনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমেয়। রাজস ও তামস ত্যাগের কোন কারণ তাঁহার ছিল না। সংসারে দুঃখের ছবি দেখিয়া বা অভাবের দ্বারা তাড়িত হইয়া তিনি সংসারত্যাগী হন নাই। লোকে সাধারণতঃ যাহা কিছু চাহিয়া থাকে, তাহার অনেক জিনিষই তাঁহার সম্মুখে ছিল। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিই ছিল অন্য লোক হইতে পৃথক্। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রাণ একটা টানে পড়িয়াছিল, একটা অভাব তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল; পৃথিবীর যাবতীয় ভোগসুখে তাঁহার সে অভাব মিটাইতে, প্রাণের সে আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহাদের মন ছোট তাহাদের কাছেই সংসারটা একটা বৃহৎ পদার্থ। কিন্তু যাহাদের মন বড়, সংসার তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তাহাদের কাছে অত্যন্ত ছোট বলিয়া প্রতীত হয়। তাই তাহাদের মন এই আপাতভোগসম্পৎপরিপূর্ণ সংসারকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধে অতিক্রম করিয়া ভূমার দিকে ধাবিত হয়, কারণ যো বৈ ভূমা, তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। বাবা গম্ভীরনাথ সেই ভূমার আকর্ষণে ১৫। ১৬ বৎসর বয়সে সংসার পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন।

সেই সময়ে বাবা গোপালনাথজি নাথসম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথ-মন্দিরের মোহন্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত খ্যাত-নামা প্রভাবশালী মহাত্মা ছিলেন। বাবা গম্ভীরনাথ প্রাণে সেই তীব্র বৈরাগ্য লইয়া সদ্গুরুলাভের আকাঙ্ক্ষায় ঘুরিতে ঘুরিতে গোরক্ষপুরে আসিয়া বাবা গোপালনাথজির শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর। গোরক্ষপুরমন্দিরে অন্যান্য সাধুদের সহবাসে থাকিয়া বৈরাগ্যসাধন ও অভ্যাসযোগ সম্যক্রূপে হওয়ার সুবিধা না দেখিয়া তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে পারিলেন না। তখন তিনি অধিকাংশ সময় পরিব্রাজকভাবে নানা তীর্থে বেড়াইতে লাগিলেন, এবং যেখানে সাধনের অনুকূল স্থান পাইতেন, সেইখানেই আসন স্থাপন করিয়া সাধনে লাগিয়া যাইতেন। গোরক্ষপুর হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই তিনি কাশীতে যান।

কাশীকে বাবাজি অনেক সময় তীর্থের রাজা বলিতেন, এবং পরবর্ত্তী জীবনে যখন তিনি অনেক বাঙ্গালীকে শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়া কৃতার্থ করেন, তখন অনেক শিষ্যকে তিনি দীক্ষার পর কাশীতে পাঠাইয়া দিতেন। কাশীতে তিনি ২।৩ বৎসর থাকিয়া কঠোর সাধন করেন। তৎপর তিনি এলাহাবাদ যাইয়া ঝুঁসি নামক স্থানে গঙ্গাপারস্থিত এক গুহায় আসন গ্রহণ করেন। সেখানেও ২ বৎসর কি কিছু বেশী দিন সাধন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি নর্ম্মদার তীরে যান। নর্ম্মদা-তীরে অমরকন্টক প্রভৃতি স্থানে তিনি প্রায় ৪।৫ বৎসর ছিলেন। কোন স্থানে নির্দ্দিষ্টভাবে থাকিতেন না। কোথাও ৪ মাস, কোথাও ৬ মাস, এইরূপে নানাস্থানে সাধন করিতেন কোথাও সুবিধামত গুহা পাইলে গুহানিবাসী হইতেন। নচেৎ অধিকাংশ সময় মুক্ত আকাশতলে থাকিতেন। কথাবার্ত্তা প্রায় বলিতেন না, সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন।

নর্ম্মদা পরিক্রমার সময়ের একটী ঘটনা বাবাজি স্বয়ং কোন একটা উপলক্ষ্যে তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীশ্রীবাবা শান্তিনাথজিকে বলিয়াছিলেন। নর্ম্মদা-প্রদক্ষিণকালে তিনি তিন দিন এক ব্রহ্মচারীর কুটীরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। বাবাজি যে তিন দিন সেখানে ছিলেন, সেই তিন দিনই একটা প্রকাণ্ড সর্প ফণা বিস্তার করিয়া বাবাজীর সম্মুখে আসিত এবং কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যাইত। বাবাজিও দেখিয়া ধ্যানস্থ হইতেন। এরূপ সর্প তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তিন দিন পরে ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে কথাপ্রসঙ্গে বাবাজি সর্পের বিবরণ বলিলেন। ব্রহ্মচারী অবাক্ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন "আমি এই সর্পটাকে দেখিবার উদ্দেশ্যেই কুটীর বাঁধিয়া ১২ বৎসর যাবত এখানে আছি, কিন্তু দর্শন পাই নাই; আর আপনি আসিয়াই তিন দিনেই এই মহাত্মার দর্শন পাইলেন; আপনি বড় ভাগ্যবান"।*

* কোন্ সূত্রে সর্পটী মহাত্মা বলিয়া গৃহীত হইল, জানিতে পারিলে ভাল হইত। সাধকদিগের সম্বন্ধে কিরূপ অলৌকিক গল্প রটিত হয়, তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই গল্পটী পরিত্যাগ করি নাই। তঃ সং

এইরূপে পরিব্রাজক অবস্থায় সাধন ও তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া তাঁহার কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়। এই সময় মাঝে মাঝে গুরুর দর্শন ও সেবার জন্য গোরক্ষপুরে আসিতেন, কিন্তু বেশী দিন থাকিতেন না।

সন্তান।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

মা, তোর চরণ দু'টী করিয়া সম্বল
বিশ্ব মাঝে মুক্ত করে দিয়েছি হৃদয়,
সাজায়ে পূজার অর্ঘ্যে তপ্ত আঁখিজল
শুনেছি আশ্বাস বাণী—পেয়েছি অভয়!
কে আজি উপেক্ষা করে দূরে সরে যায়,
কে করে মা বক্ষে মোর অশনি আঘাত,
নাহি আর অবসর—ভাবি না বৃথায়,
হইয়াছে অন্ধকারে কিরণ সম্পাত!
তুমি আর আমি আছি, আছে মা তোমার
অপার করুণাধারা ঘেরিয়া আমায়;
হাসি-খেলা-গান সদা শুধু দু'জনার—
নন্দন আনন্দ একি বুঝি বা ধরায়!
দীন হই, হীন হই, হই মা অজ্ঞান,
তবু তুমি মা আমার! আমি মা সন্তান!

বাদামি ও নিকটবর্ত্তী স্থান।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

বলা বাহুল্য দাক্ষিণাত্যে প্রাকৃতিক শোভা, পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতিস্বরূপ পুরাতন দেবমন্দির, রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, গুহামন্দির ও অতুলনীয় জলপ্রপাত প্রভৃতি নানা বিষয় দেখিবার ও জানিবার আছে। ইহাকে বিশ্বকর্ম্মার ক্রীড়াস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে খৃঃ ১৯০৫ সালে বর্ত্তমান ভারতসম্রাটের সহিত Mr. Sidney Low নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক আসিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়া A Vision of India নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তকে দাক্ষিণাত্যসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:—

It is a commonplace to observe that the South is the India of the picture-books;

but one cannot help repeating :the saying, for its truth is self evident. Here at last you can find that for which you have been searching, with expectant and baffled gaze, for many weeks. The brown deserts of Rajputana, the stony hills of the Boarder land, the rock walls and snow-capped pyramids of the Himalayas, the bare rifted plains of the upper Ganges valley, the rice fields of Lower Bengal, the forts and tombs and palaces of the old royal cities, all these are interesting enough. But they are not the India of tradition, the India of our youth, and in the midst of them we are sometimes impelled to ask where India—the real India is going to begin. It begins when the night mail from calcutta has carried you clear of Orissa &c.

যে ব্যক্তি অজন্তা, এলোরা, কার্লী, বাদামী প্রভৃতির গুহামন্দির, বিজাপুর, বিজয়নগর প্রভৃতি রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, বেলুর, মাদুরা, তাঞ্জোর প্রভৃতির দেবমন্দির এবং গর্সপা, শিবসমুদ্রম, দুধ-সাগর প্রভৃতি জলপ্রপাত দেখিবার সুবিধা পান নাই তিনি সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলেও সম্পূর্ণরূপে পর্য্যটনসুখ লাভ করিতে পারেন নাই। জনৈক বিদেশীয় পর্য্যটক লিখিয়াছেন :—

Until one has seen the falls of the Cauvery (Sivasamudram) and Gersoppa, and the high Mysore Plateau ; until one has visited Seringapatam, Bijapur and Vijayanagar that ancient and romantic capital of a now-forgotten empire, the glories of a part of India brimful of interest to the student alike of past events, current problems and future possibilities will remain unrealized.

এই সকল কারণে আমি আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে কয়েকটি চিত্র পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ইহা দ্বারা যদি একটি মাত্র বাঙ্গালীরও এই সকল স্থান দেখিবার ইচ্ছা জন্মে তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বাদামি।

(বাদামীর প্রাচীন নাম বাতাপিপুরী বা বাতাবিপুরী।

বাতাপি নামক রাক্ষসের নাম অনেকেই অবগত আছেন। এই বাতাপি দাক্ষিণাত্যে প্রজাদিগকে অতিশয় উৎপীড়ন করিত। মহামুনি অগস্ত্য ইহার বিনাশসাধন করিয়া স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

এই বাতাপি রাক্ষসের রাজধানী বাতাপি নগর এক্ষণে বাদামি বলিয়া পরিচিত। ইহা বম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত বিজাপুর জেলার একটি ক্ষুদ্র সহর। ইহা মাদ্রাজ সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ের হুটগি-গড়গ শাখার বাদামি ষ্টেসন হইতে প্রায় ২॥০ মাইল দূরবর্ত্তী।

পুরাকালে ইহা প্রথম চালুক্য রাজবংশের রাজধানী ছিল। উক্ত বংশের ৯ জন রাজা প্রায় ২০০ বৎসরকাল বাদামি নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তম্মধ্যে, প্রথম পুলোকেশী, কীর্ত্তিবীর্য্য, দ্বিতীয় পুলোকেশী এবং বিক্রমাদিত্যের নামই প্রসিদ্ধ। ইঁহারা মৌর্য্য, কন্দল, কুলচির, রাষ্ট্রকুট, গঙ্গা, লাট, মালব, গুর্জ্জর, কলিঙ্গ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুলকেশী প্রায় ১০০ জাহাজ লইয়া নৌপথে পুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহারই সময়ে রাজা হর্ষবর্দ্ধন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইনি পারস্যরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রেরিত দূতকে স্বীয় রাজসভায় স্থান দিয়াছিলেন। রাজা পুলোকেশী কর্ত্তৃক পারস্যদূতের অভ্যর্থনার চিত্র অজন্তা গুহার মধ্যে খোদিত আছে। চীনদেশীয় পর্য্যটক হুয়েন সাং তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে রাজা পুলকেশীর রাজসভার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং টলেমিও বাদামি নগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মোট কথা, এক সময় অর্থাৎ খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে বাদামি নগর উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। বাদামি নগরটি দেখিলে চালুক্যবংশের আদিপুরুষের রাজা প্রথম পুলকেশীর অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নগরটির উত্তর ও দক্ষিণদিকের দুইটি উচ্চ

পর্ব্বতমালা যেন বাহুবেষ্টন করিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছে। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যে এবং সহরের পূর্ব্ব দিকে একটি কৃত্রিম হ্রদ এবং তাহার উত্তরদিকে অনেকগুলি পুরাতন মন্দির বর্ত্তমান আছে।

উত্তরদিকের পাহাড়ের উপর বাদামির গিরি-দুর্গ। অতি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া এই দুর্গে আরোহণ করিতে হয়। অন্য কোন দিক দিয়া যাইবার উপায় নাই। সুতরাং স্বাভাবিক উপায়ে দুর্গটি বিশেষরূপে সংরক্ষিত। দুর্গের উপরেও কতক-গুলি দেবমন্দির আছে।

কিন্তু দক্ষিণ দিকের পাহাড়টিই বিশেষপ্রসিদ্ধ। এই পাহাড়ে চারিটি গুহা-মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটি শিবমন্দির, দুইটি বিষ্ণুমন্দির এবং চতুর্থটি জৈনমন্দির। এই গুহাগুলি, অজন্তা, এবং ইলোরার গুহা হইতে আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও কারুকার্য্য হিসাবে নিকৃষ্ট নহে। নানা দেশ হইতে পর্য্যটকগণ এই গিরিগুহামন্দির দেখিতে আসেন। ইহা চালুক্যবংশের লুপ্ত রাজ্যের গৌরব রক্ষা করিতেছে।

প্রথম গুহাটি শিবমন্দির। ইহা সহরের সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় ৫০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া এই গুহায় উপস্থিত হইতে হয়। সোপানাবলীর উভয় পার্শ্বে নানা-কৃতি শিবদূতগণের বামনমূর্ত্তিসকল খোদিত আছে; তৎপরে রোয়াকের পূর্ব্বদিকে পাঁচ ফুট উচ্চ অষ্টাদশ-বাহু-বিশিষ্ট বিরাট তাণ্ডবনৃত্যশীল শিব-মূর্ত্তি। ইহার পর একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে মহিষমর্দ্দিনী, তাঁহার বামদিকে গণপতি এবং দক্ষিণে দেবসেনাপতি কার্ত্তিক।

তৎপরে আমরা প্রথম বারান্দায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দক্ষিণে চতুর্ভুজ অর্দ্ধনারীশ্বরের বিরাট মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি আধ শিব আধ শক্তি। শিবা-ঙ্গের পার্শ্বে নন্দী নামক বৃষভ এবং কঙ্কালাবশিষ্ট ভৃঙ্গি দণ্ডায়মান আছে এবং শক্তি অঙ্গের পার্শ্বে সম্ভবতঃ দুর্গাসহচারিণী জয়া। কালিকা পুরাণ মতে এক সময় হর পার্ব্বতীকে বলিলেন স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। এস আমরা আজ অর্দ্ধ অঙ্গের বিনিময় করি। আমার অঙ্গের অর্দ্ধভাগ তোমাকে দিলাম। তোমার অর্দ্ধভাগ আমাকে প্রদান কর। ইহাতে পার্ব্বতী সানন্দে স্বীকৃত হইলে এই অর্দ্ধনারী অর্থাৎ শিবদুর্গার সংযোগমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য এই মূর্ত্তির দক্ষিণ অঙ্গ শিব এবং বাম অঙ্গ শক্তি। এই মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর। শিবাঙ্গের মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র গলদেশে হাড়মাল এবং হস্তে একটি ফণী জড়িত আছে। যজ্ঞোপবীতের শিব অংশে সর্প। কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম—সর্প বন্ধনী। হস্তে সর্প কঙ্কন। শক্তি অঙ্গে অর্দ্ধকবরী, রত্নমুকুট, কর্ণে কুণ্ডলাদি, হস্ত, কটিদেশ এবং পদ যুগল নানা অলঙ্কারে ভূষিত। জয়ার অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কা-রাদি আছে। এই সকল অলঙ্কারাদি এ দেশের তৎকালীন প্রচলিত অলঙ্কারাদির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ইহার সম্মুখে বারাণ্ডার অপর দিকে চতুর্ভুজ হরিহর মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির শিবাঙ্গে, এক হস্তে ডম্বুর অপর হস্তে সর্পবেষ্টিত দণ্ড—শিরোদেশে অর্দ্ধ-চন্দ্রাংশ, বন্ধনীতে সর্প। অপরার্দ্ধে মস্তকে মোহন-চূড়া, এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্ত কটিদেশে ন্যস্ত আছে।

দ্বিতীয় বারান্দার মধ্যস্থলে শিববাহন বৃষ। দেওয়ালে কোন চিত্র নাই। তৃতীয় ও চতুর্থ বারান্দায় কোন মূর্ত্তি নাই। তৎপরে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছে। চারিটি মধ্য এবং দুইটি পার্শ্বস্তম্ভ।

তৎপরে আমরা আবার সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় গুহায় উপস্থিত হইলাম। এটি বিষ্ণুমন্দির। এখানেও চারিটি মধ্য-স্তম্ভ এবং দুইটি পার্শ্বস্তম্ভবিশিষ্ট চারিটি বারান্দা আছে। এবং তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দেবতার স্থান। এক্ষণে এই প্রকোষ্ঠ মধ্যে কোন দেবমূর্ত্তি নাই। কেবলমাত্র একটি পীঠ বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ এই পীঠটি পরে নির্ম্মিত হইয়া তথায় রক্ষিত হইয়াছে। কারণ বিষ্ণুমন্দিরে ঐরূপ শিবপীঠ থাকিবার কোন কারণ নাই। এই গুহাটির সহিত প্রথম গুহার কারুকার্য্যের অনেক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ একের অনুকরণে অপরটি খোদিত হইয়াছিল।

রোয়াকের দুই পার্শ্বে ছয় ফিট উচ্চ দ্বাররক্ষকের প্রতিমূর্ত্তি। প্রথম বারান্দার বামদিকে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ বরাহমূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির বামপদ পঞ্চফণাবিশিষ্ট নাগকুণ্ডলীর উপর রক্ষিত। ইহার বামহস্তে পদ্মের উপর পৃথিবী দণ্ডায়মান। পাঠকগণ অবগত আছেন যে হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্য পৃথিবীকে হরণ করিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রস্থান করে। বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তথা হইতে তাঁহাকে পুনরায় লইয়া আসেন।

বারান্দার দক্ষিণদিকে বামন অবতারের বিরাট মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই মূর্ত্তি অষ্টবাহু—দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে চক্র, খড়্গ, গদা এবং বাণ এবং বাম হস্তত্রয়ে শঙ্খ, ধনু এবং চর্ম্ম ধারণ করিয়া আছেন। অবশিষ্ট হস্তটি দশনবিকশিত রাহুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে। রাহুর কিঞ্চিৎ উপরে অর্দ্ধচন্দ্র মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির সম্মুখে পাঁচ ছয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে। ইহার মধ্যে একটি বলিরাজার, দ্বিতীয়টি তাঁহার পুরোহিত শুক্রের এবং তৃতীয়টি বলিরাজমহিষীর। চতুর্থটি রাহুর এবং অপরগুলি সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা যায় না।

ইহার পর আমরা আবার কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিয়া তৃতীয় গুহায় উপস্থিত হইলাম। এই গুহাটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং কারুকার্য্য-শোভিত। এই গুহার শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায় যে, ইহা ৫৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম পুলোকেশীর পুত্র মঙ্গলীশ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার প্রথমে একটি ক্ষুদ্র রোয়াক, তৎপরে ছয়টি স্তম্ভ এবং দুইটি অর্দ্ধস্তম্ভ-বিশিষ্ট বারান্দা। ইহার পর সম্মুখে চারি স্তম্ভবিশিষ্ট একটি বারান্দা, তাহার পর একটি চতুষ্কোণ দালান, তৎপরে অপর গুহার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দেবতার স্থান। এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে দ্বিতীয় গুহার ন্যায় কেবলমাত্র একটি পীঠ আছে; কোন দেবমূর্ত্তি নাই। প্রথম বারান্দাটী প্রায় ৭ ফিট দীর্ঘ এবং ভিতরের বারান্দা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬৫ ফিট। বাহিরের থাম হইতে ভিতরে মন্দিরের দেওয়াল পর্য্যন্ত ৪৯ ফিট। ভিতরের প্রকোষ্ঠ প্রায় ১১ ফিট গভীর। উচ্চতায় প্রায় ১৫ ফিট। দালানের দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া বারান্দা আছে। প্রথম বারান্দার পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কুণ্ডলীকৃত শেষ-নাগের উপরে উপবেশিত আছে। তাহার মস্তকের উপর শেষ-নাগের পঞ্চ ফণা চক্র ধারণ করিয়া আছে। বিষ্ণুর বামদিকের সম্মুখের হস্তটী তাঁহার উরুদেশে স্থাপিত আছে। পশ্চাতের হস্তে শঙ্খ এবং দক্ষিণ দিকের সম্মুখের হস্তে মোক্ষফল ও পশ্চাতের হস্তে চক্র শোভা পাইতেছে। বিষ্ণুর দক্ষিণ দিকে গরুড় কুণ্ডলীকৃত শেষনাগের গায়ে ঠেস দিয়া বিশ্রাম করিতেছে এবং বামদিকে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি সম্ভবতঃ বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী উপবিষ্টা আছেন। এই মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে ফণাধারী দুই নারীমূর্ত্তি, সম্ভবতঃ শেষনাগপত্নী চামর ধারণ করিয়া আছে। বিষ্ণুমূর্ত্তির নিকট বামদিকে দ্বিতীয় গুহার অনুরূপ একটী বরাহমূর্ত্তি।

রোয়াকের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে বামনঅবতারের দ্বিতীয় গুহাস্থিত অপেক্ষা বৃহদাকার বিরাট মূর্ত্তি। তৎপরে প্রথম বারান্দার পশ্চিমদিকের দেওয়ালে চতুর্ভুজ নরসিংহমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির সম্মুখে এক দিকে বালক প্রহ্লাদ এবং অপরদিকে গরুড়। ইহার বামহস্ত একটী গদার উপর ন্যস্ত আছে। পশ্চাতের বাম এবং দক্ষিণ হস্তে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে।

এই মূর্ত্তির দক্ষিণদিকে অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ প্রাচীরে হরিহরমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

প্রথম বারান্দার ছাদে সাতটী চিত্র খোদিত আছে। একটী মৎস্য চক্র। দ্বিতীয়টিতে চিত্রিত গোলকের মধ্যে বৃষবাহনে শিবদুর্গা। তৃতীয়টিতে শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি। চতুর্থটিতে মকর চিহ্নধারী দ্বিভুজ কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের প্রতিকৃতি, পঞ্চম চিত্রে ঐরাবতপৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র এবং তাঁহার মহিষী, ষষ্ঠ চিত্রে হংসবাহনে ব্রহ্মা, এবং সপ্তম চিত্রে মকরবাহনে কামদেব মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

দালানের ছাদটি নয়ভাগে বিভক্ত। মধ্যভাগে মেষবাহনে অগ্নি এবং আরও কয়েকটি মূর্ত্তি আছে। এতদ্ভিন্ন অপর আটটি ভাগেও নানারূপ চিত্র অঙ্কিত বা খোদিত আছে।

তৃতীয় গুহার পূর্ব্বদিকের গুহাটি জৈনমন্দির। এই গুহাটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাতে প্রথমে চারিটি মধ্যস্তম্ভ এবং দুইটি পার্শ্বস্তম্ভবিশিষ্ট

একটি বারান্দা; তৎপরে দুইটি পার্শ্ব স্তম্ভ এবং দুইটি মধ্যস্তম্ভবিশিষ্ট আর একটি বারান্দা রহিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে ভিতরের বারান্দার দুই পার্শ্বে গৌতম স্বামীর মূর্ত্তি এবং পরেশনাথের নগ্ন মূর্ত্তি আছে। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭॥০ ফিট্। এতভিন্ন আরও কয়েকটি নগ্ন মূর্ত্তি আছে। জৈন মন্দিরটি দীর্ঘে প্রায় ৩১ ফুট এবং প্রস্থে ১৯ ফুট।

বাদামি হইতে প্রায় ৩॥০ মাইল দূরে পরেশগড়। এখানে এক বনশঙ্করী নামক সিংহবাহিনী দুর্গামূর্ত্তি আছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণের দীপাবলির জন্য তিনটি ইষ্টকনির্ম্মিত স্তম্ভ আছে। মন্দিরের বাহিরে একটি বৃহৎ বাঁধা পুষ্করিণী। উহার তিন পাড়ে ছায়াবিশিষ্ট পথ আছে এবং সম্মুখে একটি সুন্দর ছোট দ্বিতল গৃহ। এই পুষ্করিণীর জল সর্ব্বদা গরম থাকে। সিংহদ্বারে একখানি প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহদাকার রথ আছে। প্রতি বৎসর জান্তুয়ারী মাসে এখানে একটি বড় মেলা হয়।

এখান হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে মলপ্রভা নদীর তীরে ঋষিকুল বিদ্যালয়ের অনুকরণে বীরশৈব অর্থাৎ লিঙ্গায়তগণ একটি আশ্রম এবং বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই মঠ ১৯০৯ খৃঃ শ্রীইঙ্গলকুমার মহাস্বামী নামক জনৈক লিঙ্গায়াত গুরু কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এক্ষণে এই মঠের প্রায় ৩০০ একর জমি আছে। ইহার মূল্য ৩০,০০০ টাকা হইবে। এতদ্ভিন্ন আর আর সম্পত্তির মূল্য ৫০।৬০ হাজার টাকা হইবে। বর্ত্তমান বাৎসরিক আয় প্রায় ১০,০০০ টাকা। সোলাপুর নিবাসী রায়বাহাদুর মালাপ্পা ওরফে আব্বা সাহেব ওয়ারেদ ইহার প্রথম সভাপতি ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর বেলগাঁও নিবাসী কানাবর্গী মঠের রাওসাহেব শিবমূর্ত্তি স্বামী ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভি, এস, শ্রেষ্ঠী নামক একজন গ্রাজুয়েট ইঁহার অধ্যক্ষ।

সাধারণ মঠের একতলা পাকা গৃহ আছে। এই গৃহে নির্ম্মিত কৃত্রিম গুহা আছে। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ এই স্থানে যোগ ও সমাধি সাধনা করিয়া থাকে। গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি ইহার সন্নিকটে রক্ষিত আছে।

সাধারণ মঠ হইতে কিছু দূরে ছাত্রনিবাস। এখানে স্ত্রীলোকদিগের আসিবার অধিকার নাই। ছাত্রদিগের মধ্যে ১৩ জন শিশুদিগের প্রাথমিক শ্রেণী ভুক্ত। ইহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠের বয়স প্রায় পাঁচ বৎসর। বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা ২০ জন। ইহারা সংস্কৃত শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া থাকে এবং যোগাদি অভ্যাস করিয়া থাকে।

মঠের একদিক দিয়া মলপ্রভা নদী একটি ক্ষুদ্র প্রপাতের উপর দিয়া ভীষণ গর্জ্জনের সহিত প্রবাহিত হইতেছে। অপর তিন দিকে পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে সমতল ভূমি। এই সকল স্বাভাবিক দৃশ্য দেখিলে আশ্রমকর্ত্তা স্বামীজীর স্থাননির্ব্বাচনশক্তির প্রসংশা না করিয়া থাকা যায় না।

এখান হইতে বাদামি অভিমুখে প্রায় তিন মাইল যাইলে মহাকুট নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। এখানে এক প্রাঙ্গণ মধ্যে একটি প্রধান এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র শিবমন্দির আছে। একখানি প্রস্তরখণ্ডে ধেনুচারী বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। এই স্থানটি দাক্ষিণাত্যের কাশী বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি পাকা নাতিগভীর পুষ্করিণী। তাহার স্বচ্ছ সলিল মধ্য হইতে ঝরনার জল উঠিতেছে দেখা যায়? যাত্রীগণ এখানে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে এই পুষ্করিণীর জলে স্নান করিয়া থাকে। ইহা গঙ্গার সমতুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

তৎপরে পাহাড়ের শিখরদেশ দিয়া প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা আবার বাদামিতে প্রত্যাগমন করিলাম।

বাদামির সন্নিকট পট্টদকল এবং অদ্বিবাণী নামক আরও দুইটী প্রসিদ্ধ স্থান আছে।

৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।*

বিগত ২৩:শ মে, অপরাহ্ণ ৬টার সময়, ভবানীপুর কিংস পার্কে, মাননীয় স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভারতবন্ধু খ্যাতনামা স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর উনষষ্টিতম সাম্বৎসরিক স্মৃতি-সভা অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা, ভবানীপুর, বালীগঞ্জ, কালীঘাট, চেতলা প্রভৃতি স্থানের গণ্যমান্য প্রায় এক হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। হরিশবাবু

* নানা কারণে এই বিবরণ যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে পারে নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত। তং সং

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের অনৈক প্রতিষ্ঠাতা ও উহার সম্পাদক ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ্য বক্তৃতা দ্বারা শিক্ষিত যুবকদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁর অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি যদিও রাজনৈতিক বিষয়ে নিয়োজিত ছিল, তাহা হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে তিনি শিথিলপ্রযত্ন ছিলেন না। পাঁচটী বক্তৃতা তিনি সমাজমন্দিরে দেন। উক্ত সমাজের অধীন "সত্যজ্ঞান-সঞ্চারিণী সভা" সেই সকল বক্তৃতা ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। কেবল Ethics of Bhagabatgita" মুদ্রিত হয় নাই এবং তাহার পাণ্ডুলিপিও হরিশ বাবুর মৃত্যুর পর পাওয়া যায় নাই। বাকী চারিটার মধ্যে "Utility Of Public Worship" সম্বন্ধে শ্রীরামপুরের তৎকালীন "Fainedy Of India" সংবাদ পত্র লেখেন যে, কোনও ইংরাজ পাদরি নিশ্চয় ইহার লেখক হইবেন। "Hindu Patriot" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক হরিশবাবু পরবর্ত্তী সপ্তাহের কাগজে লেখেন যে ইংরাজ পাদরি নহেন, এক খাঁটি কুলীন ব্রাহ্মণ উক্ত বক্তৃতার প্রণেতা। বহুদিন পরে শ্রীমদ্ মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের একজন ছাত্র শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত চারিটী বক্তৃতা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করেন। তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে হরিশবাবু কিরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সরকারের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের পোষকতায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে স্মৃতিসমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের রচিত একটী সুন্দর কবিতা পঠিত হয়। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক গত কয়েক বৎসরের কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। উক্ত পার্কে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন "হরিশ মুখার্জির" নামে রাস্তার নামকরণ, সিপাহীবিদ্রোহ, অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত করা; এবং নীলকর প্রপীড়িত প্রজাবর্গের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে "Hindu Patriot" পত্রিকার হরিশবাবুর লিখিত প্রবন্ধ-গুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ; এবং এ বৎসর তাঁহার বাসভবনের ভূখণ্ডের একাংশের উপর শ্রীযুক্ত অজয়নাথ মিত্রের ত্রিতল বাটীর গায়ে শ্বেত প্রস্তর-ফলক স্থাপন, করা উক্ত সমিতির কার্য্য। "হরিশ মুখার্জ্জি রোড" হরিশ বাবুর বসত বাটীর উপর দিয়া যাওয়ায় তাহার চিহ্নমাত্র নাই। বদান্যবর রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র মিত্র ও রায়বাহাদুর রাধাচরণ পাল হরিশবাবুর গুণকীর্ত্তন করেন। তাহার পর সভাপতি মহাশয় অভিভাষণে বলেন যে হরিশ বাবুর জীবন রাজনৈতিক ব্যাপারে বিশেষ-ভাবে বিজড়িত। বিস্তারিতভাবে তাহার সমালোচনায় তাঁহার মুখ বন্ধ। আর এক মাস পরে সে বন্ধন হইতে তিনি মুক্ত হইবেন সর্ব্বশেষে সভার সকলে সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে অগ্রসর হয় তৎকর্ত্তৃক উক্ত স্মৃতিফলক উন্মোচিত হইলে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভা ভঙ্গ হয়।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

সমাজগৃহ সংস্কারার্থ দানপ্রাপ্তি।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টীগণ সমাজগৃহ-সংস্কারার্থ নিম্নলিখিত দান কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছেন।

ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজ	৫০৲
মাননীয় চীফ জষ্টিস্ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	২৫৲
,, বি, সি, মিত্র	১৫৲
,, আশুতোষ চৌধুরী	১০৲
রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	১০৲
,, ,, যোগেশচন্দ্র মিত্র	৫৲
,, ,, দেবেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
,, ,, শিতিকণ্ঠ মল্লিক	১০৲
,, ,, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	১৫৲
মাননীয় জষ্টিস সি, সি, ঘোষ	৫৲
,, পি, সি, মিত্র	৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস রায় চৌধুরী	৪৲
,, ,, ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী	২৲
,, ,, প্রফুল্ল চন্দ্র মিত্র	২৲
,, ,, রমেশচন্দ্র মিত্র	২৲
,, ,, বামাপদ চৌধুরী	১৲
,, ,, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	১৲
,, ,, ক্ষেত্রপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,, ,, কৃষ্ণচন্দ্র দে	১৲
,, ,, ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার	১৲
ডাঃ আর, এন, দত্ত	২৲
জনৈক বন্ধু	॥০
সমষ্টি	১৮১॥০

১৩২৬ সালের

কর্ম্মচারী নিয়োগ।

ট্রাষ্টীগণ।

Dr. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর D. L. T.
শ্রীযুক্ত বামাপদ চৌধুরী B. L.
" চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় B. L.
" শিতিকণ্ঠ মল্লিক

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর M. A. B. L. সভাপতি

শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী B. L.
" সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক M. A. B. L
ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসু
} সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় B. L.
" শিতিকণ্ঠ মল্লিক
} সহযোগী সম্পাদক

" পাঁচুগোপাল মল্লিক সহকারী সম্পাদক

১৩২৬ সালের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়—

পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৬৷১৫ (১৩২৫)
মাসিক দান	...	১১৯৪৲
বার্ষিক উৎসবের এককালীন দান		১০৲
ইলেক্‌ট্রিক্‌ সপ্লাই আফিস হইতে সুদ প্রাপ্তি		১৷৹
পুরাতন বরগা বিক্রয়ের মূল্য	...	২৲
অতিরিক্ত বালি, সুরকী, বাঁশ ও দড়ি বিক্রয়ের দাম	...	১৲
সম্মিলন সমাজ হইতে ইলেক্‌ট্রিক্‌ খরচ প্রাপ্ত	...	১৶৹
দানাধারে প্রাপ্ত	...	৴১৹ দুই পয়সা
সম্মিলন সমাজ হইতে একটি সেডের দাম প্রাপ্ত	...	১৷৹
সমাজগৃহসংস্কার জন্য এককালীন দান	...	১৭১৷৹
	সমষ্টি	৪৭৮৶৫

ব্যয়

সমাজগৃহ সংস্কারের ব্যয়	...	২২১৸১৹
সমাজ রক্ষকের বেতন	...	৫৬৷১৹
আচার্য্যদিগের পাথেয়	...	৫০৸৶৹
আলোক ও পাখা	...	২৭॥৴১৹
মুদ্রাঙ্কন	...	৯॥১৹
গায়ক ও বাদকের পাথেয়	...	৩৶৹
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়	...	২৩৸১৫
	সমষ্টি	৩৯৩৲ ১৫
(গতবৎসরের) মোট আয়	...	৪৭৮৶৫
" " ব্যয়	...	৩৯৩৲১৫
হস্তেস্থিত—১লা বৈশাখ, ১৩২৭ বাং		৮৫॥৶১৹

মাসিক দান প্রাপ্তি।

স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের ষ্টেট	...	২২৲
রায় যোগেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুর	...	৬৲
রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর	...	৬৲
মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র	...	১২৲
শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী	...	৬৲
" প্রিয়নাথ মল্লিক	...	৬৲
" বামাপদ চৌধুরী	...	৭৲
" সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক	...	৫৲
" আদ্যনাথ বসু	...	৩৲
" প্রিয়শঙ্কর মজুমদার	...	৩৷৹
" রমেশচন্দ্র মিত্র	...	৩৷৹
" জগবন্ধু মল্লিক	...	৩৲
" সনৎকুমার চৌধুরী	...	১২৲
" শিতিকণ্ঠ মল্লিক	...	১২৲
" ক্ষেত্রপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৷৹
" কালিদাস রায় চৌধুরী	...	১২৲
" পাঁচুগোপাল মল্লিক	...	৩৲
" হৃষীকেশ হালদার	...	১৩৲
" নিবারণচন্দ্র বসু	...	৩৲
" মনোরঞ্জন মল্লিক	...	১৩৲
" প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র	...	৬৲
রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এবং ভ্রাতাদ্বয়...		৫০৲
স্যার বি, সি, মিত্র	...	১২৲
মাননীয় চীফ জষ্টিস স্যার এ, টি, মুখার্জ্জী	...	১৮৲
	সমষ্টি	১১৯৪৲

বার্ষিক উৎসবের জন্য এককালীন দান।

রায় যোগেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুর	...	১৲
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক	...	২৲
" ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী	...	৩৲
" রমেশচন্দ্র মিত্র	...	৫৲
" ক্ষেত্রপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	॥৹
" সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক	...	॥৹
	সমষ্টি	১০৲

সমাজগৃহ সংস্কারার্থ এককালীন দান।

মাননীয় চীফ জষ্টিস স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়		২৫৲
স্যার বি, সি, মিত্র	...	১৫৲
মাননীয় শ্রীযুক্ত জষ্টিস সি, সি, ঘোষ	...	৫৲
" পি, সি, মিত্র	...	৪৲
রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর	...	৫৲
রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর	...	১০৲
রায় যোগেশচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর	...	৫৲
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০৲
" ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী	...	২৲
" শিতিকণ্ঠ মল্লিক	...	১০৲
ডাক্তার আর, এল, দত্ত	...	২৲
শ্রীযুক্ত বামাপদ চৌধুরী	...	৯৲
" প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র	...	২৲
" রমেশচন্দ্র মিত্র	...	২৲
" কালিদাস রায় চৌধুরী	...	৪৲
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	...	১৫৲
" চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	...	১৲
" ক্ষেত্রপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৲
" কৃষ্ণদাস দে	...	১৲
" ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার	...	১৲
" সমাজের জনৈক বন্ধু	...	৷৹
" সম্মিলনী ব্রাহ্মসমাজ	...	৫০৲
	সমষ্টি	১৭১৷৹

পোষ্টাফিস ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে এই হিসাব ঠিক করা হইয়াছে।

১লা বৈশাখ, ১৩২৭ সাল।

শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক।
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক,
শ্রীবামাপদ চৌধুরী,
শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়,
ট্রাষ্টীগণ।

দিন গেল।

(কুড়ানো গান)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত)

বৃথা দিন গেল ওহে হরি
তোমার ভজন সাধন কখন্ করি ?
প্রভাত শর্ব্বরী উঠি' মনে করি
ভকতি কুসুম চয়ন করি ;
তোমার এমনি মায়াযোগ
হয় না যোগাযোগ—
সারা দিনটা ঘুরে মরি।
ভূতের বেগার খেটে মরি—
পলাইব মনে করি
পথ নাহি খুঁজে পাই।
ওহে দয়াল হরি
দাও হে চরণতরী
নইলে অকূলে ডুবে মরি।

বঙ্গের জমিদার।

(শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত)

স্মরণীয় কাল হইতে বঙ্গদেশে জমিদারশ্রেণী অল্প বা বিস্তর রাজশক্তি পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। অতি প্রাচীনকালে যখন ভারতীয় হিন্দুগণ স্বাধীন ছিলেন, তখন বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজন্যবর্গ ভারতভূমিকে শাসন করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন শক্তিশালী রাজা যখন প্রতিবেশী রাজন্যবর্গকে স্বীয় বাহুবলে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতেন, তখন তিনি রাজচক্রবর্ত্তী বা সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া ঐ সকল পরাজিত রাজন্যবর্গের নিয়ামক ও তাঁহাদের নিকট হইতে কর বা উপঢৌকন গ্রহণে অধিকারী হইতেন ; কিন্তু আভ্যন্তরিক শাসনকার্য্য ঐ সকল সামন্ত রাজগণ স্বীয় রাজত্ব মধ্যে অবাধে পরিচালন করিতেন। তন্মধ্যে কেহ অত্যাচারী বা রাজচক্রবর্ত্তীর বিরোধী হইলে যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা তাহা মীমাংসিত হইত। তখন প্রত্যেক সামন্ত-নরপতি ক্রমশঃ বল সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং চক্রবর্ত্তী হইবার জন্য সচেষ্ট থাকিতেন ও তাহার পরিণামে নানা বিপ্লব উপস্থিত হইত। মুসলমানশাসনকালেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। দিল্লির সম্রাটের অধীন সামন্তরাজগণ এবং সম্রাট-নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ সুযোগ পাইলেই স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহাদের দমন করিবার জন্য দিল্লীশ্বরকে চিরজীবন যুদ্ধের আহবে ও অশান্তির দাবানলে দগ্ধ হইতে হইত। হিন্দু-রাজন্যগণ কখনও চিরশান্তভাবে মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ইংরাজশাসনের প্রথম অবস্থায়ও এইরূপ অশান্তি বিদ্যমান ছিল। ১৮৫৭ খৃঃঅব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংরাজের সাম্রাজ্যছায়ায় এই অশান্তি দূর হইয়াছে সত্য কিন্তু তথাপি সীমান্ত প্রদেশের অশান্ত জাতিগুলিকে অধীনে রাখিতে ইংরাজরাজকেও এখনও মধ্যে মধ্যে সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া শাসন করিতে হয়।

প্রাচীন ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নরপতিগণের অধীন বিভিন্ন প্রদেশে নগরে বা গ্রামে স্তরে স্তরে বিভিন্ন অধিনায়কগণ দেশশাসনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ইহা অনেকাংশে ইংলণ্ডের feudal system এর অনুরূপ ছিল। এই প্রণালী কালে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে জমিদারশ্রেণীর অভ্যুদয় হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ যখন দ্বাদশ ভৌমিক বা বার ভুঁইয়ার শাসনাধীন, তখনও এই নীতি বিদ্যমান ছিল। আকবর বাদশাহের দক্ষিণহস্তস্বরূপ রাজপুতবীর মহারাজ মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তৎকর্ত্তৃক পিঞ্জরাবদ্ধ বঙ্গের শেষ সূর্য্য যশোহরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের রাজন্যকুলের অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। এই দুর্দ্দিনের পর হইতেই বঙ্গভূপতিগণ ক্রমশঃ জমিদারপদবীতে অবনমিত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু তৎকালীন জমিদারশ্রেণীর সহিত বর্ত্তমান জমিদারগণের শক্তি-সামর্থ্যে বহু পার্থক্যের মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্য ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই প্রাচীনকালে ভূমি ভূম্যধিকারীর সম্পত্তি এবং প্রজাগণ ভূম্যধিকারীদত্ত অধিকার লাভে তদীয় ইচ্ছাধীনে ভূমি ভোগ করিতেন। বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য রাজবিধির ক্রমপরিবর্ত্তনে ভূম্যধিকারীগণ ভূমির অধিকার

হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত ও প্রজাগণ উক্ত অধিকার প্রাপ্ত হইতেছেন। কোন জমিদারী গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-বাকী-জনিত লাটবন্দী হইয়া বা কোন মধ্যবর্ত্তী স্বত্ব বাকি-করের নিলামে বিক্রীত হইলে, প্রজাস্বত্ব আইনের বিধি অনুযায়ী ভূম্যধিকারী-শব্দবাচ্য সমস্ত অধীন মৌরসদারগণের স্বত্বগুলি লোপ হইয়া যায় কিন্তু যোতস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার (Occupancy ryot) স্বত্ব কিছুতেই নষ্ট হয় না। অন্য পক্ষে সুন্দরবনসংক্রান্ত ৯৯ বা ৪০, বা ৩০ বৎসর কালের জন্য অস্থায়ী বন্দোবস্তের, জমিদারীগুলির উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে যদি পূর্ব্বাধিকারী হইতে স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তির সহিত পুনর্ব্বন্দোবস্ত (resettlement) হয় তবে ঐরূপে সমস্ত অধীন অবান্তর স্বত্বগুলি নষ্ট হইলেও যোত-স্বত্ববিশিষ্ট কৃষিপ্রজা নিরাপদে স্বীয় যোতে ভোগবান ও দখলিকার থাকে। এই পুনর্ব্বন্দোবস্তকালে সমস্ত কৃষিপ্রজার প্রদত্ত বার্ষিক কর-সমষ্টির পরিমাণ হইতে নূতন-বন্দোবস্ত-গ্রহীতাকে শতকরা সামান্য কয়েকটী মুদ্রা মাত্র আদায়কারীর পারিশ্রমিক বা লভ্যাংশস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রজাদত্ত করের অবশিষ্ট প্রধান অংশই গভর্ণমেণ্ট-প্রাপ্য রাজস্ব বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ইহাতে রাজবিধির উদ্দেশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ভূম্যধিকারীগণ প্রাচীনকালের সমস্ত রাজশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া বর্ত্তমানকালে সার্ব্বভৌম সম্রাটের করসংগ্রাহকের আসনটীমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালার জমিদারবর্গ সমগ্র ভারতের সমশ্রেণীস্থ তালুকদার বা জমিদারগণের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বা শ্রেষ্ঠতর হইলেও তাঁহারা এখন প্রকৃতপক্ষে ভূম্যধিকারী বা জমিদারপদবাচ্য নহেন; কারণ ভূমি বা জমি তাঁহাদের নহে, তাহা এখন প্রজার। তাঁহারা করসংগ্রাহক মাত্র। কয়েকটী রাজবিধি-নির্দ্দিষ্ট কারণ উপস্থিত না হইলে তাঁহারা এখন অন্য কোন কারণে বা স্বীয় শক্তির স্বেচ্ছানুরূপ পরিচালনে প্রজার ভোগাধিকারযুক্ত ভূমিখণ্ড হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারেন না বা নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক কর অপেক্ষা একটী পয়সাও বৃদ্ধি করিয়া কোন কারণে লইতে পারেন না। ঐ সকল বিধিসঙ্গত কারণ উপস্থিত হইলেও প্রজাকে উচ্ছেদ বা তাহার কর বৃদ্ধি করিতে হইলে রাজধর্ম্মাধিকরণের আদেশ লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তদন্যথায় এই ভূস্বামীনামধেয় করসংগ্রাহকগণকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। প্রজার উপর দেওয়ানী বা ফৌজদারী (civil or criminal) কোনরূপ ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার তথাকথিত জমিদারের নাই। এমন কি কোন উচ্ছৃঙ্খল প্রজার হস্তে স্বয়ং লাঞ্ছিত হইয়া একটি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলেও তিনি রাজবিধি অনুসারে দণ্ডনীয়। প্রাচীনকালের সমস্ত সামন্ত-রাজন্যবর্গের ন্যায় রাজশক্তিসমন্বিত বঙ্গভূম্যধিকারীগণ এইরূপে বর্ত্তমানকালে সর্ব্বপ্রকারে ভূমির অধিকার ও প্রজার উপর কর্ত্তৃত্বাধিকারে বঞ্চিত হওয়া বঙ্গবাসীগণের পক্ষে এমন কি নরসমাজের পক্ষে হিত বা অহিতকর হইয়াছে তাহাই এখন বিবেচ্য বিষয়।

শক্তি ও বল যেখানে যত অধিক সেখানে তাহা শুভ বা অশুভ উভয়দিকে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা তত অধিক। কোন মানব যখন অন্য কোন মানবাপেক্ষা অধিকতর শক্তিসমন্বিত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং এক বা একাধিক নরনারীর উপর স্বীয় শক্তি বিকাশ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন তখন তিনি কখন বা আত্মেতর জীব বা মানবের মঙ্গল সাধন ও অভাব মোচন করিয়া হৃদয়ের বিশালতায়, নীতির কুশলতায় ও চরিত্রের মহিমায় জগতের কল্যাণ সাধন করতঃ ভূদেব আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া নিজে ধন্য হয়েন এবং অপরকে ধন্য করেন। আবার কখন বা সে আত্মেতর জীবকুলের ধনজন, দেহগেহ, পুত্রকলত্র প্রভৃতির উপর নিজ শক্তি বিকাশ করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে নিষ্পেষিত করতঃ আত্মশক্তি বা আত্মপ্রতাপ প্রকাশ করিয়া জগতে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত করে। এইরূপে ভ্রান্ত মানব স্বীয় শক্তির অপব্যবহার করিয়া তাহারই ন্যায় করচরণদেহমনবিশিষ্ট, তাহারই ন্যায় সুখদুঃখবোধসম্পন্ন তাহারই ন্যায় বিশ্বেশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত অন্য মানবকে সমস্ত দুঃখের দহনে দগ্ধ করিয়া আত্ম-অহমিকায় পুষ্ট হইয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

অনাদিকাল হইতে মানব এইরূপে মঙ্গলময়ের মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ-পুষ্ট অথবা দারুণ অভিশাপগ্রস্ত।

এইরূপে রাজা প্রজাকে, ধনী দরিদ্রকে, পিতা পুত্রকে, পতি পত্নীকে, পত্নী ও পুত্র জরাতুর বা রোগক্ষীণ অক্ষম পতি বা পিতাকে, প্রভু ভৃত্যকে, ভৃত্য দুর্ব্বল প্রভুকে এবং সখা বিশ্বস্ত সখাকে কখন বা স্বীয় দেবত্বে পূর্ণ হইয়া সেবা করিয়া স্বীয় সেব্যগণকে দেবত্বে উন্নীত করেন আবার কখন বা অল্প-বিস্তর অত্যাচারে প্রপীড়িত করিয়া তাঁহাদের জীবনভার দুঃসহ করিয়া তোলেন। যেথানেই কর্ত্তৃত্বা-ভিমান সেইখানেই এবম্বিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের বিকাশের অবকাশ থাকে। কর্ত্তৃত্বের আবিলতায় রাজা ভুলিয়া যান যে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন প্রকৃতিকুলের তিনি স্বেচ্ছাসেবক; প্রভু বিস্মৃত হয়েন যে সেবাপ্রাপ্তির বিনিময়ে তাঁহার দাসরূপী সেব্য জনের পরিজনবর্গের পোষকরূপে তিনি তাহার অবৈতনিক সেবক; ধনী বুঝিতে পারেন না যে তিনি দরিদ্রেরই পরি-শ্রমে পুষ্ট। মানবে মানবে, ইতরে ভদ্রে, ক্ষুদ্রে বৃহতে পরস্পরের সেবাই এই বিশ্বপরিচালনের এক বিচিত্র কৌশল। এই সনাতন সেবাধর্ম্ম যিনি যতদূর বুঝিতে পারেন এবং স্বীয় কর্ম্মময় জীবনে তাহার যতটুকু বিকাশ করিতে পারেন তিনি ততদূর লব্ধকাম। যে শক্তিমান মানব অহমিকার কুহকে মুগ্ধ না হইয়া নরসমাজের অজস্র কল্যাণ সাধন করেন তিনিই মহাপুরুষ আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু প্রভুশক্তিশালী ব্যক্তির গন্তব্য পথ চিরকণ্টকময়। দুর্ব্বলতার পরিণামে মানব প্রভুত্ব বিস্তার করিতে গিয়া অনেক সময়ে নরসমাজকে সন্তাপিত ও কলঙ্কিত করিয়া তুলে। প্রভুশক্তিসম্পন্ন মানব যতদিনপর্য্যন্ত আত্মশক্তির মাদকতায় প্রমত্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে পরপীড়ন করিতে অল্প বা বিস্তর সঙ্কুচিত থাকে। কিন্তু যখন মানব আত্ম-শক্তির উপর অতিমাত্র আস্থা স্থাপন করে তখন সে নিজের প্রবল প্রতাপে মানবসমাজকে উৎপীড়িত ও নিষ্পেষিত করিবার চেষ্টা করে। এই কারণেই জগতের বিভিন্নাংশে, নর-নারীসঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্র-স্থলে এবং সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে সর্ব্বত্রই দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারকাহিনী, প্রবলে প্রবলে শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতের লোমহর্ষণ বর্ণনা অথবা প্রবলের কবল হইতে দুর্ব্বলগণের আত্মরক্ষার সমবেত চেষ্টার মর্ম্মন্তুদ আখ্যায়িকা শোনা যায়।

বঙ্গীয় জমিদারবর্গের মধ্যেও এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহাই স্বাভাবিক। তাঁহাদের মধ্যে একদিকে পরহিতব্রত, প্রজাবৎসল, চরিত্রবান ও ভগবৎপরায়ণ অনেক ভূস্বামী বঙ্গরাজশক্তিকে পুষ্ট ও কল্যাণপ্রদ করিয়া-ছিলেন। অন্যদিকে কুটিলকর্ম্মা, চরিত্রহীন, দুর্দ্দান্ত, অত্যাচারী, পরপীড়ক ও অসুরস্বভাব জমিদারবর্গেরও অভাব ছিল না। প্রজাহিতপরায়ণ নীতিকুশল ইংলণ্ডীয় রাজশক্তি ঐ সকল দানবতুল্য ভূস্বামী-গণের জ্বালাময়ী শক্তিকে সংযত করিবার জন্য ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগকে ভূমিশূন্য ভূম্যধিকারীরূপে পরিণত করিয়াছেন। যখন কোনও নিবিড় অরণ্যে দাবানল উপস্থিত হয় তখন চন্দনতরুগুলিও বিষ-বৃক্ষের সহিত সমদশা প্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। সমাজের উপর বঙ্গীয় জমিদারবর্গের যে মহিমান্বিত প্রভাব বিস্তৃত ছিল যা এখনও কিয়দংশে আছে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবে-চনা না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের নিন্দনীয় নীতিসমূহের তীব্র সমালোচনা দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার শক্তি সঙ্কুচিত করিবার অনুকূলে দীর্ঘ-কাল হইতে নানাবিধ যুক্তি ও তর্কজাল বিস্তার-পূর্ব্বক তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার প্রভাব খর্ব্ব করা হইয়াছে ও হইতেছে। তাহা কীদৃশ পরিণাম-প্রাপ্ত হইয়াছে ও বঙ্গের জমিদারবর্গ বর্ত্তমান অব-স্থায় কিরূপ প্রণালীতে স্ব স্ব অধিকার কতদূর পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছেন ও বঙ্গীয় প্রজাকুল বর্ত্তমানকালের অবলম্বিত প্রণালী দ্বারা কতদূর উপকৃত হইয়াছেন তাহাই এখন গভীর ও নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজপতাকাতলে আমাদের এই বঙ্গভূমির প্রজা ও জমিদারকুল কতদূর উপকার লাভ করিয়াছেন তাহা একবার বুঝিতে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

অনাবৃষ্টি উপলক্ষে।

সিতারখানি মল্লার—তেতালা।

জল দাও জল প্রভু যাচি হে।
তব দয়া বিনা কেমনে বাঁচি হে।
দগধ হইয়া যায় ধরার শ্যামল কায়;
মরম-দহন হায় রোদন চরণে ধায়।
প্রভু দয়াল করুণা কর—অন্ন দিয়ে
বাঁচাও হে সন্তানেরে॥

কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

II { রগমা -পধপা মগা গরা | সন্‌া রা ন্‌রসা -সা I গরা গা মাঃ -গঃ |
জ • • -• • ল্ দাও জ • ল • প্র ভু • • • • যা • চি হে •

| (-গা -া -রা -া) } | -গা -রা রা রা | রমা মপা পা পা | পা পা পধপা -পা I
• • • • • • ত ব দ • য়া • বি না কে ম নে • • •

| গা মা মা -া | -গমা -পধা -মপা -রা | রমা মপা পা পা | পা পা পপধা -নর্সা I
বা চি হে • • • • • • • • • দ • য়া • বি না কে ম নে • • • • •

I র্সা র্সা র্সা -ধা | পা -া -পগা -মরা II
বা চি হে • • • • • • •

[না -না ধপা পা ধা ধা না -া]
II { পা পা পা পা | না ধা না -া I র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সনা র্রা র্সা -া |
দ গ ধ হ ই য়া যা য় ধ রা র শ্যা ম • ল কা য়

| ধা না ধা না | র্সা র্সা র্রা -া I র্সনা র্রা র্সা র্সনা | ধা নধা পমা -পা } I
ম র ম দ হ ন হা য় রো • দ ন চ • র ণে • • ধা • য়

| পা পধনা -র্সরা র্সা | র্সা -া -া -া I র্সা মা মা মা | গমা -পধা -মপা পমা |
প্র ভু • • • • দ য়া • • • ল ক রু ণা ক • • • • • র •

| পা -না র্সা র্রা | না র্সা গা মা I পা পা পা -ধনা | -ধপধা পমা -পমগরা II
অ ন্ন দি য়ে বাঁ চা ও হে সন্ তা নে • • • • • • রে • • • • •

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

একাদশ প্রকরণ।

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

ভগবান্ খুব নিরভিমান বুদ্ধিতে ইহাই বলিয়াছেন—

একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

সাংখ্য ও (কর্ম) যোগ মোক্ষদৃষ্টিতে দুই নহে, একই, ইহা যিনি জানিয়াছেন তিনিই পণ্ডিত (গী. ৫. ৫)। এবং মহাভারতেও, একান্তিক অর্থাৎ ভাগবত ধর্ম সাংখ্য-ধর্ম্মের সমানই, "সাংখ্যযোগেন তুল্যো হি ধর্ম্ম একান্ত-সেবিতঃ" (শাং. ৩৪৮. ৭৪)——এইরূপ উক্ত হইয়াছে। মোদা কথা, পরার্থে সমস্ত স্বার্থের লয় করিয়া আপন আপন যোগ্যতানুরূপ ব্যবহারে প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্মই সর্ব্ব-ভূতহিতার্থ আমরণ নিষ্কামবুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া করিতে থাকাই প্রকৃত বৈরাগ্য কিংবা 'নিত্য সন্ন্যাস' (৫. ৩); এই কারণেই কর্ম্মযোগমার্গে স্বরূপতঃ কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া কখনই ভিক্ষা মাগে না। কিন্তু বাহ্যা-চরণ দ্বারা দেখিলে এইরূপ ভেদ প্রতীয়মান হইলেও সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব কর্ম্মযোগমার্গেও বজায় থাকে। তাই, স্মৃতিগ্রন্থের আশ্রমব্যবস্থা ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মধ্যে বিরোধ নাই, ইহাই গীতার শেষ-সিদ্ধান্ত।

উপরি-উক্ত বিচার-আলোচনা হইতে কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, সন্ন্যাসধর্ম্মের সহিত কর্ম্মযোগের সমন্বয় করিবার জন্য গীতার মধ্যে যে এতটা ধস্তাধস্তি করা হইয়াছে, স্মার্ত্ত কিংবা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম প্রাচীন হওয়া এবং কর্ম্মযোগমার্গ তাহার পরে নিঃসৃত হওয়াই তাহার কারণ। কিন্তু ইতিহাসদৃষ্টিতে বিচার করিলে সকলেরই উপলব্ধি হইবে যে, প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। বৈদিক ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাচীন স্বরূপ কর্ম্মকাণ্ডাত্মকই ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়া আসি-য়াছি। পরে ঔপনিষদিক জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের গৌণতা প্রচলিত হইতে থাকে এবং কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস আস্তে আস্তে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। বৈদিক ধর্ম্ম-বৃক্ষের বৃদ্ধির কিন্তু এই দ্বিতীয় সোপান। কিন্তু এই সময়েও ঔপনিষদিক জ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ডের সহিত মিল করিয়া জনকাদি জ্ঞানীপুরুষ আপন কর্ম্ম আমরণ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হয় যে, বৈদিক ধর্ম্মবৃক্ষের এই দ্বিতীয় সোপান দুই প্রকার ছিল—এক জনকাদির, এবং দ্বিতীয়টী যাজ্ঞবল্ক্যাদির। স্মার্ত্ত আশ্রম-ব্যবস্থা ইহার পরবর্তী কিংবা তৃতীয় সোপান। কিন্তু দ্বিতীয় সোপানের ন্যায় তৃতীয়টিরও দুই ভেদ আছে। স্মৃতিগ্রন্থে কর্ম্মত্যাগরূপ চতুর্থাশ্রমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহারই সঙ্গে জনকাদির জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম-যোগেরও—সন্ন্যাসাশ্রমের বিকল্প হিসাবে—স্মৃতিকারেরা বর্ণনা করিয়াছেন। উদাহরণ যথা—সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থে মূলীভূত মনুস্মৃতিই ধর না কেন। এই স্মৃতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনুষ্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রম সমূহে উঠিতে উঠিতে, শেষে কর্ম্মত্যাগরূপ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবেক এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম অর্থাৎ যতি-ধর্ম্মের নিরূপণ শেষ করিবার পর "যতিদিগের অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের এই ধর্ম্ম বলিলাম, এক্ষণে বেদসন্ন্যা-সিকদিগের কর্ম্মযোগ বলিতেছি" এইরূপ প্রস্তাবনা করিয়া এবং গৃহস্থাশ্রম অন্য আশ্রম হইতে কেন শ্রেষ্ঠ তাহা বলিয়া, মনু সন্ন্যাসাশ্রম কিংবা যতিধর্ম্মকে বৈকল্পিক মানিয়া নিষ্কাম গার্হস্থ্য বৃত্তির কর্ম্মযোগ বর্ণনা করি-য়াছেন (মনু. ৬. ৮৬-৯৬); এবং পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে তাহারই "বৈদিক কর্ম্মযোগ" নাম দিয়া, এই মার্গও চতুর্থাশ্রমেরই ন্যায় নিঃশ্রেয়কর অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ এইরূপ বলিয়াছেন (মনু. ১২. ৮৬-৯০)। মনুর এই সিদ্ধান্ত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে। এই স্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ে যতিধর্ম্মের নিরূপণ শেষ হইলে পর, 'অথবা' পদ প্রয়োগ করিয়া লিখিত হইয়াছে যে, পরে জ্ঞাননিষ্ঠ ও সত্যবাদী গৃহস্থও (সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া) মুক্তি লাভ করে (যাজ্ঞ. ৩. ২০৪ ও ২০৫)। সেইরূপ, যাস্কও স্বীয় নিরুক্তে লিখিয়াছেন যে, কর্ম্মত্যাগী তপস্বী ও জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মকারী কর্ম্মযোগী একই দেবযান গতি প্রাপ্ত হন (নি. ১৪. ৯)। এতদ্ব্যতীত এই বিষয়ে অন্য প্রমাণ ধর্ম্মসূত্রকারদিগের। এই ধর্ম্মসূত্র গদ্যাত্মক হওয়ায় শ্লোকে লিখিত স্মৃতিগ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে, এইরূপ বিদ্বানদিগের মত। এই মত ঠিক কি ভুল, তাহা এক্ষণে আমাদের দ্রষ্টব্য নহে। তাহা ঠিক্‌ই হউক বা ভুলই হউক, এই প্রসঙ্গের মুখ্য বিষয় এই যে, উপরে প্রদত্ত মনু-যাজ্ঞ-বল্ক্যাদি স্মৃতির বচনপ্রদর্শিত গৃহস্থাশ্রমের কিংবা কর্ম্ম-যোগের মহত্ত্ব অপেক্ষাও ধর্ম্মসূত্রে অধিক মহত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য কর্ম্মযোগকে চতুর্থাশ্রমের বিকল্প বলিয়াছেন। কিন্তু বৌধায়ন ও আপস্তম্ব সেরূপ না বলিয়া গৃহস্থাশ্রমই মুখ্য ও তাহার দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয় এইরূপ স্পষ্ট বিধান করিয়াছেন। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবা জায়তে" প্রত্যেক ব্রাহ্মণ জন্মতই তিন ঋণ আপন পৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়াছে—ইত্যাদি তৈত্তিরীয় সংহিতার বচন প্রথমে

দিয়া তাহার পর এই সকল ঋণ শোধ করিবার জন্য যাগযজ্ঞাদিপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয়কারী মনুষ্য ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়, এবং ব্রহ্মচর্য্য কিংবা সন্ন্যাসের যাহারা প্রশংসা করে সেই সব ইতর লোক ধূলিতে মিলিত হয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (বৌ. ২. ৬. ১১. ৩৩ ও ৩৪); এবং আপস্তম্বসূত্রেও ঐরূপ বিধানই আছে (আপ. ২. ৯. ২৪. ৫)। এই দুই ধর্ম্মসূত্রে সন্ন্যাসাশ্রম বর্ণিত হয় নাই এরূপ নহে; কিন্তু উহার বর্ণন করিয়াও গৃহস্থাশ্রমেরই মহত্ত্ব অধিক স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা হইতে, এবং বিশেষিত মনুস্মৃতিতে, কর্ম্মযোগকে 'বৈদিক' বিশেষণে বিশিষ্ট করাতে স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, মনুস্মৃতির সময়েও কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস আশ্রম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগরূপ গৃহস্থাশ্রম প্রাচীন বলিয়া ধারণা ছিল এবং মোক্ষদৃষ্টিতে তাহার যোগ্যতা চতুর্থাশ্রমেরই ন্যায় পরিগণিত হইত। গীতার টীকাকারদিগের ঝোঁক সন্ন্যাস কিংবা কর্ম্মত্যাগযুক্ত ভক্তির উপরেই থাকা প্রযুক্ত তাঁহাদের টীকায় উপরোক্ত স্মৃতিবচনসমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহারা ইহার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেও কর্ম্মযোগের প্রাচীনত্ব তাহাতে কমে না। কর্ম্মযোগমার্গ এইরূপ প্রাচীন হওয়াতেই উহাকে যতিধর্ম্মের বিকল্প বলিয়া স্মৃতিকারদিগের মানিতে হইয়াছে, এইরূপ বলিতে বাধা নাই। ইহা হইল বৈদিক কর্ম্মযোগের কথা। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে জনকাদি এই পন্থা অনুসারেই আচরণ করিতেন। কিন্তু পরে ভগবান তাহাতে ভক্তিকেও মিলাইয়া দিয়া তাহার প্রচার অধিক বিস্তৃত করায়, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম নাম পাইয়াছে। ভগবদ্গীতা এই প্রকারে সন্ন্যাসাপেক্ষাও কর্ম্মযোগকে অধিক মান্য বলিয়া স্থির করিলেও তাহাতে পরে গৌণত্ব আসিয়া সন্ন্যাসমার্গেরই প্রাধান্য কেন হইল, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহার বিচার পরে করা যাইবে। কর্ম্মযোগ স্মার্তমার্গের পরবর্ত্তী নহে, পুরাতন বৈদিক কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, ইহাই এখানে বক্তব্য।

ভগবদ্গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে "ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" এই যে সঙ্কল্প থাকে, তাহার মর্ম্ম এক্ষণে পাঠকের উপলব্ধি হইবে। এই সঙ্কল্পের অর্থ এই যে, ভগবান কর্ত্তৃক গীত উপনিষদে অন্য উপনিষদের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা ত আছেই, কিন্তু শুধু ব্রহ্মবিদ্যাই নহে; প্রত্যুত ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে 'সাংখ্য' ও 'যোগ' (বেদান্তী সন্ন্যাসী ও বেদান্তী কর্ম্মযোগী) এই যে দুই পন্থা উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে যোগের অর্থাৎ কর্ম্মযোগের প্রতিপাদনই ভগবদ্গীতার মুখ্য বিষয়। অধিক-কি, ভগবদ্গীতোপনিষৎই কর্ম্মযোগের মুখ্য গ্রন্থ, ইহা বলিতেও কোনই বাধা নাই। কারণ, কর্ম্মযোগ বৈদিক কাল হইতেই চলিয়া আসিলেও "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" (ঈশ. ২), কিংবা "আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি" (শ্বে. ৬. ৪), অথবা "বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধ্যায় আদি কর্ম্ম করিবে" (তৈ. ১. ৯), এই প্রকার কতকগুলি অল্পস্বল্প উল্লেখ ব্যতীত উপনিষদে এই কর্ম্মযোগের সবিস্তর বিচার কোথাও করা হয় নাই। এ বিষয়ে ভগবদ্গীতাই মুখ্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ; এবং কাব্যদৃষ্টিতেও ইহাই সঙ্গত মনে হয় যে, ভারতভূমির কর্ত্তৃপুরুষদিগের চরিত্র যে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেই অধ্যাত্মশাস্ত্রকে ধরিয়া কর্ম্মযোগেরও উপপত্তি ব্যাখ্যাত হইবে। প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে ভগবদ্গীতার সমাবেশ কেন করা হইয়াছে তাহারও উপপত্তি এক্ষণে ঠিক্ বুঝা যাইতেছে। উপনিষদ মূলীভূত হইলেও উহা বহু ঋষি কর্ত্তৃক কথিত হওয়ায় উহার বিচার সংকীর্ণ ও কোন কোন স্থানে পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই, উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের সমন্বয়কারী বেদান্তসূত্রেরও প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গণনা করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু উপনিষদ ও বেদান্তসূত্র এই দুয়ের অপেক্ষা গীতায় বেশী কিছু না থাকিলে প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতাকে ধরিবার কোনই কারণ ছিল না। কিন্তু উপনিষদের টান প্রায়ই সন্ন্যাসমার্গের দিকে, এবং তাহাতে বিশেষ করিয়া জ্ঞানমার্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে; এবং ভগবদ্গীতায় এই জ্ঞানকে ধরিয়া ভক্তিযুক্ত কর্ম্মযোগের সমর্থন আছে,—বস্, এইটুকু বলিলে, গীতাগ্রন্থের অপূর্ব্বতা সিদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্থানত্রয়ের তিন ভাগের সার্থকত্বও পরিব্যক্ত হয়। কারণ বৈদিক ধর্ম্মের প্রামাণিক গ্রন্থে জ্ঞান ও কর্ম্ম (সাংখ্য ও যোগ) এই দুই বৈদিক মার্গের বিচার না থাকিলে প্রস্থানত্রয় ততটা অপূর্ণই রহিয়া যাইত। কাহার কাহার এইরূপ ধারণা আছে যে, উপনিষদ্ যখন সাধারণতঃ নিবৃত্তিমূলক, তখন গীতার প্রবৃত্তিমূলক অর্থ ধরিলে প্রস্থানত্রয়ের তিন ভাগের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হইয়া তাহাদের প্রামাণ্যও কমিয়া যাইবে। সাংখ্য অর্থাৎ সন্ন্যাসই যদি একমাত্র বৈদিক মোক্ষমার্গ হয় তবেই এই সন্দেহ ঠিক্ হইবে। কিন্তু উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নিদানপক্ষে ঈশাবাস্যাদি কোন কোন উপনিষদে কর্ম্মযোগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাই, বৈদিক ধর্ম্মপুরুষকে কেবল এক-হস্তবিশিষ্ট অর্থাৎ সন্ন্যাসপ্রধান না বুঝিয়া, তাহার ব্রহ্মবিদ্যারূপ একই মস্তক এবং মোক্ষদৃষ্টিতে তুল্যবল সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ তাঁহার দক্ষিণ ও বাম দুই হস্ত, এইরূপ গীতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলে, উপনিষদ ও গীতার মধ্যে কোনই বিরোধ থাকে না। উপনিষদে এক মার্গের এবং গীতায় অন্য মার্গের সমর্থন আছে; তাই প্রস্থানত্রয়ীর এই দুই ভাগও দুই হস্তের ন্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ না হইয়া

সাহায্যকারী বলিয়াই উপলব্ধি হইবে। এইরূপই গীতায় কেবল উপনিষদই প্রতিপাদিত হইয়াছে মানিলে, চর্ব্বিতচর্ব্বণের যে ব্যর্থতা গীতায় প্রযুক্ত হইত, তাহাও হয় না। যাক্। গীতার সাম্প্রদায়িক টীকাকারেরা এই বিষয় উপেক্ষা করায় সাংখ্য ও যোগ এই দুই স্বতন্ত্র মার্গের প্রবর্ত্তক স্ব স্ব গ্রন্থের সমর্থনার্থ যে সকল মুখ্য কারণ বলেন, তাহাদের সাম্য ও বৈষম্য শীঘ্র নজরে পড়িবে বলিয়া, নিম্নলিখিত যুগল তালিকায় উক্ত কারণ সকল পরস্পরের পাশাপাশি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্মৃতিগ্রন্থে প্রতিপাদিত স্মার্ত্ত আশ্রমব্যবস্থা ও মূল ভাগবত ধর্ম্মের মুখ্য প্রভেদগুলি কি তাহাও উহা হইতে দৃষ্ট হইবে—

ব্রহ্মবিদ্যা কিংবা আত্মজ্ঞান
লাভ হইলে পর

কর্ম্মসন্ন্যাস (সাংখ্য)	কর্ম্মযোগ (যোগ)
১। মোক্ষ আত্মজ্ঞানের দ্বারাই লাভ হয়, কর্ম্মের দ্বারা নহে। জ্ঞানবিরহিত কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা যে স্বর্গসুখ লাভ হয় তাহা অনিত্য।	১। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়, কর্ম্মের দ্বারা নহে। জ্ঞানবিরহিত কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা যে স্বর্গসুখ লাভ হয় তাহা অনিত্য।
২। আত্মজ্ঞান পাইতে হইলে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির, নিষ্কাম, বিরক্ত ও সম করা চাই।	২। আত্মজ্ঞান পাইতে হইলে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা বুদ্ধি স্থির, নিষ্কাম, বিরক্ত ও সম করা আবশ্যক।
৩। তাই, ইন্দ্রিয়ের বিষয়পাশ হইতে মুক্ত (স্বতন্ত্র) হও।	৩। তাই, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ত্যাগ না করিয়া, তাহাতেই বৈরাগ্য অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ কষ্টিপাথর প্রয়োগ কর। নিষ্কামের অর্থ নিষ্ক্রিয় নহে।
৪। তৃষ্ণামূলক কর্ম্ম দুঃখময় ও বন্ধনস্বরূপ।	৪। দুঃখ ও বন্ধন কেন হয় ইহার ঠিক বিচার করিলে এরূপ দেখা যাইবে যে, অচেতন কর্ম্ম কাহাকেও বন্ধন করে না, কিংবা ছাড়ে না, তাহার প্রতি কর্ত্তার মনে যে কামনা কিংবা ফলাশা হয় তাহাই বন্ধন ও দুঃখের মূল।
৫। তাই, চিত্তশুদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত, কর্ম্ম করিলেও শেষে ত্যাগ করিতে হইবে।	৫। তাই চিত্তশুদ্ধি হইবার পরেও, ফলাশা ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম্ম ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত কর। কর্ম্ম ছাড়িব বলিলেও কর্ম্ম কাহাকেও ছাড়ে না। সৃষ্টির অর্থই কর্ম্ম, তাহার বিরাম নাই।
৬। যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, বন্ধন না হওয়ায় গৃহস্থাশ্রমে উহা করিতে বাধা নাই।	৬। নিষ্কামবুদ্ধিতে কিংবা ব্রহ্মার্পণ বিধির দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই—এক বৃহৎ 'যজ্ঞ'। ইহার জন্য স্বধর্ম্ম-বিহিত সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া সর্ব্বদা করিতে হইবে।
৭। দেহের ধর্ম্ম দেহ ছাড়ে না বলিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের পর উদরের জন্য ভিক্ষা করা অসঙ্গত নহে।	৭। উদরের জন্য ভিক্ষা করাও কর্ম্ম এবং তাহা 'লজ্জাজনক'। এই সব কর্ম্ম যদি করিতেই হয় তবে অন্য কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে কেন না করিবে? তাছাড়া, গৃহস্থাশ্রমী ব্যতীত ভিক্ষা আর কে দিবে?
৮। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর নিজের কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না এবং লোকসংগ্রহ করিবারও আবশ্যকতা নাই।	৮। জ্ঞানলাভের পর, আপনার জন্য কিছু অর্জ্জন করিবার না থাকিলেও, কর্ম্ম ছাড়ে না। এইজন্য যাহা কিছু শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত হইবে, তাহা 'আমার নহে' এইরূপ নির্ম্মম-বুদ্ধিতে লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিয়া যাও। লোক সংগ্রহ কাহাকেও ছাড়ে না। উদাহরণ যথা—ভগবানের চরিত্র দেখ।

৯। কিন্তু ব্যতিক্রমস্বরূপে অধিকারী কোন পুরুষের জ্ঞানলাভের পরেও নিজের ব্যবহারিক অধিকার জনকাদির ন্যায় আমরণ বজায় রাখিতে বাধা নাই।

১০। কিন্তু যাহাই কর না কেন, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ। অন্য অন্য আশ্রমের কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির সাধনমাত্র কিংবা পূর্ব্বায়োজন, জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে তো স্বভাবতই বিরোধ আছে। তাই পূর্ব্বাশ্রমে যত শীঘ্র পারা যায় চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া শেষে কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। চিত্তশুদ্ধি জন্মতই কিংবা পূর্ব্ব-বয়সে হইয়া থাকিলে, গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম করা আবশ্যক নহে। স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ করাই প্রকৃত সন্ন্যাসাশ্রম।

১১। কর্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণের পরও শমদমাদি ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।

১২। এই মার্গ অনাদি ও শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদিত।

১৩। শুক-যাজ্ঞবল্ক্যাদি এই মার্গ অনুসরণ করিয়াছেন।

৯। গুণবিভাগরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থানুসারে ছোট-বড় অধিকার সকলেই জন্মত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্ব-ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত এই অধিকার, লোকসংগ্রহার্থ সকলকেই অনাসক্তবুদ্ধিতে আমরণ অব্যতিক্রমে চালাইতে হইবে। কারণ, এই চক্র জগতের ধারণার্থ পরমেশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন।

১০। সাংসারিক কর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত রীতিতে করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় সত্য। কিন্তু চিত্তশুদ্ধিই কর্ম্মের একমাত্র উপযোগ নহে। জাগতিক কর্ম্ম চালাইবার জন্যও কর্ম্ম আবশ্যক। সেইরূপ আবার, কাম্য কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে আদৌ বিরোধ নাই। তাই, চিত্তশুদ্ধির পরেও ফলাশা ত্যাগ করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমস্ত কর্ম্ম আমরণ নিষ্কামবুদ্ধিতে জগতের সংগ্রহার্থ করিতে থাকো। ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। স্বরূপতঃ কর্ম্ম ত্যাগ করা কখনও উচিত নহে, আর সাধ্যায়ত্তও নহে।

১১। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর, ফলাশাত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শমদমাদি ধর্ম্ম ব্যতীত আত্মৌপম্যদৃষ্টিতে প্রাপ্ত সমস্ত ধর্ম্ম পালন কর; এবং এই শমের দ্বারা অর্থাৎ শান্তবুদ্ধি হইতেই শাস্ত্রতঃ-প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্ম লোকসংগ্রহার্থ আমরণ করিয়া যাও। নিষ্কাম কর্ম্ম ছাড়িও না।

১২। এই ধর্ম্ম অনাদি ও শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিপাদিত।

১৩। ব্যাস-বসিষ্ঠজৈগীষব্যাদি এবং জনক-শ্রীকৃষ্ণাদি এই মার্গ অনুসরণ করিয়াছেন।

শেষে মোক্ষ।

এই দুই মার্গ কিংবা নিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যামূলক; দুয়েরই প্রতি মনের নিষ্কাম অবস্থা ও শান্তি একই প্রকার হওয়া প্রযুক্ত, দুই মার্গের দ্বারাই শেষে একই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে (গী. ৫. ৫)। জ্ঞানলাভের পর কর্ম্মত্যাগ এবং কাম্যকর্ম্ম ছাড়িয়া নিষ্কাম কর্ম্ম নিত্য করিতে থাকা, এই দুয়ের মধ্যে ইহাই মুখ্য ভেদ।

কর্ম্ম ত্যাগ করা ও কর্ম্ম করা, উপরি-উক্ত দুই মার্গ জ্ঞানমূলক অর্থাৎ জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানীপুরুষ কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও আচরিত হয়। কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করা ও কর্ম্ম করা এই দুই বিষয় জ্ঞান না হইলেও হইতে পারে। তাই অজ্ঞানমূলক কর্ম্মের এবং কর্ম্মত্যাগেরও এখানে কিছু বিচার করা আবশ্যক। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ত্যাগের যে তিন প্রকার ভেদ বলা হইয়াছে ইহাই তাহার বীজ। জ্ঞান না হইলেও কোন কোন লোক কেবল কায়ক্লেশভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাকে গীতায় রাজসিক ত্যাগ বলা হইয়াছে (গী. ১৮. ৮)। সেইরূপ আবার, জ্ঞান না হইলেও শুধু শ্রদ্ধার সহিত কতকগুলি লোক যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্ম করিবার এই মার্গ মোক্ষপ্রদ নহে, শুধু স্বর্গপ্রদ এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী. ৯. ২০)। যাগযজ্ঞাদি শ্রৌতধর্ম্ম অধুনা প্রচলিত না থাকায়, মীমাংসকদিগের এই নিছক্ কর্ম্মমার্গসম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত এক্ষণে তেমন উপযোগী নহে, এইরূপ কাহারও কাহারও ধারণা। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ, শ্রৌত যাগযজ্ঞ লুপ্ত হইলেও স্মার্ত্ত যজ্ঞ অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্ম অদ্যাপি চলিতেছে। তাই, অজ্ঞানবশতঃ কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্ম যাহারা করে তাহাদের সম্বন্ধে গীতার যে সিদ্ধান্ত, তাহা জ্ঞান-বিরহিত কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্মকর্ত্তাদিগেরও সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে খাটে। জগতের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিলে জানা যাইবে যে সমাজে এই প্রকার শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া যাহারা নিয়মপূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ম্ম

করে তাহাদেরই বিশেষ আদর হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা পরমেশ্বরের স্বরূপ পূর্ণরূপে অবগত নহে। তাই, গণিতশাস্ত্রের সম্পূর্ণ উপপত্তি না বুঝিয়া কেবল মুখের হিসাবের উপর যাহারা গণনা করে তাহাদের ন্যায় এই শ্রদ্ধালু ও কর্ম্মঠ লোকদিগের অবস্থা। সমস্ত কর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ও শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠান করা হেতু তাহা নির্ভুল (শুদ্ধ) হইয়া পুণ্যপ্রদ অর্থাৎ স্বর্গপ্রদ হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ লাভ হইতে পারে না এইরূপ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হওয়ায়, স্বর্গলাভ অপেক্ষা মহত্তর ফললাভ এই কর্ম্মঠ লোকদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। এইজন্য স্বর্গসুখেরও অতীত অমৃতত্ব যিনি অর্জ্জন করিবেন—এবং ইহাই এক পরম পুরুষার্থ—তাঁহার উহাকে প্রথম সাধন বলিয়া এবং পরে সিদ্ধাবস্থায় লোকসংগ্রহার্থ অর্থাৎ আমরণ "সর্ব্বভূতে একই আত্মা" এই জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার মার্গকেই স্বীকার করিতে হইবে। জীবনের সমস্ত মার্গ অপেক্ষা এই মার্গ উত্তম। গীতাকে অনুসরণ করিয়া উপরি-উক্ত তালিকায় এই মার্গকে কর্ম্মযোগ বলা হইয়াছে; এবং ইহাকেই কেহ কেহ কর্ম্মমার্গ কিংবা প্রবৃত্তিমার্গও বলেন। কিন্তু কর্ম্মমার্গ বা প্রবৃত্তিমার্গ, এই দুই শব্দের দ্বারা জ্ঞানবিরহিত কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্ম করিবার স্বর্গপ্রদ মার্গই সাধারণত বুঝায়—এই এক দোষ। তাই জ্ঞানবিরহিত কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত কর্ম্ম এবং জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম এই দুয়ের ভেদ দেখাইবার জন্য দুই ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। এবং এই কারণেই মনুস্মৃতিতে এবং ভাগবতেও প্রথম প্রকারের অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত কর্ম্মকে 'প্রবৃত্ত কর্ম্ম' এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মকে 'নিবৃত্ত কর্ম্ম' নাম দেওয়া হইয়াছে (মনু. ১২. ৮৯; ভাগ. ৭. ১৫. ৪৭)। কিন্তু এই দুই শব্দও আমার মতে যতটা হওয়া উচিত ততটা নিঃসন্দিগ্ধ নহে। কারণ, 'কর্ম্ম হইতে পরাবৃত্ত হওয়া' 'নিবৃত্তি' শব্দের সাধারণ অর্থ। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য 'নিবৃত্ত' শব্দের পরে 'কর্ম্ম' এই বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে; এবং এইরূপ করায়, 'নিবৃত্ত' এই বিশেষণের অর্থ 'কর্ম্ম হইতে পরাবৃত্ত' না হইয়া নিবৃত্ত কর্ম্ম = নিষ্কাম কর্ম্ম, এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যাহাই বল না কেন, 'নিবৃত্ত' এই শব্দ যে পর্য্যন্ত উহাতে আছে সে পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগের কল্পনা মনে না আসিয়া ক্ষান্ত হয় না। এইজন্য জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার মার্গকে 'নিবৃত্তি কিংবা নিবৃত্ত কর্ম্ম' না বলিয়া 'কর্ম্মযোগ' নাম দেওয়া আমার মতে উত্তম। কারণ, কর্ম্মের পরে যোগ শব্দ যুক্ত থাকিলে স্বভাবতই তাহার 'মোক্ষের অন্তরায় না হইয়া কর্ম্ম করিবার কৌশল' এই অর্থ হয়; এবং অজ্ঞানযুক্ত কর্ম্মের নিরাসও আপনা-আপনি হয়। তথাপি ইহা বিস্মৃত হইবে না যে, গীতার কর্ম্মযোগ জ্ঞানমূলক এবং ইহাকেই কর্ম্মমার্গ কিংবা প্রবৃত্তিমার্গ বলা কেহ যদি ইষ্ট মনে করেন তাহাতে বাধা নাই। কোন কোন স্থলে আমিও ভাষাবৈচিত্র্যের জন্য এই শব্দ গীতার কর্ম্মযোগের বর্ণনায় প্রয়োগ করিয়াছি। যাক্। কর্ম্ম করা কিংবা কর্ম্ম ত্যাগ করা ইহাদের এইরূপ জ্ঞানমূলক ও অজ্ঞানমূলক যে ভেদ আছে তন্মধ্যে প্রত্যেকের সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায় এইরূপ—

জীবনের মার্গ	শ্রেণী	গতি
১। কামোপভোগকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া অহঙ্কারবশতঃ আসুরী বুদ্ধিতে, দম্ভ কিংবা লোভবশে কেবল আত্মসুখের জন্য কর্ম্ম করা, (গী. ১৬. ২৬.)—আসুরী কিংবা রাক্ষসী মার্গ।	অধম	নরক
১। সর্ব্বভূতে এক আত্মা এইরূপ পরমেশ্বরস্বরূপের যথার্থ জ্ঞান না হইলেও বেদাজ্ঞাকে কিংবা শাস্ত্রাজ্ঞাকে অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ও নীতি অনুসারে নিজ নিজ কাম্য কর্ম্ম করা। (গী. ২. ৪১-৪৪ ও ৯. ২০)—কেবল কর্ম্ম, ত্রয়ী ধর্ম্ম, কিংবা মীমাংসক মার্গ।	মধ্যম (মীমাংসক মতে উত্তম)	স্বর্গ (মীমাংসকমতে মোক্ষ)
২। শাস্ত্রোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে, শেষে বৈরাগ্যের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল জ্ঞানেই তৃপ্ত হইয়া থাকা (গী. ৫. ২)।—কেবল জ্ঞান, সাংখ্য কিংবা স্মার্ত্ত মার্গ।	উত্তম	মোক্ষ
৩। প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং তাহার দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়া পরে কেবল লোকসংগ্রহার্থ আমরণ ভগবানের ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকা (গী. ৫. ২)—জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়, কর্ম্মযোগ কিংবা ভাগবত মার্গ।	সর্ব্বোত্তম	মোক্ষ

(শ্রেণী: মধ্যম, উত্তম, সর্ব্বোত্তম — জ্ঞানবর্জিত তিন নিষ্ঠা; গতি: মোক্ষ, মোক্ষ — গীতার দুই নিষ্ঠা)

সার-কথা,—মোক্ষলাভের জন্য কর্ম্মের আবশ্যকতা না থাকিলেও উহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ত কারণে—এক তো অপরিহার্য্য বলিয়া এবং তাছাড়া জগতের ধারণপোষণার্থ আবশ্যক বলিয়া—নিষ্কাম বুদ্ধিতে সর্ব্বদাই সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকা—ইহাই গীতায় সর্ব্বোত্তম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অথবা "কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ" (মনু. ১. ৯৭) এই মনুবচনানুসারে কর্ত্তৃত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞানের সংযোগই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, এবং শুধু কর্ত্তৃত্ব কিংবা শুধু ব্রহ্মজ্ঞান ইহাদের প্রত্যেকটাই একদেশদর্শী, এইরূপ গীতার শেষ সিদ্ধান্ত।

বাস্তবিক বলিতে গেলে, এই প্রকরণ এইখানেই শেষ হইল। কিন্তু গীতার সিদ্ধান্ত শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিপাদিত ইহাই দেখাইবার জন্য উপরে স্থানে স্থানে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কারণ, উপনিষদের সাম্প্রদায়িক ভাষ্য হইতে সমস্ত উপনিষদ সন্ন্যাসমূলক কিংবা নিবৃত্তিমূলক এইরূপ অনেকের ধারণা হইয়াছে। উপনিষদে সন্ন্যাসমার্গ আদৌ নাই সে কথা আমি বলি না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে :—পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু সত্য নহে এইরূপ অনুভূতি হইলে পর "কোন কোন জ্ঞানী পুরুষ পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণার পরোয়া না করিয়া 'সন্তানসন্ততিতে আমার কি প্রয়োজন? সংসারই আমার আত্মা' এইরূপ বলিয়া ভিক্ষা মাগিয়া আনন্দে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়" (বৃ. ৪. ৪. ২২)। কিন্তু সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞানীকে এই পন্থই স্বীকার করিতে হইবে এরূপ নিয়ম বৃহদারণ্যকে কোথাও প্রদত্ত হয় নাই। অধিক কি, যাহাকে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই জনক রাজা ব্রহ্মজ্ঞানের শিখরে পৌঁছিয়া অমৃত হইয়াছিলেন এইরূপ তাঁহার বর্ণনা এই উপনিষদে করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় জগৎ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন সে কথা কোথাও বলা নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, জনকের নিষ্কামকর্ম্মমার্গ এবং যাজ্ঞবল্ক্যের কর্ম্ম-সন্ন্যাসমার্গ এই দুই মার্গ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকের বিকল্পে সম্মতি আছে এবং বেদান্তসূত্রকারও এই অনুমানই করিয়াছেন (বেসূ. ৩. ৪. ১৫)। কঠোপনিষৎ ইহা অপেক্ষাও অগ্রসর হইয়াছেন। আমার মতে কঠোপনিষদে যে নিষ্কামকর্ম্মযোগই প্রতিপাদ্য হইয়াছে ইহা পূর্ব্বে পঞ্চম প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি। ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৮. ১৫. ১) এই অর্থই প্রতিপাদ্য, এবং শেষে "গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া পরে পরিবারের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণকারী জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসে না", এইরূপ স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর এই দুই উপনিষদের এই অর্থেরই বাক্য উপরে প্রদত্ত হইয়াছে (তৈ. ১. ৯ ও শ্বে. ৬. ৪)। তাছাড়া, ইহাও ভাবিবার বিষয় যে, উপনিষদে যাঁহারা অপরকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অথবা তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানী শিষ্যদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় দুই একজন ব্যক্তি ছাড়া কাহাকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেখা যায় না। বরং তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমীই ছিলেন তাঁহাদের বর্ণনা হইতে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই, সমস্ত উপনিষদই সন্ন্যাসমূলক নহে এইরূপ মানিতে হয়। কোন কোন উপনিষদে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের বিকল্প এবং কাহারও কাহারও মধ্যে কেবল জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদের সাম্প্রদায়িক ভাষ্যে এই ভেদ না দেখাইয়া, সমস্ত উপনিষদ কেবল একই অর্থ—বিশেষতঃ সন্ন্যাস—প্রতিপাদক এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে। সারকথা, সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের হাতে গীতা ও উপনিষদের একই অবস্থা হইয়াছে; অর্থাৎ গীতার কতকগুলি শ্লোকের ন্যায় উপনিষদের কতকগুলি মন্ত্রেরও এই ভাষ্যকারেরা টানাবুনা অর্থ করিয়াছেন। উদাহরণ যথা—ঈশাবাস্য উপনিষৎ ধর না কেন। এই উপনিষৎ ছোট অর্থাৎ শুধু অষ্টাদশ শ্লোকের হইলেও ইহার যোগ্যতা অন্য উপনিষদ অপেক্ষা অধিক বলিয়া সকলে বুঝিয়া থাকে। কারণ, এই উপনিষৎ স্বয়ং বাজসনেয়ী সংহিতাতেই কথিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য উপনিষদ আরণ্যক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। সংহিতা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আরণ্যক গ্রন্থ উত্তরোত্তর কম প্রামাণ্য, এ কথা সর্ব্বমান্য। এই সমুদয় ঈশাবাস্যোপনিষৎ অথ হইতে ইতি পর্য্যন্ত জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক। ইহার প্রথম মন্ত্রে (শ্লোকে) "জগতে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশাবাস্য অর্থাৎ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত বলিয়া বুঝিবে" এইরূপ বলিয়া দ্বিতীয় মন্ত্রে "যাবজ্জীবন শত বৎসর নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকিয়াই বাঁচিবার বাসনা মনে পোষণ করিবেক" এইরূপ স্পষ্ট বিধান আছে। বেদান্তসূত্রে, কর্ম্মযোগের বিচার করিবার সময় এবং অন্যান্য গ্রন্থেও ঈশাবাস্যের এই বচনই জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয় পক্ষের সমর্থক বলিয়া প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশাবাস্যোপনিষৎ ইহাতেই পর্য্যাপ্ত হয় না। দ্বিতীয় মন্ত্রে উক্ত বিধানের সমর্থনার্থ পরে 'অবিদ্যা' (কর্ম্ম) ও 'বিদ্যা' (জ্ঞান) ইহাদের বিচার আরম্ভ করিয়া, নবম মন্ত্রে "শুধু অবিদ্যা-(কর্ম্ম) সেবক পুরুষ অন্ধকারে প্রবেশ করে এবং শুধু বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে নিমজ্জিত পুরুষ আরও অধিক অন্ধকারে পতিত হয়" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। শুধু অবিদ্যা (কর্ম্ম) এবং শুধু বিদ্যা (জ্ঞান) ইহাদের প্রত্যেকের পৃথকভাবে এইরূপ ন্যূনতা

দেখাইয়া, ১১শ মন্ত্রে নিম্নলিখিত অনুসারে 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' এই দুয়ের সমুচ্চয়ের আবশ্যকতা এই উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে—

বিদ্যাং চাঽবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥

"বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (কর্ম্ম) উভয়কে পরস্পরের সহিত যে ব্যক্তি জানে, সে অবিদ্যার (কর্ম্মের) দ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ নশ্বর মায়াজগতের প্রপঞ্চ (উত্তমরূপে) পার হইয়া, বিদ্যার দ্বারা (ব্রহ্মজ্ঞানের) দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে"। এই মন্ত্রের ইহাই স্পষ্ট ও সরল অর্থ। এবং এই অর্থই বিদ্যার 'সংভূতি' অর্থাৎ জগতের আদিকারণ এবং তাহা হইতে ভিন্ন যে অবিদ্যা তাহার 'অসংভূতি' কিংবা 'বিনাশ' এইরূপ অন্য নাম দিয়া ইহার পরবর্ত্তী তিন মন্ত্রে পুনর্ব্বার বর্ণিত হইয়াছে (ঈশ. ১২-১৪)। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, সমস্ত ঈশাবাস্যোপনিষৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার এককালীন (উভয়ের সহিত) সমুচ্চয় প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপরি-উক্ত মন্ত্রে বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই শব্দেরই ন্যায় মৃত্যু ও অমৃত এই দুই শব্দ পরস্পর-প্রতিযোগী। তন্মধ্যে অমৃত শব্দে অবিনাশী ব্রহ্ম অর্থ স্পষ্ট, এবং তদ্বিরুদ্ধ মৃত্যু শব্দে নশ্বর মৃত্যুলোক অথবা ঐহিক সংসার এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়। এই অর্থেই এই দুই শব্দ ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তেও প্রদত্ত হইয়াছে (ঋ. ১০. ১২৯. ২)। বিদ্যাদি শব্দের এই সরল অর্থ গ্রহণ করিয়া (অর্থাৎ বিদ্যা = জ্ঞান, অবিদ্যা = কর্ম্ম, অমৃত = ব্রহ্ম এবং মৃত্যু = মৃত্যুলোক এইরূপ বুঝিয়া) ঈশাবাস্যের উপরি-প্রদত্ত ১১ মন্ত্রের অর্থ করিলে, প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই মন্ত্রের প্রথম চরণে বিদ্যা ও অবিদ্যার এককালীন সমুচ্চয় বর্ণিত হইয়াছে; ঐ বিষয়ই দৃঢ় করিবার জন্য দ্বিতীয় চরণে এই দুয়ের মধ্যে প্রত্যেকের ফল কি তাহা পৃথক করিয়া কথিত হইয়াছে। ঈশাবাস্য-উপনিষদের এই দুই ফল ইষ্ট এবং সেই জন্যই জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুয়েরই এককালীন সমুচ্চয় এই উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মৃত্যুলোকের প্রপঞ্চ ঠিক্ চালানো কিংবা তাহা হইতে উত্তমরূপে-পার হওয়াকেই গীতায় 'লোক-সংগ্রহ' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মোক্ষলাভ মনুষ্যের কর্ত্তব্য সত্য, কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গেই তাহার লোক-সংগ্রহও আবশ্যক। এই হেতু জ্ঞানী পুরুষ লোক-সংগ্রাহক কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক না এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত; এবং এই সিদ্ধান্তই শব্দভেদে "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" এই উপরি-উক্ত মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। সারকথা—গীতা উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া আছে শুধু নহে, ঈশাবাস্যোপনিষদে স্পষ্টরূপে বর্ণিত অর্থই গীতায় সবিস্তর প্রতিপাদিত হইয়াছে, এইরূপ ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে। ঈশাবাস্যোপনিষৎ যে বাজসনেয়ী সংহিতায় আছে তাহারই বাজসনেয়ী সংহিতার শতপথ ব্রাহ্মণভাগ। এই শতপথব্রাহ্মণের আরণ্যকে বৃহদারণ্যকোপনিষৎ প্রদত্ত হইয়াছে; তাহাতে "শুধু বিদ্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে নিমগ্ন পুরুষ আরও অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে" ঈশাবাস্যের এই নবম মন্ত্র অক্ষরশঃ গৃহীত হইয়াছে (বৃ. ৪. ৪. ১০)। এই বৃহদারণ্যকোপনিষদেই জনকের কথা আছে; এবং সেই জনকের দৃষ্টান্ত কর্ম্মযোগসমর্থনার্থ ভগবান কর্ত্তৃক গীতায় গৃহীত হইয়াছে (গী. ৩. ২০)। ইহা হইতে—ঈশাবাস্যের ও ভগবদ্‌গীতার কর্ম্মযোগের যে সম্বন্ধ আমি উপরে দেখাইয়াছি তাহাই অধিক দৃঢ় ও নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধ হয়।

কিন্তু সমস্ত উপনিষদেই মোক্ষপ্রাপ্তির একই মার্গ প্রতিপাদ্য হইয়াছে এবং তাহাই বৈরাগ্যের কিংবা সন্ন্যাসেরই মার্গ, উপনিষদে দুই দুই মার্গ প্রতিপাদিত হইতে পারে না, এইরূপ যাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, তাঁহাদিগকে ঈশাবাস্যোপনিষদের স্পষ্টার্থক মন্ত্রগুলিকেও টানিয়াবুনিয়া কোন প্রকারে পৃথক অর্থ লাগাইয়া দিতে হয়, নচেৎ এই সকল মন্ত্র তাঁহাদের সম্প্রদায়ের প্রতিকূলে যায়; এবং সেরূপ হওয়া তাঁহাদের ইষ্ট নহে। এই জন্য ১১ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় শাঙ্করভাষ্যে 'বিদ্যা' এই শব্দের অর্থ জ্ঞান এইরূপ না করিয়া উপাসনা করা হইয়াছে। বিদ্যা শব্দের অর্থ যে উপাসনা হয় না এমন নহে। শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি স্থানে তাহার উপাসনা অর্থই বিবক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা মুখ্য অর্থ নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মনে একথা যে উদয় হয় নাই তাহাও নহে; অধিক-কি, উদয় না হওয়া অসম্ভব ছিল। "বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং" (কেন. ২. ১২), কিংবা প্রাণস্যাধ্যাত্মং বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে" (প্রশ্ন. ৩. ১২), এইরূপ বচন অন্যান্য উপনিষদেও আছে। মৈত্র্যুপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ" ইত্যাদি উপরি-প্রদত্ত ঈশাবাস্যের ১১ মন্ত্রই অক্ষরশঃ গৃহীত হইয়াছে; তাহারই সংলগ্ন তাহার পূর্ব্বে কঠ. ২. ৪ ও পরে কঠ. ২. ৫—এই মন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ এই তিন মন্ত্রই এক স্থানে পর-পর প্রদত্ত হইয়াছে; মধ্যের মন্ত্রটি ঈশাবাস্যের মন্ত্র। তিনটীতেই 'বিদ্যা' শব্দ আছে। তাই কঠোপনিষদে বিদ্যা শব্দের যে অর্থ, সেই (জ্ঞান) অর্থই ঈশাবাস্যেও গ্রহণ করিতে হইবে—মৈত্র্যুপনিষদের ইহাই অভিপ্রায়, স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু ঈশাবাস্যের শাঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে "বিদ্যা = আত্মজ্ঞান ও অমৃত = মোক্ষ এই অর্থই যদি ঈশাবাস্যের ১১ মন্ত্রে গ্রহণ

ধরা যায় তবে জ্ঞান (বিদ্যা) ও কর্ম্ম (অবিদ্যা) ইহাদের সমুচ্চয় এই উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ বলিতে হয়; কিন্তু যখন এই সমুচ্চয় ন্যায়সিদ্ধ নহে, তখন বিদ্যা=দেবতার উপাসনা এবং অমৃত=দেবলোক এই গৌণ অর্থই এই স্থানে গ্রহণ করিতে হইবে"। সার-কথা, ইহা সুস্পষ্ট যে "জ্ঞান হইলে পর, সন্ন্যাস লইবে, কর্ম্ম করিবে না; কারণ, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় কোথাও ন্যায্য নহে"—শাঙ্করসম্প্রদায়ের এই মুখ্য সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ঈশাবাস্যের মন্ত্র যাহাতে না হয় তাহার জন্য বিদ্যা শব্দের গৌণার্থ স্বীকার করিয়া সমস্ত শ্রুতিবচনের নিজ সম্প্রদায়ানুরূপ সমন্বয় করিবার জন্য শাঙ্করভাষ্যে ঈশাবাস্যের ১১ মন্ত্রের উপরিলিখিতানুসারে অর্থ করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখিলে, এই অর্থ গুরুত্বব্যঞ্জক না হইলেও আবশ্যক বটে। কিন্তু সমস্ত উপনিষদে এক অর্থই প্রতিপাদিত হওয়া উচিত,—দুই মার্গ শ্রুতিপ্রতিপাদিত হইতে পারে না,—এই মূলসিদ্ধান্তই যাঁহাদের মান্য নহে, তাঁহাদের পক্ষে—উক্ত মন্ত্রে বিদ্যা ও অমৃত শব্দদ্বয়ের অর্থ উল্টাইবার কোনই কারণই থাকে না। পরব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই তত্ত্ব মানিলেও তাঁহার জ্ঞান হইবার উপায় একাধিক হইবে না, এইরূপ সিদ্ধ হয় না। একই ছাদের উপর যাইবার দুই সিঁড়ি কিংবা একই সহরে যাইবার দুই রাস্তা যেরূপ থাকিতে পারে, সেইরূপ মোক্ষলাভের উপায় কিংবা নিষ্ঠার কথা; এবং এই অভিপ্রায়েই "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা" এইরূপ ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। নিষ্ঠা দুই প্রকার হওয়া সম্ভব কহিলে পর কোন কোন উপনিষদে শুধু জ্ঞাননিষ্ঠার, আবার কতকগুলি উপনিষদে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়নিষ্ঠার বর্ণন আসা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠার বিরোধ আসে বলিয়া ঈশাবাস্যোপনিষদের শব্দের সরল, সহজ ও স্পষ্ট অর্থ ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ থাকে না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের দৃষ্টি সরল অর্থাপেক্ষা সন্ন্যাসনিষ্ঠামূলক সমন্বয়ের দিকে বিশেষভাবে ছিল, ইহা বলিবার আরও এক কারণ আছে। তৈত্তিরীয়-উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যে (তৈ. ২-১১) "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" ঈশাবাস্যের এইটুকু অংশই প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহারই সহিত "তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" এই মনুবচনও (মনু. ১২. ১০৪) দেওয়া হইয়াছে; এবং এই দুই বচনে "বিদ্যা" শব্দের একই মুখ্যার্থ (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান) আচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য এইস্থানে এইরূপ বলেন যে "তীর্ত্বা=তরিয়া যাওয়া" এই পদ হইতে প্রথমে মৃত্যুলোক পার হইবার ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে তাহার পরে (একই সময়ে নহে) বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিবার ক্রিয়া সংঘটিত হয়। কিন্তু এই অর্থ পূর্ব্বার্দ্ধের "উভয়ং সহ" শব্দগুলির বিরুদ্ধ হয়, ইহা বলা বাহুল্য; এবং প্রায় এই কারণেই ঈশাবাস্যের শাঙ্করভাষ্যে এই অর্থ পরিত্যক্তও হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক, ঈশাবাস্যের ১১শ মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্যে পৃথক্ ব্যাখ্যা করিবার কারণ কি, তাহা ইহা হইতে ব্যক্ত হয়। এই কারণ সাম্প্রদায়িক; এবং ভাষ্যকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকে যাঁহারা স্বীকার না করেন তাঁহাদের নিকট প্রস্তুত ভাষ্যের এই ব্যাখ্যা মান্য হইবে না। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অলৌকিক জ্ঞানী পুরুষ-প্রতিপাদিত অর্থ ছাড়িয়া দিবার প্রসঙ্গ যতই পরিহার করা যায় ততই ভাল, এ কথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ছাড়িলে, এই প্রসঙ্গ তো আসিবেই; এবং এই জন্যই আমার পূর্ব্বেও ঈশাবাস্য মন্ত্রের অর্থ শাঙ্কর ভাষ্য হইতে ভিন্ন প্রকারে (আমি যেরূপ বলিতেছি সেইরূপই) অন্য ভাষ্যকারেরাও প্রয়োগ করিয়াছেন। উদাহরণ যথা,—বাজসনেয়ী সংহিতার সুতরাং ঈশাবাস্যোপনিষদের উপরও উবটাচার্য্যের যে ভাষ্য আছে তাহাতে "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় "বিদ্যা=আত্মজ্ঞান ও অবিদ্যা=কর্ম্ম এই দুয়ের সমন্বয়ের দ্বারাই অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়" এইরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। অনন্তাচার্য্য এই উপনিষদের নিজ ভাষ্যে এই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক অর্থই স্বীকার করিয়া শেষে "এই মন্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং 'যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে' (গী. ৫. ৫.) এই গীতাবচনের অর্থ একই; এবং গীতার এই শ্লোকের 'সাংখ্য' ও 'যোগ' শব্দ অনুক্রমে 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্মের' বাচক," এইরূপ স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে*। সেইরূপ আবার, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপর (যা. ৩. ৫৭ ও ২০৫) আপন টীকায় অপরার্কদেবও ঈশাবাস্যের ১১ মন্ত্র দিয়া অনন্তাচার্য্যেরই ন্যায় তাহার জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক অর্থ করিয়াছেন। ইহা হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে যে, আমি আজ নূতন করিয়া ঈশাবাস্যোপনিষদের মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্য হইতে ভিন্ন অর্থ করি নাই।

স্বয়ং ঈশাবাস্যোপনিষদের মন্ত্র সম্বন্ধে এই বিচার

---

* ঈশাবাস্যোপনিষদের এই সব ভাষ্য পুণার আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত ঈশাবাস্যোপনিষদের সংস্করণে প্রদত্ত হইয়াছে; যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির অপরার্কের টীকাও আনন্দাশ্রমেই আলাদা ছাপা হইয়াছে। প্রো. মোক্ষমূলর উপনিষদের যে ভাষান্তর করিয়াছেন তাহাতে ঈশাবাস্যের ভাষান্তর শাঙ্করভাষ্যকে অবলম্বন করিয়া করা হয় নাই। ইহার কারণ তিনি আপন ভাষান্তরের শেষে দিয়াছেন (Sacred Books of the East Series Vol 1. PP. 314-320) অনন্তাচার্য্যের ভাষ্য মোক্ষমূলর সাহেবের জানা ছিল না; এবং শাঙ্করভাষ্যে পৃথক অর্থ কেন করা হইয়াছে, তাহার মর্ম্মও মোক্ষমূলর সাহেবের উপলব্ধি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

হইল। এক্ষণে শঙ্করভাষ্যে "তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়াঽ-মৃতমশ্নুতে" এই যে মনুবচন প্রদত্ত হইয়াছে তাহার একটু বিচার করিব। মনুস্মৃতির দ্বাদশ অধ্যায়ে এই শ্লোক ১০৪ সংখ্যার, এবং মনু ১২. ৮৬ হইতে উপলব্ধি হইবে যে, ঐ প্রকরণ যে বৈদিক কর্ম্মযোগের। কর্ম্মযোগের এই বিচার-আলোচনায়—

তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥

প্রথম চরণে "তপ ও (চ) বিদ্যা (অর্থাৎ দুই-ই) ব্রাহ্মণের উত্তম মোক্ষপ্রদ" এইরূপ বলিয়া আবার প্রত্যেকের উপযোগ দেখাইবার জন্য "তপস্যার দ্বারা দোষ নষ্ট হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ হয়" এইরূপ দ্বিতীয় চরণে উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, এই স্থানে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ই মনুর অভিপ্রেত, এবং ঈশাবাস্যের ১১ মন্ত্রের অর্থই মনু এই শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। হারীতস্মৃতির বচন হইতেও এই অর্থই অধিক দৃঢ় হয়। এই হারীতস্মৃতি স্বতন্ত্র তো উপলব্ধি হয়ই এবং তাছাড়া নৃসিংহপুরাণেও (নৃ. পু. অ. ৫৭. ৬১) প্রদত্ত হইয়াছে। এই নৃসিংহপুরাণে (৬১. ৯-১১) এবং হারীতস্মৃতিতে (৭. ৯-১১) জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় সম্বন্ধে এই এক শ্লোক আছে—

যথাশ্বা রথহীনাশ্চ রথাশ্চাশ্বৈর্বিনা যথা
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ উভাবপি তপস্বিনঃ॥
যথান্নং মধুসংযুক্তং মধু চান্নেন সংযুতম্।
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ সংযুক্তং ভেষজং মহৎ॥
দ্বাভ্যামেব হি পক্ষাভ্যাং যথা বৈ পক্ষিণাং গতিঃ
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥

"যেরূপ রথ ব্যতীত অশ্ব ও অশ্ব ব্যতীত রথ (চলে না) তপস্বীর তপস্যা ও বিদ্যারও সেই অবস্থা। যেরূপ অন্ন মধুসংযুক্ত এবং মধু অন্নসংযুক্ত, সেইরূপ তপস্যা ও বিদ্যা সংযুক্ত হইলে এক মহা ঔষধ প্রস্তুত হয়। যেরূপ পক্ষীর গতি দুই পক্ষ-যোগেই হইয়া থাকে সেইরূপই জ্ঞান ও কর্ম্ম (এই দুয়ের) দ্বারা শাশ্বত ব্রহ্ম লাভ হয়"। হারীতস্মৃতির এই বচন বৃদ্ধাত্রেয়স্মৃতির দ্বিতীয় অধ্যায়েও পাওয়া যায়। এই সকল বচন হইতে, এবং বিশেষতঃ তৎপ্রদত্ত দৃষ্টান্ত হইতে মনুস্মৃতির বচনের কি অর্থ করা উচিত, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। তপ শব্দের মধ্যেই মনু চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্মের সমাবেশ করিয়াছেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (মনু ১১. ২৩৬); এবং এক্ষণে উপলব্ধি হইবে যে, তৈত্তিরীয় উপনিষদে "তপ ও স্বাধ্যায়প্রবচন" ইত্যাদি যে সকল আচরণ করিতে বলা হইয়াছে (তৈ. ১. ৯) তাহাও জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয় পক্ষ স্বীকার করিয়াই বলা হইয়াছে। সমগ্র যোগবাসিষ্ঠ গ্রন্থের তাৎপর্য্যই এই। কারণ, এই গ্রন্থের আরম্ভে সুতীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, শুধু জ্ঞানের দ্বারা, কেবল কর্ম্মের দ্বারা কিংবা দুয়ের সমুচ্চয়ের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় তাহা আমাকে বলো। এবং তাহার উত্তর দিবার সময়, হারীতস্মৃতির পক্ষীদৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া "আকাশে পক্ষীদের গতি যেরূপ দুই পক্ষ-যোগেই হইয়া থাকে সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুয়ের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, কেবল একটির দ্বারা এই সিদ্ধি লাভ হয় না" এইরূপ বলিয়া, পরে সেই অর্থকেই সবিস্তর সপ্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত যোগবাসিষ্ঠ গ্রন্থ উক্ত হইয়াছে (যো. ১. ১. ৬-৯)। সেইরূপ মুখ্য কথার মধ্যে বসিষ্ঠ রামকে "জীবন্মুক্তের ন্যায় বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিয়া তুমি সমস্ত কর্ম্ম কর" (যো. ৫. ১৮. ১৭-২৬) কিংবা "কর্ম্ম ত্যাগ করা আমরণ যুক্তি-সিদ্ধ না হওয়ায় (যো. ৬. উ. ২. ৪২), স্বধর্ম্মানুসারে নির্দ্দিষ্ট রাজ্যপালনের কাজ কর" (যো. ৫. ৫. ৫৪ ও ৬. উ. ২১৩. ৫০), এইরূপ স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উপসংহার এবং পরে রামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত কার্য্যও এই উপদেশেরই অনুরূপ। কিন্তু যোগবাসিষ্ঠের টীকাকার সন্ন্যাসমার্গীয় ছিলেন, তাই পক্ষীর দুই পক্ষের উপমা স্পষ্ট হইলেও, তিনি জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুই যুগপৎ অর্থাৎ একই কালে বিহিত নহে, এইরূপ নিজের অভিপ্রেত মত লাগাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ যে টানাবুনা, ক্লিষ্ট ও সাম্প্রদায়িক, তাহা টীকা ছাড়িয়া দিয়া মূলগ্রন্থ পাঠ করিলেই যে-কোন ব্যক্তিরই সহজে উপলব্ধি হইবে। যোগবাসিষ্ঠেরই ন্যায় মাদ্রাজ প্রান্তে গুরুজ্ঞানবাসিষ্ঠ-তত্ত্বসারায়ণ নামক এক গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে। তাহার জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড, এই তিন ভাগ আছে। এই গ্রন্থকে যতটা পুরাতন বলা হয় তত পুরাতন মনে করি না, ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু প্রাচীন না হইলেও জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয় পক্ষই তাহাতে প্রতিপাদ্য হওয়ায়, এই স্থানে তাহার উল্লেখ [illegible] আবশ্যক। ইহাতে অদ্বৈত বেদান্ত আছে; এবং নিষ্কাম কর্ম্মের উপরই ইহা বিশেষ ঝোঁক দেওয়ায় ইহার সম্প্রদায় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায় হইতে যে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, ইহা বলিতে বাধা নাই। মাদ্রাজ অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের নাম 'অনুভবাদ্বৈত'; এবং বস্তুত দেখিতে গেলে, ইহা গীতার কর্ম্মযোগেরই এক নকল মাত্র, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। কিন্তু কেবল ভগবদ্গীতারই ভিত্তিতে এই সম্প্রদায় সিদ্ধ না করিয়া, ইহাতে বলা হই-য়াছে যে, সমস্ত ১০৮ উপনিষদ হইতে ঐ অর্থই সিদ্ধ হয়। এইরূপ রামগীতা ও সূর্য্যগীতা এই দুই নূতন গীতাও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। অদ্বৈত মত স্বীকার করা অর্থে

কর্ম্মসন্ন্যাসপক্ষকেই স্বীকার করা এইরূপ যে কাহারও কাহারও ধারণা, তাহা এই গ্রন্থ হইতে দূর হইবে। উপরি-প্রদত্ত প্রমাণ একণে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, ধর্ম্মসূত্র মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, মহাভারত, ভগবদ্গীতা, যোগবাসিষ্ঠ এ ও পরিশেষে তত্ত্বনারায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থেও প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাকে শ্রুতিস্মৃতি-প্রতিপাদিত না মানিয়া কেবল সন্ন্যাসমার্গকেই শ্রুতিস্মৃতি প্রতিপাদিত বলা সর্ব্বথা ভিত্তিহীন।

এই মৃত্যুলোকের ব্যবহার চালাইবার জন্য কিংবা লোকসংগ্রহার্থ যথাধিকার নিষ্কাম কর্ম্ম, এবং মোক্ষলাভার্থ জ্ঞান, এই দুয়ের এককালীন সমুচ্চয়ই, অথবা মহারাষ্ট্র কবি শিবদীন-কেঠারীর বর্ণনা অনুসারে—

প্রপঞ্চ সাধুনি পরমার্থাচা লাহী জ্যানেঁ কেলা।
তো নর ভলা ভলা রে ভলা ভলা॥

যিনি প্রপঞ্চ সাধন করিয়া (সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য যথোচিত পালন করিয়া) পরমার্থ লাভ করিয়াছেন তিনিই "ভালো ভালো 'ভালো' ভালো"। এই অর্থই গীতায় প্রতি-পাদিত হইয়াছে। কর্ম্মযোগের এই মার্গ প্রাচীনকাল হইতে প্রচার হইয়া আসিতেছে; জনক প্রভৃতি ইহাই আচরণ করায় এবং স্বয়ং ভগবানের দ্বারা উহার প্রসার ও পুনরুজ্জীবন হওয়া প্রযুক্ত, ইহাকেই ভাগবতধর্ম্ম বলা হয়। এই সকল বিষয় ভালরূপে সিদ্ধ হইল। এই মার্গের জ্ঞানীপুরুষ পরমার্থযুক্ত স্বকীয় প্রপঞ্চ—জাগতিক ব্যব-হার—কিরূপভাবে চালান, লোকসংগ্রহদৃষ্টিতে ইহা দেখাও আবশ্যক। কিন্তু উপস্থিত প্রকরণ অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়া প্রযুক্ত পরবর্ত্তী প্রকরণে তাহার স্পষ্টীকরণ করিব।

ইতি একাদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

লিঙ্গায়ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

শরীর এবং আত্মার প্রভেদজ্ঞান যাহার জন্মি-য়াছে তাহাকে পিণ্ডজ্ঞানী কহে। চার্ব্বাকসম্প্র-দায়ের (নাস্তিক) লোকেরা শরীরকে আত্মা বলে।

চার্ব্বাক-সদৃশ অপর এক সম্প্রদায়ও ইন্দ্রিয়-গণকে আত্মা কহে। বৌদ্ধগণ বুদ্ধিকেই মুখ্য তত্ত্ব জানিয়া আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে। ইন্দ্রিয় কিম্বা শরীর কিম্বা বুদ্ধি কেহই আত্মা নহে। অহং-জ্ঞানের উৎপাদক আত্মা স্বতন্ত্র। আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি হইতে চিরকাল স্বতন্ত্ররূপে বর্ত্তমান আছে। যাহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে তাহাকে পিণ্ড-জ্ঞানী কহে। কর্ম্মপ্রমাণে উৎপন্ন শরীর নশ্বর। ইহার মধ্যে যে আত্মা বর্ত্তমান আছে তাহা নিত্য (তাহার বিনাশ নাই), এইরূপ জ্ঞান যাহার হই-য়াছে, তাহাকে প্রকৃত জ্ঞানী (পিণ্ডজ্ঞানী) বলিয়া জানিবে। শরীর হইতে আত্মা স্বতন্ত্র, আত্মা হইতে ঈশ্বর (পরমাত্মা) স্বতন্ত্র এবং শরীর ও আত্মা ঈশ্বরপ্রেরিত। এই ঈশ্বরকে যিনি জানিয়াছেন তাঁহাকে পিণ্ডজ্ঞানী (ব্রহ্মজ্ঞানী) কহে। ইতি পিণ্ডজ্ঞান।

যাহার মনমধ্যে মন্দ বাসনা সকল উৎপন্ন হয় নাই, যে আত্মাকে নিত্য ও শরীরকে অনিত্য বলিয়া মনমধ্যে সর্ব্বদা বিচার করে, তাহারই নিকট সংসার হেয় (পরিত্যাগ যোগ্য), বৈরাগ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে সে-ই সমর্থ। স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয়জন-পরিবেষ্টিত এই মৃত্যুলোক ক্ষণভঙ্গুর। ইহার জন্য কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বর্গসুখলাভে আলস্য করে?

যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার মৃত্যু আছে। যে মরিয়াছে তাহার পুনর্জ্জন্ম আছে। জীবগণ জন্ম-মরণমধ্যে চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। মহা-শক্তিমান বিষ্ণুও কর্ম্মফল অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পরম-সামর্থ্যবান হইয়াও তিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, রাম, পরশুরাম প্রভৃতি নানা জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই; যতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ততবার মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

কর্ম্মানুযায়ী মনুষ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতি মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই তিন প্রকার তাপরূপ অগ্নিমধ্যে সমভাবে দগ্ধ হয়। দুঃখের মূল কারণ কর্ম্ম। সেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক নামক তিন প্রকার দুঃখে দহ্যমান মানবের (বিশ্রান্তি) শান্তি কোথায়? উক্ত তিন প্রকার দুঃখের মধ্যে আধ্যাত্মিক (আত্মা হইতে উৎপন্ন) দুঃখ প্রথম। আধিভৌতিক (ইতর লোক হইতে উৎপন্ন) দুঃখ দ্বিতীয় এবং আধি-দৈবিক (দেবতা হইতে উৎপন্ন) দুঃখ তৃতীয় বলিয়া গণ্য হয়।

আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার। (১) বাহ্য এবং (২) আভ্যন্তর। বাত, পিত্ত, কফ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন দুঃখ বাহ্য আধ্যাত্মিক; এবং কাম, ক্রোধ, দ্বেষ ইত্যাদি ষড় রিপু হইতে উৎপন্ন দুঃখকে আভ্যন্তর আধ্যাত্মিক দুঃখ নামে অভিহিত করা হয়। রাজা প্রভৃতি ইতর লোক হইতে উৎপন্ন দুঃখ আধিভৌতিক নামে অভিহিত হয়। এবং গ্রহ, যক্ষাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে। এই তিন প্রকার দুঃখে পীড়ামান (পীড়িত) মনুষ্যের কি স্বর্গলোকে কি মর্ত্ত্যলোকে কোথায়ও সুখপ্রাপ্তি হয় না।

বিদ্যুৎতরঙ্গমালান্বিত দীপশিখার যেমন স্থিরতা নাই (সর্ব্বদা চঞ্চল), তদ্রূপ কর্ম্মহেতু প্রাপ্ত সম্পত্তির (শরীরের) বুদ্ধিবিবেকেরও স্থিরতা নাই। শরীর বিষ্ঠামূত্রের আধারস্বরূপ এইহেতু নানাপ্রকার কঠিন দুঃখ ভোগ করে এবং সেই শরীর বিদ্যুৎশিখাবৎ ক্ষণস্থায়ী। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই শরীরের অভিমান করিয়া থাকে? আত্মতত্ত্ব চিৎস্বরূপ নিত্যানন্দময়। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই নশ্বর দুঃখপাত্র শরীরের প্রতি প্রেম করিয়া থাকে?

যাহার মন নিষ্পাপ এবং যাহার আত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়াছে সেই জ্ঞানী মনুষ্য দুঃখের মূল কারণ স্বীয় শরীর, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু, দ্রব্য, বেশবিন্যাস প্রভৃতি বিষয়সমূহকে ক্ষণস্থায়ী জ্ঞান করিয়া সংসারে উদাসীন হইয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া থাকে। এই হেতু সংসার হেয়স্থল।

দীক্ষাস্থলের অপর নাম দীক্ষালক্ষণগুরুকারণ্যস্থল। এই স্থলে দীক্ষাগ্রহণের প্রণালী বর্ণিত আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দীক্ষা, তিন প্রকার:— (১) বেধা দীক্ষা, (২) মন্ত্রদীক্ষা, এবং (৩) ক্রিয়া দীক্ষা।

যে দীক্ষামূলে গুরু শিষ্যের মস্তকে আপন বরদ (আশীর্ব্বাদী) হস্ত রক্ষা করিয়া তাহার শরীরে শিব (ব্রহ্ম) শক্তি সঞ্চালিত করিয়া দেন তাহাকে বেধা দীক্ষা বলে। যে দীক্ষার মূলে গুরু শিষ্যকে কেবলমাত্র মন্ত্রশিক্ষা প্রদান করেন তাহাকে মন্ত্ররূপা দীক্ষা কহে।

কুণ্ড, মণ্ডলাদি ক্রিয়া দ্বারা যে দীক্ষা প্রদান করা হয় এবং যে দীক্ষার মূলে লিঙ্গ ধারণ করান হয় তাহাকে ক্রিয়া দীক্ষা কহে। এই দীক্ষাহেতু শুভ মাসে, শুভ তিথিতে, শুভ দিবসে এবং শুভ লগ্নে শিষ্যকে প্রথমে বিড়া (পান) দিয়া তৎপরে বিভূতি প্রদানপূর্ব্বক গুরু বিধিপূর্ব্বক যোগ্য রীতিতে দীক্ষিত করিবেন। এইহেতু শিষ্যকে প্রথমে স্নান করাইয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইয়া, দন্তধাবন মুখপ্রক্ষালনাদি শুদ্ধিকর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া মণ্ডলীমধ্যে পূর্ব্বদিকে মুখ করাইয়া উপবেশন করাইবে। তৎপরে সেই মণ্ডলী মধ্যে গুরু উত্তরদিকে মুখ করিয়া বসিয়া তাহাকে শিবনাম গ্রহণ এবং বারংবার শিব (ব্রহ্ম) কে ধ্যান করিতে উপদেশ দিবেন এবং তাহার কপোলদেশে বিভূতি লেপন করিয়া দিবেন। তৎপরে পঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপ তত্র মণ্ডলী মধ্যে স্থাপিত পঞ্চ কলসী হইতে বারিগ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যের মস্তকে তিনবার সিঞ্চন করিবেন। তদনন্তর, তাহাকে সংসারের মায়াপাশ-ছেদনকারী ষড়াক্ষরী মন্ত্রে উপদেশ এবং তাহার দক্ষিণ কর্ণে (অপরের অজ্ঞাতসারে) অতি ধীরে মন্ত্র প্রদান করিবেন এবং সেই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, স্বরূপ, দেবতা এবং ন্যাসক্রিয়া নিয়মাদি শিক্ষা দিবেন। ইতি দীক্ষাস্থল।

দীক্ষাকার্য্য সমাপন হইলে, গুরু স্ফটিক, উত্তম প্রস্তর, চন্দ্রকান্তমণি, বাণ (নর্ম্মদা নদীতে প্রাপ্ত বাণ-লিঙ্গ), অথবা সূর্য্যকান্তমণিনির্ম্মিত একটি লিঙ্গ, যথারীতি মন্ত্রঃপূত করিয়া শিষ্যের মস্তকোপরি স্থাপন করিবেন। শিষ্য সেই লিঙ্গকে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত দৃঢ়নিশ্চয়ের সহিত ধারণ করিবে। তৎপরে গুরু শিষ্যকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন—

'তুমি এই লিঙ্গকে প্রাণের ন্যায় জ্ঞান করিবে। কখন কোথায়ও ইহাকে তোমার শরীর হইতে অন্তর করিবে না। সর্ব্বদা ইহাকে তোমার শরীরের সহিত লগ্ন করিয়া রাখিবে' ইত্যাদি। এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গধারী শিষ্য শিবশক্তিসম্পন্ন সেই লিঙ্গকে সর্ব্বদা আপন প্রাণতুল্য দেখিবে।

লিঙ্গধারণ দুই প্রকার। (১) আভ্যন্তর এবং (২) বাহ্য। সকল জগতের কারণ, চিৎস্বরূপ শিব (ব্রহ্ম)ই শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ। এই লিঙ্গকে মনমধ্যে ধারণ করাকে আভ্যন্তর লিঙ্গধারণ কহে। এই চিৎরূপ ব্রহ্ম সকল প্রকার পাপের বিনাশকর্ত্তা, নিষ্কল এবং বিকল্পরহিত। তিনি অক্ষর, আনন্দময় এবং সর্ব্বব্যাপী। তিনি সপ্তদশ কলায় সমভাবে বর্ত্তমান আছেন। তিনি অপ্রমেয়, অনির্দ্দেশ্য, প্রপঞ্চাতীত, অব্যয় এবং পরব্রহ্ম। তাঁহার বিনাশ নাই।

এই লিঙ্গ প্রাণীগণের মনমধ্যে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণরূপে পরিপূর্ণভাবে ব্যাপ্ত আছেন এবং সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়মধ্যে এবং ভ্রূর মধ্যস্থানে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন। ইহাঁকেই সর্ব্বাগম ব্রহ্ম বলা যায়। ইনি লিঙ্গ, পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন (বিভাগ রহিত), অব্যক্ত এবং ব্রহ্ম সনাতন। ইহাঁকে ভক্তগণের সাধনের সহায়তার জন্য প্রাণ ও ভাবলিঙ্গরূপে বর্ণিত করা হয়।

যাঁহাতে এই স্থাবর-জঙ্গম বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হয় এবং যাঁহা হইতে উহা পুনঃপুনঃ উদিত হয়, সেই লিঙ্গ শাশ্বত ব্রহ্মরূপে অভিহিত হন। তিনি সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ। শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৃজনশক্তি বর্ত্তমান থাকা হেতু তাঁহাকে ব্রহ্ম কহা যায়। আধারমধ্যে (শরীরমধ্যে), হৃদয়মধ্যে এবং ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সেই তেজঃপুঞ্জ লিঙ্গকে ধ্যান করাকে আভ্যন্তর লিঙ্গধারণ কহে। শিবযোগী আধারমধ্যে সুবর্ণরূপী লিঙ্গের, হৃদয়মধ্যে প্রবালরূপী লিঙ্গের এবং ভ্রূদ্বয়মধ্যে

স্ফটিকরূপী লিঙ্গের ধ্যান করিবে। আভ্যন্তর লিঙ্গধারী নিরুপাধি লিঙ্গধারীরূপেও অভিহিত হয়। এইরূপ লিঙ্গধারণ বাহ্য লিঙ্গধারণ অপেক্ষা কোটীগুণে শ্রেয়স্কর। যিনি সেই চিৎস্বরূপ লিঙ্গ-(পুরুষ)কে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ তাঁহাকে এই ভয়ঙ্কর সংসারক্ষেত্রে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। অন্তর্লিঙ্গানুসন্ধান, আত্মবিদ্যা অভ্যাস এবং গুরুসেবা এই তিন মোক্ষলাভের কারণস্বরূপ। যে স্বতঃ বৈরাগ্যবান থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, যাহার মন স্থির আছে, সে-ই ব্রহ্মলিঙ্গের উপাসনা করে। যাহারা মনমধ্যে অন্তর্লিঙ্গ ধারণ করিতে অসমর্থ অথবা সমর্থ হইয়াও কোন কারণবশতঃ উহা ধারণ করিতে অশক্ত তাহাদিগের পক্ষে বাহ্য লিঙ্গধারণই বিধিসঙ্গত।

মহালিঙ্গের তিন ভেদ আছে। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং পরাৎপর। স্থূল লিঙ্গকে ইষ্টলিঙ্গ কহে। ইহা বাহ্য শরীরে ধারণ করিতে হয়। মস্তকে, গলদেশে, কক্ষে, বক্ষস্থলে, কটিদেশে কিম্বা হস্তে লিঙ্গ ধারণ করা কর্ত্তব্য। নাভির অধঃস্থলে কোন অংশে, জটাগ্রে, এবং পৃষ্ঠদেশে লিঙ্গ ধারণ করা নিষিদ্ধ এবং পাপমধ্যে পরিগণিত হয়।

লিঙ্গধারণকারী মনুষ্য সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। সে আপন মনোহর লিঙ্গকে প্রাণাপেক্ষা অধিক জ্ঞান করিবে।

অতঃপর এই পরিচ্ছেদে ঋগ্বেদ এবং যজুর্ব্বেদ হইতে প্রমাণসংগ্রহের দ্বারা লিঙ্গ-ধারণ প্রথার সমর্থন করা হইয়াছে। ইতি—লিঙ্গধারণস্থল।

গ্রন্থ-পরিচয়।

পল্লীস্বাস্থ্য। শ্রীচুণীলাল বসু প্রণীত। প্রকাশক শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু এম, বি। ২৫ নং মহেন্দ্র বসুর লেন, কলিকাতা। পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ; মূল্য চারি আনা।

পল্লীগ্রামে নানা অসুবিধার মধ্যে বাস করিয়াও কেমন করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারা যায় তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অতি সরল ভাষায় সঙ্ক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। স্বাস্থ্যের কয়েকটী মোটামুটি নিয়ম পালন করিলেও যে আমরা অনেক সময় দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ভীষণ সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি লেখক তাহা অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই পুস্তিকা প্রণয়নের জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না; কারণ স্বদেশ ও স্বজাতির দুর্দ্দশায় বেদনাই তাঁহাকে এই মহৎ কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীর বিশেষতঃ পল্লীবাসীর ইহা অবশ্যপাঠ্য। আমাদের মনে হয় দেশের হিতৈষী ব্যক্তিগণ যদি পল্লীতে পল্লীতে এই পুস্তিকা বিতরণের ব্যবস্থা করিতে পারেন তবে খুব ভাল হয়। এত শীঘ্র এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি।

ঋতুলীলা।—শ্রীরসময় লাহা কর্ত্তৃক রচিত নবপ্রকাশিত কবিতা পুস্তক। ভূমিকা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। আমরা এই পুস্তক পাঠে তৃপ্তিলাভ করিলাম। রসময় কবি কেবল পরিহাস-কবিতা রচনায় পটু নহেন; উদার ও গম্ভীরভাবোদ্দীপক কবিতা লিখিতেও তিনি সুদক্ষ। কবিতাগুলির মধ্যে যথার্থই কবিত্ব আছে; নব নব ছন্দো ঝঙ্কারে ও শব্দ-সম্পদেও সেগুলি পুষ্ট। 'বসন্ত' 'কোকিল' 'চাতক' 'চকোর' প্রভৃতি অনেক কবিতাই আমাদের ভাল লাগিল; দু-একটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

"কি মদিরা কুহুস্বরে, সুখের তড়িৎ
নাচায় শিথিল প্রাণ;
নিখিল অখিল, সলিল, অনিল, জাগায় কোকিল,
তোমার দীপক গান!"

"মুকুল-গন্ধে, আকুল অলি, আম্র-শাখে
তাম্র-কিশলয়;
জয়-পতাকা তুল্য ঝলে, স্পর্শে যখন
অরুণ দীপ্তিময়!" ইত্যাদি।

পুস্তকখানির শেষ ভাগে প্রাচীন সংস্কৃতকবিদের ষড় ঋতুর বর্ণনার সুরম্য অনুবাদ আছে।

"ছাই ভস্ম" "আরাম" "মণিমুক্তা" রসময় কবির অন্যান্য কবিতাপুস্তক। "ছাই ভস্ম" ও "আরাম" পরিহাস কবিতাদির পুস্তক। লেখক পরিহাস কবিতার আবরণে অনেক সামাজিক দোষ পরিস্ফুট করিয়াছেন।

"মণিমুক্তা"—কতকগুলি ইংরাজি কবিতার অনুবাদ। অনুবাদগুলি বেশ সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। "পাপিয়া" "সাত্ত্বিক" "নিরুপমা" "কবির অন্তর" প্রভৃতি অনেক কবিতাই অতি সুন্দর রূপে অনুবাদিত হইয়াছে।

দান প্রাপ্তি।

এলাহাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মাতা স্বর্গীয় সৌদামিনী দেবীর আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজে ২০৲ টাকা দান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

বিংশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৯১

৯২৭ সংখ্যা ১৮৪২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৫—ঈশ্বরকে তপস্যা দ্বারা জান।

(ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ জি ভাণ্ডারকর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥

শ্বেতাশ্বরঃ ৩।১১।

"সেই পরম ঐশ্বর্য্যবানের মুখ মস্তক ও কণ্ঠ সর্ব্বত্র রহিয়াছে, সকল ভূতের অন্তস্থ গূঢ়প্রদেশের মধ্যে তিনি বাস করেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী অতএব কল্যাণকারক; এই যে পরমাত্মা ইনি চারিদিকে আছেন"।

তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতস্স্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি॥

শ্বেতাশ্বতরঃ ১।১৫।

"তিলের মধ্যে যেমন তৈল থাকে, দধির মধ্যে ঘৃত, স্রোতের মধ্যে জল, এবং অরণির মধ্যে (যে কাষ্ঠের পরস্পরঘর্ষণে যজ্ঞের জন্য অগ্নি উৎপন্ন করা হয়, তাহাকে অরণি বলে) অগ্নি, সেইরূপ সত্য ও তপযোগে যে দেখে, সে আপনার মধ্যে পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়।"

সর্ব্বপ্রকারে শিব, শুভফলপ্রদ কল্যাণকর পরমেশ্বর সর্ব্বত্র আছেন; তবে, এই দুস্তর প্রপঞ্চের মধ্যে, মনুষ্য ব্যাকুলতা অনুভব করে কেন, মনুষ্যের হৃদয়ে ভীতি কেন উৎপন্ন হয়? তাহার কারণ এই যে, যদিও পরমেশ্বর এত নিকটে আছেন তথাপি আমরা কামক্রোধ প্রভৃতি রিপুর দাস হইয়া আছি; বিষয় আমাদের উপাস্য দেবতা হইয়া পড়িয়াছে; আমরা কেবল ঐহিক লক্ষ্মীর ভক্ত হইয়া পড়িয়াছি; তাই পরমেশ্বরের দিকে আমাদের দৃষ্টি যায় না। এই দৃষ্টি যাহাতে তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হয় এবং তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় এই জন্য আমাদের যত্ন করা আবশ্যক, সেইরূপ চলা আবশ্যক। তিলের মধ্যে তেল আছে, কিন্তু এই তিল ঘানিতে দিয়া পিষিবার শ্রম ব্যতীত, তৈল আমরা পাইতে পারি না; দধি মন্থনপাত্রে রাখিয়া না ঘুঁটিলে মাখন পাওয়া যায় না; দুই কাষ্ঠখণ্ডের পরস্পরঘর্ষণ ব্যতীত অগ্নি উৎপন্ন হয় না; এবং সত্য ও তপের অবলম্বন ব্যতীত, আমাদের আত্মায় যে পরমেশ্বর বাস করেন, তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যদি কেবল ঐহিক হিতের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া, কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া অন্যায় আচরণ কর, নির্ভয়ে ঘোরতর দুষ্কার্য্য কর, নানা প্রকার কু চিন্তা অন্তঃকরণে স্থান দেও; এবং "আমি কি-ই অধম, কি ই নীচ, আমার আচরণ কি-ই দুষ্ট" এইরূপ অন্তঃকরণ হইতে যে আক্ষেপ-উচ্ছ্বাস নির্গত হয়, তাহার প্রতি যদি লক্ষ্য না কর এবং জাগরণ কারী যে বিবেক সেই বিবেকের চক্ষু যদি জোর করিয়া উৎপাটন কর, তাহা হইলে পরমেশ্বরকে কিরূপে

প্রাপ্ত হইবে ? যখন লোভ প্রযুক্ত কিংবা ক্রোধ প্রযুক্ত আমরা কোন খারাপ কাজ কিম্বা অসত্য আচরণ করিতে অভ্যস্ত হই এবং বিবেক ঐরূপ কাজ করিও না বলিলেও মনকে দমন করা আমাদের পক্ষে দুর্ঘট হয়, তখন যদি দৃঢ় নিগ্রহ করিয়া বিবেক অনুসারে চলিয়া সেই অসত্য বিষয় আমরা ত্যাগ করি, তাহা হইলে আমরা আমাদের ইচ্ছার পক্ষপাতী না হইয়া সত্যের পক্ষপাতী হই ; লোভ ও ক্রোধের দাস না হইয়া পরমেশ্বরের দাস হই। তপ অর্থে অমুক উদ্দেশ্য মনে আনিয়া, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার সাফল্যসাধনে কায়মনোবাক্যে সতত প্রযত্ন করা এবং সেই প্রযত্নের মধ্যে নানা প্রকার কষ্ট পাইলেও তাহা ধৈর্য্যসহকারে সহ্য করা। প্রাচীনকালে ঋষিরা তপ করিয়াছিলেন বলিয়া যে কথা আছে তাহার বিচার করিলে, ইহাই তাহার তত্ত্বার্থ, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। অতএব, পরমেশ্বরের প্রাপ্তির প্রতি সতত লক্ষ্য রাখিয়া, তদর্থে আপনার মনের অযোগ্য, খারাপ, দুষ্ট বাসনাকে দমন করা ; কোন নীচ কর্ম্মযোগে কোটি কোটি ধন পাইবার সম্ভাবনা আছে, তথাপি তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সেই কার্য্য হইতে দূরে থাকা ; ক্রোধাদি বিকারকে বিবেকের অধীনে রাখা ; যাহা যোগ্য সেই বিষয়ে প্রযত্ন করা ; পরোপকারের ন্যায় উন্নত বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বান্তঃকরণে রত থাকা ; একান্তে বসিয়া অন্তঃকরণকে স্বস্থ বিনম্র ও শুদ্ধ করিয়া নিয়মপূর্ব্বক প্রত্যহ পরমেশ্বরের ধ্যান করা এবং এই সমস্ত করিবার সময় শারীরিক ও মানসিক কষ্ট প্রাপ্ত হইলেও ভীত না হইয়া এই কার্য্যক্রম বরাবর চালানো—ইহারই নাম তপস্যা। এবং যে ব্যক্তি এইরূপ তপস্যা করে, সে আপনার আত্মার মধ্যে ও সমস্ত বিশ্বের মধ্যে পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখিতে পায় এবং সে সুখী হয়।

১৬—ঈশ্বর পিতা ও সুহৃৎ।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ॥

শ্বেতাশ্বতর ৩।১৭।

"পরমেশ্বর সর্ব্বেন্দ্রিয়ের কাজ করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান তাঁহার আছে ; কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই ; সকলের তিনি প্রভু ও রাজা, সকলের শরণ্য তিনিই, সকলের মিত্র তিনিই।" সংসারের অনেক উপাধির যোগে অন্তঃকরণ উদ্বিগ্ন হইয়াছে ; বাস্তবিক সুখ কোথাও পাওয়া যায় না, এই জগতের মধ্যে কোথাও দাঁড়াইবার স্থান নাই, কোন মনুষ্যই আমার প্রতি স্নেহ করে না, আমার অনেক দুঃখসম্বন্ধে কাহারও অন্তঃকরণে অনুকম্পা ও করুণার উদয় হয় না,—এইরূপ অবস্থা হইলে এই সংসার কি কাহারও সহ্য হয় ? কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে নিরাশ হইয়া জীবনসম্বন্ধে উদাস হওয়া—ইহা সর্ব্বথা মিথ্যা। এই বিশ্বাসকে মনোহর রূপ দিয়া যিনি আমাদের অন্তঃকরণে পরম উন্নত আনন্দ ও শান্তি প্রদান করেন, সেই জগদাত্মা না জানি কতই বৎসল! যদি কোন সুন্দর বাড়ী, তাহার চতুর্দ্দিকে রম্য উপবন, তন্মধ্যে সুশোভন পুষ্পবৃক্ষ, চারিদিকে জলের নালা, মধ্যে ফোয়ারা এইরূপ রচনা করিয়া কোন ব্যক্তি আমাকে সেখানে থাকিতে দেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি আমার পরম বন্ধু, আমার যাহাতে সুখ হয় ইহাই তাঁহার খুব ইচ্ছা—এইরূপ আমরা নিঃসংশয়ে মনে করি না কি ? অবশ্যই মনে করি। তবে, পর্ব্বত, উপত্যকা, নদী, সাগর, বনস্পতি প্রভৃতিতে ভরপূর এই সুন্দর পৃথিবী, এবং তাহাতে দেদীপ্যমান ও সমস্ত বস্তুতে স্বকীয় কিরণযোগে সমুজ্জ্বলকারী সূর্য্য এবং রাত্রিতে ঝক্‌ঝকে রত্নসদৃশ অসংখ্য তারাগণ এবং স্বকীয় সৌম্য আলোকে সমস্তকে আনন্দময় করিয়া তোলে যে চন্দ্র সেই চন্দ্রশোভিত আকাশরূপ পরম শোভমান চন্দ্রাতপ নির্ম্মাণ করিয়া, আমাদের আত্মার যিনি আনন্দ বিধান করেন সেই পরমাত্মাকে কি পরম সুহৃদ্ বলিবে না ? আমাদের সুখের জন্য তাঁর কতই চিন্তা! এবং অনাথ শিশুদিগের রক্ষণার্থ মাতাপিতার অন্তঃকরণে যিনি আশ্চর্য্য স্নেহ উৎপাদন করেন এবং স্নেহস্বরূপ শিশুর পোষণের জন্য যিনি মাতৃস্তনে দুগ্ধ নির্ম্মাণ করেন এবং সমস্ত জগতের মধ্যে যিনি এই প্রকার যোজনা করেন তিনি আমাদের বৎসল পিতা, সুহৃদ, রক্ষাকর্ত্তা নহেন কি ? আমাদের

ঐহিক মিত্রের আত্মা এবং তদন্তর্গত স্নেহ মমতা ইত্যাদি গুণ আমাদের চোখে দেখা যায় না, তথাপি বাহ্য চিহ্নযোগে সেই আত্মা আছে এবং তদন্তর্গত এই সকল গুণ অবস্থিতি করিতেছে এইরূপ আমরা অনুমান করিয়া থাকি এবং ঐ অনুমানের সত্যতা-সম্বন্ধে তিলমাত্র আমাদের সংশয় থাকে না। তবে সেই প্রকারেরই অথচ তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত চিহ্ন বিশ্বের মধ্যে দেখিতে পাইলে সেই বিশ্বের মধ্যে আত্মা আছে এবং সেই আত্মা অত্যন্ত স্নেহ মমতা ইত্যাদি গুণে পূর্ণ এইরূপ অনুমান আমরা করিব না কি? এবং এই অনুমানের সত্যতাসম্বন্ধে আমরা কি সন্দেহ করিব? না, কখনই না। অতএব জগদাত্মা আমাদের সকলের বৎসল পিতা এবং পরম প্রেমময় সুহৃদ্। মনুষ্যের অন্তঃকরণ কেবল সংসারের চিন্তাই সতত করে বলিয়া এই বিষয় সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে না; কিন্তু উচিত বিচার ও সতত অভ্যাসের যোগে এই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইলেই সংসারের দুঃখ বিনষ্ট হয়; ভীতি ও উদ্বেগ নিরস্ত হইয়া যায় এবং নিরাশা ও উদাসীনতা তিরোহিত হইয়া হৃদয় আশ্বাস প্রাপ্ত হয়, আশা ও উৎসাহ উদিত হয়। পরমেশ্বরের নিকট, ছোট বড় ধনী-নির্ধন সকলেই সমান। তিনি সকলের সাধারণ পিতা সাধারণ সুহৃদ। সংসারে ধনশালী ব্যক্তিরা দরিদ্রগণকে তুচ্ছ মনে করিয়া তাহাদিগের অবমাননা করে; কিন্তু পরমেশ্বরের নিকট ধনীদিগের মর্য্যাদা অধিক নহে। সেখানে উভয়েরই মানমর্য্যাদা এক সমান। প্রায়শঃ পরমেশ্বরের নিকট দরিদ্র মনুষ্যদিগেরই অধিক প্রাধান্য। কারণ, লক্ষ্মীর মদ বা ধনগর্ব্ব তাহাদের শরীরে নাই বলিয়া, সেই ধনগর্ব্বজনিত ঘোর দুষ্কর্ম্ম তাহাদের দ্বারা সংঘটিত হয় না; তাহারা কাঙ্গাল হওয়ায় তাহাদের হৃদয়ে বিনম্রভাব অবস্থিতি করে, ধনশালীদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়জনিত সুখে তাহারা নিমগ্ন হয় না। ধনশালীদিগের ন্যায় তাহারা একেবারে সংসারের দাস হয় না বলিয়া তাহাদের মন পরমেশ্বরের ও পরমার্থের প্রতি বিশেষরূপে আসক্ত হয়। তাহারা আপন পরম পিতাকে অধিক চিনিতে পারে, তাহাদের প্রীতি ও ভক্তি সহজেই তাহার প্রতি ধাবিত হয়। অতএব মনুষ্য যতই গরীব হউক না কেন, সমস্ত লোক যদি তাহাকে অনাদর করে, সংসারে তিলমাত্র সুখ যদি তাহার না থাকে, তথাপি তাহার জন্য তাহার খেদ হয় না। সে নিরাশ ও উদাসীন হয় না। কারণ সমস্ত মানবসুহৃদ্ অপেক্ষা অনন্তগুণে সমর্থ, অনন্তগুণে বৃহৎ এক পুরুষ তাহার পরম সুহৃদ, সাক্ষাৎ পিতা; তিনি তাহাকে উপেক্ষা করেন না, অন্যাপেক্ষা তাহার সম্বন্ধে তিনি অধিক চিন্তা করেন, তাহার উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেন। এই সমস্ত অভিপ্রায় মনের মধ্যে আনিয়া এক ভক্ত বলিয়াছেন:—

> "রুজাসু নাথঃ পরমং হি ভেষজং
> তমঃ প্রদীপো বিষমেষু সংক্রমঃ।
> ভয়েষু রক্ষা ব্যসনেষু বান্ধবো
> ভবত্যগাধে বিষয়াম্বুধি প্লবঃ॥

"রোগ হইলে প্রভু পরমাত্মাই পরম ঔষধ। রোগ ভোগ করিবার সময় পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রেম পূর্ণরূপে জাগৃত হইলে এবং তাঁহার রূপ চক্ষের সমক্ষে প্রকাশ পাইলে সেই ব্যথা আর উপলব্ধি হয় না"। নানাপ্রকার বাধা আমার উপর আসিয়া পড়িলে, সেই সব বাধা কি করিয়া দূর করা যাইবে তাহা জানা যায় না; অসংখ্য কর্ত্তব্য আসিয়া একেবারেই উপস্থিত হইলে, কোন্‌টি করিতে হইবে তাহা জানা যায় না, মনুষ্য হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, তাহার মতি অন্ধকারে আবৃত হয়, কোন পথ দেখিতে পায় না;—এইরূপ অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস অন্তঃকরণে পূর্ণরূপে পোষণ করিলে এই অন্ধকারের মধ্যে আলোক-কিরণ প্রবিষ্ট হয় এবং তাহা দ্বারা গন্তব্য পথ দৃষ্টিপথে পতিত হয়; কিংবা ঘোর সঙ্কটে পতিত হইলে, যাহার পরমেশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস, সে সেই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হয়। যখন কোন ভয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তখন ঈশ্বরকে স্মরণ করিলে, তাঁহার চিন্তায় চিত্তহারা হইলে সেই ভীতি নষ্ট হয়; তাই প্রভুই এক রাখীবন্ধন। দুঃখাবস্থা উপস্থিত হইলে, একমাত্র তিনিই আমাদের বন্ধু, তাঁহার স্বরূপ হৃদয়ের সমক্ষে স্থাপন করিলে আমরা শান্তি পাই; সেরূপ শান্তি কোন মনুষ্য হইতে কিংবা বস্তু হইতে হয় না এবং বিষয়-

রূপ যে গভীর সমুদ্র যাহার মধ্যে বহুলোক ডুবিয়া যায় ও দুঃখ ভোগ করে, সেই সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার প্রভু পরমেশ্বরই এক নৌকা। এই অভিপ্রায়েই ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ॥

ভগবান বলিতেছেন—"আমিই এই জগতের পিতা, আমিই মাতা, আমিই ধাতা অর্থাৎ পোষণকর্ত্তা, আমিই জগতের পিতামহ, আমিই এই জগতের গতি—অর্থাৎ সমস্ত মনুষ্য আমাকে আশ্রয় করিয়াই শুভগতি প্রাপ্ত হয়। আমিই জগতের ভর্ত্তা অর্থাৎ ভরণ কর্ত্তা। আমিই জগতের স্বামী ও প্রভু। আমিই জগতের সকল ব্যাপারের সাক্ষী, আমিই সকলের আধারভূত, আমিই সকলের রক্ষাকর্ত্তা, আমিই সকলের সখা।"

মাতৃত্ব।

(শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

পুণ্য-প্রতিমা মাতৃ-গরবে
দাঁড়ায়েছে হের নারী;
সার্থক সব ত্রিদিববিভব
লুণ্ঠিত পদে তাঁরি।
অগণিত কত চন্দ্র সূর্য্য
ঘিরিয়া ঘিরিয়া আরতি করে;
বিশ্ব ভরিয়া উঠে জয়-গীতি
আনন্দ-ভরে।
অভিনন্দনে দেবতাগণে
দাঁড়ায়েছে সারি সারি
সব রিক্ততা করিয়া পূর্ণ
উজ্জ্বল করি' অন্ধকারে
আসুরী বৃত্তি করিয়া চূর্ণ
স্নিগ্ধ করিয়া পীযূষধারে
নয়নে ক্ষরিছে অমিয়রাশি
বচনে শান্তিবারি
চরণের তলে কোকনদ কত
ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিছেরে
অযুত মত্ত মধুপ তাহে
ঘিরিয়া ঘিরিয়া ঢুলিছে রে
অগণিত কত চাঁদ নিছনি
(গেছে) নখমণি ছাঁদে হারি।

বাবা গম্ভীরনাথ।

(অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

তৎপর তিনি নিয়মিতভাবে আরও তীব্রতর অভ্যাসযোগের জন্য একটী স্থায়ী আসন মনোনীত করিলেন। স্থানটী গয়ার নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নীচে, কপিলেশ্বর শিবমন্দিরের কাছে। তিন দিকে উচ্চ পাহাড়ের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অন্যদিক দিয়া নীচে লোকালয়ে যাতায়াত করা যায়। বর্ত্তমানে সেখানে মহাত্মা পরমহংস রতনগিরি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পাকাবাড়ী এবং সাধুদের স্থায়ী আবাস প্রভৃতি দ্বারা স্থানের চেহারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু বাবা গম্ভীরনাথ যখন সে স্থানটী পছন্দ করিয়াছিলেন, তখন এসব কিছুই ছিল না। দু-একজন বৈরাগ্যবান নির্জ্জনপ্রিয় সাধক সাধনের জন্যই সেখানে যাইতেন। উপরে পরিষ্কার আকাশ, তিন দিকে উচ্চ পাহাড়, স্থানটী খুব উচু পর্ব্বতের উপরে নয় অথচ নিম্নের সমতল ভূমি হইতে অনেক উচ্চে, লোকালয় হইতে দূরে অথচ এত দূরে নয় যাহাতে সেবার বিশেষ অসুবিধা হয়, ঘন জঙ্গলাকীর্ণ নয় অথচ মাঝে মাঝে বৃক্ষের ছায়া আছে, খুব শীতও নয়, অতিমাত্রায় গরমও নয়। গয়ার নিকটবর্ত্তী এই সব পার্ব্বত্য স্থানে কত মহাত্মা যে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যাঁহারা সিদ্ধিলাভান্তে জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ লোকালয়ে ফিরিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিতরণ করেন, লোকে তাঁহাদেরই কথা জানে এবং তাঁহাদেরই মধ্যে কাহারও কাহারও নাম ইতিহাসে থাকিয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা এই লোকশিক্ষার বাসনার অভাববশতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াই আত্মানন্দ উপভোগ করিতে করিতেই

বিদেহমুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞানের শক্তি অলক্ষিতে মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও তাঁহাদের নাম বা সাধনার বিবরণ জানিবার কোন উপায় থাকে না। হিমালয় ছাড়া গয়ার পাহাড়গুলির মত সাধনার অনুকূল স্থান খুব বিরল, তাই অসংখ্য সাধক এখানে লোকের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে চিরকাল সাধন করিয়া আসিতেছেন। বাবা গম্ভীরনাথও এই স্থানকেই তাঁহার সাধনের অনুকূল বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

তিনি যখন এই কপিলধারা সাধনের জন্য মনোনীত করেন, তখন সেখানে আশ্রম দূরের কথা, কোন গুফাও ছিল না। তিনি মুক্ত আকাশতলে দিন রাত্রি সাধনে অতিবাহিত করিতেন। কখনও কখনও ব্রহ্মযোনি প্রভৃতি উচ্চ পর্ব্বতের উপরে চলিয়া যাইতেন, কখনও পাহাড়ের গায়ে বসিতেন, কখনও কপিলধারায় থাকিতেন। শীত-গ্রীষ্ম তাঁহার নিকট সমান ছিল। এই সময়ে তাঁহার পরিধানে একটী মাত্র কৌপীন, আর সম্বল একটী খর্পর ও একটী ফৌরী। তাঁহার সঙ্গে কোন সেবকও ছিল না। কিন্তু এরূপ অনন্যচেতা সাধকদের 'যোগক্ষেমবহনের' ব্যবস্থা আগেই হইয়া থাকে। তিনি গয়ায় যাইবার কিছু পরেই আকু নামক এক নিতান্ত দরিদ্র কাহার তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করে। সে স্বেচ্ছায়ই এই মহাপুরুষের জন্য ধূনীর কাঠ সংগ্রহ, ধূনী জ্বালান, খাদ্যসংগ্রহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া রাখিত। ক্রমে তাহার ভাই মুন্নিও বাবাজীর অনুগত সেবক হইল। বাবাজী, প্রায় সর্ব্বদাই ধ্যানমগ্ন থাকিতেন; ইহারা তাঁহার শরীর রক্ষার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা করিত। মাস-দুই এইরূপ অতিবাহিত হইলে বাবা নৃপৎনাথ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। নৃপৎনাথ তদবধি সর্ব্বদা বাবাজীর সঙ্গে থাকিতেন, বাবাজী তীর্থভ্রমণে গেলে নৃপৎনাথ সাথে সাথে যাইতেন, তিনি যখন যেখানে যে ভাবে থাকিতেন, নৃপৎনাথ তাঁহার ছায়ারূপে সর্ব্বদা উপস্থিত। আরও কিছু কাল পরে বাবা শুক্কনাথও তাঁহার সঙ্গ প্রাপ্ত হন। তিনিও অনেক সময়ই বাবাজীর সঙ্গে থাকিতেন। বাবাজী তখন কাহাকেও শিষ্য করিতেন না। দশ বৎসর কায়মনোবাক্যে সেবা করিয়া অনেক কষ্টে নৃপৎনাথ দীক্ষা প্রাপ্ত হন, এবং আরও কিছু দিন পরে শুক্কনাথ দীক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের কাহাকেও বাবাজী সন্ন্যাস প্রদান করেন নাই। সন্ন্যাসের সংস্কার ইঁহারা অন্য কোন সাধুর নিকট পাইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই বাবাজীর একান্ত সেবক ও উপদেশী বা সাধক চেলা। বাবাজীর মহাসমাধির কিছু কাল পূর্ব্বে নৃপৎনাথের সমাধি হয়। বাবা শুক্কনাথ এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই বাবাজীর সম্বন্ধে অধিকাংশ ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে।

বাবা গম্ভীরনাথ পাহাড়ের উপরে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন, নৃপৎনাথ ও শুক্কনাথ নীচে এক কুটীরে থাকিতেন এবং যখন যাহা দরকার বুঝিয়া সব ব্যবস্থা করিতেন। এই সময়েই খুব বড় মহাত্মা বলিয়া তাঁহার নাম গয়ার অনেকের নিকট পরিচিত হয়। তখন মাধোলাল মারোয়ারী নামক এক ধনী ব্যক্তি একটী ভীষণ মোকর্দ্দমায় জড়িত হয়। এই মোকর্দ্দমায় হারিলে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, অথচ জিতিবারও কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বাবাজীর নাম শুনিয়া সে তাঁহার শরণাপন্ন হয় এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করে। তাহার এইরূপ প্রাণপণ সেবা দেখিয়া ও তাহার হৃদয়ের দীনতা ও আকুল প্রার্থনা অবগত হইয়া বাবাজীর স্বাভাবিক দয়াপ্রবণ চিত্তে দয়ার সঞ্চার হয় এবং তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। মাধোলাল হাইকোর্টে মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করে। তদবধি সে বাবাজীর একজন বিশিষ্ট অনুগত ভক্ত হয় এবং তাঁহার কোন সেবায় নিজেকে লাগাইতে পারিলেই কৃতার্থ বোধ করে। কিছুকাল পরে বাবাজীর নিকট প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, তাঁহার উপদেশ অনুসারে তাঁহার সাধনের জন্য কপিলধারায় একটী গুফা নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। এই গুফা এখনও আছে। এই গুফায় নিয়মিতভাবে তিনি ১২।১৩ বৎসর সাধন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি ঐ স্থান ছাড়িয়া গেলে যখন মহাত্মা রতনগিরি সেখানে আশ্রম

করেন, তখন তিনি গয়ায় আসিলে তাঁহার বাসের জন্য উক্ত মাধোলালই একটী নির্জ্জন স্থানে একটী বাগান বাড়ী করিয়া দেন। তিনি কয়েকবার গয়ায় আসিয়া কিছুদিন করিয়া সেই বাড়ীতে ছিলেন।

সাধনগুফা প্রস্তুত হইলে প্রথম কিছুদিন তিনি গভীর ধ্যানের জন্য গুফায় প্রবেশ করিতেন এবং অন্য সময় বাহিরে থাকিতেন। মাঝে মাঝে গভীর ধ্যানে এমনভাবে মগ্ন হইতেন যে, দিনরাত্রির মধ্যে একবারও বাহির হইতেন না। কখন কখন এক দিন কি দুইদিন অন্তর একবারমাত্র বাহিরে আসিতেন। তখন সেবকদের দ্বারা আনীত খাদ্য গ্রহণ করিতেন, এবং কেহ দর্শন করিতে আসিলে দর্শন দিতেন। এইভাবে কিছুকাল সাধনের পর তিনি নিয়মপূর্ব্বক সাতদিন পর পর একবার মাত্র দুই-ঘণ্টার জন্য গুফার বাহিরে আসিতে লাগিলেন। এই সময়ে সাধারণতঃ প্রতি মঙ্গলবার বৈকালে তিনি বাহিরে আসিতেন, আর সারা সপ্তাহ ব্যাপিয়া গুফার ভিতরে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। সেবকেরা প্রতিদিন একপোয়া পরিমাণ দুগ্ধ তাঁহার গুফার ভিতরে রাখিয়া আসিত। গুফার ভিতরে দুইটী প্রকোষ্ঠ। অন্তঃপ্রকোষ্ঠে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। কখন ধ্যান একটু শিথিল হইবে জানা নাই। সেবকেরা বহিঃপ্রকোষ্ঠে দরজার সম্মুখে দুগ্ধ রাখিয়া আসিত, ভিতরে প্রবেশ করিবার তাহাদের নিয়ম ছিল না। তিনি কোন এক সময়ে সেই দুগ্ধটুকু পান করিতেন। মলমূত্রত্যাগের কোন প্রয়োজন হইত না। এই সময়ে অলৌকিক মহাপুরুষ বলিয়া অনেকে তাঁহাকে জানিয়াছিল। তাঁহার বাহির হইবার দিনে অনেক লোক তাঁহার দর্শনপ্রত্যাশায় সেবার জিনিসপত্র লইয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। গুফার সন্নিকটে একটী বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যস্থলে স্বহস্তে তিনি কয়েকটী ত্রিশূল প্রোথিত করিয়াছিলেন। বাহির হইয়া এই ত্রিশূলের নীচে বেদীর উপরে তিনি কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিতেন। তখন কখন কখন কিছু ফল গ্রহণ করিতেন এবং তামাক সেবন করিতেন। কথাবার্ত্তা তিনি প্রায় কখনও বলিতেন না। একটু মধুর দৃষ্টিতে দর্শকদিগের মন-প্রাণ ভিজাইয়া দিতেন। কাহারও আনীত কোন জিনিষ একটু গ্রহণ করিলে তাহারা আপনাদের ভাগ্যকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইত। তাঁহার দৃষ্টির ভিতর হইতে তেজ, শান্তি ও করুণা একসঙ্গে বিকীর্ণ হইয়া উপস্থিত লোকদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিত। এতদ্ভিন্ন তিনি কখনও কোন যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেন না। লৌকিক কোন কামনা লইয়া তাঁহার নিকট যাহারা উপস্থিত হইত, তাহারা অনেক সময়েই তাঁহার ভাবগম্ভীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহাদের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। কেহ কিছু প্রকাশ করিলেও তিনি নীরব থাকিতেন, তাঁহার ভিতরে কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত না, তিনি শুনিতেন কিনা, তাহাও বুঝা কঠিন ছিল। এইরূপে কিছুক্ষণ থাকিয়া তিনি আবার ধ্যানগুহায় প্রবেশ করিতেন।

সেবকেরা বলেন যে তিনি প্রায় দুই বৎসর এইরূপ সপ্তাহে একবার করিয়া গুহার বাহিরে আসিতেন। তারপরে তিনি পক্ষান্তে একবার করিয়া বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সাধারণতঃ অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বাহিরে আসিতেন। এরূপ ধ্যাননিবিষ্ট অবস্থায় দিন, ক্ষণ, কালাকালের কোন হিসাব থাকার যে কোনই সম্ভাবনা নাই, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সত্যসংকল্প মহাত্মাগণ যদি কোন সংকল্প করিয়া তারপর ধ্যানে বসিয়া যান, তবে সেই পূর্ব্ব সংকল্প অনুসারে আপনা আপনিই কাজ হইয়া থাকে। বাবাজীর গুফা প্রবেশের কালে বোধ হয় তদ্রূপ কোন সংকল্প থাকিত। তদনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি বাহির হইতে পারিতেন। হয়ত তাঁহার শরীররক্ষা ও যোগসাধনের জন্য এবং ভবিষ্যতে লোকানুগ্রহের নিমিত্ত যে কতক পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে, তজ্জন্য এরূপ সংকল্প রক্ষা করার প্রয়োজনও থাকিতে পারে। যাহা হউক, তৎকালে তাঁহার বাহিরে আসিবার নিয়মটী প্রায়ই ঠিক থাকিত।

কিছু কাল পক্ষব্যাপী গুফানিবাসের অভ্যাসের পর তিনি মাসব্যাপী গুফানিবাসের অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তখনও ব্যবস্থা একরূপই ছিল। আহার একপোয়া দুধ, বাহিরে আসিলে কিছু

ফলাদি গ্রহণ, মলমূত্র ত্যাগের অভাব। নিদ্রা যে মোটেই ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। অবশেষে একবার তিনি তিন মাসের জন্য গুফায় প্রবেশ করেন। এই তিন মাস ব্যাপী নিয়ত ধ্যানের পর যখন তিনি গুফা হইতে বাহির হইলেন, তার পর আর নিয়মপূর্ব্বক গুফানিবাসী হন নাই। তখন হইতে আবার কখন বাহিরে থাকিতেন, কখনও গুফায় থাকিতেন। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে এ সময়ে তাঁহার ভিতর বাহির এক হইয়া গিয়াছিল।

গয়ায় সাধন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। তখনই তাঁহার জ্ঞানাগ্নিতে 'অহং' সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছিল, জগতের ব্রহ্মময়ত্ব তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু এই উপলব্ধিই সাধনের চরম অবস্থা নয়। এটা যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে স্বভাবে পরিণত না হয়, যে পর্য্যন্ত ধ্যানাবস্থা ও জাগ্রদবস্থায় কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে, যে পর্য্যন্ত সর্ব্বাবস্থায় সমাধিজ প্রজ্ঞা সমান পরিমাণে উজ্জ্বল না থাকে, সে পর্য্যন্তই তীব্র সাধনের প্রয়োজনীয়তা থাকে, শুধু তাই নয় তখনই সম্পূর্ণ বিক্ষেপ-বিহীন সমাধি অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। জ্ঞানলাভের পূর্ব্বের সাধন ও পরের সাধনের বিশেষ পার্থক্য এই যে পূর্ব্বের সাধনে জোর করিয়া বিষয় হইতে অন্তঃকরণকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মস্থ করিতে হয়, কিন্তু পরে আর প্রত্যাহারের দরকার হয় না, সংকল্পমাত্রই চিত্ত আপনা-আপনি বৃত্তিরহিত হইয়া যায় এবং সাধক আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। কিন্তু এই অবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বভাবে পরিণত করিতে হইলে, জাগ্রদবস্থাতেও দেহেন্দ্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যেও চিত্তকে সমাহিত রাখিতে হইলে, সর্ব্বাবস্থায় আত্মরতি, আত্মক্রীড় থাকিতে হইলে, অনেকদিন নিয়ত সমাধিস্থ থাকার অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। এই অভ্যাসটাই বাবাজী গয়ায় করিয়াছিলেন।

বারো তের বৎসর পূর্ব্বোক্ত প্রকার নিয়ত অভ্যাসের ফলে তিনি যোগসাধনের ও জ্ঞানসাধনের চরম অবস্থায় স্থিত হইলেন; তখন আর সংকল্পপূর্ব্বক সাধনের কোন প্রয়োজনীয়তা রহিল না, তখন তিনি 'ব্রহ্মভূতঃ প্রশান্তাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি' শাস্ত্রে জীবন্মুক্তের শ্রেষ্ঠত্বের যেরূপ বর্ণনা আছে, তদ্রূপ লক্ষণান্বিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। যথা—

> মৌনবান্নিরহম্ভাবো নির্মানো মুক্তমৎসরঃ।
> সর্ব্বত্র বিগতস্নেহো যঃ সাক্ষিবদবস্থিতঃ।
> নিরিচ্ছো বর্ত্ততে কার্য্যে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
> যেন ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ মনোমননমীহিতম্।
> সর্ব্বমন্তঃ পরিত্যক্তং স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥

ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ যখন বাহিরে আসিয়া লৌকিক ব্যবহার করেন, তখন তাঁহাদের সকলের ভাব এক রকম পরিলক্ষিত হয় না। বেদান্তশাস্ত্রানুসারে পূর্ব্ব প্রারব্ধ অনুসারে তাঁহাদের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ তাঁহাদের নূতন কোন ইচ্ছা বা দ্বেষ জন্মিতে পারে না, তাঁহারা 'নিরিচ্ছ' হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। প্রারব্ধ সকলের এক রকম নয়। তাই জীবন্মুক্তদের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবপ্রবণ হইয়া নৃত্যগীত করেন, কেহ শান্ত স্থির থাকিয়া আত্মানন্দ উপভোগ করেন, কাহারও মেজাজ একটু খিট্‌খিটে হইতে দেখা যায়, কেহ কেহ সকলের প্রতিই মধুর ব্যবহার করেন, কাহারও ব্যবহারের মধ্যে মধ্যে কোন কোন রাজস বা তামস ভাবের কাজও লক্ষিত হয়, কাহারও ব্যবহার শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে ভিতরটা সকলেরই পরিষ্কার, সকলেই সর্ব্ববন্ধনপরিশূন্য, ব্যবহারে রাজস বা তামস ভাব থাকিলেও তাহা দ্বারা মুক্ত পুরুষ বদ্ধ হন না; তবুও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বজাত সংস্কার অনুসারে তাঁহাদের বৃত্তির পার্থক্য হয়। সকল বৃত্তি, সকল সংস্কার সম্যক্‌রূপে পরিশুদ্ধ হওয়ার পরে যে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। প্রারব্ধের মধ্যে অশুদ্ধ সংস্কার থাকিলেও তীব্রপুরুষকার-সহায়ে শ্রবণ, মনন, ধারণা, ধ্যান, সমাধি প্রভাবে সাধক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যতদিন চিত্ত তত্ত্বে সমাহিত থাকে, ততদিন প্রাক্তন সংস্কারগুলি বিলীন থাকে, তাহাদের কোন কাজ থাকে না। তারপর জ্ঞানে যখন শুভ অশুভ সব সমান হইয়া যায়, যখন—

> প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
> ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥

করেন, তখন তিনি গয়ায় আসিলে তাঁহার বাসের জন্য উক্ত মাধোলালই একটা নির্জ্জন স্থানে একটী বাগান বাড়ী করিয়া দেন। [illegible] কয়েকবার গয়ায় আসিয়া কিছুদিন ক[illegible]রা সেই বাড়ীতে ছিলেন।

সাধনগুফা প্রস্তুত হইলে প্রথম কিছুদিন তিনি গভীর ধ্যানের জন্য গুফায় প্রবেশ করিতেন এবং অন্য সময় বাহিরে থাকিতেন। মাঝে মাঝে গভীর ধ্যানে এমনভাবে মগ্ন হইতেন যে, দিনরাত্রির মধ্যে একবারও বাহির হইতেন না। কখন কখন এক দিন কি দুইদিন অন্তর একবারমাত্র বাহিরে আসিতেন। তখন সেবকদের দ্বারা আনীত খাদ্য গ্রহণ করিতেন, এবং কেহ দর্শন করিতে আসিলে দর্শন দিতেন। এইভাবে কিছুকাল সাধনের পর তিনি নিয়মপূর্ব্বক সাতদিন পর পর একবার মাত্র দুই-ঘণ্টার জন্য গুফার বাহিরে আসিতে লাগিলেন। এই সময়ে সাধারণতঃ প্রতি মঙ্গলবার বৈকালে তিনি বাহিরে আসিতেন, আর সারা সপ্তাহ ব্যাপিয়া গুফার ভিতরে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। সেবকেরা প্রতিদিন একপোয়া পরিমাণ দুগ্ধ তাঁহার গুফার ভিতরে রাখিয়া আসিত। গুফার ভিতরে দুইটী প্রকোষ্ঠ। অন্তঃপ্রকোষ্ঠে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। কখন্ ধ্যান একটু শিথিল হইবে জানা নাই। সেবকেরা বহিঃপ্রকোষ্ঠে দরজার সম্মুখে দুগ্ধ রাখিয়া আসিত, ভিতরে প্রবেশ করিবার তাহাদের নিয়ম ছিল না। তিনি কোন এক সময়ে সেই দুগ্ধটুকু পান করিতেন। মলমূত্রত্যাগের কোন প্রয়োজন হইত না। এই সময়ে অলৌকিক মহাপুরুষ বলিয়া অনেকে তাঁহাকে জানিয়াছিল। তাঁহার বাহির হইবার দিনে অনেক লোক তাঁহার দর্শনপ্রত্যাশায় সেবার জিনিষপত্র লইয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। গুফার সন্নিকটে একটা বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যস্থলে স্বহস্তে তিনি কয়েকটী ত্রিশূল প্রোথিত করিয়াছিলেন। বাহির হইয়া এই ত্রিশূলের নীচে বেদীর উপরে তিনি কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিতেন। তখন কখন কখন কিছু ফল গ্রহণ করিতেন এবং তামাক সেবন করিতেন। কথাবার্ত্তা তিনি প্রায় কখনও বলিতেন না। একটু মধুর দৃষ্টিতে দর্শকদিগের মনপ্রাণ ভিজাইয়া দিতেন। কাহারও আনীত কোন জিনিষ একটু গ্রহণ করিলে তাহারা আপনাদের ভাগ্যকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইত। তাঁহার দৃষ্টির ভিতর হইতে তেজ, শান্তি ও করুণা একসঙ্গে বিকীর্ণ হইয়া উপস্থিত লোকদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিত। এতদ্ভিন্ন তিনি কখনও কোন যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেন না। লৌকিক কোন কামনা লইয়া তাঁহার নিকট যাহারা উপস্থিত হইত, তাহারা অনেক সময়েই তাঁহার ভাবগম্ভীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহাদের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। কেহ কিছু প্রকাশ করিলেও তিনি নীরব থাকিতেন, তাঁহার ভিতরে কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত না, তিনি শুনিতেন কিনা, তাহাও বুঝা কঠিন ছিল। এইরূপে কিছুক্ষণ থাকিয়া তিনি আবার ধ্যানগুহায় প্রবেশ করিতেন।

সেবকেরা বলেন যে তিনি প্রায় দুই বৎসর এইরূপ সপ্তাহে একবার করিয়া গুহার বাহিরে আসিতেন। তারপরে তিনি পক্ষান্তে একবার করিয়া বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সাধারণতঃ অমবস্যা ও পূর্ণিমায় বাহিরে আসিতেন। এরূপ ধ্যাননিবিষ্ট অবস্থায় দিন, ক্ষণ, কালাকালের কোন হিসাব থাকার যে কোনই সম্ভাবনা নাই, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সত্যসংকল্প মহাত্মাগণ যদি কোন সংকল্প করিয়া তারপর ধ্যানে বসিয়া যান, তবে সেই পূর্ব্ব সংকল্প অনুসারে আপনা আপনিই কাজ হইয়া থাকে। বাবাজীর গুফা প্রবেশের কালে বোধ হয় তদ্রূপ কোন সংকল্প থাকিত। তদনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি বাহির হইতে পারিতেন। হয়ত তাঁহার শরীররক্ষা ও যোগসাধনের জন্য এবং ভবিষ্যতে লোকানুগ্রহের নিমিত্ত যে কতক পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে, তজ্জন্য এরূপ সংকল্প রক্ষা করার প্রয়োজনও থাকিতে পারে। যাহা হউক, তৎকালে তাঁহার বাহিরে আসিবার নিয়মটী প্রায়ই ঠিক থাকিত।

কিছু কাল পক্ষব্যাপী গুফানিবাসের অভ্যাসের পর তিনি মাসব্যাপী গুফানিবাসের অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তখনও ব্যবস্থা একরূপই ছিল। আহার একপোয়া দুধ, বাহিরে আসিলে কিছু

ফলাদি গ্রহণ, মল-মূত্র ত্যাগের অভাব। নিদ্রা যে মোটেই ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। অবশেষে একবার তিনি তিন মাসের জন্য গুফায় প্রবেশ করেন। এই তিন মাস ব্যাপী নিয়ত ধ্যানের পর যখন তিনি গুফা হইতে বাহির হইলেন, তার পর আর নিয়মপূর্ব্বক গুফানিবাসী হন নাই। তখন হইতে আবার কখন বাহিরে থাকিতেন, কখনও গুফায় থাকিতেন। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে এ সময়ে তাঁহার ভিতর বাহির এক হইয়া গিয়াছিল।

গয়ায় সাধন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। তখনই তাঁহার জ্ঞানাগ্নিতে 'অহং' সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছিল, জগতের ব্রহ্মময়ত্ব তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু এই উপলব্ধিই সাধনের চরম অবস্থা নয়। এটা যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে স্বভাবে পরিণত না হয়, যে পর্য্যন্ত ধ্যানাবস্থা ও জাগ্রদবস্থায় কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে, যে পর্য্যন্ত সর্ব্বাবস্থায় সমাধিজ প্রজ্ঞা সমান পরিমাণে উজ্জ্বল না থাকে, সে পর্য্যন্তই তীব্র সাধনের প্রয়োজনীয়তা থাকে, শুধু তাই নয় তখনই সম্পূর্ণ বিক্ষেপ-বিহীন সমাধি অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। জ্ঞানলাভের পূর্ব্বের সাধন ও পরের সাধনের বিশেষ পার্থক্য এই যে পূর্ব্বের সাধনে জোর করিয়া বিষয় হইতে অন্তঃকরণকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মস্থ করিতে হয়, কিন্তু পরে আর প্রত্যাহারের দরকার হয় না, সংকল্পমাত্রই চিত্ত আপনা-আপনি বৃত্তিরহিত হইয়া যায় এবং সাধক আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। কিন্তু এই অবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বভাবে পরিণত করিতে হইলে, জাগ্রদবস্থাতেও দেহেন্দ্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যেও চিত্তকে সমাহিত রাখিতে হইলে, সর্ব্বাবস্থায় আত্মরতি, আত্মক্রীড় থাকিতে হইলে, অনেকদিন নিয়ত সমাধিস্থ থাকার অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। এই অভ্যাসটাই বাবাজী গয়ায় করিয়াছিলেন।

বারো তের বৎসর পূর্ব্বোক্ত প্রকার নিয়ত অভ্যাসের ফলে তিনি যোগসাধনের ও জ্ঞানসাধনের চরম অবস্থায় স্থিত হইলেন; তখন আর সংকল্পপূর্ব্বক সাধনের কোন প্রয়োজনীয়তা রহিল না, তখন তিনি 'ব্রহ্মভূতঃ প্রশান্তাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি' শাস্ত্রে জীবন্মুক্তের শ্রেষ্ঠত্বের যেরূপ বর্ণনা আছে, তদ্রূপ লক্ষণান্বিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। যথা—

> মৌনবাগ্নিরহঙ্কারো নির্মানো মুক্তমৎসরঃ।
> সর্ব্বত্র বিগতস্নেহো যঃ সাক্ষিবদবস্থিতঃ।
> নিরিচ্ছো বর্ত্ততে কার্য্যে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
> যেন ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ মনোমননমীহিতম্।
> সর্ব্বমন্তঃ পরিত্যক্তং স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥

ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ যখন বাহিরে আসিয়া লৌকিক ব্যবহার করেন, তখন তাঁহাদের সকলের ভাব এক রকম পরিলক্ষিত হয় না। বেদান্তশাস্ত্রানুসারে পূর্ব্ব প্রারব্ধ অনুসারে তাঁহাদের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ তাঁহাদের নূতন কোন ইচ্ছা বা দ্বেষ জন্মিতে পারে না, তাঁহারা 'নিরিচ্ছ' হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। প্রারব্ধ সকলের এক রকম নয়। তাই জীবন্মুক্তদের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবপ্রবণ হইয়া নৃত্যগীত করেন, কেহ শান্ত স্থির থাকিয়া আত্মানন্দ উপভোগ করেন, কাহারও মেজাজ একটু খিটখিটে হইতে দেখা যায়, কেহ কেহ সকলের প্রতিই মধুর ব্যবহার করেন, কাহারও ব্যবহারের মধ্যে মধ্যে কোন কোন রাজস বা তামস ভাবের কাজও লক্ষিত হয়, কাহারও ব্যবহার শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে ভিতরটা সকলেরই পরিষ্কার, সকলেই সর্ব্ববন্ধনপরিশূন্য, ব্যবহারে রাজস বা তামস ভাব থাকিলেও তাহা দ্বারা মুক্ত পুরুষ বদ্ধ হন না; তবুও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বজাত সংস্কার অনুসারে তাঁহাদের বৃত্তির পার্থক্য হয়। সকল বৃত্তি, সকল সংস্কার সম্যক্‌রূপে পরিশুদ্ধ হওয়ার পরে যে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। প্রারব্ধের মধ্যে অশুদ্ধ সংস্কার থাকিলেও তীব্রপুরুষকার-সহায়ে শ্রবণ, মনন, ধারণা, ধ্যান, সমাধি প্রভাবে সাধক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যতদিন চিত্ত তত্ত্বে সমাহিত থাকে, ততদিন প্রাক্তন সংস্কারগুলি বিলীন থাকে, তাহাদের কোন কাজ থাকে না। তারপর জ্ঞানে যখন শুভ অশুভ সব সমান হইয়া যায়, যখন—

> প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
> ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥

তখন মাঝে মাঝে শুভবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অশুভ বৃত্তিরও কাজ হইতে পারে, তাহাতে তাঁহাদের কিছুই আসে যায় না।* তথাপি যদি মহাপুরুষদের ভিতরেও পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হয়, তবে বলিতে হয় যে যিনি সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এবং যাঁহার বৃত্তিসকল সম্যক্‌রূপে সত্বগুণোপেত, তিনি প্রথম স্তরের মহাপুরুষ; এবং যাঁহাদের বৃত্তির মধ্যে রাজস বা তামস ভাব বর্ত্তমান তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেও তদপেক্ষা নিম্নস্তরের। এদিক দিয়া দেখিলে বাবা গম্ভীরনাথকে প্রথম স্তরের মহাপুরুষ বলিতে হয়। তিনি যেমন সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মে স্থিত থাকিতেন, তেমনি তাঁহার বৃত্তিও অত্যুৎকৃষ্ট ছিল। তিনি কখনও কাহাকেও কোনরূপ উদ্বেগ প্রদান করিতেন না, কেহ কোনরূপ অন্যায় করিলেও তিনি যেমনি স্থির তেমনি স্থিরভাবে থাকিতেন। কখনও বা সামান্য একটু চাহিয়া বা মাথা নাড়িয়া অন্যায়কারীর মনকে শান্ত করিয়া দিতেন।

বঙ্গে শরৎ।

(ললিত মিশ্র—খং)

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

হের শরৎ এল বঙ্গে—
এ-কি শোভা নীলাকাশে
ফুল হাসে,—স্নিগ্ধ শীতল
সমীর বহে অঙ্গে!
এ-কি শুভ্র রৌদ্র-রেখা
তৃণে আল্পনা আঁকে—
বকুল চামেলী শেফালিকা মিলি'
সাজায় ডালি কি রঙ্গে!
এ-কি পদ্ম-ঘেরা সরোবর
এ-কি কুমুদিনী মনোহর
এ কি কূল-ভরা জল নদী টলমল
ধায় মৃদু তরঙ্গে!
এ-কি লক্ষ পাখীর গীতি
তরু মর্ম্মর বায় নিতি
ঢেউ খেলে যায় সোণার ক্ষেতে
দুলায়ে মৃদুল ভঙ্গে!
এ-কি শুভ্র স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না
শশী তরল রৌপ্য ঢালে
এ-কি অগণন তারকা রতন
জ্বল জ্বল নভ-থালে!
গৃহে গৃহে বাজে বাঁশী
ওঠে আনন্দ-হাসি,—
এ-কি মধুরিমা লাবণ্যে
হের শরৎ এল বঙ্গে॥

লিঙ্গায়ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

বিভূতি পঞ্চপ্রকার। (১) বিভূতি, (২) ভসিত, (৩) ভস্ম, (৪) ক্ষার এবং (৫) রক্ষা। ভস্ম ধারণ করিলে ভূতি (ঐশ্বর্য্য, প্রাপ্ত হয় এইজন্য ইহাকে বিভূতি কহে। ইহা দ্বারা শিবরহস্য প্রকাশ পায় এইহেতু ইহাকে ভসিত কহে। ইহা দ্বারা পাতক ভস্ম হয় বলিয়া ইহার নাম ভস্ম। ইহার দ্বারা সঙ্কট নাশ প্রাপ্ত হয় এইজন্য ইহাকে ক্ষার বলে। এবং ইহা সর্ব্বভূত (গ্রহ পক্ষ্যাদি) হইতে রক্ষা করে এই কারণ ইহাকে রক্ষা কহে।

নন্দা, ভদ্রা, সুরভি, সুশীলা এবং সুমনা এই পাঁচ প্রকার গাভী শঙ্করের সদ্যোজাত প্রভৃতি পঞ্চ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা, সদ্যোজাত হইতে নন্দা, বামদেব হইতে ভদ্রা, অঘোর হইতে সুরভি, তৎপুরুষ হইতে সুশীলা এবং ঈশান হইতে সুমনা উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ণানুসারে নন্দার কপিলবর্ণ, ভদ্রার কৃষ্ণবর্ণ, সুরভির শুভ্রবর্ণ, সুশীলার ধূম্র বর্ণ এবং সুমনার লোহিত বর্ণ। নন্দা নামক গাভী হইতে উৎপন্ন ভস্মকে বিভূতি কহে। ভদ্রা হইতে উৎপন্ন ভসিত, সুরভি হইতে উৎপন্ন ভস্ম, সুশীলা হইতে উৎপন্ন ক্ষার এবং সুমনা হইতে উৎপন্ন ভস্ম রক্ষা নামে অভিহিত হয়।

নিত্য কর্ম্মে বিভূতি, নৈমিত্তিক কার্য্যে ভসিত, সাধারণ (সামান্য) কার্য্যে ক্ষার, প্রায়শ্চিত্তে ভস্ম, এবং মোক্ষপ্রাপ্তি সময়ে বা মৃত্যু সময়ে রক্ষা নামক ভস্ম ধারণ করা বিধেয়। নন্দাদি গাভীগণের যে বর্ণ তাহা হইতে উৎপন্ন ভস্মও সেই বর্ণের প্রস্তুত

---

* এই অংশে লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহার সহিত আমরা একমত নহি এবং তাহার সমর্থক কোন শাস্ত্রপ্রমাণও পাই নাই। তঃ সং।

হয়। যথা,—বিভূতি কপিল বর্ণ, ভসি কৃষ্ণবর্ণ, ভস্ম শুভ্রবর্ণ, ক্ষার ধূসর বর্ণ এবং রক্ষা লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট।

আগম শাস্ত্রে ভস্মের উৎপত্তি চারি প্রকার কথিত আছে। (১) কল্প, (২) অনুকল্প, (৩) উপকল্প এবং (৪) অকল্প। এই চারি জাতির মধ্যে কল্প জাতির ভস্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়।

ভস্ম প্রস্তুত কারণ গোময় সংগ্রহ করিবার নিয়ম শাস্ত্রে যেরূপ কথিত আছে সেই রীতি অনুসারে সদ্যোজাত গোময় একত্র করিবে। সেই গোময়কে সদ্যোজাত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভূমিতে পড়িবার পূর্ব্বে কোন পাত্রে ধারণ করিবে এবং বামদেব মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই গোময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলিকাতে পরিণত করিবে, তৎপুরুষ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই সকল গোলিকাকে শুষ্ক করিতে দিবে, এবং অঘোর মন্ত্র দ্বারা সেই গোলিকা সংস্কৃত করিয়া অগ্নি.ত জ্বালাইয়া ভস্ম করিবে। তৎপরে ঈশান মন্ত্র পাঠ সহিত সেই ভস্ম:কে বিল্ব-পত্রের মধ্যে স্থাপন করিবে। এই প্রকার ভস্ম কল্প নামে অভিহিত হয়। বন হইতে আনীত শুষ্ক গোময় চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে ভস্ম করিলে তাহা অনুকল্প নাম প্রাপ্ত হয়। বাজার হইতে আনীত ভস্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তাহা গো-মূত্রে ভিজাইয়া গোলিকা শুষ্ক করতঃ পূর্ব্বোক্ত বিধিমত প্রস্তুত ভস্ম উপকল্প নাম প্রাপ্ত হয়। যে ভস্ম অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করা হয় এবং যাহা কোন রীতি অনুসারে প্রস্তুত হইয়াছে জানি-বার উপায় নাই সেই ভস্ম অকল্পক নাম প্রাপ্ত হয়।

বীর শৈবগণ উপরি উক্ত চারি প্রকার ভস্মের মধ্যে কোন প্রকার ভস্ম সাধ্যমত তিনবার কিম্বা একবার অঙ্গে লেপন করিবে। ইহাকে ভস্মস্থান কহে। অতঃপর ভস্ম-ধারণ নিয়মাদি বর্ণিত আছে। ইতি ভস্ম ধারণস্থল।

ইহার পর রুদ্রাক্ষধারণ স্থল। এই পরিচ্ছেদে রুদ্রাক্ষধারণের নিয়ম এবং কারণাদি বর্ণিত আছে।

"নমঃ শিবায়" এই পঞ্চ অক্ষরসম্পন্ন মন্ত্রটির নাম "পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র"। পঞ্চ মহামূর্ত্তি (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম), পঞ্চ মাতৃকা, (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ), পঞ্চ জ্ঞানে-ন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (ত্বক, হস্ত, পদ, মূত্র ও শৌচকরণে-ন্দ্রিয়), পঞ্চ ব্রহ্ম (আচার লিঙ্গ, প্রসাদলিঙ্গ, চর-লিঙ্গ, শিবলিঙ্গ এবং মহালিঙ্গ) এবং পঞ্চকৃত্য (ভব, মৃড় ও হর কারণসহ বর্ত্তমান সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয়, —আবির্ভাব ও তিরোধান), পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রের পাঁচটি অক্ষর স্বরূপ।

পঞ্চশক্তি (পরশক্তি, আদিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি), পঞ্চ অঙ্গুলি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (ভাষণ, গ্রহণ, প্রদান, করণ, ও চালন), পঞ্চকৃত্য (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি এবং পুরুষ)। এই সকল পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রের ক্রিয়া স্বরূপ। এই পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রের পূর্ব্বে ওঁকার উচ্চারণ করিবে। শিবাগমশাস্ত্র এবং বেদান্ত এই মন্ত্রকে পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র বলিয়া অভিহিত করি-য়াছে। কেবলমাত্র ওঁকার হইতে একমাত্র অক্ষর পরানন্দ (শিবং পরাৎপরং সূক্ষ্মং নিত্যং সর্ব্বগমব্যয়ম ইতি শিবাগমোক্তেঃ) অদ্বিতীয় (একমেবাদ্বিতীয়ম ইতি শ্রুতেঃ) নিষ্প্রপঞ্চক পর-ব্রহ্মের স্বরূপ স্পষ্ট জানা যায়। ইহার পর এই পরিচ্ছেদে পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রের সাধনপ্রণালী এবং তাহার গুণ বর্ণিত হইয়াছে।—ইতি পঞ্চাক্ষরী জপস্থল।

অধম কিম্বা উত্তম মনুষ্যের হৃদয়ে অধিক শিবভক্তি উৎপন্ন হইলে তাহাকে শিবভক্ত কহে। যাহার হৃদয়ে শিবভক্তি আছে, সে ব্রাহ্মণ অথবা নীচজাতীয় হইলেও শঙ্করের (ব্রহ্মের) প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণও যদি শিবভক্তিশূন্য হয় তাহা হইলে সে শিবের প্রিয় হইতে পারে না।

এই শিবভক্তি দুই প্রকার; (১) বাহ্য এবং (২) আভ্যন্তর। বাহ্য ভক্তিকে স্থূলভক্তি এবং আভ্যন্তর ভক্তিকে সূক্ষ্মভক্তি কহে। পবিত্র স্থানে সুশোভিত রত্নসিংহাসনোপরি শিবলিঙ্গের পূজা করিলে তাহাতে বাহ্যভক্তি প্রকাশ পায়। শিব-লিঙ্গের উপর প্রাণস্থাপন এবং প্রাণের উপর শিবলিঙ্গস্থাপনপূর্ব্বক স্বস্থমনে যে শিবপূজা করা হয় শিবযোগীগণ তাহাতে আভ্যন্তর ভক্তি প্রকাশিত হয় বলিয়া থাকেন।

শিবসেবা তিন প্রকার। শিবস্বরূপকে মনোমধ্যে

চিন্তা করাকে মানসী সেবা কহে। সর্ব্বদা শিবনাম জপ করাকে বচনসেবা এবং আপন শরীরের কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া পত্র, পুষ্প ও বিল্ব জল, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিলে তাহাকে কায়িক সেবা বলে।

সেবার বাহ্য, আভ্যন্তর এবং বাহ্যাভ্যন্তর এই তিন ভেদ আছে। ইহাদের পুনরায় মন, বচন এবং শরীরসম্বন্ধীয় তিন ভেদ আছে। যে মন মহেশ্বরধ্যানাট্য, অন্য নাম জ্ঞান করিতে অক্ষম তাহাকেই মন কহিবে। যে বচন সর্ব্বদা শিবনাম উচ্চারণ করে অন্য নাম উচ্চারণ করিতে যাহার ত্রাস জন্মে তাহাকেই বচন বলিবে। যে দেহে শিবপূজার ক্রিয়াদির চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে তাহাকেই দেহ বা শরীর বলিবে।

পণ্ডিতগণ এই শিবপূজাকে পুনরায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন—তপ, কর্ম্ম, জপ, ধ্যান ও জ্ঞান। প্রকৃত শিবসাধনায় শরীর ক্লিষ্ট হইলে তাহা তপ নামে অভিহিত হয়; কিন্তু কৃচ্ছ্র সাধন, চন্দ্রায়ন প্রভৃতির জন্য শরীর শোষিত হইলে তাহাকে তপ বলে না। প্রকৃত শিবপূজাকে কর্ম্ম বলে, কিন্তু যাগাদি বাহ্য কর্ম্ম কর্ম্ম নহে। শিবপঞ্চাক্ষরী মন্ত্রের অভ্যাস করাকে জপ কহে, কিন্তু বেদ অধ্যয়ন করাকেও জপ বলে না। শিব-(ব্রহ্ম) রূপ চিন্তন করাকে ধ্যান কহে, অপর কোন দেবের কিম্বা বেদার্থের চিন্তাকে ধ্যান বলে না। শিবাগমের অর্থ অবগত হওয়াকে জ্ঞান বলে, অপর গ্রন্থের অর্থ জানাকে জ্ঞান বলে না। শিবপূজার এই পাঁচ প্রকার ভেদ (তপ, কর্ম্ম, জপ, ধ্যান এবং জ্ঞান, শিবযজ্ঞ নামে কথিত হয়। যে এই পাঁচ প্রকার যজ্ঞের সাহায্যে শিবপূজা করে সে-ই ভক্ত নামে অভিহিত হয়।

দৃঢ়নিশ্চয় শিবভক্ত শিব ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা করিবে না, অন্য দেবতাকে স্মরণ করিবে না, অন্য দেবতার কীর্ত্তন করিবে না এবং অন্য দেবতার নৈবেদ্যও ভক্ষণ করিবে না। ইহার পর শিবভক্তগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।—ইতি ভক্তমার্গ ক্রিয়াস্থল।

যে গুরু এই ভয়ঙ্কর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার তরণীস্বরূপ শিবজ্ঞান শিক্ষা দেন তাঁহাকে কে না মান্য করিবে? যে গুরুর সামান্যমাত্র কৃপা হইলে পরমানন্দরূপ শিবতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় তাঁহাকে কে না মান্য করিবে? গুরু (আচার্য্য) শিবজ্ঞানের মহাসমুদ্র; তিনি রাগদ্বেষশূন্য, তাঁহার যাহাতে মনস্তুষ্টি হয় সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাহা করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও গুরুর আজ্ঞা অবহেলা করে না। ইতি উভয়স্থল।

বাহ্য লিঙ্গ দুই প্রকার; জঙ্গম ও অজঙ্গম (স্থাবর)। স্থাবর লিঙ্গকে যেরূপ ভক্তি করিবে জঙ্গমকেও সেই প্রকার ভক্তি করিবে। মৃত্তিকা অথবা প্রস্তর হইতে প্রস্তুত লিঙ্গ স্থাবরলিঙ্গ। সেই স্থাবর লিঙ্গ হইতে জঙ্গমলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্য তাহাকে শিবযোগী কহে। মন্ত্রসংস্কারজনিত স্থাবরলিঙ্গে শিবশক্তি বর্ত্তমান কিন্তু জঙ্গমমধ্যে শিব সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন। শিবযোগীকে দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। শিবযোগীকে কখনও অপমান করিবে না। শিবযোগীকে সাক্ষাৎ শঙ্করস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবা করিবে। যেমন লিঙ্গের পূজা কর, যেমন গুরুর পূজা কর, সেইরূপ শিবযোগীর পূজা করিবে।—ইতি ত্রিবিধ সম্পত্তিস্থল।

দান তিন প্রকার; (১) সোপাধি, (২) নিরুপাধি এবং (৩) সহজ। ফলাভিসন্ধিসংযুক্ত যে দান তাহাকে সোপাধি দান কহে। এই দান মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের উপযোগী নহে। যে দান হইতে নিজের কোন ফল লাভ হইবে না, কেবল ঈশ্বরে অর্পণ হইল এইরূপ ইচ্ছা যাহার মূলে, তাহাকে নিরুপাধি দান কহে। এই দান তত্ত্বস্বরূপ বলিয়া জানিবে। পরিগ্রহীতা, প্রদাতা এবং দেয়কে শিবস্বরূপ (ভো ক্তৃ, ভোজ্যং, প্রেরিতারং চ জ্ঞাত্বা সর্ব্বৈঃ প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মৈতমিতি। চিন্তন করিয়া যে দান করা হয় তাহাকে সহজ দান কহে। এই দানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।—ইতি দানত্রয়স্থল।

বরষায়।

সিতারখানি মল্লার—তেতালা।

(পরিবর্দ্ধিত আকারে গৃহীত)

রিম ঝিম বারিধারা বরষে,
আজি মন উঠে নাচিয়া হরষে।
বহিছে পূরব বায় ঝর ঝর ঝরে জল;
আনন্দে শিহরে কায়, প্রাণমন ঢল ঢল;
ময়ূর ভোর ময়ূরী লাগি—মেঘদল চারিদিশি গরজেরে।
আজি বাঁধিছে দোঁহায় দোঁহে গগন ধরণী স্নেহে;—
শ্যামল পুলক দেহে প্রেমের মধুর পরশে।
বলাকার সারি যায় হেসে খল খল খল;
ঝিঁঝিঁ শত গীত গায়; মকমকে ভেকদল।
কৃষাণবধূ আশীষ দেছে—শান্তিজল শতধারে বরষেরে॥

কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

II { রগমা -পধপা মগা গরা I সন্‌া রা ন্‌রসা -সা I গরা গা মাঃ -গঃ I
রি ০ ০ ০ ০ ম্‌ ঝিম্‌ বা০ রি০ ধা রা০০ ০ ব০ র ষে ০

I (-পা -া -রা -া) } I -গা -রা রা রা I রমা মপা পা পা I পা পা পধপা -পা I
০ ০ আ জি ম০ ন০ উ ঠে না চি য়া০০ ০

I গা মা মা -া I -গমা -পধা -মপা -রা I রমা মপা পা পা I পা পা পপধা -নর্সর্রা I
হ র ষে ০ ০০ ০০ ০০ ০ ম০ ন০ উ ঠে না চি য়া০০ ০০০

I র্সা র্সা র্সা -ধা I -পা -া পগা -মরা II
হ র ষে ০ ০ ০ ০০ ০০

[না না ধপা পা ধা ধা না -া]
II { পা পা পা পা I না ধা না -া I র্সা র্সা র্সা র্সা I র্সনা র্রা র্সা সা I
ব হি ছে পূ র ব বা য় ঝ র ঝ র ঝ০ রে জ ল

I ধা না ধা না I র্সা র্সা র্রা -া I র্সনা র্সা র্সা র্সনা I ধা পধা পমা পা I
আ ন ন্দে শি হ রে কা য় প্রা০ ণ ম ন০ ঢ ল০ ঢ০ ল

I পা পধনা -র্সরা র্সা I র্সা -া -া -া I র্সা মা মা মা I গমা -পধা -মপা গমা I
ম য়ূ০০ ০০ র ভো ০ ০ ০ র ম য়ূ রী লা০ ০০ ০০ গি০

I পা না র্সা র্রা I না র্সা গা মা I পা ধা পা -ধপা I -ধপধা পগা -পমা গরা II
মে ঘ দ ল চা রি দি শি গ র জে ০০ ০০০ রে০ ০০

০ ১ ২´ ৩
রা রা II { রমা মা মা মা | পা -া পা -মা I -পা পা -া -া | মা গা পা ধা |
আ জি বাঁ॰ ধি ছে দোঁ হা য় দোঁ ॰ ॰ হে ॰ ॰ গ গ ন ধ

০ ১ ২´ ৩
| র্সা র্সা ধা -পপা | মগা -মরা -া -া I মা মা রা মা | রা রা রা -া |
র ণী রে ॰॰ হে॰ ॰॰ ॰ ॰ শ্যা ম ল পু ল ক দে ॰

০ ১ ২´ ৩
| সা -া -া -া | রা মা মা মা | পা পা ধা পা | মপা -ধপা -মপা -া } I
হে ॰ ॰ ॰ প্রে মে র ম ধু র প র শে॰ ॰॰ ॰॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
[না না ধপা পা ধা ধা না -া]
]I { পা পা পা -পা | না ধা না -া I র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সনা র্রা র্সা র্সা |
ব না কা র মা রি যা য় হে সে থ ল থ॰ ল খ ল

০ ১ ২´ ৩
| ধা না ধা না | র্সা র্সা র্রা -া I র্সনা না না র্সা | ধা পধা পমা পা } |
ঝি ঝিঁ শ ত গী ত গা য় মে॰ ক ম কে ভে ক॰ দ॰ ল

০ ১ ২´ ৩
| পা পধনা -র্সরা র্সা | র্সা -া -া র্সা I -া মা মা মা | গমা -পধা মপা মগমা |
কু যা॰॰ ॰॰ ণ ব ॰ ॰ ধূ ॰ আ নী র দে॰ ॰॰॰ ॰॰ ছে॰

০ ১ ২´ ৩
| পা না র্সা র্রা | না র্সা গা মা I পা ধা প -ধা | ধপধা পগা -পমা গরা II
শা ন্তি জ ল শ ত ধা রে ব র ষে ॰॰ ॰॰॰ রে॰ ॰॰ ॰॰

—॰—

ধর্ম্মসংঘ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত টিম্পুল ডেবিস মহোদয়ের প্রস্তাব।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বিগত বিশ্বব্যাপী মহাসমরের ফলে অনেক বিষয়ে আমাদের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। আমরা সকল বিষয়ের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিবার অবকাশ পাইয়াছি। নানা জাতির সংঘর্ষে পড়িয়া আমাদের চিরানুগত বদ্ধ ধারণা শিথিল হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা বিশ্বের দিকে তাকাইবার সুযোগ পাইয়াছি। আমরা সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি, যে দিন সমগ্র মানবমণ্ডলী একই ধর্ম্মের বন্ধনে একই ভ্রাতৃভাবে পরস্পর আবদ্ধ হইবে। আমরা আশা করিতে পারি যে সে দিন নিতান্ত দূরে নহে। আমরা বলিতে চাই জাতিসংঙ্ঘ গঠিত হইবার জন্য যে প্রস্তাব চলিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি ধর্ম্মসংঙ্ঘও বিগঠিত হউক। ধর্ম্মসংঙ্ঘ বিগঠিত হইলে জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য অচিরে সার্থকতা লাভ করিবে। ইংলণ্ডের একেশ্বরবাদীগণের উপাসনামন্দিরের টিম্পুল ডেভিস মহাশয়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ যে তিনি জেরোস্তার ধর্ম্মাবলম্বী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বাহা-ধর্ম্মাবলম্বিগণ সকলকে লইয়া একটি ধর্ম্মসংঙ্ঘ স্থাপন করিতে চান। প্রত্যেক ধর্ম্মের ভিতরে এমন অনেক রত্ন রহিয়াছে, যাহা পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া না দাঁড়াইলে ধর্ম্ম আপনার দিব্য জ্যোতিতে ভাস্বর হইয়া উঠিতে পারে না। জোরোয়াষ্টার ধর্ম্মের সাত্ত্বিকতা,

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নিষ্ঠা, বৌদ্ধধর্ম্মের মৈত্রী, এস্‌রাইল-ধর্ম্মের পবিত্রতা, কনফিউসস ধর্ম্মের সাধন, মুসলমানী ধর্ম্মের বশ্যতা, শিখধর্ম্মের নির্ভীকতা, খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের ধর্ম্মশীলতা এবং বাহাধর্ম্মের মিলনস্পৃহা, যাহা ঐ ঐ ধর্ম্মের অপূর্ব্বতম অলঙ্কার ও বিশেষত্ব তাহা একটি ধর্ম্মের ভিতরে সমষ্টিগতভাবে থাকা চাই।

সকল ধর্ম্ম মূলে এক। সকল ধর্ম্মই ভগবানের জ্ঞান শক্তি ও করুণা স্বীকার করে। উহাই প্রতি ধর্ম্মের প্রাণ। তাঁহার শক্তি হইতেই মনুষ্যের উৎপত্তি —মুসলমান ধর্ম্ম ও কন্‌ফিউসিয়স ধর্ম্ম ইহাই বলে। তাঁহারই সাদৃশ্যে মানবগণ বিগঠিত, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম এই কথাই ঘোষণা করে। মানবের জীবন ধর্ম্মের নিয়মে পরিচালিত। কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি; কার্য্যকারণের মধ্যে একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে। বৃক্ষ রোপণ করিলেই তাহা হইতে ফললাভ অবশ্যম্ভাবী। আমাদিগকে কর্ম্ম সাধন করিয়া যাইতে হইবে। ভগবানের রাজ্যে দণ্ড ও পুরস্কার উভয়েরই বিধান আছে। স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে কাহিনী রূপকভাবে মনুষ্যকে সত্যপথে চলিতে ইঙ্গিত করে। ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা যে যোগসূত্রে আবদ্ধ, তাহাই মানবমণ্ডলীর প্রতি আমাদিগকে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে আদেশ করে। জাতিসংঘই বল, আর ধর্ম্মসংঘই বল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব স্বীকার ও কর্ত্তব্যসাধন এইগুলি উভয়েরই ভিত্তিভূমি। ইহকাল ও পরকালের মিলনই প্রকৃত মিলন। ইহ ও পরলোক-বাসীর একত্ববোধেই অখণ্ড-পরিবার গঠন; ঈশ্বরকে ধরিয়াই আমাদের প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ। এবং ইহাই প্রস্তাবিত ধর্ম্মসংঘের মূলমন্ত্র।

পরহিতব্রত

পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিদ্যালয়ে অপূর্ব্ব সম্মান লাভ করিয়া উচ্চ-শিক্ষিত প্রসন্নকুমার এইবার কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি লবণসংক্রান্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক মিষ্টার প্লাউডেনের অধীনে ৮০৲ বেতনে অন্যতম সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে উক্ত পদ বিলুপ্ত হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রাজা সীতানাথ সর্ব্বাধিকারী তৎকালে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং প্রসন্নকুমারকে নবাব বাহাদুরের অধীনে কোন কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। উহাতে তাঁহার যথেষ্ট আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার স্বগ্রামনিবাসী সদর দেওয়ানী আদালতের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল রমাপ্রসাদ রায় এই সময়ে তাঁহাকে ওকালতী করিতে পরামর্শ দেন। রমাপ্রসাদের ন্যায় পৃষ্ঠপোষকের সাহায্যে উচ্চশিক্ষিত প্রসন্নকুমার যে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের দিকেই—বিদ্যাচর্চ্চার দিকেই প্রসন্নকুমারের আকর্ষণ বেশী ছিল। তিনি প্রথমে ঢাকা স্কুলে অস্থায়ীভাবে এবং পরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি দিবসে হিন্দুকলেজের স্কুলবিভাগে ৪০৲ মাসিক বেতনে একজন সামান্য শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর দিবসে শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি ও ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু পরলোকগত জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মেডিক্যাল কলেজের এবং শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক ডাক্তার এফ্ জে মৌয়েট্ মহোদয় এতদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের সহযোগিতায় 'বেথুন সোসাইটী' নামক এক সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার জন্য এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনবিষয়ক সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণে এই সভার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু বহুকাল এই সভা আমাদের মানসিক উন্নতির জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছিল তাহা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। যখন ডাক্তার মৌয়েট, ডাক্তার ডফ, কর্ণেল ম্যালিসন, কর্ণেল গুডউইন, ডাক্তার রোয়ার, ডাক্তার চেভার্স, রেভারেণ্ড ডল্ প্রভৃতি

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং গুডিব চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, কৈলাসচন্দ্র বসু, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, কিশোরী চাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, নবীনকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর বাগ্মিতায় বেথুনসভার গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত, তখন বেথুন সভার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! তখন গভর্ণর জেনারেল, লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা বিনা নিমন্ত্রণে এই সভায় বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

পুণ্যশ্লোক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন হিন্দুকলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং হিন্দুকলেজের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া প্রসন্নকুমারকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন। প্রসন্নকুমারও বেথুনকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। বেথুনের পরলোকগমনের পর তদীয় স্মৃতিরক্ষাকল্পে স্থাপিত 'বেথুন সভা'র প্রতিও প্রসন্নকুমারের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তিনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১১ই নভেম্বর দিবসে এই সভায় On the relative and absolute advantages of science & literature in a Collegiate Education" শীর্ষক একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি তৎকালে সুধীমণ্ডলী-কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে উহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগকে একবার বলিয়াছিলেন যে যখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেন তখন তাঁহাদের ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ই, বি, কাউয়েল মহোদয় একদিন প্রসন্নকুমারের এই প্রবন্ধটির অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলেন "you should study it as a model of English Composition." স্যর গুরুদাস বলেন যে উক্ত প্রবন্ধটি তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে বারম্বার পড়িয়া উহার কোন কোন অংশ মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্যর গুরুদাসের স্বর্গারোহণের এক বৎসর পূর্ব্বেও তিনি আমাদিগের নিকটে প্রসন্নকুমারের এই সন্দর্ভের অংশবিশেষ আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত প্রসন্নকুমারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সূচিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রসন্নকুমার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রসন্নকুমারের নিকট ইংরাজী ভাষায় লিখিত সাহিত্য ও দর্শনবিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন। গভর্ণমেণ্টের ইংরাজী রিপোর্ট প্রভৃতি লিখিতেও প্রসন্নকুমার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্য করিতেন।

পূর্ব্বোক্ত বেথুন সভায় পঠিত হইবার জন্য এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক যে প্রস্তাব রচনা করেন, প্রসন্নকুমারই তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া উক্ত সভায় পাঠ করিয়াছিলেন।

সেকালে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ কেহই রীতিমত ইংরাজী শিক্ষা করিতেন না। সংস্কৃত কলেজে দুইজন ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন বটে কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা বাধ্যকরী ছিল না বলিয়া ছাত্রগণ কখনও ইংরাজী শ্রেণীতে প্রবেশ করিত, কখনও বা ইচ্ছামত উহা পরিত্যাগ করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে নিয়মিতভাবে ইংরাজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। প্রসন্নকুমারে সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে সংস্কৃত কলেজে উচ্চতর প্রণালীতে ইংরাজী শিখাইতে হইবে। প্রথমে প্রসন্নকুমার হিন্দুকলেজে অধ্যাপনার পর সংস্কৃত কলেজের উচ্চ শ্রেণীর কতিপয় ছাত্রকে গোপনে ইংরাজী শিখাইতেন। পরে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের চেষ্টায় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর প্রসন্নকুমার ৭০৲ মাসিক বেতনে সংস্কৃত কলেজের অন্যতম ইংরাজী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় গভর্ণমেণ্টের নিকট সংস্কৃত কলেজের উন্নতিকল্পে কতকগুলি প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয় গভর্ণমেণ্টকে সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী বিভাগসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"যে পদ্ধতি অনুসারে এই বিভাগটী অধুনা গঠিত, তাহা অতীব অসন্তোষকর। এ বিভাগে কি শিক্ষা করিতে হইবে তাহা ছাত্রের ইচ্ছাধীন। যখন ইচ্ছা, সে তাহার পাঠ আরম্ভ করে ও ইচ্ছানুসারে তাহা পরিত্যাগ করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পরেই ব্যাকরণ-শ্রেণীতে পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু একেবারে দুইটী নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে তাহাদিগকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই অধিকাংশ ছাত্রই হয় ইংরেজী কিংবা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করে। প্রায়ই পরীক্ষার পূর্ব্বে অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজী বিভাগ হইতে পলাইয়া আইসে। সেই ছাত্রেরাই আবার পর বৎসরের আরম্ভে ভর্ত্তি হইতে আইসে। অন্য একটী কারণে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়।

"একটী ইংরেজী বিভাগের শ্রেণীতে অনেক সংস্কৃত বিভাগের শ্রেণীর ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণের বিষয় দেখা যাউক। তৃতীয় শ্রেণীতে ত্রয়োদশটী ছাত্র পাঠ করে। তন্মধ্যে চারিটী স্মৃতিশ্রেণীর ছাত্র, একটী ন্যায়শ্রেণীর, একটী অলঙ্কারশ্রেণীর, একটী তৃতীয় ব্যাকরণ শ্রেণীর ও অবশিষ্ট চারিটী চতুর্থ ব্যাকরণশ্রেণীর ছাত্র। চতুর্থ শ্রেণীতে ৩৩টী বালক অধ্যয়ন করে। তন্মধ্যে ২টী অলঙ্কারশ্রেণীর, ৫টী সাহিত্যশ্রেণীর, ২টী প্রথম ব্যাকরণশ্রেণীর, ৬টী দ্বিতীয়, ১০টী তৃতীয়, ৬টী চতুর্থ এবং ২টী পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্র।

"বিভিন্ন সংস্কৃতশ্রেণী হইতে ছাত্রেরা ইংরেজী বিভাগে পাঠ করিতে আইসে। ইহাতে এই কু-ফল উৎপন্ন হয় যে, ছাত্রগণ উক্ত সংস্কৃতশ্রেণীতে নিয়মমত উপস্থিত হইতে পারে না, বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং সংস্কৃতশ্রেণীর অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই ইংরেজী বিভাগে অধ্যয়ন করে।

"এই ছাত্রগন বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা বিশেষরূপে উভয়বিধ শিক্ষায় একসময়ে মনোযোগ দিতে অক্ষম। সুতরাং শিক্ষাবিষয়ে তাহাদিগের তাদৃশ উন্নতি দৃষ্ট হয় না।

"যদ্যপি ইংরেজী বিভাগ বর্ত্তমান নিয়মে পরিচালিত হয়, তবে ইহার ফল যে নিতান্তই অসন্তোষজনক হইবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ইংরেজী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি ঈদৃশ নিয়মে পরিচালিত হওয়াতেই উহা নিতান্ত মন্দ ফল উৎপন্ন করে ও অবশেষে সাধারণ শিক্ষার জেনারেল কমিটির আদেশে একেবারে উঠিয়া যায়। যদি অপেক্ষাকৃত সুবন্দোবস্ত না করা হয়, তবে পূর্ব্বের ন্যায় ইহা হইতে মন্দ ফল ফলিবে। তজ্জন্য আমি যে কয়েকটি বন্দোবস্তের অবতারণা করিতেছি, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে নিশ্চয়ই সুফল উৎপন্ন হইবে। আমার মন্তব্যগুলি এই,—

"ছাত্রেরা সংস্কৃত ভাষায় কিছু পারদর্শিতা না দেখাইতে পারিলে তাহাদিগকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিতে দেওয়া উচিত নয়। সংস্কৃতশ্রেণীর ছাত্রেরা সেই সঙ্গে তাহাদিগের নিজের শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করিবে। ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছাধীন না হইয়া অন্যান্য পাঠের ন্যায় অবশ্যপাঠ্য হইবে। কোন ছাত্র যদি ইংরেজী শিক্ষা করিতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রদর্শন করে, তবে তাহার পক্ষে এই নিয়ম বলবান হইবে যে, পরে কোন সময়েই সে সংস্কৃতভাষাশিক্ষাকালীন ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করিতে পারিবে না। তাহার জন্য অন্য একটী ইংরেজী শিক্ষার শ্রেণী সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব। সংস্কৃত শিক্ষার প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে সাহিত্যশ্রেণীর ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। আমি তজ্জন্য প্রস্তাব করিতেছি যে, অলঙ্কারশ্রেণীতেই ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ হউক। তাহা হইলে ছাত্রগণ ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে অন্যূন দ্বিগুণ সময় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহাদিগের চিত্ত এক্ষণে সুমার্জ্জিত হওয়াতে তাহাদিগকে সামান্য বিষয় হইতে আরম্ভ করিতে হইবে না। অলঙ্কারশ্রেণী হইতে কলেজের শেষ শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিতে যাইলে ৭৮ বৎসর লাগে। সুতরাং উক্ত সময়ের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ও শ্রমশীল ছাত্র অনায়াসেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে" *

* রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর'।

এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় দুই জন ইংরাজী ভাষার অধ্যাপকের (professor) পদের সৃষ্টি হইল। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নবেম্বর দিবসে) ১০০৲ মাসিক বেতনে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

এই সময়ে শুভঙ্করী ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায় ছাত্রগণের পাঠোপযোগী কোনও অঙ্কপুস্তক ছিল না। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত লীলাবতী ও বীজগণিত পঠিত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময়ে উপায়ান্তর না দেখিয়া সংস্কৃতকলেজে ইংরাজী পাটীগণিত পাঠের ব্যবস্থা করেন। মফস্বলে এই সময়ে কতকগুলি বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী কোন বাঙ্গালা পাটীগণিত না থাকায় প্রসন্নকুমার বাঙ্গালাভাষায় পাটীগণিত প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। ১২৬২ সালে ২১ শে চৈত্র (১৮৫৫ খৃঃ অব্দে) প্রসন্নকুমারের পাটীগণিত প্রকাশিত হয়। ইহার পরে তাঁহার বীজগণিত (Algebra) ও ক্ষেত্রব্যবহার (Mensuration) রচিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় গণিত বিষয়ক এই প্রথম গ্রন্থগুলি প্রসন্নকুমারের গভীর পাণ্ডিত্য, প্রবল মাতৃভাষানুরাগ ও শিক্ষাবিস্তারে অসীম আগ্রহের পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ আজ কাল মাতৃভাষাই যে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহার ষাট বৎসর পূর্ব্বে প্রসন্নকুমার কার্য্যতঃ এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন করা যে কতদূর দুঃসাধ্য তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্যপরিষদ বহুবৎসর কাল এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই। এই অটল বাধাই মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার প্রধান অন্তরায়। প্রসন্নকুমার গণিত শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলি উদ্ভাবিত করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি তাঁহার একটি প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ, যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় গণিতপুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই পারিভাষিক শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া প্রসন্নকুমারের নিকট ঋণী হইয়াছেন। প্রসন্নকুমারের জীবন ও কার্য্যের আলোচনা করিলে মনে হয় যদি যথার্থই আমাদের সাহিত্যরথিগণের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ থাকে এবং যথার্থই তাঁহারা মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির শিক্ষা প্রচারিত করিবার জন্য আগ্রহশীল হন, তাহা হইলে পরিভাষা নাই বলিয়া কালাতিপাত না করিয়া অধ্যবসায় সহকারে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করিতে পারেন।

যদিও প্রসন্নকুমার কখনও সাহিত্যক্ষেত্রে যশোলাভের চেষ্টা করেন নাই এবং তাঁহার সমস্ত শক্তি নীরবে জনহিতসাধনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তথাপি বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য পরোক্ষভাবে তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। প্রসন্নকুমার তাঁহার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণকে ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য প্রায়ই প্রোৎসাহিত করিতেন। তাঁহারই প্ররোচনায় তাঁহার তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান ছাত্র সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় জনসনের রাসেলাস্ ও বাণভট্টের কাদম্বরী বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার ঐ অনুবাদ আদ্যন্ত সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। বাস্তবিক প্রসন্নকুমার চিরদিন বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবকগণকে নানাপ্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। প্রসন্নকুমারের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন প্রসন্নকুমারের আবাসে অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রায়ই আসিতেন, "সেই ভাঙ্গা মোটা গলায় মাইকেলের স্বরচিত গ্রন্থের স্মৃতিপথে চিরস্থায়ী পাঠ এখনও মনে আছে। তাহা কখনও ভুলিবার নয়।" তিনি আরও বলেন :—

"ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাটীতে তখন এবং পরে কবি ও সাহিত্যিকের মেলা বসিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতালের প্রথম অংশ ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের টেলিমেকস ও নীতিবোধ সেই

বাটীতেই রচিত হয়। আমাদের স্বগ্রামবাসী এবং চাকরীর উমেদার পিতৃপিতামহপূজিত পাচকপ্রবর 'মধুসূদন' ডালে কাটি দিতে দিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটি জুতার শব্দ পাইলেই "উর্জ্জয়িনী নগরে" "উর্জ্জয়িনী নগরে" চীৎকার শব্দে বেতালের পাঠাভ্যাস পরিচয় প্রদান করিতেন। মধুদাদা শিক্ষাবিভাগ উজ্জ্বল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন এবং পিতার ও জ্যেষ্ঠতাতের পরমবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয় সে বিভাগের কর্ত্তা। অনেক বিভাগের চাকরী এই প্রণালীতেই জোটে; কিন্তু মধুদাদা চিরদিনই পাচকব্রতে ব্রতী থাকিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করেন। হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল ও বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সকল কবির গ্রন্থেরই প্রথম পাঠ আমাদের সেই দীনভবনে সম্পন্ন হইলে তবে পাণ্ডুলিপি মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা হইত। পিতৃদেবের সাহিত্যচর্চ্চার অবকাশ অল্পই ছিল; রোগীর গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমনের সময় গাড়ীতে পড়িয়া তাঁহার ব্যাকরণ, কাব্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ অধিকার জন্মিয়াছিল, কলেজে বা টোলে পড়িয়া অনেকের তাহা হয় না। "গাড়ীই" পিতৃদেবের ঠিকানা—তদানীন্তন রসিক বন্ধুগণের মতে সিদ্ধান্ত ও প্রচারিত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে আহারের সময়েও সাহিত্যচর্চ্চা চলিত। মধ্যাহ্নভোজনের সময় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সুবিপুল গৌরকান্তি দেহ ভূমিতলসংলগ্ন করিয়া বঙ্গসুন্দরীকে যখন আসরে নামাইতেন, সে দৃশ্য ভুলিবার নয়। আর হেমচন্দ্রের মোটা গলার ভারতসঙ্গীত-আবৃত্তি যে শুনিয়াছে সে অমর পদবী লাভের যোগ্য। বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী পিতৃদেবের নামে উৎসৃষ্ট হয়। নিসর্গসুন্দরী, সারদামঙ্গল, সঙ্গীতশতক প্রভৃতির প্রথম পাঠও এই আসরে হইত। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থসংগ্রহ ও রামকমলের বেকনসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপিপাঠও শুনিয়াছি। উত্তরকালে পিতৃগৃহতাড়িত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই বাসায় বাস করিয়া যখন আমাদিগকে ধন্য করিয়াছিলেন তখন তাঁহার "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" পাঠ নিজমুখে শুনিয়া তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছি। আত্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল এই সভায় স্বীয় লাঙ্গুল বিস্তার প্রথম করেন। নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়ের অর্থশাস্ত্র ও গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রীর নানা স্মৃতিশাস্ত্রের অনুবাদ, প্রসন্নকুমারের পাটীগণিত, বীজগণিত, রাজকুমারের ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী ও হিন্দু দায়াদাধিকার এই বৈঠকখানাতেই রচিত হয়। রজনীকান্ত গুপ্তের পাণিনি, জয়দেব এবং সিপাহীবিদ্রোহের কাহিনী এইখানেই প্রথম দিবালোক দর্শন করে।

* * *

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, তারাশঙ্কর, তারাকুমার, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ ন্যায়রত্ন, রামনারায়ণ তর্করত্ন, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ স্বীয় রচনার অনেক পাণ্ডুলিপি এই বৈঠকেই পেশ করিয়া বংশকে ধন্য করিতেন। শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের হাতেখড়িও এইখানে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যিক অবস্থার পদধূলিও অনেক সময় এইখানে পড়িয়াছে। মনোমোহন ঘোষ, তারকচন্দ্র পালিত এবং সদ্যোসিবিলসার্ভিসচ্যুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের রাজনৈতিক জল্পনাও উত্তরকালে অনেক সময় এইখানে হইত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ভিত্তিকল্পে পাল্‌কী করিয়া সুরেন্দ্রবাবু অনেক সময় আসিতেন। সময়, ভারতবাসী, ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড, হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতি সংবাদপত্র এইখান হইতে পরিচালিত হইত। ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা, মনোরমা, তারাবাই, অশ্রুবিলাপ প্রভৃতি রমণীরচনার সমাদর ও সম্বর্দ্ধনাও এইখানে হইত।"

প্রসন্নকুমারের ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই এরূপ অসাধারণ অধিকার ছিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া একবার বলিয়াছিলেন যে তিনি প্রসন্নকুমারকে কখনও "খিচুড়ী ভাষায়" কথা কহিতে দেখেন নাই। যখন তিনি ইংরাজীতে কথা কহিতেন তখন বিশুদ্ধ ইংরাজীতে কথা কহিতেন; যখন বাঙ্গালায় কথা কহিতেন, বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথা কহিতেন, একটিও ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে ভাষার উপর এরূপ অধিকার তিনি অধিক দেখেন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবগুলি ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইলে প্রসন্নকুমারকেই এই অনুবাদের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং যাঁহারা তাহা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে সেই অনুবাদ কার্য্য কিরূপ সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

মানত।

(শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত)

ব্যাকুল হ'য়ে ডাকিস্ যদি তাঁয়,
(ওরে তোর) দেহের ব্যাধি মনের ব্যথা সকল ঘুচে যায়।
নইলে শুধু চক্রায়ণে, মানত করি' মনে মনে,
কি হবে তোর ছাগের মাংসে, চিনি, চাল, কলায়?
টাকার জোরে লোক খাটিয়ে ভাবিস দিবি রোগ সারিয়ে,
লোভের ফাঁদে আনবি টেনে তাঁহার করুণায়;
ভোগের সন্দেশ লুটে খাবি, ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে যাবি,
এই ফাঁকিতে, মূর্খ! কি সেই ভবী ভুলে যায়?
সুস্থ হ'তে চাহিস্ যদি, ডাকরে তাঁরে নিরবধি,
(তোর) সকল ব্যথা তুলে নিবেন আপনি তাঁহার গায়,
(একবার) ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌না বসে তাঁয়।

কি? ও কেন?

(শ্রী হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

দুইটী প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। সে দুইটী "কি" ও "কেন"। একটী অতি ক্ষুদ্র বালুকণা অথবা বৃহৎ পর্ব্বত দেখিয়া যদি প্রশ্ন করি ইহা কি? প্রথমতঃ উত্তর পাইব বালুকণা অথবা পর্ব্বত। যদি জিজ্ঞাসা করি পর্ব্বত অথবা বালুকণা কি? এইরূপ ক্রমান্বয়ে "কি" প্রশ্ন করিতে করিতে এমন স্থানে উপনীত হইব যে, যেখানে আর কোনো উত্তর নাই। কেন-প্রশ্নটীও এইরূপ।

ইহা ভাবিতে একটু কষ্টও হয় যে, এতদিনের এই পুরাতন, সনাতন জগৎটা অনাদিকাল হইতে যাহাতে বস-বাস করিয়া আসিতেছি, তাহার একটা বালুকণাকেও জানিতে অথবা বুঝিতে পারি না। এ জায়গায় আমরা কেহ কাহাকেও চিনি না, কেহ কাহাকেও বুঝিতে পারি না; সবাই মিলিয়া একটা ভুলের মধ্যে গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যাহাদিগকে লইয়া দিবা-রাত্র নাড়া-চাড়া করিতেছি, যাহাদিগের সহিত আমাদের অস্তিত্বের এত নিকট সম্বন্ধ, যাহারা না থাকিলে আমাদের অস্তিত্ব থাকে না, তাহাদিগকে আমরা একেবারেই চিনি না ও বুঝি না। অথবা তাহাদিগের সম্বন্ধে যাহা বুঝি—ভুল বুঝি; যাহা দেখি—ভুল দেখি, যাহা ভাবি—ভুল ভাবি। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, ইতিহাস সবই অসম্পূর্ণ পাগলের প্রলাপ বলিলেও বুঝিতে পারি! এই তো আমরা মানুষ! এই তো আমাদের জ্ঞান! এই জ্ঞানের আবার কতই বড়াই করি।

উল্লিখিত ধারণা বদ্ধমূল হইলেই মানুষ অজ্ঞেয়-বাদী অথবা সন্দেহবাদী হইয়া উঠে। যতই বলি না কেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে যে মানুষের জ্ঞানের অগোচর কোনও বিষয় আছে। এই "কি" ও "কেন" প্রশ্নের মীমাংসা আমরা করিতে পারি। এখন দেখা যাক্ তাহা কিরূপে সম্ভবপর।

দার্শনিকের মতে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে আলোচনা হয়। তৎপর নিশ্চয়রূপা চিত্তবৃত্তি। এই নিশ্চয়রূপা চিত্তবৃত্তিই বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞান। কোনো বস্তু জানা অর্থে সেই বস্তুর সহিত একাত্মক হওয়া। কোনো বিষয় কেবল প্রশ্ন করিয়া জানা যায় না। তদ্বস্তু-আত্মক হইয়া তদ্বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। যেমন বালুকণা কি পদার্থ জানিতে হইলে ঐ বালুকণার সহিত একাত্মক হইয়া তাহাকে জানিতে হইবে। আপাততঃ কথাটা কেমন একটু অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। দেখা যাক্, বিচারে কি দাঁড়ায়।

দর্শনকার বলেন, যখন যে বস্তু আমরা জানি, তখন চিত্ত সেই বস্তুর আকারে আকারিত হয়; আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত বিশ্বে এই এক মহারহস্য যে, যে কোন একটা বস্তু জানিতে পারিলেই নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুকেই জ্ঞাত হওয়া যায়। যদি একটা বালুকণা কি জানা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহাও জানা যায়। দার্শনিকেরা বলেন, একই জ্ঞান নানা রূপে রূপান্তরিত হইতেছে।

ব্রহ্ম কি? ব্রহ্মের অস্তিত্ব কেন? ইহা কেবল প্রশ্নোত্তর দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। জগতে

একমাত্র জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং ব্রহ্ম কি বুঝিতে হইলে জ্ঞানে ব্রহ্মের সহিত একাত্মক হইতে হইবে। নিজেকে উক্ত প্রকারে উপলব্ধিই ব্রহ্মকে জানা। দর্শন বিজ্ঞান সকল শাস্ত্রই কেবল নিজকে জানিতে উপদেশ দিতেছে।

এই নিজকে এবং ব্রহ্মকে জানিবার উপায় কি? বেদান্ত দর্শন বলেন—"নেতি নেতি" অর্থাৎ ইহা নহে ইহা নহে। পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি, ইহার কিছুই আমিও নহি এবং ইহার কিছুই ব্রহ্মও নহে। যেহেতু আমি নহি সেই হেতুই ব্রহ্মও নহে। কারণ, ব্রহ্মের ন্যায়ই আমিও দ্রষ্টা; ব্রহ্মের ন্যায়ই আমি কর্ত্তা। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"মনের মন্তাকে মনন করিতে পারা যায় না; জ্ঞানের জ্ঞাতাকে জানিতে পারা যায় না।" আমাদিগকে "ইহা নহে" "ইহা নহে" করিয়াই জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। "ইহা নহে" বলিলেও জিজ্ঞাসা বস্তু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইল। কারণ "তাহা ইহা নহে" ইহাও তৎসম্বন্ধীয় এক প্রকার জ্ঞান। এই জ্ঞানটুকুই আমাদের সর্ব্বপ্রথমে অবলম্বনীয়। ইহা জানিতে পারিলেই দেখা যাইবে যে আমরা জ্ঞানের পথে এবং কি ও কেন প্রশ্নের মীমাংসার পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি। তখন "কি"? ও "কেন" প্রশ্ন লইয়া বিব্রত হইতে হইবে না। এই জ্ঞানের যতদিন না সম্যক বিকাশ হইবে ততদিন "কি" ও "কেন" প্রশ্নেরও সম্পূর্ণ নিরসন হইবে না।

বঙ্গের জমিদার।

(শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রাচীনের সর্ব্বতোমুখী রাজশক্তিসম্পন্ন ভূস্বামীবর্গ বর্ত্তমানে করসংগ্রাহক জমিদাররূপে পরিণত ইহা অবিসম্বাদী সত্য। বর্ত্তমান রাজবিধি তাঁহাকে যে কয়টি কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। সংক্ষেপতঃ সেই কর্ত্তব্যগুলি নিম্নে বিবৃত হইল।

১। প্রজার নিকট হইতে প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট কিস্তি অনুযায়ী কর আদায় করতঃ বৎসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট চারিটি কিস্তির চারিটী দিনের সূর্য্যদেব অস্তাচলের গুহাশায়ী হইবার পূর্ব্বে স্বীয় দেয় কররাশি রাজকোষে প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদার জমা দিবেন। প্রজার নিকট হইতে তিনি কর আদায় করিতে সমর্থ হউন বা নাই হউন তাহা আদৌ বিবেচ্য বিষয় নহে। যে কোন জমিদার উক্ত দিনে বাকীদার হইলে তাঁহার জমী তৎক্ষণাৎ নীলামে উঠিবার ব্যবস্থা আছে। এই বিষম অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ ভূস্বামীগণ রাজকোষে স্বীয় কর প্রদান করিবার পরে তদীয় প্রজার নিকট হইতে সংগৃহীত অবশিষ্ট করাদায়লব্ধ অর্থ হইতে স্বীয় জমিদারী পরিচালনের সর্ব্ববিধ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যদি কিছু বা যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণ, স্বীয় বংশ ও সামাজিক মর্য্যাদা রক্ষা প্রভৃতি কল্পে নিয়োগ করিবার অধিকারী। প্রজার নিকট হইতে স্বীয় প্রাপ্য কর আদায়েরও যদি এইরূপ কোন পন্থা থাকিত তাহা হইলে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন জমিদারবর্গকে লাটের খাজনা দাখিলের অব্যবহিত পূর্ব্বকালে শুষ্কবদনে অনাহারে অর্থগৃধ্নু কুসীদজীবিগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে দেখা যাইত না। বর্ত্তমানে অধিকাংশ বঙ্গজমিদারের এইরূপই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

২। প্রজার সহিত জমি বন্দোবস্তকালে যে নির্দ্দিষ্ট হারে বা করে বন্দোবস্ত হইয়াছিল বা বহুদিন হইতে প্রজা যে কর প্রদান করিয়া আসিতেছে তদতিরিক্ত কপর্দ্দকমাত্রও রাজধর্ম্মাধিকরণের বিনা আদেশে জমিদার কোনরূপে গ্রহণ করিলে, তাহা রাজবিধিসঙ্গত অপরাধ স্বরূপে গণ্য হইবে; এবং তজ্জন্য জমিদার আর্থিক ও শারীরিক উভয়রূপ দণ্ডে দণ্ডিত ও প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইবেন।

৩। প্রজার সহিত জমি বন্দোবস্তকালে যথেচ্ছ চুক্তি নির্দ্ধারণ করিতে জমিদার পারিবেন না। দৃষ্টান্ত স্থলে শতকরা ১২॥০ টাকার অধিক বাকী করের সুদ পাইবেন না এবং ইচ্ছামত কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না অথবা প্রজার দখলি জমি হইতে প্রজাকে চ্যুত করিতে পারিবেন না।

এ সমস্ত স্থানে রাজবিধি তাঁহাকে যতটুকু স্বাধীনতা দিয়াছে তাহারই সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহাকে করপদ চালনা করিতে হইবে।

৪। প্রজা যতপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করুক না কেন তাহার প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া জমিদারকে রাজধর্ম্মাধিকরণে শরণ লইতে হইবে এবং বহু অর্থ ব্যয়ে, বহু যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া দীর্ঘকাল পরে বিচারক যদি নিতান্তই রাজবিধিকে কোনরূপে প্রজার সানুকূলে প্রয়োগ করিতে না পারেন তবেই জমিদার কিঞ্চিৎ প্রতীকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবেন।

৫। রাজবিধি যখনই ভূমিকরের অতিরিক্ত কোন রথ্যা করাদি ধার্য্য করিবেন তাহা প্রায়শঃ প্রজা ও জমিদার উভয়ে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিলেও জমিদার একাকী সেই উভয় অংশ রাজকোষে জমা দিতে বাধ্য আছেন। প্রজার নির্দ্দিষ্ট অংশ অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও তাহা জমিদারকে যথাসময়ে না দিলে জমিদার প্রজার বিরুদ্ধে মন্থরগতি ধর্ম্মাধিকরণের আশ্রয়ে আদায় লইতে পারেন।

৬। প্রজার নিকট কৃষিজমির কর ব্যতীত অন্য যে কোন শ্রেণীর জমির করস্বরূপে প্রাপ্ত অর্থ অথবা প্রজাকে তাহার অসময়ে জীবিকাসাহায্যে অগ্রিম অর্থ বা শস্য দিয়া তাহার সুদ স্বরূপে ভূম্যধিকারী কিছু গ্রহণ করুন বা না করুন তাহার মূলধন পুনরায় আদায় হইয়া তাঁহার ধনাগারে ফিরিয়া আসুক বা না আসুক ভূস্বামীকে তজ্জন্য আয়করাদি রাজকোষে জমা দিতে হইবে।

৭। রাজনিয়মে সূর্য্যাস্তের মধ্যে রাজস্ব না দিলে জমিদারী বিক্রীত হইবে এবং রথ্যা করাদি যথাসময়ে রাজকোষে জমা না দিলে জমিদারের অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া আদায় হইবে এইরূপ সুব্যবস্থা থাকিলেও ভূস্বামী প্রজার বাকী কর আদায় জন্য উক্ত বাকীর দায়যুক্ত ভূমির শস্য বা প্রজার কোন সম্পত্তি স্বেচ্ছায় অর্থাৎ রাজধর্ম্মাধিকরণের বিনা আদেশে ক্রোক বিক্রয় করিতে পারিবেন না। সেরূপ কার্য্য করিলে তিনি দণ্ডবিধি আইনের কঠোর কবলে নিষ্পেষিত হইবেন।

৮। রাজকর্ম্মচারীগণের অনুরোধে ভূস্বামীগণ নানাবিধ কার্য্যে অর্থসাহায্য করিতে বাধ্য এবং অবশ্যই তাহা তাঁহার বার্ষিক আয়ের তুলনায় কম হইবে না। কিন্তু প্রজার নিকট কোনরূপ চাঁদা সেজন্য বা অন্য কোন কারণে কপর্দ্দকমাত্র গ্রহণ করিলে তাঁহার কারাগারে যাইবার পথ প্রশস্ত হইবে।

৯। জমিদারীর মধ্যবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী রাজপথ অতিক্রমকালে রাজসৈন্যগণের সর্ব্বপ্রকার রসদ সংগ্রহ করিয়া দিতে জমিদার বাধ্য, কিন্তু এজন্য প্রজার নিকট কোন দ্রব্য প্রজার অনভিপ্রায়ে গ্রহণ করিলে তিনি দণ্ডিত হইবেন।

এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনে স্থান পাইয়াছে। সে সমস্ত গুলিই প্রজার প্রতি যাহাতে ভূম্যধিকারী কোন অত্যাচার করিতে না পারেন সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কোন জমিদারী যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডের পরিচালনাধীন হয়, তখন প্রজার দেয় কর সার্টিফিকেট আইন অনুসারে তাহার অস্থাবর ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারা আদায় হইবার সুগম বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। সহৃদয় ব্যবস্থাপকগণের প্রজাস্বত্ব আইনে এইরূপ ক্ষমতা জমিদারবিশেষকে অর্পণ করিবার একটী ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ যদি কোন জমিদার তাঁহার হিসাবাদি রাজনিযুক্ত হিসাবপরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে রক্ষা করেন তবে তিনি এই অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে কোন ভূম্যধিকারী এইরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন কি না তাহা জানা যায় না। বাকী করের জন্য প্রজার উৎপন্ন শস্য ক্রোক করিয়া অর্থাৎ বাকী করের বিধিবোধিত মোকর্দ্দমা না করিয়া বাকী কর আদায়ের যে বিধি উক্ত আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বিধিপরিচালকগণের কৃপায় পুস্তকের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে মাত্র। এতদ্ব্যতীত প্রজার জরিপ জমাবন্দি (Survey & Settlement) সম্বন্ধে উক্ত রাজবিধির নির্দ্দিষ্ট অংশ এরূপ জটিল যে কার্য্যকালে তাহার দ্বারা জমিদারগণ আইনের ঈপ্সিত সামান্য উপকারটুকুও কদাচিৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এখন দেখিতে হইবে যে কেন এরূপ হইল। প্রাচীন জমিদারীপরিচালনের কুফল দেখিয়াই রাজপুরুষগণ এইরূপে জমীদারবিরোধী এবং প্রজার পক্ষপাতী নীতিপ্রচলন করিয়াছেন ইহা প্রকাশ্য গুপ্ত মন্ত্র। বর্ত্তমান জমিদারবর্গের মধ্যে একশ্রেণীর জমিদারগণ প্রায়শঃ রাজবিধির পশ্চাদনুবর্ত্তী হইয়া নিরুপদ্রবে যে কিছু লভ্যাংশ প্রাপ্ত হয়েন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আছেন। তাঁহারা সাধারণতঃ আধুনিক জমিদার। প্রাচীন অভিজাতবর্গের হস্তচ্যুত জমিদারী অথবা রাজসকাশে সুন্দর বনভূমি অস্থায়ী বন্দোবস্তে লাভ করিয়া তাঁহারা বর্ত্তমান কালের বিধিবদ্ধ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রায়শঃ ভূস্বামী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রাজশক্তিশালী ভূস্বামী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহারা এই রসের রসিক নহেন। তাঁহারা যেটুকু পাইয়াছেন তাহাতেই পরিতৃপ্ত। বিশেষতঃ তাঁহারা সাধারণতঃ বহু অর্থ পূর্ব্বে সঞ্চিত করিয়া জমিদারীরূপ লাভজনক ব্যবসায়ে সেই অর্থ নিযুক্ত করেন; এবং ব্যবসায় হিসাবে জমিদারী অর্জ্জনে নিযুক্ত অর্থের বার্ষিক শতকরা পাঁচ বা ছয় টাকা লাভ পাইলেই যথেষ্ট মনে করেন। এই সকল জমিদার মহাজনের হস্ত হইতে প্রজারক্ষার জন্য অকালে বা দুর্ভিক্ষকালে অযাচিত সাহায্যদানে প্রজারক্ষা করিতে অথবা প্রজাহিতকর কোন বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্যে সাধারণতঃ অগ্রসর হয়েন না এবং প্রজাবর্গ আত্মবিপ্লবে ও মোকর্দ্দমাসংক্রান্ত ব্যয়ে উৎসন্ন হইলেও সেদিকে ফিরিয়া চাহেন না। তাঁহারা বৎসরমধ্যে স্বীয় প্রাপ্য কর প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্ত না হইলে অবিলম্বে রাজদ্বারে অভিযোগ আনয়ন করিয়া বাকী কর আদায় করিয়া লয়েন। প্রজার মুখাপেক্ষী হইয়া যথেচ্ছ কালবিলম্ব করিয়া স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন না।

রাজপুরুষগণের নিকট তাঁহারা আদর্শ বা সৎস্বভাব জমিদার বলিয়া পরিচিত। সাধারণ্যেও তাঁহাদের প্রায় সেইরূপই সুনাম। কিন্তু ভালরূপ দেখিলে দেখা যায় যে এই সকল জমীদারের জমিদারীর মধ্যে একশ্রেণী প্রজা একাধারে অবাস্তব জমিদার ও মহাজনের আসন গ্রহণ করে এবং জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে এ কাল পর্য্যন্ত যত কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে সে সমস্ত কলঙ্ক এই সকল নবোদ্ভূত অবাস্তব জমিদার বা মহাজনবর্গের কলঙ্ককালিমার নিকট হীনপ্রভ। এই সকল জমিদারীর প্রায় সমস্ত জমি এই সকল অবাস্তব জমিদারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অধিকারভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে হস্তে হলচালনকারী সকল কৃষকই ইহাদের অধীন কোরফা প্রজারূপে জমিদারের গৃহীত কর অপেক্ষা দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ কর এই সকল অবাস্তব জমীদার বা মধ্যবর্ত্তী প্রজাবর্গকে দিয়া থাকে। এই মধ্যবর্ত্তী প্রজাবর্গ প্রজাস্বত্ব আইনের "ভূস্বামী" আখ্যায় গণ্য নহে, অথচ অনেক স্থলেই জমিদারীর সমস্ত প্রজার ভাগ্যবিধাতা। শস্য আহৃত হইলে তাহা ইহাদের গোলাজাত হইয়া থাকে এবং বর্ষাকালে নিরন্ন প্রজাগণ ইহাদের নিকট দ্বিগুণ বা তদধিক সুদের অঙ্গীকারে সেই ধান্য ঋণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া বৎসরের পর বৎসর অধিকতর ঋণগ্রস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই সকল মধ্যবর্ত্তী প্রজা এইরূপে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করতঃ মহাজনের আসন গ্রহণ করিয়া সাধারণ নিঃস্ব প্রজাকুলকে নানারূপে নিষ্পেষিত করিয়া থাকে। স্বীয় শ্রমলব্ধ ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য আপন ইচ্ছামত বিক্রয় করিবার অধিকার পর্য্যন্ত প্রজাদের নাই। উৎপন্ন শস্য, ধান্য, গুড় বা পাট বিক্রয়োপযোগী হইবার বহুপূর্ব্বে উপরোক্ত মহাজনরূপী অবাস্তব জমিদারগণ তাহাদের সুবিধা অনুযায়ী একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়া অর্থ দাদন করিয়া থাকে অথবা পূর্ব্বদাদনের অর্থ আদায়ের পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। কোন শস্য উৎপন্ন হইয়া বিক্রয়োপযোগী অবস্থায় উপনীত হইবামাত্র ঐসকল মহাজন বণিকবেশে প্রজার নিকট হইতে তাহা স্বীয় দাদনের পরিমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব নৌকা বা গাড়ী বোঝাই করতঃ কলিকাতা বা অন্য কোন ব্যবসায়কেন্দ্রে বহন করিয়া তদ্বিনিময়জাত যথেষ্ট অর্থ গ্রহণ করিয়া আপনারা অচিরকাল মধ্যে ধনেশ্বর হইয়া উঠে। আর দুঃস্থ, নিরন্ন, বস্ত্রহীন, বাতাতপ ও ক্ষুৎপিপাসা প্রপীড়িত ভূমিকর্ষককুল তাহাদের নিকটে প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা অনেক অল্পমূল্যে স্বীয় উৎপাদিত শস্যসমূহ বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং সেই অল্প মূল্যও অনেক সময়ে নগদ প্রাপ্ত হয় না। প্রাগুক্ত মধ্যবর্ত্তী জমিদার, মহাজন বা ব্যবসাদাররূপী

প্রভুগণের নিকট সে যে ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া আছে সেই ঋণপরিশোধ-ব্যপদেশে তাহার শস্যমূল্যের অধিকাংশ কর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাহাতেও তাহার দেয় সমস্ত সুদ পরিশোধ হয় না। যদি কোন প্রজার দেয় সুদ পরিশোধিত হইয়া তাহার আসলের কিয়দংশ কোনরূপে কোন বৎসর তাহার ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের মূল্য হইতে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রণালী অনুসারে পরিশোধিত হয় তবে তাহা নিশ্চয়ই তাহার সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। এই কঠোর প্রণালীনিয়মিত প্রজা এইরূপে তাহার ঋণের সুদ বা আসল যে অংশ শোধ করুক না কেন তাহার কোন নিদর্শন সেই দুর্ভাগা জীব প্রায়শঃ প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং প্রতি বৎসর হিসাবনিকাশের অভিনয়কালে তাহার ঋণভার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়। অবশেষে সেই হতভাগ্য প্রজা কখন বা ঐ শ্রেণীর অন্য কোন মহাজনের শরণাপন্ন হইয়া একবার পূর্ব্ব প্রভুর কবল হইতে উদ্ধারপ্রাপ্তির চেষ্টা করে, কখন বা স্বীয় জোতজমি উক্ত একাধারে মহাজন ও বণিকবেশধারী মধ্যবর্ত্তী প্রজাকে বিক্রয় করিয়া তদধীন কোরফা প্রজাস্বরূপে দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ কর স্বীকার করিয়া স্বীয় ভূমি কর্ষণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। মহাজন পরিবর্ত্তন করিলেও পরিণাম একই প্রকার বিষময় হইয়া থাকে। এই প্রকার মধ্যবর্ত্তী প্রজা, জমিদার, মহাজন বা বণিকবেশধারী নির্ম্মমহৃদয় অর্থগৃধ্নু জীব জগতের অন্য কোন স্থানে আছে বলিয়া বোধ হয় না। *

* লেখক একটী বড় জমীদারীর প্রধান কর্ম্মচারী। তিনি নিরপেক্ষভাবে জমীদার ও প্রজা উভয়ের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। তঃ সং

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

দ্বাদশ প্রকরণ।

সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

সর্ব্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্ব্বেষাং চ হিতে রতঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স ধর্ম্মং বেদ জাজলে॥ *

মহাভারত, শান্তি। ২৬১, ৯.

যে মার্গের এই মত যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইয়ে বুদ্ধি যখন অত্যন্ত সম ও নিষ্কাম হয় তখন মনুষ্যের কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না; এবং সেই জন্য এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারের দুঃখময় ও শুষ্ক ব্যবহার, বিরক্ত বুদ্ধিতে জ্ঞানীপুরুষের সমস্ত ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, সেই মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা কর্ম্মযোগ কিংবা গৃহস্থাশ্রমের আচরণও বিচার করিবার যোগ্য এক শাস্ত্র আছে এ কথা কখন মনেই করিতে পারেন না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে প্রথমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানলাভ হওয়া চাই, তাই তাঁহারা স্বীকার করেন যে, যে ধর্ম্মের দ্বারা চিত্তবৃত্তি শুদ্ধ হয় অর্থাৎ সাত্ত্বিকতা আসে, সেই ধর্ম্ম অনুসারেই সংসারের কার্য্য করাই উচিত। সেই কারণে তাঁহারা মনে করেন যে, সংসারেই নিত্য অবস্থিতি করা বাতুলতা, প্রত্যেক মনুষ্যের যত শীঘ্র সম্ভব সন্ন্যাসগ্রহণই এই জগতে পরম কর্ত্তব্য। এইরূপ মানিলে কর্ম্মযোগের স্বতন্ত্র মহত্ত্ব কিছুই থাকে না; এবং সেই জন্য, সন্ন্যাসমার্গীয় পণ্ডিত সাংসারিক কর্ত্তব্যবিষয়ে সামান্য প্রাসঙ্গিক বিচার করিয়া মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের বর্ণিত চারি আশ্রমরূপ সোপানে উঠিতে উঠিতে সন্ন্যাস-আশ্রমরূপ শেষ ধাপে শীঘ্র পৌঁছানো অপেক্ষা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের কর্ম্মাকর্ম্মবিবেচনা আর বেশী কিছু করেন না। সেই জন্য কলিযুগে সন্ন্যাসমার্গের প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বীয় গীতাভাষ্যে, গীতার কর্ম্ম-মূলক বচনগুলি উপেক্ষা করিয়া অথবা উহা কেবল প্রশংসামূলক (অর্থবাদমূলক) এইরূপ কল্পনা করিয়া, শেষে কর্ম্মসন্ন্যাসধর্ম্মই সমস্ত গীতার প্রতিপাদ্য এইরূপ গীতার ফলিতার্থ বাহির করিয়াছেন। অন্যান্য টীকাকারগণ স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুসারে গীতার এই যে রহস্য বিবৃত করিয়াছেন যে, ভগবান রণভূমির উপর অর্জ্জুনকে নিবৃত্তিমূলক নিছক ভক্তি বা পাতঞ্জল যোগ অথবা মোক্ষমার্গেরই উপদেশ করিয়াছেন তাহার কারণও এই। সন্ন্যাসমার্গের অধ্যাত্মজ্ঞান যে নির্দ্দোষ এবং তদ্দ্বারা প্রাপ্ত সাম্যবুদ্ধি কিংবা নিষ্কাম অবস্থাও যে গীতার গ্রাহ্য ও সম্মত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য শেষে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে, সন্ন্যাসমার্গের এই কর্ম্মসম্বন্ধীয় মত গীতার গ্রাহ্য নহে। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত বৈরাগ্য ও সমতার দ্বারাই জ্ঞানলাভের পরেও জ্ঞানীপুরুষের সমস্ত ব্যবহার করিতে হইবে, গীতার এই বিশেষ সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব প্রকরণে আমি সবিস্তর দেখাইয়াছি। জগতের জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া জগতের নাশ হয়; এবং এই প্রকারে জগতের নাশ না হইয়া সুচারুরূপে চলিবে, ইহাই যখন ভগবানের ইচ্ছা, তখন জ্ঞানীপুরুষকেও সমস্ত প্রাপঞ্চিক কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে করিয়া সাধারণ মনুষ্যদিগকে সদ্বর্ত্তনের প্রত্যক্ষ শিক্ষা

* "কর্ম্মে, মনে ও বাক্যে সকলের হিতসাধনে যিনি রত এবং সকলের যিনি নিত্য সুহৃৎ—হে জাজলে, তিনিই ধর্ম্মকে জানেন।"

দিতে হইবে। এই মার্গকে অধিক শ্রেয়স্কর ও গ্রাহ্য বলিলে এই প্রকার জ্ঞানীপুরুষ জাগতিক কর্ম কিরূপে করিয়া থাকেন তাহা দেখা আবশ্যক হয়। কারণ, এই প্রকার জ্ঞানীপুরুষের আচরণই লোকের আদর্শ হয়; তাঁহার আচরণপ্রণালী পরীক্ষা করিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্ণয়কারক সাধন বা উপায়—যাহা আমরা অন্বেষণ করিতেছিলাম তাহা—স্বতই আমরা প্রাপ্ত হই। সন্ন্যাসমার্গ হইতে কর্ম্মযোগমার্গে যা কিছু বিশেষত্ব তাহা এই। যে ব্যক্তির ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা স্থির হইয়াছে, "সর্ব্বভূতে এক আত্মা" এই সাম্য উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য হইয়াছে, তাহার বাসনাও অবশ্য শুদ্ধই হয়; এবং বাসনাত্মক বুদ্ধি এইরূপ শুদ্ধ, সম, নির্ম্মম ও পবিত্র হইলে পর, তাহার পক্ষে কোনও পাপ কিংবা মোক্ষের প্রতিবন্ধক কর্ম্ম করাই সম্ভব নহে। কারণ, প্রথমে বাসনা ও পরে তদনুকূল কর্ম্ম; এইরূপই যখন ক্রম তখন শুদ্ধ বাসনাজনিত কর্ম্ম শুদ্ধই হইবে এবং যাহা শুদ্ধ তাহাই মোক্ষানুকূল। সুতরাং পারলৌকিক কল্যাণের অন্তরায় না হইয়া এই সংসারে মনুষ্যমাত্রই কিরূপ আচরণ করিবে—আমাদের সম্মুখে 'কর্ম্মাকর্ম্মবিচিকিৎসা' কিংবা 'কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতি'র এই যে বিকট প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, নিজের আচরণের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ উত্তর দিবার গুরু এক্ষণে আমাদের লাভ হইল (তৈ. ১. ১১. ৪; গী. ৩. ২১)। অর্জ্জুনের সম্মুখে এইরূপ গুরু শ্রীকৃষ্ণরূপে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান ছিলেন। এবং যুদ্ধাদি কর্ম্ম বন্ধন বলিয়া জ্ঞানীপুরুষের কি তাহা ছাড়িতে হইবে অর্জ্জুনের যখন এই সন্দেহ হইয়াছিল, তখন এই গুরু তাহা দূর করিয়া, জাগতিক ব্যবহার কিরূপ ভাবে করিলে পাপ হয় না, অধ্যাত্মশাস্ত্র অবলম্বনে তাহা অর্জ্জুনকে ঠিক বুঝাইয়া দিলেন; তাহার পর তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এইরূপ ভাবে বুঝাইবার গুরু প্রত্যেকে সর্ব্বদা লাভ করিতে পারে না; এবং তৃতীয় প্রকরণের শেষে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই বচনের বিচার করিবার সময় আমি বলিয়াছি যে, এই মহাপুরুষদিগের শুধু বাহ্য আচরণ অবলম্বন করিয়াই সমস্ত থাকিতে পারে না। তাই, জগতকে নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষাদাতা এই জ্ঞানী পুরুষদের আচরণ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া তদন্তর্নিহিত প্রকৃত বীজ কিংবা মূলতত্ত্বটি কি, তাহার বিচার করা আবশ্যক। ইহাকেই কর্ম্মযোগশাস্ত্র বলে। এবং উপরে যে জ্ঞানী পুরুষের কথা বলিয়াছি, তাঁহার অবস্থা ও কার্য্যই এই শাস্ত্রের ভিত্তি। এই জগতের সমস্ত লোকই যদি এইরূপ আত্মজ্ঞানী ও কর্ম্মযোগী হয় তাহা হইলে কর্ম্মযোগশাস্ত্রের দরকারই হয় না। নারায়ণীয় ধর্ম্মে একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে—

> একান্তিনো হি পুরুষা দুর্লভা বহবো নৃপ।
> যদ্যেকান্তিভিরাকীর্ণং জগৎ স্যাৎ কুরুনন্দন॥
> অহিংসকৈরাত্মবিদ্ভিঃ সর্বভূতহিতে রতৈঃ।
> ভবেৎ কৃতযুগপ্রাপ্তিঃ আশীঃকর্ম্মবিবর্জ্জিতা॥

"একান্তিক অর্থাৎ প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্ম্মের সম্পূর্ণ আচরণকারী ব্যক্তি অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। আত্মজ্ঞানী, অহিংসক, সর্ব্বভূতহিতে রত ও একান্ত ধর্ম্মের জ্ঞানীপুরুষের দ্বারা যদি এই জগৎ ভরিয়া যায় তাহা হইলে আশীঃকর্ম্ম অর্থাৎ কাম্য অথবা স্বার্থবুদ্ধিতে কৃত সমস্ত কর্ম্ম এই জগতে লুপ্ত হইয়া গিয়া পুনর্ব্বার সত্যযুগের আবির্ভাব হয়।" (শাং. ৩৪৮. ৬২, ৬৩)। কারণ এই অবস্থায় সকল ব্যক্তিই জ্ঞানী হওয়ায়, কেহ কাহারও ক্ষতি করিবে না শুধু নহে; প্রত্যেক মনুষ্য, সকলের কল্যাণ কিসে হয়, তাহাই মনে করিয়া তদনুসারেই শুদ্ধান্তঃকরণে ও নিষ্কামবুদ্ধিতে আচরণ করিবে। পূর্ব্বে অতি প্রাচীনকালে এক সময়ে সমাজের এইরূপই অবস্থা ছিল এবং পুনর্ব্বার তাহা কোন-না-কোন এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারদিগের মত (মভা. শাং. ৫৯. ১৪); কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রথম কথা স্বীকার করেন না—আধুনিক ইতিহাসের প্রমাণ দর্শাইয়া তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বে কখনও এইরূপ অবস্থা ছিল না; কিন্তু পরে মানবজাতির উন্নতি হইলে, কোন এক সময়ে এই অবস্থা আসিতে পারে। সে যাহাই হউক; এক্ষণে এস্থলে ইতিহাসের বিচার করা উচিত নহে। কিন্তু ইহা বলিতে কোন বাধা নাই যে, সমাজের এইঅত্যুৎকৃষ্ট অবস্থা কিংবা পূর্ণাবস্থাতে প্রত্যেক মনুষ্য পরম জ্ঞানী রহিবেন এবং তাঁহার আচরণই শুদ্ধ, পুণ্যজনক, ধর্ম্ম্য, পরম কর্ত্তব্য বলিয়া মানিতে হইবে। এই মত উভয়েরই গ্রাহ্য। প্রসিদ্ধ ইংরেজ সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ স্পেন্সর এই মতই স্বীয় নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থের শেষে প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে গ্রীস দেশের তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা এই সিদ্ধান্তই করিয়াছিলেন।* উদাহরণ যথা,—গ্রীকতত্ত্ববেত্তা প্লেটো স্বকীয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের নিকট যে কর্ম্ম প্রশস্ত বলিয়া মনে হইবে তাহাই শুভজনক ও ন্যায্য; সাধারণ মনুষ্য এই ধর্ম্ম অবগত নহে, এই কারণেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরই নির্ণয়কে প্রমাণ বলিয়া মানা উচিত। আরিষ্টটল নামক আর

* Spencer's *Data of Ethics* Chap: XV, pp. 275-278 স্পেন্সার ইহার নাম দিয়াছেন—Absolute Ethics।

এক গ্রীক তত্ত্বজ্ঞ স্বকীয় নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থে (৩. ৪) বলেন যে, জ্ঞানীপুরুষদিগের সিদ্ধান্ত প্রায়ই নির্ভুল হইয়া থাকে, কারণ প্রকৃত সত্য তাঁহারা জানেন; এবং জ্ঞানীপুরুষের এই সিদ্ধান্ত কিংবা আচরণই অন্য লোকের প্রমাণ স্বরূপ হইয়া থাকে। এপিক্যুরস নামক আর এক তত্ত্বশাস্ত্রজ্ঞ এই প্রকার প্রামাণিক পরম জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করিবার সময় বলিয়াছেন যে, তিনি "শান্ত সমবুদ্ধিবিশিষ্ট, এমন কি পরমেশ্বরেরই ন্যায় সদা আনন্দময়; তাঁহা হইতে লোকের কিংবা লোকের নিকট হইতে তাঁহার একটুও কষ্ট হয় না"। * ভগবদ্‌গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ, ত্রিগুণাতীত কিংবা পরম ভক্ত বা ব্রহ্মভূত পুরুষের বর্ণনার সহিত এই বর্ণনার কতটা সাম্য আছে তাহা পাঠকের উপলব্ধি হইবে। "যস্মান্নোদ্‌বিজতে লোকো লোকান্নোদ্‌বিজতে চ যঃ" (গী. ১২.:১৫)—যাঁহা হইতে লোকেরা উদ্বিগ্ন হয় না কিংবা লোকের দ্বারা যিনি বিরক্ত বোধ করেন না, যিনি হর্ষ ও খেদ, ভয় ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, সদা আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট (আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ গী. ২. ৫৫), ত্রিগুণের দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ চঞ্চল হয় না (গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে ১৪. ২৩), স্তুতি ও নিন্দা কিংবা মানাপমান যাঁহার নিকটে সমান এবং সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া (১৮. ৫৪) সাম্যবুদ্ধির দ্বারা আসক্তি ছাড়িয়া ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যিনি করেন কিংবা যাঁহার নিকট লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চন সবই সমান (১৪. ২৪),—ইত্যাদি প্রকারে ভগবদ্‌গীতাতেও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ তিন চারি বার সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে। এই অবস্থাকেই সিদ্ধাবস্থা কিংবা ব্রাহ্মী স্থিতি বলে। এবং যোগবাসিষ্ঠ প্রভৃতি প্রণেতা এই অবস্থাকে জীবন্মুক্তাবস্থা বলেন। এই অবস্থা লাভ করা অত্যন্ত দুর্ঘট হওয়া প্রযুক্ত জর্ম্মন তত্ত্ববেত্তা কাণ্ট বলিয়াছেন যে, গ্রীক পণ্ডিতেরা এই অবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কোন এক বাস্তবিক ব্যক্তির বর্ণনা নহে, শুদ্ধ নীতির তত্ত্ব লোকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সমস্ত নীতির মূল যে 'শুদ্ধ বাসনা' তাহাকেই মানবমূর্ত্তি প্রদান করিয়া তাঁহারা জ্ঞানী ও নীতিমান পুরুষের এই চিত্র স্বকীয় কল্পনার দ্বারা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, এই অবস্থা কাল্পনিক নহে, সম্পূর্ণ সত্য; মনোনিগ্রহের দ্বারা ও প্রযত্নের দ্বারা তাহা ইহলোকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ অনুভবও আমাদের হইয়াছে। তথাপি এই বিষয়টা সাধারণ নহে, হাজারের মধ্যে এক আধ জন ইহার জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকে এবং এই হাজার প্রযত্নকারীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বহু জন্মান্তরে এই পরম অবস্থা শেষে প্রাপ্ত হয়, এইরূপ গীতাতেই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (গী. ৭. ৩)।

স্থিতপ্রজ্ঞাবস্থা কিংবা জীবন্মুক্তাবস্থা যতই দুর্লভ হউক না কেন, তথাপি যে ব্যক্তি এই পরম অবস্থা একবার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকে কার্য্যাকার্য্য কিংবা নীতি শাস্ত্রের নিয়ম শিক্ষা দিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না। উপরে ইহার যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতেই এই বিষয় স্বতই নিষ্পন্ন হয়। কারণ, পরমাবস্থায় শুদ্ধ, সম ও পবিত্র বুদ্ধিই নীতির সর্ব্বস্ব হওয়ায়, এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষকে নীতিনিয়ম দেখানো স্বয়ংপ্রকাশ সূর্য্যের নিকট অন্ধকারের কল্পনা করিয়া, সূর্য্যকে মশালের আলো দেখাইবার ন্যায় অসঙ্গত হয়। এক-আধ জনের এই পূর্ণাবস্থায় উপনীত হওয়া বা না হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু যে কোন প্রণালীতে যখন একবার নিশ্চয় হয় যে কোন ব্যক্তি এই পূর্ণ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার পাপপুণ্য-সম্বন্ধে অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন কল্পনাই করিতে পারা যায় না। কতকগুলি পাশ্চাত্য রাজধর্ম্মশাস্ত্রীর মত অনুসারে রাজশক্তি যেরূপ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে কিংবা ব্যক্তিসমূহে অধিষ্ঠিত থাকে এবং প্রজাগণ রাজনিয়মে বদ্ধ থাকিলেও রাজা সেই সকল নিয়মে বদ্ধ হন না, ঠিক এইরূপ নীতি-রাজ্যে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির অধিকার থাকে। তাঁহার মনে কোনও কাম্য বুদ্ধি থাকে না, তাই কেবল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে তিনি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন না; সেইজন্য পাপ কিংবা পুণ্য, নীতি কিংবা অনীতি, এই সকল শব্দ, অত্যন্ত নির্ম্মল ও শুদ্ধ বাসনাবিশিষ্ট এই পুরুষদিগের আচরণ সম্বন্ধে কদাপি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না; পাপ ও পুণ্য এই দুয়ের অতীত স্থানে তাঁহারা পৌঁছিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।

"যে ব্যক্তি ত্রিগুণাতীত হইয়াছেন, বিধিনিষেধরূপ নিয়ম তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না," আবার, "উত্তম হীরাকে যেরূপ ঘসিতে হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি নির্ব্বাণপদের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহার কর্ম্মে বিধি নিয়মের আটক স্থাপন করিতে হয় না" এইরূপ বৌদ্ধগ্রন্থকারেরাও লিখিয়াছেন (মিলিন্দ-প্রশ্ন. ৪. ৫. ৭)। কৌষীতক্যুপনিষদে

* Epuicurus held the virtuous state to be "a tranquil, undisturbed, innocuous, noncompetetive fruition, which approached most nearly to the perfect happiness of the Gods", who "neither suffered vexation in themselves, nor caused vexation to others." Spencer's *Data of Ethics* p. 278; Bain's *Mental and Moral Science* Ed. 1875 p. 530. ইহাকেই Ideal Wise Man বলা হইয়াছে।

আত্মজ্ঞানী পুরুষকে "মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা কিংবা ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি পাপও স্পর্শ করে না" এইরূপ যাহা প্রতর্দনকে ইন্দ্র বলিয়াছেন (কৌষী. ৩. ১), কিংবা যাঁহার অহঙ্কারবুদ্ধি একেবারেই গিয়াছে, তিনি লোকদিগকে হত্যা করিলেও পাপপুণ্যে অলিপ্তই থাকেন (গী. ১৮. ১৭), এইরূপ গীতায় যে বর্ণনা আছে,—এই সকলের তাৎপর্য্যও ইহাই। (পঞ্চদশী ১৪. ১৬ ও ১৭ দেখ)। 'ধম্মপদ' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে এই তত্ত্বেরই অনুরূপ বাক্য দেওয়া হইয়াছে (ধর্ম্মপদ, শ্লোক ২৯৪ ও ২৯৫ দেখ)।* বাইবেলের নববিধানে "আমার নিকট সমস্তই (সমানই) ধর্ম্ম্য" এইরূপ যাহা খৃষ্টের শিষ্য পল বলিয়াছেন (১ করিং. ৬. ১২ ; রোম ৮. ২) এই বাক্যের অভিপ্রায় কিংবা যোহনের "যিনি ভগবানের পুত্র (পূর্ণ ভক্ত) হইয়া গিয়াছেন তাঁহার দ্বারা পাপ কখনই ঘটিতে পারে না" এই বাক্যের অভিপ্রায় আমার মতে এইরূপই (জন্. ১. ৩. ৯)। শুদ্ধ বুদ্ধিকে প্রাধান্য না দিয়া, কেবল বাহ্যকর্ম্মের দ্বারাই নীতিমত্তা নির্ণয় করিতে যাঁহারা শিখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই সিদ্ধান্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে ; এবং 'বিধিনিয়মের অতীত মনে করিয়া ভালমন্দকারী' এইরূপ নিজেরই মনের মতন কুতর্ক-পূর্ণ অর্থ করিয়া, কেহ কেহ "স্থিতপ্রজ্ঞের সমস্ত মন্দ কর্ম্ম করিবারও অধিকার আছে" এইরূপ উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের অর্থবিপর্য্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্ধ স্তম্ভ দেখিতে না পাইলে যেরূপ স্তম্ভের দোষ হয় না, সেইরূপ পক্ষাভিমানে অন্ধীভূত এই আপত্তিকারী উক্ত সিদ্ধান্ত ঠিক না বুঝিতে পারিলে তাহার জন্য সিদ্ধান্ত দোষী হইতে পারে না। কোন ব্যক্তির শুদ্ধবুদ্ধির পরীক্ষা প্রথমতঃ তাঁহার বাহ্য আচরণ দ্বারাই করিতে হয়, এই কথা গীতারও মান্য ; এবং এই কষ্টি-প্রস্তরে যিনি সর্ব্বথা সিদ্ধ হইতে এখনও পারেন নাই, সেই অপূর্ণাবস্থায় অবস্থিত লোকের প্রতি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিতে অধ্যাত্মবাদীও ইচ্ছা করেন না। কিন্তু কোন ব্যক্তির বুদ্ধি পূর্ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও নিঃসীম নিষ্কাম হওয়া সম্বন্ধে যেস্থলে তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না, সেস্থলে এই পূর্ণাবস্থায় উপনীত সৎপুরুষের কথা আলাদা হইয়া পড়ে। তাঁহার কোন কার্য্য লৌকিকদৃষ্টিতে বিপরীত দেখিতে হইলেও তত্ত্বত ইহাই বলিতে হয় যে, তাঁহার বুদ্ধির পূর্ণতা শুদ্ধতা ও সমতা প্রথম হইতেই স্থির থাকায় সেই কার্য্যের বীজ নির্দ্দোষই হইবে কিংবা তাহা শাস্ত্রদৃষ্টিতে কোন যোগ্য কারণ প্রযুক্তই ঘটিয়াছে, কিন্তু সাধারণ লোকদিগের কার্য্যের ন্যায় তাহা লোভমূলক কিংবা অনীতিমূলক হইতে পারে না। বাইবেলে লিখিত আছে যে, আব্রাহাম নিজের পুত্রকে বলি দিতে চাহিলেও পুত্র-হত্যাচেষ্টার পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই ; কিংবা বুদ্ধের শাপে বুদ্ধের শ্বশুর মরিলেও মনুষ্যহত্যার পাপ তাঁহাকে স্পর্শও করে নাই ; অথবা মাতৃবধ করিলেও পরশুরামের মাতৃহত্যা ঘটে নাই ; উপরোক্ত তত্ত্বই ইহার কারণ। "তোমার বুদ্ধি যদি পবিত্র ও নির্ম্মল হয় তবে ফলাশা না রাখিয়া কেবল ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে বধ করিলেও, পিতামহহত্যা কিংবা গুরুহত্যার পাপ তোমার হইবে না ; কারণ এই সময়ে, ঈশ্বরীয় সঙ্কেত সিদ্ধ করিবার পক্ষে তুমি কেবল নিমিত্ত-মাত্র হইয়াছ" (গী, ১১. ৩৩) ইত্যাদি গীতায় যে উপদেশ অর্জ্জুনকে দেওয়া হইয়াছে তাহারও তত্ত্ব ইহাই। ব্যব-হারেও আমরা ইহা দেখি যে, কোন লক্ষপতি কোন ভিখারীর নিকট হইতে দুই পয়সা কাড়িয়া লইলে লক্ষ-পতিকে চোর না বলিয়া, ভিখারীই কোন অপরাধ করা-তেই লক্ষপতি তাহাকে শাসন করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনা করা হয়। এই নীতিই আরও নিশ্চিতরূপে ও সম্পূর্ণরূপে স্থিতপ্রজ্ঞ, অর্হত ও ভগবদ্ভক্তদিগের আচরণসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ লক্ষপতির বুদ্ধিও কোন সময়ে বিচলিত হইতে পারে ; কিন্তু ইহা জানা কথা যে, স্থিতপ্রজ্ঞের বুদ্ধিকে এই বিকার কখনই স্পর্শও করিতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও যেরূপ পাপপুণ্য হইতে অলিপ্ত থাকেন, সেইরূপই এই ব্রহ্মভূত সাধুপুরুষের অবস্থা সর্ব্বদাই পবিত্র ও নিষ্পাপ থাকে। অধিক কি, সময়ে সময়ে এইরূপ ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাক্রমে যে আচরণ করেন তাহা হইতেই পরে বিধিনিয়মের নির্ব্বন্ধ প্রস্তুত হইয়া থাকে ; এবং সেই জন্য এই সৎপুরুষেরা এই বিধিনিয়মের জনক (উৎপাদক)— তাঁহারা ইহার গোলাম কখনই হইতে পারেন না, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ; প্রাচীনগ্রীক তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদিগেরও বলা হইয়া থাকে। শুধু বৈদিক ধর্ম্মে নহে, বৌদ্ধ ও

---

* কৌষীতক্যুপনিষদের বাক্য এই—"যো মাং বিজানীয়ান্নাস্য কেনচিৎ কর্ম্মণা লোকো মীয়তে ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া।" ধম্মপদের শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিয়ে।
রট্‌ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো ॥
মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ সোত্থিয়ে।
বেয়গ্ঘপঞ্চমং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো ॥

ধম্মপদের এই কল্পনা কৌষীতক্যুপনিষৎ হইতে গৃহীত, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থকার প্রত্যক্ষ মাতৃবধ, কিংবা, পিতৃবধ অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'মাতা'র তৃষ্ণা ও 'পিতা'র অভিমান অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মতে, এই শ্লোকের নীতিতত্ত্ব বৌদ্ধগ্রন্থকার-দিগের ঠিক জানা না থাকায়, তাঁহারা এইরূপ ঔপচারিক অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। কৌষীতক্যুপনিষদে "মাতৃবধেন পিতৃবধেন" ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্ব্বে, "বৃত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে বধ করিলেও আমার তাহাতে স্পর্শ হয় না" ইন্দ্র এইরূপ বলিয়াছেন ; ইহা হইতে প্রত্যক্ষ বধই এইস্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। ধর্ম্মপদের ইংরাজী ভাষান্তরে (S. B. E. Vol. X, pp. 70, 71) মোক্ষমুলর সাহেব এই শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহাও আমার মতে ভ্রান্তিমূলক।

খৃষ্টধর্ম্মেও এই সিদ্ধান্তই দেখিতে পাওয়া যায়; প্রাচীন গ্রীক্ তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদিগেরও এই তত্ত্ব মান্য হইয়াছিল; এবং আধুনিককালে কাণ্ট * স্বকীয় নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থে ইহাই উপপত্তি সহকারে সিদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছেন এই প্রকার নীতিনিয়মসমূহের চির-নির্ম্মল মূল উৎস কিংবা ঐ উৎসেরই অনুযায়ী যতই নির্দ্দোষ নিয়ম সকল স্থাপিত হউক না, নীতিশাস্ত্রের কিংবা কর্ম্মযোগশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব যাঁহারা আলোচনা করিতে চাহেন, এই মহানুভব ও নিষ্কলঙ্ক সিদ্ধপুরুষদিগের চরিত্রই তাঁহাদের সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক, ইহাও স্পষ্টই রহিয়াছে। এই অভিপ্রায়েই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদ্গীতায় প্রশ্ন করিয়াছেন যে,—"স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্" (গী. ২. ৫৪)—স্থিতপ্রজ্ঞের বলা, বসা ও চলা কিরূপ; অথবা "কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণান্ এতান্ অতীতো ভবতি প্রভো, কিমাচারঃ" (গী. ১৪. ২১)—পুরুষ ত্রিগুণাতীত কি প্রকারে হয়, তাহার আচার কি, এবং তাহাকে কিরূপে চেনা যায়। পোদ্দারের নিকট কেহ কোন সোনার গহনা পরোখ করিবার জন্য লইয়া আসিলে, সে নিজের দোকানে রক্ষিত এক শত টঞ্চের সোনার গহনার সহিত তাহার তুলনা করিয়া যেরূপ তাহার বিশুদ্ধতার পরিমাণ স্থির করে, সেইরূপ কার্য্যাকার্য্যের কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় করিবার পক্ষে, স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণই কষ্টিপাথর হওয়ায়, আমাকে সেই কষ্টিপাথরের পরিচয় করাইয়া দাও, গীতার উক্ত প্রশ্নের ইহাই ভিতরকার অর্থ। অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞ কিংবা ত্রিগুণাতীতের অবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সন্ন্যাসমার্গীয় জ্ঞানী-পুরুষের বর্ণনা, কর্ম্মযোগীর বর্ণনা নহে, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কারণ বলা হয় এই যে, সন্ন্যাসী পুরুষকে উদ্দেশ করিয়াই 'নিরাশ্রয়ঃ' (৪. ২০) এই বিশেষণ গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং ১২ অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ ভগবদ্ভক্তের বর্ণনা করিবার সময় 'সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী' (১২. ১৬) এবং 'অনিকেতঃ' (১২. ১৯) এইরূপ স্পষ্ট পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু নিরাশ্রয় কিংবা অনিকেত পদের অর্থ 'গৃহে না থাকিয়া বনে বনে ভ্রমণকারী' অর্থ বিবক্ষিত নহে; কিন্তু ইহার অর্থ "অনাশ্রিত-কর্ম্মফলং" (৬. ১) ইহারই সমানার্থক ধরিতে হইবে অর্থাৎ 'যাহারা কর্ম্ম ফলের আশ্রয় গ্রহণ করে না' অথবা "সেই ফলে যাহাদের মনের আস্থা নাই" এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। গীতার ভাষান্তরে শ্লোকসমূহের নীচে যে সব টিপ্পনী দিয়াছি, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। তা ছাড়া স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনাতেই উক্ত হইয়াছে যে, "তিনি ইন্দ্রিয়দিগকে নিজের অধীনে রাখিয়া, বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করেন" অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া থাকেন (গী. ২. ৬৪); এবং 'নিরাশ্রয়' পদ যে শ্লোকে আসিয়াছে সেইখানেই "কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ" অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি অলিপ্ত থাকেন, এইরূপ বর্ণনা আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে অনিকেতাদি পদ সম্বন্ধে এই নিয়মই প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, এই অধ্যায়ে প্রথমে কর্ম্মফল-ত্যাগের (কর্ম্মত্যাগের নহে) প্রশংসা করিবার পর (গী. ১২. ১২) ফলাশা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে যে শান্তি পাওয়া যায় তাহাই দেখাইবার জন্য পরে ভগবদ্ভক্তের লক্ষণসকল কথিত হইয়াছে; এবং সেইরূপই অষ্টাদশ অধ্যায়েও আসক্তিবিরহিত কর্ম্ম করিলে কিরূপে শান্তি পাওয়া যায় তাহা দেখাইবার জন্য ব্রহ্মভূত পুরুষের বর্ণনা পুনরায় আসিয়াছে (গী. ১৮. ৫০)। তাই, এই সমস্ত বর্ণনা শুধু সন্ন্যাসমার্গীয়দিগের বর্ণনা নহে, ইহা কর্ম্মযোগীদিগেরই বর্ণনা, এইরূপ স্বীকার করিতে হয়। কর্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞ এবং সন্ন্যাসী স্থিতপ্রজ্ঞ, এই উভয়ের ব্রহ্মজ্ঞান, শান্তি, আত্মৌপম্য ও নিষ্কাম বুদ্ধি, অথবা নীতিতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন নহে। উভয়ই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়ায় উভয়েরই মানসিক অবস্থা ও শান্তি একই প্রকার; কিন্তু তন্মধ্যে একজন শুধু এক শান্তিতেই নিমগ্ন থাকিয়া আর কিছুরই চিন্তা করেন না, এবং আর একজন ব্যবহারক্ষেত্রে নিজের শান্তির ও আত্মৌপম্য-বুদ্ধির যথাসম্ভব নিত্য উপযোগ করিয়া থাকে, কর্ম্মদৃষ্টিতে এই দুয়ের মহত্ত্বসম্বন্ধে এই পার্থক্য আছে। তাই ব্যবহারিক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনার কাজে, যাঁহার প্রত্যক্ষ আচরণকে প্রমাণ বলিয়া মানিতে হইবে, সেই স্থিত-

---

* "A perfectly good will would therefore be equally subject to objective laws (viz laws of good), but could not be conceived as *obliged* thereby to act lawfully, because of itself from its subjective constitution it can only be determined by the conception of good. Therefore *no imperatives* hold for the Divine will, or in general for a *holy* will; *ought* is here out of place, because the volition is already of itself necessarily in unison with the law." Kants' *Metaphysic of Morals*. p. 31 (Abbot's trans, in Kants' *Theory of Ethics*, 6th Ed.) নিৎসে কোন আধ্যাত্মিক উপপত্তিই স্বীকার করেন নাই; তথাপি স্বকীয় গ্রন্থে উত্তম পুরুষের (Superman) যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে উক্ত পুরুষ ভাল ও মন্দের অতীত এইরূপ তিনি বলিয়াছেন। তাঁর এক গ্রন্থের নামও *Beyond Good and Evil*।

প্রজ্ঞের কর্ম্ম করিতেই হইবে, কর্ম্মত্যাগী সাধু কিংবা ভিক্ষু এইস্থানে বিবক্ষিত হওয়া সম্ভব নহে, ইহাই ন্যায়ত পাওয়া যাইতেছে। কর্ম্মত্যাগের আবশ্যকতা নাই এবং কর্ম্ম মানুষকে ছাড়েও না; ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া কর্ম্মযোগীর ন্যায় ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে, সাম্যাবস্থায় রাখিবে, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাত্মক বুদ্ধিও সর্ব্বদা শুদ্ধ, নির্ম্মম ও পবিত্র থাকিবে, এবং কর্ম্ম-বন্ধনও ঘটিবে না,—গীতায় অর্জ্জুনকে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার সারই এই। এই কারণেই এই প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত শ্লোকে, "শুধু বাক্য ও মনের দ্বারা নহে, সমস্ত প্রত্যক্ষ কর্ম্মের দ্বারা যে ব্যক্তি সুহৃৎ ও হিতকারী হইয়াছেন তাঁহাকেই ধর্ম্মজ্ঞ বলিতে হইবে" এই ধর্ম্মতত্ত্ব বলা হইয়াছে। জাজলীকে এই ধর্ম্মতত্ত্ব বলিবার সময় তুল্যরূপে বাক্য ও মনেরই ন্যায়, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাহাতে, কর্ম্মেরও প্রাধান্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

নিরাশার আশা।

(শ্রীমতী অভ্ররেণু দেবী)

তোমার কথা হৃদয় আমার
ভরিয়ে দিল রে
কি এক গানে কি এক তানে
আমায় যেন কুড়িয়ে নিয়ে
ছড়িয়ে দিল রে;
উদাস প্রাণে আকাশ পানে, তাহার টানে
রইব চেয়ে
হাতের কাছে হাস্‌চ ভেবে হাত বাড়িয়ে
যাইনু ধেয়ে
কিন্তু শুধু শূন্য তোমা'
নিমেষমাঝে হরিয়ে লয়ে
সরিয়ে দিলরে।
ভাবনু আমি আসবে তুমি
এমনি—ত্বরিতে
বারেক শুধু ডাকলে বঁধু!
থামবে ঘাটে, তুলবে মোরে
তোমার তরীতে।
থাম্‌লে নাত, শুন্‌লে নাত, দেখলে নাত
চক্ষু তুলে
তোমার তরে এই যে আমি আপন ভুলে
বুক খুলে;
নিমেষ পরে উছল ধারা
স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিল
নৌকা ত্বরিতে।
চল্‌লে—নাহি আমার পানে
চাইলে ফিরিয়া
তোমার টানে আমার প্রাণে
জম্‌ল ব্যথা ঝর্‌ল বারি
নয়ন চিরিয়া;
ঊর্ম্মিরাশি, উজলহাসি' কইল আসি'
কলকলিয়ে
"কাঁদ্‌চ কেন? আন্‌ব তা'রে জোয়ার এলে
ছলছলিয়ে—"
আবার তুমি আসবে, আশা
রঙিন্ ফুলে সাজায় শুধি
আমায় ঘিরিয়া।

গ্রন্থ-পরিচয়।

ভাষা ও সুর।—কবিতা পুস্তক শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ বিরচিত। ইহাতে অনেকগুলি চতুর্দ্দশপদী কবিতা (Sonnets) আছে, সেগুলি মন্দ নয়, মাঝে মাঝে কবিত্বেরও আভাস পাওয়া যায়। লেখকের আদর্শ উচ্চ—তাঁহার কবিতাগুলিতে ভাবের প্রবাহ আছে। "বিরহসূচনা" "বর্ষারম্ভ" "তুমি" "কিছু নাই" "তপস্যা" "জোছনাতে" প্রভৃতি কবিতা আমাদের ভাল লাগিল। একটু নমুনা দিলাম:—

"বিশ্বপ্রেমে আজ বীণা, বাঁধ দেখি—পাস্ কিনা
সে অক্ষয় প্রেম!—
আবার আসিবে ফিরে, তোর এ জীবন ঘিরে
স্বস্তি, শান্তি, ক্ষেম।
তোর এ মলিন মুখে স্বর্গের আলোক সুখে
খেলিবে আবার,
আবার হাসিবে ধরা ফল-পুষ্প-শোভা-ভরা
—হৃদয় আমার!

শোক-সংবাদ।

৺হৃদয়নাথ চট্টোপাধ্যায়।—স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র এবং আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হৃদয়নাথ চট্টোপাধ্যায় বিগত ২৬শে শ্রাবণ বুধবার রাত্রি ২॥০টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একজন উৎসাহী ব্রহ্মপরায়ণ যুবক

ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বেহালার বঙ্গবিদ্যালয় ও তত্রস্থ ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন; ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ—

পদক ও পুরস্কার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তবিংশবার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক — প্রবন্ধের বিষয়

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ পদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক কাব্য ও নাট্যসাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (ক)—বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ।

৪। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৫। হেমচন্দ্র সুবর্ণ-পদক—মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ ও বৃত্রসংহার কাব্যের বৃত্রাসুরের তুলনায় সমালোচনা।

৬। শশিপদ রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।

৭। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

৯। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।

১০। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে 'শৈলজা' চরিত্র।

১১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যান ভাগ।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৪র্থ বিষয় পরিষদের সাধারণ ও ছাত্রসভ্যগণের জন্য, ৫ম বিষয় স্কুলকলেজের ছাত্রগণের জন্য এবং ৯ম ও ১০ বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। ১১শ বিষয়ে প্রবন্ধ আগামী পুজার ছুটির মধ্যে ও অন্যান্য প্রবন্ধ ৩১শে চৈত্র মধ্যে পরিষৎসম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। পরিষদের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,—কলিকাতা।
১৭ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩২৭।
সম্পাদক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিংশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৯১

৯২৮ সংখ্যা ১৮৪২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

“ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব ”

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

“শরতে”।

(শ্রীনির্ম্মলহাসিনী দেবী)

আজি! শরতের শুভ বিমল ঊষায়
সুধীরে মোহন করে
খুলিয়াছ প্রভো! স্বরগের দ্বার
নীলিমা পড়িছে ঝরে
উজল চন্দ্রমা হাসিছে গগনে
অগণিত তারা রাজি
জানিনা কোথায় মেঘমালাগুলি
সরায়ে ফেলেছ আজি!
গাহিছে পাপিয়া তরু শাখে বসি
মোহিয়া মোহন স্বরে
হাসিছে শেফালি বন আলো করি
সোহাগে পড়িছে ঝরে
শোভিছে কেমন শ্যাম প্রকৃতির
শ্যামল অঞ্চলখানি
সর্ব্ব বিশ্বে যেন শ্যাম স্নিগ্ধ শোভা
ঢেলেছ স্বকরে আনি
সকলি শ্যামল শ্যাম তরুলতা
শ্যামল ধরণী খানি
শ্যাম পত্রাঞ্চলে ঢাকিয়া বদন
হাসিছে কুসুম রাণী
যেদিকে ফিরাই মুগ্ধ আঁখি দুটী
হেরি নব্য নিরমল
শোভিছে তোমার শরতে প্রকৃতি
শান্ত স্নিগ্ধ অচঞ্চল
হেরি দয়াময় তোমার প্রকৃতি
হৃদি খানি হয় নত
আমারো প্রকৃতি করুণা করিয়া
কর শরতেরি মত।

১৭—ঈশ্বর বাহিরে ও অন্তরে।

(ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ জি ভাণ্ডারকর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ২ : ১৭

“যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বভুবনমধ্যে প্রবিষ্ট আছেন, যিনি ওষধীতে, যিনি বনস্পতিতে, তাঁহাকে বিনীতভাবে আমরা নমস্কার করি”।

পরমেশ্বরের প্রতাপ, তাঁহার সামর্থ্য, তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার উন্নতি, তাঁহার দয়া, তাঁহার বাৎসল্য, এই সমস্ত পদার্থ প্রকাশ করিতেছে। পূজা-বুদ্ধিসহকারে ঐ সমস্ত গুণ অবলোকন করিয়া, তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে আপন মনকে দৃঢ় করিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁহারি যোগে ক্ষুদ্র বৃহৎ হয়, দুঃখিত সান্ত্বনা পায়, ভয়-ভীত সাহস পায়, অনাশ্রিত আশ্রয় লাভ করে এবং পাপী শুদ্ধ হয়।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎসূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্।
মুণ্ডক ২।১।৭।

"ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, দিব্য, অচিন্ত্য, অতি সূক্ষ্মাপেক্ষাও সূক্ষ্ম, অতি দূর যে প্রদেশ তাহা অপেক্ষাও দূর স্থানে তিনি ভ্রমণ করেন, আমাদের নিকটেও আছেন, এবং তাঁহাকে যদি দেখিতে হয় তিনি আমাদের অন্তঃকরণরূপ গুহার মধ্যেই আছেন।"

পরমেশ্বরের নির্ম্মিত এই বিশাল বিশ্বের যদি আমরা ধ্যান করি, আকাশমধ্যে অসংখ্য কোটি দূর যে দেদীপ্যমান পরম বিস্তীর্ণ লোকমণ্ডল আছে এবং তাহার মধ্যস্থিত পরমেশ্বরের সামর্থ্য ও যোজনা যদি আমরা মনন করি, তাহা হইলে আমাদের অন্তঃকরণে, তাঁহার বৃহত্ব, তাঁহার অনন্ততা, তাঁহার অচিন্ত্য বৈভব ও অচিন্ত্য সামর্থ্য সম্বন্ধে গম্ভীর বিচার উদিত হইয়া আমাদের মনোবৃত্তিকে অত্যন্ত বিস্মিত করে আমাদের মনকে স্তম্ভিত করে; কিন্তু এইরূপ চিন্তায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকা সম্ভব নহে; এই বিচার মন হইতে বাহির হইয়া গিয়া মন আবার সংসারে দিকেই ধাবিত হয়। সংসার সম্বন্ধে আমাদের অনেক কর্ত্তব্য আছে, তাহা যথাযোগ্যরূপে আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হয় না। আমাদের অন্তঃকরণ পাপময় দুষ্ট বাসনায় ভরা, আমাদের বিবেক অনুসারে আচরণ করিবার সামর্থ্য নাই, আমরা দুর্ব্বল, সুখের পশ্চাতেই ধাবিত হই কিন্তু সুখ প্রাপ্ত হই না; উল্টা, দুঃখের প্রসঙ্গই অনেক প্রাপ্ত হই। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের অন্তঃকরণকে ধৈর্য্য, আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়া উত্তরোত্তর আমাদিগকে উন্নত দশায় লইয়া যাইবার জন্য পরমেশ্বর আছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের প্রভাব অসংখ্য যোজন দূরস্থ প্রদেশে প্রকাশিত, কিম্বা তিনি সেখানে আছেন, তাঁহার বৈভব অনন্ত এইরূপ জ্ঞান-বোধে ঐ ধৈর্য্য ও আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া আমাদের হৃদয় স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে না। তিনি নিকটে আছেন, আমাদের পিতা সুহৃদ আমাদের সম্মুখে আছেন, আমাদের অন্তঃকরণে আছেন এইরূপ জ্ঞানযোগেই আমাদের অন্তঃকরণ শান্তি-প্রাপ্ত হয়। অতএব তাঁহার এই সামীপ্যসান্নিধ্য সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতে হইবে। পরমেশ্বর আমাদের অন্তঃকরণে আছেন, সুতরাং আমাদের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত বাসনা ও কল্পনা তিনি অবগত আছেন। অন্য মনুষ্যের নিকট আমাদের নিন্দ্য আচরণ ও আমাদের কুৎসিত চিন্তা আমরা গোপন করিতে পারি, কিন্তু পরমেশ্বরের নিকট তাহা কিরূপে গোপন করা যাইতে পারে? তাঁহার নিকট কাপট্য চলিবে না, দম্ভ চলিবে না, প্রত্যেক মনুষ্যের যথার্থ স্বরূপ তিনি জানেন। কাপট্য ও দম্ভযোগে আমরা আপনাদিগকেই বিনষ্ট করি। নিষ্কপটভাবে আপন অন্তঃকরণকে মুক্ত করিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে আনিলে এবং বিনম্রভাবে তাঁহার স্তব ও প্রার্থনা করিলে যে সমাধান ও ভাল কাজ করিবার যে বল আমরা প্রাপ্ত হই, তাহা কপট ও দাম্ভিক ব্যক্তি কদাপি প্রাপ্ত হয় না।

১৮—ঈশ্বর ও ব্রহ্মপুরী।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥
মুণ্ডক, ২।২।৭

"যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকল বিষয়ই জানেন, যাঁহার এই মহিমা বিশ্বজগতে প্রকাশ পাইতেছে, সেই আত্মা আকাশের মধ্যে দিব্য ব্রহ্মপুরীতে বাস করেন"।

এই ব্রহ্মপুরীটি কি? এক আচার্য্য বলেন, আমাদের হৃদয়ই ব্রহ্মপুরী এবং তাহার মধ্যে যে অবকাশ বা আকাশ আছে সেইখানেই পরমাত্মা বাস করেন। কিন্তু শব্দের সরল অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাৎপর্য্য দেখিলে এইরূপ মনে হয় যে পরমেশ্বর যে স্থানে থাকেন, তাহা দিব্য, শুদ্ধ, আনন্দময়, অতি উন্নত, পরম মহৎ। আমরা মনুষ্য যেখানে থাকি সেই স্থান ক্ষুদ্র, ছোট, মলিন, পাপে এবং দুঃখকষ্টে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ আমরা যেখানে থাকি তাহা হইতে পরমেশ্বরের থাকিবার স্থান দেশতঃ দূর নহে, কিন্তু গুণতঃ দূর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, শুদ্ধ, মঙ্গলময়, অতি উন্নত; এই সকল গুণে তিনি পরিপূর্ণ, এইখানেই তিনি বাস করেন। তাঁহাকে দুঃখ পাপ মলিনতা ক্ষুদ্রতা এই সমস্ত

স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু অজ্ঞ, মলিন, পাপী দুঃখী ও ক্ষুদ্র—এই সকল গুণে আমরা পরিপূর্ণ, ইহাদের মধ্যেই আমরা বাস করি। তাই দিব্য ব্রহ্মপুরী শব্দটি রূপক। যদিও তিনি আমাদের নিকটে আছেন, তথাপি আমাদের পাপ, দুঃখ, অজ্ঞতা ও ক্ষুদ্রতার কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তিনি পৃথিবীতে থাকিলেও, আমাদের অন্তঃকরণে থাকিলেও নিত্য দিব্য ব্রহ্মপুরীতে তিনি বাস করেন।

১৯—ঈশ্বর শুদ্ধ।

সূর্য্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥

কঠ—৫; ১১।

"সর্ব্বলোকের চক্ষু অর্থাৎ আপনার আলোক দিয়া চক্ষুকে দর্শনসামর্থ্য প্রদান করে যে সূর্য্য, সেই সর্ব্বলোকচক্ষু সূর্য্য যেরূপ আপনার বাহিরের (বাহ্য) চাক্ষুষ দোষে (যথা, মলমূত্রাদি চক্ষুর দ্বারা আমরা যে সব খারাপ জিনিস দেখি) লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বভূতাত্মা একমাত্র পরমেশ্বর লোকের দুঃখ ও অন্যান্য দোষ হইতে মুক্ত হওয়ায় তাহাতে লিপ্ত হন না।"

অতএব যদিও আমাদের এই মলিন পাপপূর্ণ দুঃখময় সংসারের মধ্যে তিনি বাস করিতেছেন, তথাপি তিনি সতত শুদ্ধ, মঙ্গলস্বরূপ, আনন্দময়, শান্ত ও জ্ঞানময়।

২০—ঈশ্বর বাক্যমনের অতীত।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে।

কেন, ৩।

"পরমেশ্বরের যে ব্রহ্মস্বরূপ তাহা নেত্রের গম্য নহে, বাক্যের গম্য নহে, মনের গম্য নহে। তিনি অমুক প্রকারের এইরূপ আমরা জানি না, অতএব অন্যকে তাঁহার বিষয় কি করিয়া বুঝাইব, তাহা আমরা জানি না। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ তাঁহাকে আমরা জানি এরূপও নহে, জানি না এরূপও নহে। এই বিষয় ব্রহ্মস্বরূপের ব্যাখ্যা-কর্ত্তা পুরাতন ব্যক্তিদিগের মুখে আমরা শুনিয়াছি।"

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥

কেন, ১০।২।

"পূর্ণরূপে আমি ব্রহ্মকে জানি এরূপ আমি মনে করি না, আমি ব্রহ্মকে জানি না এমনও আমি মনে করি না। আমাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি এইরূপ মনে করেন যে,—ব্রহ্মকে আমি জানি না এরূপ আমি মনে করি না।"

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ বিজানতাম্॥

কেন, ১১।৩।

"আমি ব্রহ্মকে বুঝি নাই এইরূপ যিনি মনে করেন তিনি ব্রহ্মকে বুঝিয়াছেন, এবং আমি ব্রহ্মকে বুঝিয়াছি যিনি মনে করেন তিনি তাঁহাকে বুঝেন নাই। আমরা ব্রহ্মকে জানি এইরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন না, এবং জানি না যাঁহারা বলেন তাঁহারাই জানেন।"

পরমেশ্বর-তত্ত্বের মুখ্য চমৎকারিত্বই এই যে কোন মনুষ্যই এই তত্ত্ব জানিতে সমর্থ নহে। তথাপি তাহা মূলেই জানা যায় না এমনও নহে। যেখানেই যাই না কেন, যে কাজেই প্রবৃত্ত হই না কেন, এই তত্ত্ব সদাসর্ব্বদা আমাদের অন্তঃকরণের সম্মুখে প্রতিভাত হয় এবং আপনার আলোকের যোগে আমরা এক্ষণে যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থা ক্ষুদ্র নীচ অধম পাপী দুঃখী—এইরূপে জ্ঞান অন্তঃকরণের গূঢ় প্রদেশে উৎপন্ন করিয়া আমাদের প্রাণকে উৎকণ্ঠিত করে। উৎকণ্ঠা এই যে, এই শুদ্ধ আনন্দময় মঙ্গলময় জ্যোতিকে আত্মার মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আমাদের অবস্থা কি করিয়া উন্নত হইবে। যে ঈশ্বর-তত্ত্ব এইরূপ রমণীয় আকারে হৃদয়ের সম্মুখে প্রতিভাত হয় সেই তত্ত্বের পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ পরিচয় ও পূর্ণ সমাধান আমরা কখন প্রাপ্ত করিব, তাহার মধ্যে আমরা ব্যাপ্ত করিয়া, নিমগ্ন হইয়া, কবে আমাদের এই পাপের ও দুঃখের অন্ত হবে। [illegible]

মঙ্গলস্বরূপ, রম্য ও আনন্দময়, তিনি আমাদের সুহৃদ, আমাদের পিতা, তাঁহা ব্যতীত অন্যত্র আমাদের আত্মার বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই, সুখ নাই—এইরূপ তাঁহার বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে সহজভাবেই উদিত হয়। এবং যখন আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখনও বিলক্ষণ সামর্থ্য এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি করিতেছে, সেই সামর্থ্য যোজনাকুশল, তাহা জ্ঞানময়, তাহা উত্তরোত্তর অধিকাধিক সত্ত্ব ও শুভ উৎপন্ন করিতেছে তাহা দয়াশালী, কল্যাণকারক ইত্যাদি জ্ঞান হয়। অতএব পরমেশ্বরের তত্ত্ব সর্ব্বথা অগম্য, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না—এই-যে পক্ষ কতকগুলি আধুনিক পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন তাহা সত্য নহে। পরমেশ্বর সম্বন্ধে আমাদের তিলমাত্র জ্ঞান নাই—ইহা সত্য হইলে আমাদের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হইবার সম্ভাবনা থাকে না; আমাদের অন্তঃকরণে, অনেক সাংসারিক সংকটের মধ্যে ধৈর্য্য, আশ্বাসন, আশাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পুণ্য কর্ম্ম করিবার উৎসাহ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধাবান তাঁহাদের আবার উল্টা প্রকারের ভ্রম হয়। পরমেশ্বরের তত্ত্ব দুরধিগম্য, অনন্ত, অনাদি, তাঁহার লীলা অচিন্তনীয়,—এই কথা তাঁরা বিস্মৃত হন। এবং সর্ব্ব প্রকারে মনুষ্যের ন্যায় তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া, তাঁহার অমুক এক স্ত্রী আছে, তিনি তাঁহার সঙ্গে নানা প্রকার বিলাস করেন, বৈকুণ্ঠ নামক এক পুরী আছে তাহাতে তিনি বাস করেন, এই প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। কিংবা কখনও পশু অথবা অন্য অবোধ প্রাণী কিংবা বনস্পতি কিংবা কাষ্ঠ পাষাণের সাদৃশ্য তাঁহার প্রতি আরোপ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সমস্তই মিথ্যা; কারণ,

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
কেন, ৪।

"বাক্য যাঁহাকে বর্ণনা করিতে অসমর্থ, কিন্তু যাঁহার সামর্থ্যে বাক্য উচ্চারিত হয় তিনি ব্রহ্ম এইরূপ তুমি জানিবে; লোকে যাহার উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।"

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
কেন, ৫।

"যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করিবার কোন মনুষ্যের সামর্থ্য নাই, কিন্তু যাঁহার সামর্থ্যে মন মনন করে এইরূপ কথিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম এইরূপ তুমি জানিবে; লোকে যাহার উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।"

এইরূপ মনুষ্য, পশু, বনস্পতি,—ইহারা পরমেশ্বর নহে; তাই, তাহাদের উপাসনা করিলে পরমেশ্বরের উপাসনা হয় না। এই প্রকার উপাসনার দ্বারা আমরা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হই, এবং সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে যে অনিষ্ট পরিণাম হয় তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। যাহার উপাস্য দেবতা ক্ষুদ্র, তাহার প্রতি যাহার ভক্তি সেই মনুষ্যের আত্মার অবস্থা উন্নত হওয়া অসম্ভব। মনুষ্য পশু প্রভৃতিকে দেবতা কল্পনা করিয়া তাহাদের স্থানে আপনার বুদ্ধিকে নিমগ্ন করিলে, বাক্যের অগোচর এইরূপ যে মাহাত্ম্য, এইরূপ যে আনন্দ ও মঙ্গলভাব, তাহা আমাদের অন্তরে কিরূপে উদয় হইবে? এবং দুর্ব্বল ও মনঃকল্পিত যে-দেবতা তাহা হইতে আমাদের কল্যাণ হওয়া সম্ভব নহে। আমাদের উপাস্য দেবতা পরম-সমর্থ না হইলে তিনি আমাদিগকে সংকট হইতে কিরূপে উদ্ধার করিবেন? তিনি পরম মঙ্গলবিধান না হইলে আমাদের পাষাণময় অন্তঃকরণের মধ্যে মৃদুতা উৎপন্ন করিয়া, সেই অন্তঃকরণকে পরমার্থের দিকে লইয়া গিয়া, মন্দ সংস্কার বিনষ্ট করিয়া, তাহার মধ্যে শুদ্ধ সংস্কার কি করিয়া উৎপন্ন করিবেন? তাৎপর্য্য—দুর্ব্বল, অপূর্ণ দেবতার উপাসনা করিলে মানব-আত্মার গতি কুণ্ঠিত হয়।

যাহারা মূর্ত্ত পদার্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করে তাহাদের মধ্যেও এই দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। সাকার মনুষ্যের ভজন পূজন না করিলেও তাহারা মনুষ্যের ঈর্ষ্যা অসূয়া দ্বেষ ইত্যাদি ধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করিয়া থাকে; সবশুদ্ধ তাহাদের উপাস্য দেবতা সশরীর মনুষ্য না হইলেও, রাজস ও তামস বৃত্তিবিশিষ্ট মানবাত্মা মাত্র। ইহা হইতেও

উপরে লিখিত অনুসারে অনিষ্টপরিণাম ঘটিয়া থাকে, এবং তামসী পরমেশ্বরের ভক্ত তামসী হয়, ইহার উদাহরণ সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু এইরূপ মনুষ্যের দোষ পরমেশ্বরের প্রতি আরোপ না করিলেও, পরমেশ্বরের তত্ত্ব পরম গম্ভীর ও গুহ্য এই কথা বিস্মৃত হইলে সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমাদের ধর্ম্ম ও আমাদের সাধনা মন্দ ও বিকল হইয়া পড়ে। পরমেশ্বর কোন এক মানব সুহৃদের মতো হইয়া পড়েন। যাহা হওয়া উচিত সেরূপ পূজ্য-বুদ্ধি তাঁহার প্রতি থাকে না। ভক্তি ও বিশ্বাস যেরূপ গম্ভীর হওয়া উচিত সেরূপ হয় না; তাঁহার প্রতি অতি বিনম্রভাব হওয়া চাই। তাহা হৃদয়ে উদিত হয় না। এবং যেন আমরা তাঁহার সবতত্ত্ব বুঝিয়াছি এইরূপ মনে করিয়া আমরা কোন প্রকার সন্দেহ মনে না আনিয়া গর্ব্বের সহিত ও দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্মাচার্য্যের অভিমান হৃদয়ে পোষণ করি এবং তাহার পর, দেবতার দাসের মধ্যে থাকা যা অবাঞ্ছনীয় এইরূপ দোষ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া অন্যকে মুক্তির পন্থা দেখাইবার ভাণ করিয়া আমরাই তাহা হইতে বঞ্চিত হই। কিন্তু তাঁহার লীলা অচিন্তনীয়, আমরা কখনই তাহার পারে যাইতে পারি না। অনন্ত তাঁহার মহিমা; যিনি অসংখ্য সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ড গোলক নির্ম্মাণ করিয়া আকাশে লটকাইয়া রাখিয়াছেন, অচিন্তনীয় তাঁহার সামার্থ্য, অগাধ তাঁহার যোজনা। যিনি এই সমস্ত পরস্পর-সম্বন্ধ স্থির রাখিয়াছেন; যিনি জল ও মৃত্তিকা হইতে বনস্পতি উৎপন্ন করিয়া প্রাণীদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, যিনি অণুরেণু হইতে মনুষ্যদেহের ন্যায় আশ্চর্য্য দেহ উৎপন্ন করিয়া বর্দ্ধিত করিতেছেন—এইরূপ মনুষ্যদেহ যে,—যাহা এক এক বিন্দুর মধ্যে পরম গুহ্য ব্যাপার চালাইয়া, আহার, পান, ভ্রমণ করা, জ্ঞানলাভ করা, নানা প্রকার উদ্দেশ্য মনে আনিয়া তাহা সফল করিবার চেষ্টা করা, ইত্যাদি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়;—না, তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান আমাদের কখনই হইবার নহে। কোথায় তাঁহার মহিমা আর কোথায় আমি এই ক্ষুদ্র প্রাণী—এই প্রকার বিচার মনের মধ্যে সতত চলিতে থাকিলে, আমাদের প্রার্থনাদি বাহ্য কার্য্যের দ্বারা পরমেশ্বরের সহিত আমরা যে অতিপরিচয় করিয়া থাকি সেই অতিপরিচয় যোগে আমাদের পূজ্য-বুদ্ধি হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই হয়; আমাদের জ্ঞান-সম্বন্ধে আমাদের গর্ব্ব না হইয়া মনে নম্রতা আসে; এবং যিনি অনন্ত অপরিজ্ঞেয় পরমপুরুষ তিনি আমাদের দয়াল প্রভু, তিনি আমাদের বৎসল পিতা, প্রেমময় সুহৃদ্; এই কারণে, কোন দুঃখ ও সংকট প্রাপ্ত হইলেও—আমি অজ্ঞান প্রাণী সে সম্বন্ধে তাঁহার দোষ দেওয়া আমার উচিত হয় না, আমি ঐ দুঃখের তত্ত্ব ঠিক বুঝি না—এই কথাই ঠিক; সেই অনন্ত পুরুষের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে কোন "কিন্তু" আমি মনে আনি না; আরও বেশী সংকটে আমাকে ফেলিলে তবুও আমি আক্ষেপ করি না; এবং সম্পূর্ণরূপ আমার সমস্ত আত্মাকে তাঁহার অধীন করি।—এই প্রকারের উচ্ছ্বাস অন্তঃকরণে সমুত্থিত হইয়া, আমাদের বিশ্বাস ও আমাদের ভক্তি গভীরতা লাভ করে।

গানে-গানে-গানে।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

রাগ বসন্ত—তেওরা।

দিবস-যামি রইতে দাও
গানে-গানে-গানে
সকল বোঝা বইতে দাও
গানে-গানে-গানে!
দুঃখ যেদিন দারুণ হবে
ঝঞ্ঝা-মেঘের বার্ত্তা ক'বে—
সে দুঃখ-রাতে রইতে দাও
গানে-গানে-গানে!
সকাল সাঁঝে রইতে দাও
গানে-গানে-গানে
সকল কাজে রইতে দাও
গানে গানে-গানে!
বাজুক্ রে গান বিশ্বজুড়ে
স্থলে জলে হৃদয়পুরে
সকল কথা কইতে দাও
গানে-গানে-গানে॥

পরহিতব্রত

পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ও শেষ)

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিষ্টার ইয়ংএর সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তেজস্বী বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। বিখ্যাত পণ্ডিত ই, বি, কাউয়েল মহোদয় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের কার্য্যের উপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন। প্রসন্নকুমারের বিবিধ গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া মহাত্মা কাউয়েল তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। প্রসন্নকুমারের একটি ইংরাজী প্রস্তাব সম্বন্ধে অধ্যক্ষ কাউয়েল কিরূপ উচ্চমত পোষণ করিতেন তাহা সার গুরুদাসের উক্তি হইতে পূর্ব্বেই পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। প্রসন্নকুমার সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী বিভাগে নানা উন্নতি সাধিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথমবারের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রসন্নকুমারের ছাত্রগণ এরূপ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিল যে সংস্কৃত কলেজের এবং শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ মুক্তকণ্ঠে প্রসন্নকুমারের প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের ঐকান্তিক চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজে এফ-এ ও বি-এ পড়াইবার ব্যবস্থা হয় এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরম স্নেহভাজন ছাত্র, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রথম বি এ উপাধি লাভ করেন। ইঁহার পর শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসন্নকুমারের অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ যে ইংরাজী বিদ্যায় এরূপ পারদর্শী হইবেন ইহা প্রসন্নকুমারের সংস্কৃতকলেজে আগমনের পূর্ব্বে কেহ স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই।

স্বয়ং প্রতীচ্য বিদ্যার অমূল্যরত্নের অধিকারী হইয়া প্রসন্নকুমার চিরদিনই স্বদেশবাসীর মধ্যে অকাতরে এই রত্ন বিতরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার আয় যৎসামান্য, তখনও উহার অনেকাংশ তিনি দরিদ্র বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য নিয়োজিত করিতেন। বৃত্রসংহারের মহাকবি হেমচন্দ্র, যিনি উত্তরকালে হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া "হপ্তায় হাজার দিতেন ব্যাঙ্কের খাতায়" তিনি বাল্যকালে প্রসন্নকুমারের স্নেহ ও অর্থসাহায্য না পাইলে দারিদ্র্যচক্রের নিষ্পেষণে কি হইতেন তাহা বলা যায় না। হেমচন্দ্রের ন্যায় কত বালক যে প্রসন্নকুমারের সাহায্য লাভ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। প্রসন্নকুমারের সমসাময়িক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলেন যে তাঁহার হিসাবের খাতা অতি চমৎকার ছিল। তাহাতে নিজের সংসার খরচ অতি সামান্যই লিপিবদ্ধ হইত, উহার অধিকাংশ স্থানই দরিদ্র ছাত্র এবং অনাথা বিধবাগণকে প্রদত্ত দানে পরিপূর্ণ থাকিত।

আজিকালি স্বদেশসেবার অর্থ নিজগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করা। ম্যালেরিয়ায় নিজগ্রাম উৎসন্ন যাউক তাহাতে দৃষ্টিপাত করিবে না, রাজধানীতে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে হইবে "ম্যালেরিয়া দূর কর, ম্যালেরিয়া দূর কর।" শিক্ষাবিস্তারের জন্যও এইরূপ চীৎকার করা এবং গভর্ণমেন্ট অধিকতর অর্থ সাহায্য করিতেছেন না বলিয়া অনুযোগ করাই আমরা স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করি। প্রসন্নকুমার এরূপ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না। তিনি 'বাক্যবীর' ছিলেন না, কর্ম্মবীর ছিলেন। গভর্ণমেন্টকে বা সাধারণকে জানাইয়া দান করিয়া আপনার নাম বিঘোষিত করিবার চেষ্টা তিনি কখনও করেন নাই। পরোপকার করা তিনি তাঁহার ধর্ম্ম বলিয়া মানিতেন এবং চিরদিন যথাসাধ্য তিনি পরোপকারব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তিনি একশত টাকা মাসিক বেতনে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বৎসর—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তিনি দুইশত টাকা বেতনে সংস্কৃতকলেজের ইংরাজী বিভাগের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নকুমার বহুদিনপোষিত একটি বাসনা চরিতার্থ করিবার উপায় দেখিতে পাইলেন। তিনি বহুদিন হইতে নিজগ্রাম খানাকুল কৃষ্ণনগরে সংস্কৃতকলেজের

আদর্শে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া দেশের একটি প্রধান অভাব দূর করেন। এই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি স্বয়ং সানন্দে বহন করিতেন। বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বলিলে ঠিক বলা হয় না—অনেক সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরও ব্যয়ভার বহন করিতে হইত। হিন্দু পেট্রিয়টের স্বনামধন্য সম্পাদক রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর একস্থানে লিখিয়াছেন যে অনেক স্থলেই দরিদ্র ছাত্রগণকে প্রসন্ন বাবু যে কেবল বিনাবেতনে তাঁহার বিদ্যালয়ে পড়াইতেন তাহাই নহে, তাহাদের পুস্তক কাপড় প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দিতেন এবং বর্ষাকালে পাথেয়ও দিতেন। এই বিদ্যালয় "প্রসন্ন বাবুর বিদ্যালয়" নামে সাধারণ্যে পরিচিত ছিল। প্রসন্নকুমার কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রথিতনামা শিক্ষকগণকে এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র কৃতিত্ব প্রদর্শন করিত প্রসন্নকুমার তাহাদিগকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া নিজব্যয়ে তাহাদিগের উচ্চতর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেন। দ্বারকেশ্বর নদীর তটভূমিতে অবস্থিত প্রসন্নকুমারের সেই সুসজ্জিত বিদ্যালয়ভবনে উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রভৃতি মনীষিগণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন। গ্রীষ্মাবকাশে বিদ্যালয়ে অবকাশ ছিল না, কারণ সেই সময়ে প্রসন্নকুমার স্বয়ং ছাত্রগণকে পড়াইতেন। তাঁহার এই বিদ্যালয় অল্পদিনেই একটি আদর্শ বিদ্যালয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া একবার নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু এইরূপ সাহায্য গ্রহণ করিলে গবর্ণমেণ্টের নিয়মের অধীন হইয়া বিদ্যালয় পরিচালিত করিতে হইবে বলিয়া স্বাধীনপ্রকৃতি প্রসন্নকুমার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

আজি দ্বারকেশ্বর প্রসন্নকুমারের সেই বিদ্যালয়গৃহ গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু বহুবৎসরকাল উহা শিক্ষাপ্রয়াসব্রত, পরোপকারী পণ্ডিত প্রসন্নকুমারের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বিরাজিত ছিল এবং উহার ইতিহাস চিরদিন তাঁহার দেশবাসীর অন্তরে এক গৌরবময় স্মৃতি জাগরিত করিবে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা কাউয়েল ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে প্রসন্নকুমার সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন। বলা বাহুল্য এই পদের জন্য তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি অতি অল্পই ছিল। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের মহত্তম গৌরবের দিন গিয়াছে। দর্শনাধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি অলঙ্কারশাস্ত্রাধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, সাহিত্যাধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ব্যাকরণাধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সানন্দে প্রসন্নকুমারের নেতৃত্বে কার্য্য করিয়া সংস্কৃতকলেজের সুনাম ও গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার কায়স্থবংশসমুদ্ভূত হইলেও এই সকল দেশবিখ্যাত ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন, কারণ প্রসন্নকুমারে মহাভারতোক্ত ব্রাহ্মণের গুণগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল—

> জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ
> কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

এই সময়ে একটি ভয়ানক পারিবারিক দুর্ঘটনায় প্রসন্নকুমার অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। একদিন অকস্মাৎ বিসূচিকারোগে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী দেহত্যাগ করেন। ইনি হরিপালনিবাসী হলধর ঘোষের কন্যা, এবং অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা, পতিব্রতা ও গুণবতী রমণী ছিলেন। ইঁহার গর্ভে প্রসন্নকুমারের একটি মাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের অন্যতম প্রিয় শিষ্য আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলেন যে প্রসন্নকুমারের পত্নীবিয়োগ হইলে কৃষ্ণকমল শ্মশান পর্য্যন্ত তাঁহার শবের অনুগমন করিয়াছিলেন। পত্নীবিয়োগে প্রসন্নকুমারকে নিরতিশয় কাতর দেখিয়া তাঁহার কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে সান্ত্বনালাভের জন্য কিছুদিন স্থানান্তরে যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কর্ম্মব্রত প্রসন্নকুমার তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"উহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল"—এবং কর্ম্মেই,

তিনি যথার্থ সন্তোষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার একদিকে যেমন কুসুমাপেক্ষা কোমল ছিলেন, অপরদিকে তিনি বজ্রাদপি কঠিন ছিলেন। দরিদ্র ও বিপন্নের দুঃখে যেমন তিনি বিগলিতহৃদয় হইতেন, অন্যায়ের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার সময় তিনি সেইরূপ কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্ব ও স্বাধীন প্রকৃতির একটি প্রকৃষ্ট পরিচয় এইবার আমরা প্রদান করিব।

সেকালে প্রেসিডেন্সীকলেজের স্বতন্ত্র গৃহ না থাকায় সংস্কৃত কলেজ গৃহের একাংশেই উক্ত কলেজ অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত কলেজ গৃহের দ্বিতলে একটি প্রশস্ত গৃহে অনেক দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুঁথি রক্ষিত হইত। পৃথিবীর আর কোথাও এইরূপ বহুমূল্য সংস্কৃত পুঁথির সংগ্রহ ছিল না এবং প্রসন্নকুমার উহা অমূল্যরত্নজ্ঞানে অতি যত্নে তাহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিষ্টার সাটক্লিফের সংস্কৃত কলেজের এই প্রশস্ত গৃহটীর প্রতি লোভ হইল। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে সংস্কৃত পুঁথিগুলি নীচের একটি ঘরে রাখা হউক এবং উপরের প্রশস্ত গৃহটী প্রেসিডেন্সী কলেজের ব্যবহারার্থ প্রদত্ত হউক। অবশ্যই প্রসন্নকুমার ঘোর আপত্তি করিলেন। তিনি বুঝাইলেন যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে সকল প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নতলে রাখিলে উহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু সাটক্লিফ তাঁহার যুক্তিতর্ক শুনিলেন না। তিনি শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ (Director) এটকিন্সনের সহিত কৌশল করিয়া ছোটলাট স্যর সিসিল বীডনকেও হস্তগত করিলেন। আদেশ হইল সংস্কৃত পুঁথিগুলি নিম্নতলস্থ একটি কক্ষে রক্ষিত হইবে। বহুমূল্য প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিগুলি অযত্নের সহিত নিম্নতলস্থ গৃহে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়া প্রসন্নকুমার আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি তদ্দণ্ডেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দুর্লভ পদ ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টে পত্রপ্রেরণ করিলেন। প্রসন্নকুমারের আর কোন বিশেষ আয় ছিল না, পক্ষান্তরে এই চাকুরীলব্ধ আয় (তখন মাসিক ২৫০৲) হইতে তাঁহার আশ্রিতগণকে এবং প্রাণতুল্যপ্রিয় স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়টি রক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই ত্যাগের মূল্য যে কত তাহা আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি এবং তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি ও বিরাট মনুষ্যত্বের নিকট আমাদের হৃদয় সহজেই শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে অবনত হইয়া পড়ে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৪ শে এপ্রিল দিবসে প্রসন্নকুমার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিলে উক্ত কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী বিষাদসাগরে নিমগ্ন হন। প্রসন্নকুমারের অনুপস্থিতিতে সংস্কৃত কলেজে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। তদানীন্তন ছোটলাট স্যর সিসিল বীডন প্রসন্নকুমারকে তাঁহার পদত্যাগের পত্রখানি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু প্রসন্নকুমার নিজ মত অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট প্রেসিডেন্সী কলেজের দুইজন নবীন অধ্যাপককে সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষের কার্য্যভার প্রদান করিলেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান—মিঃ সণ্ডার্স—তিনিও কলেজে শৃঙ্খলাস্থাপন করিতে অকৃতকার্য্য হইলেন। এই সময়ে পুণ্যস্মৃতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্যর সিসিল বীডনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। অন্যান্য কথার পর সংস্কৃত কলেজের কথা উঠিল। স্যর সিসিল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নূতন ব্যবস্থানুসারে সংস্কৃতকলেজের উন্নতি হইয়াছে—সে সম্বন্ধে তিনি কোন সংবাদ রাখেন কি না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "আপনাদের ব্যবস্থায় আমার একটি গল্প মনে পড়িল। কোন বিলাসী ধনী তাঁহার বাটীতে গান করিবার জন্য কোন কর্ম্মচারীকে আদেশ দেন একটী সুন্দরী ষোড়শী গায়িকা লইয়া আইস। অনেকক্ষণ পরে সেই কর্ম্মচারী দুইটী আটবৎসর বয়স্কা বালিকা লইয়া উপস্থিত হইয়া প্রভুকে বলিল যে ষোড়শবর্ষীয়া একটি সুন্দরী গায়িকা না পাওয়ায় দুইটী আট বৎসর বয়স্কা বালিকা আনিয়াছি। সংস্কৃতকলেজের একজন অভিজ্ঞ অধ্যক্ষকে অপসারিত করিয়া দুইজন নবীন অধ্যাপককে উহার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার প্রদান করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। সংস্কৃত

কলেজে বাস্তবিকই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে।” অতঃপর স্যার সিসিল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন যে, কোন প্রকারে প্রসন্নকুমারকে তিনি পুনরায় কর্ম্মগ্রহণ করিতে স্বীকার করাইতে পারিলে তিনি আনন্দিত হইবেন। প্রসন্নকুমার পুনরায় অনুরুদ্ধ হইলে তিনি এই সর্ত্তে পুনরায় কর্ম্ম গ্রহণ করিবার স্বীকার করিলেন যে হয় পুঁথি রক্ষার্থ সংস্কৃতকলেজ ভবনের দ্বিতলের প্রশস্ত কক্ষটি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে নতুবা দ্বিতলে একটি নূতন পুস্তকাগার নির্ম্মিত করিয়া দিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট প্রসন্নবাবুর সর্ত্তে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতকলেজ গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম কোণে দুইটা প্রশস্ত কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি প্রসন্নকুমারকে পুনর্নিযুক্ত করিবার সময় বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী সাহিত্যিক ও পরিহাসরসিক স্যার এশলি ইডেন শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন “Now that the *'battle of books'* is ver, Babu Prasannakumar may be reappointed &c.”

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর প্রসন্নকুমারের পুনর্নিয়োগে সকলেই আনন্দিত হইলেন। এই উপলক্ষে সংস্কৃতকলেজের ছাত্রগণ সণ্ডর্স সাহেবের সমক্ষেই উল্লাসধ্বনি করিতে করিতে মহাসমারোহে 'হরির লুট' দিয়াছিলেন এবং খানাকুল কৃষ্ণনগরের বিদ্যালয় শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিবিধ আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। সেদিন প্রসন্নকুমারের অসংখ্য ভক্তের আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

ইহার পর তেজস্বী প্রসন্নকুমারের নির্ভীক স্বাধীন অভিমত চিরদিন গভর্ণমেণ্ট যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উড্রো প্রভৃতি চিরঃস্মরণীয় শিক্ষাধ্যক্ষগণ মুক্তকণ্ঠে প্রসন্নকুমারের কার্য্যের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। শিক্ষাবিভাগে উত্তরোত্তর প্রসন্নকুমারের পদবৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে তাঁহার বেতন মাসিক ৩০০৲ টাকা, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে তাঁহার বেতন ৫০০৲ টাকা; ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে তাঁহার বেতন ৫৫০৲ টাকা এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে তাঁহার বেতন ৬০০৲ টাকা হয়। সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষের এত বেশী বেতন প্রদত্ত হইবে না বলিয়া 'কাগজে কলমে' ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে তিনি রাজশাহী বিভাগের প্রতিনিধি ইনেস্পেক্টর পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ৬০০৲ টাকা বেতন হইবার পর আর তাঁহাকে সংস্কৃতকলেজে রাখা হইল না। ১৮৭৭ সালের ২১শে মার্চ্চ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রসন্নকুমার বহরমপুরের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। উক্ত বৎসর ১৪ই মে তারিখ হইতে প্রসন্নকুমার বেঙ্গল এডুকেশন্যাল সার্ভিসে ৩য় শ্রেণীতে উন্নীত হন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুন দিবসে ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজে সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রসন্নকুমার রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমারের পিতৃবিয়োগ ঘটে, এ কথা যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর পরিচয়-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রসন্নকুমার পিতৃবিয়োগে অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। তিনি মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ এই শ্রাদ্ধসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। দীনদরিদ্রকে প্রসন্নকুমার এই উপলক্ষে অকাতরে অর্থ ও অন্নবস্ত্র দান করিয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমারের প্রথমা পত্নী একটিমাত্র কন্যা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পিতৃবিয়োগের কিছুকাল পূর্ব্বে প্রসন্নকুমার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এইবার বলো-বেলমুড়া নিবাসী রায় বিশ্বম্ভর সিংহ মহাশয়ের কন্যা সুরঙ্গিনী দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। প্রসন্নকুমার তাঁহার এই পত্নীকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সুরঙ্গিনী দেবী প্রণীত তারাচরিত নামক গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রটী উদ্ধারযোগ্য :—

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী
মহাশয় করকমলেষু—

স্বামিন্,

আমার যে লেখাপড়া শিক্ষা হওয়া তাহা আপনার

যত্নেই হইয়াছে। আপনি যত্ন না করিলে আমার বিদ্যা শিক্ষা হওয়া ভার হইত। আমার বিদ্যাচর্চ্চা দেখিয়া আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ইহাতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হই। একদা তারাবাই নামক নাটক খানি আমি পাঠ করিতেছি দেখিয়া আপনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কেমন পড়িলে! আমি বলিলাম যে গ্রন্থকার যদি নাটক না লিখিয়া আখ্যায়িকা লিখিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। আমি বলিবামাত্র আপনি বলিলেন যে তুমিই কেন লেখ না। শুনিয়া আকাশ পাতাল ভাবনা হইল। মনে করিলাম যে আমাকে অধমা নারী ভাবিয়া তামাসা করিলেন। কি করি ভাবনা প্রবল হইল। এদিকে স্বামি-বাক্য অলঙ্ঘনীয় ভাবিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। লেখা সমাপ্ত হইলে আপনাকে শুনাইলাম। শুনিয়া আপনি আহ্লাদিত হইলেন। তাহাতেই আমি স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম। এতদিনে আমার বিদ্যাশিক্ষা সার্থক হইল। এখন আপনার হস্তে আমার এই তারাকে অর্পণ করিলাম। আপনার চরণে স্থান পাইলেই যথেষ্ট হইবে। আমার আশা মহৎ হইল বটে, কিন্তু কি করি। সমুদ্রে সকল নদীই যায়, কেহই ত বিমুখ হয় না, আমি সেই ভাবিয়া অগ্রসর হইলাম। ইতি

১৫ই আশ্বিন ১২৮১ সাল।	নিয়ত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিনী শ্রীমতী সুরঙ্গিণী।

প্রসন্নকুমারের এই দ্বিতীয়া বিদুষী ও সাধ্বী পত্নীর গর্ভে তাঁহার তিন কন্যা ও এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। কন্যাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা জ্যোতিষ্মতীর সহিত শোভাবাজারের বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ও পরমবন্ধু রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীমতী রাণী জ্যোতিষ্মতী দেবী সাতিশয় বুদ্ধিমতী ও বিদুষী রমণী। ইনি অনেকগুলি সুন্দর কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের চিরপ্রসিদ্ধ সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইঁহার সন্তানগণও পিতা ও মাতামহের বিনয় ও বিদ্যার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

প্রসন্নকুমার তাঁহার বহুকষ্টার্জ্জিত পেন্সন অধিককাল ভোগ করিতে পারেন নাই। ২০ মাস পেন্সন ভোগ করিতে না করিতেই ৬২ বৎসর বয়সে (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর, বাঙ্গালা ১২৯৩ সাল ২০ শে কার্ত্তিক) জগদ্ধাত্রী পূজার দিন দিবা ৪টা ৪০ মিনিটের সময় নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়।

প্রসন্নকুমার বহুগুণের আধার ছিলেন। তাঁহার তুল্য বিনয়ী, নিরহঙ্কার, ধর্ম্মভীরু, অমায়িক ও সদালাপী ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি অকৃত্রিম স্বদেশবৎসল ছিলেন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিকল্পে চিরদিন নীরবে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁহার বিন্দুমাত্র পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল না। সর্ব্বশাস্ত্রেই তাঁহার সমান অধিকার ছিল। তিনি ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপনা করিলেও, সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় পণ্ডিত ছিলেন এবং গণিতশাস্ত্রে এতদূর তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল যে এক সময়ে কিছুকাল উক্ত শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও এম-এ পরীক্ষার্থীকে দুরূহ বিষয়ে উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতীত হয় যে তিনি চিরদিন বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন। তিনি কিরূপ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং মাতৃভাষার উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে তিনি কি করিয়াছিলেন পূর্ব্বেই তাহা উক্ত হইয়াছে। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহার কিরূপ আগ্রহ ছিল এবং স্বীয় আয়ের অধিকাংশ কিরূপে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয় করিতেন তাহারও পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। প্রসন্নকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের একজন সদস্য ছিলেন এবং গণিত শাস্ত্রের পরীক্ষক ছিলেন। প্রসন্নকুমার পিতৃভক্ত পুত্র, সন্তানবৎসল জনক এবং প্রেমময় স্বামী ছিলেন। তাঁহার দাম্পত্যজীবন অতি মধুময় ছিল। তাঁহার ভ্রাতৃবাৎসল্য অসীম ছিল। শৈশবে মাতৃহীন ভ্রাতৃগণকে তিনি কিরূপে "মানুষ" করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বঙ্গবিখ্যাত ভ্রাতৃগণের জীবনকাহিনীতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। ৺নীলমণি কুমার মহাশয় একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে প্রসন্নকুমার যদি কোন সাধারণ হিতকর কার্য্য না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার ভ্রাতা সূর্য্যকুমারকে দিয়া যাইতেন তাহা হইলেও বাঙ্গালাদেশ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিত। বাস্তবিক যেরূপ স্নেহ ও যত্নসহকারে প্রসন্নকুমার

তাঁহার মাতৃহীন ভ্রাতৃগণকে সুশিক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহাদের চরিত্র গঠিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিবাৎসল্য অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সমুচিত বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

প্রসন্নকুমারের তেজস্বিতা ও স্বাধীন প্রকৃতির পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। কিন্তু প্রসন্নকুমারের একটি গুণের তুলনায় তাঁহার অন্যান্য সকল গুণ নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা তাঁহার দয়া ও দাক্ষিণ্যের কথা বলিতেছি। পরোপকার যেন প্রসন্নকুমারের একমাত্র ব্রত ছিল, এবং এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তিনি নিজের ও নিজপরিবারের সহস্র অসুবিধা উপেক্ষা করিতেন। দরিদ্র ও বিপন্নের সাহায্যার্থ তাঁহার দক্ষিণহস্ত সর্ব্বদা প্রসারিত থাকিত। শেষ জীবনে তিনি সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতন পাইতেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার পাটীগণিত ও বীজগণিত পুস্তকবিক্রয় দ্বারাও যথেষ্ট আয় হইত। তখন জীবনধারণোপযোগী উপকরণাদিও এত মহার্ঘ্য ছিল না। কিন্তু যখন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন এই বিলাসবিদ্বেষী আড়ম্বরশূন্য মহাত্মা তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য কিছুই সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা হইতে পাঠকগণ প্রসন্নকুমারের দানের পরিমাণ অনুমান করিতে পারিবেন। যে বৎসর প্রসন্নকুমার ঢাকা কলেজে শিক্ষকতা পরিত্যাগ করেন সেই বৎসর তাঁহার ভ্রাতা সূর্য্যকুমার উক্ত কলেজ হইতে জুনিয়র-স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমারই সূর্য্যকুমার ও তাঁহার সতীর্থ জগদ্বন্ধু বসু মহাশয়কে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন। উভয়েই কিরূপ সুচিকিৎসক হইয়াছিলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সূর্য্যকুমারকে চিকিৎসক করিবার আর্ত্তবন্ধু প্রসন্নকুমারের এক গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। দরিদ্র ছাত্র বা শিক্ষক পীড়িত হইলে প্রসন্নকুমার তাঁহার ভ্রাতাকে তাঁহাদের বিনাভিজিটে চিকিৎসা করিতে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে কত দরিদ্র ছাত্র ও শিক্ষক মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না।

প্রসন্নকুমারের তিরোধান সমগ্র বঙ্গদেশ শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন সহকারী সর্ব্বাধ্যক্ষ পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্যর উইলিয়াম হাণ্টার উপাধিবিতরণ উপলক্ষে আহূত সভায় প্রসন্নকুমারের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"But chiefly we lament the loss of Babu Prasanna Kumar Sarvadhikari—the erudite Principal of the Sanskrit College, the conscientions custodian and spirited defender of its precious manascripts, the ingenions mathematician who translated the Arithmetic and Algebra of Europe into the Vernacular of Bengal."

প্রসন্নকুমারের অসংখ্য ভক্তগণ তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র সংস্কৃত কলেজে তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর সংস্কৃতকলেজের পুরস্কার বিতরণ সভায় বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন চীফ্ সেক্রেটারী মাননীয় মিঃ ডব্লিউ বোল্টন মহোদয় উক্ত প্রতিকৃতি উন্মোচিত করিবার সময় প্রসন্নকুমারের বিবিধ সদ্‌গুণনিচয়ের উচ্চ প্রশংসা করিয়া দেশবাসীগণকে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'প্রসন্নকুমার স্মৃতি-সমিতি' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার নামে একটী মেডেল প্রদানেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে পারেন তিনিই এই পদক প্রাপ্ত হন।

প্রসন্নকুমার তাঁহার গভীর স্বদেশানুরাগ ও শিক্ষাবিস্তারে অসীম উৎসাহের কয়েকটী সজীব স্মৃতিস্তম্ভও স্বয়ং রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই অকৃত্রিম স্বদেশবাৎসল্য ও বিদ্যোৎসাহ সর্ব্বাধিকারী-পরিবারের অনেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন। প্রসন্নকুমারের তিরোধানের পরেও, ডাক্তার সূর্য্যকুমার, ডাক্তার স্যর দেবপ্রসাদ, ডাঃ সুরেশপ্রসাদ, রাজকুমার ও জ্যোতিঃপ্রসাদ একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরূপে সর্ব্বাধিকারী বংশের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যানুরাগের তথা শিক্ষা-

বিস্তারের অসীম আগ্রহ ও উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন। আর কোনও পরিবারে একই সময়ে এতগুলি সুপণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন নাই। প্রসন্নকুমারের ছাত্রপ্রতিম ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সহকারীকর্ম্মাধ্যক্ষ মাননীয় ডাক্তার স্যর দেবপ্রসাদ এবং ডাক্তার সুরেশপ্রসাদকে প্রসন্নকুমারের সজীব স্মৃতিচিহ্ন বলা যাইতে পারে। প্রসন্নকুমারের এই স্মৃতিস্তম্ভগুলি বহুদিন সগৌরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার পবিত্র স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখুন এবং দেশবাসীকে নবজীবনে উদ্বোধিত করুন।

নিকট পরিচয়।

(কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ)

যত দুখ পাই তোমারে জানাই,
তত মোর বাড়ে আশা—
তত তুমি হরি এস আস্ত সরি',
পাই তব ভালবাসা।
যত কেঁদে ওঠে আমার হৃদয়,
তত তোমা সনে বাড়ে পরিচয়,
তত ভেঙ্গে যায় বুঝিবার ভুল—
জাগে মরমের ভাষা।
জগতের নরে আপনার করে'
বক্ষের কাছে টানি—
মনে হয় মোর কি যে সুন্দর
তোমার বিশ্ব খানি!
এইরূপে মোর বাড়ে পরিসর,
ভুলে যাই আমি নিজ আর পর—
সকলের মনে কি মধু মিলনে
আমারে বেঁধেছ আনি!—
ছল ছল আঁখি—বলি বার বার,
আরো দুখ দাও হে প্রভু আমার,
দাও আনি মম কণ্ঠে সতত
তোমার উদার বাণী—
জগতের নরে আপনার করে'
বক্ষের কাছে টানি!

বৈয়াসিক-ন্যায়মালা।

নবম প্রকরণ—ব্রহ্মের প্রাণশব্দবাচ্যতা অধিকরণ।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

সূত্র। অতএব প্রাণঃ॥ ২৩॥

টীকা। নবমাধিকরণমারচয়তি—

মুখস্থো বায়ুরীশো বা প্রাণঃ প্রস্তাবদেবতা।
বায়ুর্ভবেত্তত্র সুপ্তৌ ভূতসারেন্দ্রিয়ক্ষয়াৎ॥৩৩॥
সংকোচোঽক্ষপরত্বে স্যাৎ সর্ব্বভূতলয়শ্রুতেঃ।
আকাশশব্দবৎ প্রাণশব্দস্তেনেশবাচকঃ॥ ৩৪॥

আকাশবাক্যাদুত্তরস্মিন্ বাক্যে প্রস্তাবনামকঃ সামভাগস্য দেবতাং প্রস্তোত্রা পৃষ্টায়ামুষস্তিরুত্তরং দদৌ। তত্রত্যং বাক্যমেতৎ "প্রাণ ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা" ইতি। তত্র প্রাণশব্দার্থো মুখবিলান্তর্ব্বর্ত্তিবায়ুঃ ব্রহ্ম বা ইতি সন্দেহঃ। মুখবিলান্তর্ব্বর্ত্তী বায়ুর্ভবেৎ। সর্ব্বভূতলয়স্য তত্র সুসংপাদত্বাৎ। সুষুপ্তিকালে সর্ব্বভূতসারাণামিন্দ্রিয়াণাং প্রাণবায়ৌ প্রবিলয়াৎ। ইতি প্রাপ্তে—

উচ্যতে—ইন্দ্রিয়মাত্রলয়পরত্বে ব্যাখ্যায়মানে "সর্ব্বাণি হবৈ" ইত্যসৌ সর্ব্বশব্দঃ সঙ্কুচিতঃ স্যাৎ। আকাশশব্দবৎ প্রাণশব্দোঽপি শ্রৌতরূঢ়েবেকারাভাবাৎ ব্রহ্মবাচকঃ। অস্তি হি প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মণি শ্রৌতরূঢ়িঃ। "প্রাণস্য প্রাণং" ইত্যত্র ব্রহ্মবিবক্ষয়া দ্বিতীয়প্রাণশব্দপ্রয়োগাৎ। তস্মাৎ ঈশ্বরঃ প্রাণঃ॥

সূত্রের অনুবাদ। এই হেতু (ব্রহ্ম) প্রাণ(-বাচ্য)।

টীকার অনুবাদ। নবম অধিকরণ রচিত হইতেছে—

প্রস্তাব (অংশের) দেবতা যে প্রাণ তাহা মুখস্থ বায়ু অথবা ঈশ্বর? বায়ু হউক—সুষুপ্তি-

কালে তাহাতে (প্রাণবায়ুতে) (পঞ্চ) ভূতের সার ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় (বা লয়) হেতু। অক্ষ বা ইন্দ্রিয়পর ধরিলে সংকোচ হইল, কারণ সর্ব্বভূতের লয় শ্রুত আছে। আকাশ শব্দের ন্যায় প্রাণশব্দ। সেই হেতু ঈশবাচক।

আকাশ-বাক্যের পরবর্ত্তী বাক্যে প্রস্তাবনামক সামবেদীয় অংশের দেবতাবিষয়ে প্রস্তোতা প্রশ্ন করিলে পর উষস্তি উত্তর দিয়াছিলেন। সেই উত্তরবিষয়ক বাক্য এই—"প্রাণ, ইহা বলিলেন। ঐই সমস্ত ভূতই প্রাণেতেই লয় প্রাপ্ত হয়, প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়, সেই এই দেবতা প্রস্তাবের অনুগত।" এস্থলে প্রাণ শব্দের অর্থে মুখগহ্বরের অন্তর্বর্ত্তী বায়ু অথবা ব্রহ্ম, ইহাই সন্দেহ। মুখ-গহ্বরস্থ বায়ুই হউক। কারণ সেই বায়ুতে সকল ভূতের লয় সুসম্পন্ন হয়। কারণ সুষুপ্তিকালে সকলভূতের সার ইন্দ্রিয়সকল প্রাণবায়ুতেই লয়-প্রাপ্ত হয়। এই যুক্তি প্রাপ্ত হইলে—

বলা যাইতেছে—ইন্দ্রিয়মাত্রেরই লয়মূলক ব্যাখ্যা ধরিলে "সকল ভূতই" এই বাক্যের ঐ 'সকল' শব্দ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। আকাশ শব্দের ন্যায় প্রাণ শব্দও শ্রুতিপ্রসিদ্ধির কারণে এবং "এব" শব্দের দ্বারা ব্রহ্মবাচক। শ্রুতিতে প্রাণশব্দ ব্রহ্ম অর্থে প্রসিদ্ধ আছে। যথা—"প্রাণের প্রাণ" এস্থলে দ্বিতীয় প্রাণশব্দের প্রয়োগ হেতু ব্রহ্ম অর্থ বিবক্ষিত দেখা যায়। অতএব ঈশ্বরই প্রাণ।

তাৎপর্য্য। এক সময়ে এক রাজা একটী বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ-ক্ষেত্রে সামবেদ গীত হইতেছিল। সামবেদের একটী অংশ প্রস্তাব। যিনি সেই প্রস্তাব পাঠ করেন তাঁহাকে প্রস্তোতা বলা যায়। উক্ত যজ্ঞে প্রস্তোতা প্রস্তাব পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময়ে উষস্তি নামক এক ঋষি আসিয়া প্রস্তোতাকে তাঁহার প্রস্তাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে, জিজ্ঞাসা করি-লেন। প্রস্তোতা তাহার সদুত্তর দানে অক্ষম হইয়া নীরব হইলেন। তখন সেই রাজা উষস্তি ঋষিকে যজ্ঞভার গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি যজ্ঞভার গ্রহণে অস্বীকার করিলেও প্রস্তো-তাকে প্রস্তাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার তত্ত্ব শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়া ঐ প্রস্তাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "প্রাণ, ইহা বলিলেন। এই সকল ভূতই প্রাণেতেই লয় পাইতেছে, প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইতেছে, সেই এই দেবতা প্রস্তাবের অনুগত (অর্থাৎ প্রস্তাবে অধি-ষ্ঠিত) হইয়া আছেন।" প্রাণ অর্থে সাধারণত প্রাণবায়ুই বুঝায়। প্রাণ বহির্গত হইবার সময় এই প্রাণবায়ু মুখের ভিতর দিয়াই বাহির হয় বলিয়া তাহাকে এস্থলে মুখগহ্বরস্থ বলা হইয়াছে। এখন সন্দেহ হইল এই যে, প্রাণ শব্দ উপরোক্ত শ্রুতিতে ঐ প্রকার মুখগহ্বরস্থ প্রাণবায়ুর অর্থে অথবা ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষের মতে প্রাণবায়ুই বুঝাইতেছে। তাহার কারণ তিনি বলেন এই যে, শ্রুতিতে আছে যে, সুষুপ্তিকালে পঞ্চভূতের শ্রেষ্ঠ অংশ ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণবায়ুতে লয় প্রাপ্ত হয়। কাজেই উপরোক্ত শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—"সমস্ত ভূতই প্রাণেতেই প্রবেশ করে বা লয় প্রাপ্ত হয়", তাহার সহিত ইহার কোনই বিরোধ হইতেছে না। বরঞ্চ উভয়শ্রুতির একবাক্যতা করিলে প্রাণবায়ুই প্রাণশব্দের সুসঙ্গত অর্থ হয়।

সিদ্ধান্তপক্ষের মতে অবশ্য প্রাণ শব্দের অর্থে ব্রহ্ম। তিনি বলেন যে "সমস্ত ভূতই", ইহার অর্থে কেবল ইন্দ্রিয় ধরিলে "ভূত" শব্দের অর্থকে বড়ই সঙ্কুচিত করা হয়। "প্রাণস্য প্রাণং" অর্থাৎ প্রাণের প্রাণ" এই শ্রুতিতে দুইটী "প্রাণ" শব্দ আছে। প্রথম "প্রাণ" শব্দের অর্থে প্রাণবায়ুই ধরা গেল। কিন্তু তাহা হইলে প্রাণের প্রাণ কি? স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে এস্থলে দ্বিতীয় প্রাণ শব্দে ব্রহ্মই বিবক্ষিত। এই শ্রুতি এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মেতে প্রাণ শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ আছে। আরও, বর্ত্তমান অধিকরণ-ধৃত শ্রুতিতে "সমস্ত ভূতই" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই "ইকারে"র (সংস্কৃতে "এব" শব্দের) দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয় যে বুঝায় নাই, ইন্দ্রিয়সহ সমস্ত ভূতই যে উক্ত শব্দের বাচ্য হইতেছে তাহা সুস্পষ্ট। এখন, সমস্ত ভূত যে একমাত্র ব্রহ্মেতেই লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা বহু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। কাজেই সমস্ত ভূতই যে প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং যে প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই "প্রাণ" ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর কিছুই হইতে পারে না।

———

প্রাচীন রাজগৃহে বৌদ্ধচিহ্ন।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—১৮৪১ শকের চৈত্র সংখ্যা দেখ)

পিপ্পল গুহা। এই গুহাতে মহাকাশ্যপ বাস করিতেন। তিনি প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতির * সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। 'সুনত্ত নিকয়' গ্রন্থে আছে, 'একদা ভগবান্ তথাগত রাজগৃহে ভেলুবনের কলন্দক নিভাপে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে মহাকাশ্যপ পিপ্পল গুহায় মানসিক দুশ্চিন্তায় ও শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তথাগত একদিন অপরাহ্ণে সমাধি হইতে উঠিয়া কাশ্যপের নিকটে গমন করেন।' ধর্ম্মপদ গ্রন্থের টীকাতেও পিপ্পল গুহার উল্লেখ আছে। এই গুহা ভেলুবনের অতি নিকটেই ছিল, কারণ তথাগত অপরাহ্ণে সেখানে মহাকাশ্যপকে দেখিতে যান এবং ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে তিনি সেই দিন সন্ধ্যার সময় ভেলুবনে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ফা-হিয়ানের বর্ণনায়ও এই উক্তির সমর্থনযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন 'দক্ষিণ দিকের পর্ব্বত (সম্ভবতঃ বৈভার গিরি) স্পর্শ করিয়া পশ্চিমে তিন শত পদ অগ্রসর হইলে পিপ্পল গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ভগবান্ তথাগত মধ্যাহ্নের আহারাদি পর ধ্যান করিতেন।' হিউয়েন-সিয়াং বলেন, 'উক্ত প্রস্রবণের পশ্চিমের পাহাড়ে পিপ্পল গৃহ বিদ্যমান।' বৈভার গিরির পাদমূলে যে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহার পশ্চিম দিকে একটী পাথরের গায়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ আছে; এখানেই পিপ্পল গুহা ছিল। বর্ত্তমান ডাকবাংলার দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই এই অনুপম দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তপর্ণী গুহা। 'দ্বীপবংশ' গ্রন্থে আছে, 'গিরিব্রজের সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল।' 'মহাবংশে' আছে, 'তিনি (মহারাজ অজাতশত্রু) অতি সত্বর বৈভার গিরির পার্শ্বে সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারের প্রবেশপথে বিরাট একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিতে দেবতাদের সভাগৃহের মত মনোরম ছিল। মণ্ডপ প্রস্তুত হইলে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ভিক্ষুদের বসিবার জন্য তিনি মূল্যবান মাদুর পাতিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। থেরোর * জন্য দক্ষিণ দিকে উত্তর মুখ করিয়া উচ্চাসন স্থাপিত হইয়াছিল এবং সভাগৃহের মধ্যস্থলে তথাগতের উপযুক্ত উচ্চাসন পূর্ব্বমুখ করিয়া সভাপতির জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল।' 'ব্রহ্ম-সূত্তের' টীকায় আছে, 'মহারাজা বলিলেন, "পূজাপাদ মহোদয়গণ, এখন আমি কি করিব আদেশ করুন।" 'মহারাজা যে সকল ভিক্ষুরা তথাগতের উপদেশবাণী সংগ্রহ করিবেন তাঁহাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করুন।' মহারাজা বলিলেন, 'ইহা কোথায় নির্ম্মাণ করিব বলুন।' 'মহারাজা, বিভার গিরির পার্শ্বে সপ্তপর্ণী গুহা দ্বারের প্রবেশপথে ইহা নির্ম্মিত হউক।' উত্তরে রাজা অজাতশত্রু বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হউক।' টীকাকার আরও লিখিয়াছেন, 'অতি মনোরম মহামণ্ডপ গুহার প্রবেশ পথে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ভিক্ষুদের উপবেশনের জন্য পাঁচশত বহু মূল্যবান মাদুর বিস্তৃত হইয়াছিল। দক্ষিণ দিকে উত্তরমুখ করিয়া মহাকাশ্যপের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং মহামণ্ডপের কেন্দ্রস্থলে ব্যাখ্যাতার আসন পূর্ব্বদিক করিয়া স্থাপিত হইয়াছিল। এই শেষের আসনে উপালী ও আনন্দ যথাক্রমে 'বিনয়' ও 'ধর্ম্ম' সমস্বরে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু ফা-হিয়ান লিখিয়াছেন এই আসনে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন উপবেশন করিয়াছিলেন। ফাহিয়ানের বর্ণনা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কারণ তথাগতের জীবিতকালে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন দেহত্যাগ করেন। হিয়ানসিঙাএর বর্ণনায় যে আছে '৯৯৯ জন মহা অর্হৎ তথাগতের উপদেশবাণী সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন'; ইহাও ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় না। 'মহাবস্তু-অবদান' গ্রন্থকার মহাসঙ্গীতির স্থাননির্ণয়ে লিখিয়াছেন, 'এই ধর্ম্মগ্রন্থের (ত্রিপিটক) সংগ্রহক্রিয়া মগধবাসী ও মগধের রাজার দেশে—পাহাড়ের নীচে বনরাজিশোভিত স্থানে—বৈভার গিরির

* ভগবান্ তথাগতের পরিনির্ব্বাণের পর ভিক্ষুগণ রাজগৃহ, বৈশালী ও পাটলীপুত্রে তিনটী মহাসভা আহ্বান করিয়া তথাগতের বাক্যসমূহ আবৃত্তি এবং গ্রন্থাকারে বিভক্ত ও সজ্জিত করেন। এই তিনটী সভা সঙ্গীতি নামে পরিচিত।

* থেরো (স্থবির) যাঁহারা দশ বৎসর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উত্তরাংশে—শ্রেষ্ঠ নগরী রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় অনুষ্ঠিত হইত।' হিউয়েন সিয়াং এর বর্ণনায় আছে, 'বংশশোভিত বেণুবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রায় ৫।৬ লি দূরে দক্ষিণগিরির উত্তরদিকে একটা বাঁশের বন আছে। ইহার মধ্যস্থলে একটী সুবৃহৎ প্রস্তরের গৃহ আছে। এখানে তথাগতের নির্ব্বাণের পর মহাকাশ্যপ ৯৯৯ জন অর্হৎকে সঙ্গে লইয়া ত্রিপিটকের আলোচনা করেন। ইহার সম্মুখে প্রাচীন বহিঃপ্রাচীর। রাজা অজাতশত্রু এই মণ্ডপ-গৃহে প্রসিদ্ধ অর্হৎদিগকে 'ধর্ম্ম-পিটক' মীমাংসার জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।' ফাহিয়ান পিপ্পল গুহা হইতে সপ্তপর্ণী গুহার ব্যবধান পশ্চিমে প্রায় এক মাইল বলিয়া গিয়াছেন। স্যার জন মার্শাল 'রাজগৃহ' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন 'পিপ্পল গুহা হইতে বৈভার গিরির উত্তরদিক দিয়া পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া আমরা এইরূপ প্রস্তর নির্ম্মিত কক্ষের কোন চিহ্নই দেখিতে পাই নাই।' তিনি বৈভার গিরির উত্তরাংশের পাদমূলে সপ্তপর্ণী গুহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'মহাবস্তু অবদান' গ্রন্থকারেরও এই মত। কিন্তু এই সম্বন্ধে এখনও শেষ মীমাংসা হয় নাই।

গৃধ্রকূট। রাজগৃহের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থগুলির মধ্যে গৃধ্রকূট অন্যতম। এই স্থান তথাগতের অতি প্রিয় ছিল। এখানে রাজা বিম্বিসরের প্রার্থনায় তথাগত 'উপশথ' ও প্রায়শ্চিত্ত বিধান বা প্রাতিমোক্ষ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বিনয় পিটকের 'উপশথখণ্ডকে' আছে 'ভগবান্ বুদ্ধদেব রাজগৃহের গৃধ্রকূটে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে অন্য সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকেরা প্রতি মাসের অষ্টম, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ দিবসে ধর্ম্মসূত্র ব্যাখ্যার জন্য কোন একস্থানে মিলিত হইতেন। ইঁহারা অপর সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকদের অনুগ্রহ লাভ করিতেন। একদা মগধাধিপতি বিম্বিসর একাকী ভাবিতে লাগিলেন, 'এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকেরা প্রতিমাসের অষ্টম, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ দিবসে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করেন। ইঁহারাও অন্য সম্প্রদায়ের উপদেশ-বাণী শুনিতে আসেন। আচ্ছা, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ঐরূপ প্রতি পক্ষের তিন দিন ধর্ম্মব্যাখ্যা করেন না কেন?' রাজা বিম্বিসর এই প্রস্তাব তথাগতের নিকট উপস্থাপিত করিলে তিনি ইহাতে সম্মতি দান করেন। প্রথমে গৃহীদের মঙ্গলের জন্যই এইরূপ সভার অধিবেশন হইত, পরিশেষে উপশথ দিবসে ভিক্ষুরা সভা করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে নিজ নিজ কৃতাপরাধের স্বীকারোক্তি করিতেন।

গৃধ্রকূট পর্ব্বতের স্থান নির্দ্দেশ করা কঠিন নয়। স্যার জন মার্শেল চটগিরি ও গৃধ্রকূট পর্ব্বত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পাহাড়ে আরোহণ করিবার জন্য রাজা বিম্বিসর যে রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা আজিও বিদ্যমান আছে। এই রাস্তার উপর যে সকল স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার ভিত্তি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। পরিব্রাজক হিউয়েনসিয়াং এই স্তূপগুলির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই পাহাড়ের শিরো-দেশে একটী স্তূপ আছে।

চোর পপাত। কথিত আছে এই পাহাড় হইতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কতকগুলি দস্যুকে নীচে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ধর্ম্মপদের টীকায় আছে যে এই পাহাড়ের একদিক দিয়া জনসাধারণ পাহাড়ে উঠিত, কারণ অপর দিকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই দিক দিয়াই দস্যুদের নীচে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হিউয়েনসিংয়াএর বর্ণনায় আছে, 'পাহাড়ের পশ্চিমপ্রান্তে খাড়া পর্ব্বত-গাত্রের উপরিভাগে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত বিহার আছে। ইহা বেশ উচ্চ ও প্রশস্ত এবং অতি পরিপাটীরূপে নির্ম্মিত। ইহার দ্বার পূর্ব্বদিকে। সেই প্রাচীন কালে এখানে ভগবান তথাগত সময়ে সময়ে অবস্থান করিতেন এবং তাঁহার উদার বাণী প্রচার করিতেন। এইখানে তাঁহার একটী প্রচারক বেশের মূর্ত্তি আছে।' "মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে" বর্ণিত চোরা পাহাড়ই যে পরিব্রাজকবর্ণিত পাহাড় সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। আজিও পাহাড়ের এই খাড়া গাত্রে উপরোক্ত বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উচ্চ পর্ব্বতগাত্র হইতে নীচের সমতল ভূমির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। তথাগতের মূর্ত্তিটী আর বর্ত্তমানে এখানে নাই।

কালশিলা। ইসিগিলি পাহাড়ের পার্শ্বে ইহা

অবস্থিত। আনন্দের সহিত তথাগতের সম্ভাষণ প্রসঙ্গে কালশিলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থানে মৌদ্গল্যায়ন বাস করিতেন এবং এখানেই তিনি নেংটা সন্ন্যাসীদের নিযুক্ত ঘাতকহস্তে নিহত হন। ধর্ম্মপদের টীকায় আছে, 'কালশিলায় মৌদ্গল্যায়ন বাস করে। তোমরা (ঘাতকেরা) সেখানে গিয়া তাহাকে হত্যা কর।' এখন প্রশ্ন এই কালশিলা কোথায় ছিল? প্রাচীন ইসিগিলি পাহাড়ই বর্ত্তমান সোনাগিরি বলিয়া অনুমান হয়। সংস্কৃত 'ঋষিগিরি' ও পালির-'ইসিগিলি' একার্থ-বোধক। রামায়ণেও 'ঋষিগিরির' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কালশিলা অর্থে কৃষ্ণপ্রস্তর বুঝায়। বাণগঙ্গার মূল পর্য্যন্ত একটী প্রাচীন রাস্তা আছে, যেখানে এই রাস্তা বাণগঙ্গার সহিত মিশিয়াছে সেই স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম। ইহা বিশ্রাম ও ধ্যানের উপযুক্ত স্থান। এখানে একটী ছবির মত ক্ষুদ্র জলপ্রপাত আছে, ইহার জলধারা নীচে একটী গভীর খাতে আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে। এই খাতের চারিদিকে সোপানাবলী প্রকৃতির হস্তে রচিত। খুব সম্ভবতঃ এই খাতের নিকটেই কালশিলা ছিল। ইহার অনতিদূরে একটী মৃত্তিকা-স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে এখানে একটী স্তূপ ছিল। ইহা ভিন্ন ঋষি-গিরির পূর্ব্বদিকে একটী স্থান আছে, সেখানে পাহা-ড়ের গায়ে একটী প্রশস্ত জমি আছে। ঋষিগিরির পূর্ব্বদিক হইতে এই জমি পর্য্যন্ত একটী ঢালু রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা রাজগৃহের দক্ষিণ-দিকের প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত। কথিত আছে, এই কালশিলার সন্নিকটে কালশিলাবতী নামে একটী বৃহৎ বৃক্ষ ছিল এবং এই বৃক্ষতলে তথাগত সশিষ্য ধ্যান করিতেন।

সীতাবনে সপ্তশৌণ্ডিক পবাহার। ইহা রাজ-গৃহের উত্তরে অবস্থিত। এখানে কোন পাহাড় নাই, 'পবাহার' বিপুল গিরির ঢালু বলিয়া মনে হয়। কথিত আছে, তথাগতের কোন শিষ্য সীতা-বনে অনুশোচনা অভ্যাসকালে হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। এই কারণে এই স্থানটী 'গোহত্যাগৃহ' (গভঘাতনম্) বলিয়া মনে হয়। গল্পে আছে, দেবদত্ত গুহার সন্নিকটে একখানি প্রস্তরে রক্ত চিহ্ন ছিল, সম্ভবতঃ এই স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তীকালে একজন ভিক্ষু আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হন। পরিব্রাজকদের বর্ণনাদৃষ্টে এই স্থানের দূরত্ব ও অবস্থিতি চিন্তা করিলে বর্ত্তমান মকদুমশাহের দরগা ও সপ্তশৌণ্ডিক পবাহার অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

জীবক অম্ববনম্। একদিন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে রাজা অজাতশত্রু তাঁহার পারিষদমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া রাজপ্রাসাদের বারান্দায় উপবিষ্ট আছেন। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে পিতৃহত্যার জন্য ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছিল। তিনি এমন একজন পুণ্যাত্মার খোঁজ করিতেছিল, যিনি তাঁহার উদ্বেলিত প্রাণে শান্তি দিতে পারিবেন। পারিষদবর্গ রাজগৃহের আশে-পাশে যে সকল সাধু-মহাত্মা বাস করিতেন তাঁহাদের নামোল্লেখ করি-লেন। রাজবৈদ্য জীবক ভগবান্ তথাগতের কথা বলিলেন। সেই সময়ে তথাগত জীবকের প্রতিষ্ঠিত আম্রবনের বিহারে বাস করিতেছিলেন। অজাতশত্রু এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে নারী প্রহরীর সহিত জীবকের আম্রবনে লইয়া যাইতে হস্তী সাজাইতে আদেশ করিলেন।

'সামানাফলসুত্ত' আছে, 'বিদেহরমণীর পুত্র মগধাধিপতি অজাতশত্রু প্রত্যেক নারী প্রহ-রীর হস্তে একটী মশাল দিয়া হস্তীপৃষ্ঠে উঠিতে বলিলেন। পাঁচশত হস্তীপৃষ্ঠে পাঁচশত নারী প্রহরী আরোহণ করিয়া অতি জাকজমকের সহিত রাজার সঙ্গে জীবকের আম্রবনের দিকে চলিল।'

'অট্‌ঠকথা'য় আছে রাজগৃহের প্রাচীর ও গৃধ্রকূট পর্ব্বতের মাঝখানে জীবকের আম্রবন ছিল। অজাতশত্রু রাজগৃহের পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পাহাড়ের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে পড়িয়া চাঁদ দেখা যাইতেছিল না, পাহাড় ও বৃক্ষরাজির ছায়ায় সেইস্থান অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছিল। নিবিড় অন্ধকারে সেই স্থানের নির্জ্জনতা বড়ই ভীষণ বলিয়া মনে হইতেছিল, অজাতশত্রু জীবনের আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িলেন। জীবক তাঁহাকে অভয় দিয়া তথাগতের মন্দিরের আলো দেখাইলেন। সেই স্থানের রাস্তাঘাট ভাল ছিল না বলিয়া তাঁহারা সকলেই হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে

ভূমিতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে আম্রবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; সেখানে বিহারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে বুদ্ধদেব ভিক্ষু-বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। এই বর্ণনা হইতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে জীবকবন সহরের পূর্ব্বদ্বার হইতে গৃধ্রকূটের পথে অবস্থিত ছিল।

হিউয়েনসিয়াংএর বর্ণনায় আছে, 'বৃহৎ পরিখার পূর্ব্বোত্তরে পাহাড়ের কোণে একটী স্তূপ আছে। এখানেই রাজবৈদ্য জীবক বুদ্ধদেবের প্রচারের জন্য একটী কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহারই পাশে আজিও জীবকের প্রাচীন বাস্তুভিটা দেখিতে পাওয়া যায়।' 'সামান্যফলসূত্ত' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে অজাতশত্রু বুদ্ধদেবকে দেখিবার জন্য নগরের বাহিরে গিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে জীবকের আম্রবন পর্ব্বতবেষ্টিত নগরের কোণে অবস্থিত ছিল না। 'সামান্যফলসুত্ত' 'দীর্ঘনিকায়' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, ইহা অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রামাণিক এবং ইহা চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণী হইতেও অধিকতর মূল্যবান্। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের এক সহস্র বৎসর পর চৈনিক পরিব্রাজকেরা ভারতবর্ষে আগমন করেন; স্থানীয় জনশ্রুতির উপরই ইহাঁদিগকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এই কারণে অনেক স্থলে ইহাঁদের বিবরণীতে ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয়। প্রথম সঙ্গীতির বিবরণীতে ভুল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের একজনের বিবরণীতে 'আম্রবনের' স্থলে 'অম্বপালিবন' লিখিত হইয়াছে। শেষোক্ত স্থানটী বৈশালীর অন্তর্গত। বৈশালী ও রাজগৃহ বিভিন্ন জনপদ। 'সামান্যফলসূত্ত' ও 'অট্টকথায়' আছে যে, নগরের প্রাচীর ও পাহাড়ের মাঝখানে যে রাস্তা গৃধ্রকূটের দিকে চলিয়া গিয়াছে সেই স্থানে আম্রবন অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ পরিখার পূর্ব্বোত্তরে, নগরদ্বারের পূর্ব্বে এবং যেখানে বাহিরের বাঁধ রত্নগিরির (পাণ্ডরশৈল) সহিত মিলিত হইয়াছে সেই সংযোগস্থলে জীবকের উদ্যান অবস্থিত ছিল। 'ধর্ম্মপদের' টীকায় অধিকতর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আম্রবন গৃধ্রকূট পর্ব্বত ও নগরের বহিঃপ্রাচীর হইতে বেশী দূরে ছিল না।

'কথিত আছে, একদিন দেবদত্ত অজাতশত্রুর সহিত গৃধ্রকূট পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিল। সেই স্থান হইতে নৃশংস দেবদত্ত তথাগতকে মারিবার জন্য একখানি বিশাল প্রস্তর গড়াইয়া দেয়। দুই পাহাড়ের চূড়ায় ধাক্কা লাগিয়া প্রস্তরখানি চূর্ণ হইয়া যায়। একখণ্ড চূর্ণ প্রস্তর তথাগতের পায়ে লাগে এবং তৎক্ষণাৎ পা হইতে রক্ত বাহির হয়। এই আঘাতে ভগবান্ অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করেন। ভিক্ষুরা তথাগতকে মদকুচ্ছিতে লইয়া যান। তথাগত বলিলেন, 'আমাকে এথান হইতে ঐ স্থানে (জীবকবনে) লইয়া যাও'। ভিক্ষুরা তাহাই করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া জীবক সেথানে আসিলেন এবং তথাগতের ঘায়ে ব্যাণ্ডেজ ও প্রত্যক্ষফলপ্রদ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, 'প্রভু, নগরে একটী রোগীকে দেখিতে যাইব। তাহাকে দেখিয়া এখনই ফিরিয়া আসিব। ইতি-মধ্যে আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এই বন্ধনী ও ঔষধ ক্রিয়া করিতে থাকুক।' এই কথা বলিয়া জীবক রোগী দেখিবার জন্য নগরে চলিয়া গেলেন। ফিরিবার সময় তিনি নগরের দ্বারে পৌঁছিতেই দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।' উদ্ধৃতাংশ হইতে ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে জীবক-বন নগরের বাহিরে ও গৃধ্রকূটের মাঝখানে কোথায়ও অবস্থিত ছিল। মদকুচ্ছিও পর্ব্বতের পাদদেশে ছিল দুর্ঘটনার পর ভগবান্ তথাগতকে গৃধ্রকূট পর্ব্বতের নীচে উপত্যকায় আনা হয় এবং তথা হইতে সুবিধামত চিকিৎসার জন্য জীবকের আম্র-বনে লইয়া যাওয়া হয়।

"সামান্যফলসুত্তের" টীকায় আম্রবন বিহারের এইরূপ বর্ণনা আছে,—'সেই আম্রবনে জীবক ভগবান্ তথাগতের উপযুক্ত দিবারাত্রির জন্য বিশ্রামাগার, মণ্ডপ, গন্ধকুটীর, মূত্রপুরিষাদি ত্যাগের স্থান নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ১৮ হস্ত পরিমিত উচ্চ প্রাচীরে ঘিরিয়া দিলেন। এই প্রাচীরের গাত্র তাম্র রংএ অনুরঞ্জিত হইয়াছিল। এই সকল কাজ শেষ করিয়া তিনি আম্রবন উৎসর্গের পুণ্যদিনে বুদ্ধদেব ও ভিক্ষুগণকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজ দিয়া সকলকে বস্ত্র দান করেন। পরিশেষে তিনি পবিত্র বারিসংযোগে আম্রবন ভগবান্ ও ভিক্ষুগণের নামে উৎসর্গ করেন।' *

* এই প্রবন্ধের উপকরণ মূলতঃ প্রফেসার ডি, এল, সেন এম-এ, লিখিত 'Sites in Rajgir associated with Buddha and His Disciples' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সংকলিত। উক্ত ইংরাজী প্রবন্ধ বিহার ও উড়িষ্যার অনুসন্ধানসমিতির জর্ণালে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্বরলিপি।

কেদারা—তেওরা।

ধন্য হে নাথ! পূর্ণ করিলে শূন্য হৃদয় মম!
রুদ্ধ-দুয়ার খুলিয়া ডাকিলে তব পাশে প্রিয়তম!
দগ্ধ জীবন শীতল করিয়া,
সুধার উৎস গেল যে বহিয়া,
শুষ্ক মরুভূ উঠিল হাসিয়া ফুলসাজে নিরুপম!
একি নন্দন আনন্দ ধাম,
একি আনন্দ জীবনারাম,
হেরি চিদাকাশে শুধু তব নাম দীপ্ত তপন সম!
কোথায় বিষাদ কোথায় দৈন্য,
দিশে দিশে ঝরে বিমল পুণ্য,
তুমি বরেণ্য, তুমি শরণ্য, অন্য সকলি ভ্রম!
শান্ত তৃপ্ত সকল চিত্ত,
ও চরণ চুমি' করিছে নৃত্য,
লভিয়াছে দীন পরম বিত্ত, কৃপাময়, নমঃ নমঃ॥

রচনা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

আস্থায়ী।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II { মা -গা মা | পা -ক্ষা | পা -া I ধা -না ধা | ক্ষা -পা | পা পা I
ধ ০ ন্য হে ০ না থ্ পু ০ র্ণ ক ০ রি লে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মা গা মা | জ্ঞা রা | সা সা } I সা -ন্‌া সা | মা -া | মা -া I
শূ ন্য হৃ দ য় ম ম রু দ্ ধ দু ০ য়া র্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মা পা পা | ক্ষা -ধা | পা পা I র্সা না -র্সা | ধা -া | পা -া I
খু লি য়া ডা ০ কি লে ত ব ০ পা ০ শে ০

১´ ২ ৩
I মা -গা মা | রা -া | সা -া II
প্রি ০ য় ত ০ ম ০

অন্তরা।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II { পা -ধা পা | র্সা -া | র্সা র্সা I র্সা না র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা I
দ গ্ ধ জী ০ ব ন শী ত ল ক ০ রি য়া

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্মা র্গা র্মা | র্রা -া | র্সা -া I না ধা না | ধা -া | পা পা } I
সু ধা র উ ৎ স ০ গে ল যে ব ০ হি য়া

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মা -গা মা | পা -ক্ষা | ধা পা I না র্সা ধা | পা -ক্ষা | পা পা I
শু ষ্ ক ম ০ রু ভূ উ ঠি ল হা ০ সি য়া

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মা -গা মা | ধা -া | পা -া I মা -গা মা | রা -া | সা -া II
ফু ০ ল সা ০ জে ০ নি ০ রু প ০ ম ০

সঞ্চারী।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II { সা -রা সা। মা -া। মা মা I সা -রা সা। -পা পা। পা -া I
এ ॰ কি ন ন্ দ ন আ ॰ ন ন্ দ ধা ম

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ধা -র্সা ধা। র্সা -া। র্সা -র্সা I র্সা -র্না র্সা। ধা -া। পা -া } I
এ ॰ কি আ ॰ ন ন্দ জী ॰ ব না ॰ রা ম্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
*I র্মা র্মা র্মা। মা -া। মা মা I র্মা -র্গা র্মা। র্রা র্রা। র্সা -া I
হে রি চি দা ॰ কা শে ভ ॰ ধু ভ ব না ম্

১´ ২ ৩
I ধনধা -পা মা। গা মা। রা সা I
দী॰প্ ত ত প ন স ম

আভোগ।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II { পা ধা -পা। র্সা -া। র্সা -া I র্সা র্রা -র্সা। র্সা -া। র্সা -া I
কো থা য় বি ॰ ষা দ্ কো থা য় দৈ ॰ ন্য ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্গা র্মা র্রা। র্সা -র্না। র্সা র্সা I ধা না ক্ষা। র্সা -া। র্সা -া } I
দি শে দি শে ॰ স্ব রে বি ম ল পু ॰ ণ্য ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা ক্ষা ক্ষা। ধা -া। ধা -া I॰ পা ক্ষা ক্ষা। না -া। না -া I
তু মি ব রে ॰ ণ্য ॰ তু মি শ র ॰ ণ্য ॰

১´ ২ ৩
I পা -ক্ষা ক্ষা। র্সা ধা। মা মা II
অ ন্য স ক লি ত্ত ম

২য় সঞ্চারী।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II } সা -ন্া সা। মা -া। -মা -া I মা গা মা। পা -ক্ষা। পা -া I
শা ন্ ত তৃ ॰ প্ত ॰ স ক ল চি ॰ ত্ত ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ক্ষা পা ধা। র্সা -া। ধা পা I ক্ষা পা ধা। মা -া। মা -া } I
ও চ র ণ ॰ চু মি' ক রি ছে নৃ ॰ ত্য ॰

২য় আভোগ।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্মা র্মা র্রা। র্সা -র্না। র্সা -া I ধা পা ক্ষা। পা -া। পা -া I
ল ভি য়া ছে ॰ দী ন্ প র ম বি ॰ ত্ত ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মা -া গা। পা -ক্ষা। পা -া I মা -গা মা। রা -া। সা -া II II
কৃ ॰ পা ম ॰ য় ॰ ন ॰ মঃ ন ॰ মঃ ॰

* এই চরণটি গাহিতে বা বাজাইতে একটু সাধনার দরকার, কারণ 'তারা' গ্রামের 'মধ্যম' হইতে, একেবারে 'মুদারা' গ্রামের 'মধ্যমে' মধ্যেকার স্বরগুলিকে ছাড়িয়া, আরোহণ অবরোহণ আছে।

রত্নগিরি—ভবানী মন্দির।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী)

সহ্যাদ্রি পর্ব্বতমালার পশ্চিমভাগে কঙ্কন প্রদেশ অবস্থিত। এই প্রদেশটা আরব সাগরের পূর্ব্বতীরে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহা একটা পার্ব্বত্য প্রদেশ, ভূমি সমতল নহে, উচুনীচু। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার পশ্চিমপ্রান্ত ক্রমশঃ ঢালু হইয়া যে সমুদ্রতটে মিলিয়াছে তাহাই কঙ্কন প্রদেশ। প্রাচীন কাল হইতে এই প্রদেশবাসী লোকদিগের ধারণা যে কঙ্কন প্রদেশ ভারতবর্ষের অংশ নহে। উহা ভারতছাড়া একটা পৃথক প্রদেশ। পরশুরাম কর্ত্তৃক এই অভিনব প্রদেশ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রবাদ এই যে পরশুরাম যখন সীতা দেবীর বিবাহের পর রাম কর্ত্তৃক বিজিত হন, তখন তাঁহার ত্রিভুবনে গতিরোধ হয়; তিনি স্থান না পাইয়া সহ্যাদ্রি পর্ব্বত পার হইয়া সমুদ্রের নিকট স্থান চান, সমুদ্র সরিয়া যায় এবং সেই সমুদ্রপরিত্যক্ত স্থানই অভিনব কঙ্কন প্রদেশ নামে খ্যাত হইয়া পরশুরামের বাসের ও তপস্যার স্থান হয়। পরশুরাম নানা দেশ হইতে লোক আনিয়া এই অভিনব দেশে বাস করান, ইহা একটা উপনিবেশের মত হয়। এই প্রবাদে ইতিহাস কতটুকু আছে আমরা বলিতে পারি না; তবে ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যে তাহাদের সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে ব্যাপারটাকে একবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সমুদ্রকে পরশুরাম সরাইয়া না দিতে পারেন কিন্তু সমুদ্রের নিজে সরিয়া যাওয়াটা কিছু অসম্ভব নহে। এমন হইতে পারে যে সমুদ্র হটিয়া যাওয়ার দরুণ একখণ্ড নবভূমির সংগঠন হয় এবং পরশুরাম অন্য কোথাও স্থান না পাইয়া ঐ নব ভূমিখণ্ডে আসিয়া বাস করেন এবং ক্রমে ক্রমে উহা লোকের আবাসভূমি হয়। স্থানের অবস্থা দেখিয়াও বোধ হয় কঙ্কন প্রদেশ সমগ্র না হউক ইহার কতক অংশ এককালে সমুদ্রগর্ভে ছিল। অনেক স্থানে মাটির নীচে ও উপরে সমুদ্রজাত ঝিনুক ও শামুক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রজাত ঝিনুক ও শামুক প্রভৃতি জীবদেহ বহুকাল যাবৎ একত্র হইয়া জমিয়া থাকিয়া প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হয়। এইরূপ প্রস্তর কঙ্কনে অনেক আছে। কঙ্কনের অনেক স্থলে কূপ কিংবা পুষ্করিণী খনন করিতে গিয়া অর্ণবযানাদির ভগ্নাবশেষ; এমন কি ২।১টা নঙ্গরও পাওয়া গিয়াছে। কঙ্কনের এই পার্ব্বত্য ভূমিতে এ সকল বস্তু থাকিবার অন্য কোন কারণ দেখা যায় না।

দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ মোটামুটি "কঙ্কনস্থ" ও "দেশস্থ" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কঙ্কনবাসীগণ "কঙ্কনস্থ"; তদ্ব্যতীত আর যত প্রকারের দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদের সাধারণ নাম "দেশস্থ"। প্রাচীন কাল হইতে কঙ্কনে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগকেই কঙ্কনস্থ ব্রাহ্মণ বলা হয়। তাঁহাদের আর একটা নাম চিত্‌পাবন ব্রাহ্মণ। এই চিত্‌পাবন নামেই তাঁহারা সর্ব্বত্র বিশেষরূপে পরিচিত। সম্প্রতি কঙ্কনে চিত্‌পাবন ছাড়া দেশস্থ, দেউরুখা, সারস্বত, কির্ব্বন্ত, জাবাল, কনৌজিয়া প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণগণও বাস করিতেছেন; ইঁহারা প্রাচীন অধিবাসী নহেন। কঙ্কনস্থ বা চিৎপাবনেরাই আদিম কঙ্কনের ব্রাহ্মণ। কঙ্কনের ব্রাহ্মণগণ কঙ্কনস্থ, আর সব দেশস্থ, এরূপ বিভাগ কেন হইল? সম্ভবতঃ কঙ্কনের ব্রাহ্মণগণ বিদেশ হইতে আসিয়া কঙ্কনে বাস করেন, এজন্য দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ হইতে তাঁহাদিগকে পৃথক করিবার জন্য তাঁহাদিগকে কঙ্কনস্থ ব্রাহ্মণ বলা হইত। কঙ্কন যে একটা অভিনব স্থান এই ব্যাপারটা তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। পরশুরামকে এদেশে সকলে অত্যন্ত মান্য করে। তাঁহার পূজা অনেক স্থানে হইয়া থাকে। বলিতে গেলে পরশুরামই এদেশের দেবতা। রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত চিপ্‌লুন নামক স্থানে পরশুরামের একটা বৃহৎ মন্দির আছে। চিপ্‌লুন চিত্‌পাবন ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন ও প্রধান বাসস্থান। মন্দিরটা অপর দুইটা ছোট মন্দির দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরের পশ্চাৎ ভাগে একটা জলাশয় আছে। প্রবাদ এই যে পরশুরাম বাণ নিক্ষেপ করিয়া ঐ জলাশয়টা খনন করিয়াছিলেন। জলাশয়টির নাম বাণগঙ্গা। মন্দির-

মধ্যে পরশুরামের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে; প্রতিদিন তাহার পূজা হয়। সকালে ও বৈকালে যখন মূর্ত্তির স্নান হয় তখন তোপধ্বনি করা হয়। স্থানটি এদেশের একটী মহাতীর্থ। বহুতর যাত্রীর সমাগম হয়। বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ার দিবস এই মন্দিরে সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। ঐ সময়ে ন্যূনাধিক তিন চারি হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

কঙ্কনে ব্রাহ্মণ, মারহাট্টা, প্রভু, ভাণ্ডারী প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক বাস করে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপ্রধান। অন্যজাতীয় লোকেরা ব্রাহ্মণদের ন্যায় উন্নতিশীল নহে। ইহারা কেহই কঙ্কনের আদিম অধিবাসী নহে। কঙ্কনের আদিম অধিবাসী কাহারা ছিল এবং কেহ ছিল কিনা জানিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান অধিবাসীগণ অধিকাংশই অন্য স্থান হইতে আসিয়া কঙ্কনে বাস করিতেছে।

"Among the present people the early element is probably strongest in the Mahars and coast-coolies; less marked in Bhanderis, and weaker in Kunbis and Marhattas. The late arrivals, with some of whom almost every class of the present people is more or less closely connected came both from above Sahyadri hills and from beyond the sea."

(Ratnagiri Gazetteer)

ব্রাহ্মণদের মধ্যে চিত্পাবনেরাই কঙ্কনে প্রাচীনকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন, অপরাপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা পরে যাইয়া কঙ্কনে বাস করিতেছেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চিত্পাবন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য আছে। দাক্ষিণাত্যে চিত্পাবন ব্রাহ্মণদিগের প্রভূত সম্মান। ইঁহাদের পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা ও বুদ্ধিমত্তাদি সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে কোন সম্প্রদায়ের কোনও আপত্তি নাই। ইঁহারা কঙ্কনেরই ব্রাহ্মণ; কিন্তু আজ কাল সমস্ত দাক্ষিণাত্যে এমন কি অমরাবতী প্রভৃতি মধ্য ভারতবর্ষের নানাস্থানে চিত্পাবন ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। সকলে কঙ্কন হইতে আসিয়া ঐ সকল স্থানে বাস করিতেছেন এই কথা বলেন। কঙ্কনে এই ব্রাহ্মণেরা কোথা হইতে আসিল? কোন প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। পুরাকাল হইতে একটী গল্প প্রচলিত আছে যে জাহাজ ডুবিয়া গিয়া চৌদ্দটী মৃত দেহ ভাসিয়া আসিয়া কঙ্কনের তীরে লাগে; পরশুরাম সেই চৌদ্দটী মৃত দেহকে বাঁচাইয়া তুলেন, বর্ত্তমান চিত্পাবনগণ ঐ চৌদ্দজনের বংশধর। কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, বিষ্ণুবর্দ্ধন, কৌণ্ডিল্য, নিত্যুন্দন, ভরদ্বাজ, গার্গ্য, কপি, জামদগ্ন্য, বাৎস্য, বাভ্রব্য, কৌশিক এবং অত্রি—উক্ত চৌদ্দজনের এই চৌদ্দটি গোত্র ছিল। বর্ত্তমানকালেও চিতপাবনদের মধ্যে ঐ চৌদ্দটী গোত্রই প্রচলিত আছে। চৌদ্দ-গোত্রীয়দের বংশধরগণের প্রথমত ৬০টী উপাধি হয়, ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি ৩০৪টী উপাধি হইয়াছে। ভাট, গোখেলে, ধবলে, দামলে এই সকল উপাধি। ব্রাহ্মণত্ব হিসাবে আজকাল দাক্ষিণাত্যে চিত্পাবনেরাই সর্ব্বোচ্চ। ইঁহাদের আচারব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্তই বিশুদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে কেহই মাছমাংস খান না, সকলে বিশুদ্ধভাবে থাকেন। কেবল ব্রাহ্মণত্ব হিসাবে নহে, অন্যান্য বিষয়েও এই জাতি দাক্ষিণাত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ইঁহারা অতিশয় বুদ্ধিমান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাহসী, উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও সকল বিষয়ে নিপুণ। ইঁহাদের শারীরিক গঠনও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য জাতির মত নহে। অধিকাংশই গৌরবর্ণ। গৌরবর্ণ বলিলে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি তাহা নহে, এ গৌরবর্ণের কিছু বিশেষত্ব আছে। ভারতে আর কুত্রাপি এরূপ গৌরবর্ণ দেখা যায় না। দেখিলেই মনে হয় ইঁহারা অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়াছেন। রংটা অনেক স্থলে সাদা ধবধবে, বোধ হয় যেন কোন শীতপ্রধান দেশের লোক। সাধারণের অবগতির জন্য আমি বোম্বাই গেজেটীয়ার হইতে নিম্নলিখিত অংশটী উদ্ধৃত করিলাম :—

"Fair and pale with, in most cases, light eyes, they are a well-made vigorous class, the man handsome with a look of strength and intelligence; the woman small, graceful and refined but many of them delicate and weak-eyed. Many of the best coast villages owned and held by Chit-Pabans, are for cleanliness and arrangement a pleasing contrast to the ordinary Indian villages.

The houses bult of stones, stand in cocoanut gardens or in separate enclosures, shaded with mango and jack trees and the village-roads too narrow for carts are paved with blocks of laterite and well-shaded ponds, wells and temples add to the general appearance of comfort, the Chit-pabans are very clean and tidy. Among cultivating Chit-pabans many in good position as Khots or upper landholders, act as moneylenders and some trade chiefly in grain and other field produce. Others have succeeded well as pleaders, generally increasing their gains by lending them money. They have over all India a good name for their knowledge of Hindu lore and in Bombay and Poona some of the most distinguished native scholars in Sanskrit, Mathematics, Medicine and Law are Ratnagiri Chit-pabans. Ever ready to push their fortunes in other British districts or in native states as a class, they are successful and well-to-do.

বলা আবশ্যক যে বর্ত্তমান কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা গোখেল, তিলক প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের অধিকাংশই এবং প্রাচীনকালের পেসোয়াগণ—ইঁহারা সকলেই চিত্‌পাবন ব্রাহ্মণ।

উপরোক্ত গল্প ব্যতীত কঙ্কনে চিত্‌পাবনদিগের আগমনের অন্য কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইহাঁরা বহুকাল যাবৎ কঙ্কনেই বাস করিতেছেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন তাহা নিরূপণ করা কঠিন। উপরোক্ত গল্পটী বিশ্বাস করিলে বলিতে হইবে যে তাঁহাদের প্রথম আগমন সমুদ্রপথে হইয়াছিল।

"Descended from fourteen ship-wrecked corpses who were restored to life by Parasuram." Bombay Gazetteer.

সমুদ্রে যাতায়াতটা বোম্বাই উপকূলে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় কারবার, কাচ, বোম্বাই, রত্নগিরি, গোয়া প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলস্থ বন্দর হইতে নাবিকগণ নৌকা ভাসাইয়া সমুদ্র বাহিয়া আরব, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের উপকূলে বাণিজ্যার্থ গমন করে। পার্সী সম্প্রদায় পারস্যদেশ হইতে ঐরূপ সমুদ্র পথে আসিয়া প্রথমত সুরাটে এবং সম্প্রতি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নানা স্থানে বাস করিতেছেন। বোম্বাই উপকূলের অনেক মুসলমান অধিবাসিগণও আরব এবং পারস্য দেশ হইতে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের আগমনের ইতিহাস আছে। চিত্‌পাবনদিগের পূর্ব্বপুরুষগণেরও সমুদ্রপথে আসিতে আসিতে নৌকাডুবি হইয়া কঙ্কনের তীরে উঠা একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। তবে ইহা অতি পুরাকালের ব্যাপার, হইয়া থাকে যদি তবে পরশুরামের সময়ে; সেকালের ইতিহাস পাওয়া অসম্ভব।

চিত্‌পাবনগণ যদি সত্যসত্যই সমুদ্রপথে আসিয়াছেন ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে প্রশ্ন হইতেছে যে তাঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছেন? ইঁহারা খাঁটি হিন্দু। বলিতে গেলে প্রাচীন হিন্দু জাতির আচার-ব্যবহার যাহা কিছু,—সম্প্রতি চিত্‌পাবনদিগের মধ্যেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কোন অহিন্দুদেশ হইতে ইহাঁদের আগমন সম্ভবপর নহে। তবে ইহা অতি প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত; সে সময় বেদবিহিত ক্রিয়াকর্ম্মাদি কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা বলা যায় না। পারস্য, আরব, মিসর প্রভৃতি দেশসমূহে বেদবিহিত ক্রিয়াদি এককালে অনুষ্ঠিত হইত কিনা, সে সকল দেশেও এককালে ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন কি না, এককালে সে সকল দেশেও বেদভাষা প্রচলিত ছিল কি না একথা কে বলিবে? এখনও ত দেখিতেছি আফ্‌গানীস্থানে অনেক সারস্বত ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। চিত্‌পাবনদিগের কঙ্কনে আগমনের উপরোক্ত বৃত্তান্ত, তাঁহাদের শারীরিক গঠন, তাঁহাদের আচারব্যবহারাদি, এবং দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে "দেশস্থ" ও "কঙ্কনস্থ"-রূপ একটা বিভাগ থাকা প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করিলে ইহাঁদের কোন বিদেশ হইতে আগমন ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যদিও চিত্‌পাবনেরা পুরাকাল হইতে কঙ্কনে বাস করিয়া আসিতেছেন, তথাপি খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে তাঁহাদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও নিপুণতার বিষয় প্রকাশ হয় নাই।

"In former times, little thought of and known chiefly as messengers or spies, harkaras, the success of their patrons, the Maratha chiefs brought out their keen cleverness, good sense, tact and power of management and their caste supplied not only the ruling family but most of the leading men, who during the eighteenth century held the loose Maratha confederacy." B. Gazetteer.

(ক্রমশঃ)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

দ্বাদশ প্রকরণ।

সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি).

কর্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞের অথবা জীবন্মুক্তের বুদ্ধির ন্যায় সর্ব্বভূতে যাঁহার সাম্যবুদ্ধি হইয়াছে এবং যাঁহার সমস্ত স্বার্থ পরার্থে লয় পাইয়াছে, তাঁহাকে নীতিশাস্ত্র সবিস্তর শুনাইবার আবশ্যকতা নাই, তিনি তো স্বতই স্বপ্রকাশ কিংবা 'বুদ্ধ' হইয়া গিয়াছেন। অর্জ্জুনের এই প্রকার অধিকার থাকা প্রযুক্ত "তুমি নিজের বুদ্ধিকে সম ও স্থির কর" এবং "কর্ম্মত্যাগ করিব এইরূপ ব্যর্থ ভ্রমে পতিত না হইয়া, স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধি ধরিয়া, স্বধর্ম্মানুসারে নির্দ্দিষ্ট সমস্ত সংসারকর্ম্ম করিতে থাক" ইহা ব্যতীত তাঁহাকে অধিক উপদেশ দিবার আবশ্যকতা হয় নাই। তথাপি এই সাম্যবুদ্ধিরূপ যোগ সকলে একই জন্মে প্রাপ্ত হইতে পারে না বলিয়া সাধারণ লোকের জন্য স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণসম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু এই বিচার-আলোচনা করিবার সময় ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমরা যে স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে বিচার করিতে যাইতেছি, তিনি সত্যযুগের পূর্ণাবস্থায় উপনীত সমাজের অধিবাসী নহেন; কিন্তু যে সমাজে বহুসংখ্যক লোক স্বার্থের মধ্যেই ডুবিয়া আছে, সেই কলিযুগের সমাজেই তাঁহার কাজ করিতে হইবে। কারণ, মনুষ্যের জ্ঞান যতই পূর্ণ বা তাহার বুদ্ধি যতই সাম্যাবস্থায় পৌঁছাক না কেন, তাঁহাকে কামক্রোধাদির চক্রে আবদ্ধ অশুদ্ধবুদ্ধি লোকদিগের সহিত কারবার করিতে হয়। অতএব এই লোকদিগের সহিত ব্যবহার করিবার সময় অহিংসা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা ইত্যাদি নিত্য ও পরমোৎকৃষ্ট সদ্‌গুণসমূহকেই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদা স্বীকার করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করা যায় না *। অর্থাৎ যেখানে সকলেই স্থিতপ্রজ্ঞ সেই সমাজের উন্নতিশীল নীতি এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে যে সমাজে লোভীপুরুষেরই বিশেষ আধিক্য সেই সমাজের ধর্ম্মাধর্ম্ম, কিছু-না-কিছু ভিন্ন হইবেই; নচেৎ সাধুপুরুষকে এই জগৎ ত্যাগ করিতে হইবে এবং সর্ব্বত্র দুষ্টদিগেরই সাম্রাজ্য হইবে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, সাধুপুরুষকে আপন সমতা-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে; আবার সমতা ও সমতাতেও ভেদ আছে। "ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি" ব্রাহ্মণ, গো ও হস্তিতে পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি সম হইয়া থাকে (গী. ৫. ১৮), গীতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া, গরুর জন্য আনীত তৃণ ব্রাহ্মণকে এবং ব্রাহ্মণের জন্য প্রস্তুত অন্ন গরুকে যদি কেহ দেয়, তবে তাহাকে কি আমরা পণ্ডিত বলি? সন্ন্যাসমার্গের লোক এই প্রশ্নের গুরুত্ব অধিক না মানিলেও কর্ম্মযোগশাস্ত্রের কথা সেরূপ নহে। দ্বিতীয় প্রকরণের বিচার-আলোচনা হইতে পাঠকের অবশ্য উপলব্ধি হইয়া থাকিবে যে, সত্যযুগের সমাজের পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ কি, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, দেশকালানুসারে তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় তফাৎ করা আবশ্যক তাহা স্থির করিয়া, স্বার্থপরায়ণ লোকদিগের সমাজে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন; এবং কর্ম্মযোগশাস্ত্রের ইহাই বিকট প্রশ্ন। স্বার্থপরায়ণ লোকের উপর না রাগিয়া, কিংবা তাহাদের লোভবুদ্ধি দেখিয়া আপন মনের সমতাকে বিচলিত হইতে না দিয়া, বরং এইরূপ লোকের কল্যাণার্থই কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া বৈরাগ্যের সহিত সাধুপুরুষেরা নিজের চেষ্টাকে বজায় রাখেন। এই তত্ত্বটি মনে রাখিয়া শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী দাসবোধের পূর্ব্বার্দ্ধে প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া, তাহার পর, স্থিতপ্রজ্ঞ কিংবা উত্তমপুরুষ সাধারণ লোকদিগকে জ্ঞানী করিয়া তুলিবার জন্য, বৈরাগ্য সহকারে অর্থাৎ নিঃস্পৃহভাবে লোকসংগ্রহার্থ যে কাজ বা উদ্যোগ করিয়া থাকেন তাহার বর্ণনা (দাস. ১১. ১০; ১২. ৮-১০; ১৫. ২) সুরু করিয়াছেন, এবং তাহার পর অষ্টাদশ দশকে বলিয়াছেন যে, সকলকেই জ্ঞানীপুরুষদিগের এই গুণ— কথা, গল্প, সাধন, ফিকিরফন্দি, প্রসঙ্গ, প্রযত্ন, তর্ক, ধূর্ত্তামি, গূঢ় অভিসন্ধি, সহিষ্ণুতা, তীক্ষ্ণতা, ঔদার্য্য, অধ্যাত্মজ্ঞান, ভক্তি, অলিপ্ততা, বৈরাগ্য, দৃঢ়তা, উৎসাহ,

---

* "In the second place, ideal conduct such as ethical theory is concerned with, is not possible for the ideal man in the midst of men otherwise constituted. An absolutely just or perfectly sympathetic person, could not live and act according to his nature in a tribe of cannibals. Among people who are treacherous and utterly without scruple, entire truthfulness and openness must bring ruin." Spencer's *Data of Ethics* Chap. XV, p. 280. স্পেনসার সাহেব ইহার নাম দিয়াছেন Relative Ethics; এবং তিনি বলেন যে, "On the evolution-hypothesis, the two (Absolute and Relative Ethics) presuppose one another; and only when they co-exist, can there exist that ideal conduct which Absolute Ethics has to formulate and which Relative Ethics has to take as the standared by which to estimate divergencies from right or degrees of wrong."

প্রতিজ্ঞাপালন, নিগ্রহ, সমতা, এবং বিবেক ইত্যাদি— শিক্ষা করিতে হইবে (দাস. ১৮. ২)। কিন্তু এই নিঃস্পৃহ সাধুকে লোভী মনুষ্যদিগের মধ্যেই চলিতে হইবে বলিয়া শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীর এই উপদেশ—

ঘটাসী আণাবা ঘট। উদ্ধটাসী গাহিজে উদ্ধট।
খটনটাসী খটনট। অগত্য করী।

অর্থাৎ—"ঘটের সহিত ঘট আনিবে; উদ্ধতের সহি উদ্ধত ব্যবহার, ভাল-মন্দ লোকের সহিত ভাল-মন্দ ব্যবহার অগত্যা করিতে হইবে" (দাস. ১৯. ৯. ৩০)। তাৎপর্য্য, পূর্ণাবস্থা হইতে ব্যবহারে উপনীত হইলে, অত্যুচ্চ পৈঠার ধর্ম্মাধর্ম্মের মধ্যে অল্পস্বল্প তারতম্য করা আবশ্যক হয় ইহা নির্ব্বিবাদ।

আধিভৌতিকবাদীদিগের এই সম্বন্ধে এক সন্দেহ আছে যে, পূর্ণাবস্থার সমাজ হইতে নীচে নামিলে পর, অনেক বিষয়ের সারাসার বিচার করিয়া, যদি পরাকাষ্ঠা নীতি-ধর্ম্মের মধ্যে অল্পস্বল্প ফেরফার করিতেই হয় তবে নীতিধর্ম্মের নিত্যতা কোথায় রহিল, এবং "ধর্ম্মো নিত্যঃ" বলিয়া ব্যাস, ভারতসাবিত্রীর মধ্যে যে তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন তাহার দশা কি হইবে? তাঁহারা বলেন যে, ধর্ম্মের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সিদ্ধ নিত্যত্ব কাল্পনিক মাত্র; প্রত্যেক সমাজের অবস্থা অনুসারে সেই সেই কালে "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই তত্ত্ব হইতে যে নীতিধর্ম্ম পাওয়া যায় তাহাই প্রকৃত নীতিনিয়ম। কিন্তু এই যুক্তিক্রম ঠিক্ নহে। ভূমিতি-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে বিস্তৃতিহীন সরল রেখা, কিংবা সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ বর্ত্তুল পরিধি কেহ বাহির করিতে না পারিলেও, সরল রেখার কিংবা শুদ্ধ বর্ত্তুলের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা যেরূপ ভ্রান্তিমূলক কিংবা নিরর্থকও হয় না, সেইরূপ সরল ও শুদ্ধ নীতিনিয়মের কথা। কোন বিষয়ের পরাকাষ্ঠাশুদ্ধ-স্বরূপটি কি, প্রথমে তাহা নির্দ্ধারণ না করা পর্য্যন্ত ব্যবহার-ক্ষেত্রে সেই সব বিষয়ের যে সকল বহুল রূপ নজরে পড়ে, তাহার সংশোধন করা, কিংবা সারাসার বিচারান্তে তদন্তর্ভূত তারতম্যও উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না; এবং এই জন্যই, বাহান্নকোশী সোনা কোন্‌টি, পোদ্দার প্রথমে তাহার নির্ণয় করিয়া থাকে। দিগ্‌দর্শন ধ্রুবমৎস্য যন্ত্র কিংবা ধ্রুবতারার প্রতি উপেক্ষা করিয়া অপার সমুদ্রের তরঙ্গ ও বায়ু এই দুয়েরই তারতম্য দেখিয়া জাহাজের খালাসী সব সময়ে জাহাজের হাল ধরিয়া থাকিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ নীতিনিয়মের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া কেবল দেশকালানুসারে যে ব্যক্তি চলে তাহারও সেই অবস্থা হয়। তাই নিছক্ আধিভৌতিক দৃষ্টিতে বিচার করিলেও ধ্রুবতারার ন্যায় অটল ও নিত্য নীতিতত্ত্বটি কি, তাহা প্রথমে স্থির করিতেই হয়; এবং একবার এই আবশ্যকতা স্বীকার করিলেই সমগ্র আধিভৌতিক পক্ষ খোঁড়া হইয়া পড়ে। কারণ, সুখদুঃখাদি সমস্ত বিষয়োপভোগই নাম-রূপাত্মক সুতরাং অনিত্য ও বিনশ্বর মায়া-গণ্ডীরই মধ্যে পড়ে; তাই কেবল এই সকল বাহ্য প্রমাণের আধারে সিদ্ধ কোন নীতিনিয়মই নিত্য হইতে পারে না। আধিভৌতিক বাহ্য সুখদুঃখের কল্পনা যেমন যেমন বদলাইবে, সেই অনুসারেই তাহার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নীতিধর্ম্মেরও বদল হইবে। তাই, নিত্যপরিবর্ত্তনশীল নীতিধর্ম্মের এই অবস্থা এড়াইতে হইলে, মায়াজগতের বিষয়োপভোগ ছাড়িয়া, নীতিধর্ম্মের ইমারৎ "সর্ব্বভূতে এক আত্মা" এই অধ্যাত্মজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর খাড়া করিতেই হয়। কারণ, আত্মা ব্যতীত জগতে কোন বস্তুই নিত্য নহে ইহা পূর্ব্বেই নবম প্রকরণে বলিয়াছি। "ধর্ম্মো নিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে"—নীতি কিংবা সদাচরণের ধর্ম্ম নিত্য এবং সুখদুঃখ অনিত্য, এই ব্যাসবচনের ইহাই তাৎপর্য্য। দুষ্ট ও লোভী লোকদিগের সমাজে, অহিংসা এবং সত্য প্রভৃতি নিত্য নীতিধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করা যায় না, ইহা সত্য; কিন্তু তাহার দোষ এই নিত্য নীতি-ধর্ম্মের উপর আরোপ করা উচিত নহে। সূর্য্যের কিরণের দ্বারা কোন পদার্থের ছায়া, সমতল প্রদেশের উপর সমতল এবং উচুনীচু স্থানের উপর উচুনীচুভাবে পড়িয়া থাকে, তাই বলিয়া, ঐ ছায়া আসলেই উচুনীচু এই অনুমান যেরূপ করা যায় না, সেইরূপ দুষ্টলোকদিগের সমাজে, নীতিধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা-শুদ্ধস্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না বলিয়া ইহা বলিতে পারা যায় না যে, অপূর্ণাবস্থ সমাজে পরিলক্ষিত নীতিধর্ম্মের অপূর্ণস্বরূপই মুখ্য কিংবা মূলগত। এই দোষ সমাজের, নীতির নহে। তাই, যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি শুদ্ধ ও নিত্য নীতিধর্ম্মের সহিত ঝগড়া করিতে না বসিয়া, সমাজ যাহাতে উত্তরোত্তর উচ্চ পৈঠায় উঠিয়া শেষে পূর্ণাবস্থায় পৌঁছিতে পারে সেইরূপ প্রযত্ন করিয়া থাকেন। লোভী মনুষ্যদিগের সমাজে এইরূপ ভাবে চলিবার কালেই নিত্য নীতিধর্ম্মের কোন ব্যতিক্রম স্থল অপরিহার্য্য বলিয়া আমাদের শাস্ত্রকারেরা মানিলেও তাহার জন্য তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য আধিভৌতিক নীতিশাস্ত্র এই ব্যতিক্রম নির্দ্ধারণ করিবার সময়, তদুপযোগী বাহ্য ফলের তারতম্য-তত্ত্বকেই ভ্রমক্রমে নীতির মূলতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। এইরূপ ভেদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে আমি কেন দেখাইয়াছি তাহারও মর্ম্ম এক্ষণে পাঠকের উপলব্ধি হইবে।

স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানীপুরুষের বুদ্ধি ও আচরণই নীতি-শাস্ত্রের ভিত্তি; এবং তাহা হইতে নিঃসৃত নীতির নিয়ম—নিত্য হইলেও—সমাজের অপূর্ণাবস্থায় তাহার অল্পবিস্তর বদল করিতে হয়; এবং এইরূপে বদলাইলেও তাহার দ্বারা নীতিনিয়মের নিত্যত্বের কোনই বাধা হয় না, ইহা বলিয়াছি। এক্ষণে, স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানীপুরুষ অপূর্ণা-বস্থ সমাজে যে আচরণ করেন তাহার বীজ কিংবা মূলতত্ত্ব কি, এই প্রথম প্রশ্নের বিচার করিব। এই বিচার দুইপ্রকারে করা যাইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে চতুর্থ প্রকরণে বলিয়াছি; এক—কর্ত্তার বুদ্ধিকে প্রধান মনে করিয়া, এবং দ্বিতীয়—তাহার বাহ্য অনুষ্ঠান ধরিয়া। তন্মধ্যে, কেবল দ্বিতীয়োক্ত দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে যে ব্যবহার করেন তাহা প্রায় সমস্ত লোকের হিতকরই হইয়া থাকে। পরমজ্ঞানী সৎপুরুষ "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" অর্থাৎ প্রাণীমাত্রের কল্যাণে নিরত, এইরূপ গীতায় দুইবার উক্ত হইয়াছে (গী. ৫. ২৫; ১২. ৪); এবং এই অর্থই মহাভারতেও আরো অনেক স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ অহিংসাদি যে নিয়মসমূহ পালন করিয়া থাকেন তাহাই ধর্ম্ম কিংবা

সদাচারের আদর্শ তাহা আমি উপরে বলিয়াছি। এই অহিংসাদি নিয়ম কেন হইয়াছে অথবা এই ধর্ম্মের লক্ষণ কি, তাহা বলিবার সময় "অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতহিতং পরম্" (বন. ২০৬. ৭৩)—অহিংসা ও সত্যভাষণ এই নীতিধর্ম্ম সর্ব্বভূতের হিতার্থ হইয়াছে; "ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ" (শা. ১০৯. ১২)—জগৎকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম্ম; "ধর্ম্মং হি শ্রেয় ইত্যাহুঃ" (অনু. ১০৫. ১৪)—কল্যাণই ধর্ম্ম; "প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্" (শাং ১০৯. ১০)—লোকদিগের অভ্যুদয়ের জন্যই ধর্ম্মাধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে; কিংবা "লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্ম্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ; উভয়ত্র সুখোদর্কঃ" (শাং ২৫৮. ৪)—লোকব্যবহার চালাইয়া উভয়লোকে কল্যাণ হইবে এই জন্যই ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ম করা হইয়াছে;—এইরূপ ধর্ম্মের বাহ্য উপযোগ-প্রদর্শক অনেক বচন মহাভারতে আছে। সেইরূপ আবার, ধর্ম্মাধর্ম্মের সংশয়স্থলে জ্ঞানী পুরুষও—

লোকযাত্রা চ দ্রষ্টব্যা ধর্ম্মশ্চাত্মহিতানি চ।

"লোকব্যবহার, নীতিধর্ম্ম ও নিজের কল্যাণ—এই বাহ্য বিষয়ের-তারতম্যের দ্বারা বিচার করিয়া" (অনু. ৩৭. ১৬; বন. ২০৬. ৯০) তাহার পর কি করিতে হইবে তাহা স্থির করিবে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং বনপর্ব্বে শিবিরাজা ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ার্থ এই যুক্তিরই উপযোগ করিয়াছেন (বন. ১৩১. ১১ ও ১২ দেখ)। এই বচন হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সমাজের উৎকর্ষই স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণের 'বাহ্যনীতি'; এবং ইহা যদি সত্য হয় তবে 'অধিক লোকের অধিক সুখ' কিংবা (সুখশব্দকে ব্যাপক করিয়া) 'হিত' বা 'কল্যাণ' এইরূপ আধিভৌতিকবাদীদিগের যে নীতিতত্ত্ব তাহা অধ্যাত্মবাদীও কেন স্বীকার করেন না, এইরূপ প্রশ্ন পরে সহজই হয়। চতুর্থ প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি যে, 'অধিক লোকের অধিক সুখ' সূত্রে বুদ্ধির আত্মপ্রসাদজনিত সুখের কিংবা উন্নতির এবং পারলৌকিক কল্যাণের অন্তর্ভাব হয় না—এই উহার এক বড় দোষ। কিন্তু 'সুখ' শব্দের অর্থকে আরও অধিক ব্যাপক করিয়া এই দোষ অনেকাংশে দূর করা যায়; এবং নীতিধর্ম্মের নিত্যত্বসম্বন্ধে উপরে যে আধ্যাত্মিক উপপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, কেহ কেহ তাহারও গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে করেন না। তাই নীতিশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক মার্গের মধ্যে গুরুত্বের ভেদটি কি, এইখানে তাহার আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

কোন কর্ম্ম নীতিদৃষ্টিতে উচিত কি অনুচিত, তাহার বিচার দুই প্রকারে করা যাইতে পারে:—(১) সেই কর্ম্মের নিছক্ বাহ্য ফল অর্থাৎ জগতের উপর তাহার দৃশ্য পরিণাম কি ঘটিয়াছে কিংবা ঘটিবে তাহা দেখিয়া; এবং (২) উক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতার বুদ্ধি অর্থাৎ বাসনা কিরূপ তাহা দেখিয়া। প্রথমটিকে আধিভৌতিক মার্গ বলে। দ্বিতীয়টিতে আবার দুই পক্ষের উদ্ভব হয়, এবং এই দুই পক্ষের দুই ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব প্রকরণসমূহে উক্ত হইয়াছে যে, শুদ্ধ কর্ম্ম করিতে হইলে বাসনাত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ রাখা চাই এবং বাসনাত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিতে গেলে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের নির্ণয় করিবার বুদ্ধিও স্থির সম ও শুদ্ধ হওয়া চাই। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাহারও কর্ম্ম শুদ্ধ কিনা দেখিবার জন্য তাহার বাসনাত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ আছে কি না তাহা দেখা আবশ্যক, এবং বাসনাত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ আছে কিনা দেখিতে হইলে শেষে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ আছে কিনা দেখাও আবশ্যক। সারকথা, কর্ত্তার বুদ্ধি অর্থাৎ বাসনা শুদ্ধ আছে কি না ইহার নিষ্পত্তি শেষে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির শুদ্ধতা দ্বারাই করিতে হয় (গী. ২. ৪১)। এই ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে সদসদ্‌বিবেচনশক্তিরূপে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া মানিলে তাহাই আধিদৈবিক মার্গ হইয়া যায়। কিন্তু এই বুদ্ধি স্বতন্ত্র দেবতা নহে, আমাদের আত্মার এক অন্তরিন্দ্রিয়মাত্র; সেই জন্য বুদ্ধিকে প্রধান মনে না করিয়া আত্মাকে প্রধান মানিয়া বাসনার শুদ্ধতার বিচার করিলে তাহাই নীতিনির্ণয়ের আধ্যাত্মিক মার্গ হইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, এই সমস্ত মার্গের মধ্যে আধ্যাত্মিক মার্গ শ্রেষ্ঠ; এবং প্রসিদ্ধ জর্ম্মন তত্ত্ববেত্তা কাণ্ট ব্রহ্মাত্মৈক্যের সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে না বলিলেও তিনি স্বীয় নীতিশাস্ত্রের বিচার-আলোচনা, শুদ্ধ বুদ্ধি হইতে অর্থাৎ একপ্রকার অধ্যাত্মদৃষ্টি হইতেই সুরু করিয়াছেন, এবং এইরূপ কেন করিতে হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ উপপত্তিও তিনি দিয়াছেন।* গ্রীনের অভিপ্রায়ও এইরূপই। কিন্তু এই বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা এই গ্রন্থে করা সম্ভব নয়। নীতিমত্তার সম্যক্ নির্ণয় করিবার জন্য কর্ম্মের বাহ্য ফল অপেক্ষা কর্ত্তার শুদ্ধ বুদ্ধির প্রতি কেন বিশেষ লক্ষ্য করিতে হয়, তাহা দুই একটি উদাহরণ দিয়া পূর্ব্বে চতুর্থ প্রকরণে আমি স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছি; এবং এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে, ১৫শ প্রকরণে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নীতিমার্গের তুলনা করিবার সময় করা যাইবে। আপাততঃ এইটুকুই বলিতেছি যে, যে-কোন কর্ম্ম করিবার সময় সেই কর্ম্ম করিবার বুদ্ধি প্রথমে আবশ্যক হয় বলিয়া কর্ম্মের ঔচিত্যানৌচিত্যের বিচারও সর্ব্বাংশে বুদ্ধির শুদ্ধাশুদ্ধতার বিচারের উপর নির্ভর করে। বুদ্ধি খারাপ হইলে কর্ম্মও খারাপ হইবে; কিন্তু কেবলমাত্র বাহ্য কর্ম্ম খারাপ হইলে তাহা হইতে বুদ্ধিও খারাপ হইবেই হইবে এরূপ অনুমান করা যায় না। কারণ, ভ্রমক্রমে, ভুল বুঝিবার দরুণ কিংবা অজ্ঞানে ঐরূপ কর্ম্ম হইতে পারে এবং তাহার পর সেই কর্ম্মকে নীতিদৃষ্টিতে খারাপ বলিতে পারা যায় না। 'অধিক লোকের অধিক সুখ' এই নীতিতত্ত্ব কেবল বাহ্য পরিণাম সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে; এবং এই সুখ-দুঃখাত্মক বাহ্য পরিণাম নিশ্চিতরূপে গণনা করিবার বাহ্য সাধন যখন অদ্যাপি বাহির হয় নাই তখন নীতিমত্তার এই কষ্টিপাথরের দ্বারা সর্ব্বদাই যথার্থ নির্ণয় হইবার ভরসাও করা যায় না। সেইরূপ মনুষ্য যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, তাহার বুদ্ধি যদি শুদ্ধ না হয় তবে সে প্রত্যেক অবসরেই ধর্ম্মাচরণ করিবে তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ তাহার যেখানে স্বার্থ আছে সেখানে ত কথাই নাই—স্বার্থে সর্বে বিমুহ্যন্তি যেঽপি ধর্ম্মবিদো জনাঃ (মভা. বি. ৫১. ৪)। সারকথা, মানুষ যতই জ্ঞানী, ধর্ম্মবেত্তা

* See Kant's *Theory of Ethics*, trans, by Abbot. 6th *Ed*, especially *Metaphysics of Morals* therein.

বা বুদ্ধিমান হউক না, তাহার বুদ্ধি যদি সর্ব্বভূতে সম না হইয়া থাকে তবে তাহার কর্ম্ম সর্ব্বদাই শুদ্ধ কিংবা নীতি-দৃষ্টিতে নির্দ্দোষ হইবে এরূপ কোন কথা নাই। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নীতির বিচার করিবার সময়, কর্ম্মের বাহ্য ফল অপেক্ষা কর্ত্তার বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিয়া বিচার করিতে হইবে; সাম্য বুদ্ধিই সদাচরণের প্রকৃত বীজ। এবং ভগবদ্‌গীতায় অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥*

তাহারও মর্ম্ম এই। কেহ কেহ এই শ্লোকে (গী. ২. ৪৯) বুদ্ধির অর্থ জ্ঞান বুঝিয়া বলেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুয়ের মধ্যে এখানে জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমার মতে এই অর্থ ভ্রান্তিমূলক। এই স্থলের শাঙ্করভাষ্যেতেও বুদ্ধিযোগের অর্থ 'সমত্ববুদ্ধিযোগ' করা হইয়াছে; এবং এই শ্লোক কর্ম্মযোগের প্রকরণে আসিয়াছে। তাই বস্তুতঃ উহার কর্ম্মমূলক অর্থই করিতে হয়; এবং সোজাসুজি ঐ অর্থই খাটে। কর্ম্ম করিবার লোক দুই প্রকারের হইয়া থাকে; এক ফলের দিকে—উদাহরণ যথা, তাহা হইতে কত লোকেরই কত সুখ হইবে, সেই দিকে—নজর দিয়া যে কাজ করে; এবং দ্বিতীয় বুদ্ধিকে সম ও নিষ্কাম রাখিয়া যে কাজ করে, আবার কর্ম্মধর্ম্মসংযোগে যে পরিণামই হউক তাহাও সংঘটিত করে। তন্মধ্যে 'ফলহেতবঃ' অর্থাৎ "ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করিবার" লোককে নৈতিক দৃষ্টিতে কৃপণ অর্থাৎ লঘুচেতা স্থির করিয়া সমত্ববুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার লোকদিগকে এই শ্লোকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এই শ্লোকের প্রথম দুই চরণে এই যাহা বলা হইয়াছে যে, 'দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়'—হে ধনঞ্জয়! সমত্ববুদ্ধিযোগাপেক্ষা কেবলমাত্র কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট—তাহার তাৎপর্য্য ইহাই; এবং অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ভীষ্মদ্রোণদিগকে আমি কেমন করিয়া বধ করিব?" তাহারও ইহাই উত্তর। ইহার ভাবার্থ এই যে, মরা কিংবা মারা—শুধু এই ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য না করিয়া 'মনুষ্য কোন্ বুদ্ধিতে ঐ কাজ করে' ইহার প্রতিই দৃষ্টি করা আবশ্যক; সেই জন্য এই শ্লোকের তৃতীয় চরণে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, "তুমি বুদ্ধির অর্থাৎ সমবুদ্ধির আশ্রয় লও" এবং তাহার পর উপসংহারাত্মক অষ্টাদশ অধ্যায়েও ভগবান্ পুনর্ব্বার বলিয়াছেন যে, "বুদ্ধিযোগের আশ্রয় করিয়া তুমি আপন কর্ম্ম কর"। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আর এক শ্লোকেও ব্যক্ত হয় যে, গীতা নিছক কর্ম্মের বিচারকে কনিষ্ঠ মনে করিয়া সেই কর্ম্মের প্রেরক বুদ্ধির বিচারকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে কর্ম্মের ভালমন্দ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। যদি শুধু কর্ম্মফলের দিকেই গীতার লক্ষ্য হইত তাহা হইলে ভগবান্ ইহাই বলিতেন যে, অধিক লোকের যাহাতে সুখ হয় সেই কর্ম্মই সাত্ত্বিক। কিন্তু তাহা না বলিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, "ফলাশা ছাড়িয়া নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম তাহাই সাত্ত্বিক কিংবা উত্তম" (গী. ১৮·২৩)। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, কর্ম্মের বাহ্য ফল অপেক্ষা কর্ত্তার নিষ্কাম, সম ও নিঃসঙ্গ বুদ্ধিরই, কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার করিবার সময় গীতা অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন; এই নীতিসূত্রই স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণসম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে সিদ্ধ হয় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ যে সাম্যবুদ্ধির দ্বারা নিজের সমান, ছোট ও সাধারণ লোকের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই সাম্যবুদ্ধিই তাঁহার আচরণের প্রকৃত বীজ; এবং এই আচরণের দরুণ সর্ব্বভূতের যে হিত হয়, তাহা সেই সাম্যবুদ্ধির শুধু বাহ্য ও আনুষঙ্গিক পরিণাম। সেইরূপই যাঁহার বুদ্ধি পূর্ণ সাম্যাবস্থায় পৌঁছিয়াছে সেই ব্যক্তি, লোকের কেবল আধিভৌতিক সুখ লাভ করাইবার জন্যই নিজের সমস্ত কর্ম্ম করিবেন না। তিনি অন্যের ক্ষতি করিবেন না, ইহা সত্য; কিন্তু ইহা তাঁহার মুখ্য ধ্যেয় বিষয় নহে। সমাজে অবস্থিত মনুষ্যের বুদ্ধি অধিকাধিক শুদ্ধ হইয়া নিজের মতোই শেষে সমস্ত লোক যাহাতে আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থায় পৌঁছিতে পারে স্থিতপ্রজ্ঞ সেইরূপ প্রযত্ন করিয়া থাকেন। মনুষ্যের কর্ত্তব্যের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ ও সাত্ত্বিক কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র আধিভৌতিক সুখবৃদ্ধির প্রযত্নকে আমি গৌণ কিংবা রাজসিক বলিয়া মনে করি।

গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম্মাকর্ম্মনির্ণয়ার্থ কর্ম্মের বাহ্য ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কর্ত্তার শুদ্ধ বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। ইহার উপর কতকগুলি লোকের এইরূপ তর্কপূর্ণ মিথ্যা আপত্তি আছে যে, যদি কর্ম্মফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল শুদ্ধ বুদ্ধিরই এইরূপ বিচার করি তবে মানিতে হইবে যে, শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্য কোনও দুষ্কর্ম্ম করিতে পারেন, এবং তখন তো তিনি সমস্ত দুষ্কর্ম্মই করিবার অধিকার পাইবেন! এই আপত্তি আমি কেবল আমারই কল্পনা হইতে বাহির করিয়াছি এরূপ নহে;—কোন কোন পাদ্রী বাহাদুর গীতাধর্ম্মের উপর এই কথা আরোপ করিয়াছেন, তাহা আমার নজরে আসিয়াছে*। কিন্তু এই আরোপ কিংবা আপত্তি নিতান্তই মূর্খতাসূচক কিংবা দুরাগ্রহব্যঞ্জক এইরূপ বলিতে আমার কোন দ্বিধা হয় না। অধিক-কি, ইহা বলিতেও কোন বাধা নাই যে, আফ্রিকার কোন কালোকুচকুচে অসভ্য মনুষ্য সুসভ্য রাষ্ট্রের নীতিতত্ত্বের ধারণা করিবার যেরূপ অযোগ্য ও অসমর্থ সেইরূপই এই পাদ্রী ভদ্রলোকদিগের বুদ্ধি, বৈদিক ধর্ম্মোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থা শুধু ধারণা করিতেও স্বধর্ম্মের ব্যর্থ দুরাগ্রহবশতঃ কিংবা অন্য কোন খারাপ ও দুষ্ট মনোবিকারবশতঃ অসমর্থ হইয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞানী কাণ্ট স্বকীয় নীতিশাস্ত্র-সংক্রান্ত গ্রন্থের অনেক স্থানে লিখিয়াছেন যে, কর্ম্মের বাহ্য ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নীতিনির্ণয়ার্থ কর্ত্তার

* এই শ্লোকের সরল অর্থ এইরূপ—'হে ধনঞ্জয়! (সম-) বুদ্ধির যোগাপেক্ষা (শুধু) কর্ম্ম খুবই নিকৃষ্ট। (তাই) (সম-) বুদ্ধিকেই আশ্রয় কর। ফলের দিকে নজর রাখিয়া যে কর্ম্ম করে সে (পুরুষ) কৃপণ অর্থাৎ লঘুস্বভাব"।

* কলিকাতায় এক 'মিশনরি' এইরূপ বিধান করায়, মিঃ ব্রুক্‌স্ তাহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা তাঁহার *Kurukshetra* (কুরুক্ষেত্র) নামক মুদ্রিত প্রবন্ধের শেষে জুড়িয়া দিয়াছেন—তাহা দেখ (*Kurukshetra* Vyasashrama, Adyar, Madras, pp. 48-52.)

বুদ্ধিরই বিচার করিতে হইবে। * কিন্তু সেই সম্বন্ধে কেহ এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া দেখি নাই। তবে উহা গীতার নীতিতত্ত্বসম্বন্ধেই কিরূপে যুক্ত হইবে? বুদ্ধি সর্ব্বভূতে সম হইলেই পরোপকার করা সেহস্বভাবই হইয়া পড়ে; এবং তাহার পর, অমৃত হইতে মৃত্যু আসা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ পরমজ্ঞানী ও পরমশুদ্ধবুদ্ধির পুরুষের দ্বারা কুকর্ম্ম ঘটা অসম্ভব হয়। কর্ম্মের বাহ্য ফলের বিচার না করিতে যখন গীতা বলেন, তখন তাহার অর্থ ইহা নহে যে, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, তবে গীতা বলেন এই যে, যখন বাহ্যতঃ পরোপকার করিবার ভান, দম্ভ কিংবা লোভবশতঃ কেহ করিতেও পারে, কিন্তু সর্ব্বভূতে এক আত্মার উপলব্ধির দ্বারা বুদ্ধিতে যে স্থৈর্য্য ও সমতা আসে, তাহার ভান কেহ করিতে পারে না; তখন কোনও কার্য্যের ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিচার করিবার সময়, কর্ম্মের বাহ্য পরিণাম অপেক্ষা কর্ত্তার বুদ্ধির প্রতিই সমুচিত লক্ষ্য করা আবশ্যক। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, নীতিমত্তা শুধু জড় কর্ম্মের মধ্যে অবস্থিত নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তার বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া থাকে, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত। গীতাতেই পরে বলা হইয়াছে যে, এই আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তের অন্তর্গত প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া কেহ যদি যাহা ইচ্ছা তাহাই করে তবে সেই ব্যক্তিকে রাক্ষসী কিংবা তামসিক প্রকৃতির লোক বলিতে হইবে (গী. ১৮. ২৫)। একবার বুদ্ধি সম হইলে পর সেই ব্যক্তিকে পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বেশী কিছু উপদেশ করিতে হয় না; এই তত্ত্বটির প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া তুকারাম বাবা শিবাজী মহারাজাকে এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন—

কল্যাণকারক অর্থ যাচা এক।
সর্ব্বাভূ'তী দেখ এক আত্মা॥

অর্থাৎ—ইহার একই কল্যাণকর অর্থ, সর্ব্বভূতে এক আত্মাকে দেখ (তু. গা. ৪৪২৮. ৯); ইহাতেও ভগবদ্গীতার ন্যায় কর্ম্মযোগের একই তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে পুনর্ব্বার বলা আবশ্যক যে, সাম্যবুদ্ধিই সদাচরণের বীজ হইলেও, ইহা হইতে এইরূপও অনুমান করা উচিত নহে যে, পূর্ণ শুদ্ধ বুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মকারীকে হাত গুটাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতে হইবে। স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধি ধারণ করাই পরম ধ্যেয়; কিন্তু গীতার আরম্ভেই এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, এই পরম ধ্যেয়ের পূর্ণরূপে সিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা না করিয়া যতটা পারা যায় ততটাই নিষ্কাম বুদ্ধিতে প্রত্যেক মনুষ্য নিজের কর্ম্ম করিয়া যাইবে; তাহাতেই বুদ্ধি অধিকাধিক শুদ্ধ হইয়া শেষে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়। পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হইলে কর্ম্ম না-করিবার আগ্রহ ধরিয়া বৃথা কালহরণ করিবে না (গী. ২. ৪০)।

'সর্ব্বভূতহিত' কিংবা 'অধিক লোকের অধিক কল্যাণ' এই নীতিতত্ত্ব শুধু বাহ্য কর্ম্মের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়া শাখাগ্রাহী ও সংকীর্ণ; 'সর্ব্বভূতে এক আত্মা' স্থিতপ্রজ্ঞের এই সাম্যবুদ্ধি মূলগ্রাহী হওয়ায় উহাকেই নীতিনির্ণয়ের কাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে। এই কথাটি এইরূপে সিদ্ধ হইলেও এই সম্বন্ধে কাহারও কাহারও আপত্তি আছে যে, উহার দ্বারা ব্যবহারিক আচরণের ঠিক্ উপপত্তি পাওয়া যায় না। প্রায়ই সন্ন্যাসমার্গীয় স্থিতপ্রজ্ঞের জাগতিক ব্যবহার দেখিয়াই আপত্তিকারীদিগের মনে এই আপত্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু অল্প বিচারান্তে যে কোন ব্যক্তিরই সহজে উপলব্ধি হইবে যে, স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্মযোগীর ব্যবহারে এ আপত্তি খাটে না। অধিক কি, সর্ব্বভূতে এক আত্মা কিংবা আত্মৌপম্যবুদ্ধিরূপ তত্ত্বের দ্বারা ব্যবহারিক নীতিধর্ম্মের যেরূপ সম্যক্ উপপত্তি হয়, সেরূপ অন্য কোন তত্ত্বের দ্বারা হয় না বলিলেও চলে। উদাহরণ যথা—সমস্ত দেশে ও সমস্ত নীতিশাস্ত্রে যাহাকে প্রধান বলিয়া মানে, সেই পরোপকারধর্ম্মকেই ধর না কেন। 'অন্যের যে আত্মা তাহাই আমার আত্মা' এই অধ্যাত্মতত্ত্বের দ্বারা পরোপকার ধর্ম্মের যেরূপ উপপত্তি হয় সেরূপ কোনও আধিভৌতিকবাদের দ্বারা হয় না। বড়জোর আধিভৌতিক শাস্ত্র ইহাই বলিতে পারেন যে, পরোপকার-বুদ্ধি এক নৈসর্গিকগুণ এবং উহা উৎক্রান্তিবাদানুসারে বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু এইটুকু হইতে পরোপকারের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না শুধু নহে, অধিকন্তু স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে ঝগড়া বাধিলে এই দুই ঘোড়ার উপর সওয়ার হইতে ইচ্ছুক চতুর স্বার্থী ব্যক্তিও আপন মতলব সম্মুখে ঠেলিয়া লইবার এই জন্য সুযোগ পায়। এই কথা আমি পূর্ব্বে চতুর্থ প্রকরণে বলিয়াছি। কিন্তু এই সম্বন্ধেও কেহ কেহ বলেন যে, পরোপকার-বুদ্ধির নিত্যত্ব সিদ্ধ করিয়া লাভই বা কি হইবে? সর্ব্বভূতে একই আত্মা আছে মানিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সদাসর্ব্বদা সর্ব্বভূতেরই হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহার নিজের কাজ কিরূপে চলিবে? এবং এইরূপ নিজের যোগক্ষেম না চালাইতে পারিলে সে অপর লোকের কল্যাণ কি প্রকারে করিবে? কিন্তু এই আশঙ্কা অকাট্য কিংবা নূতনও নহে। ভগবান্ গীতাতেই এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন যে—"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" (গী. ৯. ২২) এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের যুক্তি দ্বারাও ঐ অর্থই নিষ্পন্ন হয়। লোককল্যাণ করিবার বুদ্ধি যাহার হইয়াছে সে ব্যক্তি খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া দিবে এরূপ নহে; তবে আমি লোকের উপকারের জন্যই দেহ ধারণও করি-

* "The second proposition is: That an action done from duty derives its moral worth, *not from the purpose* which is to be attained by it, but from the maxim by which it is determined." The moral worth of an action "cannot lie anywhere but in the *principle of the will*, without regard to the ends which can be attained by action." Kants *Metaphysic of Morals* (trans, by Abbott, in Kants *Theory of Ethics*, p. 16. The italics are author's and not our own). And again "When the question is of moral worth, it is not with the actions which we see that we are concerned, but with those inward principles of them which we do not see. p. 24. *Ibid.*

তেছি, এইরূপ তাহার বৃদ্ধি হওয়া চাই। জনক বলিয়াছেন যে, এইরূপ বৃদ্ধি হইলেই ইন্দ্রিয়গণ আপনার অধীন হয় এবং লোককল্যাণ সাধিত হয় (মভা. অশ্ব. ৩২); এবং মীমাংসকদিগের এই সিদ্ধান্তের অন্তর্গত বীজও এই যে, যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন যে গ্রহণ করে তাহাকে 'অমৃতাশী' বলিতে হইবে (গী. ৪. ৩১)। কারণ, তাঁহাদের দৃষ্টিতে জগতের ভরণপোষণের কর্ম্মই যজ্ঞ, অতএব লোককল্যাণকর কর্ম্ম করিবার সময় তাহা দ্বারাই নিজের জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং করা উচিত তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, নিজের স্বার্থের জন্য যজ্ঞচক্রকে উচ্ছেদ করা ভালো নহে। দাসবোধে শ্রীসমর্থ রামদাসস্বামীও বর্ণনা করিয়াছেন যে—

তো পরোপকার করিত চ গেলা।
পাড়িলে তো জ্যালা ত্যালা।
মগ কায উণে ত যালা।
ভূমণ্ডলী॥

অর্থাৎ—সে পরোপকারই করিতে থাকে, তাহার প্রয়োজনের জন্য সকলেই প্রস্তুত, পৃথিবীতে তাহার অভাব কি (১৯. ৪. ১০)? ব্যবহারদৃষ্টিতে দেখিলেও নিজের অভিজ্ঞতায় জানা যায় যে, এই উপদেশ সমস্তই যথার্থ। সারকথা, জগতে দেখা যায় যে, লোককল্যাণার্থ যে চেষ্টা করে সে ব্যক্তির যোগক্ষেম কখনও আটকাইয়া থাকে না। কেবল পরার্থ করিতে হইলে তাহাকে নিষ্কামবুদ্ধিতে প্রস্তুত থাকা চাই। সমস্ত লোক আমার নিজের মধ্যে এবং আমি নিজে সমস্ত লোকের মধ্যে এই ভাবনা একবার দৃঢ় হইলে পর, স্বার্থ পরার্থ হইতে ভিন্ন কিনা এই প্রশ্নও উপস্থিত হইতে পারে না। 'আমি' ভিন্ন ও 'লোকেরা' ভিন্ন এই আধিভৌতিক দ্বৈতবুদ্ধিতে 'অধিক লোকের অধিক সুখ' সম্পাদন করিতে যে প্রবৃত্ত হয় তাহার মনে উপরি-উক্ত মিথ্যা সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই অদ্বৈতবুদ্ধিতে পরোপকার করিতে যে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার এই সন্দেহ থাকে না। সর্ব্বভূতাত্মৈক্যবুদ্ধিতে নিষ্পন্ন সর্ব্বভূতহিতের এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, এবং স্বার্থ ও পরার্থরূপী দ্বৈতের অর্থাৎ অধিক লোকের সুখের তারতম্য হইতে নিঃসৃত লোককল্যাণের আধিভৌতিক তত্ত্বের মধ্যে এইটুকুই ভেদ তাহা মনে রাখা আবশ্যক। লোককল্যাণের হেতুটি মনে পোষণ করিয়া সাধুপুরুষ লোককল্যাণ করেন না। আলো দেওয়া যেরূপ সূর্য্যের স্বভাব, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মনে সর্ব্বভূতাত্মৈক্যের পূর্ণ উপলব্ধি হইলে, লোককল্যাণ করা এই সাধুপুরুষদিগের সহজ স্বভাব হইয়া যায়; এবং এইরূপ স্বভাব হওয়া গেলে, সূর্য্য যেরূপ অন্যকে আলো দিবার সময় আপনাকে আপনি আলোকিত করেন, সেইরূপ সাধুপুরুষের পরার্থ উদ্যোগের দ্বারাই তাঁহার যোগক্ষেমও স্বতই সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরোপকার করিবার এই দেহস্বভাব এবং অনাসক্ত-বুদ্ধির একত্র মিলন হইলে পর যতই সঙ্কট আসুক না কেন, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কিংবা সঙ্কট সহ্য করা ভাল অথবা যে লোককল্যাণের পরিবর্ত্তে এই সঙ্কট আসিয়াছে তাহাকে ত্যাগ করা ভাল ইহার বিচারমাত্র না করিয়া, ব্রহ্মাত্মৈক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট সাধুপুরুষ নিজের কার্য্য সম্পানই করিতে থাকেন; এবং প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে দেহপাত হইলেও তাহার জন্য চিন্তা করেন না! কিন্তু স্বার্থ ও পরার্থ ভিন্ন মনে করিয়া দাঁড়িপাল্লার কাঁটা কোন্ দিকে ঝুঁকিতেছে তাহা দেখিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিতে যাহারা শিখিয়াছে, তাহাদের লোককল্যাণের ইচ্ছা এতটা তীব্র কখনই হইতে পারে না। তাই সর্ব্বভূতহিতের তত্ত্ব ভগবদ্গীতার সম্মত হইলেও, তাহার উপপত্তি অধিক লোকের অধিক বাহ্য সুখের তারতম্যের দ্বারা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া, অনেক লোক কি কম লোক, তাহাদের অধিক সুখ কি কম সুখ—এইরূপ বিচারকে আগন্তুক সুতরাং হীন স্থির করিয়া, শুদ্ধ ব্যবহারের বীজভূত সাম্যবুদ্ধির উপপত্তি, অধ্যাত্মশাস্ত্রের নিত্য ব্রহ্মজ্ঞানের আধারে গীতায় বিবৃত হইয়াছে।

শোক-সংবাদ।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে আদিব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি পৌত্র ও একটি পৌত্রী বিগত ২২শে আশ্বিন একই দিবসে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পৌত্রটির বয়স মাত্র দুই বৎসর ও পৌত্রীটির বয়স মাত্র ১॥০ মাস হইয়াছিল।

আমরা এই শোকার্ত্ত পরিবারকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

৺অজ প্রকাশ ভদ্র :—আমরা দুঃখের সহিত অবগত হইলাম যে আদিসমাজের ভূতপূর্ব্ব সঙ্গীতাচার্য্য সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীঅজপ্রকাশ ভদ্র মহাশয় বিগত ১১ই আশ্বিন পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি গম্ভীর ও সতেজ ছিল। পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার গান শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি। ভগবান্ শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তি প্রদান করুন প্রার্থনা করি।

৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী :—বিগত ১৮ই আশ্বিন সোমবার "নব্যভারত" সম্পাদক অক্লান্তকর্ম্মা শ্রদ্ধেয় দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমন সংবাদে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্যিক জগতে দেবীপ্রসন্নের নাম সুপরিচিত। তাঁহার লিখিত পুস্তিকাগুলি চিন্তাশীলতার ও স্পষ্টবাদীতার পরিচায়ক। সাহিত্যসাধনা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল; সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। সকল বিষয়ে স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা তাঁহার চরিত্রের মহৎ গুণ—তিনি নিরহঙ্কার, আত্মনির্ভরশীল, তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। বহুলোকের তিনি নিঃস্বার্থচিত্তে উপকার করিয়া গিয়াছেন; দুর্ভিক্ষাদির সময় নিজহস্তে চাউল বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহান্তে আমরা একজন অকপটচিত্ত বন্ধুকে হারাইলাম। ঈশ্বর শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের অন্তরে শান্তি বর্ষণ করুন ও পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিংশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৯১

৯২৯ সংখ্যা | ১৮৪২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২১—জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

(ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ জি ভাণ্ডারকর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

শ্বেতাশ্বতর ৪. ৬

"পরস্পরের সঙ্গী ও সখা এইরূপ দুই পক্ষী একই বৃক্ষে বাস করে; তন্মধ্যে একটি সেই বৃক্ষের সুস্বাদ ফল আহার করে, অপরটি নিরশন থাকিয়া দর্শন করে।"

ব্রহ্মাণ্ডই এই বৃক্ষ; তাহার উপর বাস করে যে পক্ষী তাহা পরমাত্মা ও জীবাত্মা; তাহারা পরস্পরের সঙ্গী ও সখা। জীবাত্মার অর্থাৎ মনুষ্যের সহচর পরমাত্মা, পরমেশ্বর। এই জন্যই সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে মনুষ্য পরমেশ্বরকে ভজনা করে। আজ পর্য্যন্ত এমন কোন রাষ্ট্র হয় নাই যাহার সমস্ত লোক নাস্তিক। যেখানে মনুষ্য সেইখানেই পরমেশ্বর। বিশ্বমধ্যে মনুষ্যের নিকট পরমেশ্বর প্রকাশ পান। পর্ব্বতে ও উপত্যকায়, নদী ও সমুদ্রে, বনস্পতি ও প্রাণীগণের মধ্যে, পৃথিবীতে ও আকাশে পরমেশ্বরের সামর্থ্য, তাঁহার গাম্ভীর্য্য, তাঁহার গূঢ়তত্ত্ব, তাঁহার যোজনা-কৌশল, তাঁহার শান্তি, তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার অনাদ্যনন্ততা, এই সমস্ত মানবাত্মায় প্রকাশিত হইয়া মনুষ্য তল্লীন হইয়া যায় এবং আপনার সহচর-স্বরূপটি মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। এই পরমেশ্বরকে জানিবার শক্তি মনুষ্যের আছে। এই শক্তি পশুপক্ষীদের মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয় না। এই জন্য সকল দেশের মধ্যেই ধর্ম্ম ও ঈশ্বর-ভক্তির প্রবৃত্তি দেখা যায়।

পরমেশ্বর মনুষ্যের সখা। এই জন্য, পরমেশ্বরের ধ্যান, তাঁহার ভজন, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব—এই সমস্তের যোগে মনুষ্য যে সমাধান, যে শান্তি, যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, তাহা সর্ব্বথা অতুলনীয়। সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য তাহার হস্তগত হইলেও তাহা হইতে সেরূপ সুখ সে লাভ করে না। মনুষ্যের প্রকৃত সুখ অন্যত্র নাই। পরমেশ্বর-স্বরূপের অনুভূতিতে তাহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হয়। আপন ঐহিক মিত্রের সহিত অনেক-দিনের পর সাক্ষাৎ হইলে হৃদয় যেরূপ প্রেমময় হইয়া উঠে, সেইরূপ পরমেশ্বরের দর্শনে হইয়া থাকে। এবং মনুষ্য পরমেশ্বরের সখা বলিয়াই মনুষ্যের অন্তঃকরণগত তমোগুণ উত্তরোত্তর দূর করিয়া তিনি মনুষ্যকে উন্নতির পথে লইয়া যান। সত্য কি, অসত্য কি, ভাল কি, মন্দ কি, পুণ্য কি, পাপ কি, এই বিষয়ে বিবেকযোগে জ্ঞান সম্পাদন করিবার, সত্য, ভাল, ও পুণ্যের প্রতি পূজ্যবুদ্ধি এবং অসত্য, মন্দ ও পাপ সম্বন্ধে তিনি ঘৃণা উৎপন্ন করেন; এবং সত্যকে অবলম্বন করিয়া চলিলে, শান্তিজল এবং অসত্যকে স্বীকার করিলে হৃদয়ে

অসুস্থতা উৎপন্ন করেন। এইরূপে উন্নতির বীজ মনুষ্যের অন্তঃকরণে তিনি রোপণ করিয়াছেন। পরমেশ্বরের সত্য, পবিত্রতা, শান্তি, আনন্দ ইত্যাদি অনেক কল্যাণকর গুণের প্রতি মনুষ্যের স্বভাবতই পূজ্যবুদ্ধি ও প্রীতি আছে। এবং এই সকল গুণ উত্তরোত্তর মনুষ্যের মধ্যে অধিকাধিক উৎপন্ন হইয়া আপন সাদৃশ্য মনুষ্য যাহাতে প্রাপ্ত হয় সেই বিষয়ে পরমেশ্বর সতত যোজনা করিয়া থাকেন। স্বকীয় উন্নত স্বরূপ, বাহ্য জগতে, অন্তঃকরণে ও সামাজিক ব্যবহারে চতুর্দ্দিকে মনুষ্যের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে তিনি প্রকট করেন। পরমেশ্বর ব্যতীত মনুষ্যের গতি নাই। অন্তে পরমেশ্বরের নিকটে গিয়াই মনুষ্য তাহার আত্মার শান্তি ও বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হয়; অন্য কাহারো যোগে নহে। এখানে সুখ পাওয়া যাইবে, সেখানে সুখ পাওয়া যাইবে এই বুদ্ধিতে মনুষ্য যত ইচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াক, যত ইচ্ছা সেই সকল বিষয়ের সেবা করুক। এই প্রকারে মনুষ্য ও পরমাত্মার মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ; কিন্তু পৃথক-রূপ বৃক্ষের সুস্বাদ ফল মনুষ্য খায়, এবং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হইয়া আপনার চিরসঙ্গী ও সুহৃৎকে বিস্মৃত হয়।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
শ্বেতাশ্বতর ৪।৭

"সেই একই বৃক্ষের উপর থাকিয়া, মনুষ্যের আত্মা বৃক্ষের ফলাহারে নিমগ্ন থাকে এবং সত্যসম্বন্ধে ভ্রান্তিতে পড়িয়া নানাবিধ দুর্ব্বলতার যোগে সে শোকে পতিত হয়। কিন্তু অন্য যে সর্ব্বশক্তিমান আপনার সাহায্যকারী আত্মা, সেই আত্মাকে যখন দেখিতে পায় তখন সমস্ত শোক হইতে মুক্ত হয়।"

পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া মনুষ্য বিষয়সুখের মধ্যে আসক্ত হইলে নানা প্রকার দুঃখ সে প্রাপ্ত হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত ঐহিক সুখের মনোরথ ভগ্ন হয়। ধীরে ধীরে অর্জ্জিত সম্পত্তি সহসা নষ্ট হয়। অল্প বয়স হইতে সম্পাদিত যশকীর্ত্তি উত্তর-বয়সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কোন প্রিয় সুহৃৎ কিংবা আত্মীয় সহসা ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করেন এবং তাহাতে আমাদের অন্তঃকরণ শোকে বিহ্বল হয়, আমাদের জীবনও আমাদের নিকট দুঃসহ হইয়া উঠে; সুখ কোথাও নাই, মনের স্ফূর্ত্তি নাই, এইরূপ অবস্থা হয়। বিষয়সমূহের যোগে কামক্রোধাদি বৃত্তি ক্ষুভিত হয়, বিবেক নষ্ট হয়, অতি অসঙ্গত ও ভীষণ কার্য্য আমরা করিয়া থাকি; আমাদের আত্মা মলিন ও পাপী হয়; যতই চেষ্টা করি না কেন, তথাপি মন স্থির, শান্ত ও পবিত্র হয় না। দুর্ব্বাসনা ও কুচিন্তা অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপ অবস্থায়, চিত্ত অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়। এই সমস্ত অবস্থা,—আমাদের স্বাভাবিক সুহৃদকে ছাড়িয়া অন্যত্র ভ্রমণ করা প্রযুক্তেই আমরা প্রাপ্ত হই। যে স্থানে পরম মনোরথ স্থাপন করা ঠিক নহে সেইরূপ স্থানে তাহা স্থাপন করার দরুণই আমরা শোকগ্রস্ত হই। জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল সম্পত্তি ও যশোমান অর্জ্জন করিতে হইবে; এইরূপ মনের সংস্কার হইলে, কাজেই মনোরথ ভগ্ন হইলে শোক অনিবার্য্য। কিন্তু ধন মান যশ এই সমস্ত আনুষঙ্গিক ব্যাপার। আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য পরমেশ্বরের সহিত অধিকাধিক পরিচয় করিয়া তাঁহার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া, সত্য যে জ্ঞান, বাস্তবিক যে আনন্দ, অমূল্য যে শান্তি তাহা সম্পাদন করিয়া শাশ্বত পদ লাভের যোগ্যতা লাভ করি। এইরূপ অন্তঃকরণের পূর্ণ ধারণা হইলে যতই সম্পত্তি নাশ বা মান হানি হউক না কেন, আমাদের তাহাতে কি শোক হইবে? যদি পরমেশ্বরের বৎসল ও আনন্দময় স্বরূপ সতত আমাদের অন্তঃকরণে বিরাজ করে এবং তাঁহাতে আমাদের পরম প্রীতি ও ভক্তি থাকে তাহা হইলে, মৃত্যু কি আমাদের নিকট দুঃসহ হয়? এবং সত্যস্বরূপ, মঙ্গলময় পবিত্র পরমাত্মার যদি সর্বতোভাবে শরণ লই এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁহার উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে দুর্ব্বাসনা ও কুচিন্তাযোগে আমাদের হৃদয় কি চঞ্চল হয় এবং আমরা কি সন্তপ্ত হই? আমাদের বিবেক বলপ্রাপ্ত হয় না কি? কামক্রোধাদি বৃত্তিকে সংযত করিতে আমরা সমর্থ হই না কি? অতএব ইহাই সত্য যে, আমরা পরমেশ্বরকে জানি না, তাঁহার দিকে দৃষ্টি করি না, আপন সুহৃদ্রূপে আমাদের হৃদয়ে তাঁহাকে পোষণ

করি না, এই জন্যই আমরা শোকে পতিত হই। কিন্তু যখন আমরা তাঁহার দিকে আমাদের মুখ ফিরাই, তাঁহাকে আমাদের সখা বলিয়া জানি, তাঁহার অনন্ত শক্তি ও তাঁহার অনন্ত মহিমা, তাঁহার পূর্ণ মঙ্গলভাব ও অসীম আনন্দ আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমরা সর্ব্বশোক হইতে মুক্ত হই।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মুণ্ডক, ২।২।৮

"সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের স্বরূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইলে অন্তঃকরণের শোকরূপ গ্রন্থি চূর্ণ হইয়া যায়, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয় এবং আমাদের কর্ম্মোৎপন্ন সংস্কার নষ্ট হয় (আত্মা শুদ্ধ হয়)।"

পরমেশ্বরের অনন্ত উন্নত শান্ত আনন্দময় সুন্দর ও সত্য স্বরূপ আমাদের উপলব্ধি হইলে, তাঁহার যথার্থ স্বরূপ মানব দৃষ্টি-সম্মুখে নিশ্চল-ভাবে বিদ্যমান থাকিলে, তাঁহার প্রতি আমাদের অসীম ভক্তি ও প্রেম উদিত হয় এবং সমস্ত ক্লেশের নাশ হইয়া আমাদের আত্মা অত্যন্ত শুদ্ধ ও আনন্দে নিমগ্ন হয়। এই প্রকারে পরমেশ্বরে লীন হইলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

২২—ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী।

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥

কঠ ১।২।২১

"শরীরের স্থানে যাঁহার শরীর নাই, যিনি চঞ্চলের স্থানে নিশ্চল, যিনি মহান্ সর্ব্বব্যাপী আত্মা, তাঁহাকে মনন করিয়া বুদ্ধিমান পুরুষ শোক হইতে মুক্ত হয়।"

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

কঠ ১।৩।১৫

"যাঁর শব্দ নাই (সুতরাং কর্ণেন্দ্রিয়ের অগোচর), স্পর্শ নাই (ত্বগিন্দ্রিয়ের অগোচর) রূপ নাই (চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগোচর) যিনি প্রকাশ পান না, যাঁর রস নাই (রসনেন্দ্রিয়ের অগোচর) যিনি অবিনশ্বর, যাঁর গন্ধ নাই (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অগোচর) যিনি অনাদি অনন্ত, যিনি বুদ্ধির অগম্য, যিনি অব্যয় তাঁহার দর্শনে মনুষ্য মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়।"

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথা নিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি॥

শ্বেতাশ্বতর ৩।৭

"তারপর পরব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সর্ব্বভূতে গূঢ় হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন একমাত্র বিশ্বের পরিবেষ্টা যে ঈশ্বর, তাঁহাকে জানিয়া মনুষ্য মোক্ষ লাভ করে।"

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ৫।১৩

"এই গহন গম্ভীর বিস্তারের মধ্যে অনেকরূপ ধারণকারী একমাত্র বিশ্বের পরিবেষ্টা, বিশ্বের স্রষ্টা সেই দেবতাকে জানিয়া মনুষ্য সর্ব্বপাশ হইতে মুক্ত হয়।"

এই বিশ্বের অন্তর্গত বৃক্ষ পাষাণ, পর্ব্বত নদী বিস্তীর্ণক্ষেত্র মহাসাগর আকাশমণ্ডল সূর্য্য ও অসংখ্য তারা—ইহাদের এই সমস্ত বিস্তার দেখিয়া, প্রত্যেক পদার্থের স্বরূপমাত্রের জ্ঞান হইয়া থাকে, আমাদের বুদ্ধি এই মাত্র জ্ঞানেই ক্ষীণ হয়—তাহার পর তাহার গতি কুণ্ঠিত হয়—এরূপ নহে। এই সমস্ত পদার্থ দেখিয়া অন্তঃকরণের মধ্যে বিস্ময় উৎপন্ন হয়, পূজ্যবুদ্ধি উদিত হয়। কিন্তু ঐ সব পদার্থ জড় এবং আমরা মনুষ্য চেতন; চেতনা-পেক্ষা জড় পদার্থ হালকা, কম দরের। তাহার সম্বন্ধে বিস্ময় ও পূজ্যবুদ্ধি আমাদের অন্তঃকরণে উৎপন্ন হয় না। চেতন বস্তুই পূজ্যবুদ্ধি ও বিস্ময়ের বিষয় হইবে। অতএব পূজ্যবুদ্ধি ও বিস্ময় যদি মনুষ্যের অন্তঃকরণে উৎপন্ন হয় তবে অবশ্যই বিশ্বদর্শনে ইহা চেতন-আত্মার কার্য্য, এইরূপ প্রত্যয় স্বভাবতই মনোমধ্যে উদিত হইবে; এবং তাহা উদিত হইয়া তাহার পর সেই আত্মা সম্বন্ধে পূজ্যবুদ্ধি উৎপন্ন হইবে। এবং এইরূপ চেতন পরমাত্মার অনেক চিহ্ন আমাদের আত্মা এই বিশ্বের মধ্যে চিনিয়া লয়। যদিও পর্ব্বত, উপত্যকা, নদী, মহাসাগর, বৃক্ষ, পাষাণ, চন্দ্র, সূর্য্য ইহারা অচেতন তথাপি ইহাদের মধ্যে যে ব্যাপার চলিতেছে তাহা একই প্রণালীতে চলিতেছে। তাহা

সুব্যবস্থিত ও তাহার মধ্যে কোন গোলযোগ নাই। ইহা চৈতন্যের এক চিহ্ন। এবং এই সকল ব্যাপার চলিতে থাকিয়া সর্ব্বদাই সেই বস্তুসকলের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং এই প্রকার কালান্তরে পৃথিবী ও সমস্ত বিশ্বের অবস্থা ভিন্নরূপ হইয়া যায়। এই প্রকারে সমস্তই রূপান্তরিত হয়। কিন্তু রূপান্তর ঘটাইবার জন্য সমানভাবে সতত এই সকল ব্যাপারের পরিচালক যিনি, তিনি একরূপ, তিনি নিশ্চল, তিনি অব্যয়, তিনি অনাদি ও অনন্ত—এইরূপ প্রত্যয় অন্তঃকরণে সহজেই উৎপন্ন হয়। সেইরূপ আবার, এই অসীম আকাশ দেখিয়া তাহার যেরূপ সীমা কল্পনা করিতে পারা যায় না, সেইরূপ তাঁহার শক্তি, যাহা সূর্য্য চন্দ্র ও তারা পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তাহারও কল্পনা করা যায় না; এই জন্য তিনি দেশতঃ অনাদি ও অনন্ত; এবং এই সুন্দর বিশ্বের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থ এমনভাবে যোজিত হইয়াছে যে, সেই সমস্ত মিলিয়া এক সুন্দর দৃশ্য প্রকাশ পায়। কোন এক চিত্রকে মনের মধ্যে আনিলে, সেই সৌন্দর্য্যের কল্পনা প্রথমত মনোমধ্যে আনা চাই, এবং সেই কল্পনাকে বাহ্যরূপ দিবার জন্য বিভিন্ন অবয়ব ও বিবিধ-প্রকার রং উপযুক্তভাবে যোজিত করা চাই। এই প্রকারে মনের মধ্যে যদি প্রথমত এক কল্পনা না আনা হয় এবং সেই চিত্রের অবয়ব ও রং—এই সব লইয়া যে দৃশ্য—তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিলে শেষে সব মিলিয়া এক সুন্দর বস্তু কখনই হয় না। সেইরূপ বিশ্বের সৌন্দর্য্য যদি থাকে তাহা হইলে সেই সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কাহারও-না-কাহারও প্রথমত কল্পনা হওয়া চাই এবং সেই কল্পনা যাহাতে বাহ্য রূপ প্রাপ্ত হয় সেই জন্য বিভিন্ন পদার্থের উপযুক্ত যোজনা তাঁহার করা চাই। এরূপ না হইলে, যদি অচেতন শক্তির ব্যাপার দ্বারাই বিশ্ব গঠিত হইত, তাহা হইলে সমস্ত পদার্থের পারস্পরিক সম্বন্ধের দ্বারা এরূপ যোজনা হইত না যে, তাহা হইতে সমস্ত মিলিয়া অনুপম সৌন্দর্য্য ও শোভা উৎপন্ন হইতে পারে। এবং যে কোন পদার্থের মধ্যে শোভা ও সৌন্দর্য্য আছে বলিয়া যে আমাদের মনে হয় তাহার কারণ এই যে, সেই পদার্থ কোন-না-কোন শুভ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সূচনা বা প্রকাশ করে। এইরূপে এই বিশ্ব অগাধ শক্তি অনন্ত শান্তি, অনন্ত প্রেম, অপার গাম্ভীর্য্য, পরম আনন্দ, পরম শুদ্ধি, অসীম উন্নতি, অনাদ্যনন্তত্ব ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম প্রকাশ করে। মনুষ্যের মুখচর্য্যের উপর যেরূপ তাহার আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বিশ্বের উপর বিশ্বাত্মার ধর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এইভাবে যে ব্যক্তি বিশ্বকে অবলোকন করে, তাহার পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। বৃক্ষ পাষাণ পর্ব্বত উপত্যকা নদী সমুদ্র প্রভৃতি জড়পদার্থের মধ্যে চেতন যে পরমাত্মা সেই পরমাত্মা তাহার দৃষ্টিগোচর হন। চঞ্চল ও নশ্বর যে সব পদার্থ তাহার মধ্যে নিশ্চল ও শাশ্বত পরমাত্মাকে সে দেখিতে পায়। এবং অনন্ত অবর্ণনীয় আহ্লাদকারক এইরূপ ধর্ম্মের উপলব্ধি করিয়া সেই মনুষ্য তল্লীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা মনুষ্যের মনোভাব হইলে, চারিদিকে ও সতত সেই অনন্ত পরমাত্মাকে দর্শন করিলে প্রেম উৎপন্ন হয়। পরমেশ্বর ব্যতীত আর কিছুতেই তার সুখ নাই, সে সতত তাঁহার মধ্যে নিমগ্ন থাকে এবং তাহার পর অসীম প্রেমসূত্রে সে আপন পরম পিতার সহিত নিবদ্ধ হইলে সে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়, তাহার দুঃখ ও পাপ তিরোহিত হয়, সে অটল পদ প্রাপ্ত হয়।

২৩—ঈশ্বর ও আত্মপ্রত্যয়।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

শ্বেতাশ্বতর ৪।২০।

"যাঁহার স্বরূপ দৃষ্টির সম্মুখে নাই, চক্ষুর দ্বারা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না; যিনি হৃদয়ে বাস করেন তাঁহাকে মনের দ্বারা যাহারা দেখে তাহারাই মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হয়।"

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

শ্বেতাশ্বতর ৪।১৭।

"বিশ্বের কর্ত্তা এই দেবতা লোকের অন্তঃকরণে সদা বাস করেন, অন্তস্থ বুদ্ধি ও মননযোগে তিনি

প্রকাশিত হন, ইহা যাহারা উপলব্ধি করে তাহারা মুক্ত হয়।”

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
কঠ ২।৫।১২।

একমাত্র সকলের নিয়ন্তা সর্বভূতান্তরাত্মা, এক-রূপকে যিনি বহুধা করেন তাঁহাকে যে ধীরেরা আত্মস্থ করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ—অন্যের নহে।”

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥
কঠ ২।৫।১৩।

“অনিত্যের মধ্যে নিত্য যিনি, চেতনের চেতন যিনি, এক হইয়া যিনি বহুর কামনা বিধান করেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা আত্মস্থ করেন তাঁহাদের শাশ্বতী শান্তি—অপরের নহে।”

শাশ্বত পুরাণ পুরুষ পরমাত্মা বিশ্বের উৎপাদক, বিশ্বের শাময়িতা, মঙ্গলনিধান—তিনি মনুষ্যের অন্তঃকরণে বাস করেন। তাই কোন মন্দ অযোগ্য দুষ্ট নির্দ্দয় কার্য্য তাহার দ্বারা ঘটিলে, ইহা করা উচিত নহে, ইহা অশ্লাঘ্য, ইহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় এইরূপ তাহার মনে হয়। সর্ব্বথা যোগ্য শ্লাঘ্য ও আদরণীয় কি, পরম শুদ্ধি কি, বিমল মঙ্গলভাব কিরূপ এই বিষয়ে তাহার অন্তঃকরণে জ্ঞান নিহিত থাকায় এইরূপ তাহার মনোভাব হয়। পরম শুদ্ধি ও বিমল মঙ্গলভাব ইহা পরমেশ্বরের গুণ; এই মঙ্গলভাবের স্মরণ হইলে, দয়া ক্ষমা শান্তি পবিত্রতা ঔদার্য্য এই সমস্তের চিত্র স্পষ্টরূপে অন্তঃকরণে সমুদিত হয় এবং মনুষ্যের মন তল্লীন হইয়া যায়। এই সকল গুণ সনাতন, সত্য, বাধ-রহিত, বিশ্বের রাজত্ব করিবার অধিকার ইহাদেরই, এইরূপ অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রত্যয় হয় এবং এই সকল গুণ নিদানপক্ষে অংশতঃ আমাদের মধ্যে যেন থাকে এইরূপ অভিলাষ উৎপন্ন হয়। অন্য মনুষ্যাদিগের ব্যবহারের মধ্যেও উচিতানুচিত নির্বাচন করিবার সামর্থ্য ইহারই যোগে পাওয়া যায়। উহা অনুচিত হইলে সেই মনুষ্য সম্বন্ধে ঘৃণা ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় এবং সমুচিত হইলে তাহার সম্বন্ধে পূজ্যবুদ্ধি ও প্রেম আবির্ভূত হয়। কল্পিত উপন্যাসের মধ্যেও অমুক কোন মনুষ্যের উত্তম প্রকারের সাধুতা অর্থাৎ ঔদার্য্য ক্ষমা ইত্যাদি গুণ আছে এইরূপে কোন দর্শক কর্ত্তৃক বর্ণিত তাহার চরিত্র পাঠ করিলে আমাদের অন্তঃকরণ প্রেম ও পূজ্যবুদ্ধিতে পূর্ণ হয়। এবং ঈশ্বরের স্বরূপ, তাঁহার সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ, তাঁহার সহিত কি ভাবে আচরণ করিবে এইরূপ বিষয় সম্বন্ধে কোন এক সাধু যোগ্য মর্ম্মস্পর্শী ভাষণ করিলে, “উহা সমস্তই ঠিক্” “সমস্তই সত্য”—আমাদের বুদ্ধি এইরূপ যে অনুমোদন করে;—তা’ কেন করে? রামদাস, তুকারাম প্রভৃতির ন্যায় ভক্তের বাণী আমাদের এত মিষ্ট লাগে কেন? তাঁহারা যে কথা বলেন তাহা আমাদের অন্তঃকরণে গূঢ়ভাবে নিহিত আছে, পরমেশ্বরের জ্ঞান গূঢ়রূপে নিহিত আছে বলিয়াই। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তা যখন বলেন, অচল তারকাগণ দশ কোটি মাইল দীর্ঘ ব্যাসের প্রকাণ্ড গোলক, তখন ত আমাদের বুদ্ধি “একথা ঠিক্” “এ কথা সত্য” এই প্রকারের অনুমোদন তাঁহার কথায় দেয় না। তবে, ঐ কথা তাঁহাদের বিশ্বাসের উপর গ্রহণ করে। তদ্বিষয়ে আমাদের কেবল শাব্দ অথবা পরোক্ষ জ্ঞান হয় এবং যখন তাঁহার কৃত গণিত আমরা বুঝিয়া লই তখন আনুমানিক জ্ঞান হয়; কিংবা রসায়ন শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের জ্ঞান প্রথমতঃ শিক্ষকের বিশ্বাসের উপর অর্থাৎ শব্দজ্ঞান হয় এবং তাহার পর তিনি পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়া দেখাইলে ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান হয়। কিন্তু সাধুকর্ত্তৃক কথিত ব্রহ্মবাদে শিক্ষ-কের উপর বিশ্বাসের অপেক্ষা নাই, অনুমানের অপেক্ষা নাই এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়াদিরও অপেক্ষা নাই, তাহা কানে আসিবামাত্রই অন্তঃকরণে গ্রাহ্য হয়। সাধুজনকৃত সেই উপদেশ অন্তঃকরণে মুদ্রিত হয়; এবং অন্ততঃ সেই সময়ে অল্প বৈরাগ্য প্রাপ্তির কারণ ঔৎসুক্য উৎপন্ন হয়, ঈশ্বরের স্বরূপ হৃদয়-চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অকপটভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে প্রবৃত্তি হয়। এবং এইরূপ অন্য কিছু প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া, সংসারের জাল হইতে অন্তঃকরণ ক্ষণকালের জন্যও মুক্ত হইলেও, সেই দিব্য স্বরূপ তাহার

সম্মুখে উদিত হয়। মৃত্যুর যোগে অনিবার শোক পাইলে সুশ্রাব্য গান শ্রবণ করিলে, বিশ্বের সুন্দর দৃশ্য সকল দেখিলে, পৃথিবীর ইতিহাস অবলোকন করিয়া আজ-পর্য্যন্ত সংঘটিত রাজ্যের ও মানব সমাজের ক্রমবিকাশ মনোমধ্যে স্থাপিত হইলে, অনাদি অনন্ত শাশ্বত যে পরমাত্মা সেই পরমাত্মাতে অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত মন বিভোর হইয়া যায়, বিশ্রাম পায়, আনন্দে নিমগ্ন হয়। এবং সেই সময়ে "দেব, তুমি এত নিকটে আছ তবু আমি মূঢ় মনুষ্য তোমাকে দেখি না, শাশ্বত সুখের অবলম্বন এত নিকটে আছে, তবু আমি তাহার অনাদর করিয়াছি এবং এখনো পাপ হইতে মুক্ত হই নাই"—এই প্রকার উচ্ছ্বাসোক্তি বাহির হইয়া পড়ে। এই জন্য ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান বাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না, তাহা অনুমানের দ্বারা হয় না, তাহা অন্তঃকরণের দ্বারাই হয়। অন্তঃকরণের গ্রহণ শক্তি-সাংসারিক ব্যাপারের দ্বারা নষ্টপ্রায় হয়। তাহা পুনর্ব্বার উদ্দীপিত করা, অন্তঃকরণ-রূপ আদর্শের উপর সঞ্চিত মলা মুছিয়া ফেলিয়া উহাকে স্বচ্ছ করা—যাহারা পরমেশ্বরকে জানিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য। এবং তাহা উদ্দীপিত হইলে সর্ব্বত্র বিশ্বের মধ্যে ব্যবহারের মধ্যে ও অন্তরাত্মার মধ্যে পরমেশ্বর মনুষ্যের নিকট প্রকাশ পান। তাই উপনিষদের উপরি-লিখিত বচনে পরমেশ্বর হৃদয়স্থ আছেন এইরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

কঠ ২।৬।১২

"এই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা অথবা শব্দের দ্বারা কিংবা নেত্রের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে বলে তিনি আছেন তাহা ছাড়া অন্য স্থানে তাঁহাকে কি করিয়া পাওয়া যাইবে?" অর্থাৎ যদিও তাঁহাকে চক্ষে দেখা যায় না, কিংবা তিনি মনের গ্রাহ্য হন না, কিংবা শব্দের দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না, তথাপি মনুষ্য, তিনি আছেন এইরূপ বলে, তাহার কারণ—অন্তঃকরণ-যোগে ইহা তাহার প্রত্যয় হয়।" তাই

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥

অর্থাৎ—"তিনি আছেন এই যে সাহজিক অন্তঃকরণের প্রত্যয় তাহার যোগে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে। এই প্রত্যয়ের যোগে উভয়ের অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানা যায়। তিনি আছেন এইরূপ মনের প্রত্যয়ের দ্বারা তিনি উপলব্ধ হইলে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মা নাই এইরূপ ধারণা, কিংবা তিনি আছেন কিংবা নাই এইরূপ সংশয় ধরিয়া মনুষ্য কাজ করিলে, তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এই প্রকারের ধারণা পোষণ না করিয়া শুদ্ধ মনের দ্বারা যদি বিচার করে তবে দেবের অস্তিত্বসম্বন্ধে তাহার অন্তঃকরণে সহজভাবেই স্ফূর্ত্তি উৎপন্ন হয় এবং এই স্ফূর্ত্তি জোর করিয়া নষ্ট না করিয়া মনুষ্য যদি তাহার অনুসরণ করিয়া চলে তাহা হইলে পরমেশ্বরের স্বরূপ চারিদিকে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে। দুরাগ্রহ ও সংশয়ের যোগে সমস্তই বিগড়াইয়া যায়, তাহা না হইলে এবং আমাদের চিত্ত সহজ অবস্থায় থাকিলে, পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রকাশ পায়।

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

শ্বেতাশ্বতর, ২।১৫

"আপন আত্মার তত্ত্ব ইহাই দীপ, এই দীপের যোগে যখন চিত্ত দিয়া দেখে তখন জন্মরহিত শাশ্বত এবং যাঁহার সর্ব্বতত্ত্ব বিশুদ্ধ এই প্রকার দেবসম্বন্ধে মনুষ্যের জ্ঞান হইয়া সে সমস্ত পাশ হইতে মুক্ত হয়।

আপন আত্মার মধ্যে এই যে জ্যোতি আছে, পরমাত্মার তত্ত্ব গ্রহণ করিবার যে শক্তি আছে—গূঢ়রূপে, স্পষ্টরূপে নহে—পরমেশ্বর আত্মার মধ্যে বাস করেন এই-যে কথা, ইহার যোগে পরমেশ্বর-তত্ত্ব সম্পাদন করিবার উদ্যোগে মনুষ্য যখন নিযুক্ত হয় তখন, তখন সে জ্ঞান লাভ করে, হৃদয়ে বাসকারী পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয় এবং এই-রূপে সাধন করিয়া পরমেশ্বরকে সতত অবলোকন করিলে, তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি নিরন্তর সমান-ভাবে হইলে, পাপ দুঃখ ভীতি প্রভৃতি যে পাশ তাহা ছিন্ন হইয়া যায় এবং জীবাত্মা মোক্ষ লাভ করে।

ইতি "ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান" সমাপ্ত

নিবেদন।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

পলে পলে তিলে তিলে দগ্ধ করি নাথ,
আঁধার জীবনে মম কিরণ সম্পাত
তুমি কি করিবে আজি ? তাই কৃপাময়,
বিষাদে হতাশে পূর্ণ সকল হৃদয়
লুণ্ঠিত অবনীতলে—বড় নিরাশ্রয়
মনে হয় এ সংসারে! মঙ্গলনিলয়!
করো না বঞ্চনা আর! দলিয়া মথিয়া
তোমারি মনের মত আনন্দে গড়িয়া
লও তবে তুমি মোরে! তোমারি ইচ্ছায়
আত্মসমর্পিয়া সদা নির্ভীক হিয়ায়
শুধু তব মুখ পানে রহিতে চাহিয়া
দাও প্রভু, বল বুকে! আসিবে লইয়া
মরণ অমৃত বার্ত্তা—এ বিশ্বাসে আজ
বজ্র যেন সহিবারে পারি হৃদিরাজ!

বাবা গম্ভীরনাথ।

(অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গয়ার পূর্ব্বোক্ত সাধনজীবনের পরে তিনি যখন যেখানে থাকিতেন, তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই অনেক সাধু থাকিত। সাধুরা অনেক সময় ঝগড়া করিত, কখনও কখনও মারামারি করিয়া মাথা ফাটাফাটি করিত। কিন্তু তাহার মধ্যেও বাবাজি ধ্যানস্থ, তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না। অনেক সময় উভয় পক্ষই তাঁহার নিকট গিয়া নালিশ করিত এবং তাহাদের যাহা কিছু বক্তব্য ক্রোধভরে বলিতে থাকিত, তিনি নীরব, মুখে চোখে কোন পরিবর্ত্তন নাই। তাহাদের সব বলা হইয়া গেলে, একবার হয়ত বলিতেন "আচ্ছা নেহি"—বলিয়া আবার ধ্যানস্থ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐরূপ সামান্য কিছু বলাতে বা ইঙ্গিত করাতেই অধিকাংশ স্থলে সাধুদের কলহের মীমাংসা হইয়া যাইত।

লৌকিক ব্যবহারে কাহাকেও কোনরূপ উদ্বেগ প্রদান না করাই যেন তাঁহার বিশেষ নিয়ম ছিল।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

তত্ত্বজ্ঞান ও সাত্ত্বিক বৃত্তি ছাড়া তাঁহার অলৌকিক যোগশক্তি ছিল। তিনি বেদান্তের সাধন দ্বারা বিচারসিদ্ধ ও তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং যোগের সাধনা দ্বারা পূর্ণ যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিতেন যে বাবাজির সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিবার শক্তি আছে।* কিন্তু তিনি যে এইরূপ শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা আশ্চর্য্য মনে হয় যে তিনি কিরূপে এই শক্তি ও ঐশ্বর্য্যকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি কখনও তাঁহার অলৌকিক শক্তির কোন পরিচয় প্রদান করিতেন না। পরবর্ত্তীকালে দেখা গিয়াছে যে যদি তাঁহার কোন কথায় বা কাজে তাঁহার ভক্তগণ কোনরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনি সহজ জ্ঞানের ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। একবার তাঁহার একজন শিষ্য ও ভক্ত প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া এবং কায়মনে খাটিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, এবং সেবায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট বোধ করিয়া একটু যোগৈশ্বর্য্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি শিষ্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন যে এক গোয়ালা বহু বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথজিকে দুধ যোগাইয়াছিল এবং গোরক্ষনাথজি তাহার সেবায় অত্যন্ত পরিতুষ্ট ছিলেন জানিয়া সে তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য কিছু দেখিতে চাহিয়াছিল; গোরক্ষনাথজি তখন প্রথমাবধি তাহার যত দুধ খাইয়াছিলেন সব বমি করিয়া দিলেন—আমি সেই গোরক্ষনাথের সেবক। শিষ্যের অভিমান সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হইল এবং তিনি গুরুর চরণ ধারণ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনেক শক্তিশালী মহাপুরুষ প্রচুর শক্তি লাভ করিয়া সেই শক্তি দ্বারাই চালিত হইতে থাকেন। শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে রাখিবার শক্তি সকলের থাকে না, শক্তি আপনাআপনি যেন

---

* আমাদের কথা এই যে, যে কোন উপায়ে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইলে তদনুপাতে প্রাকৃতিক শক্তি অবলম্বনে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের অনুরূপ নানা কার্য্য সাধন করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় নহে।

প্রকাশ হইয়া পড়ে। শক্তিকে নিজের ভিতরে গুপ্ত রাখিবার শক্তি, অলৌকিক যোগলব্ধ শক্তি দ্বারা কিছুমাত্র মুগ্ধ না হইয়া তাহাকে বশীভূত রাখিবার শক্তি সব চেয়ে বড় শক্তি। সেই শক্তি বাবা গম্ভীরনাথে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। শক্তি যখন এইরূপে আয়ত্ত হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয় তখনই তাহা মাধুর্য্যে পরিণত হয়।

জ্ঞানে, শক্তিতে, মাধুর্য্যে, বাহ্যবৃত্তিতে সর্ব্বপ্রকারে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিপূর্ণ মহাত্মা খুব বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সমসাময়িক অনেক জ্ঞানী ও ভক্ত মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে সমগ্র ভারতবর্ষে এত বড় মহাত্মা আর দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বোক্ত সময়ের পরে আরও ৯।১০ বৎসর তাঁহার আসন গয়াতেই ছিল। এ সময়ে তিনি সর্ব্বদা গয়ায় থাকিতেন না। মাঝে মাঝে তীর্থ ভ্রমণ করিতেন। এই সব মহাপুরুষেরা যে নিজেদের জন্য তীর্থযাত্রা করেন না, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁহারা "তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি"। এই সময়েও তিনি ভারতবর্ষের অনেক তীর্থে গিয়াছিলেন। কৈলাস, মানসসরোবর, দামোদরকুণ্ড, মুক্তিনাথ, নেপাল, অমরনাথ, মানিকরণ, মনমহেস, চারিধাম, রাওয়ালেশ্বর, গঙ্গাসাগর, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর প্রভৃতি অনেক তীর্থে গমনের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়। এই সব ভ্রমণে প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে সাধুর জমায়েৎ থাকিত। তিনি কুম্ভমেলায় যোগদান করিতেন। কুম্ভমেলায় তাঁহার সঙ্গে অনেক সাধু থাকিতেন। একবারের বিবরণ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা লিখিয়াছেন, "যেরূপ তাকাইয়া একটু মাথা নাড়িয়া ইনি প্রাণ ভিজাইয়া দেন, ভাষায় তাহার বর্ণনা হয় না। ইনি অত্যন্ত অল্পভাষী। সাধুরা ইঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানেন। একদিন একজন ধনী ইঁহার আসনের নিকট পাঁচশত খণ্ড কম্বল রাখিয়া যান; গম্ভীরনাথ ধ্যানস্থ ছিলেন, কিছু পরে নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন রাশীকৃত কম্বল। বাঁ হাতের অঙ্গুলি ঈষৎ নাড়িয়া বলিলেন যাহাদের দরকার আছে, তাহাদিগকে এ সকল দিয়া দাও। তখন সমস্তই দান হইয়া গেল।" পরবর্ত্তীকালে অত্যন্ত দানশীল বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল।

তিনি যখন যেখানেই যাইতেন, যেখানেই থাকিতেন, তাঁহার ভাবের কোন পরিবর্ত্তন ছিল না। প্রায় সর্ব্বদাই আত্মস্থ থাকিতেন। ক্রমশঃ কিছু কিছু কথা বলিবার অভ্যাস করিয়াছিলেন। তখন কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে দু'এক কথায় তাহার উত্তর প্রদান করিতেন। উত্তর প্রদানের পরেই আবার অন্তর্মুখ হইতেন। দেখিলে মনে হইত যে তিনি যেন সর্ব্বদাই কোন্ ধ্যানলোকে, কোন্ সুদূর চিরপ্রশান্তির রাজ্যে বিহার করিতেছেন, কেবল এই লোকের আকর্ষণে মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হইয়া লোককে কৃতার্থ করিয়া যান।

তাঁহার তামাক সেবনের অভ্যাস ছিল। কিন্তু সে ব্যাপারটীও একটী দর্শনীয় জিনিষ ছিল। তিনি তাঁহার নিজের ভাবে মগ্ন আছেন। সেবক তামাক সাজিয়া তাঁহার আসনের সম্মুখে রাখিয়া গেল। তাঁহার চোখ খোলা, অথচ দৃষ্টি ভিতরের দিকে। কলিকার আগুন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হতাশভাবে নিবিয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকে তামাক সেবন না করাইতে পারিলে সেবকের শান্তি নাই। সে আর এক কলিকা সাজাইয়া সমস্ত ঠিক ঠাক করিয়া তাঁহার হাতের ভিতর পুরিয়া দিল। কলিকা তাঁহার হাতে রহিল, কিন্তু যিনি তামাক সেবন করিবেন তিনি কোথায়? তাঁহার অন্তঃকরণের কাজ চলিতেছে কিনা সন্দেহ, চলিলেও এ জগতে নয়। কলিকা হাতে আছে, আগুন আবার নিবিয়া গেল, ভ্রূক্ষেপ নাই। সেবক কলিকাটী হাত হইতে নামাইয়া লইল, সে দিকেও খেয়াল নাই। কোন রকমে তাঁহার দৃষ্টি বাহিরে আকর্ষণ করিয়া সেবক আর এক কলিকা তাঁহার হাতে দিল। তিনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় একবার সে দিকে তাকাইয়া তামাকে এক টান দিলেন। টান দিয়াই আবার ধ্যানস্থ। মুখের নিকটে কলিকা হাতের উপর অল্প অল্প ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশরীর নিঃস্পন্দ অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে তিন-চারি ছিলিম তামাক ক্রমাগত দিয়া তাঁহার তামাক খাইবার অভ্যাসটী বজায় রাখা হইত।

তিনি অতি সুন্দর সেতার বাজাইতে পারিতেন।

অনেক সময় গভীর রাত্রে কপিলধারায় সেতারের ধ্বনি শুনা যাইত। সেতারে সুর দিয়া তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। অঙ্গুলি আপনাআপনি তারের উপর দিয়া সঞ্চালিত হইতে থাকিত। সে বাদ্য যে শুনিয়াছে, সে-ই মুগ্ধ হইয়াছে। মহাত্মা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন যে তিনি যখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে থাকিতেন, তখন অনেক সময় গভীর রাত্রে বাবা গম্ভীরনাথের সেতারের ধ্বনি তাঁহার কাণে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি আত্মহারা হইয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইতেন।

এতদ্ভিন্ন, তিনি সর্ব্বদা অন্তর্মুখ থাকিলেও বহির্জগতের সৌন্দর্য্যবোধও তাঁহার খুব ছিল। গোরক্ষপুরে দশহরা ও দীপালির সময় মাঝে মাঝে নিজে মন্দির প্রভৃতি সাজানর উপদেশ দিতেন, রামলীলা প্রভৃতি গান তাঁহার সম্মুখে গীত হইলে তিনি কখনও কখনও তাল ঠুকিতেন এবং নায়কদিগকে উৎসাহ দিতেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল।

তাঁহার লৌকিক ব্যবহারে কয়েকটী নিয়ম লক্ষিত হইত। তিনি লোকের সহিত ব্যবহারে কখনও যোগৈশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেন না। সন্ন্যাসের রীতি অনুসারে কখনও কোন গৃহস্থের বাড়ীতে যাইতেন না। রাজদর্শন বা রাজা কিম্বা জমিদারদের দান গ্রহণ করিতেন না, দরিদ্র ও নিরভিমান শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদের সেবা গ্রহণ করিতেন। আশ্রমে অবস্থিতিকালে আশ্রমের নিয়মপালন, অতিথিসেবা প্রভৃতি যত্নসহকারে করিতেন। এসব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ দু' এক কথায় তিনি আশ্রমীদিগকে মাঝে মাঝে দিতেন। কখন যে ইহা তিনি লক্ষ্য করিতেন বা ভাবিতেন, তাহা বুঝা যাইত না। তাঁহার স্বাভাবিক ধ্যানস্থ অবস্থায় তিনি উপবিষ্ট আছেন; দুই চারি জন সাধু বা ভক্ত নিকটে বসিয়া আছেন; হঠাৎ একটা বা দুইটী কথায় কাহাকেও কোন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া আবার আত্মস্থ হইলেন, এইরূপ মাঝে মাঝে দেখা যাইত।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য বাবাজির বিশেষ অনুগত ও অনুগৃহীত ভক্ত শ্রীযুক্ত রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"বাবা অসীম ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট যোগৈশ্বর্য্য থাকিলেও, তাহার কোন পরিচয় দিতেন না। নিজেকে অত্যন্ত গোপনে রাখিতেন। তাঁহার চাল-চলন দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারিত না যে তিনি এত বড় যোগৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ ছিলেন। এই বিষয়ে তিনচারিটী ঘটনা আমি নিজেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বহুলোক তাঁহার নিকট ঔষধাদির জন্য উপস্থিত হইত। একবার গয়ার সর্ব্বপ্রধান লক্ষপতি উকীল হরিহর নাথের একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায়। তাহার পিতা 'বাবা'কে একবার বাড়ী লওয়াইবার জন্য,—অগত্যা কিছু ঔষধ, আশীর্ব্বাদ বা পদধূলির জন্য বাবাকে অনুরোধ করিতে আমার নিকট লোক পাঠান। আমি কখনও এই সব বিষয়ে কোন মহাপুরুষের নিকট ইতিপূর্ব্বে প্রার্থনা করি নাই; কিন্তু একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায়, তিনি বারংবার অনুরোধ করাতে, অগত্যা বাবাকে অতি বিনীতভাবে এ সমস্ত কথা জানাইলাম। বাবা বাড়ী যাইতে অস্বীকার করিলেন; অগত্যা পদধূলির প্রার্থনা জানাইলে, সম্মত হইলেন। তখন কিছু ধূলি লইয়া তাঁহার পায়ে মাখিয়া উকীল বাবুকে দিলাম। আশীর্ব্বাদের ভিক্ষা জানাইলে বলিলেন,—"হাঁ, ক্লেশ দূর হো যায় গা। দো তিন রোজ মে শান্তি হোগা, আচ্ছা হো যায় গা।" শুনিয়াই আমার মনে খট্‌কা লাগিল। বলা বাহুল্য—তিন দিনের মধ্যেই রোগীর পরা শান্তি লাভ হইল। বাবার চরণধূলি ও আশীর্ব্বাদের প্রভাবে ভোগ কমিয়া গেল; নচেৎ আরও কত কাল ভুগিত, কে বলিবে?"

একবার উদয়পুরের এক ময়দানে ধুনী জ্বালাইয়া আট জন সাধুর সহিত তিনি কিছুদিনের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন। ক্রমে জানাজানি হইল যে এক মহাপুরুষ কয়েকজন সহচর সঙ্গে সেখানে বাস করিতেছেন। মহাপুরুষগণ আত্মপরিচয় না দিলেও কিরূপে তাঁহাদের নাম নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচারিত হইয়া পড়ে, বোঝা যায় না। উদয়পুরের রাজা তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে রাজবাটীর নিকটে লইয়া যাওয়াও অসম্ভব জানিয়া একদিন রাজা অনেক ভেট লইয়া

তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। রাজা তাঁহার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই এই সংবাদ তিনি পান এবং তখনই সেখান হইতে আসন উঠাইয়া প্রস্থান করেন। কাশ্মীরের রাজাকেও একবার এইরূপে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে যখন তিনি দীক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন, তখনও গরীব গৃহস্থগণই প্রায়শঃ তাঁহার কৃপা-প্রাপ্ত হইয়াছেন, ধনীগণ অতি অল্পই তাঁহার সদ্গুখের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অনুগত ভক্ত মাধোলাল তাঁহাকে নিজ বাটীতে অন্ততঃ একবারমাত্র পদার্পণ করিবার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বসত-বাটীতে তিনি যাইতে স্বীকৃত হন নাই। তাঁহারই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বাগান বাড়ীতে তিনি কয়েকবার গিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

তিনি একবারমাত্র এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। গয়াতে বাবার প্রথম নিষ্কাম-সেবক আক্কুর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আক্কুর সমস্ত পরিবার শুধু সাধুসেবার দ্বারা জীবন ধন্য করিবার জন্য যেন প্রাণের টানে বরাবর বাবাজীর সেবা করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের অর্থাদি সম্বল কিছুই ছিল না। আক্কু ও তাহার ভাই মুন্নির গায়ের খাটুনির উপর সমস্ত পরিবারের জীবনধারণ নির্ভর করিত। এই আক্কু একবার মৃতপ্রায় হয়। জীবনের লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গেলে তাহাকে শ্মশানে লওয়ার আয়োজন হয়। কিন্তু যাঁহার সেবায় সে জীবন ঢালিয়া দিয়াছে, শ্মশানযাত্রার পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার সংবাদ না দিয়া সে কি করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইবে? মুন্নি শোকে আচ্ছন্ন হইয়া দৌড়িয়া বাবার নিকট গিয়া আক্কুর মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিল। সেবকপরিবারের এ অবস্থায় তিনি নিশ্চল রহিলেন না। শ্মশান-যাত্রা নিষেধ করিয়া মুন্নিকে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং কিছুক্ষণ পরে আক্কুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আক্কুর শবের নিকট গিয়া তাহার মুখে একটু জল দিলেন, আক্কুর চেতনা হইল। তৎপরে আক্কুর জন্য খিচুরী পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিজ আসনে প্রস্থান করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে আক্কু সুস্থ হয়। কয়েক বৎসর পরে বাবাজীর জীবিতাবস্থাতেই আক্কুর মৃত্যু হয়। তদবধি আক্কুর পুত্র নায়ুকে তিনি বার্ষিক ১০৲ টাকা করিয়া দিতেন, গোরক্ষপুরে যাতায়াতের খরচ দিতেন, এবং বস্ত্রকম্বলাদি নানাপ্রকার সাহায্য প্রদান করিতেন। বোধ হইত যেন আক্কুপরিবারের নিকট তিনি চিরঋণে আবদ্ধ আছেন। যদিও তাঁহার ব্যবহারিক জীবন অল্পই ছিল, তথাপি তাহারই মধ্যে তিনি গৃহস্থ সন্ন্যাসী সকল শ্রেণীর লোকের জন্য আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে বহুল ঘটনার উল্লেখ যে সম্ভবপর নয়, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

আর একটী ঘটনার উল্লেখ করি। বাবাজী যখন কপিলধারায় থাকিতেন, তখন সেখানে বড় চোরের উপদ্রব ছিল। একদিন বাবাজীর আসনের নিকট চোর আসিয়াছে। বাবাজীর সঙ্গে তখন আরও কয়েকজন সাধু ছিলেন। চোরেরা উপস্থিত হইলে বাবাজী তাঁহার কাল কম্বলটী তাহাদিগকে দিয়া বলিলেন যে, আমাদের সহিত তোমাদের ব্যবহারের উপযুক্ত আর কিছুই নাই, অতএব অনু-গ্রহপূর্ব্বক এই কম্বলটী লইয়া তোমরা গমন কর। চোরেরা কম্বলটীমাত্র লওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না। তাহারা যাত্রা নিষ্ফল ভাবিয়া চলিয়া যাইতেই কোন সাধু বলিয়া উঠিল যে ভাগ্যে আমাদের টাকা কয়েকটা বাঁচিয়া গেল। বাবাজী তাহাদের কাছে টাকা আছে জানিয়াই মৃদুভাবে আদেশ করিলেন "এখনই দৌড়িয়া গিয়া টাকাগুলি চোরদিগকে প্রদান করিয়া আইস।" সাধুরা আদেশ অমান্য করিতে অসমর্থ হইয়া অগত্যা চোরদের নিকটবর্ত্তী হইয়া টাকাগুলি সমর্পণ করিল। চোরেরা এরূপভাবে টাকা পাইয়া অবাক্ হইয়া প্রস্থান করিল।

বাবাজীর কপিলধারায় অবস্থানকালে বরাবর পাহাড়ে নাথসম্প্রদায়ের আরও দুইজন সাধক ছিলেন। তাঁহারা দুই ভাই এবং উভয়েই অওধব। বাবাজীর সহিত তাঁহাদের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। তাঁহারা মাঝে মাঝে কপিলধারায় আসিয়া বাবাজীর সহিত মিলিত হইতেন এবং বাবাজীও কখন কখন বরাবর পাহাড়ে গিয়া তাঁহাদের সহিত বাস করি-তেন। তাঁহারা খুব বড় মহাত্মা ছিলেন এবং

উভয়েই দেহত্যাগ করিয়াছেন। ধনিয়া পাহাড়ের মহাত্মা বাবা ঠাকুরদাসজীও তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি উদাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। এই চারি মহাপুরুষ অনেক সময় একত্র বসিয়া সাধনে নিবিষ্ট থাকিতেন। যদিও তাঁহাদের সাধনপন্থা পৃথক্ ছিল, তথাপি তাঁহারা বিভিন্নমার্গ অবলম্বন করিয়াও এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, যে অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ থাকে না, সমস্ত পার্থক্য একত্বে বিলীন হইয়া যায়।

১৯৫২ সংবতে (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে) গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথ-মন্দিরের কার্য্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা হইতে আরম্ভ করে। ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে মন্দিরের মোহান্তের দেহত্যাগ হওয়ায় যিনি তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন, তিনি ইতিমধ্যে নানা ভাবে নিজের অনুপযুক্ততার পরিচয় দিতে থাকেন। তখন নাথসম্প্রদায়ের পদস্থ যোগীগণ এবং গোরক্ষপুরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া বাবাজিকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করেন। বাবাজি তখন পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। অন্বেষণকারিগণ অনুসন্ধানে জানিলেন যে তিনি তখন গোদাবরীতে আছেন। তাঁহারা তাঁহাকে মোহান্তপদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার গুরুর আশ্রমটী রক্ষা করিবার জন্য নানা প্রকারে ধরিয়া পড়িলেন। যদিও কোনরূপ অনুনয়-বিনয়েই তিনি মোহান্তপদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, তথাপি তাৎকালীন মোহান্তকে স্বপদে রাখিয়াও যাহাতে গোরক্ষনাথের মন্দিরের অমর্য্যাদা না হয়, গুরুর আশ্রম রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে স্বীকৃত হইতে হইল। তাঁহার পক্ষে অবশ্যই মন্দিরের মোহান্ত পদ এবং নিবিড় জঙ্গলে অজ্ঞাতবাসের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু তাঁহার প্রারব্ধবশেই হউক কি ভগবানের বিধান অনুসারেই হউক, এই দেহেতে অবস্থান কালে কিছু প্রকাশ্য লোকশিক্ষার কাজ তাঁহার জন্য সঞ্চিত ছিল। তাই তাঁহার লোকসমাজে আসিবার ব্যবস্থা হইল। যাঁহার কাছে সকল অবস্থাই সমান, তিনি ব্যবহারিক জগতে কালের গতিকে বাধা দেন না। তাঁহার ভাব—

নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেঽহং নিদেশং ভৃতকো যথা॥

তিনি সকল অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার কোন বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ বা অনিচ্ছাপ্রকাশ কেবল লৌকিক ব্যবহার মাত্র, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই। বাবাজি গোরক্ষপুরে আসিলেন, মোহান্তের মাথা হেঁট হইল। তিনি তাঁহাকে মোহান্তপদে রাখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে একরারনাম লিখিয়া লইয়া মোহান্তের সকল ক্ষমতা নিজে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার মাসহারার বন্দোবস্ত করিলেন। সাধুগণ মোহান্তের শাসনকালে প্রায়ই মন্দির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। মন্দিরকার্য্যের নিয়ম-প্রণালী সব ঠিক হইল। তখন তিনি কর্ম্মচারীর উপর ভার দিয়া আবার গয়ায় চলিয়া আসিলেন। বাবাজির অনুপস্থিতে মোহান্ত আবার মস্তক উন্নত করিলেন এবং দুষ্ট লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কর্ম্মচারীদের কাজে বাধা দিয়া নানারকম গোলমালের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সাধুগণ, কর্ম্মচারিগণ, স্থানীয় পদস্থ ব্যক্তিগণ আবার বাবাজির শরণাপন্ন হইলেন। বাবাজিকে যাইতে হইল। তদবধি গোরক্ষপুরেই তাঁহার স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

গোরক্ষপুরেই আসন গ্রহণ করিয়া তিনি মন্দিরাধ্যক্ষ হইলেন, মন্দিরের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইলেন, প্রজাদের নিকট জমিদার হইলেন, গৃহস্থের মত সাধুসেবক ও অতিথিসেবক হইলেন। এক বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে তাঁহার আসন স্থাপিত হইল। তাঁহার আগমনের পর হইতে সুচারুরূপে মন্দিরের সমস্ত বিভাগের সমস্ত কাজকর্ম্ম সম্পন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দিকে যখনই দৃষ্টিপাত করা যাইত দেখা যাইত তিনি আত্মস্থ। কখনও কর্ম্মচারী বৈষয়িক কাজকর্ম্মের নিবেদন করিতেছে, কখনও সেবক আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে, কখনও কোন পাওনাদার অর্থের জন্য আসিয়াছে, কখনও কেহ সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে, কখনও কোন অতিথি আশ্রমে আসিয়াছে; তিনি অন্তর্মুখ অবস্থাতেই 'হাঁ' 'নহি',

'আচ্ছা' প্রভৃতি কথা বলিয়া, যাহা যাহাকে দিতে হইবে তাহা তাহাকে দিয়া, অতিথিসেবা ও সাধু-সেবার ব্যবস্থা করিয়া আবার নিজের ভাবে ধ্যানস্থ হইতেন; তাঁহার মন যে কোনরূপ জটিল বৈষয়িক ব্যাপারে কখনও আলোড়িত হইত, তাহার কোন লক্ষণ কখনও প্রকাশ পাইত না। এ সময়ের কোন বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করার অবকাশ নাই।

১৯০৮ কি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বাঙ্গালী-দিগকে দীক্ষাদানে কৃপা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম বিশেষ ব্যাকুলতা দেখিয়া দুইচারিটীকে দিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের তিনচারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে অনেক বাঙ্গালী তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি ১৯৭৩ সংবৎ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ২১শে মার্চ্চ ৮ই চৈত্র বুধবার মহাবারুণী তিথিতে গোরক্ষনাথ-মন্দিরে স্বীয় আসনে ধ্যানোপবিষ্ট অবস্থায় মহাসমাধি গ্রহণ করেন।

বাবাজী জিজ্ঞাসুদের সংস্কার অনুসারে উপদেশ দিতেন। তাঁহার কয়েকটী সাধারণ উপদেশ এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করি।

১। জ্ঞান বিনা মুক্তি হয় না।

২। কলিযুগে মানুষের পরমায়ু কম, সুতরাং কোন তপস্যা দুঃসাধ্য। এই যুগে ভক্তিই ধর্ম্ম।

৩। বিচারই তপস্যা। সদসৎ ও নিত্যা-নিত্যবিচারই বিচার। যতদিন মোক্ষলাভ না হয়, ততদিন বিচারসত্ত্বেও বিক্ষেপাদি হইবেই। তবে খাইতে, শুইতে, বসিতে, চলিতে সর্ব্বদা বিচার জাগ্রত রাখিবে। প্রথম প্রথম পদস্খলন হইতে পারে বটে, কিন্তু বিচার জাগ্রত থাকিলে ক্রমে ক্রমে বিচারও দৃঢ় হইবে এবং বিক্ষেপাদিরও শক্তি কমিয়া যাইবে। বিচারই ধ্যান। আত্মবিচার দ্বারা মানুষ যতটা পরমার্থতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার ধ্যানের বিষয় ততটাই। আত্মানু-সন্ধান ব্যতিরেকে গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া কিম্বা অন্যের মুখে শুনিয়া সাময়িক উদ্দীপন হইতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না।

৪। মনের ধর্ম্মই চঞ্চলতা, কেবল যোগীদের মনেই চঞ্চলতা নাই। সাংসারিক লোকের মনে নানারূপ কুচিন্তা আসিয়াই থাকে, কিন্তু তাহাতে মন খারাপ করিবার কিছুই নাই। মনকে সর্ব্বদা সৎচিন্তায় নিযুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে, চেষ্টা-সত্ত্বেও যদি কখনও কোন কুচিন্তা আসিয়া যায় তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। যাহাতে তাহা কার্য্যে পরিণত না হয় তাহার চেষ্টা করিবে। কার্য্যে পরিণত করিলে তাহা স্থায়ী সংস্কাররূপে দাঁড়াইয়া যায়। জপ করিতে করিতে নামের শক্তিতে ক্রমশঃ মন হইতে খারাপ ভাব সকল বিদূরিত হইতে থাকিবে এবং মন স্থির হইবে।

৫। অতীত জীবনের দুর্ব্বলতার বিষয় ভাবিবে না। দুর্ব্বলতা ও গত পাপকার্য্যের বিষয় যত স্মরণ করিবে, ততই সংস্কার গাঢ়তর হইবে। সর্ব্বদা আত্মচিন্তার দ্বারা সংস্কার কাটিয়া যায়।

৬। নিজেকে পাপী কিংবা বদ্ধ ভাবিবে না। সর্ব্বদা নিজকে মুক্ত মনে করিবে। যে যেরূপ ভাবে, সে তাহাই হইয়া যায়।

৭। কখনও পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করিবে না। কেহ নিন্দনীয় কাজ করিলেও তাহার নিন্দা করা ভাল নয়।

৮। কখনও ক্রোধকে মনে স্থান দিবে না, ক্রোধ হইতে সমস্ত অনর্থ উৎপন্ন হয়।

৯। শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিবে। শাস্ত্রের যে কথা এখন না বুঝ, তাহাও অবহেলা করিবে না, এমন সময় আসিবে, যখন তাহা বুঝিতে পারিবে। সব শাস্ত্রের সারমর্ম্ম গীতাতেই আছে। গীতা পাঠ করিবে।

১০। সনাতন ধর্ম্মের বিধান মানিয়া চলিবে।

১১। (ভগবানের) রূপ বহু, কিন্তু স্বরূপ একই। দীক্ষামন্ত্র ভগবানের নাম।

১২। আহার বিষয়ে সনাতন ধর্ম্ম ও দেশা-চার মানিয়া যাহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তাহাই খাইতে পার।

১৩। কোন প্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া জপ, ধ্যান প্রভৃতি করিবে।

১৪। কোন মহাত্মা বা সাধুলোকের খবর পাইলে তাঁহাদের বিষয় কোন সমালোচনা না করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিবে।

আত্মহারা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সংসারের কলরব গিয়াছে থামিয়া।
নীরব হয়েছে ধরা—সুষুপ্তি ছাইয়া ॥
বারেক ঘুরিয়া এস অবসর নিয়ে।
হে মন মুহূর্ত্ত আর থেকোনা ঘুমিয়ে ॥
আকাশের পরে আছে আকাশের স্তর।
চলে যাও সব ছাড়ি'—সবারি উপর ॥
নিবিড় বহিছে সেথা আনন্দের ধারা।
বচন ফিরিয়া আসে আপনাতে হারা ॥
জ্ঞানের গরব সেথা রহেনাকো আর।
সীমার বাঁধন নাহি—নাহি দুঃখভার ॥
আপনারে খুলে গাও আনন্দের গান।
আত্মহারা হও লয়ে অসীমের প্রাণ ॥

শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

'ক খ' বা বর্ণশিক্ষা জিনিসটা যত সহজ মনে করা যায় তত সহজ নয়। এম-এ শ্রেণীর যুবককে অধ্যাপক দর্শন, বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রের তত্ত্ব অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতি সহজে বুঝাইয়া দেন, এই ক্ষেত্রে অধ্যাপকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় বলিয়া বড় একটা শোনা যায় না। কারণ এখানে অধ্যাপককে কোমল শিশুর সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে হয় না। অপরপক্ষে পাঠশালার গুরুমহাশয়দিগকে কচি শিশুদের নিকট পরীক্ষা দিতে হয়, তাহাদের স্বাধীনপ্রাণের অনন্ত প্রশ্নে তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, এই পরীক্ষায় অনেকেরই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। 'ক খ' শিখাইতে যে সমস্যা, বিজ্ঞান, দর্শন বা গণিতশাস্ত্রে সে সমস্যা আছে বলিয়া মনে করি না। যুবক স্বভাবতঃ কলেজের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিবার অধিকারী; যাহার সে অধিকার নাই, সে সরিয়া পড়ে, অধ্যাপকও বাঁচিয়া যান। কিন্তু গুরুমহাশয় 'ক খ' শিখাইবার সময় নিজে বিরক্ত হইয়া কচি শিশুকে অতিরিক্ত তাড়না করিলে বা তাহাকে বিদায় করিয়া দিলে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই অমঙ্গল হয়, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন মাটী হইয়া যায়। তাই বলি, পাঠশালার গুরুমহাশয়ের দায়িত্ব কলেজের অধ্যাপকের দায়িত্ব হইতে কোন অংশে কম নয়। ভিক্টর হুগো যথার্থই বলিয়াছিলে—'The future of mankind is in the hand of the School Master.' মানবজাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষকের হাতে গড়িয়া উঠে। এই গঠনব্যাপারে গুরুমহাশয়কে উদার ও প্রেমিক হইতে হইবে। কারণ প্রেম ভিন্ন শিশুর মন কিছুতেই ধরা যায় না। ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা জানিতেন—তিনিই বিদ্যাদানের প্রকৃত অধিকারী যিনি ভালবাসিতে জানেন। যিনি একাধারে ত্যাগী ও প্রেমিক তিনিই শুধু অধ্যাপক হইবার উপযুক্ত। স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর য়ুরোপ হইতে 'বিলাত যাত্রীর পত্রে' * লিখিয়াছেন। 'We must know that only he can teach who can love. The greatest teachers of men have been lovers of men. The real teaching is a gift, it is a sacrifice, it is not a manufactured article of routine work. * * *'

আদ্যস্বর অকারের আকৃতি ও প্রকৃতি শিশুর হৃদয়ে প্রথমে মুদ্রিত করিয়া তোলা বড়ই শক্ত। কারণ যে শিশু 'ক খ' পড়িবে সে হাতে কিছু লইয়া বা মাথায় কিছু ঠাসিয়া পাঠশালায় আসে না। শিশুরা শুধু নিজেদের উৎসুক চিত্তখানি লইয়া পাঠশালায় উপস্থিত হয়। শিশুর বিক্ষিপ্ত মনটাকে গুরুমহাশয় ঠিকভাবে শান্ত করিয়া উহাতে 'বর্ণশিক্ষার' বীজ বপন করিবেন। কৃষককে যেমন মাঠে বীজ বুনিয়া পা'হারা দিতে হয়, বীজের প্রাণশক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য তাহাকে নানা দিক্ দিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, তেমনি গুরুমহাশয়কেও ধূলাখেলা-সারসর্ব্বস্ব শিশুদের বর্ণশিক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থা করিয়া খাঁটি গুরু হইতে হয়।

আসল কথা, শিশুর প্রকৃতি অনুসারে গুরুমহাশয়কে চলিতে হইবে। শাস্তি, পুরস্কার বা

'লেখা পড়া করে যেই,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই

* 'শান্তিনিকেতন'—১৩২৭ সাল, আশ্বিন সংখ্যা।

সংসারের এই অতি হেয় উন্নতির প্রলোভন দেখাইয়া শিশুর মন পাঠের দিকে আকৃষ্ট করা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। ব্যবসায় ও শিল্পোন্নতির অভাবে আমাদের দেশের লোক দরিদ্র; এ দেশেও লেখা-পড়া শিখিলেই গাড়ী ঘোড়া চড়িবে ও বড়লোক হইবে, এ কথা শিশুদের মাথায় ঢুকাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ক্ষেপাইয়া তোলা নিরাপদ নয়। সে যুগ আর নাই,—এখন শিশুকে যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সমগ্র বিশ্বের ভাবের সহিত মিল রাখিয়া শিক্ষার সংস্কার করিতেই হইবে। তাই প্রাথমিক শিক্ষার সময় সর্ব্বপ্রথমে গুরুমহাশয়কে জানিতে হইবে 'শিশু চায় কি?' সে যাহা পড়িতে চায় না,—তাহা তাহাকে জোর করিয়া পড়ানো ভাল নয়। শিশুর অভাব যে কি, তাহা না বুঝিয়া শিক্ষার বিধান করিলে কোনই ফল নাই; ঐভাবে জোর করিয়া শিশুকে লেখা-পড়া শিখাইলে শিশুর স্বাধীন ভাবটী বিনষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাবী জীবনের মানুষ হইবার মূলমন্ত্রও হারাইয়া যায়। শিশু যখন স্বাধীন, তখনই তাহার চিত্তবৃত্তিগুলি সমান হইয়া ফুটে, সেই বাধাহীন কচি শিশুর মনের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং তাহার শরীর ও মনের যথাযথ স্বাভাবিক খাদ্য যোগাইয়া দেওয়াই গুরুমহাশয়ের কাজ।

জোর করিয়া পাঠশালার কতকগুলি কড়া নিয়মের ভিতরে শিশুকে বাঁধিয়া রাখিলে শিশু ভিতরে ভিতরে পড়ার দিকে উদাসীন হইয়া উঠে। ইহার ফলে শিশুর স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, হাসিতামাসা, কথাবার্ত্তা, চলাফেরা সব দিক দিয়া বাধা পায়; কাজেই শিশুদের কাছে পাঠশালা তখন কয়েদী-খানা হইয়া দাঁড়ায়। একদিন আমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'মা, পাঠশালা তোমার কেমন লাগে?' মেয়ে উত্তরে বলিয়াছিল, 'বাবা, সে স্থান বাড়ীর মত ভালো লাগে না, দিদিরা পড়ান বটে কিন্তু তাঁহাদের দেখিয়া বড়ই ভয় হয়।' এই যে বিদ্যালয় সম্বন্ধে শিশুদের অদ্ভুত ধারণা, ইহা দূর না করিলে আমাদের ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি নিজেও যখন চাকরীর প্রারম্ভে সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন প্রাচীন শিক্ষকদের এই মূর্ত্তিই দেখিয়া আসিয়াছি। তখন কচি শিশুকে বেত মারিতে ও চোখ রাঙ্গাইতে পারিলেই যেন বিদ্যালয়ের আইন কানুনের মর্য্যাদা রক্ষা হইত। প্রেম যে কি বস্তু তাহা তাঁহারা পুঁথিতে জানিলেও শিশুদের প্রতি সেই ভাব কখনও প্রকাশ করিতেন না। শুনিতে পাই আজও বিদ্যালয়বিশেষে জেলখানার কড়া আইন প্রচলিত আছে এবং শিশুরাও সেই সকল আট-কের বাঁধন সুযোগ পাইলেই ভাঙ্গিয়া থাকে। দেখা যায় আইনের ধারা যতই কঠোর হয়, শিশুরাও সেই অনুপাতে উচ্ছৃঙ্খল হয়।

এই বাঁধন ভাঙ্গিয়া শিশুকে রক্ষা করিতে হইবে—প্রেমের ধারায় শিশুকে অভিসিঞ্চিত করিতে হইবে—তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া তৈরী করিতে হইবে—শিশুবিশেষের প্রকৃতি যাহা চায় সেই দাবীমত শিক্ষককে চলিতে হইবে। শিশু যদি উচ্ছৃঙ্খল হয় সেজন্য আমরাই দায়ী, শিশুর কোনই দোষ নাই, তাহাকে হাসিমুখে ঠিক পথে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। যিনি পারি-বেন না তিনি যেন শিক্ষার পুণ্যব্রত হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। বর্ত্তমানে এই সংস্কারের পথ ধরিয়া না চলিলে সমগ্র বিশ্বের নিকট শিশুর মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার কোনই দায়িত্ব থাকিবে না। বর্ত্তমানে যে বাড়ীতে শিশুকে পড়ানো হইতেছে তাহা বদলাইয়া শিশুর সুবিধা ও ইচ্ছামত গুরুমহাশয় অন্য উপায় অবলম্বন করিবেন। খেলাধূলার ভিতর দিয়াই শিশুর কাণে শিক্ষার বীজমন্ত্র দিতে হইবে, কারণ ঐ খেলাধূলাই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। এই ভিত্তি গোড়ায় ভাঙ্গিয়া দিলে শিশুর উর্দ্ধে উঠিবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। শিশুর সরল ও স্বাধীন প্রাণের স্বতঃ উৎসারিত প্রশ্নমালার মীমাংসা করাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে বিদ্যামন্দিরে এই আদর্শ ধরিয়া কাজ করিতে শিক্ষকদের বড় একটা দেখা যায় না। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, শিশুর প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই। মনের কথা বলিতে গেলে শিশুকে অনেক স্থলে 'বাচাল' বলিয়া তাড়না করা হয়। এইভাবে গুরুমহাশয়ের চোখরাঙ্গানি

ও তাড়নায় শিশুর মৌলিক স্বাধীন ভাবটী একেবারে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন 'বাচাল' বালকই পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রত্ন' আখ্যা লাভ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমি অধিক কিছু বলিতে চাই না।

আসল কথা এই যে, বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন জারি করিয়াই যেন গুরুমহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া না থাকেন, তাঁহার সকলের চেয়ে ভাবিবার বিষয় 'শিশু চায় কি?' এই বিষয়টী তিনি প্রত্যেক শিশুর ভিতরকার দিক দিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। তাহা হইলে শিক্ষক সহজেই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনকে ক্রমোন্নতির দিকে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন। প্রাথমিক শিক্ষা তখনই সফল হইবে যখন গুরুমহাশয় শাস্ত্রোক্ত 'পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণে' প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রেমের ধারায় শিশুর অন্তর ও বাহির সরস করিয়া তুলিবেন, নতুবা নির্জীবভাবে শিশু শুকপাখীর মত বর্ণমালা আওড়াইলে কোনই ফল নাই।

ভারতীয় বর্ণমালা শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত; দেহের কোন্ যন্ত্র হইতে বর্ণমালার উচ্চারণ কি ভাবে দন্ত, ওষ্ঠ ও তালুর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় তাহা শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সেই উপদেশমত খেলাধূলার ভিতর দিয়া প্রেমিক গুরু বর্ণমালা বুঝাইয়া দিলে শিশুদের বর্ণমালার শিক্ষা সার্থক হইবে বলিয়া আমি মনে করি। নতুবা উঠিতে বসিতে কেবলি চোখ রাঙ্গাইলে শিশুর দন্ত, ওষ্ঠ ও তালুর ক্রিয়া রোধ হইয়া আসে, তখন শিশু ভয়ে বর্ণমালার ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিতেও সমর্থ হয় না। যেখানে ভয়, সেখানে ভীত ও সন্ত্রস্ত বালকের নিকট হইতে সুফল পাইবার আশা করা যায় না। এইভাবে ভীতি ও ত্রাস শিশুর স্বাভাবিক ভাবকে বিনষ্ট করে এবং সে তখন শিক্ষার (?) মাহাত্ম্যে অদ্ভুত জীবে পরিণত হয়।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

দ্বাদশ প্রকরণ।

সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতহিতার্থে চেষ্টা করা কিংবা লোককল্যাণ বা পরোপকার করিবার যুক্তিসিদ্ধ উপপত্তি কি, তাহা ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে। এক্ষণে, সমাজে এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে তৎসম্বন্ধে সাম্যবুদ্ধির দৃষ্টিতে আমাদের শাস্ত্রে যে মূল নিয়ম বিবৃত হইয়াছে তাহার বিচার করিব। "যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" (বৃহ. ২. ৪. ১৪) যাহার সমস্ত আত্মময় হইয়াছে, সে ব্যক্তি সাম্যবুদ্ধির দ্বারাই সকলের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে এই তত্ত্ব বৃহদারণ্যক ব্যতীত ঈশাবাস্য (ঈশা. ৬) এবং কৈবল্য (কৈ. ১. ১০) উপনিষদে এবং মনুসংহিতাতেও (মনু. ১২. ৯১ ও ১২৫) প্রদত্ত হইয়াছে; এবং "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" এইরূপ গীতার ৬ অধ্যায়ে এই তত্ত্বেরই অক্ষরশঃ উল্লেখ আছে। সর্ব্বভূতাত্মৈক্যের কিংবা সাম্যবুদ্ধির এই যে তত্ত্ব, আত্মৌপম্যদৃষ্টি তাহারই এক রূপান্তর। কারণ, উহা হইতে এই সহজ সিদ্ধান্তই বাহির হয় যে, সমস্ত ভূতে আমি আছি ও আমাতে যখন সমস্ত আছে, তখন আমি আপনার সহিত যেরূপ ব্যবহার করি সেইরূপই অন্যভূতের সহিত আমার ব্যবহার করিতে হইবে। তাই, এই "আত্মৌপম্যদৃষ্টিতে অর্থাৎ সমানভাবে যে সকলের সহিত ব্যবহার করে" সে-ই উত্তম কর্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞ, এইরূপ বলিয়া তাহার পর ভগবান অর্জ্জুনকে সেই অনুসারে ব্যবহার করিতে উপদেশ করিয়াছেন (গী. ৬. ৩০-৩২)। অর্জ্জুন অধিকারী হওয়ায় গীতায় এই তত্ত্বের বেশী খোলসা করা আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু সাধারণ লোককে নীতি ও ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য রচিত মহাভারতে অনেক স্থানে এই তত্ত্ব বিবৃত করিয়া (মভা. শাং. ২৩৮. ২১; ২৬১. ৩৩), ব্যাসদেব তাহার গভীর ও ব্যাপক অর্থ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। উদাহরণ যথা— উপনিষৎ ও গীতায় সংক্ষেপে কথিত আত্মৌপম্যের এই তত্ত্বই এইরূপে বুঝাইয়াছেন—

> আত্মৌপমস্তু ভূতেষু যো বৈ ভবতি পুরুষঃ।
> ন্যস্তদণ্ডো জিতক্রোধঃ স প্রেত্য সুখমেধতে॥

"যে ব্যক্তি আপনার মতো পরকে মনে করে এবং যে ব্যক্তি ক্রোধকে জয় করিয়াছে সে পরলোকে সুখ লাভ করে" (মভা. অনু ১১৩. ৬)। এক ব্যক্তি অন্যের

সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহার বর্ণনা এইখানেই শেষ না করিয়া পরে বলিয়াছেন—

> ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
> এষ সংক্ষেপতো ধর্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ততে ॥

"আপনার যাহা প্রতিকূল অর্থাৎ দুঃখকারক বলিয়া মনে হয়, সেরূপ ব্যবহার অন্য লোকের সহিত করিবে না, ইহাই সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতির সার, বাকী সমস্ত ব্যবহার লোভমূলক" (মভা. অনু. ১১৩. ৮)। শেষে বৃহস্পতি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

> প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
> আত্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥
> যথাপরঃ প্রক্রমতে পরেষু তথা পরে প্রক্রমন্তেঽপরস্মিন্।
> তথৈব তেষূপমা জীবলোকে যথা ধর্ম্মো নিপুণেনোপদিষ্টঃ ॥

"সুখ কিংবা দুঃখ, প্রিয় কিংবা অপ্রিয়, দান কিংবা নিষেধ এই সমস্ত বিষয়ে প্রত্যেক মনুষ্য নিজের আত্মা কিরূপ অনুভব করে তাহা দেখিয়া অন্যের সম্বন্ধে অনুমান করিবে। একজন যেরূপ অন্যের সহিত ব্যবহার করে, সেইরূপ অন্য লোক তাহার সহিত ব্যবহার করে; তাই, এই উপমা লইয়াই এই জগতে আত্মৌপম্যের দৃষ্টিতে ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের ধর্ম্ম বলিতে হইবে"। (অনু. ১১৩. ১, ১০)। "ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ" এই শ্লোক বিদুর নীতিতেও আছে (উদ্যো. ৩৮. ৭২); এবং পরে শান্তিপর্ব্বে (শাং ১৬৭. ৯) পুনর্ব্বার বিদুর এই তত্ত্বই যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন। কিন্তু আত্মৌপম্য নিয়মের এই এক অংশ যে, লোককে দুঃখ দিও না, কারণ তোমার যাহা দুঃখজনক তাহাই অন্য লোকেরও দুঃখজনক হইয়া থাকে। এখন ইহার উপর কদাচিৎ কাহারও এই সংশয় স্থায়ী হইবে যে, ইহা হইতে এই নিশ্চয়াত্মক অনুমান কিরূপে বাহির হইতেছে যে, তোমার যাহা সুখজনক বলিয়া মনে হয় তাহাই অন্য লোকেরও সুখজনক, তাই অন্য লোকেরও যাহা সুখকর হইবে, সেই প্রকার ব্যবহার কর? এই শঙ্কা নিরসনার্থ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মলক্ষণ বলিবার সময় ইহা অপেক্ষা বেশী খোলসা করিয়া এই নিয়মের দুই অংশের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—

> যদন্যৈর্বিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ম পূরুষঃ।
> ন তৎ পরেষু কুর্বীত জানন্নপ্রিয়মাত্মনঃ ॥
> জীবিতং যঃ স্বয়ং চেচ্ছেৎ কথং সোঽন্যং প্রঘাতয়েৎ।
> যদ্যদাত্মনি চেচ্ছেৎ তৎ পরস্মিন্নপি চিন্তয়েৎ ॥

"আমার সহিত অন্যলোক যেরূপ ব্যবহার করিবে না বলিয়া আমি ইচ্ছা করি সেইরূপ, অর্থাৎ আপনার কিসে ভাল লাগে বুঝিয়া আমি অন্য লোকের সহিতও সেরূপ ব্যবহার করিব না। আমি নিজে জীবিত থাকিব বলিয়া যদি ইচ্ছা করি তাহা হইলে অন্যকে বধ করিব কি করিয়া? যাহা আমি চাহি তাহা অপরেও চাহে ইহা মনে রাখিতে হইবে" (শাং. ২৫৮. ১৯. ২১)। এবং অন্য স্থানে এই নিয়মই বলিবার সময় 'অনুকূল' কিংবা 'প্রতিকূল' বিশেষণ প্রয়োগ না করিয়া যে কোন প্রকারের ব্যবহার বিষয়ে সাধারণতঃ বিদুর বলিয়াছেন—

> তস্মাদ্ধর্ম্মপ্রধানেন ভবিতব্যং যতাত্মনা।
> তথা চ সর্বভূতেষু বর্তিতব্যং যথাত্মনি ॥

"ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের সহিত ব্যবহার করিবে; এবং আপনারই ন্যায় সমস্ত ভূতের সহিত ব্যবহার করিবে" (শাং. ১৬৭. ৯)। কারণ, শুকানুপ্রশ্নে ব্যাস বলেন—

> যাবানাত্মনি বেদাত্মা তাবানাত্মা পরাত্মনি ॥
> য এবং সততং বেদ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।

"আমার শরীরের মধ্যে যতখানি আত্মা অন্যের শরীরেও ততখানি আছে, ইহা যে সর্ব্বদা জানে সে-ই অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়।" (মভা. শাং. ২৩৮. ২২)। বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব মানিতেন না; নূনকল্পে, আত্মবিচারের ব্যর্থ গোলযোগের মধ্যে পড়িও না, এইরূপ তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন। তথাপি বৌদ্ধ ভিক্ষু অন্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ইহা বলিবার সময় বুদ্ধও—

> যথা অহং তথা এতে যথা এতে তথা অহং।
> অত্তানং (আত্মানং) উপমং কত্বা (কৃত্বা) ন হনেয্যং ন ঘাতয়ে ॥

"যেমন আমি তেমনি ইহারা, (এইরূপ) নিজের উপমা বুঝিয়া (কাহাকেও) বধ করিবে না ও করাইবে না"— আত্মৌপম্যদৃষ্টির এই উপদেশ দিয়াছেন (সুত্তনিপাত, নালকসুত্ত ২৭ দেখ)। ধর্ম্মপদ নামক আর এক পালী বৌদ্ধগ্রন্থেও (ধম্মপদ. ১২৯ ও ১৩০) উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ দুইবার অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে; তাহার পর তখনই মনুস্মৃতি (৫. ৪৫) ও মহাভারত (অনু. ১১৩. ৫) এই দুই গ্রন্থে লিখিত শ্লোকের নিম্নলিখিত অনুবাদ পালীভাষায় করা হইয়াছে—

> সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি।
> অত্তনো সুখমেসানো (ইচ্ছন্) পেচ্চ সো ন লভতে সুখং ॥

"(আপনারই ন্যায়) সুখের ইচ্ছাকারী অন্য প্রাণীদিগের যে ব্যক্তি আপনার (অত্তনো) সুখের জন্য দণ্ডের দ্বারা হিংসা করে, মৃত্যুর পর তাহার সুখ হয় না" (ধম্মপদ ১৩১)। আত্মার অস্তিত্ব না মানিলেও আত্মৌপম্যের এই ভাষা যখন বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়, তখন বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা এই বিচার বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু ইহার বিস্তৃত বিচার পরে করা যাইবে। উপরি-উক্ত বিচার হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি"

এইরূপ যাহার অবস্থা হইয়াছে সে ব্যক্তি অন্যের সহিত ব্যবহার করিবার সময় আত্মৌপম্য-বুদ্ধিতেই সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন ; এবং এইরূপ ব্যবহারের ইহাই এক মুখ্য নৈতিক তত্ত্ব—এইরূপ আমরা প্রাচীনকাল হইতে বুঝিয়া আসিয়াছি। সমাজে এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, ইহার নির্ণয়ে,—আত্মৌপম্যবুদ্ধির এই সূত্র "অধিক লোকের অধিক হিত" এই আধিভৌতিক তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, নির্দ্দোষ, নিঃসন্দিগ্ধ, ব্যাপক, স্বল্প ও অজ্ঞান মনুষ্যদিগেরও সহজে বোধগম্য হইবার যোগ্য, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে।* ধর্ম্মাধর্ম্ম শাস্ত্রের এই রহস্য (এষ সংক্ষেপতো ধর্ম্মঃ) কিংবা মূলতত্ত্বের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যেরূপ উপপত্তি হয় কর্ম্মের বাহ্য পরিণামের প্রতি দৃষ্টিশীল আধিভৌতিক-বাদে সেরূপ হয় না ; এবং সেইজন্যই ধর্ম্মাধর্ম্মশাস্ত্রের এই প্রধান নিয়মকে, কর্ম্মযোগের আধিভৌতিক দৃষ্টিতে যাঁহারা বিচার করেন সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে প্রধান স্থান দেওয়া হয় নাই। অধিক কি, আত্মৌপম্য-দৃষ্টির সূত্র একপাশে সরাইয়া রাখিয়া, তাঁহারা সমাজবন্ধনের উপপত্তি "অধিকাংশের অধিক সুখ" ইত্যাদি দৃশ্যতত্ত্ব-প্রয়োগেই লাগাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু উপনিষদে, মনুস্মৃতিতে, গীতায়, মহাভারতের অন্যান্য প্রকরণে এবং কেবল বৌদ্ধধর্ম্মেই নহে, অন্যান্য দেশে ও ধর্ম্মেও আত্মৌপম্যের এই সহজ নীতিতত্ত্বকেই সর্ব্বত্র অগ্রস্থান প্রদত্ত হইয়াছে, দেখা যায়। ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তকে "তুমি আপন প্রতিবেশীকে আপনার মতোই প্রীতি কর" (লেভি. ১৯· ১৫ ; মাথ্যু. ২২. ৩৯) এই যে অনুজ্ঞা আছে তাহা এই নিয়মেরই রূপান্তর। খৃষ্টানেরা ইহাকে সোনার নিয়ম অর্থাৎ সোনার ন্যায় মূল্যবান নিয়ম বলেন ; কিন্তু আত্মৈক্যের উপপত্তি উহাঁদের ধর্ম্মে প্রদত্ত হয় নাই। "তুমি নিজের সহিত অন্য লোকের যেরূপ ব্যবহার ইচ্ছা কর, তাহাদের সহিত তোমার নিজেরও সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত (মা. ৭. ১২; ল্যু. ৬. ৩১), খৃষ্টের এই উপদেশও আত্মৌপম্যসূত্রের এক অংশ মাত্র ; গ্রীসদেশের তত্ত্বজ্ঞপণ্ডিত অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থে. মনুষ্যদিগের পরস্পরব্যবহারের এই তত্ত্বই অক্ষরশঃ কথিত হইয়াছে। অ্যারিষ্টটল্ খৃষ্টের প্রায় দুই-তিনশত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; কিন্তু অ্যারিষ্টটলেরও ন্যূনাধিক প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে চিনীয় তত্ত্বজ্ঞানী খুঁ-ফু-ৎসে (ইংরেজী অপভ্রংশ কান্‌ফ্যুশিয়স্) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি আত্মৌপম্যের উপরি-উক্ত নিয়ম চিনীয় ভাষার রীতি অনুসারে এক শব্দেই বলিয়াছেন! কিন্তু আমাদের এখানে এই তত্ত্ব কন্‌ফ্যুশিয়সেরও বহুপূর্ব্বে উপনিষদে (ঈশ. ৬ ; কেন. ১৩) এবং পরে মহাভারতে, গীতায় এবং "আত্মবৎ পরাবে তে। মানীত জাবে॥" "আত্মবৎ পরকে মনে করিবে"—এই ভাবে (দাস. ১২. ১০. ২২) সাধুমণ্ডলীর গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে ; "আপনারই ন্যায় জগৎকে জানিবে" এইরূপ প্রচলিত কথাও আছে। শুধু ইহাই নহে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ইহার আধ্যাত্মিক উপপত্তিও দিয়াছেন। বৈদিকেতর ধর্ম্মে নীতি-ধর্ম্মের এই সর্ব্বমান্য সূত্রটি প্রদত্ত হইলেও উহার উপপত্তি বিবৃত হয় নাই, এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ অধ্যাত্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুতেই এই সূত্রের উপপত্তি ঠিক্ লাগ-সই হয় না, এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিলে গীতোক্ত আধ্যাত্মিক নীতিশাস্ত্রের কিংবা কর্ম্মযোগের মহত্ত্ব সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

সমাজে মনুষ্যেরা পরস্পরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে এই সম্বন্ধে আত্মৌপম্য-বুদ্ধির নিয়ম এত সুলভ, ব্যাপক, সুবোধ ও বিশ্বতোমুখ যে, সমস্ত ভূতে এইরূপ আত্মৌপম্য উপলব্ধি করিয়া "আত্মবৎ সমবুদ্ধিতে অন্যের সহিত ব্যবহার কর" এইরূপ একবার বাঁধাবাঁধি নিয়ম স্থাপন করিলে পর, লোকের উপর দয়া কর, তাহাদিগকে যথাশক্তি সাহায্য কর, তাহাদিগের উন্নতিসাধন কর, তাহাদিগকে প্রীতি কর, তাহাদিগের বিরক্তি উৎপাদন করিও না, তাহাদিগকে কষ্ট দিও না, তাহাদের সহিত ন্যায় ও সমতার সহিত ব্যবহার কর, কাহাকেও ঠকাইও না, কাহারও দ্রব্য হরণ কিংবা হিংসা করিও না, কাহারও নিকট মিথ্যা কথা বলিও না, অধিকাংশের অধিক কল্যাণ করিবার বুদ্ধি মনে নিত্য পোষণ কর, অথবা সকলকেই এক পিতার সন্তান মনে করিয়া তাহাদিগের সহিত ভায়ের মতো ব্যবহার কর ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ করা আর আবশ্যকই হয় না। যে-ই হউক না কেন তাহার নিজের সুখদুঃখ বা কল্যাণ কিসে হয় তাহা সে স্বভাবতই সহজেই বুঝিতে পারে ; এবং সংসারে ব্যবহার করিবার সময় "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি" অথবা "অর্দ্ধং ভার্য্যা শরীরস্য" এইরূপ ভাবিয়া, আপনার ন্যায়ই আপন স্ত্রীপুত্রদিগেরও প্রতি প্রীতি করা উচিত, এই বিষয়ের অনুভবও পারিবারিক ব্যবস্থার দ্বারা তাহার হইয়া থাকে। কিন্তু পরিবার আত্মৌপম্যবুদ্ধি শিক্ষার প্রথম পাঠ ; ইহাতেই সর্ব্বদা মুগ্ধ হইয়া না থাকিয়া, পরে মিত্র, আপ্ত, গোত্রজ, গ্রামস্থ, জাতিবন্ধু এবং শেষে

* 'সূত্র' শব্দের ব্যাখ্যা "অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" এইরূপ করা হইয়া থাকে। গানের সুবিধার জন্য কোন মন্ত্রে যে সকল অনর্থক অক্ষর বসানো হয় তাহাকে স্তোভাক্ষর বলে। সূত্রে এইরূপ অনর্থক অক্ষর থাকে না। তাই, এই লক্ষণে 'অস্তোভং' এই পদ আসিয়াছে।

সমস্ত মনুষ্যে সমস্ত ভূতে, এইরূপ প্রত্যেক মনুষ্য নিজের আত্মৌপম্যবুদ্ধি বেশী বেশী ব্যাপক করিয়া, আমার মধ্যে যে আত্মা আছে তাহাই সমস্ত ভূতে আছে ইহা উপলব্ধি করা ও শেষে সেইরূপ ব্যবহার করা—ইহাই জ্ঞানের ও আশ্রমব্যবস্থার পরাকাষ্ঠা অথবা মনুষ্যমাত্রের সাধ্যসীমা। ইহাই আত্মৌপম্যবুদ্ধিরূপ সূত্রের চরম ও ব্যাপক অর্থ। এবং এই পরমাবস্থা অর্জ্জন করিবার যোগ্যতা যে-যে যজ্ঞদানাদি কর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেই সমস্ত কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধিকর, ধর্ম্ম্য, সুতরাং গৃহস্থাশ্রমে কর্ত্তব্য, ইহা পরে আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধির প্রকৃত অর্থ স্বার্থবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মাত্মৈক্য উপলব্ধি করা, এবং ইহারই জন্য গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্মকে স্মৃতিকারেরা বিহিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহারও মর্ম্ম ইহাই। অধ্যাত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মযোগশাস্ত্র সকলকে বলিতেছেন যে, "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি" ইহাতেই আত্মার ব্যাপ্তির সঙ্কোচ না করিয়া তাহার এই স্বাভাবিক ব্যাপ্তি উপলব্ধি কর যে, "লোকো বৈ অয়মাত্মা"; এবং "উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকং"—উদার ব্যক্তিদিগের বসুধাই কুটুম্ব—এই ধারণা অনুসারে প্রত্যেকে নিজের ব্যবহার নিয়মিত করিবে। এই বিষয়ে আমাদের কর্ম্মযোগশাস্ত্র অন্য দেশের প্রাচীন কিংবা অর্ব্বাচীন কর্ম্মযোগশাস্ত্রের নিকট হার মানে না শুধু নহে, বরং উহাদিগকে উদরস্থ করিয়াও পরমেশ্বরের ন্যায় 'দশ অঙ্গুলী' বেশী থাকিবে এইরূপ আমার বিশ্বাস।

কিন্তু এই সম্বন্ধেও কেহ কেহ বলেন যে, আত্মৌপম্যভাবের দ্বারা "বসুধৈব কুটুম্বকং" এইরূপ বেদান্তী ও ব্যাপক দৃষ্টি হইলে পর, দেশাভিমান, কুলাভিমান, ধর্ম্মাভিমান প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণের কোন ফলে বংশ কিংবা রাষ্ট্র এক্ষণে অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে দেখা যায় সেই সমস্ত সদ্‌গুণ বিনষ্ট হয় শুধু নহে, প্রত্যুত কোন আত্মীয়কে বধ করিবার কিংবা কষ্ট দিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেও "নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু" (গী. ১১. ৫৫) এই গীতাবাক্য অনুসারে তাহাকে দুষ্টবুদ্ধিতে না মারাই আমার ধর্ম্ম হইবে (ধম্মপদ ৩৩৮ দেখ), কাজেই দুষ্টের দমন না হওয়ায় তাহাদের দুষ্কর্ম্মের নিকট সাধু পুরুষদিগের বলিদান ঘটিবে। এই প্রকারে দুষ্টদিগের প্রাবল্য হইলে তাহার ফলে সমস্ত সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের নাশও হইবে। "ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ" (মভা. বন. ২০৬. ৪৪)—দুষ্টের প্রতি দুষ্ট হইবে না, তাহার সহিত সাধু ব্যবহারই করিবে; কারণ, দুষ্ট ব্যবহারের দ্বারা কিংবা বৈরতার দ্বারা বৈরতা কখনই বিনষ্ট হয় না—"ন চাপি বৈরং বৈরেণ কেশব ব্যুপশাম্যতি" এইরূপ মহাভারতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। বরং যাহাকে আমরা পরাজয় করি সে ব্যক্তি স্বভাবতই দুষ্ট হওয়ায় পরাজিত হইলে তাহার মনে আরও কড়া পড়িয়া যায় এবং সে পুনর্ব্বার শোধ তুলিবার সুযোগ দেখিয়া থাকে—"জয়ো বৈরং প্রসৃজতি;" তাই দুষ্টদিগকে শান্তির দ্বারাই নিবারণ করা যুক্তিসিদ্ধ (মভা. উদ্যো. ৭১. ৫৯ ও ৬৩)। মহাভারতের এই শ্লোকই বৌদ্ধগ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে (ধম্মপদ ৫ ও ২০১; মহাবগ্‌গ ১০. ২ ও ৩ দেখ), এবং এইরূপই "তুমি নিজের শত্রুকে প্রীতি কর" (মাথ্যু. ৫. ৪৪), এবং "এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল বাড়াইয়া দেও" (মাথ্যু ৫. ৩৯; লু. ৬. ২৯), এইরূপ খৃষ্টও এই তত্ত্বের অনুসরণ করিয়াছেন। খৃষ্টের পূর্ব্বে চিনীয় তত্ত্বজ্ঞ লা-ও-ৎসেও এইরূপ বলিয়াছেন; আমাদের মহারাষ্ট্র-সাধুমণ্ডলীর মধ্যে একনাথ মহারাজার ন্যায় সাধুপুরুষদিগের এইরূপ আচরণ করিবার অনেক কথাই আছে। ক্ষমা কিংবা শান্তির পরাকাষ্ঠা-উৎকর্ষ যাঁহারা দেখাইয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্তের পবিত্র যোগ্যতার লাঘব করা আমার আদৌ উদ্দেশ্য নহে। সত্যেরই ন্যায় ক্ষমাধর্ম্মও শেষে অর্থাৎ সমাজের পূর্ণাবস্থায় অব্যভিচারী ও নিত্যরূপে থাকিয়া যাইবে ইহাতে সংশয় নাই। অধিক-কি, সমাজের এখনকার অপূর্ণ অবস্থাতেও বহু প্রসঙ্গে শান্তির দ্বারা যে কাজ হয় তাহা ক্রোধের দ্বারা হয় না, এইরূপ নজরে আসে। দুষ্ট দুর্যোধনকে সাহায্য করিবার জন্য কোন্ কোন্ যোদ্ধা আসিয়াছে, অর্জ্জুন যখন দেখিতে লাগিলেন তখন তাহার মধ্যে পিতামহ ও গুরুর ন্যায় পূজ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার নজরে পড়িতেই, দুর্যোধনের দুষ্টতার প্রতিকারার্থ শুধু কর্ম্মে নহে, প্রত্যুত অর্থেও যাঁহারা আসক্ত হইয়া গিয়াছেন, সেই গুরুজনদিগকে শস্ত্রের দ্বারা বধ করিবার দুষ্কর কর্ম্মও আমাকে করিতে হইবে (গী ২. ৫) এই কথা তিনি বুঝিলেন; এবং "ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ" এই নীতি অনুসারে—দুর্যোধন দুষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার সহিত দুষ্ট ব্যবহার করা আমার উচিত নয়, "তাঁহারা আমাকে বধ করিলেও (গী. ১. ৪৬) 'নির্ব্বৈর' অন্তঃকরণে শান্তভাবে আমার বসিয়া থাকা উচিত" এইরূপ অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন। এই সংশয়ের নিবারণার্থই গীতাশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং সেই জন্য গীতায় এই বিষয়ের যেরূপ খোলসা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেরূপ অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থে করা হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। উদাহরণ যথা—বৌদ্ধ ও খৃষ্টান এই দুই ধর্ম্মই নির্ব্বৈরত্বের তত্ত্ব বৈদিক ধর্ম্মেরই

অনুরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু লোকসংগ্রহের প্রতি কিংবা আত্মরক্ষণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাহার ব্যবহার এবং বুদ্ধি অনাসক্ত ও নির্ব্বৈর হইলেও সেই অনাসক্ত ও নির্ব্বৈর বুদ্ধিতে যে কর্ম্মযোগী ব্যবহার করে তাহার ব্যবহার সর্ব্বাংশে যে একই প্রকার হইতে পারে না, সে কথা বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া কোথাও বলা হয় নাই। বরং, খৃষ্টপ্রণত উপরি-উক্ত নির্ব্বৈরত্বের উপদেশ এবং সাংসারিক নীতি ইহাদের উচিত সমন্বয় কিরূপে করা যাইতে পারে সেই বিষয়ে পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞেরা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই; * এবং নিৎশে নামক আধুনিক জর্ম্মন পণ্ডিত এই মত নিজ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে, নির্ব্বৈরত্বের এই ধর্ম্মতত্ত্ব দাসত্বের ধর্ম্মতত্ত্ব ও অনিষ্টজনক ধর্ম্মতত্ত্ব, এবং সেই ধর্ম্মতত্ত্বকে খৃষ্টধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সমস্ত য়ুরোপকে নির্বীর্য্য করিয়া তবে ছাড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ দেখিলে, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই ধর্ম্মমার্গের মধ্যে এই বিষয়ে ভেদ করা আবশ্যক, এই কথা শুধু গীতার নহে মনুরও অবগত ও সম্মত ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, "ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেৎ"— ক্রুদ্ধ ব্যক্তির উপর উল্টা ক্রোধ করিবে না (মনু. ৬. ৪৮)—এই নিয়ম, মনু গার্হস্থ্য কিংবা রাজধর্ম্মের মধ্যে না বলিয়া কেবল যতিধর্ম্মের মধ্যেই বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্ বচনটি কোন্ মার্গের, কিংবা তাহার কোথায় উপযোগ করিবে, ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত মিলাইয়া ফেলিয়া একত্র বলিবার যে পদ্ধতি এখনকার টীকাকারেরা স্থাপন করিয়াছেন তাহার দরুন অনেক সময় কর্ম্মযোগের প্রকৃত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহা পূর্ব্বে পঞ্চম প্রকরণে দেখাইয়াছি। গীতার টীকাকারদিগের এই গোলমেলে পদ্ধতি ছাড়িয়া দিলে ভাগবতধর্ম্মী কর্ম্মযোগী 'নির্ব্বৈর' শব্দের কিরূপ অর্থ করেন তাহা সহজেই জানা যায়। কারণ, কর্ম্মযোগী গৃহস্থ এইরূপ প্রসঙ্গে দুষ্টের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, পরম ভগবদ্‌ভক্ত প্রহ্লাদ তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—"তস্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত! পণ্ডিতৈরপবাদিতা" (মভা. বন. ২৮. ৮)—এই জন্যই বাপু! বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সর্ব্বদা ক্ষমার অপবাদ করিয়াছেন। আমার যাহা দুঃখজনক হইবে এইরূপ কর্ম্ম করিয়া অন্যকে দুঃখ দেওয়া উচিত নহে—ইহা আত্মৌপম্যদৃষ্টির সাধারণ ধর্ম্ম—সত্য বটে; কিন্তু আমাকে দুঃখ দেওয়া অন্যেরও উচিত নহে, এইরূপ এই ধর্ম্মেরই অনুরূপ যে আর এক ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মপালনকারী লোক যে সমাজে নাই সেই সমাজে কেবল এক জন এই ধর্ম্ম পালন করিলে কোন ফল হয় না, এইরূপ মহাভারতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সমতা এই শব্দই দুই ব্যক্তির সম্বন্ধসাপেক্ষ। তাই, আততায়ী পুরুষকে মারিয়া ফেলিলে যেমন অহিংসার লাঘব হয় না, সেইরূপ দুষ্টের উচিত শাসনকারী সাধু পুরুষদিগের আত্মৌপম্যবুদ্ধিতে কিংবা নির্ব্বৈরিতাতেও কোন লাঘব ঘটে না। বরং দুষ্টদিগের অন্যায়াচরণের প্রতিকার করিয়া অন্যকে বাঁচাইবার শ্রেয় তাঁহারা লাভ করেন। যে পরমেশ্বর অপেক্ষা কাহারও বুদ্ধি অধিক সম নহে সেই পরমেশ্বর পর্য্যন্ত সাধুদিগের সংরক্ষণার্থ ও দুষ্টদিগের বিনাশার্থ যদি সময়ে সময়ে অবতার হইয়া লোকসংগ্রহ করিয়া থাকেন (গী. ৪. ৭ ও ৮) তবে অন্য ব্যক্তির কথা কি? "বসুধৈব কুটুম্বকং" এইরূপ দৃষ্টি হইলে কিংবা ফলাশা ছাড়িলে, পাত্রাপাত্রভেদ কিংবা যোগ্যাযোগ্যভেদ বিলুপ্ত হইবে—এ কথা ভ্রান্তিমূলক। ফলাশায় মমত্ববুদ্ধিই প্রধান হইয়া থাকে এবং তাহা না ছাড়িলে পাপপুণ্য হইতে মুক্তি নাই, ইহা গীতার সিদ্ধান্ত। কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন না থাকিলেও, যদি কোন সিদ্ধ পুরুষ কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে এমন কোন বস্তু লইতে দেন যাহা তাহার যোগ্য নহে, তাহা হইলে সেই সিদ্ধ পুরুষের দুষ্ট কিংবা অযোগ্য লোকদিগকে সাহায্য করিবার, এবং যোগ্য সাধুলোকদিগেরও ক্ষতি করিবার পাপ না হইয়া যায় না। কুবেরের ন্যায় কোটিপতি মহাজন বাজারে শাকসব্জি খরিদ করিতে গেলে, এক বস্তা ধানের-চালের জন্য যেরূপ তিনি লাখ টাকা দেন না, সেইরূপ পূর্ণ সাম্যাবস্থায় উপনীত ব্যক্তি, কোনও কার্য্যের যোগ্য তারতম্যের কথা বিস্মৃত হন না। তাঁহার বুদ্ধি সম হইয়াছে সত্য; কিন্তু সমতা শব্দের অর্থে গরুর ঘাস মনুষ্যকে এবং মনুষ্যের অন্ন গরুকে দিবে—এরূপ করিলে চলিবে না; এবং ভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন যে, 'দাতব্য' বলিয়া যে সাত্ত্বিক দান তাহাও "দেশে কালে চ পাত্রে চ" অর্থাৎ দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া করিতে হইবে (গী. ১৭. ২০)। সাধুপুরুষদিগের সাম্যবুদ্ধির বর্ণনা করিবার সময় জ্ঞানেশ্বর মহারাজ তাহার সহিত পৃথিবীর উপমা দিয়াছেন। এই পৃথিবীর আর এক নাম 'সর্ব্বংসহা'; কিন্তু এই 'সর্ব্বংসহা' দেবীকেও কেহ পদাঘাত করিলে, যে পা লাথি মারে সেই পায়ের তলায় ততটা জোরে প্রতিঘাত করিয়া নিজের সমতাবুদ্ধি ব্যক্ত করিয়া থাকেন! মনে বৈর না থাকিলেও (অর্থাৎ নির্বৈর) প্রতিকার কিরূপে

* See Paulsen's *System of Ethics*, Book III, Chap. X (Eng. Trans.) and Nietzsche's *Anti-Christ*.

করা যাইতে পারে, ইহার দ্বারা সুন্দর ব্যক্ত হয়। কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ায় বলিয়া আসিয়াছি যে, এই কারণেই স্বয়ং ভগবানও "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" (গী. ৪. ১১) যে আমাকে যেরূপে ভজনা করে আমি তাহাকে সেইরূপই ফল প্রদান করি—এইরূপ বলিয়াও "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য" দোষ হইতে অলিপ্ত থাকেন। সেইরূপ আবার, ব্যবহারে, কিংবা আইনেও খুনী মনুষ্যের প্রতি ফাঁসির আদেশদাতা বিচারপতির বৈরীভাব আছে এ কথা কেহ বলিবে না। বুদ্ধি নিষ্কাম হইয়া সাম্যাবস্থায় পৌঁছিলে সেই মনুষ্য স্বেচ্ছাক্রমে কাহারও ক্ষতি করেন না, উঁহা হইতে যদি অন্যের ক্ষতিই হয় তবে সে তাহারই কর্ম্মফল বুঝিতে হইবে, ইহাতে স্থিতপ্রজ্ঞের কোনই দোষ নাই; কিংবা নিষ্কাম-বুদ্ধিবিশিষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞ এইরূপ প্রসঙ্গে যে কর্ম্ম করেন—তাহা মাতৃবধ কিংবা গুরুবধের ন্যায় যতই নিষ্ঠুর প্রতীয়মান হউক না কেন—তাহার শুভাশুভ ফলের বন্ধন অথবা স্পর্শ তাঁহাকে লাগে না, ইহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত (গী. ৪. ১৪; ৯. ২৮ ও ১৮. ১৭ দেখ)। ফৌজদারী আইনে আত্মসংরক্ষণের যে নিয়ম আছে তাহা এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। মনু সম্বন্ধে এইরূপ একটা কথা আছে যে, লোকেরা তাঁহাকে রাজা হইবার জন্য যখন মিনতি করিল তখন "অনাচারী লোকদিগকে শাসন করিবার জন্য রাজ্য গ্রহণ করিয়া আমি পাপে পতিত হইতে ইচ্ছা করি না" তিনি প্রথমে এই উত্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন লোকেরা তাঁহাকে বলিল—"তমব্রুবন্ প্রজাঃ মা ভীঃ কর্ত্তৃনেনো গমিষ্যতি" (মভা. শাং. ৬৭. ২৩)—ভয় করিও না, যাহার পাপ তাহাকেই লাগিবে এবং তুমি কেবল রক্ষণ করিবার পুণ্যই লাভ করিবে; এবং "প্রজারক্ষণার্থ যে ব্যয় হইবে তাহা নির্ব্বাহ করিবার জন্য আমরা কর দিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল, তখন মনু প্রথম রাজা হইতে স্বীকার করিলেন। সার-কথা, অচেতন জগতের যেরূপ অপরিবর্ত্তনীয় এই নিয়ম আছে যে, 'যতটা আঘাত ততটাই প্রত্যাঘাত' সেইরূপই সচেতন জগতে ঐ নিয়মের রূপান্তর এই যে, 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল'। যাহাদের বুদ্ধি সাম্যাবস্থায় পৌঁছে নাই এইরূপ সাধারণ লোক, এই কর্ম্মবিপাকের নিয়মের মধ্যে নিজের মমত্ববুদ্ধি স্থাপন করে এবং ক্রোধে বা হিংসায় আঘাত অপেক্ষা অধিক প্রত্যাঘাত করিয়া আঘাতের সুদ লইয়া থাকে; কিংবা আপনার অপেক্ষা কেহ দুর্ব্বল হইলে তাহার সামান্য অথবা কাল্পনিক দোষের জন্য প্রতিকারবুদ্ধিতে তাহার দ্রব্য লুট করিয়া আপনার লাভ করিয়া লইতে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায় সুদগ্রহণবুদ্ধি, বৈরবুদ্ধি, অভিমানবুদ্ধি, ক্রোধ লোভ কিংবা দ্বেষবশতঃ দুর্ব্বলের দ্রব্য হরণ করিবার বুদ্ধি অথবা জেদবশতঃ নিজের পরাক্রমবুদ্ধি, বড়াই করিবার বুদ্ধি, শক্তিসামর্থ্য দেখাইবার বুদ্ধি যাঁহার মনে থাকে না সেই ব্যক্তির গায়ের উপর পড়া খেলিবার গোলা শুধু ফিরাইয়া দিবার বুদ্ধির ন্যায় শান্ত নির্বৈর ও সমবুদ্ধি বিচলিত হয় না; বরং দুষ্ট লোকের প্রাবল্য জগতে বৃদ্ধি পাইয়া গরীবলোকের যাহাতে কষ্ট না হয় সে জন্য এই প্রকার প্রত্যাঘাতরূপ কর্ম্ম করাই লোকসংগ্রহদৃষ্টিতে তাঁহার ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য (গী. ৩. ২৫)। এইরূপ প্রসঙ্গে সমবুদ্ধিতে কৃত ঘোর যুদ্ধও ধর্ম্ম্য ও শ্রেয়স্কর, ইহাই গীতার সমস্ত উপদেশের সার। সর্ব্বাংশে নির্বৈরভাবে ব্যবহার করিবে, দুষ্টের সহিত দুষ্ট ব্যবহার করিবে না, ক্রুদ্ধ লোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে না, ইত্যাদি ধর্ম্মতত্ত্ব স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্মযোগীর মান্য নহে এরূপ নহে; কিন্তু 'নির্ব্বৈর' শব্দের অর্থে নিষ্ক্রিয় কিংবা প্রতিকারশূন্য নিছক্ সন্ন্যাসমার্গের এই মত তাঁহার মান্য নহে; বৈর অর্থাৎ মনের দুষ্ট বুদ্ধি ত্যাগ করিবে ইহা নির্ব্বৈর পদের অর্থ বুঝিয়া কিংবা প্রতিকারার্থ যাহা আবশ্যক ও সম্ভব সেই কর্ম্ম, দুষ্ট বুদ্ধি মনে না রাখিয়া. কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া বৈরাগ্য ও নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে করিতে হইবে, এইরূপ কর্ম্মযোগের উক্তি (গী. ৩. ১৯)। তাই এই শ্লোকে (গী. ১১. ৫৫) শুধু 'নির্বৈর' পদ প্রয়োগ না করিয়া—

মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ॥

তৎপূর্ব্বেই 'মৎকর্ম্মকৃৎ' অর্থাৎ 'আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম যে করে' এই আর একটা গুরুতর রকমের বিশেষণ দিয়া ভগবান্ গীতায় নির্বৈরত্ব ও কর্ম্মের ভক্তিদৃষ্টিতে জোড়া-নৌকা ভাসাইয়াছেন। এই জন্যই এই শ্লোকই সমস্ত গীতাশাস্ত্রের সারভূত তাৎপর্য্য, ইহা শঙ্করভাষ্যে এবং অন্যান্য টীকাতেও কথিত হইয়াছে। বুদ্ধিকে নির্ব্বৈর করিবার জন্য কিংবা নির্ব্বৈর হইবার পরেও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিবে গীতায় এরূপ কোথাও বলা হয় নাই। এইপ্রকার প্রতিকারার্থ কর্ম্ম নির্বৈরত্ব সহকারে ও পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে করিলে কর্ত্তাকে তাহার কোন পাপ স্পর্শ করে না, বরঞ্চ প্রতিকারের কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর যে দুষ্টের দমন করা হইল, তাহারই আত্মৌপম্য-দৃষ্টিতে কল্যাণ চিন্তা করিবার বুদ্ধিও বিনষ্ট হয় না। উদাহরণ যথা, রাবণের দুষ্কর্ম্মের জন্য নির্বৈর ও নিষ্পাপ রামচন্দ্র যুদ্ধে তাহাকে বধ করিলে পর, উত্তরক্রিয়া করিবার সময় বিভীষণ যখন ইতস্তত করিতে লাগিলেন তখন রামচন্দ্র বিভীষণকে বুঝাইয়াছেন—

মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব॥

"বৈর (রাবণের মনের) মরণের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। আমার (দুষ্ট নাশ করিবার) কাজ শেষ হইয়াছে। এক্ষণে এ যেমন তোমার (ভাই) তেমনি আমারও। এই জন্য ইহার অগ্নিসংস্কার কর" (বাল্মীকিরা. ৬. ১০৯. ২৫)। রামায়ণের এই তত্ত্ব ভাগবতেও এক স্থানে (ভাগ. ৮. ১৯. ১৩) উক্ত হইয়াছে; এবং ভগবান্ যে দুষ্টের সংহার করিয়াছেন, পরে দয়ালু হইয়া তাহারই সদ্গতি করিয়াছেন এইরূপ অন্যান্য পুরাণেও যে কথা আছে, তাহার অন্তর্গত বীজও ইহাই। এইরূপ বিচার করিয়াই শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী বলিয়াছেন "উদ্ধতের সহিত উদ্ধত ব্যবহার করিবে"; এবং মহাভারতে ভীষ্ম পরশুরামকে বলিয়াছেন—

যো যথা বর্ত্ততে যস্মিন্ তস্মিন্নেবং প্রবর্ত্তয়ন্।
নাধর্ম্মং সমবাপ্নোতি ন চাশ্রেয়শ্চ বিন্দতি॥

"আমার সহিত যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত আমি সেইরূপ ব্যবহার করিলে অধর্ম্ম (অনীতি) ঘটে না এবং অকল্যাণও হয় না" (মভা, উদ্যো. ১৭৯. ৩০)। এবং পরে শান্তিপর্ব্বের সত্যানৃতাধ্যায়ে ঐ উপদেশই পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে দেওয়া হইয়াছে—

যস্মিন্ যথা বর্ত্ততে যো মনুষ্যঃ তস্মিংস্তথা বর্ত্তিতব্যং স ধর্ম্মঃ।
মায়াচারো মায়য়া বাধিতব্যঃ সাধ্বাচারঃ সাধুনা প্রত্যুপেয়ঃ॥

"আমার সহিত যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই ধর্ম্মনীতি; মায়াবী পুরুষের সহিত মায়াবীভাবে এবং সাধু পুরুষের সহিত সাধুভাবেই ব্যবহার করা উচিত (মভা. শাং. ১০৯. ২৯ এবং উদ্যো. ৩৬. ৭)। সেইরূপ আবার, ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে মায়াবী দোষ না দিয়া তাঁহার স্তুতিগানই করা হইয়াছে "ত্বং মায়াভিরনবদ্য মায়িনং ... বৃত্রং অর্দয়ঃ।" (ঋ. ১০. ১৪৭. ২; ১. ৮০. ৭)—হে নিষ্পাপ ইন্দ্র, মায়াবী যে বৃত্র তাহাকে তুমি মায়ার দ্বারা বধ করিয়াছ। ভারবি কবি স্বকীয় কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যেও ঋগ্বেদতত্ত্বেরই অনুবাদ এইরূপে করিয়াছেন—

ব্রজন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ পরাভবং।
ভবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ॥

"মায়াবীর সহিত যাহারা মায়াবী হয় না তাহারা বিনাশ পায়" (কিরা. ১. ৩০)। কিন্তু এই স্থানে আর একটি কথাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, দুষ্ট পুরুষের প্রতিকার সাধুতার দ্বারা সাধ্য হইলে প্রথমে তাহা সাধুতার দ্বারাই করিবে। কারণ, অন্য মনুষ্য দুষ্ট হইলে, সেই সঙ্গে আমারও দুষ্ট হওয়া উচিত নহে—এক জনের নাক কাটা গেলে, সমস্ত গ্রাম-কে-গ্রাম নিজের নাক কাটিয়া ফেলে না। অধিক কি, ইহা ধর্ম্মও নহে। "ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ" এই সূত্রের প্রকৃত ভাবার্থ ইহাই; এবং এই কারণেই, বিদুরনীতিতে প্রথমে "ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ" নিজের যাহা প্রতিকূল বলিয়া মনে কর, সেরূপ ব্যবহার অন্যের সহিত করিবে না—এই নীতিতত্ত্ব ধৃতরাষ্ট্রকে বলিবার পরই বিদুর বলিতেছেন—

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্॥

"(অন্যের) ক্রোধ (নিজের) শান্তির দ্বারা জয় করিবে, কদাচারীকে দানের দ্বারা জয় করিবে এবং সত্যের দ্বারা অনৃতকে জয় করিবে" (মভা. উদ্যো. ৩৮. ৭৩, ৭৪)। পালীভাষার বৌদ্ধধর্মীয় ধম্মপদ নামক নীতিগ্রন্থে এই শ্লোকেরই অবিকল অনুবাদ করা হইয়াছে—

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেনালীকবাদিনং॥

(ধম্মপদ. ২৩৩ দেখ)। শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিবার সময় ভীষ্মও—

কর্ম্ম চৈতদসাধূনাং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
ধর্ম্মেন নিধনং শ্রেয়ো ন জয়ঃ পাপকর্ম্মণা॥

"দুষ্টের অসাধুতা অর্থাৎ দুষ্ট কর্ম্ম সাধুতা দ্বারা নিবারণ করিবে; কারণ পাপকর্ম্মের দ্বারা লব্ধ জয় অপেক্ষা ধর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ নীতির দ্বারা মৃত্যুও শ্রেয়স্কর" (শাং. ৯৫. ১৬) এইরূপ এই নীতিতত্ত্বের মাহাত্ম্য গাহিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সাধুতা দ্বারা দুষ্ট কার্য্য নিবারণ না হইলে কিংবা সামোপচার ও শিষ্টতার কথা দুষ্টদের পছন্দ না হইলে, "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" এই নীতি অনুসারে, পুল্টিসের দ্বারা যে কাঁটা বাহির হয় না তাহা সাধাসিধা লোহার কাঁটা অর্থাৎ ছুঁচের দ্বারা বাহির করিতে হয় (দাস, ১৯. ৯. ১২-৩১)। কারণ, যখনই হউক না কেন, লোকসংগ্রহার্থ দুষ্টের নিগ্রহ করা, ভগবানের ন্যায় ধর্ম্মদৃষ্টিতে সাধুপুরুষদিগেরও প্রথম কর্ত্তব্য। "সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে" এই বাক্যেতে অসাধুতার জয় কিংবা নিবারণ করাই সাধুপুরুষদিগের মুখ্য কর্ত্তব্য এই কথা প্রথমে ধরিয়া লইয়াই পরে তৎসিদ্ধ্যর্থ প্রথমে কি উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সাধুতা দ্বারা নিবারণ অসাধ্য হইলে, 'যাহার যেমন তাহার তেমন' হইয়া দুষ্টের দমন করিতে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ কখনও বাধা দেন না, সাধুপুরুষেরা ইচ্ছা করিয়া দুষ্টতার নিকট আপনাদিগকে বলি দিবে, তাঁহারা ইহাও কোথাও প্রতিপাদন করেন নাই। আপনার দুষ্ট কার্য্যের দ্বারা যে ব্যক্তি অন্যের গলা কাটিতে প্রবৃত্ত

হইয়াছে, অন্য লোক সাধুভাবে তাহার সহিত ব্যবহার করিবে, এইরূপ বলিবার কোন নৈতিক অধিকার নাই, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। অধিক-কি, সাধু পুরুষেরা এইরূপ কোন আসাধু কর্ম্ম করিতে যখন বাধ্য হন, তখন সেই কর্ম্মের দায়িত্ব শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট সাধুপুরুষের উপর না দিয়া সেই কর্ম্ম দুষ্ট পুরুষের দুষ্কর্ম্মেরই পরিণাম হওয়ায়, তাহার জন্য দুষ্ট পুরুষকেই দায়ী করিতে হয়, এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (মনু. ৮·১৯ ও ৩৫১)। স্বয়ং বুদ্ধ দেবদত্তকে যে শাসন করিয়াছিলেন তাহার উপপত্তি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থকারেরাও এই তত্ব ধরিয়াই প্রয়োগ করিয়াছেন (মিলিন্দ প্র. ৪, ১. ৩০-৩৪ দেখ) জড়জগতের ব্যবহারে এই ঘাতপ্রতিঘাতরূপ ক্রিয়া নিত্য ও একেবারে কড়ায়গণ্ডায় ঠিক্ হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের ব্যবহার তাহার ইচ্ছাধীন; এবং উপরে যে "ত্রৈলোক্যচিন্তামণির" মাত্রার উল্লেখ করিয়াছি, দুষ্টের উপর তাহার ব্যবহার বিষয়ে নিশ্চিত বিচার যে ধর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা হয়, সেই ধর্ম্মজ্ঞানও অত্যন্ত সূক্ষ্ম; তাই আমরা যাহা করিতে ইচ্ছা করি তাহা যোগ্য কি অযোগ্য, ধর্ম্ম্য কি অধর্ম্ম্য, এই সম্বন্ধে বড় বড় লোকদিগেরও প্রসঙ্গবিশেষে ধোঁকা লাগে—কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ (গী. ৪, ১৬)। এইরূপ প্রসঙ্গে, শুধু বিদ্বানদিগের কিম্বা নিয়ত স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা ন্যূনাধিক অভিভূত ব্যক্তিদিগের পাণ্ডিত্যের উপর, কিংবা কেবলমাত্র আপনার সারাসার বিচারের উপরেই নির্ভর না করিয়া, পূর্ণ সাম্যাবস্থায় উপনীত শ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষের শুদ্ধ বুদ্ধিরই আশ্রয় লইয়া সেই গুরুর সিদ্ধান্তকে প্রমাণ বলিয়া মানিবে। কারণ শুধু তর্কমূলক পাণ্ডিত্য যত অধিক হইবে, সেই পরিমাণে যুক্তিও অধিকাধিক বাহির হইবে; তাই শুদ্ধ বুদ্ধি ব্যতীত শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা এইরূপ বিকট প্রশ্নের কখনই প্রকৃত ও সন্তোষজনক মীমাংসা হয় না; সে মীমাংসা শুদ্ধ ও নিষ্কাম বুদ্ধির গুরুকেই করিতে হইবে। যে শাস্ত্রকার অত্যন্ত সর্ব্বমান্য হইয়াছেন তাঁহারই বুদ্ধি এইপ্রকার শুদ্ধ হয়, এবং সেইজন্য "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ" (গী. ১৬, ২৪) এইরূপ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। তথাপি কালমানানুসারে শ্বেতকেতুর ন্যায় পরবর্ত্তী সাধুপুরুষেরা এই শাস্ত্রেতেও পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার পাইয়া থাকেন, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

গোপন পূজা।

ভীমপলশ্রী—একতালা।

পরাণ আমার চাহে গো তোমায়
দেবতা প্রাণের হে।
আকুল বিরহে দহিয়া হৃদয়ে
ডাকি প্রিয়তম হে॥
মোর আঁখিজলে পাষাণ যে গলে
তুমি যে টল না হে।
ভিজাই কেমনে তোমারি মরমে
জানি না জানি না হে॥

নাহি যদি লবে প্রাণে টানি' তবে
তব পদতলে হে।
পড়িয়া রহিব ভুলি' দুখ সব
মুছি' আঁখিজলে হে॥
তোমারি মূরতি হিয়ার পরতে
পরতে আঁকিব হে।
ভকতি-কুসুম করিয়া চয়ন
গোপনে পূজিব হে॥

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২´ ৩ ০ ১
II { জ্ঞা জ্ঞমা -পণা। পা পা -া। মপা মা জ্ঞা। রা সা -রণ্া I
প রা০ ০ণ আ মা র্ চা হে গো তো মা ০য়্

২´ ৩ ০ ১ [-া]
I ণ্া সা মা। মা জ্ঞমা -জ্ঞমপা। মা পা -া। -মমা -া -জ্ঞা } I
দে ব তা প্রা ণে০ ০০০ র হে ০ ০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা। মপা মজ্ঞা মা। পা র্সা র্সা। র্সনা র্রা র্সা I
আ কু ল বি র০ হে দ হি য়া হৃ০ দ য়ে

২´ ৩ ০ ১
I র্সা ণা ণা। ধণা পা মা। জ্ঞমা -পনা -র্সর্রা। -র্সণা -ধপা -মা II
ডা কি প্রি য়০ ত ম হে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

২´ ৩ ০ ১
II { পা -া ᵐপা। মা জ্ঞা মা। পা না না। নর্সা র্সা র্সা I
মো স্ আঁ খি জ লে পা ষা ণ যে ০ গ লে

২´ ৩ ০ ১
I পা না র্সা। র্জ্ঞা র্রা র্সা। নর্সা -র্রসা -র্সা। -ণা -ধণা -পা } I
তু মি যে ট ল না হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা -ণণা। পা পা পা। র্সা র্সা ণা। ধণা পা মা I
তি আ ০ই কে ম নে তো মা রি ম ০ র মে

২´ ৩ ০ ৩
I ণ্া সা মা। মপা ᵐপা মজ্ঞা। জ্ঞমা -পনা -র্সর্রা। -র্সণা -ধপা -মা II
জা নি না জা০ নি না০ হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
II { মা মা মা। জ্ঞা রা সা। সা সা ররা। ণ্া সা সা I
না হি ব দি ল বে প্রা ণে টা০ নি ত বে

২´ ৩ ০ ১
I ণ্া সা ᵐজ্ঞা। মা পা মা। পা -া -মপা। -জ্ঞমা -া জ্ঞা I
ত ব প দ ত লে হে ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা মা মা। জ্ঞা পা পা। মা ণা ণা। পা র্সা র্সা I
প ড়ি য়া র হি ব ভু লি হু খ স ব

২´ ৩ ০ ১
I ণা ণা পমা। পা মজ্ঞা পমা। পা -া মপা। -জ্ঞা -রা -সা } I
মু ছি আঁ০ খি জ০ লে০ হে ০ ০০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I { পা পা পা। ᵐপা মজ্ঞা মা। পা না -া। র্সা র্সা র্সা I
তো মা রি মু র০ তি হি য়া য় শ য় তে

২´ ৩ ০ ১
I ণা র্সা র্মা। র্জ্ঞা র্রা র্সা। ণর্সা -র্রর্রা -র্সর্সা। -ণধা -পণা -পা } I
শ য় তে আঁ কি ব হে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা ণণা পা। ᵐপা মজ্ঞা মা। পা র্সা র্সা। র্সনা র্রা র্সা I
ভ ক০ তি কু সু০ ম ক রি য়া চ০ র ণ

২´ ৩ ০ ১
I পা র্সা ণা। ধণা পা মা। জ্ঞমা -পনা -র্সর্রা। -র্সণা -ধপা -মা II II
গো প নে পূ০ জি ব হে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

—•—

রত্নগিরি—ভবানী মন্দির।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কঙ্কনের বর্ত্তমান অধিবাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণগণও চিত্‌পাবনদিগের ন্যায় বলেন যে, তাঁহারা পরশুরাম কর্ত্তৃক তথায় নীত হইয়াছেন। তন্মধ্যে সারস্বত সম্প্রদায় বিশেষ উন্নত। ইঁহারা মাছমাংস খান; এ জন্য চিত্‌পাবনদিগের সহিত ইঁহাদের বড় মিল নাই, বরঞ্চ পরস্পর বিদ্বেষই আছে। চিত্‌পাবনেরা সারস্বতদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করেন না। যাহা হউক শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কার্য্যপটুতায় সারস্বতগণ চিত্‌পাবনদিগের অপেক্ষা বড় ন্যূন নহেন। ইঁহাদের মধ্যেও অনেক কৃতবিদ্য এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা আছেন। সারস্বতেরা আপনাদিগকে গৌড়সারস্বত বলেন এবং প্রবাদ এই যে তাঁহারা গৌড় বা বঙ্গদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে পরশুরাম কর্ত্তৃক নীত হইয়াছেন। এই প্রবাদের মূল কি বুঝা যায় না। সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের আসল স্থান পঞ্জাব; বঙ্গদেশে সারস্বত ব্রাহ্মণ আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

মোটের উপর কঙ্কন প্রদেশের লোকগুলি অধিকাংশই সৎপ্রকৃতি, বুদ্ধিমান, উদ্যোগী ও পরিশ্রমী। তাঁহাদের আচারব্যবহার অতি সুন্দর। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্থানের লোকের ন্যায় ইঁহাদের চাল-চলনও আড়ম্বর-শূন্য ও বিলাসিতা-বর্জ্জিত। নিম্নে গেজেটিয়ার হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইল তৎপাঠে বুঝিতে পারিবেন যে এ দেশের লোকগুলি কিরূপ।

"Remarkable for the number of its people, their freedom from crime and their readiness to leave homes for military or other services."

কঙ্কনপ্রদেশ রত্নগিরি, কারওয়ারও আলিবাগ এই তিনটি জেলায় বিভক্ত। তন্মধ্যে রত্নগিরিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপর দুইটী জেলা তাদৃশ উন্নত নহে। রত্নগিরির বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ। কঙ্কনপ্রদেশ সমতলক্ষেত্র নহে; ইহা একটী পার্ব্বত্যভূমি, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভূমি প্রস্তরময়; মোটেই উর্ব্বরা নহে। শস্যাদি অতি সামান্যই উৎপন্ন হয়, কিন্তু কঙ্কনবাসীগণ পরিশ্রমী ও উদ্যোগী। তাহাদের জীবিকার জন্য তাহারা কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর না করিয়া নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। রত্নগিরির লোকেরা অনেকেই বোম্বাই সহরে গিয়া নানা প্রকার কাজ কর্ম্ম করে; বলিতে গেলে বোম্বাই সহরের অধিকাংশ কার্য্যই রত্নগিরির লোকের দ্বারা হইয়া থাকে।

"Connected with it by a short and easy land journey and by a safe and cheap seavoyage Ratnagiri is much more than the districts round Bombay the supplier of its labour market. It is estimated that in addition to many thousands partly settled in Bombay, over one thousand workers pass every fair season from Ratnagiri to Bombay, returning at the beginning of the rains to till their fields. To Ratnagiri's clever pushing upper classes, to its frugal teachable middle classes, and to its sober sturdy and orderly lower classes, Bombey owes many of its ablest officials and law yers, its earliest and cleverest factory workers and its most useful soldiers and constables and its cheapest and most trusty supply of unskilled labour." B. Gazeteer.

রত্নগিরি সহরটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এখানে আসিতে হইলে হয় বোম্বাই হইতে সমুদ্র দিয়া ষ্টীমারে করিয়া আসিতে হয়, অথবা কোলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৮২ মাইল মোটর, টঙ্গা কিংবা গরুর গাড়ী করিয়া আসিতে হয়। বর্ষাকালে ষ্টীমারে আসা সুবিধা নয়। সমুদ্রে ঝড়-তুফান প্রায়ই হয়; ষ্টীমারও সে সময় নিয়মমত চলে না। কোলাপুর হইতে রত্নগিরির রাস্তাটি অতি সুন্দর। উহার প্রাকৃতিক দৃশ্য এতই মনোহর যে ঐ রাস্তায় আসিবার সময় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়; পথশ্রমের ক্লেশ কিছুমাত্র অনুভব হয় না। রাস্তাটি সহ্যাদ্রি শৈল-মালার উপর দিয়া পশ্চিমাভিমুখে রত্নগিরি পর্য্যন্ত

আসিয়াছে। দুই ধারে শৈলমালা—শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ সুদূরে দিগ্বলয়ে বিলীন হইয়াছে। গিরিশৃঙ্গ কোনস্থলে মেঘমালার সহিত মিলিয়াছে, কোন স্থানে সুগভীর উপত্যকাগুলি নানাজাতীয় তরু গুল্মলতায় সুশোভিত হইয়া সুদূর নিম্নে শোভা পাইতেছে। পথের দুইধারে বনরাজি, তরুরাজি নানাজাতীয় বন্যফুল ও ফলে সুসজ্জিত হইয়া এই নিভৃত গিরিকন্দরে ভগবানের অতুলনীয় বিভূতি প্রকাশ করিতেছে। কোনস্থানে ভ্রমরবৃন্দের গুণ গুণ গুঞ্জন, কোনস্থানে বিহঙ্গকুলের কল-কল কূজন, কোনস্থানে নির্ঝরনিচয়ের ঝর-ঝর ঝঙ্কার, অদূরে কোকিলের কুহুধ্বনি, সুদূরে ময়ূরের কেকা রব, শ্রবণ ও মন যুগপৎ আকর্ষণ করিতে থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রকৃতির অনুরূপ রাস্তাটি নানা ভঙ্গিতে চলিয়াছে। কোনস্থানে সর্পগতি, কোন-স্থানে নিম্নগামী, কোনস্থানে উর্দ্ধগামী, আবার কোনস্থানে শ্যামল শস্য সুশোভিত সমতল ভূমির উপর দিয়া চলিয়াছে। আমরা বেলা একটার সময়ে একখানি মোটরে করিয়া কোলাপুর হইতে যাত্রা করি। তখন আরব সাগরের মনসুনের (monsoon) সময়। মনসুন বায়ু ঝুরু-ঝুরু করিয়া বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়া শন্-শন্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। রাশি রাশি মেঘস্তূপ সমুদ্র হইতে আসিয়া আকাশমণ্ডল ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন করি-তেছে, পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে শোভা পাইতেছে, মূহুর্মূহু বৃষ্টি পড়িতেছে,—কখন কখন তুষারকণার ন্যায় বিন্দু-বিন্দুভাবে পড়িতেছে, কখন কখন বা ধারাসম্পাত হইতেছে। গিরিগাত্রে অসংখ্য জল-প্রপাত। বৃষ্টির জলগুলি সেই প্রপাতসমূহ দিয়া বহিয়া নিম্নে পড়িতেছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। কৃষ্ণবর্ণ গিরিগাত্রে শুভ্র ও স্বচ্ছ জলপ্রবাহ যেন এক একটী রজতহারের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই মনোহর দৃশ্যের মধ্য দিয়া আমরা ক্রমাগত ছয় ঘন্টাকাল গমন করিয়া বেলা ছয় ঘটিকার সময়ে রত্নগিরিতে আসিয়া পৌঁছাই। দূর হইতে সমুদ্রের সুগম্ভীর কল্লোল ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতে-ছিল। রত্নগিরিতে আসিয়া দেখি আরব সমুদ্র মনসুন বায়ুর হিল্লোলে উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করি-তেছে, আনন্দে জয়ধ্বনি করিতেছে।

রত্নগিরি একটী ছোট সহর। সমুদ্র হইতে অনুমান দুইশত ফুট উচ্চ হইতে আরম্ভ হইয়া সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী ভূমিগুলি বেশ উর্ব্বরা। নারিকেল সুপারি প্রভৃতি বৃক্ষ ও ধান্যাদি শস্য ঐ সকল স্থানে বেশ জন্মায়। কঙ্কনে জলদস্যুদের উপদ্রব পূর্ব্বকালে খুব ছিল। দস্যুদের অত্যাচার নিবারণের জন্য তৎকালের শাসনকর্ত্তাগণ পর্ব্বতে পর্ব্বতে বহুসংখ্যক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল দুর্গ কতক মারহাট্টা শাসনের সময় নির্ম্মিত হয় আর কতক তাহারও পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়া পরে মারহাট্টা শাসনের অধীনে আসে। ঐরূপ দুর্গ রত্নগিরি জেলায় প্রায় ১৭।১৮টি আছে। তাহাদের কতক-গুলি সমুদ্রতীরে, আর কতকগুলি সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত। প্রত্যেকটি কোন না কোন একটী পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত। রত্নগিরি সহরের পশ্চিম-দিকে ঐরূপ একটী দুর্গ আছে। উহাকে রত্নগিরি দুর্গ বলা হয়। ঐ দুর্গটী বহু প্রাচীন; এখন কেবল উহার ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। পূর্ব্বে ঐ দুর্গ-প্রাচীরের ভিতরেই রত্নগিরি সহর ছিল। ব্রিটিশ শাসন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বর্ত্তমান রত্নগিরি সহর হইয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ এই যে ঐ দুর্গ বাহ-মনিবংশীয় রাজগণের সময় নির্ম্মিত হয়। বাহমনি বংশের রত্নগিরি অধিকারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। খৃঃ ১৫০০ হইতে ১৬৬০ পর্য্যন্ত রত্নগিরি বিজাপুরের রাজগণের অধীন ছিল। ঐ দুর্গ ঐ সময় মধ্যে বিজাপুর রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব নহে। খৃঃ ১৬৭০ অব্দে শিবাজী রত্নগিরি দুর্গ অধিকার করেন এবং উহার কতকটা উন্নতি সাধন করেন। খৃঃ ১৬৫৫ হইতে ১৮১৮ মধ্যে পেসোয়াগণ কর্ত্তৃক উহার বিশেষ উন্নতি সাধন করা হয়।

বর্ত্তমান রত্নগিরি সহরের মাঝামাঝি একখণ্ড উচ্চ-পার্ব্বত্য ভূমি ঘাট পর্ব্বতের অংশ। অশ্ব-ক্ষুরের আকার ধারণ করিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে বিস্তৃত হইয়াছে। ঐ ভূমিখণ্ডের পূর্ব্বে কিল্লা-বন্দর (Ratnagiri horbour); পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তর-পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তর পূর্ব্বে ঐ ভূমিখণ্ড রত্ন-গিরি সহরের সহিত মিলিত হইয়াছে। রত্নগিরি

দুর্গটি ঐ উন্নত ভূমিখণ্ডের উপর সংস্থাপিত। ভূমি-খণ্ডের পরিমাণ ন্যূনাধিক ১১০ একর হইবে—উহা সমস্তই দুর্গপ্রাচীরের অন্তর্গত। প্রাচীরের স্থানে স্থানে কামান বসাইবার স্থান আছে, এককালে ঐ সকল স্থানে কামান বসান থাকিত। প্রাচীরটি প্রস্তরময়। বর্ত্তমানে ঐ প্রাচীর ও কয়েকটী গুম্বজ ছাড়া দুর্গের আর অন্য কোন চিহ্ন নাই। দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সমুদ্রতীরে সম্প্রতি একটী আলোকগৃহ (light house) নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে প্রতিদিন আলো দেওয়া হয়। এই দুর্গের পশ্চিমে একটী উপত্যকা। ঐ উপত্যকা অতিক্রম করিলে অপর একটী উন্নতভূমি পাওয়া যায়, উহাও প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত। উহা পূর্ব্বোক্ত দুর্গের সংলগ্ন অপর একটী দুর্গ। উহাকে বালে-কিল্লা (বহির্দুর্গ) বলা হয়। এই বালেকিল্লার মধ্যে ভবানী মন্দির। প্রবাদ, শিবাজী এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের প্রস্তরময় প্রাচীর-গুলি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহার উপরের খোলার চাল নিতান্ত আধুনিক বলিয়া অনুমান হয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর খোলার চাল বসান হইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণদিকে একটী পুষ্করিণী আছে, উহা অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। বালেকিল্লার দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব্ব কোণে দুইটী গুহা আছে। উহা এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উহাতে প্রবেশ করা সহজ নহে। প্রবাদ আছে যে ঐ দুইটী গুহাপথ দিয়া বালেকিল্লা (বহির্দুর্গ) হইতে ভিতরের দুর্গে যাওয়া যায়। ভবানীমন্দিরের স্থানটী অতিশয় মনোহর। দেবীমন্দিরের ইহা উপযুক্ত স্থানই বটে। দেবীকে এ স্থানে যত্ন করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। দেবী এরূপ স্থানে সর্ব্বদাই বিরাজমানা থাকেন। ছত্রপতি শিবাজি যদি এই মন্দিরের প্রকৃত স্থাপনকর্ত্তা হন তবে বুঝিতে হইবে যে শিবাজি যে কেবল একজন অসাধারণ বীর ও অদ্ভুত রাজনৈতিক ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন পরম সাধকও ছিলেন। তাঁহার রাজধানী সাতারাৎ নগরী পরিত্যাগ করিয়া, সুদূরে পর্ব্বতমালা, গিরিনদী, গিরিসঙ্কট উল্লঙ্ঘন করিয়া এই নিভৃত সমুদ্রোপকণ্ঠে দেবীপ্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য কি ? নিভৃত ও মনোহর স্থানে জগজ্জননীকে সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি অতি অল্প ডাকেই শুনিতে পান; ঐ সকল স্থানে দণ্ডায়মান হইলে জগজ্জননীর প্রতি ভক্তিসিন্ধু আপনা হইতেই উথলিয়া উঠে, তাঁহাকে পাইবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে—তাই পরম ভক্ত, পরম সাধক শিবাজি, তাঁহার রাজ্যের এক প্রান্তে সমুদ্রোপকূলে এই মন্দির সংস্থাপন করিয়াছেন। সম্মুখে (পশ্চিম-দিকে অনন্ত সমুদ্র অনন্তের কোলে মিলিয়াছে; গভীর গর্জ্জন করিতেছে, উর্ম্মিমালার উপর উর্ম্মিমালা আসিয়া গিরিগাত্রে আঘাত করিতেছে, ফেনিল অম্বু-রাশি গিরিগাত্রে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া তুমুল শব্দে ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করিতেছে; উত্তরে ও দক্ষিণে সমুদ্র বক্রভাব ধারণ করিয়া পর্ব্বতপাদমূল বিধৌত করিতেছে, পূর্ব্বে অনন্ত পর্ব্বতমালা! প্রাবৃটকালের মেঘাশ্লিষ্ট শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ বিস্তার করিয়া সুদূরে চলিয়া গিয়াছে। যেদিকে চক্ষু ফিরান যায় সেই-দিকেই অপার সৌন্দর্য্য! পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য ও সমুদ্রের সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ। এই মনো-হর স্থানে ক্ষণকাল দাঁড়াইলেও মনে অনুপম আন-ন্দের হিল্লোল বহিতে থাকে, অনির্ব্বচনীয় শান্তি-সুধা বর্ষিত হয়। মন্দিরের ভিতরে দেবীর মূর্ত্তি। দেবী সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা। একহস্তে তলবার একহস্তে ঢাল। অপর দুই হস্তে বরাভয় প্রদান করিতেছেন। মূর্ত্তিটী প্রস্তরময়ী, মূল্যবান প্রস্তর নহে, সাধারণ প্রস্তর। দেবীর সেবার জন্য দেবোত্তর ভূমি আছে, ঐ ভূমির আয় দ্বারা সেবা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় এইস্থানে নব রাত্রির মেলা হয় ও বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই প্রদেশের মধ্যে এটী একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

রত্নগিরি সমুদ্রতীরে অবস্থিত এবং নিভৃত ও স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনেকে এখানে আসিতে ইচ্ছা করেন। রত্নগিরি যে জল বায়ু পরিবর্ত্তনের স্থান, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে পথ অতি দুর্গম, বঙ্গদেশের পক্ষে অনেক দূর দেশ; এবং সকল প্রকার রোগের পক্ষে যে ইহা উপযোগী এরূপ বলা যায় না। এবিষয়ে সাধারণের অবগতির জন্য বোম্বে গেজেটিয়ার

হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"The climate may be considered favorable for recovery from miesmatic fever even of long standing and perhaps for rheumatism when constitution is unimpaired, favorable for those whose lives suffer from the dry heat of the Deccan, unfavorable for constitutional debility, nervous affection, chronic dyspepsia and all complaints requiring a light and bracing atmosphere; fatal in the monsoon to those subject to bowel complaints. Children thrive well and appear for the most part plump and lively; yet new-comers from dry climate are apt to suffer from boils."

দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অবস্থা, দাক্ষিণাত্যবাসীদের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক লিখিবার আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বিস্তৃতভাবে লেখা অসম্ভব। দাক্ষিণাত্যবাসীদের নিকট আমাদের অনেক শিখিবার বিষয় আছে। সকল সমাজে দোষ ও গুণ উভয়েই থাকে। দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণভাগ গ্রহণ করা কোন দোষের কথা নহে। বঙ্গবাসীর অনেক গুণ আছে, তাহা দাক্ষিণাত্যবাসীগণ স্বীকার করে এবং তাহা তাহারা অনুকরণ করিতে সতৃষ্ণ। বঙ্গবাসীর অনেক দোষও আছে তাহা অবশ্য সকলেরই পরিত্যজ্য। দাক্ষিণাত্যবাসীগণ যেমন বঙ্গবাসীর গুণরাশি অনুকরণে সতৃষ্ণ, আমরাই বা কেন তাহাদের যথার্থ গুণগুলি অনুকরণ করিব না ?

বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া যে পর্য্যন্ত না দাক্ষিণাত্যে আসা যায়, সে পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মত লোক আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, জনসমাজ, জনসমাজের আচার, ব্যবহার চলন, চরিত্র প্রভৃতি সমস্তই বঙ্গবাসী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ঐ সকল দেশে বাস করিলে বিদেশে যে বাস করিতেছি, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিতান্ত হিন্দুস্থানী ব্যবহার অনুকরণ না করিলে ঐ সকল স্থানীয় লোকের সঙ্গে এক হইয়া মেলা-মেশা করা যায় না। দাক্ষিণাত্য সেরূপ নহে। দাক্ষিণাত্যে আসিলে বোধ হয় যেন আর একটী বাঙ্গালা দেশে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। যদিও দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা বঙ্গদেশের মত নহে; পর্ব্বতময় প্রদেশ—কতকটা আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রামের মত—কিন্তু ঐ সকল পার্ব্বত্য ভূমি বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবাদির মত শুষ্ক, বৃক্ষলতাদি শূন্য কেবল প্রস্তরময় নহে। বঙ্গদেশের মত সরস ও নানা জাতীয় তরুলতায় পরিপূর্ণ। লোকগুলির চেহারা, আচার, ব্যবহার, ধরণধারণ মানসিকভাব বুদ্ধির গতি সমস্তই বাঙ্গালীর মত, কেবল ভাষা পৃথক। কতকগুলি ব্যবহার পৃথক। ঐ ব্যবহারগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রাচীনকালে আমাদের মধ্যেও ছিল, কালক্রমে আমরা সেগুলি হারাইয়াছি—তাহাদের মধ্যে সেগুলি অদ্যাপি আছে। ঐ ব্যবহারগুলি অতি সৎ ব্যবহার—খাঁটি হিন্দু-ব্যবহার—নানাপ্রকার সামাজিক বিপ্লবে ঐ সকল প্রকৃত হিন্দুব্যবহার সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত হইয়াছে।

বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি দেশ যেমন উর্ব্বরা দাক্ষিণাত্য প্রদেশ তেমন উর্ব্বরা নহে। সকল প্রকার শস্য জন্মায় না। যাহাও জন্মায় তাহাও অপর্য্যাপ্তরূপে জন্মায় না, দেশে অর্থাগম তেমন নাই, লোকের অবস্থা স্বচ্ছল নহে। কিন্তু এই অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও আমাদের মত তাহাদের মধ্যে হাহাকার নাই। সকলে সুখে ও শান্তিতে আছে। ইহার কারণ এ দেশের লোকের অভাব বড় কম। অতি অল্প ব্যয়ে ইহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। বাঙ্গালীর মত ইহাদের মধ্যে আড়ম্বর নাই, বিলাসিতা নাই, লৌকিকতা ও সামাজিকতার ভীষণ বন্ধন নাই, কন্যার বিবাহের লোমহর্ষণ অত্যাচার নাই, বড়-মানুষি নাই, উচ্চতা-নীচতার তীব্রভেদ ও অহঙ্কার নাই। রাজা ও মহারাজা যাঁহারা আছেন, তদ্ভিন্ন ভদ্রবংশীয় আর সকলেই সমশ্রেণীর মধ্যবিত্ত লোক। মধ্যবিত্তদের মধ্যেও আমি বড় সে ছোট, যে প্রকৃতই অর্থে ছোট সে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া বড় হইবার চেষ্টা করিবে, এ সকল ভাব এদেশে নাই। এ সকল ভাব বঙ্গে ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে আছে ও দিন দিন বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে হাহাকারও বাড়িতেছে।

দাক্ষিণাত্যবাসীদের আহার, ব্যবহার, বসন ভূষণ প্রভৃতি সমস্তই সহজসাধ্য এবং সে সকলের প্রতি তাহাদের লক্ষ্যও বড় কম। যাহা আবশ্যক তাহারই জন্য তাহারা ব্যয় করিয়া থাকে; বিলাসিতার জন্য, বা মর্য্যাদা ও লোক দেখানোর জন্য কোন ব্যয়ই ছোট বড় কেহই করে না। এইটী আমাদের প্রাচীন হিন্দুভাব। আহার ব্যবহারে ও পোষাক পরিচ্ছদে বিলাসিতা হিন্দুসমাজনীতির বিরুদ্ধ। হিন্দু কবিগণ অনেকস্থলে 'আহার' কথাটির স্থলে 'শরীরস্থিতি' কথা ব্যবহার করিয়াছেন। "শরীরস্থিতিং চকার" এরূপ প্রয়োগ সংস্কৃত কাব্যাদিতে পাওয়া যায়। এই সামান্য বাক্যটী দ্বারা তাৎকালিক হিন্দুদের মনোগত ভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়। শরীরকে রক্ষা করা মাত্রই আহারের প্রয়োজন, আর কিছুরই জন্য নহে। সাত্ত্বিক আহার শরীর রক্ষার বিশেষ উপযোগী এজন্য সাত্ত্বিক আহারেরই ভূরি ভূরি প্রশংসা সংস্কৃত শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আহার সম্বন্ধে হিন্দুদের আড়ম্বরশূন্যতা সম্বন্ধে ইউরোপীয় লেখকগণও নীরব ছিলেন না। Megasthenesএর ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন। আধুনিক কোন কবির লিখিত নিম্নলিখিত কবিতাটী পড়িলে উক্ত বিষয়ে জানিতে পারিবেন।

"While all apart beneath the wood
A Hindu cooks his simpler food."

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ-পরিচয়।

"বন্ধু" ভাদ্র সংখ্যা—আমরা এই নব প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা পাইয়া সুখী হইলাম। ইহাতে কয়েকটি সুলিখিত ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ আছে। ঋগ্বেদে মণ্ডূকের স্তোত্রটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে দুইটি আলোচনা আছে। শ্রীযুক্তা কামিনী রায় লিখিত 'শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি বেশ সুখপাঠ্য হইতেছে। ভবানীপুর সম্মিলন সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপদেশ গুলি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে—সময়ান্তরে উদ্ধৃত করিবার বাসনা রহিল।

একনবতিতম সাম্বৎসরিক
ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

৯৩০ সংখ্যা ১৮৪২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উদ্বোধন।

হে প্রভু, হে প্রাণনাথ, রোগ শোক দুর্ভিক্ষ মৃত্যু সমস্তই অতিক্রম করিয়া আজ তোমার এই উৎসবক্ষেত্রের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। জানি না, এস্থান হইতেও শূন্যহস্তে শুষ্কমুখে ফিরিতে হইবে কি না। যখন রোগশোক দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতির মৃত্যুময় পেষণ যন্ত্রের নিষ্পেষণে অন্তরের মধ্যে এক মহা হাহাকার জাগিয়া উঠিয়াছিল, মরমের শুষ্ক মরুভূমি এক বিন্দু প্রেমবারির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তো সেই হাহাকারের শান্তিবিধানের জন্য, সেই ব্যাকুলতা দূর করিবার জন্য, হে জীবনপ্রভু, আমি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু কোথাও কোন সাড়া পাই নাই। দেখিয়াছিলাম, "ঘরে ঘরে আজ দুয়োর ভেজানো।" কোথায় যাই—কি করি, এই ভাবিতে ভাবিতেই কত-না দিন বৃথা কাটিয়া গেল; কত-না শুভ অবসর হারাইয়া বসিলাম। যখন নিরাশার অগ্নিতে প্রাণ দগ্ধ হইয়া যায়, তখন তোমার প্রেমের কণাগুলি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া আমার প্রাণ ভিজাইতে লাগিল। শুনিলাম যে তুমি নাকি উৎসবক্ষেত্রে তোমার স্নেহপ্রেম অযাচিতভাবে দান কর। তাই আজ এই উৎসবক্ষেত্রের দ্বারে আসিয়াছি।

হে প্রভু, হে জীবনবল্লভ, হে হৃদয়নাথ, আমাকে শুষ্কমুখে এখান হইতে ফিরাইয়া দিও না। আমি যে তোমাকে ভাল বাসিয়াছি—প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছি, তুমি আমাকে কেমন করিয়া ফিরাইবে বল? সকলেই আমাকে ছাড়িয়া দিবার ভয় দেখাইতেছে—দেখাক। আমি তো তোমাকে ছাড়ি নাই, আর তুমিও তো আমাকে ছাড় নাই। তবে আমার কিসের ভয়? বজ্ররবে যে মাভৈমাভৈ রব এই উৎসবক্ষেত্রে বাজিয়া উঠিয়াছে, প্রেমের আনন্দধারা যে রোগশোকের কঠোর বাধা ভেদ করিয়া আমাদের সকলকে ভাসাইয়া দিতেছে, তখন আজ কে আমাদিগকে শূন্যহস্তে ফিরাইয়া দিতে সাহস করিবে? রসের ধারায় হৃদয়কে পরিতৃপ্ত না করিয়া কে আজ পিতার গৃহ হইতে শুষ্কমুখে চলিয়া যাইবে?

রোগে শোকে তোমার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে—আত্মীয় স্বজনের বিরহ বিচ্ছেদ তোমার দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে—ভগবানের প্রেমধারা তোমার হৃদয়ে নামিবার এবং তোমার তাহা গ্রহণ করিবার ইহাই তো উপযুক্ত সময়। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পরেই বর্ষা আসে। ভগবানকে নিজের জীবন নিবেদন করিয়া দাও—দুঃখময় জীবন—তাহাই দাও—দেখিবে তাঁহার প্রেমবারি কিরকম তোমার অন্তরকে মধুময় করিয়া তোলে; দেখিবে তোমার প্রাণ কিপ্রকার হালকা হইয়া উঠে। নিজের বলিয়া কিছু রাখিও না, সমস্তই নিবেদন

করিয়া দাও—দাও—সমস্তই দাও—দেখিবে, সমস্ত বিশ্ব তোমারই আয়ত্ত ; তোমার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার সহিত মিলিত হইলে তাঁহার যাহা কিছু তাহা তো তোমারই হইল। তখন কোথায় বা রোগশোক, কোথায় বা মৃত্যু মোহ—কোন কিছুই তোমাকে ভয় দেখাইবার অবসর পাইবে না।

হে জীবনবল্লভ, তোমার চরণে আত্মনিবেদন করিবার ইচ্ছা ও শক্তি, এই উৎসবের ভিতর দিয়া আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রেরণ কর।

আত্মনিবেদন।*

ভগবদ্গীতা আমাদিগকি একটী মহাসত্য এই শিক্ষা দিয়াছেন যে আমাদের সমস্ত কর্ম্মেই, আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মেই ভগবানের চরণে আমাদের আত্মনিবেদন করিতে হইবে—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণং॥

গী. ৯. ২৭

যাহা করিতেছ, যাহা ভোগ করিতেছ, যে কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছ, যাহা দান করিতেছ, যে কোন ধর্ম্মাচরণ করিতেছ হে কৌন্তেয়, সে সমস্তই আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক করিতে থাক।

গীতার এই বাক্য সমর্থন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মও বলেন যে "যৎ যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তৎব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" যে কোন কর্ম্ম করিবে, তাহা পরমেশ্বরের চরণে নিবেদন করিয়া দিবে। আমরাও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বলে খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, জীবনের নিশ্বাস প্রশ্বাস হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কার্য্যই ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দাও—দেখিবে যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহসা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এবং সুখসূর্য্য তোমার সম্মুখে সমুজ্জ্বল আকারে প্রকাশিত হইয়া উঠিবে। সেই জীবনবল্লভের চরণে, সেই জীবনের প্রভুর চরণে আত্মনিবেদন করিলেই, রোগশোক তো দূরের কথা, মৃত্যুও আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারিবে না। তখন আমরা আপনাদিগকে মৃত্যুর অতীত অমৃতের পুত্র বলিয়াই অনুভব করিতে পারিব।

সেই জীবনবল্লভকে জীবনের প্রভু বলিয়া প্রাণসখা বলিয়া সত্যসত্যই আমাদের প্রাণের মধ্যে জানিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে। মনে করিও না যে সেই অচিন্ত্য পুরুষকে জানিবার অধিকার আমাদের নাই। উপনিষদের ঋষি হিমাচলের শিখরদেশ হইতে উদাত্তগম্ভীর স্বরে বলিতেছেন—"আমি এই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।" তিনি আমাদিগকেও জানাইয়া দিতেছেন যে সেই মহান্ পুরুষকে তাঁহারই ন্যায় আমাদেরও জানিবার অধিকার আছে। তাঁহার সেই সবল উক্তি আমাদেরও প্রাণকে বলপূর্ব্বক সেই অমৃতস্বরূপের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। আজিকার এই ভক্তসম্মিলন, আজিকার এই সঙ্গীত, এই উপাসনা, সমুদয়ই আমাদের প্রত্যেরই হৃদয়কে সজোরে সেই ভক্তবৎসল ভগবানের অভিমুখীন করিয়া দিতেছে। আমাদের প্রাণের ভিতর আজ একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ভগবানকে প্রাণের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছাটা আজ বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

আজ অনেক দিন ধরিয়া এই আশাভরসা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম যে, একদিন না একদিন সেই হৃদয়নাথের সাক্ষাৎ পাইবই। আজি এই শুভদিনে পুণ্যমুহূর্ত্তে সেই আশাভরসা মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। প্রস্তুত হও—সেই আশাভরসা নিশ্চয়ই সফল হইবে। সংসারের রোগশোক, সুখদুঃখ তো আছেই ; কিন্তু সেই সুখদুঃখের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া হৃদয়নাথকে ভুলিলে চলিবে না। রোগশোক সুখদুঃখ সমস্তই পশ্চাতে থাক্ ; তাঁহার প্রেমসাগরে আত্মবিসর্জ্জন দাও, তবেই তাঁহার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পাইবার আশা অচিরেই সফল হইবে। তাঁহার প্রেমে আপনাকে বিসর্জ্জন দিলেই আমাদের চক্ষের পরদা খুলিয়া যাইবে ; যে নিয়মের বলে এই ব্রহ্মচক্র সুনিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে, যে মহাপ্রেমের ভিত্তির উপর এই ব্রহ্মচক্র স্থিতি করিতেছে, তাহার ভিতরকার তত্ত্ব আমাদের অন্তরে অচিরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে ; সমগ্র ব্রহ্মচক্রের প্রাণের সঙ্গে আমরাও একপ্রাণ হইয়া যাইব ; ভগবানের সঙ্গে আমাদের এক মহাসামঞ্জস্য

---

* "মাঘোৎসব উপলক্ষে সায়ংকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভবনে বিবৃত"।

"বেহালা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বিবৃত"।

সাধিত হইবে। তখন আর এই ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ আমাদিগকে ঘড়ির দোলার মত একবার এদিকে আর একবার ওদিকে দোলাইতে পারিবে না।

আর বিলম্ব করিও না—তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া দাও। যতদিন না আত্মনিবেদন করিতে পারিব; যতদিন না তাঁহার চরণে অগ্নিতপ্ত মরুদগ্ধ হৃদয় লইয়া আছাড়িয়া পড়িতে পারিব; যতদিন না তাঁহাকে মঙ্গলময় পিতা বলিয়া প্রাণের ভিতর ধরিয়া রাখিব; যতদিন না নিজের অহঙ্কার অভিমান চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে এক করিয়া ফেলিব, ততদিন এই জগতের অনেক ঘটনার সার্থকতা আমরা বুঝিতেই পারিব না; ততদিন দুঃখকষ্টের জ্বালাময় দংশনে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিবে; ততদিন প্রতিপদে সংশয় দোলায় দুলিতেই থাকিব; ততদিন সত্যধর্ম্মকে ধরিতে না পারিয়া কথায় কথায় উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ছুটিব।

যে ভগবান সমস্ত সুখশান্তির মূল, তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিতে না পারিলে আমরা পরস্পরকেই কি হৃদয়ের সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রীতি দিয়া ভালবাসিতে পারি? কখনই নয়। তাঁহাকে হৃদয়ে না ধরিলে পার্থিব সুখলাভের ইচ্ছা আমার হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিবার পক্ষে কোনই বাধা থাকিবে না; কাজেই সেই ইচ্ছা সফল করিতে গিয়া অপর যে কেহ তাহার বিরুদ্ধে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহাকে পদদলিত করিবার চেষ্টা হইতে কেনই বা সহজে বিরত হইব? ষড়রিপু তো সমস্ত ক্ষণই আমাদিগকে তাহাদের বশে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। ভগবানকে ছাড়িয়া ষড়রিপুর সঙ্গে সম্প্রীতি করিবার যদি ইচ্ছা হয়, করিয়া দেখ; কিন্তু তাহার পরিণামে এতটুকুও লাভ হইবে না, কেবলই লোকসান ও বিরক্তিই সার হইবে। স্বার্থপরতা তো দিনরাতই আমাদের অন্তরে কার্য্য করিতেছে; ভগবানকে ছাড়িয়া স্বার্থপরতাকে ধরিয়া চলিলে পরিণামে কেবল নিজেরই যে ক্ষতি হয়, তাহা নহে—সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও সমূহ ক্ষতি হয়। ইহা বারম্বার প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজনই নাই, কারণ ইহা তো আমাদের প্রত্যেকেরই নিত্য অভিজ্ঞতার কথা। ভগবানকে ছাড়িয়া দিলে কে আমাদিগকে সত্যের পথ, ধর্ম্মের পথ, ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করিতে থাকিবে? তখন তো আমাদের পথপ্রদর্শক বলিয়া কেহই থাকিবে না। তখন হালভাঙ্গা নৌকার মত, মাঝিহীন তরীর মত কোথায় কখন্ ডুবিয়া যাইব, কোথায় কোন্ পাহাড়ে আছাড় খাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িব, তাহার কোন ঠিকানাই থাকিবে না। স্বার্থপরতাকে ধরিয়া থাকিলে, ষড়রিপুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, আমাদের পশুবৃত্তিই প্রবল হইবে; জ্ঞান, বিবেক বিশুদ্ধ প্রীতি প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং আমরাও বিনাশের ঘূর্ণামুখে দ্রুতবেগে আকৃষ্ট হইব। যে আত্মা ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিবে, আমাদের মনুষ্যত্ব আনিয়া দিবে, সেই আত্মাই যে তখন অসাড় হইয়া পড়িবে।

এই ষড়রিপুর সহিত সংগ্রামের জন্যই আমাদের জন্মগ্রহণ, আমাদের জীবন। কেবল ষড়রিপুকে বাধা দিবার জন্য নহে, অধর্ম্মকে পরাজয় করিবার জন্য নহে, কিন্তু চরম আদর্শকে প্রাণের ভিতর ধরিয়া রাখিবার জন্য সংগ্রাম করাও আমাদের জন্মগ্রহণের, মানবজীবনের অন্যতর প্রধান উদ্দেশ্য। এই সংগ্রাম হইতে কেহই সম্পূর্ণ নিস্তার পাইতে পারে না। পাপীতাপীকেও যেমন এই সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইতে হয়, আমরা যাঁহাদিগকে সাধু বলি, তাঁহাদিগকেও এই সংগ্রামের অগ্নিতে অল্পবিস্তর দগ্ধ হইতে হয়। এইপ্রকার সংগ্রামই হইল আমাদের জীবনের ধর্ম্ম; এইপ্রকার সংগ্রামেই আমাদের মনুষ্যত্ব। আজ যাহা আছি, তাহা হইতে ভাল হইবার চেষ্টা করিলেই এইপ্রকার সংগ্রাম অনিবার্য্য। ইহাই ভগবানের আদেশ এবং ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। ইহাই সমস্ত সংসারকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছে। ইহার হাত এড়াইবার চেষ্টা করিলেই বরঞ্চ বিপদের সম্ভাবনা। এই সংগ্রামের পথে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই সমানভাবে চলিয়া এই প্রার্থনা করিতে হইবে—"মা মা হিংসীঃ বিশ্বানি দেব সবিত দুরিতানি পরাসুব যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব"—আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না; হে দেব, হে পিতা পাপ সকল মার্জ্জনা কর; যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ

তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। এই সংগ্রামে জয়যুক্ত হইলেই, অধর্ম্মকে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেই, আমাদের জীবন আত্মমর্য্যাদাতে পূর্ণ হইবে এবং আনন্দের আধার হইয়া উঠিবে। তখনই আমাদের চিন্তা, কথা ও কাজে সুভাব সকল ফুটিয়া উঠিবে।

এই ধর্ম্মের মূল সন্ধান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদের বাক্যে বলেন যে ভগবানই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক "সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ"। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম ভগবৎপ্রীতিকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভগবৎপ্রীতি কেবল মুখের কথার বস্তু নহে, কিম্বা প্রতিজ্ঞাপত্রে মাত্র স্বাক্ষর করিবার বস্তু নহে, অথবা ভাল গান বা কথা শুনিলে প্রাণের ভিতর যে প্রকার উচ্ছ্বাস আসে, সে প্রকার উচ্ছ্বাসেরও ব্যাপার নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে, যে ঈশ্বরকে আমরা ভালবাসিতে বলি, আমাদের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রত্যেক চিন্তার মধ্যে তাঁহাকে স্থান দিতে হইবে, এবং আমাদের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রতি নির্ভর করিবার অভ্যাস করিতে হইবে। এক কথায়, আমাদের প্রত্যেক কার্য্য, আমাদের সমস্ত জীবনটা তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে। এই আত্মনিবেদনই হইল প্রকৃত ধর্ম্ম এবং ভগবৎপ্রীতিই হইল তাহার মূল।

এই মহাসত্য দেশদেশান্তরে প্রচার করাই হইল ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য। এই উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত, উপাসনা ও উপদেশ সমস্তই। প্রত্যেকের হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতি জাগাইয়া তোলাই ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। সমস্ত হৃদয় দিয়া যাহাতে আমরা প্রত্যেকে তাঁহার নাম প্রচার করি, সেই বিষয়ে সাহায্য করাই হইল ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। ভগবানকে প্রীতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে গেলেই তাঁহাকে জানা চাই। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে কেহই জানিতে পারে না, কিন্তু তিনি যে আমাদের হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধাভক্তির ন্যস্ত করিবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র, অন্তত এটুকুও আমাদের জানিতে হইবে। ইহা উপলব্ধি করাইবার চেষ্টাই ব্রাহ্মসমাজের জন্মগ্রহণের কারণ। একবার যদি আমরা এই সত্যটী উপলব্ধি করি, তখনই ব্রাহ্মসমাজের জন্মগ্রহণ সার্থক হইবে। তখন আর কেহই আমাদিগকে আমাদিগের হৃদয়নাথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। তখন আমরা স্বভাবতই আত্মার দৃঢ়তম নির্ভরভূমিতে পৌঁছিব এবং আমরা নিজেকেও যেমন অমৃতের পুত্র বলিয়া উপলব্ধি করিব, তেমনি অপর সকলকেও অমৃতের পুত্র বলিয়া জানিব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ভগবৎপ্রীতির ধর্ম্ম, ভগবানকে জানিয়া তাঁহাকে ভালবাসিবার আত্মনিবেদন করিবার ধর্ম্ম। ব্রহ্ম আছেন বলিয়া জানিলাম, ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বা উপাসনাপ্রণালী ভাল বলিলাম, অথবা অর্থসাহায্য করিলাম বলিয়া ব্রহ্মোপাসক হইলাম না। তাঁহাকে প্রাণের সঙ্গে ভাল না বাসিলে তাঁহার আদেশের সঙ্গে অন্য কাহারও আদেশের বিরোধ ঘটিলে তাঁহারই আদেশ নির্ভীকভাবে পালন করিতে অগ্রসর না হইলে ব্রহ্মোপাসক নাম সার্থক হইতে পারে না। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার আদেশ পালন করা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ—একটী অপরটীকে ছাড়িয়া থাকিতেই পারে না। এই মহাসত্যটী আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ফলকে অঙ্কিত রাখিতে হইবে। তাঁহাকে প্রীতি করিলে হৃদয়ের মধ্যে কি রসের ধারা উথলিয়া উঠে, তাহা বৈদিক ঋষি তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া সুন্দর ব্যক্ত করিয়াছেন।

গৃহে, পরিবারের মধ্যে, বাহিরে, বিদ্যালয়ে এই ভগবৎপ্রীতির ধর্ম্ম, এই আত্মনিবেদনের ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিলেই চলে। যাহাতে সন্তানেরা, ছাত্রেরা সংসারে মানসম্ভ্রম রাখিয়া, সামাজিক সভ্যতাভব্যতা বজায় রাখিয়া চলিতে পারে, পিতামাতা এবং শিক্ষকগণ সেই প্রকার শিক্ষা দিতেই ব্যস্ত থাকেন; এরূপ শিক্ষা দেওয়া অন্যায় বলি না। কিন্তু ভগবানকে সকল কার্য্যে আত্মনিবেদন শিক্ষা দেওয়া হয় কোথায়? সমস্ত ধর্ম্ম, সমস্ত সদ্‌গুণের মূল উৎস ভগবৎপ্রীতি শিক্ষা না দিলে আমরা দাঁড়াইব কোথায়? আমাদের তো দাঁড়াইবার স্থান নাই। তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদ্যন্ত শিক্ষাই এই যে, যাহা কিছু করিবে, তাহাই ভগবানে সমর্পণ করিবে। তাঁহার জ্বলন্ত মঙ্গলদৃষ্টি সমস্তই মঙ্গলময় করিয়া তুলিবে। ইহা জানিয়া আজ এই পবিত্র দিবসে সমস্ত বলের সহিত সকলকে ব্রহ্মনামের পতাকার নিম্নে সমবেত হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

স্বরলিপি।

বেহাগ—একতালা।

মন জাগো বিশ্বনাথে—
আজি এ মধুর উজল রাতে!
তাঁহারে বরি' হৃদয় মাঝে
অভয় হও সকল কাজে—
চল রে ভুবনে বীরের সাজে
দুঃখ-ঝঞ্ঝা-ঘাতে!

জীবনে তাঁহারে বাস রে ভাল
জ্বাল রে হৃদয়ে তাঁহারি আলো!
বিশ্বভুবনে তাঁহারে দেখি
ভকত চিত্তে শান্তি একি—
চরম দুঃখে—পরম সুখী
মিলি তাঁহার সাথে॥

কথা সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

২´ ৩ ০ ১
সা সা II { গা -া গা। মা -া পা। গা -া -রা। সা -া (সসা) } I -া I
ম ন জা ০ গো বি ০ শ্ব না ০ ০ থে ০ "মন" ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা হ্মা। পা না ধা। পা মা গা। রা -গমা গা II
আ জি এ ম ধু র উ জ ল রা ০০ তে

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১
II { পা পা পা। না -া না। র্সা র্সা র্সনা। র্রর্সা -া র্সা I
তাঁ হা রে ব ০ রি হৃ দ য়০ মা০ ০ ঝে

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা। র্রর্সা -া র্সা। না না পা। র্সা -া না } I
অ ভ য় হ০ ০ ও স ক ল কা ০ জে

২´ ৩ ০ ১
[সা সা পা]
I { পা পা হ্মা। পা না ধা। পা মা গা। রা -গমা গা } I
চ ল রে ভু ব নে বী রে র সা ০০ জে

২´ ৩ ০ ১
I গা -া গা। মা মা পা। গা -া -রা। সা -া সসা II
দুঃ ০ খ ঝ ন্ ঝা ঘা ০ ০ তে ০ "মন"

২´ ৩ ০ ১
II সা পা পা। হ্মা পনা না। ধা পা মগা। রা -মা গা I
জী ব নে তাঁ হা০ রে বা স রে০ ভা ০ ল

২´ ৩ ০ ১
I গা গা গা। মা মপা পা। গা গা গা। সা -া সা II
জ্বা ল রে হৃ দ য়ে তাঁ হা রি আ ০ লো

২´ ৩ ০ ১
II { পা -া পা। না না না। র্সা র্সা র্সা। র্রর্সা -া র্সা I
বি ০ শ্ব ভু ব নে তাঁ হা রে দে০ ০ খি

```
  ২´              ৩                 ০                  ১
I র্সা র্সা র্সা।      র্রসা -া র্সা।       না -া পা।           র্সা -া না } I
  ভ  ক  ত          চি ০  ০ ত্তে         শা  ন্ তি            এ  ০ কি

   ২´              ৩                 ০                  ১
  [সা সা পা]
I { পা পা ক্ষা।      পা  না  না।      ধা  পা  মগা।          রা -গমা গা } I
   চ  র  ম          দুঃ  ০  খে        প  র  ম০            সু   ০০  খী
  ২´           ৩            ০            ১
I গা গা গা।    মা -া পা।    গা -া রা।    সা -া সনা II II
  মি লি তাঁ     হা  ০  র      সা  ০  ০     থে  ০ "মন"
```

—•—

ব্রাহ্মসমাজের অভিব্যক্তি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে কেন্দ্রে রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া মৈত্রী সাধনের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করাই ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবের কারণ। কিন্তু স্থান ও কাল অনুকূল হওয়াতেই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম সম্ভব হইয়াছিল। স্থান ও কাল অনুকূল না হইলে কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ সহজ হয় না, বরঞ্চ অসম্ভব হইয়া পড়ে। জগতের প্রত্যেক নিমেষের প্রত্যেক ঘটনাই অনুকূল স্থান ও কাল লাভ করিয়াই অভিব্যক্ত হয়। যে ঘটনা যে পরিমাণে অনুকূল স্থান ও কাল লাভ করে, সেই ঘটনা সেই পরিমাণেই পরিস্ফুট হইতে সক্ষম হয়। ভগবানের মঙ্গলবিধানে তাঁহার স্বপ্রকাশ সত্যরূপ জগতে চিরপ্রকাশিত থাকিবেই; কিন্তু তাহা যে আকারে পরিস্ফুট হইবে, সেই আকারপ্রকার অনুকূল বা প্রতিকূল স্থান ও কালের উপরেই নির্ভর করে। স্থান ও কাল অনুকূল হইয়াছিল বলিয়াই ভগবানের মঙ্গলভাব ব্রাহ্মসমাজের আকারে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে ভারতের একাংশ এই বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। স্থান ও কাল অনুকূল হইয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ অল্পকালের ভিতর কেবল এদেশে নহে, সমগ্র জগতের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। স্থান ও কাল অনুকূল হইয়াছিল বলিয়াই বঙ্গের সুপ্রশস্ত জলাশয় উদ্ভিন্ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ-শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া স্বীয় সুগন্ধে দশদিক আকুল করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল এবং আজও তাহার সুবাসে দেশবিদেশের জনগণ আকৃষ্ট হইতেছে।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশ বলিতে গেলে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের ত্রিধারা-সঙ্গমে পরিণত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবে বিশেষ সহায় হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইবার ন্যূনাধিক তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপখণ্ডে ধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-লাভের একটা বিশেষ প্রয়াস হইয়াছিল দেখা যায়। কথিত আছে যে, যিশুখৃষ্টের দেহান্তর প্রাপ্তির পরে তাঁহার দুইটী শিষ্য রোমনগরে গিয়া তথায় একটী ধর্ম্মসমাজের ভিত্তি সংস্থাপিত করেন। তাঁহারাই প্রথম পোপ নামে যিশুখৃষ্টের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারীগণও জনসাধারণের নিকট সেই সম্মানই পাইতে লাগিলেন। পোপেরা কেবল ধর্ম্মসমাজের মধ্যে আপনাদিগকে আবদ্ধ না রাখিয়া ক্রমে ক্রমে বিস্তর বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইলেন এবং বাধ্য হইয়া ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বীয় প্রভাব বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য সময়ে সময়ে পোপেরা বিষপ্রয়োগ, অন্যায়-পূর্ব্বক ধর্ম্মসমাজ হইতে বহিষ্করণ প্রভৃতি অধর্ম্ম্য উপায় সকল অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

কিন্তু ধর্ম্মসমাজসমূহের উপর তাঁহাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকাতে জনসাধারণ তো দূরের কথা, ইউরোপের রাজন্যবর্গও তাঁহাদিগকে ভয় করিয়া চলিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু মানুষ স্বাধীন পরমাত্মার সন্তান—সে কখনও চিরকাল পরাধীনতার পাষাণভার বহন করিয়া সুস্থমনে বিচরণ করিতে পারে না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে দেখা যায় যে সমস্ত ইউরোপখণ্ডে পোপের অধীনতা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টার একটা বাতাস বহিয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের কয়েকটা রাজ্য পোপের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। এই সূত্রেই ইউরোপে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বীজ বিশেষভাবে উপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু পরিণামে সেখানে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্থানমাহাত্ম্যে রাজনৈতিক আকারেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

ঐ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের দেশেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বীজ বিশেষভাবে উপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা পুণ্যভূমি ভারতের স্থানমাহাত্ম্যে ভগবদ্ভক্তির আকারে পরিস্ফুট হইয়া ভারতের দুই কূল ভাসাইয়া দিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম অবনত হইয়া যখন "নেড়ানেড়ি" সম্প্রদায়ের জন্মদান করিয়া ভারতবাসীকে কি শারীরিক, কি মানসিক সকল প্রকারে নিবীর্য্য করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে যতটুকু বুঝা যায় তাহাতে অনুমান হয় যে, সেই সময়েই ভারতে তান্ত্রিক ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। এই তান্ত্রিক ধর্ম্মে "পঞ্চমকারকে" আয়ত্ত করিয়া জনসাধারণকে ধর্ম্মবিষয়ক সিদ্ধিপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বিভূতি বা শক্তিলাভের অধিকার দিবার প্রতিশ্রুতি দেখা যায়। "পঞ্চ মকারকে" আয়ত্ত করিবার চেষ্টার ফলে, অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টার ফলে নামেমাত্র তান্ত্রিকধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে খুবই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার সহিত প্রকৃত ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি অল্পই ছিল। ক্রমে তান্ত্রিকধর্ম্মের নামে মদ্যপান প্রভৃতি অনাচার দুরাচারসকল দেশকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল, এবং তন্ত্রপন্থীদিগের অনেকে মারণ বশীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধি বা শক্তিলাভের পরিচয় দিবার জন্য অধিকাংশস্থলেই বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি অন্যায় ও অধর্ম্ম্য উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিত। বলা বাহুল্য যে, এই সকল ক্রিয়াকর্ম্মের জন্য তান্ত্রিকগণ খুবই গোপনভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত। কালক্রমে তান্ত্রিকগণ এই সকল ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য এতই বিস্তৃতভাবে অবলম্বন করিয়াছিল যে তান্ত্রিক শব্দ দুরাচারীদিগের নামান্তরে পরিণত হইয়াছিল বলিলেও চলে। কেবল তাহাই নহে, তান্ত্রিকের নামে ভারতবাসীর প্রাণে এক মহা ভীতিকম্প উপস্থিত হইত; তান্ত্রিকদিগের গুপ্তভাবে ক্রিয়াকর্ম্ম এবং নরবলি, ব্যভিচার মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি কার্য্যসকল জনসাধারণের মনের উপর মহাভয়ের একটা আবরণ ফেলিয়া সমস্ত মানসিক বল হরণ করিয়া লইতেছিল। কিন্তু ভগবানের মঙ্গলবিধানে এতটা অধর্ম্মের নিকট পরাধীনতা-স্বীকার স্থায়ীরূপে দাঁড়াইতে পারে না। বঙ্গের এক কোণে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া ভারতবাসীকে তান্ত্রিকদিগের অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নির্ম্মল মুক্ত বায়ুসেবনে আহ্বান করিলেন। এই সময়ে সমস্ত ভারতের উপর দিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এক মহান্ বায়ুস্রোত চলিয়া গিয়াছিল। একদিকে চৈতন্যদেব, অপরদিকে কবীর, নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আনিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ভারতের উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে নানক প্রভৃতির প্রচারিত স্বাধীনতা পরিণামে স্থানমাহাত্ম্যে ও ঘটনাচক্রে রাজনৈতিক আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের এই পূর্ব্বপ্রান্তে চৈতন্যদেব ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে ভাগীরথী আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা পুণ্যভূমি ভারতের স্থানমাহাত্ম্যে ভক্তির আকার পরিগ্রহ করিয়া ভারতের অনেকস্থানই ভক্তিবন্যায় ভাসাইয়া দিয়া নূতন করিয়া ধর্ম্মভাবে শ্যামল করিয়া তুলিয়াছিল। সেই ধর্ম্মভাবের স্রোত শত শত বৎসর ধরিয়া জ্ঞানোজ্জ্বল খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের বহুস্থান, বিশেষত বঙ্গদেশকে সিক্ত রাখিয়াছিল।

যে বঙ্গদেশে ভক্তিস্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া

উঠিয়াছিল, সেই বঙ্গদেশেই কঠোর জ্ঞানেরও চর্চ্চা বড় অল্প ছিল না। কঠোর জ্ঞানেরও বহুল চর্চ্চা এদেশে ছিল বলিয়াই সেই জ্ঞানালোচনার নিয়ামক ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নৈয়ায়িকগণ এদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগেও এদেশে দর্শনশাস্ত্রের, এবং বিশেষভাবে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা যথেষ্ট ছিল। ন্যায়, বেদান্তপ্রমুখ দর্শনশাস্ত্রের সমধিক আলোচনার ফলে নানা কারণে সুস্পষ্ট প্রকাশভাব ধারণ না করিলেও, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বঙ্গবাসীর অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল। তাই যখন পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-স্পৃহা ক্রমওয়েল, হ্যামডেন প্রভৃতির ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইতে হইতে আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রামের ভিতর দিয়া এবং সর্ব্বশেষে ফরাসিবিপ্লবের ভিতর দিয়া বিরাট বিশাল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভারতের উপকূলে আসিয়া আঘাত করিল, তখন দেখা যায় যে বঙ্গবাসীই সেই স্বাধীনতাস্পৃহাকে আয়ত্ত করিয়া ভারতের উপযুক্ত আকার প্রদানে সক্ষম হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বঙ্গদেশেই ইংরাজদিগের এবং সেই সঙ্গে দেশবাসীগণেরও সুপ্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজগণ বঙ্গদেশে ব্যবসায় বাণিজ্য সংস্থাপন করিবার বহুপূর্ব্বে বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে কর্ম্মক্ষেত্র খুলিলেও ইতিহাসে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশেই তাহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে বিদেশীয়দিগের কর্ম্মবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্যই এদেশবাসীগণও আনুকূল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয় সূত্রেই আলস্য ও জড়তা পরিহার পূর্ব্বক নানাবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। যেখানেই ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কর্ম্ম, সেইখানেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রের অবিদিত নাই।

এই প্রকারে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের তিনটী ধারা হইতে বল লাভ করিতে করিতে, খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে বঙ্গদেশ যখন ঐ তিনটী ধারার সঙ্গমতীর্থে পরিণত হইয়াছিল, সেই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবসমূহের ঘাতপ্রতিঘাতে সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রবলবেগে ফাটিয়া ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ফাটিয়া ফুটিয়া বাহির হইবার অবসর পাইলে দ্বিতীয় ফরাসিবিপ্লবের আকারে কি যে বিষম সর্ব্বনাশ সাধন করিত, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু অবসর পাইবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই প্রাচ্যজগতের এক কোণে অবস্থিত এই বঙ্গদেশে ভগবানের করুণাধারা ব্রাহ্মসমাজের আকারে অভিব্যক্ত হইয়া পুণ্যভূমি ধর্ম্মের আকরভূমি এই ভারতবর্ষকে বিপ্লবের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করিল। যুগযুগান্তর হইতে কঠোর সামাজিক শাসনের অধীনতায় থাকিবার অভ্যাসের পর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া দেশবাসী যখন দিশাহারা হইয়া কেন্দ্রচ্যুত হইবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ ভারতের চিরন্তন কেন্দ্রস্থল পরব্রহ্মকে সম্মুখে ধারণ করিয়া তাঁহারই অজেয় পতাকার নিম্নে দেশবাসীগণকে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। সমগ্র দেশ তখন সেই পতাকার সম্মুখে মস্তক অবনত করিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভারতে যে সকল ধর্ম্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, বোধ হয় তাহাদের সকলগুলিরই নিজ নিজ সমাজের অঙ্গবিশেষেরই উন্নতি লক্ষ্য ছিল। ইহার কারণ এই যে, বাহিরের সহিত সংঘর্ষণের অভাবে সেই সকল সমাজের দৃষ্টি স্বভাবতই অন্তর্মুখীন হইয়া পড়িত। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় যে সময়ে, সে সময়ে কি শারীরিক, কি মানসিক এবং কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়ে এবং সকল ক্ষেত্রেই বাহিরের সহিত এক বিষম ঘাতপ্রতিঘাত চলিয়াছিল। কাজেই বাধ্য হইয়াই দেশবাসীর নিকটে পরব্রহ্মকে কেন্দ্রে রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকে লক্ষ্য রাখিবার কথা ব্রাহ্মসমাজকে ঘোষণা করিতে হইয়াছিল। সে সময়ে শাক্তবৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ববিবাদ চলিয়াছিল; জনসাধারণ সেই দ্বন্দ্ববিবাদ অতিক্রম করিয়া শান্তি অন্বেষণ করিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজ দ্বন্দ্ববিবাদের অতীত বিগতবিবাদ পর-

মেশ্বরকে সম্মুখে ধারণ করিয়া, কেবল এ দেশের কেন, সমগ্র জগতের অধিবাসীর সহিত মৈত্রীসাধনের প্রয়োজন ঘোষণা করিয়া গভীর শান্তির আনন্দধারা বহাইয়া দিলেন। বহুকাল পরে দেশবাসীগণ মুক্তির নবতর আশাবাণী শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইল।

নির্ভীক।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

এ নিষ্ঠুর সংসারের ক্ষণিক আশ্রয়
হারায়ে পেয়েছি আজ সত্য দয়াময়,
শাশ্বত-আশ্রয় তব ত্রিলোকশরণ
রাতুল চরণতলে! মুখাপেক্ষা আর
রাখিনা এখন কারো, বন্দীর মতন
রহি না সশঙ্ক হয়ে! তোমার উদার
উন্মুক্ত গগন-নিম্নে উচ্চ করি' শির
চলিয়াছি একা আজি আপনার মনে
স্বাধীন নির্ভীক চিত্তে, সঁপি' আঁখিনীর
আনন্দে অর্চ্চিতে তোমা! হৃদয়ে গোপনে
জাগ নাথ নিরন্তর, আজি নাহি ভয়,
আজি নাই দুঃখ কিছু! রাজরাজেশ্বর
আমার আশ্রয় তুমি! যদি মৃত্যু হয়
ঘুমাবে তোমারি অঙ্কে বিজয়ী অন্তর!

রত্নগিরি—ভবানী মন্দির।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মারহাট্টা ভাষায় 'আহার'কে জীবন বলে। যে অর্থে সংস্কৃত সাহিত্যে শরীরস্থিতি কথাটী ব্যবহৃত হইয়াছে, মারহাট্টা ভাষায় জীবন কথাটীও যে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার কোন সন্দেহ নাই। জীবনের জন্যই আহার, অতএব আহারই জীবন। প্রকৃত প্রস্তাবে মহারাষ্ট্রীয়দের খাদ্যাদি কেবল শরীররক্ষার উপযোগী করিয়াই প্রস্তুত হয়, উহাতে বিলাসিতার লেশমাত্রও নাই। পোলাও, কালিয়া ও নানা প্রকারের মিষ্টান্ন, নানা প্রকারের মসলা দেওয়া তরকারী এ সকল কিছুই তাহাদের আহারে থাকে না; কিন্তু দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, দধি, তক্র প্রভৃতি সাত্ত্বিক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে থাকে। নিম্ন শ্রেণীর লোক ব্যতীত মৎস্য মাংস বড় কেহ খায় না। নিরামিষভোজীর সংখ্যাই অধিক। নিরামিষাশীগণ ঘৃত দুগ্ধাদি যথেষ্ট পরিমাণে খাইয়া থাকে। আমাদের মত অল্প একটু ঘৃত লইয়া আহার আরম্ভ করে না; তাহারা ঘৃত দিয়া আরম্ভ করিয়া প্রায় শেষ পর্য্যন্ত ঘৃত ঢালায়। তরকারীর নানা রকমের আড়ম্বর নাই; নিরামিষ তরকারী দুই চারি রকমের থাকে। নিমন্ত্রণাদিতে এবং কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাহারও বাড়ীতে লোক সমাগম হইলেও যে আহারাদির বিশেষ কিছু বাড়াবাড়ি হয় তাহা নহে। নিমন্ত্রণাদিতে লুচি পায়স প্রভৃতি হয়, তরকারী কিছু কিছু বেশী হয় ও দুই চারি রকমের মিষ্টান্নও হয়। মোটের উপর মহারাষ্ট্রীয়দের নিয়ম এই যে নিজে যাহা খাই অতিথিকেও তাহাই খাওয়াইব—অতিথির জন্য যেন কোন উদ্বেগ অনুভব করিতে না হয়। এই নিয়ম থাকাতে অতিথিসেবা কার্য্যটী তাহাদের মধ্যে খুব সহজ হইয়াছে; সকলেই অনায়াসে অতিথিসেবা করিতে পারে এবং অনেকেই আহ্লাদের সহিত তাহা করিয়াও থাকে। মহারাষ্ট্রীয়গণ খুব আতিথেয়। নিমন্ত্রণাদি উৎসব উপলক্ষে তাহাদের ব্যয় অতি অল্প। আমাদের যেখানে ৫০০৲ শত টাকা খরচ হবে, হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, সেখানে তাহাদের দুই শত টাকাও খরচ হয় না।

পোষাক পরিচ্ছদাদিও তাহাদের অতি অল্পব্যয় সাধ্য। ছোট বড় সকলেই প্রায় এক রকমের বসন ব্যবহার করে। আমাদের মত অর্থশালিত্বের গৌরব করিয়া কেহ ঢাকাই, কেহ শান্তিপুরী বা ফরাসডাঙ্গানির্ম্মিত বসনাদি, আর কেহ বা অর্থহীনতাবশতঃ দেশী বা বিলাতি কলের কাপড় পরে না। দাক্ষিণাত্যবাসিগণ সকলেই মোটা কাপড় পরিয়া থাকে, মোটা-সূক্ষ্মের বিচার ছোট-বড় কেহই করে না। ঐ মোটা কাপড়গুলির মধ্যে কতকগুলি মিলের প্রস্তুত, আর কতগুলি দেশী তাঁতের প্রস্তুত। মেয়েরা প্রায়ই দেশী তাঁতের প্রস্তুত রঙ্গিন সাড়ী পরে। ঐ সাড়ী-

গুলির দৈর্ঘ্য পনেরো ষোল হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ সাড়ীগুলির মূল্য কিছু বেশী, কিন্তু অনেক দিন যায়—দুই তিন বৎসরের কম নয়। প্রত্যেকে এক জোড়া কি জোর দুই জোড়া সাড়ী ক্রয় করে; ধোপার বাড়ীতে প্রায়ই পাঠায় না—নিজেরাই কাচিয়া লয়। ধোপার বাড়ী যায় না বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে দাক্ষিণাত্য মহিলাগণ হিন্দুস্থানী মহিলাগণের ন্যায় অপরিষ্কার মলিন বসন পরিধান করিয়া থাকেন, তাহা নহে। ইঁহারা বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নিজেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। পরিশ্রম করিয়া বসনাদি নিজেরাই সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। পুরুষেরা অধিকাংশই মোটা মিলের কাপড় ব্যবহার করে, কেহ কেহ দেশী তাঁতের কাপড়ও ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদের ন্যায় পুরুষদেরও কাপড়ের সংখ্যা বেশী নহে।

দাক্ষিণাত্য রমণীগণ সোনা রূপার গহনা ব্যবহার করেন। সেগুলি অতি সুরুচিসম্পন্ন—হিন্দুস্থানীদের মত অতিরিক্ত মোটা নহে। সেগুলি অতি অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত। আমরা যেখানে তিন চারি শত টাকা ব্যয় করি, সেখানে তাঁহারা অনধিক একশত টাকা ব্যয় করেন। আমাদের গহনায় কত ভরি সোনা আছে, অগ্রে আমরা তাহাই বিচার করি। সোনা বেশী থাকিলেই গহনা ভাল হয় অনেকেরই এই ধারণা। তাঁহাদের মধ্যে ভরির বিচার নাই। গহনাটী দেখিতে ভাল হইয়াছে কি না ইহাই তাঁহারা দেখিয়া থাকেন। গহনার সংখ্যাও তাঁহাদের কম। আমাদের মত সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিবার নিয়ম নাই। কাণে, গলায়, হাতে এই তিন স্থানে সচরাচর গহনা পরিহিত হয়। এক স্থানে একই রকমের গহনা থাকে, দুই তিন রকমের থাকে না। উপর-হাতে (বাজুতে), নাকে, কোমরে, এসকল স্থানে তাঁহারা গহনা পরেন না। কেহ কেহ পায়ে রূপার শিকলি-মল ব্যবহার করেন।

সামাজিক অবস্থা—দাক্ষিণাত্যের সমাজ বেশ উন্নতিশীল। প্রাচীনকাল হইতে এদেশে সংস্কৃতের চর্চ্চা প্রচুর পরিমাণে চলিয়া আসিতেছে, ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেও সংস্কৃতচর্চ্চা লোপ হয় নাই। দাক্ষিণাত্যবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অধিকাংশই আজকাল ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন দেখা যায়। এদেশের লোকেরা অতিরিক্ত রক্ষণশীল (Conservative) নহে। কোন বিষয়ে সামাজিক সংস্কারের আবশ্যক হইলে তাহা করিতে বিশেষ আপত্তি উপস্থিত হয় না। বঙ্গদেশে যেমন সমাজে কোন একটা নূতন ব্যাপার প্রবর্ত্তিত করাইতে গেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র চাই এ দেশে তাহা চাই না। এ দেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া কোন একটা শক্তিশালী সম্প্রদায় নাই এবং সামাজিক সংস্কারের জন্য তাঁহাদের কোন অনুমতিরও অপেক্ষা নাই। সমাজের লোক যাহা ভাল ও মঙ্গলজনক মনে করে তাহাই সমাজে প্রবর্ত্তিত করে, ইহাতে কোন বাধা পড়ে না। পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় বালিকাদের ১০।১১ বৎসর বয়সে বিবাহ হইত। এখন ১৮।১৯ বৎসর বয়সের কমে আর কেহ কন্যার বিবাহ দেয় না। এই নিয়ম খুব নিষ্ঠাবান হিন্দুর মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বে কেহ বিলাতে গেলে তাহার জাতিচ্যুতি হইত এবং সমাজে তাহাকে গ্রহণ করা হইত না। এখন আর সে কথা নাই। এখন যে-ই বিলাতে যাউক না, আসিয়া সমাজ পায় ও সমাজেই থাকে। চিত্পাবন ব্রাহ্মণদের অনেকে বিলাতে যাইয়া কৃতবিদ্য হইয়া আসিয়া সমাজেই রহিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার, আদান-প্রদান করিতে কাহারই আপত্তি নাই। সমাজের সম্মতিক্রমে এই নিয়ম সমগ্র মহারাষ্ট্রসমাজে প্রচলিত ও আচরিত হইয়াছে।

নারীসমাজ।—মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণ প্রাচীনকাল হইতে বিশেষ উন্নত অবস্থায় আছেন। রমণীদের লেখাপড়া শিখিতে নাই এরূপ একটা সংস্কার বহুপূর্ব্বে যেমন বঙ্গদেশে ছিল এবং এখনও পশ্চিমাঞ্চলে আছে, দাক্ষিণাত্যে তাহা কদাচ ছিল না ও নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। প্রাচীনকালের অনেক মহারাষ্ট্রীয় রমণী সংস্কৃত ভাষায় বেশ বিদুষী ছিলেন। তৎকালে তাঁহারা সংস্কৃতভাষারই শিক্ষা লাভ করিতেন। সম্প্রতি ইংরাজী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অধিক পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হয়; কেহ

কেহ সংস্কৃতও শিখেন। ১৮।১৯ বৎসর বয়সে বিবাহ দেওয়ার নিয়ম থাকাতে বঙ্গদেশের মত শিক্ষার বাধা পড়ে না। বঙ্গদেশে ১৪।১৫ বৎসর বয়সে ছেলের মা হয়—শিক্ষা করিবে কখন্? দাক্ষিণাত্যে গ্রামে গ্রামে বালিকাদের শিক্ষার ভালরূপ ব্যবস্থা আছে এবং সকলে বেশ শিক্ষাও লাভ করিতেছে। ঐ বিদ্যালয়গুলির অবস্থা দেখিয়া মনে বড়ই সুখ হয়।

মহারাষ্ট্রীয়গণ বড় সঙ্গীতপ্রিয়। সঙ্গীতের চর্চ্চা এদেশে বহুল পরিমাণে হয়। প্রায় গ্রামে গ্রামে দুটী চারটী সঙ্গীতবেত্তা (ওস্তাদ) থাকেন। তাঁহারা গ্রামের লোককে শিক্ষা দেন। সঙ্গীত ইহারা নিয়মিত শিক্ষা করে—আমাদের মত দশটা পাঁচটা গান শিখিয়াই ইহাদের সঙ্গীতশিক্ষা শেষ হয় না। রীতিমত সা রে-গা-মা সাধিয়া শিক্ষা করে। রমণীরাও অনেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। অনেক মহারাষ্ট্রীয় রমণী সঙ্গীতবিদ্যায় বেশ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন দেখিয়াছি। সাধারণতঃ গাহিতে বাজাইতে অনেকেই জানেন। অনেকের বাড়ীতেই মেয়েদের ছেলেবেলা হইতে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়।

মেয়েমানুষ বলিলে আমাদের সাধারণতঃ যেমন একটা ধারণা আছে, মহারাষ্ট্রীয় রমণীদিগকে দেখিলে সে ধারণা আর থাকে না। আমাদের মেয়েরা নিতান্ত লজ্জাশীল—কেহ কেহ লজ্জার মাত্রা অধিক দেখাইতে গিয়া কৃত্রিমতা পর্য্যন্ত আশ্রয় করেন—স্বভাবতঃ দুর্ব্বল,ভীরু অনেকে; চঞ্চলপ্রকৃতি, অনেকে ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যবর্জ্জিত; অধিকাংশই পরমুখাপেক্ষ—পুরুষের আশ্রয় ও সাহায্য ভিন্ন যেন দাঁড়াইতেই পারেন না; নিজের যেন একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, চরিত্রের বল, আত্মনির্ভরত এ সকল কিছুই নাই। তাঁহারা যেন এক জনের সম্পত্তি—অপরের দ্বারা যত্নে লালিত ও রক্ষিত হইতেছেন; নিজের হস্তপদ যাহা কিছু যেন নিজের বশে নাই, কেহ চালাইলে চলিতে পারেন, নচেৎ পারেন না। ষ্টেশনের প্লাটফরমের উপর দিয়া হাঁটিয়া গাড়িতে উঠিতে হইবে; কেহ হাত ধরিয়া লইয়া না গেলে যাইতে পারিবেন না; কাহারও পানে তাকাইতে পারিবেন না, কাহাকেও কিছু বলিতে পারিবেন না, কেহ কিছু অত্যাচার করিলে তাহা সহ্য করা ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিবেন না। পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের যেন সর্ব্বদাই একটা বিরুদ্ধ সম্পর্ক। পুরুষকে দেখিলেই সতর্ক হইতে হইবে, মাথায় কাপড় টানিয়া দিতে হইবে কিংবা ঘোমটা দিতে হইবে, সঙ্কুচিত হইতে হইবে; পুরুষ যে পথে যায় সে পথ পরিত্যাগ করিতে হইবে, কিংবা ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যদিও আজকাল শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে এরূপ ভাব বড় দেখা যায় না, কিন্তু সাধারণত বঙ্গরমণীগণের এই ভাব। শিক্ষিতার সংখ্যা তুলনায় অতি অল্প; ইহার মধ্যে অনেক সময়ে সরলতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময় কৃত্রিমতার বাড়া-বাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক সময়ে অন্তঃকরণের বিকৃতভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। অপর পুরুষের সমক্ষে, এমন কি শ্বশুর ভাশুর দেবর প্রভৃতি নিতান্ত আপন জনের সমক্ষেও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারেন না বা কহেন না। কেন? স্বামী কি পরম আত্মীয় ব্যক্তি নহেন? সাধারণের পক্ষে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে বাধা কেন? তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে এত লজ্জা আবশ্যক কেন? ইহার ভিতরে কি একটা বিকৃত ভাব দেখা যায় না?

মহারাষ্ট্রদেশে গেলে এই সকল ব্যাপারের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে রমণীগণ এমনভাবে পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করেন যে তাঁহারা ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সকল সময়ে সকল অবস্থায় গৃহে বাহিরে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন—তাঁহারা সকল সময়ে প্রস্তুত। মুহুর্মুহু মাথায় কাপড় তুলিয়া দেওয়া বা ঘোমটা দেওয়া, মুহুর্মুহু গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া দেওয়া এ সকল কিছুই করিতে হয় না। তাঁহারা অতি স্বচ্ছন্দভাবে, সরলচিত্তে এবং অসঙ্কুচিতভাবে সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন। তাঁহাদের মুখের ভাব, চক্ষুর চাহনি, গমনের পারিপাট্য সমস্তই সরলতাব্যঞ্জক। তাঁহাদের পুরুষভীতি একেবারেই নাই, কৃত্রিমতা কিছুমাত্র নাই, বিকৃতভাবের সম্পূর্ণ অভাব। বদনমণ্ডল গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। মুখের হাসি সরলতামিশ্রিত; সে হাসিতে লজ্জা, কৃত্রিমতা প্রভৃতি কিছুই নাই। দেখিলে বোধ হয় এক একটী মাতৃমূর্ত্তি বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা পর্দ্দার

ভিতরে আবদ্ধ থাকেন না, স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র অবারিতভাবে গমনাগমন করেন, কিন্তু তাই বলিয়া স্বৈরচারিণী নহেন। শাস্ত্রে স্ত্রীজাতিকে যে প্রকার পরাধীন হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা আছে তাহা তাঁহারা কদাচ অতিক্রম করেন না। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" মনুর এই বাক্যের মর্ম্ম স্ত্রীজাতিকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখা নহে। দাক্ষিণাত্যে রমণীগণ অবারিতভাবে সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন এবং নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন অপর পুরুষের সঙ্গে কদাচ গমন করেন না। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে রমণীগণ কদাচ বাক্যালাপ করেন না। রমণীগণ দলবদ্ধ হইয়া রাস্তায় মাঠে বেড়াইয়া বেড়ান, সে দলে পুরুষের থাকিবার নিয়ম নাই। পুরুষের দল পৃথক। দাক্ষিণাত্যবাসীদের বাটীতে অন্তঃপুর বলিয়া একটা ভিন্ন প্রকোষ্ঠ থাকে না; আবশ্যকমত রমণীগণ বাটীর সর্ব্বত্রই অবাধে বেড়াইতে পারেন। কোন অপরিচিত পুরুষ বাটীতে আসিলে রমণীগণ তাঁহার সঙ্গে কথা কহেন না, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে যাইবার কোন বাধা নাই। কোন অপরিচিত অতিথি বাটীতে আসিলে রমণীগণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পরিচর্য্যাদি সমস্তই করিবেন, কেবল কথা কহিবেন না।

দাক্ষিণাত্যে রমণীগণ উপরোক্ত প্রকারে অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকেন না বলিয়া তাঁহারা অনেকেই সুস্থকায় ও সবলশরীর হইয়া থাকেন এবং বেশ পরিশ্রমী হন। তাঁহারা সংসারের অনেক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন; বলিতে গেলে, অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত সংসারের অধিকাংশ কার্য্যই তাঁহারা করেন, দাস দাসীর উপর নির্ভর তাঁহাদের খুব কম। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা বস্ত্র ও গৃহাদি পরিষ্কারও অপর জাতির জলে করেন না, সুতরাং জল সংগ্রহাদি কার্য্য ব্রাহ্মণমহিলাদের নিজের কর্ত্তব্য। আমি অনেক পল্লীগ্রামে দেখিয়াছি ব্রাহ্মণ-মহিলাগণ দূরস্থ ঝরণা বা নদী হইতে প্রত্যেকে ২।৩টী জলের কলসী বহিয়া লইয়া আসিতেছেন। এই কার্য্যে তাঁহারা অপমান মনে করেন না; এবং ইহা করিতেও তাঁহাদের অধিকাংশেই সক্ষম। নিতান্ত যাঁহারা অর্থশালী পদস্থ ব্যক্তি, তাঁহাদের জলসংগ্রহ পাচক ব্রাহ্মণের দ্বারা হইয়া থাকে। রমণীগণ এরূপ শ্রমশীল ও সক্ষম বলিয়া দাক্ষিণাত্যে পরিবারের ব্যয়বাহুল্য হইতে পারে না; সাংসারিক অভাব কম হয়। আমাদের মহিলাগণ প্রায়ই সুস্থকায় নহেন। পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করা দূরে থাকুক নিতান্ত করণীয় কার্য্যই আজকাল তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দিনে দিনে যে আরও কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে? কেবল অসুস্থতা নহে, গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকেন বলিয়া অনেক কার্য্য করিতে তাঁহাদের শক্তি থাকিলেও করিতে পারেন না। মনে করুন রাত্রে বাড়ীতে কাহারও অসুখ হইল। চাকর উপস্থিত নাই। প্রতিবেশীও কেহ নাই। বাড়ীতে মেয়েরা আছে, আর পুরুষের মধ্যে আমি একা আছি—ডাক্তার ডাকিতে যায় কে? আমি রোগীকেও ছাড়িতে পারি না, বাহিরেও যাইতে পারি না। মেয়েরা তো পিঞ্জরাবদ্ধ। এরূপ ব্যাপার অনেক সময়ে ঘটে। একটা টেলিগ্রাফ্ করিবার লোক থাকে না। সামান্য একটী জিনিষ সংগ্রহ করিবার লোক থাকে না। দুইরসি তফাতে একজন প্রতিবেশীকে খবর দিবার লোক থাকে না। বাড়ীতে কেহ অভ্যাগত আসিলে তাঁহার পরিচর্য্যা ভাল হয় না। এসকল অসুবিধা অনেকেরই ঘটিয়া থাকে এবং তজ্জন্য অনেক অনেক সময়ে ব্যয় করিয়া প্রহরী চাকরও রাখিতে বাধ্য হন। বঙ্গদেশ অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে পর্দার ব্যবস্থা আরও কড়াকড়। ঘরে জানালা থাকে না; ছোট ছোট গবাক্ষ। সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলাদের প্রায় ঘর হইতে বাহির হইবার নিয়ম নাই; চাকরের সঙ্গে কথা কহিবে না; প্রত্যেক মহিলার সঙ্গে একটী করিয়া দায়ী (ঝি) থাকে। দায়ীর মারফতে চাকরদের প্রতি আদেশাদি যায়। আমি যত দূর দেখিয়াছি তাহাতে আমার বোধ হয় পশ্চিমদেশীয় ভদ্র মহিলাগণ বঙ্গমহিলাগণ অপেক্ষাও রুগ্ন ও অসুস্থকায়। তাঁহারা সাংসারিক কার্য্য প্রায় কিছুই করেন না এবং করিতেও পারেন না।

নারীদের দাক্ষিণাত্যে তো এই প্রকার আচার ব্যবহার। পুরুষেরা নারীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে, আমি দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়াছি। কোন পুরুষ কোন নারীর প্রতি

কুদৃষ্টি কি কটাক্ষপাত করিয়াছে এরূপ একটা ব্যাপার কোন দিনও আমার চক্ষে পড়ে নাই। তাহা কদাচিতও ঘটে না। সেরূপ পুরুষও সে দেশে নাই, সেরূপ নারীও নাই। নারীগণ সে দেশে অতি সম্মানের পাত্র;—ক্রীড়ার পুত্তলী বা আমোদের জিনিষ নহে। তাঁহাদের চলন চরিত্র ও হাবভাবও এরূপ যে তাঁহাদিগকে দেখিয়া মাতৃভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাব উপস্থিত হয় না। মনের উপর সমস্ত নির্ভর করে। নরনারীর মন যদি বিশুদ্ধ থাকে তবে বাহিক ভাব-চলন-চরিত্রাদি বসন ভূষণ প্রভৃতি সমস্তই সেই বিশুদ্ধ ভাবকেই প্রকাশ করে। সেই বিশুদ্ধতার মধ্যে যাঁহারা বিচরণ করেন তাঁহাদের মনে কুভাব সহজে আসিতে পারে না। যে সমাজে সেই বিশুদ্ধতা নাই বা লোপ পাইয়া গিয়াছে, সে সমাজে চলন চরিত্র আচার ব্যবহার বসন ভূষণ প্রভৃতি সমস্তই দূষিত হইয়া উঠে। আমরা সেই বিশুদ্ধতা হারাইয়াছি, হারাইয়াছি বলিয়াই রমণীগণের উপযুক্ত সম্মান রক্ষার জন্য আমাদিগকে এতটা সতর্ক হইতে হইতেছে;—তাঁহাদিগকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখি, ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখি, নিতান্ত পরিচিত ও আত্মীয়ের সম্মুখেও যাইতে দিই না এবং কথা কহিতে দিইনা;—এই সকল সাবধানতা, পাছে তাঁহাদের সম্মানের হানি হয়। এই সাবধানতার বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া আমাদের মন এত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং সেই সঙ্কীর্ণতাতে মন এতই অভ্যস্ত হইয়াছে যে এখনও আমরা নরনারীর পরস্পর-সম্মিলন সুদৃষ্টিতে প্রায়ই দেখিতে পারি না। দেখিতে সকল সময় বস্তুতই পারা যায় কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। দাক্ষিণাত্যে সমাজের স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা লোপ পায় নাই। প্রাচীন ঋষিদের সময়ে সমাজের যেরূপ ভাব ছিল, দাক্ষিণাত্যে কতকটা আজও সেই ভাব রহিয়াছে সুতরাং নারীর সম্মান সে দেশে বিনা সতর্কতায় রক্ষা পাইয়া থাকে। তাঁহাদিগকে পর্দার আড়ালে রাখিতে হয় না। নারীদের ঐরূপ সচ্ছন্দ বিচরণ আমাদের দেশে প্রচলিত করিতে গেলে অগ্রে আমাদের সামাজিক বিশুদ্ধতা সম্পাদন করা আবশ্যক। ভূমি রীতিমত কর্ষণ না করিয়া বীজ বপন করিলে শস্য না জন্মাইয়া ঘাসই জন্মাইবে। দাক্ষিণাত্যে সমাজের যে বিশুদ্ধতা, তাহা প্রকৃত হিন্দু বিশুদ্ধতা। সেই বিশুদ্ধতার ভিত্তির উপর যাহাই নির্ম্মাণ করিবে তাহাই স্থির ও অটল থাকিবে। সেই বিশুদ্ধতা আমরা বহুকাল হইল নানা কারণে হারাইয়াছি। কিসে তাহা পুনরায় পাওয়া যায় তাহারই চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। তাহা পাইলে আর আমাদের কোন অভাবই থাকিবে না। দাক্ষিণাত্যের নারীসমাজের কথা আমি আমার পশ্চিমাঞ্চলের অনেক শিক্ষিত হিন্দুস্থানী বন্ধুর সহিত আলাপ করিয়াছি। তাঁহারা বলেন "ও সাচ্চা মুলুক"। "আমরা যখন ঐরূপ সাচ্চা ছিলাম তখন আমাদের মধ্যেও ঐরূপ ব্যবহার ছিল; সে ভাবও গিয়াছে সে ব্যবহারও গিয়াছে"। কথাটা বড়ই ঠিক। ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা আছে। তাহার ভিত্তি-স্বতন্ত্র। আমরা সে স্বাধীনতা চাই না। যতদিন রমণীকে মাতৃচক্ষে দেখিতে না শিখিব ততদিন তাঁহাদিগকে পর্দার আড়ালে রাখাই আমরা নিরাপদ মনে করি। আমরা আমাদের মনের পবিত্রতা হারাইয়াছি। আমরা পুরুষেরাই যে হারাইয়াছি তাহা নহে, মেয়েরাও হারাইয়াছেন। সুতরাং এই অপবিত্রতার মধ্যে পরস্পরের মেলামেশা তত সুবিধাজনক নহে। ফলেও তাহাই দেখা গিয়াছে। সেই হিন্দু ভাব, সেই হিন্দু শিক্ষা যতদিন না আমাদের ভিতরে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে তত দিন কোন উন্নতিই আশা করা যায় না। ঐ পবিত্রতা ফিরিয়া আসিলে এসব বাঁধন আপনা হইতে খসিয়া পড়িবে। ঐ শিক্ষা ঐ পবিত্রতা আমাদের মধ্যে কি প্রকারে ফিরিয়া আইসে তাহাই আমাদের সকলের চিন্তা করা আবশ্যক এবং সকলের সেই পথে চেষ্টা ও যত্ন করা নিতান্ত উচিত।

বসনাদি পরিধানের নিয়ম।—দাক্ষিণাত্যবাসী পুরুষগণ যে ভাবে বসনাদি পরিধান করেন তাহা অনেকেই জানেন ও দেখিয়াছেন। সে বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। ধুতি, কোট, ও মাথার টুপি বা পাগড়ি ইহাই পুরুষদের সাধারণ পোষাক। ধুতিগুলি ওসারে বড়—৪৮ ইঞ্চির কম নহে, ৫২।৫৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়।

রমণীদের বসনাদি পরিধেয়ের বিশেষত্ব আছে। বাঙ্গালীর মেয়েদের কাপড় পরিবার নিয়মটা অতি অসঙ্গত—উহা দূরীভূত হওয়া আবশ্যক। যদিও আজকাল সেমিজ প্রভৃতি ব্যবহার হইয়া কতকটা ভাল হইয়াছে, তথাপি এখনও যেরূপ হওয়া আবশ্যক সেরূপ হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের একশ্রেণীর মেয়েদের কাপড় পরার নিয়ম অনুকরণ করিয়া প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজে এবং আজকাল অনেকেই সেই ফ্যাসনে কাপড় পরিতেছেন। ঐ ফ্যাসনটি খাঁটি দাক্ষিণাত্য কোন সম্প্রদায়ের নহে। উহা পার্শিদিগের নিকট হইতে পরিবর্ত্তন সহকারে গৃহীত। ঐধরণে বস্ত্রাদি পরিয়া সাংসারিক কার্য্য করার সুবিধা হয় না। উহা সাজিয়া গুজিয়া বেড়াইতে যাইবার ফ্যাসন। * বস্তুতঃ তাহাই হইতেছে আজ কাল। অনেকেই কোথায় যাইতে হইলে ঐরূপ ফ্যাসনে কাপড় পরেন, আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সাবেক মত পরেন। এরূপ পোষাকী ফ্যাসনের দ্বারা কোন অভাব মোচন হয় না। যে ফ্যাসন ঘরে বাহিরে চলিতে পারে তাহাই প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

দাক্ষিণাত্যে রমণীদের পোষাক পরার দুই প্রকারের ফাসন প্রচলিত আছে। একটী মারহাট্টি ফ্যাসন, অপরটী গুজরাটী ফ্যাসন। মারহাট্টা রমণীগণ ষোল হাত কাপড় কাচা কোঁচা দিয়া এবং নানা ভাবে জড়াইয়া পরেন। উহাতে সভ্যতা যথেষ্ট, কার্য্যাদি করিবারও খুব সুবিধা। ঐ ভাবে কাপড় পরিয়া অশ্বারোহণ পর্য্যন্ত করিতে পারা যায় অনেকে তাহা করিয়াও থাকেন। মারহাট্টা রমণীগণ এককালে বীররমণী ছিলেন, কাজেই তাঁহাদের বসন ভূষণ বীরত্বেরই পরিচায়ক; এখনও তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গুজরাটী ফ্যাসন যাহা তাহাই পার্শি ফ্যাসন। পার্শিগণ গুজরাটি ফ্যাসনেরই অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহারা চোলি অর্থাৎ কাঁচুলি ও ঘাগরা পরিয়া তাহার উপরে ১০ হাতি পাতলা রঙ্গিন ও কাজকরা সাড়ী পরেন। মস্তক ঐ সাড়ীর আঁচল দ্বারা আচ্ছাদন করেন। ঘোমটা দেওয়ার নিয়ম নাই—মাথায় কাপড় দেওয়া মাত্র। গুজরাটীদের এই ফ্যাসন অনুকরণ করিয়া বঙ্গদেশে একটী নূতন ফ্যাসন সৃষ্টি হইয়াছে। উহা অতিশয় জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ; নিতান্তই পোষাকী—চলনসহি নহে। প্রকৃত গুজরাটী ফ্যাসন অতি সহজ ও চলনসহি। তাহা আমাদের অনুকরণীয়। মারহাট্টা রমণীগণ সধবা অবস্থায় মস্তকাচ্ছাদন করেন না। অনেকে মস্তকে বনফুল পরেন।

* লেখকের এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিলে একথা বলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তঃ সং।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

দ্বাদশ প্রকরণ।

সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নির্ব্বৈর ও শান্ত সাধু পুরুষদিগের আচরণসম্বন্ধে লোকদিগের এক্ষণে যে ভুল ধারণা দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, কর্ম্মযোগমার্গ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এবং সমস্ত সংসারই ত্যাজ্য এই মতাবলম্বী সন্ন্যাসমার্গের এক্ষণে চতুর্দ্দিকে বিস্তার-বৃদ্ধি হইয়াছে। নির্ব্বৈর হইলে পর নিষ্প্রতিকারও হওয়া চাই, গীতার ইহা উপদেশ কিংবা উদ্দেশ্যও নহে। লোকসংগ্রহের প্রতি যে ব্যক্তি ভ্রুক্ষেপ করে না, তাহার পক্ষে জগতে দুষ্টের প্রাবল্য হইল কি হইল না, অথবা নিজের প্রাণ থাকিল বা গেল উভয়ই সমান। কিন্তু পূর্ণাবস্থায় উপনীত কর্ম্মযোগী সর্ব্বভূতাত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া সমস্ত ভূতের সহিত নির্ব্বৈরভাবে ব্যবহার করিলেও অনাসক্ত বুদ্ধিতে পাত্রাপাত্রের সারাসার বিচার করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম করিতে কখনো ভুলেন না; এবং এইরূপে কৃত কর্ম্মপ্রযুক্ত কর্ত্তার সাম্য-বুদ্ধিরও লাঘব হয় না, এইরূপ কর্ম্মযোগের উক্তি। গীতাধর্ম্মের অন্তর্ভূত কর্ম্মযোগের এই তত্ত্ব স্বীকার করিলে, কুলাভিমান দেশাভিমান ইত্যাদি কর্ত্তব্যধর্ম্মেরও কর্ম্মযোগশাস্ত্রানুসারে সমুচিত উপপত্তি হইতে পারে। সমগ্র মানবজাতির, এমন কি প্রাণীমাত্রেরই যাহাতে হিত হয় তাহাই ধর্ম্ম, ইহা চরম সিদ্ধান্ত হইলেও এই পরম অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে কুলাভিমান, ধর্ম্মাভিমান, দেশাভিমান প্রভৃতি আরোহণের পৈঠার আবশ্যকতা কখনই বিনষ্ট হয় না। নির্গুণ ব্রহ্মলাভের জন্য যেরূপ সগুণোপাসনা আবশ্যক সেইরূপ 'বসুধৈব কুটুম্বকং' এই বুদ্ধি হইবার পক্ষে কুলাভিমান, জাত্যাভিমান, ধর্ম্মাভিমান, দেশাভিমান প্রভৃতির ধাপ আবশ্যক; এবং সমাজের প্রত্যেক বংশ এই সিঁড়ি দিয়া

আরোহণ করে বলিয়া এই সিঁড়িকে নিয়ত বজায় রাখিতে হয়। এইরূপই আমাদের চারিপাশের লোক কিংবা অন্য রাষ্ট্র যখন নীচের পৈঠায় থাকে, তখন কোন ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্র যদি চাহে যে, তাহারাই কেবল বরাবর উপরের পৈঠায় থাকিবে, তাহা কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, পরস্পর ব্যবহারে "যাহার যেমন, তাহার তেমন" এই নীতিসূত্র অনুসারে উপর-উপর পৈঠার লোকদিগের দ্বারা নীচের-নীচের পৈঠার লোকের অন্যায়ের প্রতিকার করা প্রসঙ্গ বিশেষে আবশ্যক হয়, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। জগতের সমস্ত মনুষ্যের অবস্থার উন্নতি হইতে হইতে প্রাণীমাত্র কোন না কোন সময়ে সর্ব্বভূতাত্মৈক্য উপলব্ধি পর্য্যন্ত-পৈঠায় আসিয়া পৌঁছিবে তাহাতে সন্দেহ নাই; অন্ততঃ ঐরূপ অবস্থা মনুষ্যমাত্রই অর্জ্জন করিতে পারে এরূপ আশা করা অসঙ্গতও নহে। কিন্তু আত্মোন্নতির এই চূড়ান্ত অবস্থা যে পর্য্যন্ত সকলে প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত অন্য রাষ্ট্র কিম্বা সমাজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধুপুরুষেরা দেশাভিমানাদি ধর্ম্মেরই এরূপ উপদেশ দেন যাহা আপন আপন সমাজের পক্ষে তৎ-তৎকালে শ্রেয়স্কর হয়। তাছাড়া ইহাও মনে রাখা উচিত যে, গৃহের উপর-উপর তলা গড়িয়া তুলিলেও নীচের তলাকে যেরূপ ছাঁটিয়া ফেলা যায় না, কিংবা তলোয়ার গড়িলেও কোদালের, অথবা সূর্য্য থাকিলেও অগ্নির আবশ্যকতা যেরূপ নষ্ট হয় না, সেইরূপ সর্ব্বভূতহিতের চরম পৈঠায় পৌঁছিলেও শুধু দেশাভিমানের নহে, কুলাভিমানেরও আবশ্যকতা বজায় থাকে। কারণ, সমাজসংস্কারের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কুলাভিমান যে বিশিষ্ট কাজ করে তাহা কেবল দেশাভিমানের দ্বারা হয় না, এবং দেশাভিমানের কাজ নিছক সর্ব্বভূতাত্মৈক্য দৃষ্টির দ্বারা সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ সমাজের পূর্ণাবস্থাতেও সাম্যবুদ্ধিরই ন্যায়, দেশাভিমান ও কুলাভিমান ইত্যাদি ধর্ম্মেরও সর্ব্বদাই আবশ্যকতা থাকে। কিন্তু কেবল আপনারই দেশের অভিমানকে পরম সাধ্য মনে করিলে যেমন এক রাষ্ট্র নিজের লাভের জন্য অন্য রাষ্ট্রের যতটা-পারে ক্ষতি করিতে প্রস্তুত হয়, সর্ব্বভূত-হিতকে পরমসাধ্য মনে করিলে সেরূপ হয় না। কুলা-ভিমান, দেশাভিমান এবং শেষে সমস্ত মানবজাতির হিত, ইহাদের মধ্যে যদি বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে নীচের নীচের আদর্শের ধর্ম্মকে উপর-উপর পৈঠার ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ করিবে, সাম্যবুদ্ধির দ্বারা পরিপূর্ণ নীতিধর্ম্মের এই মহৎ ও বিশিষ্ট উক্তি। যুদ্ধে কুলক্ষয় হইবে, অতএব দুর্যোধনের জেদ বজায় রাখিবার জন্য পাণ্ডবদিগকে রাজ্যের ভাগ না দেওয়া অপেক্ষা, দুর্যোধন কথা না শুনিলে, (আপন পুত্র হইলেও) একা তাহাকে ত্যাগ করাই উচিত বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ উপদেশ করিবার সময় তৎসমর্থনার্থ—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

কুলের (রক্ষণের) জন্য একজনকে, গ্রামের জন্য কুলকে সমস্ত জনপদের জন্য গ্রামকে এবং আত্মার জন্য পৃথিবীকে ছাড়িবে" (মভা. আদি. ১১৫. ৩৮ মভা. ৩১. ১১)। এই শ্লোকের প্রথম তিন চরণের তাৎপর্য্য ইহাই; চতুর্থ চরণে আত্মসংরক্ষণের তত্ত্ব বলিয়াছেন। 'আত্ম' শব্দ সাধারণ সর্ব্বনাম, ইহা হইতে আত্মসংরক্ষণের এই তত্ত্ব এক ব্যক্তিরই ন্যায় সমবেত লোকসমূহের প্রতি, জাতির প্রতি, দেশের প্রতি কিংবা রাষ্ট্রেরও প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে; এবং কুলের জন্য এক ব্যক্তিকে, গ্রামের জন্য কুলকে, দেশের জন্য গ্রামকে ছাড়িবার ক্রমশঃ উত্থানশীল এই প্রাচীন প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, আত্ম শব্দের অর্থ এই সকলের অপেক্ষা এইস্থানে অধিক গুরুত্বসূচক, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। তথাপি কোন কোন মৎলবী কিংবা শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক এই চরণের কখন কখন বিপরীত অর্থাৎ নিছক স্বার্থপর অর্থ করিয়া থাকে; তাই, আত্মসংরক্ষণের এই তত্ত্ব স্বার্থপরতার তত্ত্ব নহে, এই কথা এখানে বলা আবশ্যক। কারণ, যে শাস্ত্রকারেরা নিছক্ স্বার্থসাধু চার্বাক-পন্থাকে রাক্ষসী স্থির করিয়াছেন (গী. অ. ১৬ দেখ) স্বার্থের জন্য, জগৎকে উচ্ছেদ করিতে কাহাকেও বলিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। উপরি-উক্ত শ্লোকের 'অর্থে' শব্দের অর্থ নিছক্ স্বার্থপর নহে; "সঙ্কট উপস্থিত হইলে তাহার নিবারণার্থ" এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; এবং কোষ-কারেরাও এই অর্থই দিয়াছেন। আত্মোদরপরতা ও আত্মসংরক্ষণের মধ্যে অনেক প্রভেদ। কামোপভোগের ইচ্ছা কিংবা লোভবশতঃ আপনার লাভের জন্য জগতের ক্ষতি করা আত্মোদরপরতা। ইহা অমনুষ্যোচিত ও গর্হিত। একজনের হিত অপেক্ষা বহুলোকের হিতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ইহাই উক্ত শ্লোকের প্রথম তিন চরণে উক্ত হইয়াছে। তথাপি সর্ব্বভূতে একই আত্মা থাকায়, প্রত্যেকের সুখে থাকিবার সমান নৈস-র্গিক অধিকার আছে; এবং এই সর্ব্বমান্য মহৎ ও নৈসর্গিক অধিকারের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, জগতের কোনও এক ব্যক্তির বা সমাজের ক্ষতি করিবার অধিকার, অন্য কোন ব্যক্তি বা সমাজ প্রাপ্ত হয় না—নীতিদৃষ্টিতে সেই সমাজ শক্তিতে কিংবা সংখ্যায় যতই বড় হউক না কেন, কিংবা তাহার নিকট পরাভব করিবার সাধন অন্যের অপেক্ষা যতই অধিক থাকুক না কেন। একজন অপেক্ষা অথবা অল্প লোক অপেক্ষা বহুলোকের

হিত অধিক যোগ্য এইরূপ যুক্তিবাদের দ্বারা সংখ্যায় অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমাজের আত্মমৎলবী আচরণ যদি কেহ সমর্থন করে তবে সেই যুক্তিবাদকে রাক্ষসী বুঝিতে হইবে। এইরূপ অন্য লোক যদি অন্যায় ব্যবহার করে, তবে বহুলোকের কেন, সমস্ত পৃথিবীর হিত অপেক্ষাও আত্মসংরক্ষণের অর্থাৎ আপনাকে বাঁচাইবার নৈতিক অধিকার আরও বলবত্তর হয়; ইহাই উক্ত চতুর্থ চরণের ভাবার্থ; এবং প্রথম তিন চরণে বর্ণিত অর্থেরই জন্য মহত্ত্বপূর্ণ অপবাদসূত্রেই উহাদেরই সঙ্গে ইহা ব্যাঘাত হইয়াছে। তাছাড়া, আর একটা দেখাও আবশ্যক, আমরা নিজে বাঁচিলে তবে তো লোকের কল্যাণ করিব। তাই, লোকহিতদৃষ্টিতে বিচার করিলেও বিশ্বামিত্রের কথা অনুসারে বলিতে হয়, "জীবন্ ধর্ম্মমবাপ্নুয়াৎ"—আপনি বাঁচলে তবে ধর্ম্ম, কিংবা কালিদাসের কথা অনুসারে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" (কুমা. ৫. ৩৩) শরীরই সমস্ত ধর্ম্মের মূলসাধন, অথবা মনুর কথা অনুসারে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"—আপনাকে আপনি সতত রক্ষা করিবেক। আত্মসংরক্ষণের অধিকার, সমস্ত জগতের হিতাপেক্ষা এই প্রকার শ্রেষ্ঠ হইলেও কোন কোন প্রসঙ্গে কুলের জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য কিংবা পরোপকারার্থ সাধুব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমেই নিজের প্রাণ দান করেন ইহা পূর্ব্বে দ্বিতীয় প্রকরণে বলা হইয়াছে। এই তত্ত্বই উক্ত শ্লোকের প্রথম তিন চরণে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ প্রসঙ্গে মনুষ্য আত্মসংরক্ষণরূপ স্বকীয় শ্রেষ্ঠ অধিকারকেও ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করায় এই কার্য্যের নৈতিক যোগ্যতাও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। তথাপি এইরূপ প্রসঙ্গ কখন্ উপস্থিত হয়, তাহা অভ্রান্তরূপে স্থির করিবার পক্ষে শুধু পাণ্ডিত্য কিংবা তর্কবুদ্ধি যথেষ্ট নহে; এইজন্য যে ব্যক্তি বিচার করিবে তাহার অন্তঃকরণ প্রথম হইতেই শুদ্ধ ও সম হওয়া আবশ্যক, ইহা ধৃতরাষ্ট্রের উল্লিখিত কথা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। বিদুরপ্রদত্ত উপদেশ বুঝিতে না পারিবার মত ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধি অল্প ছিল এরূপ নহে, কিন্তু পুত্রস্নেহবশতঃ তাঁহার বুদ্ধি সম হইত না, এইরূপ মহাভারতেই উক্ত হইয়াছে। কুবেরের যেরূপ লাখটাকার কখনই অভাব হয় না, সেইরূপ যাহার বুদ্ধি একবার সম হইয়াছে তাহার কুলাত্মৈক্য, দেশাত্মৈক্য কিংবা ধর্ম্মাত্মৈক্য প্রভৃতি নিম্ন পৈঠার ঐক্যগুলিও কখনও ভাঙ্গিয়া যায় না। ব্রহ্মাত্মৈক্যের মধ্যে এই সমস্ত অন্তর্ভূত হইয়া থাকে; আবার দেশধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ইত্যাদি সংকীর্ণ ধর্ম্মের কিংবা সর্ব্বভূতহিতরূপ ব্যাপক ধর্ম্মের—অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের অবস্থা অনুসারে, কিংবা আত্মসংরক্ষণার্থ যে সময়ে যাহার যে ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর তাহাকে সেই ধর্ম্মেরই উপদেশ করিয়া জগতের ধারণপোষণের কাজ সাধুপুরুষ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে, মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থায় দেশাভিমানই মুখ্য সদ্‌গুণ; এবং সুসভ্য রাষ্ট্রও পার্শ্ববর্ত্তী শত্রুরাষ্ট্রের অনেক মনুষ্যকে অল্পকালের মধ্যে কিরূপে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে তাহার বিচারে এবং তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার বিষয়ে নিজের জ্ঞান, কৌশল ও ধনের উপযোগ করিয়া থাকে। কিন্তু স্পেন্সর, কোঁৎ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা স্বকীয় গ্রন্থে স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কেবল এই একই কারণে দেশাভিমানকেই নীতিদৃষ্টিতে মানবের পরম সাধ্য বলিয়া মানিতে পারা যায় না; এবং তাঁহাদের প্রতিপাদিত তত্ত্বের উপর যে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না তাহাই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাপ্ত সর্ব্বভূতাত্মৈক্যরূপ তত্ত্বের উপরেও কেন খাটিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ছেলে যখন ছোট থাকে তখন তাহার কাপড় তাহার শরীরের মাপে—বড় জোর, কিছু বড় হইলে তাহার বর্দ্ধিত শরীরের মাপে—যেরূপ ছাঁটিতে হয়, সেইরূপই সমস্ত ভূতাত্মৈক্যেরও কথা। সমাজই হউক বা ব্যক্তিই হউক, সর্ব্বাত্মৈক্যবুদ্ধিতে তাহার সম্মুখে যে সাধ্য স্থাপিত হয়, তাহা তাহার অধিকারের অনুরূপ, কিংবা তাহা অপেক্ষা একটু অগ্রবর্ত্তী হইলেই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর হয়; তাহার যোগ্যতা অপেক্ষা বেশী ভালো বিষয় তাহাকে একেবারেই করিতে বলিলে তাহার তাহাতে কখনই কল্যাণ হইতে পারে না। পরব্রহ্মের কোন সীমা না থাকিলেও, উপনিষদে তাঁহার উপাসনার উত্তরোত্তর উচ্চতর পৈঠা নির্দ্দেশ করিবার কারণই এই; যে সমাজে সকলেই স্থিতপ্রজ্ঞ, সেখানে ক্ষাত্রধর্ম্মের আবশ্যকতা না থাকিলেও, জগতের অন্যান্য সমাজের তৎকালীন অবস্থা মনে করিয়া, "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই তত্ত্বের উপরে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থায় ক্ষাত্রধর্ম্মের সংগ্রহ করিয়াছেন। এবং প্রসিদ্ধ গ্রীকতত্ত্বজ্ঞ প্লেটো স্বকীয় গ্রন্থে যে সমাজব্যবস্থাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন, তাহার মধ্যেও, নিত্যনিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা যুদ্ধকলায় প্রবীণ শ্রেণীকে, সমাজরক্ষকের হিসাবে প্রমুখত্ব দিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানী লোক পরম শুদ্ধ ও উচ্চ অবস্থার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেও তৎ-তৎকালীন অপূর্ণ সমাজব্যবস্থার বিচার করিতেও তাঁহারা ভুলেন না, এইরূপ ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

উপরি-উক্ত সকল বিষয়ের এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে জ্ঞানী পুরুষ সম্বন্ধে ইহা সিদ্ধ হয় যে, তিনি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে নির্বিষয়, শান্ত, সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর ও সম রাখেন; এই অবস্থা লাভ

হইলে সাধারণ অজ্ঞান লোকের বিষয়ে বিরক্ত হন না; নিজের সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মসন্ন্যাশ্রম স্বীকার করিয়া এই লোকদিগের বুদ্ধি বিগড়ান না; দেশকাল ও অবস্থা অনুসারে যাহার যেরূপ যোগ্য তাহাকে তাহারই উপদেশ দেন; নিজের নিষ্কাম কর্ত্তব্যাচরণ দ্বারা সদ্ব্যবহারের যথাধিকার প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইয়া সকলকে আস্তে আস্তে যথাসম্ভব শান্ত-ভাবে অথচ উৎসাহজনকরূপে উন্নতির পথে আনেন; ইহাই জ্ঞানীপুরুষদিগের প্রকৃত ধর্ম্ম। সময়ে সময়ে অবতার ধারণ করিয়া ভগবানও এই কাজই করিয়া থাকেন; এবং জ্ঞানীপুরুষেরও এই আদর্শ ধরিয়া ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আপন কর্ত্তব্য শুদ্ধ অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে যথাশক্তি করিতে থাকা উচিত। সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, এই প্রকার কর্ত্তব্যপালনে মৃত্যু ঘটিলেও তাহা অতি আনন্দের সহিত স্বীকার করিতে হইবে (গী. ৩. ৩৫), আপন কর্ত্তব্য অর্থাৎ ধর্ম্ম ছাড়িবে না। ইহাকেই লোকসংগ্রহ কিংবা কর্ম্মযোগ বলে। শুধু বেদান্ত নহে, তাহার ভিত্তি ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মাকর্ম্মের উপর উক্ত জ্ঞানও যখন গীতায় বলা হইয়াছে, তখনও তো প্রথমে যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষা মাগিতে প্রস্তুত অর্জ্জুন পরে স্বধর্ম্ম অনুসারে ঘোর যুদ্ধ করিতে—শুধু ভগবান বলিয়াছেন বলিয়া নহে, প্রত্যুত স্বেচ্ছাক্রমে—প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্থিতপ্রজ্ঞের সাম্যবুদ্ধির যে তত্ত্ব অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই তত্ত্বই কর্ম্ম-যোগশাস্ত্রের মূল ভিত্তি। তাই ইহাকেই প্রমাণ মানিয়া ইহার আধারে পরাকাষ্ঠানীতিমত্তার উপপত্তি কিরূপ লাগ-সই হয় তাহা বলিয়াছি। আত্মৌপম্য-দৃষ্টিতে সমাজে পরস্পর পরস্পরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে; 'যে যেমন তাহাকে তেমন' এই নীতিসূত্র অনুসারে কিংবা পাত্রাপাত্রতামূলে পরাকাষ্ঠা নীতিধর্ম্মে কিরূপ প্রভেদ হয়, অথবা অপূর্ণাবস্থার সমাজে ব্যবহারকালে সাধুপুরুষকেও অপবাদাত্মক নীতিধর্ম্মকে কেন স্বীকার করিতে হয়, ইত্যাদি কর্ম্মযোগশাস্ত্রের মুখ্য মুখ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত নিরূপণ আমি এই প্রকরণে করিয়াছি। এই যুক্তিবাদই ন্যায়, পরোপকার, দান, দয়া, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি নিত্যধর্ম্মে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এখনকার অপূর্ণ সমাজব্যবস্থার প্রসঙ্গা-নুসারে এই নীতিধর্ম্মে কি ভাবে কোন্ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক তাহা দেখাইবার জন্য এই ধর্ম্মসমূহের মধ্যে প্রত্যেক ধর্ম্মের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিলেও এই বিষয় শেষ হইবার নহে; এবং ভগবদ্গীতার মুখ্য উদ্দেশ্যও তাহা নহে। অহিংসা ও সত্য, সত্য ও আত্মসংরক্ষণ, আত্মসংরক্ষণ ও শান্তি ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর-বিরোধ ঘটিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সংশয় প্রসঙ্গবিশেষে উৎপন্ন হয়, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রকরণেই তাহার আভাস দিয়াছি। এইরূপ প্রসঙ্গে সাধু-পুরুষ "নীতিধর্ম্ম, লোকযাত্রাব্যবহার, স্বার্থ ও সর্ব্বভূত-হিত" প্রভৃতি বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া তাহার পর কার্য্যাকার্য্যের নির্ণয় করিয়া থাকেন ইহা নির্ব্বিবাদ; মহাভারতে শ্যেন শিবিরাজকে এই কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন। সিজ্‌উইক নামক ইংরেজ গ্রন্থকার আপন নীতি-শাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে এই অর্থই বিস্তারপূর্ব্বক অনেক উদাহরণ দিয়া বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন যে, স্বার্থ ও পরার্থের সারাসার বিচার করাই নীতিনির্ণয়ের তত্ত্ব, কিন্তু তাহা আমাদের শাস্ত্রকারদিগের কখনই মান্য হয় নাই। কারণ আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, এই সারাসার-বিচার অনেক সময় এত সূক্ষ্ম ও অনৈকান্তিক অর্থাৎ অনেকগুলি অনুমান নিষ্পন্ন করে যে, "যেমন আমি অন্যলোকও তেমনি" এই সাম্যবুদ্ধি পূর্ব্বেই যদি মনে ষোল আনা মুদ্রিত না থাকে তাহা হইলে শুধু তার্কিক সারাসার-বিচারের দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সর্ব্বদা অভ্রান্ত নির্ণয় করিতে পারে না; এবং তাহার পর, "ময়ূর নাচিতেছে বলিয়া মুর্গীও নাচিতেছে", এইরূপ হওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ "দেখাদেখি সাধে যোগ, নাশে দেহ বাড়ে রোগ" এই প্রবাদ অনুসারে ঢং বিস্তৃত হইবে এবং সমাজের হানি হইবে। মিল প্রভৃতি উপযুক্ততা-বাদী পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞদিগের উপপাদনে ইহাই তো মুখ্য অপূর্ণতা আছে। গরুড় ছোঁ মারিয়া আপন খাবার ভেড়াকে ধরিয়া উচ্চ আকাশে উঠাইয়া লইলে কাকও যদি সেইরূপ করিতে যায়, তবে তাহাকে বিড়ম্বিত হইতেই হয়। এই জন্য সাধুপুরুষ-দিগের শুধু বাহ্য সাধনের উপর নির্ভর করিও না, অন্তঃকরণের সতত-জাগ্রত সাম্যবুদ্ধিকেই শেষে আশ্রয় করিতে হইবে; সাম্যবুদ্ধিই কর্ম্মযোগশাস্ত্রের প্রকৃত মূল, এইরূপ গীতা বলিয়াছেন। আধুনিক আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ স্বার্থকে কেহ বা পরার্থ অর্থাৎ "অধিক লোকের অধিক হিতকে" নীতির মূলতত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করেন। কিন্তু আমি চতুর্থ প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, কর্ম্মের কেবল বাহ্য পরিণামে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বত্র কাজ চলে না; কর্ত্তার বুদ্ধি কতটা শুদ্ধ তাহারও বিচার অবশ্যই করিতে হয়। ইহা কর্ম্মের বাহ্য পরিণামের সারাসার বিচার করা বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার লক্ষণ বটে; কিন্তু দূরদর্শিতা ও নীতি এই দুই শব্দ সমানার্থক নহে। তাই, কেবল বাহ্য কর্ম্মের সারাসার-বিচার এই নিছক ব্যাপারী ক্রিয়ার মধ্যে সদাচরণের প্রকৃত বীজ নাই; সাম্যবুদ্ধিরূপ পরমার্থই নীতির মূলভিত্তি, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির করিয়াছেন। মনুষ্যের অর্থাৎ জীবাত্মার পূর্ণ অবস্থার উচিত বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই করিতে হয়। লোভবশতঃ কাহারও দ্রব্য হরণ করিতে অনেক মানুষই খুব বুদ্ধির পরিচয় দেয়; কিন্তু এই বুদ্ধিমত্তা কিংবা অধিক লোকের অধিক হিত কিসে হয়, ইহার সম্যক্ জ্ঞানলাভের যোগ্য নিছক ব্রহ্মজ্ঞানকেই এই জগতে প্রত্যেকের পরম সাধ্য কেহ বলে না। যাহার মন কিংবা অন্তঃকরণ শুদ্ধ তাহাকেই উত্তম বলিতে হয়। এমন কি, অন্তঃকরণ নির্ম্মল, নির্বৈর ও শুদ্ধ না হইয়া কেবল বাহ্য কর্ম্মের লোকদেখানে আচরণে নিমগ্ন হইয়া তদনুসারেই যে চলে, সেই ব্যক্তি ভণ্ড হওয়াই সম্ভব এইরূপও বলিতে পারা যায় (গী. ৩. ৬ দেখ)। কর্ম্মযোগশাস্ত্রে সাম্যবুদ্ধিকে প্রমাণ বলিয়া মানিলে এই দোষ থাকে না। সাম্যবুদ্ধিকে প্রমাণ বলিয়া মানিলে বলিতে হয় যে, বিশেষ কঠিন সমস্যার স্থলে ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়ার্থ সাধুপুরুষদিগেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। কোন উৎকট রোগ হইলে বৈদ্যের সাহায্য ব্যতীত তাহার

নিদান ও চিকিৎসা হওয়া যেমন সম্ভব হয় না, সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম সংশয়ের উৎকট প্রসঙ্গে যদি কেহ সৎপুরুষের সাহায্য না লয়, এবং এই অভিমান রাখে যে আমি "অধিক লোকের অধিক হিত" এই একই সাধনের দ্বারা নিজেই ধর্ম্মাধর্ম্মের অভ্রান্ত নির্ণয় করিয়া লইব, তবে উহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। সাম্যবুদ্ধি বাড়াইবার অভ্যাস প্রত্যেকের করা উচিত; এবং এইরূপে জগতের সমস্ত মনুষ্যের বুদ্ধি যখন পূর্ণ সাম্যাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিবে তখনই সত্যযুগ আবির্ভূত হইয়া মানবজাতির পরম সাধ্য লাভ হইবে কিংবা সকলেই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কার্য্যাকার্য্যশাস্ত্রও এইজন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং সেইজন্য তাহার ইমারৎও সাম্যবুদ্ধির ভিত্তির উপরেই খাড়া করিতে হইবে। কিন্তু এতটা তলাইয়া না দেখিয়া নীতিমত্তার শুধু লৌকিক কষ্টিপাথরের দৃষ্টিতেই বিচার করিলেও গীতার সাম্যবুদ্ধির পক্ষই পাশ্চাত্য আধিভৌতিক কিংবা আধিদৈবত পন্থা অপেক্ষা অধিক যোগ্য ও মার্মিক বলিয়া সিদ্ধ হয়। এই বিষয় পরে ১৫শ প্রকরণে কৃত তুলনাত্মক আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু গীতার তাৎপর্য্যনিরূপণের একটা যে গুরুতর অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে তাহা তৎপূর্ব্বে শেষ করিয়া ফেলিব।

ইতি দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ প্রকরণ।

ভক্তিমার্গ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ *

সর্ব্বভূতাত্মৈক্যরূপ নিষ্কাম বুদ্ধিই কর্ম্মযোগের ও মোক্ষেরও মূল; এই শুদ্ধ বুদ্ধি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং এই শুদ্ধ বুদ্ধিরই দ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম আজন্ম করিতে হইবে, এখন পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তাহার বিচার করিয়াছি। কিন্তু ভগবদ্‌গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় তাহাতেই সম্পূর্ণ হয় না। কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ যে, ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই কেবল সত্য ও চরম সাধ্য, এবং "তাহার সমান পবিত্র জগতে আর কিছুই নাই" (গী. ৪, ৩৮); তথাপি এখন পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা সাম্যবুদ্ধি সম্পাদন করিবার যে বিধি অর্থাৎ মার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছি, সে সকলই বুদ্ধিগম্য। তাই সাধারণ ব্যক্তির আশঙ্কা এই যে, তাহার পূর্ণ ধারণা করিবার মত তীব্র বুদ্ধি প্রত্যেক মনুষ্য কোথায় পাইবে; এবং যদি কাহারও বুদ্ধি তীব্র না হয়, তবে সেই ব্যক্তি কি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হাত হইতে ঝাড়িয়া বসিবে? সত্য বলিতে কি, এই সংশয় অসঙ্গতও মনে হয় না। যদি কেহ বলে—"বড় বড় জ্ঞানীপুরুষও যখন নশ্বর নামরূপাত্মক মায়ায় আচ্ছন্ন তোমার সেই অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্মের বর্ণনা করিবার সময় "নেতি নেতি" বলিয়া চোক্ গিলিতে থাকেন তখন আমাদের ন্যায় সাধারণ লোক কি প্রকারে পরব্রহ্মকে জানিবে? এইজন্য, তোমার এই গহন ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের স্বল্প ধারণাশক্তির গণ্ডীর মধ্যে যাহাতে আসিতে পারে এরূপ কোন সুলভ বিধি কিংবা মার্গ যদি থাকে ত বলো, এইরূপ যদি কেহ বলে, তাহাতে তাহার দোষ কি? আত্মার (অর্থাৎ ব্রহ্মের) আশ্চর্য্য বক্তা ও শ্রোতা অনেক থাকিলেও তাঁহার জ্ঞান কাহারও হয় না, ইহা গীতায় এবং কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে (গী. ২. ২৯; কঠ. ২. ৭)। এই সম্বন্ধে শ্রুতিগ্রন্থে এক বোধপ্রদ কথাও প্রদত্ত হইয়াছে। এই কথার মধ্যে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, যখন বাষ্কলী বাহ্বকে বলিলেন যে, "ভগবন্, ব্রহ্ম কি, আমাকে কৃপা করিয়া বলুন", তখন বাহ্ব কিছুই বলিলেন না। বাষ্কলী আবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তবুও বাহ্ব নীরব! এইরূপ চারি পাঁচ বার হইলে পর শেষে বাহ্ব বাষ্কলীকে বলিলেন "বাপু! তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি সেই অবধিই দিয়া আসিতেছি, তুমি কিন্তু তাহা বুঝিতে পার নাই—আমি কি করিব? ব্রহ্ম-স্বরূপ কোন প্রকারেই বলা যায় না; অতএব শান্তভাবে থাকা অর্থাৎ চুপ করিয়া থাকাই প্রকৃত ব্রহ্মলক্ষণ! বুঝিলে"? (বেসূ. শাংভা, ৩. ২. ১৭)। সারকথা,—মুখ বুজিয়া থাকিলেও যাঁহার বিষয়ে বলা যায়, চক্ষুর প্রত্যক্ষ না করাইলেও যাঁহাকে দেখা যায়, এবং জ্ঞানগম্য না হইলেও যাঁহাকে জানা যায়, (কেন. ২. ১১) এইরূপ এই দৃশ্যজগৎ হইতে ভিন্ন, অনির্ব্বাচ্য ও অচিন্ত্য যে পরব্রহ্মের বর্ণনা আছে, তাঁহাকে সামান্য বুদ্ধির মনুষ্য উপলব্ধি করিবে কি প্রকারে, এবং তাঁহা দ্বারা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাহার কিরূপে সদ্গতি লাভ হইবে? সচরাচর জগতের একই আত্মা, এইরূপ পরমেশ্বরস্বরূপের অনুভবাত্মক ও যথার্থ জ্ঞান হইলেই মনুষ্যে পূর্ণ উন্নতি হইবে; এবং যদি এই উন্নতিসাধনকল্পে তীব্র বুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন মার্গই না থাকে, তবে জগতের লক্ষ কোটী মনুষ্যকে ব্রহ্মলাভের আশা ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়! কারণ, বুদ্ধিমান মনুষ্য প্রায় অল্পই থাকে। বুদ্ধিমান পুরুষ যাহা বলেন তাহার উপর বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিলেই চলিবে যদি বল, তবে তাঁহাদের মধ্যেও অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; এবং বিশ্বাস স্থাপন করিলে কাজ চলে এইরূপ যদি বল তবে এই গহন জ্ঞান অর্জ্জনের পক্ষে 'বিশ্বাস কিংবা শ্রদ্ধা রাখা'ও বুদ্ধির অতিরিক্ত অন্য কোন মার্গ এই কথা উহা হইতে আপনিই সিদ্ধ হইতেছে। সত্য জিজ্ঞাসা করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞানের সম্পূর্ণতা অথবা ফলদাতৃত্ব শ্রদ্ধা ব্যতীত হয় না। সমস্ত জ্ঞান কেবল বুদ্ধির দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আর কোন মনোবৃত্তির সাহায্য আবশ্যক হয় না, ইহা কেবল তর্কপ্রধান শাস্ত্রের আজন্ম অধ্যয়নজনিত কর্কশবুদ্ধি পণ্ডিতদিগের বৃথাভিমান মাত্র। উদাহরণার্থ এই সিদ্ধান্ত ধর যে, কাল সকালে সূর্য্য পুনর্ব্বার উদয় হইবে। এই সিদ্ধান্তের জ্ঞানকে আমরা অত্যন্ত নিশ্চিত মানি। কেন? উত্তর ইহাই যে, আমরা ও আমাদের পূর্ব্ব-জেরা এই ক্রম সর্ব্বদা অবাধিত দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু একটু তলাইয়া বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, 'তুমি ও তোমার পিতৃপিতামহেরা এখন পর্য্যন্ত

---

* "সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর-প্রাপ্তির সাধন ছাড়িয়া একান্তভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভীত হইও না" এই শ্লোকের অর্থের ব্যাখ্যা এই প্রকরণের শেষে করা হইয়াছে—তাহা দেখ।

প্রতিদিন সকালে সূর্য্যোদয় দেখিয়া আসিয়াছেন' ইহা কাল সকালে সূর্য্যোদয় হইবার কারণ কখনই হইতে পারে না ; কিংবা রোজ তোমার দেখিবার নিমিত্ত অথবা তোমার দেখার দরুণই কিছু সূর্য্য উদিত হয় না ; প্রকৃত-পক্ষে সূর্য্যোদয়ের আরও কোন কারণ আছে। ভাল, এখন যদি তোমার সূর্য্যকে রোজ দেখা কাল সকালে সূর্য্যোদয়ের কারণ না হয়, তাহা হইলে কাল সূর্য্যোদয় যে হইবে তাহার প্রমাণ কি ? দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কোন বস্তুর ক্রম একই প্রকার অবাধিত আছে দেখিতে পাইলে ঐ ক্রম পরেও ঐপ্রকারই নিত্য চলিতে থাকিবে, মনে করাও একপ্রকার বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাই। আমরা যদিও তাহার 'অনুমান' এইরূপ একটা অনেক বড় প্রসিদ্ধ নাম দিই তবু এই অনুমান বুদ্ধিগম্য কার্য্যকারণাত্মক নহে, কিন্তু উহার মূলস্বরূপ শ্রদ্ধাত্মকই তাহা মনে রাখা আবশ্যক। চিনি রামের মিষ্টি লাগিতেছে বলিয়া শ্যামেরও তাহা মিষ্ট লাগিবে, যে নিশ্চয় আমরা করিয়া থাকি, তাহাও আসলে এই ধরণের ; কারণ, যখন কেহ বলে যে, চিনি আমার মিষ্ট লাগিতেছে, তখন এই জ্ঞানের অনুভব তাহার বুদ্ধির প্রত্যক্ষ হয় সত্য, কিন্তু ইহারও বাহিরে গিয়া সমস্ত মানুষেরই চিনি মিষ্ট লাগে এইরূপ যখন আমরা বলি, তখন বুদ্ধির সঙ্গে শ্রদ্ধার যোগ না হইলে কাজ চলে না। রেখাগণিত বা ভূমিতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এমন দুই রেখা হইতে পারে, যাহা-দিগকে যতই বাড়াও না কেন তবু পরস্পরের সহিত তাহারা মিলিবে না। ভূমিতিশাস্ত্রের এই তত্ত্বকে নিজের ধ্যানে আনিবার জন্য আমাকে কেবল শ্রদ্ধার দ্বারাই প্রত্যক্ষ অনুভবকেও যে ছাড়াইয়া যাইতে হয় তাহা বলিতে হইবে না। তাছাড়া, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, জগতের সমস্ত ব্যবহার শ্রদ্ধাপ্রেমাদি নৈসর্গিক মনো-বৃত্তির দ্বারাই চলিয়া থাকে ; এই বৃত্তিদিগকে আটকানো ছাড়া বুদ্ধি আর কোন কাজ করে না, এবং বুদ্ধি কোন বিষয়ের ভাল-মন্দের সিদ্ধান্ত করিলে পর, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার কাজ মনের দ্বারা অর্থাৎ মনোবৃত্তির দ্বারাই হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারেই বলা হইয়াছে। সার কথা এই যে, বুদ্ধিগম্য জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য এবং পরে আচরণে ও কার্য্যে তাহার ফলদ্রূপতা সম্পাদনের জন্য এই জ্ঞানকে নিয়ত শ্রদ্ধা দয়া বাৎসল্য কর্ত্তব্য প্রেম ইত্যাদি নৈসর্গিক মনোবৃত্তির অপেক্ষায় থাকিতে হয় ; এবং যে জ্ঞান এই মনোবৃত্তিসমূহকে শুদ্ধ ও জাগ্রত করে না, এবং যে জ্ঞান তাহাদের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না, তাহা শুষ্ক, অপূর্ণ, মিথ্যা, অকেজো, তুচ্ছ ও কাঁচা, জ্ঞান বুঝিতে হইবে। বারুদ ব্যতীত কেবল গুলির দ্বারা যেরূপ বন্দুক ছোড়া যায় না, সেইরূপ প্রেমশ্রদ্ধাদি মনোবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত কেবল বুদ্ধিগম্য জ্ঞান কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত আমাদের প্রাচীন ঋষিরা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। উদাহরণার্থ ছান্দোগ্যোপ-নিষদে বর্ণিত এই কথা ধর (ছাং ৬. ১২) :—অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম পরব্রহ্মই সমস্ত দৃশ্য জগতের মূল কারণ, ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য একদিন শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেত-কেতুকে বলিলেন যে, বট গাছের এক ফল আন এবং তাহাতে কি আছে দেখ। শ্বেতকেতু সেই ফল ভাঙ্গিয়া দেখিয়া ভিতরে ক্ষুদ্র অনেক বীজ বা দানা আছে' বলিলেন। তাঁহার পিতা 'উহাদের মধ্য হইতে একটা বীজ লও এবং তাহা ভাঙ্গিয়া দেখিয়া বল যে উহাতে কি আছে' এইরূপ আবার বলিলে পর শ্বেতকেতু এক বীজ ভাঙ্গিয়া 'এখন কিছুই দেখিতেছি না' এই উত্তর দিলেন। তাহাতে পিতা বলিলেন—"বাপু! এই যে তুমি 'কিছুই দেখিতেছি না,' তাহা হইতেই এই প্রকাণ্ড বট গাছ হইয়াছে' ; এবং শেষে এই উপদেশ দিলেন যে, 'শ্রদ্ধৎস্ব'—ইহার উপর বিশ্বাস রাখো—অর্থাৎ এই কল্পনা শুধু বুদ্ধিতে রাখিয়া, কেবল মুখে 'হঁ,' না-বলিয়া তাহার বাহিরেও চল, অর্থাৎ এই তত্ত্বকে নিজের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া আচরণে বা কার্য্যে পরিণত কর। সার কথা, সূর্য্য কাল সকালে উদয় হইবে এই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইবার জন্যও যদি শেষে শ্রদ্ধা আবশ্যক হয়, তবে সমস্ত জগতের মূলীভূত মূলতত্ত্ব, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও চৈতন্যরূপ, ইহা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য প্রথমে আমাদিগের যতটা সম্ভব বুদ্ধিরূপ নটকে অবলম্বন করিতে হইবে, কিন্তু পরে তাহার অনুরোধক্রমে কতকদূর তো অবশ্যই শ্রদ্ধা ও প্রেমের পথ দিয়া তাহাকে চলিতে হইবে। দেখ, আমি যাহাকে মা বলিয়া দেবতার ন্যায় বন্দনীয় ও পূজনীয় মনে করি তাহাকেই অন্য লোকে একজন সাধারণ স্ত্রীলোক, কিংবা নৈয়ায়িকদিগের শাস্ত্রীয় শব্দাড়ম্বর অনুসারে "গর্ভধারণপ্রসবাদিস্ত্রীত্ব-সামান্যাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যক্তিবিশেষঃ" মনে করিয়া থাকে। এই এক ক্ষুদ্র ব্যবহারিক উদাহরণ হইতে, শুধু তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত জ্ঞানকে শ্রদ্ধা ও প্রেমের ছাঁচের মধ্যে ঢালাই করিলে তাহাতে কি প্রভেদ হয়, তাহা যে-কোন ব্যক্তিরই সহজে উপলব্ধ হইবে। এই কারণেই কর্ম্মযোগীদিগের মধ্যেও শ্রদ্ধাবানই শ্রেষ্ঠ এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী. ৬. ৪৭) ; এবং "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ চিন্তয়েৎ"—ইন্দ্রিয়াতীত হওয়া প্রযুক্ত যে পদার্থের চিন্তা করা যায় না তাহার স্বরূপের নির্ণয় কেবল তর্কের দ্বারা করিতে বসিবে না—এইরূপ পূর্ব্বকথিত সিদ্ধান্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রেও করা হইয়াছে।

এই এক বাধাই যদি হয় যে, নির্গুণ পরব্রহ্মকে জানা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে কঠিন, তবে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে মতভেদ হইলে পরও শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের দ্বারা এই বাধা দূর করা যাইতে পারে। কারণ, এই ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে অধিক বিশ্বসনীয় হইবে তাহারই বচনের উপর শ্রদ্ধা রাখিলেই আমার কাজ চলিবে (গী. ১৩. ২৫)। তর্কশাস্ত্রে এই মার্গকে "আপ্তবচন প্রমাণ" বলে। 'আপ্ত' অর্থ বিশ্বসনীয় পুরুষ। জাগতিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, হাজার হাজার লোক আপ্তবাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই আপন ব্যবহার চালাইয়া থাকে। দুই পাঁচে দশের বদলে সাত কেন হয় না, কিংবা একের পর আর একটী একের অঙ্ক বসাইলে দুই না হইয়া এগারো কেন হয়, ইহার উপপত্তি কিংবা কারণ যে বলিতে পারে এইরূপ ব্যক্তি খুব কমই হয়। তথাপি এই সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার সহিত সত্য মনে করিয়াই জগতের ব্যবহার চলিতেছে। হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতা পাঁচ

মাইল কি দশ মাইল—ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এইরূপ ব্যক্তি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি হিমালয়ের উচ্চতা কত, আমাদিগের জিজ্ঞাসা করিলে, স্কুলের ভূগোল বর্ণনার পুস্তকে পঠিত "তেইশ হাজার ফুট" এই অঙ্ক আমাদের মুখ হইতে চট্ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সেইরূপ 'ব্রহ্ম কিরূপ' এই কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, 'নির্গুণ' এইরূপ উত্তর দিতে বাধা কি? ব্রহ্ম সত্যসত্যই নির্গুণ কি না ইহার সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া তাহার সাধক-বাধক প্রমাণের মীমাংসা করিবার মত সাধারণ লোকের বুদ্ধি না থাকিলেও, শ্রদ্ধারূপ মনোধর্ম্মটি এরূপ নহে যে, তাহা কেবল মহাবুদ্ধিমান ব্যক্তিতেই পাওয়া যায়। নিতান্ত অজ্ঞান মনুষ্যেরও শ্রদ্ধার অভাব হয় না। এবং শ্রদ্ধার দ্বারাই যদি সেই মনুষ্য একশো সাংসারিক ব্যবহার করে, তবে সেই শ্রদ্ধার দ্বারাই ব্রহ্মকে নির্গুণ মানিয়া লইবার পক্ষে কোনই প্রত্যবায় দেখা যায় না। মোক্ষধর্ম্মের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞানীপুরুষের ব্রহ্মস্বরূপের মীমাংসা করিয়া ব্রহ্ম নির্গুণ এইরূপ নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বেই, মনুষ্য কেবল আপন শ্রদ্ধার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, জগতের মূলে নশ্বর ও অনিত্য জাগতিক পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন-এক অনাদ্যন্ত, অমৃত স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব আছে; এবং মনুষ্য সেই সময় অবধি কোন-না-কোন আকারে তাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে। এই জ্ঞানের উপপত্তি সেই সময় মনুষ্য দিতে পারে নাই সত্য; কিন্তু আধিভৌতিক শাস্ত্রেও প্রথমে অনুভব তাহার পর তাহার উপপত্তি—এই ক্রমই বর্ণিত দেখা যায়। উদাহরণ যথা—ভাস্করাচার্য্যের পৃথিবীর (কিংবা শেষে নিউটনের সমস্ত বিশ্বের) গুরুত্বাকর্ষণের কল্পনা মনে আসিবার পূর্ব্বেই গাছের ফল নীচে পড়ে, এই কথা অনাদিকাল হইতে সকলেরই জানা ছিল। অধ্যাত্মশাস্ত্রেও এই নিয়মসূত্রের প্রয়োগ হয়। শ্রদ্ধার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে চাঁকিয়া তাহার উপপত্তির খোঁজ করা বুদ্ধির কাজ সত্য; কিন্তু সম্যক্‌রূপে যোগ্য উপপত্তি না মিলিলেই শ্রদ্ধার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান কেবল ভ্রমমাত্র, এ কথা বলা যায় না।

যাক্। ব্রহ্ম নির্গুণ ইহা বুঝিলেই যদি আমার কাজ চলিয়া যায় তবে উপরি-উক্ত অনুসারে এই কাজ শ্রদ্ধার দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে ইহাতে সংশয় নাই (গী. ১৩. ২৫)। কিন্তু নবম প্রকরণের শেষে কথিত অনুসারে এই জগতে মনুষ্যের পরম সাধ্য যে ব্রাহ্মী স্থিতি কিংবা সিদ্ধাবস্থা, তাহা পাইতে হইলে ব্রহ্ম নির্গুণ এই শুষ্কজ্ঞানে কাজ চলে না। দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা ও নিত্য সাধনের দ্বারা এই জ্ঞান হৃদয়ে ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া চাই এবং আচরণের দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্যবুদ্ধিই দেহস্বভাব হইয়া যাওয়া চাই; এইরূপ হইতে হইলে, পরমেশ্বর-স্বরূপকে প্রীতিপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া মনকে তদাকারে পরিণত করাই এক সুলভ মার্গ। এই মার্গ কিংবা সাধন আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; ইহাকেই উপাসনা বা ভক্তি বলে। "সা (ভক্তিঃ) পরানুরক্তিরীশ্বরে"—ঈশ্বরের প্রতি পরা অর্থাৎ নিরতিশয় যে প্রীতি তাহাকেই ভক্তি বলে, ভক্তির এই লক্ষণ শাণ্ডিল্য-সূত্রে প্রদত্ত হইয়াছে (শাং. সূ. ২)। পরা অর্থে কেবল নিরতিশয়ই নহে; কিন্তু ভাগবতপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে সেই প্রেম অহেতুক, নিষ্কাম ও নিরন্তর হওয়া চাই—"অহেতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে" (ভাগ. ৩. ২৯. ১২)। কারণ, "হে পরমেশ্বর, আমাকে অমুক দেও"—ভক্তি যখন এই প্রকার সহেতুক হইয়া থাকে, তখন্ কাম্য বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের ন্যায় তাহাও কতকটা ব্যাপারের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ভক্তি হিসাবী অর্থাৎ রাজসিক উক্ত হয়, এবং তাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি পূরাপুরি হয় না। এবং চিত্তশুদ্ধি সম্পূর্ণ না হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মোক্ষপ্রাপ্তি পক্ষেও যে বাধা আসিবে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। অধ্যাত্মশাস্ত্রের পূর্ণ নিষ্কামত্বের তত্ত্ব ভক্তিমার্গেও এইরূপ বজায় থাকে বলিয়া গীতায় ভগবদ্‌ভক্তের চারি বর্গ করিয়া বলা হইয়াছে যে, 'অর্থার্থী' অর্থাৎ কোন হেতুর জন্য পরমেশ্বরকে যে ভক্তি করে এইরূপ ভক্ত নীচের পৈঠার এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান হওয়াতে যে জ্ঞানীপুরুষ স্বয়ং নিজের জন্য কিছু অর্জ্জন করিবার ইচ্ছা না রাখিয়া (গী. ৩. ১৮) নারদাদির ন্যায় কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেই পরমেশ্বরকে ভক্তি করে, সেই ব্যক্তিই সকল ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (গী. ৭. ১৬-১৮)। এই ভক্তি ভাগবত পুরাণ অনুসারে—নয় প্রকার (ভাগবত ৭. ৫. ২৩), যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম্॥

নারদের ভক্তিসূত্রে এই ভক্তিরই একাদশ ভেদ করা হইয়াছে (না. সূ. ৮২)। কিন্তু ভক্তির এই সমস্ত প্রকার-ভেদ মারাঠী দাসবোধ প্রভৃতি অনেক ভাষা গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে নিরূপিত হওয়ায় আমি তৎসম্বন্ধে এখানে বিশেষরূপে আলোচনা করিব না। ভক্তি যে প্রকারেরই হউক না, পরমেশ্বরের উপর নিরতিশয় ও অহেতুক প্রেম স্থাপন করিয়া স্বীয় বৃত্তিকে তদাকারে পরিণত করা, ভক্তির এই যে সাধারণ কাজ, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যকে নিজের মনের দ্বারাই করিতে হইবে ইহা সুস্পষ্ট। ষষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, বুদ্ধি নামক অন্তরিন্দ্রিয় কেবল ভাল-মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিংবা কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় করা ব্যতীত আর কিছু করে না; বাকী সমস্ত মানসিক কাজ মনকেই করিতে হয়। অর্থাৎ এক্ষণে মনেরই দুই ভেদ হইতেছে—এক, যে মন ভক্তি করে এবং দ্বিতীয়, তাহার উপাস্য অর্থাৎ যাহার উপর প্রেম স্থাপন করিতে হইবে সেই বস্তু। উপনিষদে যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা ইন্দ্রিয়াতীত, অব্যক্ত, অনন্ত, নির্গুণ ও 'একমেবাদ্বিতীয়ং' হওয়ায়, সেই স্বরূপ হইতে উপাসনা সুরু হইতে পারে না। কারণ, যখন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব হয় তখন মন স্বতন্ত্র না থাকিয়া, উপাস্য ও উপাসক, কিংবা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই দুই-ই একরূপ হইয়া যায়। নির্গুণ ব্রহ্ম ইহা চরম সাধ্য বস্তু, সাধন নহে; এবং কোন-না-কোন প্রকার সাধনের দ্বারা যে পর্য্যন্ত নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত একাকার হইবার যোগ্যতা মনের মধ্যে উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব সাধন হিসাবে যে উপাসনা করিতে হয় তাহার জন্য যে ব্রহ্মস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে তাহা অন্য শ্রেণীর, অর্থাৎ উপাস্য ও উপাসক এই ভেদের দ্বারা মনের গোচর হয়, অর্থাৎ

সগুণই হয় ; এবং সেই জন্য উপনিষদে যেখানে যেখানে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে, সেখানে সেখানে উপাস্য ব্রহ্ম অব্যক্ত হইলেও সগুণরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। উদাহরণ যথা,—শাণ্ডিল্যবিদ্যায় যে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে সেই ব্রহ্ম অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার হইলেও ছান্দোগ্যউপনিষদে উক্ত হইয়াছে (ছা. ৩. ১৪) যে, তিনি প্রাণ-শরীর, সত্যসঙ্কল্প, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বকর্ম্ম, অর্থাৎ মনের গোচর সমস্তর গুণের দ্বারাই যুক্ত। মনে থাকে যেন, উপাস্য ব্রহ্ম এই স্থানে সগুণ হইলেও অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার। কিন্তু মানব-মনের স্বাভাবিক গঠন এরূপ যে, সগুণ বস্তুর মধ্যেও যে বস্তু অব্যক্ত অর্থাৎ যাহার কোন প্রকার বিশিষ্ট আকার প্রভৃতি না থাকায় যাহা নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহার উপর প্রেম স্থাপন করা অথবা তাহার নিত্য চিন্তনের দ্বারা মনকে তাহাতে স্থির রাখিয়া বৃত্তিকে তদাকার করা মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, এমন কি দুঃসাধ্য। কারণ, মন স্বভাবতই চঞ্চল হওয়ায় ইন্দ্রিয়গোচর কোন স্থির বস্তু আধাররূপে মনের সম্মুখে না থাকিলে কাহাতে স্থির রাখিবে তাহাই মন পুনঃ পুনঃ ভুলিয়া যায়। চিত্তস্থৈর্য্যের এই মানসিক কর্ম্ম বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিরও দুষ্কর মনে হয়, সাধারণ মনুষ্যের কথা দূরে থাক্। তাই, ভূমিতিশাস্ত্র শিখাইবার সময় যেরূপ অনাদি, অনন্ত ও বিস্তৃতিহীন (অব্যক্ত) কিন্তু যাহা দৈর্ঘ্য গুণ থাকায় সগুণ, এইরূপ রেখার কল্পনা মনে আনিতে হইলে সেই রেখার একটি ছোট টুক্‌রা নমুনাস্বরূপ শ্লেটের উপর কিংবা কাষ্ঠফলকের উপর আঁকিয়া দেখাইতে হয়, সেইরূপ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ (সুতরাং সগুণ) কিন্তু নিরাকার অর্থাৎ অব্যক্ত পরমেশ্বরের উপর প্রেম স্থাপন করিয়া তাঁহাতে নিজের বৃত্তি লীন করিবার জন্য মনের সম্মুখে কোনপ্রকার 'প্রত্যক্ষ' নামরূপাত্মক বস্তু না থাকিলে সাধারণ লোকদিগের কাজ চলিতে পারে না।* এমন কি, প্রথমে কোন প্রকার ব্যক্ত বস্তু না দেখিলে অব্যক্তের কল্পনাই মনুষ্যের মনে জাগ্রত হইতে পারে না। উদাহরণ যথা—লাল, সবুজ ইত্যাদি ব্যক্ত রং প্রথমে চোখে দেখিলে পর, তবেই রংয়ের সাধারণ ও অব্যক্ত কল্পনা মনুষ্যের মনে জাগৃত হয়; নচেৎ রংয়ের এই অব্যক্ত কল্পনা হইতেই পারে না। এখন কেহ তাহাকে মানব-মনের স্বভাবই বলুক কিংবা দোষই বলুক; যাহাই বল না কেন, মনের এই স্বভাব যে পর্য্যন্ত দেহধারী মনুষ্য বাহির করিয়া ফেলিতে না পারে সে পর্য্যন্ত উপাসনার জন্য অর্থাৎ ভক্তির জন্য নির্গুণ হইতে সগুণে—এবং তাহাতেও অব্যক্ত সগুণাপেক্ষা ব্যক্ত সগুণেই আসা-ব্যতীত অন্য মার্গ নাই। তাই ব্যক্তোপাসনার মার্গ অনাদি কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে; রামতাপনীয়াদি উপনিষদে মনুষ্যরূপধারী ব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে; এবং ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

> ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
> অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

"অব্যক্তের উপর চিত্তের (মনের) একাগ্রতা যে করে তাহার অনেক কষ্ট হয়; কারণ, দেহেন্দ্রিয়ধারী মনুষ্যের পক্ষে এই অব্যক্তগতি লাভ করা স্বভাবতই কষ্টকর" (গী. ১২. ৫)। এই 'প্রত্যক্ষ' মার্গকেই 'ভক্তিমার্গ' বলে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কোন বুদ্ধিমান পুরুষ নিজের বুদ্ধির দ্বারা পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া পরব্রহ্মের অব্যক্তস্বরূপে কেবল নিজের বিচারের বলে নিজের মনকে স্থির করিতে পারে। কিন্তু এই প্রণালীতে অব্যক্তের উপর 'মন'কে আসক্ত করিবার কাজও তো শেষে শ্রদ্ধা ও প্রেমের দ্বারাই সিদ্ধ করিতে হয়, তাই এই মার্গেও শ্রদ্ধা ও প্রেমের আবশ্যকতা চলিয়া যায় না। সত্য বলিলে, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে প্রেমমূলক ভক্তিমার্গের মধ্যেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মোপাসনারও সমাবেশ করিতে হয়। কিন্তু ধ্যানের জন্য এই মার্গে স্বীকৃত ব্রহ্মস্বরূপ কেবল অব্যক্ত ও বুদ্ধিগম্য অর্থাৎ জ্ঞানগম্য এবং উহাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় বলিয়া এই ক্রিয়ার 'ভক্তিমার্গ' নাম না দিয়া ইহাকে অধ্যাত্মবিচার, অব্যক্তোপাসনা কিংবা শুধু উপাসনা, অথবা জ্ঞানমার্গ বলিবার রীতি আছে। এবং উপাস্য ব্রহ্ম সগুণ হইলেও তাঁহার অব্যক্তের বদলে ব্যক্ত—এবং বিশেষ ভাবে মনুষ্য-দেহধারী—রূপ স্বীকার করিলে তাহাকেই ভক্তিমার্গ বলা হয়। এই প্রকারে মার্গ দুই হইলেও ঐ দুইয়ের মধ্যে একই পরমেশ্বরের প্রাপ্তি হয় এবং শেষে একই সাম্যবুদ্ধি মনে উৎপন্ন হয়; তাই স্পষ্ট দেখা যায় যে, ছাদে উঠিবার সিঁড়ির ন্যায় প্রত্যেকের অধিকার অনুসারে এই দুই (জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ) অনাদিসিদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন মার্গ রহিয়াছে; এই মার্গের ভিন্নতার কারণে চরম সাধ্য অথবা ধ্যেয় বিষয়ে কোনই ভিন্নতা হয় না। তন্মধ্যে একটি সোপানের প্রথম ধাপ বুদ্ধি, দ্বিতীয়টির শ্রদ্ধা ও প্রেমই প্রথম ধাপ; এবং যে সোপান দিয়াই উঠ না কেন, শেষে একই পরমেশ্বরের একই প্রকার জ্ঞান হয় এবং একই প্রকার মোক্ষও লাভ হয়। তাই, "অনুভবাত্মক জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ নাই" এই সিদ্ধান্তই দুই মার্গে সমানই বজায় থাকে। তার পর জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ঠ কি ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ, এই বৃথা বিবাদ করিয়া লাভ কি? এই দুই সাধন প্রথম অবস্থায় অধিকার বা যোগ্যতা অনুসারে ভিন্ন হইলেও শেষে বা পরিণামরূপে একই যোগ্যতাবিশিষ্ট; এবং গীতায় উভয়েরই 'অধ্যাত্ম' এই নাম দেওয়া হইয়াছে (গী. ১১. ১)। এখন সাধন হিসাবে জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই যদিও একই যোগ্যতার হয়, তবু এই দুয়ের মধ্যে গুরুতর ভেদ এই যে, ভক্তি কখনও নিষ্ঠা হয় না, কিন্তু জ্ঞানকে নিষ্ঠা অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থার চরম অবস্থা বলা যাইতে পারে। অধ্যাত্মবিচার কিংবা অব্যক্তোপাসনা

---

* এই বিষয়ে যোগবাসিষ্ঠের বলিয়া প্রসিদ্ধ এক শ্লোক বলা হইয়া থাকে,—

> অক্ষরাবগমলব্ধয়ে যথা স্থূলবর্ত্তুলদৃষৎপরিগ্রহঃ।
> শুদ্ধবুদ্ধপরিলব্ধয়ে তথা দারুমৃন্ময়শিলাময়ার্চ্চনম্ ॥

"অক্ষর পরিচয়ের জন্য ছোট ছেলেদের সম্মুখে যেরূপ স্থূল কাষ্ঠবর্ত্তুল সাজাইয়া অক্ষরের আকার দেখান হয় সেইরূপ (নিত্য) শুদ্ধ বুদ্ধ পরব্রহ্মের জ্ঞান সম্পাদনের জন্য, মাটি কিংবা কাষ্ঠ বা প্রস্তরের মূর্ত্তি স্বীকার করা হইয়া থাকে"। কিন্তু এই শ্লোক বৃহৎ যোগবাসিষ্ঠে পাওয়া যায় না।

দ্বারা পরমেশ্বরের যে জ্ঞান হয় তাহাই ভক্তির দ্বারাও হইতে পারে (গী. ১৮. ৫৫) ইহা সত্য ; কিন্তু এই জ্ঞান হইলে পর যদি কেহ সংসার ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের মধ্যেই নিমগ্ন থাকে, তবে গীতা অনুসারে তাহাকে 'জ্ঞাননিষ্ঠ' বলিতে হইবে, 'ভক্তিনিষ্ঠ' নহে। কারণ, যে পর্য্যন্ত ভক্তির ক্রিয়া বজায় থাকে সে পর্য্যন্ত উপাস্য-উপাসক এই দ্বৈতভাবও থাকে ; এবং চরম ব্রহ্মাত্মৈক্য অবস্থায় তো শুধু ভক্তি কেন, অন্য কোন প্রকারের উপাসনাই অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। ভক্তির পর্য্যবসান বা ফল জ্ঞান ; ভক্তি তাহার সাধন মাত্র, তাহা কিছু চরম সাধ্য বস্তু নহে। সার কথা, অব্যক্তোপাসনার দৃষ্টিতে জ্ঞান একবার সাধন হইতে পারে, আবার ব্রহ্মাত্মৈক্যের অপরোক্ষানুভবের দৃষ্টিতে এই জ্ঞানকেই নিষ্ঠা অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থার চরম অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই ভেদ স্পষ্টরূপে দেখানো যখন আবশ্যক হয়, তখন 'জ্ঞানমার্গ' ও 'জ্ঞাননিষ্ঠা' এই দুই শব্দ সমানার্থে ব্যবহার না করিয়া অব্যক্তোপাসনার সাধনাবস্থার স্থিতি দেখাইবার জন্য 'জ্ঞানমার্গ' শব্দের এবং জ্ঞান-লাভের পর সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানেতেই নিমগ্ন থাকিবার সিদ্ধাবস্থার স্থিতি দেখাইবার জন্য 'জ্ঞাননিষ্ঠা', শব্দের উপযোগ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ অব্যক্তো-পাসনা কিংবা অধ্যাত্মবিচার অর্থে জ্ঞানকে একবার সাধন (জ্ঞানমার্গ), আবার অপরোক্ষানুভব অর্থে তাহাকেই নিষ্ঠা অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগরূপ চরম অবস্থা বলা যাইতে পারে। কর্ম্মের সম্বন্ধেও এই একই কথা। শাস্ত্রোক্ত সীমা অনুসারে চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমে যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা সাধনমাত্র। এই কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইয়া পরিণামে জ্ঞান ও শান্তি লাভ করা যায় ; কিন্তু পরে এই জ্ঞানেতেই নিমগ্ন না হইয়া শান্তভাবে আমরণ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকিলে, জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের দৃষ্টিতে উহার এই কর্ম্মকে নিষ্ঠা বলা যাইতে পারে (গী. ৩. ৩)। এই কথা ভক্তির বিষয়ে বলা যায় না ; কারণ ভক্তি শুধু এক মার্গ বা উপায় অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধনমাত্র—উহা নিষ্ঠা নহে। তাই, গীতার আরম্ভে জ্ঞান (সাংখ্য) ও যোগ (কর্ম্ম) এতদ্রূপ দুই নিষ্ঠারই উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠার সিদ্ধির উপায়, সাধন, বিধি কিংবা মার্গের বিচার করিবার সময় (গী. ৭. ১), অব্যক্তোপাসনা (জ্ঞানমার্গ) এবং ব্যক্তোপাসনার (ভক্তিমার্গ)—অর্থাৎ যে দুই সাধন পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিয়াছে তাহার—বর্ণনা করিয়া, গীতায় কেবল এই-টুকু বলা হইয়াছে যে, ঐ দুয়ের মধ্যে অব্যক্তোপাসনা অনেক ক্লেশময় এবং ব্যক্তোপাসনা কিংবা ভক্তি অধিক সুলভ, অর্থাৎ এই সাধন সকলের সাধ্যায়ত্ত—কিংবা "তুজ হরাবা আছে দেবা তরি হা সুলভ উপায়"—হে দেব তোমাকে পাইবার এই সুলভ উপায়—(গা. ৩০০২)। প্রাচীন উপনিষদে জ্ঞানমার্গেরই বিচার করা হইয়াছে এবং শাণ্ডিল্যাদি সূত্রে, এবং ভাগবতাদি গ্রন্থে ভক্তিমার্গেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু সাধন দৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের যোগ্যতানুসারে ভেদ দেখাইয়া, শেষে দুয়েরই নিষ্কাম কর্ম্মের সহিত মিল স্থাপনের কাজ গীতার ন্যায় সমবুদ্ধি সহকারে অন্য কোন প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থ করিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না।

ললিত বিস্তর।

প্রথম অধ্যায় *।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ)

ওম্। † দশ দিগন্ত বিস্তৃত এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে (লোকধাতুতে) অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান কালে ‡ প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, আর্য্য, শ্রাবক ও প্রত্যেক-বুদ্ধগণকে নমস্কার।

আমি শুনিয়াছি (১) যে একটা মহান্ ভিক্ষু-সঙ্ঘের সহিত ভগবান্ শ্রাবস্তী (২) প্রদেশে দ্বৈতবনে (জেতবনে) অনাথপিণ্ডদের (৩) আশ্রমে বিহার (৪) করিতেছিলেন। সেই সঙ্ঘে দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষু ছিলেন। তন্মধ্যে ছিলেন আয়ুষ্মান্ (৫) জ্ঞানকৌণ্ডিল্য, আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎ, আয়ুষ্মান্ বাষ্প, আয়ুষ্মান্ মহানামা, আয়ুষ্মান্ ভদ্রিক, আয়ুষ্মান্ যশোদেব, আয়ুষ্মান্ বিমল, আয়ুষ্মান্ পূর্ণ, আয়ুষ্মান্ গবাম্পতি, আয়ুষ্মান্ উরুবিল্বাকাশ্যপ, আয়ুষ্মান্ নদীকাশ্যপ, আয়ুষ্মান্ গয়াকাশ্যপ, আয়ুষ্মান্ শারি-পুত্র, আয়ুষ্মান্ মহা-মৌদ্গল্যায়ন, আয়ুষ্মান্ মহা-কাশ্যপ, আয়ুষ্মান্ মহাকাত্যায়ন, আয়ুষ্মান্ কফিল,

---

* মূলে আছে "প্রথমাধ্যায়প্রারম্ভঃ"। এই প্রকার প্রত্যেক অধ্যায়েই প্রারম্ভ শব্দের যোগ আছে, যথা "দ্বিতীয়াধ্যায়প্রারম্ভঃ"।

† "ওম্" শব্দ সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে বেদ হইতে উদ্ধৃত বাক্যের আদি ও অন্তে ব্যবহৃত হইত। তৎপরে সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার অর্থ হইয়াছে "অকার—উকার—মকার—বর্ণত্রয়াত্মক প্রণব অর্থাৎ পরব্রহ্ম"। "অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট, উকারশ্চ মহেশ্বরঃ। মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়োমতাঃ।" অর্থাৎ অবর্ণের অর্থ বিষ্ণু, উ-বর্ণের অর্থ মহেশ্বর এবং ম-বর্ণের অর্থ ব্রহ্মা ; প্রণব বা ওঙ্কার এই দেবত্রয়াত্মক পরব্রহ্মের দ্যোতক। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে এই "ওম্" শব্দের নূতন নূতন অর্থ কল্পিত হইয়াছে এবং জৈনসাহিত্যে "ওম্" এর স্ত্রীলিঙ্গে "এম্" হইয়াছে। যাহাই হউক এখানে গ্রন্থারম্ভে ওঙ্কারের উচ্চারণ সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরূপ "মঙ্গলবাচক"।

মূলে আছে "দশ দিগনন্তাপর্য্যন্ত লোক ধাতু প্রতিষ্ঠিত"। এখানে 'অন্ত' শব্দ স্থানে 'অনন্ত' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে এবং ইহার অন্ত্য অকারের দীর্ঘতা ঘটিয়াছে। 'অন্ত' স্থানে 'অনন্ত' শব্দের ব্যবহার এবং সমাস-মধ্যগত শব্দের অন্ত্য অকারের আকারে পরিণতি ললিত বিস্তরের ভাষায় বিরল নহে। এই অধ্যায়েই স্থানান্তরে "সমন্ততঃ" স্থানে "সমনন্ততঃ" আছে। সমাস মধ্যগত শব্দের অন্ত্য অকারের আকারে পরিণতির উদাহরণ,- 'স্মিত মুখঃ' স্থানে "স্মিতা মুখো" "ছত্রপতাকা" স্থানে "ছত্রাপতাকা"।

‡ মূলে আছে "অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নেভ্যঃ"।

১ মূলে আছে "এবং ময়া শ্রুতম্"। এই বাক্য ভূয়োভূয়ঃ এই গ্রন্থের প্রতি প্রস্তাবের প্রারম্ভে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২ প্রাচীন কালের কোশলরাজধানী, এবং বর্ত্তমান ফৈজাবাদ।

৩ এই শব্দটীর অর্থ "যিনি অনাথ অর্থাৎ দরিদ্রগণকে পিণ্ড অর্থাৎ ভোজ্য দান করিতেন"।

৪ বিহার শব্দের অর্থ ধর্ম্মপ্রচারার্থ পর্য্যটন। এই শব্দ তথাগত বুদ্ধদেবের সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়।

৫ "আয়ুষ্মান্" শব্দ এখানে ভিক্ষুচিত সম্মানের জ্ঞাপক।

(৬) আয়ুষ্মান কৌণ্ডিন্য, আয়ুষ্মান চুনন্দ, (৬) আয়ুষ্মান মৈত্রায়ণীপুত্র, (৭) আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিক, আয়ুষ্মান কম্ফিল, (৬) আয়ুষ্মান সুভূতি, আয়ুষ্মান রেবত, (৮) আয়ুষ্মান খদির বনীক, (৯) আয়ুষ্মান অমোঘরাজ, আয়ুষ্মান মহা পারনিক, আয়ুষ্মান বক্কুল, (৬) আয়ুষ্মান নন্দ, আয়ুষ্মান রাহুল, আয়ুষ্মান স্বাগত, এবং আয়ুষ্মান আনন্দ, ইঁহাদিগকে লইয়া তাঁহার সঙ্গে দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষু ছিলেন। আর ছিলেন দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বোধিসত্ব। তাঁহারা সকলেই এক সম্প্রদায় ভুক্ত, বোধিসত্বোচিত দানাদি যাবতীয় পারমিতার * অনুশীলনে নির্ম্মলচিত্ত (নির্জ্জাত), বোধিসত্বোচিত জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যে বিগত-চাপল্য, (১) বোধিসত্বগ্রাহ্য সর্ব্বপ্রকার ধারণী মন্ত্রের (২) জ্ঞানজ্যোতিতে প্রোদ্ভাসিত, বোধিসত্ব-গ্রাহ্য সর্ব্বপ্রকার ধারণী মন্ত্রের জ্ঞান-সম্পন্ন, বোধিসত্বোচিত ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত (সুপরিপূর্ণ), বোধিসত্বপতির নিকট সতত প্রণতি-পরায়ণ, বোধিসত্বোচিত সমাধিগুণে বশিত্ব-প্রাপ্ত, (৩) বোধিসত্বোচিত আত্মসংযমে অভ্যস্ত, (৪) বোধিসত্বোচিত ক্ষমাবৈভবে পরিপূর্ণ, (৫) এবং বোধিসত্বোচিত দশভূমি (৬) সম্পন্ন। ইঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন, মহাসত্ব (৭) বোধিসত্ব মৈত্রেয়, মহাসত্ব বোধিসত্ব ধরণীশ্বররাজ, মহাসত্ব বোধিসত্ব সিংহ-কেতু, মহাসত্ব বোধিসত্ব সিদ্ধার্থমতি, মহাসত্ব বোধিসত্ব প্রশান্তচরিত্রমতি, মহাসত্ব বোধিসত্ব প্রতিসংবিৎপ্রাপ্ত, মহাসত্ব বোধিসত্ব নিত্যাযুক্ত, এবং মহাসত্ব বোধিসত্ব মহাকরুণাচন্দ্রী। ইঁহাদিগকে লইয়া সেখানে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বোধিসত্ব ছিলেন।

তৎকালে (১) ভগবান শ্রাবস্তী মহানগরীতে উপনীত হইয়া সেইস্থানে বিহার করিতেছিলেন। সেখানে চতুর্ব্বিধ সঙ্ঘ (২) তাঁহার অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া যথাবিধি সম্মাননা ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তত্রত্য রাজগণ, রাজকুমারগণ, রাজমন্ত্রিগণ, মহামাত্যগণ ও অন্যান্য নিম্নতন রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া যথা বিধি সম্মাননা ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তত্রত্য ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ ও অমাত্যগণ তাঁহার অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া যথাবিধি সম্মাননা ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তত্রত্য পৌরগণ, জনপদবাসিগণ এবং তীর্থিক, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী (চরক) ও পরিব্রাজকগণ তাঁহার অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া যথাবিধি সম্মাননা ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। (৩) তাঁহার চীবর, পিণ্ডপাত্র, শয্যা, আসন এবং গ্লানিবিনোদনোপযোগী সংস্কৃত ও উপাদেয় ভক্ষ্য, ভোজ্য ও আস্বাদনীয় বস্তুজাত প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্বেও, এবং অত্যুৎকৃষ্ট উপহার সামগ্রী ও সর্ব্বোত্তম প্রশংসা প্রাপ্তি সত্বেও, ভগবান তৎসমুদায়ে সরোবরসলিলে পদ্মের ন্যায় অনাসক্ত ও উদার

৬ এই সকল নামের অর্থবোধ হয় না। এগুলি সেকালের গ্রাম্য ভাষা।

৭ মায়ের নামে পুত্রের নামকরণ হইয়াছে।

৮ বেদের ভাষায় "রেবান্" অর্থে "ধন-সম্পন্ন" পাওয়া যায়।

৯ ইনি কি স্থানের নামে প্রসিদ্ধ?

* দান, শীল, শান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, উপায়, বল, প্রণিধি (পরিদর্শনশক্তি) এবং জ্ঞান, এই দশ সংখ্যক পারমিতা বোধিসত্বগণের ভূষণ-স্বরূপ।

১। মূলে আছে "সর্ব্ববোধিসত্বাভিজ্ঞাবসিতাবিক্রীড়িতৈঃ"। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুবাদ করিয়াছেন "who had made their command over Bodhi sattwa knowledge a pastime"। আমাদের বোধ হয় তিনি এই স্থানটী এড়াইয়া গিয়াছেন। অবসিত শব্দের অন্ত্য অকারের আকারে পরিণতি হইয়াছে। আমাদের কৃত অন্বয়—বোধিসত্বগণের (উপযুক্ত) সর্ব্ব (প্রকার) অভিজ্ঞা (জ্ঞান সম্পদ বা জ্ঞানগাম্ভীর্য্য) (বশতঃ) অবসিত (বিগত) হইয়াছে বিক্রীড়িত (ক্রীড়া অর্থাৎ চাপল্য) যাঁহাদিগের তাঁহারা।

২। ধারণী—তান্ত্রিক মন্ত্রের ন্যায় অর্থশূন্য অথচ মানবের দুঃখনাশে সমর্থ মন্ত্রসমূহ। এই সকল মন্ত্র বোধিসত্বগণের অনুশীলনীয়।

৩। মূলে আছে "সমাধি-বশিতা-প্রাপ্তৈঃ"।

৪। মূলে আছে "সর্ব্ববোধিসত্ববশিতাপ্রতিলব্ধৈঃ।

৫। মূলে আছে "ক্ষান্ত্যবকীর্ণৈঃ"। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুবাদ refulgent in Bodhisattwa forbearance,

৬। পূর্ণতা বা বোধিসত্বত্বলাভের অধিকারী হইবার জন্য বহু যোনি পার হইয়া প্রত্যেক জন্মের মহিমা-সম্পন্ন হইতে হয়। এই মহিমা বা পূর্ণতা লাভের দশসংখ্যক সোপানকে ভূমি বলে।

৭। বোধিসত্বগণের সম্মানের উপযোগী উপাধি। "His Holiness the Pope" এর তুল্য।

১ মূলে আছে "তেন খলু সময়েন"। এই ভাষাও পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

২ চতুর্ব্বিধ সঙ্ঘ—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের চতুর্ব্বিধ শ্রেণী বিভাগ। বুদ্ধ, লোক জ্যেষ্ঠ, বোধিসত্ব, প্রত্যেক বুদ্ধ, শ্রাবক প্রভৃতি যাঁহাদের ধর্ম্ম আচারানুশীলনাদি নিঃশ্রেয় অতীত এবং যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যাঁহারা শিরোমুণ্ডনাদি বৌদ্ধ আচার মানিয়া চলেন এবং তদুচিত পরিচ্ছদ পরিধান করেন, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। যে সকল মানব ও ইতর জীব পাপ-পুণ্য বুঝে না তাহারা তৃতীয় সঙ্ঘ ভুক্ত। আর যে সকল ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বনের পর বৌদ্ধ আচার অবগত হইয়াও আচারভ্রষ্ট ও পাপকর্ম্মশীল তাহারা চতুর্থ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত।

৩ এই স্থানটাও ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এড়াইয়া গিয়াছেন। মূলে আছে—"সৎকৃতো গুরুকৃতো মানিতঃ পূজিতশ্চতসৃণাং পরিষদাং রাজ্ঞাং রাজকুমারাণাং রাজমন্ত্রিণাং রাজমহামাত্রাণাং রাজপার্ষদিকানাং ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-গৃহ-পত্যমাত্যপার্ষদানাং পৌর-জনপদানাং অন্যতীর্থিক-শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-চরক-পরিব্রাজকানাং। অনুবাদ respected, venerated, revered and adored by the four-fold congregation;—by kings, princes, their counsellors, prime ministers, and followers,—by refenues of Kshattriyas, Brahmins, house holdes, and ministers,—by citizens, foreigners, Brahmins, recluses and ascetics,

ছিলেন। * তিনি অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচার সম্পন্ন, সুগত, (১) লোকবিৎ, পরম পুরুষ, সংযতেন্দ্রিয় † দেবগণ ও মনুষ্যগণের উপদেষ্টা (শাস্তা), ভগবান পঞ্চনেত্র (২) বুদ্ধ। তাঁহার মহামহিমত্বের বার্ত্তা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। দেবতা, মার (৩) ও ব্রহ্মা সমেত এবং শ্রমণ জাতীয় ও ব্রাহ্মণ জাতীয় প্রকৃতিবর্গ ও দেব মানুষ সমেত ইহলোক ও পরলোক সমস্ত স্বয়ং অবগত হইয়া তিনি সর্ব্বত্র উপস্থিত হইয়া, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং সদ্ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি, শোভন উচ্চারণ ও অর্থবিশিষ্ট ভাষায়, আদি মধ্য ও অবসানে কল্যাণকর, সম্পূর্ণতাযুক্ত, বিশুদ্ধ ও অবদাত ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে ভগবান্ রাত্রির মধ্য যামে বুদ্ধালঙ্কার ব্যূহ নামক সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। ভগবান সমাধি মগ্ন হইলে তাঁহার মস্তকের উপরিভাগে তদীয় উষ্ণীষ-বিবর হইতে পূর্ব্ব বুদ্ধদিগের ও তাঁহাদের সঙ্ঘসমূহের বিস্মৃতি ও অজ্ঞানমোচনকারী আলোকরশ্মি † বিনির্গত হইল। সেই আলোকরশ্মিতে দেবভবনসমূহ উজ্জ্বল (অবভাসিত) হইল, এবং তাহাতে মঙ্গল গৃহবাসী মহেশ্বরপ্রমুখ অসংখ্য দেবপুত্র সম্প্রবুদ্ধ হইলেন। এই রশ্মি নির্গত হইয়া গেলে তথাগতের রশ্মিজাল হইতে নিম্নলিখিত চেতনাসঞ্চারক (সঞ্চোদনী) গাথাসমূহ বিনিঃসৃত হইল :—

"* জ্ঞানপ্রভ, অজ্ঞানান্ধকার নাশে প্রভাকর সদৃশ, কল্যাণদায়ী, মঙ্গলজনক ও বিমল তেজঃসম্পন্ন প্রশান্তকায়, শুভশান্তমনাঃ মুনি শাক্যসিংহকে আলিঙ্গন কর। জ্ঞানোদধি, শুদ্ধাত্মা, মহানুভাব, ধর্ম্মের ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, মুনিশ্রেষ্ঠ, দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ নরদেব পূজ্য, ধর্ম্মে স্বয়ম্ভূ স্বরূপ, সংযতাত্মা (বশিনং) শাক্যসিংহের আশ্রয় গ্রহণ কর। যিনি দুর্দ্দম চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি মার পাশ হইতে মুক্তচিত্ত, যিনি চৌরকর্ম্মবিরোধী, সর্পও যাঁহার নিকট অবধ্য, যিনি শান্তি ও মোক্ষে পারগ, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর। অতুলনীয় ধর্ম্মের আলোক সদৃশ, তমোনাশক, সন্মার্গবিৎ, শান্তক্রিয়, অমেয়-বুদ্ধি বুদ্ধের নিকটে সকলে ভক্তিসহকারে আশ্রয় গ্রহণ কর। তিনি বৈদ্যশ্রেষ্ঠ, তিনি ভেষজামৃত-দান করিতে পারেন, তিনি কলহকারীদিগের নিবারণকারী শূর, তিনি দুষ্টগণের দমন করেন, তিনি সদ্ধর্ম্মাবলম্বীর বন্ধু, তিনি পরমার্থ জ্ঞানী এবং তিনিই মুক্তিমার্গ প্রদর্শক।"

তৎপরে সেই পূর্ব্ববুদ্ধদিগের এবং তাঁহাদের সঙ্ঘসমূহের অজ্ঞান ও বিস্মৃতি বিমোচনকারী আলোকরশ্মির স্পর্শে শুদ্ধবাস ও শুদ্ধদেহ দেবপুত্রগণ এই সকল গাথা শ্রবণে প্রবুদ্ধ (সঞ্চোদিত) হইয়া, প্রশান্তভাবে সমাধি হইতে উঠিয়া, ভগবান বুদ্ধের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, স্মৃতির সাহায্যে অসংখ্য পূর্ব্ববুদ্ধগণকে (অন্তর্নয়নের দ্বারা) দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের লীলাভূমি (বুদ্ধক্ষেত্র), তাঁহাদের সদ্গুণাবলী, তাঁহাদের সঙ্ঘ ও অনুচরবর্গ এবং তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ সমূহ, একে একে সকলই ধ্যানযোগে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সেই পূর্ব্ববুদ্ধগণ, বুদ্ধোচিত মহিমা প্রভাবে যাঁহারা ধর্ম্মের অন্তিম কল্প অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও মহিমান্বিত। তারপর রাত্রি গভীর হইলে * ঈশ্বর, মহেশ্বর, নন্দ, সুনন্দ, মহিত, প্রশান্ত, প্রশান্ত বিনীতেশ্বর এবং অন্য বহু শুদ্ধবাস ও শুদ্ধদেহ দেবপুত্র, সমধিক উজ্জ্বল বর্ণে সকলকে অতিক্রম করিয়া যেখানে দ্বৈতবনে (জেত বনে) ভগবান বুদ্ধ ছিলেন সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা সেখানে উপনীত হইলে তাঁহাদের দিব্য জ্যোতিতে সমস্ত দ্বৈতবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; তাঁহারা মস্তক দ্বারা ভগবান বুদ্ধের পাদস্পর্শ পূর্ব্বক তাঁহার বন্দনা করিয়া একান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একান্তে অবস্থিত হইয়া সেই শুদ্ধবাস ও শুদ্ধদেহ দেবপুত্রগণ ভগবানকে এই সকল কথা বলিলেন :—

"ভগবন্! মহা বৈপুল্য † সূত্রের অন্তর্গত ললিত-বিস্তর নামে একখানি ধর্ম্মপর্য্যায়ভুক্ত সূত্র-গ্রন্থ ‡ আছে। তাহাতে বোধিসত্বোচিত সুখের মূল ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তুষিত-স্থিত প্রাসাদ সমূহের গৌরব বর্ণিত হইয়াছে (১) ভগবান্ বুদ্ধের সমাধি,

* মূলে আছে "পদ্ম ইব জলেন"। আমার অর্থ বুঝিলাম "পদ্মনাল জলে থাকিলেও পদ্ম যেমন তদুপরি নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত থাকে তদ্রূপ"। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুবাদ করিয়াছেন—like water on a lotus leaf.

১ মূলে আছে "দম্যসারথি"। ৺রাজেন্দ্রলাল অনুবাদ করিয়াছেন—the all controlling charioteer.

† ৺রাজেন্দ্রলাল বলেন—the word is no doubt another version of তথাগত and the meaning must neccessarily bear a strong similitude to the sense of that word.

২ মানসচক্ষু, ধর্ম্মচক্ষু, প্রজ্ঞানচক্ষু, দিব্যচক্ষু ও বুদ্ধচক্ষু, এই পঞ্চসংখ্যক নেত্র-বিশিষ্ট।

৩ মার—কাম, ক্রোধ, অনিষ্ট ও মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী উপদেবতা; ধর্ম্ম ও বুদ্ধের শত্রু; বৌদ্ধ গ্রন্থে ইঁহার নাম বহু স্থানে আছে।

† মূলে এই অংশ পদ্যে লিখিত। উপজাতি ছন্দঃ।

* রশ্মি শব্দ ললিতবিস্তরের ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ।

* মূলে আছে "রাত্রৌ প্রশান্তায়াং"। রাজেন্দ্রলালের অনুবাদ at the end of that night.

† যে গ্রন্থে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলরূপ অর্থ ও ধর্ম্মের উপদেশ আছে তাহাকে বৈপুল্য গ্রন্থ বলে।

‡ ত্রিপিটকের তৃতীয় পিটক সূত্র।

১ মূলে "তুষিত-বর-ভবন-বিকিরণ" আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের অনুবাদ—discloses the light of Tushita. তুষিত শব্দ স্বর্গ বা Paradiseএর ন্যায় উপভোগ্য স্থানবিশেষের নাম।

লীলাভূমি ও জন্মভূমি (২) এবং জন্মভূমির আভিজাত্য প্রভাব বিবৃত হইয়াছে (৩)। ইহাতে তাঁহার বাল্য-লীলা মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার লৌকিক কার্য্যকলাপ, শিক্ষাস্থান, কর্ম্মস্থান, লিপি-শিক্ষা, সংখ্যা ও মুদ্রাগণনা শিক্ষা, (৪) অসি-চালনা-শিক্ষা, ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা, যুদ্ধ ও ব্যায়ামাদিতে পার-দর্শিতা বিশিষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে এবং তাঁহার দাম্পত্যপ্রণয় ও বিষয়োপভোগ বর্ণিত হইয়াছে। যিনি বোধিসত্ত্বোচিত সমাধির চরম ফল প্রাপ্তির (৫) বিষয় প্রচার করিয়াছেন, সেই বোধিসত্ত্বোচিত বিক্রমসম্পন্ন, সর্ব্ব মার-মণ্ডল-বিধ্বংসী ভগবান তথাগতের (৬) চরিত্র কীর্ত্তন সেই গ্রন্থে আছে।

২। মূলে 'গর্ভস্থান' আছে।

৩। মূলে আছে "অভিজাতজন্মভূমিপ্রভাবসন্দর্শনঃ"। ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের অনুবাদ—(discloses) the greatness of the birth place of Buddha.

৪। মূলে 'লিপি-সংখ্যা-মুদ্রা-গণনা' আছে। রাজেন্দ্রলালের অনুবাদ—in writing, arithmetic & numeration,

৫। মূলে 'সর্ব্ববোধিসত্ত্বচরিতনিষ্পন্দনিষ্পত্তিফলাধিগমপরিকীর্ত্তনঃ'।

অনুবাদ—recites the method of acquiring the final and immutable reward of all Bodhisattwa discipline.

৬। তথাগত—বুদ্ধদেবের উপাধি বিশেষ। এইটী বুদ্ধদেবের সবিশেষ গৌরবাবহ উপাধি।

History of the Primitive Aryans of Central Asia and the Earliest Indo-Aryans based chiefly on the Puranas especially the Vishnu Purana.*

(BY THE LATE RAJNARAIN BOSE)

INTRODUCTION.

Many are of opinion that the Puranas of the Hindus do not contain history, but that they are only repositories of fables, legends and allegories. But if we carefully study them marking the words used, we cannot but observe that, in many places, they use what may be called strict historical language. If they be rejected as the basis of history, the early accounts of Rome speaking of Romulus and Remus, being nursed by a wolf can merit the same treatment. If the substratum of the Puranas be not reckoned history, no history except very few modern histories can be reckoned as history. Lord Byron calls history "that grand liar history." Every one knows the story of Sir Walter Raleigh and the quarrel that happened in another room of his prison-house than that in which he was confined when he was writing his "History of the World.

Eastern nations are very careful in preserving genealogies. When we read genealogies in the Puranas, we have no reason to distrust them altogether though inaccuracies might have crept into them here and there, such as, for instance, those marked on the genealogies given in the New Testament. When we find in the Puranas accounts of the persons whose genealogies are given, why shall we not believe in them as we do in the genealogies themselves and conclude that the substratum of the narrative is true though thickly covered with, and concealed by fable and allegory as a tree is concealed by a thick profusion of creepers twining themselves round it. In many places we can bring out the truth, divesting it of the garb of allegory and exaggerated language. The Puranists had a separate language for writing history different from the language of modern historians especially European historians. If a Puranist had lived now, he would have described the conquest of India by the English somewhat in this way :

---

* ভক্তিভাজন ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে আমার নিকট এই ইংরাজী প্রবন্ধ রাখিয়াছিলেন। তারপর তিনি পরলোক গমন করিলেন এবং নানা কারণে আমিও উহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। এখন তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছি বটে, কিন্তু বড়ই আশঙ্কা হয় যে ইহার প্রতি সুবিচার করিতে পারিব না—না জানি ইহাতে কত ভুলভ্রান্তি থাকিয়া যাইবে। তবু তিনি কি ভাবে পুরাণ হইতে ইতিহাস সঙ্কলন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা জানিলে ভারতের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদিগের উপকারে আসিতে পারে, এই ভরসায় প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

'About this period several Rakshashas came from the West to the Kalyavana Emperor that sat on the throne of Indra-prastha (Delhi). The Rakshashas can put on many guises and are proficient in wiles and machinations. They came at first in the humble guise of merchants and implored for a plot of land on which to erect a factory. As the bards sing : "He entereth in the shape of a needle but cometh out as large as a ploughshare." From a factory the possessions of the Rakshashas gradually swelled into an empire. The Rakshashas had an invisible magical engine which they obtained as a boon from Siva concealed within their heads. This they brought out thence when necessary and by means of it they conquered Bharatbarsa more than by their sword.'

The imaginary Puranist, alluded to above, would have been justified in terming the Western foreigners as Rakshashas, seeing their craving for what, in his opinion was half-cooked flesh. Kalayavana or the dreadful Yavana would have meant the Mogul Emperor of Delhi and the magical invisible engine astute diplomacy by means of which the English conquered India more than by their sword.

We have ventured to make an attempt in the following pages to extract the earliest Aryan history from the Puranas. How far we have succeeded in our attempt the reader will decide. We have made the Vishnu, Purana the principal basis of our attempt supplying its omissions by facts stated in other Puranas and in the Itihases and in other Hindu books besides the Puranas and Itihases but never tampering with the statement of the Vishun Purana except when clearly proved to be inaccurate by a consensus of statements in other Puranas and not simply by the statemant of one of them. Unless we adopt one Purana as of greater reliable authority than any other, we will be tossed about on an occean of doubt and uncertainty. The Vishnu Purana being more ancient than any other, marking its language, we have made it the basis of our history.

The reader, while reading these pages, will mark that human beings are named after the deities whom the primitive Aryans, the followers of the religion of the Rigveda, when not yet embodied in slokas, as was the case after their emigration to India, worshipped, as is still the custom among their descendents in India. Really existing human beings were named Diti and Aditi after the deities, Diti and Aditi, whom the primitive Aryans worshipped and to whom hymns are addressed in the Rigveda.

The Vishnu Purana, while giving the genealogy from Manu Swayambhu, indulges in what seems to be allegorical language in the names given to men and women. It mentions some moral qualities as the sons or daughters of men. But the reader should consider that it is still the custom among Hindus to name their sons and daughters after moral qualities such as Lajja (modesty) Santi (Peace) Siddhi (success) Kirti or glorious act, Prema (Love), Kshema (Forgiveness) &c. &c. It is not improbable that the imagination of parents taking fire at the first putting of names after moral qualities to their sons, would go on to put allegorical names to the offspring of them again in consistency with the first allegory. *(To be continued)*

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

আড়ানা-বাহার—আড়াঠেকা।

এ দিন তো রবে না।
জীবন জীবনবিম্ব জানিয়া কি জান না।
দারা সুত বন্ধুজন, হয় একত্র মিলন,
বিচ্ছেদ হলে তখন, কোথায় যাবে বল না।
মায়ার্ণব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে,
শান্তি ধৈর্য্য যুক্ত হয়ে, কর ব্রহ্মের সাধনা।

কথা—রাজা রামমোহন রায়। স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন।

৩ ১´ ২ ০
মা II { পা -র্সা র্সর্রা র্সা I সা -া -ণা -পা। -ণা -া পা -া। (-মা -া -া মা)}।
এ দি ন্ তো র বে • • • • • না • • • • এ

০ ৩ ১ ২
। -মা -া -া মা। মা মা মা -া I ণা ণা -পা -মা। -রা -মা পা ণা।
• • • জী ব ন জী • ব ন • • • • বি ম্ব

০ ৩ ১´ ২
। -মা -া -া পা। র্সনা র্সা র্রা -া I র্রা -া -র্সাঃ -নঃ। র্রা -র্সর্রা র্সা -া।
• • • জা নি• য়া কি • জা • • • ন • না •

০
। -মা -া -া মা II
• • • "এ"

৩ ১´ ২ ০
মা II { পা না -া না I র্সা র্সা -া -া। না র্সা র্সা র্সা। -া -া -া র্সা।
(১)দা রা সু • ত ব ন্ধু • • • • জ ন • • • হ
(২)মা য়া র্ণ • ব উ ত্ত • • • • রি য়ে • • • কা

৩ ১´ ২ ০
। র্সনা র্সা র্রা -া I র্সা -া -না না। র্সনা র্রর্রা র্সা -া। (-ণা -ধা -ণপা মা)}।
(১)য়• এ ক • • • • ত্র মি• ল• ন • • • • দা
(২)মা• দি কে • • • • বি না• শি• য়ে • • • • মা

০ ৩ ১´ ২
। -ণা -ধা -া ধা। ধা ধা -া ণা I র্সা র্মা -া র্জা। -র্মা -র্মা র্রা -র্জ।
(১) • • • বি চ্ছে দ • হ লে ত • • • • খ •
(২) • • • শা ন্তি ধৈ • র্য্য যু ক্ত • • • • হ •

০ ৩ ১´ ২
। র্সা -া -া র্সনা। র্সা র্রা র্সা -র্স I না র্সা -াঃ -নঃ। র্রা -র্সর্রা র্সা -া।
(১)ন • • কো• থা য় যা • বে, ব • • ল • না •
(২)য়ে • • ক• র ব্র হ্মে • র সা • • ধ • না •

০
। -মা -া -া মা II II
(১) • • • "এ"
(২) • • • "এ"

গ্রন্থ-পরিচয়।

নাটক ও নাটকের অভিনয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ। ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক শ্রীঅবনীনাথ ভট্টাচার্য্য। ১০৬।৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,—কলিকাতা। মূল্য ॥০ আট আনা।

পূর্ব্বে এক সময় ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। সেই সময় তাঁহার লিখিত এই প্রবন্ধগুলি তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীঅবনীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেগুলি পুনর্মুদ্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধকয়টী প্রধানতঃ নাটকীয় সমালোচন-বিষয়ক। যদিও এগুলি বহুদিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল—যদিও তাহার পর বাঙ্গালা ভাষা উন্নতির পথে অনেকদূর দ্রুত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলেও বড় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বর্ত্তমানকালে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুচিন্তিত সমালোচন প্রবন্ধ কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এ জাতীয় কাব্যসমালোচনা পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি প্রাচীন মাসিক পত্রে এইরূপ সমালোচনা সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। সেই অবধি বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য-সমালোচনার এই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তখনকার সেই অল্প সংখ্যক সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন বর্ত্তমানকালে তাহা নিতান্তই দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। নাটকসমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখক সাধারণভাবে স্থানে স্থানে সরল ভাষায় আলঙ্কারিক বিচার করিয়াছেন; সেগুলি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে নাটকের যথার্থ প্রকৃতির সহিত পাঠকগণ পরিচিত হইতে পারিবেন এরূপ আশা আমরা করি।

আমাদের কিন্তু একটী কথা বলিবার আছে। লেখক প্রধানতঃ ৺দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী নাটক অবলম্বনে নাটকের প্রকৃতি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে পারি না। তিনি ৺দীনবন্ধু মিত্র এবং অপরাপর নাটককারদিগেরও দুই চারিটী নাটক অবলম্বন করিলেই তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য লাভ করিতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থের "সধবার একাদশী ও তাহার বিশ্লেষণ" এইরূপ কোন নাম প্রদান করিলে অধিকতর সঙ্গত হইত।

পাশ্চাত্যধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা। শ্রীসুকুমার হালদার প্রণীত। ৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট,—কলিকাতা কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য লিখিত হয় নাই।

লেখক নানা প্রকার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এবং বিবিধ যুক্তিতর্ক দ্বারা নির্ণয় করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা পাশ্চাত্য খৃষ্টানধর্ম্মের নিকট একটুও ঋণী নহে, বরং চিরকাল শত্রুতাই লাভ করিয়া আসিয়াছে। লেখক আশঙ্কা করিয়াছেন যে, এখনও আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ পাদ্রীদিগের কথার মোহে ভুলিয়া কখন কখন খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ফেলেন। এইজন্য ইনি ইহার অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতা এবং হিন্দুধর্ম্মের তুলনায় ইহার অনুদারতা স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। গ্রন্থটী এককথায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিধ্বংসী (destructive) সমালোচনা বলিলেও চলে। বর্ত্তমানে এরূপ গ্রন্থ খৃষ্টধর্ম্ম-বিরোধীদের হস্তে reference book হিসাবে যথেষ্ট উপকারে আসিবে। কিন্তু আমরা সুবিজ্ঞ লেখকের হস্তে বিভিন্ন ধর্ম্মবিষয়ক constructive সমালোচনা দেখিতে চাহি।

বল্লাল-সেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। ১৪ নং মদন বড়াল লেন,—কলিকাতা। লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২১ নং বেণেপুকুর রোড হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা একখানি ঐতিহাসিক নাটক। সুপ্রসিদ্ধ সেন বংশের রাজা বল্লাল সেনের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। লেখক বলিয়াছেন যে, তিনি প্রসিদ্ধ আনন্দ-ভট্টের "বল্লাল-চরিত" অবলম্বনে এই "বল্লাল-সেন" নাটক রচনা করিয়াছেন। তাহা হইলেও আমরা ইহার নাটকত্ব বিষয়ে বিশেষ প্রশংসার কিছুই দেখিলাম না। নাটকের যাহা প্রাণ—সেই ঘটনার পর ঘটনাকে কৌতুহলোদ্দীপক করিয়া তুলিবার ক্ষমতা গ্রন্থে পরিস্ফুট হয় নাই।

বিংশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৯১

৯৩১ সংখ্যা ১৮৪২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসমাজ ও সামঞ্জস্য।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবদ্গীতায় আছে "সমত্বং যোগ উচ্যতে" অর্থাৎ সামঞ্জস্যই যোগ নামে উক্ত হয়। এই যোগ বা সামঞ্জস্যের উপরেই জগতের মঙ্গল নির্ভর করে। সামঞ্জস্যই প্রকৃতির নিয়ম; সামঞ্জস্যের অভাবই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই জলাশয় হইতে এক ঘটী জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের সমস্ত জল শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসে। সামঞ্জস্যই প্রকৃতির অনুগত নিয়ম বলিয়া প্রকৃতিতে কোন শক্তিই বিনষ্ট হয় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র।

জড়-জগতে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ, এই দুইটী শক্তি অবিশ্রামে কার্য্য করিয়া জগতের সকল বস্তুকে, সকল শক্তিকে যথাযথ ক্ষেত্রে পরিচালিত করিতেছে। মনোজগতে সেইরূপ রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা, এই দুই শক্তি অবিচলিতভাবে কার্য্য করিয়া জগতের মনোরাজ্যকে সামঞ্জস্যের ফলে, প্রকৃত মঙ্গলের পথে লইয়া চলিয়াছে।

জড়-জগতের কেন্দ্রানুগ শক্তি যেমন সমস্ত বস্তুকেই একই বিন্দুর অভিমুখীন করিয়া টানিয়া রাখিতে চাহে, সেইরূপ মানসিক জগতে রক্ষণশীলতা মানবের সমস্ত চিন্তা ও সমস্ত শক্তিকে একই ভাবকেন্দ্রের অভিমুখে দাঁড় করাইয়া রাখিতে চাহে। রক্ষণশীলতাই মানুষকে প্রাচীনপক্ষপাতী করিয়া রাখে। ইহারই কারণে সাধারণ মানব পুরাতন কোন কিছুরই কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখিলেই অস্থিরতা প্রকাশ করে—পরিবর্ত্তনের ভাল-মন্দ বিচার করিতে চাহে না। রক্ষণশীলতার কারণেই মন্দ অভ্যাসও কালক্রমে চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় হইয়া উঠিলে তাহার কুফলভোগীরাও সেই অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিবার বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। এই রক্ষণশীলতা অবশ্য ভগবানের সৃষ্টিরক্ষার এক অপূর্ব্ব কৌশল। ইহার অভাবে সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইত। মনুষ্যসমাজে এই নিয়ম কার্য্য করিতে বিরত থাকিলে মানবের সমাজরক্ষণ সামাজিক উন্নতি প্রভৃতির কোনই সম্ভাবনা থাকিত না, প্রত্যুত মানবের অস্তিত্বই দেখিতাম কি না সন্দেহ। রক্ষণশীলতাই জীবদিগের জীবনরক্ষার এক প্রধান সহায়। ইহারই কারণে আমাদের জীবনের প্রতি এত মায়ামমতা এবং মৃত্যুর প্রতি এত গুরুতর ভয়। কিন্তু এই রক্ষণশীলতার একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলেই মনুষ্য নির্জ্জীব জড়পদার্থে পরিণত হয় বলিলেও চলে। এই প্রকার নির্জ্জীব মানব মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়া প্রকৃত কেন্দ্রভূমিতে পৌঁছিতে পারে না—পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জীবন্মৃত্যু লাভ করে। সে নিজের মঙ্গলামঙ্গল স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারে না, নিজের উন্নতি কিসে হয় জানে না,

কেবল অপর পাঁচজনের মুখাপেক্ষা করিয়া সুখে দেহযাত্রা নিষ্পন্ন করিতে পারিলেই কৃতার্থ হয়। এই সকল অতি-রক্ষণশীল ব্যক্তি মানব নামের অনুপযুক্ত সামাজিক জীবমাত্র। সামাজিক পরাধীনতাই হইল রক্ষণশীলতার মূলপ্রাণ। অতিরিক্ত সামাজিক পরাধীনতার ফলের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এই ভারতবর্ষ। যে স্বাধীনতার বলে প্রাচীন ভারত উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই ভারতবর্ষ আজ সেই স্বাধীনতা হারাইয়া শত শত বৎসর ধরিয়া পরাধীনতার পরিপোষক অন্যায় পৌরোহিত্য প্রভৃতির পেষণ-যন্ত্রের নিম্নে পড়িয়া মৃতপ্রায় নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। বহিঃশত্রুর নিকট আমাদের পরাজয় ও দাসত্বশৃঙ্খল আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরাধীনতারই বহির্লক্ষণ মাত্র।

রক্ষণশীলতার বিপরীত হইল উন্নতিশীলতা। উন্নতিশীলতা আমাদের সমস্ত চিন্তা ও শক্তিকে বহির্মুখে টানিয়া আনিয়া আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রকে সুপ্রশস্ত করিয়া দিতে চাহে। স্বাধীনতা বা আত্মনির্ভরই হইল উন্নতিশীলতার মূল প্রাণ। উন্নতিশীল ব্যক্তি অপর পাঁচজনের কথার উপর নির্ভর না করিয়া নিজের উপর নির্ভর করত নিত্য নূতন বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয়। সেই কারণে প্রাচীনের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা নবীনের প্রতি আসক্তিই তাঁহাকে বেশী অধিকার করিয়া রাখে। আত্মনির্ভরশীল বলিয়া সে সামাজিকতার বড় একটা অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু রক্ষণশীলতার ন্যায় উন্নতিশীলতারও একটা সীমা আছে। সেই সীমার বাহিরে গেলেই স্বেচ্ছাচার আসিয়া পড়ে। অতিরিক্ত সামাজিকতা বা রক্ষণশীলতায় যেমন দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়, অতিরিক্ত উন্নতিশীলতায় সেইরূপ স্বেচ্ছাচার আসে। সীমার ভিতরে আত্মনির্ভরের ভাব হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বল প্রদান করে এবং এই বলপ্রভাবেই উপনিষদকার ঋষিরা ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অতিরিক্ত উন্নতিশীলতার ফলের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ফরাসিবিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সের অবস্থা। সেই এক কাল, যখন ফ্রান্সের অধিবাসীগণ সামাজিকতার বাঁধ সম্পূর্ণ তিরোহিত করিয়া একেবারেই উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিবার অভিলাষ করিয়াছিল। ফলে দাঁড়াইল অশ্রুতপূর্ব্ব স্বেচ্ছাচার। ভগবানের রাজ্যে সেরূপ ভীষণ স্বেচ্ছাচার চিরস্থায়ী হইতে পারে না। এই স্বেচ্ছাচারের প্রতিবিধানের সূত্র ধরিয়া রক্ষণশীলতা আসিয়া সামঞ্জস্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। স্বেচ্ছাচারী ফ্রান্স বলিল "ধর্ম্ম চাহি না"; কিন্তু সেই ধর্ম্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে ফ্রান্স স্বেচ্ছাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া আবার উন্নতির পথে মঙ্গলের পথে দৌড়িতে পারিল।

রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার সামঞ্জস্যপথই প্রকৃত উন্নতির পথ, প্রকৃত মঙ্গলের পথ। উপযুক্ত কাল ও ক্ষেত্র বুঝিয়া যিনি এই পথ দেখাইতে পারেন, তিনিই জগতের প্রকৃত উপকারক। যাহারা রক্ষণশীলতার মোহে পড়িয়া আত্মার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া বিলাসমোহে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকে, অথবা যাহারা উন্নতিশীলতার দোহাই দিয়া স্বেচ্ছাচারকে বন্ধুবোধে আলিঙ্গন করে, তাহাদের কেহই এই সামঞ্জস্যপথের নেতৃত্বলাভে সক্ষম হয় না। যে সকল মহাপুরুষ রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা, উভয়কেই আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, উভয়েরই মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই এই সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম এবং ইহাতেই তাঁহাদের মহাপুরুষত্ব। তাঁহারা নিজের সুখকে গণনার মধ্যে আনেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে পরের মুখাপেক্ষা করিয়াও থাকিতে হয় না, প্রতি কথায় সামাজিকতার নিকট অবনতমস্তক হইয়া চলিতে হয় না। তাঁহারা পুরাতন প্রাচীন প্রথা প্রভৃতির মধ্যে ভালটুকু বজায় রাখিয়া নূতন যাহা কিছু ভাল, তাহাও বিচারপূর্ব্বক অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। তাঁহারা যেমন একদিকে রক্ষণশীল, অপরদিকে তাঁহারা সেইরূপ আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীনতার মূর্ত্তিমান অবতার।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে, বিশেষত বঙ্গদেশে, এদেশবাসীর সহিত পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকদিগের সংঘর্ষণজনিত ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে উন্নতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার মধ্যে ঘোরতর

বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এক সম্প্রদায়—সংখ্যাতে এই সম্প্রদায়েরই লোক বেশী—ভাল বা মন্দ সর্ব্বপ্রকার আচারব্যবহার অটুট রাখিতে বদ্ধপরিকর; অপর সম্প্রদায় প্রাচীন আচারব্যবহার—ভাল বা মন্দ—সমূলে উৎপাটন করিয়া বিধ্বংসিতার অবতাররূপে নিজেদের উন্নতিশীল নাম সার্থক করিতে উদ্যত। এই বিষম বিরোধের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় পরব্রহ্মকে কেন্দ্রে রাখিয়া এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যের পথ আবিষ্কার করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথে প্রচলিত প্রাচীন আচারব্যবহার রীতিনীতি এবং সর্ব্বোপরি ভারতসেবিত আদিম ও সনাতন ধর্ম্মের যেমন স্বচ্ছন্দ সমাবেশ হইল, সেইরূপ পাশ্চাত্যদিগের আনীত যাহা কিছু ভাল, নূতন সভ্যতা, নূতন রীতিনীতি প্রভৃতির যাহা কিছু গ্রহণের যোগ্য, সে সমুদয়েরও সমাবেশ হইবার কোনই বাধা ঘটিল না। এই সামঞ্জস্যই হইল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের মূলপ্রাণ। এই সামঞ্জস্যের পথ দেখাইবার কারণেই আমরা রাজা রামমোহন রায়কে একজন মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করি।

সামঞ্জস্যের পথ রাজা রামমোহন রায় খুব স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে স্বতই প্রকাশমান হইতে পারিয়াছিল। পাশ্চাত্য ভূখণ্ড যে কারণেই হউক, সেখানে সভ্যতার সূচনা অবধি পার্থিব বিষয় লইয়াই উন্মত্ত, তাই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম আবিষ্কার করিবার অনেক সুন্দর অবসর হারাইয়া ফেলিয়াছে। এক সময়ে রোম নগরে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন-আচারী, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র লোক বাস করিতে লাগিল। অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম আবিষ্কারের তেমন শুভ অবসর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে কখনও ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না এবং আর কখনও ঘটিবে কি না জানি না। কিন্তু রোমক নেতাগণ সেই শুভ অবসর হেলায় হারাইয়া অসাম্প্রদায়িক আইনকানুন আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু ভারতভূমি পুণ্যভূমি ধর্ম্মক্ষেত্র। এখানে শতসহস্র যুগযুগান্তর ধরিয়া ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া সকল কর্ম্ম করিবার শিক্ষা দিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তাই খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে যখন এই বঙ্গদেশে বিভিন্ন পাশ্চাত্যরাজ্যের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগের সহিত এদেশের মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকদিগের ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল, তখনই তো অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, সকল মানবের অন্তরস্থিত সাধারণ ধর্ম্ম, তাহাই আবিষ্কার করিবার উপযুক্ত অবসর বলিয়া গৃহীত হইল। এই অবসর হারাইলে ভারতের লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিত না। কিন্তু এই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম আবিষ্কার করিবার উপযুক্ত পাত্র তিনি, যিনি রক্ষণশীল হউক বা উন্নতিশীল হউক, সকলপ্রকার সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছেন। ইংরাজ, মুসলমান ও হিন্দু প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্ব্বশ্রেণীর সাধু ও বিদ্বান ব্যক্তিগণের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিলিত হইবার ফলে এবং তিব্বত প্রভৃতি দেশে ভ্রমণের ফলে রাজা রামমোহন রায় আপনাকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসমূহের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত রাখিতে পারিবার কারণেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহারই ভিতর দিয়া স্বীয় স্বপ্রকাশ অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম ভারতে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়া সনাতন ভারতভূমিকে অবনতির মুখ হইতে রক্ষা করিলেন। অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম প্রচার হইবার ফলে ভারতে কি সাহিত্যে, কি আচারে ব্যবহারে, কি আহারে বিহারে সকল বিষয়কেই অসাম্প্রদায়িক মুক্তভাব স্পর্শ করিয়াছে। ভারতবাসীগণ আজ সেই মুক্তভাবের স্পর্শের ফলে মুক্তির আশাবাণী লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে।

ধূমপানের অপকারিতা।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

(স্বাস্থ্যসমাচার হইতে উদ্ধৃত)

মদ্যের ন্যায় গঞ্জিকা চরসাদির ধূমপানেও এদেশের সহস্র সহস্র লোক বহুকাল হইতে বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত। কি নগরে কি পল্লীতে সর্ব্বত্রই ধূমপায়ীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাও যে দেশ উৎসন্নের দিকে ধাবিত হওয়ার একটা কারণ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ

নাই। ধূমপান নিবারণার্থ বিশেষরূপে চেষ্টিত হওয়া দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য; নতুবা দেশোন্নতিকর অন্যবিধ সকল কর্ম্মে আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও, দেশের দুরবস্থা সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

মদ্য-পায়ীদের :মত গঞ্জিকা চণ্ডুসেবিগণও রোগ-দৈন্যের হস্ত হইতে কখনও নিস্তার পায় না। এমন লোক আছে, যাহারা সকল প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনেই বিশেষ পটু। আবার কেহ কেহ যখন সুরা-দেবীর অর্চ্চনায় অহরহঃ ইচ্ছানুরূপ অর্থব্যয় করিতে করিতে, অভাব পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা অল্প পয়সায় নেশা গঞ্জিকাদি সেবনে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই গঞ্জিকা-চরসাদি সেবীর সংখ্যাই অধিক বটে; কিন্তু এইরূপ নেশার বশবর্ত্তী উচ্চ :শ্রেণীর লোকও কম দেখা যায় না। ধূমপানার্থ কত লোক যে কত অর্থ অপব্যয় করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধূমপায়ীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভগ্নস্বাস্থ্য। যাহারা অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই এইরূপে বিনষ্ট করে, তাহারা সদাসর্ব্বদাই অশেষ কষ্টে কালাত্যয় করিয়া থাকে।

গঞ্জিকা—এদেশে গাজার প্রচলন ক্রমশঃই যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে বাস্তবিকই আতঙ্কিত হইতে হয়। ইহা তামাকের ন্যায় সস্তা দরে বিক্রীত হইলে বুঝি গাঁজাখোরদের আহ্লাদের সীমা থাকিত না, কারণ, অতি সহজেই ও সত্বর তাহাদের দলপুষ্টি হইত। পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে প্রতিনিয়ত কত লোক যে গাঁজার আড্ডায় মিশিয়া গাঁজার নেশায় মশগুল থাকিত ও দিন দিন আরও কত লোককে এই পথের পথিক করিত, তাহা কে বলিতে পারে? চড়া দরে বিক্রীত হওয়াতেও, গাঁজাখোরের অভাব নাই; সস্তা হইলে ইহা দ্বারা না জানি কতই অনর্থ সংঘটিত হইত। সুলেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিয়াছেন, গাঁজা ও অহিফেনের ব্যবহারও দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না; বিশেষতঃ এ বিষয়ে বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে প্রতি-যোগিতায় পরাজিত করিয়াছে; বৎসর বৎসর আবগারী বিভাগের আয় দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা যে দেশের পক্ষে কিরূপ অশুভকর তাহা দেশহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবৃন্দ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

যাহারা গঞ্জিকা সেবনে বিশেষ পটু তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই হাঁপানি, রক্তামাশায় প্রভৃতি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া অশেষ কষ্টে কাল যাপন করিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও অনেকে পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। যাহা সেবনে কোনও লাভ নাই, কেন যে তাহাতে লোকের অত্যাসক্তি জন্মে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ তাহা বলিতে পারেন।

আজকাল এমন গ্রাম দেখা যায় না, যেখানে দুই একটা গাঁজার আড্ডা না আছে। এরূপ শুনা যায় যে, কোন কোন আড্ডায় গাঁজাখোরগণ সারারাত্রি বিকট চীৎকারে তান-লয়হীন অশ্রাব্য সঙ্গীতে নিরীহ পল্লীবাসীদের নিদ্রার ব্যাঘাত ও অন্যবিধ অসুবিধা জন্মাইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইদানীং কোন কোন ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট ব্যাপারেও গঞ্জিকা স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। অধিকাংশ ভণ্ড সন্ন্যাসী গাঁজায় বিভোর হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই জানেন, কিন্তু হরি-সংকীর্ত্তন কালেও যে গায়কদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই তামাক ও কেহ কেহ গঞ্জিকা সেবন করিয়া বক-ধার্ম্মিকের পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই বিদিত ন'ন। গান হইতে থাকে, ঘন ঘন তামাক ও মাঝে মাঝে গাঁজা গায়ক ও শ্রোতাদের তৃপ্তি সাধন করিতে থাকে,-গানের আসর তামাক গাঁজার দুর্গন্ধময় ধূমে ভরিয়া যায়। যিনি এই-রূপ বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছেন, তিনিই মনঃকষ্ট পাই-য়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আজ-কাল নিরীহ গ্রামবাসীগণ হরিলুট দিতে ইচ্ছা করিয়া গাঁজাখোরদিগকে গাঁজা দিতে না চাহিলে, তাহাদের পক্ষে উক্ত কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করা অসাধ্য হইয়া থাকে। ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

একবার ধামরাই ৺মাধবের আঙ্গিনায় সুগায়ক ও সদুপদেষ্টা শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় কীর্ত্তন গান করেন। সেই সময় দুইটী ভদ্রলোকের হুঁকায় তাম্রকুট সেবন ও অনেক বালকের চুরুটের ধূমপান সন্দর্শনে তিনি বড়ই দুঃখ প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহারা লজ্জায় অধোমুখ হন এবং গান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সকলেই ধূমপানে বিরত থাকেন। সেই সময়ে যদি তিনি কাহাকেও গঞ্জিকা সেবনে প্রবৃত্ত দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে না জানি কতই মর্ম্মাহত হইতেন। এইরূপ সৎপ্রকৃতির লোক নগরে পল্লীতে বিদ্যমান থাকিলে, সম্ভবতঃ লোকের এই কুপ্রবৃত্তি অনেকাংশে লোপ পাইত।

গাঁজায় একবার আসক্তি জন্মিলে, উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর সম্ভাবনা থাকে না। গাঁজাখোর-গণ যদি সময়মত গাঁজা না পায়, তবে তাহারা হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। একদা আমার স্বর্গীয় পিতামহ মহাশয় কোনও কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাদের জমিদার বাটী রওনা হইয়াছিলেন, তাঁহার

মোট-বাহক ছিল, ভাল লোক অভাবে, এক গাঁজা-খোর। উহার সঙ্গে সর্ত্ত ছিল, চাহিবামাত্রই গাঁজা দিতে হইবে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে এক মেঠো পথে লোকটী হঠাৎ গাঁজা চাহিয়া বসে এবং তৎক্ষণাৎ উহা না পাইয়া পথের উপরেই শুইয়া পড়ে। তখন লোকটীকে লইয়া তিনি মহা মুস্কিলে পড়িলেন। ঠিক সেই সময়ে একটী বলিষ্ঠা স্ত্রীলোক গোময় সংগ্রহার্থ তথায় উপস্থিত হন। ঘটনা অবগত হওতঃ নানা কৌশলে লোকটীকে তাঁহার সঙ্গে পথ চলিতে বাধ্য করেন। গ্রাম্য বাজারে উপস্থিত হইয়া লোকটী তাঁহার নিকট হইতে গাঁজার দাম আদায় করে ও সন্নিহিত দোকান হইতে তাহা ক্রয় করিয়া পূর্ণ মাত্রায় এক ছিলিম খাইয়া হৃষ্ট চিত্তে তাঁহার সঙ্গে হাঁটিতে থাকে।

গঞ্জিকাসেবিগণ স্বাস্থ্যসুখ উপভোগে ত বঞ্চিত থাকেই, সাংসারিক অবনতি লক্ষ্য করিলেও কিছুতেই উহার প্রতিবিধান করিতে পারে না। চালার খড়, পরিধানের বস্ত্র এবং সবচেয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় খাইবার চাউল-ডাইলের সংগ্রহ করাও এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। ইহারা নিজেদের কিংবা পরিবারের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত ততটা চিন্তিত হয় না, যতটা গঞ্জিকার জন্য হইয়া থাকে।

সিদ্ধি—গঞ্জিকাসেবিগণ যখন গাঁজা না পায় তখন সিদ্ধিপাতার (ভাঙ্গের) ধূমপান করিয়া থাকে। ইহার নেশা আরও উৎকট। ইহাতে অল্পদিনেই শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

চণ্ডু-চরস—কোন কোন অঞ্চলে চণ্ডু-চরসের রীতিমত প্রচলন আছে। যাহারা এরূপ বদ নেশার বশবর্ত্তী হইয়াছে, তাহারা একেবারে মনুষ্যত্ব-হীন হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকা ইহাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। তবে দেশে গাঁজাখোরের তুলনায় চণ্ডু-চরসসেবীর সংখ্যা কম। কিন্তু তাই বলিয়া এবিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন বাঞ্ছনীয় নহে। এই পাপ যাহাতে দেশ হইতে চিরকালের নিমিত্ত বিদূরিত হয়, তাহা করা দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিবৃন্দের একান্ত কর্ত্তব্য।

তামাক—এদেশে সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের মধ্যে তামাকের প্রচলন খুব বেশী। তামাকের এমনি আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে, যাহারা মদ গাঁজা ইত্যাদির বশীভূত, তাহার ত ইহার অনাদর কখনই করে না, যাহারা—অন্য কোন নেশার আসক্ত নয়, তাহাদের মধ্যেও অনেকে ইহার পরম ভক্ত। ইহা মদ, গাঁজা প্রভৃতির ন্যায় অনিষ্টকর না হইলেও, তিল তিল করিয়া মানব দেহে বিষক্রিয়া করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, হুঁকায় নলে (নলচায়) যেরূপ ময়লা জমিয়া থাকে, তাম্রকূট-সেবীর গলনালীতেও তদ্রূপ ময়লা সঞ্চিত হয়। কথাটি কত দূর সত্য বিশেষজ্ঞগণ তাহা বলিতে পারেন।

বহুকাল হইতেই এদেশবাসী অতিথি-অভ্যাগত-দিগকে তামাক দেওয়া আদর-আপ্যায়নের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যাঁহার বাড়ীতে কেহই তামাক খায় না, তাঁহাকেও ভদ্রতার খাতিরে উহার সরঞ্জাম রাখিতেই হয়। কিন্তু তামাক খায় না এরূপ লোকের সংখ্যা এদেশে খুব কম।

অধিকাংশ তাম্রকূটসেবীকে এক হিসাবে উচ্ছিষ্ট-ভোজনকারী বলা যায়। বিশেষতঃ এক হুঁকায় ও এক চুরুটে বহুলোক ধূম পান করিলে একের মুখের লালা প্রভৃতি অন্যের মুখে সংক্রামিত হইয়া বহু রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। অতএব এ প্রথা বিশেষ অনিষ্ট-জনক। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ম্মা মহাশয়ও ঠিক্ এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন—"এক হুঁকায় ও এক চুরুটে বহু লোক ধূমপান করিয়া থাকেন,—ইহাতে যে কত রোগ সংক্রামিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তাই নাই। যথা, কাহারও হয় ত মুখে নানা প্রকার ঘা ও দাঁতে (gum) ব্যায়রাম আছে,—তাহাদের হুঁকায় তামাক খাইলে ঐ সমস্ত সাংঘাতিক ব্যায়রাম সংক্রামিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।" (স্বাস্থ্যসমাচার কার্ত্তিক ১৩২৬ সন) একথা বর্ণে বর্ণে সত্য হইলেও, ইহার বিলোপসাধন অতিশয় কঠিন। সমাজের নেতাগণ এ বিষয়ে মনো-যোগী হইলে সুফল প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে ছাত্রদের মধ্যে তামাক-খোর কদাচিৎ দৃষ্ট হইত। আজ কাল তাহাদের মধ্যেও অনেকে গোপনে, কেহ কেহ প্রকাশ্যে, এবং কৃষকদের কচি কচি ছেলেরাও সর্ব্বসমক্ষেই নিঃসঙ্কোচে ধূমপান করিয়া থাকে। ভদ্র যুবক সম্প্রদায় বয়োবৃদ্ধগণের সমক্ষে ধূমপান করা লজ্জা-জনক বিবেচনা করে বলিয়া কিংবা অন্য কোন কারণে, সিগারেট্ বিড়ির প্রতি বিশেষ রূপে আসক্ত। শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ বসু B. Sc. মহাশয় লিখিয়াছেন—"...... It (cigarette) is doing incalculating mischief among young pepole including large number of students ......" (Modern Review Sept. 1920) বাস্তবিক ইহা হুঁকায় তামাক খাওয়ার চেয়েও ঘোর অনিষ্টকর। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ছাত্রগণও এইরূপ কু-অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। হাঁপানি প্রভৃতি কঠিন ব্যাধি বাল্য কালে ধূমপানে অভ্যস্ত হওয়ার ফলেও হয়। অতএব বালক-দিগের তামাক-সিগারেট প্রভৃতির ধূমপানে নিবৃত্ত করিবার জন্য সজ্জন মাত্রেরই বিশেষ যত্নশীল হওয়া

অবশ্য কর্ত্তব্য। দেশবাসী যে ভাবে তামাক ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে ইহার প্রচলন একেবারে বন্ধ করা অসম্ভব বটে, কিন্তু বালকদিগকে এই কুঅভ্যাসের হাত হইতে মুক্ত করা সাধ্যাতীত বলিয়া মনে হয় না।

যে অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইলে স্বাস্থ্য, সম্মান, অর্থ প্রভৃতি সকলই বিনষ্ট হয়, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহার অনিষ্টকারিতা তারস্বরে ঘোষণা করেন, তাহাতে আসক্ত হওয়া মানব মাত্রেরই একান্ত অকর্ত্তব্য। স্বাস্থ্যই সুখের মূল। তাহা যখন ধূমপানে নষ্ট হয়, তখন উহার বশবর্ত্তী হইয়া কষ্টে কাল যাপন করা ও পরিবারের দুঃখের কারণ হওয়া কাহারও উচিত নহে। যে সকল দেশহিতকামী লোক স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা গাঁজা, চরস প্রভৃতি ধূমপানের প্রতিকারার্থ বিশেষ যত্নবান হ'ন, তাঁহাদের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

একনবতিতম সাম্বৎসরিক মাঘোৎসব।

এ বৎসর ১১ই মাঘের প্রাতঃকাল হইতে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। প্রবল ঝটিকা উঠিয়া উৎসব প্রাঙ্গনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে। মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। এ কারণে প্রাতের উৎসব শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রবাবুর বাটীর সুবিস্তীর্ণ হলে সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীর আসন গ্রহণ করেন। সুধীন্দ্রবাবুর উদ্বোধন ও চিন্তামণি বাবুর প্রদত্ত উপদেশ সময়োপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বালিকাগণের সঙ্গীত ও মধ্যে মধ্যে নির্ম্মলচন্দ্র বড়ালের সঙ্গীত ও অন্যান্য গায়কগণের সমবেত কণ্ঠের গান উৎসব ক্ষেত্রকে মধুময় করিয়া তুলিয়া ছিল।

সমস্ত দিন অল্পাধিক ধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতে জনসমাগম হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু তখনও আকাশ নির্ম্মল হয় নাই। নিরুপায় হইয়া মহর্ষিদেবের বাটীর প্রশস্ত উঠানেই সন্ধ্যার উৎসব সম্পন্ন হয়। কিন্তু বৃষ্টির বিরাম না হওয়ায় শ্রোতার সংখ্যা সেরূপ অধিক হইতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীর আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বেদগান হইয়া উপাসনা আরম্ভ হয়। চিন্তামণি বাবু উদ্বোধন ও ক্ষিতীন্দ্রবাবু "আত্মনিবেদন" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। সঙ্গীতও প্রাতের ন্যায় শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় মনকে আর্দ্র করিয়াছিল। নবাগত দুইটি যুবকের সুচারু সঙ্গীত বড়ই সুমিষ্ট হইয়াছিল।

(শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উপদেশ)

সম্বৎসরকাল পরে মাঘোৎসবের পবিত্র আহ্বান আজ আবার আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। এ উৎসব নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নহে, ইহা আমাদের জাতীয় উৎসব, সত্যের জয় ঘোষণা বলিয়া ইহা নিখিল বিশ্বের মহোৎসব। প্রায় এক শতাব্দী হইতে চলিল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, যে প্রেরণা শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রত্যেকের ধমনীর ভিতর দিয়া সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে যুগযুগান্তর পরে আমরা একেশ্বরবাদের প্রকৃত সন্ধান লাভ করিতে পারিয়াছি, জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রকৃত সামঞ্জস্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছি। পুরাণ-তন্ত্রের ভিতরে যে সত্য, অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায়, কখন আমাদের অন্তঃশ্চক্ষুর সম্মুখে, কখন বা অন্তরালে বহিয়া যাইতেছিল, নানাবিধ কল্পনার ভিতরে পড়িয়া আত্মহারা হইবার উপক্রম করিয়াছিল, আমরা তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অবধারণ করিবার অবসর লাভ করিয়াছি। বাহিরের আবরণ স্থূল হইয়া যতই কেন বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করুক না, পরস্পরের মধ্যে যতই কেন বিবাদ-বিসম্বাদ মতদ্বৈধ প্রধূমিত হউক না, উহাদের প্রাণের কথা যে সেই বেদ-উপনিষদ-ঘোষিত একেশ্বরবাদ, দিন দিন তাহা পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে যাহা কিছু অসত্য, যাহা কিছু জ্ঞানের ও হৃদয়ের বিরোধী, তাহা দিন দিন তিরোহিত হইতেছে। এই ব্রাহ্মসমাজই সমগ্র হিন্দুসমাজের ভিতরে এমন একটি চাঞ্চল্য ও সচেতন ভাব আনিয়া দিয়াছে, যে তাহার প্রভাবে অগণ্য শাস্ত্ররাজি দিন দিন প্রকাশিত হইতেছে এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বিপুল প্রচলন বৈষম্যকে সত্যের অনুকূল করিয়া তুলিতেছে।

এই যে জাতীয় মহাসমিতির অভ্যুত্থান, এই যে জাতিনির্ব্বিশেষের ভাবে ও চিন্তায় অবাধ মিলন,

উহারও মূলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অসীম প্রভাব। তিনি যে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সর্ববিধ ব্যাপারে তিনি আমাদিগকে বন্ধনমুক্ত, ও অন্তরে নবনব অধিকার লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন। আবার যখন দেখি ব্রাহ্মসমাজের ভিতর হইতে সমুত্থিত হইয়া অন্ততঃ ব্রাহ্মসমাজের ভাবাপন্ন হইয়া অসীম প্রতিভাসম্পন্ন মহাত্মাগণ ভগবৎ প্রেমের ও বৈরাগ্যের বারতা লইয়া ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিচরণ করিয়া, তাহাদের মধ্যে নব চেতনার সঞ্চার করিতেছেন, তাহাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা প্রবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছেন, ত্যাগের বীজ তাহাদের অন্তরে বিপুলভাবে বপন করিতেছেন, জড়বাদের মোহ আবরণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইতেছেন, তখন আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কীর্ত্তি-কলাপ সন্দর্শনে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি, যে পতিত-ভারত অধীনতার কঠিন পাশে দৃঢ়বদ্ধ হইলেও, তাহার অন্তর্নিহিত এমন একটি অজেয় নিজস্ব শক্তি আছে, যাহার বলে সে স্বাধীনতায় বলদৃপ্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকেও মুক্তিদান করিতে পারে,—স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারে বাহিরে তোমাদের সাম্য ও স্বাধীনতার ব্যর্থ আস্ফালন, কিন্তু তোমাদের অন্তর্দ্দেশ জড়বাদের ও স্বার্থপরতার অচ্ছেদ্য নিগড়ে শৃঙ্খলিত।

বাহিরের গণনাতে এ দেশ নিতান্ত উপেক্ষিত হইলেও, আমাদের সেই একটি স্থান আছে, যেখানে দণ্ডায়মান হইয়া নিখিল বিশ্বকে আহ্বান করিয়া তারস্বরে বলিতে পারি "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।" উত্থান কর, জাগ্রত হও। বর্ত্তমান যুগে রামমোহন রায়ের কণ্ঠ হইতে সেই ধ্বনীই প্রথম উদ্গীরিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোকে যখন আমরা উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলাম, তিনি কীট নিষ্কৃষিত উপনিষদের পত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন, যে তোমাদিগকে কেন্দ্রচ্যুত হইতে হইবে না, জাতীয়ত্বের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া ঋষিগণ পরিসেবিত একেশ্বরবাদ গ্রহণ কর, জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন কর, বিদেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা কর, দেশীয় শাস্ত্ররাজি অধ্যয়ন কর, অন্য ধর্ম্মকে উদার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কর; হৃদয়কে বিপুল ও বিরাট করিয়া সকলের সহিত ভ্রাতৃসৌহার্দে মিলিত হও, প্রকৃত জ্ঞানের উপরে জাতীয়ত্বের উপরে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা কর। ইহারই কল্পে অদ্যকার পুণ্যতিথিতে তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। তাই আমাদের এই উৎসব আয়োজন।

তিনি ত চেতনার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগকে দেখিতে হইবে তিনি যে গুরুভার আমাদের মস্তকের উপর ন্যস্ত করিয়া গেলেন, আমরা নিজ জীবনে তাঁহার আদেশ যতটুকু পালন করিতে সক্ষম হইয়াছি। ত্যাগে ঔদার্য্যে, সংযমে শিক্ষায় সাধনে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। প্রকৃত জাতীয়ত্বের ভাব কতটুকু পোষণ করিতেছি, প্রকৃত একেশ্বরবাদকে কতটুকু অনাবিল অবস্থায় রাখিতে পারিয়াছি। বাহিরে কতকগুলি কৃত্রিম বিধি-নিষেধের সৃষ্টি করিয়া যদি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে সুরক্ষিত করিতে চাই, অপরকে পরিহার করিয়া ফেলি, একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিবার প্রয়াসী হই, তবে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। যদি জ্ঞানের উপরে, শিক্ষার উপরে, যুক্তির উপরে সমধিক নির্ভর না করিয়া অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণতা আনয়ন করি, বুঝিতে হইবে যে আমাদিগকে অচিরে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। যদি অন্য ধর্ম্মের নিন্দাবাদ ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়ভেরী নিনাদিত করিবার জন্য লালায়িত হই, বুঝিতে হইবে, উহা সত্য প্রচারের প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। যদি পাশ্চাত্য আদর্শে আমরা সমাজ গঠন করিবার জন্য লালায়িত হই, বিলাস-বাহুল্যে আত্মহারা হইয়া পড়ি এবং সমস্ত শক্তিকে সেইদিকেই নিয়োগ করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আধ্যাত্মিকতা যাহা ভারতের অস্থিমজ্জাগত, তাহা সংযমের অভাবে, নবার্জ্জিত ঔদ্ধত্যের প্রভাবে, আমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। দীনতা, ব্যাকুলতা, পবিত্রতা, সাধন-শীলতা, সকল কার্য্যে ও প্রতিদিনের সকল চিন্তায় ভগবানের উপরে চির নির্ভরতা, এ দেশের

অনন্যসাধারণ সৌভাগ্য। ইহা হইতে একবার বঞ্চিত হইলে এবং জীবনে ইহাদের প্রবেশ পথ একবার প্রতিরুদ্ধ করিয়া দিলে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঔদাস্য ঔদাসীন্য জীবনে একবার ফুটিয়া উঠিলে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা সাধকের অভাবে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। নিশ্চয় জানিও সমস্ত পৃথিবী প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার ছবি, ত্যাগের আদর্শ, সংযমের মূর্ত্তি, ভাবগদ-গদ প্রেমভক্তির জীবন্ত চিত্র সন্দর্শন করিবার জন্য ভারতের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। যদি আমরা সাধনের অভাবে সে মূর্ত্তি, আমাদের মধ্যে ফুটাইয়া রাখিতে না পারি, তাহা হইলে একজন পুণ্যশীলা পাশ্চাত্য মহিলার ভাষায় বলিতে চাইবে, ভারতের আধ্যাত্মিকতার বিনাশে সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিকতা চিরসমাধি লাভ করিবে।

বাহিরের এই যে দারুণ কোলাহল, এই যে তুমুল আন্দোলন, অধিকার লাভের জন্য এই যে অদম্য চেষ্টা, তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র, এই ব্রাহ্মসমাজ নহে। কিন্তু আমরা দেখিতে যাই, সকল আয়োজনেও সর্ব্ববিধ সাধনার ভিতরে অটল সংযম, ভগবানের উপর অচল নির্ভর। ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া কর্ত্তব্য সমাধান করিতে করিতে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাকে পরিস্ফুট ও জাগ্রত তুলিতে হইবে। আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস, নব নব ধর্ম্ম অভ্যুদয়ের কাহিনী ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমুদ্র পর্ব্বত বেষ্টিত ভারতে অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায় বিরাজমান। অসংখ্য জাতিতে হিন্দুজাতি ছিন্নবিচ্ছিন্ন। আদিম অধিবাসীর সহিত, আর্য্যজাতির সন্তান সন্ততি একই জনপদে নির্ভয়ে বাস করিতেছে। অথচ কেহ কাহাকে আঘাত করে না। এ দৃশ্য পাশ্চাত্য ভূমিতে বা সুসভ্য আমেরিকা খণ্ডে নিতান্তই দুর্লভ। সংসারে বৈষম্য চিরকালই রহিয়াছে, অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। কিন্তু সংযমের ভাব এ দেশের অস্থিমজ্জাগত বলিয়াই, শত শত বৈষম্যের ভিতরে, একমাত্র মৈত্রীর অনুশীলনে, প্রকৃত সাম্যের ভাব প্রকৃত শান্তির ভাব এদেশে বহুকাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত। সংযমই আমাদের দেশের গৌরব—আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট। এই বিশিষ্টতাকে যেন আমরা আমাদের দোষে ম্লান করিয়া না ফেলি।

পাশ্চাত্য জগতে যতকিছু বিপ্লব সংগঠিত হইয়াছে, তরবারির কঠিন আঘাত বিজয়ীকে জয়মাল্য দান করিয়াছে। কিন্তু আমরা হিংসা চাহি না, নরশোণিতে নিজ হস্তকে কলঙ্কিত করিতে চাহি না, আমরা চাই ধর্ম্মের বলে, নৈতিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে, ব্রহ্মবলে বিজয় লাভ করিতে। আমাদের দেশের শাস্ত্র স্মরণাতীত কাল হইতে,সমুচ্চ স্বরে ঘোষণা করিতেছে, "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয় বলং, বলং বলং ব্রহ্মবলং", ক্ষত্রিয় বলে—পাশব শক্তির পরিচালনে ধিক্, ব্রহ্মবল—ধর্ম্মের বলই প্রকৃত বল। যদি বিজয়লাভ করিতে চাও সেই ব্রহ্মবলে বলীয়ান্ হও। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" সর্ব্ববিধ মুক্তি প্রাপ্তির ইহাই একমাত্র পন্থা।

সেই ব্রহ্মবল লাভ করিবার জন্য ও সাধনাকে চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি। ইহারই কল্পে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আপনার জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু পর্য্যন্ত পাত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হও। এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কাতর কণ্ঠে আহ্বান কর। তিনি আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করুন। তাঁহার অমোঘ আশ্রয় ভিক্ষা কর, তিনি আমাদিগকে অভয়কুলে স্থানদান করুন—সর্ব্ববিধ বিঘ্ন বিপত্তি অপসারিত করিয়া দিন।

ব্রহ্মণ। সম্বৎসরকাল পরে তোমার উদ্দেশে পূর্ণাহুতি দান করিবার জন্য আজ আমরা মহর্ষির স্মৃতি-মণ্ডিত এই পবিত্র নিকেতনে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। স্তুতি বন্দনা ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তোমার জয়ধ্বনি চারিদিকে বিঘোষিত হইতেছে। তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ, আমাদের মস্তকের উপরে আজ বর্ষিত হউক। তুমি আমাদিগকে সংযমে ত্যাগে বৈরাগ্যে দীক্ষিত কর। চারিদিকের কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে, তুমি শান্তিবারি বর্ষণ কর। সকলের হৃদয়ে সদ্ভাব বিস্তার কর। অভিমান ঔদ্ধত্য বিচূর্ণ কর। বিনয়ে ঔদার্য্যে সকলের অন্তর বিভূষিত কর। তোমার

মঙ্গল আলোকে আমাদের অধ্যাত্মিক চক্ষু বিকশিত কর, দুর্ব্বল হৃদয়ে অজেয় বল বিধান কর, দুঃখ দুর্দ্দিনে ইহাই তোমার নিকট আমাদের কাতর নিবেদন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

মিশ্র রামকেলী—দাদরা।

এই তো তুমি সূর্য্য-আলোকে,
এই তো তুমি-অরুণ আকাশে,
এই তো তুমি প্রভাত-পুলকে,
এই তো তুমি পুষ্প-বিকাশে।
এই তো তুমি পাখীর কণ্ঠে
গেয়ে ওঠ এমন আনন্দে,
ঝর্ণা-ধারার গভীর ছন্দে
বেজে ওঠ দখিণ বাতাসে।
এই তো তুমি আমার হৃদয়ে
চলেছ আজ বিশ্ব-বিজয়ে,
এই তো তুমি প্রাণের আনন্দে
বাজাও আমায় এমন ছন্দে।
এই তো তুমি গানে গানে
জেগেছ মোর প্রাণে প্রাণে,
বর্ষা শরৎ কতই বসন্তে
লিখে গেছ হৃদয় আকাশে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

মিশ্র রামকেলী—তেওরা।

ঐ অমল হাতে রজনী-প্রাতে আপনি জ্বালো,
এই ত আলো—এই ত আলো
এই ত প্রভাত, এই ত আকাশ,
এই ত পূজার পুষ্পবিকাশ,
এই ত বিমল, এই ত মধুর, এই ত ভালো—
এই ত আলো—এই ত আলো।
আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে আপনি জ্বালো,
এই ত আলো—এই ত আলো!
এই ত ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা,
এই ত দুঃখের অগ্নিমালা,
এই ত মুক্তি, এই ত দীপ্তি, এই ত ভালো—
এই ত আলো—এই ত আলো॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিশ্র ভৈরবী—ঠুংরি।

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে,
কি উৎসবের লগনে।
সব আলোটি কেমন করে
ফেল আমার মুখের পরে,
আপনি থাক আলোর পিছনে।
প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে,
কি উৎসবের লগনে।
সব আলো তার কেমন করে
পড়ে তোমার মুখের পরে,
আপনি পড়ি আলোর পিছনে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—দাদরা।

তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।
আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ করব পরে।
না চাহিলে তোমার মুখপানে,
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত,
ফিরি কূলহারা সাগরে॥
বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসে
এল আমার বাতায়নে,
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গনে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সায়ংকাল।

উদ্বোধন।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

দুর্ভাগ্য বশে জন-সমাজ যখন বীর্য্যহীন হইয়া পড়ে, কিছুতেই তাহার মোহনিদ্রা অপসারিত না হয়, নিজ দুর্গতি অনুভব করিবার সমস্ত শক্তি যখন তাহার তিরোহিত হয়, তখন বাহির হইতে আঘাত আসিয়া তাহার লুপ্ত-চৈতনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলে। প্রকৃত পক্ষে এই আঘাতের ভিতর

দিয়া জনসমাজ দিন দিন বিকাশের পথে অগ্রসর হইতেছে। পুষ্প-কোরকের উপর যখন তরুণ রবিকিরণের সম্পাত হয়, তখন দিবালোকের সেই সুকোমল আঘাতে কুসুম আপনাকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া তোলে। কিন্তু জনসমাজকে জাগাইতে হইলে কঠিন আঘাতের প্রয়োজন। দারুণ আঘাত আসিয়াছিল বলিয়াই যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া বাহুল্যের ভিতর হইতে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিতে পারিয়াছিল। আঘাত আসিয়াছিল বলিয়াই সকাম কর্ম্মসাধনার ভিতর হইতে গীতার ফলকামনা রহিতোর ভেরী নিনাদিত হইতে পারিয়াছিল। ধর্ম্মের নামে যুপবদ্ধ পশুর ভীষণ আর্ত্তনাদ যখন চারিদিক আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, উপকরণবাহুল্য যখন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছিল, তখন আঘাত আসিয়াছিল বলিয়াই সরস গৌরাঙ্গ-ধর্ম্ম বিঘোষিত হইতে পারিয়াছিল। আবার যখন বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য আলোকে শিক্ষিত সম্প্রদায় উদ্‌ভ্রান্ত হইবার উপক্রম করিতেছিল, ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আঘাত দানে আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন।

আঘাত প্রথম অবস্থায় যে চাঞ্চল্য আনয়ন করে, ক্রমে তাহা প্রশমিত হইয়া যায়। জনসমাজ আঘাত লাভ করিয়া ভাবে চিন্তায় ও সাধনায় আপনাকে নূতন ভাবে বিগঠিত করিয়া তোলে। এইরূপেই নিখিল-বিশ্ব আঘাতের ভিতর দিয়া নব নব চেতনা নব নব দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রীসম্পদে বিভূষিত হইয়া উঠিতেছে। জনসমাজ কখনও এইরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইতে পারে না, যেখানে আসিয়া সে নিশ্চিন্তভাবে বলিতে পারে, যে আমার আর আঘাতের প্রয়োজন নাই—নব প্রেরণালাভের আবশ্যকতা নাই। স্পন্দনের ভিতর দিয়াই জনসমাজের জীবনের প্রবাহ। যেখানে স্পন্দন নাই, চেতনা নাই, কর্ম্মশীলতা নাই, সে জনসমাজ মৃত্যুর অভিমুখীন।

আঘাত ত প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে; কিন্তু যখন নিজ নিজ দীনতা ও হীনতা তীব্ররূপে উপলব্ধি করিবার শুভ অবসর আমাদের জীবনে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ঐ হীনতাবোধ আমাদিগকে নিতান্ত চঞ্চল ও উৎপীড়িত করিয়া তোলে, তখনই সময়ের আহ্বানে, ভগবানের মঙ্গলবিধানে, অসীম শক্তি-সম্পন্ন এক একজন সাধু মহাত্মা আঘাতদানে লুপ্তচেতনা উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন। এই আঘাত আর কিছুই নহে, ইহা তাঁহাদের বজ্র-নির্ঘোষী বাণী। ঐ বাণীর ভিতরে এমন একটি অজেয় শক্তি থাকে, এমন একটি মাদকতা থাকে, সত্যের এমন একটি জ্বলন্ত প্রভা বিদ্যমান থাকে, আমাদের দীনতা দূরীকরণের এমন একটি অব্যর্থ মহৌষধ থাকে, যে আমরা অবনত মস্তকে সর্ব্ববিধ দ্বিধা পরিহার করিয়া ঐ বাণীর অনুবর্ত্তী হই; এবং ঐ বাণীর আদেশে আমরা আমাদের জীবনকে সংস্কৃত করিয়া তুলি। আবার কালক্রমে আমাদের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন যখন ঐ বাণীর প্রভাব মন্দীভূত হইয়া আইসে, জনসমাজের ভিতরে নূতন ব্যাধির সঞ্চার হয়, আমরা হতচেতন হইয়া পড়ি, নূতন আঘাতের জন্য অনুকূল সময়ের জন্য আবার আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে হয়।

এইরূপে যুগে যুগে কত আঘাত আসিয়া মানব সমাজকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিতেছে, কত আবর্জ্জনাকে বিতাড়িত করিতেছে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভাবকে বিকাশ দান করিতেছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের হস্তে আমরা যে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহারই স্মৃতিরূপে আমাদের এই উৎসব আয়োজন। সেই আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কেমন করিয়া আপনার জীবনকে, চরিত্রকে, ধর্ম্মভাবকে, সাধনাকে, নিষ্ঠাকে জাগাইয়া তুলিতে হয়, যিনি তাহার সন্ধান দান করিলেন, যিনি সেই আঘাতফলে সেই প্রাচীন ঋষিভাব নিজ জীবনে ফুটাইয়া তুলিলেন, আজ সেই মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের নামেও এই উৎসব কোলাহল।

আঘাত লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। আজ সুস্পষ্ট অনুভব করিতে হইবে যে এই উৎসবের ভিতর দিয়াও মৃদু আঘাত আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে। আঘাতফলেই মানবজীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা। আমরা রাজার সুশাসন ফলে স্বাধীনভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। এদেশে যুদ্ধবিগ্রহ

প্রশমিত হইয়াছে, এ কথা সত্য। কিন্তু আবার নবতর আঘাত আসিয়া এ দেশীয় জনসাধারণকে জাগ্রত করিতেছে। রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবার জন্য, মানব আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন চারিদিকে চলিতেছে। এই উৎসবক্ষেত্র তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনার প্রকৃষ্ট স্থান নয়। কিন্তু আমরা দেখিতে চাই সকল চেষ্টায় ও সর্ব্ববিধ সাধনার ভিতরে প্রকৃত সংযম, আমরা দেখিতে চাই আধ্যাত্মিক বীর্য্যের সমধিক বিকাশ। ত্যাগের উপরে, সংযমের উপরে, সত্যনিষ্ঠার উপরে, ধর্ম্মের উপরে, সাধনার উপরেই হিন্দুজাতির প্রকৃত ভিত্তি। সে ভিত্তিকে অটল রাখিয়া, সে আদর্শকে অম্লান রাখিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং জগৎকে দেখাইতে হইবে যে আধ্যাত্মিক শক্তিই মনুষ্যের অজেয় শক্তি।

এই মহামহোৎসবে সম্মিলিত কণ্ঠে আমরা যে দেবতার আরাধনা করিতে আসিয়াছি, তিনি কেবল ভারতের ভাগ্যবিধাতা নন। তিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর। তিনি আমাদের চিরদিনের সহায়, চিরদিনের বন্ধু, চিরদিনের আশ্রয়। ভারতের উপর দিয়া কত বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। আমরা কেবল তাঁহারই দিকে তাকাইয়া সমস্ত নিগ্রহ সহ্য করিয়াছি। তিনি ধর্ম্মের কবচে,—সংযমের কবচে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সেই জাগ্রত কৃপা আজ গাঢ়রূপে অনুভব করিয়া সেই চিরজাগ্রত দেবতাকে অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান দেখিয়া আইস আমরা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার বিমল অঞ্জলি তাঁহার চরণে অর্পণ করি এবং তাঁহার পূজার্চ্চনায় জীবনকে একেবার মধুময় করিয়া তুলি এবং ব্রহ্মবলে আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলি তিনি আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ॥

ব্রহ্মসঙ্গীত।

মিশ্র বারোয়াঁ—দাদরা।

কোন্ সুদূর হতে আমার মনোমাঝে
বাণীর ধারা বহে। (আমার প্রাণে প্রাণে)
কথন্ শুনি কথন্ শুনি না যে
কথন্ কি যে কহে। (আমার কানে কানে)
আমার ঘুমে আমার কোলাহলে,
আমার আঁখি জলে (তাহারি সুর)
তাহারি সুর জীবন গুহাতলে
গোপন গানে রহে ॥ (আমার কানে কানে)
কোন্ ঘন গহন বিজন তীরে তীরে
তাহার ভাঙা গড়া, (ছায়ার তলে তলে)
আমি জানি না কোন্ দক্ষিণ সমীরে
তাহার ওঠা পড়া। (ঢেউয়ের ছলছলে)
এই ধরণীরে গগন-পারের ছাঁদে
সে যে তারার সাথে বাঁধে,
সুখের সাথে দুখ মিলায়ে কাঁদে,—
"এ নহে এই নহে।"(কাঁদে কানে কানে)।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঝাঁপতাল।

ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।
চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে,
সাড়া যেন দেয় সে তোমার ডাকে,
যত বাঁধন সব টুটে যায় যেন
প্রভু তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।
বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি
এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে
প্রভু তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।
হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর!
এ জীবনে যা'-কিছু সুন্দর,
সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে
প্রভু তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

ত্রয়োদশ প্রকরণ।

ভক্তিমার্গ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'সর্ব্বভূতে একই পরমেশ্বর' ঈশ্বরস্বরূপের এই যথার্থ ও অনুভবাত্মক জ্ঞান পাইতে হইলে, দেহেন্দ্রিয়ধারী

মনুষ্যের কি করা আবশ্যক? উপরি-উক্ত অনুসারে এই প্রশ্নের বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ অনাদি অনন্ত অচিন্ত্য ও 'নেতি নেতি' হইলেও পরমেশ্বর নির্গুণ, অজ্ঞেয় ও অব্যক্তও বটে; এবং যখন তাঁহার অনুভব হয় তখন উপাস্য ও উপাসক এই দুই ভেদ অবশিষ্ট না থাকায়, সেখান হইতে উপাসনা সুরু হইতে পারে না। পরমেশ্বর তো কেবল চরম সাধ্য —সাধন নহে; এবং তদাকার হইবার যে অদ্বৈত অবস্থা তাহা লাভ করিবার কেবল এক সাধন বা উপায় উপাসনা। তাই এই উপাসনার জন্য যে বস্তু স্বীকার করিতে হইবে তাহার সগুণই হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ সেইরূপ অর্থাৎ সগুণ। কিন্তু তিনি কেবল বুদ্ধিগম্য ও অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হওয়া প্রযুক্ত তাঁহার উপাসনা ক্লেশময় হইয়া থাকে। এইজন্য পরমেশ্বরের এই দুই স্বরূপ অপেক্ষা যে পরমেশ্বর অচিন্ত্য সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান জগদাত্মা হইয়াও আমাদের ন্যায় আমাদের সহিত কথা কহিবেন, আমাদের উপর মমতা করিবেন, আমাদিগকে সৎমার্গে আনিয়া সদ্গতি দিবেন, যাঁহাকে আমরা 'আপনার' বলিতে পারি, আমাদের সুখদুঃখের সহিত যাঁহার সহানুভূতি হইবে কিংবা যিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, যাঁহার সহিত আমাদিগের 'আমি তোমার এবং তুমি আমার' এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ উৎপন্ন হইবে, যিনি আমাকে পিতার ন্যায় রক্ষা করিবেন এবং মাতার ন্যায় ভাল বাসিবেন; অথবা যিনি 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" (গী. ৯. ১৭ ও ১৮)—আমার গতি, আমার পোষণকর্ত্তা, আমার প্রভু, আমার সাক্ষী, আমার শরণ ও সুহৃৎ;—এবং ইহা বলিয়া সন্তানের ন্যায় আমি যাঁহাকে প্রেমের সহিত ও আদরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিব, এইরূপ সত্যসঙ্কল্প সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, দয়ার সাগর, ভক্তবৎসল, পরমপবিত্র পরমোদার পরমকারুণিক, পরমপূজ্য, সর্ব্বসুন্দর, সকল-গুণনিধান, কিংবা সংক্ষেপে বলিতে হইলে প্রাণপ্রিয় সগুণ প্রেমগম্য ও ব্যক্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপধারী সুলভ পরমেশ্বরকেই 'ভক্তির জন্য' স্বভাবতঃ স্বীকার করা হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যেক ধর্ম্মেই দেখা যায়। যে পরব্রহ্ম মূলে অচিন্ত্য ও 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তাঁহার উক্ত প্রকার অন্তিম দুই স্বরূপকেই (অর্থাৎ প্রেমশ্রদ্ধাদি মনোময় নেত্রের দ্বারা মনুষ্যের গোচর স্বরূপকেই) বেদান্তশাস্ত্রের পরিভাষায় 'ঈশ্বর' বলা হয়। পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও সীমাবদ্ধ হইলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় সাধু তুকারাম এক কবিতায় দিয়াছেন—

হরি তুকা ক্ষণে অবঘা একলা।
পরি হা ধাকুলা ভক্তী সাঠী" ॥

অর্থাৎ—তুকা বলে, হরি সর্ব্বত্র এক, কিন্তু ভক্তের জন্যই ছোট হন (গা. ৩৮. ৭.)। বেদান্তসূত্রেও এই সিদ্ধান্তই প্রদত্ত হইয়াছে (১. ২. ৭)। উপনিষদেও যেখানে যেখানে ব্রহ্মের উপাসনার বর্ণনা আছে সেই-সেইখানে প্রাণ, মন ইত্যাদি সগুণ ও কেবল অব্যক্ত বস্তুসমূহেরই নির্দ্দেশ করিয়া তাহারই সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্য (আদিত্য), অন্ন ইত্যাদি সগুণ ও ব্যক্ত পদার্থেরও উপাসনা কথিত হইয়াছে (তৈ. ৩. ২-৬; ছাং. ৭)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আবার "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্" (শ্বে. ৪. ১০)—প্রকৃতিরই নাম মায়া এবং এই মায়ার যে অধিপতি তিনিই মহেশ্বর—'ঈশ্বরের' এইরূপ লক্ষণ বলিয়া তাহার পর "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ"—এই দেবতাকে জানিলে সমস্ত পাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায় (৪. ১৬), এইরূপ গীতারই ন্যায় (গী. ১০. ৩) সগুণ ঈশ্বরের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। এই যে নামরূপাত্মক বস্তু উপাস্য পরব্রহ্মের চিহ্ন, পরিচয়, অবতার, অংশ কিংবা প্রতিনিধিরূপে উপাসনার জন্য আবশ্যক হয়, উহাকেই বেদান্তশাস্ত্রে 'প্রতীক' বলে। প্রতীক (প্রতি+ইক) শব্দের ধাত্বর্থ এই—প্রতি=আপনার দিকে, ইক=ঝোঁকা; কোন বস্তুর যে পার্শ্বটা প্রথমে আমাদের গোচর হয় এবং পরে সেই বস্তুর জ্ঞানলাভ হয় সেই পার্শ্বকে কিংবা সেই ভাগটাকে প্রতীক বলে। এই হিসাবে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভের জন্য তাহার কোন প্রত্যক্ষ চিহ্ন, ভাগ, বা অংশরূপ বিভূতি প্রতীক হইতে পারে। উদাহরণ যথা—মহাভরতে ব্রাহ্মণ-ব্যাধ-সংবাদে, ব্যাধ ব্রাহ্মণকে প্রথমে অনেক অধ্যাত্মজ্ঞান বলিবার পর, শেষে "প্রত্যক্ষং মম যো ধর্ম্মস্তং চ পশ্য দ্বিজোত্তম" (বন. ২১৩. ৩)—আমার প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম কি, তাহা দেখ—এই কথা বলিয়া উক্ত ব্রাহ্মণকে ব্যাধ আপন বৃদ্ধ মা-বাপের নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন—ইঁহারাই আমার 'প্রত্যক্ষ দেবতা' এবং এইরূপ মনে করিয়া ঈশ্বরের ন্যায় ইঁহাদের সেবা করাই আমার 'প্রত্যক্ষ' ধর্ম্ম। এই অভিপ্রায়কেই মনে রাখিয়া, নিজের ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনার কথা বলিবার পূর্ব্বে ভগবান্ গীতাতেই বলিয়াছেন—

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥

অর্থাৎ এই ভক্তিমার্গ "সমস্ত বিদ্যার মধ্যে ও গুহ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য); ইহা উত্তম, পবিত্র, প্রত্যক্ষগম্য, ধর্ম্মানুকূল, সুখসাধ্য ও অক্ষয়" (গী. ৯. ২)। এই শ্লোকে রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য এই দুইটী সামাসিক

শব্দ ; ইহাদের বিগ্রহ এই—'বিদ্যানাং রাজা' ও 'গুহ্যানাং রাজা' (বিদ্যাদিগের রাজা ও গুহ্যদিগের রাজা) ; এবং যখন সমাস হইল তখন সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'রাজ' শব্দ প্রথমে আসিল। কিন্তু ইহার বদলে 'রাজ্ঞাং বিদ্যা' (রাজাদিগের বিদ্যা) এইরূপ বিগ্রহ করিয়া কেহ-কেহ এইরূপ বলেন যে, যোগবাসিষ্ঠের বর্ণনা অনুসারে (যো. ২. ১১. ১৬-১৮) প্রাচীনকালে ঋষিরা রাজাদিগকে যখন ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সময় অবধি ব্রহ্মবিদ্যা কিংবা অধ্যাত্মজ্ঞানকেই রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য বলা হইত, তাই এই দুই শব্দের দ্বারা গীতাতেও ঐ অর্থই অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞান—ভক্তি নহে—বিবক্ষিত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। গীতার উপদিষ্ট মার্গও মনু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজপরম্পরাক্রমেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে (গী. ৪. ১) ; তাই, 'রাজবিদ্যা ও 'রাজগুহ্য' এই দুই শব্দ 'রাজাদিগের বিদ্যা' ও 'রাজাদিগের গুহ্য' অর্থাৎ রাজমান্য বিদ্যা ও গুহ্য এই অর্থে গীতায় প্রযুক্ত হয় নাই এরূপ বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এই অর্থ স্বীকার করিলেও এই স্থলে এই শব্দ জ্ঞানমার্গের বর্ণনায় প্রযুক্ত হয় নাই ইহা মনে রাখা আবশ্যক। কারণ, গীতার যে অধ্যায়ে এই শ্লোকটি আসিয়াছে তাহাতে ভক্তিমার্গই বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে (গী. ৯. ২২-৩১ দেখ) ; এবং চরম সাধ্য ব্রহ্ম একই হইলেও গীতাতেই অধ্যাত্মবিদ্যার সাধনাত্মক জ্ঞানমার্গ কেবল 'বুদ্ধিগম্য' অতএব 'অব্যক্ত' ও 'দুঃখকারক' বলিয়া কথিত হইয়াছে (গী. ১২. ৫) ; এই অবস্থায় তাহাকেই ভগবান্ এক্ষণে 'প্রত্যক্ষাবগমং' অর্থাৎ ব্যক্ত, ও 'কর্তুং সুসুখং' অর্থাৎ সুখসাধ্য বলিবেন ইহা সম্ভবপর নহে। তাই, প্রকরণ-সাম্যার্থ এবং কেবল ভক্তিমার্গেরই সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত 'প্রত্যক্ষাবগমং' ও 'কর্তুং সুসুখং' এই পদদ্বয়ের উপযোগিতার কারণে,—অর্থাৎ এই দুই কারণে—'রাজবিদ্যা' শব্দে ভক্তিমার্গই এই শ্লোকে বিবক্ষিত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হয়। 'বিদ্যা' শব্দ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানবাচক নহে ; কিন্তু পরব্রহ্মের জ্ঞান অর্জন করিবার যে সাধন বা মার্গ তাহারও উপনিষদে 'বিদ্যা' নামই দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ যথা—শাণ্ডিল্যবিদ্যা, প্রাণবিদ্যা, হার্দবিদ্যা ইত্যাদি। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে উপনিষদে বর্ণিত এই প্রকার অনেক বিদ্যার অর্থাৎ সাধনের বিচার করা হইয়াছে। উপনিষৎ পাঠে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল বিদ্যাকে গুপ্ত রাখিয়া কেবল শিষ্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রাচীনকালে ঐ সকল উপদেশ দেওয়া হইত না। তাই যে-কোন বিদ্যাই ধর না কেন, তাহা গুহ্য হইবেই। কিন্তু ব্রহ্মলাভের সাধনীভূত এই যে গুহ্য বিদ্যা বা মার্গ তাহা অনেক হইলেও সেই সমস্তের মধ্যে গীতোক্ত ভক্তিমার্গরূপ বিদ্যা অর্থাৎ সাধন শ্রেষ্ঠ (গুহ্যানাং বিদ্যানাং চ রাজা)। কারণ, আমার মতে উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, জ্ঞানমার্গীয় বিদ্যার ন্যায় উহা (ভক্তিমার্গরূপ সাধন) 'অব্যক্ত' নহে, উহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর এবং সেইজন্য উহা সুখসাধ্য। গীতায় যদি কেবল বুদ্ধিগম্য জ্ঞানমার্গই প্রতিপাদ্য হইত তাহা হইলে বৈদিক ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ একশো বৎসর ধরিয়া এই গ্রন্থের প্রতি যেরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে সেরূপ আগ্রহ থাকিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। যে মাধুর্য্য ও প্রেম বা রসে গীতা পরিপূর্ণ তাহা তৎপ্রতিপাদিত ভক্তিমার্গেরই পরিণাম। প্রথমে তো পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ অবতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা বলিয়াছেন ; এবং তাহার ভিতরেও আর একটী কথা এই যে, অজ্ঞেয় পরব্রহ্মের শুষ্ক জ্ঞানের কথা না বলিয়া স্থানে স্থানে প্রথম পুরুষের প্রয়োগ করিয়া নিজের সগুণ ও ব্যক্ত স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, "আমাতে এই সমস্ত ওতপ্রোত রহিয়াছে" (৭. ৭), "এই সমস্ত আমারই মায়া" (৭. ১৪), "আমা হইতে ভিন্ন আর কিছুই নাই" (৭. ৭) "আমার নিকট শত্রু মিত্র উভয়ই সমান" (৯. ২৯), "আমিই এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছি" (৯. ৪), "আমিই ব্রহ্মের ও মোক্ষের মূল" (গী. ১৪. ২৭) কিংবা "আমাকে "পুরুষোত্তম" বলে" (গী. ১৫. ১৮) ; এবং শেষে অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, "সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া তুমি এক আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভীত হইও না" (১৮. ৬৬)। ইহাতে শ্রোতার মনে এই ধারণা হয় যে, আমি সমদৃষ্টি, পরমপূজ্য ও প্রেমময় এইরূপ সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমের সম্মুখে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছি, এবং তখন আত্মজ্ঞানে তাহার নিষ্ঠা খুব দৃঢ় হয়। শুধু তাহাই নহে ; কিন্তু একবার জ্ঞান ও একবার ভক্তি এইরূপ গীতার অধ্যায়সমূহের পৃথক পৃথক বিভাগ না করিয়া, জ্ঞানের সহিত ভক্তিকে এবং ভক্তির সহিত জ্ঞানকে গাঁথিয়া দেওয়ায় ফল হইয়াছে এই যে, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কিংবা বুদ্ধি ও প্রেমের মধ্যে পরস্পর বিরোধ না থাকিয়া পরমেশ্বরের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমরসেরও অনুভব হয় এবং সর্ব্বভূতে আত্মৌপম্যবুদ্ধি জাগৃত হইয়া শেষে চিত্ত বিলক্ষণ শান্তি ও সন্তোষসুখ লাভ করে। দুধে চিনি দিবার মতো ইহাতেও আবার কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়িল! তাহার পর, গীতোক্ত জ্ঞান ঈশাবাস্যোপনিষদের উক্তি অনুসারে

মৃত্যু ও অমৃত—অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোক উভয়ই শ্রেয়স্কর, আমাদের পণ্ডিতেরা এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ভক্তিমার্গ কি, জ্ঞান-মার্গ ও ভক্তিমার্গের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্য কোথায়, ভক্তি-মার্গকে রাজমার্গ (রাজবিদ্যা) অথবা সরল সোপান কেন বলা হয়, এবং গীতায় ভক্তিকে স্বতন্ত্র নিষ্ঠা বলিয়া কেন স্বীকার করা হয় নাই তাহা পাঠকের উপলব্ধি হইবে। কিন্তু জ্ঞানলাভের এই সুলভ অনাদি ও প্রত্যক্ষমার্গেও ধোঁকার যে-এক জায়গা আছে তাহা এক্ষণে বলা আবশ্যক, নতুবা এই পথের পথিকের অসাবধানতা বশত খানায় পড়িবার সম্ভাবনা আছে। ভগবদ্গীতায় এই খানার স্পষ্ট বর্ণনা আছে; এবং বৈদিক ভক্তিমার্গে অন্য ভক্তিমার্গ অপেক্ষা যাহা কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাই। পরব্রহ্মে মনকে আসক্ত করিয়া চিত্তশুদ্ধির দ্বারা সাম্যবুদ্ধি লাভ করিবার জন্য পরব্রহ্মের 'প্রতীক' সদৃশ কোন কিছু সগুণ ও ব্যক্ত বস্তু সাধারণ মনুষ্যের সম্মুখে থাকা আবশ্যক; তাহা না হইলে চিত্ত স্থির হইতে পারে না; এই কথা সকলে স্বীকার করিলেও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই প্রতীকের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক সময় বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখিলে, এই জগতে কোথাও এমন স্থান নাই যেখানে পরমেশ্বর নাই। ভগবদ্গীতাতেও অর্জ্জুন "তোমার কোন্ কোন্ বিভূতির রূপ অবলম্বনে তোমাকে ভজনা করিতে হইবে তাহা আমাকে বল" (গী. ১০. ১৮), এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলে পর ১০ম অধ্যায়ে ভগবান এই স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত আপনার অনেক বিভূতির বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, "আমি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, স্থাবরের মধ্যে হিমালয়, যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ, সর্পের মধ্যে বাসুকি, দৈত্যের মধ্যে প্রহ্লাদ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্ররথ, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু, অক্ষরের মধ্যে অকার, এবং আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু", এবং শেষে বলিলেন—

যদ্যদ্ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

"হে অর্জ্জুন, যাহা কিছু বৈভব, লক্ষ্মী ও প্রভাবের দ্বারা যুক্ত তাহা আমারই তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে" (১০. ৪১); আর বেশী কি বলিব? আমার এক অংশের দ্বারা আমি এই সমস্ত ব্যাপিয়া আছি। এইটুকু বলিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের দ্বারা অর্জ্জুনকে এই সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রত্যয় জন্মাইয়া দিলেন। জগতে দৃষ্টিগোচর সমস্ত বস্তু কিংবা গুণই যদি পরমেশ্বরের প্রতীক হইল, তবে তন্মধ্যে কোন এক বস্তুর মধ্যেই পরমেশ্বর আছেন অন্যের মধ্যে নাই এ কথা কে বলিবে, আর কেমন করিয়া বলিবে? ন্যায়ত ইহাই বলিতে হয় যে, তিনি দূরেও আছেন নিকটেও আছেন, তিনি সৎ ও অসৎ হইলেও ঐ উভয়ের অতীত অথবা তিনি গরুড় ও সর্প, মৃত্যু ও মৃত্যুদাতা বিঘ্নকর্ত্তা ও বিঘ্ন-হর্ত্তা, ভয়দাতা ও ভয়নাশন, ঘোর ও অঘোর, শিব ও অশিব, বৃষ্টিদাতা ও বৃষ্টিরোধক —এই সকলই (গী. ৯. ১৯ ও ১০. ৩২) তিনিই। তাই ভগবদ্ভক্ত তুকারাম বাবাও এই অর্থেই বলিয়াছেন—

তুকা ম্হণে যেঁ যেঁ বোলা।
তেঁ তেঁ সাজে যা বিঠ্ঠলা॥

"তুকা বলে, যাহা যাহা আছে, এই বিঠোবা দেব সেই-সেই রূপে সজ্জিত" (তু. গা. ৩০৬৫. ৪)। এই প্রকার বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, জগতের প্রত্যেক বস্তু অংশত পরমেশ্বরেরই স্বরূপ; তবে আবার পরমেশ্বরের এই সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ একেবারেই যিনি মনে আনিতে পারেন না তিনি যদি এই অব্যক্ত ও শুদ্ধ রূপ উপলব্ধি করিবার জন্য এই অনেক বস্তুর মধ্যে কোন একটি বস্তুকে সাধন কিংবা প্রতীক বুঝিয়া তাহার উপাসনা করেন তাহাতে হানি কি? কেহ মনের উপাসনা করিবে, কেহ বা দ্রব্যযজ্ঞ বা জপযজ্ঞ করিবে। কেহ গরুড়কে ভক্তি করিবে, কেহ বা ওঁকার এই মন্ত্রাক্ষরেরই জপ করিতে বসিবে। কেহ বিষ্ণুর, কেহ বা শিবের, কেহ বা গণপতির এবং কেহ বা ভবানীর ভজনা করিবে। কেহ নিজের পিতামাতার চরণে পরমেশ্বর-বুদ্ধি রাখিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে, এবং কেহ তাহা হইতেও ব্যাপক সর্ব্বভূতাত্মক বিরাটপুরুষের উপাসনা পছন্দ করিবে। কেহ বলিবে সূর্য্যকে পূজা কর এবং কেহ বলিবে সূর্য্যাপেক্ষা কৃষ্ণ কিংবা রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যখন অজ্ঞান বা মোহবশতঃ এই দৃষ্টি চলিয়া যায় যে, সমস্ত বিভূতির মূলে একই পর-ব্রহ্ম কিংবা যখন কোন ধর্ম্মের মূল সিদ্ধান্তেই এই ব্যাপক দৃষ্টি না থাকে তখন অনেক প্রকার উপাস্যবিষয়ে বৃথা অভিমান ও অন্যায় আগ্রহ উৎপন্ন হইয়া কখন কখন মারামারি কাটাকাটিতে পর্য্যবসিত হয়। বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান ও মুসলমানী ধর্ম্মের পরস্পরবিরোধ একপাশে সরাইয়া রাখিলেও, কেবল খৃষ্টধর্ম্ম আলোচনা করিলে য়ুরোপখণ্ডের ইতিহাস হইতে দেখা যাইবে যে, একই সগুণ ও ব্যক্ত খৃষ্টের উপাসকদিগের মধ্যে বিধিভেদের কারণে মারামারি কাটাকাটি পর্য্যন্ত একসময়ে হইয়াছিল। এই দেশের সগুণ-উপাসকদিগের মধ্যেও, এখন পর্য্যন্ত এই বিরোধ দেখা যায় যে, এক জনের দেবতা নিরাকার হওয়ায় অপরের সাকার দেবতা অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ ! ভক্তিমার্গে উৎপন্ন এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার কোন উপায় আছে কি নাই? যদি থাকে তবে সে উপায়টি কি? ইহার ঠিক ঠিক বিচার না হইলে ভক্তিমার্গকে খটকাশূন্য বা ধোঁকারহিত বলা যায় না। তাই, গীতায় এই প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া হইয়াছে এক্ষণে তাহার বিচার করিব। হিন্দুস্থানের বর্ত্তমান অবস্থাতে এই প্রশ্নের সমুচিত বিচার করা খুবই দরকার ইহা বলা বাহুল্য।

সাম্যবুদ্ধি সম্পাদন করিবার জন্য মনকে স্থির করিয়া পরমেশ্বরের অনেক সগুণ বিভূতির মধ্যে কোন এক বিভূতির স্বরূপ প্রথমত চিন্তা করা, অথবা উহাকে প্রতীক বুঝিয়া চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ রাখা—ইত্যাদি সাধন প্রাচীন উপনিষদেও বর্ণিত হইয়াছে; শেষে রামতাপনীর ন্যায় উত্তরকালের উপনিষদে কিংবা গীতাতেও মানবরূপধারী সগুণ পরমেশ্বরের অসীম ও ঐকান্তিক ভক্তিকেই পরমেশ্বর-প্রাপ্তির মুখ্য সাধন বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু সাধন হিসাবে গীতায় বাসুদেবভক্তির প্রাধান্য দিলেও অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে বিচার করিলে বেদান্তসূত্রের ন্যায় (বে. সূ. ৪. ১. ৪.) গীতাতেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, 'প্রতীক'ও একপ্রকার সাধন—উহা সত্য, সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য পরমেশ্বর হইতে পারে না। আর অধিক কি বলিব? নামরূপাত্মক ও ব্যক্ত অর্থাৎ সগুণ বস্তুসমূহের মধ্যে যে কোন-এক বস্তু গ্রহণ কর, তাহা মায়া মাত্র; সত্য পরমেশ্বরকে যে ব্যক্তি দেখিতে চাহে তাহার স্বীয় দৃষ্টিকে সগুণ রূপের অতীত স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। ভগবানের যে অনেক বিভূতি আছে তন্মধ্যে অর্জ্জুনকে প্রদর্শিত বিশ্বরূপ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক অপর কোন বিভূতিই হইতে পারে না। কিন্তু যখন এই বিশ্বরূপই ভগবান্ নারদকে দেখাইলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন "তুমি আমার এই যে রূপ দেখিতেছ ইহা সত্য নহে, ইহা মায়ামাত্র; আমার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে হইলে, ইহারও বাহিরে তোমায় যাইতে হইবে" (শা. ৩৩৯. ৪৪); গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

আমি অব্যক্ত হইলেও আমাকে মূর্খ লোকেরা ব্যক্ত (গী. ৭. ২৪) অর্থাৎ মনুষ্যদেহধারী মনে করে (গী. ৯. ১১); কিন্তু ইহা সত্য নহে; আমার অব্যক্ত স্বরূপই সত্য। সেইরূপ আবার, উপনিষদেও—মন, বাক্য, সূর্য্য, আকাশ ইত্যাদি অনেক ব্যক্ত ও অব্যক্ত ব্রহ্মপ্রতীক উপাসনার জন্য কথিত হইলেও, শেষে বলা হইয়াছে যে, যাহা বাক্য চক্ষু কিংবা কর্ণের গোচর হয় তাহা ব্রহ্ম নহে—

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

"মনের দ্বারা যাহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু মনই যাহার মনন শক্তিতে উৎপন্ন হয় তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যাহার (প্রতীকরূপে) উপাসনা করে তাহা (প্রকৃত) ব্রহ্ম নহে" (কেন, ১. ৫-৮)। "নেতি নেতি" সূত্রেরও ইহাই অর্থ। মন ও আকাশ ধর; কিংবা ব্যক্তোপাসনামার্গ অনুসারে শালগ্রাম, কিংবা শিবলিঙ্গ প্রভৃতি ধর; কিংবা শ্রীরাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারদিগের অথবা সাধুপুরুষদিগের ব্যক্ত মূর্ত্তির চিন্তা কর; মন্দিরসমূহে শিলাময় বা ধাতুময় দেবমূর্ত্তি দেখ; কিংবা মূর্ত্তিহীন মন্দির বা মসজিদই ধর;—এই সমস্ত ক্ষুদ্র শিশুদের খেলা গাড়ীর ন্যায় মনকে স্থির করিবার অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত করিবার সাধনমাত্র। প্রত্যেক মনুষ্য নিজ নিজ ইচ্ছা ও অধিকার অনুসারে উপাসনার জন্য কোন এক প্রতীককে গ্রহণ করে; এই প্রতীক যতই চিত্তপ্রিয় হউক না কেন, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর এই সকল "প্রতীকে নাই"—"ন প্রতীকে ন হি সঃ" (বে. সূ. ৪. ১. ৪)—তিনি ইহার অতীত, ইহা ভুলিলে চলিবে না। এই জন্যই "আমার মায়া যাহারা অবগত নহে সেই মূঢ় লোকেরা আমাকে জানে না" ভগবদ্গীতাতেও এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (গী. ৭. ১৩—১৫ দেখ)। ভক্তিমার্গে মনুষ্যকে ত্রাণ করিবার যে শক্তি আছে তাহা কোন সজীব বা নির্জীব মূর্ত্তিতে কিংবা পাথরের ইমারতে নাই; উক্ত প্রতীকের উপর উপাসক আপনার সুবিধার জন্য যে ঈশ্বর-ভাবনা রাখে তাহাই প্রকৃত তারক। প্রতীক কাঠের, ধাতুর কিংবা অন্য কোন পদার্থেরই হউক না কেন; 'প্রতীক' অপেক্ষা তাহার যোগ্যতা কখনই অধিক হইতে পারে না। এই প্রতীকের উপর তোমার যেরূপ ভাব হইবে ঠিক সেই অনুসারে তোমার ভক্তির ফল পরমেশ্বর—প্রতীক নহে—তোমাকে দিয়া থাকেন। তাহার পর, তোমার প্রতীক ভাল, কি আমার প্রতীক ভাল এইরূপ ঝগড়া করিয়া লাভ কি? তোমার মনের ভাব যদি শুদ্ধ না হয় তবে প্রতীক যতই ভাল হউক না কেন, তাহাতে লাভ কি হইবে? সমস্ত দিন লোকদিগকে ঠকাইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশসাধনের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাতে বা সন্ধ্যায় কিংবা কোন রবিবারে দেবালয়ে দেবদর্শনের জন্য কিংবা কোন নিরাকার দেবতার মন্দিরে উপাসনার জন্য গমন করিলে পরমেশ্বরকে লাভ করা যায় না। পুরাণ শুনিবার জন্য যাহারা দেবালয়ে যায়, রামদাস স্বামী তাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন—

বিষয়ী লোক শ্রবণা বেতী।
তে বায়কাং কডেচ পহাতী।

চোরটে লোক চোরুণ জাতী।
পাদরক্ষা॥

"কোন কোন বিষয়ী লোক পুরাণ শুনিবার সময় স্ত্রীলোক-দিগেরই কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়; চোরেরা পাদত্রাণ (জুতা) চুরি করে" (দাস. ১৮. ১০. ২৬)। শুধু দেবালয়ে কিংবা দেবের মূর্ত্তিতেই যদি তারকত্ব থাকে, তাহা হইলে এই সকল লোকদিগেরও মুক্তি হওয়া উচিত। কাহারও কাহারও ধারণা আছে যে, কেবল মোক্ষেরই জন্য পরমেশ্বরের ভক্তি করিতে হয়, কিন্তু যাহারা ব্যবহারিক কিংবা স্বার্থসম্বন্ধ বস্তু প্রার্থনা করে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনা করিতে হয়। এইরূপ স্বার্থ-বুদ্ধির দ্বারা কতক লোক ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করিয়া থাকে, ইহা গীতাতেও উল্লিখিত আছে (গী. ৭. ২০)। কিন্তু গীতাও পরে এইরূপ :বলিয়াছেন যে, ইহা বুঝিয়া তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে স্বীকার করা যায় না যে, এই দেবতা-দিগের আরাধনা করিলে তাঁহারা স্বয়ং কোন ফল প্রদান করেন (গী. ৭. ২১)। অধ্যাত্মশাস্ত্রের ইহা স্থির সিদ্ধান্ত (বেসূ. ৩. ২. ৩৮-৪১). এবং এই সিদ্ধান্তই গীতারও মান্য (গী. ৭. ২২) যে, যে-কোন বাসনা মনে পোষণ করিয়া তুমি যে-কোন দেবতাকেই আরাধনা কর না কেন, উক্ত আরাধনার ফল প্রদান করেন সর্ব্ব-ব্যাপী পরমেশ্বর—দেবতা নহে। ফলদাতা পরমেশ্বর এই প্রকার একই হইলেও প্রত্যেকের ভালমন্দ ভাবনা অনু-সারে তিনি প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করেন (বেসূ. ২. ৯. ৩৪-৩৭), তাই ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কিংবা প্রতীকের উপাসনার ফলও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এইরূপ আমরা দেখিতে পাই। এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়াই ভগবান বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।

"মনুষ্য শ্রদ্ধাময়; প্রতীক যাহাই হউক না কেন, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে সেইরূপই হয় (গী. ১৭. ৩; মৈত্র্য. ৪, ৬); কিংবা—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥

'দেবভক্ত দেবলোকে, পিতৃগণভক্ত পিতৃলোকে, ভূতভক্ত ভূতগণের মধ্যে এবং আমার ভক্ত আমার নিকট উপনীত হয়" (গী. ৯. ২৫); অথবা—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

"আমাকে যে যেরূপ ভজনা করে, সেইরূপ আমি তাহা-দিগকে ভজনা করি" (গী. ৪. ১১)। সকলেই জানে যে শালগ্রাম একটা পাথর মাত্র। তাহাতে বিষ্ণুর ভাব রাখিলে বিষ্ণুলোক পাইবে; এবং সেই প্রতীকের উপর যক্ষরক্ষাদি ভূতগণের ভাবনা স্থাপন করিলে, তুমি ভূত-লোকই প্রাপ্ত হইবে। ফল তোমার ভাবনার, প্রতীকের নহে—এই সিদ্ধান্ত আমাদের সমস্ত শাস্ত্রকারদিগেরই সম্মত। লৌকিক ব্যবহারে কোন মূর্ত্তির পূজা করিবার পূর্ব্বে উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার যে রীতি আছে, তাহারও মর্ম্ম ইহাই। যে দেবতার ভাবনা দ্বারা ঐ মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে সেই দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঐ মূর্ত্তিতে করা হইয়া থাকে। কোন মূর্ত্তিতে পরমেশ্বরের ভাবনা না রাখিয়া, এই মূর্ত্তি কোন বিশেষ আকারের মাটী, কাঠ বা ধাতু ভাবিয়া কেহ তাহার পূজা করে না। এবং করিলেও গীতার উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সে নিঃস-ন্দেহ মাটী কিংবা কাঠের গতিই প্রাপ্ত হইবে। প্রতীক এবং প্রতীকে স্থাপিত বা আরোপিত মনোভাব—এই প্রকার ভেদ করিলে, প্রতীক যাহাই হউক না কেন তৎসম্বন্ধে বিবাদ করিবার কারণ থাকে না; কারণ, এখন তো প্রতীকই দেবতা, এই ভাবই থাকে না। সমস্ত কর্ম্মের ফলদাতা ও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের দৃষ্টি ভক্তের ভাবের উপরেই থাকে। তাই, "দেব ভাবাচা ভুকেলা" অর্থাৎ দেবতা ভাবেরই জন্য ক্ষুধিত, প্রতীকের জন্য নহে—এইরূপ তুকারাম বাবা বলিয়াছেন। ভক্তিমার্গের এই তত্ত্ব যাহার বিদিত আছে তাহার মনে "আমি যে ঈশ্বরস্বরূপের বা প্রতীকের উপাসনা করিতেছি তাহাই সত্য এবং অন্য সকলই মিথ্যা" এই দুরাগ্রহ না থাকিয়া "যাহার প্রতীক যাহাই হউক না কেন, তদ্দ্বারা পর-মেশ্বরকে যে ভজনা করে সে পরমেশ্বরেতেই উপনীত হয়"—এইরূপ উদারবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং তখন ভগবানের এই উক্তি তাহার উপলব্ধি হইতে থাকে—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

অর্থাৎ "বিধি অর্থাৎ বাহ্যোপচার বা সাধন শাস্ত্রানুযায়ী না হইলেও, যাহারা অন্য দেবতাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত (অর্থাৎ তাহাদের উপর শুদ্ধ পরমেশ্বরের ভাব রাখিয়া) যজন করে তাহারা (পর্য্যায়ক্রমে) আমারই যজন করিয়া থাকে" (গী. ৯. ২৩)। ভাগবতেও এই অর্থই অল্প শব্দভেদে বর্ণিত হইয়াছে (ভাগ. ১০. পূ. ৪০. ৮-১০); শিবগীতায় তো উক্ত শ্লোক অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে (শিব. ১২. ৪); এবং "একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋ. ১. ১৬৪. ৪৬) এই বেদ-বচনের তাৎপর্য্যও ইহাই। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, এই তত্ত্ব বৈদিক ধর্ম্মে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; এবং এই তত্ত্বেরই এই ফল যে, আধুনিককালে শ্রীশিবাজী মহারাজের ন্যায় বৈদিকধর্ম্মীয় বীরপুরুষের স্বভাবে, তাঁহার পরম উৎকর্ষের সময়েও, পরধর্ম্মাসহিষ্ণুতা দোষ দেখিতে পাওয়া যায়

নাই। ইহা মনুষ্যের শোচনীয় মূর্খতার লক্ষণ যে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, এমন কি তাহারও অতীত অর্থাৎ অচিন্ত্য, এই প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া অমুক সময়ে, কিংবা অমুক দেশে, অমুক মায়ের পেটে, অমুক বর্ণের বা আকৃতির তিনি যে ব্যক্ত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন তাহাই কেবল সত্য, এইরূপ নামরূপাত্মক মিথ্যা অভিমান পোষণ করে, এবং এই অভিমানে পড়িয়া তলোয়ারের দ্বারা পরস্পরের প্রাণ পর্য্যন্ত হরণ করিতে উদ্যত হয়। গীতার ভক্তি-মার্গের সংজ্ঞা 'রাজবিদ্যা' সত্য; কিন্তু ইহা যদি অনু-সন্ধান করা যায় যে, যে প্রকার স্বয়ং ভগবান "আমার দৃশ্য স্বরূপও মায়াময়, আমার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে হইলে এই মায়াকে ছাড়াইয়া যাও" এই যথার্থ উপদেশ করিয়াছেন সেইপ্রকার উপদেশ আর কে দিয়াছেন, এবং "অবিভক্তং বিভক্তেষু" এই সাত্ত্বিক জ্ঞানদৃষ্টিতে সমস্ত ধর্ম্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া ভক্তিমার্গের মিথ্যা বাদ-বিতণ্ডার মূলই যিনি সমূলে উৎপাটন করিয়াছেন সেই ধর্ম্মগুরু সর্ব্ব প্রথম কোথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিংবা তাঁহার মতাবলম্বী লোক কোথায় অধিক, তাহা হইলে আমাদের ভারতভূমিকেই অগ্রস্থান দিতেই হয়। আমাদের দেশবাসীরা রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্যের এই প্রত্যক্ষ পরশ-পাথর অনায়াসেই পাইয়াছেন; কিন্তু যখন আমি দেখি যে, আমাদেরই মধ্যে কোন কোন লোক অজ্ঞানের চস্‌মা নিজেদের চোখে লাগাইয়া উহাকে চক্‌মকি পাথর মাত্র বলিতে প্রস্তুত তখন ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলিব!

প্রতীক যাহাই হউক না কেন, প্রতীকের উপর আমরা যে ভাবনা স্থাপন করি, ভক্তিমার্গের ফল তাহা-তেই হয়, প্রতীকে নহে; এবং সেইজন্য ইহা সত্য যে, প্রতীকসম্বন্ধে বিবাদ করায় কোন লাভ নাই। কিন্তু এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রতীকের উপর বেদান্ত-দৃষ্টিতে যে শুদ্ধ পরমেশ্বরের ভাবনা রাখিতে হয়, সেই শুদ্ধ পরমেশ্বর-স্বরূপের কল্পনা অনেক লোকের পক্ষে—তাহাদের প্রকৃতিস্বভাব অনুসারে কিংবা অজ্ঞানপ্রযুক্ত ঠিকঠিক করিতে পারা প্রায় অসম্ভব; এই অবস্থায় এই সকল লোকের পক্ষে প্রতীকের উপর শুদ্ধ ভাবনা স্থাপন পূর্ব্বক পরমেশ্বরকে লাভ করিবার কি উপায়? 'ভক্তিমার্গে জ্ঞানের কাজ শ্রদ্ধার দ্বারা করিয়া লওয়া যায়, অতএব বিশ্বাসের দ্বারা কিংবা শ্রদ্ধার দ্বারা শুদ্ধ পরমেশ্বর-স্বরূপের ধারণা করিয়া প্রতীকের উপর সেই ভাবনা স্থাপন করা—তোমার ভাবনা সফল হইবে'—এই কথা বলিলে চলিবে না। কারণ, কোন একটা ভাবনা স্থাপন করা মনের অর্থাৎ শ্রদ্ধার ধর্ম্ম হইলেও, বুদ্ধির ন্যূনাধিক সাহায্য ব্যতীত কখনই কাজ চলে না। অন্য সকল মনো-ধর্ম্মের ন্যায় শুধু শ্রদ্ধা বা প্রেমও এক প্রকার অন্ধই; কোন্ বিষয়ের উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করিবে এবং কোন্ বিষয়ের উপর করিবে না, অথবা কাহার উপর প্রেম স্থাপন করা উচিত কিংবা অনুচিত, ইহা শুধু প্রেম কিংবা শ্রদ্ধা দ্বারা জানা যায় না। এই কাজ প্রত্যেকের নিজের বুদ্ধি দ্বারাই করিতে হয়; কারণ, নির্ণয় করিবার জন্য বুদ্ধি ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয় নাই। সার কথা, কাহারও বুদ্ধি অতিশয় তীব্র না হইলেও উহাতে শ্রদ্ধা প্রেম বা বিশ্বাস কোথায় স্থাপন করিতে হইবে এইটুকু জানিবারও ত সামর্থ্য থাকা চাই; নতুবা, অন্ধ শ্রদ্ধা এবং সেইসঙ্গে অন্ধ প্রেমও ভুল পথে গিয়া উভয়েই গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইবে। উল্টাপক্ষে ইহাও বলা যায় যে, শ্রদ্ধারহিত শুধু বুদ্ধিই যদি কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নিছক যুক্তিবাদ ও তার্কিকতার মধ্যে পড়িয়া সে কোন্ দিকে ঝুঁকিবে তাহার ঠিকানা নাই; বুদ্ধি যতই অধিক তীব্র হইবে ততই অধিক বিভ্রান্ত হইবে। তাছাড়া এই প্রকরণের আরম্ভেই বলা হইয়াছে যে, শ্রদ্ধা প্রভৃতি মনোধর্ম্মের সাহায্য ব্যতীত শুধু বুদ্ধিগম্য জ্ঞানে, কর্ত্তৃত্ব-শক্তিও উৎপন্ন হয় না। তাই শ্রদ্ধা ও জ্ঞান, কিংবা মন ও বুদ্ধি ইহাদের সর্ব্বদা মিলন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু মন ও বুদ্ধি এই দুইই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিরই বিকার হওয়ায়, উহাদের প্রত্যেকের জন্মত সাত্ত্বিক রাজসিক ও তাম-সিক এই তিন ভেদ হইতে পারে; এবং উহাদের মিলন স্থায়ী হইলেও ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের মধ্যে যে পরি-মাণে উহা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হইবে সেই পরিমাণে মনুষ্যের স্বভাব, ধারণা ও ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। এই বুদ্ধিই কেবল জন্মত অশুদ্ধ রাজসিক কিংবা তামসিক হইলে, উহার কৃত ভালমন্দের নির্ণয় ভ্রান্তিমূলক হওয়া প্রযুক্ত, অন্ধ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক অর্থাৎ শুদ্ধ হইলেও ভ্রমে পতিত হইবে। ভাল, শ্রদ্ধাই যদি জন্মত অশুদ্ধ হয় তাহা হইলে বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইলেও কোন লাভ নাই, কারণ এই অবস্থায় বুদ্ধির হুকুম মানিয়া চলিবার জন্য শ্রদ্ধা প্রস্তুত থাকেই না। কিন্তু সাধারণত এই অনুভব হয় যে, মন বুদ্ধি ইহারা পৃথক পৃথক অশুদ্ধ থাকে না; যাহার বুদ্ধি জন্মত অশুদ্ধ তাহার মন অর্থাৎ শ্রদ্ধাও প্রায় ন্যূনাধিক অশুদ্ধই হইয়া থাকে; এবং তাহার পর এই অশুদ্ধ বুদ্ধি স্বভাবতই অশুদ্ধ শ্রদ্ধাকে অধিকাধিক ভ্রমে পাতিত করে। এই অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপের যেমন ইচ্ছা উপদেশ করিলেও উহা তাহার মনে ভাল করিয়া বসে না; কিংবা ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে অনেক সময়ে—বিশেষতঃ শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি দুইই জন্মতঃ অপক্ক ও স্বল্পবল হইলে—উপদেশের বিপরীত

অর্থ করিয়া থাকে। খৃষ্টান্ ধর্ম্মোপদেষ্টা আফ্রিকার কালো-কুচ্‌কুচ্‌ অসভ্য হাপ্‌সীকে যখন খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন তখন সেই হাপ্‌সী, "স্বর্গের পিতা" কিংবা খৃষ্টেরও যথার্থ কল্পনা কিছুই করিতে পারে না। তাহাকে যাহা বলা হয়, সে নিজের অপক্ক বুদ্ধি অনুসারে তাহা অযথার্থভাবে গ্রহণ করে। এবং সেই জন্য, উন্নত ধর্ম্ম বুঝিবার যোগ্যতা এই সব লোকের আনিতে হইলে তাহাদিগের মধ্যে প্রথমে আধুনিক মনুষ্যের যোগ্যতা আনয়ন করা উচিত, এইরূপ এক ইংরেজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন। * ভবভূতির এই উক্তিরও অর্থ ইহাই—গুরু এক হইলেও, শিষ্যে শিষ্যে ভেদ দেখা যায়, এবং সূর্য্য এক হইলেও তাহার আলোকে কাচের মণি হইতে আগুন বাহির হয় কিন্তু মাটির ঢিবির উপর কোন পরিণাম ঘটে না (উ. রাম. ২. ৪)। প্রায় এই কারণেই প্রাচীনকালে শূদ্রাদি অজ্ঞজাতি বেদশ্রবণে অনধিকারী বিবেচিত হইয়া থাকিবে, এইরূপ মনে হয়। † গীতাতেও (১৮ অধ্যায়ে) এই বিষয়ের উল্লেখ আছে; বুদ্ধির যেরূপ স্বভাবতই সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ হয় (১৮. ৩০-৩২) সেইরূপ শ্রদ্ধারও স্বভাবতই সাত্ত্বিকাদি তিন ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় (১৭. ২)। এইরূপ আরম্ভে বলিবার পর, প্রত্যেকের দেহস্বভাব অনুসারে শ্রদ্ধাও স্বভাবতই ভিন্ন হওয়ায় (১৭. ৩) সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি দেবতার উপর, রাজসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি স্বভাবতই যক্ষ-রাক্ষসের উপর এবং তামসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি ভূতপিশাচাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এইরূপ ভগবান্ বলিয়াছেন (গী. ১৭. ৪-৬)। মনুষ্যের শ্রদ্ধাব ভালমন্দত্ব যদি এইরূপ জন্মজ স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তবে এই প্রশ্ন সহজেই আসে যে, যথাশক্তি ভক্তির দ্বারা এই শ্রদ্ধাকে উন্নত করিতে করিতে কোন-না-কোন সময়ে পূর্ণ শুদ্ধ অবস্থায় পৌছতে পারে কি না, জ্ঞানার্জ্জন কার্য্যে মনুষ্য স্বাধীন কি না এইরূপ কর্ম্মবিপাক প্রক্রিয়ার যে প্রশ্ন আছে তাহা এবং ভক্তিমার্গের উক্ত প্রশ্নের স্বরূপ এক-সমান। এবং বলিতে হইবে না যে এই দুই প্রশ্নের উত্তরও একই। আমার শুদ্ধ স্বরূপের উপর তোমার মন স্থাপন কর—"ময্যেব মন আধৎস্ব" (গী. ১২. ৮)—এইরূপ অর্জ্জুনকে প্রথমে উপদেশ করিয়া, তাহার পর "আমার স্বরূপের উপর যদি চিত্ত স্থাপন করিতে না পার তবে অভ্যাস অর্থাৎ বারংবার প্রযত্ন কর; অভ্যাসও যদি না করিতে না পার, তবে আমার জন্য চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম কর; এবং তাহাও যদি না পার, তবে কর্ম্মফল ত্যাগ কর এবং তদ্দ্বারা আমাকে লাভ কর" পরমেশ্বরস্বরূপকে মনে স্থির করিবার জন্য ভগবান্ এইরূপ বিভিন্ন মার্গের বর্ণনা করিয়াছেন (গী. ১২. ৯-১১; ভাগ. ১১. ১১. ২১-২৫)। মূল দেহস্বভাব কিংবা প্রকৃতি তামসিক হইলে পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপের উপর চিত্ত স্থির করিবার উদ্যোগ একেবারে কিংবা একজন্মেই সফল হইবার নহে। কিন্তু কর্ম্মযোগের ন্যায় ভক্তিমার্গেও কিছুই ব্যর্থ হয় না। স্বয়ং ভগবান্ সকলকে আশ্বাস দিয়াছেন—

> বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
> বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

একবার ভক্তিমার্গে আসিয়া পড়িলে এ জন্মে, না হয় পরজন্মে, পরজন্মে না হয় তাহার পরের জন্মে কখন-না-কখন "এই সমস্ত বাসুদেবাত্মকই" এইরূপ পরমেশ্বর-স্বরূপের প্রকৃত জ্ঞান মনুষ্য লাভ করিয়া, সেই জ্ঞানের দ্বারা শেষে মোক্ষও লাভ করে (গী. ৭. ১৯)। ষষ্ঠ অধ্যায়েও কর্ম্মযোগের অভ্যাসের উদ্দেশে "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্" (৬. ৪৫), এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং ভক্তিমার্গেও এই নীতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ভক্ত চাহে যে, প্রতীকের মধ্যে যে দেবতার ভাবনা স্থাপন করিতে হইবে, তাহার স্বরূপ নিজের দেহস্বভাবানুসারে প্রথম হইতেই যতটা সম্ভব শুদ্ধ মনে করিতে হইবে। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত এই ভাবনারই ফল পরমেশ্বর (প্রতীক নহে) দিয়া থাকেন (৭. ২২)। কিন্তু তাহার পর চিত্তশুদ্ধির জন্য অন্য কোন সাধনেরই আবশ্যকতা থাকে না; পরমেশ্বরের সেই ভক্তিই যথামতি সর্ব্বদা বজায় রাখিলে তাহার দ্বারা ভক্তের অন্তঃকরণের ভাবনা আপনাপনিই উন্নত হয়, তাহার পর পরমেশ্বরের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইয়া শেষে "বাসুদেবঃ সর্বং" এইরূপ মনের অবস্থা দাঁড়াইয়া উপাস্য ও উপাসক এই ভেদও আর থাকে না, এবং শেষে শুদ্ধ ব্রহ্মানন্দে আত্মা বিলীন হইয়া যায়। মনুষ্য কেবল আপনার প্রযত্নের মাত্রা কম না করিলেই হইল। সারকথা, কর্ম্মযোগের শুধু জিজ্ঞাসা মনে আসিলেই মনুষ্য চরকার মুখে পড়িবার মত ধীরে ধীরে পূর্ণ সিদ্ধির দিকে

---

* And the only way, I suppose, in which beings of so low an order of devlopment (E. G. an Australian savage, or a Bushman) could be raised to a civilized level of feeling and thought would be by cultivation continued through several generations; they would have to undergo a gradual process of humanization before they could attain to the capacity of civilization." Drl Maudsley's *Body and Mind*, Ed. 1873. P. 57.

† See Maxmuller's *Three Lectures on the Vedanta Philosophy*, pp. 72, 73.

স্বভাবতই যেরূপ আকৃষ্ট হয় (গী. ৬. ৪৪), সেইরূপ ভক্তিমার্গেও ভক্ত একবার পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে তাহার নিষ্ঠা বাড়াইয়া বাড়াইয়া শেষে ভগবানই আপনার স্বরূপের পূর্ণ জ্ঞানও তাহার জন্মাইয়া দেন (গী. ৭. ২১; ১০. ১০)। সেই জ্ঞানের দ্বারা (শুধু শুষ্ক ও অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা নহে) অবশেষে ভগবদ্‌ভক্তের পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়, এইরূপ গীতাধর্ম্মের সিদ্ধান্ত ভক্তিমার্গে। এই প্রকার উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে শেষে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানমার্গের চরম অবস্থা—এই দুই অবস্থা একই হওয়ায় গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিমান পুরুষের চরম অবস্থার যে বর্ণনা আছে তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনার সহিত এক ইহা গীতার পাঠকদিগের সহজেই উপলব্ধি হইবে। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ এই দুই মার্গ আরম্ভে ভিন্ন হইলেও, যখন অধিকারভেদে কেহ প্রথম কেহ বা দ্বিতীয় মার্গ অনুসরণ কর, তখন এই দুই মার্গ শেষে একত্র মিলিয়া যায় এবং যে গতি জ্ঞানী প্রাপ্ত হয়, ভক্তও সেই গতিই প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানমার্গে প্রথমেই বুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বর-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয় এবং ভক্তিমার্গে এই স্বরূপই শ্রদ্ধার দ্বারা গ্রহণ করা হইয়া থাকে—এই দুয়ের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। কিন্তু প্রারম্ভের এই ভেদ পরে বিলুপ্ত হইয়া যায়; এবং ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিং অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥

"শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রযত্ন করিলে, তাহার ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ জ্ঞানের অপরোক্ষানুভব ঘটিয়া সেই জ্ঞানের দ্বারা পরে তাহার শীঘ্রই পূর্ণ শান্তি লাভ হয়।" (গী. ৪. ৩৯); কিংবা—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥*

"ভক্তির দ্বারা আমার স্বরূপের তাত্ত্বিক জ্ঞান হয়; এবং এই জ্ঞান হইবার পর (পূর্ব্বে নহে) সেই ভক্ত আমাতে আসিয়া মিলিত হয়" (গী. ১৮. ৫৫ এবং ১১. ৫৪ দেখ)। পরমেশ্বরের পূর্ণজ্ঞান হইবার পক্ষে এই দুই পন্থা ব্যতীত তৃতীয় পন্থা নাই। তাই, যাহার নিজের বুদ্ধি নাই এবং শ্রদ্ধাও নাই সে ব্যক্তি—"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" (গী. ৪. ৪০) একেবারে বিনাশ পায় জানিবে" এইরূপ গীতায় পরে সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা শেষে পূর্ণ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হয়। এই সম্বন্ধে কোন কোন তার্কিক এই তর্ক তুলেন যে, উপাস্য ভিন্ন ও উপাসক ভিন্ন—এই দ্বৈতভাবের দ্বারাই ভক্তিমার্গের যদি আরম্ভ হয়, তবে শেষে ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ অদ্বৈত জ্ঞান কি করিয়া উৎপন্ন হইবে? কিন্তু এই আপত্তি নিছক্ ভ্রান্তিমূলক। ঐক্য জ্ঞান হইলে পর, ভক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়,—ইহাই যদি আপত্তির বিষয় হয় তাহা হইলে উহাতে কোন আপত্তি দেখি না। কারণ, উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা এই ত্রিপুটীর লয় হইলে পর, ব্যবহারে যাহাকে ভক্তি বলে সেই ভক্তিব্যাপার বন্ধ হইয়া যায়—ইহা অধ্যাত্মশাস্ত্রেও স্বীকৃত হয়। কিন্তু দ্বৈতমূলক ভক্তিমার্গের দ্বারা শেষে অদ্বৈতের জ্ঞান হইতেই পারে না, এইরূপ যদি এই আপত্তির অর্থ হয় তবে এই আপত্তি শুধু তর্ক-শাস্ত্রের দৃষ্টিতে নহে, প্রসিদ্ধ ভগবদ্‌ভক্তদিগের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দ্বারাও মিথ্যা সিদ্ধ হয়। পরমেশ্বরে কোন ভক্তের চিত্ত যেরূপ অধিকাধিক সমাহিত হইবে, সেই অনুসারে তাহার মন হইতে ভেদবুদ্ধিও চলিয়া যাইবে—তর্কদৃষ্টিতে এই বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্মের সৃষ্টিতেও আমি দেখি যে, আরম্ভে পারার গুলি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও পরে উহারা একত্র মিলিত হয়; সেইরূপ অন্য পদার্থেও একীকরণের ক্রিয়ার আরম্ভ প্রাথমিক ভিন্নতা হইতেই সুরু হয়; ভৃঙ্গি-কীটের দৃষ্টান্ত তো সকলেরই বিদিত আছে। এই বিষয়ে তর্কশাস্ত্র অপেক্ষা সাধুপুরুষদিগের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই অধিক প্রামাণ্য বুঝিতে হইবে। ভগবদ্‌ভক্ত-শিরোমণি তুকারাম বাবার ন্যায় ব্যক্তির অনুভব আমার নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তুকারাম বাবার অধ্যাত্মজ্ঞান উপনিষদাদি গ্রন্থের অধ্যয়নে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা কাহাকে বলিতে হইবে না। তথাপি তাঁহার গাথার মধ্যে প্রায় ৪০০ অভঙ্গ অদ্বৈত অবস্থার বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে। সেই সমস্ত অভঙ্গের মধ্যে "বাসুদেবঃ সর্বং" (গী. ৭. ১৯), কিংবা বৃহদারণ্যক-উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত "সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" এই ভাবই স্বানুভূতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। উদাহরণার্থ তাঁহার এক অভঙ্গের ভাব দেখ (গা. ৩৬২৭)—

গোড়পণে জৈসা গূল।
তৈসা দেব জালা সকল।
আতাঁ ভজোঁ কোণে পরী।
দেব সবাহ্য অন্তরী ॥
উদকা বেগলা।
নহে তরঙ্গ নিরালা।

---

* এই শ্লোকের অন্তর্গত 'অভি'উপসর্গের উপর জোর দিয়া ভক্তি জ্ঞানের সাধন নহে, উহা স্বতন্ত্র সাধ্য, বা নিষ্ঠা এইরূপ দেখাইবার জন্য শাণ্ডিল্যসূত্রে (সূ. ১৫.) প্রযত্ন করা হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থ অন্য সাম্প্রদায়িক অর্থের ন্যায় গরজমূলক, সরল নহে।

হেম অলঙ্কারা নামী ।
তুকা ক্ষণে তৈসে আম্হী ॥

ইহার মধ্যে, প্রথম দুই চরণ অধ্যাত্ম-প্রকরণে দিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের সহিত উহার অর্থের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। স্বয়ং তুকারাম বাবা স্বানুভূতির দ্বারা ভক্তদিগের পরমাবস্থার বর্ণনা করিবার পর, কোন তার্কিক 'ভক্তিমার্গের দ্বারা অদ্বৈত জ্ঞান হইতে পারে না' কিংবা 'দেবতার উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিলেই মোক্ষ লাভ হয়, তাহাতে জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই' ইত্যাদি অসংবত কথা বলিতে সাহসী হইতে পারে ইহাই আশ্চর্য্য !

অলক্ষিত।

(শ্রীমতী অভ্ররেণু দেবী)

একি হাহাকার—
একি ওগো গুমরিয়া করুণ ক্রন্দন
জাগে আজ হৃদয়ে আমার !—
কোথা প্রাণে কিসের বন্ধন ?
ধিকি-ধিকি প্রধূমিত একি তুষানল
হৃদি মাঝে জ্বলি' জ্বলি' ধূমছায়ে আনে আঁখি-জল !
কেন মন এ-হেন চঞ্চল ?
কোন্ তার ছিঁড়ে গেছে হৃদয়বীণার
যার তরে বাঁধা সুর হেন বিশৃঙ্খল—
গান মোর একান্ত বিকল !—
সুর তার মেলে না'ক' বেজে উঠে শুধু হাহাকার—
কি যেন হারায়ে গেছে যার তরে এ মহাশূন্যতা—
ক্ষণে ক্ষণে দেয় নব ব্যথা,
হাসি-স্থানে কেঁদে উঠে অব্যক্ত ক্ষুব্ধতা।

অজানা কি কাজ ছিল—হয় নাই তাহা যেন করা ;
তাহা যেন হর্ষমাখা তাহা যেন বেদনায় ভরা
—জীবন থাকিতে যেন মরা ;
কোন্ সুদূরের পানে ছুটে যেতে চায় মোর প্রাণ—
হৃদয় আড়াল থেকে শুনেছে সে কার যেন গান,—
তারি তরে আকাশে নিয়ত
উৎকণ্ঠার পেতে আছে কান,—
পুঞ্জীভূত করি অবিরত
তীক্ষ্ণ একাগ্রতা ;
অন্য কাজে নাহি ইচ্ছা, নাহি দৃষ্টি আর কারো পানে
শুধু সেই অজানার তরে এ-হেন ব্যগ্রতা !

আকাশের এক প্রান্ত হতে সীমান্তরগামী
সঙ্গচ্যুত লক্ষ্যহারা বিহগের মত
প্রাণ-পাখী মোর ওগো করে দিনযামি'
শ্রান্ত পক্ষ মেলিয়া নিয়ত
যাওয়া আর আসা ;
স্থাণুসম শক্তিহীন স্থির—অচঞ্চল—
থাকে পড়ে এ-কায়া আমার
বহি শুধু আপনার ভার—
পাখিটীর পরিত্যক্ত বাসা।

কেটে যায় কতক্ষণ তার, কোনও নাহিক নির্দ্দেশ—
শ্রান্তিভরে অৰ্দ্ধপথে যাত্রা করি' শেষ—
ফিরে আসে প্রাণপাখী মোর,—
আশাহত বেদনায় গুমরিয়া কাঁদে নিশিভোর
আপনার ভাবেতে বিভোর।
অন্ধকার আসে ঘনাইয়া আলোময় প্রকৃতির কোলে—
অন্ধ হয়ে পাখিটী সে
কারে যেন দেখিবার আশে বৃথা তার আঁখিপাতা খোলে,
—নির্জীব হইয়া পড়ে পুনরায় নিরাশার বিষে।

কেন হাহাকার ? কার তরে এ-হেন বিকার ?
কার তরে হেন আকুলতা, বহে যা'তে নয়নের ধার ?
কার তরে নিতি হেন বেদনা অপার ?
সে কে গোরে এসেছিল লুব্ধ এই নয়নের পথে ?—
কিংবা শুধু অলক্ষ্যেতে থাকি'
সুরে প্রাণ করেছে আস্থির
অদৃশ্য রজ্জুতে বাঁধি' টানে সদা মোর মনোরথে ?
ব্যর্থ অন্বেষণে ঘুরি' বহে মোর নয়নের নীর,—
আপনারে লুকাইয়া রাখি' মোরে কেন দেয় শুধু ফাঁকি ?

নয়নে কখনো হায় দেখি নাই যারে
তার তরে কেন আকুলতা ?—
মনে হয় শুনিয়াছি মাঝে মাঝে যেন তার অস্ফুট গুঞ্জন—
কোথা হতে আসে ধ্বনি ? মনে হয় দিগন্তের পারে
বুঝি ওগো মেঘ-অন্তরালে লুকাইয়া সে আমার নয়ন-রঞ্জন,
দেয় মোরে এতখানি ব্যথা,—
কহে না'ক কথা ;
হাসে বুঝি হেরি' মোর হেন ব্যাকুলতা—
পূর্ণ বাতুলতা ?

যে-ই হও তুমি ওগো ! রেখ নাক আর প্রতীক্ষায়,
কানে তোলো এ দীন ভিক্ষায় ;
অলক্ষ্যে থাকিয়া মোরে কোরো নাক এ-হেন অস্থির
বহায়ো না নয়নের নীর ;
আঁখিজল অচিরে শুখায়ে
দেখাইয়া দাও ওগো তবরূপ—রেখেছ লুকায়ে
সঙ্গীতের উৎস ; দেখাও গো একবার
স্বরূপ তোমার—
পূর্ণ হোক হৃদয়ের আশা—
মিটে যাক অতৃপ্ত পিয়াসা
ঘুচে যাক ছুটে ছুটে ব্যর্থ এই যাওয়া আর আসা।

ললিত বিস্তর।

প্রথম অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ)

তিনি অষ্টাদশবিধ সংশয়বিহীন শৌর্য্যে বেণ-কুলের * উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন (১), এবং বুদ্ধধর্ম্মের অনুশীলনে সম্ভাব্য ত্রুটি নির্ধারণ করিয়াছিলেন। (২) পূর্ব্বকালে পদ্মোত্তর, ধর্ম্মকেতু, দীপঙ্কর, গুণকেতু, মহাকর, ঋষিদেব, শ্রীতেজাঃ, সত্যকেতু, বজ্রসংহত, সর্ব্বাভিভূ, হেমবর্ণ, অত্যুচ্চগামী, প্রতাপসার, পুষ্পকেতু, বররূপ, সুলোচন, ঋষিগুপ্ত, জিনবক্ত্র, উন্নত, পুষ্পিত, ঊর্ণীতেজাঃ, পুষ্কর, সুরশ্মি, মঙ্গল, সুদর্শন, মহাসিংহতেজাঃ, স্থিতবুদ্ধিদত্ত, বসন্তগন্ধী, সত্যধর্ম্মবিপুলকীর্ত্তি, তিষ্য, পুষ্য, লোকসুন্দর, বিস্তীর্ণভেদ, রত্নকীর্ত্তি, উগ্রতেজাঃ, ব্রহ্মতেজাঃ, সুঘোষ, সুপুষ্য, সুমনোজ্ঞঘোষ, সুচেষ্টরূপ, প্রহসিতনেত্র, গুণরাশি, মেঘস্বর, সুন্দরতেজাঃ, সলীলগামী, লোকাভিলাষিত, জিতশত্রু, সম্পূজিত, বিপশ্চিৎ, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও কাশ্যপ নামক (৩) অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগত বুদ্ধগণও ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব, ভগবন্! এই গ্রন্থ প্রকাশ করুন।

বহুলোকের মঙ্গলের জন্য, জনসাধারণের সুখের নিমিত্ত, নরজাতির প্রতি অনুকম্পাবশতঃ, মহান্ জনহিতকর কার্য্যের নিমিত্ত, দেবগণ ও মনুষ্যগণের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্ত, এই মহাযান (১) দর্শনের উদ্ভাবনের নিমিত্ত, পরধর্ম্মিগণের নিগ্রহের নিমিত্ত, যাবতীয় বোধিসত্ত্বগণের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত, যাবতীয় মার-বৃন্দের পরাজয়ের নিমিত্ত, যাঁহারা বোধিসত্ত্বযান অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের বীর্য্য ও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ, সদ্ধর্ম্মের পরিগ্রহার্থ, ত্রিরত্ন-বংশের গৌরবরক্ষার্থ, ত্রিরত্নবংশের (২) ধ্বংস-নিবারণার্থ, ও বুদ্ধকার্য্যের পরিদর্শনার্থ ভগবান্ মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক সেই দেবপুত্রগণের অনুরোধরক্ষায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। (৩) ইহাতে দেবগণ ও মনুষ্যগণের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুকম্পা প্রকাশ পাইল। (৪)

তৎপরে ভগবান্ বুদ্ধের মৌনভাবে ব্যক্ত সম্মতি বিদিত হইয়া দেবপুত্রগণ সন্তুষ্টচিত্তে আশান্বিতমনে (৫) সংযতভাবে এবং আনন্দিত ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানের চরণদ্বয়ে শিরঃস্পর্শ দ্বারা বন্দনা করিয়া তিনবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং দিব্যচন্দনচূর্ণ, অগুরুচন্দনচূর্ণ, ও মন্দারকুসুম বিক্ষেপ করিয়া সেইখানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।

তদনন্তর ভগবান্ সেই রাত্রেরই অবসানসময়ে কারীরমণ্ডলমাত্রের আশ্রয় পাইয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন। (১) তথায় উপস্থিত হইয়া

---

(১) মূলে আছে—বলবৈশারদ্যাষ্টাদশাবেণিকসমুচ্ছয়ঃ। রাজেন্দ্রলালের অনুবাদ—His might and majesty in all their eighteen declensions,

(২) 'অপ্রমাণবুদ্ধধর্ম্মনির্দ্দেশঃ'—translated as, "points out the heresies of the Buddha religion,

(৩) শাক্যসিংহের পূর্ব্বে এই ৫৪ জন তথাগত আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা বুদ্ধধর্ম্মের প্রণালী জনসাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন। নামগুলি নিরর্থক নহে।

* বেণ (Vena)—Name of a Rajarshi or royal rishi (father of Prithu and said to have perished through irreligious conduct and want of submissivenessto the Brahmins: he is represented as having occasioned confusion of castes, see Manu VII 41; IX 66, 67, and as founder of the Nishadas and Dhivaras &c. To Vishnu Purana, Vena was a son of Anga & a descendant of the first Manu.—Monier Williams. According to Manusamhita and Padmapurana Vena was an enemy to the Jainas who killed him and his family.

(১) ফলপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—'মহাযান, মধ্যযান, হীনযান। যান=উপায়, ফলপ্রাপ্তি বা সিদ্ধিলাভের হেতু।

(২) ত্রিরত্ন শব্দে সাধারণতঃ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ বুঝায়, কিন্তু এস্থলে ত্রিরত্ন শব্দে শাক্যসিংহ, তৎপুত্র রাহুল এবং ভ্রাতা আনন্দকে বুঝাইতেছে।

(৩) মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।

(৪) মূলে 'সদেবকস্য লোকস্যানুকম্পামুপাদায়'—অনুবাদ—yea, in great compassion towards men and gods.

(৫) উদগ্রাঃ।

(১) "কারীরো মণ্ডলমাত্রং বৃক্ষস্তেনোপসংক্রামৎ"—রাজেন্দ্রলালের অনুবাদ—proceeded towards a bamboo grove. "করীর বা কারীর"=a thorny plant, described as growing in deserts and fed upon by camels, cassarisaphylla, reed, bamboo, Caparis, Aphylla"—Monier Williams.

বোধিসত্ত্বগণ ও শ্রাবকসঙ্ঘের অনুরোধে (২) তাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ভিক্ষুগণের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। (৩) অতঃপর প্রশান্ত রজনীতে (৪) শুদ্ধবাস ও শুদ্ধদেহ ঈশ্বর, মহেশ্বর, নন্দন, আনন্দ, সুনন্দ, চন্দন, মহিত, প্রশান্ত, বিনীতেশ্বর ও অন্যান্য দেবপুত্রগণ পূর্ব্বের ন্যায় সেইখানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। * তৎপরে সেই বোধিসত্ত্ব ও মহাশ্রাবকগণ ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন :—

ভগবন্! ললিতবিস্তর নামে ধর্ম্মপর্য্যায় গ্রন্থ যথাযথ বিবৃত করুন। (৫) তাহা বহুলোকের মঙ্গলজনক হইবে, বহুলোকের সুখের হেতুভূত হইবে, তাহাতে জনসাধারণের মহান্ উপকার সংসাধিত হইবে, দেব ও মনুষ্যগণের সুখ ও কল্যাণ হইবে এবং ইহাতে নরজাতির প্রতি আপনার অনুকম্পা প্রকাশ পাইবে। এইরূপে (৬) ভগবান্ সমাগত সেই মহাসত্ত্ব, বোধিসত্ত্ব ও মহাশ্রাবকগণের প্রস্তাবে মৌন দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিলেন। (৭) ইহাতে দেবতা, মনুষ্য ও অসুরগণের প্রতি তাঁহার অনুকম্পা প্রদর্শিত হইল। এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে :—(১)

"হে ভিক্ষুগণ! (২) অদ্য রজনীতে আমি যখন অঙ্গনাসম্পর্ক পরিহারপূর্ব্বক (৩) এই স্থানে সুখে উপবিষ্ট আছি, শুভ বিহারাদিতে (৪) মনোনিবেশ করিয়াছি, এবং সমাহিত ও একাগ্রচিত্ত হইয়াছি, তখন আমার নিকটে দেবস্তুত মহর্ষিগণ সানন্দচিত্তে শুভাগমন করিলেন। তাঁহাদের সুপরিচিত বিমলোজ্জ্বল দেহশ্রীতে দ্বৈতবন আলোকিত হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন মহেশ্বর, চন্দন, ঈশ, নন্দ, প্রশান্তচিত্ত, মহিত, সুনন্দ, শান্ত ও অন্যান্য প্রথিতনামা কোটি কোটি দেবপুত্র। (৫) তাঁহারা এখানে আসিয়া আমার চরণ বন্দনা ও আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আমার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে সসম্মানে (৬) প্রার্থনা করিলেন :—

পুরাকালে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাৎকালিক তথাগতগণ এই বাসনাবিনাশী (৭) ধর্ম্মশাস্ত্রের নিদানভূত বৈপুল্যসূত্র (৮) প্রচার করিয়াছিলেন।

এই শ্রেষ্ঠ মহাযানের বক্তা ও ধর্ম্মমতবিরোধী শত্রু নমুচির ধর্ষয়িতা সেই মহামুনি এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া বোধিসত্ত্বগণের মর্য্যাদারক্ষণেচ্ছায় (১) দেবপুত্রগণের এই আহ্বানে মৌনভাব

(২) মূলে 'প্রজপ্তঃ'।
(৩) মূলে 'আমন্ত্রয়তি স্ম'।
(৪) 'প্রশান্তায়াং রজন্যাম্'।
(৫) 'সাধু দেশয়তু'।
(৬) 'এতর্হি'।
(৭) 'অধিবাসয়তি স্ম তূষ্ণীম্ভাবেন।'—"vouchsafed their request."

* রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন যে যদিও পাঁচখানি পাণ্ডুলিপিতে তিনি গ্রন্থে প্রদত্ত পাঠই পাইয়াছেন, তথাপি তাঁহার বিশ্বাস এই যে, 'তথায়' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অন্তর্দ্ধান করিলেন' পর্য্যন্ত অংশটী স্থানচ্যুত হইয়া এখানে পড়িয়াছে, বস্তুতঃপক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারাগ্রাফে এই অংশ ছিল।

(১) তত্রেদমুচ্যতে।
(২) এই স্থান হইতে অধ্যায়ান্ত পর্য্যন্ত পদ্যে লিখিত; উপজাতি ছন্দঃ।
(৪) বিহার=পর্য্যটন।
(৩) মূলে 'নিরঙ্গনস্য' = অঙ্গনা-সম্পর্ক-বিহীনস্য মে।

(৫) তাস্তাশ্চ বহ্ব্যোঽথ চ দেবকোট্যঃ—myriads of the Devaputras.
(৬) সগৌরবা যাচিহ তে যথাচুঃ—"reverentially beseeched me."
(৭) রাগনিসূদনাগ্র্যং—"antidote to evil passions."
(৮) বৌদ্ধ ত্রিপিটকের তৃতীয় পিটক সুত্তপিটক বা সূত্রপিটক। সূত্র শব্দের সংস্কৃত ব্যাখ্যা :—

অল্পাক্ষরম্ অসন্দিগ্ধং
সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভম্ অনবদ্যঞ্চ
সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥

"স্বল্পাক্ষর সারবান্ সর্ব্বত্র কার্য্যকরী অসন্দিগ্ধ, নির্দ্দুষ্ট ও অনবদ্য সূত্রের নাম সূত্র।"

(১) বোধিসত্ত্বোষপরিগ্রহেচ্ছয়া—for the removal of the sins of Bodhi-satwas."

মূল—তৎ সাধ্বিদানীমপি ভাষিতো মুনিঃ
স বোধিসত্ত্বোষপরিগ্রহেচ্ছয়া।
পরং মহাযানমিদং প্রভাষয়ন্
পরং প্রবাদান্ নমুচিং চ ধর্ষয়ন্ ॥
অধ্যেষণাং দেবগণস্য তূষ্ণীম্
অগৃহ্নদেবমধিবাসনঞ্চ ॥

রাজেন্দ্রলালের অনুবাদ—Thus addressed, the sage benignly listened to their entreaty, and, for the removal of the sins of Bodhisattwas, recited the excellent discourses of the Mahayana, to the utter over-throw of the demon of love—Namuchi.

আমাদের অন্বয়—ইদং পরং (শ্রেষ্ঠং) মহাযানং প্রভাষয়ন্ প্রবাদাৎ (ধর্ম্মমতবিরোধাৎ) পরং (শত্রুস্থানীয়ং) নমুচিং (মারং) চ ধর্ষয়ন্ স মুনিঃ বোধিসত্ত্বোষপরিগ্রহেচ্ছয়া দেবগণস্য অধ্যেষণামধিবাসনঞ্চ তূষ্ণীমগৃহ্নৎ (অগৃহ্নাৎ)

অবলম্বন পূর্ব্বক সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে তাঁহারা অতি সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দোদামে (২) পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে ভিক্ষুগণ! আপনারা সকলে সেই মহানিদান বৈপুল্য-সূত্র শ্রবণ করুন। এই গ্রন্থ পুরাকালে তথাগতগণ তাৎকালিক জনসাধারণের উপকারার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ললিতবিস্তার গ্রন্থের নিদানপরিবর্ত্ত নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

লিঙ্গায়ত ধর্ম্মশাস্ত্র।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

যে ভক্ত বৈরাগ্য-গৌরবের উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, যাহার বিবেক স্থির-নিশ্চল হইয়াছে তাহাকে মাহেশ্বর কহে। এই ত্রিলোক মধ্যে রুদ্র (ব্রহ্ম) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তিনি ত্রৈলোক্যের উপর সর্ব্বদা কৃপাদৃষ্টি রাখেন, যাহার হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জন্মিয়াছে সে মাহেশ্বর নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ মায়া-মোহে আচ্ছন্ন হন বলিয়া তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়াছেন (অবতার গ্রহণ করিয়াছেন) এইরূপ কথিত আছে। এইজন্য তাঁহারা প্রকৃত মোক্ষদানে অসমর্থ। কেবলমাত্র মহেশ্বর (ব্রহ্মই) জন্ম-মরণবিহীন সুতরাং মোক্ষদানের একমাত্র অধিকারী এইরূপ জ্ঞান যাহার হইয়াছে সে মাহেশ্বর-পদবাচ্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ প্রভৃতি ধর্ম্মের আধার বিষয় এবং তাহার সুখকে অল্প (তুচ্ছ)-জ্ঞানকারী যে ব্যক্তি শিবের (ব্রহ্মের) আনন্দে মগ্ন থাকে তাহাকে বীর মাহেশ্বর বলে।

যে পরস্ত্রীর প্রতি পাপচক্ষে দৃষ্টি না করে, যে পরদ্রব্যের প্রতি লোভ না করে, যে ঈশ্বরের কার্য্যে আপন ধনাদি ব্যয় করে, যে শিবাগমশাস্ত্র অনুযায়ী আচরণ করে, যে শিবস্তুতির রস আস্বাদন করিয়া মনকে সুখসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছে, যে নিষ্পাপ থাকিয়া শিবধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ, যাহার মমতা নাই, যাহার অভিমান নাই, যে অজ্ঞানতা হেতু সংকটকে অতিক্রম করিয়াছে, যাহার গর্ব্বের গন্ধমাত্র নাই, যাহার মাৎসর্য্য নাই, যাহার কামবিকার আদৌ হয় না, যাহার রাগাবেশ হয় না, যে সদানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ, যে প্রাণিমাত্রেরই হিতসাধনে সর্ব্বদা রত, যে শিবকার্য্যে কোন ব্যাঘাত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম, যে শিবধর্ম্মের উৎকর্ষ লাভ করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা সজ্জন লোকের সঙ্গ করে, শিবধর্ম্মের হ্রাস হইতে পারে এরূপ কোন কারণ হইলে যে আপন জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াও নিজশক্তি অনুসারে সেই শিবধর্ম্মের সংকট দূর করিতে চেষ্টা করে, যে শিবধর্ম্মের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস স্থাপন করে, যে সর্ব্বত্র শিবভাবে পরিপূর্ণ এইরূপ অনুভব করিতে সমর্থ, তাহাকে বীর মাহেশ্বর কহে। ইতি মাহেশ্বর-প্রশংসা স্থল।

প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা হইলেও লিঙ্গকে পরিত্যাগ করিব না, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় (দৃঢ় সংকল্প)কে লিঙ্গনিষ্ঠা স্থল কহে। যে ব্যক্তি লিঙ্গপূজা না করিয়া ভোজন করে না, মোক্ষলক্ষ্মী তাহার হস্তগত। চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মে যাহার মন সর্ব্বদা স্থির আছে, অন্য কাহারও (দেবতা অথবা মূর্ত্তির) প্রতি যাহার মন আদৌ ধাবিত হয় না সে প্রত্যক্ষ শঙ্করস্বরূপ বলিয়া মান্য হয়। লিঙ্গ-স্বরূপে যাহার মন গঠিত হইয়া গিয়াছে, লিঙ্গস্বরূপ বর্ণনা করিতে যাহার বাক্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে, যাহার হস্ত সর্ব্বদা লিঙ্গসেবায় রত সে রুদ্রস্বরূপ বলিয়া গণ্য হয়। যে সর্ব্বদা ইষ্টলিঙ্গের প্রতি দৃঢ়নিশ্চয়, যাহার স্বভাব শান্ত, যাহার অঙ্গে সর্ব্বদা বিভূতি এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষ বর্ত্তমান আছে দেবতাগণও তাহার প্রশংসা করেন। ইতি লিঙ্গ-নিষ্ঠা-স্থল।

যে সকল মাহেশ্বর লিঙ্গনিষ্ঠার প্রতিকূল হইয়া আপন আপন জাতি অথবা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে পূর্ব্বাশ্রয়-নিরাসক বলে। শিবদীক্ষার সংস্কার হেতু নির্দ্দোষ সজ্জন পুরুষের পূর্ব্বাশ্রিত অন্য দেবতা ও মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি মিথ্যা ধর্ম্মের আবশ্যকতা কি? তাহা নীচলোকের আচার মধ্যে গণ্য হইতে পারে, কিন্তু শিবভক্তের যোগ্য

---

(২) মূলে তুষ্টাঃ, মুদিতাঃ ও অবাপ্রহর্ষম্ এই তিনটী একার্থক শব্দ একত্র আছে। এ প্রকার অতিরিক্ত শব্দের প্রয়োগ ললিত-বিস্তরের ভাষায় বিরল নহে।

নহে। শিবদীক্ষারূপ যোগ দ্বারা শিবধর্ম্মের আশ্রয়-কারী ব্যক্তি নীচলোকাশ্রিত ধর্ম্মের নিকট কদাপি যাইবে না। মনুষ্যের দুই ভেদ আছে—শুদ্ধ ও প্রাকৃত। যাহার শিবদীক্ষা হইয়াছে তাহাকে শুদ্ধ এবং যাহার শিবদীক্ষাসংস্কার হয় নাই তাহাকে প্রাকৃত কহে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থা দুই প্রকার—(১) শিবধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট এবং (২) ব্রাহ্মণধর্ম্মকথিত। শিবধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট আচরণকারী মনুষ্য শিবধর্ম্মপ্রমাণে শিবধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস করিবে। যাহার শিবধর্ম্মসংস্কার হয় নাই সে ব্রাহ্মণকথিত (পুরাণাদিকথিত) ধর্ম্ম আচরণ করিবে। ইতি পূর্ব্বস্থল নিরূপণ স্থল।

শঙ্কর (ব্রহ্ম) প্রেরক (প্রেরণকর্ত্তা), আত্মা (জীব) প্রেরিত। এই হেতু দ্বৈতমতাবলম্বী বীর শৈবগণ নিত্য শঙ্করের উপাসনা করিবে। তাঁহাদিগের ক্রিয়াবিষয়ে অদ্বৈতপর হওয়া উচিত নহে। শিব পশুপতি,তাঁহার আশ্রয়স্থিত জীব পশু,—ইহাদিগের মধ্যে স্বামীভৃত্যরূপ ভেদ বর্ত্তমান আছে। যখন জ্ঞান দ্বারা শ্রেষ্ঠ শিবতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় তখনই অদ্বৈত-ভাবের পূর্ণ যোগ্যতা জন্মে। জ্ঞানহীন মনুষ্যের হওয়া অসম্ভব। লিঙ্গপূজা প্রভৃতি ক্রিয়াশীল বীর শৈবগণ ঐ সকল ক্রিয়া করা হেতু অদ্বৈত নামে অভিহিত হইতে পারে না। ইতি সর্ব্বাদ্বৈত-নিরসন স্থল।

লিঙ্গপূজা (বাহ্য লিঙ্গপূজা)-কারী বীর শৈবকে অদ্বৈতমতের শিক্ষা দিয়া ফল নাই, কারণ তাহা হইলে তাহারা "আমি এবং শিব একই" (অহং ব্রহ্ম) এইরূপ মিথ্যা গর্ব্ব করিয়া নিজ কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিবে। লিঙ্গপূজক লিঙ্গই ব্রহ্ম এইরূপ বিশ্বাস করিয়া পূজা করিবে। এই লিঙ্গপূজায় আহ্বান বা বিসর্জ্জনের প্রয়োজন নাই। ইতি আহ্বান-নিরসন স্থল।

শঙ্কর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নিহোত্র (আত্মা) এই অষ্ট মূর্ত্তি বিশিষ্ট বলিয়া কথিত হন। এই অষ্টপ্রকার প্রপঞ্চ মিলিত হইয়া শঙ্করের শরীর। আত্মা-শঙ্কর সর্ব্ব তত্ত্বকে যথা রীতি রক্ষা করেন। এই পঞ্চমূর্ত্তিবিশিষ্ট শরীর মধ্যে তিনি আত্মা-স্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু তিনি এই সমস্ত হইতে পৃথক অথবা পৃথক নহেন, ইহা বলা যায় না। পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত অচে-তন, আত্মা (জীব) অজ্ঞান, কিন্তু মহেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। একারণ তাঁহার এবং জড়ময় পৃথিব্যাদি ভূতগণের ও আত্মার একরূপ কিরূপে সম্ভব? এই কারণ বশতঃ বীর শৈব পৃথিবী প্রভৃতি অষ্ট মূর্ত্তিবিশিষ্ট শঙ্কর এবং ঐ অষ্ট মূর্ত্তি স্বতন্ত্র এইরূপ ধারণা করিবে। ইতি অষ্টমূর্ত্তি-নিরসন স্থল।

শঙ্কর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। এইজন্য যে কোন স্থানে থাকিয়া তাঁহার পূজা করিলে সেই পূজা তিনি প্রাপ্ত হয়েন। কেবল লিঙ্গমাত্রের পূজা করিলেই যে তাঁহার পূজা করা হয় এমত নহে, এইরূপ ধারণা হইয়া লিঙ্গ হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে বলিয়া লিঙ্গপূজকগণ সত্য হইলেও উক্ত তত্ত্বের বশবর্ত্তী হইতে চাহে না। যেমন সকল বৃক্ষেই অগ্নি পরোক্ষভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও শমীবৃক্ষে বিশেষ-ভাবে বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ সর্ব্বস্থানে তিনি ব্যাপ্ত থাকিলেও আত্মার লক্ষ্যস্থল লিঙ্গমধ্যে লিঙ্গ-ভক্তগণ তাঁহার বিকাশ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করে। "হে শঙ্কর! তুমি লিঙ্গ মধ্যে বাস করিতেছ, তোমার স্বরূপ সর্ব্বদা প্রকাশমান আছে, তোমার শরীর কল্যাণকারক, শান্ত এবং পাপনিবারক", প্রাচীনকাল হইতে বেদে এইরূপ উক্ত আছে। ইতি সর্ব্বগত্ব-নিরসন স্থল।

ঈশ্বর সর্ব্বনিয়ামক। পূজাকরণার্থ, লিঙ্গ-মধ্যে তিনি বিশেষভাবে অবস্থান করিতেছেন এইরূপ মনে ভাবিয়া বীর শৈবগণ লিঙ্গ পূজা করিবে। তথাপি তিনি যে "সর্ব্বগঃ" সর্ব্বব্যাপী ইহা মান্য করিবে। যেমন কুম্ভকার কর্ত্তৃক মৃত্তিকা হইতে ভাণ্ড প্রস্তুত হইলে সেই ভাণ্ড মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ শঙ্কর হইতে উৎপন্ন এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব শিব হইতে পৃথক নহে। সমুদ্র হইতে যেমন ফেন, ঊর্ম্মি, বুদ্বুদাদি পৃথক নহে, সেইরূপ শিব হইতে উৎপন্ন এই ত্রৈলোক্য তাঁহা হইতে প্রভিন্ন নহে। যেমন নানা সূত্র দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র সূত্র হইতে ভিন্ন নহে, সেই-রূপ শিব হইতে উৎপন্ন এই বিশ্বচরাচর তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে।

আত্মশক্তিবিকাশ দ্বারা শিব বিশ্বাত্মারূপে অবস্থান করিতেছেন। যেমন বস্ত্রকে সংযত

(গুটাইয়া) রাখিলে অতি ক্ষুদ্র দেখায় কিন্তু আবার প্রসারণ করিলে বৃহৎ হয়, সেইরূপ শঙ্কর আপন শক্তিবলে লিঙ্গ মধ্যে (লক্ষ্য মধ্যে) সংক্ষিপ্ত-রূপে অবস্থান করিতে পারেন এবং সমস্ত বিশ্ব-জগতে প্রসারিত হইতে পারেন। সর্পরূপী (লম্বমান) রজ্জু দেখিয়া যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, অথচ সর্প এবং রজ্জু দুইটি বিভিন্ন বস্তু, সেইরূপ এই চরাচর বিশ্ব শিবস্বরূপ হইলেও শিব এবং বিশ্ব স্বতন্ত্র বলিয়া জানিবে। রজ্জু দেখিয়া যেমন সর্পের ভ্রম হয়, শুক্তি দেখিয়া যেমন রৌপ্য বলিয়া ভ্রম হয়, শাখাহীন বৃক্ষ দেখিয়া যেমন চোর ভ্রম হয়, মরীচিকা দেখিয়া যেমন জল বলিয়া ভ্রম হয়, আকাশ দেখিয়া যেমন গন্ধর্ব্বলোক বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মমধ্যে ত্রৈলোক্যকে শিব বলিয়া ভ্রম হয়। শিব অবিনাশী, বিশ্ব নশ্বর অনিত্য-স্বরূপ। বৃক্ষ যেমন পত্রশাখারূপে শোভা পায়, শিব (ব্রহ্ম) সেইরূপ ক্ষিতি, অপ, তেজরূপে বিরাজ করেন। ইতি শিব-জগন্ময় স্থল।

শঙ্কর অন্তর্যামী পরমেশ্বর। তথাপি তিনি ভক্তগণের হৃদয়মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত হন। শঙ্কর তাঁহার কল্যাণকর, শান্ত, এবং পাতকনাশক রূপে অনাদি কাল হইতে ভক্তের হৃদয়ে বিশেষভাবে বিরাজ করিতেছেন। যে ব্যক্তি নিষ্পাপ, বিরক্ত (বৈরাগ্যপ্রাপ্ত), বিবেকী (বিচারশীল), মহাত্মা, শিবলাঞ্ছনধারী (ভস্মাদিধারী) তাহার হৃদয়ে শিবের বিকাশ অধিকতরভাবে হইয়া থাকে। ইতি ভক্ত-দেহিক লিঙ্গস্থল।

প্রসাদি-স্থল।

মাহেশ্বরের ইষ্ট লিঙ্গের প্রতি দৃঢ় নিশ্চয়তা প্রযুক্ত যাহার পূর্ব্বকৃত পাপসকল বিনষ্ট হইয়াছে, এবং শিবজ্ঞান উপলব্ধি হইয়া যাহার মন প্রসন্ন হইয়াছে, তাহাকে প্রসাদী বলে। শিবকে (শিব-উদ্দেশে) যে দ্রব্য সমর্পণ করা হয় তাহাকে শিবপ্রসাদ কহে। সেই নির্ম্মাল্য বীর শৈবদিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ। যে ব্যক্তি নির্ম্মল শিবজ্ঞান উৎপন্ন হইবার সহায়-স্বরূপ এই শিবপ্রসাদ চিত্ত প্রসন্ন করিবার জন্য স্বীকার করে তাহাকে প্রসাদী কহে। প্রসাদিস্থলে গুরুমাহাত্ম্য, লিঙ্গপ্রশংসা, জঙ্গমগৌরব, ভক্ত-মাহাত্ম্য, শয়ন, কীর্ত্তন এবং শিবপ্রসাদমাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থল হইতে অধিক কিছু উদ্ধৃত করিবার নাই।

প্রাণ-লিঙ্গ-স্থল।

প্রাণবায়ু এবং অপানবায়ু এই দুয়ের অভিঘাত হেতু নাভিকন্দ মধ্যে যে তেজ উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রাণলিঙ্গ বলে। শিশির যেমন সূর্য্যমধ্যে লীন হয় সেইরূপ প্রাণবায়ু পরব্রহ্মরূপ শিবলিঙ্গে লয়-প্রাপ্ত হয়। এ কারণ এই শিবলিঙ্গকে প্রাণলিঙ্গ কহে। এই প্রাণলিঙ্গ যোগসাধনকারী জ্ঞানী-লোকের হৃদয়মধ্যে দীপপ্রমাণে সর্ব্বদা প্রকাশমান থাকে। ইহা চিৎস্বরূপ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলিঙ্গ। এই হৃদয়স্থিত প্রাণলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তেজোময় শিবস্বরূপ। তাহাকে ছাড়িয়া যে বাহ্যলিঙ্গের উপাসনা করে সে অন্ত্য নামে অভিহিত হয়। যে ব্যক্তি এই অভ্যন্তরবর্ত্তী চিদ্রূপ প্রাণলিঙ্গের ভজনা করে সে বাহ্যলিঙ্গের পূজন এবং তৎপূজনার্থ সামগ্রী-সংগ্রহের জন্য আগ্রহ করে না। এই ত্রৈলোক্য মধ্যে মনুষ্য মায়ার অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন আছে। এই মায়া পরিত্যাজ্য, সর্ব্বদা এইরূপ লক্ষ্য রাখিয়া চৈতন্যস্বরূপ আনন্দময় প্রাণলিঙ্গের মধ্যে যাহার মন সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকে তাহাকে প্রাণলিঙ্গী কহে। সত্তা প্রাণময়ী শক্তি, প্রাণলিঙ্গ সৎস্বরূপ; যাহার এই দুয়ের সম্যক জ্ঞান জন্মিয়াছে সে প্রাণলিঙ্গী নামে অভিহিত হয়। অন্তর্গত (হৃদয়কমলস্থিত) প্রাণলিঙ্গ হৃষ্ট এবং চিৎস্বরূপ। ভক্তিরূপ পুষ্প দ্বারা তাহার পূজা করিলে সেই পূজাকে প্রাণ-লিঙ্গার্চ্চন কহে। ভক্তের চিৎস্বরূপ মন্দিরমধ্য-স্থিত পঞ্চপ্রাণরূপী বায়ুপ্রবাহ হেতু সর্ব্বদা শীতল রহে, এবং তন্মধ্যে অতি সূক্ষ্ম আকাশ বর্ত্তমান থাকে। ভক্তের ব্রহ্মরন্ধ্রগত পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডল হইতে ক্ষরিত সুধাসিঞ্চনেও তাহা সর্ব্বদা অতি শীতল রহে। এই মন্দিরের দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, নাসিকা, মুখগহ্বর এবং শৌচ ইন্দ্রিয়দ্বয়, এই নব দ্বার আছে। তাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ দীপের আলোক পতিত হয়। সেই উর্দ্ধহৃদয়রূপ মন্দিরের মধ্যস্থিত সিংহাসনের উপরে শিব (ব্রহ্ম) রূপী প্রাণ-লিঙ্গ অবস্থান করে। সর্ব্বদা বিধিমত এই লিঙ্গকে

সুন্দর সুন্দর মানসিক বস্তু (ফল, পুষ্প, গন্ধাদি) দ্বারা পূজা করিবে। এই মানসিক পূজায় ক্ষমা (শান্তি) রূপ নির্ম্মল জল দ্বারা অভিষেক করিবে, বিবেকরূপী বস্ত্র প্রদান করিবে, সত্যভাষণ-রূপ অলঙ্কার দিবে, বৈরাগ্যরূপ পুষ্পমালা ব্যবহার করিবে। শিবযোগ-সমাধি রূপ সম্পত্তিকে গন্ধ-স্বরূপ মনে করিবে, নিরভিমানকে অক্ষতস্বরূপ জ্ঞান করিবে, ভক্তিরূপ ধূপ এবং শিব (ব্রহ্ম)-জ্ঞান-রূপ জ্ঞানদীপ প্রজ্জলিত করিবে, ভ্রান্তিমূল প্রপঞ্চকে নৈবেদ্য জ্ঞান করিবে, মৌনরূপী ঘণ্টা বাদ্য করিবে, বিষয়ভোগ-নিস্পৃহ-রূপ তাম্বূল প্রদান করিবে, বিষয়সুখের ভ্রান্তিপরিত্যাগকে প্রদক্ষিণ জ্ঞান করিবে এবং সেই শিব(ব্রহ্ম)-স্বরূপের উদ্দেশে একাগ্রচিত্তরূপ নমস্কার করিবে।

সর্ব্ব তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে সৎ চিৎ এবং আনন্দ স্বতঃ প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশ বাক্য ও মনের অগোচর। পরমেশ্বর মহালিঙ্গ এবং প্রাণ জীব নামে অভিহিত হয়। এই মহালিঙ্গ এবং প্রাণের অনুসরণকারী লিঙ্গরূপী শিব-জীবের ঐক্য-মতে চিন্তন করাকে শিবসমাধি নষ্ট কহে। জীবের সূক্ষ্ম শরীরমধ্যে ষট্কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন মূল (আধার-চক্র) হইতে ভ্রূমধ্য (আজ্ঞা-চক্র) পর্য্যন্ত ষট্ কমল আছে। ইহাদিগের স্থান (১) পায়ু, (২) উপস্থ, (৩) নাভি, (৪) হৃদয়, (৫) কণ্ঠ এবং (৬) ভ্রূমধ্য। এই চক্রমধ্যে ব্রহ্মস্থান। ভ্রূ-মধ্যস্থিত স্থানে (ব্রহ্মরন্ধ্রে) সহস্র-দল-বিশিষ্ট পদ্ম আছে। সেই কমলমধ্যে স্বচ্ছ চন্দ্রমণ্ডল বিরাজ করিতেছে। সেই চন্দ্রমণ্ডলের সূক্ষ্ম রন্ধ্রের নাম কৈলাস। এই কৈলাসশিখরে শিবরূপী ব্রহ্ম বিরাজমান আছেন। এই ব্রহ্মই সকল কারণের কারণস্বরূপ।

সংসারমধ্যে জন্মমৃত্যু নামে দুইটী বিষবৃক্ষ আছে। তাহার অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চ পত্র আছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্ম এই সংসারবৃক্ষের মূলস্বরূপ। শিবধ্যানই এই বিষ-বৃক্ষের মূল ছেদন করিবার কুঠারস্বরূপ। এই সংসার অন্ধকারময়—অজ্ঞানরূপ রাক্ষসের প্রসারস্থল। এখানে আত্মস্বরূপ জ্ঞান লয়প্রাপ্ত হয়। শিবধ্যানই এই সংসারান্ধকারকে নাশ করিবার তেজঃপুঞ্জরূপে বর্ত্তমান সূর্য্য। ইতি শিবযোগসমাধিস্থল।

আত্মস্থিত শিবলিঙ্গের প্রত্যক্ষানুভবস্থিতি যাহা হইতে উৎপন্ন হয় সেই স্থিতিকে আত্মতত্ত্বজ্ঞানীগণ মহালিঙ্গের নিজস্বরূপ বলেন। শিব সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ এবং নিরঞ্জন। একমাত্র তিনিই লিঙ্গ নামে অভিহিত হন। এই লিঙ্গ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এই লিঙ্গই সকল জগতের আশ্রয়ভূত। কোন কোন ব্যক্তি বেদান্ত হইতে উৎপন্ন ("প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি বেদবাক্য হইতে উৎপন্ন) বিদ্যাকে লিঙ্গ বলিয়া থাকে। পরব্রহ্মরূপী লিঙ্গকে প্রমেয়বস্তুমধ্যে গণনা করা হেতু উক্ত বেদান্তবাক্য-জন্য জ্ঞানকে লিঙ্গ বলা ঠিক নহে। সর্ব্ব জগতের মূল কারণ মায়াকে লিঙ্গ এবং মহেশ্বরকে লিঙ্গী নামে যাহারা অভিহিত করে তাহারা মায়াকে প্রকৃতি এবং মহেশ্বরকে মায়ী রূপে ব্যক্ত করে—তাহা অসংগত বলিয়া জানিবে। পরমেশ্বরই শ্রেষ্ঠ প্রাণলিঙ্গ, তিনি স্বতঃ প্রকাশিত। তাঁহার তেজের নিকট সূর্য্যের তেজ কিছুই নহে। চন্দ্রের তেজ, বিদ্যুতের তেজ, নক্ষত্রের তেজ অথবা অগ্নির তেজের ত কথাই নাই। বেদপ্রমাণে, লিঙ্গই তেজঃপুঞ্জ শ্রেষ্ঠ শিবস্বরূপ। তাঁহার তেজের প্রকাশ হেতু আমরা সকল জগৎ দেখিতে পাই। লিঙ্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব কিছুই নাই। এই লিঙ্গ হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এই লিঙ্গ দ্বারা সর্ব্ব জগৎ রক্ষা পাইতেছে এবং এই লিঙ্গ-মধ্যেই সর্ব্ব জগৎ লয়প্রাপ্ত হইবে। ইতি লিঙ্গ-নিজ স্থল।

শিব-জ্ঞান-বিশিষ্ট জীব অঙ্গ নামে অভিহিত হয়। তাহার ধ্যান করিবার বস্তুকে লিঙ্গ কহে। যাহার এই দুই (জ্ঞান এবং লিঙ্গ) আছে তাহাকে অঙ্গলিঙ্গী কহে। অঙ্গে (জীবে) লিঙ্গ মিলিত হইবে এবং লিঙ্গে অঙ্গ মিলিত হইবে এইরূপ উভ-য়ের একত্র স্থিতি যাহাতে হইয়াছে, তাহাকে অঙ্গ-লিঙ্গী বলিবে। যে ব্যক্তি আপন হৃদয়মধ্যে স্থিত (হৃদয়কমলস্থিত) তেজঃপুঞ্জ প্রাণ-লিঙ্গকে যথার্থরূপে অবগত হইয়া প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা করে তাহাকে অঙ্গলিঙ্গী জানিবে। অনাদি-কাল হইতে সর্ব্বশাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে যে, লিঙ্গই কায়া, ইহাই পরব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যের আধার

এবং মোক্ষস্থল। এই লিঙ্গ মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ, যাহার মনে এইরূপ পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে সে দেহধারী হইলেও মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। লিঙ্গের জন্ম ও মৃত্যু নাই। ইহা সর্ব্ব ত্রৈলোক্যের কারণস্বরূপ। যে লোক এই লিঙ্গসম্বন্ধীয় গূঢ় রহস্য অবগত নহে, সে মোক্ষপ্রাপ্তির অধিকারী হয় না। যে ভক্ত, ভক্তি (বাসনা) রূপ পুষ্পের দ্বারা প্রাণলিঙ্গের পূজা করে, আপন ধর্ম্ম যথারীতি পালন করে, মনোমধ্যে সর্ব্বদা শিবচিন্তা করে, তাহার জ্ঞান পরিপূর্ণ হওয়ায় সে চতুর্থ-অধিকারসম্পন্ন ভক্ত অর্থাৎ শরণ নামে অভিহিত হয়। ইতি অঙ্গলিঙ্গ স্থল।

সঞ্চিতের নাশ।

(ডাক্তার ভাণ্ডারকর লিখিত প্রবন্ধের শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদ)

এ পর্য্যন্ত উপনিষদ্ ও তদনন্তর অন্য গ্রন্থাদির বচন লইয়া পরমেশ্বরের গুণ অথবা স্বরূপ, মানবাত্মা ও পরমেশ্বরের সম্বন্ধ এবং কিরূপে তিনি মানবাত্মার গ্রাহ্য হন, অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে মনুষ্যকে কোন্ পথ ধরিয়া চলিতে হইবে, প্রাপ্তব্য স্থানটি কি, ও তাহার জন্মের উদ্দেশ্য কি, এই সম্বন্ধে একটু বিচার-আলোচনা করিব।

সংসারের অনেক ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সংকট ভোগ করিবার সময় পরমেশ্বর-দর্শনের, তাঁহার শরণাপন্ন হইবার উৎকণ্ঠা মনুষ্যের অন্তঃকরণে উৎপন্ন হয়—"জল বিনা ধড়ফড় করে মাছ, সেই প্রকার হয় এই প্রাণ" এইরূপ সাধুসন্তের অনেক বচনে এই কথা ব্যক্ত হয়। এই প্রকার মনুষ্যের যে উৎকণ্ঠা সেই অনুসারেই উপনিষদের মধ্যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; তাহা এইরূপ যথা—"এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ" পরমাত্মার সতত সমাগমই মানবাত্মার পরম গতি, ইহাই মানবের পরম সম্পত্তি, ইহা তাহার উত্তম লোক এবং ইহাই তাহার নিরতিশয় আনন্দ।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥
মুণ্ডক ৩।১।৩

"দ্রষ্টা যখন তিনি সকলের প্রভু, সমস্ত ব্রহ্ম অর্থাৎ বিশ্ব তাঁহা হইতে প্রভূত এইরূপ সেই পুরুষকে দেখে তখন জ্ঞানী মানব ক্ষুদ্র বিষয়ে যে পুণ্য-পাপ তাহা হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্লিপ্ত হইয়া সেই পুরুষের পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়।"

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানঃ বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥
মুণ্ডক ৩।২।৫

"ঋষিরা এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানের দ্বারা সন্তৃপ্ত হন, ইহাঁদের আত্মা সংস্কৃত হয়; আর কোন বিষয়ে তাঁহাদের অনুরাগ বা প্রীতি থাকে না; তাঁহারা গভীর শান্তি প্রাপ্ত হন এবং যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা একনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বত্র বর্ত্তমান যিনি তাঁহাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলের মধ্যেই সমাবিষ্ট হন।" এই বচনের তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মা আমাদের গন্তব্যস্থান, তাঁহাকে পাওয়াই আমাদের জন্মের উদ্দেশ্য, এবং তাঁহার সহিত পরম সাম্যই আমাদের উত্তম গতি, এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, মনুষ্য আত্মাতে অত্যন্ত সমাধান, শান্তি উপলব্ধি করে। তাহা হইলে, এইরূপ পরমেশ্বর-প্রাপ্তির উপায় কি? পরমেশ্বরের ধ্যানভজন করিতে গেলেও তাহা আমাদের সাধ্য হয় না। "মন হেঁ নাবরে যেঁউ নেদী বাব" "ন রাহে নিশ্চল জাগরিতা মন," "কাম ক্রোধ আড় পড়লে পর্ব্বত," সাধুদের অনুভব এই প্রকার। মন যদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের দিকে সতত ধাবমান হয়, এবং ক্ষণকালের জন্যও যদি নিশ্চল না হয়; অহঙ্কার কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি ভাবে যদি অন্তরাত্মা বশীভূত হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বরের ধ্যানভজন কিরূপে সাধ্য হইবে? অহঙ্কার ও কামক্রোধাদির সংস্কার অন্তরাত্মায় সংলিপ্ত রহিয়াছে, তাহার দরুণ মন চঞ্চল হয়। এই সকল সংস্কার অর্থাৎ এই সকল সঞ্চিত নষ্ট না হইলে আত্মার গতি নাই। এই সকল সংস্কার বাল্যকাল হইতে মনুষ্যের অন্তঃকরণে উদিত হয় এবং তাহার মা-বাপ কি গুরু তাহাকে যোগ্য পথে না চালাইলে, ঐ সকল

সংস্কার অনিবার্য্য হয়, এবং অধিক বয়সে উহা সর্ব্বথা ঘাতক হইয়া উঠে। হয় তো এই সংস্কার অথবা এই সঞ্চিত মনুষ্যের অন্তরে জন্ম হইতেই থাকে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন উহা পূর্ব্বজন্ম হইতে মনুষ্য আনয়ন করে; কিন্তু এই প্রশ্নের নির্ণয় হওয়া কঠিন এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। বর্ত্তমানে, যে পরিণামবাদ অথবা বিকাশবাদ বাহির হইয়াছে তাহার দৃষ্টিতে দেখিলে উত্তরোত্তর প্রাণীদিগের মধ্যে যেরূপ আকারাদির অভিব্যক্তি হয় সেইরূপ প্রাণবস্তুরও অধিকাধিক বিকাশ হইয়া থাকে। মনুষ্যের অন্তরে পশুর ন্যায় ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্রোধ, অন্যকে প্রহার করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে প্রাণের বিশেষ বিকাশ হওয়া প্রযুক্ত যোগ্যাযোগ্য-বিবেচনা শক্তি মনুষ্য প্রাপ্ত হয়; তাহার দরুণ, কোথায় রাগ করিবে, কোথায় করিবে না, কোথায় ক্ষুধাতৃষ্ণার শান্তি করিবে, কোথায় করিবে না, এবং সাধারণতঃ সমস্ত কার্য্যের মধ্যে কোন্‌টা যোগ্য, কোন্‌টা অযোগ্য তাহা মনুষ্য বুঝিতে পারে। কিন্তু আমরা যখন পশুর অবস্থায় ছিলাম তখন হইতে চলিয়া আসিতেছে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম ক্রোধ—ইহাদের বল তাদৃশ কম হয় নাই; তাই, অনেক সময়ে আমাদের বিবেচনাসামর্থ্য থাকে না এবং অযোগ্য স্থলেও আমরা সেই কাম-ক্রোধাদি ভাবের বশীভূত হই। অতএব এই সঞ্চিত অতিশয় প্রবল এবং তাহার যোগে আমরা পাপে প্রবৃত্ত হই। এই জন্যই তুকারামের মত সাধু বলেন:—"সঞ্চিতানি নাহি চুকো দিলী বাট"; অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার সমস্ত পথ আমাদের সঞ্চিতের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া আছে, এবং তাঁহার কাছে আমাদের কাহারও যাওয়া হয় না। তবে, এই সঞ্চিতের নাশ কিসে হইতে পারে? আমরা নিশ্চয়ই দুর্ব্বল, কাম ক্রোধাদি অতীব প্রবল; তবে, যেরূপ সমস্ত সঙ্কটের মধ্যে সাহায্যকারী পরমেশ্বর, সেইরূপ এই সঙ্কটেরও মধ্যে সাহায্যকারী তিনিই। তাই ভগবদ্‌গীতার মধ্যে শেষাশেষি এই সিদ্ধান্তই করা হইয়াছে যে—

> সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

"সকল ধর্ম্ম, অর্থাৎ সাধনা ত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি সর্ব্বপাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।" শরণাপন্ন হওয়া অর্থে তোমা ছাড়া আমার গতি নাই, একমাত্র তুমিই আমার উদ্ধারকর্ত্তা, সর্ব্বপ্রকারে তুমিই একমাত্র আমার প্রমাণ, আমি তোমার দাস, আমি তোমার সেবক, এই প্রকার ঈশ্বরবিষয়ক ভাব মনে আনিয়া সর্ব্বদা চলা। মনুষ্য এই প্রকারে চলিলে শাশ্বত ধর্ম্মের অধিষ্ঠান, সত্যনিধি প্রেমস্বরূপ পবিত্র পরমাত্মা চিত্তের সম্মুখে থাকিয়া আমাদের পাপ সম্বন্ধে আমাদের লজ্জা উৎপন্ন করেন এবং দুঃসংস্কারের যে সঞ্চিত, তাহার মূল শিথিল করিয়া দেন; এবং কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের দোষ সূক্ষ্মরূপে অবলোকন করিয়া পরম অনুতাপের সহিত তাঁহার নিকট তৎসম্বন্ধে নিবেদন করিলে আমাদের অন্তঃকরণও পবিত্র করিয়া দেন। সেই জন্যই এই প্রকার নিবেদন তুকারাম বাবার ন্যায় সাধু অনেক প্রকারে করিয়াছেন—"চতুর মী ঝালী আড়ল্যা তোঁবতা। ভাবেঁ বীণ রীতো খুঁজ অংগীঁ" "তুকা ম্হণে জোডী কেলী চ মাঁ নাহীঁ। লটিকেঁচি দেহী ফুগেপণ॥" "তুকা ম্হণে নাহি পালট মন্তরী। তেথেঁ দিসে হরী ঠকাঠকী॥ এই অন্তঃকরণশুদ্ধি বিষয়ে যতই উপায় করা হোক্ না, তথাপি তাহা সহজসাধ্য হয় না; দৃঢ়বদ্ধমূল যে দুঃসংস্কাররূপ সঞ্চিত তাহা সর্ব্বদা অন্তরায় হয় দেখিয়া এবং ঈশ্বর সঞ্চিতের নাশ করিয়া পতিতকে পবিত্র করেন এইরূপ মনে আনিয়া এইরূপ করুণা যাচ্ঞা করেন—"ন কো আণূ মাঝেঁ সঞ্চিত মনাসী। পাবন আহেসী পতিতা তূঁ॥ "অনাথা চা নাথ পতিত পাবন। হে আতাঁ জতন করো নাম।" "মী ঝালো পতিত, পাবন তু হোসী। কাঁ বা উপেক্ষিসী দীনবন্ধো।" সতত এইরূপে চলিলে শেষে ইষ্টসিদ্ধি হয়। ভগবদ্‌গীতাতে ইহাই কথিত হইয়াছে,—

> অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
> সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।
> ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি॥

"মনুষ্য যতই দুরাচার হোক্ না কেন, আমাকে অনন্যভাবে ভজনা করিলে তাহাকে সাধুই বলিতে হইবে; কারণ তাহার মনের এই সংকল্প উত্তম।

সে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মাত্মা হয় এবং চিরন্তন শান্তি প্রাপ্ত হয়।" ভাগবতে এইপ্রকার বচনও আছে যথা :—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

"হে উদ্ধব, যাহার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে এইরূপ অগ্নিশিখা যেরূপ সমিদ্ তৃণাদি ভস্মসাৎ করে সেইরূপ আমার প্রতি ভক্তি সকল পাপ ভস্মীভূত করে।" এই প্রকারে সঞ্চিতের নাশ হইয়া, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইয়া মনুষ্য তাঁহার সাদৃশ্য লাভের পথে অগ্রসর হয়। ইহার আলোচনা পরে করিব।

জন্মদিনের নিবেদন।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

সপ্তত্রিংশ বর্ষ প্রাতে হে প্রভু আমার!
তোমার চরণতলে
এসেছি জানাব বলে
মরমের দু'টী কথা দীন অভাগার!
সপ্তত্রিংশ বর্ষ আজ
বিশাল বসুধা মাঝ
এমনি প্রভাত কালে লভিয়া জনম,
স্নেহময়ী মার বুকে
মাথা রাখি কত সুখে
উদার আকাশ রবি হেরিনু প্রথম!
প্রথম বিহঙ্গ গান
মাতায়ে তুলিল প্রাণ,
করে গেল স্নিগ্ধ বায়ু প্রথম চুম্বন!
পুরাঙ্গনা হুলু' রবে
তোমার বিপুল ভবে
করিল নবীন পান্থে প্রথম বরণ!
অজানিত ভবিষ্যৎ
দেখায়ে চলিল পথ,
দীর্ঘ যাত্রা আরম্ভিল আলো-অন্ধকারে!
কত আশা-নিরাশায়
কত হর্ষ-বেদনায়
কত যশঃ অপযশে চিনিনু সংসারে!
অন্তর্যামী ভগবান্,
জানি' তব স্নেহ-দান,
সকলি লইনু বরি' অন্তরে আমার,
আজি সব ফেলি' দূরে
তোমার গোপন পুরে
এসেছি আপনা শুধু দিতে উপহার!
তোমারি ইচ্ছায় লয়
কর মোরে দয়াময়,
তোমারি ইচ্ছার জয় ঘোষিয়া জীবনে,
অন্তিমে তোমার পায়,
শ্রান্ত শির রাখি হায়,
মুদি আঁখি নিরখিয়া প্রসন্ন আননে!

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

দশম অধিকরণ—ব্রহ্মের জ্যোতিঃশব্দ-বাচ্যতাধিকরণ।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিএ)

সূত্র। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ॥ ২৪॥ ছন্দোভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনং॥ ২৫॥ ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং॥ ২৬॥ উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নবিরোধাৎ॥ ২৭॥

টীকা। দশমাধিকরণমারচয়তি—

কার্য্যং জ্যোতিরুত ব্রহ্ম জ্যোতির্দীপ্যত ইত্যদঃ।
ব্রহ্মণোঽসংনিধেঃ কার্য্যং তেজোলিঙ্গবলাদপি॥৩৫॥
চতুষ্পাৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম যচ্ছন্দেনানুবর্ত্ত্যতে।
জ্যোতিঃ স্যাদ্‌ভাসকং ব্রহ্ম লিঙ্গং তূপাধিযোগতঃ॥৩৬॥

ছান্দোগ্যস্য তৃতীয়েঽধ্যায়ে গায়ত্রীবিদ্যায়াং হৃদয়চ্ছিদ্রোপাসনমভিধায়েদমাম্নায়তে—"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে" ইতি। তত্র—'দ্যুলোকাৎ পরং দীপ্যমানং বস্তু কিং কার্য্যরূপং নেত্রানুগ্রাহকং তেজঃ উত ব্রহ্ম' ইতি সংশয়ঃ। 'কার্য্যম্' ইতি তাবৎ প্রাপ্তং। ব্রহ্মণোঽসন্নিহিতত্বেন বাক্যস্য ব্রহ্মপরত্বাযোগাৎ। তেজঃপরত্বং তূপপদ্যতে, তল্লিঙ্গসদ্ভাবাৎ। "ইদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে

জ্যোতিঃ” ইতি শ্রূয়মাণো জাঠরাগ্ন্যভেদস্তেজো-লিঙ্গং।

অত্রোচ্যতে—অসিদ্ধোঽসংনিধিঃ, পূর্বস্মিন্ গায়ত্রী-খণ্ডে “পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।” ইতি চতুষ্পাদো ব্রহ্মণো প্রকৃতত্বাৎ। তস্য চাত্র প্রকৃতবাচিনা যচ্ছব্দেনানুবর্তনাৎ। ‘অস্য ব্রহ্মণঃ সর্বাণি ভূতান্যেকাংশঃ, পাদত্রয়োপলক্ষিতমনন্তস্বরূপং দ্যোতনাত্মকে দিবি স্বস্মিন্নেবাবতিষ্ঠতে’ ইত্যর্থঃ। ন চ জ্যোতিঃশব্দস্য ব্রহ্মণি বৃত্ত্যনুপপত্তিঃ, ভাসকত্ব-বাচিত্বাৎ। ব্রহ্মণো জগদ্‌ভাসকত্বাৎ। তেজো-লিঙ্গং ত্বৌপাধিকে ব্রহ্মণ্যবকল্প্যতে। তস্মাৎ জ্যোতির্ব্রহ্ম॥

সূত্রের অনুবাদ। জ্যোতি (অর্থে) ব্রহ্ম, চরণের উল্লেখ হেতু॥ ২৪॥ ছন্দের উল্লেখ হেতু (জ্যোতি ব্রহ্ম) নহে, ইহা যদি বল, তাহা নহে; কারণ তাহা দ্বারা (ব্রহ্মে) চিত্তের অর্পণ উক্ত হই-য়াছে; সেইরূপেই ব্রহ্মদর্শন॥ ২৫॥ এই প্রকার ভূতাদিরূপ পাদের উল্লেখরূপ উপপত্তি হেতু॥ ২৬॥ উপদেশ বা বিভক্তিনির্দ্দেশের ভেদ হেতু নহে ইহা যদি বল, তাহা নহে, উভয়েতে বিরোধের অভাব হেতু॥ ২৭॥

টীকার অর্থ। দশম অধিকরণ রচিত হইতেছে—

“জ্যোতির্দীপ্যতে” অর্থাৎ “জ্যোতি দীপ্তি পাইতেছে” এই শ্রুতির ঐ (জ্যোতি শব্দে) নৈস-র্গিক জ্যোতি অথবা ব্রহ্ম (বুঝাইতেছে)? ব্রহ্ম সন্নিহিত না থাকায় (এবং) তেজরূপ চিহ্নের বলের কারণেও নৈসর্গিক (জ্যোতি বুঝাইতেছে)। পূর্বপ্রকরণোক্ত চতুষ্পাদ ব্রহ্ম যৎশব্দের দ্বারা অনুসূচিত হইতেছে। জ্যোতি (অর্থে) প্রকাশক ব্রহ্ম, কিন্তু উপাধির যোগে (তেজরূপ পরিচায়ক) চিহ্ন (দৃষ্ট হয়)॥ ৩৫ ও ৩৬॥

ছান্দোগ্যের তৃতীয় অধ্যায়ে গায়ত্রী বিদ্যাতে হৃদয়চ্ছিদ্রোপাসনার কথা বলিয়া ইহা উক্ত হই-য়াছে—“অনন্তর এই দ্যুলোকের পরবর্তী (বা ঊর্দ্ধ্ববর্ত্তী) যে জ্যোতি দীপ্তি পাইতেছে।” এই শ্রুতিতে ‘দ্যুলোকের পরে দীপ্যমান বস্তু চক্ষুর সহায়ক নৈসর্গিক তেজ অথবা ব্রহ্ম’ ইহাই হইল সংশয়। ‘নৈসর্গিক তেজ’ ইহাই প্রাপ্ত হইতেছে। কারণ ব্রহ্ম শব্দ নিকটে না থাকাতে (শ্রুতি) বাক্য ব্রহ্মবিষয়ক হওয়া অসম্ভব। কিন্তু (ইহা) তেজবিষয়ক হওয়া উপপন্ন হইতেছে, কারণ (শ্রুতিতে) তাহার (তেজের) চিহ্নের উল্লেখ আছে।” “ইহাই সেই জ্যোতি যাহা এই পুরুষের অন্তরে আছে” এই শ্রুতিতে (উক্ত জ্যোতির সহিত) জঠরাগ্নির অভেদ শোনা যায় এবং তাহাই তেজের (পরিচায়ক) চিহ্ন।

ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—(ব্রহ্মশব্দ) অ-সন্নিহিত বলা অসিদ্ধ, কারণ পূর্ববর্ত্তী গায়ত্রী খণ্ডে “সকল ভূত এই ব্রহ্মের একাংশ মাত্র, ইঁহার অমৃতস্বরূপ (অবশিষ্ট) তিন অংশ স্বপ্রকাশ মহিমাতে (আছে)” এই শ্রুতিতে চতুরংশাত্মক ব্রহ্মই প্রকরণসূত্রে পাওয়া যাইতেছে। এই শ্রুতিতে পূর্বোক্ত-বিষয়সূচক যৎ শব্দের প্রয়োগের দ্বারা সেই ব্রহ্মই অনুসূচিত হইতেছেন। ‘এই ব্রহ্মের সমস্ত ভূত একাংশ মাত্র, (অবশিষ্ট) অংশত্রয়ের দ্বারা উপলক্ষিত অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ স্বীয় মহিমাতেই অবস্থিতি করিতেছেন’ ইহাই ভাবার্থ। জ্যোতি শব্দ প্রকাশবাচী হইবার কারণে ব্রহ্ম অর্থে (তাহার) প্রয়োগ অসঙ্গত নহে, কারণ ব্রহ্মই জগৎপ্রকাশক। তেজরূপ চিহ্ন ঔপাধিক ব্রহ্মেতে কল্পিত হয়। অতএব জ্যোতি শব্দ ব্রহ্ম অর্থেই প্রযুক্ত।

তাৎপর্য্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে গায়ত্রী-উপাসনাপ্রসঙ্গে হৃদয়ের পাঁচটী ছিদ্র এবং সেই পাঁচটী ছিদ্রের পাঁচটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়া সেই দেবতাদিগের উপাসনার বিধান দেওয়া হইয়াছে। সেই বিধান দেওয়া হইবার পর এই শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে—“এই দ্যুলোকের পর-বর্ত্তী জ্যোতি দীপ্তি পাইতেছে।” অমনি এক মহাসংশয় উপস্থিত হইল যে, এই জ্যোতি শব্দে নৈসর্গিক জ্যোতি বুঝাইতেছে অথবা ব্রহ্ম বুঝাই-তেছে? পূর্বপক্ষ বলেন যে নৈসর্গিক জ্যোতি অর্থেই জ্যোতি শব্দ হইয়াছে। এই প্রকরণের কোথাও যখন পরমাত্মাবাচী ব্রহ্মশব্দের উল্লেখ নাই, তখন ব্রহ্ম অর্থে জ্যোতি শব্দের ব্যবহারের কথাও আসিতেই পারে না। বরঞ্চ জ্যোতি শব্দ উপরোক্ত শ্রুতিতে যে তেজ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই প্রতিপন্ন হয়, কারণ এই প্রকরণে এমন

অনেক কথা আছে যেগুলি তেজেরই পরিচায়ক চিহ্ন অর্থাৎ যেগুলি একমাত্র তেজকেই নির্দ্দেশ করিতে পারে, ব্রহ্মকে পারে না। পূর্ব্বপক্ষ তাঁহার মতের সমর্থনে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির শেষাংশে উল্লিখিত এই একটী শ্রুতি বলিতেছেন—"ইহাই সেই জ্যোতি যাহা এই পুরুষের অন্তরে আছে।" এখন তেজের চিহ্ন কি? তেজের চিহ্ন হইতেছে উষ্ণতা এবং শব্দ অর্থাৎ যখন কোন-কিছু হুহু করিয়া জ্বলিতে থাকে, তখন দুইটা চিহ্নের দ্বারা আমরা তাহার তেজের পরিচয় পাই—এক, তাহার ঐ হুহু বা শোঁ-শোঁ শব্দ এবং দ্বিতীয়, তাহার উষ্ণতা। এই দুইটা চিহ্ন আমাদের দেহেও প্রকাশ পায়—এক, শরীর স্পর্শ করিলে তাহার উষ্ণতা উপলব্ধি হয় এবং দ্বিতীয়, কাণ দুইটা বন্ধ করিলে একটা শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা যায়; কাজেই মানিতে হয় যে, আমাদের দেহের ভিতরে তেজ আছে। অন্যতর শ্রুতিতে জ্যোতি সম্বন্ধেই ঐ দুইটী লক্ষণ বা চিহ্ন উল্লিখিত হইয়াছে; কাজেই পূর্ব্বপক্ষ তাঁহার উল্লিখিত শ্রুতির জ্যোতি শব্দকে তেজ অর্থেই এবং জঠরাগ্নির তেজ অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর তিনি বলেন এই যে, যখন শেষোক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির জ্যোতিই শেষোক্ত শ্রুতির জ্যোতি অর্থাৎ উভয় শ্রুত্যুক্ত জ্যোতি শব্দ একার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন প্রথমোক্ত শ্রুতির "দ্যুলোকের পরবর্ত্তী জ্যোতি"ও জঠরাগ্নির সহিত অভিন্ন বলিয়াই ধরিতে হইবে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে পূর্ব্বপক্ষের প্রথম যুক্তি যে, প্রকরণের কোথাও পরমাত্মাবাচী ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ নাই, তাহা সঙ্গত নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদের গায়ত্রী বিদ্যাকে টীকাকার দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রথম খণ্ডের নাম গায়ত্রীখণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের নাম হৃদয়চ্ছিদ্রোপাসনাখণ্ড। গায়ত্রীখণ্ডে "সমস্ত ভূত ইঁহার একাংশ মাত্র, ইঁহার অবশিষ্ট তিন অংশ স্ব মহিমাতেই আছে" এই শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান অধিকরণ ধৃত শ্রুতিতে "যৎ" শব্দের দ্বারা সেই ব্রহ্মই অনুসূচিত হইতেছেন। "যৎ" শব্দ বা "যাহা" ব্যবহার করিলেই পূর্ব্বের উল্লিখিত একটা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা আসে বা কোন-কিছু অনুসূচিত হয়। বর্ত্তমান অধিকরণ-ধৃত শ্রুতিতে "যে জ্যোতি দীপ্তি পাইতেছে" বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কাজেই এখানে এই আকাঙ্ক্ষা বা প্রশ্ন উঠিল—'যে জ্যোতি—কোন্ জ্যোতি?' সিদ্ধান্তপক্ষ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, গায়ত্রী-বিদ্যার প্রথম খণ্ডে "এই সমস্ত ভূত এই ব্রহ্মের একাংশমাত্র" বলিয়া যে অনন্ত ব্রহ্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, "যে" শব্দের দ্বারা সেই ব্রহ্মই অনুসূচিত হইতেছে। কাজেই বলিতে হয় যে, পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি যে ব্রহ্ম শব্দ উক্ত শ্রুতির অসন্নিহিত বা নিকটে নাই, সেই আপত্তি নিরস্ত হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষের মনে আর একটা আপত্তি উঠিয়াছিল এই যে, ব্রহ্ম শব্দ নিকটে না থাকিবার যে আপত্তি ছিল তাহা কাটিয়া গেলেও জ্যোতি শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইবে কি প্রকারে—আমরা তো দেখি যে, যাহা প্রকাশ করে, যাহার অস্তিত্বের কারণে অন্য কোন কিছু প্রকাশ পায় তাহাই জ্যোতি; ব্রহ্মের সে প্রকার কি গুণ আছে যে, আমরা ধরিতে পারি যে, শ্রুতিতে তাঁহাকে জ্যোতি বলা অসম্ভব নহে? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে জ্যোতি শব্দ প্রকাশকত্ববাচী ধরিলেও ব্রহ্মেতে যে তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে না এমন নহে; কারণ, ব্রহ্মও জগত প্রকাশ করিতেছেন—শ্রুতিতে আছে "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" তাঁহারই জ্যোতিতে এই সমস্তই প্রকাশ পাইতেছে।

পূর্ব্বপক্ষের তৃতীয় আপত্তি ছিল এই যে, আমাদের অন্তঃস্থিত জ্যোতির পরিচয় পাই তেজের দ্বারা এবং তেজের চিহ্ন হইল উষ্ণতা ও শব্দ। এখন, আকাশের পরবর্ত্তী জ্যোতি ও আমাদের অন্তরস্থিত জ্যোতি যখন এক বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তখন সেই আকাশের পরবর্ত্তী জ্যোতিও আমাদের অন্তরস্থিত জ্যোতিরই ন্যায় নৈসর্গিক জ্যোতি। সিদ্ধান্ত পক্ষ তাহার উত্তরে বলেন এই যে, আমাদের অন্তরস্থিত জ্যোতি এবং আকাশের পরবর্ত্তী জ্যোতি উভয়ই প্রকৃতপক্ষে এক ও অভিন্ন, কিন্তু আমাদের অন্তরস্থিত জ্যোতির পরিচায়ক তেজের চিহ্ন যে উষ্ণতা ও শব্দ অনুভব করি, তাহা আকাশের পরবর্ত্তী জ্যোতি বা ব্রহ্মের

উপর উপাধিকৃত কল্পনামাত্র। যে শুভ্র আলোক বাহিরে আছে, সেই আলোকই ঘরের ভিতরেও আসিতেছে, কিন্তু ঐ আলোক যখন সবুজ কাচের ভিতর দিয়া আসে, তখন তাহা সবুজ রং ধারণ করে; আবার সেই একই আলোক যখন লাল কাচের ভিতর দিয়া আসে, তখন তাহা লাল আকার ধারণ করে। এখানে সবুজ লাল কাচগুলি উপাধি হইল। শুভ্র আলোক শুভ্র আলোকই ছিল, কিন্তু যখনই তাহা সবুজ লাল কাচের ভিতর দিয়া আসিতে লাগিল, তখনই তাহা বর্ণবিশিষ্ট বা ঔপাধিক আলোক হইয়া পড়িল, এবং তখনই আমরা সেই অখণ্ড শুভ্র, কিন্তু বর্ত্তমানে ঔপাধিক আলোকের উপর সবুজ লাল প্রভৃতি রং আরোপ করিতে লাগিলাম। সেইরূপ সেই আকাশের পরবর্ত্তী জ্যোতি বা ব্রহ্ম এবং আমাদের অন্তরস্থিত জ্যোতি আসলে এক ও অভিন্ন হইলেও আমাদের অন্তরের ভিতর দিয়া যখনই প্রকাশ পাইতে থাকেন, তখনই তিনি ঔপাধিক হইয়া পড়েন, এবং তখনই আমাদের অন্তরস্থিত জ্যোতির পরিচায়ক তেজের চিহ্ন উষ্ণতা ও শব্দও সেই আসলে অখণ্ড ব্রহ্মজ্যোতির উপরে আমরা আরোপ করিয়া দেখিমাত্র। সিদ্ধান্তপক্ষ এই যুক্তির উপর দাঁড়াইয়া বলেন যে অধিকরণধৃত শ্রুতির জ্যোতি শব্দ ব্রহ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষ আবার এই সংশয় উঠাইলেন যে, গায়ত্রীখণ্ডে গায়ত্রীছন্দের বিষয়েই বলা হইতেছে; তাহার মধ্যে সহসা ব্রহ্মের কথা আসিবে কেন? তাহা সম্ভব নহে। প্রত্যেক ছন্দই চতুষ্পাদাত্মক বা প্রত্যেক ছন্দেরই চারিটা করিয়া ভাগ থাকে। গায়ত্রীখণ্ডেও গায়ত্রীবিষয়ে বলিতে গিয়া তাহার চারিটা ভাগের কথা বলা হইয়াছে—ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়। ছন্দমাত্রই বাগাত্মক; গায়ত্রীখণ্ডেও গায়ত্রীকে বাক্ বলিয়া বলা হইয়াছে। এই দুইটী সাদৃশ্যের উপর দাঁড়াইয়া পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে গায়ত্রীখণ্ডে গায়ত্রীছন্দেরই বিষয় বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের বিষয় বলা হয় নাই। সিদ্ধান্তপক্ষ তদুত্তরে বলেন এই যে, এখানে প্রকৃতপক্ষে গায়ত্রী ছন্দের বিষয় বলা হয় নাই—ব্রহ্মেরই বিষয় বলা হইয়াছে। কতকগুলি অক্ষর সন্নিবেশের দ্বারাই ছন্দমাত্র সিদ্ধ হয়; গায়ত্রীছন্দও কতকগুলি অক্ষর সন্নিবেশের ফল। কিন্তু গায়ত্রীখণ্ডে বলা হইয়াছে—"গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ"—"গায়ত্রীই এই সমস্ত ভূত—এই যাহা কিছু;" এখানে অক্ষরসন্নিবেশের কোনই কথা আসিতেই পারে না। আর শ্রুতিতে ইহাও দেখা যায় যে, গায়ত্রীরূপী ব্রহ্মেতে চিত্ত সমর্পণের কথাও উল্লিখিত আছে। কাজেই গায়ত্রীখণ্ডের গায়ত্রীকে ছন্দঃস্বরূপ বলা যাইতে পারে না, ব্রহ্ম বলিয়াই ধরিতে হইবে।

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যে চতুষ্পাদ বলা হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদসম্মত। এই গায়ত্রীখণ্ডে গায়ত্রীকেও চতুষ্পাদ বলা হইয়াছে এবং "এই সমস্ত ভূত", "পৃথিবী", "শরীর" এবং "হৃদয়" এই চারিটাকে গায়ত্রীর চারিটা পাদ বলিয়া ধরা হইয়াছে। এখন, পূর্ব্বপক্ষের মতে যদি গায়ত্রীকে কেবল ছন্দ হিসাবেই ধরা যায়, তাহা হইলে "এই সমস্ত ভূত" প্রভৃতিকে সেই ছন্দের এক একটা অংশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে এখানে গায়ত্রী অর্থে ব্রহ্ম।

বর্ত্তমান অধিকরণের শেষ কথা এই যে, "সমস্ত ভূত ইহাঁর এক পাদ, এবং ইহাঁর অমৃতস্বরূপ তিন পাদ 'দ্যুলোকে' আছে" এই শ্রুতিতে আছে "দিবি" বা দ্যুলোকে। "দিবি" শব্দ সপ্তমী বিভক্তিতে সিদ্ধ—ইহার অর্থ দ্যুলোকরূপ আধারে বা অধিকরণে। বর্ত্তমান অধিকরণে ধৃত অপর শ্রুতিতে আছে "এই দ্যুলোকের পরবর্ত্তী যে জ্যোতি দীপ্তি পাইতেছে"—এখানে "দ্যুলোকের পরবর্ত্তী" বলা হইয়াছে—অবধি অর্থে পঞ্চমীবিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষের কথা এই যে, শ্রুত্যুক্ত জ্যোতি শব্দের অর্থে যদি ব্রহ্ম ধরা হয়, তবে যে ব্রহ্মকে "দ্যুলোকে আছেন" বলিয়া বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মকে আবার "দ্যুলোকের পরবর্ত্তী" বলা সঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, ঐ দুই প্রকার উক্তির মধ্যে কোনই বিরোধ নাই। ধরা যাক্ যে একটা গাছের ডগায় একটা পাখী বসিয়া আছে। আমরা তাহাকে দুইভাবে ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি—এক, "গাছে পাখী বসিয়া আছে", এবং দ্বিতীয়, "গাছের ডগার

উপরে পাখী বসিয়া আছে"। এখানে একই বিষয়কে দুই প্রকারে ব্যক্ত করা হইয়াছে মাত্র—সত্য সত্য দুইটী পাখী বা দুইটী বিভিন্ন বিষয়ের কথা বলা আমর উদ্দেশ্য নহে। সেইরূপ এখানেও উপরোক্ত উভয় শ্রুতিতেই একই ব্রহ্ম উদ্দিষ্ট হইয়াছেন ধরা অসঙ্গত হইবে না।

কুমারী স্পিনারের পত্র ও তদুত্তর।

আজ ২৫ বৎসরের উর্দ্ধ অতীত হইল, শ্রীমান উইলফ্রিড স্পিনার জাপান হইতে দেশে ফিরিবার সময় কলিকাতায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জর্ম্মনির উদারমতের খৃষ্টধর্ম্ম পচারক স্বরূপে তিনি জাপানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে একদিন তাঁহাকে সকল ব্রাহ্মসমাজ মিলিতভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেই অভ্যর্থনাসভায় তিনি সমস্ত পৃথিবীতে উদারমতের উন্মেষের কথা বলিয়া ব্রাহ্মসমাজকে এক মহান্ আশাবাণী শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা যে আজ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। তাঁহার পত্র ও আমাদের প্রদত্ত তদুত্তর সাদরে প্রকাশ করিলাম। বিদেশীয়ের নিকটে ব্রাহ্মসমাজের মিলনের জন্য আগ্রহ দেখিয়া আমরাও যদি সত্য-সত্যই মিলনের জন্য আগ্রহান্বিত হই, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজে নবজীবন সঞ্চারিত হইবে নিঃসন্দেহ।

To Kshitindra Nath Tagore Esq.
Secretary, Adi Brahmo Somaj
Calcutta,—India.

Zurich 19 Oktober 20.

Dear Sir,

Mister Satyendro Nath Tagore whom I addressed in some questions about the Brahmo-Somaj and to whom I am indebted for his very valuable information has given me your address for further details—I write to you with the more confidence as my father, the late pastor Wilfrid Spinner who was in India returning from Japan in 1891, was known to you and spoke of you in very friendly terms. Therefore I trust you will allow me a few questions. In the first place I should be thankful if you could :give me some certain informations about the present standing of the Brahmo Somaj raising. Is this religion this day only the religion of the cultivated circles of India without the possibility of becoming the wealth of broader communities? Have the Samajes still now after the death of their great leaders growth, inner life and a considerable field of action? I am very glad to hear from Mister Satyendro Nath that he believes that the somajes are at one as regards the fundamental principles. It would be a great thing, if the present time could at least overcome the old contrast and enmities which to us Europeans look so small as we look at them from a great distance. —It would be of great interest to me, to hear what your footing is in regard to Christianity. I am well aware that the Adi Brahmo Somaj was always rather diffident against Europe and Christianity contrary to Keshab Chandra Sen. Meanwhile things with us have vividly changed or are on the way to do so. For years the enmity and even more the indifference against Christendoom and every religious feeling increases, and more still since the war. Many who are at the spiritual head stand quite outside religion. And yet just now one tries to find a way out of the flatness and emptiness of our present life to new depths, and we feel, more than ever, the longing for a higher aim of our life. I am convinced, that this longiug is not only promient in Germany. Everywhere the desire for true religion is reviving and first of all we, the young generation are those who search and anticipate that the future will make great revolutions necessary. Much as we know that cold eclecticism cannot help us, and much as I believe that we cannot in reality rise higher than true Christanity yet I think that our religion must become deeper, more vivid and wider. Therefore

the Brahmo Somaj motion in India is for me a certain emblem. You will uuderstand, that this letter is written as well as from my personal and the commiom interest.

Believe me, dear sir, Yours sincerely

Gerhard Spinner

My address: Heidelberg Kaiserstrasse 25 Germany.

পত্রোত্তর।

Miss G. Spinner,

Heidelberg Kaiserstrasse 25 Germany.

Dear Miss Spinner,

I need hardly tell you what a great pleasure it has been to me personally to receive your kind letter of the 19th October last I still remember your talented father Mr. Spinner distinctly and as I read your letter, his face and tall figure vividly come back to my mind. Indeed it seems to me but yesterday when he visited India; I was then Secretary to the Adi Brahmo Somaj, and in that capacity it was my proud privilege to arrange for the public reception which was accorded to him. It is a pity I have not got a photo of his, and I shall deem it a favor if you could present one to me. Now I come to your querries about the Brahmo Somaj and its rellgion. Brahmoisim is being of course propagated, but for the present, appeal is pratically made only to the educated classes. But Brahmoism or real theism is so simple in its principles, that I doubt not but that it could be brought home to the minds of the non-educated classes as well, provided it was propagated in its true spirit and on proper lines. I am afraid there has been a perceptible decadence in religious life of the Brahmas since the death of their leaders, but germs of piety are still there which are sure to sprout up again under favourable conditions.

My uncle Mr. Satyendro Nath Tagore is quite right in saying that the three sections of the Brahmo Somaj have very little difference as regards the fundamental principle of Brahmoism itself. It is only in the matter of outward usages that they differ. I am at one with you in thinking that "it would be a great thing if the three sections could over-come their differnces". I certainly consider the present moment to be a very opportune one for an attempt in this direction. Efforts are being made to that end but it is to be regretted only in a very small and spasmodic way.

So far as Europe is concerned, it is quite natural that after the last great war with death at every step, there should be a revolt against dogmatic Christianity or for the matter of that, against every dogmatic religion, and that in its place there should come to every one's mind at times a longing for higher life, and specially for a more perfect form of creed, which should ensure a closer bond between the outer and the inner life of humanity. Mere eclecticism will not do, though no religion can be altogether without more or less of that. That religion must find a truer response in our hearts, wherever it may arise, which would enable us to live better and nobler lives. With best wishes for a happy new year, I remain

Yours Sincerely

Kshitindro Nath Tagore

অবতারবাদ ও মহাপুরুষ।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

মহাপুরুষ ধন্য। যে জাতির ভিতরে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে জাতি ধন্য। যে জাতি সেই মহাপুরুষের সম্মান করিতে জানে সে জাতি আরও ধন্য। যে দেশে মহাপুরুষের আদর নাই, সে দেশ বর্ব্বরতার লীলাভূমি।

মহাত্মাগণের জীবন আলোচনা করিলে, মানুষ যে অমৃতের সন্তান, মানুষ যে বিশ্ববিধাতার চরম

সৃষ্টি, মানুষ যে দেবতা অপেক্ষাও বড় হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যখন জগতে নানা প্রকার সঙ্কীর্ণতা স্বার্থ ও জটিলতা দেখিয়া সংসারের উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মে তখন এই সকল মহাত্মাগণের পবিত্র জীবনী আলোচনা করিলে আবার মানবত্বের উপর শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। তখন বুঝিতে পারি, "মানব কি" "মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি" এবং "কি জন্য মানব পৃথিবীতে আসিয়াছে"। তখন বুঝিতে পারি যে কেবল আহার-নিদ্রাই মানুষের চরম লক্ষ্য নহে, প্রধান কর্ত্তব্য নহে। তখন বুঝিতে পারি যে প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে দেবতারও বড় হইতে হইবে। তখন বুঝিতে পারি যে মানুষ এই মর্ত্ত্যের ধূলির উপর দাঁড়াইয়া সগর্ব্বে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বলিতে পারে— "সূর্য্য তুমি সূর্য্য বটে কিন্তু মানুষ নও"।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যখন কোনো একটা জাতি বা ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময় হয় তখন সেই জাতি বা ধর্ম্ম-চক্রের ভিতরে তদুদ্দেশ্যসাধনোপযোগী মহা-পুরুষের আবির্ভাব হয়। প্রকৃতি যেন পূর্ব্ব হইতেই এই মহদ্ব্যাপার সংঘটনের একটা আভাস পায়। প্রকৃতি যেন আপনা হইতেই তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহকে সেই মহাপুরুষের আবির্ভাবের অনুকূল করিয়া লয়। মানবের বহু ভাগ্যফলে এই প্রকার মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়। এই প্রকার মহাপুরুষগণই কালে অবতার বলিয়া কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা কোনো নির্দ্দিষ্ট জাতির মধ্যে অথবা সমগ্র জগতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মানুষের ইহা চিরন্তন স্বভাব যে, সে শক্তির কাছে মস্তক অবনত করিবেই। সাধারণ লোকের অপেক্ষা যেখানেই যাঁহার মধ্যে কোনো অসাধারণ শক্তির বিকাশ দেখিতে পায়, মানুষ তাঁহার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয়া ধন্য হইতে চাহে। প্রত্যেক মানবজীবনের মধ্য দিয়াই বিশ্বস্রষ্টা তাঁহার চর-মোদ্দেশ্য সফল করিতে চাহেন। ভগবান সকলের মধ্যেই আছেন। যাহার মধ্যে ঐশী শক্তির যত বেশী বিকাশ হয়, সে-ই তত শ্রেষ্ঠ। এইরূপ অলোকসামান্য মহাত্মাগণকেই অবতার বলা যায়। নতুবা অবতার বলিতে পূর্ণাঙ্গ মানব ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না। পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থেই ঈশ্বর আছেন।

কাহারো মতে মহাপুরুষ-পূজার প্রবৃত্তি হইতেই জগতে অবতারবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

অবতারবাদ মানিতে গেলে মানুষের উপর শ্রদ্ধা হারাইতে হয়। মানুষ অতবড় হইতে পারে না, ইহা ভাবিতে গেলেই অবতার মানিতে হয়।

মানুষ খুব বড়; মানুষের লক্ষ্য অনেক উচ্চ ইহা ভাবিলে আর অবতারবাদ মানিবার প্রয়োজন হয় না। মানবসমাজের ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবতারবাদের হ্রাস হইবে। যে দিন মানুষ বুঝিতে পারিবে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "নেহনানাস্তি কিঞ্চন" তখনই অবতারবাদ আপনাআপনি চলিয়া যাইবে।

মানুষ মাত্রেই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সর্ব্বদাই আদর্শের অনুসরণ করিতেছে। আদর্শা-নুসরণ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। মানবের আদর্শ মানুষই হওয়াই উচিত। যদি ভাবি, অমুক মহাত্মা ঈশ্বরের অবতার মাত্র, তবে তাঁহাকে কেবল পূজা করিতে পারি কিন্তু সর্ব্বথা তাহার মত জীবন গঠন করিবার চেষ্টা করিতে সাহসী হইতে পারি না; কারণ মানবের ঈশ্বরত্ব লাভ করা সহজ কথা নহে। যদি বুঝি যে পরমহংসদেব মানুষ ছিলেন, তাহাতে আমাদের প্রাণে আশা হয় যে, আমরাও ঐরূপ হইতে পারি। কিন্তু দেবতা বা অবতার বলিয়া ভাবিলে এ আশাটুকু থাকে না।

পূর্ব্বেই কহিয়াছি—যখনি জগতে ধর্ম্মবিপ্লব এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখনি মহাপুরুষগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া মানবসমাজের উন্নতিবিধান করেন।

বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি সকল মহা-পুরুষেরাই এই মহদুদ্দেশ্য সাধনকল্পে বিশ্বে আবি-র্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রথমতঃ ইহাঁদের অনেক ঝঞ্ঝাট অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। ইহাঁদের পুণ্যপূত দেহে বজ্রের শক্তি, প্রাণে অনাবিল শুভ্র পবিত্রতা; ইহাঁদের চক্ষে বিদ্যুৎ, বাক্যে মেঘগর্জ্জন, হৃদয়ে সূর্য্যের তেজ। কোনো প্রকার বাধাবিঘ্নই ইহাঁদের

গন্তব্য পথ রোধ করিতে পারে না। বাধাবিঘ্ন সমূহ কেবল ইহাঁদের মহত্ত্বের মহিমা বৃদ্ধি করে মাত্র। অহঙ্কার ইহাঁদিগকে স্ফীত করে না; সঙ্কীর্ণতা ইহাঁদিগকে সঙ্কুচিত করে না। দেশ-কালের বন্ধন ইহাঁদিগকে বদ্ধ করিতে পারে না। এই মহাপুরুষগণের নাম স্মরণ করিলে জীবন পবিত্র হয়, ইহাঁদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মনুষ্যত্বের উপর শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। মহাপুরুষ জগতে অল্পই জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু অল্প হইলেও ইহাঁদের প্রভাবেই এই নিখিল বিশ্বকেন্দ্র স্থির রহিয়াছে। দুর্দ্দিনে এই সকল মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিলে হৃদয় আশ্বস্ত হয়। যতদিন জাতীয় জীবনে এইরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব না হইবে, মহাপুরুষের শক্তি সংক্রমিত না হইবে মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত না হইবে, ততদিন জাতীয় উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

কোনো মহাপুরুষই কোনো নির্দ্দিষ্ট জাতি, সম্প্রদায় অথবা দেশবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে। মহাপুরুষ, সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক। বিশ্বই মহাপুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র; সমস্ত মানবজীবনই তাঁহার জীবন; সমস্ত বিশ্বের শক্তিই তাঁহার শক্তি; সমস্ত জগতের কল্যাণসাধনই তাহার উদ্দেশ্য। মহাপুরুষের জীবনের কোন জাতি অথবা সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে অনুষ্ঠিত কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধক অনুষ্ঠান অবশেষে সমস্ত জগতের অনুকরণীয় হইয়া থাকে।

খুব সাধারণ লোকেও সহসা একটা খুব বড় কাজ করিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র-তুচ্ছ ব্যাপার সম্পাদনের ভিতরেও যিনি ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ। তাই একজন মহাপুরুকে বুঝিতে হইলে কেবল তাহার বড় বড় কাজগুলির প্রতিই লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না; তাঁহার দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্রতুচ্ছ অনুষ্ঠানগুলির বিষয়ও ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

কোনো কোনো মহাপুরুষের জীবন অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায়। ইহাঁরা লোকলোচনের অন্তরালে একান্ত অনাড়ম্বরে নীরবে জগন্মঙ্গলোদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়া থাকেন। বহুকাল পরে বিশ্ববাসীগণ তাঁহার কার্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হয়। ইহাঁরা যশের প্রত্যাশী নহেন। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অনেক মহাপুরুষ নীরবে জন্মগ্রহণ করিয়া নীরবে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহাদের কল্যাণকর অনুষ্ঠানের প্রভাবে জগতের মেরুদণ্ড স্থির রহিয়াছে। জগতের রীতিই এই যে অতীতের অপেক্ষা বর্ত্তমানের আদর অনেক বেশি। অতীতের মহাজঠরেই যে বর্ত্তমানের বীজ উপ্ত থাকে মানুষ অনেক সময়েই তাহা ভুলিয়া যায়। সেই জন্য যে মহাপুরুষগণ প্রথমতঃ প্রবর্ত্তনের যুগে কোনো কল্যাণকর অনুষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপনের সহায়তা করেন, সাধারণ লোকে তাহাঁদের অপেক্ষা আধুনিক মহাপুরুষগণকেই সমধিক শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। এমন কি অতীত কালের সেই মহাত্মাগণের প্রতি সময়ে সময়ে স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধিগর্ব্বে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

আপাততঃ আধুনিকগণের কার্য্যগুলি অধিকতর দেদীপ্যমান হইলও বুঝিতে হইবে যে, যে মহাসৌধ গঠিত হইয়াছে তাহার উপাদানসংগ্রহকর্ত্তা সেই প্রাচীনগণ। তাঁহাদের কার্য্যের বলেই এই মহাসৌধ গঠিত হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের কথা ছাড়িয়া দিলেও বহু পুরাতন কালে—মানবজাতির সভ্যতার শৈশব সময়ে—এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অনেক মহাপুরুষ জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় মহাপুরুষগণের বীরত্ব শস্ত্রে নহে শাস্ত্রে। রাজপ্রাসাদ, দরিদ্রকুটীর এবং তপোবন সর্ব্বত্রই ভারতীয় মহাপুরুষগণের উৎপত্তিস্থান।

মহাপুরুষ দুই জাতীয়। কোনো কোনো মহাত্মা জীবন্মুক্ত হইয়া আর পার্থিব কোনো কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না; কেহ বা জীবন্মুক্ত হইয়াও জগন্মঙ্গলোদ্দেশ্যে কার্য্য করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানুষমাত্রেই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সর্ব্বদাই আদর্শের অনুসরণ করিতেছে। আদর্শানুসরণ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। আমরা সকলেই পৃথিবীতে অনুকরণ করিতেছি মাত্র, কেহই কিছু নিজে সৃষ্টি করি না।

মহাপুরুষেরাও একটা অভূতপূর্ব কোন-কিছুর সৃষ্টির মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন না।

ধরিতে গেলে এ জগতে মৌলিকতা বলিয়া কোন কথা থাকিতে পারে না। এইরূপ নিরপেক্ষ অস্পষ্ট মৌলিকতা স্বীকার করিতে গেলে সৃষ্টির সৃষ্টিত্ব থাকে না। যদিও স্যার আইজাক নিউটনকেই একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের আবিষ্কারক বলা হয়, তবু বুঝিতে হইবে, উহা তাঁহার অস্পষ্ট একটা কিছু নহে। তিনিও ঐ আবিষ্কারের মূলভিত্তি অপরের কাছে শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোনো ব্যাপারেই মানুষের আদর্শানুসরণ না করিয়া উপায়ান্তর নাই।

আদর্শ ভালমন্দ উভয়েরই আছে। যাহার যেরূপ আদর্শ সে সেইরূপ লোক হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, যে যেরূপ লোক সে সেইরূপই আদর্শ বাহির করে। ইহার কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা তাহা বিচারসাপেক্ষ। আমাদের মতে প্রথমটাই সত্য। এই কথাই যদি স্বীকার্য্য হয় যে, যাহার যেরূপ আদর্শ সে সেইরূপ লোক হইবে, তাহা হইলে বলা বাহুল্য যে, এই আদর্শ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিচক্ষণতার সহিত সদসদ্বিচার জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রকৃতি অসম্পূর্ণ। পৃথিবীতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সকলেই কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ মনুষ্য লইয়া তৃপ্ত হইতে পারে না,—এমন কোনো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ মনুষ্য জগতে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই আদর্শান্বেষণ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই আদর্শান্বেষণের মধ্য দিয়াই যেন মানবজীবনে ঈশ্বরধারণার অভিব্যক্তি হইয়াছে। প্রকৃতি অসম্পূর্ণ, মানব অসম্পূর্ণ, মানব আদর্শকে ধরিয়া সম্পূর্ণ হইতে চাহে। তাই ক্রমে যখন প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা কেবল তাহাকে আহত ও ব্যথিত করিতে থাকে, তখন মানুষ ক্রমে মহৎ আদর্শ হইতে মহত্তর আদর্শ অবলম্বন করিয়া অবশেষে মহত্তম আদর্শ ভূমার সন্নিধানে উপস্থিত হয়। মানুষের অপূর্ণতা দেখিয়াই আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সম্পূর্ণতা ধারণা করিয়া লই এবং ইহা দ্বারাই প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে আরম্ভ করি। মানুষের চরম আদর্শ কখনই মানুষ হইতে পারে না। যেখানেই মানুষ কোন ব্যক্তিবিশেষকেই চরমাদর্শ করিতে গিয়াছে, সেখানেই প্রথমে তাহার স্বকীয় ব্যক্তিত্বের মৃত্যু, পরে ঘোর অবনতি। মানুষকে চরম আদর্শ করিতে গেলে, ঈশ্বরের স্থানেই মানুষকে বসাইতে হয়।

মানুষকে চরমাদর্শ করিয়া ঈশ্বরের স্থানে তাঁহার আসন দিলে, আর এক দোষ হইতে পারে। মানুষ ঠকিয়াই চিরদিন শিখিয়া আসিতেছে। সর্ব্ব প্রকারেই আদর্শানুসরণ করা আমাদের অভ্যাস। যখন আমরা অনুসরণীয় আদর্শের কোন কার্য্যের অনুকরণ করিয়া ঠকিয়া বসি, তখনই আদর্শের উপর আমাদের অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে, এবং কাজেই জীবনের গতি বিপর্য্যস্ত হয়। মানুষের দুর্ব্বলতা একপ্রকার স্বাভাবিক। সুতরাং এরূপ আদর্শের দোষগুণ অবশ্যম্ভাবী। এখন জিজ্ঞাস্য এই—তবে কি আর কোন প্রকারেই মানুষের আদর্শ মানুষ হইতে পারে না? তবে আমরা দাঁড়াইব কোথায়? প্রথম কোথায় আদর্শ পাইব? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মানুষের আদর্শ অবশ্য মানুষ হইতে পারে; কিন্তু কথা এই যে, মানুষ যেন সেই প্রথমাদর্শটির কাছে গিয়াই থামিয়া না পড়ে, তাহার ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামীর আদর্শ, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়াচার্য্য পরমহংসদেব। বিবেকানন্দ স্বামী আমাদের জাতীয় ধর্ম্মের অন্যতর আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। অবশ্য সকলেই তাঁহার মত গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে এমন কথা বলা যায় না।

তাঁহার সাধনার উপায়গুলি সর্ব্বথা গ্রহণীয় না হউক কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য আমাদের অবলম্বনীয়ই সকল মহাপুরুষেরা যদিও উদ্দেশ্য একমাত্র জগতের কল্যাণ তবু তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থা বিভিন্ন প্রকারের। এক প্রকার পন্থানুসরণ সকলে করিতে পারে না।

মহাপুরুষকে শুধু পূজা করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল না। তাঁহাকে রীতিমত বুঝিয়া লইতে হইবে। আবার কেবল বুঝিলেই চলিবে না, তাঁহার সাধু কার্য্যগুলির অনুসরণ করিতে হইবে। আশঙ্কা হয়, আমাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র কোন মহাত্মাকে অবতার বলিয়া ধরিয়া লইয়া অবতারবাদী হইতে চাহি! এইজন্যই এত কথা লিখিলাম। ভক্তি ও শ্রদ্ধা নাম্নী মনোবৃত্তিদ্বয়ের যে কোনো একটি যখন একান্ত নিয়মাতিরিক্ত অসংযতভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এবং স্বাভাবিক মাত্রাকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভাব বাহুল্যকে প্রশ্রয় দেয় তখনি তাহার নাম হয় ভাবপ্রবণতা। ভক্তিপাত্রের আভ্যন্তরীণ প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিলেই ভক্তি ও শ্রদ্ধার এই শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত হয়। ইহাতে বিচারশক্তি লোপ পায়। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত প্রাগুক্ত ভাবপ্রবণতার এমনি আশ্চর্য্য রকম সৌসাদৃশ্য আছে যে অনেক সময়ে উহাকে

চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে। এবম্বিধ অবস্থাপন্ন অর্থাৎ অসার ভাবপ্রবণ লোকেরা একটা অদ্ভুত রকমের কল্পনারাজ্যে, যেথানে বাস্তবের সহিত সংশ্রব খুব কম, এবং যেস্থলে সমস্ত কার্য্যগুলি ঔপন্যাসিক নিয়মে সংসাধিত হয়, এরূপস্থলে বসিয়া কথনো আকাশ কুসুমের মালা গাঁথে, অথবা শূন্যমার্গে দোলায় চড়িয়া দুলিতে থাকে, আবার কথনো বা মানস-প্রসূত পন্থার সাহায্যে অচিন্তাপূর্ব্ব মায়ালোকে উড়িয়া বেড়ায়। এরূপ লোকের মানবপ্রকৃতিগত স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। ইহারা যাহা দেখিতে চায়, তাহা সৃষ্টির মধ্যে নাই; এবং যাহা করিতে চায় তাহা কেহ করে না অথবা করা উচিত নহে। এইরূপে মানুষ কল্পনারাজ্যের অত্যুচ্চ মায়াসৌধমঞ্চে বসিয়া "মনের মতন" একটা কিছু করিয়া রাখে, তারপর কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রের বন্ধুর ভূমিতে নামিয়া আসিলেই যথন দেখিতে পায় যে অবস্থা বড়ই বিভিন্ন রকমের, তথন কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে একটা নীরস ভেদমূলক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণরূপেই বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে। মানবপ্রকৃতির অন্তঃস্থলে স্বভাবতঃ এই ভাবপ্রবণতার সম্ভাবনা গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে, প্রশ্রয় পাইলেই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া জীবনযাত্রার পথে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটায়। অতএব আমরা অনেক সময় কল্পনার মধ্যে যে ভাবটাকে গড়িয়া তুলি, প্রায়শঃ বাস্তব জগতে যে তাহা ঘটিয়া উঠে না, ইহা বিশ্ববিধাতার একান্ত অনুগ্রহই বলিতে হইবে।

অবহিতচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের চিন্তা, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি সকল প্রকার কার্য্যই যেন একটু ক্রমে বাহুল্যদোষে দুষ্ট হইয়া পড়িতেছে। আমরা কোন সাধুর জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেই তাঁহাকে একেবারে বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ, মহম্মদ অপেক্ষাও বড় করিয়া তুলি। এইরূপ আবার কাহারও নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও আবশ্যকের অতিরিক্ত বলিয়া ফেলি। ইহাতে বুঝা যায় যে, কোন প্রবল বৃত্তির উচ্ছ্বাসকে আমরা আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারি না; ইহার প্রথম স্পন্দনেই এমন অভিভূত হইয়া পড়ি যে, তথন আর আমাদের কার্য্যকারী শক্তি যথাযথভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। প্রাগুক্ত কারণে আমাদের প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস হয় নাই এবং যথার্থ জীবনচরিতের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প।

অসার ভাবপ্রবণ লোকেরা প্রায়শঃ miracleএ আস্থাবান্। প্রকৃতির ভিতরে অথবা কোনো মহাপুরুষের জীবনে ইহারা অতিপ্রাকৃত কিছু না দেখিতে পারিলে যেন তৃপ্ত হইতে পারে না। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস স্থাপন একান্তই মানসিক দুর্ব্বলতা। অবতারবাদ এবং মানুষকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবাও এই প্রকার ভাবপ্রবণতার ফল। প্রকৃত ভক্তির সহিত কোন কালেই জ্ঞানের বিরোধ নাই, প্রকৃত ভক্তি ক্রমে জ্ঞানের দিকে লইয়া যায়। যে ভক্তির সহিত জ্ঞানের বিরোধ তাহাই ভাবপ্রবণতা। ভক্তি আমাদিগকে লইয়া যায় জ্ঞানের দিকে, আর অসার ভাবপ্রবণতা লইয়া যায় মোহের দিকে।

অসার ভাবপ্রবণতার সহিত সত্যের একান্ত বিরোধ। কারণ অসার ভাবপ্রবণতা বাস্তব পদার্থটাকে বাস্তব আকারে রাখিতে পারে না, তাহাকে অসার কল্পনা দিয়া পূর্ণ করিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে চায়। কিন্তু তাই বলিয়া শুষ্ক কল্পনা ও অসার ভাবপ্রবণতায় অনেক প্রভেদ। কল্পনা জানে যে সে কল্পনা, বাস্তব নহে। কিন্তু অসার ভাবপ্রবণতা কল্পনাকে সত্য বলিয়া মনে করে। এই ভাবপ্রবণতাসঞ্জাত অসার কল্পনার ফলে অনেক ধর্ম্মে নানাপ্রকার মিথ্যাচার প্রবেশ করিয়াছে।

যথন দেখি রোগীশয্যাপার্শ্বে সমাজবিশেষের সেবকবৃন্দ, যথন দেখি দরিদ্রের অভাবমোচনে সম্প্রদায়বিশেষের লোকবৃন্দ, যথন দেখি জাতিনির্ব্বিশেষে ব্রহ্মোপদেশদানে সেই সমাজের সেবকবৃন্দ অগ্রসর, তথন ভক্তিপুলকে রোমাঞ্চিত হই। তথন এই হিন্দু ধর্ম্মের সারভূত নির্য্যাসস্বরূপ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের প্রচারকদিগের লোকহিতৈষণা ও উদারতা দেখিয়া আশান্বিত হই। কিন্তু যথনই দেখি যে, সেই সকল সমাজ বা সম্প্রদায়ের অনেকে মূল স্থাপয়িতাকে নরোত্তম মানবাদর্শ ভাবিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন না, তাহাতে অবতারত্বের আরোপ করিতেছেন, তথনি কেমন খটকা লাগে। ইহাতে কি সেই মহাপুরুষের সম্মান বাড়িবে? আমরা মনে করি উহাতে তাঁহাকে ছোট করা হয়। এই অবতারত্ব আরোপে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক করিয়া তোলা হয়। যাহারা অবতারবাদের বিরোধী তাহারা তো এ মতের সহিত যোগদান করিতে পারিবে না।

সনাতনধর্ম্ম কোন ব্যক্তি, শাস্ত্র, অথবা মতবাদের উপর নির্ভর করে না। সনাতনধর্ম্ম সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ের ধর্ম্ম। অর্থাৎ মানবসাধারণের হৃদয়ে যে ধর্ম্মের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম মাত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য চিরদিনই সত্য এবং তাহা চিরকালই একরূপ। অন্যান্য অনেক ধর্ম্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে। যীশুখৃষ্টের ঐতিহাসিকতায় গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে তাহাতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রত্যবায় আছে। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের তাহা নহে। কারণ সনাতন ধর্ম্ম মাত্র সত্যের

উপর প্রতিষ্ঠিত। সনাতন ধর্ম্মমন্দিরে জাতিবর্ণ সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলেরই স্থান আছে; সকল শাস্ত্র হইতেই সত্য গ্রহণ করিবার পন্থা আছে। সনাতন ধর্ম্ম কাহারও সৃষ্ট নহে। চিরকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এই ধর্ম্ম খাঁটি ধর্ম্ম; বেদান্তের মূলীভূত কথাও ইহাই। সেই সনাতন ও বেদান্ত-প্রচারিত ধর্ম্মের মধ্যে অবতারবাদের অবতারণা করিয়া তাহাকে ক্রমে সাম্প্রদায়িকতায়পূর্ণ করিয়া ফেলা হইতেছে।

যে জাতির মূলমন্ত্র পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগ, সে জাতির অবতারবাদের অবসর কোথায়? যদি বল অবতারবাদ ধর্ম্মের বহিরঙ্গমাত্র; ইহাতে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই— তাহা সঙ্গত নহে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, অবতারবাদ স্বীকার করিলে ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা কিছুতেই রক্ষা করা যায় না।

মহাজনগণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, নানা মহৎভাবের মধ্যে একটি ভাব প্রধান হইয়া তাঁহাদিগের জীবনপথের নেতৃস্বরূপ হয়। তাঁহারা যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু করেন সেই ভাবটি তন্মধ্যে মধ্যবিন্দু হইয়া অবস্থিতি করে।

"আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন" উপনিষদ্‌কার-দিগের ইহাই প্রধান ভাব। বুদ্ধদেবের "বিশ্বব্যাপী মৈত্রী"; সক্রেটিসের—"আপনাকে আপনি জান"; ঈশার—"পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য"; মহম্মদের—"এক-মাত্র ঈশ্বরের পূজা, আর সকল পূজায় প্রতিবাদ"; লুথারের—"ধর্ম্মচিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা"; চৈতন্যের—"ভক্তিতেই মুক্তি"; থিওডোর পার্কা-রের—"মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি"; রামমোহন রায়ের—"সার্ব্বভৌমিক উপাসনা"; আর পরম-হংসদেব রামকৃষ্ণের "সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়"। প্রকৃতধর্ম্মের চরম লক্ষ্যের ভিতরে জাতিভেদ, অবতারবাদ বা পৌত্তলিকতার স্থান নাই। ইহার ভিত্তি "এক-মেবাদ্বিতীয়ম্" এই মহতী বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিতরে কোন প্রকার মতবাদের স্থান নাই; কিন্তু ইহাতে অধিকারীভেদে সাধনার অধিকার আছে।

আসল কথা এই যে মানুষ যেন প্রথম স্তরেই পড়িয়া না থাকে। যাহাতে ক্রমান্বয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

সত্য ধর্ম্ম অবলম্বনের অর্থে সকল ধর্ম্মই নির্ব্বি-চারে মানিয়া লওয়া নহে। এস্থলে আমি ধর্ম্মশব্দের ব্যাপক অর্থের কথা বলিতেছি না। সত্য ধর্ম্ম অবলম্বনের অর্থে আমি এই বুঝি—

প্রকৃত ধর্ম্ম চির সনাতন, শাশ্বত ও ধ্রুব। প্রত্যেক লিতচ ধর্ম্মের মধ্য হইতে তাহার বাহিরের খোসাগুলি ছাড়িয়া ফেলিলেই যে সত্য ধর্ম্ম প্রকাশ পাইবে তাহাই গ্রহণ করা। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই যে চরম লক্ষ্য মূলতত্ত্ব এক, তাহা উপলব্ধি করাই সত্যধর্ম্মের মূল ভিত্তি।

শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে ধর্ম্ম শব্দে Religion বুঝায় না। এই ধর্ম্ম শব্দকে Religion শব্দে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমরা বড় গোলে পড়ি। Religion সার্ব্বভৌমিক হইতে পারে না, কিন্তু ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। মহাত্মা বিবেকানন্দস্বামীর মতে আত্মস্বরূপ অবগত হওয়াই ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম যে কেবল মনুষ্যেরই মধ্যে আছে তাহা নহে। এ ধর্ম্ম মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, জড়, চেতননির্ব্বিশেষে সকলেরই ধর্ম্ম। সকলের মধ্যেই একমাত্র পরমাত্মা বিরা-জিত—তাঁহাকে ছাড়িয়া জগতে কিছু নাই। এই স্বরূপ বোধ হওয়াই ধর্ম্মবোধ। তৃণগুচ্ছ অবধি মানুষ পর্য্যন্ত পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থেরই ইহা একদিন বুঝিতে হইবে। এই বোধই ধর্ম্ম। মানুষ আর ঈশ্বর এক যোগে সম্বন্ধ। এই ধর্ম্মই "তত্ত্বমসি" "আত্মানং বিদ্ধি" "ব্রহ্মৈবাহং" প্রভৃতি তত্ত্বে পরিস্ফুট।

এ ধর্ম্মে আত্মবিকাশ ও আত্মানুশীলন আছে। কারণ আত্মস্বরূপ-জ্ঞান আত্মার অনুশীলন ও আত্ম-বিকাশ। এ ধর্ম্ম লাভ করিবার নহে, ইহা লব্ধ; মাত্র বিকাশ করিতে হইবে। এই ধর্ম্মই বেদান্তের ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মই সমস্ত মানুষের প্রাণের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষেই প্রচারিত হইয়াছে, এই জন্য বিবেকানন্দ বলেন ভারতবর্ষের ধর্ম্মই সমগ্র মানব-জাতির প্রাণের ধর্ম্ম। তাই তাঁহার অনুষ্ঠের কার্য্য ছিল জগতকে indianise করা।

এই ধর্ম্মের দুইটা দিকই আছে, একত্ব হইতে বহুত্বে এবং বহুত্ব হইতে একত্বে যাওয়া।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ এই ধর্ম্ম শব্দের বহু প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু যত প্রকার ব্যাখ্যাই থাকুক না কেন, অর্থযুক্ত ব্যাখ্যা হইলে সকল মতের ব্যাখ্যাই একপ্রকার হয়; বাহিরে অবশ্য আকারগত প্রভেদ থাকিতে পারে। ধর্ম্ম শব্দের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। "ধৃঙ্ অবস্থানে" এই ধাতুর উত্তর "মন্" প্রত্যয় দ্বারা ধর্ম্মপদ সাধিত। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না, যাহা বস্তুর প্রকৃতিস্বরূপ তাহাই তাহার ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মও সেইরূপ। যে গুণবিশেষ সূক্ষ্ম বীজভাবে থাকাতে আমরা মনুষ্য, যে সূক্ষ্ম গুণবিশেষের বিনাশে মনুষ্যত্বের হানি, যে সূক্ষ্ম গুণবিশেষ না থাকিলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, সেই সূক্ষ্ম গুণবিশেষই আমাদের ধর্ম্ম। সেই গুণবিশেষকে অপর ভাষায়

আমরা বলিতে পারি আত্মদর্শন। তাই আত্মদর্শনকেই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি বলিতে বাধা নাই।

সকল ধর্ম্মই এক, শাশ্বত, অনাদি ও সনাতন। তবু ব্যবহারিকভাবে জাতিসম্প্রদায়বিশেষে ইহার বহিরাকারগত বিভেদ হইয়াছে। যথা—হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, ইস্‌লামধর্ম্ম ইত্যাদি। ধর্ম্ম মহাবৃক্ষের উক্ত শাখাগুলির আবার নানা প্রকার উপশাখা আছে। যেমন হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্ম্মের হীনযান ও মহাযান; খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমাণ-ক্যাথলিক ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ধর্ম্ম যদি জীবনের এত প্রয়োজনীয়, শাশ্বত, সনাতন ও একপদার্থ, তবে তাহার এত বৈচিত্র্য ও বহুত্ব কেন? পূর্ব্বেই কহিয়াছি ধর্ম্ম শব্দে কেহ Religion বুঝিবেন না। Religion আর ধর্ম্ম এক কথা নহে।

আমরা বর্ত্তমানে ধর্ম্ম শব্দে বৈশেষিক দর্শনের সংজ্ঞা ধরিয়া লইব যথা—যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"; প্রকারান্তরে ইহারই অর্থ এই যে যদ্দ্বারা আত্মদর্শন হয় তাহাই ধর্ম্ম। জগতে আজ পর্য্যন্ত যত প্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত হইয়াছে—সকল ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার-লাভ। ধর্ম্ম যে শাশ্বত, অনাদি ও সনাতন পদার্থ, এই বৈচিত্র্য ও বহুত্বই তাহার প্রমাণ। আজকাল এই উন্নতির যুগে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার নিজের নিজের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মমত আছে। ইহাতে ধর্ম্মের ব্যাপকতা বৃদ্ধি হইয়া লোকের ধর্ম্মবুদ্ধির প্রসারতা আনয়ন করে। ধর্ম্মকে যেমন একের ভিতর দিয়া, তেমনি বহুর ভিতর দিয়াও জানিতে হইবে। না হইলে জানা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। এই বৈচিত্র্য ধর্ম্মের বাহিরের রূপ। একত্ব ইহার আন্তরিক রূপ। এই বহুত্ব দ্বারা ধর্ম্মের অনাদ্যনন্ত ভাব প্রতিপন্ন হইতেছে। বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের মধ্যেই জগতের অস্তিত্ব পর্য্যবসিত রহিয়াছে। বিচিত্রতাই জগত। জগতের চারিদিকেই বহুত্ব। এই বৈচিত্র্য দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলে চলিবে না, ইহার মধ্য দিয়া একত্বে পৌঁছিতে হইবে। বহুত্ব সেই একত্বকেই প্রকাশ করিতেছে। বহু না থাকিলে একের অস্তিত্ব থাকে কি করিয়া? অন্ধকারই আলোর প্রকাশক মানদণ্ড।

শোক সংবাদ।

৺ দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। নব্যভারত পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন বাবু পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত পত্রিকা বিশেষ নিপুণতার সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তিনি নির্ভীক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার আবাস-নিকেতন অনেক দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তির আশ্রয়স্থল ছিল। তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর সেবাধর্ম্মে অনেকেই বিমুগ্ধ হইতেন। দেবীবাবুর মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে নিজ শীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেন ইহাই প্রার্থনা।

৺ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র ও সাহিত্য পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির অকাল মৃত্যুতে আমরা নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। সকল প্রকার সভাসমিতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতম যোগ ছিল। তিনি একজন সুবক্তা ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিলেন। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণসাধন করুন।

বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩১শে চৈত্র বুধবার বর্ষ শেষ। প্রত্যেক জীবনের একটী বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

পরদিন ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার নববর্ষ। এদিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে অর্থাৎ প্রত্যূষে ৬৷ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

	পূর্ণ মূল্য।
পরলোকগত আচার্য্য ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত	
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	/০
ধর্ম্মদীক্ষা	৶০
সঙ্গীত মুক্তাবলী ১ম হইতে ৪র্থ ভাগ	৷৶০
গৃহকর্ম্ম	৷০
কুমার শিক্ষা	৷৷০
প্রশ্ন মঞ্জরী	৷৷০
প্রভাতকুসুম	৷/০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷৶০
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	৸/০
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত	
হরিলীলা	১৷০
স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত	
ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা	৷৷৶০
শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত	
ব্রহ্মনাম ও হরিনাম	৶০
নামতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব	৶০
মানব মণ্ডলে কি সুন্দর দেখায়	৶০
প্রণবতত্ত্ব	৶০
সহজ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য	৶০
উত্তরাখণ্ডের ধ্বনি	৶০
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	৷৶০
মহর্ষির কর্ম্মজীবন	১৷০
সাধু উমেশচন্দ্র	৷৶০
এ, কে, কৌকভ প্রণীত	
সঙ্গীত পরিচয়	৷৷০
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত	
Life of Dwarka N. Tagore	৷০
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঘোষ প্রণীত	
প্রবচন সংগ্রহ	৩

	পূর্ণ মূল্য।
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত	
নচিকেতা	৸০
স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত—	
হিত গ্রন্থাবলী	২৲
শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত—	
পদরাগ	৸০
মুদীর দোকান	১৷৷০
সপ্তস্বর	১৷৷০
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত	
আদর্শ বা দাদাঠাকুর	১৲
৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত	
* পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷৷০
* পারিবারিক প্রবন্ধ (৮ম সংস্করণ)	১৷৷০
ঐ (৭ম ঐ)	১৲
* সামাজিক প্রবন্ধ (চতুর্থ ঐ)	১৷৷০
* আচার প্রবন্ধ (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲
* বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় ঐ)	৷৷০
* ঐ ২য় ভাগ (তন্ত্রের কথা প্রভৃতি)	৷৷০
* স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস	৷০
* বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ	৷৷০
ঐতিহাসিক উপন্যাস (ষষ্ঠ সংস্করণ)	৷৷০
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব (পঞ্চম ঐ)	১৲
সংক্ষিপ্ত] ভূদেব জীবনী	৷৶০
অনাথবন্ধু [উপন্যাস]	১৷০
* সদালাপ নং ১ (সচিত্র)	৸০
* ঐ নং ২ (ঐ)	৸০
* ঐ নং ৩ (ঐ)	৸০
* নেপালী ছবি (ঐ)	৸০
Folk Tales of Assam—J. Barua.	১৷৷০